আশরাফুল হিদায়া

৯

লেখকবৃন্দ

মাওলানা মুফতি হাবীবুল্লাহ
মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, গুলশান, ঢাকা

মাওলানা যাকারিয়া
মুহাদ্দিস, জামিয়া সোবহানিয়া, ধউর, ঢাকা

মাওলানা বশীরুল্লাহ
মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, গুলশান, ঢাকা

মাওলানা মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইকরা চৌধুরীপাড়া, ঢাকা

মাওলানা আবূ বকর
মুহাদ্দিস, দারুল উলূম টঙ্গী, গাজীপুর

সম্পাদনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

পরিবেশক

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখকবৃন্দের প্রয়াস

■ মাওলানা মুফতি হাবীবুল্লাহ

كتاب الشفعة -এর শুরু থেকে كتاب القسمة -এর পূর্ব পর্যন্ত।

■ মাওলানা যাকারিয়া

كتاب القسمة -এর শুরু থেকে فصل فى كيفية القسمة -এর শেষ পর্যন্ত।

■ মাওলানা বশীরুল্লাহ

باب دعوى الغلط فى القسمة والاستحقاق فيها -এর শুরু থেকে كتاب المزارعة -এর শেষ পর্যন্ত।

■ মাওলানা মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান

كتاب المساقاة -এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

■ মাওলানা আবূ বকর

كتاب الذبائح -এর শুরু থেকে كتاب احياء الموات -এর পূর্ব পর্যন্ত।

আশরাফুল হিদায়া বাংলা

সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা

শব্দবিন্যাস ❖ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০

হাদিয়া : ৬৫০.০০ [ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]

সূচিপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين . اما بعد :

ফিকহে হানাফীতে হিদায়া গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের বিবেচনায়ই গ্রন্থখানি শত শত বছর ধরে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এবং সোয়া আটশ' বছরের অধিককাল যাবৎ এটি ফিকহশাস্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে সারা বিশ্বে পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষায় এর অনুবাদ ও ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। খোদ আরবি ভাষায় গ্রন্থখানির ভাষ্য প্রণীত হয়েছে সবচেয়ে বেশি; প্রায় অর্ধ শতকের মতো। বাংলাভাষায় ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে এর আংশিক অনুবাদ এবং ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও আনন্দের কথা যে, একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে কিছুদিন পূর্বে। অবশ্য শুধু অনুবাদের সাহায্যে হিদায়ার মতো গ্রন্থ ভালোভাবে বোঝা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাই এর একখানা নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভাষ্যগ্রন্থের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে, যা এখনো পর্যন্ত পূরণ হয়নি। উর্দু ভাষায়ও 'আইনুল হিদায়া' নামে এর একখানা সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ এবং 'আশরাফুল হিদায়া' নামে একখানা সবিশদ অপূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব একজন উচুঁমানের ও সাহসী হৃদয়ের মানুষ। তিনি বিশাল সাহস নিয়ে হিদায়ার একখানা পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করা ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে উর্দু ভাষ্যগ্রন্থ আশরাফুল হিদায়ার অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন এবং মরহুম হযরত মাওলানা ইসহাক ফরিদী (র.)-এর তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশের কাজে হাত দেন। ইতোমধ্যে তার দু'খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। হিদায়া আখেরাইনের জন্য উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ না করে হিদায়া'র প্রধান আরবি ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল কাদীর' ও 'আল-বিনায়া' সামনে রেখে প্রয়োজনবোধে উর্দু আশরাফুল হিদায়া থেকে সাহায্য নিয়ে একখানা মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করার পরামর্শ দেই। সে মোতাবেক তিনি আমাকে ফাতহুল কাদীর, আল-বিনায়া ও উর্দু আশরাফুল হিদায়া এ তিনটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশ সরবরাহ করেন। আমি গ্রন্থখানির একটি মৌলিক ভাষ্য প্রণয়নের কিছু মূলনীতি তৈরি করি এবং এ কাজের জন্য আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ও এক সময়কার কতিপয় মেধাবী ছাত্র, যারা বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক ও মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন, তাদেরকে মনোনীত করে তাদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করি। তারা হলেন, মাওলানা মুফতি হাবীবুল্লাহ, মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, গুলশান, ঢাকা; মাওলানা যাকারিয়া, মুহাদ্দিস জামিয়া সোবহানিয়া, ধউর, ঢাকা; মাওলানা বশীরুল্লাহ, মুহাদ্দিস জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, গুলশান, ঢাকা; মাওলানা মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান, মুহাদ্দিস, জামিয়া ইকরা চৌধুরীপাড়া, ঢাকা এবং মাওলানা আবূ বকর, মুহাদ্দিস দারুল উলূম টঙ্গী, গাজীপুর।

তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে উপরিউক্ত তিনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ সামনে রেখে হিদায়ার একখানা সহজবোধ্য, সাবলীল ও নির্ভরযোগ্য মৌলিক বাংলা ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং আমি গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দেখে পরিমার্জন ও সম্পাদনা করে দিয়েছি। সুতরাং হিদায়া আউয়ালাইনের ভাষ্যগ্রন্থ 'আশরাফুল হিদায়া বাংলা সংস্করণ' উর্দু আশরাফুল হিদায়ার অনুবাদ হলেও আখেরাইনের ভাষ্য অংশটি উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ নয়; বরং এটি হিদায়া আখেরাইনের একখানা স্বতন্ত্র ও মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ।

এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও একে 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণের ব্যাপারে আমার একটুখানি কৈফিয়ত আছে। একটি স্বতন্ত্র ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে এর আশরাফুল হিদায়া নামকরণে আমার জোর আপত্তি ছিল, কিন্তু জনাব প্রকাশক মহোদয়ের আবদার ছিল 'আশরাফুল হিদায়া' নামটি ধরে রাখার। কারণ তিনি ইতঃপূর্বে 'আশরাফুল হিদায়া' নামক ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এ নামে আউয়ালাইনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উর্দু আশরাফুল হিদায়ার দু খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশও করে ফেলেছেন। তাই তার আবদার রক্ষার্থে 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণে সম্মত হই। অবশ্য এর পক্ষে একটি যুক্তিও পেয়ে যাই যে, কখনো দেখা যায়, দুজন পৃথক পিতার দু'সন্তানের নাম একই হয়ে থাকে তাই বলে দু সন্তান তো আর এক হয়ে যায় না। পূর্ববর্তীতের রচনাবলিতেও আমরা এরূপ দেখতে পাই যে, একই নামে পৃথক দুই বা ততোধিক লেখক পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণকে অনুচিত বলা যায় না। অন্যের রাখা কোনো একটি নাম কারও পছন্দ হলে সে নামটি তো অন্য কেউ ধার করেও নিতে পারে। সমাজের অনেকে এমন তো নেয়ও। এতে তেমন অসুবিধা তো কিছু নেই।

হিদায়া গ্রন্থখানি এমনিতেই একটি সমুদ্র। আর একটি মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ তৈরি করা কত বড় কঠিন কাজ তা সহজেই অনুমেয়। এজন্য লেখকবৃন্দ, সম্পাদক, প্রকাশকসহ, সংশ্লিষ্ট সকলেই অটুট ধৈর্য, নিরলস শ্রম ও পর্যাপ্ত সময় এবং সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার তৌফিকপ্রাপ্তির বড় প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলার তার নিজ অনুগ্রহে সব কিছু সহজ করে দিয়েছেন। এজন্য সকল প্রশংসা তাঁরই।

হে মহান করুণাময় আল্লাহ! আমাদেরকে সবাইকে এবং সকল মানুষকে সকল নেক কাজে ইখলাস দান করুন। বিশেষ করে এ বিশাল কাজটির রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রুফ সংশোধন, প্রকাশনা ইত্যাদির সাথে যারা জড়িত ছিলেন এবং আছেন, তাদের সবার শ্রমটুকু কেবল দুনিয়ার জন্য না বানিয়ে আপনার প্রিয় দীনের উপকারার্থে কাজে লাগিয়ে সকলের পরকালের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন এবং আমাদের সবাইকে এর জাযায়ে খায়ের দান করুন। হে আল্লাহ! পরকালের পুরস্কারপ্রাপ্তিই বড় প্রাপ্তি। আমাদের শ্রম-সুনাম সবটুকু আপনার জন্য কবুল করে নিন। আপনি আমাদের কাউকে পরকালের প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমরা সবাই আপনার অনুগ্রহের ভিখারি। আপনি একমাত্র দয়ালু দাতা।

আরজগুজার

[মাওলানা আহমদ মায়মূন]

মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

كِتَابُ الشُّفْعَةِ : অধ্যায় শুফ'আ

ভূমিকা

এ অধ্যায়ের সাথে পূর্বের অধ্যায়ের ধারাবাহিকতার সম্পর্ক:

মুসান্নিফ (র.) 'আত্মসাৎ অধ্যায়ের' পর শুফ'আর অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। উভয় অধ্যায়ের মাঝে পারস্পরিক সামঞ্জস্য হলো, উভয়টিতেই অন্যের সম্পদ তার সম্মতি ছাড়া নিজের মালিকানায় নিয়ে নেওয়া হয়। তবে 'আত্মসাৎ' হচ্ছে হারাম আর শুফ'আ হচ্ছে বৈধ। এ দিকটি বিবেচনা করলে শুফ'আর আলোচনা প্রথমে করে তারপর আত্মসাতের আলোচনা করা অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল। কেননা বৈধ বিষয়কে আগে উল্লেখ করার পর অবৈধ বিষয় উল্লেখ করাই সঙ্গত। কিন্তু আরেকটি দিক বিবেচনায় 'আত্মসাৎ অধ্যায়' আগে আলোচনা করার অগ্রাধিকার পেয়েছে। তা হলো, ক্রয় বিক্রয়, ইজারা, শিরকাত, চাষাবাদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'আত্মসাৎ' সংঘটিত হয়। তাই এটি সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্র অধিক হওয়ার কারণে এর সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন বেশি। যাতে এ সকল ক্ষেত্রে মানুষ আত্মসাৎ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। তাই আত্মসাতের আলোচনা আগে করা হয়েছে। তাছাড়া শুফ'আ কেবল স্থাবর সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট আর আত্মসাৎ স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কাজেই আত্মসাৎ হচ্ছে 'ব্যাপক' আর শুফ'আ হচ্ছে তদপেক্ষা 'সীমিত'। আর সীমিত বিষয়ের উপর ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। তাই আত্মসাতের আলোচনা আগে করা হয়েছে।

শুফ'আর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ :

আভিধানিক অর্থ : اَلشُّفْعَةُ [শুফ'আ] শব্দটি اَلشَّفْعُ ধাতুমূল থেকে নির্গত। এর মূল অর্থ হচ্ছে– اَلضَّمُّ "মিলিত করা, সংযুক্ত করা।" যেমন বলা হয়– كَانَ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُ شَفْعًا "এটি একক তথা বেজোড় ছিল, আমি এটিকে [আরেকটির সাথে মিলিয়ে] জোড় বানিয়ে দিয়েছি।" اَلشَّفْعُ-এর বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে اَلْوِتْرُ তথা বেজোড়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : শুফ'আর পারিভাষিক সংজ্ঞা হচ্ছে– هِيَ تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ بِمَا قَامَ عَلَى الْمُشْتَرِيْ بِالشَّرِكَةِ أَوِ الْجِوَارِ "শরিকানা কিংবা প্রতিবেশিত্বের ভিত্তিতে ক্রেতার ক্রয়কৃত মূল্যে স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা লাভ করাকে শুফ'আ বলা হয়।" উল্লেখ্য, তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই শুফ'আর সংজ্ঞাটি এভাবেই করেছেন। যদিও শব্দের মাঝে কিছুটা তারতম্য রয়েছে, তবে সকলের সংজ্ঞার সারমর্ম এক। এরপর লেখক উল্লেখ করেছেন যে, এই সংজ্ঞার মাঝে একটি আপত্তি দেখা দেয়। আপত্তিটি হলো, সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে– تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ الخ "... স্থাবর সম্পত্তির মালিক হওয়াকে শুফ'আ বলে।" আর শুফ'আর অধ্যায়ে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শুফ'আ সাব্যস্ত হয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হলে, তা দৃঢ় হয় সাক্ষী রাখার মাধ্যমে এবং সম্পত্তি মালিকানায় আসে শফী' তা হস্তগত করলে। অতএব যদি শুফ'আর সংজ্ঞাই হয় "...স্থাবর সম্পত্তির মালিক হওয়া" তাহলে তো বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যখন শুফ'আ সাব্যস্ত হয় তখনই সম্পত্তিতে শফী'র মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যেত, অথচ তা হয় না।

এ আপত্তি নিরসনের জন্য غَايَةُ الْبَيَانِ গ্রন্থের লেখক শুফ'আর সংজ্ঞায় حَقّ শব্দটি সংযোজন করে এভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন – اَلشُّفْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ حَقِّ التَّمَلُّكِ فِى الْعَقَارِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَارِ অর্থাৎ, "প্রতিবেশিত্বের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য স্থাবর সম্পত্তিতে মালিকানা লাভের অধিকারকে শুফ'আ বলা হয়।" এ সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা হলে উক্ত আপত্তি আর থাকে না। সুতরাং এ সংজ্ঞাটিই যথার্থ সংজ্ঞা বলে গণ্য হবে। আর অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ যদিও حَقّ শব্দটি উল্লেখ করেননি তবে সম্ভবত তাদেরও এই ভাবার্থই উদ্দেশ্য।

আভিধানিক ও পরিভাষিক অর্থের মাঝে সম্পর্ক :
পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, اَلشُّفْعَةُ [শুফ'আ] -এর ধাতুমূল اَلشَّفْعُ -এর অর্থ হচ্ছে– মিলিত করা, সংযুক্ত করা। এ অর্থে পারিভাষিকভাবে এর নামকরণের কারণ হলো, শুফ'আর অধিকারের ভিত্তিতে শফী' অন্যের নিকট বিক্রীত সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তির সাথে মিলিত করে নেয় বা সংযুক্ত করে নেয়। কাজেই শুফ'আ শব্দটির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে স্পষ্টভাবে সম্পর্ক রয়েছে।

শরিয়তে শুফ'আর অধিকার বৈধ করণের তাৎপর্য :
স্বাভাবিক কিয়াসের পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও শরিয়তে শুফ'আর অধিকার বৈধ করণের কারণ হলো, প্রতিবেশির আচার ব্যবহারের ফলে মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই অতিষ্ঠ হয়ে থাকে। আর এ অতিষ্ঠতা তার জন্য একটি স্থায়ী সমস্যা। তাই কারো পার্শ্ববর্তী সম্পত্তি অন্য কেউ ক্রয় করে তার স্থায়ী সমস্যার যাতে কারণ না হতে পারে সেজন্য পার্শ্ববর্তী জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য শরিয়তে শুফ'আর অধিকার প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ "তিনি ধর্মে তোমাদের জন্যে কোনো প্রকার অসুবিধা রাখেননি"। নবী করীম ﷺ বলেছেন– لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ "[কেউ] ক্ষতিগ্রস্ত হবেও না এবং ক্ষতিগ্রস্ত করতেও পারবে না"। শরিয়তে একজনের সুবিধা লাভ এবং আরেকজনের অসুবিধা সৃষ্টি একত্রিত হলে অসুবিধা দূরীকরণ অগ্রাধিকার পায়।

শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের ঐকমত্য :
শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম ও আলেম একমত। একমাত্র আবূ বকর আল্ আছম্ম (أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ) ব্যতীত। তাঁর মতে, কোনো ক্ষেত্রেই শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা এতে ক্রেতা মালিকানা লাভ করার পর তার সম্মতি ছাড়া তার থেকে সম্পত্তি গ্রহণের মাধ্যমে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। তাঁর বিপক্ষে দলিল হলো– ১. শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন সহীহ হাদীস, যা বুখারী ও মুসলিমসহ হাদীসের সকল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ২. তাঁর পূর্বের সকল সাহাবা ও তাবেয়ীর ইজমা [ঐকমত্য]।

উল্লেখ্য, শুফ'আর বৈধতার বিধানের উপর কারো এই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী– يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ . "হে মু'মিনগণ! পারস্পরিক সন্তুষ্টি সহকারে ব্যবসায়ের মাধ্যমে না হলে তোমরা পরস্পরে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না" এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গ্রহণ করলে তা হারাম হবে। আর এই হারাম হওয়ার ইল্লত বা কারণ হলো, যার সম্পদ তার সন্তুষ্টি না থাকা। এই ইল্লত বা কারণটি যেহেতু স্পষ্ট আয়াত [তথা অকাট্য দলিল] দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই যে ক্ষেত্রেই এই ইল্লত থাকবে সে ক্ষেত্রেই অপর থেকে গৃহীত সম্পদ হারাম হবে। সুতরাং শুফ'আর ক্ষেত্রেও যেহেতু ক্রেতার সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পত্তি নেওয়া হয়, সেহেতু এ আয়াতের ভিত্তিতে তা হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে যে সকল হাদীসের ভিত্তিতে শুফ'আ সাব্যস্ত করা হয়, সে সকল হাদীস হচ্ছে خَبَرِ وَاحِدٌ [একক বর্ণনাকারীর রেওয়ায়েত] যা অকাট্য নয়। কাজেই অকাট্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত ইল্লতের বিপরীতে এ সকল হাদীসের ভিত্তিতে শুফ'আর অধিকার কীভাবে সাব্যস্ত করা হলো?

এর জবাব হলো, শুফ'আ সাব্যস্ত হয়েছে দু'টি অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে। একটি হলো, শুফ'আ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ। কেননা এ সকল হাদীস যদিও পৃথক পৃথকভাবে خَبَرِ وَاحِدٌ [একক বর্ণনাকারীর রেওয়ায়েত] কিন্তু একই মর্মের হাদীস এত সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যা অর্থগত দিক থেকে 'মুতাওয়াতির' (مُتَوَاتِرُ الْمَعْنٰى)। কাজেই তা অকাট্য দলিল। দ্বিতীয়টি হলো, সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ইজমা [ঐকমত্য]। আর ইজমাও হচ্ছে একটি অকাট্য দলিল।

শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব' বা কারণ :
অধিকাংশ মাশায়েখের মতে শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব' বা কারণ হলো– اِتِّصَالُ مِلْكِ الشَّفِيْعِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ "শফী'র মালিকানাধীন সম্পত্তি বিক্রেতার [বিক্রীত] সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত হওয়া"। কেননা যে ক্ষতিগ্রস্ততা দূরীকরণের জন্য শুফ'আ সাব্যস্ত হয় তা এরূপ সংযুক্ত হলেই কেবল দেখা দেয়। তাই এটিই শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ। আর বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়া হচ্ছে শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার شَرْطٌ [শর্ত]। আর কারো কারো মতে, উভয়ের সম্পত্তি সংযুক্ত হওয়া এবং বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়া এ দু'য়ের সমষ্টি হচ্ছে শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব'।

اَلشُّفْعَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الشَّفْعِ وَهُوَ الضَّمُّ سُمِّيَتْ بِهَا لِمَا فِيْهَا مِنْ ضَمِّ الْمُشْتَرَاةِ إِلَى عَقَارِ الشَّفِيْعِ - قَالَ اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلْخَلِيْطِ فِيْ نَفْسِ الْمَبِيْعِ ثُمَّ لِلْخَلِيْطِ فِيْ حَقِّ الْمَبِيْعِ كَالشِّرْبِ وَالطَّرِيْقِ ثُمَّ لِلْجَارِ - اَفَادَ هٰذَا اللَّفْظُ ثُبُوْتَ حَقِّ الشُّفْعَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هٰؤُلَاءِ وَاَفَادَ التَّرْتِيْبَ - اَمَّا الثُّبُوْتُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلشُّفْعَةُ لِشَرِيْكٍ لَمْ يُقَاسِمْ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَالْاَرْضِ يُنْتَظَرُ لَهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا سَقَبُهُ؟ قَالَ شُفْعَتُهُ وَيُرْوٰى اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ -

অনুবাদ : اَلشُّفْعَةُ [শুফ'আ] শব্দটি اَلشَّفْعُ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– মিলিত করা, একটির সাথে আরেকটি সম্পৃক্ত করা। শুফ'আর মাধ্যমে যেহেতু শফী' তার সম্পত্তির সাথে বিক্রীত সম্পত্তিকে সম্পৃক্ত করে নেয় সেহেতু এর নামকরণ করা হয়েছে اَلشُّفْعَةُ [শুফ'আ]। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শুফ'আ সাব্যস্ত হবে [প্রথমত] বিক্রীত সম্পত্তির মাঝে অংশীদারের জন্য। তারপর বিক্রীত সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বস্তু যেমন পানির নালা, যাতায়াতের রাস্তা ইত্যাদিতে অংশীদারের জন্য। তারপর পার্শ্ববর্তী জমির মালিকের জন্য। ইমাম কুদূরী (র.)-এর এই বক্তব্য থেকে দু'টি বিষয় বুঝা গেছে। এক. উল্লিখিত তিনজনের প্রত্যেকেরই শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়। দুই. পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এদের শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়। [প্রথম বিষয়টি তথা] এদের প্রত্যেকের শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার দলিল হচ্ছে নবী করীম ﷺ-এর বাণী– اَلشُّفْعَةُ لِشَرِيْكٍ لَمْ يُقَاسِمْ "শুফ'আ এমন অংশীদার ব্যক্তি লাভ করবে যে তার অংশ বণ্টন করে নেয়নি।" এছাড়া নবী করীম ﷺ -এর এই বাণীর ভিত্তিতে– جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَالْاَرْضِ يُنْتَظَرُ لَهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا "বাড়ির প্রতিবেশী বাড়ি ও জমির অধিক হকদার। সে অনুপস্থিত থাকলেও তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যদি উভয়ের যাতায়াত পথ এক হয়।" এছাড়া নবী করীম ﷺ -এর এই বাণীর ভিত্তিতে اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا سَقَبُهُ؟ قَالَ شُفْعَتُهُ "প্রতিবেশী তার 'সাকাব' [নিকটবর্তী বাড়ি]-এর ক্ষেত্রে অধিক হকদার। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! 'সাকাব' এর কী অর্থ? উত্তরে তিনি বললেন, 'তার শুফ'আ।' অপর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে– اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ "প্রতিবেশী তার শুফ'আর ক্ষেত্রে অধিক হকদার"।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلشُّفْعَةُ مُشْتَقَّةٌ الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। একটি হলো, শুফ'আর আভিধানিক অর্থ আর দ্বিতীয়টি হলো, শুফ'আর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে সম্পর্ক বা শুফ'আর নামকরণের কারণ। আমরা এ দু'টি বিষয়ই ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। কাজেই এখানে তা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

قَالَ : "ইমাম কুদূরী (র.) তাঁর 'মুখতাছার' গ্রন্থে বলেছেন।" এখানে উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) তাঁর হিদায়াহ গ্রন্থে যে মূল ইবারত [উপরে দাগযুক্ত বাক্যগুলো] এনে তার ব্যাখ্যা করেছেন, এই মূল ইবারত বা মতন তিনি দু'টি গ্রন্থ থেকে সংকলন করেছেন। একটি হচ্ছে ইমাম কুদূরী (র.) -এর সংকলিত গ্রন্থ যা 'মুখতাছারুল কুদূরী' নামে পরিচিত। আর অপরটি হচ্ছে ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত 'আল জামিউস সগীর' গ্রন্থ। তবে অধিকাংশ ইবারত তিনি 'মুখতাসারুল কুদূরী' গ্রন্থ হতে গ্রহণ করেছেন। মুসান্নিফ (র.) কোন্ ইবারতটুকু কোন্ গ্রন্থ হতে গ্রহণ করেছেন তা সাধারণত পার্থক্য করে উল্লেখ করেননি। শুধু মূল ইবারত উল্লেখ করার পূর্বে قَالَ লিখেন। কাজেই قَالَ -এর অর্থ কোথাও হবে ইমাম কুদূরী তাঁর 'মুখতাসার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবার কোথাও হবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর 'জামিউস সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ 'আল্ বিনায়াহ'-য় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) কোনটি কোন গ্রন্থের তা নির্ণয় করে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلْخَلِيْطِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, শুফ'আর অধিকার প্রথমত লাভ করবে মূল বিক্রীত সম্পত্তিতে যার অংশীদারিত্ব রয়েছে সে। দ্বিতীয় পর্যায়ে লাভ করবে সে ব্যক্তি, যার মূল সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব নেই, কিন্তু মূল সম্পত্তির হক [সংশ্লিষ্ট বিষয়]-এর মাঝে অংশীদারিত্ব রয়েছে। মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্য রয়েছে যেমন– যাতায়াতের রাস্তা, জমিতে পানি নেওয়ার নালা তথা ড্রেন ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, দুই ব্যক্তির এক খণ্ড শরিকানা জমি ছিল। অতঃপর তারা জমিটি বণ্টন করে প্রত্যেকের অংশ পৃথক করে নিয়েছে। কিন্তু জমিতে যাতায়াত করার জন্য যে রাস্তা রয়েছে তা অবণ্টিত অবস্থায়ই রয়ে গেছে। তাহলে এরা মূল সম্পত্তির হক বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাঝে একে অপরের অংশীদার। আর তৃতীয় পর্যায়ে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে বিক্রীত সম্পত্তির সংলগ্ন প্রতিবেশী।

قَوْلُهُ اَفَادَ هٰذَا اللَّفْظُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) -এর উল্লিখিত ['মতন'-এর] বক্তব্য থেকে দু'টি বিষয় বুঝা যায়। একটি হলো, উক্ত তিন শ্রেণির লোকই শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। [যদিও এক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে, যা একটু পরে মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করবেন]। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, উক্ত তিন শ্রেণির লোক যে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে তা পর্যায়ক্রমের ভিত্তিতে লাভ করবে। অর্থাৎ যদি প্রথম শ্রেণির শফী' বিদ্যমান থাকে এবং সে শুফ'আর ভিত্তিতে বিক্রীত জমিটি নিতে আগ্রহী হয় তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শফী' তথা সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদার ও প্রতিবেশী শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না। অনুরূপভাবে যদি দ্বিতীয় প্রকারের শফী' [সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদার] বিদ্যমান থাকে এবং জমিটি নিতে আগ্রহী হয় তাহলে তৃতীয় প্রকারের শফী' [প্রতিবেশী] শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না। এ বিষয়টি ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেছে। আর তা এভাবে যে, তিনি উক্ত তিন প্রকারের শফী'র অধিকার লাভ করার ক্ষেত্রে ثُمَّ "তারপর" শব্দ সহকারে উল্লেখ করেছেন। আর এ শব্দটি 'পর্যায়ক্রমিকভাবে' হওয়ার অর্থ প্রদান করে। পরবর্তী ইবারতে মুসান্নিফ (র.) উক্ত দু'টি বিষয়ের দলিল বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ اَمَّا الثُّبُوْتُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) প্রথম বিষয়টির দলিল বর্ণনা করছেন। প্রথম বিষয়টি ছিল, তিন প্রকারের ব্যক্তি শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। এক. মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি, দুই. মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়। যেমন রাস্তা বা পানির নালায় অংশীদার ব্যক্তি। তিন. প্রতিবেশী। এই তিন শ্রেণির লোকের শুফ'আর অধিকারী হওয়ার উপর দলিল বর্ণনা করতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) প্রত্যেক শ্রেণির জন্য একটি করে হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম শ্রেণি তথা মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তির শুফ'আর অধিকারী হওয়ার দলিল হিসেবে যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা হলো নবী করীম ﷺ -এর এই বাণী– اَلشُّفْعَةُ لِشَرِيْكٍ لَمْ يُقَاسِمْ "শুফ'আ এরূপ অংশীদার ব্যক্তি লাভ করবে যে তার অংশ বণ্টন করে পৃথক করেনি।" এ হাদীস থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, বিক্রেতার সম্পত্তির সাথে যার সম্পত্তি অবণ্টিতভাবে সম্পৃক্ত আছে [অর্থাৎ যে মূল সম্পত্তিতে অংশীদার] সে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে।

উল্লেখ্য, এ হাদীসটি মুসান্নিফ (র.) যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা হাদীসবিশারদদের নিকট غَرِيْبٌ [অপরিচিত]। কিন্তু এ মর্মে সহীহ হাদীস মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ـ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتّٰى يُؤْذِنَ ـ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ـ

অর্থাৎ "হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল শরিকানা সম্পত্তিতে শুফ'আর ফয়সালা করেছেন, তা বসতি ভূমি হোক কিংবা বাগান হোক। অপর অংশীদারকে না জানিয়ে তা বিক্রয় করা বৈধ হবে না। জানানোর পর অংশীদার তা গ্রহণ করবে কিংবা ছেড়ে দিবে। আর যদি না জানিয়ে বিক্রয় করে তাহলেও অপর অংশীদারই অধিক হকদার থাকবে।"

قَوْلُهُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَارُ الدَّارِ : এখান থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির তথা মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদার ব্যক্তির শুফ'আর অধিকারী হওয়ার দলিল বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে দলিল হলো, নবী করীম ﷺ -এর বাণী–

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَالْأَرْضِ، يُنْتَظَرُ لَهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا ـ

"বাড়ির প্রতিবেশী বাড়ি ও জমির অধিক হকদার। সে অনুপস্থিত থাকলেও তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যদি উভয়ের যাতায়াতের রাস্তা এক হয়।"

এ হাদীসে উল্লিখিত جَارُ الدَّارِ 'প্রতিবেশী' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমাদের উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণির অংশীদার। অর্থাৎ মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেমন রাস্তা বা পানির নালায় অংশীদার ব্যক্তি। কেননা হাদীসটিতে শর্ত হিসেবে উভয়ের রাস্তা এক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই মূল সম্পত্তির অংশীদার কিংবা শুধু প্রতিবেশী উদ্দেশ্য হবে না। কারণ যে মূল সম্পত্তিতে অংশীদার তার রাস্তা এক না হলেও সকলের ঐকমত্যে সে শুফ'আর অধিকারী হয় [যা পূর্বের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে]। আর সংলগ্ন প্রতিবেশী রাস্তায় অংশীদার না হলেও শুফ'আর অধিকারী হওয়ার বিষয় অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই তার ক্ষেত্রেও রাস্তা এক হওয়ার শর্ত নেই। সুতরাং এ হাদীসে কেবল দ্বিতীয় শ্রেণির লোকই উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, আল্লামা যায়লায়ী, আল্লামা আইনী ও হাফিজ ইবনে হাজার (র.) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, মুসান্নিফ (র.) এখানে হাদীসটি যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা পূর্ণ একটি হাদীস নয় ; বরং দু'টি পৃথক হাদীসের মিশ্রিত রূপ। এর প্রথম অংশ তথা جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَالْأَرْضِ "বাড়ির প্রতিবেশী বাড়ি ও জমির অধিক হকদার"। এ অংশটুকু একটি হাদীস। হাদীসটি ইমাম নাসায়ী, আবূ দাউদ, ও তিরমিযী (র.) তাঁদের গ্রন্থে হযরত সামুরা (রা.) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ وَالْأَرْضِ ـ

"হযরত ছামুরা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বাড়ির প্রতিবেশী বাড়ি ও জমির অধিক হকদার"। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন– حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ [হাদীসটি হাসান, সহীহ]।

আর দ্বিতীয় অংশ তথা– يُنْتَظَرُ لَهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا এ অংশটি অপর একটি হাদীসের অংশবিশেষ। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ও আবূ দাউদ (র.) আব্দুল মালিক ইবনে আবী সুলায়মানের সূত্রে হযরত জাবির (রা.) থেকে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ : يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا : إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا ـ

"প্রতিবেশী তার অপর প্রতিবেশীর শুফ'আর অধিকারের ক্ষেত্রে অধিক হকদার। সে অনুপস্থিত থাকলেও শুফ'আর জন্য তার অপেক্ষা করতে হবে।"

قَوْلُهُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ : سَقَبٌ এর অর্থ হলো مَا قَرُبَ مِنَ الدَّارِ তথা কারো বাড়ির সংলগ্ন সম্পত্তি। শব্দটির س-এর স্থলে ص যুক্ত করে صَقَبٌ ও ব্যবহার হয়।

এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) তৃতীয় শ্রেণির শফী' তথা প্রতিবেশীর শুফ'আর অধিকার লাভ করার দলিল বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে দলিল হলো, নবী করীম ﷺ -এর বাণী– اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا سَقَبُهُ قَالَ شُفْعَتُهُ "প্রতিবেশী তার 'সাকাব' [নিকটবর্তী বাড়ি]-এর ক্ষেত্রে অধিক হকদার। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! 'সাকাব' এর অর্থ কী? উত্তরে তিনি বললেন, 'তার শুফ'আ।"

এ হাদীসটি বুখারী শরীফে হযরত আবূ রাফে' (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে– عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "হযরত আবূ রাফে' (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিবেশী তার নিকটবর্তী সংলগ্ন সম্পত্তির অধিক হকদার।"

মুসান্নিফ (র.) এখানে হাদীসটির শেষাংশে যা উল্লেখ করেছেন– قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا سَقَبُهُ قَالَ شُفْعَتُهُ এ অংশটুকু সম্পর্কে আল্লামা যায়লায়ী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এটুকু হাদীসের অংশ নয়। তবে মু'জামে তাবারানীতে এভাবে আছে– قِيْلَ لِعَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ مَا السَّقَبُ قَالَ الْجِوَارُ অর্থাৎ হাদীসটির বর্ণনাকারী আমর ইবনে শারীদকে জিজ্ঞাসা করা হলো 'সাকাব' এর অর্থ কী? তিনি উত্তর দিলেন, এর অর্থ হচ্ছে প্রতিবেশিত্ব।

قَوْلُهُ وَيُرْوٰى اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসে اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ এর স্থলে অন্য রেওয়ায়েতে اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ -ও বর্ণিত হয়েছে। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.) তাঁর মুসনাদে এই উভয় রেওয়ায়েত একই সাহাবী অর্থাৎ হযরত আবূ রাফে' (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আমাদের পূর্বে বর্ণিত তিরমিযীতে হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীসেও اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ الشَّافِعِيُّ رح، لَا شُفْعَةَ بِالْجِوَارِ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اَلشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ : فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ـ وَلِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مَعْدُولٌ بِهِ عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ ـ لِمَا فِيهِ مِنْ تَمَلُّكِ الْمَالِ عَلَى الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ـ وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ـ وَهٰذَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ ـ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الْقِسْمَةِ تَلْزَمُهُ فِي الْأَصْلِ دُونَ الْفَرْعِ ـ

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে কোনো শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না ; বরং নবী করীম ﷺ -এর এই বাণীর ভিত্তিতে اَلشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ অর্থাৎ, "শুফ'আ সাব্যস্ত হবে যে জমি বণ্টন করা হয়নি তাতে। আর যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং পৃথক যাতায়াত পথ করে দেওয়া হবে তখন আর কোনো শুফ'আ থাকবে না।" তাছাড়া এ কারণে যে, শুফ'আর অধিকার হচ্ছে কিয়াসের দাবির পরিপন্থি। কেননা এর মাধ্যমে অন্যের সম্পদের উপর মালিকানা সাব্যস্ত করা হয় তার সম্মতি ছাড়া। আর শরিয়তের বাণী কেবল অবণ্টিত সম্পত্তির ক্ষেত্রেই এসেছে। প্রতিবেশীর অধিকারের বিষয়টি অবণ্টিত সম্পত্তির ক্ষেত্রের সমপর্যায়েরও নয়। কেননা মূল ক্ষেত্রে [তথা অবণ্টিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে] অংশীদারের উপর বণ্টনের ব্যয় নির্বাহ করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে ফরা' তথা বণ্টিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই ব্যয় নির্বাহের বিষয়টি নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا شُفْعَةَ بِالْجِوَارِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) কোন কোন শ্রেণির লোক শুফ'আর অধিকারী হবে এ সম্পর্কে আমাদের মাঝে ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাঝে মতবিরোধ ও উভয় পক্ষের দলিল বর্ণনা করছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কেবল বিক্রিত মূল সম্পত্তির মাঝে অংশীদার ব্যক্তি শুফ'আর অধিকারী হবে। অপর দুই শ্রেণির শফী' তথা মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদার ও প্রতিবেশী শুফ'আর অধিকারী হবে না। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের অনুরূপ। মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে দৃশ্যত বুঝা যায় যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) কেবল প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে আমাদের সাথে মতবিরোধ করেন। অপর দুই শ্রেণির শফী'র ক্ষেত্রে আমাদের সাথে একমত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয় ; বরং ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ ইমাম মালিক ও আহমাদ (র.)-এর মতে কেবল মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে [রাস্তা বা পানির নালা ইত্যাদিতে] অংশীদার ব্যক্তি বা প্রতিবেশী শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না। [দ্র: বিনায়াহ, আল মুগনী লি ইবনে কুদামাহ]

মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে নকলী ও আকলী উভয় প্রকারের দলিল বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ (র.) -এর পক্ষে নকলী দলিল হলো, নবী ﷺ -এর হাদীস- اَلشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ অর্থাৎ "শুফ'আ সাব্যস্ত হবে যে জমি বণ্টন করা হয়নি তাতে। আর যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং পৃথক যাতায়াত পথ করে দেওয়া হবে তখন আর কোনো শুফ'আ থাকবে না।"

এ হাদীসটি হযরত জাবির (রা.) থেকে বুখারী শরীফ ও মুসনাদে আহমাদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে– عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ . فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ . "হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ অবণ্টিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুফ'আর ফয়সালা করেছেন। কাজেই যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং পৃথক যাতায়াত পথ করে দেওয়া হবে তখন আর কোনো শুফ'আ থাকবে না।"

وَلِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مَعْدُوْلٌ بِهٖ عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ : শব্দার্থ: سَنَنٌ শব্দটির প্রথম দু'টি অক্ষরেই যবর হবে। এর অর্থ হচ্ছে اَلطَّرِيْقُ 'রাস্তা'।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর আকলী দলিল হলো, শুফ'আর অধিকার লাভ করার বিধানটি মূলত কিয়াসের দাবির পরিপন্থি। কেননা এ অধিকারের মাধ্যমে অন্যের সম্পত্তি তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হয়। অথচ তা বৈধ হওয়ার কথা নয়। নবী করীম ﷺ বলেছেন– لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبٍ مِنْ نَفْسِهٖ "কোনো মুসলিমের সম্পদ তার অন্তরের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে নেওয়া হালাল নয়।" সুতরাং কিয়াসের পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের ভিত্তিতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে। আর উপরে বর্ণিত হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীসের ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এ অধিকার কেবল মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই অন্য কারো ক্ষেত্রে এই অধিকার সাব্যস্ত করা যায় না। কেননা কিয়াসের পরিপন্থি যদি কোনো বিধান হাদীস বা আয়াতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, তাহলে তা কেবল যে ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়েছে সেক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য কোনো ক্ষেত্রে কিয়াস করে তা প্রযোজ্য করা যায় না।

قَوْلُهٗ وَهٰذَا لَيْسَ فِيْ مَعْنَاهُ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মূল সম্পত্তির অংশীদার ব্যক্তির শুফ'আর অধিকারের উপর কিয়াস করে অপর দুই শ্রেণির ব্যক্তি তথা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদার ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত করা যাবে না, তদ্রূপ دَلَالَةُ النَّصِّ -এর ভিত্তিতেও সাব্যস্ত হবে না। কারণ যে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তির জন্য শুফ'আর অধিকার দেওয়া হয়েছে সে ক্ষতি অপর দুই শ্রেণির ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। এই ক্ষতিটি হলো, বণ্টন করার খরচ ও ঝামেলা বহন করা। কেননা মূল সম্পত্তির কোনো এক অংশীদার যদি তার অংশ অন্য কারো নিকট বিক্রয় করে তখন অপর অংশীদার ব্যক্তি ক্রেতার সাথে জমি বণ্টন করে নিতে বাধ্য হয়। ফলে তাকে বণ্টনের খরচ ও ঝামেলা বহন করতে হয়। পক্ষান্তরে অপর দুই শ্রেণির ব্যক্তি যেহেতু মূল সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব নেই তাই তাদের উপর বণ্টনের খরচ ও কষ্টের বোঝা আপতিত হয় না। সুতরাং মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তির উপর কিয়াস করে কিংবা دَلَالَةُ النَّصِّ -এর ভিত্তিতে অপর দুই শ্রেণির ক্ষেত্রে শুফ'আ সাব্যস্ত করা সঠিক হবে না।

উল্লেখ্য, অপর দুই শ্রেণির জন্য শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে আমরা যে হাদীস দিয়ে দলিল দিয়েছি ইমাম শাফেয়ী (র.) তার কোনটির মাঝে تَاوِيْل করেন আর কোনটি সহীহ হাদীস বলে স্বীকার করেন না। আমরা এর জবাব একটু পরে উল্লেখ করব।

وَلَنَا مَا رَوَيْنَا ، وَلِأَنَّ مِلْكَهُ مُتَّصِلٌ بِمِلْكِ الدَّخِيلِ اِتِّصَالَ تَابِيدٍ وَقَرَارٍ . فَيَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَاوَضَةِ بِالْمَالِ . اِعْتِبَارًا بِمَوْرِدِ الشَّرْعِ ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْاِتِّصَالَ عَلٰى هٰذِهِ الصِّفَةِ إِنَّمَا انْتَصَبَ سَبَبًا فِيهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَارِ . إِذْ هُوَ مَادَّةُ الْمُضَارِّ عَلٰى مَا عُرِفَ . وَقَطْعُ هٰذِهِ الْمَادَّةِ بِتَمَلُّكِ الْاَصِيلِ أَوْلٰى . لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي حَقِّهِ بِإِزْعَاجِهِ عَنْ خِطَّةِ آبَائِهِ أَقْوٰى . وَضَرَرُ الْقِسْمَةِ مَشْرُوعٌ . لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِتَحْقِيقِ ضَرَرِ غَيْرِهِ .

অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো, উপরে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তাছাড়া এ কারণে যে, প্রতিবেশীর মালিকানা ক্রেতার মালিকানার সাথে স্থিতিশীল হয়ে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত রয়েছে। সুতরাং যখন [মূল জমির উপর] সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে তখন শরিয়ত বর্ণিত ক্ষেত্রের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে প্রতিবেশীরও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। এর কারণ হলো, এভাবে স্থিতিশীল হয়ে স্থায়ীভাবে একজনের সম্পত্তি অপর জনের সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত থাকার বিষয়টি শরিয়ত বর্ণিত ক্ষেত্রে [অর্থাৎ মূল সম্পত্তিতে অংশীদারের ক্ষেত্রে শুফ'আ সাব্যস্ত করার জন্য] 'সবব' বা কারণ হয়েছে। কেবল এ জন্যই যে, [অংশীদারের উপর] প্রতিবেশীত্বের ক্ষতির আগমন যাতে প্রতিহত করা যায়। কেননা প্রতিবেশীত্বের বিষয়টিই হচ্ছে ক্ষতিসাধন ও অসুবিধা সৃষ্টির মূল, যা সর্বজনবিদিত। আর শুফ'আর দাবিকৃত সম্পত্তিতে শফী'র মালিকানা সাব্যস্ত করে এই ক্ষতি ও অসুবিধার মূলোৎপাটিত করা অগ্রগণ্য। কেননা শফী'কে তার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি পরিত্যাগের মাধ্যমে অস্থির করে তোলার ক্ষতিটি অধিক শক্তিশালী। পক্ষান্তরে বণ্টন আবশ্যক হওয়ার ক্ষতি শরিয়ত স্বীকৃত। কাজেই তা অন্য ব্যক্তি [অর্থাৎ ক্রেতা]-র ক্ষতি সাধন [সংশ্লিষ্ট বিধান]-এর ইল্লাত বা কারণ হিসেবে নির্ণিত হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের পক্ষেও নকলী ও আকলী উভয় প্রকারের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের নকলী দলিল পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে তিন শ্রেণির শফী'র শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে মুসান্নিফ (র.) তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। কাজেই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এই দাবি সঠিক নয় যে, শুফ'আর অধিকার কেবল প্রথম শ্রেণির শফী'র জন্যে শুফ'আর অধিকার হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় শ্রেণির শফী'র শুফ'আর অধিকার লাভের পক্ষে আমরা আব্দুল মালিক ইবনে আবী সুলায়মান এর সূত্রে হযরত জাবির (রা.) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি। তা হলো– "اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهٖ يُنْتَظَرُ بِهَا وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا" এ হাদীসটি সম্পর্কে শাফেয়ীগণের বক্তব্য হচ্ছে, হাদীসটি হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস– فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ الخ -এর সাথে বিরোধপূর্ণ। কাজেই এ হাদীসটি যেহেতু আবদুল মালিক ইবনে আবী সুলায়মান (র.) একা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম শু'বা (র.) তাঁর ব্যাপারে 'কালাম' করেছেন তাই এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন– يُخَافُ اَنْ لَا يَكُوْنَ مَحْفُوْظًا ، وَاَبُوْ سَلَمَةَ حَافِظٌ . وَكَذَا اَبُو الزُّبَيْرِ ، وَلَا يُعَارَضُ حَدِيْثُهُمَا بِحَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ "অর্থাৎ আব্দুল মালিক বর্ণিত হাদীসটি সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে আবূ সালামা হচ্ছেন 'হাফিজ' অনুরূপভাবে আবূ যুবায়েরও। কাজেই তাঁদের বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে আব্দুল মালিকের বর্ণিত হাদীস টিকে না।"

আমাদের পক্ষ হতে এর জবাব হলো, আব্দুল মালিক ইবনে আবী সুলায়মান (র.) সমস্ত হাদীস বিশারদের নিকট নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। কেউ তার ব্যাপারে কোনো রকম আপত্তির কথা বলেননি। একমাত্র ইমাম শু'বা (র.) শুধু এই হাদীসটি হযরত জাবির (রা.) প্রসিদ্ধ হাদীসের সাথে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ হওয়ার কারণে তার ব্যাপারে আপত্তির কথা বলেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করার পর উল্লেখ করেছেন- وَعَبْدُ الْمَلِكِ ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ، لَا نَعْلَمُ اَحَدًا تَكَلَّمَ فِيْهِ غَيْرَ شُعْبَةَ مِنْ اَجْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ অর্থাৎ "আব্দুল মালিক (র.) হাদীস বিশারদগণের মতে একজন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন বর্ণনাকারী। শু'বা ব্যতীত কেউ তাঁর ব্যাপারে আপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। শু'বা কেবল এই হাদীসটির কারণেই তার ব্যাপারে আপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন।"

ইমাম শু'বা ও অন্যান্য বর্ণনাকারী উক্ত হাদীস দু'টির মাঝে যে বিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন প্রকৃতপক্ষে হাদীস দু'টির মাঝে সে বিরোধ নেই। কেননা আব্দুল মালিক বর্ণিত হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি বিক্রিত সম্পত্তির রাস্তার মাঝে কেউ অংশীদার থাকে তাহলে সে মূল সম্পত্তিতে অংশীদার না থাকলেও শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। আর অপর হাদীসটি তথা জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসটিতে এ বিষয়টি নাকচ করা হয়নি। কেননা সেখানে বলা হয়েছে- فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ "যখন [বণ্টন করে] সীমানা আলাদা করা হবে এবং রাস্তা পৃথক করা হবে তখন আর শুফ'আর অধিকার থাকবে না।" এর দ্বারা বুঝা যায় সীমানা আলাদা করার পরও রাস্তা পৃথক করার আগ পর্যন্ত শুফ'আর অধিকার থাকবে। কাজেই দু'টি হাদীসের মাঝে বিরোধ নেই ; বরং প্রসিদ্ধ এ হাদীসটিও স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর বিপক্ষে একটি দলিল। কেননা তাঁদের অভিমত অনুসারে মূল সম্পত্তিতে অংশীদার না হলে, রাস্তার মাঝে অংশীদার হওয়ার কারণে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। অথচ রাস্তার মাঝে অংশীদারিত্ব যদি শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ না হয় তাহলে উক্ত হাদীসে وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ এ শর্তটি উল্লেখের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে এতটুকু বললেই তো যথেষ্ট হতো "যখন সীমানা আলাদা করা হবে তখন আর শুফ'আর অধিকার থাকবে না"। -[এ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: এ'লাউস সুনান খণ্ড : ১৭, নসবুর রায়াহ খণ্ড : ৪]।

তৃতীয় শ্রেণির শফী' তথা প্রতিবেশীর শুফ'আর অধিকারের পক্ষে আমরা যে আবূ রাফে (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছি। শাফেয়ীগণ এ হাদীসটির মাঝে تَاْوِيْل করে বলেন যে, এখানে جَارٌ [প্রতিবেশী] বলে মূল সম্পত্তির মাঝে অংশীদার ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। কিন্তু তাদের এই تَاْوِيْل নিতান্ত দুর্বল। কারণ প্রতিবেশীর শুফ'আর অধিকার সম্পর্কে এ হাদীসটি ছাড়াও আরো একাধিক হাদীস ও সাহাবীদের 'আছার' বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ تَاْوِيْل এর মাধ্যমে কারণ ব্যতীত শব্দকে তার প্রকৃত অর্থ ছেড়ে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হচ্ছে যা নীতিবহির্ভূত। -[এ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: এলাউসুস সুনান খণ্ড : ১৭]

قَوْلُهُ وَلِاَنَّ مِلْكَهُ مُتَّصِلٌ بِمِلْكِ الدَّخِيْلِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের পক্ষে আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন। এ দলিলের সারকথা হচ্ছে, যদি আমরা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দাবি মেনেও নেই যে, হাদীস দ্বারা কেবল মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তির শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়, তাহলেও আমরা বলব যে, কিয়াসের ভিত্তিতে অপর দুই শ্রেণির ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। কিয়াস হলো এভাবে যে, প্রতিবেশীর সম্পত্তি নতুন আগত ক্রেতার ক্রীত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত স্থায়ীভাবে ও সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে। স্থায়ীভাবে হওয়ার অর্থ হলো, এটি স্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি নয় যে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যাবে। আর সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে হওয়ার অর্থ হলো, ক্রেতা যেহেতু সহীহ চুক্তির মাধ্যমে ক্রয় করেছে তাই তা প্রত্যাহার করার সম্ভবনা নেই। কাজেই মূল মালিক যখন ক্রেতার নিকট কোনো মালের বিনিময়ে জমি বা বাড়িটি বিক্রয় করেছে তখন যে কারণে হাদীসে প্রথম শ্রেণির তথা মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তির জন্য শুফ'আর অধিকার দিয়েছে সে কারণ বিদ্যমান থাকায় কিয়াসের ভিত্তিতে এই প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তির সম্পত্তিও ঠিক এভাবেই স্থায়ীভাবে ও সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে ক্রেতার ক্রীত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকে। কাজেই সেখানে তার শুফ'আর

অধিকার লাভের কারণ হিসেবে আমরা যা দেখতে পাই। তাহলো دَفْعُ ضَرَرِ الْجِوَارِ অর্থাৎ প্রতিবেশীর তথা নতুন ক্রেতার আচার আচরণের দরুণ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা করা। কেননা প্রতিবেশীর আচার আচরণের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। সুতরাং অপর প্রতিবেশীর আচার আচরণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে যার সম্পত্তি নতুন ক্রেতার সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত তাকে হাদীসে শুফ'আর অধিকার প্রদান করেছে। আর এই বিষয়টি মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেভাবে বিদ্যমান ঠিক সেভাবেই পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন জমির মালিক তথা প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। কাজেই প্রথম ব্যক্তির উপর কিয়াস করে কিংবা دَلَالَةُ النَّصِّ -এর ভিত্তিতে দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেও শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। আমাদের এই বক্তব্য দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) যে বলেছেন 'প্রতিবেশীর বিষয়টি মূল সম্পত্তির অংশীদারে সমপর্যায়ের নয়' তার জবাবও হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَقَطْعُ هٰذِهِ الْمَادَّةِ بِتَمَلُّكِ الْأَصِيْلِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো নতুন ক্রেতার আচার আচরণের কারণে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক যেরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে তদ্রূপ পার্শ্ববর্তী জমির মালিকের আচার আচরণের কারণে নতুন ক্রেতারও তো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। উভয়েরই সমান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনা বিদ্যমান। কাজেই কেবল শফী'র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনার দিক বিবেচনা করে তাকে শুফ'আর অধিকার দেওয়া হবে কেন?

জবাবের সারকথা হচ্ছে, এখানে শফী'র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দিকটি অগ্রগণ্য। কেননা নতুন ক্রেতার আচার আচরণের কারণে শফী'র পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করে ছেড়ে চলে যাওয়া তার জন্য অধিক ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে ক্রেতার মালিকানা এখনো সুদৃঢ় হয়নি এবং শফী' জমি গ্রহণ করলেও ক্রেতা তার দেওয়া আসল মূল্য ফেরত পাচ্ছে শুধু লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং শফী'র ক্ষতির দিকটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাকে ক্রেতার সম্পত্তি লাভের অধিকার দিয়ে উক্ত ক্ষতি থেকে রক্ষা করাই অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ وَضَرَرُ الْقِسْمَةِ مَشْرُوْعٌ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً : এ ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্যের জবাব দিচ্ছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) মূল সম্পত্তির অংশীদার ব্যক্তিকে শুফ'আর অধিকার দেওয়ার কারণ নির্ণয় করেছেন বণ্টনের খরচ ও ঝামেলার শিকার হওয়াকে। অর্থাৎ মূল সম্পত্তিতে অংশীদার শফী' যদি বিক্রীত সম্পত্তি গ্রহণ না করে তাহলে ক্রেতা তার অংশ সেই অংশীদারের [শফী'র] নিকট বণ্টন করে দেওয়ার জন্য বলবে। ফলে শফী'র উপর বণ্টনের খরচ ও ঝামেলা এসে পড়বে। পক্ষান্তরে বণ্টনের বিষয়টি যেহেতু প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই তাই সেক্ষেত্রে শুফ'আও সাব্যস্ত হবে না।

মুসান্নিফ (র.) এর জবাব দিচ্ছেন যে, বণ্টন করার ক্ষতি ও ঝামেলা শুফ'আ লাভের কারণ হিসেবে নির্ধারিত হতে পারে না। কেননা বণ্টনের ক্ষতি হচ্ছে তার উপর শরিয়ত স্বীকৃত একটি হক বা অধিকার। এ জন্যই তো এক অংশীদার বণ্টনের দাবি করলে অপর জন বণ্টনে বাধ্য হয়। আর যে ক্ষতি শরিয়ত স্বীকৃত হক হিসেবে তার উপর ধার্য হয়েছে তা দূর করার জন্য অন্য ব্যক্তিকে [অর্থাৎ ক্রেতাকে] ক্ষতিগ্রস্ত করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। কাজেই বণ্টনের ক্ষতি শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত করার কারণ হিসেবে নির্ধারিত হতে পারে না; বরং আমরা যে প্রতিবেশীর আচার আচরণের ক্ষতির কথা বলেছি তাই শুফ'আর অধিকার প্রদানের কারণ হবে।

وَأَمَّا التَّرْتِيْبُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَلشَّرِيْكُ أَحَقُّ مِنَ الْخَلِيْطِ، وَالْخَلِيْطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيْعِ : فَالشَّرِيْكُ فِىْ نَفْسِ الْمَبِيْعِ، وَالْخَلِيْطُ فِىْ حُقُوْقِ الْمَبِيْعِ . وَالشَّفِيْعُ هُوَ الْجَارُ، وَلِأَنَّ الْاِتِّصَالَ بِالشَّرِكَةِ فِى الْمَبِيْعِ أَقْوٰى، لِأَنَّهُ فِىْ كُلِّ جُزْءٍ، وَبَعْدَهُ الْاِتِّصَالُ فِى الْحُقُوْقِ . لِأَنَّهُ شِرْكَةٌ فِىْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ، وَالتَّرْجِيْحُ يَتَحَقَّقُ بِقُوَّةِ السَّبَبِ . وَلِأَنَّ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ عِلَّةً صَلُحَ مُرَجِّحًا .

অনুবাদ : আর [ইমাম কুদূরী (র.) বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয়টি তথা] পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে [উক্ত তিন শ্রেণির লোকের] শুফ'আর অধিকারী হওয়ার দলিল হলো, নবী করীম ﷺ-এর বাণী– اَلشَّرِيْكُ أَحَقُّ مِنَ الْخَلِيْطِ وَالْخَلِيْطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيْعِ "শরিক ব্যক্তি 'খলীত' অপেক্ষা অধিক হকদার, আর 'খলীত' ব্যক্তি শফী' অপেক্ষা অধিক হকদার।" [এ হাদীসে বর্ণিত] শরিক ব্যক্তি হলো মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি, আর 'খলীত' হলো বিক্রীত সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে অংশীদার, আর শফী' হলো প্রতিবেশী। তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো, বিক্রীত সম্পত্তিতে সংলগ্ন হওয়ার বিষয়টি অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী। কেননা এক্ষেত্রে সংলগ্নতা প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশেও বিরাজমান। এর পরবর্তী শক্তিশালী হলো মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংলগ্নতা। কেননা এটি হচ্ছে সম্পত্তির প্রয়োজনীয় উপকারী বস্তুতে অংশীদারিত্ব। আর অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হয় 'সবব'-এর শক্তির ভিত্তিতে। এছাড়া আরেকটি কারণ হলো, বণ্টনের ক্ষতি যদিও [শুফ'আর বিধানের] 'ইল্লাত' হওয়ার উপযুক্ত নয়, কিন্তু অগ্রাধিকারের কারণ হওয়ার উপযুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا التَّرْتِيْبُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلشَّرِيْكُ الخ : পূর্বের পৃষ্ঠায় 'মতনে' উল্লিখিত ইমাম কুদূরী (র.) এর ইবারত থেকে যে দু'টি বিষয় বুঝা গিয়েছিল তার একটির দলিল বর্ণনা করা উপরে শেষ হয়েছে। আর এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় বিষয় তথা উক্ত 'তিন শ্রেণির শফী' যে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে' তার দলিল বর্ণনা করছেন। এক্ষেত্রে মুসান্নিফ (র.) একটি নকলী ও দু'টি আকলী দলিল পেশ করেছেন।

নকলী দলিল হলো, নবী করীম ﷺ -এর বাণী– اَلشَّرِيْكُ أَحَقُّ مِنَ الْخَلِيْطِ وَالْخَلِيْطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيْعِ "শরীক 'খলীত' অপেক্ষা অধিক হকদার, আর 'খলীত' শফী' অপেক্ষা অধিক হকদার।" এ হাদীসে শরীক বলে মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে আর 'খলীত' বলে মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে অংশীদারকে বোঝানো হয়েছে। আর শফী' বলে প্রতিবেশীকে বোঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ হাদীসটি সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেছেন হাদীসটি আমি কোথাও খুঁজে পাইনি। আল্লামা ইবনুল জাওযী তার 'আত তাহকীক' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করে লিখেছেন–

إِنَّهُ حَدِيْثٌ لَا يُعْرَفُ . وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ مَا رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِيِّ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّفِيْعُ أَوْلٰى مِنَ الْجَارِ وَالْجَارُ أَوْلٰى مِنَ الْجُنُبِ .

অর্থাৎ, উক্ত হাদীসটি [হাদীস বিশারদগণের নিকট] একটি অপরিচিত হাদীস। তবে এ বিষয়ে পরিচিত হাদীস হচ্ছে যা সাঈদ ইবনে মানসূর ইমাম শা'বীর সূত্রে মুরসাল হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "শফী' প্রতিবেশীর চেয়ে অধিক হকদার আর প্রতিবেশী দূরবর্তীর চেয়ে অধিক হকদার।"

এছাড়া এ মর্মে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে কাযী শুরাইহি (র.)-এর উক্তি ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে। -[দ্র: নাসবুর রায়াহ ৪র্থ খ.]

قَوْلُهٗ وَلَاَنَّ الْاِتِّصَالَ بِالشَّرِكَةِ فِى الْمَبِيْعِ : এখান থেকে আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন। আকলী প্রথম দলিল হলো শুফ'আর অধিকার লাভ করার 'সবব' হলো বিক্রীত সম্পত্তির সাথে শফী'র সম্পত্তি সংলগ্ন হওয়া। আর এই 'সবব'টি প্রথম শ্রেণির শফী'র ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। তারপর দ্বিতীয় শ্রেণির তারপর প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর 'সবব' শক্তিশালী হওয়ার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার অর্জিত হয়। কাজেই সর্বাগ্রে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। মূল সম্পত্তিতে অংশীদার তারপর মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে [যেমন রাস্তা, পানির নালা ইত্যাদিতে] অংশীদার, তারপর প্রতিবেশী। মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'সবব' তথা জমির সংলগ্নতা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়ার কারণ হলো, তার সম্পত্তি প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ বিক্রীত সম্পত্তির প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু অপর দুই শফী'র ক্ষেত্রে এরূপ নয়। আর প্রতিবেশীর তুলনায় দ্বিতীয় শফী' তথা মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদার ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংলগ্নতা অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণ হলো, বিক্রীত সম্পত্তির প্রয়োজনীয় উপকারী বস্তু। যেমন রাস্তা বা পানির নালা ইত্যাদিতে তার অংশীদারিত্ব আছে। আর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রতিটি অংশের সাথে অপরে অংশ সংলগ্ন থাকে। কাজেই প্রতিবেশীর তুলনায় তার সম্পত্তির সংলগ্নতা অধিক শক্তিশালী হবে। কেননা প্রতিবেশীর সম্পত্তির কেবল একাংশই বিক্রীত সম্পত্তির সাথে সংলগ্ন। প্রতিটি অংশ সংলগ্ন নয়।

قَوْلُهٗ وَلَاَنَّ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ وَاِنْ لَمْ يَصْلُحْ : দ্বিতীয় আকলী দলিল হলো, পূর্বে আমরা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্যের জবাবে উল্লেখ করেছিলাম যে, বণ্টনের ক্ষতি শুফ'আ লাভের 'ইল্লত' তথা কারণ হতে পারে না। কেননা তা শরিয়ত স্বীকৃত একটি হক বা অধিকার। মুসান্নিফ (র.) বলেন, বণ্টনের ক্ষতি যদিও 'ইল্লাত' হওয়ার উপযুক্ত নয় কিন্তু তা অগ্রাধিকার দানের কারণ হতে পারে। কেননা অগ্রাধিকার দেওয়াই হয় এমন অতিরিক্ত কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে যা 'ইল্লত' হওয়ার উপযুক্ত নয়। সুতরাং এই ভিত্তিতে মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তিই শুফ'আর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবে। কেননা অপর অংশীদার যৌথ সম্পত্তি বিক্রয়ের কারণে বণ্টনের ক্ষতি ও ঝামেলার সম্মুখীন হয়। প্রতিবেশী বণ্টনের ক্ষতি ও ঝামেলার সম্মুখীন হয় না।

قَالَ : وَلَيْسَ لِلشَّرِيْكِ فِى الطَّرِيْقِ وَالشِّرْبِ وَالْجَارِ شُفْعَةٌ مَعَ الْخَلِيْطِ فِى الرَّقَبَةِ لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّهُ مُقَدَّمٌ ـ قَالَ : فَإِنْ سَلَّمَ فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيْكِ فِى الطَّرِيْقِ، فَإِنْ سَلَّمَ أَخَذَهَا الْجَارُ، لِمَا بَيَّنَّا مِنَ التَّرْتِيْبِ : وَالْمُرَادُ بِهٰذَا الْجَارِ الْمُلَاصِقُ ـ وَهُوَ الَّذِى عَلٰى ظَهْرِ الدَّارِ الْمَشْفُوْعَةِ وَبَابُهُ فِى سِكَّةٍ أُخْرٰى، وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ أَنَّ مَعَ وُجُوْدِ الشَّرِيْكِ فِى الرَّقَبَةِ لَا شُفْعَةَ لِغَيْرِهِ سَلَّمَ أَوْ اِسْتَوْفٰى، لِأَنَّهُمْ مَحْجُوْبُوْنَ بِهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি বিদ্যমান থাকলে যাতায়াত পথ ও পানির নালায় অংশীদার ব্যক্তির এবং প্রতিবেশীর কোনো শুফ'আর অধিকার থাকবে না। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি [সকলের উপর] অগ্রগণ্য। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি যদি তার অধিকার পরিত্যাগ করে, তাহলে যাতায়াত পথে অংশীদার ব্যক্তি শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। আর সেও যদি পরিত্যাগ করে তাহলে প্রতিবেশী তা গ্রহণ করবে। পূর্বে আমরা যে পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুফ'আ লাভ করার কথা আলোচনা করে এসেছি; তাই হচ্ছে এ মাসআলার দলিল। আর এখানে প্রতিবেশী বলে সংলগ্ন প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে। সংলগ্ন প্রতিবেশী হলো, যার বাড়ি শুফ'আর দাবিকৃত বাড়ির পিছনে অবস্থিত এবং বাড়ির দরজা অন্য গলিতে অবস্থিত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে [জাহিরী রেওয়ায়েতের বিপরীতে] বর্ণিত আছে যে, মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি বিদ্যমান থাকলে অন্য কারো শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। চাই সে শুফ'আর অধিকার পরিত্যাগ করুক বা তা গ্রহণ করুক। কেননা অন্যরা তার প্রতিবন্ধকতায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلشَّرِيْكِ فِى الطَّرِيْقِ : পূর্বের মতনে উল্লিখিত ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতে যে তিন শ্রেণির শফী'র ক্রমানুসারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুফ'আ লাভের কথা বুঝা গিয়েছিল তারই উপর ভিত্তি করে বিস্তারিত বিধান আলোচ্য ইবারতে বর্ণনা করছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি প্রথম শ্রেণির শফী' তথা মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি বর্তমান থাকে তাহলে পরবর্তী দুই শ্রেণির শফী' তথা মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে অংশীদার ব্যক্তি ও প্রতিবেশীর শুফ'আ লাভ করার কোনো অধিকার থাকবে না।

قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّهُ مُقَدَّمٌ : এ মাসআলার দলিল তাই যা আমরা একটু আগে মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি অগ্রগণ্য হওয়ার উপর উল্লেখ করেছি।

قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَ فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيْكِ فِى الطَّرِيْقِ : **সংশ্লিষ্ট** মাসআলা : যদি প্রথম শ্রেণির শফী' তথা মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণির শফী' তথা মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়; যেমন রাস্তা, পানির নালা ইত্যাদিতে অংশীদার ব্যক্তি শুফ'আ অধিকার লাভ করবে। আর এই দ্বিতীয় শ্রেণির শফী'ও যদি শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে তৃতীয় শ্রেণির শফী' তথা প্রতিবেশী শুফ'আর অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّا مِنَ التَّرْتِيْبِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলার দলিল তাই যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত তিন শ্রেণির শফী'র শুফ'আর অধিকার লাভের ক্ষেত্রে 'পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার' পাওয়ার উপর দলিল হিসেবে বর্ণনা করেছি।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهٰذَا الْجَارِ الْمُلَاصِقُ : মতন-এর ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.) যে বলেছেন, যাতায়াত পথে অংশীদার ব্যক্তি তথা দ্বিতীয় শ্রেণির শফী' শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিলে শুফ'আ লাভ করবে 'প্রতিবেশী'। এখানে প্রতিবেশী বলতে কীরূপ প্রতিবেশী উদ্দেশ্য? আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) তা বর্ণনা করছেন।

এক্ষেত্রে জানা আবশ্যক যে, রাস্তা দু ধরনের হয়ে থাকে। যথা– ১. سِكَّةٌ نَافِذَةٌ - সর্বসাধারণের জন্য এমন রাস্তা যার প্রান্ত কিছুদূর গিয়ে শেষ হয়ে যায়নি : বরং অন্য রাস্তার সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। ২. سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ তথা সীমিত বাড়ির মালিকদের যাতায়াতের জন্য এমন গলি বা রাস্তা যার প্রান্ত কিছুদূর গিয়ে শেষ হয়ে গেছে।

যে বাড়িটি বিক্রয় হয়েছে সে বাড়িটি যদি এই দ্বিতীয় প্রকার রাস্তা তথা سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ-এর পার্শ্বে অবস্থিত হয় তাহলে এই রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত অন্যান্য বাড়ির মালিকগণ সকলেই দ্বিতিয় শ্রেণির শফী' তথা মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদার বলে গণ্য হবে। কাজেই এরা প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার পাবে। তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী বলতে কাকে বুঝাবে? মুসান্নিফ (র.) বলেন, এক্ষেত্রে প্রতিবেশী হবে যার বাড়ি বিক্রীত বাড়ির সাথে পিছনের দিক থেকে [কিংবা পার্শ্ববর্তী দিক থেকে] সংযুক্ত কিন্তু তার গেট বা দরজা অন্য গলিতে। কেননা যদি এই গলিতেই তার গেট বা দরজা হয় তাহলে সে প্রতিবেশী নয় : বরং বিক্রীত বাড়ির সংশ্লিষ্ট বিষয় তথা রাস্তায় অংশীদার।

উল্লেখ্য, এখানে প্রতিবেশী বলতে সংলগ্ন প্রতিবেশী (اَلْجَارُ الْمُلَاصِقُ) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে প্রতিবেশীর বাড়ি বিক্রীত বাড়ির সাথে সংযুক্ত। পক্ষান্তরে যদি প্রতিবেশী এমন হয় যার বাড়ি বিক্রীত বাড়িটি রাস্তার যে পার্শ্বে অবস্থিত তার বিপরীত দিকে অবস্থিত। অর্থাৎ উভয় বাড়ির মাঝখান দিয়ে রাস্তাটি অতিক্রম করেছে। তাহলে এরূপ প্রতিবেশীকে اَلْجَارُ الْمُحَاذِيْ তথা মুখোমুখী অবস্থিত প্রতিবেশী বলে। এরূপ প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি মধ্যবর্তী রাস্তাটি سِكَّةٌ نَافِذَةٌ হয় তাহলে সে শুফ'আর অধিকার পাবে না। আর যদি রাস্তাটি سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ হয় তাহলে সে দ্বিতীয় শ্রেণির শফী' তথা মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদার হিসেবে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে।

وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) : উপরের মতনে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথম শ্রেণির শফী' শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিলে দ্বিতীয় শ্রেণির শফী' শুফ'আ লাভ করবে আর সেও ছেড়ে দিলে তৃতীয় শ্রেণির শফী' শুফ'আ লাভ করবে. আর এটি ছিল জাহিরে রেওয়ায়েত। জাহিরে রেওয়ায়েত অনুসারে উক্ত বিধানে আমাদের তিন ইমামের কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু জাহিরে রেওয়ায়েত বহির্ভূত একটি রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, উক্ত মাসআলার বিধান ভিন্ন। তাঁর মতে, যদি প্রথম শ্রেণির শফী' তথা মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি বর্তমান থাকে তাহলে সে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিক বা না দিক কোনো অবস্থাতেই অপর দুই শ্রেণির শফী' শুফ'আ লাভ করবে না। অনুরূপভাবে যদি দ্বিতীয় শ্রেণির শফী' বর্তমান থাকে তাহলে সে তার অধিকার ছেড়ে দিলেও তৃতীয় শ্রেণির শফী' তথা প্রতিবেশী শুফ'আ লাভ করবে না।

لِأَنَّهُمْ مَحْجُوْبُوْنَ بِهٖ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর দলিল হলো, এক্ষেত্রে মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি অপর দুই শ্রেণির শফী'র জন্য প্রতিবন্ধক (اَلْحَاجِبُ), তদ্রূপ দ্বিতীয় শ্রেণির শফী' তৃতীয় শ্রেণির শফী'র জন্য প্রতিবন্ধক। আর নিয়ম হচ্ছে প্রতিবন্ধক যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে যাদের জন্য সে প্রতিবন্ধক তারা কোনো অবস্থাতেই অধিকার লাভ করে না। চাই সে তার অধিকার গ্রহণ করুক বা না করুক। যেমন মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে। যদি নিকটতম ওয়ারিশ বর্তমান থাকে এবং সে যদি তার অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে তার চেয়ে দূরবর্তী ওয়ারিশ ত্যাজ্য সম্পত্তি লাভ করে না। যেমন পিতামহ যদি বর্তমান থাকে আর সে তার অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে প্রপিতামহ তার অংশ লাভ করে না। কেননা পিতামহ হচ্ছে প্রপিতামহের জন্য প্রতিবন্ধক। তদ্রূপ শুফ'আর ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক তথা পূর্ববর্তী শ্রেণির শফী'র বর্তমানে পরবর্তী শ্রেণির শফী' শুফ'আ থেকে বঞ্চিত হবে, পূর্ববর্তী শ্রেণি অধিকার ছেড়ে দিলেও।

وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَقَرَّرَ فِيْ حَقِّ الْكُلِّ إِلَّا أَنَّ لِلشَّرِيْكِ حَقُّ التَّقَدُّمِ، فَإِذَا سَلَّمَ كَانَ لِمَنْ يَلِيْهِ، بِمَنْزِلَةِ دَيْنِ الصِّحَّةِ مَعَ دَيْنِ الْمَرَضِ. وَالشَّرِيْكُ فِي الْمَبِيْعِ قَدْ يَكُوْنُ فِيْ بَعْضٍ مِنْهَا، كَمَا فِيْ مَنْزِلٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الدَّارِ أَوْ جِدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَارِ فِي الْمَنْزِلِ. وَكَذَا عَلَى الْجَارِ فِيْ بَقِيَّةِ الدَّارِ فِيْ أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ، لِأَنَّ اِتِّصَالَهُ أَقْوَى وَالْبُقْعَةُ وَاحِدَةٌ.

অনুবাদ : জাহিরী রেওয়ায়েতের দলিল হলো, শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান রয়েছে. তবে মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তির অগ্রাধিকার পাওয়ার হক রয়েছে। সুতরাং যখন সে তার অধিকার পরিত্যাগ করবে তখন তার পরবর্তী ব্যক্তির হক সাব্যস্ত হবে। যেমন সুস্থ অবস্থায় গৃহীত ঋণের সাথে অসুস্থ অবস্থায় গৃহীত ঋণের বিধান। বিক্রীত মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি কখনো [সম্পূর্ণ সম্পত্তিতে অংশীদার না হয়ে আংশিক সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে। যেমন বিক্রীত বাড়ির কোনো একটি ঘরের মাঝে সে অংশীদার কিংবা [ভূমিসহ] একটি দেওয়ালের মাঝে অংশীদার। এরূপ একটি ঘরের মাঝে অংশীদার ব্যক্তি উক্ত ঘরটি লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার পাবে। অনুরূপভাবে বাড়ির অবশিষ্ট অংশ লাভের ক্ষেত্রেও সে প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-থেকে বর্ণিত দু'টি বর্ণনার মধ্য হতে বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুসারে। কেননা অংশীদারের [ক্ষেত্রে] সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টি অধিকতর শক্তিশালী। আর [বাড়ির] সম্পূর্ণ ভূমি একটিই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ السَّبَبَ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) জাহিরী রেওয়ায়েতের দলিল বর্ণনা করেছেন। দলিলের সারকথা হলো, শুফ'আর অধিকার লাভ করার সবব হচ্ছে, বিক্রীত সম্পত্তির সাথে শফী'র সম্পত্তি সংযুক্ত হওয়া। আর এই সববটি তিন শ্রেণির শফী'র ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকা সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই তিন শ্রেণির শফী'ই শুফ'আর অধিকারী। তবে প্রথম শ্রেণির শফী' তথা মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি অগ্রাধিকার লাভ করে [যার কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।] সুতরাং যখন প্রথম শ্রেণির শফী' তার অধিকার ছেড়ে দিবে তখন পরবর্তী শ্রেণির শফী' পূর্ব সাব্যস্ত অধিকারের ভিত্তিতে শুফ'আ লাভ করবে।

قَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ دَيْنِ الصِّحَّةِ مَعَ دَيْنِ الْمَرَضِ : মুসান্নিফ (র.) এ মাসআলার একটি নজির তথা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। নজিরটি হলো, যদি কোনো মুমূর্ষু ব্যক্তি তার উপর এমন কিছু ঋণের কথা স্বীকার করে, যা তার কারণে তার উপর প্রাপ্য হয়েছে তা অজ্ঞাত। আর উক্ত মুমূর্ষু ব্যক্তির উপর সুস্থ থাকা অবস্থারও কিছু ঋণ রয়েছে। তাহলে বিধান হলো, সুস্থ থাকাকালীন ঋণগুলো পরিশোধের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া। যদি এগুলো পরিশোধ হওয়ার পর ত্যাজ্য সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তাহলে মুমূর্ষু অবস্থায় স্বীকারকৃত ঋণ পরিশোধ করা হবে; নতুবা নয়। কিন্তু সুস্থকালীন কোনো ঋণ যদি না থাকে তাহলে ত্যাজ্য সম্পত্তি দ্বারা মুমূর্ষু অবস্থায় স্বীকৃত ঋণ পরিশোধ করা হয়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায়ও প্রথম শ্রেণির শফী' যখন তার অধিকার ছেড়ে দিবে তখন দ্বিতীয় শ্রেণির শফী' শুফ'আ লাভ করবে।

[উল্লেখ্য মুমূর্ষু ব্যক্তির ঋণ সম্পর্কিত উক্ত মাসআলাটি হিদায়ার মূল গ্রন্থের ২২৫ নং পৃষ্ঠায় بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيْضِ -এ মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করেছেন।]

قَوْلُهُ وَالشَّرِيكُ فِي الْمَبِيعِ قَدْ يَكُونُ فِي : আলোচ্য ইবারতে বিক্রীত বাড়ির নির্দিষ্ট একটি অংশে যদি কেউ অংশীদার থাকে তাহলে সে কি সম্পূর্ণ বাড়ির মধ্যে শুফ'আ লাভ করার বিষয়ে প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে? নাকি কেবল যে অংশের মাঝে তার অংশীদারিত্ব রয়েছে সে অংশের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। এ সম্পর্কে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এমন একটি বাড়ি বিক্রয় করা হলো, যার মাঝে কতকগুলো ঘর রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ঘরের মাঝে অপর একজনের অংশীদারিত্ব রয়েছে কিংবা বাড়িটির একটি দেওয়ালের মাঝে অংশীদারিত্ব রয়েছে। তাহলে উক্ত অংশীদার কি কেবল যে ঘরটির মাঝে বা যে দেওয়ালটির মাঝে তার অংশীদারিত্ব রয়েছে সেটিতে প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে নাকি পুরো বাড়িটিতে লাভ করবে?

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনানুসারে এরূপ অংশীদার কেবল যে ঘর বা দেওয়ালের মাঝে তার অংশীদারিত্ব রয়েছে সেটিতেই অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শুফ'আ লাভ করবে এবং প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার পাবে। আর বাড়ির অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীত্বের ভিত্তিতে শুফ'আ লাভ করবে। কাজেই সেক্ষেত্রে অপর প্রতিবেশীর সাথে যৌথভাবে শুফ'আ লাভ করবে।

দ্বিতীয় বর্ণনানুসারে উক্ত অংশীদার ব্যক্তি সম্পূর্ণ বাড়িটির ক্ষেত্রেই অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শুফ'আ লাভ করবে এবং প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ বাড়ির একটি অংশে তার অংশীদারিত্ব থাকার কারণেই সে সম্পূর্ণ বাড়িটি লাভ করার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার পাবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত এই দ্বিতীয় বর্ণনাটিই অধিক বিশুদ্ধ। এই বর্ণনাটি মুসান্নিফ (র.)-এর নিকট অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার কারণেই কেবল এই মতটির দলিল উল্লেখ করেছেন। [উল্লেখ্য, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতও এই দ্বিতীয় বর্ণনার অনুরূপ। [দ্র. : বিনায়াহ]

قَوْلُهُ لِأَنَّ اِتِّصَالَهُ أَقْوَى : এ থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় রেওয়ায়েত তথা উক্ত অংশীদার ব্যক্তি সম্পূর্ণ বাড়ির ক্ষেত্রে যে প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে তার দলিল বর্ণনা করেছেন। দলিলটি হলো, প্রতিবেশীর তুলনায় উক্ত অংশীদারের সম্পত্তি বিক্রীত সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত থাকার বিষয়টি অধিক শক্তিশালী। কেননা বাড়িটির একটি অংশের মাঝে [অর্থাৎ উক্ত ঘর বা দেওয়ালের মাঝে] তার সরাসরি অংশীদারিত্ব রয়েছে। আর সম্পূর্ণ বাড়ি 'একটি স্থান' হিসেবে গণ্য। সুতরাং যখন সম্পূর্ণ বাড়িটি একটি স্থান হিসেবে গণ্য হলো তখন বাড়িটির একটি অংশে তার অগ্রাধিকার থাকায় সম্পূর্ণ বাড়িতেই তার অগ্রাধিকার অর্জিত হবে।

قَوْلُهُ أَوْ جِدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا : হিদায়া গ্রন্থের ভাষ্যকার আল্লামা আইনী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, বাড়ির একটি দেওয়ালের মাঝে অংশীদারিত্বের কারণে সম্পূর্ণ বাড়িতে শুফ'আ লাভের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সূরত হলো. দুই ব্যক্তির মাঝে একটি অবণ্টিত ভূমি ছিল। অতঃপর তারা ভূমিটির মাঝ বরাবর একটি দেওয়াল নির্মাণ করেছে। তারপর উভয়ে অবশিষ্ট ভূমি নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিয়েছে। ফলে প্রাচীরটিও তার নিম্নস্থ ভূমি উভয়ের মাঝে শরিকানা সম্পত্তি হিসেবে রয়ে গেছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীরটির মাঝে অংশীদার ব্যক্তি বিক্রীত বাড়িটির সম্পূর্ণ অংশে অগ্রাধিকার লাভ করবে।

পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে, প্রাচীর নির্মাণের পূর্বে তারা ভূমিটি বণ্টন করে নিয়েছে। অতঃপর উভয়ের সম্পত্তির মাঝখানে উভয়ে যৌথভাবে প্রাচীর নির্মাণ করেছে। এক্ষেত্রে উভয়ে কেবল প্রাচীরটির মাঝেই অংশীদার হয়েছে। প্রাচীরের নিম্নস্থ ভূমিতে অংশীদার হয়নি। এ অবস্থায় উভয়ে একে অপরের প্রতিবেশী। সুতরাং এরূপ প্রাচীরের মাঝে অংশীদার ব্যক্তি অপর প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে না।

ثُمَّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ الطَّرِيْقُ أَوِ الشِّرْبُ خَاصًّا حَتّٰى يَسْتَحِقَّ الشُّفْعَةَ بِالشَّرِكَةِ فِيْهِ، فَالطَّرِيْقُ الْخَاصُّ أَنْ لَا يَكُوْنَ نَافِذًا، وَالشِّرْبُ الْخَاصُّ أَنْ يَكُوْنَ نَهْرًا لَا تَجْرِىْ فِيْهِ السُّفُنُ، وَمَا تَجْرِىْ فِيْهِ فَهُوَ عَامٌّ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) . وَعَنْ أَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّ الْخَاصَّ أَنْ يَكُوْنَ نَهْرًا يُسْقٰى مِنْهُ قُرَاحَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، وَمَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ عَامٌّ . فَإِنْ كَانَتْ سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ يَنْشَعِبُ مِنْهَا سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ . وَهِىَ مُسْتَطِيْلَةٌ فَبِيْعَتْ دَارٌ فِى السُّفْلٰى فَلِأَهْلِهَا الشُّفْعَةُ خَاصَّةً دُوْنَ أَهْلِ الْعُلْيَا . وَإِنْ بِيْعَتْ فِى الْعُلْيَا فَلِأَهْلِ السِّكَّتَيْنِ . وَالْمَعْنٰى مَا ذَكَرْنَا فِىْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِىْ . وَلَوْ كَانَ نَهْرٌ صَغِيْرٌ يَأْخُذُ مِنْهُ نَهْرٌ أَصْغَرُ مِنْهُ فَهُوَ عَلٰى قِيَاسِ الطَّرِيْقِ فِيْمَا بَيَّنَّاهُ .

অনুবাদ : আর [যে রাস্তা ও পানির নালার ভিত্তিতে শুফ'আ সাব্যস্ত হয় সে] রাস্তা বা পানির নালা 'খাস' হওয়া আবশ্যক। তাহলে এ দুটিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। খাস রাস্তা বলতে এমন রাস্তাকে বুঝায়, যার শেষ প্রান্ত অন্য রাস্তার সাথে মিলিত নয়। আর খাস পানির নালা বলতে এমন নালাকে বুঝায়, যাতে নৌযান চলাচল করে না। আর যে নালাতে নৌযান চলাচল করে তা সর্বসাধারণের নালা বলে পরিগণিত। এটি হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, খাস নালা হলো যা থেকে দু'টি বা তিনটি ভূমিতে সেচকার্য সম্পূর্ণ করা যায়। এর চেয়ে অধিক ভূমিতে সেচ করা গেলে তা হচ্ছে সর্বসাধারণের নালা। যে গলির শেষ প্রান্ত অন্য গলি বা রাস্তার সাথে মিলিত হয়নি [বরং শেষ হয়েছে] এরূপ একটি গলি থেকে যদি অনুরূপ আরেকটি লম্বা গলি বের হয়ে তার প্রান্তে শেষ হয়ে যায়, তাহলে যদি [দ্বিতীয় গলি তথা] নিম্নদিকের গলিতে কোনো বাড়ি বিক্রি হয় তবে সে গলির বাসিন্দাগণই কেবল শুফ'আর হকদার হবে। আর যদি [প্রথম গলি তথা] শুরু দিকের গলিতে কোনো বাড়ি বিক্রি হয়, তাহলে উভয় গলির বাসিন্দাদেরই শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে 'বিচারকের নিয়মরীতি' [আদাবুল কাজী] অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। যদি একটি ছোট খাল থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট আরেকটি খাল প্রবাহিত হয় তাহলে রাস্তার ক্ষেত্রে যে বিধান আমরা উল্লেখ করলাম তদ্রূপ বিধানই প্রযোজ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শব্দার্থ: اَلشِّرْبُ -এর অর্থ হচ্ছে اَلنَّصِيْبُ مِنَ الْمَاءِ তথা পানির হিস্যা, পানি গ্রহণের অধিকার, পানির অংশবিশেষ।
اَلسُّفُنُ– নৌযান, জাহাজ, নৌকা। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ছোট নৌযান, ডিঙ্গি নৌকা।
قُرَاحَانِ এটি قُرَاحٌ এর দ্বিবচন। এর অর্থ হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রের এরূপ বিস্তৃত ভূমি, যার মধ্যে কোনো বাড়ি বা গাছগাছালি নেই। আমাদের দেশে সাধারণত এরূপ কৃষিজমির এরিয়াকে 'ব্লক' বলা হয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) রাস্তা বা নালার ধরন বা প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করতেছেন, পূর্বে এ মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণির শফী' তথা বিক্রীত সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয় (حُقُوْقُ الْمَبِيْعِ)-এ অংশীদার ব্যক্তি তার অংশীদারিত্বের কারণে শুফ'আর অধিকার লাভ করে। যেমন রাস্তা বা পানির নালা হচ্ছে এরূপ সংশ্লিষ্ট বিষয় (حُقُوْقُ الْمَبِيْعِ)। আলোচ্য ইবারতে উক্ত রাস্তা বা পানির নালা বলতে কীরূপ রাস্তা বা পানির নালা উদ্দেশ্যে তা ব্যাখ্যা করছেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, রাস্তা বা পানির নালায় অংশীদারিত্ব থাকার কারণে শুফ'আ লাভ করার জন্য অবশ্যক হলো, উক্ত রাস্তা বা পানির নালা 'খাস' হওয়া। অর্থাৎ ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া অনির্দিষ্ট না হওয়া।

রাস্তার ক্ষেত্রে এ খাস বা নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ হলো রাস্তাটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত না হওয়া। অর্থাৎ যে রাস্তার অধিবাসীরা সাধারণ পথচারীকে তাদের রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে। সেটি হচ্ছে 'খাস' তথা ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা। -[দ্র. ফতুয়ায়ে শামী] । এরূপ রাস্তার অধিবাসীরা সকলেই রাস্তাটির ক্ষেত্রে অংশীদার। সুতরাং রাস্তা সংলগ্ন কোনো বাড়ি বিক্রয় হলে অপর অধিবাসীগণ বিক্রীত সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শুফ'আ লাভ করবে এবং প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার পাবে।

আর পানির নালার ক্ষেত্রে 'খাস' বা ব্যক্তিবর্গের জন্যে নির্দিষ্ট হওয়ার কী অর্থ হবে? এ ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, ব্যক্তিবর্গের জন্য খাস বা নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এমন নালা বা খাল যাতে নৌকা চলাচল করে না। আর যে সকল খাল বা নদীতে নৌকা চলাচল করে সেগুলো হচ্ছে খাস এর বিপরীত। তথা সাধারণ পানির নালা বা পানি সিঞ্চনের উৎস।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে খাস নালা বলতে এমন পানির নালা বা খাল উদ্দেশ্য যেখান থেকে একটি বা দুইটি কৃষি জমির 'ব্লকে' পানি সিঞ্চন করা হয়। আর এর চেয়ে অধিক জমিতে যেখান থেকে পানি সিঞ্চন করা হয় তা 'খাস' নালা নয়; বরং তা সাধারণ পানি প্রাপ্তির উৎস বা নালা।

উল্লেখ্য, আল্লামা শামী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশ মাশায়েখের মতে যে 'নহর' বা নালা থেকে পানি গ্রহণকারী অংশীদারদের সংখ্যা সীমিত, সেটি হচ্ছে 'খাস' বা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দিষ্ট নালা। আর যে 'নহর' বা নালা থেকে পানি গ্রহণকারী অংশীদারদের সংখ্যা সীমিত নয়; বরং বেশি। সেটি হচ্ছে সাধারণ পানির নালা বা নহর। তবে কতজন অংশীদারকে খাস বা সীমিত সংখ্যক বলা হবে আর কত জনকে আ'ম তথা অসীমিত বলা হবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে, অসীমিত বলতে বুঝাবে পাঁচশত সংখ্যক হলে। আর কারো মতে, চারশত সংখ্যক হলে। আর কেউ কেউ মনে করেন, এ বিষয়টি প্রত্যেক যুগের মুজতাহিদের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল থাকবে। আল্লামা আইনী (র.) এই শেষোক্ত মতটিকে অধিক যুক্তিযুক্ত বলে অভিহিত করেছেন এবং 'মুহীত' গ্রন্থে এটিকে অধিক সঠিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। -[ফতুয়ায়ে শামী, খণ্ড : ৯ পৃ.-৩২১]

শব্দার্থ: سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ – কতিপয় ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দিষ্ট এমন গলি যার অধিবাসীরা সাধারণ পথচারীকে চলাচল করতে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে।

سِكَّةٌ نَافِذَةٌ – সাধারণ পথচারীদের চলাচলের জন্য তৈরি রাস্তা যার পার্শ্ববর্তী অধিবাসীরা সাধারণ পথচারীকে চলাচল করতে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে না।

سِكَّةٌ مُسْتَطِيْلَةٌ : এমন গলি বা রাস্তা যা লম্বা হয়ে সম্মুখ দিকে গিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে কিংবা অগ্রসর হয়েছে। এর বিপরীত হচ্ছে سِكَّةٌ مُسْتَدِيْرَةٌ তথা এমন গলি বা রাস্তা যা একটি মূল রাস্তা হতে উদগত হয়ে বক্র হয়ে পুনরায় মূল রাস্তাটিতে এসে মিলিত হয়েছে।

فَإِنْ كَانَتْ سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'খাস' বা প্রাইভেট রাস্তা সংলগ্ন বাড়ির অধিবাসীগণ দ্বিতীয় শ্রেণির শফী'। এরূপ রাস্তা সংলগ্ন কোনো বাড়ি বিক্রয় হলে অপর অধিবাসীরা বিক্রীত সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদার হিসেবে শুফ'আ লাভ করে। আলোচ্য ইবারতে এই মাসআলার উপর একটি বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

মাসআলার সূরত হলো, একটি 'খাস' রাস্তা (سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ) কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে। এই গলিটি থেকে দ্বিতীয় আরেকটি 'খাস' গলি সৃষ্টি হয়ে ডানে বা বামে কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় গলিটি লম্বা হয়ে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়েছে (وَهِيَ مُسْتَطِيلَةٌ) অর্থাৎ দ্বিতীয় গলিটি এমন নয় যে, সেটি বক্র হয়ে ঘুরে আবার প্রথম গলিটির সাথেই মিলিত হয়েছে। নিম্নে এর চিত্র দেখানো হলো–
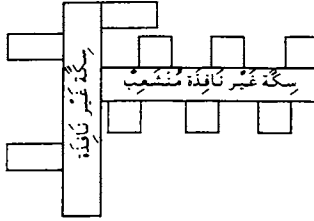
এখানে দু'টি গলি এবং উভয় গলিই سِكَّةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ অর্থাৎ কেবল রাস্তা সংলগ্ন অধিবাসীদের যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট গলি। কিন্তু প্রথম গলিটি উভয় গলির বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য আর দ্বিতীয় গলিটি কেবল দ্বিতীয় গলির বাসিন্দাদের জন্য।

এখন আলোচ্য সুরতের বিধান হলো, যদি দ্বিতীয় গলিটির সংলগ্ন কোনো বাড়ি বিক্রয় করা হয় তাহলে কেবল দ্বিতীয় গলিটির বাসিন্দারা রাস্তার মাঝে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শুফ'আ লাভ করবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় গলির সকল বাসিন্দাই সমানভাবে শুফ'আর অধিকার পাবে।

আর যদি প্রথম গলিটি (اَلْعُلْيَا) সংলগ্ন কোনো বাড়ি বিক্রয় করা হয় তাহলে উভয় গলির বাসিন্দাই তাতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। উভয় গলির বাসিন্দা সমানভাবে [বিক্রীত সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথা] রাস্তায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শুফ'আ লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَالْمَعْنٰى مَا ذَكَرْنَا فِىْ كِتَابِ اَدَبِ الْقَاضِىْ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরিউক্ত বিধানের কারণ বা দলিল তাই যা আমরা 'বিচারকের নিয়মনীতি' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) এ বিষয়টি হিদায়া গ্রন্থের كِتَابُ اَدَبِ الْقَاضِىْ নামক গ্রন্থের অধীনে بَابُ التَّحْكِيْمِ-এর ১২৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। সেখানে যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, দ্বিতীয় গলিটি কেবল এর বাসিন্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ কারণেই প্রথম গলির কোনো বাসিন্দা যদি তার বাড়ির গেট দ্বিতীয় গলিতে খুলতে চায় তাহলে সে অধিকার তার থাকে না। তাই প্রথম গলির বাসিন্দা দ্বিতীয় গলির বিক্রীত বাড়ির উপর শুফ'আও লাভ করবে না।

উল্লেখ্য, যদি দ্বিতীয় গলিটি مُسْتَطِيلَةٌ তথা লম্বা না হয়; বরং বক্র হয়ে ঘুরে প্রথম গলিতেই এসে মিলিত হয়, তাহলে উভয় গলির অধিবাসীরা যে কোনো বাড়ি বিক্রয় হলে তাতে শুফ'আ লাভ করবে। [এ মাসআলাটিও كِتَابُ اَدَبِ الْقَاضِىْ -তে উল্লেখ করা হয়েছে। –[দ্র.-হিদায়া পৃ. : ১৩০।]

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ نَهْرٌ صَغِيْرٌ يَأْخُذُ مِنْهُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে রাস্তার [শুফ'আর হকের] ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিটি ও তার বিধান উল্লেখ করা হলো, পানির নালার ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি হলে একইরূপ বিধান হবে।

পানির নালা বা 'নহর'-এর ক্ষেত্রে এর পদ্ধতি হলো, একটি ক্ষুদ্র নহর বা নালা প্রবাহিত হয়েছে। আবার এই ক্ষুদ্র নালাটি থেকে তার চেয়ে ক্ষুদ্র দ্বিতীয় আরেকটি নালা সৃষ্টি হয়েছে। উভয় নালাই 'খাস' বা সীমিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দিষ্ট [যার ব্যাখ্যা মতবিরোধসহ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে]। এক্ষেত্রেও বিধান হলো, যদি দ্বিতীয় নালাটি থেকে পানি সিঞ্চন করা হয় এমন জমি বিক্রয় করা হয়, তাহলে তাতে শুফ'আ লাভ করবে কেবল দ্বিতীয় নালাটি থেকে পানি সিঞ্চনকারী অধিবাসীরা। আর যদি প্রথম নালাটি থেকে যে ভূমিসমূহে পানি সিঞ্চন করা হয় তন্মধ্য থেকে কোনো ভূমি বিক্রয় করা হয় তাহলে তাতে উভয় নালা থেকে পানি গ্রহণকারী অধিবাসীগণ শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। এই বিধানের দলিলও পূর্বে বর্ণিত রাস্তার মাসআলার দলিলের অনুরূপ।

قَالَ : وَلَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِالْجُذُوْعِ عَلَى الْحَائِطِ شَفِيْعَ شِرْكَةٍ، وَلٰكِنَّهُ شَفِيْعُ جِوَارٍ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الشَّرْكَةُ فِي الْعَقَارِ، وَبِوَضْعِ الْجُذُوْعِ لَا يَصِيْرُ شَرِيْكًا فِي الدَّارِ، إِلَّا أَنَّهُ جَارٌ مُلَازِقٌ ـ قَالَ : وَالشَّرِيْكُ فِي الْخَشَبَةِ تَكُوْنُ عَلٰى حَائِطِ الدَّارِ جَارٌ لِمَا بَيَّنَّا ـ قَالَ : وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ عَلٰى عَدَدِ رُؤُوْسِهِمْ، وَلَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ الْأَمْلَاكِ ـ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) : هِيَ عَلٰى مَقَادِيْرِ الْأَنْصِبَاءِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ ـ أَلَا يُرٰى أَنَّهَا لِتَكْمِيْلِ مَنْفَعَتِهِ فَأَشْبَهَ الرِّبْحَ وَالْغِلَّةَ وَالْوَلَدَ وَالثَّمَرَةَ ـ

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, [বিক্রীত বাড়ির] দেওয়ালের উপর কারো গাছের ডাল থাকার কারণে সে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শুফ'আর হকদার হবে না। তবে সে প্রতিবেশী হিসেবে শফী' [শুফ'আর হকদার] হবে। [অংশীদার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য] কারণ হলো, সম্পত্তিতে অংশীদার হওয়া। আর গাছের ডাল রাখার কারণে কেউ বাড়ির মাঝে অংশীদার সাব্যস্ত হয় না। তবে সে লাগোয়া প্রতিবেশী বলে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন, প্রাচীরের উপর স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ডে অংশীদার ব্যক্তি প্রতিবেশী বলে গণ্য হবে। এর কারণ তা-ই যা আমরা একটু পূর্বে বর্ণনা করেছি। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [একই সম্পত্তিতে] শুফ'আর হকদার কয়েকজন হলে শুফ'আর সম্পত্তি তাদের মাঝে বণ্টিত হবে মাথাপিছু হিসেবে। এক্ষেত্রে তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তির তারতম্য বিবেচিত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এক্ষেত্রে শুফ'আর সম্পত্তি বণ্টিত হবে তাদের [নিজ নিজ] অংশের পরিমাণের আনুপাতিক হারে। কেননা শুফ'আর অধিকার মূলত মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে অর্জিত সুবিধা বিশেষ। তুমি কি এ বিষয়টি লক্ষ্য করনি যে, মালিকানাধীন সম্পত্তির উপকারিতার পূর্ণতা বিধানের জন্যই শুফ'আর অধিকার [শরিয়তে] অনুমোদিত হয়েছে। সুতরাং শুফ'আর বিষয়টি মুনাফা, জমির ফসল, দাসীর সন্তান এবং গাছের ফলের মতোই হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِالْجُذُوْعِ الخ : এ ইবারতে قَالَ [বলেন] বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বয়ং হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন। এখানে যে মাসআলাটি মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করেছেন তা পরবর্তী 'মতন'-এর ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। যে মাসআলা পরবর্তী 'মতনে' বর্ণনা করা হবে তা পূর্বেই মুসান্নিফ (র.) কেন বর্ণনা করেছেন তা আমাদের নিকট স্পষ্ট নয়। ভাষ্যকারগণও বিষয়টির ব্যাখ্যা উল্লেখ করেননি। তবে এর আনুমানিক কারণ এটা হতে পারে যে, পরবর্তীতে মতনে মাসআলাটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। তাই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য তুলনামূলক স্পষ্ট ইবারতে দলিলসহ মুসান্নিফ (র.) আগে একবার বর্ণনা করে নিয়েছেন।

যাই হোক, মাসআলা হলো–দু'টি বাড়ির মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত প্রাচীরের উপর স্থাপিত কোনো গাছের খণ্ডে যদি উভয় বাড়ির মালিক অংশীদার হয়, তাহলে কেবল এই বৃক্ষখণ্ডের মাঝে অংশীদারিত্বের কারণে তাদেরকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শফী' হিসেবে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শফী' হওয়ার কথা পূর্বে যে বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রাচীরের উপর স্থাপিত কাঠের মাঝে অংশীদারিত্বের কারণে অর্জিত হবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الشَّرِكَةُ فِي الْعَقَارِ الخ : উপরিউক্ত বিধানের কারণ হলো, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শুফ'আ লাভের ক্ষেত্রে 'ইল্লত' হচ্ছে ভূ-সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব। আর প্রাচীরের উপর শরিকানা কাষ্ঠখণ্ড স্থাপনের মাধ্যমে বাড়ির মাঝে কোনো অংশীদারিত্ব অর্জিত হয় না। সুতরাং এর কারণে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না [তথা শুধুমাত্র অধিকার অর্জিত হয় না]। অবশ্য এরূপ অংশীদার যেহেতু পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন বাড়ির অধিকারী তাই সে লাগোয়া প্রতিবেশী। কাজেই প্রথম দুই শ্রেণির শফী' না থাকলে প্রতিবেশী হিসেবে সে শুফ'আ লাভ করবে।

উল্লেখ্য, উপরে যে 'কাষ্ঠখণ্ডের মাঝে অংশীদারিত্বের কারণে শুফ'আ লাভ না করার' মাসআলাটি বর্ণনা করা হয়েছে এটি নিতান্তই সহজ কথা। যা মাসআলা হিসেবে উল্লেখ করার তেমন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। হিদায়া গ্রন্থের গ্রন্থকার আল্লামা আইনী (র.) আলোচ্য মাসআলাটি উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম কারখী (র.)-এর 'মুখতাসার' গ্রন্থে বর্ণিত একটি সুরত উল্লেখ করেছেন। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় সেটি অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সুরতটি সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরলাম–

"ইমাম কারখী (র.) তাঁর মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ফকীহ হিশাম (র.) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি দু'টি বাড়ির মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকে, আর প্রাচীরটির উপর উভয় বাড়ির মালিকের শরিকানা একটি কাষ্ঠখণ্ড স্থাপিত থাকে, তারপর দু'টি বাড়ির একটি বাড়ি বিক্রয় করায় অপর বাড়ির মালিক এসে শুফ'আর দাবি করে এবং অন্য প্রতিবেশীও এসে শুফ'আর দাবি করে, কিন্তু এ বিষয়টি জানা নেই যে, উক্ত প্রাচীরটি উভয় বাড়ির মালিকের মাঝে শরিকানা কিনা, তাহলে বিধান কী হবে? ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উত্তরে বললেন, অপর বাড়ির মালিককে বলা হবে তুমি এই মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ কর যে, প্রাচীরটি তোমাদের উভয়ের মাঝে শরিকানা ছিল। যদি সে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় তাহলে সে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শুফ'আ লাভ করবে। নতুবা সে অংশীদার হিসেবে শফী' সাব্যস্ত হবে না।"

قَوْلُهُ قَالَ : وَالشَّرِيكُ فِي الْخَشَبَةِ الخ : উক্ত মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সগীর গ্রন্থের 'ক্রয়বিক্রয়' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এ মাসআলাটিই এর পূর্বের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) নিজের ইবারতে দলিলসহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ الخ : মাসআলা হলো, যদি একই শ্রেণির শফী' একাধিক ব্যক্তি হয় এবং শফী'দের সম্পত্তি কারো কম আর কারো বেশি হয় তাহলে উক্ত শফী'গণের মাঝে শুফ'আর সম্পত্তি কি সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে নাকি তাদের অংশের কমবেশির দিকে লক্ষ্য করে শুফ'আর ক্ষেত্রেও কমবেশি করা হবে? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আমাদের ইমামগণের মতে এক্ষেত্রে শফী'গণের মাঝে শুফ'আর সম্পত্তি সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হবে। যে সম্পত্তির ভিত্তিতে তারা শুফ'আর অধিকার লাভ করেছে সে সম্পত্তি কারো কম হোক বা বেশি হোক তা বিবেচ্য হবে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি বাড়ি তিন ব্যক্তির মাঝে শরিকানা। তাদের একজনের বাড়িটির অর্ধেক দ্বিতীয়জনের একতৃতীয়াংশ আর তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানায় একষষ্ঠাংশ। অতঃপর যার অর্ধেক মালিকানা ছিল সে তার অংশ বিক্রয় করল। তাহলে আমাদের মতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি বিক্রীত অংশটুকু সমানভাবে অর্ধেক অর্ধেক করে লাভ করবে। তাদের অংশীদারিত্বের মাঝে যে কম বেশি রয়েছে তা ধর্তব্য হবে না। সারকথা, শুফ'আ লাভের ক্ষেত্রে শফী'দের সংখ্যা বিবেচ্য হবে; মালিকানাধীন অংশ বিবেচ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ عَلَى مَقَادِيرِ الْأَنْصِبَاءِ : আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, শফী'দের মালিকানাধীন অংশের কমবেশির অনুপাতেই তারা শুফ'আ লাভ করবে। যার অংশ কম সে কম অংশ পাবে আর যার অংশীদারিত্বের পরিমাণ বেশি সে বেশি অংশ লাভ করবে। সুতরাং উপরে বর্ণিত উদাহরণে দ্বিতীয় ব্যক্তি বিক্রীত অংশ থেকে দুই তৃতীয়াংশ লাভ করবে আর তৃতীয় ব্যক্তি একতৃতীয়াংশ লাভ করবে। সারকথা, শফী'গণ যে সম্পত্তির ভিত্তিতে শুফ'আ লাভ করবে সে সম্পত্তির অনুপাতেই তারা শুফ'আ লাভ করবে।

উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপরিউক্ত মতটি হচ্ছে তাঁর থেকে বর্ণিত দু'টি মতের একটি। 'শরহুল ওয়াজীয' গ্রন্থে এটিকে শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধতম মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতও অনুরূপ। আর ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ মতও তাই।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর দ্বিতীয় মত হচ্ছে আমাদের মতের অনুরূপ। ইমাম মুযানী (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এই দ্বিতীয় মতটিই গ্রহণ করেছেন। ইমাম শা'বী, নাখয়ী, সাওরী, ইবনে আবী লায়লা ও ইবনে শাবরুমা প্রমুখ ইমামগণের মতও আমাদের মতের অনুরূপ।

উল্লেখ্য, উপরে যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এরূপ পদ্ধতি যদি প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে হয়। যেমন তিনজন প্রতিবেশী শুফ'আর হকদার। কিন্তু বিক্রীত জমির সাথে তাদের কারো জমি কম পরিমাণ সংলগ্ন আর কারো জমি বেশি পরিমাণ সংলগ্ন। তাহলে আমাদের মতে উপরে বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ তিনজনে সমান হারেই শুফ'আর সম্পত্তি লাভ করবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এক্ষেত্রে তারা শুফ'আ লাভ করবে না। কেননা তাঁর মতে, প্রতিবেশীত্বের কারণে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত বা অর্জিত হয় না। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ الخ : এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর দলিল হলো, শুফ'আর অধিকার হচ্ছে শফী'দের মালিকানাধীন সম্পত্তির কারণে অর্জিত ফল। কেননা মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে পূর্ণরূপে যাতে উপকার অর্জন করা সম্ভব হয় সেজন্যই তো শুফ'আর অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং শুফ'আর অধিকার যখন সম্পত্তির কারণে অর্জিত ফল হলো তখন সম্পত্তির কমবেশি হওয়ার কারণে অর্জিত ফল তথা শুফ'আর ক্ষেত্রেও কমবেশি হবে।

قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ الرِّبْحَ وَالْغِلَّةَ وَالْوَلَدَ وَالثَّمَرَةَ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের সমর্থনে কিয়াস হিসেবে চারটি নজির পেশ করা হচ্ছে। এই নজিরগুলোতে আহনাফের মতেও মালিকানাধীন বস্তুর মাঝে অংশীদারিত্বের তারতম্যের অনুপাতে তা থেকে অর্জিত ফলের অংশীদারিত্ব কমবেশি সাব্যস্ত হয়।

প্রথম নজির : اَلرِّبْحُ তথা সম্পদ থেকে অর্জিত মুনাফার মাসআলা। উদাহরণস্বরূপ, দুই ব্যক্তি ১৫ টাকার বিনিময়ে একটি দ্রব্য ক্রয় করল। তাদের মধ্যে একজন দিল ১০ টাকা আর অপরজন দিল ৫ টাকা। লাভের ক্ষেত্রে কে কতটুকু লভ্যাংশ পাবে সে ব্যাপারে তারা কোনো শর্ত করল না। অতঃপর তারা দ্রব্যটি ১৮ টাকায় বিক্রি করল। এখন লাভের ৩ টাকা তাদের মাঝে বণ্টিত হবে দ্রব্যটিতে তাদের যে হারে মালিকানা ছিল সে অনুপাতে। সুতরাং যার ১০ টাকা ছিল সে লভ্যাংশের দুইতৃতীয়াংশ তথা ২ টাকা পাবে আর যে ৫ টাকা দিয়েছিল সে পাবে লভ্যাংশের একতৃতীয়াংশ তথা ১ টাকা।

দ্বিতীয় নজির : اَلْغِلَّةُ তথা শরিকানা সম্পত্তিতে উৎপাদিত ফসলের মাসআলা। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি সম্পত্তি দুই ব্যক্তির মাঝে শরিকানা হয় এবং একজনের তিন ভাগের দুই ভাগ আর অপর জনের এক ভাগ। তাহলে উক্ত সম্পত্তিতে যে ফসল হবে তা তাদের মাঝে তিনভাগে ভাগ করে বণ্টিত হবে। প্রথম ব্যক্তি পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ আর অপরজন পাবে এক ভাগ।

তৃতীয় নজির : اَلْوَلَدُ তথা যৌথ দাসীর গর্ভে জন্মলাভ করা সন্তানের মাসআলা। যেমন একটি দাসী যদি দুই ব্যক্তির যৌথ মালিকানাধীন হয় এবং একজনের দুইতৃতীয়াংশ আর অপরজনের একতৃতীয়াংশ। অতঃপর তাকে অন্য এক ব্যক্তির নিকট বিবাহ দেওয়ার পর তার গর্ভে যদি কোনো সন্তান জন্মলাভ করে তাহলে উক্ত সন্তানের মালিক হবে মাতার মালিক যে দুইজন তারাই। এক্ষেত্রেও প্রথমজন সন্তানটির দুইতৃতীয়াংশের মালিক হবে আর অপরজন একতৃতীয়াংশের মালিক হবে।

চতুর্থ নজির : اَلثَّمَرَةُ তথা জমিতে উৎপন্ন ফসলের মাসআলা। অর্থাৎ যদি কোনো জমি একাধিক ব্যক্তির মাঝে শরিকী হয় তাহলে সে জমিতে উৎপন্ন ফসল অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশের অনুপাতেই লাভ করবে।

উক্ত চারটি মাসআলায়ই সকলের ঐকমত্যে মালিকগণ মালিকানাধীন বস্তু থেকে অর্জিত ফলের ক্ষেত্রে নিজ নিজ অংশের অনুপাতেই অংশীদার হয়ে থাকে। কাজেই শুফ'আর অধিকারও যেহেতু শফী'র মালিকানাধীন সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে অর্জিত ফলস্বরূপ। তাই এক্ষেত্রেও শফী'গণ নিজ নিজ অংশের অনুপাতেই শুফ'আর অংশীদার সাব্যস্ত হবে।

وَلَنَا أَنَّهُمْ اِسْتَوَوْا فِي سَبَبِ الْاِسْتِحْقَاقِ وَهُوَ الْاِتِّصَالُ فَيَسْتَوُوْنَ فِي الْاِسْتِحْقَاقِ . أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ اِنْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اِسْتَحَقَّ كَمَالَ الشُّفْعَةِ . وَهٰذَا اٰيَةُ كَمَالِ السَّبَبِ . وَ كَثْرَةُ الْاِتِّصَالِ تُؤْذِنُ بِكَثْرَةِ الْعِلَّةِ . وَالتَّرْجِيْحُ يَقَعُ بِقُوَّةٍ فِي الدَّلِيْلِ لَا بِكَثْرَتِهِ . وَلَا قُوَّةَ هٰهُنَا ، لِظُهُوْرِ الْأُخْرٰى بِمُقَابَلَتِهِ ، وَتَمَلُّكُ غَيْرِهِ لَا يُجْعَلُ ثَمَرَةً مِنْ ثَمَرَاتِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ وَأَشْبَاهِهَا .

অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো, শুফ'আর হকদার হওয়ার জন্য যা কারণ তথা 'সবব' তাতে শফী'গণ সকলেই সমান। সে কারণ তথা 'সবব' হলো সম্পত্তিতে পরস্পরের সম্পৃক্ততা। কাজেই শফী'গণ শুফ'আর হকদার হওয়ার ক্ষেত্রেও সমান হবে। তুমি কি এ বিষয়টি লক্ষ্য করনি যে, যদি তাদের মধ্য হতে কেবল একজন হকদার থাকত তাহলে সে সম্পূর্ণ শুফ'আর অধিকারী হতো। এ বিষয়টি এ কথারই প্রমাণ যে, [তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকারী হওয়ার] কারণ বা 'সবব' পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। আর [কারো ক্ষেত্রে] সম্পৃক্ততার আধিক্য [কারো ক্ষেত্রে] কারণ বা 'সবব' অধিক হওয়ার কথা প্রকাশ করে। কিন্তু অগ্রাধিকার তো দেওয়া হয় দলিল [বা কারণ] শক্তিশালী হওয়ার ভিত্তিতে; তা অধিক হওয়ার ভিত্তিতে নয়। এখানে শফী'গণের একজনের বিপরীতে অন্যজন আত্মপ্রকাশ করছে, তাই কারো [ক্ষেত্রে] কারণ বা 'সবব'-এর শক্তিশালী হওয়ার বিষয় হাসিল হয়নি।
আর অন্যের সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকারকে নিজ সম্পত্তির ফলস্বরূপ গণ্য করা সঠিক নয়। পক্ষান্তরে গাছের ফল ও [উল্লিখিত] অন্যান্য বস্তুগুলোর বিষয়টি ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : وَلَنَا أَنَّهُمْ اِسْتَوَوْا الخ : উল্লিখিত ইবারত থেকে আমাদের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। দলিলের সারকথা হচ্ছে, শুফ'আর অধিকার লাভ করার 'সবব' তথা 'ইল্লত' বা কারণ হলো, 'সংলগ্নতা'। অর্থাৎ শফী'র সম্পত্তি বিক্রীত সম্পত্তির সাথে সংলগ্ন হওয়া। আর শফী'গণ যখন একই শ্রেণির হয় তখন তারা এই 'সবব' তথা 'ইল্লত' এর ক্ষেত্রে সমান হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকের মাঝে এই 'সবব' সমানভাবে বিদ্যমান। সুতরাং শুফ'আর অধিকার লাভ করার ক্ষেত্রেও তারা সমান হবে।
قَوْلُهُ : أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ اِنْفَرَدَ الخ : 'সবব' যে তাদের মাঝে বিদ্যমান তার প্রমাণ হচ্ছে, সমানভাবে যদি একই শ্রেণির কয়েকজন শফী' না থাকে ; বরং একজন থাকে তাহলে সে সম্পূর্ণ শুফ'আর অধিকারী হয়। এটাই প্রমাণ করে যে 'সবব'টি তার মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা 'সবব' যদি তার মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান না থাকত তাহলে পূর্ণ শুফ'আর অধিকারী সে হতো না। সুতরাং 'সবব' যখন প্রত্যেকের মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান সাব্যস্ত হলো তখন অধিকার লাভ করার ক্ষেত্রেও সকলে সমতা লাভ করবে।
قَوْلُهُ : وَكَثْرَةُ الْاِتِّصَالِ تُؤْذِنُ : এ থেকে গ্রন্থকার (র.) একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আর প্রশ্নটি হলো, এরূপ শুফ'আ লাভ করার 'সবব' তথা 'ইল্লত' হলো সংলগ্নতা। কিন্তু যে শফী' এর সম্পত্তি বেশি তার ক্ষেত্রে সংলগ্নতাও তো বেশি, আর যে শফী' এর সম্পত্তি কম তার ক্ষেত্রে সংলগ্নতাও তো কম। কাজেই 'সবব' এর ক্ষেত্রে উভয়ে সমান হবে কীভাবে?

এই প্রশ্নের জবাবের সারকথা হলো, শফী'র সম্পত্তির সংলগ্নতা বেশি হওয়া 'সবব' তথা 'ইল্লত' বেশি হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা জমির সামান্য অংশ যদি বিক্রীত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সংলগ্ন থাকে তাহলে সেটুকুই [শফী' একজন হলে] পূর্ণ শুফ'আ লাভ করার 'ইল্লত' তথা কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হয় [যা আমরা একটু পূর্বে বর্ণনা করেছি]। কাজেই সংলগ্নতা বেশি হলে 'সবব' তথা 'ইল্লত' বেশি আছে বলে বুঝা গেল ঠিক। কিন্তু নিয়ম হলো, কোনো বিধানের ক্ষেত্রে 'ইল্লত' তথা দলিল বেশি হওয়ার কারণে বিধানের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অগ্রাধিকার অর্জিত হয় না। বরং অগ্রাধিকার অর্জিত হয় দলিল তথা 'ইল্লত' শক্তিশালী হওয়ার ভিত্তিতে। যেমন এক পক্ষে যদি দশজন সাক্ষী থাকে আর অপর পক্ষে দুইজন সাক্ষী থাকে তাহলে যে পক্ষে দশজন সাক্ষী আছে সে কোনো প্রকার অগ্রাধিকার লাভ করে না; বরং উভয় পক্ষের সাক্ষীকে সমান বলে ধর্তব্য হয়।

আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যে শফী'র সম্পত্তি বেশি তার ক্ষেত্রে 'ইল্লত' বা 'সবব'-এর পরিমাণও বেশি কিন্তু তাতে শক্তি বেশি বলে সাব্যস্ত হয় না। অর্থাৎ কম সম্পত্তির শফী'র তুলনায় বেশি সম্পত্তির শফী'র 'সবব' শক্তিশালী নয়। আর এর প্রমাণ হচ্ছে, যদি তার 'সবব' তথা 'ইল্লত' অধিক শক্তিশালী হতো তাহলে তার বর্তমানে কম সম্পত্তির শফী' শুফ'আর অধিকার মোটেই লাভ করত না। কেননা নিয়ম হচ্ছে যার 'সবব' শক্তিশালী সে অগ্রাধিকার লাভ করবে। আর একজন অগ্রাধিকার লাভকারী বিদ্যমান থাকলে নিম্নতর ব্যক্তি অধিকার লাভ করে না। সুতরাং বেশি সম্পত্তির শফী'র সাথে কম সম্পত্তির শফী'ও যখন শুফ'আ লাভে আত্মপ্রকাশ করছে, তখন বুঝা গেল বেশি সম্পত্তির শফী'র ক্ষেত্রে 'সবব' অধিক শক্তিশালী নয়। কাজেই শুফ'আ লাভের ক্ষেত্রে সমতাই সাব্যস্ত হবে।

وَتَمَلُّكُ مِلْكِ غَيْرِه لَا يُجْعَلُ ثَمَرَةً الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) যে বলেছিলেন, "শুফ'আর অধিকার হচ্ছে মালিকানাধীন সম্পত্তির অর্জিত ফল" তার জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, অন্যের সম্পত্তির উপর মালিকানা লাভ করাকে নিজের সম্পত্তির অর্জিত ফল হিসেবে গণ্য করা যায় না। কেননা অন্যের সম্পত্তি তার নিজের সম্পত্তি থেকে সৃষ্ট নয়। যেমন পিতা তার ছেলের দাসীর উপর মালিকানা লাভ করার অধিকার পায়, কিন্তু এটাকে পিতার সম্পত্তির অর্জিত ফল হিসেবে গণ্য করা হয় না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ وَأَشْبَاهِهَا : পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) যে চারটি নজির উল্লেখ করেছিলেন, তথা শরিকী গাছের ফল, যৌথভাবে ক্রয়কৃত পণ্য থেকে অর্জিত মুনাফা, শরিকী জমিতে উৎপন্ন ফসল ও যৌথ মালিকানাধীন দাসীর গর্ভে জন্ম লাভ করা সন্তান এগুলোর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এর সবগুলোই নিজের মালিকানাধীন সম্পদ থেকে সৃষ্ট ফল। এ জন্যই এগুলোর উপর অনিচ্ছাকৃতভাবেই মালিকানা অর্জিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শুফ'আর সম্পত্তির উপর অনিচ্ছাকৃতভাবে মালিকানা হাসিল হয় না। কাজেই তা নিজ সম্পদের সৃষ্ট ফল নয়। অতএব ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দাবি সঠিক নয়।

وَلَوْ اَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ فَهِيَ لِلْبَاقِيْنَ فِي الْكُلِّ عَلَى عَدَدِهِمْ لِأَنَّ الْاِنْتِقَاصَ لِلْمُزَاحَمَةِ مَعَ كَمَالِ السَّبَبِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقَدِ انْقَطَعَتْ .

অনুবাদ : যদি শফী'গণের কেউ তার হক ছেড়ে দেয় তাহলে অবশিষ্ট শফী'দের জন্য সম্পূর্ণ সম্পত্তি তাদের মাথাপিছু হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কেননা শফী'গণের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে শুফ'আ লাভের 'সবব' পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ সম্পত্তি লাভের অধিকার খর্ব হয়েছিল অন্যদের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক উপস্থিতির কারণে। [হক ছেড়ে দেওয়ার ফলে] এখন সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَوْ اَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ الخ : পূর্বে বর্ণিত 'মতন' -এর মাসআলার উপর ভিত্তি করে মুসান্নিফ (র.) আরো কিছু মাসআলার বিধান বর্ণনা করছেন।

মাসআলা : যদি একই শ্রেণির শফী'গণের মধ্য হতে কেউ তার অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে অবশিষ্ট শফী'গণ সম্পূর্ণ শুফ'আর সম্পত্তি সমানভাবে লাভ করবে। [এটিও হচ্ছে আমাদের মতানুসারে আর অন্যান্য তিন ইমামের মতে, পূর্বের মাসআলার মতোই নিজ নিজ সম্পত্তির আনুপাতিক হারে লাভ করবে।]

উল্লেখ্য, যদি অবশিষ্ট শফী'গণ ছেড়ে দেওয়া অংশটুকু গ্রহণ করতে না চায়; বরং শুধু নিজেদের অংশটুকু গ্রহণ করতে চায় তাহলে সকলের ঐকমত্যে তাদের এই অধিকার থাকবে না; বরং সম্পূর্ণ জমি তাদের নিতে হবে।

স্মরণযোগ্য যে, মুসান্নিফ (র.) যে বিধান উল্লেখ করেছেন এটি হচ্ছে, বিচারক শুফ'আর রায় প্রদানের পূর্বে হলে সে সূরতের বিধান। পক্ষান্তরে যদি বিচারক দুইজনের পক্ষে শুফ'আর রায় প্রদান করে তারপর তাদের একজন অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে তার অংশ অপরজন গ্রহণ করতে পারবে না।

অনুরূপভাবে প্রথম শ্রেণির শফী' [তথা মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তি]-এর পক্ষে শুফ'আর রায় হওয়ার পরে সে যদি শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণির শফী' [অর্থাৎ মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদার ব্যক্তি] শুফ'আ লাভ করবে না। ঠিক একইভাবে যদি দ্বিতীয় প্রকার শফী'র পক্ষে রায় হওয়ার পরে সে তার অধিকার পরিত্যাগ করে তাহলে তৃতীয় প্রকার শফী' তথা প্রতিবেশী শুফ'আ লাভ করবে না। -[দ্র. : আল্ বিনায়াহ]

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْاِنْتِقَاصَ لِلْمُزَاحَمَةِ مَعَ كَمَالِ السَّبَبِ الخ : এখানে থেকে মুসান্নিফ (র.) তাঁর বর্ণিত মাসআলার দলিল বর্ণনা করছেন। দলিল হলো, পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, একই শ্রেণির শফী' যখন একাধিক থাকে তখন প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই 'সবব' তথা 'ইল্লত' পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই শুফ'আর পূর্ণ সম্পত্তি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু অন্যদের বিদ্যমানতার কারণে প্রত্যেকের অধিকারের মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন একজন তার অধিকার ছেড়ে দেয় তখন তার বিদ্যমানতা দূর হয়ে যায়। সুতরাং তখন অবশিষ্ট একজন থাক কিংবা একাধিক থাক সম্পূর্ণ সম্পত্তিতে তাদের অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাওনাদারদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পাওনাদারগণ যদি মৃতব্যক্তির সম্পত্তি থেকে তাদের ঋণ আদায়ের জন্য একত্রিত হয় তখন ত্যাজ্য সম্পত্তি কম থাকলে তাদের মাঝে ঋণ আনুপাতিক হারে বণ্টন করে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তাদের একজন তার প্রাপ্য ঋণ ছেড়ে দেয় তাহলে অবশিষ্ট পাওনাদারগণ ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তির অংশও নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নেয়। অনুরূপভাবে কোনো হত্যাকারী যদি দুই ব্যক্তিকে হত্যা করে থাকে অতঃপর একজনের অভিভাবক 'কিসাস' গ্রহণ করা থেকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে অপরজন 'কিসাস' গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে। কেননা প্রত্যেকের অধিকার হত্যাকারীর সম্পূর্ণ দেহে সাব্যস্ত হয়। কাজেই একজন যখন ক্ষমা করবে তখন অপরজন পূর্ণরূপেই 'কিসাস' গ্রহণের অধিকার লাভ করবে। সুতরাং আলোচ্য শুফ'আর মাসআলার বিধানও তদ্রূপ হবে।

وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ غُيَّبًا يُقْضٰى بِهَا بَيْنَ الْحُضُوْرِ عَلٰى عَدَدِهِمْ، لِأَنَّ الْغَائِبَ لَعَلَّهُ لَا يَطْلُبُ . وَإِنْ قُضِىَ لِحَاضِرٍ بِالْجَمِيْعِ ثُمَّ حَضَرَ آخَرُ يُقْضٰى لَهُ بِالنِّصْفِ، وَلَوْ حَضَرَ ثَالِثٌ فَبِثُلُثِ مَا فِىْ يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ، تَحْقِيْقًا لِلتَّسْوِيَةِ، فَلَوْ سَلَّمَ الْحَاضِرُ بَعْدَ مَا قُضِىَ لَهُ بِالْجَمِيْعِ لَا يَأْخُذُ الْقَادِمُ إِلَّا النِّصْفَ ـ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِىْ بِالْكُلِّ لِلْحَاضِرِ قَطَعَ حَقَّ الْغَائِبِ عَنِ النِّصْفِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ ـ

অনুবাদ : যদি শফী'দের কেউ অনুপস্থিত থাকে তাহলে শুফ'আর সম্পত্তিতে উপস্থিত শফী'দের মাঝে তাদের মাথাপিছু হিসেবে শুফ'আর ফয়সালা হবে। কেননা হতে পারে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি তার শুফ'আর দাবি করবে না। যদি উপস্থিত শফী'র অনুকূলে সম্পূর্ণ সম্পত্তির ফয়সালা করা হয়। অতঃপর অপর একজন উপস্থিত হয় এবং শুফ'আ দাবি করে তাহলে তার জন্য অর্ধেক সম্পত্তির ফয়সালা করা হবে। এরপর যদি তৃতীয় একজন উপস্থিত হয় তাহলে তার জন্য [প্রথমোক্ত দু'জনের] প্রত্যেকের নিকট যা রয়েছে তার একতৃতীয়াংশ সম্পত্তির ফয়সালা করা হবে। [এ বিধান হলো] শফী'গণের মাঝে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে। যদি উপস্থিত শফী'র অনুকূলে সম্পূর্ণ সম্পত্তির ফয়সালা হওয়ার পর সে যদি তা ছেড়ে দেয় তাহলে অনুপস্থিত আগমনকারী ব্যক্তি কেবল অর্ধেক সম্পত্তিই লাভ করবে। কেননা বিচারক কর্তৃক উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে পূর্ণ সম্পত্তির রায় হওয়ায় অর্ধেক সম্পত্তিতে অনুপস্থিত ব্যক্তির হক কর্তন হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বিষয়টি বিচারকের রায়ের পূর্বে হলে সে বিষয়টি ভিন্ন ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শব্দ বিশ্লেষণ : غُيَّبًا শব্দটি غَائِبٌ -এর বহুবচন। অর্থ হচ্ছে– অনুপস্থিত , অবর্তমান। اَلْحُضُوْرُ শব্দটি حَاضِرٌ -এর বহুবচন। অর্থ হচ্ছে উপস্থিত, বর্তমান।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ غُيَّبًا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আরো কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করছেন।

মাসআলা : যদি শফী'গণের মধ্য হতে এক বা একাধিক ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে। তাহলে যারা উপস্থিত আছে তাদের মাঝে শুফ'আর সম্পূর্ণ সম্পত্তি মাথাপিছু সমান হারে বণ্টন করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ অনুপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য অপেক্ষা করা হবে না এবং তাদের অংশ রেখেও দেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَائِبَ لَعَلَّهُ لَا يَطْلُبُ : এ মাসআলার দলিল হলো, অনুপস্থিত শফী' হয়তো শুফ'আর দাবি নাও করতে পারে। অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে দু'টি সম্ভবনাই বিদ্যমান, সে দাবি করতেও পারে আবার দাবি নাও করতে পারে। সুতরাং তার শুফ'আর দাবি করার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই সন্দেহযুক্ত বিষয়ের কারণে উপস্থিত শফী'দের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ قُضِىَ لِحَاضِرٍ بِالْجَمِيْعِ الخ : মাসআলা যদি উপস্থিত শফী'র পক্ষে বিচারক সম্পূর্ণ সম্পত্তির রায় প্রদান করে তারপর অনুপস্থিত শফী' এসে তার শুফ'আ দাবি করে, তাহলে তার পক্ষে বিচারক পুনরায় অর্ধেক সম্পত্তির রায় প্রদান করবেন। অর্থাৎ তখন প্রথম শফী' অর্ধেক সম্পত্তি পাবে আর দ্বিতীয় তথা পরে আগত শফী' অর্ধেক লাভ করবে। এরপর যদি আবার তৃতীয় আরেকজন অনুপস্থিত শফী' এসে হাজির হয় এবং শুফ'আর দাবি করে তাহলে বিচারক প্রথমোক্ত দুই শফী'র প্রত্যেকে যে অর্ধেক সম্পত্তি লাভ করেছিল সে অর্ধেক থেকে একতৃতীয়াংশ করে নিয়ে এই তৃতীয় আগত শফী'কে সম্পূর্ণ সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ প্রদান করবেন। অর্থাৎ তখন প্রত্যেক শফী' একতৃতীয়াংশ করে লাভ করবে। মোদ্দাকথা পূর্ব থেকে উপস্থিত শফী' ও পরবর্তীতে আগত শফী'র মাঝে সর্বাবস্থায় সমতা সাধন করা হবে।

قَوْلُهُ تَحْقِيقًا لِلتَّسْوِيَةِ : উক্ত বিধানের কারণ এটাই যা পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ শফী'গণ সকলেই 'সবব' তথা ইল্লতের ক্ষেত্রে সমান। কাজেই শুফ'আর সম্পত্তি লাভের ক্ষেত্রে তারা সমানভাবে অধিকার পাবে। অতএব সমতা বিধান করার জন্য উপরিউক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে।

قَوْلُهُ فَلَوْ سَلَّمَ الْحَاضِرُ بَعْدَ مَا الخ : আর যদি উপস্থিত শফী'র পক্ষে সম্পূর্ণ সম্পত্তির রায় হওয়ার পর সে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয়, তারপর যদি অনুপস্থিত শফী' আগমন করে তাহলে আগত শফী' কেবল তার অর্ধেকই লাভ করবে। এক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ সম্পত্তি লাভ করবে না। অর্থাৎ ইতঃপূর্বে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন শফী' তার অধিকার ছেড়ে দিলে অন্যজন সম্পূর্ণ সম্পত্তি লাভ করে সে বিধান ছিল, বিচারকের রায় হওয়ার পূর্বের সুরতে। পক্ষান্তরে বিচারকের রায় হয়ে যাওয়ার পর কেউ তার অধিকার ছেড়ে দিলে তার অংশ অন্য শফী' লাভ করবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِى بِالْكُلِّ الخ : রায় হওয়ার পরবর্তী ক্ষেত্রে বিধান এরূপ হওয়ার কারণ হলো, যখন উপস্থিত শফী'র পক্ষে সম্পূর্ণ সম্পত্তির রায় হয়েছে তখন অর্ধেক সম্পত্তি থেকে অনুপস্থিত শফী'র হক পূর্ণরূপে রহিত হয়েছে। আর অবশিষ্ট অর্ধেক যদিও উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে রায় হয়েছে কিন্তু সে অর্ধেকের উপর হতে অনুপস্থিত ব্যক্তির অধিকার সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়নি। অর্থাৎ প্রথম অর্ধেকের ব্যাপারে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কাজেই সে এই অর্ধেকের উপর কোনোক্রমে অধিকার লাভ করবে না। কারণ যে বস্তু কারো বিপক্ষে রায় হয় তা তার পক্ষে রায় হতে পারে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ : পক্ষান্তরে যদি বিচারকের রায় হওয়ার পূর্বে উপস্থিত ব্যক্তি তার অধিকার পরিত্যাগ করে তাহলে অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ সম্পত্তি লাভ করবে। কারণ বিচারকের রায়ের মাধ্যমে কোনো অর্ধেকের উপর হতেই তার অধিকার রহিত হয়নি। কাজেই 'সবব' তথা 'ইল্লত' পূর্ণ থাকার কারণে সে সম্পূর্ণ সম্পত্তি লাভ করবে।

স্মরণযোগ্য যে, আল্লামা আইনী (র.) উল্লেখ করেছেন, কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, যখন উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে বিচারকের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ সম্পত্তির রায় হয়েছে তখন উপস্থিত শফী' মূল ক্রেতার নিকট হতে সম্পত্তিটির মালিকানা লাভ করেছেন। তারপর যখন সে আবার রায়ের পরে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছে তখন এটি 'ইকালাহ' তথা চুক্তি প্রত্যাহার হলো। আর সম্পত্তির মালিকানা লাভ করার পরে চুক্তি প্রত্যাহার করে নিলে তা [শফী'র ক্ষেত্রে] নতুন বিক্রয় বলে গণ্য হয়। ফলে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আলোচ্য সুরতে অনুপস্থিত আগত শফী' উভয় অর্ধেকই লাভ করার কথা। এক অর্ধেকের কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে আর অপর অর্ধেক উপস্থিত শফী'র 'ইকালাহ' তথা দ্বিতীয়বার বিক্রয়ের কারণে লাভ করার কথা। কিন্তু আলোচ্য সুরতে উপস্থিত শফী'র অর্ধেক সে কেন পাচ্ছে না?

এতদসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব হলো, সম্পত্তির মূল বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে যে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা পূর্ণরূপে রহিত হয়নি; বরং রহিত হয়েছিল কেবল ক্রেতার দিকে চুক্তির সম্পৃক্ততা। অতঃপর যখন উপস্থিত শফী' শুফ'আ লাভ করার পরে আবার ছেড়ে দিয়েছে তখন চুক্তির সম্পৃক্ততা পূর্বে ক্রেতার দিকে আবার ফিরে গিয়েছে। কাজেই বিক্রেতার প্রথম বিক্রয় চুক্তি বহাল রয়েছে।

قَالَ : وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ . وَمَعْنَاهُ بَعْدَهُ، لَا أَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ، لِأَنَّ سَبَبَهَا الْاِتِّصَالُ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ . وَالْوَجْهُ فِيْهِ أَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ إِذَا رَغِبَ الْبَائِعُ عَنْ مِلْكِ الدَّارِ، وَالْبَيْعُ يُعَرِّفُهَا، وَلِهٰذَا يُكْتَفٰى بِثُبُوْتِ الْبَيْعِ فِىْ حَقِّهِ حَتّٰى يَأْخُذَهَا الشَّفِيْعُ إِذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِىْ يُكَذِّبُهُ . قَالَ : وَتَسْتَقِرُّ بِالْاِشْهَادِ . وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ، لِأَنَّهُ حَقٌّ ضَعِيْفٌ يَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِشْهَادِ وَالطَّلَبِ . لِيُعْلَمَ بِذٰلِكَ رَغْبَتُهُ فِيْهِ دُوْنَ إِعْرَاضِهِ عَنْهُ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلٰى إِثْبَاتِ طَلَبِهِ عِنْدَ الْقَاضِىْ وَلَا يُمْكِنُهُ إِلَّا بِالْاِشْهَادِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শুফ'আ সাব্যস্ত হয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার মাধ্যমে। এর অর্থ হলো, 'বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর'। এর অর্থ এই নয় যে, বিক্রয় চুক্তিই হচ্ছে শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ তথা 'সবব'। কেননা শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব' হলো পরস্পরের সম্পত্তি সংলগ্ন হওয়া, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, বিক্রেতা তার বাড়ির মালিকানার প্রতি অনীহা প্রকাশ করলে শফী'র শুফ'আ সাব্যস্ত হয়। আর বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন হচ্ছে এই অনীহা প্রকাশের পরিচায়ক। এ কারণেই কেবল বিক্রেতার দিকে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন প্রমাণিত হওয়াই শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়। এর ফলেই, যদি বিক্রেতা বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা স্বীকার করে তাহলে ক্রেতা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেও শফী' তা নিয়ে নিতে পারে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শুফ'আর অধিকার দৃঢ় হয় সাক্ষী রাখার দ্বারা। তবে তাৎক্ষণিক দাবিও অপরিহার্য। কেননা শুফ'আর অধিকার হচ্ছে একটি দুর্বল অধিকার, যা অনীহা প্রকাশ বা অনিষ্ট পেলে বাতিল হয়ে যায়। কাজেই এক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা ও দাবি করা অপরিহার্য হবে। এর দ্বারা বুঝা যাবে যে, তার এই অধিকারের প্রতি আগ্রহ রয়েছে, এবং অনীহা নেই। তাছাড়া বিচারকের নিকট শফী'র 'দাবি করার বিষয়টি' প্রমাণ করার প্রয়োজন পড়বে, সাক্ষী রাখা না হলে তা প্রমাণ করা সম্ভব হবে না। [অতএব দাবির সাথে সাথে সাক্ষী রাখাও জরুরি।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন– وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ অর্থাৎ, "শুফ'আ সাব্যস্ত হয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার মাধ্যমে"। এই ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.) শুফ'আর অধিকার কখন সাব্যস্ত হয় তা বর্ণনা করেছেন। আর পরবর্তী 'মতন'-এর ইবারতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার পর তা কখন সুদৃঢ় হয় আর কখন শফী' তা গ্রহণ করতে পারে তা বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.)-এর উক্ত ইবারত থেকে বাহ্যিকভাবে এরূপ অর্থ বুঝার সম্ভাবনা ছিল যে, এখানে بِعَقْدِ الْبَيْعِ -এর মাঝে ب হচ্ছে 'সবব' বা কারণ এর অর্থে। তাহলে অর্থ দাঁড়াবে 'বিক্রয় চুক্তির কারণে শুফ'আ সাব্যস্ত হয়'। অর্থাৎ শুফ'আ লাভ করার 'সবব' তথা কারণ হচ্ছে বিক্রয় চুক্তি।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এই অর্থ এখানে সঠিক নয়। কেননা ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, 'শুফ'আর অধিকার লাভের 'সবব' তথা কারণ হচ্ছে জমির সংলগ্নতা। অর্থাৎ বিক্রীত সম্পত্তির সাথে শফী'র সম্পত্তি সংলগ্ন হওয়া। কাজেই ইমাম কুদূরী (র.) -এর উক্ত ইবারতে بِعَقْدِ الْبَيْعِ -এর অর্থ গ্রহণ করতে হবে بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ "বিক্রয় চুক্তির পর" অর্থাৎ শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর। [উল্লেখ্য, যদিও ب হরফটি 'পরে' অর্থে ব্যবহার হয় না, কিন্তু ب-কে مُصَاحَبَةٌ "সাথে" -এর অর্থে ধরে উক্ত অর্থটি গ্রহণ করা সম্ভব। কেননা তখন অর্থ হবে 'শুফ'আ সাব্যস্ত হয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময়।]

মূলকথা হচ্ছে, শুফ'আর সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব' তথা কারণ যেহেতু 'সম্পত্তির সংলগ্নতা' তাই ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতের অর্থ 'বিক্রয় চুক্তির কারণে' না হয়ে এর অর্থ হবে 'বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময় বা সম্পাদিত হওয়ার পর। এর অর্থ হচ্ছে, বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়া শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত।

قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব' বা কারণ তথা জমির সংলগ্নতা তো বিক্রয়ের পূর্ব থেকে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু 'সবব' পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়ের পর শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, শুফ'আ মূলতঃ সাব্যস্ত হয় যখন মূল সম্পত্তির মালিক তার সম্পত্তি মালিকানায় রাখতে অনিচ্ছুক হয়। আর অনিচ্ছুক হওয়ার বিষয়টি যেহেতু অন্তরের সাথে জড়িত তাই বাহ্যিকভাবে তা বুঝা যায় না। কিন্তু যখন সে সম্পত্তি বিক্রয় করে তখন তা প্রমাণ বহন করে যে, সে তার সম্পত্তি নিজ মালিকানায় আর রাখতে চাচ্ছে না। কাজেই বিক্রয় হচ্ছে তার 'অনিচ্ছার পরিচায়ক'।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا يَكْتَفِى بِثُبُوتِ الْبَيْعِ فِى حَقِّهِ الخ : এ কারণেই অর্থাৎ "মূলত শুফ'আ সাব্যস্ত হয় সম্পত্তির প্রতি মালিকের অনীহা, অনিচ্ছা দেখা দিলে। আর বিক্রয় হচ্ছে কেবল সেই অনীহার বা অনিচ্ছার প্রকাশক বা পরিচায়ক।" এ কারণেই বিধান হলো, যদি জমির মালিকের দিক থেকে বিক্রয় হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় তাহলেই শুফ'আ সাব্যস্ত হবে, চাই জমিটির ক্রেতার দিকে তা প্রমাণিত না হোক। যেমন জমির মালিক যদি নিজের ব্যাপারে স্বীকার করে যে, সে জমিটি বিক্রয় করেছে তাহলেই শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। তখন ক্রেতা যদি বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে তবুও শুফ'আ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ এরূপ সূরতে বিক্রয়ের বিষয়টি কেবল জমির মালিকের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়েছে তার স্বীকারোক্তির কারণে। কিন্তু ক্রেতার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়নি। কেননা স্বীকারোক্তি কেবল স্বীকারকারীর ক্ষেত্রে ধর্তব্য হয় তা অপরের ক্ষেত্রে কোনো কার্যকারিতা রাখে না। তবুও এরূপ সূরতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা এক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তিটি পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হলেও জমির মালিকের জমিটি রাখায় অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এই অনীহা প্রকাশই মূল বিষয়।

قَوْلُهُ وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর আলোচ্য ইবারতে বলেন, উক্ত অধিকার দৃঢ়তা লাভ করে বিক্রয় সম্পর্কে শফী' যখন সংবাদ জানতে পারবে তখন তাৎক্ষণিকভাবে শুফ'আর দাবি করা এবং সে ব্যাপারে সাক্ষী রাখার মাধ্যমে। এই তাৎক্ষণিক দাবি করাকে طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে– طَلَبُ الشُّفْعَةِ عَلَى السُّرْعَةِ "তাৎক্ষণিকভাবে শুফ'আর দাবি করা।" [উল্লেখ্য, শুফ'আর দাবি মোট তিন প্রকার হয়ে যাবে। তন্মধ্যে এ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ তথা তাৎক্ষণিক দাবি হচ্ছে প্রথম প্রকার। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা মুসান্নিফ (র.) উক্ত গ্রন্থের পরবর্তী পরিচ্ছেদে করেছেন।]

طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ-এর পদ্ধতি : طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ তথা 'তাৎক্ষণিক দাবি'-র প্রদ্ধতি হলো, যখন শফী'র নিকট সম্পত্তি বিক্রয়ের সংবাদ পৌছবে তখন সে সাথে সাথে বলবে, আমি অমুক সম্পত্তির শুফ'আর দাবি করি এবং এ মর্মে সাক্ষী রাখবে। তবে এই সাক্ষী রাখা তার শুফ'আর দাবি সহীহ [সঠিক] হওয়ার জন্য অপরিহার্য নয়। সাক্ষী রাখার প্রয়োজন শুধু এই জন্য যে, যদি বিপক্ষ তার 'তাৎক্ষণিক দাবি' করার বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে সে যাতে বিচারকের নিকট তা প্রমাণ করতে পারে। [বিস্তারিত দ্র.- ফতোয়ায়ে শামী খণ্ড : ৯ পৃ.-৩২৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া।]

قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ حَقٌّ ضَعِيفٌ يَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ الخ : আলোচ্য ইবারত থেকে উক্ত মাসআলার দলিল বর্ণনা করছেন। দলিল হলো, শুফ'আর অধিকার হচ্ছে একটি দুর্বল অধিকার, যা শফী'র পক্ষ থেকে অনীহা প্রকাশ পেলে বাতিল হয়ে যায়। কাজেই শফী'র পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে দাবি করা এবং সাক্ষী রাখা প্রয়োজন, যাতে তার সম্পত্তিটি গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায় অনীহা না বুঝায়।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِ طَلَبِهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে দ্বিতীয় আরেকটি দলিল বর্ণনা করেছেন। এ দলিলটি হচ্ছে সাক্ষী রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর। এর সারকথা হচ্ছে, তাৎক্ষণিক দাবি শুফ'আ লাভ করার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু শফী' তাৎক্ষণিকভাবে এ দাবি করেছে কিনা তা বিচারকের নিকট তার প্রমাণ করার প্রয়োজন পড়বে। কাজেই সে যদি তাৎক্ষণিকভাবে দাবি করার সময় সাক্ষী না রাখে তাহলে সে বিচারকের নিকট তার 'তাৎক্ষণিক দাবি' করার বিষয়টি প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না। অতএব, 'তাৎক্ষণিক দাবির' সময় তার সাক্ষী রাখা প্রয়োজন হয়।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.)-এর এ দলিলটি থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, শফী'র 'তাৎক্ষণিক দাবি' করার বিষয়টি যদি বিপক্ষ অস্বীকার করে তাহলে শফী' শপথ করে তা বললে তার শপথ গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু বিধান তা নয়; বরং শফী' কসম করে যদি বলে তাহলে তার শপথ গৃহীত হবে। সাক্ষী পেশ করা অপরিহার্য নয়। সুতরাং সারকথা হচ্ছে, طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ তথা 'তাৎক্ষণিক দাবির' জন্য সাক্ষী রাখা আবশ্যক নয়। শুধু শপথ না করে প্রমাণের জন্য সাক্ষী রাখা প্রয়োজন।

قَالَ : وَتَمَلَّكَ بِالْأَخْذِ إِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِيْ أَوْ حَكَمَ بِهَا الْحَاكِمُ، لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِيْ قَدْ تَمَّ، فَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى الشَّفِيْعِ إِلَّا بِالتَّرَاضِيْ أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِيْ، كَمَا فِي الرُّجُوْعِ فِي الْهِبَةِ . وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هٰذَا فِيْمَا إِذَا مَاتَ الشَّفِيْعُ بَعْدَ الطَّلَبَيْنِ أَوْ بَاعَ دَارَهُ الْمُسْتَحِقَّ بِهَا الشُّفْعَةَ أَوْ بِيْعَتْ دَارٌ بِجَنْبِ الدَّارِ الْمَشْفُوْعَةِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ تَسْلِيْمِ الْمُخَاصِمِ، لَا تُوْرَثُ عَنْهُ فِي الصُّوْرَةِ الْأُوْلٰى، وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ فِي الثَّانِيَةِ . وَلَا يَسْتَحِقُّهَا فِي الثَّالِثَةِ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ لَهُ . ثُمَّ قَوْلُهُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ بَيَانٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا عِنْدَ مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى . وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন ক্রেতার হস্তান্তরের পর কিংবা বিচারকের রায়ের পর শফী' তা গ্রহণ করবে তখন শুফ'আর সম্পত্তি শফী'র মালিকানায় আসবে। কেননা ক্রেতার মালিকানা ইতঃমধ্যে পূর্ণ হয়ে গেছে কাজেই তা পারস্পরিক সম্মতি কিংবা বিচারকের রায় ব্যতীত শফী'র মালিকানায় যাবে না। যেমন দান করা বস্তু ফেরত নিতে চাইলে [পারস্পরিক সম্মতি কিংবা বিচারকের রায় ব্যতীত দানকারী তা গ্রহণ করতে পারে না।] এ বিধানের কার্যকারিতা নিম্নোক্ত মাসআলাগুলোতে প্রকাশ পাবে। শফী' উভয় প্রকার দাবি করার পর বিচারক কর্তৃক রায় হওয়ার বা প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে শুফ'আর সম্পত্তি হস্তান্তর করার পূর্বে যদি শফী' মৃত্যুবরণ করে অথবা যে বাড়ির মালিকানার ভিত্তিতে সে শুফ'আর অধিকার লাভ করেছে সে বাড়িটি বিক্রয় করে ফেলে কিংবা শুফ'আর দাবিকৃত বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ি বিক্রয় করা হয় তাহলে প্রথম সুরতে শুফ'আর মধ্যে উত্তরাধিকার আইন প্রযোজ্য হবে না। দ্বিতীয় সুরতে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর তৃতীয় সুরতে সে [পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে] শুফ'আর হকদার হবে না, শুফ'আর দাবিকৃত সম্পত্তিতে তার মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে। আর "বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর শুফ'আ সাব্যস্ত হবে" কুদূরী (র.)-এর এ বাক্যটিতে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের চুক্তি সম্পাদিত হলেই কেবল শুফ'আ সাব্যস্ত হবে [অন্যথা নয়]। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সঠিক বিষয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ-ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَمَلَّكَ بِالْأَخْذِ إِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِيْ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উপরে যে দুই প্রকার দাবি উত্থাপন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ "তাৎক্ষণিক দাবি" ও طَلَبُ الْإِشْهَادِ "সাক্ষী রাখার মাধ্যমে দাবি" এ দুই প্রকার দাবি উত্থাপনের পর শুফ'আর অধিকার দৃঢ় হয়। কিন্তু শফী' সম্পত্তির মালিক হয় না। সে মালিক হবে যখন সম্পত্তির ক্রেতা সম্পত্তিটি তার হাতে হস্তান্তর করবে কিংবা বিচারক শফী'র পক্ষে রায় প্রদান করবেন। এ দুই সুরতের কোনো একটি বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে শফী' সম্পত্তির মালিক হবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ الْمُشْتَرِىْ قَدْ تَمَّ الخ : অত্র ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত বিধানের দলিল বর্ণনা করছেন। দলিল হলো, উক্ত সম্পত্তির উপর ক্রেতার মালিকানা পূর্ণরূপে অর্জিত হয়েছে। কেননা ক্রয় পূর্ণরূপে সম্পন্ন হলে ক্রীত সম্পত্তিতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। কাজেই ক্রেতার স্বীয় সম্মতিতে হস্তান্তর করা ব্যতীত কিংবা বিচারকের রায় ব্যতীত সে মালিকানা অন্য কারো কাছে যাবে না। কেননা কারো মালিকানাধীন জিনিসে তার সম্মতি ব্যতীত অন্য ব্যক্তি মালিকানা লাভ করতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্রেতার সম্মতি ছাড়াও শরিয়ত শফী'কে শুফ'আ লাভের অধিকার প্রদান করেছে। তাই ক্রেতা যদি স্বেচ্ছায় হস্তান্তর না করে তখন ক্রেতার ইচ্ছার বিপরীতে তার সম্পত্তির মালিকানা লাভ করার জন্য বিচারকের ফয়সালা অপরিহার্য।

[উল্লেখ্য, উক্ত বিধানের ভিত্তিতে মাসআলা হলো, শুফ'আর সম্পত্তি যদি আঙ্গুরের বাগান হয় এবং শফী' সম্পত্তির মালিকানা লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা আঙ্গুর ফল ভোগ করে থাকে তাহলে তার উপর কোনো রকম জরিমানা আসবে না এবং এ কারণে সম্পত্তির মূল্যের কোনো অংশ কর্তনও করা হবে না।]

قَوْلُهُ كَمَا فِى الرُّجُوْعِ فِى الْهِبَةِ الخ : উক্ত বিধানের একটি নজির হচ্ছে, কেউ যদি কোনো জিনিস কাউকে দান [হিবা] করার পর তা ফেরত নিতে চায় তাহলেও বিধান হলো, দানকারী উক্ত জিনিস ফেরত নিতে পারবে যদি দানগ্রহীতা স্বেচ্ছায় তা ফেরত দেয় কিংবা বিচারক ফয়সালা করে। এক্ষেত্রেও কারণ হলো, গ্রহীতা উক্ত জিনিসটি দান হিসেবে গ্রহণ করার পর তার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কাজেই তার সম্মতি ব্যতীত অন্যের মালিকানায় তা যাবে না। যতক্ষণ না দানকারীর ফেরত গ্রহণের অধিকার থাকার ভিত্তিতে বিচারক দানকারীর অনুকূলে রায় প্রদান করেন।

قَوْلُهُ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هٰذَا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উপরে 'মতনে' বর্ণিত বিধান তথা ক্রেতা স্বেচ্ছায় সম্পত্তি হস্তান্তর কিংবা বিচারকের রায় প্রদানের পূর্বে শফী' যে সম্পত্তির মালিকানা লাভ করবে না' এই বিধানের প্রভাব কোন কোন্ সুরতে প্রকাশ পাবে তা বর্ণনা করছেন। এক্ষেত্রে তিনি তিনটি সূরত উল্লেখ করেছেন–

১. যদি শফী' উপরে বর্ণিত দুই প্রকারের দাবি উত্থাপন তথা طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ [তাৎক্ষণিক দাবি] ও طَلَبُ الْإِشْهَادِ [সাক্ষী রাখার মাধ্যমে দাবি] উত্থাপন করার পর মারা যায় এবং এ মৃত্যু বিচারকের রায় প্রদান কিংবা বিপক্ষ স্বেচ্ছায় সম্পত্তি হস্তান্তর করার পূর্বে হয়, তাহলে শফী'র ওয়ারিশগণ উত্তরাধিকারসূত্রে উক্ত সম্পত্তির মালিক হবে না। কেননা মৃত্যুর সময় শফী' উক্ত সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেনি। কাজেই ওয়ারিশগণ তা উত্তরাধিকারসূত্রে পাবে না।

২. যদি শফী' ক্রেতার স্বেচ্ছায় হস্তান্তর কিংবা বিচারকের রায়ের পূর্বে নিজের যে সম্পত্তির ভিত্তিতে শুফ'আ দাবি করেছিল সে সম্পত্তি বিক্রয় করে ফেলে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা শুফ'আ লাভের 'সবব' বা কারণই ছিল শফী'র সম্পত্তি বিক্রীত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকা। আর এই 'সবব' শুফ'আর বিধান তথা মালিকানা লাভের পূর্বেই দূর হয়ে গেছে। কাজেই বিধান সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে 'সবব' চলে যাওয়ার কারণে বিধান তথা মালিকানাও সাব্যস্ত হবে না।

৩. যদি ক্রেতার স্বেচ্ছায় হস্তান্তর কিংবা বিচারকের শুফ'আর রায়ের পূর্বে শুফ'আর সম্পত্তির পার্শ্ববর্তী কোনো বাড়ি বিক্রয় হয় অর্থাৎ শফী' শুফ'আর ভিত্তিতে যে সম্পত্তিটি লাভ করবে তার সাথে সংলগ্ন কোনো বাড়ি বিক্রয় করা হয় তাহলে এই সংলগ্ন বাড়িটিতে শফী' শুফ'আর দাবি করতে পারবে না। কেননা এই বাড়িটি হচ্ছে শফী' প্রথমে যে সম্পত্তি শুফ'আর ভিত্তিতে লাভ করার কথা তার সাথে সংলগ্ন। কিন্তু শফী' যেহেতু শুফ'আর ভিত্তিতে এখনও সে সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেনি কাজেই তার পার্শ্ববর্তী বিক্রীত সম্পত্তিতে শুফ'আর দাবি করার অধিকার পাবে না। কারণ শুফ'আর দাবি সে তখনই করতে পারত যদি পার্শ্ববর্তী বিক্রীত এই বাড়িটির বিক্রয়ের পূর্বেই তার প্রথমোক্ত শুফ'আর সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে থাকত। কিন্তু ক্রেতার স্বেচ্ছায় হস্তান্তর কিংবা বিচারকের রায় না হওয়ার কারণে সে শুফ'আর সম্পত্তির মালিক তখনো হয়নি।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) প্রথমে কেবল উক্ত সুরত তিনটি উল্লেখ করেছেন। তারপর لَا تُوْرَثُ فِي الصُّوْرَةِ الْأُوْلٰى বলে প্রথম সুরতের বিধান, وَلَا يَسْتَحِقُّهَا فِي الثَّالِثَةِ বলে দ্বিতীয় সুরতের বিধান এবং وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ فِي الثَّانِيَةِ বলে তৃতীয় সুরতের বিধান বর্ণনা করেছেন। আর সর্বশেষে لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ لَهُ "শফী'র মালিকানা অর্জিত না হওয়ার কারণে" বলে তিনটি সুরতের দলিল বা কারণ বর্ণনা করেছেন। আমরা সহজে বোধগম্য করার জন্য সব কয়টি সুরতের বিধান ও কারণ একসাথে বর্ণনা করেছি।

قَوْلُهُ ثُمَّ قَوْلُهُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, পূর্বের ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.) যে বলেছেন, وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ "শুফ'আ সাব্যস্ত হয় বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর" তাঁর এ ইবারতে "বিক্রয় চুক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ "সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের চুক্তি।" অর্থাৎ শুফ'আর অধিকার লাভ হবে কেবল জমিটি যদি কেউ 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের চুক্তির ভিত্তিতে মালিকানা লাভ করে সেক্ষেত্রে। কাজেই কেউ যদি কোনো সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে কোনো বিনিময় ছাড়া তাহলে তাতে কেউ শুফ'আ দাবি করতে পারবে না। যেমন– দান [হেবা], সদকা, অসিয়ত কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে কেউ যদি সম্পত্তির মালিক হয় তাহলে তাতে কেউ শুফ'আ দাবি করতে পারবে না। কেননা এর সবগুলো সুরতেই বিনিময় ব্যতিরেকে মালিকানা অর্জিত হয়। অনুরূপভাবে এমন কিছুর বিনিময়ে যদি সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে যা 'মাল' বা সম্পদ নয় তাহলে তাতেও শুফ'আর দাবি করতে পারবে না। যেমন বিবাহের মোহরানা হিসেবে যদি সম্পত্তি প্রদান করে তাহলে তাতে কেউ শুফ'আ দাবি করতে পারবে না। কেননা যদি ও স্ত্রী এই মোহরানার সম্পত্তি লাতে তার সতীত্বের বিনিময়ে লাভ করেছে কিন্তু সতীত্ব যেহেতু 'মাল' বা সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় না কাজেই তাতে শুফ'আর দাবি কেউ করতে পারবে না। কারণ শর্ত হচ্ছে مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ "সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ' এর ভিত্তিতে মালিকানা লাত করতে হবে। আর এখানে সে শর্ত বিদ্যমান নেই।

بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُوْمَةِ فِيْهَا

قَالَ : وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيْعُ بِالْبَيْعِ أَشْهَدَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ . إِعْلَمْ أَنَّ الطَّلَبَ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ . طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ، وَهُوَ أَنْ يَطْلُبَهَا كَمَا عَلِمَ، حَتّٰى لَوْ بَلَغَ الشَّفِيْعَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَطْلُبْ شُفْعَتَهُ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ . لِمَا ذَكَرْنَا . وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَلشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ، وَلَوْ أُخْبِرَ بِكِتَابٍ وَالشُّفْعَةُ فِيْ أَوَّلِهِ أَوْ فِيْ وَسَطِهِ فَقَرَأَ الْكِتَابَ إِلٰى اٰخِرِهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ . وَعَلٰى هٰذَا عَامَّةُ الْمَشَايِخِ (رح) ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ . وَعَنْهُ أَنَّ لَهُ مَجْلِسَ الْعِلْمِ، وَالرِّوَايَتَانِ فِي النَّوَادِرِ . وَبِالثَّانِيَةِ أَخَذَ الْكَرْخِيُّ . لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ لَهُ خِيَارُ التَّمَلُّكِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ زَمَانِ التَّأَمُّلِ كَمَا فِي الْمُخَيَّرَةِ .

পরিচ্ছেদ : শুফ'আ দাবি ও শুফ'আর ব্যাপারে মামলা দায়ের করা

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শফী' যখন সম্পত্তি বিক্রয় করা সম্পর্কে অবগত হবে তখন সে ঐ বৈঠকেই তার শুফ'আ দাবি করার বিষয়ে সাক্ষী রাখবে। জেনে রাখ, দাবি তিন প্রকার : ১. তলবে মুওয়াছাবাহ বা তাৎক্ষণিক দাবি। এটি হচ্ছে [বিক্রয় সম্পর্কে] অবগত হওয়া মাত্রই শুফ'আর দাবি উত্থাপন করা। সুতরাং যদি শফী'র নিকট বিক্রয়ের সংবাদ পৌঁছে কিন্তু সে তার শুফ'আর দাবি না করে তাহলে তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে। এর কারণ তা-ই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এছাড়া নবী করীম ﷺ -এর এ বাণীর কারণে – اَلشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا অর্থাৎ "শুফ'আ কেবল তারই প্রাপ্য হবে যে তাৎক্ষণিকভাবে দাবি করবে।" যদি চিঠি মারফত শফী'র নিকট সংবাদ পৌঁছে এবং সংবাদটি চিঠির শুরুতে কিংবা মাঝখানে থাকে আর শফী' চিঠিটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করে তাহলে তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে। এটিই অধিকাংশ মাশায়েখের মত। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত। তাঁর থেকে বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত হচ্ছে, অবগতির মজলিস শেষ হওয়া পর্যন্ত তার অধিকার থাকবে। দু'টি রেওয়ায়েতই 'নাওয়াদের' গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম কারখী (র.) দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটিই গ্রহণ করেছেন। কেননা যখন শফী'র জন্য বিক্রীত সম্পত্তিটির মালিক হওয়ার ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হয়েছে তখন তার চিন্তাভাবনা করে দেখার সময় সুযোগ থাকা আবশ্যক। যেমনটা তালাক গ্রহণের ইচ্ছাধিকার প্রাপ্তা স্ত্রীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যেহেতু শুফ'আর দাবি উত্থাপন করা শুফ'আ লাভের জন্য অপরিহার্য এবং ক্রেতা স্বেচ্ছায় হস্তান্তর না করলে বিচারকের রায় আবশ্যক, তাই এ পরিচ্ছেদে মুসান্নিফ (র.) শুফ'আর দাবি উত্থাপন কিভাবে করতে হবে এবং কিভাবে মামলা পরিচালিত হবে? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছেন।

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ أَشْهَدَ الخ: ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শফী'র নিকট যখন তার সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি বিক্রয় হওয়ার সংবাদ পৌছবে তখন সেখানেই এ মর্মে সাক্ষী রাখবে যে, সে বিক্রীত সম্পত্তিটির শুফ'আর দাবিদার। এটি হচ্ছে طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ তথা 'তাৎক্ষণিক দাবি।' বিস্তারিত আলোচনা মুসান্নিফ (র.) পরবর্তী ইবারতে করবেন।

قَوْلُهُ إِعْلَمْ أَنَّ الطَّلَبَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, শুফ'আর ক্ষেত্রে 'দাবি' তিন প্রকার। অর্থাৎ শুফ'আ লাভ করার জন্য শফী'র তিন প্রকারে দাবি উত্থাপন করা আবশ্যক হয়। এই তিন প্রকার দাবি হচ্ছে যথাক্রমে- ১. طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ তথা 'তাৎক্ষণিক দাবি' ২. طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ তথা 'দৃঢ়করণের জন্য সাক্ষী রাখার মাধ্যমে দাবি', ৩. طَلَبُ الْخُصُوْمَةِ وَالتَّمَلُّكِ তথা 'মামলা দায়ের করে মালিকানা লাভের দাবি।' মুসান্নিফ (র.) তিন প্রকারের দাবির আলোচনা পর্যায়ক্রমে করেছেন। প্রথমে طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ وَهُوَ أَنْ يَطْلُبَهَا থেকে প্রথম প্রকারের আলোচনা শুরু করেছেন। তারপর পরবর্তী 'মতনের' পূর্বে وَالثَّانِيْ طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ বলে দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা শেষ করে وَالثَّالِثُ طَلَبُ الْخُصُوْمَةِ وَالتَّمَلُّكِ থেকে তৃতীয় প্রকারের আলোচনা করেছেন।

قَوْلُهُ قَالَ : طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ وَهُوَ أَنْ يَطْلُبَهَا كَمَا عَلِمَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) প্রথম প্রকারের 'দাবি উত্থাপনের' আলোচনা করছেন। প্রথম প্রকার 'দাবি উত্থাপন' -এর সূরত হচ্ছে, যখন শফী'র নিকট তার জমির সাথে সম্পৃক্ত জমি বিক্রয় হওয়ার সংবাদ পৌছবে তখনই সাথে সাথে সে বিক্রীত জমিটির শুফ'আর দাবি করবে। যদি তার কাছে সংবাদ পৌছার পরপরই শুফ'আর দাবি না করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। যে বৈঠকে থাকাকালে শফী'র নিকট সংবাদ পৌছবে সে বৈঠকে যদি সাক্ষী উপস্থিত থাকে তাহলে তাদেরকে সাক্ষী বানিয়ে সে তার দাবির কথা জানাবে। আর যদি সাক্ষী উপস্থিত না থাকে তাহলেও সে একাকী দাবির কথা মুখে বলবে। এর ফলে যদি বিপক্ষ তার 'তাৎক্ষণিক দাবি' করার বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে সে বিচারকের নিকট শপথ করে বলতে পারবে যে, সে 'তাৎক্ষণিকভাবে দাবি করেছে'।

পরবর্তী ইবারতে মুসান্নিফ (র.) 'তাৎক্ষণিক দাবি উত্থাপন' আবশ্যক হওয়ার দলিল বর্ণনা করছেন। এক্ষেত্রে তিনি একটি আকলী দলিল ও একটি নকলী দলিল উল্লেখ করেছেন।

لِمَا ذَكَرْنَا – এটি হচ্ছে আকলীল দলিল। মুসান্নিফ (র.) বলেন– طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ "তাৎক্ষণিক দাবি" উত্থাপন আবশ্যক হওয়ার দলিল তাই, যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ কথা বলে মুসান্নিফ (র.) এর পূর্বের পরিচ্ছেদের শেষের দিকের 'মতন'-এর ইবারত وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ -এর অধীনে لِأَنَّهُ حَقٌّ ضَعِيْفٌ يَبْطُلُ بِالْأَعْرَاضِ বলে যে দলিলটি বর্ণনা করেছেন তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেখানে বর্ণিত দলিলটির সারকথা হচ্ছে, শুফ'আর অধিকার হচ্ছে একটি দুর্বল অধিকার, শফী'র পক্ষ থেকে অনীহা প্রকাশ পেলে তা বাতিল হয়ে যায়। কাজেই সংবাদ পৌছার সাথেই দাবি উত্থাপন করা আবশ্যক। যাতে তার বিক্রীত সম্পত্তিতে শুফ'আ লাভের প্রতি আগ্রহ আছে বলে প্রকাশ পায়।

قَوْلُهُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا الخ : এখান থেকে নকলী দলিল বর্ণনা করছেন। নকলী দলিল হলো, নবী করীম ﷺ -এর বাণী– الشفعة لمن واثبها "শুফ'আর অধিকার তারই হবে যে সাথে সাথে দাবি করবে।" এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, শুফ'আর অধিকার লাভ করার জন্য সাথে সাথে দাবি করা আবশ্যক।

উল্লেখ্য, হিদায়ার ভাষ্যকার আল্লামা আইনী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, মুসান্নিফ (র.) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এটি নবী করীম ﷺ -এর হাদীস নয়; বরং এটি কাজী শুরাইহি (شُرَيْحٌ)-এর উক্তি। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-এ এটি কাজী শুরাইহি (র.)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ মর্মে নবী করীম ﷺ -এর হাদীস দুর্বল সনদে সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ "হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, শুফ'আ হচ্ছে পশুর রশি খোলার ন্যায়।" অর্থাৎ সামান্য অবহেলার কারণে পশুর রশি যেমন খুলে যায় তেমনি শুফ'আর অধিকারও হচ্ছে দুর্বল অধিকার। শফী' অবহেলা করলে তার অধিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, কাজী শুরাইহি (র.) বিখ্যাত তাবেয়ী। তিনি সাহাবীদের যুগে সাহাবীদের উপস্থিতিতেই বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল হলেও কাজী শুরাইহি (র.)-এর উক্ত বাণী থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসটির ভিত্তি রয়েছে। -[বিস্তারিত দ্র.- ই'লাউস সুনান- খ. ১৭, পৃ. ১৮, নাসবুর রায়াহ- খ. ৪, পৃ. ১৭৬]

قَوْلُهُ وَلَوْ أُخْبِرَ بِكِتَابٍ وَالشُّفْعَةُ فِى أَوَّلِهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি শফী'র নিকট তার জমির সাথে সংলগ্ন জমি বিক্রয়ের সংবাদ চিঠি বা পত্রের মাধ্যমে পৌছে আর জমি বিক্রয়ের কথাটি পত্রের শুরুতে কিংবা মাঝামাঝিতে উল্লেখ থাকে তাহলে বিধান হলো, যদি শফী' পত্রের শুরুতে কিংবা মাঝখানে উক্ত কথাটি পাঠ করার পর শুফ'আর দাবি না করে চিঠিটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে থাকে তবে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে দাবি উত্থাপন করা আবশ্যক। আর এখানে সে সাথে সাথে দাবি উত্থাপন না করে চিঠি পাঠ করার কাজে মশগুল রয়েছে। কাজেই তার শুফ'আর অধিকার আর বাকি থাকবে না; বরং বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا عَامَّةُ الْمَشَايِخِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'তাৎক্ষণিক দাবি' (طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ) সম্পর্কে উপরে যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো শফী'র নিকট সংবাদ পৌছার সাথে সাথেই তার দাবি করা অপরিহার্য, কিছু সময় বিলম্ব করলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে, এটিই হচ্ছে অধিকাংশ মাশায়েখের অভিমত। এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়, উভয় বর্ণনাই হচ্ছে 'নাওয়াদির' -এর রেওয়ায়েত। একটি রেওয়ায়েত হচ্ছে উপরে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ, অর্থাৎ সাথে সাথেই দাবি করা আবশ্যক। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত হচ্ছে, যে বৈঠকে শফী'র নিকট সংবাদ পৌছবে, সে বৈঠকে যতক্ষণ সে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে দাবি করার সুযোগ পাবে। তবে প্রথম রেওয়ায়েতটি অধিকাংশ মাশায়েখ গ্রহণ করেছেন। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি গ্রহণ করেছেন ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.)। [উল্লেখ্য, ফতুয়ায়ে শামীতে প্রথম রেওয়ায়েতটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত ফতোয়ায়ে শামী খ. ৯, পৃ. ৩২৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া দ্র.]

উল্লেখ্য, উক্ত মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একাধিক মত রয়েছে। একটি মত অনুসারে সাথে সাথেই দাবি করা আবশ্যক। এটি ইমাম আহমাদ (র.)-এরও দু'টি মতের একটি। 'আল মুগনী' গ্রন্থে আল্লামা ইবনে কুদামা (র.) এটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ (র.) -এর অপর মতটি হচ্ছে শুফ'আ অধিকারের দাবি উত্থাপন করতে বিলম্ব করলেও তা বাতিল হবে না, যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে বিক্রয়ের ব্যাপারে তার সম্মতি প্রকাশ পায়। এটি ইমাম মালেক (র.)-এরও অভিমত। তবে ইমাম মালেক (র.)-এর মতে এক বৎসরকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে তা বাতিল হয়ে যাবে। আরেক বর্ণনায় চারমাসকাল অতিবাহিত হলে বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকেও অনুরূপ একাধিক অভিমত বর্ণিত আছে। আল্লামা আইনী (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর চারটি অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন। -[বিনায়া, এ'লাউস সুনান]

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ لَهُ خِيَارُ التَّمَلُّكِ الخ : এখান থেকে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় রেওয়ায়েত, যেটি ইমাম কারখী (র.) গ্রহণ করেছেন, তার দলিল বর্ণনা করছেন। এ অভিমতটির দলিল হলো, যখন শফী' বিক্রীত জমির মালিকানা লাভের অধিকার পেয়েছে তখন তার এতটুকু সময় পর্যন্ত সুযোগ থাকা আবশ্যক, যতটুকু সময়ে সে জমিটি নিবে কিনা তা ভেবে দেখতে পারে। কাজেই যে বৈঠকে সংবাদ পৌছবে সে বৈঠকে থাকা পর্যন্ত তার সুযোগ থাকবে।

قَوْلُهُ كَمَا فِى الْمُخَيَّرَةِ : যেমন, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে যে, তোমার [তালাক গ্রহণের] অধিকার তোমার হাতে অর্পণ করলাম, তাহলে বৈঠকে থাকা পর্যন্ত সে ভেবে দেখার সুযোগ লাভ করে। যদি কিছু না বলে বৈঠক থেকে উঠে যায় তাহলে প্রদত্ত অধিকার বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং শুফ'আর ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধানই হবে।

উল্লেখ্য, ইমাম কারখী (র.) তাঁর রচিত 'মুখতাসার' গ্রন্থে 'নাওয়াদির' ও 'মাবসূত' -এর বর্ণনাগুলো উল্লেখ করার পর লিখেছেন, আমার মতে এ সকল বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধপূর্ণ নয়; বরং সবগুলো বর্ণনার সারমর্ম এক। আর তা হচ্ছে, সংবাদ পৌছার পর শফী'র পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপিত হতে এতটুকু সময় বিলম্ব না হওয়া আবশ্যক যা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে শুফ'আর দাবি ছেড়ে দিয়েছে কিংবা শুফ'আর দাবি করতে অনিচ্ছুক। অতএব, রেওয়ায়েতসমূহের মর্মার্থ অনুযায়ী বৈঠকের সময়টুকু শফী' অবকাশ পাবে। -[বিনায়া]

وَلَوْ قَالَ بَعْدَ مَا بَلَغَهُ الْبَيْعُ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ أَوْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ أَوْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ـ لِأَنَّ الْأَوَّلَ حَمْدٌ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْ جِوَارِهِ، وَالثَّانِيْ تَعَجُّبٌ مِنْهُ لِقَصْدِ إِضْرَارِهِ، وَالثَّالِثُ لِافْتِتَاحِ كَلَامِهِ، فَلَا يَدُلُّ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى الْإِعْرَاضِ ـ وَكَذَا إِذَا قَالَ، مَنِ ابْتَاعَهَا وَبِكَمْ بِيْعَتْ، لِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِيْهَا بِثَمَنٍ دُوْنَ ثَمَنٍ، وَيَرْغَبُ عَنْ مُجَاوَرَةِ بَعْضٍ دُوْنَ بَعْضٍ ـ

অনুবাদ : যদি শফী'র নিকট বিক্রয়ের সংবাদ পৌছার পর সে 'আল্ হামদুলিল্লাহ' কিংবা 'লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অথবা 'সুবহানাল্লাহ' বলে, তাহলে তার শুফ'আ বাতিল হবে না। কেননা প্রথম বাক্যটি প্রতিবেশীত্ব হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা বুঝায়। আর দ্বিতীয় বাক্যটি বিক্রেতা কর্তৃক শফী'কে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যের জন্য আশ্চর্য প্রকাশ করা বুঝায়। আর তৃতীয় বাক্যটি বলে শফী' তার বক্তব্য সূচনা করছে এই কথা বুঝায়। সুতরাং এই তিনটির কোনোটিই তার শুফ'আ গ্রহণে অনিচ্ছার কথা বুঝায় না। অনুরূপভাবে বিক্রয়-সংবাদ শুনে শফী' যদি বলে, জমিটি কে ক্রয় করেছে এবং কত টাকায় বিক্রয় হয়েছে? [তাহলেও একই বিধান হবে]। কেননা শফী' এক মূল্য হলে শুফ'আ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় আবার অন্য মূল্য হলে তা নিতে আগ্রহী হয় না। তদ্রূপ একজনের প্রতিবেশী হতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং অন্য আরেকজনের প্রতিবেশী হতে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ مَا بَلَغَهُ الْبَيْعُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) 'মতনে' ইমাম কুদূরী (র.) বর্ণিত মাসআলার উপর নির্ভরশীল কয়েকটি মাসআলার বিধান উল্লেখ করছেন। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শফী'র নিকট যখন বিক্রয় সম্পর্কে সংবাদ পৌছবে তখন শফী'র জন্য শ্রবণমাত্রই দাবি করা অপরিহার্য নাকি যে বৈঠকে সংবাদ পৌছেছে সে বৈঠকে অবস্থানকাল পর্যন্ত সে সময় পাবে? এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে দু'টি অভিমত বর্ণিত রয়েছে। একটি মত অনুযায়ী বৈঠকে অবস্থানকাল পর্যন্ত সুযোগ পাবে। আর আরেকটি মত অনুসারে শ্রবণমাত্রই দাবি করা আবশ্যক হবে। 'মতনে' ইমাম কুদূরী (র.) -এর বর্ণনায় প্রথম মতটিই উল্লেখ করা হয়েছে। এই মতটির উপর ভিত্তি করে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলাগুলো উল্লেখ করছেন। এক্ষেত্রে সারকথা হচ্ছে, বৈঠকে অবস্থানকাল পর্যন্ত শফী' সুযোগ লাভ করবে, তবে দাবি করার পূর্বে যদি তার পক্ষ থেকে এমন কথা বা কাজ প্রকাশ পায় যা দ্বারা তার অনীহা বুঝা যায় তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) তিনটি বাক্য উল্লেখ করে বলেন, যদি শফী'র নিকট সংবাদ পৌছার পর সে এ বাক্যগুলোর কোনোটি ব্যক্ত করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। কেননা এগুলোর কোনোটিই স্পষ্টরূপে তার অনীহা প্রকাশ করে না। বরং ভিন্ন অর্থ প্রকাশের সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই শুফ'আ বাতিল হবে না, বৈঠক শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত তার সুযোগ বহাল থাকবে। বাক্যগুলো হচ্ছে–

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ –"আলহামদু লিল্লাহ" [অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর।]

২. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ – "লা- হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" [অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।]

৩. سُبْحَانَ اللّٰهِ "সুবহানাল্লাহ" [অর্থ: আল্লাহ পূত পবিত্র।]

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ حَمْدٌ عَلَى الْخَلَاصِ الخ : প্রথম বাক্যটি তথা "আলহাম্‌দু লিল্লাহ" কথাটি দ্বারা নিশ্চিতভাবে অনীহা প্রকাশ পায় না। তার কারণ হচ্ছে, "আলহামদু লিল্লাহ" বলা হয় ভালো কোনো কিছু অর্জিত হলে শুকরিয়া প্রকাশের জন্য। তাই এরূপ হতে পারে যে, বিক্রীত সম্পত্তির যে মালিক ছিল সে জমিটি বিক্রয় করার ফলে শফী' তার আচার আচরণে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হতো তা থেকে নিস্তার লাভ করেছে। সেজন্য সে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 'আলহামদু লিল্লাহ' পাঠ করেছে।

قَوْلُهُ وَالثَّانِيْ تَعَجُّبٌ مِنْهُ لِقَصْدِ إِضْرَارِهِ : আর দ্বিতীয় বাক্যটি অর্থাৎ 'লা– হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ' বাক্যটি দ্বারাও অনীহা প্রকাশ পায় না। কারণ এ বাক্যটি পাঠ করা হয় সাধারণত কোনো ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করলে। কাজেই এখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, বিক্রেতা জমিটি অন্য কারো নিকট বিক্রয় করে শফী'কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়। তাই শফী' এতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে উক্ত বাক্যটি পাঠ করছে যে, বিক্রেতা তার প্রতিবেশী কিংবা অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও কিরূপে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা পোষণ করল! সুতরাং এর দ্বারা শফী'র শুফ'আ দাবি করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ পায় না।

قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ لِافْتِتَاحِ كَلَامِهِ الخ : আর তৃতীয় বাক্যটি তথা 'সুবহানাল্লাহ' বাক্যটি পাঠ করার দ্বারা অনীহা প্রকাশ পায় না। তার কারণ হচ্ছে, অনেকের এরূপ অভ্যাস রয়েছে যে, কোনো কথা বা বক্তব্য শুরু করার পূর্বে 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করে। কাজেই এখানে শফী' হয়তো তার দাবির বক্তব্য শুরু করার জন্য 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করেছে। অতএব, এর কারণে তার অনাগ্রহ প্রকাশ পায় না। মোটকথা, উক্ত তিনটি বাক্যের কোনোটিই নিশ্চিতরূপে শফী'র শুফ'আর দাবি করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে না। কাজেই বৈঠক থেকে উঠে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার শুফ'আর দাবি করার সুযোগ বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ مَنِ ابْتَاعَ الخ : পূর্বের তিনটি বাক্যের দ্বারা যেরূপ অনীহা প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ শফী'র নিকট বিক্রয়ের সংবাদ পৌছার পর সে যদি জিজ্ঞাসা করে যে, জমিটি কে ক্রয় করেছে? কিংবা জিজ্ঞাসা করে যে, জমিটি কত টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে? তাহলে সেক্ষেত্রেও তার অনীহা প্রকাশ পায় না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِيْهَا بِثَمَنٍ دُوْنَ ثَمَنٍ : 'জমিটি কত টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে?' এ কথা জিজ্ঞাসা করার কারণে অনীহা প্রকাশ পায় না। তার কারণ হলো, শফী' সাধারণত একটি পরিমাণ পর্যন্ত মূল্য হলে শুফ'আর দাবি করতে আগ্রহী হয় আর তার চেয়ে অধিক হলে শুফ'আর দাবি করতে আগ্রহী হয় না। তাই সে মূল্য জানতে চেয়েছে, যাতে তার কাঙ্ক্ষিত পরিমাণের মধ্যে হলে সে শুফ'আর দাবি করতে পারে আর এর চেয়ে অধিক হলে দাবি ছেড়ে দিতে পারে। কাজেই মূল্য জিজ্ঞাসা করার কারণে তার অনীহা প্রকাশ পায় না।

قَوْلُهُ وَيَرْغَبُ عَنْ مُجَاوَرَةِ بَعْضٍ دُوْنَ بَعْضٍ : আর 'জমিটি কে ক্রয় করেছে?' এ কথা জিজ্ঞাসা করার কারণে অনাগ্রহ বা অনীহা বুঝা যায় না, তার কারণ হলো, শফী' শুফ'আর দাবি করবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেয় অনেক সময় জমিটি কে ক্রয় করেছে তার উপর বিবেচনা করে। যদি ক্রেতা তার মনঃপুত ব্যক্তি হয় তাহলে সে শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ করে। আর ক্রেতা যদি তার অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হয় তাহলে সে শুফ'আর দাবি করে। অতএব সে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই 'জমিটি কে ক্রয় করেছে'? তা জানতে চাচ্ছে। কাজেই এর দ্বারা তার অনিচ্ছা প্রকাশ পায় না। সুতরাং এক্ষেত্রেও পূর্বের মাসআলার ন্যায় তার বৈঠকে থাকাকাল পর্যন্ত শুফ'আর দাবি করার সুযোগ বহাল থাকবে।

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ، أَشْهَدَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ، طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ وَالْإِشْهَادُ فِيْهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ . إِنَّمَا هُوَ لِنَفْيِ التَّجَاحُدِ وَالتَّقْيِيْدُ بِالْمَجْلِسِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا اخْتَارَهُ الْكَرْخِيُّ (رحـ) وَيَصِحُّ الطَّلَبُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُفْهَمُ مِنْهُ طَلَبُ الشُّفْعَةِ، كَمَا لَوْ قَالَ طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ أَوْ أَطْلُبُهَا أَوْ أَنَا طَالِبُهَا، لِأَنَّ الْاِعْتِبَارَ لِلْمَعْنَى .

অনুবাদ : 'মুখতাসারুল কুদূরী' গ্রন্থে ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য: أَشْهَدَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ "শফী' ঐ বৈঠকেই তার শুফ'আ দাবি করার বিষয়ে সাক্ষী রাখবে" -এর উদ্দেশ্য হলো, তাৎক্ষণিক দাবি করা (طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ) । এক্ষেত্রে তার সাক্ষী রাখার বিষয়টি অপরিহার্য নয়। সাক্ষী রাখতে হবে কেবল বিপক্ষের অস্বীকারের পথ রুদ্ধ করার জন্য। আর "ঐ বৈঠকেই" বলে ইমাম কারখী (র.)-এর গৃহীত অভিমতটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমন যে কোনো শব্দের মাধ্যমে দাবি উত্থাপন করলে তা সহীহ হবে, যা দ্বারা শুফ'আর দাবি করেছে বলে বুঝা যায়। যেমন সে বলল, 'আমি শুফ'আ দাবি করলাম' অথবা 'আমি শুফ'আ দাবি করছি' কিংবা 'আমি শুফ'আর দাবিদার'। কেননা বাক্যের মর্মার্থ ও উদ্দেশ্যই বিবেচ্য হয় [শাব্দিক অর্থ নয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ أَشْهَدَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, [পূর্বের পৃষ্ঠায়] 'মতনে' ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন- وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيْعُ بِالْبَيْعِ أَشْهَدَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ - অর্থাৎ "যখন শফী' বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত হবে তখন সে বৈঠকেই তার দাবির ব্যাপারে সাক্ষী রাখবে"- ইমাম কুদূরী (র.)-এর এই বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ তথা 'তাৎক্ষণিক দাবি।' অর্থাৎ শফী' তখন তাৎক্ষণিকভাবে শুফ'আর দাবি করবে এবং সে ব্যাপারে সাক্ষী রাখবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এই طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ তথা 'তাৎক্ষণিক দাবি'-র ক্ষেত্রে ইমাম কুদূরী (র.) যে সাক্ষী রাখার কথা উল্লেখ করেছেন এটি 'তাৎক্ষণিক দাবি' সঠিক হওয়ার জন্য অপরিহার্য নয়; বরং এক্ষেত্রে অপরিহার্য হচ্ছে কেবল শফী'র দাবি করা, কাউকে সে সাক্ষী রাখুক বা না রাখুক। তবে সাক্ষী রাখা এ জন্য প্রয়োজন যে, যদি বিপক্ষ শফী'র তাৎক্ষণিক দাবি করার বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে যাতে সে সাক্ষী পেশ করে তার দাবি করার বিষয়টির সত্যতা প্রমাণ করতে পারে।

উল্লেখ্য, যদি শফী' সাক্ষী বানিয়ে না থাকে আর বিপক্ষ যদি তার 'তাৎক্ষণিক দাবি' করার বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে বিচারক শফী'র নিকট হতে 'হলফ' গ্রহণ করবে। হলফ করে শফী' বলবে যে, সে সংবাদ পাওয়ার পরপরই দাবি করেছিল।

قَوْلُهُ وَالتَّقْيِيْدُ بِالْمَجْلِسِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا اخْتَارَهُ الْكَرْخِيُّ (رحـ) : আর উক্ত 'মতনে' ইমাম কুদূরী أَشْهَدَ فِيْ مَجْلِسِهِ "বৈঠকেই সাক্ষী রাখবে" কথাটি বলে, 'তাৎক্ষণিক দাবি'-র সময়সীমা বৈঠকে অবস্থানকাল পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন- এর দ্বারা তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি মত হতে যেটি ইমাম আবুল হাসান কারখী (র.) গ্রহণ করেছেন সেটির

প্রতি ইশারা করেছেন। অর্থাৎ ইমাম কুদূরী (র.)-এর মতেও ইমাম কারখী (র.) গৃহীত মতটি সঠিক বলে বিবেচিত। উল্লেখ্য, ইমাম কারখী (র.) কর্তৃক গৃহীত মত অনুসারে শফী'র নিকট সংবাদ পৌঁছার পর যে বৈঠকে থাকাকালে সংবাদটি পৌঁছেছে সে বৈঠকে যতক্ষণ সে অবস্থান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার দাবি করার সুযোগ থাকবে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত অপর মতটি [যা অধিকাংশ মাশায়েখ গ্রহণ করেছেন] অনুসারে শ্রবণমাত্রই দাবি করা অপরিহার্য, অন্যথায় শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। [এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।]

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَصِحُّ الطَّلَبُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُفْهَمُ مِنْهُ طَلَبُ الشُّفْعَةِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে সকল বাক্য বলে শফী' শুফ'আর দাবি করছে বলে বুঝা যায়, এরূপ যে কোনো বাক্য দ্বারাই শুফ'আর দাবি করলে দাবি সঠিক হবে। আভিধানিক অর্থ এক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে না। সুতরাং শফী' যদি বলে, طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ "আমি শুফ'আর দাবি করলাম" কিংবা বলে, اَطْلُبُ الشُّفْعَةَ। "আমি শুফ'আর দাবি করছি/করব" অথবা বলে, أَنَا طَالِبُ الشُّفْعَةِ "আমি শুফ'আর দাবিদার" তাহলে সে শুফ'আর দাবি করেছে বলে সাব্যস্ত হবে। এক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে বলা যায় যে, সে প্রথম বাক্যটি তথা "আমি শুফ'আর দাবি করলাম বা করেছি" –এর দ্বারা অতীতে দাবি করেছে বলে সে সংবাদ দিচ্ছে, অথচ তা তো মিথ্যা। কাজেই দাবি করা হলো না। তদ্রূপ দ্বিতীয় বাক্যটি তথা "আমি দাবি করছি বা করব"–এটি হচ্ছে সে পরবর্তীতে দাবি করবে বলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। কাজেই এর দ্বারা দাবি করা হয়নি। কিন্তু এই আভিধানিক অর্থ বিবেচ্য হবে না; বরং সাধারণ প্রচলনে যেহেতু এ সকল বাক্য বলে দাবি উত্থাপন করা হয় তাই সাধারণ প্রচলনে যে অর্থ বুঝা যায় সে অর্থই ধর্তব্য হবে। সুতরাং তার দাবি করা সঠিক হয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা কেউ কোনো কথা ব্যক্ত করলে সে কথাটির যা মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য বুঝা যায় তাই ধর্তব্য হয়। শুধু আভিধানিক অর্থ ধর্তব্য হয় না।

وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ بَيْعُ الدَّارِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ حَتّٰى يُخْبِرَهُ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَاحِدٌ عَدْلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) وَقَالَا : يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ إِذَا أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا صَبِيًّا كَانَ أَوِ امْرَأَةً إِذَا كَانَ الْخَبَرُ حَقًّا . وَأَصْلُ الْاِخْتِلَافِ فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِدَلَائِلِهِ وَأَخَوَاتِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ . وَهٰذَا بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ إِذَا أُخْبِرَتْ عِنْدَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلْزَامُ حُكْمٍ . وَبِخِلَافِ مَا إِذَا أَخْبَرَهُ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيهِ، وَالْعَدَالَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْخُصُومِ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোনো বাড়ির বিক্রয় সংবাদ শফী'র নিকট পৌঁছার ক্ষেত্রে যতক্ষণ না তাকে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা অথবা একজন দীনদার ব্যক্তি (عدل) সংবাদ দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর [শুফ'আ দাবি করার বিষয়ে] সাক্ষী রাখা আবশ্যক হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এক ব্যক্তি সংবাদ দিলেই তার উপর সাক্ষী বানানো আবশ্যক হবে। চাই সে একজন স্বাধীন ব্যক্তি হোক কিংবা গোলাম, নাবালেগ কিশোর হোক কিংবা মহিলা, যদি সংবাদটি [তার ধারণায়] সত্য বলে মনে হয়। তাঁদের এই মতবিরোধটির মূল ক্ষেত্র হচ্ছে প্রতিনিধি বরখাস্ত করার মাসআলা। এ মাসআলাটি আমরা দলিল প্রমাণ ও নজির সহকারে পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, এ বিধানটি তালাকের ইচ্ছাধিকারপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যখন তার ইচ্ছাধিকার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রের ব্যতিক্রম [অর্থাৎ সংবাদদাতা একজন হলেই যথেষ্ট হয়।] কেননা এ সংবাদে তার উপর [স্বার্থবিরোধী] কোনো বিধান আপতিত হওয়ার বিষয় নেই। অনুরূপভাবে এ বিধানটি ঐ সুরতের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম, যখন ক্রেতা নিজে শফী'কে বিক্রয় সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করে [অর্থাৎ তখনও সংবাদদাতা একাধিক ও বা দীনদার হওয়া আবশ্যক নয়।] কেননা ক্রেতা এক্ষেত্রে তার বিবাদী। আর বাদী-বিবাদীর [পরস্পরের সংবাদ দেওয়ার] ক্ষেত্রে দীনদার হওয়ার বিষয়টি আবশ্যক হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ بَيْعُ الدَّارِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الخ : পূর্বে 'মতনে' উল্লেখ করা হয়েছিল যে, যখন শফী' বিক্রয় সম্পর্কে জানতে পারবে তখন সে সাক্ষী রাখবে। আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) উক্ত 'যখন জানতে পারবে' কথাটির ব্যাখ্যা করছেন যে, যে কোনো ব্যক্তির সংবাদ দেওয়ার মাধ্যমে জানলে কি শফী'র উপর শুফ'আর দাবি করা আবশ্যক হবে নাকি সংবাদদাতা একাধিক হওয়া বা সত্যনিষ্ঠ দীনদার ব্যক্তি হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য হবে– এ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এক্ষেত্রে সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যে দু'টি শর্ত রয়েছে। [অর্থাৎ ১. সাক্ষী দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হওয়া। ২. সাক্ষীগণ 'আদেল' অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ দীনদার হওয়া।] এ দু'টি শর্তের মধ্য হতে যে কোনো একটি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। সুতরাং শফী'র নিকট সংবাদদাতা যদি দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সংবাদ পৌছায় কিংবা এমন একজন ব্যক্তি সংবাদ পৌছায় যে সত্যনিষ্ঠ ও দীনদার, তাহলেই কেবল শফী'র উপর তাৎক্ষণিকভাবে দাবি করা আবশ্যক হবে এবং সে তার দাবির ব্যাপারে সাক্ষী রাখবে। পক্ষান্তরে যদি সংবাদদাতা এমন একজন হয়, যে সত্যনিষ্ঠ দীনদার নয় তাহলে তার সংবাদের উপর ভিত্তি করে শফী'র শুফ'আর দাবি করা এবং সাক্ষী রাখা

আবশ্যক হবে না। অর্থাৎ এরূপ সংবাদদাতার কারণে শফী' বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত হয়েছে বলে গণ্য হবে না। [উল্লেখ্য, ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে, যদি এরূপ একজন সংবাদ দেয় যে সত্যনিষ্ঠ দীনদার নয়, তাহলে শফী' যদি তার কথার সত্যায়ন করে তাহলে দাবি করা আবশ্যক হবে আর মিথ্যাপ্রতিপন্ন করলে আবশ্যক হবে না।

–[ফতোয়ায়ে শামী খ. ৯, পৃ.৩২৮]

উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর থেকে বর্ণিত একটি মত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের অনুরূপ। আর তাঁদের উভয়ের অপর একটি মত সাহেবাইনের মতের অনুরূপ।

قَوْلُهُ وَقَالَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ إِذَا أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ الخ : আর সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এক্ষেত্রে সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যে দু'টি শর্ত তার কোনোটিই আবশ্যক হবে না। বরং যেকোনো এক ব্যক্তি সংবাদ দিলেই তার ভিত্তিতে শফী'র উপর শুফ'আর দাবি করা আবশ্যক হবে। চাই সে একজন সংবাদদাতা স্বাধীন ব্যক্তি হোক কিংবা গোলাম হোক, [বুদ্ধিসম্পন্ন] কিশোর হোক কিংবা মহিলা হোক সর্বাবস্থাতেই তা শফী'র জন্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কাজেই এ সংবাদ পাওয়ার পর সে যদি শুফ'আর দাবি না করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে, যদি উক্ত সংবাদদাতার সংবাদ সঠিক হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَأَصْلُ الْاِخْتِلَافِ فِيْ عَزْلِ الْوَكِيْلِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে যে মতবিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে মূল মতবিরোধ হচ্ছে 'উকিল বা প্রতিনিধি বরখাস্ত করা'-র মাসআলায়। অর্থাৎ কেউ যদি কাউকে কোনো কাজের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করে, অতঃপর দায়িত্ব অর্পণকারী প্রতিনিধিকে তার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করে আর সে সংবাদ প্রতিনিধির নিকট কেউ পৌঁছায় তাহলে সংবাদদাতার সংবাদ প্রতিনিধির নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কী শর্ত হবে? সে ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.) -এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, সংবাদদাতা দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হতে হবে নতুবা এমন একজন হতে হবে যে সত্যনিষ্ঠ দীনদার [আদেল]। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে, যে কোনো একজন সংবাদদাতা হলেই যথেষ্ট হবে। এ মাসআলার এই মতবিরোধের উপর ভিত্তি করেই শুফ'আর মাসআলায় শফী'র নিকট জমি বিক্রয় সম্পর্কে সংবাদাতার ক্ষেত্রেও একই রূপ মতবিরোধ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِدَلَائِلِهِ وَأَخَوَاتِهِ فِيْمَا تَقَدَّمَ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল মতবিরোধ যে মাসআলায় তথা 'প্রতিনিধি বরখাস্ত করা'-র মাসআলা, তা আমরা মতবিরোধ এবং উভয় পক্ষের দলিল ও সে মাসআলার নজিরসহ ইতোপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) উক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করে এসেছেন كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِيْ -এর অধীনে فَصْلٌ فِي الْمَوَارِيْثِ অনুচ্ছেদের শেষের দিকে মূল হিদায়া গ্রন্থের ১৩৬ নং পৃষ্ঠায়। নিম্নে আমরা সেখানের সম্পূর্ণ ইবারতটুকু উল্লেখ করে দিলাম–

قَالَ : وَلَا يَكُوْنُ النَّهْيُ عَنِ الْوَكَالَةِ حَتّٰى يُشْهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ. وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا : هُوَ وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ، وَبِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِيْهَا كِفَايَةٌ. وَلَهُ أَنَّهُ خَبَرٌ مُلْزِمٌ، فَيَكُوْنُ شَهَادَةً مِنْ وَجْهٍ، فَيُشْتَرَطُ أَحَدُ شَطْرَيْهَا، وَهُوَ الْعَدَدُ أَوِ الْعَدَالَةُ. بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَبِخِلَافِ رَسُوْلِ الْمُوَكِّلِ، لِأَنَّ عِبَارَتَهُ كَعِبَارَةِ الْمُرْسِلِ. لِلْحَاجَةِ إِلَى الْإِرْسَالِ. وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا أَخْبَرَ الْمَوْلٰى بِجِنَايَةِ عَبْدِهِ، وَالشَّفِيْعُ وَالْبِكْرُ وَالْمُسْلِمُ الَّذِيْ لَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا.

এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে, উভয় পক্ষের দলিল আর অপরটি হচ্ছে, নজির হিসেবে আরো কয়েকটি মাসআলা।

উভয় পক্ষের দলিল :

সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে, প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান হচ্ছে 'মুআমালাত' বা পারস্পরিক লেনদেন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অন্যান্য লেনদেন চুক্তির ন্যায় এক্ষেত্রে যেকোনো একজন ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে, প্রতিনিধিত্ব হতে অব্যাহতি প্রদানের সংবাদ হচ্ছে এমন একটি সংবাদ যা প্রতিনিধির উপর তার বিপক্ষে কিছু বিষয় অনিবার্যরূপে চাপিয়ে দেয়। কাজেই এ সংবাদটি এক হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানের অনুরূপ। কেননা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমেও অপর পক্ষের বিপক্ষে কোনো বিষয়কে চাপিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং একদিক থেকে এই সংবাদ সাক্ষ্য প্রদানের অনুরূপ তাই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যে দু'টি শর্ত রয়েছে তার যেকোনো একটি শর্ত এক্ষেত্রেও আবশ্যক হবে। সে দু'টি শর্ত হচ্ছে, সাক্ষ্যদাতা নিষ্ঠাবান দীনদার হওয়া এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক হওয়া [অর্থাৎ দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হওয়া।]

নজির হিসেবে বর্ণিত মাসআলাসমূহ : নজির হিসেবে যে মাসআলাগুলো উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে–

১. কোনো গোলামের মনিবের নিকট কেউ যদি সংবাদ দেয় যে, আপনার গোলাম অমুককে হত্যা কিংবা অন্য কোনো ক্ষতিসাধন করেছে। আর এই সংবাদ পাওয়ার পর মনিব উক্ত গোলামকে বিক্রয় করল কিংবা আজাদ করে দিল।
২. কোনো কুমারী [বাকেরা] রমণীকে কেউ সংবাদ দিল যে, তোমাকে তোমার অভিভাবক বিবাহ দিয়েছে। অতঃপর সে রমণী নিশ্চুপ রইল।
৩. কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে কাফের রাষ্ট্রেই অবস্থান করতে থাকল। আর এই অবস্থানকালে তাকে শরিয়তের কোনো বিধান সম্পর্কে তাকে কোনো ব্যক্তি সংবাদ দিল।

তাহলে এ সকল সুরতে সাহেবাইনের মতে কোনো এক ব্যক্তি সংবাদ দিলেই সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে। ফলে প্রথম সুরতে মনিবের উক্ত আজাদ করা বা বিক্রয় করার কারণে সে উক্ত ক্ষতিসাধনের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে সম্মত বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয় সুরতে উক্ত রমণীর বিবাহে সম্মতি প্রদান বলে সাব্যস্ত হবে। আর তৃতীয় সুরতে উক্ত ব্যক্তির উপর বিধান অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উক্ত বিধানগুলো হওয়ার জন্য সংবাদদাতার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত দু'টি শর্তের যেকোনো একটি শর্ত বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য হবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ إِذَا أُخْبِرَتْ عِنْدَهُ : পূর্বের মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামত বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, শফী'র নিকট বিক্রয় সম্পর্কে সংবাদদাতার সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দু'টি শর্তের একটি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আর সাহেবাইনের মতে, যেকোনো একজন সংবাদদাতার সংবাদই গ্রহণযোগ্য হবে। মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে দু'টি মাসআলা বর্ণনা করে বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এ দু'টি মাসআলার ক্ষেত্রে বিধান ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এ দু'টি মাসআলায় তাঁর মতেও যেকোনো একজন ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট হবে।

প্রথম মাসআলা হচ্ছে– কোনো মহিলার নিকট কেউ যদি সংবাদ দেয় যে, তার স্বামী তাকে তালাক গ্রহণ করার ইচ্ছাধিকার প্রদান করেছে, তাহলে স্ত্রীর নিকট সংবাদটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সংবাদদাতা যেকোনো একজন [বুদ্ধিসম্পন্ন] ব্যক্তি হলেই যথেষ্ট হবে। এক্ষেত্রে সাহেবাইনের সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ও একমত। সুতরাং এরূপ একজন ব্যক্তির সংবাদ দেওয়ার পর উক্ত স্ত্রী ইচ্ছাধিকারপ্রাপ্তা বলে গণ্য হবে। অতঃপর যদি সে তালাক গ্রহণ করে নেয় তাহলে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার তালাক গ্রহণের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلْزَامُ حُكْمٍ الخ : এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, বিধান ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ হলো, স্ত্রীর নিকট স্বামীর পক্ষ হতে তালাক গ্রহণের ইচ্ছাধিকার প্রদান সম্পর্কিত সংবাদের মাধ্যমে স্ত্রীর উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়নি যা তার স্বার্থের বিপরীত। কেননা সে যে বিবাহবন্ধনে ছিল তা এই সংবাদের পরে বহালই রয়েছে। কাজেই এ সংবাদটি কেবল সংবাদই। এতে সাক্ষ্য প্রদানের ন্যায় কোনো বিষয় চাপিয়ে দেওয়ার দিক নেই। কাজেই সাক্ষ্য গ্রহণ হওয়ার জন্য যে দু'টি শর্ত তার কোনোটিই এক্ষেত্রে আবশ্যক হবে না।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا أَخْبَرَهُ الْمُشْتَرِي : আর দ্বিতীয় মাসআলা হলো, জমিটি যে ক্রয় করেছে সে নিজেই যদি শফী'কে বিক্রয় সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করে। যেমন ক্রেতা নিজেই এসে শফী'কে খবর দিল যে– তোমার জমির সংলগ্ন জমিটি আমি ক্রয় করেছি– তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও ক্রেতার সংবাদটি শফী'র নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নিষ্ঠাবান দীনদার হওয়া কিংবা সংবাদদাতা একাধিক হওয়া জরুরি নয়; বরং ক্রেতা যেরূপ ব্যক্তিই হোক না কেন তার একার সংবাদই শফী'র গ্রহণ করে নেওয়া অপরিহার্য বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيهِ وَالْعَدَالَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْخُصُومِ : অর্থাৎ এর কারণ হচ্ছে, ক্রেতা হচ্ছে শফী'র প্রতিপক্ষ। আর প্রতিপক্ষের সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান দীনদার হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য হয় না।

وَالثَّانِي طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادُ، لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِإِثْبَاتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِشْهَادُ ظَاهِرًا عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ، لِأَنَّهُ عَلَى فَوْرِ الْعِلْمِ بِالشِّرَاءِ، فَيَحْتَاجُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَى طَلَبِ الْإِشْهَادِ وَالتَّقْرِيرِ. وَبَيَانُهُ مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ.

অনুবাদ : ২. [দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে] দৃঢ় করণার্থে সাক্ষী রাখার মাধ্যমে দাবি করা। এর কারণ হচ্ছে, শফী' বিচারকের নিকট দাবি করার বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্য সাক্ষীর মুখাপেক্ষী হবে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর বাহ্যত শফী'র পক্ষে তাৎক্ষণিক দাবির সময় সাক্ষী রাখা সম্ভব নয়। কেননা তাৎক্ষণিক দাবি করা হয় বিক্রয় চুক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথেই। সুতরাং তাৎক্ষণিক দাবি করার পরে শফী'র জন্যে দৃঢ়করণার্থে সাক্ষী রাখার মাধ্যমে [শুফ'আর] দাবি উত্থাপন করা প্রয়োজন পড়ে। এই প্রকার দাবি করার পদ্ধতির বর্ণনা তা-ই যা ইমাম কুদূরী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন [পরবর্তী বাক্যগুলোতে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّانِي طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادُ الخ : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুফ'আর দাবি তিন প্রকার। তন্মধ্য হতে প্রথম প্রকারের আলোচনা শেষ হয়েছে। এখান থেকে দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা করছেন। দ্বিতীয় প্রকার দাবি হচ্ছে, طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادُ তথা 'দৃঢ়করণার্থে সাক্ষী রাখার মাধ্যমে দাবি।' এই প্রকার দাবির পর যেহেতু শুফ'আর অধিকার দৃঢ় হয় তাই একে طَلَبُ التَّقْرِيرِ তথা 'দৃঢ় করণার্থে দাবি' বলা হয় এবং এ দাবিতে যেহেতু সাক্ষী রাখা আবশ্যক হয় তাই একে طَلَبُ الْإِشْهَادِ তথা 'সাক্ষী রাখার মাধ্যমে দাবি' বলা হয়।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِإِثْبَاتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي الخ : এই দ্বিতীয় প্রকার দাবি আবশ্যক হওয়ার দলিল হচ্ছে– শফী' যে বিক্রীত জমির শুফ'আর দাবি করেছে তাকে বিচারকের নিকট তা প্রমাণ করতে হবে। আর সাক্ষী ব্যতীত সে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না। কাজেই তার দাবির ব্যাপারে সাক্ষী রাখা প্রয়োজন। আর প্রথম প্রকার দাবি তথা 'তাৎক্ষণিক দাবি'র সময় সাধারণত সাক্ষী রাখা সম্ভব হয় না। কেননা 'তাৎক্ষণিক দাবি' তাকে করতে হয় বিক্রয় সংবাদ শ্রবণ মাত্রই। তখন সাক্ষীগণ তার নিকট উপস্থিত না থাকতে পারে। কাজেই শ্রবণ মাত্র 'তাৎক্ষণিক দাবি' করার পর তাকে সাক্ষী রাখার মাধ্যমে দ্বিতীয়বার দাবি করতে হবে যাতে এই সাক্ষীদেরকে সে বিচারকের নিকট পেশ করতে পারে। আর এটিই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার দাবি তথা طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادُ। মূলকথা হচ্ছে, শফী'র নিকট বিক্রয়ের সংবাদ পৌছার পর তাকে দাবি করতে হবে এবং তার দাবির ব্যাপারে সাক্ষী রাখতে হবে। কিন্তু দাবি করতে হবে তৎক্ষণাৎ আর সাক্ষী রাখতে হবে জমির বিক্রেতার নিকট [যদি জমিটি তার হাতে থেকে থাকে] কিংবা ক্রেতার নিকট অথবা বিক্রীত জমির নিকট উপস্থিত হয়ে। এ কারণেই যদি শফী'র নিকট যখন বিক্রয়ের সংবাদ পৌছে তখন যদি সে ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা বা জমির নিকট উপস্থিত থাকে এবং সাক্ষীগণও হাজির থাকে আর এমতাবস্থায় সে তার দাবি করে তাহলে পৃথকভাবে তাকে দুই প্রকার দাবি করতে হবে না; বরং এই দাবি তার উভয় প্রকার দাবির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

عَلَى مَا ذَكَرْنَا [যার কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি] –একথাটি বলে মুসান্নিফ (র.) পূর্বের পৃষ্ঠায় بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُومَةِ فِيهَا -এর একটু আগে وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ -এর অধীনে যে দলিলটি বর্ণনা করেছেন তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেখানে দলিলটি এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِ طَلَبِهِ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا يُمْكِنُهُ إِلَّا بِالْإِشْهَادِ.

قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ : পরবর্তী মূল ইবারতে [মতনে] ইমাম কুদূরী (র.) দ্বিতীয় প্রকার দাবি তথা طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادُ কিভাবে করবে তার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তাই মুসান্নিফ (র.) বলেন, এই দ্বিতীয় প্রকার দাবি উত্থাপনের পদ্ধতি তাই যা তিনি [অর্থাৎ ইমাম কুদূরী] গ্রন্থে [তথা মুখতাসারুল কুদূরী গ্রন্থে] বর্ণনা করেছেন।

ثُمَّ يَنْهَضُ مِنْهُ يَعْنِى مِنَ الْمَجْلِسِ وَيُشْهِدُ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ كَانَ الْمَبِيْعُ فِىْ يَدِهٖ . مَعْنَاهُ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَى الْمُشْتَرِىْ أَوْ عَلَى الْمُبْتَاعِ أَوْ عِنْدَ الْعَقَارِ، فَإِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ اِسْتَقَرَّتْ شُفْعَتُهُ . وَهٰذَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمٌ فِيْهِ، لِأَنَّ لِلْأَوَّلِ الْيَدَ وَلِلثَّانِى الْمِلْكَ . وَكَذَا يَصِحُّ الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْمَبِيْعِ، لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ، فَإِنْ سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيْعَ لَمْ يَصِحَّ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِخُرُوْجِهٖ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ خَصْمًا . إِذْ لَا يَدَ لَهُ وَلَا مِلْكَ، فَصَارَ كَالْأَجْنَبِىِّ .

অনুবাদ : অতঃপর শফী' সেখান থেকে অর্থাৎ উক্ত মজলিস থেকে উঠে বিক্রেতার নিকট গিয়ে [তার দাবির ব্যাপারে] সাক্ষী রাখবে যদি বিক্রীত সম্পত্তি [তখন পর্যন্ত] বিক্রেতার দখলেই থেকে থাকে অর্থাৎ ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে না থাকে। অথবা ক্রেতার নিকট বা বিক্রীত সম্পত্তির নিকট গিয়ে [সাক্ষী রাখবে]। এ কার্য যখন সে সম্পন্ন করবে তখন তার শুফ'আর অধিকার দৃঢ় হয়ে যাবে। এ বিধানের [বিক্রেতা, ক্রেতা কিংবা সম্পত্তির নিকট সাক্ষী রাখার বিধানের] কারণ হলো, বিক্রেতা ও ক্রেতা এদের প্রত্যেকেই শফী'র প্রতিপক্ষ। কেননা [বিক্রীত সম্পত্তিতে] বিক্রেতার দখল রয়েছে আর ক্রেতার মালিকানা রয়েছে। তদ্রূপ বিক্রীত সম্পত্তির নিকটও সাক্ষী রাখা সঠিক, কেননা শুফ'আর হক এই সম্পত্তির সাথেই সম্পৃক্ত। আর বিক্রেতা যদি বিক্রীত সম্পত্তি [ক্রেতার নিকট] হস্তান্তর করে দিয়ে থাকে তাহলে বিক্রেতার নিকট গিয়ে সাক্ষী রাখা কার্যকর হবে না। কেননা তার দখল বা মালিকানা কোনটিই না থাকায় সে এখন প্রতিপক্ষ হওয়া থেকে বেরিয়ে গেছে। কাজেই সে এখন অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ يَنْهَضُ مِنْهُ يَعْنِى مِنَ الْمَجْلِسِ الخ : দ্বিতীয় প্রকার দাবি তথা طَلَبُ التَّقْرِيْرِ وَالْإِشْهَادُ -এর পদ্ধতি হলো, যে বৈঠকে থাকাকালে শফী'র নিকট বিক্রয় সংবাদ পৌঁছেছে সে বৈঠকে 'তাৎক্ষণিক দাবি' করার পর যথাশীঘ্র সেখান থেকে উঠে সে বিক্রেতার নিকট কিংবা ক্রেতার নিকট অথবা জমির নিকট গিয়ে তার শুফ'আর দাবি করার ব্যাপারে সাক্ষী রাখবে। তবে বিক্রেতার নিকট যাওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো জমিটি তখন পর্যন্ত বিক্রেতার দখলে থাকতে হবে। অর্থাৎ ক্রেতার নিকট যদি হস্তান্তর না করে থাকে তাহলেই কেবল বিক্রেতার নিকট সাক্ষী রাখতে পারবে। আর যদি বিক্রেতা ইতোমধ্যে জমিটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে থাকে তাহলে বিক্রেতার নিকট গিয়ে সাক্ষী রাখলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিভাবে সাক্ষী রাখবে সে সম্পর্কে একটু পরে মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করবেন।

উল্লেখ্য, এই দ্বিতীয় প্রকার দাবির ক্ষেত্রে শফী'র যথেচ্ছা বিলম্ব করার অবকাশ নেই; বরং এই দাবি করার সুযোগ পাওয়ার পর যদি সে বিলম্ব করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এক্ষেত্রে শফী'র বিলম্ব করার অধিকার থাকলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা শফী' হয়তো শুফ'আর দাবি করবে না মনে করে ক্রেতা তার ক্রয়কৃত জমিতে কোনো গৃহ নির্মাণ করতে পারে কিংবা গাছ রোপণ করতে পারে। ফলে শফী'র যদি বিলম্ব করার সুযোগ থাকে তাহলে সে বিলম্বে যখন শুফ'আর দাবি করবে তখন ক্রেতার নির্মিত গৃহাদি ভেঙ্গে ফেলতে হবে, ফলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তবে এক্ষেত্রে শফী' যথাবিহিত সুযোগ লাভ করা সত্ত্বেও বিলম্ব করলে শুফ'আ বাতিল হবে, সুযোগ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত বিলম্বে শুফ'আ বাতিল হবে না। এ সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি মাসআলা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যথা–

১. বিক্রয়ের সংবাদ শোনার পর যদি জোহর নামাজের শেষের দুই রাকাত সুন্নত আদায় করে তাহলে শুফ'আ বাতিল হবে না। আর যদি সুন্নত দুই রাকাতের পর আরো নামাজ আদায় করে তাহলে শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে।

২. জুমার নামাজের পর বিক্রয়ের সংবাদ শোনার পর যদি চার রাক'আত সুন্নত আদায় করে তাহলে শুফ'আ বাতিল হবে না। আর এর চেয়ে অধিক আদায় করলে বাতিল হয়ে যাবে।

৩. যদি জমি বিক্রেতা, ক্রেতা ও জমিটি একই শহরে থাকে আর এদের মধ্যে যে শফী'র সবচেয়ে অধিক নিকটবর্তী, শফী' তাকে ছেড়ে যে দূরবর্তী তার নিকট সাক্ষী রাখতে যায় তাহলে শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। কেননা সম্পূর্ণ শহর একটি স্থান রূপে গণ্য হয়। আর যদি ক্রেতা বা বিক্রেতা কিংবা জমি ভিন্ন কোনো শহরে থাকে আর শফী' তার নিকটতম ব্যক্তিকে ছেড়ে দূরবর্তীর নিকট যায় তাহলে তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা নিকটতম ব্যক্তি বা জমির নিকট যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পর সে বিলম্ব করেছে। –[বিনায়া]

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمٌ فِيْهِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) মূল ইবারতে ইমাম কুদূরী বর্ণিত মাসআলার দলিল বর্ণনা করছেন। মূল ইবারতে যে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় প্রকার দাবি তথা طَلَبُ التَّقْرِيْرِ وَالْإِشْهَادُ -এর ক্ষেত্রে শফী' সাক্ষী রাখতে পারবে বিক্রেতার নিকট [যদি সম্পত্তি সে হস্তান্তর করে না থাকে], কিংবা ক্রেতার নিকট অথবা বিক্রীত সম্পত্তির নিকট। এদের যে কারো নিকট সাক্ষী রাখলে তা সঠিক হবে। এর দলিল নিম্নরূপ–

বিক্রেতা বা ক্রেতার নিকট গিয়ে সাক্ষী রাখা সঠিক হবে, তার কারণ হলো এদের প্রত্যেকেই শফী'র প্রতিপক্ষ। কাজেই তারা শুফ'আ সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তাদের সামনে সাক্ষী রাখা সঠিক হবে। বিক্রেতা প্রতিপক্ষ হওয়ার কারণ হচ্ছে, জমিটি তখনও তারই দখলে রয়েছে। এ অবস্থায় শফী' জমিটি গ্রহণ করতে চাইলে তার নিকট হতেই গ্রহণ করবে। সুতরাং সেও শফী'র প্রতিপক্ষ। আর ক্রেতা প্রতিপক্ষ হওয়ার কারণ হচ্ছে, জমির মালিকানা এখন ক্রেতারই। কাজেই জমি বিক্রেতার দখলে থাক বা ক্রেতার দখলে থাক, উভয় অবস্থায়ই ক্রেতা শফী'র প্রতিপক্ষ। আর বিক্রীত সম্পত্তির নিকট গিয়ে সাক্ষী রাখলে তা সঠিক হওয়ার কারণ হচ্ছে, শুফ'আর অধিকার বিক্রীত সম্পত্তির সাথেই সংশ্লিষ্ট। কাজেই সেখানে গিয়ে সাক্ষীদেরকে জমিটি দেখিয়ে দাবির কথা তাদেরকে জানালে তাও যথেষ্ট হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيْعَ لَمْ يَصِحَّ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ الخ : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিক্রেতার নিকট গিয়ে শুফ'আর দাবির কথা জানিয়ে সাক্ষী রাখা কেবল তখনই সঠিক হবে যদি বিক্রেতা তখন পর্যন্ত জমিটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে না থাকে। এখানে মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি জমি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে থাকে তাহলে বিক্রেতার নিকট গিয়ে দাবির কথা জানিয়ে সাক্ষী রাখলে তা সঠিক হবে না।

এর কারণ হচ্ছে, যখন বিক্রেতা জমিটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দিয়েছে তখন জমিটির উপর তার মালিকানাও নেই, দখলও নেই। কাজেই সে এখন আর কোনোভাবে শফী'র প্রতিপক্ষ নয়; বরং সে এখন নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি, যার সাথে শুফ'আর অধিকারের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। সুতরাং তার নিকট সাক্ষী রাখা একজন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট সাক্ষী রাখার মতো হবে। অতএব, তা সঠিক হবে না।

[উল্লেখ্য, বিক্রেতা জমি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করার পর যে তার নিকট সাক্ষী রাখা সঠিক নয়– এটি ইমাম কুদূরী (র.) উল্লেখ করেছেন এবং ফকীহ ইসাম ও নাতেফীও বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সদরুস শহীদ (র.) এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ আত্-তওয়াওসী এবং আশ্ শাইখ খাওয়াহির জাদাহ (র.) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, বিক্রেতা জমি হস্তান্তর করার পরও তার নিকট গিয়ে দাবি পেশ করে সাক্ষী রাখা সঠিক হবে। আর তা হবে 'ইসতিহ্সান' তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। কেননা বিক্রেতা বিক্রয় সম্পাদনে একজন চুক্তিকারী।

–[বিস্তারিত দ্র. ফতোয়ায়ে শামী খ. ৯ পৃ. ৩২৯, ও বিনায়া]

وَصُورَةُ هٰذَا الطَّلَبِ أَنْ يَقُولَ إِنَّ فُلَانًا اِشْتَرٰى هٰذِهِ الدَّارَ وَأَنَا شَفِيعُهَا، وَقَدْ كُنْتُ طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ وَأَطْلُبُهَا الْاٰنَ فَاشْهَدُوا عَلٰى ذٰلِكَ . وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ تَسْمِيَةَ الْمَبِيعِ وَتَحْدِيدَهُ، لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا فِيْ مَعْلُومٍ وَالثَّالِثُ طَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ . وَسَنَذْكُرُ كَيْفِيَّتَهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অনুবাদ : এ প্রকার দাবির সুরত হলো, শফী' বলবে: অমুক ব্যক্তি এই বাড়িটি ক্রয় করেছে এবং আমি বাড়িটির শফী'। ইতিমধ্যে আমি এর শুফ'আ দাবি করেছি এবং এখন তা [আবার] দাবি করছি। তোমরা এ ব্যাপারে সাক্ষী থাক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, বিক্রীত সম্পত্তির পরিচয় ও তার সীমারেখা উল্লেখ করাও আবশ্যক হবে। কেননা দাবি করা কেবল সুনির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রেই সহীহ হয়। তৃতীয় প্রকার দাবি হচ্ছে মামলা দায়ের ও মালিকানার দাবি করা। এর পদ্ধতির আলোচনা আমরা পরে করব ইনশা আল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَصُورَةُ هٰذَا الطَّلَبِ أَنْ يَقُولَ إِنَّ فُلَانًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে দ্বিতীয় প্রকার দাবির আলোচনা করা হয়েছে সে দাবি ও সাক্ষী রাখার সুরত বা পদ্ধতি হলো– শফী' সাক্ষীদেরকে নিয়ে বিক্রেতা কিংবা ক্রেতা বা জমির নিকট যাওয়ার পর বলবে, এই জমিটি অমুক ব্যক্তি ক্রয় করেছে। আমি জমিটির শুফ'আর হকদার। ইতোপূর্বে আমি [সংবাদ পাওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে] শুফ'আর দাবি করেছি। আর এখন তোমাদের উপস্থিতিতে জমিটির শুফ'আর দাবি করছি। তোমরা এ ব্যাপারে সাক্ষী থাক। এতটুকু বিষয় শফী' বললেই তার দ্বিতীয় প্রকার দাবি সঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে 'জাহিরী রেওয়ায়েত' ছাড়া অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে শফী'কে এক্ষেত্রে বিক্রীত সম্পত্তির চতুঃসীমা উল্লেখপূর্বক তা সাক্ষীদের নিকট সুনির্দিষ্ট করাও আবশ্যক হবে। কেননা কোনো জিনিসের দাবি উত্থাপন করলে সে জিনিসটি সুনির্দিষ্ট হওয়া অপরিহার্য। দাবিকৃত জিনিস সুনির্দিষ্ট না হলে দাবি সঠিক বলে গণ্য হয় না। সুতরাং জমির চৌহদ্দী উল্লেখ করে তা নির্দিষ্ট করা জরুরি হবে।

قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ طَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ الخ : এ পরিচ্ছেদের শুরুর দিকে মুসান্নিফ (র.) বলেছিলেন যে, শুফ'আর দাবি তিন প্রকার। তন্মধ্যে দুই প্রকার দাবির আলোচনা শেষ করার পর এখান থেকে তৃতীয় প্রকার দাবির আলোচনা শুরু করছেন। তৃতীয় প্রকার দাবি হচ্ছে, طَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ অর্থাৎ, "মামলা দায়ের করে মালিকানা লাভের দাবি।" 'আল কাফী' (اَلْكَافِيْ) গ্রন্থে এই প্রকার দাবিকে طَلَبُ الْاِسْتِحْقَاقِ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, কি পদ্ধতিতে এই তৃতীয় প্রকারের দাবি করতে হবে সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। উল্লেখ্য, এ আলোচনা মুসান্নিফ (র.) মাত্র ৮/৯ লাইন পরে মূল ইবারতে قَالَ وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِيْ এ বাক্য থেকে করেছেন।

قَالَ : وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِتَاخِيْرِ هٰذَا الطَّلَبِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ رِوَايَةً عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) : اِنْ تَرَكَهَا شَهْرًا بَعْدَ الْإِشْهَادِ بَطَلَتْ . وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رحـ) مَعْنَاهُ إِذَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ . وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ : أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْمُخَاصَمَةَ فِيْ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْقَاضِيْ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ . لِأَنَّهُ إِذَا مَضٰى مَجْلِسٌ مِنْ مَجَالِسِهِ وَلَمْ يُخَاصِمْ فِيْهِ اِخْتِيَارًا دَلَّ ذٰلِكَ عَلٰى إِعْرَاضِهِ وَتَسْلِيْمِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এই প্রকার দাবি বিলম্বিত করার কারণে শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর থেকেও একটি রেওয়ায়েত। অন্যদিকে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সাক্ষী রাখার পর যদি একমাসকাল বিলম্ব করে তাহলে শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে। এটি ইমাম যুফার (র.)-এরও অভিমত। তবে তাঁদের এ অভিমতের অর্থ হলো, যদি বিনা ওজরে বিলম্ব করে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, যদি বিচারকের এজলাসের কোনো একটি এজলাসে দাবি না করে অতিবাহিত করে তাহলে তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বিচারকের কোনো একটি এজলাস যদি অতিবাহিত হয়ে যায় আর শফী' ইচ্ছাকৃতভাবে তাতে মামলা উত্থাপন না করে তাহলে তা তার শুফ'আ গ্রহণে অনীহা ও তা পরিত্যাগ করার প্রমাণ বহন করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِتَاخِيْرِ هٰذَا الطَّلَبِ الخ : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় প্রকার দাবি করার পর শুফ'আর অধিকার দৃঢ় ও মজবুত হয়ে যায়। এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচনা করছেন, যদি শফী' দ্বিতীয় প্রকার দাবি করার পর তৃতীয় প্রকার দাবি তথা 'মামলা দায়ের করে বিচারকের নিকট মালিকানা লাভের দাবি' করতে বিলম্ব করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে কিনা– সে প্রসঙ্গে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তিনি তিনটি মতের কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, শফী' যতই বিলম্ব করুক না কেন তার শুফ'আ বাতিল হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকেও অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। এটি ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ (র.)-এরও অভিমত।
২. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, দ্বিতীয় প্রকার দাবি তথা সাক্ষী রাখার পর শফী' যদি তৃতীয় প্রকার দাবি করতে একমাসকাল বিলম্ব করে তাহলে তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে। আর একমাসের কম সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের করলে শুফ'আ বহাল থাকবে। এটি ইমাম যুফার (র.)-এরও অভিমত। মুসান্নিফ (র.) বলেন, একমাসকাল বিলম্ব করলে যে মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শুফ'আ বাতিল হবে, এর অর্থ হচ্ছে যদি শফী' বিনা ওজরে একমাস বিলম্ব করে তাহলে বাতিল হবে। আর যদি ওজরবশত বিলম্ব করে তাহলে সকলের ঐকমত্যে শুফ'আ বাতিল হবে না। উল্লেখ্য, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের অনুরূপ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকেও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে।
৩. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত অনুসারে যদি শফী' দ্বিতীয় প্রকার দাবি করার পর বিচারকের কোনো একটি এজলাস [বিচারকের বিচারকার্যের বৈঠক] অতিবাহিত হয়ে যায় এবং শফী' ইচ্ছাকৃতভাবে সে এজলাসে দাবি উত্থাপন করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِذَا مَضٰى مَجْلِسٌ مِنْ مَجَالِسِ وَلَمْ يُخَاصِمْ فِيْهِ الخ : এখান থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত তৃতীয় মতটির দলিল বর্ণনা করছেন। এ মতটির দলিল হলো, শফী'র সাক্ষী রাখার পর যদি বিচারকের বিচারকার্যের বৈঠক বসা সত্ত্বেও শফী' ইচ্ছাকৃতভাবে তার দাবি উত্থাপন না করে তাহলে এটি তার শুফ'আর দাবি ছেড়ে দেওয়া ও শুফ'আ গ্রহণে অনিচ্ছা রয়েছে বলে প্রকাশ করে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শফী'র পক্ষ হতে শুফ'আ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ পেলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যায়। কাজেই এক্ষেত্রে তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে।

وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْقُطْ بِتَاخِيْرِ الْخُصُوْمَةِ مِنْهُ أَبَدًا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُشْتَرِىْ. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّصَرُّفُ حِذَارَ نَقْضِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّفِيْعِ، فَقَدَّرْنَاهُ بِشَهْرٍ، لِأَنَّهُ أَجِلٌ وَمَا دُوْنَهُ عَاجِلٌ عَلٰى مَا مَرَّ فِى الْأَيْمَانِ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى أَنَّ الْحَقَّ مَتٰى ثَبَتَ وَاسْتَقَرَّ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِإِسْقَاطِهِ. وَهُوَ التَّصْرِيْحُ بِلِسَانِهِ كَمَا فِىْ سَائِرِ الْحُقُوْقِ، وَمَا ذُكِرَ مِنَ الضَّرَرِ يَشْكُلُ بِمَا إِذَا كَانَ غَائِبًا وَلَا فَرْقَ فِىْ حَقِّ الْمُشْتَرِىْ بَيْنَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহম্মাদ (র.)-এর অভিমতের দলিল হলো, যদি মামলা দায়ের বিলম্বিত করার কারণে তার শুফ'আ কখনও বাতিল না হয় তাহলে এর ফলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা তার পক্ষে এই সম্পত্তিতে [ভবন বা প্রাচীর নির্মাণ বা অন্য কোনোভাবে] অধিকার-চর্চা করা সম্ভব হবে না, যেহেতু সর্বদা এই আশঙ্কা থাকবে যে, [যে কোনো সময়ে] শফী'র পক্ষ হতে তা বাতিল করে দেওয়া হবে। অতএব আমরা একমাসকাল সময় নির্ধারণ করে দিয়েছি। কেননা এক মাস হলে তা মেয়াদী সময়ের অন্তর্ভুক্ত আর এক মাসের কম হলে তা নগদ সময়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়, যার বিবরণ 'কসমের অধ্যায়ে' বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত –যা জাহিরী মাযহাব এবং যার উপর ফতোয়া– এর দলিল হলো, কোনো হক সাব্যস্ত ও দৃঢ় হওয়ার পর তা রহিত না করলে স্বয়ং রহিত হয় না। আর রহিতকরণ হয় মুখে স্পষ্টভাবে বলার মাধ্যমে। যেমন অন্যান্য সমস্ত হকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ হতে যে ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়টি শফী' অনুপস্থিত থাকার সুরতেও দেখা দেয় [অথচ সেক্ষেত্রে কারো মতেই শুফ'আ বাতিল হয় না]। ক্রেতার [ক্ষতি হওয়ার] ক্ষেত্রে শফী' উপস্থিত থাকা বা অনুপস্থিত থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْقُطْ الخ : এখান থেকে পূর্বে বর্ণিত দ্বিতীয় মত তথা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের দলিল বর্ণনা করছেন। তাঁর দলিলের সারকথা হচ্ছে, শফী' তৃতীয় প্রকার দাবি করতে তথা মামলা দায়ের করতে বিলম্ব করার কারণে যদি কখনই শুফ'আ বাতিল না হয় তাহলে এর ফলে জমির ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা সে তার ক্রয়কৃত সম্পত্তি কোনো কাজে লাগাতে [যেমন তাতে গৃহ নির্মাণ করা, বৃক্ষাদি লাগানো ইত্যাদি কাজ করতে] পারবে না। কারণ সর্বদা তার এই আশঙ্কা থাকবে যে, আমি জমিতে কোনো গৃহ নির্মাণ করলে কিংবা অন্য কোনোভাবে তা কাজে লাগালে পরবর্তীতে শফী' তার শুফ'আর দাবি করবে এবং আমার নির্মিত গৃহ কিংবা লাগানো গাছ তুলে নিতে বাধ্য করবে। কাজেই এই আশঙ্কার ফলে জমিটি ক্রয় করা সত্ত্বেও তা সে কোনো কাজে লাগাতে পারবে না। এভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই শফী'র জন্য সময় বেঁধে দেওয়া অপরিহার্য। তাই আমরা একমাসের চেয়ে কম সময় তার জন্য বেঁধে দিয়েছি। কেননা একমাস সময় বিলম্ব হিসেবে গণ্য হয় আর একমাসের কম সময় শীঘ্র হিসেবে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ عَلٰى مَا مَرَّ فِى الْأَيْمَانِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, একমাস সময় যে বিলম্ব হিসেবে গণ্য হয় আর একমাসের কম সময় শীঘ্র বলে গণ্য হয়– এ সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে كِتَابُ الْأَيْمَانِ -এ আলোচনা করে এসেছি। উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) এ আলোচনাটি হিদায়ার দ্বিতীয় খণ্ডে كِتَابُ الْأَيْمَانِ [কসমের অধ্যায়']-এর অধীনে بَابُ الْيَمِيْنِ فِيْ تَقَاضَى الدَّرَاهِمِ -এর অধীনে ৪৮৫ নং পৃষ্ঠায় করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, একমাসের কম সময়কে শীঘ্র ধরা হয় আর একমাস বা একমাসের অধিক সময়কে বিলম্ব ধরা হয়। এ কারণেই কারো সাথে সাক্ষাৎ বিলম্বে হলে সেক্ষেত্রে বলা হয়– مَا لَقِيْتُكَ مُنْذُ شَهْرٍ "একমাস যাবৎ তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ নেই।"

قَوْلُهُ وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের দলিল বর্ণনা করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতটিই হচ্ছে জাহিরী মাযহাব [বা জাহিরী বর্ণনা] এবং এই মতটির উপরই ফতোয়া [এ সম্পর্কে আমরা একটু পরে আলোচনা করব।]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের দলিল হচ্ছে, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় প্রকার দাবি তথা طَلَبُ التَّقْرِيْرِ وَالْإِشْهَادِ করার পর শুফ'আর অধিকার দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর সমস্ত 'হক' বা অধিকারের ক্ষেত্রে বিধান হলো, তা সাব্যস্ত হওয়ার পর যার 'হক' সে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ মুখে স্পষ্টভাবে ছেড়ে না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা কোনোভাবে বাতিল হয় না। সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার দাবি করার পর যখন শুফ'আর অধিকার দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত হয়েছে তখন শফী' নিজ মুখে স্পষ্টরূপে ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত তা বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ مِنَ الضَّرَرِ يَشْكُلُ بِمَا إِذَا كَانَ غَائِبًا الخ : এখান থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উল্লেখকৃত দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। তাঁর দলিলের সারকথা ছিল– যদি শফী'র তৃতীয় প্রকার দাবি উত্থাপনে বিলম্ব করার কারণে শুফ'আর অধিকার কখনো বাতিল না হয় তাহলে জমির ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জবাবের সারমর্ম হচ্ছে, যে ক্ষতির কথা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে সে ক্ষতি শফী' বিদেশে বা দূরে কোথাও থাকার অবস্থায়ও দেখা দেয়। অর্থাৎ শফী' যদি বিদেশে থাকে কিংবা দূরে কোথাও অবস্থানরত হয় তাহলে তার না আসা পর্যন্ত সকলের ঐকমত্যে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয় না। অথচ এক্ষেত্রে শফী' ক্ষতির সম্মুখীন হয় এভাবে যে, সে তার ক্রীত জমিতে গৃহাদি নির্মাণ কিংবা বৃক্ষাদি রোপণ ইত্যাদি কোনো কাজ করতে সক্ষম হয় না। কেননা সেক্ষেত্রে তাকে এই আশঙ্কায় থাকতে হয় যে, শফী' তার অবস্থানস্থল হতে এসে শুফ'আর দাবি করে জমিটি নিয়ে নিবে এবং তার নির্মিত গৃহাদি বা লাগানো গাছপালা তুলে নিতে বাধ্য করবে। সুতরাং শফী' দূরে অবস্থানরত অবস্থায় যখন একইরূপ ক্ষতির সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও সকলের ঐকমত্যে শুফ'আর অধিকার বহাল থাকে এবং উক্ত ক্ষতির দিকটি বিবেচ্য হয় না তখন শফী' নিকটে উপস্থিত থাকার সুরতেও এরূপ ক্ষতির দিকটি ধর্তব্য হবে না এবং এ কারণে প্রতিষ্ঠিত শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। কেননা শফী' নিকটে উপস্থিত থাক কিংবা দূরে অবস্থানরত থাক ক্রেতার ক্ষতির দিক উভয় ক্ষেত্রেই সমান। ক্রেতার ক্ষেত্রে এতে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় সুরতেই সে সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই এই ক্ষতি শুফ'আ বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলে উভয় সুরতেই ধর্তব্য হতো।

উল্লেখ্য, কারো এই আপত্তি হতে পারে যে, এক্ষেত্রে উভয় সুরতের বিষয় এক নয়, বরং উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই একটির সাথে অপরটির তুলনা করা সঠিক হবে না। উভয় সুরতের মাঝে পার্থক্য হলো, শফী' বিদেশে বা দূরে অবস্থানরত থাকার সুরতে যদি দাবি উত্থাপনে বিলম্বের কারণে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল করা হয় তাহলে শফী' ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা তার পক্ষে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে দাবি উত্থাপন কঠিন। আর শফী'র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি ক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তুলনায় অধিক বিবেচ্য হয়। এ কারণে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয় না। পক্ষান্তরে নিকটে উপস্থিত শফী'র ক্ষেত্রে কোনোরূপ ক্ষতির দিক নেই। কেননা সে অবিলম্বে মামলা দায়ের করতে সক্ষম। কাজেই বিলম্বের কারণে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে।

এ আপত্তির জবাব হলো, যদিও নিকটে উপস্থিত থাকা অবস্থায় শফী'র ক্ষতির দিক নেই; কিন্তু আরেক দিক থেকে তার বিষয়টি দূরে অবস্থানরত শফী'র তুলনায় অগ্রগণ্য। তা হচ্ছে– দূরে অবস্থানরত শফী' প্রথম দুই প্রকার দাবি না করা সত্ত্বেও তার অধিকার বাতিল হচ্ছে না। অথচ এরূপ অবস্থায় তার শুফ'আর অধিকার দুর্বল। পক্ষান্তরে নিকটে অবস্থানরত শফী'র অধিকার প্রথম দুই প্রকার দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই দুর্বল অপ্রতিষ্ঠিত অধিকারের তুলনায় দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত অধিকার বাতিল না হওয়ার অধিক দাবি রাখে। কাজেই শফী' ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দিক থেকে উপস্থিত ব্যক্তির বিষয়টি দুর্বল হলেও দৃঢ় ও অদৃঢ় হওয়ার দিক থেকে তার বিষয়টি অধিক শক্তিশালী।

[উল্লেখ্য, উপরিউক্ত মাসআলায় তিনটি মতের উপর কোন মতটির উপর ফতোয়া হবে এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের উপরই ফতোয়া এবং এটিই জাহিরী মাযহাব। ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থে আল্লামা শামী (র.) উল্লেখ করেছেন 'আল্-কাফী' গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া।

এরপর আল্লাম শামী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, পক্ষান্তরে শাইখুল ইসলাম, ইমাম কাজী খান উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া। 'বিকায়া', 'নুকায়া', 'জাখীরা', 'মুগনী' প্রভৃতি গ্রন্থেও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর আল্লামা শামী (র.) অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করার পর ফতোয়ার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নিম্নে ফতোয়ায়ে শামীর কিছু ইবারত উদ্ধৃত করা হলো–

بِهِ يُفْتَى (يَعْنِى بِقَوْلِ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ) كَذَا فِى الْهِدَايَةِ وَالْكَافِىْ وَ دُرَرٍ. قَالَ فِى الْعَزمِيَّةِ : وَقَدْ رأَيْتُ فَتْوَى الْمَوْلَى أَبِى السَّعُوْدِ عَلَى هٰذَا الْقَوْلِ . وَقِيْلَ يُفْتَى بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ، قَائِلُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقَاضِيْخَانْ فِىْ فَتَاوَاهُ وَشَرْحِهِ عَلَى الْجَامِعِ . وَمَشَى عَلَيْهِ فِى الْوِقَايَةِ وَالنِّقَايَةِ وَالذَّخِيْرَةِ وَالْمُغْنِىْ . وَفِى الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنِ الْبُرْهَانِ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا يُفْتَى بِهِ . قَالَ يَعْنِىْ أَنَّهُ أَصَحُّ مِنْ تَصْحِيْحِ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِىْ . وَعَزَاهُ الْقُهُسْتَانِىْ إِلَى الْمَشَاهِيْرِ كَالْمُحِيْطِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُضْمَرَاتِ وَغَيْرِهَا . (ثُمَّ قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّامِىْ) وَقَدْ شَاهَدْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَنْ جَاءَ يَطْلُبُهَا بَعْدَ عِدَّةِ سِنِيْنَ قَصْدًا لِلْإِضْرَارِ وَطَمْعًا فِىْ غِلَاءِ السِّعْرِ فَلَا جُرْمَ كَانَ سَدُّ هٰذَا الْبَابِ اَسْلَمُ.

–[ফতোয়ায়ে শামী খ. ৯ পৃ. ৩৩১ : মাকতাবায়ে যাকারিয়া]

وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ قَاضٍ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِالتَّاخِيْرِ بِالْاِتِّفَاقِ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْخُصُوْمَةِ إِلَّا عِنْدَ الْقَاضِيْ فَكَانَ عُذْرًا.

অনুবাদ : যদি জানা যায় যে, শহরে কোনো বিচারক বর্তমান নেই তাহলে সকলের ঐকমত্যে বিলম্বিত করার কারণে শুফ'আ বাতিল হবে না। কেননা বিচারক ব্যতীত সে মামলা দায়ের করতে সক্ষম হবে না, কাজেই এটি তার [বিলম্ব করার জন্য] ওজর হিসেবে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ قَاضٍ الخ : মাসআলা হলো, যদি শফী' জানে যে, শহরে বর্তমানে কোনো বিচারক নেই; কাজেই মামলা দায়ের করা যাবে না। আর এ কারণে সে মামলা দায়ের করতে বিলম্ব করে তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْخُصُوْمَةِ إِلَّا عِنْدَ الْقَاضِيْ : এর কারণ হচ্ছে, শফী' এক্ষেত্রে ওজরের কারণে বিলম্ব করেছে বলে গণ্য হবে। কেননা বিচারক ব্যতীত সে বিবাদীর সাথে মামলা চালাতে পারবে না। সুতরাং বিচারক না থাকা বিলম্ব করার জন্য একটি ওজর। আর ওজরের কারণে যদি বিলম্ব করে তাহলে সকলের ঐকমত্যে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয় না।

[উল্লেখ্য, হিদায়ার ভাষ্যকার আল্লামা আইনী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, মুসান্নিফ (র.) এখানে 'সকলের ঐকমত্য' (بِالْاِتِّفَاقِ) বলে 'আমাদের ইমামগণের সকলের ঐকমত্য' বুঝিয়েছেন। অন্য মাযহাবের ইমামগণ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর মতে, এক্ষেত্রে শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ তাঁদের উভয়ের মতে শুফ'আর সম্পত্তি গ্রহণের জন্য বিচারকের রায়ের আবশ্যকতা নেই। কারণ শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে 'শরিয়তের বাণী' (نَصّ) ও 'ইজমা' [সকলের ঐকমত্য]-এর ভিত্তিতে। কাজেই তা বিচারকের রায়ের প্রতি মুখাপেক্ষী না। আর আমাদের ইমামগণের মতে শুফ'আর সম্পত্তির মালিকানা লাভের জন্য বিচারকের রায় আবশ্যক। কারণ শুফ'আর ভিত্তিতে ক্রেতার মালিকানা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যের মালিকানায় নেওয়া হয়। কাজেই তাতে বিচারকের রায় অপরিহার্য হবে।

قَالَ : وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيْعُ إِلَى الْقَاضِىْ فَادَّعَى الشِّرَاءَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ سَأَلَ الْقَاضِىْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ـ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِىْ يَشْفَعُ بِهِ وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ـ لِأَنَّ الْيَدَ ظَاهِرٌ مُحْتَمَلٌ فَلَا تَكْفِىْ لِإِثْبَاتِ الْاِسْتِحْقَاقِ . قَالَ : يَسْأَلُ الْقَاضِىْ الْمُدَّعِىَ قَبْلَ أَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ عَنْ مَوْضَعِ الدَّارِ وَحُدُوْدِهَا ـ لِأَنَّهُ ادَّعٰى حَقًّا فِيْهَا ـ فَصَارَ كَمَا إِذَا ادَّعٰى رَقَبَتَهَا ، وَإِذَا بَيَّنَ ذٰلِكَ يَسْأَلُهُ عَنْ سَبَبِ شُفْعَتِهِ ـ لِاخْتِلَافِ أَسْبَابِهَا ، فَإِنْ قَالَ أَنَا شَفِيْعُهَا بِدَارٍ لِىْ تُلَاصِقُهَا الْآنَ تَمَّ دَعْوَاهُ عَلٰى مَا قَالَهُ الْخَصَّافُ (رح) وَذُكِرَ فِى الْفَتَاوٰى تَحْدِيْدُ هٰذِهِ الدَّارِ الَّتِىْ يَشْفَعُ بِهَا أَيْضًا ـ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِى الْكِتَابِ الْمَوْسُوْمِ بِالتَّجْنِيْسِ وَالْمَزِيْدِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন শফী' বিচারকের নিকট গিয়ে [সম্পত্তি] বিক্রয় হয়েছে বলে দাবি করে তার শুফ'আর আবেদন করবে তখন বিচারক বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করবে। যদি বিবাদী শফী' যে মালিকানার ভিত্তিতে শুফ'আর দাবি করে সে মালিকানার কথা স্বীকার করে তো ভালো, অন্যথায় বিচারক শফী'কে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে বাধ্য করবেন। কেননা দখলদারিত্ব হচ্ছে একাধিক সম্ভবনাময় বাহ্যত মালিকানা প্রকাশক। কাজেই তা অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না। হিদায়ার গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিচারক বিবাদীকে [জিজ্ঞাসা করতে] উদ্যত হওয়ার পূর্বে বাদীকে [বিক্রীত] বাড়িটির অবস্থান ও তার চতুঃসীমা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। কেননা বাদী এই বাড়িতে তার একটি অধিকার দাবি করছে। সুতরাং সে সরাসরি বাড়িটি দাবি করলে যেরূপ হতো সেরূপই হলো। যখন সে এগুলো বর্ণনা করবে বিচারক তাকে তার শুফ'আর দাবির ভিত্তি [সবব] কী সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। কারণ শুফ'আ দাবির ভিত্তি [সবব] কয়েক প্রকারের রয়েছে। এর উত্তরে বাদী যদি বলে যে, আমার একটি বাড়ি বর্তমানে [বিক্রীত] বাড়িটির সাথে সংযুক্ত রয়েছে, তার ভিত্তিতে আমি এর শুফ'আর হকদার তাহলে ইমাম খাস্‌সাফের বিবরণ অনুসারে শফী'র দাবি উত্থাপন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর 'ফতোয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শফী' যে বাড়িটির ভিত্তিতে শুফ'আ দাবি করছে সে বাড়িটির চতুঃসীমাও বর্ণনা করা আবশ্যক হবে। আমি এ সম্পর্কে 'আত্ তাজনীস ওয়াল মাযীদ' নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيْعُ إِلَى الْقَاضِىْ فَادَّعَى الشِّرَاءَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) তৃতীয় প্রকার দাবি তথা 'মামলা দায়ের করে মালিকানা লাভের দাবি' (طَلَبُ الْخُصُوْمَةِ وَالتَّمَلُّكِ) কিভাবে করতে হবে তার বিবরণ দিচ্ছেন। এই বিবরণ সম্পর্কেই ৭/৮ লাইন পূর্বে বলেছিলেন– وَسَنَذْكُرُ كَيْفِيَّتَهُ مِنْ بَعْدُ "আমরা পরে এর বিবরণ উল্লেখ করব।"

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন শফী' বিচারকের নিকট গিয়ে তার দাবি জানাবে যে, "অমুক ব্যক্তি একটি বাড়ি ক্রয় করেছে ওমুক স্থানে [শহরের নাম, মহল্লার নাম ও চৌহদ্দি বর্ণনাপূর্বক] এবং আমি সে বাড়িটির শফী'। কাজেই বাড়িটি আমার নিকট হস্তান্তর করার নির্দেশ দিন!" এভাবে যখন দাবি জানাবে তখন বিচারক প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ বাড়িটির ক্রেতাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করবেন, যে সম্পত্তির ভিত্তিতে শফী' শুফ'আর দাবি করছে সেটি প্রকৃতপক্ষে শফী'র মালিকানাধীন কিনা। যদি ক্রেতা স্বীকার করে যে, হ্যাঁ, শফী' সে সম্পত্তির মালিক তাহলে পরবর্তী বিষয় জিজ্ঞাসা করবেন। আর যদি ক্রেতা অস্বীকার করে; যেমন সে বলল, যে সম্পত্তির ভিত্তিতে শফী' শুফ'আর দাবি করছে তা তার নিজস্ব সম্পত্তি নয়; বরং সে অন্যের সম্পত্তিতে কেবল বসবাস করছে– তাহলে বিচারক শফী'কে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে বলবেন যে, উক্ত সম্পত্তি তার নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পত্তি। এর কারণ হচ্ছে, শুফ'আর অধিকার নিয়ে মামলা অগ্রসর হওয়া নির্ভর করে শুফ'আ লাভের 'সবব' [বা ভিত্তি] সাব্যস্ত হওয়ার উপর। আর এই 'সবব' হচ্ছে বিক্রীত সম্পত্তির সাথে শফী'র সম্পত্তি সংযুক্ত হওয়া। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত এই 'সবব'-এর অস্তিত্ব প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মামলা সামনে অগ্রসর হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর মতে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি রেওয়ায়েতের একটি রেওয়ায়েত অনুসারে এক্ষেত্রে যে সম্পত্তির ভিত্তিতে শফী' তার শুফ'আর দাবি করছে, সেটি তার মালিকানধীন সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক হবে না; বরং শফী'র দখলে থাকলেই যথেষ্ট হবে। কেননা দখলে থাকাই [বাহ্যত] মালিকানার প্রমাণ বহন করে। এ কারণেই তো সাক্ষীগণ কোনো বাড়ি কারো দখলে আছে দেখেই তার পক্ষে মালিকানার সাক্ষ্য দিতে পারে।

আমাদের দলিল মুসান্নিফ (র.) পরবর্তী ইবারতে বর্ণনা করছেন–

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْيَدَ ظَاهِرٌ مُحْتَمَلٌ فَلَا تَكْفِيْ لِإِثْبَاتِ الْاِسْتِحْقَاقِ : [ইমাম যুফার (র.)-এর বিপক্ষে আমাদের দলিল হলো,] শফী'কে তার মালিকানার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে হবে। তার কারণ, দখলদারিত্ব হচ্ছে একটি বাহ্যিক প্রমাণ, যা অন্য কিছু হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। কেননা দখলদারিত্ব মালিকানার কারণে যেমন হতে পারে তেমনি অন্য কারণেও হতে পারে। যেমন আমানত, বন্ধক, ভাড়ায় গ্রহণ ইত্যাদি কারণে হতে পারে। কাজেই এরূপ বাহ্যিক একাধিক বিষয়ের সম্ভাবনাময় প্রমাণ অন্যের হাতে থাকা কোনো জিনিসের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শুফ'আর অধিকার হচ্ছে অন্যের হাতে থাকা জমির উপর অধিকারের দাবি। কাজেই একাধিক বিষয়ের সম্ভাবনাময় প্রমাণ [তথা অনিশ্চিত প্রমাণ] এক্ষেত্রে কার্যকর হবে না।

বাহ্যিক প্রমাণ [যা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ বহন করে না তা] অন্যের উপর কোনো অধিকার সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয় না। তার নজির হচ্ছে–

১. যদি কেউ কোনো স্বাধীন ব্যক্তির উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। অতঃপর সে অপবাদ যথার্থ প্রমাণিত না হয় তাহলে অপবাদদাতার জন্য নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে। কিন্তু অপবাদ আরোপকারী যদি বলে, "অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি স্বাধীন নয়; বরং সে গোলাম" তাহলে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি শুধু স্বাধীন বলে দাবি করলেই অপবাদদাতার উত্তরে শাস্তি সাব্যস্ত হয় না; যতক্ষণ না সে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে। কেননা যদিও যেকোনো ব্যক্তি স্বাধীন হওয়াই মানুষের মূল অবস্থা। প্রমাণ না থাকলেও স্বাধীন হওয়া বাহ্যত সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে অন্যের মাধ্যমে অন্যের উপর শাস্তির বিধান করা হয় তাই এই বাহ্যিক প্রমাণ যথেষ্ট হয় না; বরং সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করতে হয়।

২. অনুরূপভাবে কেউ যদি কারো হাত কেটে ফেলে। অতঃপর যার হাত কাটা হয়েছে সে যদি বিচারকের নিকট এর কিসাস দাবি করে তাহলে হাতকাটা ব্যক্তি যদি নিজেকে স্বাধীন ব্যক্তি দাবি করে এবং কর্তনকারী তাকে গোলাম বলে দাবি করে তবে কিসাস হিসেবে কর্তনকারীর হাত কাটার ফয়সালা হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, যার হাত কর্তন করা হয়েছে সে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে নিজেকে স্বাধীন বলে প্রমাণিত করবে। –[বিনায়া]

قَوْلُهُ قَالَ (رض) يَسْأَلُ الْقَاضِيْ الْمُدَّعِيْ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তৃতীয় প্রকার দাবি তথা মামলা দায়ের ও মালিকানা লাভের দাবির পদ্ধতি [যা 'মতনে' ইমাম কুদূরী (র.) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন]-এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, বিচারকের নিকট যখন শফী' বিক্রীত জমিতে তার শুফ'আ দাবি করবে তখন বিচারক বিবাদী তথা ক্রেতাকে এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বে শফী'কে জিজ্ঞাসা করবেন, সে যে জমিটিতে শুফ'আ দাবি করছে সে জমিটি কোথায় অবস্থিত? তার চতুঃসীমা কী? শফী' এর জবাবে জমিটি কোন শহরে কোন মহল্লায় অবস্থিত তা উল্লেখ করবে এবং জমিটির চৌহদ্দি বর্ণনা করবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ادَّعَى حَقًّا فِيْهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا ادَّعَى رَقَبَتَهَا : শফী'র দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য উক্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করে জমিটি সুনির্দিষ্ট করা আবশ্যক হওয়ার কারণ হলো, শফী' এক্ষেত্রে উক্ত জমিতে তার অধিকার দাবি করছে। আর নির্দিষ্ট জিনিস ব্যতীত কোনো জিনিসের অধিকার দাবি করলে সে দাবি সঠিক বলে গণ্য হয় না। কাজেই দাবিকৃত জমি নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। আর নির্দিষ্ট করার জন্য উক্ত বিষয়গুলো তথা জমি বা বাড়ির অবস্থান, তার চতুঃসীমা উল্লেখ করা অপরিহার্য। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু শফী' বিক্রীত জমির মাঝে একটি অধিকার তথা শুফ'আর অধিকার দাবি করছে। তাই এর বিধান ঠিক সেরূপই হবে যখন কেউ সরাসরি জমির মালিকানা দাবি করে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে যেরূপ দাবিকৃত জমির অবস্থান ও চতুঃসীমা উল্লেখপূর্বক তা নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য তদ্রূপ শুফ'আর অধিকার দাবি করার ক্ষেত্রেও অবস্থান ও চতুঃসীমা বর্ণনা করা অপরিহার্য হবে।

قَالَ وَإِذَا بَيَّنَ ذٰلِكَ يَسْأَلُهُ عَنْ سَبَبِ شُفْعَتِهِ الخ : যখন শফী' তার শুফ'আর দাবিকৃত জমি বা বাড়ির অবস্থান ও চৌহদ্দি উল্লেখ করা শেষ করবে তখন বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তার দাবিকৃত শুফ'আর 'সবব' কী? অর্থাৎ কিসের ভিত্তিতে সে শুফ'আ দাবি করছে? এ প্রশ্ন বিচারক এ জন্য করবেন যে, শুফ'আ লাভ করার 'সবব' বা কারণ তিন প্রকারের রয়েছে [যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে]। যথা– মূল সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব, মূল সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদারিত্ব ও প্রতিবেশীত্ব। আর প্রথম প্রকারের শফী'র বর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণির শফী' শুফ'আর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, আবার দ্বিতীয় শ্রেণির শফী'র বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণির শফী' বঞ্চিত হয়। কাজেই শফী' কি কারণে বা কিসের ভিত্তিতে শুফ'আর দাবি করছে তা বর্ণনা করা আবশ্যক, যাতে বিচারক বুঝতে পারেন যে, শফী' অন্য কারো বিদ্যমান থাকার কারণে শুফ'আর অধিকারী হবে কিনা। তাছাড়া এ জন্য আবশ্যক যে, অনেক সময় শুফ'আ লাভের যা যথার্থ কারণ নয় তাকেই শফী' শুফ'আর সঠিক কারণ হিসেবে গণ্য করে থাকতে পারে। যেমন বিক্রীত বাড়ির বিপরীত দিকে অবস্থিত অসংলগ্ন বাড়ির মালিক প্রতিবেশী হিসেবে শুফ'আর দাবি করে থাকতে পারে [এবং কাজী শুরাইহ-এর মতে এরূপ বাড়ির মালিকও শুফ'আর অধিকারী হয়], অথচ [আমাদের মতে] সে শুফ'আর অধিকারী হয় না। কাজেই শফী'কে তার শুফ'আ লাভের কারণ বর্ণনা করতে হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ أَنَا شَفِيْعُهَا بِدَارٍ لِيْ تُلَاصِقُهَا الْآنَ : শুফ'আর 'কারণ' বা ভিত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর শফী' যখন যথার্থ কারণের কথা উল্লেখ করবে তখন তার দাবি করা যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে। যথার্থ কারণের কথা শফী' এভাবে বলবে যে, আমি উক্ত বিক্রীত জমি বা বাড়ির শফী' – এর ভিত্তি বা কারণ হচ্ছে বিক্রীত জমি বা বাড়ির সাথে আমার বাড়ি সংলগ্ন বা সম্পৃক্ত অবস্থায় বর্তমানে রয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ دَعْوَاهُ عَلٰى مَا قَالَهُ الْخَصَّافُ رح: মুসান্নিফ (র.) বলেন, শফী' যখন উক্ত বিষয়গুলো বিচারকের নিকট তথা বিক্রীত জমির অবস্থান, তার চৌহদ্দি ও শুফ'আ লাভে 'কারণ' বা ভিত্তি উল্লেখ করবে তখন তার দাবি করা সম্পন্ন হয়ে যাবে– এটি হচ্ছে ইমাম খাস্‌সাফ (র.)-এর অভিমত। তাঁর মতে, শফী'র দাবি সম্পন্ন হওয়ার জন্য শফী'র নিজের জমি বা বাড়ির চৌহদ্দি উল্লেখ করার আবশ্যকতা নেই।

قَوْلُهُ وَذُكِرَ فِي الْفَتَاوِى تَحْدِيْدُ هٰذِهِ الدَّارِ الخ : পক্ষান্তরে 'আল ফাতাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাবি সম্পন্ন হওয়ার জন্য শফী'র নিজের বাড়িটির [অর্থাৎ যে বাড়িটির ভিত্তিতে সে শুফ'আর দাবি করছে সেটির] চতুঃসীমা বর্ণনা করাও আবশ্যক হবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ সম্পর্কে আমি 'আত্‌তাজনীস ওয়াল মাযীদ' নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য, এটি মুসান্নিফ (র.)-এর লিখিত ফতোয়ার একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শফী'কে তার নিজের বাড়ির চৌহদ্দি এবং বিক্রীত বাড়ির চৌহদ্দি উল্লেখ করতে হবে। নিম্নে উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত ইবারত তুলে ধরা হলো–

يَنْبَغِيْ أَنْ يَقُوْلَ وَأَنَا أَطْلُبُ الشُّفْعَةَ بِدَارٍ اِشْتَرَيْتُهَا مِنَ الَّتِيْ أَحَدُ حُدُوْدِهَا كَذَا وَالثَّانِيْ كَذَا وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ كَذَا . لِأَنَّ الدَّارَ إِنَّمَا تَصِيْرُ مَعْلُوْمَةً بِذِكْرِ الْحُدُوْدِ . وَبَيَّنَ حُدُوْدَ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ أَيْضًا لِأَنَّ الدَّعْوٰى إِنَّمَا تَصِحُّ بَعْدَ إِعْلَامِ الْمُدَّعٰى بِهٖ وَالْإِعْلَامُ بِذِكْرِ الْحُدُوْدِ.

উল্লেখ্য, শফী'র দাবি সম্পন্ন হওয়ার জন্য উপরে মুসান্নিফ (র.) যে কয়টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন ব্যাখ্যাকারগণ এর সাথে আরেকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে, শফী'কে বিচারক জিজ্ঞাসা করবেন, যখন তার নিকট জমি বিক্রয় সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছেছে তখন সে কিভাবে প্রথম দাবি [তাৎক্ষণিক দাবি] এবং দ্বিতীয় দাবি করেছিল? এক্ষেত্রে সে বিলম্ব করেছিল কিনা? কেননা এক্ষেত্রে বিলম্ব করে থাকলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই ক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে শফী'কে এ বিষয়েও বিচারক জিজ্ঞাসা করে নিবেন। আর সাহেবাইনের মতানুসারে দ্বিতীয় প্রকার দাবি করার পর মামলা দায়ের করতে কতটুকু বিলম্ব করেছে তাও জিজ্ঞাসা করবেন। কারণ সাহেবাইনের মতে দ্বিতীয় প্রকার দাবির পর অধিককাল বিলম্ব করলেও শুফ'আ বাতিল হয়ে যায় [যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ফতোয়াও সাহেবাইনের মতের উপর।]

قَالَ : فَإِنْ عَجِزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ اِسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِىْ بِاللّٰهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَالِكٌ لِلَّذِىْ ذَكَرَهُ مِمَّا يَشْفَعُ بِهِ مَعْنَاهُ بِطَلَبِ الشَّفِيْعِ . لِأَنَّهُ اِدَّعٰى عَلَيْهِ مَعْنًى لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ . ثُمَّ هُوَ اِسْتِحْلَافٌ عَلٰى مَا فِىْ يَدِ غَيْرِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি শফী' সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে অপারগ হয় তাহলে বিচারক ক্রেতার নিকট হতে এই মর্মে 'হলফ' গ্রহণ করবেন যে, বাদি যে সম্পত্তির ভিত্তিতে শুফ'আর হকদার হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে সে যে ঐ সম্পত্তির মালিক তা সে জানে না। এখানে উদ্দেশ্য হলো, শফী' আবেদন করলে [বিচারক এই হলফ গ্রহণ করবে।] [ক্রেতার নিকট হতে এই 'হলফ' গ্রহণ করার] কারণ হলো, শফী' ক্রেতার বিপরীতে এমন একটি বিষয় দাবি করছে যা ক্রেতা স্বীকার করলে তা মেনে নেওয়া ক্রেতার উপর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। আর এই 'হলফ' গ্রহণ হচ্ছে অন্যের দখলে থাকা বস্তু সম্পর্কে, কাজেই সে ক্রেতা জানা থাকার ব্যাপারেই কেবল 'হলফ' করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : فَإِنْ عَجِزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ اِسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِىْ الخ : পূর্বের মূল ইবারতে [মতনে] ইমাম কুদূরী (র.) বলেছিলেন যে, শফী' বিচারকের নিকট শুফ'আর দাবি করার পর বিচারক বিবাদী তথা জমির ক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করবেন, যে জমির ভিত্তিতে শফী' শুফ'আর দাবি করছে শফী' প্রকৃতপক্ষে সে জমির মালিক কিনা? যদি ক্রেতা তা অস্বীকার করে তাহলে বিচারক শফী'কে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে বলবেন যে, সে উক্ত জমির প্রকৃত মালিক।

আলোচ্য ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি শফী' তার নিজের জমির মালিকানার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে সক্ষম না হয় তাহলে বিচারক বিবাদী তথা জমির ক্রেতাকে 'হলফ' করাবেন। 'হলফ' করাবেন এভাবে যে, "আল্লাহর শপথ করে বলছি, বাদী যে জমির ভিত্তিতে শুফ'আর অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে সে যে উক্ত জমির মালিক তা আমি জানি না।"

قَوْلُهُ مَعْنَاهُ بِطَلَبِ الشَّفِيْعِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন যে, শফী' সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হলে বিচারক বিবাদী তথা ক্রেতাকে 'হলফ' করাবেন। তার এ কথার অর্থ হচ্ছে, যদি শফী' সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে বিচারকের নিকট ক্রেতাকে 'হলফ' করানোর আবেদন জানায় তাহলে বিচারক হলফ করাবেন। আর যদি শফী' 'হলফ' গ্রহণের আবেদন না জানায় তাহলে 'হলফ' গ্রহণ করা হবে না এবং মামলা এখানেই শেষ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اِدَّعٰى عَلَيْهِ مَعْنًى لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ : উক্ত মাসআলায় বিবাদী তথা ক্রেতার নিকট হতে 'হলফ' গ্রহণ করা হবে তার কারণ হচ্ছে, শফী' এক্ষেত্রে ক্রেতার উপর একটি হক [শুফ'আ] দাবি করছে এবং ক্রেতা তা স্বীকার করে নিলে ক্রেতার উপর উক্ত হক প্রদান করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। কাজেই সে অস্বীকার করতে হলে তাকে 'হলফ' [আল্লাহর নামে শপথ] করে অস্বীকার করতে হবে। কেননা মামলার ক্ষেত্রে যে অস্বীকারকারী হয় তার উপর 'হলফ' করা আবশ্যক হয়, যদি সে অস্বীকার করতে চায়।

قَوْلُهُ ثُمَّ هُوَ اِسْتِحْلَافٌ عَلَى مَا فِيْ يَدِ غَيْرِهٖ فَيَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ : আলোচ্য ইবারতটুকু বুঝার পূর্বে একটি বিষয় জানা থাকা আবশ্যক। তা হলো, 'হলফ' দুই প্রকার। যথা–

১. حَلَفٌ عَلَى الْبَتَّاتِ তথা 'নিশ্চিতভাবে হলফ করা' অর্থাৎ কোনো বিষয় হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে শপথ করে বলা। যেমন– আল্লাহর শপথ করে বলছি, এমন হয়েছে বা এমন হয়নি।"

২. حَلَفٌ عَلَى الْعِلْمِ তথা 'অবগত থাকা না থাকার উপর হলফ করা'। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে হলফকারী জানে কিংবা জানে না এ মর্মে শপথ করা। বাস্তবে বিষয়টি কিরূপ তা উল্লেখ না করা।

যদি হলফকারী তার নিজের কোনো কর্ম কিংবা নিজের দখলে থাকা কোনো বিষয়ে হলফ করে সেক্ষেত্রে তাকে প্রথম প্রকারের হলফ তথা حَلَفٌ عَلَى الْبَتَّاتِ ['নিশ্চিতভাবে হলফ'] করতে হয়। আর যদি হলফকারী অন্যের কোনো কাজ কিংবা অন্যের দখলে থাকা কোনো জিনিস সম্পর্কে হলফ করে তাহলে তাকে দ্বিতীয় প্রকার হলফ তথা حَلَفٌ عَلَى الْعِلْمِ ['অবগত থাকা না থাকার উপর হলফ'] করতে হয়।

আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে বর্ণিত মাসআলায় ক্রেতা যে হলফ করবে তা যেহেতু তার নিজের দখলে থাকা জিনিস নয়; বরং তা শফী'র দখলে থাকা সম্পত্তি সম্পর্কে কাজেই সে দ্বিতীয় প্রকারের 'হলফ' তথা حَلَفٌ عَلَى الْعِلْمِ ['জানা সম্বন্ধে হলফ'] করবে। এ জন্যই ইমাম কুদূরী (র.) 'মতনে' এভাবে হলফ করার কথাই উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, জখীরা (اَلذَّخِيْرَةُ) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ মাসআলায় ক্রেতা যে حَلَفٌ عَلَى الْعِلْمِ ['জানা সম্বন্ধে হলফ'] করবে, এটি হচ্ছে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এক্ষেত্রে ক্রেতা প্রথম প্রকারের 'হলফ' তথা حَلَفٌ عَلَى الْبَتَّاتِ ['নিশ্চিতরূপে হলফ'] করবে। অর্থাৎ সে এভাবে বলবে যে, আল্লাহর শপথ শফী' উক্ত সম্পত্তির মালিক নয়।

উল্লেখ্য, উপরে আমরা হলফ'-এর যে দুই প্রকারের বর্ণনা দিয়ে যে বিধান উল্লেখ করেছি অর্থাৎ হলফকারী নিজের কর্ম কিংবা নিজের দখলে থাকা বিষয়ে হলফ করলে حَلَفٌ عَلَى الْبَتَّاتِ ['নিশ্চিতরূপে হলফ'] করবে আর অন্যের কর্ম বা অন্যের দখলে থাকা বিষয়ে হলফ করলে حَلَفٌ عَلَى الْعِلْمِ '[জানা সম্বন্ধে হলফ'] করবে। এ বিষয়ের মূল দলিল হচ্ছে قَسَامَةٌ সংক্রান্ত নবী ﷺ -এর হাদীস– যা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ ইহুদিদেরকে বলেছিলেন– فَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُوْنَ رَجُلًا خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا بِاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا "তাহলে তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশ ব্যক্তি পঞ্চাশটি হলফ করে বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং তার কোনো হত্যাকারীকে আমরা জানিও না।" এ হাদীস থেকে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, হলফকারী নিজের কর্মের কথা উল্লেখ করার সময় সরাসরি করা বা না করার কথা বলবে আর অন্যের কর্মের ক্ষেত্রে তার জানা থাকা বা না থাকার কথা বলবে।

فَإِنْ نَكَلَ أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيْعِ بَيِّنَةٌ ثَبَتَ مِلْكُهُ فِى الدَّارِ الَّتِى يَشْفَعُ بِهَا وَثَبَتَ الْجِوَارُ. فَبَعْدَ ذٰلِكَ سَأَلَهُ الْقَاضِىْ يَعْنِى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ هَلْ إِبْتَاعَ أَمْ لَا؟ فَإِنْ أَنْكَرَ الْاِبْتِيَاعَ قِيْلَ لِلشَّفِيْعِ : أَقِمِ الْبَيِّنَةَ، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوْتِ الْبَيْعِ، وَثُبُوْتُهُ بِالْحُجَّةِ.

অনুবাদ : যদি ক্রেতা 'হলফ' করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে কিংবা শফী'র পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে যে বাড়িটির ভিত্তিতে সে শুফ'আর দাবি করছে সে বাড়িটিতে তার মালিকানা প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং তার জমি [বিক্রীত জমির] সংলগ্ন হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এরপর বিচারক তাকে অর্থাৎ বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে সম্পত্তিটি ক্রয় করেছে কিনা। যদি সে ক্রয় করার কথা অস্বীকার করে তাহলে শফী'কে বলা হবে, তুমি সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন কর। কেননা বিক্রয় হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া ব্যতীত শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। আর এটি প্রমাণিত হবে দলিল প্রমাণের মাধ্যমেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيْعِ بَيِّنَةٌ : পূর্বের মূল ইবারতে বলা হয়েছিল, শফী' নিজের জমির মালিকানার ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হলে ক্রেতার নিকট হতে বিচারক 'হলফ' গ্রহণ করবেন। আলোচ্য ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি উক্ত 'হলফ' করতে ক্রেতা অস্বীকৃতি জানায় কিংবা শফী' যদি তার জমির মালিকানার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয়ে যায় তাহলে বিচারকের নিকট যে জমির ভিত্তিতে শফী' শুফ'আর দাবি করছে সে জমির মালিক যে শফী' তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং বিক্রীত সম্পত্তির সাথে শফী'র সম্পত্তি সংলগ্ন হওয়ার বিষয়টি, যা শুফ'আর অধিকার লাভের 'সবব' সাব্যস্ত হবে। কাজেই মামলা পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হবে। সুতরাং বিচারক এবার বিবাদী তথা ক্রেতাকে জমিটি ক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে জমিটি ক্রয় করেছে কিনা? যদি ক্রেতা জমি বা বাড়ি ক্রয় করার কথা অস্বীকার করে তাহলে বিচারক শফী'কে বলবেন, তুমি বিবাদী যে জমিটি ক্রয় করেছে– এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ কর। মামলা পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য তখন শফী'কে বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوْتِ الْبَيْعِ، وَثُبُوْتُهُ بِالْحُجَّةِ : এক্ষেত্রে শফী'র জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক হওয়ার কারণ হলো, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে জমির বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া। অর্থাৎ জমি বিক্রয় হওয়ার পরেই কেবল শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং বিক্রয় হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। আর বিক্রয় সাব্যস্ত হবে কেবল দলিল প্রমাণের মাধ্যমে। দলিল প্রমাণ এক্ষেত্রে কেবল দু'টির যে কোনো একটিই হতে পারে। তা হচ্ছে, বিবাদী তথা ক্রেতা জমিটি কিংবা বাড়িটি ক্রয় করেছে বলে স্বীকার করে নেওয়া কিংবা শফী'র পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তা প্রমাণিত করা। কাজেই বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এ দু'টির যে কোনো একটি হওয়া অপরিহার্য হবে।

قَالَ : فَإِنْ عَجِزَ عَنْهَا اِسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِىْ بِاللّٰهِ مَا ابْتَاعَ أَوْ بِاللّٰهِ مَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ فِىْ هٰذِهِ الدَّارِ شُفْعَةً مِنَ الْوَجْهِ الَّذِىْ ذَكَرَهُ، فَهٰذَا عَلَى الْحَاصِلِ وَالْأَوَّلُ عَلَى السَّبَبِ، وَقَدْ اِسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِيْهِ فِى الدَّعْوٰى . وَذَكَرْنَا الْاِخْتِلَافَ بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ . وَإِنَّمَا يَحْلِفُهُ عَلَى الْبَتَّاتِ، لِأَنَّهُ اِسْتِحْلَافٌ عَلٰى فِعْلِ نَفْسِهِ . وَعَلٰى مَا فِىْ يَدِهِ إِصَالَةً، وَفِىْ مِثْلِهِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَّاتِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি শফী' সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয় তাহলে বিচারক ক্রেতার নিকট হতে এভাবে 'হলফ' গ্রহণ করবেন যে, আল্লাহর শপথ! সে বাড়িটি ক্রয় করেনি। অথবা আল্লাহর শপথ! বাদী যে ভিত্তিতে এই বাড়ির শুফ'আর কথা উল্লেখ করেছে সেই ভিত্তিতে সে এই বাড়িতে কোনো প্রকার শুফ'আর হকদার নয়। এই [অথবা বলে উল্লেখকৃত] শপথটি হলো [দাবির] সারকথার ব্যাপারে হলফ করা, আর প্রথমটি হলো 'সবব' বা কারণের ব্যাপারে শপথ। আল্লাহর অনুগ্রহে এ সম্পর্কে আমরা "দাবি অধ্যায়"-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি এবং [ইমামগণের] মতবিরোধ নিয়েও আলোচনা করেছি। আর [আলোচ্য সুরতে] ক্রেতার নিকট হতে এ জন্যই অকাট্যভাবে 'হলফ' গ্রহণ করা হচ্ছে যে, এখানে হলফ গ্রহণ হচ্ছে ক্রেতার নিজের কাজের সম্পর্কে এবং মৌলিকভাবেই যা তার দখলে আছে সে সম্পর্কে। এরূপ বিষয়ের ক্ষেত্রে অকাট্যভাবেই হলফ গ্রহণ করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ عَجِزَ عَنْهَا اِسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِىْ الخ : পূর্বের মূল ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.) উল্লেখ করেছিলেন যে, ক্রেতা যদি বাড়িটি ক্রয় করার কথা অস্বীকার করে তাহলে বিচারক শফী'কে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে বলবেন। আর আলোচ্য ইবারতে তিনি বলেন, যদি শফী' 'ক্রেতা বাড়িটি ক্রয় করেছে' এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম না হয় তাহলে বিচারক ক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি ক্রয় না করার ব্যাপারে 'হলফ' গ্রহণ করবেন। ক্রেতা এক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতির যে কোনো এক পদ্ধতিতে 'হলফ' করবে। প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে, ক্রেতা বলবে, আল্লাহর শপথ! আমি উক্ত বাড়িটি ক্রয় করিনি। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, ক্রেতা বলবে, 'আল্লাহর শপথ! বাদী যে কারণে উক্ত বাড়িতে শুফ'আর অধিকারী হওয়ার কথা দাবি করেছে সে কারণে আমার উপর সে শুফ'আর অধিকারী নয়।

قَوْلُهُ فَهٰذَا عَلَى الْحَاصِلِ وَالْأَوَّلُ عَلَى السَّبَبِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে দুইভাবে 'হলফ' করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ তথা 'ফলাফলের ব্যাপারে হলফ' অর্থাৎ কোনো কারণ সংঘটিত হলে তার যে ফলাফল বা বিধান বর্তমানে রয়েছে সে ব্যাপারে হলফ করা (اِسْتِحْلَافٌ عَلٰى حُكْمِ الشَّيْءِ فِى الْحَالِ)। এখানে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সরাসরি ক্রয়ের কথা অস্বীকার না করে ক্রয় করলে যে বিধান হতো [অর্থাৎ শুফ'আর অধিকার] তা বর্তমানে থাকার কথা হলফ করে অস্বীকার করছে। কাজেই এটি حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ তথা 'ফলাফল বা বিধানের ব্যাপারে হলফ।'

আর প্রথম পদ্ধতির হলফ তথা "আল্লাহর শপথ আমি বাড়িটি ক্রয় করিনি"–এটি হচ্ছে حَلَفٌ عَلَى السَّبَبِ তথা 'সবব বা কারণের উপর হলফ।' অর্থাৎ বিধান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যে বিষয়টি কারণ বা 'সবব' তা সংঘটিত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে হলফ। এখানে ক্রেতার ক্রয় করা হচ্ছে শফী'র শুফ'আ লাভের কারণ বা 'সবব'। আর ক্রেতা হলফ করে সেই কারণ বা 'সবব' সংঘটিত হওয়া অস্বীকার করেছে। কাজেই এটি حَلَفٌ عَلَى السَّبَبِ তথা 'সবব বা কারণের ব্যাপারে হলফ।'

قَوْلُهُ : وَقَدْ اِسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِيْهِ فِي الدَّعْوٰى وَذَكَرْنَا الْاِخْتِلَافَ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে হলফের যে দুই প্রকারের বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্য হতে বিবাদী কোন প্রকারের হলফ কোন ক্ষেত্রে করবে– তা আমাদের ইমামগণের মতবিরোধসহ বিস্তারিতভাবে আমি ইতোপূর্বে كِتَابُ الدَّعْوٰى "দাবি অধ্যায়"-এ আলোচনা করেছি।

উল্লেখ্য, উক্ত আলোচনা হিদায়া তৃতীয় খণ্ডে كِتَابُ الدَّعْوٰى -এর অধীনে فَصْلٌ فِيْ كَيْفِيَّةِ الْيَمِيْنِ وَالْاِسْتِحْلَافِ 'শপথ করা ও হলফ গ্রহণের পদ্ধতির পরিচ্ছেদ'-এর শেষের দিকে ১৯২ নং পৃষ্ঠায় করা হয়েছে। সেখানে মুসান্নিফ (র.) যা উল্লেখ করেছেন তার সারকথা হচ্ছে, বিবাদী 'ফলাফল বা বিধানের উপর হলফ' (حَلَفٌ عَلَى الْحَاصِلِ) করবে, নাকি 'সবব বা কারণের উপর হলফ' (حَلَفٌ عَلَى السَّبَبِ) করবে? এ ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দু'টি সুরতে কেবল 'সবব বা কারণের উপর হলফ' করবে। তাছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে 'ফলাফলের উপর হলফ' (حَلَفٌ عَلَى الْحَاصِلِ) করবে। যেমন বাদী যদি দাবি করে যে, সে বিবাদীর নিকট হতে তার গোলাম ক্রয় করেছে আর বিবাদী তা অস্বীকার করে তাহলে বিবাদী এভাবে হলফ করবে যে, "আমাদের মাঝে বর্তমানে গোলামটির কোনো ক্রয় বিক্রয় বহাল নেই।" বিবাদীর নিকট হতে এভাবে হলফ গ্রহণ করা হবে না যে, "আমি গোলামটি বিক্রয় করিনি।" কেননা 'সবব বা কারণের উপর হলফ' করানো হলে বিবাদী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ এ মাসআলায় এমন হতে পারে যে, বিবাদী গোলামটি বিক্রয় করেছিল, কিন্তু পরে তারা পরস্পরে বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কাজেই যদি তাকে 'সবব' তথা বিক্রয় অস্বীকার করতে হলফ করার জন্য বাধ্য করা হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে 'সবব বা কারণের উপর হলফ' (حَلَفٌ عَلَى السَّبَبِ) করবে। তবে যদি বিবাদী 'সবব' বা কারণ সংঘটিত হওয়ার পর তা আবার দূরীভূত হওয়ার কথা জানায় তাহলে 'ফলাফলের উপর হলফ' গ্রহণ করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতেও [তথা সকলের ঐকমত্যে] যে দু'টি সুরতে 'সবব বা কারণের উপর হলফ' গ্রহণ করা হবে তা হচ্ছে– ক. যদি 'ফলাফলের উপর হলফ' করার ফলে বাদীর কল্যাণের দিক বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। যেমন বাদী যদি প্রতিবেশীত্বের ভিত্তিতে শুফ'আর দাবিদার হয় আর বিবাদী এমন ব্যক্তি হয়, যে প্রতিবেশীত্বের ভিত্তিতে শুফ'আর অধিকারী হওয়ার মতের অনুসারী নয় [যেমন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী]। এক্ষেত্রে যদি 'ফলাফলের উপর হলফ' করে বিবাদী এভাবে বলে যে, "বাদী শুফ'আর অধিকারী নয়" তাহলে বিবাদী হলফে সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও বাদী তার প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত হবে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যে 'সবব বা কারণের উপর হলফ' করে বলবে 'আমি ক্রয় করিনি'।

খ. যদি 'সবব' বা কারণ এমন বিষয় হয় যা একবার সংঘটিত হয়ে আবার দূরীভূত হয়ে গেছে এরূপ সম্ভাবনা রাখে না তাহলে সেক্ষেত্রেও সকলের ঐকমত্যে 'সবব বা কারণের উপর হলফ' গ্রহণ করা হবে। যেমন– মুসলিম গোলাম যদি দাবি করে যে তার মনিব তাকে আজাদ করে দিয়েছে আর মনিব তা অস্বীকার করে তাহলে মনিব 'সবব' তথা আজাদ করার বিষয়টি সরাসরি হলফ করে অস্বীকার করবে। কেননা আজাদ একবার করার পর মনিব তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে– এরূপ সম্ভাবনা নেই। কাজেই এ ক্ষেত্রে তার নিকট হতে সরাসরি 'সবব' সংঘটিত না হওয়ার উপর হলফ গ্রহণ করা হবে।

বিষয়টি পূর্ণরূপে অনুধাবনের জন্য মুসান্নিফ (র.)-এর ইবারত নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

وَفِى دَعْوَى الطَّلَاقِ، بِاللّٰهِ مَا هِىَ بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَةَ بِمَا ذَكَرَتْ ـ وَلَا يَسْتَحْلِفُ بِاللّٰهِ مَا طَلَّقَهَا ـ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُجَدَّدُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ ـ فَيَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِىْ هٰذِهِ الْوُجُوْهِ (اَىْ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ وَالَّتِىْ قَبْلَهَا) لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى السَّبَبِ يَتَضَرَّرُ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ ـ وَهٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) أَمَّا عَلَى قَوْلِ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) يَحْلِفُ فِىْ جَمِيْعِ مَا ذُكِرَ عَلَى السَّبَبِ إِلَّا إِذَا عَرَضَ الْمُدَّعِىْ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَا، فَحِيْنَئِذٍ يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ ـ وَقِيْلَ يَنْظُرُ إِلٰى إِنْكَارِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ، إِنْ أَنْكَرَ السَّبَبَ يَحْلِفُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْحُكْمَ يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ ـ فَالْحَاصِلُ هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُمَا، إِذَا كَانَ سَبَبًا يَرْتَفِعُ بِرَافِعٍ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيْهِ تَرْكُ النَّظَرِ فِىْ جَانِبِ الْمُدَّعِىْ ـ فَحِيْنَئِذٍ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجْمَاعِ ـ وَذٰلِكَ مِثْلُ أَنْ تَدَّعِىَ مَبْتُوْتَةٌ نَفَقَةَ الْعِدَّةِ وَالزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يَرَاهَا أَوْ اِدَّعٰى شُفْعَةً بِالْجِوَارِ وَالْمُشْتَرِىْ لَا يَرَاهَا ـ لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ يُصَدَّقُ فِىْ يَمِيْنِهِ فِىْ مُعْتَقِدِهِ فَيَفُوْتُ النَّظَرُ فِىْ حَقِّ الْمُدَّعِىْ ـ

وَإِنْ كَانَ سَبَبًا لَا يَرْتَفِعُ بِرَافِعٍ فَالتَّحْلِيْفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجْمَاعِ، كَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إِذَا ادَّعَى الْعِتْقَ عَلٰى مَوْلَاهُ ـ

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَحْلِفُهُ عَلَى الْبَتَاتِ لِأَنَّهُ اِسْتِحْلَافٌ عَلٰى فِعْلِ نَفْسِهِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে [মূল ইবারতে] বর্ণিত মাসআলায় ক্রেতার যে হলফ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে 'নিশ্চিতরূপে হলফ' (حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ) করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্রেতা 'নিশ্চিতরূপে ক্রয় না করার ব্যাপারে হলফ করবে, শুধু জানা না থাকার ব্যাপারে হলফ (حَلَفَ عَلَى الْعِلْمِ) করবে না। এর কারণ হচ্ছে, ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, যদি হলফকারী নিজের কোনো কর্ম কিংবা নিজের দখলে থাকা কোনো জিনিসের ব্যাপারে হলফ করে তাহলে তার নিকট হতে 'নিশ্চিতরূপে হলফ' (حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ) গ্রহণ করা হয়। আর যদি হলফকারী অন্যের কোনো কর্ম বা অন্যের দখলে থাকা কোনো বস্তুর ব্যাপারে হলফ করে তাহলে তার কাছ থেকে কেবল 'জানা থাকার ব্যাপারে হলফ' (حَلَفَ عَلَى الْعِلْمِ) গ্রহণ করা হয়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু ক্রেতার নিকট হতে তার নিজের কর্ম তথা বাড়িটি ক্রয় করা সম্পর্কে হলফ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তার মালিকানা হিসেবে নিজের দখলে থাকার ব্যাপারে হলফ গ্রহণ করা হচ্ছে, সেহেতু সে নিশ্চিতরূপেই হলফ করে বলবে, "আমি বাড়িটি ক্রয় করিনি।" এক্ষেত্রে এরূপ হলফ গৃহীত হবে না যে, "আমি বাড়িটি ক্রয় করা সম্পর্কে জানি না।"

قَالَ : وَتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِى الشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِى . فَإِذَا قَضَى الْقَاضِى بِالشُّفْعَةِ لَزِمَهُ إِحْضَارُ الثَّمَنِ . وَهٰذَا ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) أَنَّهُ لَا يَقْضِى حَتَّى يُحْضِرَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ . وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ (رحـ) لِأَنَّ الشَّفِيعَ عَسَاهُ يَكُونُ مُفْلِسًا ، فَيَتَوَقَّفُ الْقَضَاءُ عَلَى إِحْضَارِهِ حَتَّى لَا يَتْوِىَ مَالُ الْمُشْتَرِى . وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا ثَمَنَ لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَلِهٰذَا لَا يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُهُ ، فَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ إِحْضَارُهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শফী' বিচারকের এজলাসে মূল্য উপস্থিত না করলেও শুফ'আর মামলা চলতে পারবে। কিন্তু বিচারক যখন রায় প্রদান করবেন তখন শফী'র মূল্য উপস্থিত করা আবশ্যক হবে। এটি হচ্ছে 'আসল' তথা মাবসূত গ্রন্থের বাহ্যিক রেওয়ায়েত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, শফী' মূল্য উপস্থিত করার পূর্বে বিচারক [শুফ'আর] রায় প্রদান করবেন না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান ইবনে যিয়াদেরও বর্ণনা। কারণ হলো, শফী' দেওলিয়াও হতে পারে। কাজেই তার মূল্য উপস্থিত করার উপর বিচারকের রায় প্রদান নির্ভরশীল হয়ে থাকবে, যাতে ক্রেতার সম্পদ বিফলে না যেতে পারে। জাহিরী রেওয়ায়েতের দলিল হলো, রায়ের পূর্বে শফী'র নিকট ক্রেতার কোনো মূল্য পাওনা সাব্যস্ত হয়নি। এ কারণেই তো [কারো মতেই রায়ের পূর্বে] শফী'র জন্য মূল্য হস্তান্তর করা আবশ্যক নয়। সুতরাং তা উপস্থিত করাও আবশ্যক হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِى الشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ الخ : মাসআলা হচ্ছে, শফী' যে বাড়ির শুফ'আর দাবি করছে সে বাড়ির মূল্য যদি বিচারকের এজলাসে উপস্থিত না করে তবু শুফ'আর মামলা চলতে পারবে। অর্থাৎ মামলার কার্যক্রম অগ্রসর হওয়ার জন্য শফী'র মূল্য উপস্থিত করা আবশ্যক নয়। তবে বিচারক যখন শফী'র পক্ষে শুফ'আ লাভ করার রায় প্রদান করবেন তখন মূল্য উপস্থিত করা শফী'র জন্য আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَقْضِى : উপরে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল্য উপস্থিত না করলে মামলা চলতে পারবে। এটি হচ্ছে বাহ্যত জাহিরী রেওয়ায়েত তথা ইমাম মুহাম্মদ (র.) লিখিত 'আল্ আসল' [মাবসূত] গ্রন্থের বাহ্যিক রেওয়ায়েত(ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ)। মুসান্নিফ (র.) এটি 'আসল' বা মাবসূত গ্রন্থের বাহ্যিক রেওয়ায়েত এজন্য বলেছেন যে, মাবসূত গ্রন্থে বিধানটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে মাবসূত গ্রন্থের ইবারত থেকে বিধানটি বুঝা যায়। মাবসূতে উল্লেখ করা হয়েছে– لِلْمُشْتَرِى أَنْ يَحْبِسَ الدَّارَ حَتَّى يَسْتَوْفِىَ الثَّمَنَ مِنْهُ أَوْ مِنْ وَرَثَتِهِ إِنْ مَاتَ "ক্রেতা [শুফ'আর রায়ের পর] বাড়িটি আটক রাখতে পারবে, শফী'র নিকট হতে কিংবা শফী' মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীদের হতে মূল্য আদায় করা পর্যন্ত।" এখান থেকে বুঝা যায় যে, মূল্য উপস্থিত না করলেও মামলা চলতে পারে। কেননা যদি মামলা চালানোর জন্য মূল্য পূর্বেই উপস্থিত করা আবশ্যক হতো তাহলে রায়ের পরে মূল্য আদায় হওয়া পর্যন্ত বাড়িটি আটক রাখতে পারবে –এ কথার কোনো অর্থ নেই।

সারকথা, জাহিরী রেওয়ায়েত মোতাবেক বিধান হচ্ছে, শফী' মূল্য উপস্থিত না করলেও মামলা চলতে পারবে। পক্ষান্তরে জাহিরী রেওয়ায়েতের বাইরে তথা নাওয়াদের রেওয়ায়েতে ইমাম মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার মতে শফী' বাড়ির মূল্য উপস্থিত না করা পর্যন্ত শুফ'আর রায় প্রদান করা হবে না। এ মতটি নাওয়াদের রেওয়ায়েতে হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর থেকেও বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর মতেও শফী' মূল্য উপস্থিত না করলেও মামলা চলতে পারবে এবং রায় হতে পারবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শফী'কে রায়ের পর তিন দিন সময় দেওয়া হবে, যদি তিন দিনের মধ্যে সে মূল্য উপস্থিত না করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার রহিত করে দেওয়া হবে। আর ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর মতে, একদিন কিংবা দুই দিন সময় প্রদান করা হবে, এরপর তার অধিকার রহিত করা হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّفِيْعَ عَسَاهُ يَكُوْنُ مُفْلِسًا الخ : নাওয়াদের রেওয়ায়েতে যে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত বর্ণনা করা হয়েছে, তার দলিল হচ্ছে, মামলা পরিচালনার পূর্বে শফী'র বিচারকের নিকট মূল্য উপস্থিত করা এজন্য আবশ্যক যে, শফী' অনেক ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে থাকতে পারে। যদি শফী' দেউলিয় হয়ে থাকে তাহলে বিবাদী তথা ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা ক্রেতা তখন শফী'র নিকট হতে বাড়ির মূল্য আদায় করতে সক্ষম হবে না, অথচ বাড়ির রায় হয়ে যাবে শফী'র পক্ষে। ফলে ক্রেতা তার সম্পদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তা অযথা বিনষ্ট হবে। এটা হতে দেওয়া যাবে না। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন– لَا تَوَى عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ "কোনো মুসলমানের সম্পদ অযথা বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবে না।" সুতরাং শুফ'আর রায় শফী'র মূল্য উপস্থিত করার উপর স্থগিত থাকবে।

قَوْلُهُ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا ثَمَنَ لَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ الخ : এখান থেকে জাহিরী রেওয়ায়েতের দলিল বর্ণনা করছেন। [উল্লেখ্য, জাহিরী রেওয়ায়েতে যেহেতু কোন মতবিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়নি সেহেতু জাহিরী রেওয়ায়েত অনুসারে এটি আমাদের ইমামগণের সকলের অভিমত]। জাহিরী রেওয়ায়েতের দলিল হলো, শুফ'আর রায় হওয়ার পূর্বে শফী'র নিকট বিবাদী তথা ক্রেতার কোনো মূল্য সাব্যস্ত হচ্ছে না। কাজেই যা এখনো পাওনা হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি তা উপস্থিত করার জন্য বাধ্যও করা যাবে না। পাওনা সাব্যস্ত হবে রায়ের পর, সুতরাং মূল্য উপস্থিত করতে বাধ্যও হবে রায়ের পরে। যেহেতু রায় হওয়ার পূর্বে শফী'র উপর কোনো মূল্য সাব্যস্ত হয় না সে কারণেই রায়ের পূর্বে শফী'র মূল্য হস্তান্তর করা কারো মতে আবশ্যক হয় না। কাজেই উপস্থিত করাও আবশ্যক হবে না। [উল্লেখ্য, আমাদের দেশে বর্তমান প্রচলিত আইনে পূর্বেই মূল্য জমা দেওয়া আবশ্যক।]

টীকা : ১. জাহিরী রেওয়ায়েত বলা হয়, ঐ সকল রেওয়ায়েতকে যা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর লিখিত প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের কোনো একটিতে বর্ণিত হয়েছে। এই ছয়টি গ্রন্থ হচ্ছে– ১. اَلْمَبْسُوْطُ 'মাবসূত', এই গ্রন্থটিকে 'আসল'ও (اَلْاَصْلُ) বলা হয়। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) মাবসূতকে সর্বদা اَلْاَصْلُ বলেই উল্লেখ করেন। ২. اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ [জামি' সগীর] ৩. اَلْجَامِعُ الْكَبِيْرُ [জামিউল কাবীর] ৪. اَلسِّيَرُ الصَّغِيْرُ [সিয়ারে সগীর] ৫. اَلسِّيَرُ الْكَبِيْرُ [সিয়ারে কাবীর] ৬. اَلزِّيَادَاتُ [যিয়াদাত]। এ সকল গ্রন্থের রেওয়ায়েতকে জাহিরী রেওয়ায়েত বলার কারণ হচ্ছে, জাহিরী اَلظَّاهِرُ -এর অর্থ হচ্ছে স্পষ্ট, প্রকাশ্য। যেহেতু এই ছয়টি গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে স্পষ্ট সনদে তথা মশহুর কিংবা 'মুতাওয়াতির' সনদে বর্ণিত হয়েছে তাই এগুলোর রেওয়ায়েতকে জাহিরী রেওয়ায়েত (ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ) বলা হয়।

২ 'নাওয়াদির রেওয়ায়েত' বলা হয়, ঐ সকল রেওয়ায়েতকে যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত উক্ত ছয়টি গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি; বরং ইমাম মুহাম্মদ (র.) লিখিত অন্য কোনো গ্রন্থে কিংবা ইমাম মুহাম্মদ (র.) ব্যতীত অন্য কারো রচিত গ্রন্থে যেমন ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ রচিত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল রেওয়ায়েতকে নাওয়াদির রেওয়ায়েত (رِوَايَةُ النَّوَادِرِ) বলার কারণ হচ্ছে, নাওয়াদির অর্থ হচ্ছে বিরল, অপ্রসিদ্ধ। যেহেতু এ সকল গ্রন্থের রেওয়ায়েত প্রসিদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়নি তাই এগুলোকে নাওয়াদির রেওয়ায়েত (رِوَايَةُ النَّوَادِرِ) বলা হয়। উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) সাধারণত وَعَنْ... বলে নাওয়াদির রেওয়ায়েতের কথা বর্ণনা করেন। যেমন– وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ... "আর মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত আছে..." এর অর্থ হচ্ছে নাওয়াদির-এর রেওয়ায়েতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে....।

وَإِذَا قَضَى لَهُ بِالدَّارِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ . وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ أَيْضًا . لِأَنَّهُ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ . وَوَجَبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فَيُحْبَسُ فِيهِ . فَلَوْ أَخَّرَ أَدَاءَ الثَّمَنِ بَعْدَ مَا قَالَ لَهُ ادْفَعِ الثَّمَنَ إِلَيْهِ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ . لِأَنَّهَا تَأَكَّدَتْ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْقَاضِي .

অনুবাদ : যখন শফী'র অনুকূলে বাড়িটির রায় হয়ে যাবে তখন ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে মূল্য সম্পূর্ণ আদায় করা পর্যন্ত বাড়িটি নিজের কাছে আটকে রাখার। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতেও [মূল্য উপস্থিত না করা সত্ত্বেও বিচারক রায় দিলে সে] রায় কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা বিধানটি ইজতিহাদ-নির্ভর। আর শফী'র উপর মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়েছে। কাজেই এই মূল্যের জন্য বিক্রীত বাড়িটি আটক রাখতে পারবে। আর বিচারক শফী'কে "তুমি ক্রেতার নিকট মূল্য হস্তান্তর করে দাও" এ কথা বলার পরে শফী' যদি তা পরিশোধ করতে বিলম্ব করে তাহলেও তার শুফ'আ বাতিল হবে না। কেননা বিচারকের নিকট মামলার মাধ্যমে তা দৃঢ় হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قُضِيَ لَهُ بِالدَّارِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَهَا الخ : মাসআলা হচ্ছে, যখন শফী'র পক্ষে বিক্রীত বাড়িতে শুফ'আর রায় হয়ে যাবে তখন বিবাদী তথা ক্রেতা ইচ্ছা করলে বাড়িটি আটকে রাখতে পারবে শফী' সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত।

قَوْلُهُ وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ أَيْضًا لِأَنَّهُ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শফী' বিচারকের এজলাসে মূল্য উপস্থিত না করা পর্যন্ত বিচারক রায় প্রদান করবেন না। আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বলেন, কিন্তু শফী' মূল্য উপস্থিত না করা সত্ত্বেও যদি বিচারক শুফ'আর রায় প্রদান করেন তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতেও রায় কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা মূল্য উপস্থিত না করলে রায় প্রদান জায়েজ হবে কিনা এটি একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা; সুতরাং বিচারক কোনো একটি মত অবলম্বন করে রায় প্রদান করলে তার রায় বৈধ বলে গণ্য হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فَيُحْبَسُ فِيهِ : শুফ'আর রায় হওয়ার পর শফী' বাড়িটির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিবাদী তথা ক্রেতা বাড়িটি আটকে রাখতে পারবে– এর কারণ হচ্ছে, রায় প্রদানের পর শফী'র উপর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়েছে। কাজেই মূল্য আদায়ের জন্য বাড়ি আটকে রাখার অধিকার বিবাদী তথা ক্রেতার থাকবে। যেমন ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিক্রেতা তার বিক্রীত দ্রব্য আটকে রাখতে পারে।

قَوْلُهُ فَلَوْ أَخَّرَ أَدَاءَ الثَّمَنِ بَعْدَ مَا قَالَ لَهُ ادْفَعِ الثَّمَنَ إِلَيْهِ : মাসআলা হচ্ছে, যদি শফী'কে বিচারক মূল্য পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়ার পর শফী' তা পরিশোধ করতে বিলম্ব করে তাহলে শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। যেমন শফী' বলল, 'আমার নিকট মূল্য পরিশোধ করার মতো টাকা নেই' কিংবা 'আমি আগামী দিন বা আগামী অমুক তারিখে পরিশোধ করব' বিচারকের রায়ের পরে শফী' এরূপ বিলম্ব করলে সকলের ঐকমত্যে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে বিচারকের রায়ের পূর্বে বিচারক যদি শফী'কে মূল্য উপস্থিত করতে বলে এবং শফী' এভাবে বিলম্বের কথা বলে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। –[দ্র. ফতোয়ায়ে শামী]

قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَأَكَّدَتْ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْقَاضِي : শুফ'আর রায়ের পর মূল্য পরিশোধে শফী' বিলম্ব করলে শুফ'আ বাতিল না হওয়ার কারণ হচ্ছে, বিচারকের নিকট মামলা করে রায় প্রাপ্তির মাধ্যমে শুফ'আর অধিকার সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন তা আর বাতিল হবে না।

قَالَ : وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيْعُ الْبَائِعَ وَالْمَبِيْعُ فِيْ يَدِهٖ فَلَهٗ أَنْ يُخَاصِمَهٗ فِي الشُّفْعَةِ. لِأَنَّ الْيَدَ لَهٗ، وَهِيَ يَدٌ مُسْتَحِقَّةٌ. وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِيْ الْبَيِّنَةَ حَتّٰى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِيْ، فَيُفْسِخُ الْبَيْعَ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ، وَيَقْضِيْ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ، وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ. لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِيْ وَالْيَدُ لِلْبَائِعِ وَالْقَاضِيْ يَقْضِيْ بِهِمَا لِلشَّفِيْعِ، فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُوْرِهِمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الدَّارُ قَدْ قُبِضَتْ. حَيْثُ لَا يُعْتَبَرُ حُضُوْرُ الْبَائِعِ. لِأَنَّهٗ صَارَ أَجْنَبِيًّا، إِذْ لَا يَبْقٰى لَهٗ يَدٌ وَلَا مِلْكٌ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি শফী' বিক্রেতাকে উপস্থিত করে এবং বিক্রীত সম্পত্তি তারই দখলে থাকে তাহলে শফী' বিক্রেতাকেই বিবাদী বানিয়ে আর্জি পেশ করতে পারবে। কেননা, দখলদারিত্ব তারই রয়েছে এবং এই দখল অধিকারভুক্ত দখল। তবে এক্ষেত্রে বিচারক ক্রেতা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণ শুনবেন না। ক্রেতা উপস্থিত হলে তার উপস্থিতিতে বিচারক বিক্রয় চুক্তি বাতিল করে দেবেন। আর শুফ'আর রায় দেবেন বিক্রেতার বিপক্ষে এবং দায়দায়িত্ব বিক্রেতার উপরই নির্ধারণ করে দেবেন। কেননা [সম্পত্তির] মালিকানা হচ্ছে ক্রেতার এবং দখলদারিত্ব হচ্ছে বিক্রেতার। আর বিচারক উভয়টির রায় দেবেন শফী'র পক্ষে। কাজেই উভয়ের উপস্থিতি অপরিহার্য। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, যদি বাড়িটি [ইতোমধ্যে ক্রেতার নিকট] হস্তান্তর করা হয়ে থাকে সে সুরতে। তখন আর বিক্রেতার উপস্থিতি ধর্তব্য থাকে না। কেননা সে এখন তৃতীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। কারণ তার এখন দখলও নেই, মালিকানাও নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيْعُ الْبَائِعَ وَالْمَبِيْعُ فِيْ يَدِهٖ الخ : মাসআলা হচ্ছে, বিক্রীত বাড়ি যদি বিক্রেতার দখলেই থেকে থাকে এবং শফী' যদি বিক্রেতাকে বিচারকের নিকট উপস্থিত করে তাহলে সে বিক্রেতাকেই বিবাদী বা প্রতিপক্ষ বানাতে পারবে। তখন বিক্রেতার সাথেই তার মামলা চলতে থাকবে।

قَوْلُهٗ لِأَنَّ الْيَدَ لَهٗ وَهِيَ يَدٌ مُسْتَحِقَّةٌ الخ : এক্ষেত্রে যদিও বাড়িটির মালিকানা হচ্ছে ক্রেতার, তা সত্ত্বেও বিক্রেতাকে প্রতিপক্ষ বানাতে পারবে। তার কারণ হচ্ছে, এ সুরতে বাড়িটির উপর দখল রয়েছে বিক্রেতার। আর তার এ দখল কেবল আমানত হিসেবে দখলের মতো নয়; বরং মালিকানার ন্যায় অধিকারভুক্ত দখল। এ কারণেই তো বিক্রেতা মূল্য পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত বাড়িটি আটকে রাখতে পারে, বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় হালাক হলে তা বিক্রেতার সম্পদ থেকে হালাক হয়েছে বলে গণ্য হয়। আর এরূপ দখলদারিত্ব যার থাকে তার দখলভুক্ত জিনিসে কেউ অধিকার দাবি করলে সে তার প্রতিপক্ষ হতে পারে। কেননা বাদীর পক্ষে রায় হলে তাতে তার দখলদারিত্ব চলে যাবে।

উল্লেখ্য, এখানে يَدٌ مُسْتَحِقَّةٌ "ন্যায্য অধিকারভুক্ত দখল" বলে যার হাতে গচ্ছিত রাখা হয় তার দখল এবং যে উধার হিসেবে গ্রহণ করে তার দখল (يَدُ الْمُوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيْرِ) -এর ক্ষেত্রে বিধান ব্যতিক্রম হওয়ার বিষয়টি বুঝানো হয়েছে। কেননা এ দুটি সুরতে দখলকারীর দখল যেহেতু 'অধিকারভুক্ত দখল' يَدٌ مُسْتَحِقَّةٌ নয়, তাই কেউ তাতে অধিকার দাবি করলে দখলকারী বিবাদী হতে পারে না; বরং মূল মালিকই বিবাদী বা প্রতিপক্ষ হয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِى الْبَيِّنَةَ حَتّٰى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِىْ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় শফী' বিক্রেতাকেই প্রতিপক্ষ বানায় তাহলে বিধান হলো, শফী'র পক্ষ হতে সাক্ষ্য প্রমাণ বিচারক গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রেতা উপস্থিত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিক্রেতাকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে শফী' যখন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করবে তখন ক্রেতার উপস্থিত থাকাও অপরিহার্য। ক্রেতা উপস্থিত হওয়ার পর বিচারক ক্রেতার সম্মুখে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে সম্পাদিত বিক্রয়চুক্তিটি রহিত করে দেবেন এবং বিক্রেতার বিপক্ষে শুফ'আর রায় প্রদান করবেন। আর এর সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব বিক্রেতার উপরই সাব্যস্ত করে দেবেন। এর সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব হচ্ছে, অন্য কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত বাড়িটির প্রকৃত মালিক হিসেবে বেরিয়ে আসে তখন শফী'কে তার প্রদত্ত মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার দায়দায়িত্ব। এটি এক্ষেত্রে বিক্রেতাই বহন করবে। কেননা আলোচ্য সুরতে সে-ই শফী'র নিকট হতে মূল্য গ্রহণ করে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِىْ وَالْيَدَ لِلْبَائِعِ وَالْقَاضِىْ يَقْضِىْ بِهِمَا الخ : আলোচ্য সুরতে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ ও রায় প্রদানের সময় বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ই উপস্থিত থাকা আবশ্যক হওয়ার কারণ হচ্ছে, যখন শফী'র অনুকূলে শুফ'আর রায় হবে তখন জমির মালিকানা ও দখল উভয় বিষয়ে শফী'র অধিকারভুক্ত হওয়ার রায় হবে। আর আলোচ্য সুরতে এ দুটি বিষয়ের একটি রয়েছে ক্রেতার হাতে আর আরেকটি রয়েছে বিক্রেতার হাতে। ক্রেতার হাতে রয়েছে বাড়িটির মালিকানা, কেননা ক্রয়ের মাধ্যমে সে বাড়িটির মালিক হয়ে গেছে। আর বিক্রেতার হাতে রয়েছে দখলদারিত্ব। কাজেই রায়ের মাধ্যমে যখন উভয় বিষয় উভয়ের হাত হতে শফী'র হাতে চলে যাওয়ার ফয়সালা বিচারক করবেন তখন উভয়েরই উপস্থিত থাকা আবশ্যক হবে। কেননা যার বিপক্ষে বিচার হয় তার উপস্থিত থাকা আবশ্যক হয়।

এছাড়া আরেকটি কারণ হচ্ছে, বিক্রেতার নিকট হতে শফী'র গ্রহণ করা ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে সম্পাদিত চুক্তি রহিত-করণকে অনিবার্য করে। আর ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে সংঘটিত চুক্তি তাদের উভয়ের উপস্থিতি ছাড়া রহিত হতে পারে না। কাজেই ক্রেতার উপস্থিতি আবশ্যক। –[দ্র. আল বিনায়াহ]

উল্লেখ্য, এখানে আল্লামা আইনী (র.) বর্ণনা করেছেন, এক্ষেত্রে শফী' যে বাড়িটি বিক্রেতার নিকট হতে গ্রহণ করবে এটি আমাদের মত এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত একটি মত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আরেকটি মত এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর থেকে একটি রেওয়ায়েত হচ্ছে, এক্ষেত্র বিচারক প্রথমে ক্রেতাকে বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি হস্তগত করাবেন। তারপর ক্রেতার নিকট হতে শফী' তা গ্রহণ করবে। আর শফী' গ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব [যার অর্থ আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি] অন্য তিন ইমাম তথা ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, সর্বাবস্থায় ক্রেতার উপরই বর্তাবে। আর ইমাম যুফার ও ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর মতে সর্বাবস্থায় বিক্রেতার উপর বর্তাবে। আর আমাদের মতে যদি শফী' বিক্রেতার হাত হতে গ্রহণ করে তাহলে বিক্রেতার উপর বর্তাবে এবং ক্রেতার নিকট হতে গ্রহণ করলে ক্রেতার উপর বর্তাবে।

আর ফকীহ ইবনে সামা'আহ ও বিশর ইবনে ওয়ালিদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যদি ক্রেতা ইতে-মধ্যে বিক্রেতার নিকট মূল্য পরিশোধ করে থাকে কিন্তু বাড়ি হস্তগত না করে থাকে তাহলে শফী' বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করবে। কিন্তু মূল্য দেবে ক্রেতার হাতে এবং ক্রেতার উপরই দায়দায়িত্ব অর্পিত হবে। আর যদি তখনও মূল্য পরিশোধ না করে থাকে তাহলে শফী' মূল্য বিক্রেতার হাতে হস্তান্তর করবে এবং দায়দায়িত্ব বিক্রেতার উপরই থাকবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الدَّارُ قَدْ قُبِضَتْ حَيْثُ لَا يُعْتَبَرُ حُضُوْرُ الْبَائِعِ الخ : উপরে বর্ণনা করা হয়েছিল যে, বাড়ি যদি বিক্রেতার দখলেই থেকে থাকে তাহলে বিচারের সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়ের থাকা আবশ্যক। এখানে বলা হচ্ছে, পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা বাড়িটি বিক্রেতার নিকট হতে ইতোমধ্যে হস্তগত করে থাকে তাহলে তার বিধান ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তখন বিক্রেতার উপস্থিত হওয়ার কোনো রকম প্রয়োজনীয়তা বাকি থাকবে না। কেননা ক্রেতা হস্তগত করার পর শফী'র ক্ষেত্রে বিক্রেতা অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। কারণ এখন তার মালিকানাও নেই এবং দখলও নেই। উভয়টিই ক্রেতার হাতে চলে গেছে। আর শফী' এ দুটিই লাভ করতে চায়। সুতরাং বিক্রেতার যখন শুফ'আর ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টতা নেই তখন তার উপস্থিত হওয়ার কোনো প্রকার প্রয়োজনীয়তাও অবশিষ্ট নেই।

وَقَوْلُهُ "فَيَفْسَخُ الْبَيْعَ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ" إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةٍ أُخْرَى . وَهِيَ أَنَّ الْبَيْعَ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ يَنْفَسِخُ لَا بُدَّ مِنْ حُضُوْرِهِ، لِيُقْضَى بِالْفَسْخِ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَجْهُ هٰذَا الْفَسْخِ الْمَذْكُوْرِ أَنْ يَنْفَسِخَ فِي حَقِّ الْإِضَافَةِ، لِامْتِنَاعِ قَبْضِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَهُوَ يُوْجِبُ الْفَسْخَ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْقَى أَصْلُ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِ انْفِسَاخِهِ . لِأَنَّ الشُّفْعَةَ بِنَاءٌ عَلَيْهِ، وَلٰكِنَّهُ تَتَحَوَّلُ الصَّفْقَةُ إِلَيْهِ، وَيَصِيْرُ كَأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ . فَلِهٰذَا يَرْجِعُ بِالْعُهْدَةِ عَلَى الْبَائِعِ . بِخِلَافِ مَا إِذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ، حَيْثُ تَكُوْنُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ . لِأَنَّهُ تَمَّ مِلْكُهُ بِالْقَبْضِ . فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ اِمْتَنَعَ قَبْضُ الْمُشْتَرِي، وَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْفَسْخَ . وَقَدْ طَوَّلْنَا الْكَلَامَ فِيْهِ فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য "বিচারক ক্রেতার উপস্থিতিতে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করে দেবেন" এর দ্বারা অন্য একটি ইল্লত বা কারণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো বিক্রয় চুক্তি যখন ক্রেতার ক্ষেত্রে রহিত করে দেওয়া হচ্ছে তখন ক্রেতার উপস্থিতি আবশ্যক, যাতে তার বিপক্ষে চুক্তিটি রহিতকরণের রায় [তার উপস্থিতিতে] দেওয়া যায়। আর এ রহিতকরণের বিষয়টি হচ্ছে এরূপ যে, বিক্রয় চুক্তিটি [ক্রেতার দিকে] সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি রহিত হবে। কেননা শুফ'আর ভিত্তিতে সম্পত্তিটি শফী' গ্রহণ করায় ক্রেতার হস্তগত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর এরূপ অসম্ভব হয়ে পড়া রহিতকরণকে আবশ্যক করে। তবে মূল বিক্রয় চুক্তিটি বহাল থেকে যাবে। কেননা মূল চুক্তিটি রহিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার কারণ, শুফ'আ মূল চুক্তিটির উপর নির্ভরশীল। তবে চুক্তিটি এখন শফী'র সাথে সম্পৃক্ত হবে। যেন সেই বিক্রেতার নিকট হতে ক্রয় করেছে। এ কারণেই সমস্ত দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে সে বিক্রেতার নিকটই রুজু করবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা সম্পত্তি হস্তগত করার পর যদি তার হাত থেকে শফী' তা গ্রহণ করে তাহলে বিধান ব্যতিক্রম। সেক্ষেত্রে 'দায়দায়িত্ব' ক্রেতার উপরই বর্তাবে। কেননা হস্তগত করার কারণে তার মালিকানা পূর্ণ হয়ে গেছে। আর প্রথমোক্ত সুরতে ক্রেতার হস্তগত করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, আর এরূপ হওয়া চুক্তি রহিতকরণকে আবশ্যক করে। এ সম্পর্কে আমি আল্লাহর তাওফীকে 'কিফায়াতুল মুনাতাহী' গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَوْلُهُ "فَيَفْسَخُ الْبَيْعَ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ" إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةٍ أُخْرَى الخ : মূল ইবারত তথা মতনে ইমাম কুদূরী (র.) বলেছিলেন– فَيَفْسَخُ الْبَيْعَ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ "ফলে বিচারক ক্রেতার উপস্থিতিতে বিক্রয় চুক্তিটি রহিত করে দেবেন।" পূর্ণ কথাটি ছিল এরূপ যে, শফী' বিক্রেতাকে প্রতিপক্ষ বানাতে পারবে তবে ক্রেতাও উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বিচারক শফী'র সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করবেন না। ক্রেতা উপস্থিত হলে "তার উপস্থিতিতে বিচারক [সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করার পর] বিক্রয় চুক্তিটি রহিত করে দেবেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, فَيَفْسَخُ الْبَيْعَ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ "ফলে বিচারক ক্রেতার উপস্থিতিতে বিক্রয় চুক্তিটি রহিত করে দেবেন" ইমাম কুদূরী (র.) এ কথাটি বলে উক্ত বিধানের অর্থাৎ উক্ত সূরতে ক্রেতার উপস্থিতি আবশ্যক হওয়ার আরেকটি কারণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ ক্রেতার উপস্থিতি আবশ্যক হওয়ার দুটি কারণ– একটি তো ইতোপূর্বে মুসান্নিফ (র.) لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِيْ وَالْيَدَ لِلْبَائِعِ الخ বলে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় কারণটির প্রতি স্বয়ং ইমাম কুদূরী (র.) মূল ইবারতে ইঙ্গিত করেছেন। সে কারণটি হলো, বিচারক তার রায়ের মাধ্যমে ক্রেতা যে বাড়িটি ক্রয় করেছিল সে ক্রয় চুক্তিটি ক্রেতার ক্ষেত্রে রহিত করে দেবেন। আর এ রহিতকরণ যেহেতু ক্রেতার বিপক্ষে একটি ফয়সালা, সেহেতু ক্রেতার উপস্থিতি আবশ্যক। কেননা কারো অনুপস্থিতিতে তার বিপক্ষে রায় প্রদান বৈধ নয়। সুতরাং ক্রেতার ক্রয় রহিতকরণের দিক থেকেও তার উপস্থিতি অপরিহার্য।

قَوْلُهُ ثُمَّ وَجْهُ هٰذَا الْفَسْخِ الْمَذْكُوْرِ أَنْ يَنْفَسِخَ فِيْ حَقِّ الْإِضَافَةِ : উপরে যে বলা হয়েছে, বিচারক ক্রয়বিক্রয় রহিত করে দেবেন– এখানে বিক্রয় রহিত করার বিষয়টিতে যেহেতু একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে তাই মুসান্নিফ (র.) এখানে বিক্রয় রহিতকরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করছেন। প্রশ্নটি হলো, যে উদ্দেশ্যে বিক্রয় রহিত করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যটিই আবার বিক্রয় রহিত করার কারণে বিনষ্ট হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে, এখানে বিক্রয় রহিত করা হচ্ছে শুফ'আর ভিত্তিতে বাড়িটি প্রদান করার উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে শুফ'আর ভিত্তি হচ্ছে বিক্রয়ের উপর। কেননা বিক্রয় না থাকলে শুফ'আ সাব্যস্ত হয় না। কাজেই বিক্রয় যদি রহিত করা হয় তাহলে বিক্রয় আর বাকি থাকল না। কাজেই শুফ'আর অধিকারও থাকবে না। ফলে বিষয়টি এই দাঁড়াল যে, যে উদ্দেশ্যে রহিত করা হচ্ছে, রহিত করার কারণে আবার সেই উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই প্রশ্ন দেখা দেওয়ার সম্ভাবনার জন্য মুসান্নিফ (র.) রহিতকরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করছেন।

ব্যাখ্যার সারকথা হচ্ছে, বিচারক যে বিক্রয় রহিত করে দেবেন সেক্ষেত্রে মূল বিক্রয় রহিত হবে না; বরং বিক্রয়ের সম্পর্ক ক্রেতার সাথে হওয়ার বিষয়টি কেবল রহিত হবে। অর্থাৎ মূল বিক্রয় চুক্তিটি বহাল থেকে চুক্তির সম্পর্ক এখন শফী'র সাথে যুক্ত হবে। কাজেই রহিত করার অর্থ হচ্ছে চুক্তির সম্পর্ক রহিতকরণ, মূল চুক্তি রহিতকরণ নয়। পরবর্তী ইবারতে মুসান্নিফ (র.) এ দুটি বিষয় অর্থাৎ ক্রেতার সাথে বিক্রয় চুক্তির সম্পর্ক রহিত হওয়ার বিষয় এবং মূল বিক্রয় চুক্তিটি বহাল থাকার বিষয় কারণসহ বর্ণনা করছেন–

قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ قَبْضِ الْمُشْتَرِيْ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ : ক্রেতার সাথে বিক্রয় চুক্তির সম্পর্ক রহিত হয়ে যাবে– এর কারণ হচ্ছে, যখন শুফ'আর ভিত্তিতে বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি শফী'র হস্তগত করার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে তখন আর বাড়িটি ক্রেতার হস্তগত করার অধিকার নেই। কাজেই তার হস্তগত করা এখন অসম্ভব। আর ক্রয়ের পর যদি ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে তা বিক্রয় চুক্তি রহিত করাকে অনিবার্য করে। কেননা ক্রয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রয়কৃত বস্তু হতে উপকৃত হওয়া, আর সেই উদ্দেশ্য যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন বিক্রয় চুক্তি বহাল থাকার কোনো অর্থ হয় না। কাজেই ক্রেতার হস্তগতকরণ অসম্ভব হয়ে পড়া বিক্রয় রহিতকরণকে অনিবার্য করে তোলে।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَبْقٰى أَصْلُ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِ انْفِسَاخِهِ : যদিও ক্রেতার হস্তগতকরণ অসম্ভব হয়ে পড়া বিক্রয় রহিতকরণকে অনিবার্য করে কিন্তু এ রহিতকরণ কেবল ক্রেতার সাথে বিক্রয় চুক্তির সম্পর্ক রহিতকরণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কেননা এতেই উক্ত অনিবার্যতা নিবারণ হয়ে যায়। অন্যদিকে মূল বিক্রয় চুক্তিটি বহালই থেকে যাবে। কেননা মূল চুক্তিটি রহিত হওয়া এক্ষেত্রে অসম্ভব। কারণ হচ্ছে, মূল চুক্তি রহিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে যেন বিক্রয়চুক্তি ছিলই না। আর বিক্রয়চুক্তি যদি একেবারেই না থাকে তাহলে শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেননা শুফ'আর ভিত্তি হচ্ছে

বাড়িটি বিক্রয় হওয়ার উপর। বাড়ি বিক্রয় না হলে তার উপর কেউ শুফ'আ লাভ করতে পারে না। কাজেই শুফ'আ লাভ করার জন্য বিক্রয় বহাল থাকা আবশ্যক। অতএব, মূল বিক্রয় বহাল থাকবে। তবে চুক্তিটি এখন ক্রেতার পরিবর্তে শফী'র দিকে সম্পৃক্তও হবে। এখন এরূপ ধরা হবে যে, শফী'ই হচ্ছে বিক্রেতার নিকট হতে ক্রয়কারী। এ কারণেই আলোচ্য সুরতে [অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট হতে শফী' বাড়ি গ্রহণ করার সুরতে] শফী' বাড়িটির দায় দয়িত্বের ব্যাপারে বিক্রেতার দিকে রুজু করে। অথচ যদি এটি ক্রেতার নিকট হতে গ্রহণ বলে গণ্য হতো তাহলে দায় দায়িত্বের ব্যাপারে ক্রেতার দিকে রুজু করতে হতো।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِى فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ : পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি বাড়িটি হস্তগত করার পর শফী' ক্রেতার নিকট হতে বাড়ি গ্রহণ করে তাহলে বিধান হয় এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব বিক্রেতার উপর বর্তায় না। বরং ক্রেতার উপরই বর্তায়। আর শফী' গ্রহণ করার জন্য বিক্রেতার ও ক্রেতার মাঝের চুক্তি রহিতকরণেরও প্রয়োজন পড়ে না। কেননা ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি হস্তগত করে নিয়েছে, কাজেই ক্রেতার মালিকানা পূর্ণ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে প্রথম সুরতে অর্থাৎ ক্রেতা হস্তগত করার পূর্বে যখন বিক্রেতার নিকট হতে শফী' বাড়িটি গ্রহণ করে তখন ক্রেতা বাড়িটি ক্রয় করা সত্ত্বেও তার হস্তগত করা অসম্ভব হয়ে পড়ার কারণে বিক্রয় [ক্রেতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে] রহিত করা আবশ্যক হয়। ফলে ক্রেতার আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। তাই দায়দায়িত্ব বিক্রেতার উপর বর্তায়।

قَوْلُهُ وَقَدْ طَوَّلْنَا الْكَلَامَ فِيهِ فِى كِفَايَةِ الْمُنْتَهِى : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে বিক্রয় রহিতকরণ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা করেছি এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আরো বিস্তারিতভাবে আমি আমার রচিত গ্রন্থ 'কিফায়াতুল মুনতাহী'-তে আলোচনা করেছি। [উল্লেখ্য, এটি মুসান্নিফ (র.) লিখিত বিশাল কলেবরের একটি গ্রন্থ। হিদায়ার প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি এ গ্রন্থ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى دَارًا لِغَيْرِهٖ فَهُوَ الْخَصْمُ لِلشَّفِيْعِ لِأَنَّهٗ هُوَ الْعَاقِدُ، وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حُقُوْقِ الْعَقْدِ، فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ ـ قَالَ : إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهٗ لَمْ يَبْقَ لَهٗ يَدٌ وَلَا مِلْكٌ، فَيَكُوْنُ الْخَصْمُ هُوَ الْمُوَكِّلُ ـ وَهٰذَا لِأَنَّ الْوَكِيْلَ كَالْبَائِعِ مِنَ الْمُوَكِّلِ عَلٰى مَا عُرِفَ ـ فَتَسْلِيْمُهٗ إِلَيْهِ كَتَسْلِيْمِ الْبَائِعِ إِلَى الْمُشْتَرِيْ ـ فَتَصِيْرُ الْخُصُوْمَةُ مَعَهٗ، إِلَّا أَنَّهٗ مَعَ ذٰلِكَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ، فَيَكْتَفِيْ بِحُضُوْرِهٖ فِي الْخُصُوْمَةِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ـ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَكِيْلُ الْغَائِبِ فَلِلشَّفِيْعِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ إِذَا كَانَتْ فِيْ يَدِهٖ ـ لِأَنَّهٗ عَاقِدٌ ـ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَصِيًّا لِمَيِّتٍ فِيْمَا يَجُوْزُ بَيْعُهٗ لِمَا ذَكَرْنَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি অন্যের জন্য একটি বাড়ি ক্রয় করে তাহলে ক্রেতা-ই শফী'র বিবাদী হবে। কেননা সে-ই হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনকারী। আর শুফ'আর ভিত্তিতে সম্পত্তি গ্রহণ চুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তার সাথেই শফী' বোঝাপড়া করবে। তবে সে যদি তার মুয়াক্কিলের নিকট বাড়িটি হস্তান্তর করে দিয়ে থাকে [তাহলে সে আর বিবাদী হবে না।] কেননা এখন তার দখলও নেই, মালিকানাও নেই। সুতরাং মুয়াক্কিলই বিবাদী হবে। এর কারণ হলো, মুয়াক্কিলের সাথে প্রতিনিধির সম্পর্ক হচ্ছে বিক্রেতার ন্যায়, যা একটি পরিজ্ঞাত বিষয়। সুতরাং মুয়াক্কিলের নিকট প্রতিনিধির হস্তান্তর বিবেচিত হবে ক্রেতার নিকট বিক্রেতার হস্তান্তরের ন্যায়। অতএব, বিবাদ মুয়াক্কিলের সাথে চলবে। তবে [উল্লিখিত সম্পর্ক সত্ত্বেও] প্রতিনিধি তার মুয়াক্কিলের স্থলাভিষিক্ত। কাজেই [বাড়িটি মুয়াক্কিলের নিকট] হস্তান্তরের পূর্বে মামলায় তার একার উপস্থিতিই যথেষ্ট হবে [মুআক্কিলের উপস্থিতি আবশ্যক হবে না।] অনুরূপভাবে বিক্রেতা যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতিনিধি হয়ে থাকে তাহলে শফী' বিক্রেতার নিকট হতেই বাড়িটি নিতে পারবে, যদি বাড়িটি তার হাতেই থেকে থাকে। কেননা সে-ই হচ্ছে চুক্তি সম্পাদনকারী। অনুরূপভাবে বিক্রেতা যদি যে ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হয় সেরূপ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির অছি [অসিয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি] হয় [তাহলেও উপরের বিধানই হবে।] কারণ তা-ই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَمَنِ اشْتَرٰى دَارًا لِغَيْرِهٖ فَهُوَ الْخَصْمُ لِلشَّفِيْعِ : কেউ যদি অন্যের প্রতিনিধি وَكِيْل হয়ে একটি বাড়ি ক্রয় করে তাহলে শফী'র প্রতিপক্ষ কে হবে? প্রতিনিধি [উকিল] নাকি মূল ব্যক্তি [মুয়াক্কিল]– এ সম্পর্কে এখানে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি প্রতিনিধি বাড়িটি ক্রয় করার পর এখনও মুয়াক্কিল তথা মূল ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর না করে থাকে তাহলে প্রতিনিধিই শফী'র প্রতিপক্ষ হবে। সে-ই শুফ'আর ব্যাপারে শফী'র সাথে মামলার বিবাদী নির্ধারিত হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ الخ : এক্ষেত্রে প্রতিনিধি শফী'র প্রতিপক্ষ হবে। তার কারণ হচ্ছে, যে চুক্তি সম্পাদন করে চুক্তির حُقُوْق অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব ও অধিকার তার সাথেই সম্পৃক্ত হয়। যেমন বিক্রয় করার পর ক্রেতার নিকট হতে মূল্য আদায় করা, ক্রেতার নিকট বিক্রয় দ্রব্য হস্তান্তর করা, ত্রুটির কারণে বিক্রয় দ্রব্য ফেরত দেওয়া এবং এজন্যে বিচারকের নিকট মামলা চালাতে হলে তা পরিচালনা করা ইত্যাদি দায়দায়িত্ব চুক্তিকারীর সাথেই সম্পৃক্ত হয়। কেননা এগুলো হচ্ছে, চুক্তির সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব ও অধিকার। কাজেই চুক্তিকারীর উপরই এগুলো বর্তাবে। সুতরাং আলোচ্য সুরতে শুফ'আর ভিত্তিতে বাড়ি গ্রহণ করাও হচ্ছে বিক্রয় চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি অধিকার। আর উক্ত প্রতিনিধিই হচ্ছে মূলত চুক্তিকারী। কাজেই শুফ'আর অধিকারের বিষয়টি প্রতিনিধির সাথেই সম্পৃক্ত হবে।

قَوْلُهُ قَالَ : إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَى الْمُوَكِّلِ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে প্রতিনিধি বাড়িটি ক্রয় করার পর যদি মুয়াক্কিল [মূল ব্যক্তি] -এর নিকট তা হস্তান্তর করে থাকে তাহলে আর প্রতিনিধি শফী'র প্রতিপক্ষ হবে না। তখন মুয়াক্কিলই শফী'র প্রতিপক্ষ হবে এবং মামলায় বিবাদী হয়ে শফী'র বিপক্ষে মামলা চালাবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ وَلَا مِلْكٌ فَيَكُوْنُ الْخَصْمُ هُوَ الْمُوَكِّلُ : মুয়াক্কিলের নিকট হস্তান্তর করার পর প্রতিনিধি [উকিল] শফী'র প্রতিপক্ষ না হওয়ার কারণ হচ্ছে, মুয়াক্কিলের নিকট বাড়িটি হস্তান্তর করার পর বাড়িটির উপর প্রতিনিধির মালিকানাও থাকে না দখলও থাকে না। মালিকানা থাকে না তার কারণ হচ্ছে, প্রতিনিধি বাড়িটি ক্রয় করার সাথে সাথে তাতে মুয়াক্কিলের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর হস্তান্তর করার কারণে প্রতিনিধির দখলও অবশিষ্ট নেই। কাজেই বাড়িটির সাথে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা রইল না। সুতরাং এখন সে আর শফী'র প্রতিপক্ষ হবে না। যেমন বিক্রেতা ও ক্রেতার মাসআলায় [যা ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে] যদি বাড়িটি বিক্রেতার হাতেই থাকে তাহলে বিক্রেতা শফী'র প্রতিপক্ষ হতে পারে। কিন্তু সে যদি ক্রেতার নিকট বাড়ি হস্তান্তর করে দেয় তাহলে সে আর প্রতিপক্ষ হতে পারে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَكِيْلَ كَالْبَائِعِ مِنَ الْمُوَكِّلِ عَلَى مَا عُرِفَ الخ : এখান থেকে পূর্বের কথাটিই আরো স্পষ্ট করেছেন। অর্থাৎ প্রতিনিধি বাড়িটি মুয়াক্কিলের নিকট হস্তান্তর করার পর তার মালিকানাও থাকে না এবং দখলও থাকে না, তাই সে শফী'র প্রতিপক্ষ হবে না। এর কারণ হচ্ছে, প্রতিনিধি ও মুয়াক্কিলের মাঝে সম্পর্ক হচ্ছে বিক্রেতা ও ক্রেতার মতো। অর্থাৎ প্রতিনিধি বাড়ি বা দ্রব্য ক্রয়ের পর যখন তা মুয়াক্কিলকে প্রদান করে তখন সে মুয়াক্কিলের নিকট বিক্রয়কারীর মতো গণ্য হয় এবং মুয়াক্কিল ক্রেতার মতো গণ্য হয়। কেননা এক্ষেত্রে তাদের মাঝে বিধানগত দিক থেকে একটি লেনদেন হচ্ছে, প্রতিনিধি দ্রব্য প্রদান করছে আর মুয়াক্কিল তার বিনিময় প্রদান করছে। কাজেই উভয়ের মাঝে একটি বিধানগত লেনদেন [বিক্রয়] ধরে নেওয়া হবে [এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) كِتَابُ الْوَكَالَةِ "প্রতিনিধি অধ্যায়"-এ আলোচনা করেছেন]। অতএব, প্রতিনিধি যখন বিক্রেতার পর্যায় এবং মুয়াক্কিল ক্রেতার পর্যায় হলো তখন প্রতিনিধির বাড়িটি মুয়াক্কিলের নিকট হস্তান্তর করা বিধানের ক্ষেত্রে ঠিক তদ্রূপই হবে, যেমন বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করলে হয়ে থাকে। আর ইতঃপূর্বে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিক্রেতা যদি বাড়ি বিক্রয় করার পর ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেয় তাহলে সে আর শফী'র প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হতে পারে না। কাজেই এক্ষেত্রেও প্রতিনিধি মুয়াক্কিলের নিকট হস্তান্তর করার পর সে আর শফী'র প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না; বরং বিবাদ এখন মুয়াক্কিলের সাথেই চলবে।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ مَعَ ذٰلِكَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন।

প্রশ্ন. প্রশ্নটি হচ্ছে, যদি প্রতিনিধি ও মুয়াক্কিল [যে প্রতিনিধি বানিয়েছে] বিধানগত দিক থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতার মতো হয় [যা একটু পূর্বে মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন] তাহলে প্রতিনিধি বাড়িটি মুয়াক্কিলের নিকট হস্তান্তর করার পূর্বে প্রতিনিধি যখন শফী'র প্রতিপক্ষ হবে তখন মুয়াক্কিলের উপস্থিতি ব্যতীত বিচারকের রায় না হওয়ার কথা। কেননা পূর্বে এ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিক্রেতার হাতে বাড়ি থাকাবস্থায় বিক্রেতা যদি শফী'র প্রতিপক্ষ হয় তাহলে ক্রেতারও উপস্থিতি আবশ্যক; ক্রেতা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে বিচারক শফী'র সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করবেন না এবং রায় প্রদান করবেন না। সুতরাং প্রতিনিধির ক্ষেত্রেও তো তাই হওয়ার কথা। অথচ প্রতিনিধির ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, মামলা পরিচালনা ও রায় প্রদানের জন্য মুয়াক্কিলের উপস্থিতির কোনো আবশ্যকতা নেই। তাহলে এক্ষেত্রে তো প্রতিনিধি ও মুয়াক্কিলের বিষয়টি ক্রেতা ও বিক্রেতার মতো হলো না।

উত্তর. জবাবের সারকথা হচ্ছে, যদিও প্রতিনিধি ও মুয়াক্কিলের বিষয়টি ক্রেতা ও বিক্রেতার মতোই; কিন্তু এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে, তা হচ্ছে প্রতিনিধি হলো মুয়াক্কিলের স্থলাভিষিক্ত। কেননা সে মুয়াক্কিলের পক্ষ থেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই মুয়াক্কিলের নিকট বাড়িটি হস্তান্তরের পূর্বে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিনিধির উপস্থিতিই যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাসআলায় বিক্রেতা যেহেতু ক্রেতার পক্ষ হতে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নয়, তাই বিক্রেতার উপস্থিতি ক্রেতার পক্ষ হতে উপস্থিতি বলে বিবেচিত হয় না। ফলে সেক্ষেত্রে ক্রেতার উপস্থিতি আবশ্যক হয়।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَكِيْلَ الْغَائِبِ الخ : উপরে মূল ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.) যে বিধান উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ 'প্রতিনিধিই হবে শুফ'আর ক্ষেত্রে শফী'র প্রতিপক্ষ যদি উক্ত বাড়িটি প্রতিনিধির হাতে থেকে থাকে।' এ বিধানটি ছিল প্রতিনিধি যদি মুয়াক্কিলের পক্ষ হতে ক্রেতা হয় সে সুরতে। এখানে মুসান্নিফ (র.) বলেন, অনুরূপভাবে প্রতিনিধি যদি বিক্রেতার প্রতিনিধি হয় তাহলেও একই রকম বিধান হবে। অর্থাৎ প্রতিনিধি যদি অনুপস্থিত বিক্রেতার পক্ষ হতে বাড়িটি বিক্রয় করে এবং বাড়িটি এখনও বিক্রেতা তথা প্রতিনিধির হাতে থেকে থাকে তাহলে শফী' এ প্রতিনিধিকে বিচারকের নিকট প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করে তার নিকট হতে শুফ'আর ভিত্তিতে বাড়ি গ্রহণ করতে পারবে। কেননা প্রতিনিধিই হচ্ছে এক্ষেত্রে চুক্তিকারী এবং বিক্রেতা। আর চুক্তি সংশ্লিষ্ট অধিকার ও দায়দায়িত্ব চুক্তিকারীর সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। কাজেই চুক্তিকারী হিসেবে এ প্রতিনিধির উপর শুফ'আ সংশ্লিষ্ট থাকবে। আর ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, বিক্রেতার হাতে বাড়ি থাকা অবস্থায় শফী' বিক্রেতাকেও প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করে তার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রেও শফী' বিক্রেতা তথা প্রতিনিধিকে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করে তার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করার অধিকার পাবে।

قَوْلُهُ كَذَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَصِيًّا لِمَيِّتٍ فِيْمَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ : উপরের মাসআলার ন্যায় একই বিধান হবে যদি বিক্রেতা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে 'অসিয়তপ্রাপ্ত' [দায়িত্বপ্রাপ্ত] হয় এবং সে বৈধ অধিকারে বাড়িটি বিক্রয় করে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি কাউকে তার সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করে [অসিয়ত করে] যায়, অতঃপর উক্ত অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির কোনো বাড়ি বা জমি বিক্রয় করে এবং বিক্রয় তার বৈধ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বিক্রয়ের পর জমি বা বাড়িটি যদি অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি তথা বিক্রেতার হাতেই থেকে থাকে তাহলে শফী' এ অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে তার নিকট হতে বাড়ি বা জমিটি গ্রহণ করতে পারবে।

উল্লেখ্য, এখানে 'বৈধ অধিকারভুক্ত বিক্রয়' فِيْمَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ বলে মুসান্নিফ (র.) বুঝিয়েছেন যে, যে ক্ষেত্রে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিক্রয় তার বৈধ অধিকারভুক্ত না হবে সেক্ষেত্রে উক্ত বিধান হবে না। কেননা সেক্ষেত্রে তার বিক্রয়ই জায়েজ হবে না। কাজেই শফী' তার নিকট হতে গ্রহণও করতে পারবে না। এরূপ সুরত দুটি হতে পারে–

১. যদি অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি এত কম মূল্যে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি বিক্রয় করে যে এতকম মূল্যে সাধারণত কেউ বিক্রয় করে না (مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ) তাহলে তার এ বিক্রয় জায়েজ হয় না। কাজেই এটি তার বৈধ অধিকার বহির্ভূত বিক্রয়। সুতরাং এক্ষেত্রে শফী' বাড়িটি গ্রহণ করতে পারবে না।
২. যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত [বালেগ] হয় এবং মৃত ব্যক্তির উপর ঋণ না থাকে তাহলেও অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিক্রয় জায়েজ হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রেও শফী' শুফ'আর ভিত্তিতে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হতে জমি বা বাড়ি গ্রহণ করতে পারবে না।

لِمَا ذَكَرْنَا – অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তার বৈধ অধিকারভুক্ত ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য জমি বা বাড়ি বিক্রয় করে তাহলে শফী' উক্ত অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে তার নিকট হতে বাড়ি বা জমিটি গ্রহণ করতে পারবে। এর কারণ তাই যা আমরা মাত্র একটু পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেহেতু এক্ষেত্রে বিক্রেতা তাই সে চুক্তিকারী। আর চুক্তিকারীর সাথে চুক্তি সংশ্লিষ্ট অধিকার ও দায়দায়িত্ব সম্পৃক্ত হয়। আর শুফ'আর অধিকারও হচ্ছে বিক্রয়-চুক্তি সংশ্লিষ্ট একটি অধিকার। কাজেই এটিও চুক্তিকারী তথা উক্ত অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে। সুতরাং সে শফী'র প্রতিপক্ষ হতে পারবে এবং তার নিকট হতে শফী' বিক্রীত জমি বা বাড়ি গ্রহণ করতে পারবে।

قَالَ : وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيْعِ بِالدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِيْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ ـ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ ـ أَلَا يَرَى أَنَّهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، فَيَثْبُتُ فِيْهِ الْخِيَارَانِ، كَمَا فِي الشِّرَاءِ ـ وَلَا يَسْقُطُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْمُشْتَرِيْ وَلَا بِرُؤْيَتِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَائِبٍ عَنْهُ، فَلَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন শফী'র অনুকূলে বাড়িটির রায় হবে তখন পর্যন্ত শফী' যদি বাড়িটি না দেখে থাকে তাহলে দেখার পর তার [গ্রহণ না করার] ইচ্ছাধিকার থাকবে। আর যদি সে বাড়িটিতে কোনো ত্রুটি পায় তাহলে ফেরত দিতে পারবে। যদিও ক্রেতা বাড়িটি ত্রুটিমুক্ত থাকার শর্ত উল্লেখ করে থাকে। কেননা শুফ'আর মাধ্যমে সম্পত্তি গ্রহণ তা ক্রয় করারই পর্যায়ভুক্ত। তুমি লক্ষ্য করছ না যে, শুফ'আর মাধ্যমে গ্রহণ [কার্যত] সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ গ্রহণ। সুতরাং ক্রয়ের ন্যায় এক্ষেত্রেও উভয় প্রকার ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে। ক্রেতার পক্ষ থেকে 'ত্রুটি মুক্ত থাকার শর্ত' কিংবা তার দেখার কারণে ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না। কেননা সে শফী'র স্থলাভিষিক্ত নয়। কাজেই সে ইচ্ছাধিকার বাতিল করার ক্ষমতা রাখে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا قَضَى لِلشَّفِيْعِ بِالدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا الخ : মাসআলা হলো, ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন ক্রীত দ্রব্য না দেখে ক্রয় করার পর ক্রেতা যখন তা দেখে তখন তার পছন্দ না হলে তা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার থাকে। [এটিকে خِيَارُ الرُّؤْيَةِ "খিয়ারে রুইয়াত" বলা হয়] এবং ক্রেতা কোনো দ্রব্য ক্রয় করার পর তাতে কোনো ত্রুটি দেখতে পেলে সে তা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার লাভ করে [এটিকে خِيَارُ الْعَيْبِ "খিয়ারুল আয়েব" বলা হয়।] তদ্রূপ শুফ'আর ক্ষেত্রেও শফী' জমি বা বাড়ি গ্রহণ করার পর তাতে উক্ত দু প্রকারের ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। অর্থাৎ শফী'র পক্ষে শুফ'আর রায় হওয়ার পর সে যখন বাড়িটি দেখবে তখন যদি সে বাড়িটি ইতঃপূর্বে না দেখে থাকে তাহলে সে 'খিয়ারে রুইয়াত' বা না দেখার কারণে প্রাপ্ত ইচ্ছাধিকারের ভিত্তিতে বাড়িটি ফেরত দিতে পারবে। অনুরূপভাবে শফী' যদি বাড়িটি গ্রহণ করার পর তাতে কোনো ত্রুটি দেখতে পায় তাহলে সে বাড়িটি 'খিয়ারে আয়েব' বা ত্রুটিজনিত কারণে প্রাপ্ত ইচ্ছাধিকারের ভিত্তিতে তা ফেরত দিতে পারবে।

প্রথম সুরতে শফী' যে না দেখার কারণে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার লাভ করবে– এক্ষেত্রে বাড়িটির ক্রেতা তা দেখে থাক বা না দেখে থাক তাতে শফী'র ইচ্ছাধিকার পাওয়ার বিধানের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে না। শফী' সর্বাবস্থাতেই ফেরত দেওয়া অধিকার লাভ করবে।

আর দ্বিতীয় সুরতে অর্থাৎ ত্রুটি পাওয়ার সুরতে ক্রেতা যদি বাড়িটি ক্রয়ের সময় বিক্রেতার সাথে এই শর্তে আবদ্ধ হয়ে থাকে যে, ত্রুটির কারণে বাড়িটি ফেরত দেওয়া যাবে না তবুও শফী' বাড়িটি নেওয়ার পর ত্রুটির কারণে তা ফেরত দিতে পারবে। ক্রেতার উক্ত শর্তে আবদ্ধ হওয়া শফী'র ক্ষেত্রে কার্যকর থাকবে না। [ইবারতে شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ -এর অর্থ হচ্ছে– বাড়িটি সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত এই শর্ত মেনে নিয়ে আমি ক্রয় করছি। অর্থাৎ কোনো ত্রুটির কারণে আমার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে না।]

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ الخ : এখান থেকে শফী' ফেরত দেওয়ার উক্ত দু প্রকার ইচ্ছাধিকার লাভ করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ হচ্ছে এই যে, শুফ'আর ভিত্তিতে গ্রহণ করা– এটি ক্রয় করারই পর্যায়ভুক্ত। কেননা ক্রয়বিক্রয়ের মাঝে যেমন مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ আদান-প্রদান' করা হয় তদ্রূপ শুফ'আর ক্ষেত্রেও 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ আদান-প্রদান' করা হয়। কেননা শফী' ক্রেতা বা বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করে আর তার বিনিময়ে সে মূল্য পরিশোধ করে। কাজেই এটি ক্রয় করার মতোই হলো। সুতরাং ক্রয় করার ক্ষেত্রে ক্রেতা যে ইচ্ছাধিকার লাভ করে তা শফী'ও লাভ করবে। ক্রেতা পূর্বে না দেখে থাকলে দেখার পর তা ফেরত দেওয়ার এবং ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার লাভ করে সেহেতু শফী'ও এ দু প্রকারের ইচ্ছাধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَسْقُطُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْمُشْتَرِيْ وَلَا بِرُؤْيَتِهِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, শফী' যে উক্ত দু প্রকারের ইচ্ছাধিকার লাভ করবে তা বাড়িটির ক্রেতার কারণে যদি রহিত হয় তবুও শফী'র ক্ষেত্রে রহিত হবে না। সুতরাং ক্রেতা যদি ক্রয় করার সময় বিক্রেতার সাথে এ মর্মে শর্তে আবদ্ধ হয় যে, বাড়িটি ত্রুটিমুক্ত এ শর্তে বিক্রয় করা হলো অর্থাৎ ত্রুটির কারণে তা ফেরত দেওয়া যাবে না তাহলেও ত্রুটির কারণে শফী'র ফেরত দেওয়ার অধিকার বাতিল হবে না। আবার ক্রেতা যদি ক্রয়ের সময় বাড়িটি দেখে ক্রয় করে তাহলে ক্রেতার ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে কিন্তু এতে শফী'র ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَائِبٍ عَنْهُ فَلَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ : ক্রেতার কারণে শফী'র উক্ত অধিকার দুটি বাতিল না হওয়ার কারণ হচ্ছে, ক্রেতা শফী'র পক্ষ হতে প্রতিনিধি বা তার স্থলাভিষিক্ত ছিল না। কেননা ক্রেতা তো বাড়িটি শফী'র পক্ষ হয়ে ক্রয় করেনি। কাজেই শফী'র যে অধিকার তা ক্রেতা কোনোক্রমে রহিত বা বাতিল করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তার দেখার কারণে কিংবা ত্রুটিমুক্তির শর্ত মেনে নেওয়ার কারণে শফী'র উক্ত অধিকার দুটি বাতিল হবে না।

فَصْلٌ فِى الْاخْتِلَافِ

অনুচ্ছেদ : মতানৈক্য সম্পর্কে

যদি শফী' ও ক্রেতা কিংবা বিক্রেতার মাঝে বিক্রীত বাড়ির মূল্য কিংবা অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে কোন ক্ষেত্রে কার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে, কে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবে আর কে শপথসহকারে দাবি অস্বীকার করবে ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে এ অনুচ্ছেদে।

মুসান্নিফ (র.) প্রথমে শফী' ও তার প্রতিপক্ষ যে সকল ক্ষেত্রে একমত থাকে সে সকল মাসআলা আলোচনা করার পর তাদের পারস্পরিক মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ আলোচনা করছেন। কেননা এই বিন্যাসই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত। কারণ স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে এ সকল বিষয় নিয়ে মতবিরোধ না হওয়া। কাজেই যা স্বাভাবিক তাই আগে আলোচনা করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

قَالَ : وَإِنِ اخْتَلَفَ الشَّفِيْعُ وَالْمُشْتَرِىْ فِى الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِىْ . لِأَنَّ الشَّفِيْعَ يَدَّعِىْ اِسْتِحْقَاقَ الدَّارِ عَلَيْهِ عِنْدَ نَقْدِ الْأَقَلِّ وَهُوَ يُنْكِرُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِيْنِهِ . وَلَا يَتَحَالَفَانِ . لِأَنَّ الشَّفِيْعَ إِنْ كَانَ يَدَّعِىْ عَلَيْهِ اِسْتِحْقَاقَ الدَّارِ فَالْمُشْتَرِىْ لَا يَدَّعِىْ عَلَيْهِ شَيْئًا لِتَخَيُّرِهِ بَيْنَ التَّرْكِ وَالْأَخْذِ، وَلَا نَصَّ هٰهُنَا فَلَا يَتَحَالَفَانِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মূল্য সম্পর্কে যদি শফী' এবং ক্রেতার মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তাহলে ক্রেতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা শফী' ক্রেতার নিকট হতে অপেক্ষকৃত কম মূল্য পরিশোধে বাড়িটির অধিকারী হওয়ার দাবি করছে এবং ক্রেতা তা অস্বীকার করছে। আর যে অস্বীকারকারী হয় শপথ সহকারে তার বক্তব্যই গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে উভয়ে শপথ করবে না। কেননা, শফী' যদিও ক্রেতার বিপক্ষে বাড়িটির অধিকারী হওয়ার দাবি করছে কিন্তু ক্রেতা শফী'র বিপক্ষে কিছু দাবি করছে না। কারণ শফী'র [সম্পত্তি] ছেড়ে দেওয়া এবং গ্রহণ করা উভয়েরই ইচ্ছাধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে শরিয়তের কোনো বাণী নেই। সুতরাং উভয়ে শপথ করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِنِ اخْتَلَفَ الشَّفِيْعُ وَالْمُشْتَرِىْ فِى الثَّمَنِ الخ : মাসআলা হলো, যদি শফী' ও ক্রেতার মাঝে বিক্রীত বাড়িটির মূল্য কত ছিল সে সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ ক্রেতা বলে যে, আমি বাড়িটি দু হাজার টাকায় ক্রয় করেছি আর শফী' বলে আপনি বাড়িটি এক হাজার টাকায় ক্রয় করেছেন— তাহলে বিধান হলো, [সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে] ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, তবে আল্লাহর নামে শপথ সহকারে বলতে হবে। [উল্লেখ্য, অন্যান্য তিন ইমাম তথা ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও তাই।]

قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّفِيْعَ يَدَّعِيْ اِسْتِحْقَاقَ الدَّارِ عَلَيْهِ الخ : উক্ত মাসআলায় ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হচ্ছে নবী করীম ﷺ -এর বাণী– اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ এর ভিত্তিতে মূলনীতি হচ্ছে বিবাদ বা মামলার ক্ষেত্রে যে দাবিদার সাব্যস্ত হয় তার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয় আর যে দাবি অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হয় দাবিদারের সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে সেই অস্বীকারকারীর কথা আল্লাহর নামে শপথসহকারে গৃহীত হয়। আলোচ্য সুরতে শফী' হচ্ছে দাবিদার আর ক্রেতা হচ্ছে অস্বীকারকারী। কাজেই ক্রেতার কথা আল্লাহর নামে শপথ সহকারে গৃহীত হবে। শফী' দাবিদার হওয়ার কারণ হচ্ছে, যে মূল্যে ক্রেতা ক্রয় করেছে বলে শফী' দাবি করছে তার দাবি অনুসারে সেই মূল্য আদায় করে দিলে ক্রেতার উপর জমিটি ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ সে কম মূল্যে উক্ত বাড়িটির হকদার হওয়ার দাবি করছে। আর ক্রেতা শফী'র এই দাবি অর্থাৎ কম মূল্যে বাড়িটিতে শফী'র হকের কথা অস্বীকার করছে। কাজেই শফী' হচ্ছে দাবিদার আর ক্রেতা হচ্ছে সে দাবির অস্বীকারকারী। সুতরাং ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَتَحَالَفَانِ لِأَنَّ الشَّفِيْعَ اِنْ كَانَ يَدَّعِىْ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ক্রয়বিক্রয়ের মাসআলা ও শুফ'আর মাসআলার বিধানের পার্থক্য ও তার কারণ বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়ের মাসআলায় যদি বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে মূল্য নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং কারো সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে তাহলে উভয়কে আল্লাহর নামে শপথ করা আবশ্যক হয় এবং তারপর বিচারক চুক্তিটি ভঙ্গ করে দেন। কিন্তু আলোচ্য শুফ'আর মাসআলায় মূল্য নিয়ে শফী' ও ক্রেতার মাঝে মতবিরোধের ক্ষেত্রে উপরে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্রেতা কেবল শপথ করে তার অস্বীকারের কথা বলবে, তারপর তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয়ের ন্যায় উভয়ের নিকট হতে শপথ গ্রহণ করা হবে না। মুসান্নিফ (র.)-এর কারণ এখানে বর্ণনা করছেন।

কারণ বিশ্লেষণ : ক্রয়বিক্রয়ের মাসআলায় দুটি সুরত রয়েছে। একটি হচ্ছে, ক্রেতা বিক্রেয়-দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া। এ সুরতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নিকট হতে শপথ গ্রহণ করা হয় এবং কিয়াসের দাবিও তাই। কেননা এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে দাবিদার আবার উভয়ে অস্বীকারকারী। কেননা বিক্রয় চুক্তির পর ক্রেতার নিকট বিক্রেতার মূল্য প্রাপ্য সাব্যস্ত হয় আর বিক্রেতার নিকট ক্রেতার বিক্রেয়-দ্রব্য প্রাপ্য হয়। এখন বিক্রেতা ক্রেতার নিকট অধিক মূল্য প্রাপ্য দাবি করছে আর ক্রেতা তা অস্বীকার করছে। অপরদিকে ক্রেতা কম মূল্যে বিক্রেয়-দ্রব্য প্রাপ্য বলে দাবি করছে আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করছে। সুতরাং যখন উভয়ে অস্বীকারকারী হচ্ছে তখন উভয়ের নিকট হতে শপথ গ্রহণ করা হবে। কেননা অস্বীকারকারীর নিকট হতেই শপথ গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় সুরত হলো, ক্রেতা বিক্রেয়-দ্রব্য হস্তগত করার পর মূল্য নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া। এ সুরতে কিয়াসের দাবি অনুসারে শুধুমাত্র ক্রেতার নিকট হতে শপথ গ্রহণ করার কথা। কেননা এক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট কিছু দাবি করছে না, কেননা সে ইতোমধ্যে বিক্রেয়-দ্রব্য হস্তগত করে ফেলেছে। বিক্রেতা কেবল ক্রেতার নিকট অতিরিক্ত মূল্য প্রাপ্য হওয়ার দাবি করছে আর ক্রেতা তা অস্বীকার করছে। কাজেই কেবল ক্রেতার নিকট হতেই শপথ গ্রহণ করার কথা। কিন্তু কিয়াসের বিপরীতে হাদীসের ভিত্তিতে এক্ষেত্রেও উভয়ের নিকট হতে শপথ গ্রহণ করে চুক্তি রহিত করে দেওয়ার বিধান। হাদীসটি হচ্ছে- اِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادَّا "যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা মতবিরোধ করে এবং দ্রব্যটি বিদ্যমান থাকে তাহলে তারা উভয়ে শপথ করে বলবে এবং উভয়ে উভয়ের দ্রব্য ফেরত দেবে।"

আমাদের আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বলেন, শুফ'আর মাসআলায় শফী' ও ক্রেতার মতবিরোধের ক্ষেত্রে উভয়ের নিকট হতে শপথ গ্রহণ করা হবে না। তার কারণ হচ্ছে, এক্ষেত্রে উভয়ে অস্বীকারকারী নয়; তাই কিয়াসের দাবি অনুসারেও উভয়ে শপথ করবে না। আর এক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ হতে কোনো বাণী (نَصّ) ও নেই। তাই শরিয়তের বাণী (نَصّ) -এর ভিত্তিতে কিয়াসের বিপরীত বিধান হিসেবেও উভয়ে শপথ করবে না; বরং কিয়াসের দাবি অনুসারে যে একজন অস্বীকারকারী সেই [অর্থাৎ ক্রেতা] শপথ করবে এবং তার কথা গৃহীত হবে।

এক্ষেত্রে উভয়ে যে অস্বীকারকারী নয় তার কারণ হচ্ছে, এখানে ক্রেতার বিপক্ষে শফী' [তার দাবিকৃত কম মূল্যের বিনিময়ে] ক্রেতার নিকট জমি বা বাড়িটি প্রাপ্য হওয়ার কথা দাবি করছে আর ক্রেতা এই কম মূল্যে প্রাপ্য হওয়ার কথা অস্বীকার করছে। পক্ষান্তরে ক্রেতা মূলত শফী'র নিকট কোনো কিছু দাবি করছে না। কেননা শফী' ইচ্ছা করলে বেশি মূল্যে বাড়িটি নিতেও পারে আবার ইচ্ছা না থাকলে তা পরিত্যাগও করতে পারে। আর কেউ কোনো কিছু দাবি করলে সে দাবি সাব্যস্ত ধরে নিলে অপর পক্ষের জন্য যদি তা প্রদান করা বা না করার ইচ্ছাধিকার থাকে তাহলে সেটি দাবি হিসেবে গণ্য হয় না। সুতরাং এখানে যদিও ক্রেতা বেশি মূল্যের কথা দাবি করছে কিন্তু তার এ দাবি সঠিক হলেও শফী'র জন্য তা প্রদান করা অপরিহার্য নয়। কেননা জমিটি গ্রহণ করা বা না করা উভয়টির ইচ্ছাধিকার তার রয়েছে। অতএব, এক্ষেত্রে দাবিদার কেবল শফী'ই প্রমাণিত হচ্ছে। তাই অস্বীকারকারী হিসেবে কেবল ক্রেতাই শপথ করবে এবং তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যেহেতু এক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয়ের মাসআলার ন্যায় কোনো শরিয়তের বাণী (نَصٌ) নেই। তাই কিয়াসের দাবি অনুসারেই বিধান হবে। আর তা হচ্ছে, অস্বীকারকারী একজন হলে সেই কেবল শপথ করবে এবং তার কথাই গৃহীত হবে।

আর ক্রয়বিক্রয়ের মাসআলায় কিয়াসের পরিপন্থি শরিয়তের বাণী (نَصٌ) রয়েছে, তাই সেখানে একজন অস্বীকারকারী হওয়া সত্ত্বেও দুজনের নিকট হতে শপথ গ্রহণ করার বিধান হয়েছে। শুফ'আর মাসআলায় যদিও শফী' ও ক্রেতা একদিক থেকে বিক্রেতা ও ক্রেতার মতো, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এটি ক্রয়বিক্রয়ের মতো নয়। কেননা শুফ'আর ক্ষেত্রে কেবল ক্রয়বিক্রয়ের 'রোকন' পাওয়া যায়। কিন্তু 'রোকনের শর্ত' পাওয়া যায় না। 'রোকন' হচ্ছে সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ আদান-প্রদান, আর তার শর্ত হচ্ছে 'উভয়ের সন্তুষ্টি'। 'উভয়ের সন্তুষ্টি' এ শর্তটি যেহেতু শুফ'আর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, তাই এটি সর্বদিক থেকে ক্রয়বিক্রয়ের মতো নয়। সুতরাং ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে শরিয়তের বাণী রয়েছে তা কিয়াসের পরিপন্থি হওয়ার কারণে শুফ'আর মাসআলা তার আওতাভুক্ত হবে না।

উল্লেখ্য, উপরে আমরা যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মতবিরোধের বিধানের দুটি সুরত ও কোন্‌টি কিয়াসের দাবির অনুকূল ও কোন্‌টি কিয়াসের পরিপন্থি– এ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তা বিস্তারিতভাবে মুসান্নিফ (র.) হিদায়ার তৃতীয় খণ্ডে كِتَابُ الدَّعْوٰى 'দাবি অধ্যায়'-এর অধীনে بَابُ التَّحَالُفِ -এর শুরুর দিকে ১৯৩ ও ১৯৪ নং পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন। সেখান হতে সামান্য ইবারত নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

وَهٰذَا التَّحَالُفُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلٰى وِفَاقِ الْقِيَاسِ، لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِيْ زِيَادَةَ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِيْ يُنْكِرُهَا . وَالْمُشْتَرِيْ يَدَّعِيْ وُجُوْبَ تَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ بِمَا نَقَدَ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ . فَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ، فَيَحْلِفُ . فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَمُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ . لِأَنَّ الْمُشْتَرِيْ لَا يَدَّعِيْ شَيْئًا . لِأَنَّ الْمَبِيْعَ سَالِمٌ لَهٗ . فَبَقِيَ دَعْوَى الْبَائِعِ فِيْ زِيَادَةِ الثَّمَنِ. وَالْمُشْتَرِيْ يُنْكِرُهَا، فَيَكْتَفِيْ بِحَلْفِهٖ . لٰكِنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ . وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادَّا .

[উল্লেখ্য, উপরে মাসআলাটির আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, এটিই অধিক স্পষ্ট। কিন্তু হিদায়ার কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থে এভাবে স্পষ্ট করা হয়নি। এ সম্পর্কে تَكْمِلَةُ فَتْحِ الْقَدِيْرِ) نَتَائِجُ الْاَفْكَارِ) দ্রষ্টব্য]

قَالَ : وَلَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ لِلشَّفِيْعِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) اَلْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِيْ ـ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إِثْبَاتًا. فَصَارَ كَبَيِّنَةِ الْبَائِعِ وَالْوَكِيْلِ وَالْمُشْتَرِيْ مِنَ الْعَدُوِّ ـ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا تُنَافِيْ بَيْنَهُمَا ، فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْمَوْجُوْدَ بَيْعَانِ، وَلِلشَّفِيْعِ أَنْ يَأْخُذَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ـ وَهٰذَا بِخِلَافِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِيْ ـ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَالٰى بَيْنَهُمَا عَقْدَانِ إِلَّا بِانْفِسَاخِ الْأَوَّلِ،

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি ক্রেতা এবং শফী' উভয়েই সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে তাহলে শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। কেননা তার সাক্ষ্য-প্রমাণ অধিক মূল্য সাব্যস্ত করছে। সুতরাং তার সাক্ষ্য-প্রমাণ বিক্রেতা, প্রতিনিধি ও শত্রুর নিকট হতে ক্রয়কারীর সাক্ষ্য-প্রমাণের মতো হলো। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, ক্রেতা ও শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কাজেই ধরে নিতে হবে যে, এখানে দুটি বিক্রয় চুক্তি রয়েছে। শফী' দুটির যে কোনো একটির মূল্যে সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারে। পক্ষান্তরে ক্রেতার সাথে বিক্রেতার [সাক্ষ্য-প্রমাণের] বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের মাঝে পরপর দুটি বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না, যদি প্রথমটি রহিত করা না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ لِلشَّفِيْعِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ الخ : পূর্বে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি শফী' ও ক্রেতার মাঝে শুফ'আর দাবিকৃত বাড়ির মূল্য নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে [যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে] ক্রেতার কথা শপথসহকারে গ্রহণযোগ্য হবে। আলোচ্য ইবারতে বলা হচ্ছে যে, যদি ক্রেতা ও শফী' উভয়েই তাদের নিজ দাবির উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাহলে কার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে– সে সম্পর্কে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এক্ষেত্রে শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। মূল ইবারত তথা 'মতনে' ইমাম কুদূরী (র.) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতটি উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, আলোচ্য মাসআলায় দুররে মুখতার ও ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতটিই গ্রহণ করা হয়েছে। –[দ্র. ফতোয়ায়ে শামী- খ. ৯, পৃ. ৩৩৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া।]

(উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে এক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী হওয়ার কারণে উভয়ের সাক্ষ্য প্রমাণই বাতিল বলে গণ্য হবে। অতঃপর ক্রেতার কথা শপথ সহকারে গৃহীত হবে।]

قَوْلُهُ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إِثْبَاتًا : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল বর্ণনা করছেন। তাঁর দলিল হচ্ছে, আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ অতিরিক্ত বিষয় সাব্যস্ত করছে শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণের তুলনায়। অর্থাৎ শফী' ও ক্রেতার মাঝে মতবিরোধের সুরত তো কেবল এটাই যে, ক্রেতা বলে আমি বেশি মূল্যে বাড়িটি ক্রয় করেছি। আর শফী' বলে যে, তুমি কম মূল্যে ক্রয় করেছ। উদাহরণস্বরূপ ক্রেতা বলল, আমি বাড়িটি দু হাজার টাকায় ক্রয় করেছি,

আর শফী' বলল, তুমি বাড়িটি এক হাজার টাকায় ক্রয় করেছ। অতঃপর যখন উভয়ে তাদের দাবির সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে তখন স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অধিক সাব্যস্ত হয় শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণের চেয়ে। যেমন উক্ত উদাহরণে শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় ক্রয়মূল্য এক হাজার টাকা আর ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় দুই হাজার টাকা। কাজেই ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অধিক সাব্যস্ত হচ্ছে। সুতরাং তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা যার সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অধিক সাব্যস্ত হয় (اَكْثَرُ إِثْبَاتًا) তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হয়।

قَوْلُهُ : فَصَارَ كَبَيِّنَةِ الْبَائِعِ وَالْوَكِيْلِ وَالْمُشْتَرِىْ مِنَ الْعَدُوِّ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সমর্থনে কিয়াস হিসেবে উক্ত মাসআলার তিনটি নজির উল্লেখ করেছেন। এই তিনটি নজিরে সকলের ঐকমত্যে যার সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অধিক সাব্যস্ত হয় তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়। কাজেই আলোচ্য মাসআলার বিধানও তাই হবে।

اَلْبَائِعُ- প্রথম নজির হচ্ছে, বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণের মাসআলা। অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে যদি মূল্য নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, বিক্রেতা বেশি মূল্যে দ্রব্যটি বিক্রয় করেছে বলে দাবি করে আর ক্রেতা তা কম মূল্যে ক্রয় করেছে বলে দাবি করে। অতঃপর উভয়ে তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাহলে সকলের ঐকমত্যে বিক্রেতার সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হয়। কেননা বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ অধিক মূল্য সাব্যস্ত করছে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণের তুলনায়। তাই বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও যেহেতু ক্রেতা অধিক মূল্যে ক্রয় করার কথা দাবি করছে সেহেতু তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে।

وَالْوَكِيْلُ - দ্বিতীয় নজির হচ্ছে, প্রতিনিধি (اَلْوَكِيْلُ) -এর সাক্ষ্য-প্রমাণের মাসআলা। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো কিছু ক্রয় করার জন্য কাউকে প্রতিনিধি বানায়, অতঃপর প্রতিনিধি উক্ত দ্রব্য ক্রয় করে আনার পর প্রতিনিধি ও তার মুয়াক্কিল [যে প্রতিনিধি বানিয়েছে]-এর মাঝে দ্রব্যটির মূল্য নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, প্রতিনিধি বেশি মূল্যে ক্রয় করার কথা দাবি করে আর মুয়াক্কিল কম মূল্যে ক্রয় করার কথা বলে এবং উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে তাহলে সকলের মতে প্রতিনিধির সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। কেননা প্রতিনিধির সাক্ষ্য-প্রমাণ অতিরিক্ত মূল্য সাব্যস্ত করছে। কাজেই তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হবে।

وَالْمُشْتَرِىْ مِنَ الْعَدُوِّ তৃতীয় নজির হচ্ছে, কাফের শত্রুর নিকট হতে ক্রয়কারীর সাক্ষ্য-প্রমাণের মাসআলা। অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রের কোনো মুসলিম মনিবের একটি গোলাম পলায়ন করে কাফের রাষ্ট্রে চলে গেল। অতঃপর কোনো মুসলিম ব্যক্তি ভিসা নিয়ে উক্ত কাফের রাষ্ট্রে গিয়ে উক্ত গোলামটিকে কাফেরদের নিকট হতে ক্রয় করে নিয়ে এলো। এক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, গোলামটির পূর্বে যে মালিক ছিল সে ইচ্ছা করলে এ ক্রেতার নিকট হতে গোলামটি নিতে পারবে। তবে ক্রয়কারী যে মূল্য দিয়ে গোলামটি ক্রয় করে এনেছে তা তাকে পরিশোধ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে যদি পূর্বের মালিক ও কাফেরদের নিকট হতে ক্রয়কারীর মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, পূর্বের মালিক দাবি করে ক্রেতা কম মূল্যে ক্রয় করে এনেছে আর ক্রেতা দাবি করে সে বেশি মূল্যে ক্রয় করে এনেছে এবং উভয়ে তাদের দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাহলে ক্রেতা [অর্থাৎ কাফেরদের নিকট হতে ক্রয়কারী]-র সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। কারণ তার সাক্ষ্য-প্রমাণে অধিক বিষয় [মূল্য] সাব্যস্ত হচ্ছে, কাজেই তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। অনুরূপভাবে আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও শফী'র বিপক্ষে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা শফী'র তুলনায় ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ অধিক মূল্য সাব্যস্ত করছে।

সারকথা, উক্ত তিনটি নজিরেই যার সাক্ষ্য-প্রমাণে অধিক বিষয় [মূল্য] সাব্যস্ত হয় তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয়। সুতরাং এ তিনটি নজিরের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে আমাদের আলোচ্য মাসআলা তথা শুফ'আর ক্ষেত্রেও। যেহেতু শফী'র তুলনায় ক্রেতার দাবি অধিক মূল্য তাই ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। এ হচ্ছে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের দলিল।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল বর্ণনা করছেন। তাঁদের দলিল হচ্ছে, শফী' ও ক্রেতা যে তাদের বক্তব্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করেছে– এক্ষেত্রে যদিও ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ বেশি মূল্য সাব্যস্ত করে আর শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণ কম মূল্য সাব্যস্ত করে তা সত্ত্বেও উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণের মাঝে মূলত বৈপরীত্য অনিবার্যভাবে সাব্যস্ত হচ্ছে না। কেননা এটা ধরে নেওয়া সম্ভব যে, উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণই সত্য ও সঠিক। এভাবে যে, ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে জমিটি দু-বার ক্রয় করেছে। একবার এক মূল্যে ক্রয় করার পর তারা ক্রয়বিক্রয় প্রত্যাহার করেছে। তারপর পুনরায় আবার নতুন মূল্যে ক্রয় করেছে। আর এখন একজনের সাক্ষ্য-প্রমাণ সেই দুটি বিক্রয়ের একটির সাক্ষ্য বহন করছে। আর অপরজনের সাক্ষ্য-প্রমাণ অপর বিক্রয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। আর নিয়ম হচ্ছে, যদি উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ সঠিক ধরা যায় বা উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয় তাহলে উভয়টিকেই সঠিক ধরা হবে। একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। অতএব, যখন ক্রেতা ও শফী'র উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ সঠিক ধরে দু-বার দুই মূল্যে বিক্রয় হয়েছে বলে গণ্য হয়েছে, তখন শফী' উক্ত দুই মূল্যের মধ্য হতে যে কোনো একটির বিনিময়ে জমিটি গ্রহণ করার অধিকার লাভ করবে। কেননা বিক্রেতা যে মূল্যে জমিটি বিক্রয় করে সেই মূল্যেই শফী' তা গ্রহণ করার অধিকার পায়। কাজেই সে তার অধিকার অনুযায়ী কম মূল্যেই জমিটি নিয়ে নেবে। এভাবে সারকথা এই দাঁড়ায় যে, এক্ষেত্রে শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে। এর অর্থ হচ্ছে, সে তার দাবি অনুসারে কম মূল্যেই বাড়ি বা জমিটি লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِخِلَافِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِيْ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে পেশকৃত তিনটি নজিরের জবাব দিচ্ছেন। প্রথম নজির তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা মূল্য নিয়ে মতবিরোধ করলে সেক্ষেত্রে যে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয় তার জবাব হচ্ছে, উপরে শফী' ও ক্রেতার ক্ষেত্রে আমরা যে বলেছি, উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ সঠিক ধরে ক্রেতা দু-বার ক্রয় করেছে বলে গণ্য হতে পারে। এ বিষয়টি ক্রেতা ও বিক্রেতার মতবিরোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন মূল্য নিয়ে মতবিরোধ করে এবং প্রত্যেকে তার দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে তখন এটা ধরা সম্ভব নয় যে, তাদের মাঝে ক্রয়বিক্রয় দু-বার হয়েছে এবং উভয় ক্রয়বিক্রয়ই সঠিক রয়েছে; বরং তাদের মাঝে একবার বিক্রয় চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার চুক্তি হতে হলে প্রথম চুক্তিটি রহিত হওয়া আবশ্যক। ফলে প্রথম চুক্তি যদি রহিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার চুক্তি হয়ে থাকে তাহলে ক্রেতার উপর দ্বিতীয়বার যে মূল্য নির্ধারিত হয় তা পরিশোধ করাই আবশ্যক। এক্ষেত্রে সে প্রথমবারের মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না। কেননা রহিত হওয়ার পর তা কোনোভাবে তাদের মাঝে কার্যকর থাকে না। সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতার যে কোনো একজনের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। এক্ষেত্রে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ অগ্রাধিকার পাবে। কেননা তার সাক্ষ্য-প্রমাণে অধিক [মূল্য] সাব্যস্ত হয়। আর যার সাক্ষ্য-প্রমাণে অধিক সাব্যস্ত হয় তার সাক্ষ্য-প্রমাণ অগ্রাধিকার লাভ করে।

وَهٰهُنَا الْفَسْخُ لَا يَظْهَرُ فِى حَقِّ الشَّفِيْعِ . وَهُوَ التَّخْرِيْجُ لِبَيِّنَةِ الْوَكِيْلِ . لِأَنَّهُ كَالْبَائِعِ وَالْمُوَكِّلُ كَالْمُشْتَرِىْ مِنْهُ كَيْفَ وَإِنَّهَا مَمْنُوْعَةٌ عَلٰى مَا رُوِىَ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) وَأَمَّا الْمُشْتَرِىْ مِنَ الْعَدُوِّ قُلْنَا ذُكِرَ فِى السِّيَرِ الْكَبِيْرِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ الْقَدِيْمِ ، فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ . وَبَعْدَ التَّسْلِيْمِ نَقُوْلُ لَا يَصِحُّ الثَّانِىْ هُنَالِكَ إِلَّا بِفَسْخِ الْأَوَّلِ ، أَمَّا هٰهُنَا بِخِلَافِهِ . وَلِأَنَّ بَيِّنَةَ الشَّفِيْعِ مُلْزِمَةٌ وَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِىْ غَيْرُ مُلْزِمَةٍ ، وَالْبَيِّنَاتُ لِلْإِلْزَامِ .

অনুবাদ : আর আলোচ্য ক্ষেত্রে রহিতকরণের প্রভাব শফী'র ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না। এ তাৎপর্যটিই প্রতিনিধির সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয়েও প্রযোজ্য। কেননা প্রতিনিধি বিক্রেতার পর্যায়ের আর মুয়াক্কিল তার নিকট হতে ক্রয়কারীর পর্যায়ের। কিভাবেই বা [প্রতিনিধির মাসআলার উপর কিয়াস সঠিক হতে] পারে! অথচ ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী প্রতিনিধির সাক্ষ্য-প্রমাণ অগ্রহণযোগ্য। আর শত্রুর নিকট হতে ক্রয়কারীর মাসআলাটির ক্ষেত্রে আমরা বলব যে, 'সিয়ারে কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, পুরাতন মালিকের সাক্ষ্য-প্রমাণই প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই আমরা এক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধানটি অস্বীকার করতে পারি। আর বিধানটি যদি মেনে নেই তাহলে আমরা বলব, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিক্রয় সহীহ হচ্ছে কেবল প্রথম বিক্রয় রহিত করার পর। পক্ষান্তরে এখানের [আলোচ্য] মাসআলায় বিষয়টি ভিন্ন। তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো, শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণ হলো এমন যা [প্রতিপক্ষকে কোনো কিছু] মেনে নিতে বাধ্য করছে। পক্ষান্তরে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ কোনো কিছু মেনে নিতে বাধ্য করছে না। আর সাক্ষ্য-প্রমাণ মূলত [বিপক্ষকে] মেনে নিতে বাধ্য করার জন্যই [শরিয়তে] নির্ধারিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰهُنَا الْفَسْخُ لَا يَظْهَرُ فِى حَقِّ الشَّفِيْعِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের মূল আলোচ্য মাসআলা তথা শফী' ও ক্রেতার মতবিরোধের মাসআলায় আমরা যে বলেছি "উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ সঠিক ধরে দু-বার বিক্রয় হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং শফী' তন্মধ্য হতে কম মূল্যের চুক্তিটি অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করবে"– এক্ষেত্রে এ জটিলতা সৃষ্টি হবে না যে, দ্বিতীয়বার বিক্রয় হতে হলে তো প্রথম বিক্রয় রহিত করে দ্বিতীয়বার চুক্তি হতে হবে। ফলে প্রথমবারের বিক্রয় আর কার্যকর থাকবে না এবং শফী' সে চুক্তির মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন বরং দ্বিতীয়বারের মূল্যই পরিশোধ করতে হবে। এ প্রশ্ন এখানে দেখা দেবে না তার কারণ হচ্ছে, ক্রেতার একবার বাড়ি ক্রয় করার পর যদি সেই ক্রয়বিক্রয় কোনোভাবে রহিত করে বা প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তা শফী'র ক্ষেত্রে রহিত হিসেবে গণ্য হয় না। এই রহিতকরণের বিষয়টি কেবল ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই ক্রেতা যদি একবার চুক্তি রহিত করে দ্বিতীয়বার আবার ক্রয় করে তাহলে উভয় চুক্তিই শফী'র ক্ষেত্রে কার্যকর হিসেবে থেকে যাবে। সুতরাং সে যে কোনো একটি চুক্তি অনুসারে মূল্য পরিশোধ করার ইচ্ছাধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ التَّخْرِيجُ لِبَيِّنَةِ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ كَالْبَائِعِ وَالْمُوَكِّلُ كَالْمُشْتَرِي مِنْهُ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ হতে পেশকৃত দ্বিতীয় নজিরের জবাব দিয়েছেন। দ্বিতীয় নজির ছিল প্রতিনিধি ও মুয়াক্কিলের মাঝে মূল্য নিয়ে মতবিরোধের মাসআলা। মুসান্নিফ (র.) বলেন, প্রথম নজিরের জবাবে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছি দ্বিতীয় নজির তথা প্রতিনিধি ও মুয়াক্কিলের ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য। কেননা ইতঃপূর্বে আমরা [একাধিক স্থানে] উল্লেখ করে এসেছি যে, প্রতিনিধি (اَلْوَكِيلُ) ও মুয়াক্কিলের মাঝে সম্পর্ক ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্কের মতোই। কারণ বিধানগত দিক থেকে তাদের মাঝে 'পারস্পরিক সম্পদের বিনিময়' হয়। ফলে প্রতিনিধি দ্রব্যটি প্রদান করার ক্ষেত্রে বিক্রেতার পর্যায়ভুক্ত আর মুয়াক্কিল তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ক্রেতার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং প্রতিনিধি ও মুয়াক্কিলের মাঝে যখন মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, প্রতিনিধি বেশি মূল্যে ক্রয় করেছে বলে দাবি করে আর মুয়াক্কিল দাবি করে যে প্রতিনিধি কম মূল্যে ক্রয় করেছে এবং উভয় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তখন তাদের উভয়ের সাক্ষ্য প্রমাণ সঠিক ধরে দুইবার তাদের মাঝে বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা সম্ভব নয়। কেননা এক্ষেত্রেও দ্বিতীয়বার বিক্রয় হওয়ার জন্য প্রথমবারের বিক্রয় রহিতকরণ আবশ্যক। আর প্রথমবারের বিক্রয় রহিত হলে তা আর তাদের মাঝে কার্যকর হিসেবে থাকে না। কাজেই একটি চুক্তিই বহাল ধরতে হবে। সুতরাং একজনের সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হবে। আর এক্ষেত্রে প্রতিনিধির সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণ করা হবে। কেননা তার সাক্ষ্য-প্রমাণ অধিক [মূল্য] সাব্যস্ত করে। সারকথা প্রথম নজির তথা ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে যে কারণে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয় বলে আমরা উল্লেখ করে এসেছি ঠিক একই কারণে প্রতিনিধি ও মুয়াক্কিলের মাসআলায়ও প্রতিনিধির সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে।

قَوْلُهُ كَيْفَ وَأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে পেশকৃত দ্বিতীয় নজিরটির আরেকটি জবাব দিয়েছেন। এ জবাবের সারকথা হচ্ছে, এ মাসআলাকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের স্বপক্ষে নজির হিসেবে পেশ করা আরো একটি কারণে সঠিক নয়। তা হচ্ছে, 'জাহিরী রেওয়ায়েতের বাইরে' একটি রেওয়ায়েত মতে এক্ষেত্রে যে প্রতিনিধির সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হবে তা সকলের ঐকমত্যে নয়; বরং এ রেওয়ায়েত অনুসারে মুয়াক্কিলের সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে ইবনু সামা'আহ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যখন প্রতিনিধির সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হওয়ার বিধানটিতে মতবিরোধ রয়েছে তখন এটিকে বিপক্ষ তথা ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের বিপরীতে নজির হিসেবে পেশ করা সঠিক কিভাবে হবে? [উল্লেখ্য, এ রেওয়ায়েতটি হচ্ছে 'জাহিরী রেওয়ায়েতের বিপরীত' (غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ)। পক্ষান্তরে জাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী সকলের মতে প্রতিনিধির সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। সেক্ষেত্রে প্রথম জবাবটিই কেবল প্রযোজ্য হবে।]

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ قُلْنَا ذُكِرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে পেশকৃত তৃতীয় নজিরের জবাব দিয়েছেন। তৃতীয় নজিরটি ছিল, কাফেরদের নিকট হতে গোলাম ক্রয়কারী ও গোলামের পূর্বের মালিকের মাঝে মতবিরোধের মাসআলা। এক্ষেত্রেও মুসান্নিফ (র.) দুটি জবাব উল্লেখ করেছেন। প্রথম জবাব হচ্ছে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর রচিত 'আস সিয়ারুল কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এক্ষেত্রে গোলামের পূর্বের মালিকের সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত সেখানে উল্লেখ করেননি। কাজেই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ বর্ণনা অনুসারে আমরা বলতে পারি যে, এ মাসআলাকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্যের পক্ষে নজির হিসেবে পেশ করা সঠিক হবে না। কেননা এক্ষেত্রে পূর্বের মালিকের সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হয়। কাজেই এ কথা সঠিক নয় যে, এ মাসআলায় যেমন কাফেরদের নিকট হতে ক্রয়কারীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয়, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ অধিক [মূল্য যা ক্রয়কারী দাবি করে তা] সাব্যস্ত করার কারণে। তদ্রূপ ক্রেতা ও শফী'র ক্ষেত্রেও ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ অধিক [মূল্য] সাব্যস্ত করার কারণে গৃহীত হবে।

قَوْلُهُ وَبَعْدَ التَّسْلِيْمِ نَقُوْلُ لَا يَصِحُّ الثَّانِيْ الخ : এখান থেকে দ্বিতীয় জবাবটি বর্ণনা করেছেন। এ জবাবের সারকথা হচ্ছে, যদি আমরা মেনে নেই যে, কাফেরদের নিকট হতে গোলামটি ক্রয়কারী ও গোলামের পূর্বের মালিকের মতবিরোধের ক্ষেত্রে সকলের মতেই ক্রয়কারীর সাক্ষ্য-প্রমাণই গৃহীত হবে তবুও এক্ষেত্রে আমরা বলব, পূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় নজিরের জবাবে যে বিষয়টি আমরা উল্লেখ করেছি তা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যখন ক্রেতা ও গোলামের পূর্বের মালিকের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তখন উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ সঠিক ধরে ক্রেতা দু-বার ক্রয়চুক্তি করেছে বলে গণ্য করা সম্ভব নয়। কেননা প্রথমবার ক্রেতা ক্রয় করার পর দ্বিতীয়বার ক্রয় করতে হলে প্রথম ক্রয়চুক্তি রহিত করা অপরিহার্য। আর প্রথম চুক্তিটি রহিত করলে তা আর ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কোনোভাবে কার্যকর থাকে না। কাজেই এ কথা বলা যায় না যে, দু-বার ক্রয়বিক্রয় হয়েছে, তাই পূর্বের মালিক যে কোনো একটি মূল্যে গোলামটি নিয়ে নিতে পারবে; বরং এ কথা বলতে হবে যে, যে কোনো একজনের সাক্ষ্য-প্রমাণ সঠিক হবে। আর কাফেরদের নিকট হতে ক্রয়কারীর সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা তার সাক্ষ্য-প্রমাণ অধিক [মূল্য] সাব্যস্ত করছে। আর যার সাক্ষ্য-প্রমাণ অধিক সাব্যস্ত করে তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণ করা হয়।

পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য মূল মাসআলা তথা শফী' ও ক্রেতার মতবিরোধের মাসআলায় উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ সঠিক ধরে দুটি চুক্তিই বহাল ধরা সম্ভব [যার কারণ আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি]। কাজেই শফী' যে কোনো একটি চুক্তির মূল্য অনুসারে জমি বা বাড়িটি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং উভয় মাসআলার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। একটির কিয়াস অপরটির উপর সঠিক হবে না।

উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের পক্ষে একটি দলিল এবং তারপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে পেশকৃত নজিরসমূহের জবাব উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী ইবারতে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের পক্ষে আরেকটি দলিল বর্ণনা করছেন। প্রথম দলিলটি মূলত ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে বর্ণনা করেছেন এবং নিজে তা গ্রহণ করেছেন। আর নিম্নবর্ণিত দ্বিতীয় দলিলটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি নিজে তা অবলম্বন করেননি।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ بَيِّنَةَ الشَّفِيْعِ مُلْزِمَةٌ وَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِيْ غَيْرُ مُلْزِمَةٍ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের মূল আলোচ্য মাসআলা তথা শফী' ও ক্রেতার মতবিরোধ এবং উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষে দ্বিতীয় আরেকটি দলিল বর্ণনা করছেন। দলিলটি হলো, বাড়ির মূল্য নিয়ে যখন ক্রেতা ও শফী'র মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়; ক্রেতা বেশি মূল্যের কথা বলে আর শফী' কম মূল্যের কথা বলে এবং উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তখন শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে তার কারণ হলো, এক্ষেত্রে শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে এমন যে, তা গৃহীত হলে বিপক্ষ তথা ক্রেতার উপর সে মূল্যে জমিটি হস্তান্তর করা অপরিহার্য হয়। অর্থাৎ শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে, প্রতিপক্ষের উপর অপরিহার্যভাবে কিছু চাপিয়ে দেয় এমন। পক্ষান্তরে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে এমন যে, তা গৃহীত হলেও বিপক্ষ তথা শফী'র উপর কিছু অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত হয় না। কেননা ক্রেতার দাবি অনুসারে জমিটি বেশি মূল্যে বিক্রয় হয়েছে এ কথা সাব্যস্ত হলেও শফী'র জন্য জমিটি গ্রহণ করা অপরিহার্য হয় না; বরং সে ইচ্ছা করলে জমিটি গ্রহণ করতেও পারে আবার ইচ্ছে হলে গ্রহণ নাও করতে পারে। অর্থাৎ ক্রেতার সাক্ষ্যর প্রমাণ অনিবার্যরূপে কিছু সাব্যস্ত করে না। সুতরাং শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সাক্ষ্য-প্রমাণ শরিয়তে নির্ধারণ করাই হয়েছে বিপক্ষের উপর কোনো হক মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য এবং কোনো কিছু তার উপর অপরিহার্যরূপে সাব্যস্ত করার জন্য। অতএব, ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণে যেহেতু এ উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে না সেহেতু তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না। আর শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণে যেহেতু তা অর্জিত হচ্ছে তাই তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে।

قَالَ : وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِى ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ أَخَذَهَا الشَّفِيْعُ بِمَا قَالَهُ الْبَائِعُ، وَكَانَ ذٰلِكَ حَطًّا عَنِ الْمُشْتَرِى . وَهٰذَا لِأَنَّ الْأَمْرَ إِنْ كَانَ عَلٰى مَا قَالَ الْبَائِعُ فَقَدْ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ بِهِ . وَإِنْ كَانَ عَلٰى مَا قَالَ الْمُشْتَرِى فَقَدْ حَطَّ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ . وَهٰذَا الْحَطُّ يَظْهَرُ فِىْ حَقِّ الشَّفِيْعِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى . وَلِأَنَّ التَّمَلُّكَ عَلَى الْبَائِعِ بِإِيْجَابِهِ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِىْ مِقْدَارِ الثَّمَنِ مَا بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ، فَيَأْخُذُ الشَّفِيْعُ بِقَوْلِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি ক্রেতা একটা মূল্যের কথা দাবি করে আর বিক্রেতা তার চেয়ে কম মূল্যের কথা দাবি করে কিন্তু বিক্রেতা তখনও মূল্য হস্তগত করেনি তাহলে বিক্রেতা যে মূল্যের কথা বলেছে সেই মূল্যেই শফী' বাড়িটি নিয়ে নেবে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা যা কম বলেছে তা সে ক্রেতার উপর হ্রাস করে দিয়েছে বলে গণ্য হবে। এর কারণ হলো, বাস্তবে বিষয়টি যদি তা-ই হয়ে থাকে যা বিক্রেতা বলেছে তাহলে তো সে মূল্যেই শুফ'আ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি ক্রেতা যা বলেছে তাই বাস্তব হয়ে থাকে তাহলে [এমন হলো যে,] বিক্রেতা [কম দাবি করার মাধ্যমে] কিছু পরিমাণ মূল্য হ্রাস করে দিল। আর ক্রেতার এ হ্রাসকরণ শফী'র ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। এর কারণ আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আরেকটি কারণ হলো, বিক্রেতার বিপক্ষে শফী'র মালিকানার অধিকার লাভ হয়েছে বিক্রেতার [সম্পত্তি] বিক্রয় করার প্রস্তাব দেওয়ার কারণেই। কাজেই যতক্ষণ তার [মূল্য] দাবি করার অধিকার থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে তার কথা-ই গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং শফী' বিক্রেতার কথা অনুসারেই [সম্পত্তি] গ্রহণ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে শফী' ও ক্রেতার মাঝে মূল্য নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার বিধান কি হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখান থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে, যদি মূল্য সম্পর্কে বিক্রেতা ও ক্রেতার দাবির মাঝে বিরোধ দেখা দেয় তার বিধান। এক্ষেত্রে কয়েকটি সুরত হতে পারে: বিক্রেতা ইতোমধ্যে মূল্য হস্তগত করেছে কিংবা করেনি অথবা সে হস্তগত করেছে কিনা তা নিশ্চিতরূপে জানা নেই। আবার বিক্রেতার দাবি ক্রেতার দাবির চেয়ে কম কিংবা বেশি। এ সকল সুরতের বিধান এখান থেকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো–

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِى ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ الخ : যদি শুফ'আর দাবিকৃত জমি বা বাড়িটি কত টাকা মূল্যে ক্রেতা ক্রয় করেছে এ সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার বক্তব্যের মাঝে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে ক্রেতা যে পরিমাণ মূল্যের কথা দাবি করে, যদি বিক্রেতা তার চেয়ে কম মূল্যের কথা দাবি করে থাকে এবং বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে মূল্য হস্তগত এখনও না করে থাকে তাহলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে, বিক্রেতা ক্রেতার নিকট তার প্রাপ্য নির্ধারিত মূল্য হতে কিছু হ্রাস করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِأَنَّ الْأَمْرَ إِنْ كَانَ عَلٰى مَا قَالَ الْبَائِعُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত বিধানের দলিল বর্ণনা করছেন। তিনি দুটি দলিল বর্ণনা করেছেন। প্রথম দলিল হলো, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মূল্য নিয়ে মতবিরোধ হয়েছে তখন বাস্তবে তাদের যে কোনো একজনের বক্তব্য সঠিক হবে আর অপরজনের বক্তব্য মিথ্যা হবে। কিন্তু যার কথাই সঠিক হোক বিক্রেতার কথাই গ্রহণ করা হবে। কেননা যদি বাস্তবে বিক্রেতার কথা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো সেই মূল্যেই শফী' বাড়িটি লাভ করবে। আর যদি ক্রেতার কথা বাস্তবে সঠিক হয়ে থাকে তাহলে বিক্রেতা এখনো মূল্য গ্রহণ না করা সত্ত্বেও যখন কম মূল্যের কথা দাবি করছে তার অর্থ তখন এই ধরা হবে যে, সে তার প্রাপ্য মূল্যের কিছু অংশ হ্রাস করে দিয়েছে। আর বিক্রয়ের পর বিক্রেতা যদি ক্রেতার উপর হতে কিছু মূল্য হ্রাস করে দেয় তবে তা শফী'র ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়ে থাকে। অর্থাৎ হ্রাস করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তার বিনিময়েই শফী' বাড়ি বা জমিটি লাভ করে। সুতরাং বাস্তবে বিক্রেতার কথা সঠিক হোক চাই ক্রেতার কথা সঠিক হোক উভয় অবস্থাতেই বিক্রেতার কথা-ই ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى : মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিক্রয়ের পর বিক্রেতা যদি কিছু মূল্য হ্রাস করে দেয় তাহলে তা শফী'র ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। এর কারণ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য, এ আলোচনা মুসান্নিফ (র.) পরবর্তী পৃষ্ঠার মাঝামাঝি একটি অনুচ্ছেদ (فَصْلٌ فِيْمَا يُؤْخَذُ بِهِ الْمَشْفُوْعُ) -এর শুরুতে করেছেন। সেখানে যা উল্লেখ করেছেন তার সারকথা হচ্ছে, বিক্রেতা যদি মূল্যের আংশিক হ্রাস করে তাহলে তা শফী'র ক্ষেত্রে হ্রাস পাবে। আর যদি সম্পূর্ণ মূল্য ছেড়ে দেয় তাহলে তা শফী'র উপর হতে বাতিল হবে না। বরং সম্পূর্ণ মূল্যই বহাল থাকবে। কেননা আংশিক মূল্য হ্রাস করলে তা মূল চুক্তির সাথে সংযুক্ত হয় এবং যা অবশিষ্ট থাকে তাই মূল্য হিসেবে সাব্যস্ত হয়। কাজেই তা শফী'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কেননা শফী' মূল্যের বিনিময়েই জমি বা বাড়ি গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মূল্য যদি ছেড়ে দেয় তাহলে তা কোনোভাবে মূল চুক্তির সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা তাহলে চুক্তিটিতে কেবল বিক্রেয়-দ্রব্য থাকে মূল্য থাকে না। অথচ মূল্যবিহীন বিক্রয় সঠিক নয়। কাজেই তা শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ التَّمَلُّكَ عَلٰى الْبَائِعِ بِإِيْجَابِهِ الخ : এখান থেকে মূল মাসআলার দ্বিতীয় দলিল বর্ণনা করছেন। দ্বিতীয় দলিল হলো, শফী'র যে বিক্রেতার বিপক্ষে জমি বা বাড়ির মালিকানা লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এটি বিক্রেতার পক্ষ থেকেই সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ শফী'র এ অধিকার লাভ বিক্রেতার কথার উপরই কেবল নির্ভরশীল; ক্রেতার কথার উপর নির্ভরশীল নয়। এ কারণেই যদি বিক্রেতা বলে যে আমি বাড়িটি বিক্রয় করেছি কিন্তু ক্রেতা ক্রয়ের কথা অস্বীকার করে তাহলেও শফী'র শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে যখন বিক্রেতার বক্তব্যের মাধ্যমে অধিকারটি সাব্যস্ত হচ্ছে তখন মূ-ল্যের পরিমাণ সম্পর্কে তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে যদি সে তখনও মূল্য হস্তগত না করে থাকে এবং তা তার প্রাপ্য হিসেবে থেকে থাকে। [অবশ্য ইতোমধ্যে বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করে থাকলে প্রাপ্য হিসেবে আর না থাকার কারণে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না– যা একটু পরে আলোচনা করা হবে।]

قَالَ : وَلَوْ اِدَّعَى الْبَائِعُ الْاَكْثَرَ يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ ـ وَاَيُّهُمَا نَكَلَ ظَهَرَ اَنَّ الثَّمَنَ مَا يَقُوْلُهُ الْاٰخَرُ ـ فَيَاْخُذُهَا الشَّفِيْعُ بِذٰلِكَ ـ وَاِنْ حَلَفَا يَفْسِخُ الْقَاضِيْ الْبَيْعَ، عَلٰى مَا عُرِفَ ـ وَيَاْخُذُهَا الشَّفِيْعُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ ـ لِاَنَّ فَسْخَ الْبَيْعِ لَا يُوْجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الشَّفِيْعِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি বিক্রেতা [ক্রেতার দাবিকৃত মূল্যের চেয়ে] অধিক মূল্যের কথা দাবি করে তাহলে উভয়ে হলফ করবে এবং একে অপরের নিকট [হস্তগতকৃত বস্তু] ফিরিয়ে দেবে। যদি তাদের কোনো একজন হলফ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাহলে অপরজন যে মূল্যের কথা দাবি করেছিল তা-ই সঠিক মূল্য বলে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সেই মূল্যেই শফী' সম্পত্তিটি নিয়ে নেবে। আর যদি তারা উভয়ে হলফ করে তাহলে বিচারক বিক্রয়চুক্তিটি রহিত করে দেবেন, এর কারণ [পূর্বে দাবি উত্থাপন সংক্রান্ত অধ্যায়ে] জানা হয়েছে। আর শফী' ক্রেতা যে মূল্যের দাবি করেছে সে মূল্যে সম্পত্তিটি গ্রহণ করবে। কেননা বিক্রয়চুক্তি রহিতকরণ শফী'র অধিকারকে বাতিল করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَوْ اِدَّعَى الْبَائِعُ الْاَكْثَرَ يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ الخ : পূর্বের ইবারতে আলোচনা করা হয়েছিল বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে মূল্য নিয়ে মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি কম দাবি করে– তার বিধান নিয়ে। এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, তার বিপরীত তথা বিক্রেতা যদি ক্রেতার চেয়ে বেশি দাবি করে তার বিধান নিয়ে। যদি ক্রেতা যে মূল্যের কথা বলে বিক্রেতা তার চেয়ে অধিক মূল্যের কথা দাবি করে। যেমন– ক্রেতা বলল, 'বাড়িটি এক হাজার টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে' আর বিক্রেতা বলল, 'দুই হাজার টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে' আর বিক্রেতা এখনও মূল্য হস্তগত করেনি তাহলে বিধান হলো, [যদি কারো পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে তবে তার কথাই গ্রহণ করা হবে, যদি উভয়েই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাহলে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। আর যদি কারো পক্ষেই সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে তাহলে] বিচারক উভয়ের নিকট হতে হলফ গ্রহণ করবেন। প্রত্যেকেই নিজের বক্তব্যের কথা আল্লাহর নাম নিয়ে হলফ করে বলবে এবং একে অপরের দ্রব্য ফেরত দিয়ে দেবে। যদি বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্য হতে কেউ 'হলফ' করে বলতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে অপরজনের বক্তব্য সঠিক ধরে সে যে মূল্যের কথা বলেছে তাই মূল্য হিসেবে সাব্যস্ত হবে। শফী' সেই মূল্যেই গ্রহণ করবে। আর যদি উভয়ই তাদের বক্তব্য 'হলফ' করে বলে তাহলে বিচারক বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে সংঘঠিত চুক্তিটি রহিত করে দেবেন [যার কারণ ইতঃপূর্বে كِتَابُ الدَّعْوٰى-এ আলোচনা করা হয়েছে।] অতঃপর শফী' বিক্রেতা যে মূল্যের কথা বলেছে সে মূল্যে বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে বিচারক বিক্রয় চুক্তি রহিত করে দেওয়ার কারণে শফী'র অধিকার বাতিল হয়ে যাবে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّ فَسْخَ الْبَيْعِ لَا يُوْجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الشَّفِيْعِ : বিক্রেতা ও ক্রেতা 'হলফ' করার পর বিচারক উভয়ের মাঝে সংঘটিত চুক্তিটি রহিত করে দেওয়ার পরও শফী'র অধিকার বহাল থাকার কারণ বর্ণনা করছেন। তা হচ্ছে, বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে বিক্রয়চুক্তিটি রহিত করলে তা শফী'র অধিকারকে বাতিল করে না। কেননা শুফ'আর ভিত্তিতে শফী'র জমি বা বাড়িটি গ্রহণ করার জন্যই বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে চুক্তি রহিতকরণ আবশ্যক হয় [যা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে]। কেননা, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন বিক্রেতার নিকট হতে শফী' জমি বা বাড়িটি গ্রহণ করে তখন ক্রেতাকে উপস্থিত করে বিচারক ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে সম্পাদিত চুক্তিটি রহিত করে দেবেন। সুতরাং যে রহিতকরণ শুফ'আর স্বার্থে করতে হয় তা শুফ'আকে বাতিল করতে পারে না; বরং তা শুফ'আকে মজবুত করতে পারে। অতএব, বিচারক ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে চুক্তিটি রহিত করার কারণে শফী'র অধিকার বহালই থেকে যাবে। আর যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে চুক্তিটি রহিত হয়ে গেছে তখন ক্রেতার কোনো সম্পর্ক না থাকার কারণে শফী' বিক্রেতার বক্তব্য অনুসারেই তার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করবে।

قَالَ : وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ أَخَذَ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِىْ إِنْ شَاءَ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِ الْبَائِعِ ـ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوْفَى الثَّمَنَ إِنْتَهَى حُكْمُ الْعَقْدِ ، وَخَرَجَ هُوَ مِنَ الْبَيْنِ ، وَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ ـ وَبَقِيَ الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُشْتَرِىْ وَالشَّفِيْعِ ـ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করে থাকে তাহলে শফী' সম্পত্তিটি নিতে চাইলে সেই মূল্যেই নেবে যা ক্রেতা দাবি করেছে। এক্ষেত্রে বিক্রেতার কথার প্রতি কর্ণপাত করা হবে না। কেননা বিক্রেতা যখন মূল্য উসুল করে নিয়েছে তখন চুক্তিটির বিধান পূর্ণতায় পৌঁছেছে। এখন সে উভয়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে গেছে এবং সে অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে। কাজেই এখন মতভেদ রয়ে গেছে ক্রেতা এবং শফী'র মাঝে। আর এদের উভয়ের মতবিরোধের বিধান পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ أَخَذَ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِىْ الخ : মূল্য নিয়ে মতবিরোধের ক্ষেত্রে উপরে যে দুটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে তা ছিল বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করার পূর্বে হলে- সে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে যদি বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে মূল্য নিয়ে বিরোধ হয় এমতাবস্থায় যে, বিক্রেতা ইতোমধ্যে তার প্রাপ্য মূল্য হস্তগত করে নিয়েছে তাহলে উভয় অবস্থায়ই অর্থাৎ চাই বিক্রেতা কম মূল্যের কথা বলুক কিংবা বেশি মূল্যের কথা বলুক উভয় অবস্থায়ই ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। বিক্রেতার বক্তব্যের প্রতি কর্ণপাত করা হবে না। কাজেই শফী' যদি জমি বা বাড়িটি গ্রহণ করতে চায় এবং মূল্য কত ছিল এ সম্পর্কে শফী'র কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে তাহলে শপথ সহকারে ক্রেতার বক্তব্য অনুসারেই মূল্য পরিশোধ করে বাড়ি বা জমিটি নিতে হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوْفَى الثَّمَنَ إِنْتَهَى حُكْمُ الْعَقْدِ الخ : উক্ত বিধানের কারণ হলো, বিক্রেতা যখন ক্রেতার নিকট হতে মূল্য আদায় করে নিয়েছে তখন বিক্রয়চুক্তির বিধান তথা বিক্রেতার মূল্য হস্তগতকরণ এবং ক্রেতার ক্রয়কৃত দ্রব্য হস্তগতকরণ পূর্ণতায় পৌঁছেছে। ফলে বিক্রেয়-দ্রব্য তথা জমি বা বাড়িটির ক্ষেত্রের বিক্রেতার কোনো প্রকার সম্পৃক্ততা অবশিষ্ট নেই। কাজেই ক্রেতা ও শফী'র পারস্পরিক বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা থেকে বিক্রেতা বের হয়ে গেছে এবং সে এখন তৃতীয় ব্যক্তিতে পরিণত। অতএব, তার কোনো কথার প্রতি বিচারক কোনোরূপ কর্ণপাত করবেন না। এখন মতবিরোধের বিষয়টি কেবল ক্রেতা ও শফী'র মাঝে অবশিষ্ট রয়েছে। আর ক্রেতা ও শফী'র মাঝে মূল্য নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে ক্রেতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হয় শপথ সহকারে। কেননা এক্ষেত্রে শফী' হচ্ছে দাবিদার আর ক্রেতা হচ্ছে অস্বীকারকারী। কারণ শফী' তার বক্তব্য অনুসারে অল্প মূল্যে ক্রেতার নিকট হতে জমিটি লাভ করার দাবি করছে আর ক্রেতা তা অস্বীকার করছে। পক্ষান্তরে ক্রেতা তার বক্তব্যে শফী'র উপর আবশ্যিকরূপে কিছুই দাবি করছে না। কেননা বেশি মূল্যে শফী'র জমি নেওয়া আবশ্যক নয়। সে ইচ্ছা করলে জমিটি ত্যাগ করতে পারে। সুতরাং ক্রেতা যখন অস্বীকারকারী তখন প্রসিদ্ধ হাদীস وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ أَنْكَرَ "শপথ করে বলবে অস্বীকারকারী" অনুসারে ক্রেতাই শপথ করে তার বক্তব্য বলবে এবং তার কথা গ্রহণ করা হবে। এ সম্পর্কে পূর্বের পৃষ্ঠায় মুসান্নিফ (র.) দলিলসহ বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, "এ সম্পর্কে আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি"। অর্থাৎ ক্রেতা ও শফী'র মাঝে মূল্য নিয়ে মতবিরোধের ক্ষেত্রে যে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনাটি মুসান্নিফ (র.) পূর্বের পৃষ্ঠায় [৩৮১ নং পৃষ্ঠায়] فَصْلٌ فِى الْاِخْتِلَافِ -এর শুরুতে করেছেন। সেখানের ইবারতটুকু নিম্নরূপ- قَالَ : وَإِنْ اِخْتَلَفَ الشَّفِيْعُ وَالْمُشْتَرِىْ فِى الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِىْ ، لِأَنَّ الشَّفِيْعَ يَدَّعِىْ اِسْتِحْقَاقَ الدَّارِ عَلَيْهِ عِنْدَ نَقْدِ الْأَقَلِّ وَهُوَ يُنْكِرُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِيْنِهِ - এর সারকথা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি।

وَلَوْ كَانَ نَقْدُ الثَّمَنِ غَيْرَ ظَاهِرٍ، فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُ الدَّارَ بِأَلْفٍ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ يَأْخُذُهَا الشَّفِيْعُ بِالْأَلْفِ . لِأَنَّهُ لَمَّا بَدَأَ بِالْاِقْرَارِ بِالْبَيْعِ تَعَلَّقَتِ الشُّفْعَةُ بِهِ، فَبِقَوْلِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ قَبَضْتُ الثَّمَنَ يُرِيْدُ إِسْقَاطَ حَقِّ الشَّفِيْعِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ . وَلَوْ قَالَ قَبَضْتُ الثَّمَنَ وَهُوَ أَلْفٌ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ . لِأَنَّ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْاِقْرَارُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ خَرَجَ مِنَ الْبَيْنِ وَسَقَطَ اِعْتِبَارُ قَوْلِهِ فِيْ مِقْدَارِ الثَّمَنِ .

অনুবাদ : আর যদি মূল্য পরিশোধ করার বিষয়টি স্পষ্ট না হয়; এ অবস্থায় বিক্রেতা বলে, আমি বাড়িটি এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করেছি এবং মূল্য হস্তগত করেছি তাহলে শফী' এক হাজার দিরহামেই বাড়িটি নিয়ে নেবে। কেননা, যখন সে প্রথমে বিক্রয়ের স্বীকারোক্তি করেছে তখনই তার উল্লিখিত পরিমাণের সাথে শুফ'আর অধিকার সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। কাজেই তার পরবর্তী উক্তি "এবং মূল্য হস্তগত করেছি" এর দ্বারা সে [নিজের উপর থেকে] শফী'র অধিকার দূর করতে চায়, সুতরাং তা প্রত্যাখ্যাত হবে। আর যদি সে বলে, "আমি মূল্য হস্তগত করেছি এবং মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম" তাহলে তার কথার প্রতি কর্ণপাত করা হবে না। কেননা, তার প্রথম কথাটি তথা মূল্য হস্তগত করার স্বীকারোক্তি -এর মাধ্যমে সে উভয়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে গেছে এবং মূল্যের ব্যাপারে তার কথার গ্রহণযোগ্যতা বাদ হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ نَقْدُ الثَّمَنِ غَيْرُ ظَاهِرٍ الخ : মূল্য নিয়ে মতবিরোধ সম্পর্কিত পূর্বে যে মাসআলাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তা ছিল বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করেছে কিনা তা শফী'র জানা থাকার সুরত সংশ্লিষ্ট। তন্মধ্যে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছিল বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করেনি বলে শফী'র জানা থাকার সুরতের মাসআলা। তারপর বর্ণনা করা হয়েছিল বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করেছে বলে শফী'র জানা থাকার সুরতের মাসআলা। এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করছেন, উক্ত মতবিরোধ যদি এমন অবস্থায় দেখা দেয় যে, বিক্রেতা জমি বা বাড়িটির মূল্য হস্তগত করেছে কিনা তা শফী'র জানা নেই। তাহলে মূল্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে কার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে– সে সম্পর্কে। এক্ষেত্রে প্রথমত দুটি সুরত হতে পারে– ১. বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করেছে বলে স্বীকার করবে। ২. সে হস্তগত করার কথা স্বীকার করবে না। দ্বিতীয় সুরত তথা বিক্রেতা যদি মূল্য হস্তগত করার কথা স্বীকার না করে ত.হলে বিধান কি হবে– এ সুরতটি মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেননি। ইনায়াহ-র গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, এক্ষেত্রে বিধান তা-ই হওয়ার কথা যা পূর্বে বর্ণিত বিক্রেতা মূল্য হস্তগত না করার সুরতে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিক্রেতা যদি ক্রেতার চেয়ে কম দাবি করে তাহলে বিক্রেতার কথা গ্রহণ করা হবে। আর বিক্রেতা যদি ক্রেতার চেয়ে বেশি দাবি করে তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে শপথ করে বলবে এবং বিচারক বিক্রয় রহিত করার পর বিক্রেতার দাবি অনুসারে শফী' জমিটি গ্রহণ করবে।

আর প্রথম সুরত তথা বিক্রেতা যদি মূল্য হস্তগত করার কথা স্বীকার করে তাহলে বিধান কি হবে এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য ইবারতে বর্ণনা করছেন। এক্ষেত্রে দু সুরত হতে পারে। ১. বিক্রেতা হয়তো প্রথমে মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করবে তারপর মূল্য হস্তগত করার কথা স্বীকার করবে। ২. বিক্রেতা প্রথমে মূল্য হস্তগত করার কথা স্বীকার করবে তারপর মূল্যের পরিমাণের কথা উল্লেখ করবে। যদি প্রথম সুরত হয়– যেমন বিক্রেতা এভাবে বলল, بِعْتُ الدَّارَ بِأَلْفٍ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ "আমি বাড়িটি এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করেছি এবং মূল্য হস্তগত করেছি"– তাহলে বিক্রেতার দাবি অনুসারে এক হাজার দিরহামেই শফী' বাড়িটি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে পূর্বের মাসআলার ন্যায় বিক্রেতা "আমি মূল্য হস্তগত করেছি" বলার কারণে সে তৃতীয় ব্যক্তিতে পরিণত হবে না এবং ক্রেতা ও শফী'র সংশ্লিষ্ট বিষয় তথা শুফ'আর বিষয় থেকে বের হয়ে যাবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ بِالْبَيْعِ تَعَلَّقَتِ الشُّفْعَةُ بِهِ الخ : উক্ত বিধানের কারণ হচ্ছে, বিক্রেতা যখন প্রথমে এক হাজার দিরহামে বিক্রয়ের কথা স্বীকার করেছে তখন এক হাজার দিরহামেই শফী'র শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিক্রেতার বিপক্ষে শফী'র শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় বিক্রেতার স্বীকারোক্তির কারণেই। কাজেই তার বক্তব্য অনুসারেই তা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যখন বিক্রেতার প্রথম কথার দ্বারা এক হাজার দিরহামে শফী'র শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেছে তখন পরবর্তী এমন কোনো কথা গ্রহণযোগ্য হবে না যা দ্বারা তার স্বীকারোক্তি বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। অতএব, "আমি মূল্য হস্তগত করেছি" বিক্রেতার পরের এ বক্তব্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা, এটি গ্রহণ করা হলে তার পূর্বের বক্তব্যের কারণে এক হাজার দিরহামে শুফ'আর অধিকার যে সাব্যস্ত হয়েছে তা বাতিল হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ, বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করে ফেললে সে তৃতীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যায়, তখন তার কোনো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয় না [যা ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি]। সারকথা এই দাঁড়াল যে, বিক্রেতা তার পরবর্তী কথা "আমি মূল্য হস্তগত করেছি"-এর দ্বারা তার পূর্বের বক্তব্য "আমি এক হাজার দিরহামে বাড়িটি বিক্রয় করেছি"- এটি বাতিল করতে চাচ্ছে। কাজেই তার দ্বিতীয় বক্তব্যটি গ্রহণ করা হবে না। আর প্রথম কথাটি অনুসারে শফী' এক হাজার দিরহামে বাড়িটি গ্রহণ করবে।

قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ قَبَضْتُ الثَّمَنَ وَهُوَ أَلْفٌ الخ : এখান থেকে দ্বিতীয় সুরত তথা বিক্রেতা যদি প্রথমে মূল্য হস্তগত করার কথা স্বীকার করে তারপর মূল্যের পরিমাণের কথা উল্লেখ করে, যেমন সে বলল, "আমি মূল্য হস্তগত করেছি, আর মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম" – এ সুরতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিধান হলো, বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং ক্রেতা যে মূল্যের কথা বলবে সে মূল্যেই শফী' বাড়িটি গ্রহণ করবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ الخ : এ বিধানের কারণ হলো, বিক্রেতা যখন প্রথমে মূল্য হস্তগত করার কথা স্বীকার করেছে তখন সে তার এ স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তৃতীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থাৎ শুফ'আর সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে সে বের হয়ে গেছে। কেননা, মূল্য হস্তগত করার পর বাড়িটির ক্ষেত্রে তার কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতা অবশিষ্ট নেই। কাজেই মূল্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে এখন আর তার কোনো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং তার পরবর্তী বক্তব্য "আর মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম"– এটির প্রতি কোনোরূপ কর্ণপাতই করা হবে না।

উল্লেখ্য, উক্ত সুরতগুলো হচ্ছে যদি জমি বা বাড়িটি বিক্রেতার দখলে না থাকে; বরং ক্রেতার দখলে থাকে– সেক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে যদি জমি বা বাড়িটি বিক্রেতার হাতেই থেকে থাকে তাহলে তার বিধান সম্পর্কে হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক্ষেত্রে বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করার কথা আগে স্বীকার করার পরও যদি তার পরিমাণ উল্লেখ করে তবুও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এক্ষেত্রে শফী' জমি বা বাড়িটি বিক্রেতার দখল হতেই গ্রহণ করবে। আর বাড়িটি তার দখলে থাকার কারণে সে মূল্য হস্তগত করা সত্ত্বেও তৃতীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়নি। কাজেই সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসেবেই বহাল রয়েছে। অতএব, তার বিপরীতে যখন শফী' বাড়িটি গ্রহণ করছে তখন তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। –[দ্র. আল বিনায়াহ, আল ইনায়াহ]

فَصْلٌ فِيْمَا يُؤْخَذُ بِهِ الْمَشْفُوْعُ

অনুচ্ছেদ : যার বিনিময়ে শুফ'আর সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়

এ অনুচ্ছেদে যে বিনিময়-বস্তু পরিশোধ করে শফী' জমি বা বাড়ি গ্রহণ করবে অর্থাৎ প্রদেয় মূল্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ক্রেতা কখনো বাকি মূল্যে কখনো নগদ মূল্যে ক্রয় করে, আবার ক্রয় করার পর কখনো বিক্রেতা কিছু মূল্য হ্রাস করে দেয়। এ সকল বিষয়াদি শফী'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে মুসান্নিফ (র.) مَشْفُوْعٌ অর্থাৎ শুফ'আর সম্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর এখান থেকে مَشْفُوْعٌ بِهٖ তথা 'শুফ'আর বিনিময় বস্তু বা মূল্য' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেহেতু শুফ'আর সম্পত্তি হচ্ছে اَصْلٌ বা মূল বস্তু আর মূল্য হচ্ছে তার [মূল বস্তুর] تَابِعٌ বা অনুগামী, তাই প্রথমে মূল বস্তু তথা শুফ'আর সম্পত্তির আলোচনা করার পর তার অনুগামী বস্তু তথা বিনিময় বস্তু [মূল্য]-র আলোচনা করেছেন। কেননা, অনুগামী বস্তু মূল বস্তুর পরেই হয়ে থাকে।

قَالَ : وَإِذَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِىْ، بَعْضَ الثَّمَنِ يَسْقُطُ ذٰلِكَ عَنِ الشَّفِيْعِ، وَإِنْ حَطَّ جَمِيْعَ الثَّمَنِ، لَمْ يَسْقُطْ عَنِ الشَّفِيْعِ . لِأَنَّ حَطَّ الْبَعْضِ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَيَظْهَرُ فِىْ حَقِّ الشَّفِيْعِ . لِأَنَّ الثَّمَنَ مَا بَقِىَ وَكَذَا إِذَا حَطَّ بَعْدَ مَا أَخَذَهَا الشَّفِيْعُ بِالثَّمَنِ يُحَطُّ عَنِ الشَّفِيْعِ حَتّٰى يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ الْقَدْرِ بِخِلَافِ حَطِّ الْكُلِّ لِأَنَّهُ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ بِحَالٍ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِى الْبُيُوْعِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি বিক্রেতা ক্রেতার উপর থেকে নির্ধারিত মূল্যের কিছু অংশ ছাড় দিয়ে দেয় তাহলে তা শফী'র উপর থেকেও রহিত হয়ে যাবে। আর যদি সে সম্পূর্ণ মূল্যই ছেড়ে দেয় তাহলে শফী'র উপর থেকে তা রহিত হবে না। কেননা কিছু অংশ ছাড় দিলে তা মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। কাজেই তা শফী'র ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। কারণ, অবশিষ্ট অংশই হচ্ছে [এখন] মূল্য। অনুরূপভাবে যদি শফী' [সম্পূর্ণ] মূল্যের বিনিময়ে বাড়িটি গ্রহণ করার পর বিক্রেতা [ক্রেতার উপর থেকে] কিছু অংশ হ্রাস করে দেয় তাহলেও তা শফী'র উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। কাজেই সে হ্রাসকৃত পরিমাণ তার থেকে ফেরত নিয়ে নেবে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মূল্য ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, কোনো অবস্থায়ই তা মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয় না। এ সম্পর্কে আমরা 'বিক্রয় অধ্যায়'-এ আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِىْ بَعْضَ الثَّمَنِ الخ : মাসআলা হলো, যে মূল্যে জমি বা বাড়ি বিক্রয় করা হয়েছে পরবর্তীতে বিক্রেতা যদি তা থেকে কিছু মূল্য ক্রেতার জন্য হ্রাস করে দেয় তাহলে এ হ্রাসকরণ শফী'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ হ্রাস করার পর অবশিষ্ট যে মূল্য থাকবে শফী' সেই মূল্যেই জমি বা বাড়িটি গ্রহণ করবে। যেমন– বাড়িটি বিক্রয় করা হয়েছিল দুই হাজার টাকায়, তারপর বিক্রেতা পাঁচশত টাকা ক্রেতার জন্য ছাড় দিল তাহলে ক্রেতা যেমন পনেরো শত টাকা পরিশোধ করবে তেমনি শফী'ও পনেরো শত টাকা পরিশোধ করে বাড়িটি লাভ করবে।

কিন্তু বিক্রেতা যদি সম্পূর্ণ মূল্য ছেড়ে দেয় তাহলে এটা শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে শফী'কে নির্ধারিত সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করেই বাড়িটি গ্রহণ করতে হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ حَطَّ الْبَعْضِ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) প্রথম বিধান অর্থাৎ আংশিক মূল্য হ্রাস করলে তা যে শফী'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে তার দলিল বর্ণনা করছেন। এর দলিল হচ্ছে, আংশিক মূল্য হ্রাস করা হলে তা আমাদের মতে পৃথক কোনো দান হিসেবে গণ্য না হয়ে মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয় [এর বিস্তারিত কারণ মুসান্নিফ (র.) হিদায়া ৩য় খণ্ডে ৫৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন]। এই হ্রাসকরণ মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে হ্রাস করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই মূল্য হিসেবে ধর্তব্য হবে। কাজেই তা শফী'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কেননা, শফী' বিক্রয় মূল্যের বিনিময়েই জমি বা বাড়িটি গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে। সুতরাং সে অবশিষ্ট মূল্যেই বাড়িটি লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا حَطَّ بَعْدَ مَا أَخَذَهَا الشَّفِيْعُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে মূল্যে প্রথমে বাড়িটি বিক্রয় করা হয়েছে সেই মূল্যে শফী' বাড়িটি গ্রহণ করার পর যদি বিক্রেতা ক্রেতার উপর হতে কিছু মূল্য হ্রাস করে দেয় সেক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রেও উক্ত হ্রাসকরণ শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বিক্রেতা যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস করবে শফী' সে পরিমাণ মূল্য ফেরত লাভ করবে। এক্ষেত্রেও কারণ তাই যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। সারকথা বিক্রেতা চাই শফী' জমিটি গ্রহণ করার আগে আংশিক মূল্য হ্রাস করুক কিংবা পরে হ্রাস করুক উভয় অবস্থায়ই শফী'র ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে। কেননা, হ্রাস করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই হচ্ছে বিক্রয়-মূল্য। আর শফী' বিক্রয়-মূল্যের বিনিময়েই বিক্রীত সম্পত্তি লাভ করে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَطِّ الْكُلِّ لِأَنَّهُ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ بِحَالٍ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বিক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য ছেড়ে দিলে তা যে শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না তার দলিল বর্ণনা করছেন। এর দলিল হচ্ছে, সম্পূর্ণ মূল্য হ্রাস করা হলে তা মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা সম্পূর্ণ মূল্য ছেড়ে দিলে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, বিক্রয়-চুক্তিতে একদিকে বিক্রেয়-দ্রব্য রয়েছে অথচ অপরদিকে কোনো মূল্য নেই। ফলে মূল্যবিহীন বিক্রয় (اَلْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ) হচ্ছে। আর মূল্যবিহীন বিক্রয় হচ্ছে ফাসিদ বিক্রয়। কাজেই তা মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে পৃথকভাবে বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতাকে দান হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং তা শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কেননা, এটি বিক্রয়চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত নয়। শফী' গ্রহণ করবে বিক্রয়চুক্তির মূল্য অনুসারে। অতএব, সম্পূর্ণ মূল্যের বিনিময়েই তা গ্রহণ করবে।

قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِى الْبُيُوْعِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আংশিক হ্রাস করা হলে তা যে মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে আর সম্পূর্ণ মূল্য হ্রাস করা হলে তা মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে না। এ বিষয়টি আমরা বিস্তারিতভাবে كِتَابُ الْبُيُوْعِ ['বিক্রয় অধ্যায়']-এ আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) এ আলোচনাটি হিদায়া ৩য় খণ্ডে 'বিক্রয় অধ্যায়'-এ بَابُ الرِّبٰوا -এর এক-দেড় পৃষ্ঠা পূর্বে ৫৯ ও ৬০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। সেখানের মূল ইবারত [মতন] হচ্ছে নিম্নরূপ- قَالَ وَيَجُوْزُ لِلْمُشْتَرِىْ أَنْ يَزِيْدَ لِلْبَائِعِ فِى الثَّمَنِ وَيَجُوْزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَزِيْدَ لِلْمُشْتَرِىْ فِى الْمَبِيْعِ وَيَجُوْزُ أَنْ يَحُطَّ عَنِ الثَّمَنِ وَيَتَعَلَّقُ الْاِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيْعِ ذٰلِكَ। এ ইবরাতের অধীনে মুসান্নিফ (র.) ইমামগণের মতবিরোধ ও উভয় পক্ষের দলিলসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

وَإِنْ زَادَ الْمُشْتَرِيْ لِلْبَائِعِ لَمْ تَلْزَمِ الزِّيَادَةُ فِيْ حَقِّ الشَّفِيْعِ . لِأَنَّ فِيْ اِعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ ضَرَرًا بِالشَّفِيْعِ . لِاسْتِحْقَاقِهِ الْأَخْذَ بِمَا دُوْنَهَا . بِخِلَافِ الْحَطِّ . لِأَنَّ فِيْهِ مَنْفَعَةً لَهُ . وَنَظِيْرُ الزِّيَادَةِ إِذَا جَدَّدَ الْعَقْدَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ لَمْ يَلْزَمِ الشَّفِيْعَ حَتّٰى كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ . لِمَا بَيَّنَّا ، كَذَا هٰذَا .

অনুবাদ : আর যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে [নির্ধারিত মূল্যের উপর] আরো কিছু বাড়িয়ে দেয় তাহলে বর্ধিত অংশ প্রদান করা শফী'র উপর আবশ্যক হবে না। কেননা, শফী' যেহেতু বর্ধিত অংশ ছাড়াই বাড়িটি পাওয়ার অধিকার লাভ করেছে সেহেতু বর্ধিত অংশ তার উপর সাব্যস্ত করলে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। পক্ষান্তরে [বিক্রেতার মূল্য] হ্রাসকরণের বিষয় এরূপ নয়; কেননা, তাতে শফী'র লাভ হয়। মূল্য বৃদ্ধি করে দেওয়ারই সমপর্যায়ের হলো, যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা [তাদের নির্ধারিত] প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে চুক্তিটি নতুন করে সম্পাদিত করে নেয়, তাহলেও বর্ধিত মূল্য প্রদান করা শফী'র উপর আবশ্যক হবে না। কাজেই সে প্রথম মূল্যেই বাড়িটি নিতে পারবে। কারণ তা-ই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, এটিও পূর্বেরটিরই মতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ الْمُشْتَرِيْ لِلْبَائِعِ لَمْ تَلْزَمِ الزِّيَادَةُ الخ : মাসআলা হচ্ছে, জমি বা বাড়ি যে মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে ক্রেতা যদি পরবর্তীতে তার সাথে আরো কিছু পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি করে দেয়, তাহলে এ বর্ধিত মূল্য শফী'র উপর আবশ্যক হবে না। শফী' এক্ষেত্রে কেবল চুক্তিকালে নির্ধারিত আসল মূল্যই পরিশোধ করে জমি বা বাড়িটি নিতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ চুক্তিকালে বাড়িটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল দু হাজার টাকা। পরে ক্রেতা আরো পাঁচশত টাকা বাড়িয়ে পঁচিশ শত টাকা বিক্রেতাকে প্রদান করল। তাহলে শফী'কে এ অতিরিক্ত পাঁচশত টাকা দেওয়া আবশ্যক হবে না। সে দু হাজার টাকা পরিশোধ করেই বাড়িটি নেওয়ার অধিকার লাভ করবে। অর্থাৎ মূল্য হ্রাস করা হলে তা শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বৃদ্ধি করা হলে তা শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيْ اِعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ ضَرَرًا بِالشَّفِيْعِ الخ : মূল্য বৃদ্ধি করে দেওয়া হলে তা শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। অথচ হ্রাস করা হলে তা শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। তার কারণ হচ্ছে, যে মূল্যে প্রথমে বিক্রয় করা হয়েছে সে মূল্যে শফী' বাড়ি বা জমিটি গ্রহণ করার অধিকার লাভ করেছে। এখন বর্ধিত মূল্য যদি তার উপর আবশ্যক করা হয় তাহলে ইতঃপূর্বে সে যে অধিকার লাভ করেছে তাতে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। কাজেই তার প্রাপ্ত অধিকারের ক্ষেত্রে নতুন করে কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করা যাবে না। পক্ষান্তরে মূল্য হ্রাস করা হলে তা শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হলে তার [শফী'র] ক্ষতি হচ্ছে না; বরং সে লাভবান হচ্ছে। ফলে হ্রাসকৃত মূল্য প্রযোজ্য হওয়ার কারণে তার প্রাপ্ত অধিকার বিনষ্ট করা হচ্ছে না। সুতরাং সে তা লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَنَظِيْرُ الزِّيَادَةِ إِذَا جَدَّدَ الْعَقْدَ بِأَكْثَرَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ক্রেতা মূল্য বৃদ্ধি করে দিলে তা যে শফী'র উপর আবশ্যক হবে না এ বিধানের নজির হচ্ছে– জমি বা বাড়িটি প্রথমবার এক মূল্যে বিক্রয় করার পর যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরে সম্মত হয়ে চুক্তিটি রহিত করে পুনরায় অধিক মূল্যে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে শফী'র উপর পরবর্তী চুক্তি অনুসারে অধিক মূল্যে বাড়িটি গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না; বরং সে প্রথম চুক্তি অনুসারে কম মূল্যেই বাড়িটি গ্রহণ করতে পারে। এর কারণ হচ্ছে, ক্রেতা ও বিক্রেতা তাদের চুক্তি রহিত করলে তা শফী'র ক্ষেত্রে রহিত বলে গণ্য হয় না। কেননা, তার অধিকার বিক্রয়ের সাথে সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে যায়। ফলে বিক্রেতা বা ক্রেতা সে অধিকার বাতিল করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতার বর্ধিত মূল্য শফী'র উপর আবশ্যক হবে না।

قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّا كَذَا هٰذَا : মুসান্নিফ (র.) বলেন, প্রথম চুক্তি রহিত করে দ্বিতীয়বার অধিক মূল্যে চুক্তি করলে তা যে শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না– এর কারণ তাই যা আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। এ কারণটি তিনি পূর্বের পৃষ্ঠায় [হিদায়ার ৩৮১ নং পৃষ্ঠায়] মূল ইবারত وَلَوْ اَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ لِلشَّفِيْعِ -এর অধীনে উল্লেখ করেছেন। কারণটির সারকথা আমরা উপরে উল্লেখ করে দিয়েছি। সেখানের ইবারতটুকু নিম্নরূপ–فَيَجْعَلُ كَأَنَّ الْمَوْجُوْدَ بَيْعَانِ وَلِلشَّفِيْعِ أَنْ يَأْخُذَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ..... وَهٰهُنَا الْفَسْخُ لَا يَظْهَرُ فِيْ حَقِّ الشَّفِيْعِ । কিন্তু হিদায়ার ভাষ্যকার আল্লামা আইনী (র.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী لِمَا بَيَّنَّا বলে মুসান্নিফ (র.) একটু পূর্বে [২ লাইন উপরে] যে কারণটি উল্লেখ করেছেন সেটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। কারণটি হচ্ছে – لِأَنَّ فِيْ اِعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ ضَرَرًا بِالشَّفِيْعِ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْأَخْذَ بِمَا دُوْنَهَا অর্থাৎ শফী' যেহেতু পূর্বেই কম মূল্যে জমিটি লাভ করার অধিকার পেয়েছে কাজেই বর্ধিত মূল্য আরোপিত করা হলে তার ক্ষতি সাধন করা হয়। কাজেই তা আরোপিত করা হবে না। আমাদের মনে হয় لِمَا بَيَّنَّا বলে মুসান্নিফ (র.) পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত কারণটিই বুঝিয়েছেন। [আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ]

যাহোক, উক্ত নজিরে যেমনিভাবে দ্বিতীয় চুক্তি অনুসারে শফী'র জন্য অধিক মূল্য পরিশোধ আবশ্যক নয় তদ্রূপ আলোচ্য ক্ষেত্রেও বর্ধিত মূল্য শফী'র উপর আবশ্যক হবে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى دَارًا بِعَرْضٍ أَخَذَهَا الشَّفِيْعُ بِقِيْمَتِهٖ . لِأَنَّهٗ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمَكِيْلٍ أَوْ مَوْزُوْنٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهٖ . لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ . وَهٰذَا لِأَنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ لِلشَّفِيْعِ وِلَايَةَ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمُشْتَرِىْ بِمِثْلِ مَا تَمَلَّكَ بِهٖ فَيُرَاعِىْ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ كَمَا فِى الْإِتْلَافِ . وَالْعَدَدِىُّ الْمُتَقَارِبُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ আসবাবপত্রের বিনিময়ে বাড়ি বিক্রয় করে তাহলে শফী' সেই আসবাবপত্রের বাজারমূল্যের বিনিময়ে বাড়িটি গ্রহণ করবে। কেননা, আসবাবপত্র হচ্ছে মূল্যনির্ভর বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর যদি পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্যের বিনিময়ে কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্যের বিনিময়ে বাড়িটি বিক্রয় করে তাহলে শফী' সে পরিমাণ অনুরূপ দ্রব্য দিয়ে বাড়িটি নেবে। কেননা, এ দু প্রকারের দ্রব্য হচ্ছে সম সদৃশলভ্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। বিধানটি এরূপ হওয়ার কারণ হলো, শরিয়ত শফী'র জন্য ক্রেতার বিপক্ষে ক্রেতা যে বস্তুর বিনিময়ে সম্পত্তিটির মালিক হয়েছিল ঠিক তারই অনুরূপ বস্তুর বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা লাভের অধিকার দিয়েছে। কাজেই অনুরূপ হওয়ার বিষয়টি যতদূর সম্ভব রক্ষা করতে হবে। ঠিক যেমনি বিধান রয়েছে অপরের সম্পদ বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে। আর কাছাকাছি আকারের গণনানির্ভর বস্তু সম সদৃশলভ্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى دَارًا بِعَرْضٍ أَخَذَهَا الشَّفِيْعُ بِقِيْمَتِهٖ الخ : আলোচ্য ইবারতের মাসআলাগুলো বুঝার পূর্বে একটি বিষয় জানা থাকা আবশ্যক। আর তা হলো, যে বস্তুর বিনিময়ে কোনো কিছু ক্রয় করা হয় তা দু প্রকারের হতে পারে–

১. ذَوَاتُ الْقِيَمِ "মূল্য-নির্ভর বস্তু"। অর্থাৎ এমন বস্তু যার একটির অনুরূপ আরেকটি সহজে পাওয়া যায় না; বরং সাধারণত একটি অপরটির সাথে তারতম্যপূর্ণ হয়ে থাকে। যেমন– গোলাম, গরু, ছাগল ইত্যাদি। এগুলোর ক্ষেত্রে কেউ যদি অপরের একটি বস্তু বিনষ্ট করে তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যেহেতু অনুরূপ একটি দেওয়া সম্ভব হয় না তাই বাজারদর হিসেবে তার মূল্য দিতে হয়।

২. ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ – 'সদৃশলভ্য বস্তু'। অর্থাৎ এমন বস্তু যা পরস্পর একটি অপরটির সদৃশ বা অনুরূপ হয়ে থাকে, তেমন একটা তারতম্যপূর্ণ হয় না। যেমন– ডিম, একই জাতের ধান বা গম ইত্যাদি। যে সকল দ্রব্য পাত্র দ্বারা কিংবা ওজন করে পরিমাপ করা হয় তা এ দ্বিতীয় শ্রেণির বস্তু। এ প্রকারের বস্তুর ক্ষেত্রে বিধান হলো, কেউ যদি অপরের একটি বিনষ্ট করে তাহলে যেহেতু সদৃশ বা অনুরূপ আরেকটি দেওয়া সম্ভব, সেহেতু অনুরূপ আরেকটি দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করা আবশ্যক হয়। মূল্য দিয়ে দেওয়া যথেষ্ট হয় না।

আলোচ্য ইবারতে বর্ণিত মাসআলা হলো, ক্রেতা যদি বাড়ি বা জমি মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় না করে অন্য কোনো আসবাবপত্র কিংবা যে কোনো 'মূল্য-নির্ভর বস্তু' (ذَوَاتُ الْقِيَمِ) -এর বিনিময়ে ক্রয় করে যেমন– সে একটি গোলামের বিনিময়ে বাড়িটি ক্রয় করল কিংবা কয়েকটি পশুর বিনিময়ে ক্রয় করল। তাহলে শফী' উক্ত বাড়ি বা জমিটি গ্রহণ করবে ক্রেতা যে গোলাম বা যে বস্তুটির বিনিময়ে ক্রয় করেছে তার বাজারদর পরিমাণ মুদ্রা [টাকা] দিয়ে। উল্লেখ্য, উক্ত বাজারদর দেখা হবে বাড়িটি বিক্রয়ের দিন হিসেবে। অর্থাৎ যেদিন বাড়িটি ক্রয়বিক্রয় হয়েছে সেদিন উক্ত গোলাম বা বস্তুটির যা বাজারদর ছিল তা পরিশোধ করে শফী' বাড়িটি নেবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ : এক্ষেত্রে ক্রেতা যে বস্তু বা জিনিসের বিনিময়ে বাড়িটি ক্রয় করেছে শফী' তার বাজারদর পরিশোধ করবে। তার কারণ হচ্ছে, এ সকল বস্তু বা জিনিস যেহেতু 'মূল্য-নির্ভর বস্তু' যার অনুরূপ আরেকটি সহজলভ্য নয়, তাই তার বাজারমূল্য পরিশোধ করবে। কেননা, যে ক্ষেত্রে অনুরূপ আরেকটি দেওয়া সম্ভব হয় না সে ক্ষেত্রে তার মূল্য পরিশোধ করাই ওয়াজিব হয়।

قَوْلُهُ وَإِنِ اشْتَرَاهَا مَكِيْلٌ أَوْ مَوْزُوْنٌ أَخَذَهَا الخ : আর ক্রেতা যদি বাড়িটি কোনো পাত্র পরিমাপিত দ্রব্য কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য যেমন- ধান, চাল, গম, তরল বস্তু ইত্যাদির বিনিময়ে ক্রয় করে তাহলে ক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয় করেছে শফী' সে পরিমাণ অনুরূপ দ্রব্যের বিনিময়ে উক্ত বাড়িটি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে উক্ত দ্রব্যের বাজারদর পরিশোধ করে বাড়িটি গ্রহণ করার অধিকার সে পাবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ : এক্ষেত্রে সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু দেওয়া আবশ্যক হওয়ার কারণ হচ্ছে, সমাজ-প্রচলনে যে সকল দ্রব্য পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয় কিংবা ওজন বা মেপে পরিমাপ করা হয় সে সকল দ্রব্য 'সদৃশ লভ্য' (ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ)-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এগুলো পরস্পর তেমন তারতম্যপূর্ণ হয় না। কাজেই ক্রেতা এরূপ দ্রব্যের যে পরিমাণের বিনিময়ে বাড়িটি ক্রয় করেছে শফী' ঠিক সে পরিমাণ অনুরূপ দ্রব্যের বিনিময়ে বাড়িটি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে মূল্য দেওয়া যথেষ্ট হবে না; অনুরূপ দ্রব্য দিয়েই নিতে হবে। এর কারণ হচ্ছে, শরিয়ত শফী'কে যে ক্রেতার ক্রয়কৃত জমি বা বাড়িটির মালিকানা লাভের অধিকার দিয়েছে তা কেবল ক্রেতাপ্রদত্ত জিনিসের অনুরূপ জিনিস পরিশোধের শর্তেই প্রদান করেছে। কাজেই যতদূর সম্ভব ক্রেতাপ্রদত্ত জিনিসের অনুরূপ জিনিস দেওয়া শফী'র জন্য অপরিহার্য। আর 'অনুরূপ' হওয়া দুটি দিক থেকে হয়। একটি হচ্ছে বাহ্যিক সুরতের দিক থেকে (صُوْرَةً) আর অপরটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ তথা মূল্যমানের দিক থেকে। যদি ক্রেতা যে বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করেছে অনুরূপ বস্তু দেওয়া হয় তাহলে উভয় দিক থেকে 'অনুরূপ' হওয়ার বিষয়টি পাওয়া যায়। আর যদি বাজারদর হিসেবে মূল্য দেওয়া হয় তাহলে কেবল একদিক থেকে তথা মূল্যমানের দিক থেকে (مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَةِ) 'অনুরূপ' হয়। সুতরাং আলোচ্য সুরতে যেহেতু ক্রেতা এমন বস্তু দিয়ে ক্রয় করেছে যার অনুরূপ বস্তু পাওয়া যায়, তাই অনুরূপ বস্তু দিয়েই শফী'কে জমি বা বাড়ি নিতে হবে। যাতে উভয় দিক থেকে সাদৃশ্য বা অনুরূপ হওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে পূর্বের মাসআলায় যেহেতু ক্রেতাপ্রদত্ত জিনিসের অনুরূপ জিনিস পাওয়া যায় না, তাই অপারগতাবশত একদিক থেকে সদৃশ বা অনুরূপ বস্তু তথা বাজারদর হিসেবে মূল্য দিয়ে শফী' বাড়ি গ্রহণ করার বিধান হয়েছে।

قَوْلُهُ كَمَا فِي الْإِتْلَافِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, অন্যের জিনিস বিনষ্ট করার ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ বিধান। অর্থাৎ কেউ যদি অপরের কোনো জিনিস বিনষ্ট করে তাহলে যে জিনিসটি বিনষ্ট করেছে সে জিনিসটি যদি 'সদৃশলভ্য' বস্তু (مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ) হয় অর্থাৎ সহজেই তার অনুরূপ বস্তু পাওয়া যায় তাহলে অনুরূপ বস্তু দিয়েই তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। আর যদি বিনষ্টকৃত জিনিসটি 'মূল্যনির্ভর' বস্তু (مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ) হয় অর্থাৎ যার পুরোপুরি অনুরূপ বস্তু পাওয়া যায় না এমন হয় তাহলে তার বাজারদর হিসেবে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করা আবশ্যক হয়। সুতরাং শুফ'আর ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম বিধান হবে।

قَوْلُهُ وَالْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, প্রায় কাছাকাছি আকারবিশিষ্ট গণনা-নির্ভর বস্তুসমূহ 'সদৃশলভ্য বস্তু'-র অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য জন প্রচলনে গণনা করে লেনদেন করা হয় তন্মধ্য হতে যেগুলো পরস্পর প্রায় কাছাকাছি আকারের; একটির সাথে অপরটির তেমন একটা পার্থক্য থাকে না সেগুলো বিধানগত দিক থেকে 'সদৃশলভ্য বস্তু' (ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ) হিসেবেই গণ্য হবে। যেমন- ডিম, লিচু, কমলা ইত্যাদি। এগুলো যদিও পরস্পরে কিছুটা ছোট বড় হয়; কিন্তু এই তারতম্য জনপ্রচলনে ধর্তব্য হয় না। এ কারণেই এগুলো একই মূল্যে ক্রয়বিক্রয় হয়। ছোট বড় হওয়ার কারণে মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয় না। সুতরাং এগুলো 'সদৃশলভ্য বস্তু' বলে গণ্য হবে। অতএব, যদি এরূপ বস্তু দিয়ে কেউ জমি বা বাড়ি ক্রয় করে তাহলে শফী' সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু দিয়ে জমি বা বাড়িটি গ্রহণ করবে। আবার এরূপ বস্তু কেউ বিনষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ অনুরূপ আরেকটি দিয়ে পরিশোধ করা আবশ্যক হবে।

وَإِنْ بَاعَ عِقَارًا بِعِقَارٍ أَخَذَ الشَّفِيْعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيْمَةِ الْأَخَرِ . لِأَنَّهُ بَدَلُهُ وَهُوَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَيَأْخُذُهُ بِقِيْمَتِهِ . قَالَ : وَإِذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلِلشَّفِيْعِ الْخِيَارُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِثَمَنٍ حَالٍ وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ ثُمَّ يَأْخُذُهَا . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فِي الْحَالِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ . وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) : لَهُ ذٰلِكَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيْمِ . لِأَنَّ كَوْنَهُ مُؤَجَّلًا وَصْفٌ فِي الثَّمَنِ كَالزِّيَافَةِ، وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِهِ، فَيَأْخُذُهُ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، كَمَا فِي الزُّيُوْفِ .

অনুবাদ : আর যদি একটি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে আরেকটি স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে তাহলে সম্পত্তি দুটির প্রত্যেকটি [ঐ সম্পত্তির] শফী' গ্রহণ করবে অপর সম্পত্তির বাজারমূল্যের বিনিময়ে। কেননা, অপর সম্পত্তিটি হচ্ছে এ সম্পত্তির বিনিময় এবং প্রথমোক্তটি যেহেতু মূল্য-নির্ভর বস্তু (ذَوَاتُ الْقِيَمِ) সেহেতু তার বাজারমূল্যের বিনিময়েই সম্পত্তিটি গ্রহণ করবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি বিক্রেতা বাকি মূল্যে বিক্রয় করে তাহলে শফী'র ইচ্ছাধিকার থাকবে; সে ইচ্ছা করলে সম্পত্তি নগদ মূল্যে গ্রহণ করবে নতুবা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে, তারপর সম্পত্তি গ্রহণ করবে। কিন্তু বাকি মূল্যে বর্তমানে সম্পত্তি গ্রহণ করার অধিকার সে পাবে না। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ অধিকার সে পাবে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও পূর্ববর্তী মত। কারণ হলো, 'মূল্য বাকি হওয়া' এটি মূল্যের একটি গুণ বা অবস্থা, যেমন নিম্নমানের মুদ্রা হওয়া মূল্যের একটি গুণ বা অবস্থা। আর শুফ'আর ভিত্তিতে [সম্পত্তি] নেওয়া হয় মূল্যেরই বিনিময়ে। কাজেই [নির্ধারিত] গুণাগুণ বা অবস্থা সহকারে মূল মূল্যের বিনিময়েই শফী' তা গ্রহণ করবে। যেমন বিধান নিম্নমানের মুদ্রার ক্ষেত্রে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ عِقَارًا بِعِقَارٍ أَخَذَ الشَّفِيْعُ : কেউ যদি জমির বিনিময়ে জমি ক্রয় করে তাহলে প্রত্যেক জমির শফী' অপর জমিটির বাজারমূল্য পরিশোধ করে তার প্রাপ্য জমিটি গ্রহণ করবে। অর্থাৎ জমির বিনিময়ে যদি জমি ক্রয়বিক্রয় করা হয় তাহলে উভয় জমি বিক্রয় করা হয়েছে বলে গণ্য হয়। কাজেই উভয় জমিরই অংশীদার বা প্রতিবেশী শুফ'আর দাবি করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক জমির শফী' তার প্রাপ্য জমিটি গ্রহণ করবে অপর জমিটির বাজারমূল্য দিয়ে; অপর জমির অনুরূপ আরেকটি জমি দিয়ে নয়। কেননা, জমি হচ্ছে 'মূল্য-নির্ভর বস্তু' (مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ) ; একটি জমি আরেকটি জমির সাথে গুণগত দিক থেকে পার্থক্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কাজেই অনুরূপ আরেকটি জমি দিয়ে তা আদায় হবে না; বরং তার বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلِلشَّفِيْعِ الْخِيَارُ : মাসআলা হচ্ছে, বিক্রেতা যদি তার বাড়ি ক্রেতার নিকট বাকি মূল্যে বিক্রয় করে তাহলে শফী' বাড়িটি নিতে চাইলে বাকি মূল্যে নেওয়ার অধিকার লাভ করবে না। তবে তার এ ইচ্ছাধিকার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে নগদ মূল্য পরিশোধ করে এখনই বাড়িটি গ্রহণ করবে কিংবা ইচ্ছা করলে সে বিক্রেতা ক্রেতাকে যতদিনের বাকি দিয়েছে ততদিন পরে মূল্য পরিশোধ করবে এবং তারপর বাড়িটি গ্রহণ করবে। কিন্তু এ অধিকার পাবে না যে, এখন বাড়িটি নিয়ে নেবে আর মূল্য পরিশোধ করবে বাকির মেয়াদান্তে। এ হচ্ছে আমাদের তিন ইমামের অভিমত এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দুটি অভিমতের মধ্য হতে পরবর্তী ও বিশুদ্ধতর অভিমত।

পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.)-এর মত ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দুটি মতের প্রথম মত হলো, ক্রেতা যেভাবে বাকি মূল্যে বাড়িটি ক্রয় করেছে শফী'ও সেভাবে বাকি মূল্যে বাড়িটি নেওয়ার অধিকার লাভ করবে। অর্থাৎ শফী'ও বাড়িটি এখন গ্রহণ করে মূল্য বাকির মেয়াদ শেষ হলে পরিশোধ করার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, এটি ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (র.)-এরও অভিমত।

قَوْلُهُ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُؤَجَّلًا وَصْفٌ فِي الثَّمَنِ كَالزِّيَافَةِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম যুফার (র.)-এর মত ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম মতের দলিল বর্ণনা করছেন। এ মতের দলিল হচ্ছে, 'বাকি হওয়া'– এটি হচ্ছে মূল্যের একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য (وَصْفٌ)। যেমন উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হওয়া মুদ্রার একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। গুণ বা বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণেই গুণবাচক শব্দে বলা হয় ثَمَنٌ مُؤَجَّلٌ 'বাকি মূল্য', ঠিক যেমনিভাবে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রেও গুণবাচক শব্দরূপে বলা হয় ثَمَنٌ جَيِّدٌ 'উৎকৃষ্ট মানের [মুদ্রার] মূল্য' কিংবা ثَمَنٌ زُيُوفٌ 'নিকৃষ্ট মানের [মুদ্রার] মূল্য'। কাজেই উৎকৃষ্ট মুদ্রা হওয় বা নিকৃষ্ট মুদ্রা হওয়া যেমনিভাবে সকলের নিকট মূল্যের গুণ বা বৈশিষ্ট্য তদ্রূপ 'বাকি হওয়া'ও মূল্যের গুণ বা বৈশিষ্ট্য হবে আর কোনো জিনিসের গুণ বা বৈশিষ্ট্য তার সাথেই অনুগামী হিসেবে সম্পৃক্ত থাকে। কাজেই শফী' যেহেতু মূল্যের বিনিময়ে বাড়িটি লাভ করে সেহেতু মূল্য তার উপর সাব্যস্ত হবে মূল্যের গুণ তথা বাকি হওয়ার বিষয়টি সহকারে। কেননা, তা মূল্যের গুণ বা বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণে পৃথক হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন– ক্রেতা যদি নিম্নমানের এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে বাড়িটি ক্রয় করে তাহলে সকলের ঐকমত্যেই শফী' নিম্নমানের এক হাজার মুদ্রার বিনিময়েই বাড়িটি লাভ করে। সেক্ষেত্রেও নিম্নমানের হওয়ার বিষয়টি হচ্ছে মূল্যের গুণ বা বৈশিষ্ট্য, তাই শফী'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছে। অতএব, বাকি হওয়ার বিষয়টিও একই কারণে শফী'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

وَلَنَا أَنَّ الْأَجَلَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ وَلَا شَرْطَ فِيمَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْبَائِعِ أَوِ الْمُبْتَاعِ وَلَيْسَ الرِّضَاءُ بِهِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي رِضَاءٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْمَلَاءَةِ وَلَيْسَ الْأَجَلُ وَصْفَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ وَصْفًا لَهُ لَتَبِعَهُ فَيَكُونُ حَقًّا لِلْبَائِعِ كَالثَّمَنِ وَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ وَلَّاهُ غَيْرَهُ لَا يَثْبُتُ الْأَجَلُ إِلَّا بِالذِّكْرِ كَذَا هٰذَا.

অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো, মূল্য বাকি হওয়া নির্ধারিত হয় কেবল [ক্রেতা-বিক্রেতার] শর্তের ভিত্তিতে। শফী'র মাঝে এবং বিক্রেতা বা ক্রেতার মাঝে এরূপ কোনো শর্ত হয়নি। আবার বিক্রেতার ক্ষেত্রে বাকি দেওয়ার সম্মতির ফলে শফী'র ক্ষেত্রেও বাকি দেওয়ার সম্মতি রয়েছে তা-ও নয়। কেননা, ধনসম্পদ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য রয়েছে। আর 'মূল্য বাকি হওয়া' এটি মূল্যের গুণ বা অবস্থা নয়। কেননা, এটা হচ্ছে ক্রেতার হক। যদি এটি মূল্যের গুণ হতো তাহলে মূল্যের অনুগামী হয়ে মূল্যের ন্যায় এটিও বিক্রেতার হক হতো। বিষয়টি এমনই হলো যে, কেউ কোনো একটি বস্তু বাকি মূল্যে ক্রয় করল, অতঃপর সে তা আরেকজনের নিকট ক্রয়মূল্যে বিক্রয়ের শর্তে বিক্রয় করে দিল। এক্ষেত্রে মূল্য বাকি হওয়ার বিষয়টি যদি উল্লেখ করা না হয় তাহলে [দ্বিতীয় ক্রেতার ক্ষেত্রে] তা প্রযোজ্য হয় না। আলোচ্য মাসআলাটিও তদ্রূপই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْأَجَلَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করছেন। আমাদের দলিল হলো, মূল্য বাকি হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয় ক্রেতার পক্ষ হতে শর্তের ভিত্তিতে। অর্থাৎ ক্রেতা যদি বাকি প্রদানের শর্ত করে নেয় এবং বিক্রেতা তাতে সম্মত হয় তাহলেই কেবল মূল্য বাকি হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। এটি বিক্রয়চুক্তির সত্তাগত দাবি হিসেবে সাব্যস্ত হয় না (لَيْسَ هٰذَا مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ)। আর বাকিতে পরিশোধের শর্ত হয়েছিল বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে; শফী' ও বিক্রেতা কিংবা শফী' ও ক্রেতার মাঝে এরূপ কোনো শর্ত হয়নি। কাজেই শফী'র ক্ষেত্রে যেহেতু এ শর্ত হয়নি এবং এটি চুক্তির সত্তাগত দাবিও নয়, সেহেতু শফী'র ক্ষেত্রে মূল্য বাকি হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ الرِّضَاءُ بِهِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي رِضَاءٌ بِهِ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ الخ : হিদায়ার ভাষ্যকার আল্লামা আইনী (রহ.) ও 'আল ইনায়ার' মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের পক্ষে দ্বিতীয় আরেকটি দলিল পেশ করেছেন। দলিলটির সারকথা হচ্ছে, শুফ'আর ভিত্তিতে সম্পত্তি গ্রহণ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ অর্থাৎ 'মালের বিনিময়ে মাল আদান প্রদান'-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এক্ষেত্রে পারস্পরিক সন্তুষ্টি থাকা আবশ্যক। অথচ বাকির বিষয়টির ক্ষেত্রে শফী'র বেলায় সে সন্তুষ্টি এখানে বিদ্যমান নেই। কেননা, ক্রেতাকে বাকিতে দেওয়ার প্রতি বিক্রেতার সন্তুষ্টি ছিল বলে শফী'র ক্ষেত্রেও তার সন্তুষ্টি রয়েছে তা ধরে নেওয়া যায় না। কারণ, সকল মানুষ এক রকম নয়। কেউ বিশ্বস্ত; কেউ বিশ্বস্ত নয়। আবার কেউ ধনী– পরিশোধ করতে পারবে আর কেউ অভাবী– হয়তো পরিশোধ করতে পারবে না। কাজেই একজনকে বাকি দিতে সম্মত হলে অন্যকেও বাকি দিতে সম্মত বলে ধরা যায় না। অতএব, শফী'র ক্ষেত্রে বিক্রেতার পক্ষ হতে বাকি দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি না থাকায় সে বাকিতে গ্রহণ করতে পারবে না।

দলিলটি এভাবে ব্যাখ্যা করার পর উক্ত ব্যাখ্যাকারদ্বয় লিখেছেন যে, এক্ষেত্রে কারো প্রশ্ন হতে পারে যে, শুফ'আর ক্ষেত্রেও যদি পারস্পরিক সম্মতির বিষয়টি বিবেচ্য হতো তাহলে তো শুফ'আর ভিত্তিতে শফী' জমি লাভ না করারই কথা। কেননা, শফী'র সম্পত্তি গ্রহণ করার ব্যাপারে ক্রেতা বা বিক্রেতার সম্মতি থাকে না।

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, শফী' জমিটি গ্রহণ করার ব্যাপারে যদিও বিক্রেতা বা ক্রেতার সম্মতি থাকে না তা সত্ত্বেও শফী'র ক্ষতির দিক লক্ষ্য করে অনিবার্যতার ভিত্তিতে তাকে শুফ'আর অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ অনিবার্যতা কেবল মূল অধিকার সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। বাকির ক্ষেত্রে এ অনিবার্যতা না থাকার কারণে সেক্ষেত্রে অপর পক্ষের সম্মতি আবশ্যকই থেকে যাবে।

আল্লামা আইনী (র.) এভাবেই আলোচ্য ইবারতটুকু ব্যাখ্যা করেছেন। হিদায়ার 'হাশিয়া'-য়ও এটিকে দ্বিতীয় একটি দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 'নাতাইজুল আফকার' -এর গ্রন্থকার উক্ত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন, এটি স্বতন্ত্র কোনো দলিল নয়; বরং এটি পূর্বের দলিলেরই অংশ বা পরিপূরক। এর সারকথা হচ্ছে, পূর্বের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) যে বলেছেন, বাকি হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয় ক্রেতার পক্ষ হতে শর্তের মাধ্যমে। শফী'র ক্ষেত্রে এ শর্ত বিদ্যমান নেই। এ কথার উপর কেউ বলতে পারে যে, যদিও শফী'র পক্ষ হতে বাকির শর্ত করা হয়নি; কিন্তু বিক্রেতা যখন ক্রেতাকে বাকিতে দিতে সম্মত হয়েছে তখন পরোক্ষভাবে শফী'র ক্ষেত্রে তার সম্মতি আছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মুসান্নিফ (র.) এরূপ একটি ধারণা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য ইবারতটুকু এনেছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে, ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রেতার বাকি দেওয়ার সম্মতিকে শফী'র ক্ষেত্রেও সম্মতি বলে ধরা যাবে না। কেননা, সকল মানুষ সমান নয়; কেউ আস্থাভাজন হয়, কেউ আস্থাভাজন হয় না। আবার কেউ পরিশোধের সামর্থ্য রাখে আবার কেউ রাখে না। কাজেই ক্রেতাকে বাকি দিতে সম্মত হওয়াকে শফী'র ক্ষেত্রেও বাকি দিতে সম্মতি বলে গণ্য করা যাবে না। অতএব, শফী'কে নগদ মূল্যেই জমি গ্রহণ করতে হবে কিংবা বাকির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। [অধমের মতে 'নাতাইজুল আফকারে' উল্লিখিত ব্যাখাটিই সঠিক।]

قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْأَجَلُ وَصْفَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُشْتَرِىْ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে, ইমাম যুফার (র.) যে বলেছেন, "বাকি হওয়ার বিষয়টি হচ্ছে মূল্যের গুণ বা বৈশিষ্ট্য, কাজেই তা মূল্যের অনুগামী হবে" তাঁর এ বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, বাকি হওয়ার সুবিধাটি লাভ করে ক্রেতা, এটি ক্রেতার হক। যদি তা মূল্যের কোনো অনুগামী গুণ বা বৈশিষ্ট্য হতো তাহলে এর হকদার হতো বিক্রেতা। কারণ, বিক্রেতা হচ্ছে মূল্যের হকদার, কাজেই মূল্যের অনুগামী গুণেরও সে-ই হকদার হওয়ার কথা। অতএব, যখন বাকি হওয়ার সুবিধাটি বিক্রেতা লাভ করে না তখন বুঝা গেল এটি মূল্যের কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এটি ভিন্ন একটি বিষয় যা ক্রেতার পক্ষ হতে শর্তের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرٰى شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ وَلَّاهُ غَيْرَهُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলার একটি নজির পেশ করছেন। নজিরটি হলো, কেউ যদি কোনো একটি দ্রব্য বাকিতে ক্রয় করে অতঃপর সেই দ্রব্যটি অন্য আরেকজনের নিকট এই শর্তে বিক্রয় করে যে, আমি যে মূল্যে ক্রয় করেছি সে মূল্যে তোমাকে দিলাম [এটিকে 'বায় তাওলিয়া' বলা হয়] তাহলে তার এই শর্তটি কেবল মূল্যের পরিমাণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। বাকির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। অর্থাৎ প্রথম ক্রেতা যে পরিমাণ মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করেছিল দ্বিতীয় ক্রেতা সে পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করবে; কিন্তু প্রথম ক্রেতা যদিও বাকিতে ক্রয় করে থাকে তাহলেও দ্বিতীয় ক্রেতাকে মূল্য নগদ পরিশোধ করতে হয়। কেননা, বাকি হওয়ার বিষয়টি মূল্যের কোনো অনুগামী গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়। কাজেই 'যে মূল্যে ক্রয় করেছি সে মূল্যে বিক্রয় করলাম' কথাটিতে বাকির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং আমাদের আলোচ্য শুফ'আর মাসআলায়ও একই রকম বিধান হবে। অর্থাৎ বাকির বিষয়টি শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কেননা, এটি মূল্যের কোনো অনুগামী গুণ নয়; এটি ক্রেতা লাভ করেছিল কেবল শর্তের ভিত্তিতে। শফী'র ক্ষেত্রে সে শর্ত বিদ্যমান না থাকায় সে এই সুযোগ লাভ করবে না।

ثُمَّ إِنْ أَخَذَهَا بِثَمَنٍ حَالٍّ مِنَ الْبَائِعِ سَقَطَ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِيْ، لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ . وَإِنْ أَخَذَهَا مِنَ الْمُشْتَرِيْ رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِيْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ كَمَا كَانَ . لِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِيْ جَرٰى بَيْنَهُمَا لَمْ يَبْطُلْ بِأَخْذِ الشَّفِيْعِ فَيَبْقٰى مُوْجِبُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَقَدِ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلًا . وَإِنِ اخْتَارَ الْاِنْتِظَارَ لَهُ ذٰلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَلْتَزِمَ زِيَادَةَ الضَّرَرِ مِنْ حَيْثُ النَّقْدِيَّةِ .

অনুবাদ : এরপর [মাসআলা হলো,] যদি শফী' নগদ মূল্যে বিক্রেতার কাছ থেকে সম্পত্তি নিয়ে নেয় তাহলে ক্রেতার উপর হতে মূল্য রহিত হয়ে যাবে, যার কারণ আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর শফী' যদি ক্রেতার নিকট হতে সম্পত্তিটি গ্রহণ করে তাহলে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে সে মূল্য গ্রহণ করবে যেভাবে বাকি ছিল ঠিক সেভাবেই বাকির মেয়াদান্তে। কেননা, ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে যে [বাকির] শর্ত নির্ধারিত হয়েছিল তা শফী' সম্পত্তি নেওয়ার ফলে বাতিল হয়ে যায়নি। কাজেই সে শর্তের কার্যকারিতা বহাল রয়েছে। সুতরাং বিষয়টি এরূপ হয়েছে যে, কেউ বাকি মূল্যে কোনো কিছু ক্রয় করে তা কারো নিকট নগদ মূল্যে বিক্রয় করে দিল। আর শফী' যদি বাকির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে চায় তাহলে তার এ অধিকার থাকবে। কেননা, নগদ পরিশোধের বাড়তি ক্ষতি নিজের উপর গ্রহণ না করার অধিকার তার আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ أَخَذَهَا بِثَمَنٍ حَالٍّ مِنَ الْبَائِعِ الخ : পূর্ববর্ণিত সুরতে [অর্থাৎ ক্রেতা বাড়িটি বাকিতে ক্রয়ের সুরতে] যদি শফী' নগদ মূল্য পরিশোধ করে তখনই বাড়িটি গ্রহণ করে নেয় তাহলে বিধান হলো, যদি বিক্রেতা তখন বাড়িটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে না থাকে এবং শফী' বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করে মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে ক্রেতার জিম্মা হতে মূল্য রহিত হয়ে যাবে। তাকে আর মূল্য পরিশোধ করতে হবে না।

قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এক্ষেত্রে ক্রেতার জিম্মা হতে মূল্য রহিত হওয়ার কারণ তাই যা আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। উল্লেখ্য, এ কথা বলে মুসান্নিফ (র.) যে কারণটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তা তিনি ৩ পৃষ্ঠা পূর্বে بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُوْمَةِ فِيْهَا -এর অধীনে হিদায়ার ৩৮০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি যা বলেছেন তার সারকথা হচ্ছে, শফী' যখন বিক্রেতার নিকট হতে বাড়ি বা সম্পত্তি গ্রহণ করে তখন বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে যে চুক্তিটি হয়েছিল তা রহিত হয়ে যায়। কেননা, শফী' সরাসরি বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করার কারণে ক্রেতার জন্য তা আর হস্তগত করা সম্ভব নয়। তবে চুক্তিটি মূল সত্তাগত দিক থেকে রহিত হয় না। কেননা, শুফ'আর অধিকারটি এ চুক্তিটির উপরই নির্ভরশীল; বরং চুক্তির সম্পর্ক ক্রেতার দিক হতে রহিত হয়ে তা শফী'র সাথে সম্পৃক্ত হবে, যেন শফী'ই বাড়িটি ক্রেতার নিকট হতে ক্রয় করেছে।

এ বর্ণনা অনুসারে শফী' বাড়িটি বিক্রেতার নিকট হতে গ্রহণ করার কারণে যখন ক্রেতার সাথে বিক্রয়ের সম্পর্ক রহিত হয়ে গেছে তখন আমাদের আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতার জিম্মা হতে মূল্য রহিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। কেননা বিক্রয়ের সম্পর্ক

যখন ক্রেতার উপর থেকে রহিত হয়েছে তখন মূল্য তার জিম্মা হতে রহিত হয়ে যাবে। নিম্নে হিদায়ার ৩৮০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত মূল ইবারতটুকু তুলে ধরা হলো–

"ثُمَّ وَجْهُ هٰذَا الْفَسْخِ الْمَذْكُوْرِ أَنْ يَنْفَسِخَ فِىْ حَقِّ الْإِضَافَةِ لِامْتِنَاعِ قَبْضِ الْمُشْتَرِىْ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَهُوَ يُوْجِبُ الْفَسْخَ إِلَّا أَنَّهُ يَبْقٰى أَصْلُ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِ انْفِسَاخِهٖ، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ بِنَاءٌ عَلَيْهِ وَلٰكِنَّهُ تَتَحَوَّلُ الصَّفْقَةُ إِلَيْهِ وَيَصِيْرُ كَأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِىْ مِنْهُ"

قَوْلُهُ وَإِنْ أَخَذَهَا مِنَ الْمُشْتَرِىْ رَجَعَ الْبَائِعُ الخ : উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যদি শফী' বিক্রেতার নিকট হতে জমিটি গ্রহণ করে তার বিধান। এখান থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে, [ক্রেতা বাকিতে বাড়ি ক্রয়ের মাসআলায়] যদি ক্রেতা বাড়িটি হস্তগত করে থাকে এবং শফী' তা ক্রেতার নিকট হতে নগদ মূল্য পরিশোধ করে হস্তগত করে তাহলে বিধান হলো, ক্রেতা শফী'র নিকট হতে নগদ মূল্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে সে মূল্য গ্রহণ করবে বাকির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শফী' নগদ মূল্যে নিয়েছে বলে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মূল্য নগদ চাওয়ার অধিকার পাবে না; বরং বিক্রয়কালে ক্রেতার সাথে যেভাবে বাকিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্ত নির্ধারিত হয়েছিল ঠিক সে শর্ত মোতাবেকই বিক্রেতা মূল্য লাভ করবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِىْ جَرٰى بَيْنَهُمَا لَمْ يَبْطُلْ بِأَخْذِ الشَّفِيْعِ الخ : এক্ষেত্রে বিক্রেতা মূল্য নগদ চাওয়ার অধিকার না পাওয়ার কারণ হচ্ছে, বিক্রেতা তো ক্রেতার নিকট বাকির শর্তেই বিক্রয় করেছে। তারপর ক্রেতা বাড়িটি হস্তগত করে নিয়েছে এবং নগদ মূল্যের বিনিময়ে শফী'কে হস্তান্তর করেছে। বাড়িটি শফী'র গ্রহণ করার কারণে বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে যে বাকির শর্ত হয়েছিল তা বাতিল হয়ে যায়নি। কেননা, ক্রেতা হস্তগত করার পর বাড়িটিতে ক্রেতার মালিকানা পূর্ণ হয়ে গেছে। অতঃপর শফী' যে ক্রেতার নিকট হতে তা গ্রহণ করেছে এটি একটি নতুন ক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। এর প্রভাব বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে সম্পাদিত চুক্তির উপর পড়বে না। কাজেই তাদের উভয়ের কৃত শর্ত স্বীয় স্থানে বহাল থাকবে। অতএব, সে শর্ত অনুসারে ক্রেতা মূল্য বাকিতেই পরিশোধ করবে।

قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ حَالٍ وَقَدِ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلًا الخ : উক্ত বিধানের একটি নজির হলো, কেউ যদি একটি দ্রব্য বাকিতে ক্রয় করে অতঃপর আরেকজনের নিকট নগদ বিক্রয় করে তাহলে প্রথম বিক্রেতা তার প্রাপ্য মূল্য বাকিতেই পাওয়ার অধিকার রাখে– নগদ পাওয়ার অধিকার রাখে না। অর্থাৎ ক্রেতা বাকিতে নিয়ে নগদ বিক্রয় করার কারণে বিক্রেতা তার মূল্য নগদ চাওয়ার অধিকার লাভ করে না। কেননা, ক্রেতার দ্বিতীয়বার নগদ বিক্রয়ের কারণে প্রথম বিক্রেতার সাথে তার কৃত বাকির শর্তটি বাতিল হয়নি, কাজেই সে তা বাকিতেই পরিশোধ করবে। আমাদের আলোচ্য মাসআলাটিও ঠিক তদ্রূপ। কেননা, ক্রেতার নিকট হতে শফী'র গ্রহণ ক্রেতার দ্বিতীয়বার নগদ বিক্রয়েরই পর্যায়ভুক্ত।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.)-এর দলিলটি আমরা এখানে যেভাবে ব্যাখ্যা করলাম যে, "ক্রেতার নিকট হতে শফী'র গ্রহণ করা নতুনভাবে ক্রয় করার পর্যায়ভুক্ত" এ ব্যাখ্যাই সঠিক। কিন্তু হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-বিনায়াহ' ও 'আল-ইনায়াহ'-য় এর ব্যতিক্রম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ দুই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসান্নিফ (র.)-এর ইবারত থেকে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আলোচ্য সুরতে শফী'র ক্রেতার নিকট হতে গ্রহণ একটি নতুন ক্রয়বিক্রয় হিসেবে গণ্য। এটি হচ্ছে কারো কারো অভিমত। পক্ষান্তরে গ্রহণযোগ্য মতানুসারে এক্ষেত্রে বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে যে চুক্তিটি হয়েছিল সেটিই ক্রেতার দিক হতে পরিবর্তিত হয়ে শফী'র সাথে সম্পৃক্ত হয়। তবে বাকির বিষয়টি শফী'র দিকে সম্পৃক্ত হয় না। তার কারণ হলো, বাকির বিষয়টি চুক্তির দাবি (مُقْتَضٰى) নয়; বরং এটি হচ্ছে শর্তের দাবি। কাজেই তা শফী'র দিকে যাবে না।

'নাতাইযুল আফকার' গ্রন্থে এ দুটি গ্রন্থের বক্তব্য জোড়ালোভাবে প্রত্যাখান করে বলা হয়েছে, এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কেননা, এ বিধান হচ্ছে যদি শফী' বাড়িটি বিক্রেতার নিকট হতে গ্রহণ করে সে সুরতে। পক্ষান্তরে যদি শফী' ক্রেতার নিকট হতে গ্রহণ করে [ক্রেতার বাড়িটি হস্তগত করার পর] তাহলে সকলের ঐকমত্যে এটি একটি নতুন বিক্রয় বলে গণ্য হয়। এক্ষেত্রে কারো দ্বিমত নেই। মুসান্নিফ (র.)-এর ইতঃপূর্বের ৩৮০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইবরাত থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট। মুসান্নিফ (র.) সেখানে লিখেছেন–

بِخِلَافِ مَا إِذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ حَيْثُ تَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَمَّ مِلْكُهُ بِالْقَبْضِ وَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ امْتَنَعَ قَبْضُ الْمُشْتَرِي وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْفَسْخَ .

তার এ ইবারতের সারমর্ম হচ্ছে, শফী' বিক্রেতার নিকট হতে গ্রহণ করলে বিক্রয়ের সম্পর্ক ক্রেতার দিক হতে রহিত হয়ে শফী'র সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে শফী' যদি ক্রেতা হস্তগত করার পর তার নিকট হতে গ্রহণ করে তাহলে বিক্রয় কোনোভাবে রহিত হওয়ার আবশ্যকতা নেই। কেননা, হস্তগত করার কারণে তার মালিকানা পূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে সম্পাদিত চুক্তি বহালই থাকবে। [শফী' বরং নতুন বিক্রয় হিসেবে গ্রহণ করবে।]

–[বিস্তারিত দ্র. নাতাইজুল আফকার : পৃ. ৪০৪]

قَوْلُهُ وَإِنِ اخْتَارَ الْإِنْتِظَارَ لَهُ ذٰلِكَ : পূর্বে বিধান বর্ণনা করা হয়েছিল যে, ক্রেতা বাকিতে ক্রয় করলে শফী'র দু'টি ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে মূল্য নগদ পরিশোধ করে বাড়িটি নগদ গ্রহণ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে ক্রেতা যে মেয়াদে বাকি ক্রয় করেছে সে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেও বাড়িটি নিতে পারে। উপরে প্রথম ইচ্ছাধিকার অনুযায়ী নগদ মূল্যে নগদ গ্রহণ করার বিধান দলিলসহ উল্লেখ করা হয়েছে। আর আলোচ্য ইবারতে দ্বিতীয় ইচ্ছাধিকার তথা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত শফী'র বিলম্ব করার বিধান দলিলসহ বর্ণনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, শফী' যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় তাহলে সে এ অধিকার লাভ করবে। কেননা, ক্রেতা বাকি মূল্যে বাড়িটি ক্রয় করেছে. আর শফী' মূল্যের বিনিময়েই বাড়িটি লাভ করে। কাজেই মূল্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোনো ক্ষতি শফী'র উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে। আর মূল্য বিলম্বে পরিশোধ করার সুযোগ একটি সুবিধা হিসেবে গণ্য। কাজেই শফী'র উপর নগদ পরিশোধ করা অপরিহার্য করা হলে তা তার উপর অতিরিক্ত ক্ষতি বলে গণ্য হবে। কাজেই তা করা যাবে না। [পক্ষান্তরে উপরে যে বলা হয়েছে যে, ক্রেতা যেভাবে বাকি মূল্যের বিনিময়ে বাড়িটি নগদ গ্রহণ করেছে শফী' তা পারবে না; বরং সে বাড়িটি নগদ গ্রহণ করতে চাইলে নগদ মূল্যেই নিতে হবে। এর কারণ ছিল বাকি মূল্যের বিনিময়ে নগদ বস্তু হস্তান্তর করার বিষয়টি ক্রেতার উপর বিক্রেতার আস্থার উপর নির্ভরশীল। এ আস্থা যেহেতু শফী'র ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়নি তাই সে এ সুযোগ লাভ করবে না।]

وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ : وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتّٰى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ مُرَادُهُ الصَّبْرُ عَنِ الْأَخْذِ . أَمَّا الطَّلَبُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ حَتّٰى لَوْ سَكَتَ عَنْهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) خِلَافًا لِقَوْلِ أَبِي يُوْسُفَ الْأَخِرِ . لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْبَيْعِ وَالْأَخْذُ يَتَرَاخٰى عَنِ الطَّلَبِ، وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الْأَخْذِ فِي الْحَالِ، بِأَنْ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ حَالًا، فَيُشْتَرَطُ الطَّلَبُ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ .

অনুবাদ : মূল গ্রন্থে কুদূরী (র.)-এর যে বক্তব্য "আর যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে বাকির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "সম্পত্তিটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অপেক্ষায় থাকবে"। পক্ষান্তরে দাবি উত্থাপনের বিষয়টি তার উপর তাৎক্ষণিকভাবেই আবশ্যক। কাজেই যদি সে দাবি না করে নীরব থাকে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পরবর্তী মত এর বিপরীত। [ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে] বাতিল হওয়ার কারণ হলো, শুফ'আর অধিকার তো সাব্যস্ত হয় [সম্পত্তি] বিক্রয় হওয়ার কারণে। আর সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়ে থাকে দাবি উত্থাপনের আরো পরে। মূল্য নগদ পরিশোধের মাধ্যমে শফী'র বর্তমানেই সম্পত্তিটি নেওয়ার সুযোগও রয়েছে। কাজেই বিক্রয় হওয়ার ব্যাপারে তার অবগত হওয়ার সময়ই দাবি উত্থাপন আবশ্যক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ : وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরের 'মতন' [তথা ইমাম কুদূরীর মুখতাছার গ্রন্থের ইবারত]-এ যে বলা হয়েছে وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتّٰى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ অর্থাৎ [ক্রেতা বাড়িটি বাকিতে ক্রয়ের সুরতে] "শফী' যদি চায় তাহলে বাকির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে"– এখানে এ অপেক্ষা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেবল বাড়িটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অপেক্ষা করা। অর্থাৎ শফী' চাইলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করে বাড়িটি গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু শফী'কে বাড়িটি বিক্রয় হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়ার পর শুফ'আর দাবি উত্থাপন করতে হয়, এক্ষেত্রে সে বিলম্ব করতে পারবে না; বরং জানার সাথে সাথেই তাকে শুফ'আর দাবি উত্থাপন করতে হবে।

কাজেই যদি শফী' "বাড়িটি বাকিতে বিক্রয় করা হয়েছে" এ সংবাদ পাওয়ার পর শুফ'আর দাবি উত্থাপন না করে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

তবে এ বিধান হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সর্বশেষ অভিমত হচ্ছে, বাকি বিক্রয়ের সুরতে শফী' বিক্রয় সংবাদ পাওয়ার পরও যদি শুফ'আর দাবি না করে; বরং বাকির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার দাবি বিলম্ব করার অবকাশ থাকবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর প্রথম অভিমত ছিল ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতেরই অনুরূপ। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তার এ মত পরিবর্তন করেন এবং উক্ত দ্বিতীয় মতটি অবলম্বন করেন।

মুসান্নিফ (র.) পরবর্তী ইবারতে কেবল ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল তিনি এখানে বর্ণনা করেননি। তবে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে মূলত উদ্দেশ্য থাকে জমি বা বাড়িটি গ্রহণ করা। শফী' এক্ষেত্রে যেভাবে বাড়িটি গ্রহণ করতে চায় তা তার জন্য সম্ভব হচ্ছে না। সে চায় মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর গ্রহণ করতে কিংবা বাকি মূল্যে নগদ গ্রহণ করতে, আর এর কোনোটিই তার জন্য সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই এখন দাবি উত্থাপনের কোনো লাভ অর্জিত হচ্ছে না। অতএব, এক্ষেত্রে সে যদি দাবি উত্থাপনে বিলম্ব করে তাহলে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে সে বাড়িটি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক; বরং এখন দাবি উত্থাপন করে লাভ হবে না বিধায় সে বিলম্ব করেছে বলে ধরা হবে। সুতরাং শুফ'আ গ্রহণে তার অনীহা প্রকাশ না পাওয়ার কারণে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। কেননা, দাবি উত্থাপনে বিলম্ব করলে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয় যেক্ষেত্রে বিলম্ব করার কারণে তার অনীহা প্রকাশ পায় সেক্ষেত্রে । আলোচ্য সূরতে তার অনীহা প্রকাশ পায়নি।

قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْبَيْعِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল বর্ণনা করছেন। তাঁদের উভয়ের দলিল হলো, শুফ'আর দাবি উত্থাপন করতে হয় যখন শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় তখন। আর শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় বিক্রয়ের পরেই। কাজেই বিক্রয়ের সংবাদ জানার সাথে সাথেই তাকে দাবি উত্থাপন করতে হবে। কেননা, অধিকার লাভ করার পর যদি সে দাবি উত্থাপন পরিত্যাগ করে তাহলে তা অনীহা প্রকাশেরই প্রমাণ বহন করে। অতএব, তৎক্ষণাৎ দাবি উত্থাপন না করলে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْأَخْذُ يَتَرَاخَى عَنِ الطَّلَبِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) প্রচ্ছন্নভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব দিয়েছেন। তিনি যে বলেছেন শফী' যেহেতু বর্তমানে জমি গ্রহণ করতে পারছে না তাই দাবি উত্থাপন করে লাভ না থাকায় তার উপর এখনই দাবি উত্থাপন আবশ্যক হবে না। এর জবাব হচ্ছে, দাবি উত্থাপন করার বিষয়টি জমি গ্রহণ করার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা, সকল সূরতেই শফী' জমি বা বাড়ি গ্রহণ করে পরে; কিন্তু দাবি উত্থাপন বিক্রয় সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই তাকে করতে হয়। আর যদি ধরেও নেই যে, জমি গ্রহণ করার সুযোগ থাকার সাথেই দাবি করার বিষয়টি সম্পৃক্ত তবু আমরা বলব যে, আমাদের আলোচ্য সূরতে শফী'র জন্য বাড়িটি নগদ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। কেননা, সে নগদ মূল্য পরিশোধ করে বাড়িটি নগদ নিয়ে নিতে পারে। কাজেই তার জন্যে বাড়িটি নগদ নেওয়া সম্ভব। অতএব, বিক্রয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথেই তাকে দাবি উত্থাপন করতে হবে। নতুবা তার অনীহা হিসেবে গণ্য হবে এবং শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَالَ : وَإِذَا اشْتَرٰى ذِمِّيٌّ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ وَشَفِيْعُهَا ذِمِّيٌّ أَخَذَهَا بِمِثْلِ الْخَمْرِ وَقِيْمَةِ الْخِنْزِيْرِ . لِأَنَّ هٰذَا الْبَيْعَ مُقْضًى بِالصِّحَّةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ، وَحَقُّ الشُّفْعَةِ يَعُمُّ الْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيَّ، وَالْخَمْرُ لَهُمْ كَالْخَلِّ لَنَا وَالْخِنْزِيْرُ كَالشَّاةِ. فَيَأْخُذُ فِي الْأَوَّلِ بِالْمِثْلِ وَفِي الثَّانِيْ بِالْقِيْمَةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি অমুসলিম বাসিন্দা মদ কিংবা শূকরের বিনিময়ে সম্পত্তি ক্রয় করে এবং সম্পত্তির শফী'ও যদি অমুসলিম বাসিন্দা হয় তাহলে সে [মদের ক্ষেত্রে] অনুরূপ মদের বিনিময়ে এবং [শূকরের ক্ষেত্রে] শূকরের বাজারমূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তি গ্রহণ করবে। কেননা, এরূপ বিক্রয় চুক্তি তাদের পরস্পরের ক্ষেত্রে সঠিক বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। আর শুফ'আর অধিকার মুসলিম বাসিন্দা ও অমুসলিম বাসিন্দা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর তাদের বেলায় মদের বিধান হচ্ছে আমাদের বেলায় সিরকার বিধানের অনুরূপ এবং শূকর হচ্ছে বকরির অনুরূপ। সুতরাং প্রথমটির ক্ষেত্রে অনুরূপ বস্তুর বিনিময়ে আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে মূল্যের বিনিময়ে [সম্পত্তি] গ্রহণ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا اشْتَرٰى ذِمِّيٌّ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ الخ : মাসআলা হলো, যদি কোনো জিম্মি [মুসলিম দেশে বসবাসকারী অমুসলিম বাসিন্দা] মদ কিংবা শূকরের বিনিময়ে আরেকজন জিম্মির নিকট হতে কোনো বাড়ি বা জমি ক্রয় করে তাহলে বিধান হলো, যদি উক্ত বাড়ি বা জমির শফী' জিম্মি হয়ে থাকে তবে সে মদের বিনিময়ে ক্রয়ের সুরতে ক্রেতা যে পরিমাণ মদের বিনিময়ে বাড়িটি ক্রয় করেছে শফী'ও সমপরিমাণ অনুরূপ মদ দিয়ে বাড়িটি গ্রহণ করবে। আর শূকরের ক্ষেত্রে ক্রেতা যে শূকরের বিনিময়ে ক্রয় করেছে শফী' সে শূকরের বাজারমূল্য মুদ্রা [টাকা]-র মাধ্যমে পরিশোধ করে বাড়িটি গ্রহণ করবে। [আর যদি উক্ত বাড়ির শফী' মুসলিম বাসিন্দা হয় তাহলে তার বিধান ভিন্ন হবে, যা পূর্ববর্তী ইবারতে বর্ণনা করা হয়েছে।]

قَوْلُهُ لِأَنَّ هٰذَا الْبَيْعَ مُقْضًى بِالصِّحَّةِ : উক্ত বিধানের দলিল হলো, মদ বা শূকরের বিনিময়ে অমুসলিম বাসিন্দাদের ক্রয়বিক্রয় সঠিক বলে গণ্য হয়। কেননা, মদ ও শূকর অমুসলিমদের নিকট মাল [বৈধ সম্পদ] বলে গণ্য। কাজেই তাদের পরস্পরের ক্ষেত্রে উক্ত বিক্রয় সঠিক বলে গণ্য হবে। আর শুফ'আর অধিকার যেমনিভাবে মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অমুসলিম বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তারাও শুফ'আর অধিকার লাভ করে। কেননা, শুফ'আ সংক্রান্ত যে সকল হাদীস ও দলিল রয়েছে [যা আমরা শুফ'আর অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি] তা কেবল মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। কাজেই যখন একজন অমুসলিম বাসিন্দা মদ বা শূকরের বিনিময়ে বাড়ি ক্রয় করে তখন শফী' অপর একজন অমুসলিম বাসিন্দা হলে সেও শুফ'আর অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَالْخَمْرُ لَهُمْ كَالْخَلِّ لَنَا وَالْخِنْزِيْرُ كَالشَّاةِ الخ : আর উক্ত সুরতে মদের ক্ষেত্রে অনুরূপ মদ এবং শূকরের ক্ষেত্রে তার বাজারদর দিতে হবে। তার কারণ হলো, অমুসলিমদের ক্ষেত্রে মদ হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে সিরকার মতো। অর্থাৎ কোনো মুসলিম যদি সিরকার বিনিময়ে বাড়ি বিক্রি করে তাহলে শফী' সমপরিমাণ অনুরূপ সিরকা দিয়েই বাড়িটি গ্রহণ করতে পারবে। কেননা, সিরকা হচ্ছে 'সদৃশলভ্য বস্তু' (مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ) অর্থাৎ ক্রেতাপ্রদত্ত সিরকার অনুরূপ সিরকা শফী'র পক্ষে দেওয়া সম্ভব; কাজেই তাকে অনুরূপ সিরকাই দিতে হয়। তদ্রূপ মদের ক্ষেত্রেও তাই বিধান হবে। কেননা, মদও হচ্ছে 'সদৃশলভ্য বস্তু' অর্থাৎ একই রকম মদ সাধারণত পাওয়া যায়। কাজেই ক্রেতা যে মদের বিনিময়ে বাড়িটি ক্রয় করেছে অমুসলিম শফী' অনুরূপ মদ দিয়েই বাড়িটি গ্রহণ করবে।

আর তাদের ক্ষেত্রে শূকর হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে বকরির মতো। অর্থাৎ বকরি হচ্ছে 'মূল্যনির্ভর বস্তু' (مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ)। তাই কেউ যদি বকরির বিনিময়ে বাড়ি ক্রয় করে তাহলে উক্ত বাড়ি বকরির বাজারদর হিসেবে তার মূল্য পরিশোধ করে শফী' বাড়িটি গ্রহণ করে। কেননা, ক্রেতাপ্রদত্ত বকরির অনুরূপ বকরি দেওয়া সাধারণত সম্ভব নয়; বরং সেক্ষেত্রে অনুরূপ বকরি রয়েছে কিনা, তা নিয়ে বিরোধ দেখা দিতে পারে। তাই বকরিটির বাজারদর হিসেবে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। তদ্রূপ অমুসলিমদের ক্ষেত্রে আলোচ্য সুরতে শফী' উক্ত শূকরের বাজারদর হিসেবে মূল্য পরিশোধ করে বাড়িটি গ্রহণ করবে। কেননা, তাদের ক্ষেত্রে শূকর হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে বকরিরই অনুরূপ।

قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ فِي الْأَوَّلِ بِالْمِثْلِ وَالثَّانِيْ بِالْقِيْمَةِ : অর্থাৎ প্রথম সুরতে তথা মদের বিনিময়ে ক্রয়ের সুরতে অনুরূপ মদ দিয়ে শফী' বাড়িটি গ্রহণ করবে। আর দ্বিতীয় সুরতে শফী' উক্ত শূকরের বাজারমূল্য দিয়ে বাড়িটি গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য, একজন অমুসলিম বাসিন্দা আরেকজন অমুসলিম বাসিন্দার নিকট হতে শুফ'আর অধিকারবলে জমি বা বাড়ি লাভ করতে পারবে– এ ব্যাপারে কোনো ইমামের দ্বিমত নেই। কিন্তু একজন অমুসলিম বাসিন্দা আরেকজন মুসলিম বাসিন্দার নিকট শুফ'আর অধিকার লাভ করবে কিনা– এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমাদ, হাসান বসরী ও শা'বী (র.)-এর মতে কোনো অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম বাসিন্দার নিকট হতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না। পক্ষান্তরে আহনাফ, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীসহ অধিকাংশ ইমামের মতে সে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। আর ভিসার মাধ্যমে আগত অমুসলিমের বিধান অমুসলিম বাসিন্দারই অনুরূপ। –[দ্র. আল-বিনায়াহ]

قَالَ : وَإِنْ كَانَ شَفِيْعُهَا مُسْلِمًا أَخَذَهَا بِقِيْمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ . أَمَّا الْخِنْزِيْرُ فَظَاهِرٌ، وَكَذَا الْخَمْرُ لِامْتِنَاعِ التَّسْلِيْمِ وَالتَّسَلُّمِ فِيْ حَقِّ الْمُسْلِمِ، فَالْتَحَقَ بِغَيْرِ الْمِثْلِيِّ، وَإِنْ كَانَ شَفِيْعُهَا مُسْلِمًا وَذِمِّيًّا أَخَذَ الْمُسْلِمُ نِصْفَهَا بِنِصْفِ قِيْمَةِ الْخَمْرِ وَالذِّمِّيُّ نِصْفَهَا بِنِصْفِ مِثْلِ الْخَمْرِ، اِعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ . فَلَوْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ أَخَذَهَا بِنِصْفِ قِيْمَةِ الْخَمْرِ لِعَجْزِهِ عَنْ تَمْلِيْكِ الْخَمْرِ، وَبِالْإِسْلَامِ يَتَأَكَّدُ حَقُّهُ لَا أَنْ يَبْطُلَ، فَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَاهَا بِكُرٍّ مِنْ رُطَبٍ فَحَضَرَ الشَّفِيْعُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ يَأْخُذُهَا بِقِيْمَةِ الرُّطَبِ، كَذَا هٰذَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর উক্ত সম্পত্তির শফী' যদি মুসলিম হয় তাহলে সে সম্পত্তি নেবে মদ ও শূকর উভয়ের মূল্যের বিনিময়ে। শূকরের ক্ষেত্রে বিষয়টি তো স্পষ্ট। মদের বিষয়টিও তদ্রূপ। কেননা, মুসলমানের ক্ষেত্রে তা হস্তান্তর করা এবং গ্রহণ করা উভয়ই অসম্ভব। কাজেই এটিও সদৃশলভ্য নয়– এমন বস্তুরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর যদি উক্ত সম্পত্তির শফী' একজন মুসলিম এবং আরেকজন অমুসলিম বাসিন্দা হয় তাহলে মুসলিম শফী' তার প্রাপ্য অর্ধেক নেবে মদের অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে আর অমুসলিম বাসিন্দা তার অর্ধেক নেবে অনুরূপ অর্ধেক পরিমাণ মদের বিনিময়ে। [এ বিধান হয়েছে] আংশিক পরিমাণকে সম্পূর্ণ পরিমাণের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে। আর যদি অমুসলিম বাসিন্দাও মুসলমান হয়ে যায় তাহলে সেও তার প্রাপ্য অর্ধেক গ্রহণ করবে মদের অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে। কেননা, অন্যকে মদের মালিক বানাতে সে এখন অপারগ। আর ইসলাম গ্রহণের ফলে প্রাপ্য অধিকার তো আরো দৃঢ় হবে; বাতিল হতে পারে না। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, কেউ সম্পত্তি ক্রয় করল এক 'কুর' পরিমাণ পাকা খেজুরের বিনিময়ে। অতঃপর পাকা খেজুর বাজারে দুষ্প্রাপ্য হওয়ার পর শফী' আগমন করল। সে ক্ষেত্রে শফী'কে সম্পত্তিটি পাকা খেজুরের বাজার মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করতে হয়। আলোচ্য বিষয়টিও তদ্রূপই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِنْ كَانَ شَفِيْعُهَا مُسْلِمًا الخ : পূর্ববর্ণিত মাসআলায় [অর্থাৎ মদ কিংবা শূকরের বিনিময়ে বাড়ি বিক্রয়ের মাসআলায়] বিক্রীত বাড়ির শফী' যদি কোনো মুসলমান ব্যক্তি হয় তাহলে বিধান হলো, সে মদ ও শূকর উভয় ক্ষেত্রেই বাজারমূল্য দিয়ে বাড়িটি গ্রহণ করবে। অর্থাৎ যদি বাড়িটি মদের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়ে থাকে তাহলে শফী' উক্ত মদের যা বাজারমূল্য রয়েছে তা মুদ্রা [টাকাপয়সা]-র মাধ্যমে পরিশোধ করে বাড়িটি নেবে। আর যদি শূকরের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়ে থাকে তাহলে উক্ত শূকরের বাজারমূল্য দিয়ে শফী' বাড়িটি গ্রহণ করবে।

قَوْلُهُ أَمَّا الْخِنْزِيْرُ فَظَاهِرٌ وَكَذَا الْخَمْرُ الخ : এখান থেকে উক্ত বিধান তথা শফী' মুসলমান হলে উভয় ক্ষেত্রে বাজারমূল্য দিয়ে বাড়ি নিতে হবে– এর দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিক্রেতা যদি শূকরের বিনিময়ে বাড়িটি বিক্রয় করে তাহলে শূকরের বাজারমূল্য দিয়ে শফী'কে বাড়িটি গ্রহণ করতে হবে। এর কারণ তো স্পষ্ট। কেননা, শূকর হচ্ছে

'মূল্যনির্ভর বস্তু' (مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ) -এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ একটি শূকরের হুবহু অনুরূপ আরেকটি শূকর সাধারণত পাওয়া যায় না। তাই কারো জিম্মায় যখন তা সাব্যস্ত হয় তখন তার বাজারমূল্য সাব্যস্ত হয়। অনুরূপ আরেকটি শূকর সাব্যস্ত হয় না। অতএব, ক্রেতা যে শূকরের বিনিময়ে বাড়িটি ক্রয় করেছে শফী' তার বাজারমূল্য পরিশোধ করে বাড়িটি গ্রহণ করবে। আর মদের ক্ষেত্রে শফী' বাজার মূল্য দিয়ে বাড়িটি নেবে তার কারণ হচ্ছে, মদ যদিও 'সদৃশলভ্য বস্তু' (مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ)-এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ মদের অনুরূপ মদ জোগাড় করা সম্ভব। তাই ক্রেতা যে মদের বিনিময়ে ক্রয় করেছে সমপরিমাণ অনুরূপ মদ দিয়েই শফী' বাড়িটি নেওয়ার কথা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে শফী' যেহেতু মুসলিম, আর মুসলিমের জন্য মদ গ্রহণ করাও নাজায়েজ এবং অন্যকে প্রদান করাও নাজায়েজ, তাই শফী'র জন্য এক্ষেত্রে বিক্রেতাকে অনুরূপ মদ হস্তান্তর করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর যে ক্ষেত্রে কোনো বস্তুর অনুরূপ বস্তু দেওয়া অসম্ভব হয় সেক্ষেত্রে তার বাজারমূল্য দেওয়াই নির্ধারিত হয়। কাজেই এক্ষেত্রে মদের বিষয়টিও শূকরের ন্যায় 'সদৃশলভ্য নয়' (غَيْرُ الْمِثْلِيِّ) এমন বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং শফী' মদের বাজারমূল্য দিয়ে বাড়িটি গ্রহণ করবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ شَفِيْعُهَا مُسْلِمًا وَذِمِّيًّا أَخَذَ الْمُسْلِمُ : যদি মদের বিনিময়ে বাড়িটি বিক্রয় করা হয় আর বাড়িটির শফী' দুজন হয়, একজন মুসলিম আর অপরজন অমুসলিম [জিম্মি], তাহলে বিধান হলো, মুসলিম শফী' তার অর্ধেক নেবে উক্ত মদের অর্ধেকের যা বাজারমূল্য হয় তার বিনিময়ে। আর অমুসলিম শফী' তার প্রাপ্য অর্ধেক বাড়ি গ্রহণ করবে উক্ত মদের অর্ধেক পরিমাণ মদের বিনিময়ে।

قَوْلُهُ اِعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ : এ বিধানের কারণ হলো, সম্পূর্ণ বাড়ির শুফ'আর অধিকারী হলে যেরূপ বিধান ছিল আংশিক বাড়ির শুফ'আর ক্ষেত্রেও সেরূপই বিধান হবে। আর পূর্বে সম্পূর্ণ বাড়ির শুফ'আর ক্ষেত্রে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে যে, মদের বিনিময়ে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শফী' যদি অমুসলিম হয় তাহলে সে অনুরূপ মদ দিয়ে বাড়িটি নেবে। আর শফী' মুসলমান হলে মদের বাজারমূল্য পরিশোধ করে বাড়িটি নেবে। কাজেই অর্ধেক শুফ'আ লাভের ক্ষেত্রে মুসলমান শফী' অর্ধেক মদের বাজারমূল্য দেবে। আর অমুসলিম শফী' অর্ধেক পরিমাণ মদ দিয়ে বাড়ির অর্ধেক নেবে।

قَوْلُهُ فَلَوْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ أَخَذَهَا بِنِصْفِ قِيْمَةِ الْخَمْرِ : উপরে বর্ণিত সুরতে [অর্থাৎ বাড়িটি যদি মদের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয় এবং শফী' একজন মুসলমান হয় আর আরেকজন অমুসিলম হয় সে সুরতে] যদি অমুসলিম [জিম্মি] তার প্রাপ্য অর্ধেক গ্রহণ করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে মুসলমান শফী'র ন্যায় উক্ত মদের অর্ধেকের বাজারমূল্য দিয়ে তার প্রাপ্য অর্ধেক বাড়ি গ্রহণ করবে। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পর সে মদ প্রদান করে বাড়ি নেবে না; বরং মদের বাজারমূল্য পরিশোধ করে বাড়ি নেবে।

قَوْلُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ تَمْلِيْكِ الْخَمْرِ وَبِالْإِسْلَامِ يَتَأَكَّدُ حَقُّهُ : উক্ত বিধানের কারণ হলো, অমুসলিম [জিম্মি] শফী' মুসলমান হওয়ার কারণে এখন অন্যকে সে মদের মালিক বানাতে পারবে না। কেননা, মুসলমানের জন্য যেমনিভাবে মদের মালিকানা লাভ করা নাজায়েজ তদ্রূপ অন্যকে হস্তান্তর করে মালিক বানানোও নাজায়েজ। কাজেই এখন হয় তার শুফ'আর অধিকার বাতিল করতে হবে নতুবা উক্ত মদের বাজারমূল্য দিয়ে তার প্রাপ্য অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে। এ দুটির যে কোনো একটি অবলম্বন করতে হবে। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কারো প্রাপ্য অধিকার বাতিল হয় না; বরং আরো শক্তিশালী হয়। অতএব, তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। কাজেই সে উক্ত মদের বাজারমূল্য দিয়েই তার প্রাপ্য অংশগ্রহণ করবে।

قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَاهَا بِكُرٍّ مِنْ رُطَبٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) উক্ত বিধানের একটি নজির পেশ করছেন। নজিরটি হলো, কেউ বাড়ি ক্রয় করল এক 'কুর' পরিমাণ তাজা খেজুরের বিনিময়ে। বাড়িটির শফী' বিক্রয়কালে অনুপস্থিত ছিল। এরপর যখন তাজা খেজুর দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে তখন শফী' আসল। তাহলে বিধান হলো শফী' উক্ত এক 'কুর' তাজা খেজুরের বাজারমূল্য দিয়ে বাড়িটি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে শফী'র উপর প্রথমত এক 'কুর' তাজা খেজুর দিয়েই বাড়িটি নেওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু তার আগমনের পর থেকে যেহেতু তাজা খেজুর দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে সেহেতু তার পক্ষে তাজা খেজুর হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। কাজেই তাকে উক্ত এক 'কুর' পরিমাণ তাজা খেজুরের বাজারমূল্য দেওয়ার বিধান হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও ইসলাম গ্রহণকারী শফী'র পক্ষে যেহেতু মদ হস্তান্তর করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাই তার উপর উক্ত মদের বাজারমূল্য দেওয়ার বিধান হয়েছে।

فَصْلٌ : অনুচ্ছেদ

এ অনুচ্ছেদে মুসান্নিফ (র.) শুফ'আর সম্পত্তি শফী' গ্রহণ করার পূর্বে ক্রেতা কিংবা অন্য কারো পক্ষ হতে তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হলে তার বিধান সম্পর্কিত মাসায়েল বর্ণনা করেছেন। সম্পত্তিতে পরিবর্তন না হওয়াই হচ্ছে তার মূল বা প্রকৃত অবস্থা, আর পরিবর্তন হচ্ছে পরবর্তীতে সৃষ্ট অবস্থা। তাই মুসান্নিফ (র.) পরিবর্তন না হওয়া সম্পর্কিত মাসায়েল বর্ণনা করার পর পৃথক অনুচ্ছেদে পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্পর্কিত মাসায়েল বর্ণনা করছেন।

قَالَ : وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِىْ أَوْ غَرَسَ ثُمَّ قَضَى لِلشَّفِيْعِ بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ وَقِيْمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِىْ قَلْعَهُ . وَعَنْ أَبِىْ يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ الْقَلْعَ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ وَقِيْمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) إِلَّا أَنَّ عِنْدَهُ لَهُ أَنْ يَقْلَعَ وَيُعْطِى قِيْمَةَ الْبِنَاءِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি ক্রেতা [সম্পত্তি ক্রয় করার পর তাতে] গৃহাদি নির্মাণ করে কিংবা গাছ লাগায় অতঃপর শফী'র পক্ষে শুফ'আর রায় হয় তাহলে শফী'র ইচ্ছাধিকার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে সম্পত্তির মূল্য এবং নির্মিত গৃহাদি ও গাছের মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করবে, আবার ইচ্ছা করলে ক্রেতাকে এগুলো তুলে নিতে বাধ্য করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে [গায়রে জাহিরী রেওয়ায়েতে] একটি বর্ণনা আছে যে, শফী' ক্রেতাকে এগুলো তুলে নিতে বাধ্য করতে পারবে না। সে কেবল এ ইচ্ছাধিকার পাবে যে, হয় সে সম্পত্তির দাম এবং নির্মিত গৃহাদি ও বৃক্ষের মূল্য দিয়ে সম্পত্তি গ্রহণ করবে নতুবা [তার হক] ছেড়ে দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এ অভিমত। তবে তাঁর মতে শফী'র এ অধিকার থাকবে যে, সে এগুলো তুলে দিয়ে এর মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِىْ أَوْ غَرَسَ ثُمَّ قَضَى لِلشَّفِيْعِ الخ : মাসআলা হচ্ছে, ক্রেতা বাড়ি ক্রয় করার পর যদি তাতে ঘর নির্মাণ করে কিংবা গাছ লাগায় তারপর শফী'র পক্ষে বাড়িটির রায় হয়ে যায় তাহলে জাহিরী রেওয়ায়েত অনুসারে আমাদের তিন ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শফী' তিনটি ইচ্ছাধিকার লাভ করবে।

১. সে ইচ্ছা করলে বাড়ির ক্রয়মূল্য এবং ক্রেতার নির্মিত ঘর বা লাগানো গাছের মূল্য দিয়ে উক্ত ঘর বা গাছ সহকারে বাড়িটি নিয়ে নেবে। এক্ষেত্রে নির্মিত ঘর বা গাছের মূল্য ধরা হবে উপড়ানো অবস্থার মূল্য হিসেবে। অর্থাৎ উক্ত ঘর যদি ভেঙ্গে ফেলা হয় বা গাছ যদি উপড়িয়ে ফেলা হয় তাহলে যে মূল্য হতে পারে শফী' ক্রেতাকে সে মূল্য প্রদান করবে। ঘর বা গাছ স্বস্থানে থাকাবস্থায় যে মূল্য হয় তা দিতে হবে না।

২. শফী' ইচ্ছা করলে ক্রয়মূল্য দিয়ে কেবল বাড়িটি গ্রহণ করবে, আর ক্রেতাকে বলবে– তুমি তোমার নির্মিত ঘর কিংবা গাছ তুলে নিয়ে যাও। ক্রেতা তার নির্মিত ঘর বা লাগানো গাছ তুলে নিতে বাধ্য থাকবে।

৩. আর শফী' ইচ্ছা করলে তার শুফ'আর অধিকার ত্যাগ করবে।

قَوْلُهُ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ الْقَلْعَ الخ : উপরে যে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে জাহিরী রেওয়ায়েত। সে রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-ও তরফাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে একমত। কিন্তু 'গাইরে জাহিরী রেওয়ায়েতে' ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর মতে শফী' এক্ষেত্রে কেবল দুটি ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। যেমন–

১. সে ইচ্ছা করলে বাড়িটির ক্রয়মূল্য এবং নির্মিত ঘর বা গাছের মূল্য পরিশোধ করে বাড়িটি উক্ত ঘর বা গাছসহ গ্রহণ করবে।

২. নতুবা সে শুফ'আর অধিকার পরিত্যাগ করবে।

অর্থাৎ এ রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শফী' ক্রেতাকে তার নির্মিত ঘর বা লাগানো গাছ তুলে নিতে বাধ্য করতে পারবে না; বরং শফী' উক্ত ঘর বা গাছের মূল্য দিয়ে তা সহ বাড়িটি নিয়ে নেবে।

উল্লেখ্য, এ রেওয়ায়েতটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদের নিজস্ব অভিমতও অনুরূপ। আর প্রথমে বর্ণিত জাহিরী রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুহাম্মদ (র.)। এ মতটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে ইবনু সামাআহ, বিশর ইবনুল ওলীদ, আলী ইবনুল জা'দ এবং হাসান ইবনে আবী মালিক (র.) প্রমুখও বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) اِلَّا اَنَّ عِنْدَهُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের অনুরূপ। তবে তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বর্ণিত দুটি ইচ্ছাধিকারের সাথে তৃতীয় আরেকটি ইচ্ছাধিকার শফী'কে প্রদান করেন। সুতরাং তাঁর মতে শফী' নিম্নোক্ত তিনটি ইচ্ছাধিকার লাভ করবে–

১. শফী' ইচ্ছা করলে বাড়িটির ক্রয়মূল্য এবং নির্মিত ঘর বা গাছের মূল্য দিয়ে ঘর বা গাছসহ বাড়িটি গ্রহণ করবে।

২. সে ইচ্ছা করলে ক্রেতাকে বলবে তুমি তোমার নির্মিত ঘর বা লাগানো গাছ তুলে নাও। তবে এক্ষেত্রে শফী' ক্রেতাকে ঘর বা গাছ তুলে নেওয়ার কারণে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা দিয়ে দেবে। অর্থাৎ নির্মিত ঘর বা গাছ স্বস্থানে থাকাবস্থায় যে মূল্য ছিল তুলে নেওয়ার পর তা থেকে যতটুকু মূল্য কমে গেছে শফী' ক্রেতাকে তা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়ে দেবে। এ শর্তে ক্রেতাকে সে ঘর বা গাছ তুলে নিতে বাধ্য করতে পারবে। তারপর সে বাড়িটি ক্রয়মূল্য দিয়ে নিয়ে নেবে।

[উল্লেখ্য, 'মতনে' বর্ণিত আমাদের মতানুসারে শফী' ইচ্ছা করলে ক্রেতাকে তার নির্মিত ঘর বা গাছ তুলে নিতে বলবে এবং সেক্ষেত্রে তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।]

৩. আর ইচ্ছা করলে শফী' তার শুফ'আর অধিকার পরিত্যাগ করবে।

لِأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي الْبِنَاءِ، لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلٰى أَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ، وَالتَّكْلِيْفُ بِالْقَلْعِ مِنْ أَحْكَامِ الْعُدْوَانِ وَصَارَ كَالْمَوْهُوْبِ لَهُ وَالْمُشْتَرِيْ شِرَاءً فَاسِدًا وَكَمَا إِذَا زَرَعَ الْمُشْتَرِيْ . فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْقَلْعَ، وَهٰذَا لِأَنَّ فِيْ إِيْجَابِ الْأَخْذِ بِالْقِيْمَةِ دَفْعُ أَعْلَى الضَّرَرَيْنِ بِتَحَمُّلِ الْأَدْنٰى فَيُصَارُ إِلَيْهِ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, নির্মাণের ক্ষেত্রে ক্রেতার ন্যায্য অধিকার ছিল। কেননা, বাড়িটি তার মালিকানভুক্ত এই ভিত্তিতেই সে তাতে নির্মাণ করেছে। অথচ তুলে নিতে বাধ্য করার বিধানটি হয়ে থাকে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে ক্রেতা দানগ্রহীতা এবং ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে ক্রয়কারী ব্যক্তির মতোই হলো। অনুরূপভাবে তার বিষয়টি এমন হলো যে, ক্রেতা সম্পত্তিতে ফসল লাগাল [তারপর শফী'র পক্ষে শুফ'আর রায় হলো]। কেননা, এক্ষেত্রে ক্রেতাকে ফসল তুলে নিতে বাধ্য করা হয় না। উক্ত বিধান এজন্যই যে, [নির্মিত গৃহাদি ও বৃক্ষের] মূল্য দিয়ে নেওয়ার বিধান করার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষতি স্বীকার করে তুলনামূলক বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা হয়। কাজেই এ ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِأَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي الْبِنَاءِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে 'গাইরে জাহিরী রেওয়ায়েতে' বর্ণিত মতটির দলিল বর্ণনা করছেন। তাঁর পক্ষে দুটি আকলী দলিল ও কিয়াস হিসেবে তিনটি নজির পেশ করেছেন।

প্রথম আকলী দলিল হলো, ক্রেতা বাড়িটি ক্রয় করার পর যে ঘর নির্মাণ করেছে কিংবা গাছ লাগিয়েছে তা সে ন্যায্য অধিকারের ভিত্তিতে করেছে। কেননা, বাড়িটি ক্রয় করার পর সেই তার মালিক হয়েছে। কাজেই সে বাড়িটির মালিক– এ ভিত্তিতেই সে ঘর নির্মাণ করেছে বা গাছ লাগিয়েছে। সুতরাং ঘর ভেঙ্গে নিতে বা গাছ তুলে নিতে তাকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা, তুলে নিতে বাধ্য করার বিধানটি প্রযোজ্য হয় সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কেউ যদি অন্যায়ভাবে ঘর নির্মাণ করে বা গাছ লাগায় সে ক্ষেত্রে তা তুলে নিতে বাধ্য করার বিধান হয়। ন্যায্য অধিকারের ভিত্তিতে লাগালে বা নির্মাণ করলে এ বিধান হয় না। কাজেই এক্ষেত্রে ক্রেতাকে ঘর বা গাছ তুলে নিতে বাধ্য করা যাবে না। সুতরাং শফী' হয় এগুলোর মূল্য দিয়ে নিয়ে নেবে নতুবা সে শুফ'আর অধিকার পরিত্যাগ করবে।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَالْمَوْهُوْبِ لَهُ : এখান থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষে কিয়াস হিসেবে তিনটি নজির পেশ করছেন।

প্রথম নজির হলো, কেউ যদি কাউকে একটি বাড়ি দান ['হেবা'] করে, তারপর দানগ্রহীতা উক্ত বাড়িতে ঘর নির্মাণ করে কিংবা গাছ লাগায় তাহলে বিধান হলো, দানকারী দানগ্রহীতাকে তার নির্মিত ঘর বা গাছ তুলে নিতে বাধ্য করে বাড়িটি ফেরত নিতে পারে না। কেননা দানগ্রহীতা ন্যায্য অধিকারের ভিত্তিতে ঘর নির্মাণ করেছে বা গাছ লাগিয়েছে। তাই তাকে সেগুলো তুলে নিতে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতাকে তার নির্মিত ঘর বা লাগানো গাছ তুলে নিতে বাধ্য করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِىْ شِرَاءً فَاسِدًا : দ্বিতীয় নজির হলো, কেউ যদি 'ফাসিদ' চুক্তির মাধ্যমে একটি বাড়ি ক্রয় করে তাতে ঘর নির্মাণ করে কিংবা গাছ লাগায় তাহলে বিধান হলো, বিক্রেতা ক্রেতাকে তার ঘর বা গাছ তুলে নিতে বাধ্য করতে পারবে না; বরং চুক্তি রহিত করে বাড়িটি ফেরত নেওয়ার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। বিক্রেতা এক্ষেত্রে উক্ত বাড়িটি ক্রেতা যেদিন হস্তগত করেছে সেদিনের বাজারমূল্য গ্রহণ করবে। কেননা, ক্রেতা [স্থগিত] মালিকানায় উক্ত ঘর বা গাছ লাগিয়েছে। কাজেই বিক্রেতা তাকে সেগুলো তুলে নিতে বাধ্য করতে পারবে না। আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও একই বিধান হবে।

قَوْلُهُ وَكَمَا إِذَا زَرَعَ الْمُشْتَرِىْ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْقَلْعَ الخ : তৃতীয় নজির হলো, শুফ'আর ক্ষেত্রেও ক্রেতা যদি কোনো জমি ক্রয় করার পর তাতে শস্যাদি [যেমন– ধান, গম ইত্যাদি] বপন করে তারপর উক্ত জমিটি শফী'র পক্ষে রায় হয় তাহলে সকলের ঐকমত্যে শফী' ক্রেতাকে ফসল কাটার সময়ের পূর্বেই উক্ত ফসল তুলে নিতে বলতে পারে না। অর্থাৎ ধান, গম ইত্যাদি অস্থায়ী ফসলের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতেও শফী' ক্রেতাকে ফসল তুলে নিতে বাধ্য করতে পারে না। সুতরাং ঘর বা গাছের ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে। কেননা উভয় ক্ষেত্রে একই কারণ। আর তা হচ্ছে, ক্রেতা তার ন্যায্য অধিকারের ভিত্তিতে তাতে ফসল বা গাছ লাগিয়েছে কিংবা ঘর নির্মাণ করেছে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِأَنَّ فِىْ إِيْجَابِ الْأَخْذِ بِالْقِيْمَةِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষে দ্বিতীয় আকলী দলিল পেশ করছেন। এ দলিলটির সারকথা হচ্ছে, এখানে দুটি ক্ষতি একত্রিত হচ্ছে, একটি শফী'র উপর আর অপরটি ক্রেতার উপর। যদি ঘর বা গাছের মূল্য দিয়ে তা নিয়ে নিতে শফী'র উপর বিধান করা হয় তাহলে শফী' ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, এর মাধ্যমে ক্রয়মূল্য ছাড়া অতিরিক্ত মূল্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর যদি ক্রেতাকে তার ঘর বা গাছ তুলে নিতে বাধ্য করা হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ দুটি ক্ষতির মধ্য হতে শফী'র ক্ষতি তুলনামূলকভাবে ছোট বা হালকা। কেননা, তার উপর যে অতিরিক্ত মূল্য চাপানো হচ্ছে সে তার বিনিময়ে উক্ত ঘর বা গাছ লাভ করছে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি ঘর বা গাছ তুলে নেয় তাহলে তাতে তার যে ক্ষতি হবে তার বিনিময়ে সে কিছুই পাবে না। সুতরাং ক্রেতার ক্ষতিটা শফী'র ক্ষতির তুলনায় বড়। আর নিয়ম হলো, "যদি দুটি ক্ষতির কোনো একটি অবলম্বন করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় তখন যে ক্ষতিটি ছোট বা হালকা তা অবলম্বন করতে হয়।" সুতরাং এক্ষেত্রে শফী'র ক্ষতিটি ছোট হওয়ায় তাই অবলম্বন করা হবে। কাজেই শফী' মূল্য দিয়ে উক্ত ঘর বা গাছ নিতে বাধ্য থাকবে [যদি সে বাড়িটি গ্রহণ করতে চায়।]

وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ بَنٰى فِيْ مَحَلٍّ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مُتَأَكِّدٌ لِلْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيْطٍ مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فَيَنْقُضُ، كَالرَّاهِنِ إِذَا بَنٰى فِي الْمَرْهُوْنِ. وَهٰذَا لِأَنَّ حَقَّهُ أَقْوٰى مِنْ حَقِّ الْمُشْتَرِيْ. لِأَنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ، وَلِهٰذَا يَنْقُضُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَغَيْرُهُ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِأَنَّهُ حَصَلَ بِتَسْلِيْطٍ مِنْ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ. وَلِأَنَّ حَقَّ الْاِسْتِرْدَادِ فِيْهِمَا ضَعِيْفٌ. وَلِهٰذَا لَا يَبْقٰى بَعْدَ الْبِنَاءِ، وَهٰذَا الْحَقُّ يَبْقٰى، فَلَا مَعْنٰى لِإِيْجَابِ الْقِيْمَةِ، كَمَا فِي الْاِسْتِحْقَاقِ، وَالزَّرْعُ يُقْلَعُ قِيَاسًا وَإِنَّمَا لَا يُقْلَعُ اِسْتِحْسَانًا. لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُوْمَةً، وَيَبْقٰى بِالْأَجْرِ وَلَيْسَ فِيْهِ كَثِيْرُ ضَرَرٍ. وَإِنْ أَخَذَهُ بِالْقِيْمَةِ يُعْتَبَرُ قِيْمَتُهُ مَقْلُوْعًا، كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْغَصَبِ.

অনুবাদ : আর জাহিরী রেওয়ায়েতের দলিল হলো, ক্রেতা এমন একটি স্থানে [গৃহাদি] নির্মাণ করেছে যে স্থানের সাথে অন্যের একটি মজবুত হক জড়িত রয়েছে এবং তার এই নির্মাণ কার্য যার হক জড়িত রয়েছে তার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে হয়নি। কাজেই তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। যেমন বন্ধকদাতা [ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছাধিকার লাভ করে] যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধককৃত সম্পত্তিতে গৃহাদি নির্মাণ করে। এ বিধান এজন্যই যে, শফী'র হক ক্রেতার হকের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কেননা, শফী' ক্রেতার উপর অগ্রাধিকার লাভ করে। এজন্যই তো ক্রেতার উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা, তা কাউকে দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি অধিকারচর্চা সব বাতিল করে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে "অনুদানের বিষয়টি" এবং "ফাসিদ বিক্রয়ের বিষয়টি" ভিন্ন। কেননা, এক্ষেত্রে নির্মাণ কার্যটি বাস্তবায়িত হয়েছে যার হক জড়িত ছিল তারই ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে। তাছাড়া এই দু'টি ক্ষেত্রে ফেরত গ্রহণের অধিকার দুর্বল। এজন্যই তো নির্মাণের পরে এ অধিকার বহাল থাকে না। পক্ষান্তরে এ হক [তথা শুফ'আর হক নির্মাণের পরেও] বহাল থাকে। অতএব, [নির্মাণাদি ও বৃক্ষাদির] মূল্য [দিয়ে নেওয়া] সাব্যস্ত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। যেমন মূল মালিক বের হয়ে আসা [ইসতিহকাক]-এর ক্ষেত্রে বিধান। আর 'ফসল'ও কিয়াসের দাবি অনুসারে তুলে নেওয়ারই কথা। কিন্তু তুলে নিতে হয় না কেবল 'ইসতিহসান' -এর দাবির কারণে। কেননা, শস্য কাটার একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে এবং তা ভাড়ার বিনিময়ে [জমিতে] থাকতে দেওয়া হয়। আর তাতে ক্ষতিও তেমন নেই। আর শফী' যদি [নির্মিত গৃহাদি ও বৃক্ষাদির] মূল্য দিয়েই সম্পত্তি গ্রহণ করতে চায় তাহলে এগুলোর মূল্য নির্ণয় করা হবে উৎপাটিত অবস্থায় যা মূল্য হয় সে হিসেবে। যা আমরা 'আত্মসাৎ অধ্যায়ে' আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ بَنٰى فِىْ مَحَلٍّ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) 'মতনে' বর্ণিত জাহিরী রেওয়ায়েতের দলিল বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত নজিরগুলোর জবাব উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রথমে দুটি আকলী দলিল ও কিয়াস হিসেবে একটি নজির পেশ করেছেন তারপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব দিয়েছেন।

প্রথম দলিল হলো, ক্রেতা যে বাড়ি ক্রয়ের পর তাতে ঘর নির্মাণ করেছে কিংবা গাছ লাগিয়েছে সেখানে দুটি বিষয় বিদ্যমান। একটি হচ্ছে এই যে, এ বাড়ির সাথে অন্যের [তথা শফী'র] 'সুদৃঢ় অধিকার' সম্পৃক্ত। সুদৃঢ় অধিকারের অর্থ হচ্ছে, এ অধিকার অন্য কেউ বাতিল করার ক্ষমতা রাখে না। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যার অধিকার সম্পৃক্ত তথা শফী' ক্রেতাকে উক্ত ঘর বা গাছ লাগানোর ক্ষমতা প্রদান করেনি। অর্থাৎ শফী'র পক্ষ হতে ক্ষমতা বা অনুমতি প্রদান ছাড়াই ক্রেতা ঘর নির্মাণ করেছে বা গাছ লাগিয়েছে। আর নিয়ম হলো, কেউ যদি অন্যের অধিকার সংশ্লিষ্ট জমিতে তার অনুমতি বা ক্ষমতা অর্পণ ছাড়া ঘর নির্মাণ করে বা গাছ লাগায় তাহলে যার অধিকার সম্পৃক্ত ছিল সে তা তুলে নিতে বাধ্য করতে পারে। কাজেই আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু শফী'র 'সুদৃঢ় অধিকার' সম্পৃক্ত ছিল এবং সে ক্রেতাকে অনুমতি বা ক্ষমতা প্রদান করেনি সেহেতু সে তা তুলে নিতে ক্রেতাকে বাধ্য করতে পারবে।

قَوْلُهُ كَالرَّاهِنِ إِذَا بَنٰى فِى الْمَرْهُوْنِ : উক্ত বিধানের একটি নজির হলো, কেউ যদি একটি বাড়ি অন্যের নিকট বন্ধক রাখে অতঃপর বন্ধকদাতা উক্ত বাড়িতে ঘর নির্মাণ করে কিংবা গাছ লাগায় তাহলে বিধান হলো, বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতাকে তার নির্মিত ঘর বা গাছ তুলে নিতে বাধ্য করতে পারবে। কেননা, বন্ধক রাখার পর যদিও বাড়িটি বন্ধকদাতার মালিকানায়ই রয়েছে; কিন্তু বাড়িটির সাথে এখন বন্ধকগ্রহীতার হক জড়িত রয়েছে। কাজেই তার পক্ষ থেকে অধিকার অর্পণ ছাড়াই যখন বন্ধকদাতা তাতে ঘর নির্মাণ করেছে বা গাছ লাগিয়েছে তখন তাকে সেগুলো তুলে নিতে বাধ্য করা যাবে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতা যেহেতু শফী'র অধিকার সংশ্লিষ্ট বাড়িতে তার অনুমতি ছাড়া ঘর নির্মাণ করেছে বা গাছ লাগিয়েছে সেহেতু শফী' ক্রেতাকে তা তুলে নিতে বাধ্য করতে পারবে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) যে বলেছেন, كَالرَّاهِنِ إِذَا بَنٰى فِى الْمَرْهُوْنِ -এর অর্থ হচ্ছে– "বন্ধকদাতা যদি তার বন্ধক রাখা জমিতে গৃহাদি নির্মাণ করে"– যা আমরা উপরে ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি। ব্যাখ্যাকারগণ এই অর্থই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মূল হিদায়া গ্রন্থে بَيْنَ السُّطُوْرِ –এ بَنٰى শব্দটির উপরে লেখা রয়েছে اَلْمُرْتَهِنُ ; সেমতে অর্থ দাঁড়ায় "বন্ধকগ্রহীতা যদি গৃহাদি নির্মাণ করে"। কিন্তু এ অর্থ সঠিক নয়।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِأَنَّ حَقَّهُ أَقْوٰى مِنْ حَقِّ الْمُشْتَرِىْ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) জাহিরী রেওয়ায়েতের পক্ষে দ্বিতীয় আকলী দলিল বর্ণনা করছেন। এ দলিলের সারমর্ম হচ্ছে, বিক্রীত বাড়িতে ক্রেতার যে অধিকার তার চেয়ে শফী'র অধিকার অধিক শক্তিশালী। এ কারণেই ক্রেতা যদি বাড়িটি ক্রয় করার পর তা কারো নিকট আবার বিক্রয় করে ফেলে কিংবা কাউকে দান করে দেয় বা এ জাতীয় অন্য কোনো কার্য সম্পাদন করে। যেমন কাউকে বাড়িটি ভাড়া দেয় বা তাতে মসজিদ নির্মাণ করে তারপর যদি শফী'র পক্ষে রায় হয় তাহলে শফী' এ সকল কার্য বাতিল করে দিয়ে তার বাড়িটি গ্রহণ করতে পারে [সকলের ঐকমত্যে]। এ দ্বারা বুঝা গেল যে, শফী'র অধিকার ক্রেতার অধিকারের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। সুতরাং কোন্ পন্থাটি অবলম্বন করলে ক্ষতি কম সাধিত হয় তা বিবেচিত হবে না; বরং কার অধিকার অধিক শক্তিশালী তা বিবেচিত হবে। কেননা, কম ক্ষতি আর বেশি ক্ষতির বিষয়টি বিবেচিত হয় যখন উভয়ের অধিকার সমপর্যায়ের হয় তখন। এখানে তা নয়; এখানে একজনের অধিকার অপরজনের তুলনায় শক্তিশালী। কাজেই যার অধিকার অধিক শক্তিশালী তথা শফী'র অধিকারের বিষয়টিই প্রাধান্য পাবে। অতএব, তার উপর নির্মিত ঘর বা গাছের মূল্য পরিশোধ করার বিষয়টি চাপিয়ে দেওয়া যাবে না; বরং সে ক্রেতাকে তা তুলে নিতে বাধ্য করার অধিকার পাবে।

উল্লেখ্য, এ দলিলটির মাধ্যমে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে বলেছিলেন, এখানে শফী'র ক্ষতি হচ্ছে কম আর ক্রেতার ক্ষতি বেশি তাই ক্রেতার অধিকারের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে, তাঁর এই বক্তব্যে জবাব হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ হতে কিয়াস হিসেবে যে তিনটি নজির পেশ করা হয়েছিল পর্যায়ক্রমে তার জবাব দিচ্ছেন। প্রথমে তিনি প্রথম দুটি নযীর তথা দানকৃত বাড়িতে দানগ্রহীতার ঘর নির্মাণ ও ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে ক্রীত বাড়িতে ক্রেতার ঘর নির্মাণ সম্পর্কিত নজিরের দুটি জবাব দিয়েছেন।

প্রথম জবাব হলো, দানকৃত বাড়িতে যদি দানগ্রহীতা ঘর নির্মাণ করে কিংবা গাছ লাগায় তাহলে যে দানকারী দানগ্রহীতাকে তা তুলে নিতে বাধ্য করে বাড়িটি ফেরত গ্রহণ করতে পারে না তার কারণ হচ্ছে, এখানে দানগ্রহীতা যে ঘর নির্মাণ করেছে বা গাছ লাগিয়েছে দানকারীই তাকে এ অধিকার দিয়েছে। কেননা, সে-ই বাড়িটি তাকে দান করেছিল। কাজেই সে ঘর নির্মাণের অধিকার দেওয়ার পর তা আবার তুলে নিতে বাধ্য করে দানগ্রহীতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে শুফ'আর মাসআলায় ক্রেতা যে ঘর নির্মাণ করেছে সে অধিকারটি শফী' তাকে দেয়নি। কাজেই একটির উপর অপরটির কিয়াস সঠিক হয়নি।

অনুরূপভাবে ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি ক্রীত বাড়িতে গৃহাদি নির্মাণ করে তাহলে যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রেতা ক্রেতাকে তার নির্মিত ঘর তুলে নিতে বাধ্য করে বাড়িটি ফেরত নিতে পারে না তার কারণ হচ্ছে, এক্ষেত্রেও ক্রেতাকে ঘর নির্মাণের অধিকার বিক্রেতাই দিয়েছে। কাজেই সে আর তাকে সে ঘর তুলে নিতে বাধ্য করতে পারবে না। কাজেই এর সাথেও শুফ'আর মাসআলার কিয়াস সঠিক নয়।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) যে এখানে عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ "ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে" কথাটি উল্লেখ করেছেন– তার কারণ হলো, ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে ক্রয়কৃত বাড়িতে ঘর বা গাছ লাগানোর পর যে বিক্রেতা তা আর ফেরত নিতে পারে না এ বিধানটি কেবল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ক্রেতা ঘর নির্মাণ বা গাছ লাগানোর পরেও বিক্রেতা চুক্তি রহিত করে বাড়িটি ফেরত নিতে পারে।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ حَقَّ الْاِسْتِرْدَادِ فِيْهِمَا ضَعِيْفٌ الخ : উক্ত নজির দুটির দ্বিতীয় জবাব হলো, এ দুটি নজিরে তথা দান করার মাসআলায় এবং ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে ক্রয় করার মাসআলায় দানকারী এবং বিক্রেতার ফেরত গ্রহণের অধিকার দুর্বল। অর্থাৎ দান করার পর দানকারীর বাড়ি ফেরত নেওয়ার অধিকার রয়েছে তদ্রূপ ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় করার পর বিক্রেতার বাড়িটি ফেরত নেওয়ার অধিকার রয়েছে ঠিক; কিন্তু তাদের উভয়ের এ ফেরত নেওয়ার অধিকারটি দুর্বল– শক্তিশালী নয়। এ কারণেই যদি দানগ্রহীতা কিংবা ক্রেতা তাতে ঘর নির্মাণ করে বা গাছ লাগায় তাহলে ফেরত গ্রহণের অধিকার বাতিল হয়ে যায়। কাজেই অধিকার দুর্বল হওয়ার কারণে তারা দানগ্রহীতাকে বা ক্রয়কারীকে নির্মিত ঘর তুলে নিতে বাধ্য করতে পারে না। পক্ষান্তরে বিক্রীত বাড়ি শফী'র গ্রহণ করার অধিকারটি হচ্ছে শক্তিশালী। এ কারণে ক্রেতা ঘর নির্মাণ করার পরও শফী'র অধিকার বহাল থাকে। শক্তিশালী অধিকারকে দুর্বল অধিকারের উপর কিয়াস করা সঠিক নয়।

قَوْلُهُ فَلَا مَعْنٰى لِإِيْجَابِ الْقِيْمَةِ كَمَا فِي الْاِسْتِحْقَاقِ : এ বাক্যটি মুসান্নিফ (র.)-এর পূর্বের বক্তব্যের পরিপূরক। অর্থাৎ পূর্বের বক্তব্য থেকে যখন এ কথা সাব্যস্ত হলো যে, শফী' ক্রেতাকে তার নির্মিত ঘর বা লাগানো গাছ তুলে নিতে বাধ্য করতে পারবে তখন শফী'র উপর ক্রেতার নির্মিত ঘর বা লাগানো গাছের মূল্য পরিশোধ করা অপরিহার্য করে দেওয়ার কোনো অর্থ নেই। কেননা, সে যখন ক্রেতাকে তুলে নিতে বাধ্য করার অধিকার লাভ করেছে তখন তার উপর এগুলোর মূল্য পরিশোধ করা অপরিহার্য করা হলে তা হবে উক্ত অধিকারের পরিপন্থি। কাজেই তা করা যাবে না।

كَمَا فِى الْاِسْتِحْقَاقِ – যেমন ক্রেতা যদি বাড়ি ক্রয় করার পর তাতে ঘর নির্মাণ করে বা গাছ লাগায় তারপর দেখা যায় যে, বাড়িটির মালিকানা অন্য এক ব্যক্তির [বিক্রেতা প্রকৃত মালিক ছিল না] তাহলে বিধান হলো, যার মালিকানা প্রকাশ পেয়েছে (مُسْتَحِقٌّ) সে ক্রেতাকে তার নির্মিত ঘর বা গাছ তুলে নিতে বাধ্য করার অধিকার পাবে। আর ক্রেতা তার প্রদত্ত মূল্য এবং উক্ত নির্মিত ঘর বা গাছের মূল্য বিক্রেতার নিকট হতে আদায় করবে। যার মালিকানা প্রকাশ পেয়েছে তার নিকট হতে ক্রেতা তার নির্মিত ঘর বা গাছের মূল্য আদায় করতে পারবে না। শফী'ও এ মালিকানা প্রকাশ পাওয়া ব্যক্তির মতোই। অতএব, তার উপরও ঘর বা গাছের মূল্য অপরিহার্য করে দেওয়া যাবে না।

قَوْلُهُ وَالزَّرْعُ يُقْلَعُ قِيَاسًا وَاِنَّمَا لَا يُقْلَعُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ হতে পেশকৃত তৃতীয় নজির তথা শুফ'আর অধিকার সংশ্লিষ্ট বাড়িতে ক্রেতার অস্থায়ী ফসল যেমন– ধান, গম ইত্যাদি লাগানো সম্পর্কিত মাসআলার জবাব দিচ্ছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ক্রেতা যদি জমি ক্রয় করার পর তাতে অস্থায়ী ফসল ধান, গম ইত্যাদি রোপণ করে, তারপর শফী'র পক্ষে জমিটির রায় হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও কিয়াসের দাবি অনুসারে ক্রেতা উক্ত ফসল তুলে নিতে বাধ্য হওয়ার কথা। কেননা, সে শফী'র অধিকার সংশ্লিষ্ট জমিতে তার পক্ষ থেকে অধিকার প্রদান ছাড়াই ফসল লাগিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে 'ইসতিহসান' তথা আরেকটি সূক্ষ্ম কারণে ক্রেতাকে ফসল তুলে নিতে বাধ্য করা হবে না। সে কারণটি হলো, অস্থায়ী ফসলের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে, কখন উক্ত ফসল কাটা হবে তার সময় সকলেরই জানা। আর রায় হওয়ার পর ফসল কাটা পর্যন্ত সময়টুকুতে জমিতে ফসল রাখাও হবে ভাড়া হিসেবে। অর্থাৎ ক্রেতা এ সময়টুকুর জমির ভাড়া শফী'কে দিয়ে দেবে। ফলে শফী'র এতে তেমন কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। অথচ ক্রেতাকে যদি ফসল তুলে নিতে বাধ্য করা হয় তাহলে সে কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হবে। তাই এ সকল বিষয়ের কারণে শফী' ক্রেতাকে তার ফসল তুলে নিতে বাধ্য করার অধিকার লাভ করবে না। পক্ষান্তরে ঘর নির্মাণ বা গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে এ সকল বিষয় বিদ্যমান নেই। কাজেই দুটি সুরতের মাঝে পার্থক্য থাকায় একটির সাথে অপরটির কিয়াস সঠিক হবে না।

قَوْلُهُ وَاِنْ اَخَذَهُ بِالْقِيْمَةِ يُعْتَبَرُ قِيْمَتُهُ مَقْلُوْعًا : এ ইবারতটুকু পূর্বে [মূল ইবারতে] বর্ণিত বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট। পূর্বে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্রেতা গাছ লাগালে বা গৃহাদি নির্মাণ করলে শফী'র ইচ্ছাধিকার রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে ক্রেতাকে তার লাগানো গাছপালা বা গৃহাদি তুলে নিতে বলতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তাকে লাগানো গাছ বা ঘরের মূল্য আদায় করে দিয়ে তা রেখে দিতেও পারে। এখানে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি শফী' দ্বিতীয় পন্থাটি গ্রহণ করে তথা মূল্য পরিশোধ করে উক্ত গাছপালা বা ঘর রেখে দিতে চায় সেক্ষেত্রে এগুলোর মূল্য ধরা হবে গাছ উপড়ানো বা কাটা অবস্থায় যে মূল্য হয় সে হিসেবে। তদ্রূপ ঘর ভেঙ্গে বা ছুটিয়ে ফেলার পর যে মূল্য হয় সে হিসেবে যবের মূল্য দেবে। গাছ বা ঘর স্বস্থানে অকাটা বা অভাঙ্গা অবস্থায় যে মূল্য হয় সে হিসেবে মূল্য ধরা হবে না। কেননা, বাড়িটিতে এখন শফী'র অধিকার। ক্রেতার কোনো অধিকার নেই; ক্রেতার অধিকার কেবল তার লাগানো গাছ বা ঘরের উপর। কাজেই এগুলোর পৃথকভাবে যে মূল্য হয় তাই সে পাবে।

قَوْلُهُ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِى الْغَصَبِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ সম্পর্কে আমি غَصَبْ [আত্মসাৎ]-এর অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য, এ আলোচনাটি মুসান্নিফ (র.) كِتَابُ الْغَصَبِ -এ হিদায়া ৩য় খণ্ডের ৩৬৩ নং পৃষ্ঠায় করেছেন। নিম্নে সেখানকার ইবারতটুকু তুলে দেওয়া হলো–

وَمَنْ غَصَبَ اَرْضًا فَغَرَسَ فِيْهَا اَوْ بَنٰى قِيْلَ لَهُ اِقْلَعِ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَرُدَّهَا .... فَاِنْ كَانَتِ الْاَرْضُ تَنْقُصُ بِقَلْعِ ذٰلِكَ فَلِلْمَالِكِ اَنْ يَضْمَنَ لَهُ قِيْمَةَ الْبِنَاءِ وَقِيْمَةَ الْغَرْسِ مَقْلُوْعًا . وَيَكُوْنَانِ لَهُ . لِاَنَّ فِيْهِ نَظْرًا لَهُمَا وَدَفْعَ الضَّرَرِ عَنْهُمَا وَقَوْلُهُ مَقْلُوْعًا مَعْنَاهُ قِيْمَةُ بِنَاءٍ اَوْ شَجَرٍ يُؤْمَرُ بِقَلْعِهِ . لِاَنَّ حَقَّهُ فِيْهِ اِذْ لَا قَرَارَ لَهُ فِيْهِ فَيُقَوَّمُ الْاَرْضُ بِدُوْنِ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ . وَيُقَوَّمُ وَبِهَا شَجَرٌ اَوْ بِنَاءٌ لِصَاحِبِ الْاَرْضِ اَنْ يَاْمُرَهُ بِقَلْعِهِ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا .

وَلَوْ أَخَذَهَا الشَّفِيْعُ فَبَنٰى فِيْهَا أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اسْتَحَقَّتْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ، لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيْمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ لَا عَلَى الْبَائِعِ إِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ، وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِيْ إِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ . وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ يَرْجِعُ، لِأَنَّهُ مُتَمَلِّكٌ عَلَيْهِ فَنَزَلَا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيْ - وَالْفَرْقُ عَلٰى مَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مَغْرُوْرٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ وَمُسَلَّطٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا غُرُوْرَ وَلَا تَسْلِيْطَ فِيْ حَقِّ الشَّفِيْعِ مِنَ الْمُشْتَرِيْ، لِأَنَّهُ مَجْبُوْرٌ عَلَيْهِ -

---

অনুবাদ : আর যদি শফী' সম্পত্তি গ্রহণ করে তাতে কোনো কিছু নির্মাণ করে কিংবা বৃক্ষাদি লাগায়। অতঃপর সম্পত্তিতে [বিক্রেতা ব্যতীত] অন্য কারো মালিকানা দেখা দেয় তাহলে শফী' [কেবল সম্পত্তির] মূল্যই ফেরত পাবে [ক্ষতিপূরণ পাবে না]। কেননা, এ বিষয়টি ধরা পড়েছে যে, শফী' সম্পত্তিটি নিয়ে ছিল তার প্রকৃত হক ব্যতীত। সে নির্মিত গৃহাদি ও বৃক্ষাদির মূল্য নিতে পারবে না; বিক্রেতার নিকট হতেও না যদি সে বিক্রেতার কাছ হতে জমিটি গ্রহণ করে থাকে কিংবা ক্রেতার নিকট হতেও না যদি সে ক্রেতার নিকট হতে জমিটি গ্রহণ করে থাকে [বরং সে তার নির্মিত গৃহাদি ভেঙ্গে রেখে দেবে]। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, শফী' এগুলোর মূল্য ফেরত নিতে পারবে। কেননা, শফী' ক্রেতার নিকট হতে [বাহ্যত] মালিক হয়েছিল। কাজেই এরা উভয় বিক্রেতা ও ক্রেতার পর্যায়ভুক্ত হবে। আর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত অনুসারে শফী'র মাসআলাটি ও ক্রেতা-বিক্রেতার মাসআলাটির মাঝে পার্থক্য হলো, ক্রেতা বিক্রেতার পক্ষ হতে প্রতারণার শিকার এবং তার পক্ষ থেকে সে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে শফী'র প্রতি ক্রেতার কোনো প্রতারণাও নেই, ক্ষমতা প্রদানও নেই। কেননা, ক্রেতা তো [জমি হস্তান্তরে কেবল] বাধ্য ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَذَهَا الشَّفِيْعُ فَبَنٰى فِيْهَا الخ : মাসআলা হচ্ছে, শফী' যদি শুফ'আর সম্পত্তি গ্রহণ করার পর তাতে ঘর নির্মাণ করে কিংবা বৃক্ষ রোপণ করে তারপর দেখা যায় যে, উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ছিল অন্য এক ব্যক্তি; বিক্রেতা সম্পত্তিটির প্রকৃত মালিক ছিল না। ফলে যে প্রকৃত মালিক সে শফী'কে তার নির্মিত ঘর বা লাগানো গাছ তুলে নিতে বাধ্য করল এবং জমিটি নিয়ে নিল। তাহলে বিধান হলো, শফী' কেবল যে মূল্য পরিশোধ করে বাড়িটি গ্রহণ করেছিল তা ফেরত পাবে। যদি বাড়িটি বিক্রেতার নিকট হতে গ্রহণ করে থাকে তাহলে বিক্রেতার নিকট হতে মূল্য ফেরত নেবে, আর যদি ক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করে থাকে তাহলে ক্রেতার নিকট হতে মূল্য ফেরত নেবে।

এক্ষেত্রে শফী' তার ঘর বা গাছপালা তুলে নেওয়ার কারণে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ সে কারো নিকট হতে লাভ করবে না। চাই সে বাড়িটি ক্রেতার নিকট হতে হস্তগত করে থাকুক বা বিক্রেতার নিকট হতে হস্তগত করে থাকুক, কোনো অবস্থাতেই সে ক্ষতিপূরণ পাবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ الخ : এক্ষেত্রে শফী' যে শুধু তার পরিশোধকৃত মূল্যই ফেরত পাবে, ঘর বা গাছপালার ক্ষতিপূরণ পাবে না, তার কারণ হলো, যখন অন্য ব্যক্তি জমিটির প্রকৃত মালিক বলে সাব্যস্ত হয়েছে তখন প্রমাণিত হয়েছে যে, শফী' জমিটি ন্যায্য অধিকার বলে গ্রহণ করেনি। কেননা, প্রকৃত মালিক জমিটি বিক্রয়ই করেনি। কাজেই শফী'র শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে কিভাবে? আর শফী' যখন তার শুফ'আর অধিকার ছাড়া বাড়িটি গ্রহণ করে তাতে ঘর নির্মাণ করেছে বা গাছ লাগিয়েছে তখন তার ক্ষতিপূরণ অন্য কেউ বহন করবে না। কেননা, এক্ষেত্রে জমিটি কেউ তাকে প্রতারণা করে দেয়নি; বরং সেই শুফ'আর অধিকার বলে [যা সঠিক ছিল না] জমিটি হস্তগত করেছিল। অতএব উক্ত ক্ষতিগ্রস্ততা তার নিজেরই বহন করতে হবে।

[উল্লেখ্য, এখানে মুসান্নিফ (র.)-এর ইবারত رَجَعَ بِالثَّمَنِ -এর অর্থ হচ্ছে "শফী' কেবল মূলই ফেরত পাবে অন্য কোনো ক্ষতিপূরণ পাবে না।" এ অর্থ হিসেবেই لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ الخ বলে তার কারণ বর্ণনা করেছেন।]

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ يَرْجِعُ : উপরে যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ শফী' তার ক্ষতিপূরণ কারো নিকট হতে লাভ করবে না। এটি ছিল ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণিত প্রসিদ্ধতম বর্ণনা। ইমাম মুহম্মদ (র.) এটি তাঁর মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং কোনো মতবিরোধের কথা উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে বিশর ইবনুল ওয়ালিদ ও হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাঁর মতে এক্ষেত্রে শফী' তার ঘর ভেঙ্গে ফেলার কারণে কিংবা গাছ কেটে ফেলার কারণে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে সে তার ক্ষতিপূরণ লাভ করবে। যদি সে বাড়িটি ক্রেতার নিকট হতে হস্তগত করে থাকে, তাহলে ক্রেতার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ নেবে আর যদি বিক্রেতার নিকট হতে হস্তগত করে থাকে তাহলে বিক্রেতার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ নেবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُتَمَلِّكٌ عَلَيْهِ فَنَزَلَا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيْ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত মত অনুসারে শফী'র ক্ষতিপূরণ লাভ করার কারণ হলো, শফী' এক্ষেত্রে যার নিকট হতে বাড়িটি হস্তগত করেছিল তার নিকট হতে সে মালিকানা লাভের ভিত্তিতেই হস্তগত করেছিল। অর্থাৎ সে 'গসব' বা আত্মসাৎ করে তা হস্তগত করেনি। কাজেই শফী' যার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করেছে সে এবং শফী' এ দুজনকে এক্ষেত্রে বিক্রেতা ও ক্রেতার পর্যায়ে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ কেউ যদি একটি বাড়ি বিক্রয় করে, আর ক্রেতা তা গ্রহণ করার পর তাতে ঘর নির্মাণ করে কিংবা গাছপালা লাগায় অতঃপর দেখা যায় যে, বিক্রেতা প্রকৃত মালিক ছিল না; বরং অন্য এক ব্যক্তি বাড়িটির প্রকৃত মালিক, তাহলে বিধান হলো ক্রেতা তার নির্মিত ঘর বা গাছ কেটে রেখে দেবে এবং ঘর ভাঙ্গার কারণে কিংবা গাছ কাটার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ সে বিক্রেতার নিকট হতে গ্রহণ করবে। কেননা, ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি মালিকানা লাভের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছিল। কাজেই সে ক্ষতিপূরণ লাভ করবে। আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও যেহেতু শফী' বাড়িটি মালিকানা লাভের ভিত্তিতে গ্রহণ করে তাতে ঘর নির্মাণ করেছিল বা গাছ লাগিয়েছিল সেহেতু সে ক্ষতিপূরণ লাভ করবে। কেননা, উপরে বর্ণিত বিক্রেতা ও ক্রেতার বিষয়টি যেরূপ শফী' ও শফী' যার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করেছে তাদের বিষয়টিও তদ্রূপ।

قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটির দলিলের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে, শফী' ও শফী' যার নিকট হতে বাড়িটি গ্রহণ করেছে তাদের বিষয়টি এবং ক্রেতার ও বিক্রেতার বিষয়টি এক নয়। উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই একটির সাথে অপরটির কিয়াস সঠিক হবে না। পার্থক্য হলো এই যে, বিক্রেতা ও ক্রেতার মাসআলায় বিক্রেতা যখন অন্য ব্যক্তির বাড়ি বিক্রয় করে তখন ক্রেতা বিক্রেতার পক্ষ হতে প্রতারণার শিকার হয় এবং ক্রয়ের পরে ক্রেতা বাড়িটির উপর যে ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করে তাও অর্জিত হয় বিক্রেতার পক্ষ থেকে প্রদত্ত হিসেবে। কেননা, বিক্রেতা-ই বিক্রয় করার মাধ্যমে ক্রেতাকে এ ক্ষমতা প্রদান করেছে। কাজেই পরে যখন অন্য ব্যক্তি প্রকৃত মালিক হিসেবে সাব্যস্ত হয় তখন বিক্রেতার প্রতারণার কারণে বিক্রেতার উপর ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান হয়। কেননা, যার প্রতারণতার কারণে ক্ষতি সাধিত হয় ক্ষতিপূরণ তার বহন করতে হয়।

পক্ষান্তরে শফী'র মাসআলায় শফী'কে কেউ প্রতারিত করেনি এবং কেউ তাকে ক্ষমতা বা অধিকার প্রদান করেনি। কেননা, শফী' বাড়িটি গ্রহণ করেছে স্বীয় অধিকার বলে; বিক্রেতা বা ক্রেতা প্রতারণার মাধ্যমে তাকে বাড়িটি দেয়নি; বরং উল্টো তারা বাধ্য হয়ে বাড়িটি তাকে হস্তান্তর করেছে। কাজেই এক্ষেত্রে তাদের প্রতারণা না থাকার কারণে তারা এর ক্ষতিপূরণ বহন করবে না। অতএব, উভয় মাসআলার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। সুতরাং শফী'র মাসআলাকে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাসআলার সাথে কিয়াস করা সঠিক হবে না।

قَالَ : وَإِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ أَوْ إِحْتَرَقَ بِنَاؤُهَا أَوْ جَفَّ شَجَرُ الْبُسْتَانِ بِغَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ فَالشَّفِيْعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيْعِ الثَّمَنِ، لِأَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ تَابِعٌ حَتّٰى دَخَلَا فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ، فَلَا يُقَابِلُهُمَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ مَا لَمْ يَصِرْ مَقْصُوْدًا. وَلِهٰذَا يَبِيْعُهَا مُرَابَحَةً بِكُلِّ الثَّمَنِ فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا غَرِقَ نِصْفُ الْأَرْضِ حَيْثُ يَأْخُذُ الْبَاقِيْ بِحِصَّتِهِ، لِأَنَّ الْفَائِتَ بَعْضُ الْأَصْلِ. قَالَ : وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَمَلُّكِ الدَّارِ بِمَالِهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত [আপনা আপনি] বিক্রীত বাড়ি ধসে যায় কিংবা তার নির্মিত গৃহাদি পুড়ে যায় অথবা বাগানের গাছগুলো শুকিয়ে যায় তাহলে শফী' [কেবল] এ ইচ্ছাধিকার পাবে যে, সে ইচ্ছা করলে বাড়িটি সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে নেবে। কেননা, নির্মিত গৃহাদি ও বৃক্ষাদি বাড়ির অনুগামী। এ কারণেই [বাড়ি বিক্রয়কালে] এগুলোর কথা উল্লেখ না করলেও এগুলো বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং [ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করার মাধ্যমে] মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গণ্য না হওয়া পর্যন্ত এগুলোর বিপরীতে কোনো মূল্য আসবে না। এ কারণেই উক্ত সুরতে ক্রেতা বাড়িটি 'মুরাবাহাহ' অর্থাৎ ক্রয়মূল্যে বিক্রয়ের শর্তে বিক্রয় করলে পূর্ণ মূল্যেই তা বিক্রয় করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি জমির অর্ধেক পরিমাণ [নদীগর্ভে] পানিমগ্ন হয়ে যায় তাহলে বিষয়টি ভিন্ন। সেক্ষেত্রে শফী' অবশিষ্ট জমি কেবল সে অংশের মূল্যের বিনিময়েই গ্রহণ করবে। কেননা, বিলীন হয়ে যাওয়া জমি মূল বস্তুরই অংশ। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর [উক্ত সুরতে সম্পূর্ণ মূল্যে নিতে না চাইলে] শফী' শুফ'আর অধিকার পরিত্যাগ করতে পারবে। কেননা, স্বীয় সম্পদের বিনিময়ে বাড়ির মালিকানা গ্রহণে বিরত থাকার অধিকার তার আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ أَوْ إِحْتَرَقَ بِنَاؤُهَا الخ : মাসআলা হলো, যদি বাড়ি বিক্রয়ের পর শফী' গ্রহণ করার পূর্বে বাড়িটি বিধ্বস্ত হয় [ঘর, দরজা, প্রাচীর ইত্যাদি ধসে পড়ে] কিংবা ঘর ইত্যাদি আগুনে পুড়ে যায় কিংবা বাড়ির বাগানের গাছপালা শুকিয়ে যায়, আর এ সবই যদি হয় এমনিতেই, কারো ইচ্ছাকৃতভাবে না হয় তাহলে বিধান হলো, শফী' বাড়িটি নিতে চাইলে ক্রেতা যে মূল্যে বাড়িটি ক্রয় করেছে সে মূল্য পুরোপুরি দিয়েই নিতে হবে। এ সকল ক্ষতির কারণে মূল্যের মাঝে কোনোরূপ হ্রাস করতে পারবে না। আর ইচ্ছা করলে সে তার শুফ'আর অধিকার ত্যাগ করে বাড়িটি গ্রহণ করা পরিহার করবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ تَابِعٌ الخ : বাড়িটি নিতে চাইলে তাকে যে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে নিতে হবে তার কারণ হলো, বাড়িতে নির্মিত ঘর-দোর ও গাছপালা হচ্ছে বাড়ির [ভূ-সম্পত্তির] অনুগামী বস্তু (تَابِع)। এগুলো অনুগামী বা 'তাবে' হওয়ার কারণেই কেউ যদি বাড়ি বিক্রয় করে তাহলে ঘর ও গাছপালার কথা উল্লেখ না করলেও তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর যে বস্তু অন্য বস্তুর অনুগামী (تَابِع) তা ঐ বস্তুর গুণ (وَصْف) -এর পর্যায়ে গণ্য হয়। আর আমাদের মূলনীতি হচ্ছে মূল্য কেবল মূল বস্তুর বিপরীতে [মুকাবালায়]-ই সাব্যস্ত হয়। অনুগামী তথা গুণ (وَصْف) -এর বিপরীতে সাব্যস্ত হয় না।

তবে অনুগামী বস্তু যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে তখন সেটি অনুগামী হিসেবে থাকে না; বরং তা মূল উদ্দীষ্ট বস্তু হিসেবে গণ্য হয়, কিংবা পৃথকরূপে যদি বিক্রয় করা হয় তখন তার অনুগামী থাকে না। তখন তার বিপরীতে মূল্য সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আলোচ্য সুরতে যেহেতু ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ তা নষ্ট করেনি তাই এটি অনুগামী তথা গুণ হিসেবে রয়েছে। অতএব, উক্ত বিনষ্ট ঘর বা গাছপালার বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ সাব্যস্ত হবে না; বরং সম্পূর্ণ মূল্যই মূল বাড়ির বিনিময়ে ধরা হবে। অতএব, শফী' বাড়িটি গ্রহণ করতে চাইলে তাকে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়েই নিতে হবে।

[উল্লেখ্য, আলোচ্য মাসআলার বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ (র.) থেকে দুটি করে রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে আমাদের মাযহাবের মতোই শফী'কে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে বাড়িটি নিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত এ রেওয়ায়েতটিই অধিক বিশুদ্ধ। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুসারে বিনষ্ট ঘর বা গাছপালার মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য দিয়ে শফী' বাড়িটি গ্রহণ করবে।]

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا يَبِيْعُهَا مُرَابَحَةً بِكُلِّ الثَّمَنِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা যে বলেছি, ঘর-দোর এবং গাছপালা হচ্ছে বাড়ির অনুগামী বস্তু এবং এগুলোর বিপরীতে কোনো মূল্য সাব্যস্ত হয় না, ঠিক এ কারণেই কেউ যদি একটি বাড়ি ক্রয় করার পর বাড়িটি আপনা-আপনি বিধ্বস্ত হয়ে যায় কিংবা তার ঘর দোর আগুনে পুড়ে যায় অথবা গাছপালা শুকিয়ে যায়, আর এগুলো কারো ইচ্ছাকৃতভাবে না হয়। তারপর ক্রেতা বাড়িটি অন্য কারো নিকট 'মুরাবাহাহ' তথা 'ক্রয়মূল্যে বিক্রয় করছি'– এ শর্তে বিক্রয় করে তাহলে সে সম্পূর্ণ মূল্য ধরেই বিক্রয় করতে পারবে। বিনষ্ট ঘর বা গাছপালার মূল্য তাকে বাদ দিতে হবে না। কেননা, উক্ত ঘর বা গাছপালা মূল বাড়ির অনুগামী। কাজেই এগুলোর বিপরীতে মূল্য ধরা হবে না। যদি উক্ত ঘর বা গাছপালার বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ সাব্যস্ত হতো তাহলে ক্রেতা এ সুরতে সম্পূর্ণ মূল্যে বাড়িটি বিক্রয় করতে পারত না; বরং বিনষ্ট ঘর ও গাছপালার মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য দিতে হতো।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا غَرِقَ نِصْفُ الْأَرْضِ الخ : উপরে বর্ণনা করা হয়েছে বাড়ির অনুগামী বস্তু। যেমন– ঘর, দেওয়াল, গাছপালা ইত্যাদির বিধান। পক্ষান্তরে যদি বাড়ির ভূমি বিনষ্ট হয় যেমন বাড়ির অর্ধাংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেল, তাহলে তার বিধান ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে যতটুকু ভূমি নদীগর্ভে চলে গেছে ততটুকুর মূল্য বাদ যাবে, আর অবশিষ্ট অংশের মূল্য পরিশোধ করে শফী' অবশিষ্ট বাড়ি গ্রহণ করবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যতটুকু বিনষ্ট হয়েছে ততটুকুর বিপরীতে মূল্যও সাব্যস্ত হবে এবং শফী' সে পরিমাণ মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْفَائِتَ بَعْضُ الْأَصْلِ : এ সুরতে নদীগর্ভে বিলীন হওয়া অংশের মূল্য বাদ যাওয়ার কারণ হলো, যে অংশটুকু বিলীন হয়েছে তা বিক্রীত মূল বস্তু, অনুগামী বস্তু নয়। কাজেই এর প্রতিটি অংশের বিপরীতে মূল্যের একটি অংশ নির্ধারিত হবে। সুতরাং যতটুকু অংশ বিলীন হয়েছে ততটুকুর মূল্য শফী' পরিশোধ করবে না। কেননা, ঐ অংশটুকু সে গ্রহণ করছে না। অতএব তার মূল্যও তার উপর সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর শফী' যদি সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে বাড়িটি নিতে না চায় তাহলে সে বাড়িটি পরিত্যাগ করতে পারবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَمَلُّكِ الدَّارِ بِمَالِهِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, শফী'র বাড়িটি গ্রহণ না করার ইচ্ছাধিকার থাকার কারণ হলো, যে ক্ষেত্রে কোনো কিছুর মালিক হওয়ার জন্য বিনিময় পরিশোধ করতে হয় সে ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছাধিকার থাকে উক্ত জিনিসের মালিকানা গ্রহণ না করার। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে বিনিময় ছাড়াই মালিকানা অর্জিত হয় সে ক্ষেত্রে মালিকানা লাভ না করার ইচ্ছাধিকার থাকে না; বরং আপনা-আপনিই তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। যেমন, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মালিকানা। ওয়ারিশ না চাইলেও তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু শফী'র মালিকানা সাব্যস্ত হবে মূল্যের বিনিময়ে তাই তার মালিকানা গ্রহণ না করারও ইচ্ছাধিকার থাকবে।

قَالَ : وَإِنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِى الْبِنَاءَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ إِنْ شِئْتَ فَخُذِ الْعَرْصَةَ بِحِصَّتِهَا وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ، لِأَنَّهُ صَارَ مَقْصُودًا بِالْإِتْلَافِ فَيُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْهَلَاكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ النَّقْضَ، لِأَنَّهُ صَارَ مَفْصُولًا فَلَمْ يَبْقَ تَبَعًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি ক্রেতা নির্মিত গৃহাদি ভেঙ্গে ফেলে তাহলে শফী'কে বলা হবে: "তুমি যদি চাও তাহলে ভূমির অংশের মূল্যের বিনিময়ে শূন্যভূমিটি গ্রহণ কর নতুবা ইচ্ছা হলে অধিকার পরিত্যাগ কর"। কেননা [ক্রেতার] ইচ্ছাকৃত বিনষ্ট করার কারণে নির্মিত গৃহাদি মূল প্রতিপাদ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার বিপরীতে মূল্যের অংশ আসবে। পক্ষান্তরে প্রথম সুরতটি এর ব্যতিক্রম। কেননা [সেক্ষেত্রে] ধ্বংস হয়েছিল নৈসর্গিক দুর্যোগের কারণে। শফী'র জন্য [উক্ত গৃহাদির] ভগ্নাংশগুলো নেওয়ার অধিকার নেই। কেননা, সেগুলো এখন পৃথক বস্তুতে পরিণত হয়েছে, কাজেই তা আর বাড়ির অনুগামী বস্তু নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِى الْبِنَاءَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ الخ : পূর্বের মূল ইবারতে যে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তা ছিল আসমানি দুর্যোগের কারণে বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে। আলোচ্য ইবারতে বর্ণনা করা হচ্ছে, যদি ক্রেতা ক্রয় করার পর বাড়ির ঘর, গাছপালা স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করে ফেলে তার বিধান। এক্ষেত্রে বিধান হলো, শফী'কে বলা হবে তুমি ইচ্ছা করলে বিনষ্ট ঘর ও গাছপালার যা মূল্য হয় তা বাদ দিয়ে জমির যা মূল্য হয় তা পরিশোধ করে বাড়িটি নিয়ে নাও। নতুবা বাড়িটি ছেড়ে দাও। অর্থাৎ ক্রেতা যে মূল্যে বাড়িটি ক্রয় করেছিল তা বিভাজন করা হবে বাড়ির ভূমি এবং উক্ত ঘর ও গাছপালার উপর। এক্ষেত্রে ঘর ও গাছপালা ভালো থাকার অবস্থা হিসেবে ধরতে হবে। এভাবে মূল্য, ভূমি এবং ঘর ও গাছপালার উপর বণ্টন করার পর ভূমির অংশে যতটুকু মূল্য সাব্যস্ত হয় শফী' ততটুকু মূল্য দিয়ে বাড়ির কেবল ভূমি গ্রহণ করবে। আর বিনষ্ট ঘর, প্রাচীর ও গাছপালা ক্রেতা রেখে দেবে। এগুলো শফী' নিতে পারবে না। আর শফী' যদি এভাবে নিতে না চায় তাহলে সে তার অধিকার ছেড়ে দেবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَارَ مَقْصُودًا بِالْإِتْلَافِ فَيُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য সুরতে বিনষ্ট ঘর ও গাছপালার মূল্য বাদ যাওয়ার কারণ বর্ণনা করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এক্ষেত্রে যেহেতু ঘর বা গাছপালা আসমানি দুর্যোগে বিনষ্ট হয়নি; বরং ক্রেতা নিজেই বিনষ্ট করেছে। সেহেতু এগুলোকে আর অনুগামী বস্তু হিসেবে ধরা হবে না। ক্রেতা ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করার কারণে এগুলোকে তার উদ্দীষ্ট বস্তু হিসেবে গণ্য করা হবে। সুতরাং যখন এগুলো তার উদ্দীষ্ট বস্তু হিসেবে গণ্য হলো তখন তার বিপরীতে মূল্যেরও একটা অংশ সাব্যস্ত হবে। অতএব, ক্রয় করার দিন উক্ত ঘর ও গাছপালার মূল্য হিসেবে ভূমি ও ঘর এবং গাছপালার উপর মূল্য বণ্টন করে ভূমির মূল্য যা হয় তা শফী' পরিশোধ করে বাড়িটি গ্রহণ করবে।

পক্ষান্তরে পূর্ববর্ণিত মাসআলায় যেহেতু ঘর ও গাছপালা নৈসর্গিক দুর্যোগের কারণে নষ্ট হয়েছে। তাই তা অনুগামী বস্তু হিসেবেই গণ্য হয়েছে। ফলে তার বিপরীতে কোনো মূল্য সাব্যস্ত হয়নি।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ النَّقْضَ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আলোচ্য সুরতে শফী' উক্ত বিনষ্ট ঘর ও গাছপালার ভগ্নাংশগুলো নেওয়ার অধিকার পাবে না। এগুলো ক্রেতা-ই রেখে দেবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَارَ مَفْصُولًا فَلَمْ يَبْقَ تَبَعًا : এর কারণ হলো, ঘর ভেঙ্গে ফেলার পর কিংবা তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পর অথবা গাছ কেটে ফেলার পর এগুলো ভূমি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। কাজেই এগুলো এখন বাড়ির অনুগামী বস্তু হিসেবে থাকেনি। সুতরাং তা শুফ'আর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, শুফ'আ সাব্যস্ত হয় কেবল স্থাবর সম্পত্তিতে, অস্থাবর সম্পত্তি (مَنْقُولِيْ شَيْءٌ) -তে শুফ'আ সাব্যস্ত হয় না। এ সকল ভগ্নাংশ এখন অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে বিনষ্ট করার পূর্বে তা ছিল বাড়ির অনুগামী বস্তু। তাই অনুগামী (تَابِعٌ) হিসেবে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়েছিল। এখন যেহেতু অনুগামী নয় তাই শুফ'আর অধিকারও তাতে থাকবে না। অতএব, শফী' এগুলো নিতে পারবে না।

قَالَ : وَمَنِ ابْتَاعَ أَرْضًا وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِثَمَرِهَا، وَمَعْنَاهُ إِذَا ذَكَرَ الثَّمَرَ فِي الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ . وَهٰذَا الَّذِي ذَكَرَهُ اِسْتِحْسَانٌ، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَأْخُذُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَبَعٍ . أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ فَأَشْبَهَ الْمَتَاعَ فِي الدَّارِ. وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْاِتِّصَالِ صَارَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ، كَالْبِنَاءِ فِي الدَّارِ وَمَا كَانَ مُرَكَّبًا فِيهِ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি [বৃক্ষাদিসহ] ভূমি ক্রয় করে আর তার বৃক্ষে তখন ফল থাকে তাহলে শফী' ফল-ফলাদি সহ-ই তা গ্রহণ করবে। এর অর্থ হলো, যদি বিক্রয়-চুক্তিতে ফলের কথা উল্লেখ করে থাকে। কেননা উল্লেখ করা না হলে ফল বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এই যে বিধানের কথা উল্লেখ করা হলো, এটি হচ্ছে 'ইসতিহসান' -এর ভিত্তিতে। আর কিয়াসের দাবি অনুসারে শফী' ফল গ্রহণ করতে না পারার কথা। কেননা ফল [বিক্রীত ভূমির] অনুগামী নয়। কেন, তুমি দেখছ না যে, উল্লেখ করা না হলে ফল বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না? কাজেই তা তো বাড়িতে রাখা আসবাবপত্রের ন্যায়ই হলো। কিন্তু 'ইসতিহসানের' দিক হলো, ফল-ফলাদি [বৃক্ষের সাথে] সম্পৃক্ত হওয়ার বিবেচনায় তা ভূমির অনুগামী বস্তুতেই পরিণত হয়েছে। যেমন বাড়ির উপর নির্মিত গৃহাদি ও তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিসপত্র [যথা– দরজা, তালা, চাবি ইত্যাদি]। সুতরাং শফী' উক্ত ফল-ফলাদিও গ্রহণ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ ابْتَاعَ أَرْضًا وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি খেজুর গাছসহ জমি ক্রয় করে এবং ক্রয়কালে উক্ত গাছে খেজুর থাকে অতঃপর শফী' তার শুফ'আর অধিকারবলে জমিটি নিতে চায় তাহলে সে উক্ত খেজুরসহ-ই জমিটি গ্রহণ করবে।

قَوْلُهُ وَمَعْنَاهُ إِذَا ذَكَرَ الثَّمَرَ فِي الْبَيْعِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে ইমাম কুদূরী (র.) যে উল্লেখ করেছেন "ক্রয়কালে গাছে খেজুর থাকলে শফী' উক্ত খেজুরসহ জমিটি গ্রহণ করবে" তার এ কথার অর্থ হচ্ছে, যদি ক্রয়কালে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে এই শর্ত হয়ে থাকে যে গাছের খেজুরও বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত, তাহলে শফী' উক্ত খেজুরসহ জমিটি গ্রহণ করবে। কেননা, বিক্রয়কালে যদি খেজুরের কথা উল্লেখ না করে তাহলে জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গাছের খেজুর বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কাজেই সে ক্ষেত্রে শফী' উক্ত খেজুরসহ জমিটি লাভ করবে না।

[উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে শফী' উক্ত খেজুর লাভ করবে না; বরং তা ক্রেতারই থেকে যাবে। ক্রেতা খেজুর কাটার সময় আসা পর্যন্ত খেজুর গাছেই রাখার সুযোগ পাবে। আর ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত আমাদের মতেরই অনুরূপ।]

قَوْلُهُ وَهٰذَا الَّذِي ذَكَرَهُ اِسْتِحْسَانٌ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَأْخُذُهُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) যে বিধান বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে 'ইসতিহসান'-এর ভিত্তিতে। কিয়াসের দাবি অনুসারে আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা যদি ক্রয়কালে গাছের খেজুর শর্ত করে গ্রহণ করে থাকে তবুও শফী' তা না পাওয়ার কথা। কেননা, গাছের খেজুর বাড়ির অনুগামী বস্তু (تَابِعٌ) নয়। অনুগামী যে নয় তার প্রমাণ হচ্ছে কেউ বাড়ি বিক্রয় করলে যদি গাছের খেজুরের কথা উল্লেখ না করে তাহলে সে খেজুর বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কাজেই বুঝা গেল যে, গাছের খেজুর বাড়ির অনুগামী বস্তু নয়। অনুগামী বস্তু হলে তা উল্লেখ না করলেও বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। সুতরাং যখন খেজুর বাড়ির অনুগামী বস্তু (تَابِعٌ) নয়, তখন তাতে শুফ'আর অধিকারও সাব্যস্ত হবে না। কেননা, শুফ'আর অধিকার মূলত সাব্যস্ত হয় স্থাবর সম্পত্তিতে। আর অন্য বস্তু যদি স্থাবর সম্পত্তির অনুগামী (تَابِعٌ) হয় তখন তাতেও শুফ'আ সাব্যস্ত হয়। অথচ গাছের খেজুর স্থাবর সম্পত্তিও নয় এবং স্থাবর সম্পত্তির অনুগামীও নয়। কাজেই তাতে কিয়াসের দাবি অনুসারে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার কথা।

قَوْلُهُ فَاشْبَهَ الْمَتَاعَ فِي الدَّارِ : যখন গাছের খেজুর বা ফল বাড়ির অনুগামী বস্তু নয় তখন এটি বাড়িতে রাখা আসবাবপত্রের মতোই হলো। অর্থাৎ কেউ যদি একটি বাড়ি বিক্রয় করে এবং বিক্রয়কালে বাড়িতে বিক্রেতার কিছু আসবাবপত্র থাকে। যেমন– চেয়ার টেবিল ইত্যাদি। আর ক্রেতা ক্রয়কালে এ আসবাবগুলোও শর্ত করে ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় তাহলে শফী' যদি উক্ত বাড়িটি নিতে চায় তাহলে সে উক্ত আসবাবপত্র লাভ করে না। কেননা, এগুলো বাড়ির অন্তর্ভুক্তও নয় এবং বাড়ির অনুগামী বস্তুও নয়। কাজেই তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হয় না। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও যেহেতু খেজুর বা ফল বাড়ির অন্তর্ভুক্তও নয় আবার বাড়ির অনুগামী বস্তু (تابع)ও নয় সেহেতু তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত না হওয়া-ই কিয়াসের দাবি।

قَوْلُهُ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْإِتِّصَالِ : কিয়াসের বিপরীতে 'ইসতিহসান' তথা 'সূক্ষ্ম কিয়াস'-এর ভিত্তিতে উক্ত খেজুরের উপরও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। 'ইসতিহসান'-এর দিকটি হচ্ছে, গাছ বাড়ির মাটির সাথে সম্পৃক্ত থাকে, আর খেজুর বা ফল গাছের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। সুতরাং গাছের মধ্যস্থতায় খেজুর বা ফলও বাড়ির সাথে সম্পৃক্ত। এ হিসেবে খেজুর বা ফল বাড়ির অনুগামী বস্তু (تَابِعٌ)। কাজেই এ বিবেচনায় বাড়ির অনুগামী হিসেবে খেজুর বা ফলের উপরও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে এবং শফী' তা লাভ করবে।

قَوْلُهُ كَالْبِنَاءِ فِي الدَّارِ وَمَا كَانَ مُرَكَّبًا فِيْهِ الخ : যেমন বাড়ির মাঝে নির্মিত ঘর এবং ঘরের সাথে সম্পৃক্ত বস্তুসমূহ যেমন– দরজা, জানালা, সিঁড়ি ইত্যাদি বস্তুসমূহেও মূলত শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু এগুলো বাড়ির মাটির সাথে সম্পৃক্ত তাই এগুলো বাড়ির অনুগামী বস্তু। আর অনুগামী হিসেবে এগুলোতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়। তদ্রূপ গাছের ফল বা খেজুরও গাছের মধ্যস্থতায় বাড়ির মাটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বাড়ির অনুগামী হিসেবে গণ্য হবে এবং তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কাজেই শফী' তা নেওয়ার অধিকার লাভ করবে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) উপরে যেভাবে কিয়াস ও 'ইসতিহসান'-এর দিক বর্ণনা করেছেন, হিদায়ার ব্যাখ্যাকারগণ এভাবেই এর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। আর তা হলো, যদি গাছের খেজুর বা ফল গাছের মধ্যস্থতায় মাটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বাড়ির অনুগামী বস্তু (تَابِعٌ) হয়ে থাকে তাহলে বাড়ি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ না করলেও গাছের খেজুর বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। অথচ মুসান্নিফ (র.) কিয়াসের দিক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, খেজুর বাড়ির অনুগামী বস্তু নয়, এজন্যই বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা ব্যতীত বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। মোটকথা, যদি খেজুর বাড়ির অনুগামী ধরা হয় তাহলে শুফ'আর ক্ষেত্রে যেরূপ অনুগামী হিসেবে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে তদ্রূপ বাড়ি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুগামী হিসেবে উল্লেখ ছাড়াই বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। অথচ বিধান হলো তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ প্রশ্নটি এখানে থেকে যাচ্ছে।

بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ [বাদয়েউস সানায়ে] গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা আলাউদ্দীন আল কাসানী (র.) আলোচ্য মাসআলাটির দলিল যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে উক্ত প্রশ্নের নিরসন হয়। তিনি দলিলটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়াসের দাবি অনুসারে শুফ'আ সাব্যস্ত না হওয়ার কথা। কেননা, ফল হচ্ছে অস্থাবর সম্পদ (مَنْقُوْلِيْ شَيْئٌ)। আর অস্থাবর সম্পদে শুফ'আ সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু গাছের মধ্যস্থতায় যেহেতু ফলও বাড়ির সাথে সম্পৃক্ত তাই তা বাড়ির অনুগামী বস্তু। অতএব, 'ইসতিহসান'-এর ভিত্তিতে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। তবে বাড়ির অনুগামী বস্তু হওয়া সত্ত্বেও বাড়ি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা ব্যতীত গাছের খেজুর বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের কারণে। হাদীসটি হচ্ছে– أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ "কেউ যদি ..... খেজুর গাছ বিক্রয় করে তাহলে তার ফল বিক্রেতারই থাকবে। তবে যদি ক্রেতা তা [নিজের জন্য] শর্ত করে নেয় [তাহলে ক্রেতার হবে]।" এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত না করলে [অর্থাৎ ক্রয়কালে ফলের কথা উল্লেখ না করলে] ফল বা খেজুর বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং এ হাদীসের কারণে অনুগামী বস্তু হওয়া সত্ত্বেও বাড়ি বা গাছ বিক্রয় করলে গাছের খেজুর বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। –[দ্র. بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ, মাকতাবায়ে নাঈমিয়্যাহ, খ. ৪, পৃ. ১৩৪-৩৫]

قَالَ : وَكَذٰلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَلَيْسَ فِي النَّخِيلِ ثَمَرٌ فَأَثْمَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي يَعْنِي يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ، لِأَنَّهُ مَبِيعٌ تَبَعًا، لِأَنَّ الْبَيْعَ سَرَى إِلَيْهِ. عَلٰى مَا عُرِفَ فِي وَلَدِ الْمَبِيعِ.

অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, অনুরূপ বিধান হবে যদি ক্রেতা জমি এমন অবস্থায় ক্রয় করে যে, তার বৃক্ষসমূহে ফল ছিল না অতঃপর ক্রেতার হাতে থাকাকালে বৃক্ষে ফল ধরেছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও শফী' ফল গ্রহণ করবে। কেননা, এ ফল অনুগামী হিসেবে বিক্রীত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, বিক্রয়ের কার্যকারিতা ফল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। যার কারণ বিক্রীত দাসীর সন্তানের আলোচনায় ইতঃপূর্বে জানা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَلَيْسَ فِي النَّخِيلِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে যে, শফী' গাছের খেজুরসহ বাড়িটি গ্রহণ করবে। ঠিক একই বিধান হবে যদি এমন হয় যে, বাড়িটি ক্রয় করার সময় গাছে খেজুর ছিল না; কিন্তু ক্রেতা হস্তগত করার পর তার হাতে থাকাবস্থায় গাছে খেজুর ধরেছে। অর্থাৎ এ সুরতেও শফী' গাছের খেজুরসহ বাড়িটি লাভ করবে।

[উল্লেখ্য, বিক্রয়ের পরে যদি বিক্রেতার হাতে থাকাবস্থায় খেজুর ধরে তাহলেও শফী' তা লাভ করবে।]

–[বাদায়েউস সানায়ে]

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ تَبَعًا لِأَنَّ الْبَيْعَ سَرٰى إِلَيْهِ : এ সুরতেও শফী' গাছের খেজুর লাভ করার কারণ হলো, এক্ষেত্রে যদিও বিক্রয়কালে গাছে খেজুর ছিল না। কিন্তু বিক্রীত জমির গাছে আপনাআপনি খেজুর ধরায় এবং গাছের মধ্যস্থতায় জমির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে জমির অনুগামী হিসেবে বিক্রীত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং বিক্রয়ের কার্যকারিতা খেজুরের উপরও বিস্তৃতি লাভ করেছে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَا عُرِفَ فِي وَلَدِ الْمَبِيعِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়ের পরে সৃষ্টি হওয়া ফল বিক্রীত জমির অনুগামী হওয়ার বিধানের নজির হচ্ছে, বিক্রীত দাসীর গর্ভে জন্মলাভ করা সন্তানের মাসআলা। অর্থাৎ কেউ যদি একটি দাসী বিক্রয় করে। অতঃপর ক্রেতা হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রেতার হাতে থাকাবস্থায় উক্ত দাসীর গর্ভ হতে কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে উক্ত সন্তানও ক্রেতা লাভ করে। কেননা, মায়ের অনুগামী হিসেবে সন্তানও বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও ফল যেহেতু গাছের মধ্যস্থতায় জমির অনুগামী বস্তু তাই অনুগামী হিসেবে ফলও বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হয়ে যাবে এবং জমির অনুগামী হিসেবে তাতেও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

قَالَ : فَإِنْ جَدَّهُ الْمُشْتَرِى ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيْعُ لَا يَأْخُذُ الثَّمَرَ فِى الْفَصْلَيْنِ جَمِيْعًا . لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ وَقْتَ الْأَخْذِ حَيْثُ صَارَ مَفْصُوْلًا عَنْهُ . فَلَا يَأْخُذُهُ . قَالَ فِى الْكِتَابِ : فَإِنْ جَدَّهُ الْمُشْتَرِى سَقَطَ عَنِ الشَّفِيْعِ حِصَّتُهُ . قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهٰذَا جَوَابُ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ . لِأَنَّهُ دَخَلَ فِى الْبَيْعِ مَقْصُوْدًا فَيُقَابِلُهُ شَئٌ مِنَ الثَّمَنِ . أَمَّا فِى الْفَصْلِ الثَّانِى يَأْخُذُ مَا سِوَى الثَّمَرِ بِجَمِيْعِ الثَّمَنِ، لِأَنَّ الثَّمَرَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُوْدًا عِنْدَ الْعَقْدِ، فَلَا يَكُوْنُ مَبِيْعًا إِلَّا تَبَعًا، فَلَا يُقَابِلُهُ شَئٌ مِنَ الثَّمَنِ .

والله أعلم .

অনুবাদ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি উক্ত ফল ক্রেতা পেড়ে [নামিয়ে] নেয় তারপর শফী' উপস্থিত হয় তাহলে উপরের দুই সুরতের কোনো সুরতেই শফী' ফল গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা, [বাড়িটি] গ্রহণকালে তা জমির অনুগামী হিসেবে বহাল নেই। কেননা, তা জমি থেকে পৃথক হয়ে গেছে। কাজেই শফী' তা নিতে পারবে না। 'মুখতাসার' গ্রন্থে ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, ক্রেতা যদি ফল কেটে নেয় তাহলে শফী'র উপর থেকে এর [মূল্যের] অংশ রহিত হয়ে যাবে। হিদায়ার গ্রন্থকার (র.) বলেন, "আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন"– কুদূরীর এ বক্তব্য প্রথম সুরতের বিধান। [এ বিধানের] কারণ হলো, এ সুরতে ফল ক্রয়বিক্রয়ে মূল প্রতিপাদ্য বস্তু হিসেবেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই তার বিপরীতে মূল্যের অংশ ধার্য হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে ফল ছাড়াই যা বর্তমান আছে তা-ই সম্পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে শফী' গ্রহণ করবে। কেননা, চুক্তিকালে ফল বিদ্যমান ছিল না। কাজেই তা মূল বিক্রয়বস্তু বলে গণ্য হবে না। তবে তার অনুগামী হিসেবে গণ্য। সুতরাং তার বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ সাব্যস্ত হবে না। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : فَإِنْ جَدَّهُ الْمُشْتَرِى ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيْعُ الخ : শব্দার্থ : جد -এর অর্থ হচ্ছে খেজুর ফল কাটা। আর যদি শব্দটি د এর পরিবর্তে ذ দ্বারা (جذ) হয় তাহলে তার অর্থ হচ্ছে যে কোনো ফল কাটা বা পাড়া।

উপরে দুটি সুরত বর্ণনা করা হয়েছিল। একটি হলো, বিক্রয়কালে গাছে ফল ছিল এবং ফলের কথা উল্লেখ করে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হলো, বিক্রয়কালে ফল ছিল না; কিন্তু বিক্রয়ের পর ক্রেতার হাতে থাকাবস্থায় গাছে ফল ধরেছে। উপরে এ দু সুরতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছিল যে, ফল বা খেজুর গাছে থাকাবস্থায় যদি শফী' জমিটি গ্রহণ করে তাহলে সে গাছের ফলসহই গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ফলের মাঝেও শুফ'আ সাব্যস্ত হবে।

এখানে বলা হচ্ছে যে, উক্ত দুটি সুরতের যেটিই হোক না কেন যদি ক্রেতা গাছের খেজুর কেটে ফেলে তারপর শফী' তার শুফ'আর অধিকার বলে জমিটি গ্রহণ করে তাহলে সে কেবল জমি এবং গাছ লাভ করবে। উক্ত খেজুর বা ফল সে লাভ করবে না। অর্থাৎ কাটার পর খেজুরের মাঝে শুফ'আর অধিকার আর বহাল থাকবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ وَقْتَ الْأَخْذِ الخ : এক্ষেত্রে খেজুরের উপর শুফ'আর অধিকার না থাকার কারণ হলো, শুফ'আর অধিকার মূলত সাব্যস্ত হয় স্থাবর সম্পত্তিতে। তবে গাছ বা গাছের ফল জমির সাথে সম্পৃক্ত থাকা অবস্থায় তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হয় জমি তথা স্থাবর সম্পত্তির অনুগামী (تَابِعٌ) হিসেবে। সুতরাং আলোচ্য সুরতে শফী' জমিটি গ্রহণকালে যেহেতু ফল গাছ থেকে পৃথক হয়ে গেছে সেহেতু তা জমির অনুগামী হিসেবে আর বহালও থাকেনি। অতএব, তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং শফী' তা লাভ করবে না। তবে উক্ত ফলের মূল্য পরিমাণ টাকা শফী'র উপর হতে কর্তন করা হবে কিনা– এ সম্পর্কে পরবর্তী ইবারতে মুসান্নিফ (র.) আলোচনা করছেন।

قَوْلُهُ قَالَ فِى الْكِتَابِ فَإِنْ جَذَّهُ الْمُشْتَرِىْ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) তাঁর মুখতাসারুল কুদূরী গ্রন্থে উপরে বর্ণিত সুরত দুটি বর্ণনা করার পর লিখেছেন যে, যদি ক্রেতা উক্ত খেজুর গাছ হতে খেজুর কেটে ফেলার পর শফী' জমিটি গ্রহণ করে তাহলে শফী' উক্ত খেজুর লাভ করবে না। কিন্তু উক্ত খেজুরের মূল্য পরিমাণ টাকা শফী'র জিম্মা হতে বাদ দেওয়া হবে। অর্থাৎ ক্রেতা জমিটি যে মূল্যে ক্রয় করেছিল তা হতে উক্ত খেজুরের মূল্য বাদ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে শফী' তা পরিশোধ করে জমিটি গ্রহণ করবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا جَوَابُ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) যে বিধানটি উল্লেখ করেছেন যে, "উক্ত খেজুরের মূল্য পরিমাণ টাকা শফী'র জিম্মা হতে বাদ দেওয়া হবে"– এ বিধানটি কেবল পূর্ববর্ণিত প্রথম সুরতের বিধান। প্রথম সুরতটি ছিল, খেজুর ক্রয়কালেই গাছে বিদ্যমান ছিল এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার শর্তের মাধ্যমে তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সুরতে যদি ক্রেতা খেজুর কেটে নেয় তারপর শফী' জমিটি গ্রহণ করে তাহলে খেজুরের মূল্য পরিমাণ টাকা শফী'র জিম্মা হতে বাদ যাবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সুরত তথা বিক্রয়কালে যদি গাছে খেজুর না থাকে, অতঃপর ক্রেতার হাতে থাকাবস্থায় গাছে খেজুর ধরে– সে সুরতের বিধান ভিন্ন। এ সম্পর্কে একটু পরে উল্লেখ করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِى الْبَيْعِ مَقْصُوْدًا الخ : প্রথম সুরতে উক্ত খেজুরের মূল্য পরিমাণ টাকা শফী'র জিম্মা হতে বাদ যাওয়ার কারণ হলো, যেহেতু উক্ত খেজুর বিক্রয়কালে গাছে বিদ্যমান ছিল এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার শর্তের মাধ্যমে তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেহেতু তা ক্রয়বিক্রয়ের উদ্দীষ্ট বস্তু (مَقْصُوْد) হিসেবে গণ্য হবে। আর যা ক্রয়বিক্রয়ের উদ্দীষ্ট বস্তু হিসেবে গণ্য হয় তার বিপরীতে মূল্যের একটা অংশ থাকা আবশ্যক হয়। অতএব, শফী' যখন উক্ত খেজুর ছাড়া বাড়িটি গ্রহণ করছে তখন বাড়িটির মূল্য হতে উক্ত খেজুরের মূল্য পরিমাণ টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা সে পরিশোধ করে বাড়িটি গ্রহণ করবে।

[উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে উক্ত খেজুরের মূল্য ধরা হবে যেদিন বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেদিনের মূল্য হিসেবে।
–বাদায়েউস সানায়ে]

قَوْلُهُ أَمَّا فِى الْفَصْلِ الثَّانِىْ يَأْخُذُ مَا سِوَى الثَّمَرِ الخ : এখান থেকে দ্বিতীয় সুরত তথা জমিটি ক্রয়কালে যদি তাতে খেজুর না থাকে, অতঃপর ক্রেতার হাতে থাকাবস্থায় গাছে খেজুর ধরে তারপর ক্রেতা আবার সে খেজুর কেটে নেয়– সে সুরতের বিধান বর্ণনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ সুরতে উক্ত খেজুরের মূল্য পরিমাণ টাকা শফী'র জিম্মা হতে বাদ যাবে না; বরং শফী' যদি জমিটি নিতে চায় তাহলে তাকে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করেই [খেজুর ছাড়া] জমিটি নিতে হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الثَّمَرَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُوْدًا عِنْدَ الْعَقْدِ الخ : এ সুরতে খেজুরের মূল্য পরিমাণ টাকা শফী'র জিম্মা হতে বাদ না যাওয়ার কারণ হলো, বিক্রয়কালে গাছে কোনো খেজুর ছিল না এবং ক্রেতা খেজুরসহ জমিটি গ্রহণও করেনি। কাজেই তা বিক্রয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যতক্ষণ খেজুর গাছে ছিল ততক্ষণ তা অনুগামী হিসেবে বিক্রয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য ছিল। কিন্তু গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তা আর কোনোভাবে বিক্রয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। এখন বিক্রয়বস্তু কেবল জমি এবং জমির গাছ। শফী' তো এ বিক্রয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে লাভ করছে। কাজেই উক্ত খেজুরের বিনিময়ে কোনো মূল্য শফী'র জিম্মা হতে বাদ যাবে না।

[উল্লেখ্য, উপরিউক্ত বিধান হলো, ক্রেতার হাতে থাকাবস্থায় গাছে ফল ধরার সুরতে। পক্ষান্তরে যদি বিক্রয়কালে গাছে খেজুর না থাকে, অতঃপর বিক্রেতার হাতে থাকাবস্থায় গাছে খেজুর ধরে, তারপর বিক্রেতা তা কেটে নেয় কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করে তাহলে সে খেজুরের মূল্য পরিমাণ টাকা শফী'র জিম্মা হতে বাদ যাবে।] –[দ্র: বাদায়েউস সানায়ে]

بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَمَا لَا تَجِبُ

পরিচ্ছেদ : যে সকল বস্তুতে শুফ'আ সাব্যস্ত হয় আর যে সকল বস্তুতে হয় না

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে সংক্ষিপ্তভাবে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। আর এ পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে কোন কোন বস্তুতে এবং কোন কোন সুরতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে তা আলোচনা করা হয়েছে।

قَالَ : اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْعَقَارِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ ـ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا شُفْعَةَ فِيمَا لَا يُقْسَمُ، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ دَفْعًا لِمُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ، وَهٰذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا لَا يُقْسَمُ ـ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَقَارٍ أَوْ رَبْعٍ إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْعُمُوْمَاتِ، وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ سَبَبُهَا الْاِتِّصَالُ فِي الْمِلْكِ ـ وَالْحِكْمَةُ دَفْعُ ضَرَرِ سُوْءِ الْجِوَارِ، عَلَى مَا مَرَّ وَأَنَّهُ يَنْتَظِمُ الْقِسْمَيْنِ ـ مَا يُقْسَمُ وَمَا لَا يُقْسَمُ وَهُوَ الْحَمَّامُ وَالرَّحٰى وَالْبِئْرُ وَالطَّرِيْقُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্থাবর সম্পত্তিতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে, তা বণ্টনযোগ্য না হলেও। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, অবণ্টনযোগ্য সম্পত্তিতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। কেননা, বণ্টনের কষ্ট ও বোঝা দূরীকরণার্থেই শুফ'আ প্রবর্তিত হয়েছে। এ কারণ অবণ্টনযোগ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। আমাদের দলিল হলো নবী করীম ﷺ-এর বাণী- اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَقَارٍ أَوْ رَبْعٍ "শুফ'আর অধিকার রয়েছে ভূ-সম্পত্তি কিংবা আবাসগৃহ জাতীয় সকল সম্পত্তিতে।" এ হাদীসের অনুরূপ অপরাপর ব্যাপকতাজ্ঞাপক শরিয়তের বাণীসমূহ [আমাদের দলিল]। তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো, শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব' বা কারণ হলো, মালিকানাধীন সম্পত্তির সংলগ্নতা। আর এর হিকমত [বা উদ্দেশ্য] হচ্ছে খারাপ প্রতিবেশীত্বের ক্ষতি হতে রক্ষা লাভ, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ 'সবব' ও হিকমত বণ্টনযোগ্য ও অবণ্টনযোগ্য উভয় প্রকারের সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবণ্টনযোগ্য সম্পত্তি যেমন- গোসলখানা, পাতাল হতে পানি উত্তোলনের জন্য স্থাপিত চাক্কি, পানির কূপ ও রাস্তা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْعَقَارِ الخ : **শব্দার্থ :** اَلْعَقَارُ -স্থাবর সম্পত্তি, ভূমি। আল মুগরিব গ্রন্থে এর অর্থ এভাবে লেখা হয়েছে- اَلْعَقَارُ الضَّيْعَةُ وَقِيْلَ كُلُّ مَالَهُ أَصْلٌ مِنْ دَارٍ أَوْ ضَيْعَةٍ "اَلْعَقَارُ" -এর অর্থ হচ্ছে ভূমি। আর কারো কারো মতে ভূমি, বাড়ি ইত্যাদি যে কোনো স্থিতিশীল সম্পত্তি। হিদায়ার ব্যাখ্যাকারগণ দ্বিতীয় অর্থটিই এখানে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ভূমি, বাড়ি ইত্যাদি যে কোনো স্থিতিশীল সম্পত্তি।

মাসআলা : স্থাবর সম্পত্তিতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি আবার দু ধরনের হতে পারে-

১. বণ্টনযোগ্য। অর্থাৎ এমন সম্পত্তি যা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে বণ্টন করা হলে তা থেকে প্রত্যেকেই যথারীতি উপকৃত হতে পারবে। যেমন- বাগান, ফসলের জমি।

২. অবণ্টনযোগ্য। অর্থাৎ এমন সম্পত্তি যা বণ্টন করা হলে তা থেকে যথারীতি উপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না। যেমন– গোসলখানা, পানির কূপ ইত্যাদি। এগুলো মাঝখান থেকে যদি পৃথক করে দুজনের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে কেউ-ই তা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারবে না।

প্রথম প্রকারের স্থাবর সম্পত্তির মাঝে শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। দ্বিতীয় প্রকার তথা অবণ্টনযোগ্য সম্পত্তিতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে কিনা– এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আমাদের মতে অবণ্টনযোগ্য সম্পত্তিতেও শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে অবণ্টনযোগ্য সম্পত্তিতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) থেকে দুটি করে রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি রেওয়ায়েতে তাঁদের উভয়ের মত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের অনুরূপ। আর অপর রেওয়ায়েত অনুসারে তাঁদের উভয়ের মত আমাদের মাযহাবের অনুরূপ। এ ছাড়া শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহ ইবনে শুরাইহ-এর অভিমত আমাদের মাযহাবের অনুরূপ।

নিম্নে মুসান্নিফ (র.) উভয় পক্ষের দলিল বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে একটি আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন। আর আমাদের পক্ষে একটি নকলী ও একটি আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ دَفْعًا الخ : এখান থেকে উক্ত মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল বর্ণনা করেছেন। তাঁর পক্ষে আকলী দলিল হলো, শরিয়তে শুফ'আর অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অংশীদারদেরকে বণ্টনের খরচভার থেকে রক্ষা করার জন্য। অর্থাৎ যদি একটি জমি দুজন অংশীদারের মালিকানাধীন হয় তারপর একজন অংশীদার তার অংশ অন্য কারো নিকট বিক্রয় করে ফেলে তাহলে অপর অংশীদার জমিটি বণ্টন করে অর্ধেক উক্ত ক্রেতাকে হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে। ফলে বণ্টনের খরচাদি সেই অংশীদারের বহন করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। শরিয়ত এ খরচের ভার অংশীদারদের উপর যাতে না পড়ে সে জন্যই শুফ'আর অধিকার প্রদান করেছে, যাতে অপর অংশীদার বিক্রীত অংশ নিজে গ্রহণ করে এ খরচের ভার হতে মুক্ত থাকতে পারে। সুতরাং যে সকল সম্পত্তি বণ্টন করার উপযুক্ত নয় তা বণ্টনের খরচভারেরও প্রশ্ন আসবে না। কাজেই তাতে শুফ'আও সাব্যস্ত হবে না। সারকথা হচ্ছে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার যে 'ইল্লত' বা কারণ তা অবণ্টনযোগ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। কাজেই সে ক্ষেত্রে শুফ'আও সাব্যস্ত হবে না।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে কেবল আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন, কোনো নকলী দলিল উল্লেখ করেননি। হিদায়ার ভাষ্যকার আল্লামা আইনী (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে একটি নকলী দলিলও উল্লেখ করে তার জবাব দিয়েছেন। দলিলটি হলো, নবী করীম ﷺ -এর বাণী– لَا شُفْعَةَ فِي بِنَاءٍ وَلَا طَرِيقٍ وَلَا مَنْقَبَةٍ - رَوَاهُ ابْنُ الْخَطَّابِ। "নির্মিত ঘর, রাস্তা ও ছোট গলির ক্ষেত্রে কোনো শুফ'আর অধিকার নেই।" হাদীসটি ইবনুল খাত্তাব বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে যে সকল জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অবণ্টনযোগ্য। কাজেই বুঝা গেল বণ্টনের অনুপযুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। আল্লামা আইনী (র.) এ দলিলটির জবাব দিয়েছেন যে, হাদীসটি غَيْرُ مَعْرُوفٍ তথা 'অপ্রসিদ্ধ' কাজেই এটি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। –[দ্র. বিনায়াহ পৃ. ৪১৬]

قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ اِلخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের নকলী দলিল হলো, নবী করীম ﷺ -এর বাণী– اَلشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ عَقَارٍ أَوْ رَبْعٍ "জমি, আবাসগৃহ ইত্যাদি সকল বস্তুতেই শুফ'আর অধিকার রয়েছে।" এ হাদীসে স্থাবর যে কোনো সম্পত্তিতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বণ্টনযোগ্য এবং অবণ্টনযোগ্য এর মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। কাজেই হাদীসের ব্যাপকতা অনুসারে উভয় প্রকার সম্পত্তিতেই শুফ'আ সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য, এ হাদীসটি ইসহাক ইবনে রাহওয়াই তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ 'হাসান'। তবে তাঁর বর্ণিত ইবারত হচ্ছে নিম্নরূপ– اَلشَّرِيْكُ شَفِيْعٌ وَالشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ "অংশীদার শুফ'আর হকদার। আর শুফ'আর অধিকার রয়েছে [স্থাবর] সকল সম্পত্তিতে।" ইমাম তাহাবী (র.)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণিত সনদটি দুর্বল।

–[দ্র. নসবুর রায়াহ]

قَوْلُهُ إِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْعُمُوْمَاتِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত হাদীসটি ছাড়াও অন্যান্য যে সকল হাদীসে শুফ'আর অধিকারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু বণ্টনযোগ্য ও অবণ্টনযোগ্য সম্পত্তির কোনো পার্থক্যের কথা বলা হয়নি, সে সকল হাদীসও আমাদের পক্ষে দলিল।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ سَبَبُهَا الْإِتِّصَالُ فِى الْمِلْكِ الخ : এখান থেকে আমাদের আকলী দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের আকলী দলিল হলো, শুফ'আর অধ্যায়ের শুরুতে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব' হলো, পরস্পরের মালিকানাধীন সম্পত্তির সংলগ্নতা। অর্থাৎ একজনের স্থাবর সম্পত্তি অন্যজনের স্থাবর সম্পত্তির সাথে মিলিত থাকাই হচ্ছে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব'। আর এ অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার হেকমত বা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিবেশীর আচার-আচরণের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ নতুন কোনো ক্রেতা এসে যাতে সংলগ্ন জমির মালিককে অতিষ্ঠ করতে না পারে, সে জন্যই শুফ'আর অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আর এ বিষয়টি উভয় প্রকার সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ সম্পত্তি চাই বণ্টনযোগ্য হোক বা বণ্টনযোগ্য না হোক উভয় ক্ষেত্রে নতুন ক্রেতা এসে অপর অংশীদার বা অপর প্রতিবেশীকে অতিষ্ঠ করতে পারে। কাজেই উভয় ক্ষেত্রেই পরস্পরের জমির সংলগ্নতা শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব' হবে এবং 'সবব' বিদ্যমান হওয়ার কারণে বিধান তথা শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বণ্টনের খরচভার আরোপিত হওয়াকে যে শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব' বা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নয়। শুফ'আর অধ্যায়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় [মূল গ্রন্থের ৩৭৪ নং পৃষ্ঠায়] মুসান্নিফ (র.) এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন- وَضَرَرُ الْقِسْمَةِ مَشْرُوْعٌ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِتَحْقِيْقِ ضَرَرِ غَيْرِهِ অর্থাৎ বণ্টনের যে খরচভার অপর অংশীদারের উপর বর্তায় তা শরিয়তসম্মত একটি হক। যদি কোনো অংশীদার তার জমি বিক্রয় করেও অপর অংশীদারের সাথে জমি বণ্টন করে নিতে চায় তাহলে উভয়ের বণ্টন-খরচ বহন করতে হয়। কাজেই এ খরচভারকে ক্রেতার নিকট হতে জমি লাভ করার 'সবব' বা 'ইল্লত' হিসেবে নির্ধারণ করা সঠিক নয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْحَمَّامُ وَالرَّحٰى وَالْبِئْرُ وَالطَّرِيْقُ : এখান থেকে কয়েকটি অবণ্টনযোগ্য সম্পত্তির উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

১. اَلْحَمَّامُ - গোসলখানা। ২. اَلرَّحٰى - পানি উত্তোলনের চাক্কি। এখানে اَلرَّحٰى বলে بَيْتُ الرَّحٰى তথা 'পানি উত্তোলনের চাক্কির ঘর' উদ্দেশ্য। কেননা, শুধু চাক্কি হচ্ছে স্থানান্তরযোগ্য বস্তু, তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হয় না। ৩. اَلْبِئْرُ পানির কূপ, ৪. اَلطَّرِيْقُ - রাস্তা। এ সকল সম্পত্তি বণ্টন করে পৃথক করা হলে কোনো অংশীদারই যথাযথভাবে উপকৃত হতে পারে না। এগুলোর কোনোটি যদি কোনো অংশীদার বিক্রয় করে তাহলে আমাদের মতে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু এ সকল সম্পত্তি যদি এমন হয় যে, বণ্টন করা হলেও প্রত্যেক অংশীদার যথাযথভাবে উপকৃত হতে পারবে, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতেও তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। যেমন- বড় একটি গোসলখানা যা দুই অংশীদারের মাঝে বণ্টন করার পর প্রত্যেকেই তার অর্ধেককে একটি গোসলখানা হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, তাহলে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে।

قَالَ : وَلَا شُفْعَةَ فِي الْعُرُوْضِ وَالسُّفُنِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِيْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ . وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ (رحـ) فِيْ إِيْجَابِهَا فِي السُّفُنِ . وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ ضَرَرِ سُوْءِ الْجِوَارِ عَلَى الدَّوَامِ، وَالْمِلْكُ فِي الْمَنْقُوْلِ لَا يَدُوْمُ حَسْبَ دَوَامِهِ فِي الْعَقَارِ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ . وَفِيْ بَعْضِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْبِنَاءِ وَالنَّخْلِ إِذَا بِيْعَتْ دُوْنَ الْعَرْصَةِ، وَهُوَ صَحِيْحٌ مَذْكُوْرٌ فِي الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ لَا قَرَارَ لَهُ فَكَانَ نَقْلِيًّا . وَهٰذَا بِخِلَافِ الْعُلُوِّ حَيْثُ يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَيُسْتَحَقُّ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي السُّفْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ طَرِيْقُ الْعُلُوِّ فِيْهِ، لِأَنَّهُ بِمَا لَهُ مِنْ حَقِّ الْقَرَارِ الْتَحَقَ بِالْعَقَارِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আসবাবপত্র ও নৌযানে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। নবী করীম ﷺ-এর এ হাদীসের কারণে لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِيْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ "বাসস্থান কিংবা বাগান ব্যতীত অন্য কিছুতে শুফ'আ নেই।" ইমাম মালেক (র.)-এর নৌযানে শুফ'আ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে এ হাদীসটি তাঁর বিপক্ষে দলিল। এছাড়া আরেকটি কারণ হলো, শুফ'আ [শরিয়তে] সাব্যস্ত হয়েছে খারাপ প্রতিবেশীত্বের দীর্ঘস্থায়ী অনিষ্ট প্রতিহতকরণার্থে। অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা স্থাবর সম্পত্তির মালিকানার ন্যায় স্থায়ী হয় না। কাজেই [বিধানের ক্ষেত্রে] অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়টিকে স্থাবর সম্পত্তির সাথে তুলনা করা যাবে না। মুখতাসারুল কুদূরী গ্রন্থের কোনো কোনো অনুলিপিতে উল্লেখ আছে "গৃহ এবং খর্জুর বৃক্ষ যদি [সংশ্লিষ্ট] জমি বাদ রেখে বিক্রয় করা হয় তাহলে তাতে শুফ'আর অধিকার থাকবে না।" এ বিধানটি সঠিক। 'আল আসল' তথা মাবসূত গ্রন্থে এ বিধানটির উল্লেখ রয়েছে। এর কারণ হলো, এগুলোর কোনো স্থায়িত্ব নেই। কাজেই তা অস্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। এর ব্যতিক্রম হলো, উপরের তলার বিষয়টি। কেননা, শুফ'আর ভিত্তিতে উপরের তলার অধিকারী হওয়া যায়। আবার উপরের তলার মালিকানার ভিত্তিতে নিচের তলার শুফ'আ লাভ করা যায়, যদি উপরের তলার যাতায়াত পথ নিচের তলার ভিতর দিয়ে না হয়ে থাকে। কেননা, উপরের তলার স্থায়িত্বের অধিকার থাকায় তা জমির পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْعُرُوْضِ وَالسُّفُنِ : মাসআলা হলো, আসবাবপত্র ও নৌযানে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। অর্থাৎ যে কোনো স্থানান্তরযোগ্য বস্তুতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য স্থাবর সম্পত্তি [যা স্থানান্তরযোগ্য নয়] হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, নৌযান তথা নৌকা বা জাহাজের ক্ষেত্রেও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলায় কেবল আমাদের পক্ষের দলিল বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক (র.)-এর পক্ষে কোনো দলিল উল্লেখ করেননি। আমাদের পক্ষে একটি নকলী ও একটি আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِى رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ : নৌযান বা যে কোনো স্থানান্তরযোগ্য জিনিসে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার পক্ষে আমাদের নকলী দলিল হলো, নবী করীম ﷺ -এর বাণী- لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِى رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ "আবাসগৃহ ও বাগান ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসে শুফ'আর অধিকার নেই।" এ হাদীসে বাড়ি ও বাগান ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসে শুফ'আর অধিকার না থাকার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। তবে বাড়ি ও বাগান বলে স্থাবর সম্পত্তি বুঝানো হয়েছে। কাজেই স্থাবর সম্পত্তি যদি খালি জমিও হয় তবে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে- এ ব্যাপারে সকলে একমত। [উল্লেখ্য, হাদীসটি সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে। -[দ্র. বাদায়েউস সানায়ের টীকা, খ. ৪ ; পৃ.১০৯, মাকতাবায়ে নাঈমিয়া, দেওবন্দ।]

قَوْلُهُ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ (رح) فِىْ إِيْجَابِهَا فِى السُّفُنِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের বর্ণিত এ হাদীসটি [তথা لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِىْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ] ইমাম মালেক (র.)-এর বিপক্ষে আমাদের দলিল। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে নৌযানের ক্ষেত্রেও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। অথচ এ হাদীসে বলা হয়েছে, আবাসগৃহ ও বাগান [তথা স্থাবর সম্পত্তি] ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসে শুফ'আর অধিকার নেই।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ ضَرَرِ سُوْءِ الْجِوَارِ الخ : নৌযান বা যে কোনো স্থানান্তরযোগ্য বস্তুতে শুফ'আ সাব্যস্ত না হওয়ার পক্ষে আমাদের আকলী দলিল হলো, পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, শুফ'আর অধিকার কিয়াসের পরিপন্থি। তা সত্ত্বেও শরিয়ত দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবেশীত্বের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য শুফ'আর অধিকার প্রদান করেছে। আর এ দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবেশীত্বের অনিষ্ট কেবল স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কেননা, স্থানান্তরযোগ্য বস্তুসমূহের উপর মানুষের মালিকানা ততটা স্থায়ী হয় না যতটা স্থায়ী হয় স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। স্থানান্তরযোগ্য বস্তুসমূহ মানুষ সাধারণত অধিক ক্রয়বিক্রয় করে। পক্ষান্তরে স্থাবর সম্পত্তি মানুষ সাধারণত ঘন ঘন বিক্রয় করে না। কাজেই স্থানান্তরযোগ্য বস্তুতে যদি আরেকজন প্রতিবেশী হয় তার অনিষ্ট দীর্ঘস্থায়ী বলে গণ্য হবে না। সুতরাং এগুলোকে স্থাবর সম্পত্তির উপর কিয়াস করে এতে শুফ'আর অধিকারও সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা 'নস' তথা শরিয়তের বাণী কেবল স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেই রয়েছে, অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নেই। আর কারণ বা 'ইল্লত'-এর ক্ষেত্রে তা স্থাবর সম্পত্তির সমপর্যায়ের নয়। কাজেই কিয়াসের ভিত্তিতেও তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَفِىْ بَعْضِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বলছেন, ইমাম কুদূরী (র.) রচিত 'মুখতাসার' [যা মুখতাসারুল কুদূরী নামে প্রসিদ্ধ] গ্রন্থের কোনো কোনো অনুলিপিতে এই ইবারতটুকুও পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَلَا شُفْعَةَ فِى الْبِنَاءِ وَالنَّخْلِ إِذَا بِيْعَتْ دُوْنَ الْعَرْصَةِ الخ : "যদি জমি ছাড়া শুধু ঘর বা গাছ বিক্রয় করা হয় তাহলে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।" অর্থাৎ এ ইবারতটুকু 'মুখতাসারুল কুদূরী' গ্রন্থের কোনো কোনো অনুলিপিতে নেই, আবার কোনো কোনো অনুলিপিতে আছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ ইবারতটুকুতে যে মাসআলাটি বর্ণনা করা হয়েছে তা সঠিক এবং মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত 'মাবসূত' গ্রন্থ যা 'আল আসল' নামে অধিক প্রসিদ্ধ- তাতে উল্লেখ রয়েছে। মাসআলাটি হলো, কেউ যদি জমি বিক্রয় না করে জমির উপর যে ঘর আছে শুধু তা বিক্রয় করে কিংবা জমির উপর লাগানো শুধু গাছ বিক্রয় করে তাহলে উক্ত ঘর বা গাছের উপর কোনো প্রকার শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا قَرَارَ لَهُ فَكَانَ نَقْلِيًّا : এ মাসআলাটির দলিল হলো, জমি ছাড়া যখন শুধু ঘর বা গাছ বিক্রয় করা হয়েছে তখন ক্রেতা উক্ত ঘর বা গাছ তুলে নিতে বা কেটে নিতে বাধ্য। স্থায়ীভাবে ঘর বা গাছ উক্ত জমিতে রাখার অধিকার তার নেই। কাজেই এগুলোর স্থিতিশীলতা না থাকার কারণে এগুলো স্থানান্তরযোগ্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থানান্তরযোগ্য বস্তুতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে জমিসহ যদি ঘর বা গাছ বিক্রয় করে তাহলে উক্ত ঘর বা গাছের মাঝেও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়। তার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে ক্ষেত্রে উক্ত ঘর বা গাছ জমির অনুগামী হিসেবে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِخِلَافِ الْعُلُوِّ حَيْثُ يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে জমি ব্যতীত ঘর বা গাছ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, কোনো ভবনের উপরের তলার বিধান এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কেউ যদি নিচের জমি ছাড়া শুধু কোনো ভবনের উপর তলা বিক্রয় করে তাহলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। নিচের তলার মালিক উক্ত উপরের তলা শুফ'আর অধিকার বলে লাভ করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَقُّ بِهِ الشُّفْعَةُ فِي السُّفْلِ : আবার নিচের তলা যদি বিক্রয় হয় তাহলে উপরের তলার মালিক নিচের তলায় শুফ'আ দাবি করতে পারবে। এক্ষেত্রে যদি উপরের তলার যাতায়াত পথ নিচের তলার ভিতর দিয়ে না হয়ে থাকে তাহলে শুফ'আর দাবি করতে পারবে বিক্রীত সম্পত্তির প্রতিবেশী (عَلَى الْجِوَارِ) হিসেবে। আর যদি উপরের তলার যাতায়াত পথ নিচের তলার ভিতর দিয়ে হয়ে থাকে তাহলে শুফ'আর দাবি করতে পারবে বিক্রীত সম্পত্তিতে অংশীদার (بِالشَّرِكَةِ) হিসেবে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) এখানে إِذَا لَمْ يَكُنْ طَرِيقُ الْعُلُوِّ فِيهِ "যদি উপরের তলার যাতায়াত পথ নিচের তলার ভিতর দিয়ে না হয়ে থাকে" – শর্ত উল্লেখ করেছেন এ কথা বুঝানোর জন্য নয় যে, যদি নিচ তলার ভিতর দিয়ে যাতায়াত পথ থাকে তাহলে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না; বরং এ কথা বুঝানোর জন্য যে, যদি নিচ তলার ভিতর দিয়ে যাতায়াত পথ থাকে তাহলে তো নিচ তলার মাঝে উপরের তলার মালিক অংশীদার। আর এ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এমনিতেই সে শুফ'আর দাবি করতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি নিচ তলার ভিতর দিয়ে যাতায়াত পথ না থাকে তাহলেও সে শুফ'আর দাবি করতে পারবে। এ অধিকারটি হচ্ছে উপরের তলার প্রতিবেশীত্বের ভিত্তিতে। আর এখানে এটা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, উপরের তলার প্রতিবেশীত্বের ভিত্তিতে নিচ তলার শুফ'আ দাবি করা যায়।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَا لَهُ مِنْ حَقِّ الْقَرَارِ الْتَحَقَ بِالْعَقَارِ : এখান থেকে উপরের তলার বিধানটি পূর্ববর্ণিত ঘর বা গাছের বিধানের ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিচ তলা বা জমি ছাড়া শুধু উপরের তলা বিক্রয় করা সত্ত্বেও তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে তার কারণ হলো, কেউ যদি উপরের তলা ক্রয় করে তাহলে সে স্থায়ীভাবে উক্ত স্থানটির হকদার হয়। অর্থাৎ উক্ত উপরের তলা সর্বদাই সেখানে থাকার অধিকার তার থাকে। এমন কি যদি উপরের তলাটি বিধ্বস্ত হয়ে যায় তাহলে সে পুনরায় তা নির্মাণ করারও অধিকার পায়। কাজেই শুধু উপরের তলার মালিক হলেও তা ভূমির ন্যায় স্থিতিশীল জিনিস। সুতরাং তাতে ভূমির বিধানই প্রযোজ্য হবে। অতএব, তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে পূর্ববর্ণিত জমি ছাড়া ঘর বা গাছ -এর কোনো স্থিতিশীলতা নেই। কাজেই তাতে ভূমির বিধান প্রযোজ্য হবে না এবং তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।

উল্লেখ্য, উপরের তলার ক্ষেত্রে শুফ'আর এ বিধানটি হচ্ছে 'ইসতেহসান'-এর ভিত্তিতে। কিয়াসের দাবি অনুসারে শুফ'আর অধিকার না থাকার কথা। কেননা, উপরের তলা স্থায়ীভাবে স্থিতিশীল জিনিস নয়। আর 'ইসতিহসান'-এর দিক হলো, যেহেতু স্থায়ীভাবে নির্মিতরূপে রাখার অধিকার আছে তাই এটিও স্থায়ীভাবে স্থিতিশীল জিনিসেরই পর্যায়ের।

قَالَ : وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ فِى الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ لِلْعُمُوْمَاتِ، وَلِأَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِى السَّبَبِ وَالْحِكْمَةِ فَيَسْتَوِيَانِ فِى الْاِسْتِحْقَاقِ . وَلِهٰذَا يَسْتَوِى فِيْهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثٰى وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَالْبَاغِىْ وَالْعَادِلُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ إِذَا كَانَ مَاذُوْنًا أَوْ مُكَاتَبًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শুফ'আর অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলামান ও জিম্মী [অমুসলিম বাসিন্দা] সমান। কেননা বর্ণিত বাণীগুলো [উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে] ব্যাপকতাজ্ঞাপক। তাছাড়া এ কারণে যে, উভয়ে 'সবব' ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সমান। কাজেই অধিকার লাভ করার ক্ষেত্রেও সমান হবে। এ কারণেই তো এই অধিকার লাভ করার ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা, ছোট-বড়, দেশদ্রোহী-অনুগত নাগরিক, স্বাধীন ব্যক্তি ও অনুমতিপ্রাপ্ত বা অর্থের বিনিময়ে আজাদ হওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ গোলাম– এরা সকলেই সমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ فِى الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ الخ : মাসআলা হলো, শুফ'আর অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম বাসিন্দা হোক কিংবা অমুসলিম বাসিন্দা [জিম্মী] হোক উভয়েই সমান। অর্থাৎ অমুসলিম বাসিন্দার ক্রয়কৃত বাড়ি মুসলিম বাসিন্দা শুফ'আর অধিকার বলে লাভ করতে পারবে। আবার মুসলিম বাসিন্দার ক্রয়কৃত বাড়ি অমুসলিম বাসিন্দা [জিম্মী] শুফ'আর অধিকার বলে লাভ করতে পারবে। অনুরূপভাবে একটি বাড়ির প্রতিবেশী যদি দুই জন মুসলিম ও একজন অমুসলিম বাসিন্দা হয় তাহলে এরা সকলেই শুফ'আর ভিত্তিতে সমানভাবে বাড়িটি লাভ করবে। এটি হচ্ছে আমাদের মত। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতও তাই।

পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ, ইবনে আবী লায়লা ও হাসান বসরী (র.) প্রমুখের মতে, কোনো অমুসলিম বাসিন্দা মুসলিম বাসিন্দার ক্রয়কৃত জমিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না। কিন্তু মুসলিম বাসিন্দা অমুসলিম বাসিন্দার ক্রয়কৃত জমিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। তাঁদের দলিল হচ্ছে, সুনানে দারা কুতনীতে হযরত আনাস (রা.)-থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ عَلٰى مُسْلِمٍ – "হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মুসলমানের বিপক্ষে কাফেরের কোনো শুফ'আর অধিকার নেই।" আল্লামা আইনী (র.) তাঁদের এ দলিলটি উল্লেখ করে এর জবাব দিয়েছেন এই বলে وَحَدِيْثُ الدَّارَ قُطْنِىْ غَرِيْبٌ لَمْ يَثْبُتْ ["দারা কুতনী বর্ণিত এ হাদীসটি 'অপরিচিত', সঠিক বলে প্রমাণিত নয়।"]

মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলায় আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক (র.)-এর পক্ষে নকলী ও আকলী উভয় প্রকার দলিলই উল্লেখ করেছেন। তবে নকলি দলিল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেননি, শুধু পূর্ববর্ণিত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ لِلْعُمُوْمَاتِ : এ ইবারতটুকু দ্বারা মুসান্নিফ (র.) উক্ত মাসআলার নকলী দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। عُمُوْمَاتٌ শব্দটি عُمُوْمٌ -এর বহুবচন। আর عُمُوْمٌ শব্দটি عَامٌّ -এর বহুবচন। ইবারতটুকুর অর্থ হচ্ছে 'ব্যাপকতাজ্ঞাপক হাদীসসমূহের কারণে'। অর্থাৎ শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়া সংক্রান্ত যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলো ব্যাপকতাজ্ঞাপক।

তাতে মুসলিম ও অমুসলিম বাসিন্দার মাঝে কোনো পার্থক্যের কথা বলা হয়নি। যেমন শুফ'আর অধ্যায়ের শুরুতে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে– اَلشُّفْعَةُ لِشَرِيْكٍ لَمْ يُقَاسِمْ "যে অংশীদার বণ্টন করে নেয়নি সে শুফ'আর অধিকার পাবে।" جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ "বাড়ির প্রতিবেশী [বিক্রীত] বাড়ির উপর অধিক হকদার।" এ সকল হাদীসে মুসলিম ও অমুসলিম -এর মাঝে কোনো পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং সবগুলো হাদীসই মুসলিম ও অমুসলিমের ক্ষেত্রে ব্যাপকতাজ্ঞাপক। কাজেই হাদীসের ব্যাপকতা অনুসারে উভয়ই শুফ'আর ক্ষেত্রে সমানভাবে অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي السَّبَبِ وَالْحِكْمَةِ الخ : এখান থেকে আকলি দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলিম বাসিন্দা ও অমুসলিম বাসিন্দা শুফ'আর অধিকারের ক্ষেত্রে সমান হওয়ার আকলী দলিল হলো, পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব' হচ্ছে জমির সংলগ্নতা। একজনের জমি অপরজনের জমির সাথে সংলগ্ন হলে সেক্ষেত্রে শুফ'আ সাব্যস্ত হয়। আর এ সংলগ্নতা শুফ'আর 'সবব' হওয়ার 'হেকমত' বা কারণ হচ্ছে প্রতিবেশীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা। এই 'সবব' ও হেকমতের ক্ষেত্রে মুসলিম বাসিন্দা হোক আর অমুসলিম বাসিন্দা হোক উভয়ে সমান। কেননা মুসলিম বাসিন্দারও জমি যেভাবে সংলগ্ন থাকে অমসুলিম বাসিন্দার জমিও ঠিক তেমনিই সংলগ্ন থাকে। আবার মুসলিম বাসিন্দা যেমনিভাবে প্রতিবেশীর অনিষ্টের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অমুসলিম বাসিন্দাও তেমনিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং যে 'সবব' ও হেকমতের কারণে মুসলিম বাসিন্দা শুফ'আর অধিকারী হয় সেই 'সবব' ও হেকমত অমুসলিম বাসিন্দার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান থাকার কারণে সেও শুফ'আর অধিকারী হবে। কাজেই উভয়ে সমানভাবেই শুফ'আর অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا يَسْتَوِي فِيْهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثٰى : মুসান্নিফ (র.) বলেন, শুফ'আর 'সবব' ও হেকমতের ক্ষেত্রে সমান হলে সে শুফ'আর অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রেও সমান হবে বলে আমরা উল্লেখ করলাম। ঠিক এই কারণেই শুফ'আর অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা, ছোট-বড়, বিদ্রোহী-অনুগত, গোলাম-স্বাধীন ব্যক্তিরা সমান বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ এরা সকলেই শুফ'আর 'সবব' তথা জমির সংলগ্নতা ও হেকমত তথা প্রতিবেশীর অনিষ্টতায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। তাই বিধান তথা শুফ'আর অধিকার লাভ করার ক্ষেত্রেও এরা সকলে সমান বলে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ : আমাদের মতে ও অধিকাংশ ইমামগণের মতে শুফ'আর অধিকারের ক্ষেত্রে ছোট-বড় সমান, উভয়েই সমানভাবে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। কিন্তু ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর মতে ছোট ছেলে-মেয়ের জন্য কোনো শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী (র.) থেকেও এ মতটি বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য, আমাদের মতে গর্ভের বাচ্চাও শুফ'আর অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَالْبَاغِي وَالْعَادِلُ : শব্দার্থ: اَلْبَاغِيْ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে মুসলিম শাসকের আনুগত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহ করে তাকে। আর العادل হচ্ছে এর বিপরীত, অর্থাৎ যে মুসলিম শাসকের আনুগত্য স্বীকার করে। এরা উভয়ই শুফ'আর অধিকার লাভ করার ক্ষেত্রে সমান। কেননা, 'সবব' ও হেকমতের ক্ষেত্রে উভয়েই সমান। তাই বিধান তথা শুফ'আ লাভের ক্ষেত্রেও সমান হবে।

قَوْلُهُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ إِذَا كَانَ مَأْذُوْنًا أَوْ مُكَاتَبًا : স্বাধীন ব্যক্তি ও গোলাম, এরা উভয়ও শুফ'আর অধিকারের ক্ষেত্রে সমান। কেননা 'সবব' ও হেকমতের ক্ষেত্রে এরাও সমান। তবে গোলাম শুফ'আর অধিকার লাভ করে যদি সে মালিকের পক্ষ হতে ব্যবসা করার অনুমতিপ্রাপ্ত হয় কিংবা মালিকের সাথে অর্থের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করার চুক্তিতে আবদ্ধ [মুকাতাব] হয়। অন্যথায় গোলাম ব্যক্তি শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না। কেননা তখন গোলামের মালিকানায় কিছুই সাব্যস্ত হতে পারে না, সবকিছুর মালিকানা তার মনিবের হয়ে থাকে।

قَالَ : وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيْهِ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّهُ أَمْكَنَ مُرَاعَاةُ شَرْطِ الشَّرْعِ فِيْهِ، وَهُوَ التَّمَلُّكُ بِمِثْلِ مَا تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشْتَرِيْ صُوْرَةً أَوْ قِيْمَةً عَلٰى مَا مَرَّ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা লাভ হয় এমন কিছুর বিনিময়ে যা সম্পদ বলে গণ্য তাহলেই সে সম্পত্তিতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা [এরূপ হলেই] শরিয়তের [নির্ধারিত] শর্ত রক্ষা করা সম্ভব হয়। সে শর্ত হলো, ক্রেতা যে বস্তুর বিনিময়ে [সম্পত্তির] মালিকানা লাভ করেছে। অনুরূপ বস্তুর বিনিময়ে [শফী'র] মালিকানা লাভ করা, [অনুরূপ বস্তু হতে পারে] বাহ্যিক দিক থেকে কিংবা মূল্যমানের দিক থেকে– যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوَضٍ الخ : শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বাড়ি বা জমিতে নতুন মালিকের মালিকানা এমন বস্তুর বিনিময়ে অর্জিত হতে হবে যা শরিয়তে সম্পদ বলে গণ্য হয়। সুতরাং যদি কোনো বিনিময় ছাড়া কেউ জমি বা বাড়ির মালিকানা লাভ করে তাহলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। যেমন, 'হিবা' [দান], সদকা, অসিয়ত কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ জমির মালিকানা লাভ করলে সে জমিতে অন্য কেউ শুফ'আর দাবি করতে পারবে না। এটিই হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.) সহ অধিকাংশ ইমামগণের অভিমত। আর ইমাম মালেক (র.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েত অনুসারে তাঁর মতে সদকা ও 'হিবা'-র মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তিতেও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর অভিমতও তাই। তাঁদের মতে এক্ষেত্রে শফী' উক্ত জমির বাজার মূল্য পরিশোধ করে তা গ্রহণ করবে। –[দ্র. আল বিনায়াহ]

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ مُرَاعَاةُ شَرْطِ الشَّرْعِ الخ : উক্ত বিধানের দলিল হলো, শরিয়তে শুফ'আর অধিকারের ভিত্তিতে শফী' জমি গ্রহণ করার জন্য যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা রক্ষা করা কেবল তখনই সম্ভব যখন নতুন মালিক জমিটি এমন বস্তুর বিনিময়ে লাভ করে থাকে যা শরিয়তে সম্পদ বলে গণ্য। কেননা, শরিয়তে শুফ'আর ভিত্তিতে সম্পত্তি গ্রহণ করার জন্য যে শর্ত আরোপ করেছে তা হচ্ছে, নতুন মালিক যে বস্তুর বিনিময়ে জমিটি লাভ করেছে শফী'কে উক্ত বস্তুর অনুরূপ বস্তু পরিশোধ করে জমিটি গ্রহণ করতে হবে। আর এ শর্ত রক্ষা করা সম্ভব হবে কেবল নতুন মালিকের প্রদত্ত বিনিময়টি যদি শরিয়তসম্মত সম্পদ হয়ে থাকে তাহলে। শরিয়তসম্মত সম্পদ না হলে তা সম্ভব হবে না। যেমন– নতুন মালিক জমিটি লাভ করল বিবাহের মোহরানা কিংবা সমঝোতার ভিত্তিতে কিসাসের পরিবর্তে প্রদত্ত সম্পদ হিসেবে। এক্ষেত্রে উক্ত জমির বিনিময় বস্তু হচ্ছে, মহিলার সম্ভোগ-অঙ্গের সত্ত্ব কিংবা কিসাস। আর এ দু'টির কোনোটিই শফী'র পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে নতুন মালিক যদি জমিটির মালিক হয়ে থাকে 'হিবা' কিংবা সদকার মাধ্যমে তাহলে সেক্ষেত্রে জমিটির বিনিময় বস্তু কিছুই নেই। আর শরিয়তে বিনা বিনিময়ে শফী'র জন্য শুফ'আর অধিকার প্রদান করেনি। কাজেই শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে, নতুন মালিকের এমন বস্তুর বিনিময়ে জমিটির মালিকানা লাভ করা যা শরিয়তে সম্পদ বলে গণ্য হয়। যাতে শফী' নতুন মালিকের প্রদত্ত বস্তুর অনুরূপ বস্তু আদায় করে জমিটি লাভ করতে পারে।

তবে শফী' যে নতুন মালিকের আদায়কৃত বস্তুর অনুরূপ বস্তু আদায় করবে, এই 'অনুরূপ' হওয়াটা বাহ্যিকভাবেও হতে পারে আবার মূল্যমানের দিক থেকেও হতে পারে। যদি বস্তুটি 'সদৃশলভ্য' বস্তু (مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ) -এর অন্তর্ভুক্ত হয় [অর্থাৎ এমন বস্তু হয় যার অনুরূপ বস্তু সহজে নির্ণিত হয়। যেমন– এক মণ ধানের অনুরূপ এক মণ ধান] তাহলে শফী' উক্ত বস্তুর অনুরূপ বস্তু সমপরিমাণ পরিশোধ করে জমিটি গ্রহণ করবে।

আর যদি নতুন মালিকের আদায়কৃত বস্তুটি 'মূল্যনির্ভর বস্তু' (مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ) -এর অন্তর্ভুক্ত হয় [অর্থাৎ এমন বস্তু হয় যার হুবহু অনুরূপ বস্তু সহজে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না] তাহলে শফী' বাজারদর হিসেবে উক্ত বস্তুর মূল্য পরিশোধ করে জমিটি গ্রহণ করবে। যেমন, ক্রেতা তিনটি গরুর বিনিময়ে জমিটি ক্রয় করেছে। তাহলে, শফী' উক্ত তিনটি গরুর বাজারমূল্য পরিশোধ করে জমিটি নিবে। কেননা হুবহু ঐরূপ গরু নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

عَلٰى مَا مَرَّ "যার বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে"। এ কথা বলে মুসান্নিফ (র.) হিদায়ার মূল গ্রন্থের ৩৮২ নং পৃষ্ঠার শেষে فَصْلٌ فِيْمَا يُؤْخَذُ بِهِ الْمَشْفُوْعُ অনুচ্ছেদের অধীনে বর্ণিত আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেখানকার ইবারতটুকু নিম্নরূপ–

وَمَنِ اشْتَرٰى دَارًا بِعَرْضٍ أَخَذَهَا الشَّفِيْعُ بِقِيْمَتِهٖ لِأَنَّهٗ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمَكِيْلٍ أَوْ مَوْزُوْنٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهٖ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَهٰذَا لِأَنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ لِلشَّفِيْعِ وِلَايَةَ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمُشْتَرِيْ بِمِثْلِ مَا تَمَلَّكَهٗ فَيُرَاعٰى بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ كَمَا فِي الْإِتْلَافِ.

এর সারবস্তু আমরা উপরে উল্লেখ করেছি।

قَالَ : وَلَا شُفْعَةَ فِي الدَّارِ . الَّتِي يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا أَوْ يُخَالِعُ الْمَرْأَةُ بِهَا أَوْ يَسْتَأْجِرُ بِهَا دَارًا، أَوْ غَيْرَهَا أَوْ يُصَالِحُ بِهَا عَنْ دَمِ عَمْدٍ أَوْ يُعْتِقُ عَلَيْهَا عَبْدًا . لِأَنَّ الشُّفْعَةَ عِنْدَنَا إِنَّمَا تَجِبُ فِي مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِمَا بَيَّنَّا . وَهٰذِهِ الْأَعْوَاضُ لَيْسَتْ بِأَمْوَالٍ فَإِيجَابُ الشُّفْعَةِ فِيهَا، خِلَافُ الْمَشْرُوعِ وَقَلْبُ الْمَوْضُوعِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এমন বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না যে বাড়ির বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি বিবাহ করে কিংবা তার বিনিময়ে স্ত্রী [স্বামীর নিকট হতে] 'খুলা' [বিবাহ-বিচ্ছেদ] গ্রহণ করে অথবা তার বিনিময়ে অন্য একটি বাড়ি বা অন্য কিছু ভাড়া নেয় কিংবা তা প্রদান করে ইচ্ছাকৃত খুনের মুক্তিপণ হিসেবে সমঝোতা করে কিংবা এর বিনিময়ে গোলাম আজাদ করে দেয়। কেননা আমাদের মতে শুফ'আ সাব্যস্ত হয় কেবল সম্পদের বিপরীতে সম্পদ বিনিময় করা হলে সেক্ষেত্রে। তার কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর [উক্ত সুরতগুলো বাড়ির বিপরীতের] বিনিময়গুলো সম্পদ নয়। কাজেই এগুলোতে শুফ'আ সাব্যস্ত করা হলে তা হবে শরিয়ত নির্ধারিত ক্ষেত্রের পরিপন্থি এবং নির্ধারিত নিয়মের উল্টো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا شُفْعَةَ فِي الدَّارِ الَّتِي يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ আলোচ্য ইবারতে কয়েকটি সুরত বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। এ ইবারতের মাসআলাগুলো এর পূর্বের ইবারত (وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ الخ.) -এ বর্ণিত মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। সেখানে বলা হয়েছিল, যদি কেউ সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে এমন জিনিসের বিনিময়ে যা সম্পদ [মাল] বলে গণ্য তাহলেই কেবল শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। অতএব, যদি কেউ সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে এমন জিনিসের বিনিময়ে যা সম্পদ বলে গণ্য হয় না। তাহলে সেক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। এরই উপর ভিত্তি করে আলোচ্য ইবারতে কয়েকটি সুরত বর্ণিত হয়েছে যেগুলোতে সম্পত্তির মালিকানা লাভ হয় এমন জিনিসের বিনিময়ে যা সম্পদ [মাল] বলে গণ্য নয়, তাই তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

প্রথম সুরত হলো, اَلدَّارِ الَّتِي يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا - অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহে স্ত্রীর মোহরানা নির্ধারণ করে একটি বাড়ি বা জমি, ফলে স্ত্রী উক্ত বাড়ি বা জমির মালিকানা লাভ করে তাহলে উক্ত বাড়ি বা জমিতে কেউ শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না।

দ্বিতীয় সুরত হলো, أَوْ يُخَالِعُ الْمَرْأَةُ بِهَا - অর্থাৎ যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সাথে খুলা' করে [অর্থাৎ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের চুক্তি করে] এবং খুলা'-র শর্ত হিসেবে স্ত্রী স্বামীকে একটি বাড়ি প্রদান করে, ফলে স্বামী উক্ত বাড়িটির মালিকানা লাভ করে তাহলে সে বাড়িতে কেউ শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে না।

তৃতীয় সুরত হলো, أَوْ يَسْتَأْجِرُ بِهَا دَارًا أَوْ غَيْرَهَا অর্থাৎ কেউ যদি একটি বাড়ি কিংবা অন্য কোনো জিনিস যেমন দোকান, পুকুর ইত্যাদি ইজারা নেয়। আর এর বিনিময় হিসেবে মালিককে অন্য একটি [ছোট] বাড়ি বা জমি প্রদান করে [অর্থাৎ ইজারা গ্রহণকারী ভাড়া হিসেবে একটি বাড়ি বা জমি ইজারাদাতাকে দিয়ে দেয়] ফলে ইজারাদাতা এই বাড়িটি বা জমিটির মালিকানা লাভ করে তাহলে এই বাড়ি বা জমিতে কেউ শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না।

চতুর্থ সুরত হলো, أَوْ يُصَالِحُ بِهَا عَنْ دَمِ عَمْدٍ - অর্থাৎ, কোনো হত্যাকারীর উপর যদি কিসাস [হত্যার বিনিময়ে হত্যার শাস্তি] সাব্যস্ত হয়। অতঃপর সে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের সাথে এ মর্মে সমঝোতা করে নেয় যে, সে কিসাস গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে এবং বিনিময়ে সে তাদেরকে একটি বাড়ি প্রদান করবে। এরপর নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা সে বাড়িটির মালিকানা লাভ করে তাহলে এই বাড়িটিতে কেউ শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না।

পঞ্চম সুরত হলো, أَوْ يُعْتِقُ عَلَيْهَا عَبْدًا - অর্থাৎ যদি কোনো মনিব [গোলামের মালিক] তার গোলামের সাথে এ চুক্তি করে যে, সে গোলামকে আজাদ করে দিবে আর এর বিনিময়ে গোলাম তাকে একটি বাড়ি প্রদান করবে। অতঃপর মনিব সে বাড়িটির মালিকানা লাভ করে তাহলে এ বাড়িটিতে কেউ শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে না।

উল্লেখ্য, উপরে বর্ণিত সুরতগুলোতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার বিধান হানাফী ইমামগণের মতে। এছাড়া এটি ইমাম আহমাদ (র.) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধতম মত এবং হাসান বসরী, ইমাম শা'বী, আবূ ছাওর ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ ইমামগণের অভিমত।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ عِنْدَنَا إِنَّمَا تَجِبُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত সুরতগুলোতে আমাদের মত অনুসারে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার দলিল বর্ণনা করছেন। এর দলিল হলো, আমাদের মতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় কেবল مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ - অর্থাৎ "সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ" -এর চুক্তির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কেউ যদি জমি বা বাড়ির মালিকানা লাভ করে এমন জিনিসের বিনিময়ে যা শরিয়তে সম্পদ বলে গণ্য তাহলেই কেবল সেই জমি বা বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি বাড়ি বা জমির মালিকানা লাভ করে এমন জিনিসের বিনিময়ে যা শরিয়তে সম্পদ [মাল] বলে গণ্য হয় না তাহলে সে জমি বা বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না।

لِمَا بَيَّنَّا "শুধুমাত্র সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের চুক্তির ক্ষেত্রেই শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ তাই যা আমরা একটু পূর্বে উল্লেখ করেছি"– একথা বলে মুসান্নিফ (র.) দুই লাইন পূর্বের ইবারত لِأَنَّهُ أَمْكَنَ مُرَاعَاةُ شَرْطِ الشَّرْعِ فِيْهِ الخ. -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সে ইবারতের সারমর্ম হচ্ছে, শরিয়ত শুফ'আর অধিকার লাভের ক্ষেত্রে যে শর্ত নির্ধারণ করেছে তা রক্ষা করা সম্ভব হয় যদি 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ'-এর চুক্তি হয় সেক্ষেত্রে, অন্যথায় তা রক্ষা করা সম্ভব হয় ফলে শুফ'আর অধিকারও সাব্যস্ত হয় না। শরিয়ত আরোপিত উক্ত শর্ত হচ্ছে, تَمَلُّكَ الشَّفِيْعُ بِمِثْلِ مَا تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشْتَرِيْ - অর্থাৎ ক্রেতা জমি বা বাড়ির মালিকানা যে বস্তুর বিনিময়ে লাভ করেছে শফী' ঠিক সেই বস্তুরই অনুরূপ বস্তু দ্বারা জমি বা বাড়টি গ্রহণ করবে। ক্রেতা যদি শরিয়ত সম্মত কোনো সম্পদের বিনিময়ে জমিটি লাভ করে থাকে তাহলেই কেবল শফী'র পক্ষে উক্ত সম্পদের অনুরূপ সম্পদ দিয়ে জমিটি গ্রহণ করা সম্ভব। আর শরিয়ত সম্মত সম্পদ ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসের বিনিময়ে যদি কেউ জমির মালিকানা লাভ করে তাহলে শফী'র পক্ষে সে জিনিসের অনুরূপ জিনিস দেওয়া সম্ভব হবে না [এর বিবরণ পরবর্তী আলোচনায় আসছে]। সুতরাং শরিয়ত আরোপিত শর্ত রক্ষা না হওয়ার কারণে তাতে শুফ'আর অধিকারও সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ : وَهٰذِهِ الْأَعْوَاضُ لَيْسَتْ بِأَمْوَالٍ الخ : মূল ইবারতে যে পাঁচটি সুরত উল্লেখ করা হয়েছে তাতে জমি বা বাড়ির মালিকানা লাভকারীগণ যে জিনিসের বিনিময়ে তা লাভ করে তা শরিয়তে সম্পদ বলে গণ্য নয়। কাজেই তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত করা হলে তা উপরে বর্ণিত আলোচনার ভিত্তিতে শরিয়ত পরিপন্থি হবে এবং শরিয়ত নির্ধারিত ক্ষেত্রের মাঝে পরিবর্তন সাধন করা হবে। অতএব, উক্ত সুরতগুলোতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

প্রথম সুরত : اَلدَّارُ الَّتِيْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا স্ত্রী বাড়িটির মালিকানা লাভ করে তার সতীত্ব مَنَافِعُ الْبُضْعِ -এর বিনিময়ে। আর স্ত্রীর এ সতীত্ব শরিয়তে সম্পদ বলে গণ্য নয় এবং শফী'র পক্ষে অনুরূপ সতীত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব, তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।

দ্বিতীয় সুরত : أَوْ يُخَالِعُ الْمَرْأَةَ بِهَا স্বামী জমিটির মালিকানা লাভ করে স্ত্রীর উপর অধিকার ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে। এটিও কোনো সম্পদ নয় এবং শফী'র পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।

তৃতীয় সুরত : أَوْ يَسْتَأْجِرُ بِهَا دَارًا أَوْ غَيْرَهَا ইজারাদাতা জমি বা বাড়িটির মালিকানা লাভ করে তার নিজের বাড়ি বা দোকান ব্যবহারের সুযোগ দানের বিনিময়ে। আর এটিও কোনো সম্পদ বলে গণ্য নয়। কাজেই তাতে শুফ'আর অধিকার থাকবে না।

চতুর্থ সুরত : أَوْ يُصَالِحُ بِهَا عَنْ دَمٍ عَمْدٍ নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ বাড়িটির মালিকানা লাভ করে হত্যাকারীকে কিসাস হিসেবে হত্যা করার অধিকার ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে। আর এই অধিকার কোনো সম্পদ বলে গণ্য নয় এবং শফী'র পক্ষে অনুরূপ 'অধিকার ছেড়ে দেওয়া' সম্ভব নয়। অতএব, তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।

পঞ্চম সুরত : أَوْ يُعْتِقُ عَلَيْهَا عَبْدًا মনিব বাড়িটির মালিকানা লাভ করে গোলামের উপর থেকে দাসত্ব দূর করার বিনিময়ে। আর দাসত্ব দূর করা সম্পদ বলে গণ্য নয়। সুতরাং তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) تَجِبُ فِيْهَا الشُّفْعَةُ ـ لِأَنَّ هٰذِهِ الْأَعْوَاضَ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُ فَأَمْكَنَ الْأَخْذُ بِقِيْمَتِهَا، إِنْ تَعَذَّرَ بِمِثْلِهَا كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالْعَرْضِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ، لِأَنَّهُ لَا عِوَضَ فِيْهَا رَأْسًا، وَقَوْلُهُ يَتَأَتّٰى فِيْمَا إِذَا جَعَلَ شِقْصًا مِنْ دَارٍ مَهْرًا أَوْ مَا يُضَاهِيْهِ لِأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا فِيْهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এ সকল ক্ষেত্রে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা তাঁর মতে উক্ত বিনিময়গুলো মূল্যমানসম্পন্ন। কাজেই এগুলোর অনুরূপ জিনিস দেওয়া অসম্ভব হলেও এগুলোর [যথাযথ] মূল্য দিয়ে বাড়িটি নেওয়া সম্ভব হবে। যেমন [বিধান] আসবাবপত্রের বিনিময়ে [বাড়ি] বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে 'হিবা' [দান] এর বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা 'হিবা'-র ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো বিনিময় থাকে না। তবে [উল্লেখ্য যে,] ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের প্রয়োগক্ষেত্র কেবল তখনই হবে যখন বাড়ির [অবণ্টিত] কোনো অংশ [উল্লিখিত] বিবাহের মোহর বা অনুরূপ বিষয়গুলো হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। কারণ তাঁর মতে শরিকানাভুক্ত সম্পত্তি ব্যতীত শুফ'আ সাব্যস্ত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) تَجِبُ فِيْهَا الشُّفْعَةُ : এখান থেকে মূল ইবারতে বর্ণিত পাঁচটি সুরতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত বর্ণনা করছেন। তাঁর মতে উক্ত সূরতগুলোতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। এটি ইমাম মালেক, ইবনে শুবরুমা, ইবনে আবী লায়লা প্রমুখ ইমামগণেরও মত এবং ইবনে হামিদ-এর রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আহমাদ (র.)-এরও অভিমত তাই। -[দ্র. বিনায়াহ]

قَوْلُهُ لِأَنَّ هٰذِهِ الْأَعْوَاضَ مُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হচ্ছে, উক্ত পাঁচটি সুরতে জমি বা বাড়ির মালিকানা লাভকারীগণ যে সকল জিনিসের বিনিময়ে তা লাভ করে সেগুলো ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ঐরূপ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যার মূল্য ধার্য করা সম্ভব। অতএব, শফী' উক্ত জিনিসগুলো অনুরূপ জিনিস দিতে সক্ষম না হলেও সে ঐগুলোর মূল্য পরিশোধ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং সে ঐ সকল জিনিস [তথা স্ত্রীর সতীত্ব, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার পরিত্যাগ ইত্যাদি]-এর মূল্য পরিশোধ করে শফী' উক্ত সুরতগুলোতে জমি বা বাড়ির শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। কেননা শুফ'আর ক্ষেত্রে বিধানই হচ্ছে এরূপ যে, জমির মালিকানা লাভকারী যে জিনিসের বিনিময়ে তা লাভ করেছে যদি তার অনুরূপ জিনিস দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে শফী' অনুরূপ জিনিস দিয়ে সে জমি গ্রহণ করবে। আর যদি তার অনুরূপ বস্তু দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে তার যথাযথ মূল্য দিয়ে শফী' জমিটি গ্রহণ করবে। আর উক্ত সুরতগুলোতে বিনিময় বস্তু তথা স্ত্রীর সতীত্ব, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার পরিত্যাগ, দোকান বা বাড়ি ব্যবহারের সুযোগ লাভ ইত্যাদির যথাযথ মূল্য দেওয়া যেহেতু [ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে] সম্ভব সেহেতু শফী' সে মূল্য দিয়ে বাড়ি বা জমি লাভ করার অধিকার পাবে।

قَوْلُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالْعَرْضِ : যেমন- কেউ যদি কোনো আসবাবপত্রের বিনিময়ে জমি ক্রয় করে তাহলে যেহেতু আসবাবপত্র হুবহু একই রকম দেওয়া সম্ভব হয় না তাই তার মূল্য পরিশোধ করে শফী' সে জমি লাভ করতে পারে। অতএব, আলোচ্য সুরতগুলোতেও তদ্রূপ মালিকানা লাভকারীগণের প্রদত্ত জিনিসগুলোর অনুরূপ জিনিস দেওয়া সম্ভব হওয়ার কারণে সেগুলোর মূল্য পরিশোধ করে শফী' জমি বা বাড়ি লাভ করতে পারবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ لِأَنَّهُ لَا عِوَضَ فِيهَا رَأْسًا : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তবে কেউ যদি জমি বা বাড়ি কাউকে হেবা [দান] করে তাহলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা যাকে হেবা করা হয় সে জমিটির মালিকানা লাভ করে কোনো বিনিময় ছাড়া। ফলে বিনিময় বস্তুর অনুরূপ বস্তু কিংবা তার মূল্য দিয়ে শফী' জমি গ্রহণ করার কোনো সম্ভাবনা এখানে নেই। অতএব, এক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। অর্থাৎ হেবার সুরতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এবং আহনাফের অভিমত একই। কারো মতে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ يَتَأَتَّى فِيمَا إِذَا جَعَلَ شِقْصًا : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত পাঁচটি সুরতে যে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কার্যতঃ সাব্যস্ত হবে কেবল ঐ সুরতে যখন স্ত্রীকে মোহরানা হিসেবে কিংবা খুলা'র বিনিময় হিসেব বা ভাড়া হিসেবে অথবা কিসাসের বিনিময় হিসেবে কোন শরিকানা জমি বা বাড়ির কোনো অংশ প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে যদি জমি বা বাড়িটি শরিকানা না হয়; বরং সম্পূর্ণটি একই মালিকের হয় এবং সে তা উক্ত সুরতগুলো প্রদান করে তাহলে তাতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা তাঁর মতে শুফ'আ কেবল শরিকানা বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়। প্রতিবেশীত্ব কিংবা জমির সংশ্লিষ্ট জিনিসে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোনো শুফ'আর অধিকার নেই। অতএব, উক্ত পাঁচ সুরতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে যদি শরিকানা জমির কোনো অংশ যথাক্রমে স্ত্রীকে, স্বামীকে, ইজারাদাতাকে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদেরকে এবং মনিবকে প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.)-এর ইবারত مَهْرًا وَمَا يُضَاهِيهِ "মোহরানা কিংবা মোহরানার অনুরূপ জিনিসগুলো হিসেবে"– এখানে وَمَا يُضَاهِيهِ 'অনুরূপ জিনিসগুলো' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– অপর চারটি সুরতের জিনিসগুলো তথা দ্বিতীয় সুরতে بَدَلُ الْخُلْعِ 'খুলা'র বিনিময়'। তৃতীয় সুরতে أُجْرَةُ الدَّارِ 'বাড়ির ভাড়া' চতুর্থ সুরতে بَدَلُ الصُّلْحِ 'কিসাসের সমঝোতার বিনিময়' ও পঞ্চম সুরতে مَالُ الْعِتْقِ 'আজাদ করার বিনিময়'। অর্থাৎ এ সকল বিনিময় হিসেবে যখন শরিকানা জমি বা বাড়ির কোনো অংশ প্রদান করবে তখনই কেবল তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

وَنَحْنُ نَقُولُ إِنْ تَقَوُّمَ مَنَافِعُ الْبُضْعِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرُهَا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ضَرُورِيٌّ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ وَكَذَا الدَّمُ وَالْعِتْقُ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ لِأَنَّ الْقِيمَةَ مَا يَقُومُ مَقَامَ غَيْرِهِ فِي الْمَعْنَى الْخَاصِّ الْمَطْلُوبِ وَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِمَا وَعَلَى هٰذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ ثُمَّ فَرَضَ لَهَا الدَّارَ مَهْرًا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَفْرُوضِ فِي الْعَقْدِ فِي كَوْنِهِ مُقَابِلًا بِالْبُضْعِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِالْمُسَمّٰى لِأَنَّهُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ .

অনুবাদ : আমাদের বক্তব্য হলো, বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ-সম্ভোগের সুবিধা এবং ইজারার মাধ্যমে অন্যান্য বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার সুবিধাদি মূল্যমানসম্পন্ন ধরা হয় কেবল প্রয়োজনের তাগিদে। কাজেই এর কার্যকারিতা শুফ'আর ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না। তদ্রূপ খুন ও আজাদ করার বিষয়টিও কোনো মূল্যমানসম্পন্ন বস্তু নয়। কেননা মূল্য হলো যা অন্য একটি বস্তুর স্থলাভিষিক্ত হয়, বস্তুটি থেকে অর্জনীয় বিশেষ দিক বিবেচনায়। আর এটি উল্লিখিত দু'টির ক্ষেত্রে হয় না। ঠিক একই বিধান হবে যদি স্ত্রীকে মোহরানা ব্যতীত বিবাহ করে, তারপর আবার মোহরানা হিসেবে বাড়িটি প্রদান করে [অর্থাৎ এক্ষেত্রেও শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। কেননা স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বিনিময় হওয়ার ক্ষেত্রে এটিও বিবাহ-চুক্তির সময়ে নির্ধারিত মোহরানারই পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে যদি স্ত্রীর নিকট সঙ্গত মোহরানা (مَهْرِ مِثْل) কিংবা নির্ধারিত মোহরানার বিনিময়ে বাড়িটি বিক্রয় করে [অর্থাৎ তাহলে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে]। কেননা এটি হচ্ছে সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ আদান প্রদান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : وَنَحْنُ نَقُولُ إِنْ تَقَوُّمَ مَنَافِعُ الْبُضْعِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে, ইমাম শাফেয়ী (র.) যে বলেছেন, উক্ত পাঁচ সুরতে জমি বা বাড়ির মালিকানা লাভকারীগণ যে সকল জিনিসের বিনিময়ে তা লাভ করে শরিয়তে সেগুলোর মূল্য ধার্য হয় [যেমন, স্ত্রীর সতীত্বের মূল্য ধার্য হয় মোহরানার মাধ্যমে], তাঁর এ কথার জবাবে আমরা বলি, উক্ত পাঁচ সুরতের মধ্য হতে প্রথম তিন সুরতে বিনিময় জিনিসগুলো তথা স্ত্রীর সতীত্ব, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার ও বাড়ি বা দোকান ব্যবহারের সুযোগ– এগুলোর মূল্য শরিয়তে ধার্য হয় ঠিক, কিন্তু এই মূল্য ধার্য হওয়া এগুলোর স্বাভাবিক মূল্য (قِيْمَةٌ مُطْلَقَةٌ) হিসেবে নয়; বরং অনিবার্য প্রয়োজনের কারণে বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলোর মূল্য (قِيْمَةٌ ضَرُوْرِيَّةٌ) ধরা হয়। আর اَلضَّرُوْرَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ অর্থাৎ "অনিবার্য প্রয়োজনে যা ধরে নেওয়া হয় তা কেবল সেই প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে" এ মূলনীতির ভিত্তি উক্ত মূল্য ধার্য হওয়ার বিষয়টি কেবল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ তথা যথাক্রমে বিবাহ, খুলা' ও ইজারার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। শুফ'আর ক্ষেত্রে এই মূল্য ধার্য হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। কাজেই শুফ'আর ক্ষেত্রে উক্ত জিনিসগুলো [স্ত্রীর সতীত্ব, বাড়ি বা দোকান ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি] এমন জিনিসের অন্তর্ভুক্তই থেকে যাবে যার মূল্য ধার্য করা সম্ভব নয়। অতএব, শফী'র পক্ষে তা গ্রহণ করাও সম্ভব হবে না।

উল্লেখ্য, স্ত্রীর সতীত্ব (مَنَافِعُ الْبُضْعِ) -এর মূল্য ধার্য হওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ হলো, টাকা পয়সা বা ধন-সম্পদের সাথে স্ত্রীর সতীত্বের কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। কাজেই টাকা-পয়সা বা কোনো সম্পদ স্ত্রীর সতীত্বের মূল্য হতে পারে না। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে শরিয়ত এই সতীত্বের মূল্য হিসেবে মোহরানা ধার্য করেছে। সেই প্রয়োজন হলো, স্ত্রীর সতীত্বের মর্যাদা প্রকাশ করা। কাজেই এই বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে যে মূল্য ধরা হয়েছে তা শুফ'আর ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে না।

অনুরূপভাবে ইজারার ক্ষেত্রে বাড়ি বা দোকান ব্যবহার করার সুযোগ (مَنَافِعُ الدَّارِ وَالدُّكَّانِ)-এর যে ভাড়া হিসেবে মূল্য ধরা হয় তাও বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে করা হয়েছে। তা হচ্ছে, ইজারার চুক্তির প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা। নতুবা কোন জিনিসের সত্তাকে ঠিক রেখে তা ব্যবহার করে যে উপকার গ্রহণ করা হয় তা মূলত মাল বলে গণ্য নয়। কাজেই তার মূল্য ধার্য হওয়ার কথা নয়। এ কারণেই কেউ যদি কারো কোনো বস্তু গসব [আত্মসাৎ] করার পর তা ব্যবহার করে তা থেকে উপকার গ্রহণ করে তাহলে তার উপর কোনো জরিমানা সাব্যস্ত হয় না। কাজেই ইজারার ক্ষেত্রে ভাড়া হিসেবে দোকান বা বাড়ি ব্যবহার করার যে মূল্য ধরা হয় তা কেবল ইজারার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। শুফ'আর ক্ষেত্রে তা ধর্তব্য হবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا الدَّمُ وَالْعِتْقُ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ الخ : পাঁচটি সূরতের মধ্য হতে প্রথম তিনটি সুরতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট দু'টি সূরত তথা কিসাসের ক্ষেত্রে সমঝোতার ভিত্তিতে প্রদত্ত জমি এবং আজাদ করার বিনিময়ে প্রদত্ত জমির ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব এখানে দেওয়া হচ্ছে। এ দু'টি ক্ষেত্রে আমাদের জবাব আরো স্পষ্ট। তা হচ্ছে এই যে, কিসাস গ্রহণের অধিকার এবং গোলামকে আজাদ করা এ দু'টি এমন বিষয় কোনোভাবে যার মূল্য ধার্য হতে পারে না। অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদেও না। কেননা কিসাস গ্রহণ হচ্ছে শুধুমাত্র একটি অধিকার। এটি কোনো প্রকার সম্পদ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। তদ্রূপ গোলাম আজাদ করার অর্থ হচ্ছে দাসত্ব দূর করা বা দাসত্ব মুক্ত করা। এটিও কোনোভাবে সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। কাজেই এ দু'টি বিষয়ের মূল্য ধরা সম্ভব নয়। কেননা اَلْقِيمَةُ مَا يَقُومُ مَقَامَ غَيْرِهِ فِي الْمَعْنَى الْخَاصِّ الْمَطْلُوبِ অর্থাৎ "মূল্য বলা হয় এমন জিনিসকে যা বিশেষ দিক থেকে তথা সম্পদ হওয়ার দিক থেকে অন্য একটি জিনিসের স্থলাভিষিক্ত হয়।" কাজেই এক্ষেত্রে উভয় জিনিস [মূল্য ও যে জিনিসের মূল্য] সম্পদ হওয়া আবশ্যক। আর এই সম্পদ হওয়ার বিষয়টি কিসাস গ্রহণের অধিকার ও দাসত্ব মুক্তির মাঝে কোনোভাবে প্রযোজ্য হয় না। অতএব, এ দু'টি বিষয়ের মূল্য ধার্য হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এ দু'টি বিষয়ের বিনিময়ে যদি জমি বা বাড়ি দেওয়া হয় তা কেবল সমঝোতার কারণেই দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ দু'টির মূল্য হিসেবে নয়। সুতরাং সে জমি বা বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ الخ : এখান থেকে আরেকটি মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে। এতক্ষণ যে পাঁচটি সূরত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তন্মধ্যে প্রথম সুরত ছিল, যদি কেউ স্ত্রীর মোহরানা হিসেবে কোনো জমি বা বাড়ি নির্ধারণ করে তাহলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বলেন, ঠিক একইভাবে যদি কেউ বিবাহের সময় মোহরানার উল্লেখ করা ছাড়াই বিবাহ করে এবং পরবর্তীতে স্ত্রীর মোহরানা হিসেবে একটি বাড়ি ধার্য করে তাহলে সেক্ষেত্রে একই বিধান হবে, অর্থাৎ সে বাড়িতেও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা পরবর্তীতে ধার্য করলে তাও স্ত্রীর সতীত্বের বিনিময়েই ধার্য করা হয়। ফলে বিবাহের সময় ধার্য করলে যে কারণে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না সে কারণ এক্ষেত্রেও বিদ্যমান। তা হচ্ছে, এই বাড়িটির মালিকানা লাভ হচ্ছে এমন জিনিসের বিনিময়ে যা সম্পদ বলে গণ্য নয় তথা স্ত্রীর সতীত্বের বিনিময়ে। কাজেই এক্ষেত্রেও শুফ'আর অধিকার থাকবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِالْمُسَمّٰى : পক্ষান্তরে কারো উপর যদি مَهْرِ مِثْل [স্ত্রীর স্বগোত্রীয় সমমানের মহিলাদের মোহরানার সমপরিমাণ মোহরানা] প্রদান করা সাব্যস্ত হয়, অতঃপর স্বামী সে 'মোহরে মিছিল' এর বিনিময়ে স্ত্রীর নিকট একটি বাড়ি বা জমি বিক্রয় করে তাহলে সে বাড়ি বা জমিতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ বিবাহের সময় স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরানা ধার্য করে। অতঃপর সেই নির্দিষ্ট মোহরানার বিনিময়ে স্ত্রীর নিকট একটি বাড়ি বা জমি বিক্রয় করে তাহলে সে বাড়ি বা জমিতেও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। কেননা এ দু'টি সুরতে স্বামী স্ত্রীকে যে বাড়ি বা জমিটি প্রদান করছে সেটি সরাসরি স্ত্রীর সতীত্বের বিনিময়ে নয়; বরং প্রথম সূরতে 'মোহরে মিছিল' ও দ্বিতীয় সূরতে নির্ধারিত মোহরানার বিনিময়ে সে স্ত্রীর কাছে বাড়িটি বিক্রয় করেছে। আর 'মোহরে মিছিল' ও নির্ধারিত মোহরানা এ উভয়টিই সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। ফলে এই দুই ক্ষেত্রে স্ত্রী উক্ত জমি বা বাড়ির মালিকানা লাভ করছে সম্পদের বিনিময়ে। অতএব, এটি مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ তথা 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ' লাভ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সম্পদের বিনিময়ে জমি বা বাড়ির মালিকানা লাভ করলে সে জমি বা বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়। কাজেই এই দুই সুরতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى دَارٍ عَلٰى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفًا فَلَا شُفْعَةَ فِيْ جَمِيْعِ الدَّارِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا تَجِبُ فِيْ حِصَّةِ الْأَلْفِ، لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ مَالِيَّةٌ فِيْ حَقِّهِ . وَهُوَ يَقُوْلُ مَعْنَى الْبَيْعِ فِيْهِ تَابِعٌ، وَلِهٰذَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَلَا يَفْسُدُ بِشَرْطِ النِّكَاحِ فِيْهِ، وَلَا شُفْعَةَ فِي الْأَصْلِ فَكَذَا فِي التَّبَعِ . وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ شُرِعَتْ فِي الْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَقْصُوْدَةِ حَتّٰى أَنَّ الْمُضَارِبَ إِذَا بَاعَ دَارًا وَفِيْهَا رِبْحٌ لَا يَسْتَحِقُّ رَبُّ الْمَالِ الشُّفْعَةَ فِيْ حِصَّةِ الرِّبْحِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا فِيْهِ .

অনুবাদ : আর যদি স্ত্রীকে বাড়ির বিনিময়ে এই শর্তে বিবাহ করে যে, স্ত্রী স্বামীকে এক হাজার দিরহাম ফেরত দিবে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সম্পূর্ণ বাড়িতেই শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, উক্ত এক হাজার দিরহামের অংশে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা সে অংশে এটি সম্পদের বিপরীতে সম্পদের বিনিময়ই হয়েছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য হচ্ছে, এ বিনিময়করণে ক্রয় বিক্রয়ের অর্থ উপস্থিত হয়েছে বিবাহ চুক্তির অনুগামী হয়ে। এ কারণেই তো এই বিনিময়করণ বিবাহের শব্দ দ্বারা [যেমন– এর বিনিময়ে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম' এভাবে বলার দ্বারা] সম্পাদিত হয়ে যায়। আবার এই বিনিময়করণ চুক্তিতে বিবাহ বন্ধনকে শর্ত করলে বিনিময়করণ বাতিল হয় না। আর [যেহেতু] মূল ক্ষেত্রে [তথা বিবাহ চুক্তিতে] শুফ'আ সাব্যস্ত হয় না, কাজেই তার অনুগামী বিষয়েও তাই হবে [শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না]। তাছাড়া এ কারণে যে, শুফ'আর অধিকার শরিয়তে প্রবর্তিত হয়েছে যেখানে মূল লক্ষ্য হয় সম্পদের বিপরীতে সম্পদের বিনিময়করণ। এ জন্যই 'মুদারিব' যদি একটি বাড়ি বিক্রয় করে এবং বাড়িটিতে লভ্যাংশও ছিল তাহলে 'রাব্বুল মাল' বাড়িটির লাভের অংশের ক্ষেত্রেও শুফ'আর অধিকার লাভ করে না। কেননা লভ্যাংশ হচ্ছে মূল পুঁজির অনুগামী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى دَارٍ عَلٰى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفًا : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আরেকটি মাসআলা বর্ণনা করছেন। এ মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাবসূত গ্রন্থ হতে সংগৃহীত। যেহেতু উপরে [মতনে] ইমাম কুদূরী (র.) বর্ণিত মোহরানা সম্পর্কিত মাসআলার সাথে এ মাসআলাটি সম্পর্কযুক্ত তাই এটিকে মুসান্নিফ (র.) এখানে উল্লেখ করেছেন। মাসআলাটি হচ্ছে, কেউ যদি বিবাহে মোহরানা স্বরূপ একটি বাড়ি ধার্য করে এবং এ শর্ত আরোপ করে যে, স্ত্রী তাকে [বাড়ি বাবদ] এক হাজার দিরহাম ফেরত দিবে [অর্থাৎ বাড়িটির কতেক অংশ স্ত্রী লাভ করবে তার মোহারানা বাবদ আর কতেক অংশ লাভ করবে উক্ত এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে] তাহলে উক্ত বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে কিনা এ সম্পর্কে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বাড়ির কোনো অংশেই শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে স্ত্রী উক্ত এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বাড়ির যতটুকু অংশের মালিকানা লাভ করবে ততটুকু অংশে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। আর যতটুকু অংশ তার মোহরানা স্বরূপ লাভ করবে ততটুকুতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বাড়ির কতটুকু অংশ লাভ করল তা নির্ধারণ করা হবে এভাবে যে, স্ত্রীর 'মোহরে মিছিল' (مَهْر مِثْل) এবং উক্ত এক হাজার দিরহামের মাঝে বাড়িটি বণ্টন করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি স্ত্রীর 'মোহরে মিছিল' দুই হাজার দিরহাম হয় তাহলে 'মোহরে মিছিল'এর দুই হাজার এবং উক্ত এক হাজার এই মোট তিন হাজারের উপর বাড়িটি তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগে উক্ত এক হাজারের বিনিময় ধরা হবে। ফলে বাড়িটির এক তৃতীয়াংশের মাঝে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। -[দ্র. বিনায়াহ ও ইনায়াহ][১]

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ مَالِيَّةٌ فِيْ حَقِّهِ الخ : উক্ত মাসআলায় সাহেবাইনের দলিল হলো, যে অংশটুকু স্ত্রী উক্ত এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে লাভ করছে সে অংশটুকুতে مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ' এর চুক্তি হয়েছে। কেননা এই অংশটুকু স্ত্রী লাভ করছে উক্ত এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে যা সম্পদ বলে গণ্য। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি সম্পদের বিনিময়ে জমি বা বাড়ির মালিকানা লাভ করে তাহলে সেই জমি বা বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। কাজেই যতটুকু সে মোহরানা হিসেবে লাভ করেছে ততটুকুতে শুফ'আ সাব্যস্ত না হলেও এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে যতটুকুর মালিকানা লাভ করেছে ততটুকুতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مَعْنَى الْبَيْعِ فِيْهِ تَابِعٌ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল উল্লেখ করছেন। তাঁর দলিল হচ্ছে, উক্ত সুরতে স্ত্রী যে এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করে সে অংশে যদিও সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ বা বিক্রয়ের বিষয়টি বিদ্যমান কিন্তু এই বিক্রয়ের বিষয়টি এখানে মূল চুক্তি তথা বিবাহের মোহরানা চুক্তির অনুগামী (تَابِعٌ)। কেননা এখানে মূল উদ্দেশ্য ক্রয় বিক্রয় নয়; বরং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহ ও তার মোহরানা প্রদান।

এখানে যে ক্রয় বিক্রয়ের বিষয়টি [তথা এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বাড়ির একটি অংশ আদান প্রদান] বিবাহ চুক্তির অনুগামী তার প্রমাণ হচ্ছে, প্রথমত এখানে বিবাহ (نِكَاحٌ) -এর শব্দ দ্বারাই উক্ত ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী যখন বলেছে অমুক বাড়িটির মোহরানা ধার্য করে এই শর্তে আমি বিবাহ করলাম যে, স্ত্রী আমাকে এক হাজার দিরহাম ফেরত দিবে তখন তার এই কথার মাধ্যমেই উক্ত সুরতে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি ধরা হয়েছে। আলাদাভাবে তাকে একথা বলতে হয়নি যে, উক্ত এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বাড়ির যতটুকু অংশ হয় ততটুকু আমি বিক্রয় করলাম। মোটকথা এখানে বিবাহের শব্দ দ্বারাই উক্ত বিক্রয় সম্পাদিত হয়েছে। অথচ সাধারণ নিয়ম হলো, ক্রয় বিক্রয় চুক্তি বিবাহের শব্দ দ্বারা সহীহ হয় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখানে ক্রয় বিক্রয়ের বিষয়টি বিবাহ চুক্তির অনুগামী (تَابِعٌ)। দ্বিতীয়ত সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, কেউ যদি বিক্রয় চুক্তির সাথে বিবাহের শর্ত যুক্ত করে [যেমন- সে বলল, আমি তোমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে, তুমি আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে] তাহলে উক্ত বিক্রয় চুক্তি ফাসেদ হয়ে যায়। অথচ আলোচ্য সুরতে উক্ত বিক্রয়ের বিষয়টি বিবাহের শর্তেই সম্পাদিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিক্রয়ের বিষয়টি বাতিল হয়নি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখানে বিক্রয়ের বিষয়টি মূল নয়; বরং তা বিবাহ চুক্তির অনুগামী (تَابِعٌ)।

অতএব, যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, এখানে মূল বিষয় হচ্ছে বিবাহ চুক্তি আর বিক্রয়ের বিষয়টি বিবাহ চুক্তির অনুগামী (تَابِعٌ) তখন [ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর] বক্তব্য হচ্ছে, মূল চুক্তি তথা বিবাহের মোহরানার ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না [যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে] সুতরাং তার অনুগামী (تَابِعٌ)-এর ক্ষেত্রেও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা মূল বিষয়ের যে বিধান হয় তার অনুগামী (تَابِعٌ) -এরও তাই বিধান হয়।

---

১. উল্লেখ্য, মিশরের হানাফী মুফতী শায়েখ আব্দুল কাদির রাফেয়ী -এর تَقْرِيْرَات رَافِعِيْ [যা বর্তমানে ফতুয়ায়ে শামী গ্রন্থের সাথে ছাপা হয়েছে তাতে.] উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তিনটি অভিমত বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে তাঁর সর্বশেষ মতটি হচ্ছে সাহেবাইনের মতের অনুরূপ। নিম্নে تَقْرِيْرَات رَافِعِيْ -এর ইবারতটুকু তুলে ধরা হলো-

قَالَ عَبْدُ الْحَلِيْمِ كَانَ اَبُوْ حَفْصٍ الْكَبِيْرُ يَقُوْلُ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ يَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيْهِمَا ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ لَا يَجِبُ فِيْهِمَا ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ لِكُلٍّ قِسْطٍ حُكْمُ نَفْسِهِ كَمَا فِيْ مَبْسُوْطِ خَواهِرْزَادَه وَالْحَقَائِقِ. وَأَنْتَ خَبِيْرٌ بِأَنَّ هٰذَا تَرْجِيْحٌ لِقَوْلِهِمَا لِأَنَّهُ مَرْجُوْعٌ إِلَيْهِ مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ كَمَا لَا يَخْفٰى.

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ شُرِعَتْ فِى الْمُبَادَلَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَقْصُوْدَةِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে আরেকটি দলিল বর্ণনা করছেন। এ দলিলটির মূল কথা পূর্বের দলিলটিরই অনুরূপ। তবে এটিকে পৃথকরূপে বর্ণনা করে সম্ভাব্য এ দাবিকে খণ্ডন করছেন যে, শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তো কেবল 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের চুক্তি' হওয়াই যথেষ্ট। চাই তা মূল চুক্তি হোক কিংবা অনুগামী চুক্তি হোক। সম্ভাব্য এরূপ দাবিকে খণ্ডন করে মুসান্নিফ (র.) বলেন, শরিয়তে শুফ'আর অধিকার দেওয়া হয়েছে কেবল সেক্ষেত্রে, যেখানে "সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের চুক্তি" মূল উদ্দেশ্যরূপে সম্পাদিত হয়। পক্ষান্তরে যেখানে 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের চুক্তি' মূল উদ্দেশ্যরূপে সম্পাদিত না হয় সেখানে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না।

قَوْلُهُ حَتّٰى أَنَّ الْمُضَارِبَ إِذَا بَاعَ الخ : আমাদের উক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে– যদি মুদারিব [যে অন্যের মূলধন নিয়ে লভ্যাংশের ভিত্তিতে ব্যবসা করে] পুঁজিদাতার পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করার পর যখন তাতে লাভের টাকা মিশ্রিত হয় এবং সে টাকা দিয়ে বাড়ি বা জমি ক্রয় করার পর তা বিক্রয় করে তাহলে সে বাড়ি বা জমিটি যদি পুঁজিদাতা (رَبُّ الْمَالِ)-এর জমির সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে পুঁজিদাতা সে জমি বা বাড়িতে শুফ'আ দাবি করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ পুঁজিদাতা মুদারিবকে এক হাজার টাকা অর্ধা-অর্ধি লভ্যাংশের ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্য দিল। অতঃপর মুদারিব ব্যবসা করে এক হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করল এবং এই দুই হাজার টাকা দিয়ে পুঁজিদাতার জমির পাশে একটি জমি ক্রয় করল। তারপর মুদারিব দুই হাজার টাকায় জমিটি অন্য একজন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে ফেলল। এক্ষেত্রে বিধান হলো, পুঁজিদাতা উক্ত জমিটির কোনো অংশেই শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে না। অথচ নিয়ম অনুসারে উক্ত জমিতে লভ্যাংশের মধ্য হতে মুদারিবের পাঁচশত টাকার যে ভাগ রয়েছে তথা উক্ত জমির এক চতুর্থাংশে পুঁজিদাতার শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার কথা। কেননা উক্ত দুই হাজার টাকা হতে পনেরো শত টাকার মালিক হচ্ছে পুঁজিদাতা আর লভ্যাংশের ভাগ হিসেবে পাঁচশত টাকার মালিক হচ্ছে মুদারিব। সুতরাং পুঁজিদাতা পনেরো শত টাকার মালিক হিসেবে উক্ত জমির তিন চতুর্থাংশে শুফ'আ দাবি করতে পারবে না এ কারণে যে, এটি মূলত তারই জমি মুদারিব তার পক্ষ হতে উকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে বিক্রয় করছে। আর অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ যেহেতু মুদারিবের অংশ সেহেতু তাতে পুঁজিদাতার শুফ'আর অধিকার থাকার কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। এর কারণ হচ্ছে, এখানে মুদারিবের লভ্যাংশ মূল পুঁজির অনুগামী (تَابِعٌ)। তাই তার সে অংশের বিক্রয় পুঁজিদাতার অংশের অনুগামী হয়েই সম্পাদিত হয়েছে। তাই তাতে [সকলের ঐকমত্যে] শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শরিয়তে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় কেবল যখন 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের চুক্তি' মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সম্পাদিত হয়। আর যখন তা অনুগামী হয়ে সম্পাদিত হয় তখন তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং আমাদের মূল আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রী-প্রদত্ত উক্ত এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বাড়ির যতটুকু অংশ আসে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা তা বিবাহচুক্তি তথা মোহরানার অনুগামী (تَابِعٌ) হয়ে সম্পাদিত হয়েছে।

قَالَ : أَوْ يُصَالِحُ عَلَيْهَا بِإِنْكَارٍ فَإِنْ صَالَحَ عَلَيْهَا بِإِقْرَارٍ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰكَذَا ذُكِرَ فِيْ أَكْثَرِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ وَالصَّحِيْحُ أَوْ يُصَالِحُ عَنْهَا بِإِنْكَارٍ مَكَانَ قَوْلِهِ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ إِذَا صَالَحَ عَنْهَا بِإِنْكَارٍ بَقِيَ الدَّارُ فِيْ يَدِهِ فَهُوَ يَزْعَمُ أَنَّهَا لَمْ تَزِلْ عَنْ مِلْكِهِ، وَكَذَا إِذَا صَالَحَ عَنْهَا بِسُكُوْتٍ ـ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَذَلَ الْمَالَ اِفْتِدَاءً لِيَمِيْنِهِ وَقَطْعًا لِشَغْبِ خَصْمِهِ، كَمَا إِذَا أَنْكَرَ صَرِيْحًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَنْهَا بِإِقْرَارٍ، لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِيْ وَإِنَّمَا اسْتَفَادَهُ بِالصُّلْحِ، فَكَانَ مُبَادَلَةً مَالِيَّةً ـ أَمَّا إِذَا صَالَحَ عَلَيْهَا بِإِقْرَارٍ أَوْ سُكُوْتٍ أَوْ إِنْكَارٍ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ، لِأَنَّهُ أَخَذَهَا عِوَضًا عَنْ حَقِّهِ فِيْ زَعْمِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ فَيُعَامَلُ بِزَعْمِهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ... কিংবা যদি অস্বীকারপূর্বক বাড়িটির উপর [বিপক্ষের সাথে] সমঝোতা করে [তাহলেও তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না]। আর যদি [বিপক্ষের দাবি] স্বীকারপূর্বক সমঝোতা করে নেয় তাহলে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, 'মুখতাসারুল কুদূরী' গ্রন্থের অধিকাংশ অনুলিপিতে এভাবেই أَوْ يُصَالِحُ عَلَيْهَا ["বাড়িটির উপর"] কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সঠিক হলো, এখানে "عَلَيْهَا" -এর স্থলে أَوْ يُصَالِحُ عَنْهَا بِإِنْكَارٍ "যদি দাবি অস্বীকারপূর্বক বাড়িটির পরিবর্তে [অন্য কিছু দিয়ে] সমঝোতা করে" কথাটি হবে। কেননা যখন সমঝোতাকারী [বিপক্ষের দাবি] অস্বীকারপূর্বক দাবিকৃত বাড়িটির পরিবর্তে [অন্য কিছু দিয়ে] সমঝোতা করে তখন বাড়িটি তার হাতেই বহাল থেকে যায় এবং তার ধারণা অনুসারে বাড়িটি ইতোপূর্বে তার মালিকানা বহির্ভূত হয়নি। তদ্রূপ সে যদি [বিপক্ষের দাবির ব্যাপারে] নীরবতা পালন করে বাড়িটির পরিবর্তে [অন্য কিছু দিয়ে] সমঝোতা করে [সেক্ষেত্রেও একই কথা]। কেননা, হতে পারে যে, সে [বিপক্ষকে] সম্পদ দিয়েছে [বিচারকের নিকট] 'হলফ' করা থেকে বাঁচার জন্য এবং বিপক্ষের মামলার ঝাক্কি-ঝামেলা বন্ধ করার জন্য। যেমনটি হয়েছে স্পষ্টরূপে অস্বীকার [করা সত্ত্বেও সমঝোতা] করার সুরতে। পক্ষান্তরে [বিপক্ষের দাবি] স্বীকারপূর্বক যদি [কোনো কিছু দিয়ে] সমঝোতা করে তাহলে বিধান হবে, এর ব্যতিক্রম। কেননা বিবাদী এক্ষেত্রে বাদীর মালিকানা স্বীকার করছে, কিন্তু বাড়িটি সে লাভ করছে কেবল [অন্য কিছুর বিনিময়ে] সমঝোতার মাধ্যমে। কাজেই তা 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ' আদান-প্রদান হলো। আর ["বাড়ির উপর" সমঝোতার যে বিষয়টি সেক্ষেত্রে বিধান হলো,] যদি বাড়ির উপর সমঝোতা করে [অর্থাৎ, দাবিকৃত বস্তুর পরিবর্তে একটি বাড়ি প্রদান করে যদি সমঝোতা করে] তা স্বীকারপূর্বক হোক বা নীরবতা পালন করে হোক কিংবা অস্বীকারপূর্বক হোক সর্বাবস্থাতেই শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা বাদী এই বাড়িটি লাভ করেছে তার ধারণা অনুসারে স্বীয় হকের বিনিময়ে, যদি এই লব্ধ বাড়িটি তার দাবিকৃত হকের অংশবিশেষ না হয়ে থাকে। সুতরাং তার ধারণা অনুসারেই তার সাথে আচরণ করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : اَوْ يُصَالِحُ عَلَيْهَا بِاِنْكَارٍ الخ : 'মতন'-এর এ ইবারতটুকু পূর্বের 'মতন'-এর সাথে সম্পর্কিত (عَطْف)। যে সকল সুরতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না তন্মধ্য হতে পাঁচটি সুরতের আলোচনা পূর্বের ইবারতে করা হয়েছিল। এখানে আরো কয়েকটি সুরতের আলোচনা করা হচ্ছে–

ভূমিকা : মূল আলোচনা বুঝার পূর্বে দু'টি বিষয় জানা থাকা আবশ্যক–

প্রথম বিষয়টি হলো, যদি কারো দখলে থাকা একটি বাড়ির উপর অন্য এক ব্যক্তি মালিকানা দাবি করে এবং এ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়, তারপর বিবাদী তথা যার দখলে বাড়িটি বর্তমানে রয়েছে সে বাদী [যে মালিকানা দাবি করছে]-এর সাথে এই সমঝোতায় উপনীত হয় যে, বিবাদী বাড়িটি তার দখলে রেখে দিবে আর বাদীকে সে অন্য একটি বাড়ি প্রদান করবে। তাহলে যে বাড়িটি বিবাদী রেখে দিল এটিকে আরবিতে বলা হবে مُصَالِحٌ عَنْهَا অর্থাৎ "যাকে কেন্দ্র করে সমঝোতা করা হয়েছে" আর এই বাড়িটির পরিবর্তে বাদীকে সে যে বাড়িটি প্রদান করবে সেটিকে বলা হবে مُصَالِحٌ عَلَيْهَا অর্থাৎ "যার উপর সমঝোতা করা হয়েছে।"

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, উক্ত সমঝোতার তিনটি সুরত হতে পারে–

১. اَلصُّلْحُ عَنْ اِنْكَارٍ অর্থাৎ বিবাদী তার দখলে থাকা বাড়িটির উপর বাদীর মালিকানার দাবি অস্বীকার করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মামলা-মকদ্দমার ঝামেলা এড়ানোর জন্য বাদীর সাথে আরেকটি বাড়ি বা টাকা-পয়সা দেওয়ার শর্তে একটি সমঝোতা করে নিল।
২. اَلصُّلْحُ عَنْ سُكُوْتٍ অর্থাৎ বিবাদী বাদীর মালিকানার দাবিকে স্বীকারও করেনি এবং অস্বীকারও করেনি; বরং সে নীরবতা পালন করে বাদীর সাথে অন্য একটি বাড়ি প্রদানের শর্তে সমঝোতা করে নিল।
৩. اَلصُّلْحُ عَنْ اِقْرَارٍ অর্থাৎ বিবাদী তার দখলে থাকা বাড়িটির উপর বাদীর মালিকানার দাবি স্বীকার করে নিল। তারপর সে বাদীর সাথে এ সমঝোতায় উপনীত হলো যে, এ বাড়িটি সে রেখে দিবে এর পরিবর্তে বাদীকে অন্য একটি বাড়ি প্রদান করবে।

উক্ত তিন সুরতের মধ্য হতে প্রথম দুই সুরতে বিবাদী যে বাড়িটি রেখে দিয়েছে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। কেননা প্রথম সুরতে তো সে বাদীর মালিকানার দাবি অস্বীকার করেছে। কাজেই তার ধারণা অনুসারে বাড়িটি তারই ছিল বর্তমানেও আছে। এটি সে তার দেওয়া বাড়ির বিনিময়ে লাভ করেনি। আর দ্বিতীয় সুরতে যেহেতু সে নীরবতা অবলম্বন করেছে সেহেতু এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে বাদীকে অপর বাড়িটি দিয়েছে কেবল এই জন্য যে, বিচারকের নিকট গিয়ে যাতে 'হলফ' করতে না হয় এবং মামলার ঝাক্কি-ঝামেলা পোহাতে না হয়। কাজেই এক্ষেত্রেও সে তার দখলে থাকা বাড়িটি অন্য বাড়িটির বিনিময়ে লাভ করেনি। সুতরাং তাতে কেউ শুফ'আর দাবি করতে পারবে না।

আর তৃতীয় সুরতে বিবাদীর রেখে দেওয়া বাড়িটিতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। কেননা এ সুরতে সে বাদীর মালিকানার দাবি স্বীকার করেছে। কাজেই তার বক্তব্য অনুসারে সে বাদীর কাছ থেকে এ বাড়িটির মালিকানা লাভ করেছে অপর একটি বাড়ির বিনিময়ে। অতএব, তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

এ তো হলো বিবাদীর দখলে থাকা বাড়িটির বিধান। অপর দিকে বাদী সমঝোতার ভিত্তিতে বিবাদীর নিকট হতে যে বাড়িটি লাভ করল সে বাড়িটিতে উক্ত তিন সুরতেই শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। কেননা উক্ত তিন সুরতেই বাদী তার দাবি অনুসারে এ বাড়িটির মালিকানা লাভ করেছে তার নিজের বাড়ি বিবাদীকে দিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে। কাজেই তার দিক থেকে তিন সুরতেই এটি 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের মালিকানা লাভ'-এর অন্তর্ভুক্ত। আর পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের মালিকানা লাভ করলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়।

আমাদের আলোচ্য ইবারতের সারকথা এখানে আলোচনা করা হলো। এতে মুসান্নিফ (র.)-এর ইবারত বুঝতে সহায়ক হবে।

قَوْلُهُ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰكَذَا ذُكِرَ فِيْ أَكْثَرِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ الخ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) 'মতন' তথা মূল ইবারতে একটি ভুলের কথা উল্লেখ করে তার সংশোধনী উল্লেখ করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'মতন'-এ 'মুখতাসারুল কুদূরী' গ্রন্থ হতে যে ইবারতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে তথা أَوْ يُصَالِحُ عَلَيْهَا بِإِنْكَارٍ الخ. এ ইবারতটুকু 'মুখতাসারুল কুদূরী' গ্রন্থের অধিকাংশ অনুলিপিতে ঠিক এভাবেই অর্থাৎ أَوْ يُصَالِحُ -এর পরে عَلَيْهَا শব্দ সহকারে উল্লেখ আছে। কিন্তু এটি সঠিক নয়; বরং সঠিক হলো, عَلَيْهَا -এর স্থলে عَنْهَا হবে। এমনিভাবে فَإِنْ صَالَحَ عَلَيْهَا -এর স্থলেও فَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا হবে। এর কারণ হচ্ছে, ভূমিকায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, যদি কারো দখলে থাকা বাড়িতে অন্য কেউ মালিকানা দাবি করে তারপর যার দখলে বাড়িটি আছে [তথা বিবাদী] ও যে মালিকানা দাবি করছে [তথা বাদী] উভয়ে এ মর্মে সমঝোতা করে নেয় যে, এ বাড়িটি বিবাদীর নিকটই থাকবে আর বিবাদী বাদীকে অন্য একটি বাড়ি প্রদান করবে তাহলে বিবাদীর নিকট যে বাড়িটি থাকল সেটিকে বলা হয় مُصَالِحٌ عَنْهَا আর বাদীকে যে বাড়িটি দেওয়ার সমঝোতা হয়েছে সেটিকে বলা হয় مُصَالِحٌ عَلَيْهَا । এরপর ভূমিকায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, বাদীকে যে বাড়িটি প্রদান করা হয় সেটিতে তথা مُصَالِحٌ عَلَيْهَا -তে সর্বাবস্থায় শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। আর مُصَالِحٌ عَنْهَا তথা যে বাড়িটি বিবাদীর নিকট থেকে যায় সেটিতে দুই সুরতে [তথা অস্বীকার ও নীরবতা অবলম্বনের সুরতে] শুফ'আ সাব্যস্ত হয় না। আর এক সুরতে [স্বীকার করে নেওয়ার সুরতে] শুফ'আ সাব্যস্ত হয়।

সুতরাং 'মতন' -এর ইবারতে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, অস্বীকারপূর্বক সমঝোতা করা হলে সে বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। আর যদি [বাদীর মালিকানার দাবি] স্বীকার করে নিয়ে সমঝোতা করে তাহলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল এখানে যে বাড়ির কথা বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে مُصَالِحٌ عَنْهَا তথা বিবাদীর রেখে দেওয়া বাড়ি। কাজেই মতনের ইবারত এভাবে হবে- أَوْ يُصَالِحُ عَنْهَا আর পরের অংশটুকু হবে فَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا অর্থাৎ উভয় স্থলে عَلَيْهَا -এর পরিবর্তে عَنْهَا হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِذَا صَالَحَ عَنْهَا بِإِنْكَارٍ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত ইবারতের ভুল সংশোধনের পর 'মতন'-এ উল্লিখিত দুটি সুরতের প্রথম সুরতের দলিল বর্ণনা করছেন। প্রথম সুরতটি ছিল, যদি বিবাদীর দখলে থাকা বাড়িতে বাদী এসে মালিকানা দাবি করে আর বিবাদী তার দাবি অস্বীকার করে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বাদীর সাথে সমঝোতা করে বাদীকে অপর একটি বাড়ি দিয়ে দেয়। তাহলে বিবাদীর দখলে থাকা সেই বাড়িতে কেউ শুফ'আর দাবি করতে পারবে না। এ মাসআলার তিনটি সুরতেরই দলিলের সারকথা আমরা ভূমিকার অধীনে উল্লেখ করেছি। এখানে পুনরায় সংক্ষেপে তা আলোচনা করছি-

উক্ত সুরতে যেহেতু বিবাদী বাদীর মালিকানার দাবি অস্বীকার করেছে সেহেতু তার বক্তব্য অনুসারে সে তার দখলে থাকা বাড়িটি (اَلدَّارُ الْمُصَالِحُ عَنْهَا) -এর মালিকানা বাদীকে যে বাড়িটি প্রদান করেছে তার বিনিময়ে লাভ করেনি। বরং তার ধারণা মতে এ বাড়িটি পূর্ব হতেই তার মালিকানাভুক্ত ছিল। নতুন করে কোনো কিছুর বিনিময়ে সে এর মালিকানা লাভ করেনি। কাজেই এক্ষেত্রে 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ' (مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ) -এর চুক্তি সংঘটিত হয়নি। অতএব, এ বাড়িটিতে কেউ শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে না। কেননা শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় কেবল সেখানে যেখানে সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের মালিকানা লাভ হয়, আর এখানে তা হয়নি।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا صَالَحَ عَنْهَا بِسُكُوْتٍ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সমঝোতা চুক্তির আরেকটি সুরত বর্ণনা করছেন। এ সুরতটি 'মতন'-এর ইবারতে উল্লেখ করা হয়নি। এটিকে আমরা ভূমিকায় ২নং সুরতে উল্লেখ করেছি। এ সুরতটি হলো, যদি বিবাদীর দখলে থাকা বাড়িতে বাদী মালিকানা দাবি করার পর বিবাদী সে দাবি সঠিক কি সঠিক নয়, এ ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করে [অর্থাৎ বাদীর দাবিকে সে স্বীকারও করেনি এবং অস্বীকারও করেনি] অতঃপর সে সমঝোতার ভিত্তিতে বাদীকে অপর একটি বাড়ি প্রদান করে তাহলে এক্ষেত্রেও বিধান হলো বিবাদীর দখলে থাকা সেই বাড়িটিতে কেউ শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَذَلَ الْمَالَ افْتِدَاءً لِيَمِيْنِهِ : এ সুরতটির দলিল হলো, এ সুরতে বিবাদী যেহেতু নীরবতা অবলম্বন করেছে তাই এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, সে বাদীর মালিকানা স্বীকার করে নিয়েছে এবং অপর বাড়িটি বাদীকে দিয়ে সে এই বাড়িটির মালিকানা গ্রহণ করেছে। কেননা এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যদি মামলা দায়ের করে তাহলে বিচারকের নিকট তাকে 'হলফ' গ্রহণ করতে হবে এবং মামলার ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হবে। তাই আদালতে গিয়ে 'হলফ' করা ও বাদীর পক্ষ হতে ঝক্কি-ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য সে অপর বাড়িটি বাদীকে দিয়েছে। কাজেই একথা বলা যাবে না যে, এ বাড়িটির মালিকানা সে বাদীর নিকট হতে অন্য বাড়িটির বিনিময়ে লাভ করেছে; বরং এটি তার পূর্ব থেকেই মালিকানাভুক্ত বলে গণ্য হবে। অতএব, তাতে কেউ শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَنْهَا بِإِقْرَارٍ : এখান থেকে সমঝোতা চুক্তির তৃতীয় সুরতের আলোচনা করছেন। এ সুরতটি হলো, যদি বিবাদীর দখলে থাকা বাড়িতে বাদী মালিকানা দাবি করার পর বিবাদী সেই দাবি স্বীকার করে নেয়। তারপর এই বাড়িটি বাদীকে না দিয়ে তার পরিবর্তে সমঝোতার ভিত্তিতে অপর একটি বাড়ি প্রদান করে তাহলে যে বাড়িটি বিবাদী রেখে দিল সে বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي الخ : এ সুরতে উক্ত বাড়িতে শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, বিবাদী এখানে বাদীর মালিকানার দাবি স্বীকার করেছে এবং এর পরিবর্তে সমঝোতার মাধ্যমে বাদীকে সে অন্য একটি বাড়ি প্রদান করেছে। এর অর্থ এই হলো যে, বিবাদী তার দখলে থাকা বাড়িটির মালিকানা এখন বাদীর কাছ থেকে লাভ করল অপর একটি বাড়ির বিনিময়ে। কাজেই এটি 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ লাভ' এর অন্তর্ভুক্ত হলো। আর সম্পদের বিনিময়ে কোনো বাড়ি বা জমির মালিকানা লাভ করলেই সেখানে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়।

উল্লেখ্য, উপরে সমঝোতার যে তিনটি সুরত বর্ণনা করা হয়েছে উক্ত তিন সুরতেই যদি বিবাদী বাদীকে অন্য কোনো জিনিস বা টাকা-পয়সা দিয়ে সমঝোতা করে তাহলেও ঠিক একই বিধান হবে। অর্থাৎ প্রথম দুই সুরতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। আর তৃতীয় সুরতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا صَالَحَ عَلَيْهَا بِإِقْرَارٍ أَوْ سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ الخ : উপরে আলোচনা করা হয়েছে বিবাদীর দখলে থাকা বাড়িতে সমঝোতা করার পর তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে কিনা সে প্রসঙ্গে। এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচনা করছেন, বাদীকে যে বাড়িটি সমঝোতার ভিত্তিতে বিবাদী প্রদান করে, সে বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে কিনা তা নিয়ে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, সমঝোতার ভিত্তিতে যে বাড়িটি বিবাদী বাদীকে প্রদান করে, সে বাড়িতে তিন সুরতেই শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ বিবাদী চাই বাদীর মালিকানার দাবি অস্বীকার করে সমঝোতা করুক চাই নীরবতা অবলম্বন করে সমঝোতা করুক কিংবা তার দাবি স্বীকার করে সমঝোতা করুক সর্বাবস্থায়ই বাদী যে বাড়িটি বিবাদীর নিকট হতে গ্রহণ করবে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا صَالَحَ عَلَيْهَا بِإِقْرَارٍ أَوْ سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ الخ : উক্ত বিধানের কারণ হলো, বাদী উক্ত তিন সুরতেই বিবাদীর দখলে থাকা বাড়িতে তার মালিকানা দাবি করেছে। সুতরাং বিবাদী চাই তা স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক বা নীরব থাকুক বাদীর বক্তব্য অনুসারে বাড়িটি তার। কাজেই বিবাদী যে বাড়িটি তাকে দিয়েছে সেটি বাদী লাভ করেছে তার বাড়িটি বিবাদীকে ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে। অতএব, সে একটি বাড়ির বিনিময়ে অন্য একটি বাড়ির মালিকানা লাভ করেছে। কাজেই বাদী তার ধারণা অনুযায়ী যেভাবে বাড়িটি লাভ করেছে সে অনুযায়ী তাতে বিধান সাব্যস্ত করা হবে। আর এরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো কিছুর বিনিময়ে যদি একটি বাড়ির মালিকানা লাভ হয় তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং উক্ত তিন সুরতেই বাদীর গ্রহণ করা বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ الخ : "যদি বাদীর গ্রহণকৃত জমি তার দাবিকৃত জমির অন্তর্ভুক্ত না হয়।" এ ইবারতে বলা হয়েছে, উপরে আমরা বিধান উল্লেখ করেছি যে, বাদী যে জমিটি বিবাদীর নিকট হতে গ্রহণ করে সেটিতে সর্বাবস্থায় শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। এ বিধান হলো, যদি বাদী বিবাদীর নিকট হতে যে বাড়ি বা জমি লাভ করে সে যদি তার দাবিকৃত বাড়ি ব্যতীত অন্য জমি বা বাড়ি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে, বিবাদীর দখলে থাকা বাড়িটিতে বাদী মালিকানা দাবি করার পর বিবাদী সমঝোতার ভিত্তিতে সেই বাড়িটিরই কিছু অংশ বাদীকে দিয়ে দিল আর কিছু অংশ নিজে রেখে দিল তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে বাদী যে অংশটুকু গ্রহণ করল সে অংশে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা এক্ষেত্রে সে তার দাবি অনুসারে নিজের জমিরই একটি অংশ গ্রহণ করেছে যার মালিকানা তার পূর্ব থেকেই ছিল। কাজেই তার ধারণা অনুযায়ী সে এই অংশটুকু কোনো কিছুর বিনিময়ে নতুন করে লাভ করেনি। অতএব, তাতে কারো শুফ'আর অধিকার দাবি করার সুযোগ থাকবে না।

উল্লেখ্য, উক্ত ইবারতের পরের ইবারত فَيُعَامَلُ بِزَعْمِهِ এ অংশটুকুর সম্পর্ক পূর্বের ইবারত عِوَضًا عَنْ حَقِّهِ بِزَعْمِهِ -এর সাথে। অর্থ হচ্ছে, বাদী তার ধারণা অনুসারে [বিবাদীর দেওয়া] বাড়িটি লাভ করেছে তার নিজের প্রাপ্যের বিনিময়ে। কাজেই তার ধারণা অনুসারেই তার ক্ষেত্রে বিধান প্রযোজ্য হবে।

قَالَ : وَلَا شُفْعَةَ فِي هِبَةٍ، لِمَا ذَكَرْنَا، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ بِعِوَضٍ مَشْرُوْطٍ، لِأَنَّهُ بَيْعٌ إِنْتِهَاءً، وَلَا بُدَّ مِنَ الْقَبْضِ وَأَنْ لَا يَكُوْنَ الْمَوْهُوْبُ وَلَا عِوَضُهُ شَائِعًا، لِأَنَّهُ هِبَةٌ اِبْتِدَاءً . وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ فِيْ كِتَابِ الْهِبَةِ . بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعِوَضُ مَشْرُوْطًا فِي الْعَقْدِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هِبَةٌ مُطْلَقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ أُثِيْبَ مِنْهَا فَامْتَنَعَ الرُّجُوْعُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'হেবা' [দান]-এর ক্ষেত্রে কোনো শুফ'আ নেই। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবে যদি শর্তের ভিত্তিতে কোনো বস্তুর বিনিময়ে 'হেবা' করা হয়ে থাকে [তাহলে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে]। কেননা পরিণতির দিক থেকে এটি ক্রয় বিক্রয়। অবশ্য এক্ষেত্রে [হেবা গ্রহণকারীর] হস্তগত করা এবং হেবাকৃত সম্পত্তি ও তার বিনিময়ে প্রদত্ত সম্পদ অবণ্টিত এজমালী অংশ না হওয়া আবশ্যক হবে। কেননা এটা [পরিণতিতে বিক্রয় হলেও] সূচনাতে হেবা-ই। এ বিষয়টি আমরা 'হেবার অধ্যায়ে' আলোচনান্তে সাব্যস্ত করে এসেছি। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, যদি 'বিনিময় বস্তুটি' চুক্তিকালে শর্তের কারণে না হয়ে থাকে। কেননা এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র 'হেবা' [দান]। তবে হিবা প্রদানকারী যেহেতু এর প্রতিদান লাভ করেছে তাই ফেরত গ্রহণের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا شُفْعَةَ فِيْ هِبَةٍ : মাসআলা হচ্ছে, কেউ যদি কাউকে একটি বাড়ি বা জমি 'হেবা' [প্রীতিসূচক দান] করে তাহলে আমাদের মতে উক্ত জমি বা বাড়িতে কেউ শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে না। এটি ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ (র.)-এরও অভিমত। আর ইমাম মালেক ও ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর মতে উক্ত জমি বা বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। তাঁদের মতে শফী' উক্ত জমির বাজার-মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করবে।

قَوْلُهُ : لِمَا ذَكَرْنَا : "হেবাকৃত বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ তা-ই, যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।" মুসান্নিফ (র.) এ কথা বলে পূর্বের পৃষ্ঠায় [অর্থাৎ হিদায়ার ৩৮৭ নং পৃষ্ঠার ৫ম লাইনে] উল্লিখিত ইবারত بِخِلَافِ الْهِبَةِ لِأَنَّهُ لَا عِوَضَ فِيْهَا رَأْسًا -এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর সারকথা হচ্ছে, 'হেবা'-র মাধ্যমে যে জমির মালিকানা লাভ হয় তার বিনিময়ে কিছু দিতে হয় না। কাজেই কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই এর মালিকানা অর্জিত হয়। অতএব, তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শরিয়তে শর্ত হচ্ছে, মালিকানা লাভকারী ব্যক্তি যে জিনিসের বিনিময়ে জমিটি লাভ করেছে শফী'ও অনুরূপ জিনিসের বিনিময়ে সে জমিটি লাভ করবে। আর এটা সম্ভব হয় কেবল যেখানে 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ' -এর চুক্তির মাধ্যমে জমির মালিকানা লাভ করে। পক্ষান্তরে যেখানে কোনো বিনিময় ছাড়া মালিকানা লাভ হয় সেখানে শরিয়তের উক্ত শর্ত বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। বিধায় সেখানে শুফ'আর অধিকারও সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ بِعِوَضٍ مَشْرُوْطٍ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে চুক্তির সময় বিনিময় প্রদানের শর্তে যদি 'হেবা' করা হয় তাহলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ কেউ যদি কাউকে একটি বাড়ি বা জমি 'হেবা' করে এবং 'হেবা' করার সময়ই এরূপ শর্ত করে যে, আমি তোমাকে এই বাড়িটি বা জমিটি এই শর্তে 'হেবা' করলাম যে, তুমি এর বিনিময়স্বরূপ অমুক জিনিসটি আমাকে দিবে তাহলে এরূপ 'হেবা'-কে বলা হয় 'বিনিময়ের শর্তে হেবা' (اَلْهِبَةُ بِالْعِوَضِ) এবং এক্ষেত্রে উক্ত জমি বা বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ اِنْتِهَاءً : উক্ত সুরতে [অর্থাৎ বিনিময়ের শর্তে হেবা করার সুরতে] শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে, বিনিময় দেওয়ার শর্তে কাউকে কোন কিছু 'হেবা' করা হলে সে চুক্তিতে اِنْتِهَاءً বা পরিশেষে তথা উভয় পক্ষ হস্তগত করার পর 'বিক্রয়' বলে গণ্য করা হয়। আর اِبْتِدَاءً প্রথম দিকে তথা উভয় পক্ষ হস্তান্তর করার পূর্বে উক্ত চুক্তিকে 'হেবা' বলে গণ্য করা হয়। যেহেতু এরূপ চুক্তিতে হেবাকারী তার জমির বিনিময়ে অন্য জিনিস লাভ করছে তাই উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিক্রয়ের সাথে সামঞ্জস্য থাকার কারণে এটি পরিশেষে বিক্রয় বলে গণ্য হয়। অতএব, পরিশেষে যখন এটি বিক্রয় চুক্তি বলে গণ্য তখন এতে শুফ'আর অধিকারও সাব্যস্ত হবে। যেমনিভাবে কেউ তার জমি বা বাড়ি সরাসরি বিক্রয় করলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنَ الْقَبْضِ وَأَنْ لَا تَكُوْنَ الْمَوْهُوْبُ الخ : উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিনিময়ের শর্তে 'হেবা' করা হলে তা পরিশেষে (اِنْتِهَاءً) বিক্রয় আর প্রথম দিকে (اِبْتِدَاءً) 'হেবা' বলে গণ্য হয়। অতএব, প্রথম দিকে যেহেতু 'হেবা' বলে গণ্য তাই হেবা সঠিক হওয়ার জন্য যা শর্ত তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আলোচ্য ইবারতে এই শর্তের কথাই মুসান্নিফ (র.) আলোচনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু উক্ত চুক্তি তথা বিনিময়ের শর্তের 'হেবা' করার চুক্তি প্রথম দিকে হেবা হিসেবেই গণ্য হয়। তাই উভয় পক্ষের চুক্তির বৈঠকেই নগদ হস্তগত করা আবশ্যক হবে। কেননা হেবার ক্ষেত্রে নগদ হস্তগত করা শর্ত। আরেকটি শর্ত হলো, যে জমি বা বাড়ি হেবা করা হবে সেটি এবং তার বিনিময়ে যা দেওয়ার শর্ত করা হবে এ উভয়টি অবণ্টিত কোনো অংশ না হতে হবে; বরং তা বণ্টিত ও পৃথক জমি বা বাড়ি হতে হবে। কেননা অবণ্টিত জমি বা বাড়ি হেবা করা সহীহ নয়। কেননা অবণ্টিত অবস্থায় থাকলে নগদ হস্তগত করার যে শর্ত রয়েছে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং বিনিময়ের শর্তে জমি বা বাড়ি হেবা করা হলে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য উপরিউক্ত দু'টি শর্ত তথা উভয় পক্ষের নগদ হস্তগত করা এবং কোনো পক্ষের জিনিস অবণ্টিত না হওয়া অপরিহার্য। এই শর্ত মোতাবেক যখন উভয় পক্ষের হস্তগত করা হয়ে যাবে তখন এই চুক্তিটি বিক্রয় বলে গণ্য হয়ে যাবে এবং তখন শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। এর পূর্বে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে, বিনিময়ের শর্তে হেবা করা হলে তা পরিশেষে যেমন বিক্রয় বলে গণ্য হয়, তেমনি প্রথম দিকেও বিক্রয় বলে গণ্য হয়। কাজেই তাঁদের উভয়ের মতে, এক্ষেত্রে হেবার চুক্তি হওয়ার পরই তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। উভয় পক্ষের হস্তগত করা শর্ত থাকবে না।

قَوْلُهُ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ فِىْ كِتَابِ الْهِبَةِ الخ : "এ বিষয়টি আমরা 'হেবার অধ্যায়ে' আলোচনা করে সাব্যস্ত করে এসেছি।" অর্থাৎ বিনিময়ের শর্তে হেবা করা হলে সেটি যে প্রথম দিকে হেবা পরিশেষে বিক্রয় বলে গণ্য হবে– এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) মতভেদ দলিল-প্রমাণসহ 'হেবার অধ্যায়ে' আলোচনা করে এসেছেন।

উল্লেখ্য, এ আলোচনা মুসান্নিফ (র.) كِتَابُ الْهِبَةِ -এর অধীনে بَابُ مَا يَصِحُّ رُجُوْعُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ -এর ৩য় পৃষ্ঠায় তথা মূল গ্রন্থের ২৭৫ নং পৃষ্ঠায় করেছেন। নিম্নে সেখানের মূল ইবারতটুকু উল্লেখ করে দিলাম–

(قَالَ : وَإِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ اُعْتُبِرَ التَّقَابُضُ فِى الْمَجْلِسِ فِى الْعِوَضَيْنِ وَيَبْطُلُ بِالشُّيُوْعِ، لِأَنَّهُ هِبَةٌ اِبْتِدَاءً. فَإِنْ تَقَابَضَا صَحَّ الْعَقْدُ وَصَارَ فِىْ حُكْمِ الْبَيْعِ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَيُسْتَحَقُّ فِيْهِ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّهُ بَيْعٌ اِنْتِهَاءً. وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) هُوَ بَيْعٌ اِبْتِدَاءً وَاِنْتِهَاءً. لِأَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْبَيْعِ وَهُوَ التَّمْلِيْكُ بِعِوَضٍ، وَالْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْدِ لِلْمَعَانِىْ، وَلِهٰذَا كَانَ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إِعْتَاقًا . وَلَنَا أَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلٰى جِهَتَيْنِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَا أَمْكَنَ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ، وَقَدْ أَمْكَنَ لِأَنَّ الْهِبَةَ مِنْ حُكْمِهَا تَأَخُّرُ الْمِلْكِ إِلَى الْقَبْضِ، وَقَدْ يَتَرَاخٰى عَنِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْبَيْعُ مِنْ حُكْمِهِ اللُّزُوْمُ، وَقَدْ تَنْقَلِبُ الْهِبَةُ لَازِمَةً بِالْعِوَضِ، فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ بَيْعِ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْبَيْعِ فِيْهِ، إِذْ هُوَ لَا يَصْلُحُ مَالِكًا لِنَفْسِهِ.)

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعِوَضُ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ : উপরে যে বিনিময়ের শর্তে হেবা করলে তাতে শুফ'আর অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল, যদি বিনিময়ের বিষয়টি হেবা করার সময়ই শর্ত করা হয় সেক্ষেত্রে। এখানে মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে বিনিময়ের বিষয়টি যদি চুক্তির সময় শর্ত করা না হয় তাহলে তার বিধান ভিন্ন। অর্থাৎ কেউ যদি কাউকে একটি জমি বা বাড়ি হেবা করে এবং হেবা করার সময় এর বিনিময়ে কিছু দেওয়ার শর্ত না করে; কিন্তু হেবা গ্রহণকারী স্বেচ্ছায় এর বিনিময় হিসেবে তাকে কোনো কিছু প্রদান করে তাহলে উক্ত জমি বা বাড়িতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। তদ্রূপ হেবা গ্রহণকারী বিনিময় হিসেবে যা দিয়েছে তা যদি জমি বা বাড়ি হয় তাহলে সে জমি বা বাড়িতেও শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। মোটকথা শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বিনিময়ের বিষয়টি হেবার চুক্তির সময়ই শর্ত হিসেবে আরোপিত হতে হবে, অন্যথায় তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هِبَةٌ مُطْلَقَةٌ : উক্ত সুরতে অর্থাৎ চুক্তির সময় শর্ত না করে হেবার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা হলে সে সুরতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হলো, এক্ষেত্রে হেবাকারী যে জমি দিয়েছে এবং হেবা গ্রহণকারী এর বিনিময়ে যা দিয়েছে উভয়টি পৃথক পৃথক বিনিময়বিহীন হেবা (هِبَةٌ مُطْلَقَةٌ) বলে গণ্য হবে। কেননা চুক্তির সময় যেহেতু বিনিময়ের শর্ত করা হয়নি সেহেতু গ্রহণকারী যা দিয়েছে তা পৃথক হেবা বলেই গণ্য হবে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিনিময় ছাড়া হেবা করা হলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। কাজেই এ ক্ষেত্রে উক্ত দু'টি হেবার কোনোটির মাঝেই শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ أُثِيبَ مِنْهَا فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত সুরতে যদিও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু হেবাকারী যেহেতু যেকোনো প্রকারে বিনিময় লাভ করেছে তাই তার হেবাকৃত জিনিস ফেরত নেওয়ার যে অধিকার ছিল তা রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো কিছু হেবা করে তাহলে সেই হেবাকৃত জিনিসটি যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণকারীর হাতে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দানকারীর তা ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকে। কিন্তু দানকারী যদি তার হেবাকৃত বস্তুর বিনিময়ে কোনো কিছু গ্রহণ করে তাহলে তার সেই ফেরত নেওয়ার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। অতএব, আমাদের আলোচ্য সুরতে যদিও বিনিময়ের শর্ত চুক্তিকালে করা হয়নি তবুও যেহেতু দানকারী তার হেবার বিনিময়ে অন্য কিছু লাভ করেছে তাই তার ফেরত গ্রহণের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيْعِ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنِ الْبَائِعِ . فَإِنْ أَسْقَطَ الْخِيَارَ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّهُ زَالَ الْمَانِعُ عَنِ الزَّوَالِ وَيُشْتَرَطُ الطَّلَبُ عِنْدَ سُقُوْطِ الْخِيَارِ فِي الصَّحِيْحِ . لِأَنَّ الْبَيْعَ يَصِيْرُ سَبَبًا لِزَوَالِ الْمِلْكِ عِنْدَ ذٰلِكَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি 'খিয়ারে শর্ত' -এর ভিত্তিতে বিক্রয় করে তাহলে শফী'র কোনো শুফ'আর অধিকার থাকবে না। কেননা 'খিয়ারে শর্ত' বিক্রেতার মালিকানা উঠে যেতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু তারপর যদি 'খিয়ারে শর্ত' তুলে নেয় তাহলে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা [মালিকানা] উঠে যাওয়ার পথে যা প্রতিবন্ধক ছিল তা দূর হয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে খিয়ারে শর্ত যখন উঠে যাবে তখন [শুফ'আর] দাবি উত্থাপন করা আবশ্যক হবে। কেননা এই সময়েই বিক্রয় চুক্তিটি বিক্রেতার মালিকানা উঠে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيْعِ : মাসআলা হচ্ছে, জমি বা বাড়ির বিক্রেতা যদি 'খিয়ারে শর্ত' -এর ভিত্তিতে জমি বা বাড়ি বিক্রয় করে তাহলে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। অর্থাৎ জমির বিক্রেতা যদি কারো নিকট জমিটি এরূপ শর্তে বিক্রয় করে যে, আমি তোমার নিকট জমিটি এত টাকার বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে, আমার তিন দিন ভেবে দেখার অবকাশ থাকবে, তিন দিনের ভিতর আমি ইচ্ছা করলে চুক্তিটি বাতিল করতে পারব, তাহলে তিন দিন পার হওয়ার দ্বারা কিংবা বিক্রেতার পক্ষ হতে বিক্রয় পাকাপোক্ত করার দ্বারা বিক্রয় চুক্তি নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে কেউ উক্ত জমিতে শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنِ الْبَائِعِ : উক্ত সুরতে শুফ'আর অধিকার না থাকার কারণ হলো, 'খিয়ারে শর্ত' তথা ভেবে চিন্তে দেখার ইচ্ছাধিকার বিক্রীত বস্তুকে বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হতে বাধা দান করে। অর্থাৎ 'খিয়ারে শর্ত' -এর ভিত্তিতে কেউ কোনো জিনিস বিক্রয় করলে সে জিনিসটি উক্ত 'খিয়ার' বা ইচ্ছাধিকার বহাল থাকা পর্যন্ত বিক্রেতার মালিকানায়ই থেকে যায়। কাজেই তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় যখন বিক্রীত বস্তু বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়। মূল মালিকের তথা বিক্রেতার মালিকানায় থাকা অবস্থায় জমিতে কারো শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না।

قَوْلُهُ فَإِنْ أَسْقَطَ الْخِيَارَ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ : বিক্রেতা 'খিয়ারে শর্ত' তথা ভেবে চিন্তে দেখার ইচ্ছাধিকার নেওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে তার সেই অধিকার যদি তুলে নেয় [অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে বিক্রয়-চুক্তিকে নিশ্চিত করে দেয়] তাহলে সে জমিতে তখন শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ زَالَ الْمَانِعُ عَنِ الزَّوَالِ : কেননা বিক্রীত জমিটি বিক্রেতার মালিকানা হতে বের হওয়ার পথে যে বাধা ছিল তা দূর হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'খিয়ারে শর্ত' থাকাবস্থায় শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ ছিল, বিক্রীত জমিটি বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে না যাওয়া। তার মালিকানা থেকে জমিটি বের হয়ে যাওয়ার পথে বাধা ছিল 'খিয়ারে শর্ত'। কিন্তু যখন বিক্রেতা তার 'খিয়ারে শর্ত' তুলে নিয়েছে তখন সেই বাধা দূর হয়ে গেছে এবং জমিটি এখন বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছে। কাজেই উক্ত জমিতে এখন শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ الطَّلَبُ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ فِى الصَّحِيْحِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, সঠিক মত এটিই যে, উক্ত সুরতে শফী'র পক্ষ হতে শুফ'আর দাবি উত্থাপন করা আবশ্যক হবে সেই সময়, যখন বিক্রেতার পক্ষ হতে 'খিয়ারে শর্ত' তুলে নেওয়া হয়। শুফ'আর অধ্যায়ের শুরুতে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শুফ'আর অধিকার লাভ করার জন্য শফী'র পক্ষ হতে তিন প্রকার দাবি উত্থাপন করা আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে বিক্রয় সম্পর্কে সে অবহিত হওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে দাবি উত্থাপন করা। কিন্তু আমাদের উপরে বর্ণিত সুরতে যেহেতু 'খিয়ারে শর্ত' এর ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয় এবং বিক্রেতার পক্ষ হতে উক্ত 'খিয়ারে শর্ত' তুলে নেওয়ার পর তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় তাই উক্ত সুরতে শফী'র পক্ষ হতে যখন দাবি উত্থাপন করতে হবে এ সম্পর্কে মাশায়েখে কেরামের মতভেদ রয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিশুদ্ধ মত এটিই যে, যখন বিক্রেতা তার 'খিয়ারে শর্ত' তুলে নিবে তখন শফী'র দাবি উত্থাপন করা আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে কোনো কোনো মাশায়েখের মতে উক্ত সুরতে বিক্রেতা তার জমি বিক্রয় করার পরপরই [শফী' তা জানার পর] শুফ'আর দাবি করা আবশ্যক। কেননা বিক্রয় চুক্তি হচ্ছে, শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার সবব বা কারণ। কাজেই সবব বিদ্যমান হওয়ার পরই তাকে দাবি উত্থাপন করতে হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَصِيْرُ سَبَبًا لِزَوَالِ الْمِلْكِ عِنْدَ ذٰلِكَ : মুসান্নিফ (র.) যে মতটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন তার পক্ষে দলিল বর্ণনা করছেন। দলিলের সারকথা হচ্ছে, সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের পরপরই শুফ'আর দাবি করা আবশ্যক হয়। তার কারণ হলো, সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সাথে সাথেই জমি বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তিটি সাথে সাথে মালিকানা চলে যাওয়ার সবব বা কারণ হয়। কিন্তু 'খিয়ারে শর্তের' ভিত্তিতে বিক্রয় করা হলে বিক্রয় চুক্তিটি বিক্রেতার মালিকানা চলে যাওয়ার সবব বা কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন বিক্রেতা তার 'খিয়ারে শর্ত' তুলে নেয়। আর মালিকানা চলে যাওয়ার সবব সংঘটিত হওয়ার উপরই নির্ভর করে শুফ'আর দাবি উত্থাপন করা। অতএব, বিক্রয় চুক্তিটি যখন মালিকানা চলে যাওয়ার সবব হিসেবে গণ্য হবে তখন শফী'র পক্ষ হতে দাবি উত্থাপন করা আবশ্যক হবে, তার পূর্বে আবশ্যক হবে না।

উল্লেখ্য, আলোচ্য মাসআলায় ফতুয়ায়ে শামী গ্রন্থে উক্ত দু'টি মতের পক্ষেই মাশায়েখে কেরামের تَصْحِيْح [বিশুদ্ধ মত বলে সাব্যস্তকরণ] বর্ণনা করেছেন। আল্লামা শামী (র.) এও উল্লেখ করেছেন যে, জহীরিয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দ্বিতীয় মতটি তথা বিক্রয় চুক্তির পরপরই শুফ'আর দাবি উত্থাপন করতে হবে। এ মতটিই হচ্ছে, জাহিরী রেওয়ায়েত। এরপর তিনি বলেছেন, যদি জাহীরিয়্যার এই বর্ণনা সঠিক প্রমাণিত হয় তাহলে এ মতটিই গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। নিম্নে আমরা ফতুয়ায়ে শামী থেকে সংশ্লিষ্ট ইবারত উদ্ধৃত করে দিলাম–

قَوْلُهُ فِى الصَّحِيْحِ. كَذَا فِى الْهِدَايَةِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْبَيْعَ يَصِيْرُ سَبَبًا لِزَوَالِ الْمِلْكِ عِنْدَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ فِى الْجَوْهَرَةِ وَالدُّرَرِ وَالْمِنَحِ وَأَقَرَّهُ شُرَّاحُ الْهِدَايَةِ. وَقَالَ فِى الْعِنَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَقَوْلُهُ فِى الصَّحِيْحِ احْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الطَّلَبُ عِنْدَ وُجُوْدِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ الخ. أَقُوْلُ لٰكِنَّ فِى الظَّهِيْرِيَّةِ قَالَ يُشْتَرَطُ الطَّلَبُ وَالْإِشْهَادُ عِنْدَ الْبَيْعِ حَتّٰى لَوْ لَمْ يَطْلُبْ وَلَمْ يُشْهِدْ عِنْدَ الْبَيْعِ وَجَازَ الْبَيْعُ بِالْإِجَازَةِ أَوْ عِنْدَ مُضِىِّ مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ جَوَازِ الْبَيْعِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِىْ يُوْسُفَ، وَنَظِيْرُهُ الدَّارُ إِذَا بِيْعَتْ وَلَهَا جَارٌ وَشَرِيْكٌ فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيْكِ لَا لِلْجَارِ وَلٰكِنْ مَعَ هٰذَا يُشْتَرَطُ الطَّلَبُ مِنَ الْجَارِ عِنْدَ الْبَيْعِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْفُضُوْلِىِّ فَإِنَّ الطَّلَبَ عِنْدَ إِجَازَةِ الْمَالِكِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْعَ بِالْخِيَارِ عَقْدٌ تَامٌّ أَلَا تَرٰى أَنَّهُ يَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ إِجَازَةِ أَحَدٍ وَلَا كَذٰلِكَ عَقْدُ الْفُضُوْلِىِّ الخ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِى الْقُهُسْتَانِىِّ يُطْلَبُ بَعْدَ سُقُوْطِ الْخِيَارِ وَقِيْلَ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَمَا فِى الْكَافِىْ وَالثَّانِىْ كَمَا فِى الْهِدَايَةِ الخ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِبَارَةَ مَقْلُوْبَةٌ لِأَنَّ الْمُصَحَّحَ فِى الْهِدَايَةِ هُوَ الْأَوَّلُ. فَقَدْ ظَهَرَ تَصْحِيْحُ كُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ. وَلٰكِنْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ الثَّانِىْ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لَا يُعْدَلُ عَنْهُ.

এ টুকু হচ্ছে ফতুয়ায়ে শামীর ইবারত। শেষোক্ত ইবারত وَلٰكِنْ إِنْ ثَبَتَ الخ এর টিকা হিসেবে تَقْرِيْرَاتُ رَافِعِىْ তে উল্লেখ করা হয়েছে– سَيَأْتِىْ أَنَّ مَا فِى الْمُتُوْنِ وَالشُّرُوْحِ مُقَدَّمٌ عَلٰى مَا فِى الْفَتَاوٰى ....

وَإِنِ اشْتَرٰى بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنِ الْبَائِعِ بِالْاِتِّفَاقِ، وَالشُّفْعَةُ تَبْتَنِى عَلَيْهِ عَلٰى مَا مَرَّ ـ وَإِذَا أَخَذَهَا فِى الثَّلَاثِ وَجَبَ الْبَيْعُ لِعَجْزِ الْمُشْتَرِىْ عَنِ الرَّدِّ ـ وَلَا خِيَارَ لِلشَّفِيْعِ، لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ وَهُوَ لِلْمُشْتَرِىْ دُوْنَ الشَّفِيْعِ . وَإِنْ بِيْعَتْ دَارٌ إِلٰى جَنْبِهَا وَالْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَظَاهِرٌ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فِى الَّتِىْ يُشْفَعُ بِهَا، وَكَذَا إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِىْ . وَفِيْهِ إِشْكَالٌ أَوْضَحْنَاهُ فِى الْبُيُوْعِ فَلَا نُعِيْدُهُ، وَإِذَا أَخَذَهَا كَانَ إِجَازَةً مِنْهُ لِلْبَيْعِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَرَهَا حَيْثُ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ بِأَخْذِ مَا بِيْعَ بِجَنْبِهَا بِالشُّفْعَةِ، لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ لَا يَبْطُلُ بِصَرِيْحِ الْإِبْطَالِ فَكَيْفَ بِدَلَالَتِهِ . ثُمَّ إِذَا حَضَرَ شَفِيْعُ الدَّارِ الْأُوْلٰى لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا دُوْنَ الثَّانِيَةِ لِانْعِدَامِ مِلْكِهِ فِى الْأُوْلٰى حِيْنَ بِيْعَتِ الثَّانِيَةُ ـ

অনুবাদ : আর 'খিয়ারে শর্ত' -এর ভিত্তিতে যদি ক্রয় করে তাহলে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা সকলের ঐকমত্যেই এটি বিক্রেতার মালিকানা উঠে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে না। শুফ'আ এই মালিকানা উঠে যাওয়ার উপরই নির্ভর করে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যদি শফী' তিন দিনের মধ্যে বাড়িটি গ্রহণ করে নেয় তাহলে বিক্রয় চূড়ান্ত হয়ে যাবে। কেননা ক্রেতা এখন ফেরত দিতে অপারগ। শফী'র কোনো ইচ্ছাধিকার [খিয়ার] থাকবে না। কেননা এই ইচ্ছাধিকার কেবল শর্তের ভিত্তিতেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর সেই শর্ত হচ্ছে ক্রেতার জন্য: শফী'র জন্য নয়। আর যদি উক্ত বাড়িটির পার্শ্বে আরেকটি বাড়ি বিক্রয় হয় এবং ক্রেতা বিক্রেতার কোনো একজনের 'খিয়ারে শর্ত' থাকে তাহলে যার 'খিয়ারে শর্ত' রয়েছে তার [পার্শ্ববর্তী বাড়িটি] শুফ'আর ভিত্তিতে নেওয়ার অধিকার থাকবে। বিক্রেতার ক্ষেত্রে বিষয়টি তো স্পষ্ট। কেননা যে বাড়িটির ভিত্তিতে সে শুফ'আ দাবি করছে সে বাড়িটিতে তো তার মালিকানা বহাল রয়েছে। অনুরূপভাবে ক্রেতার খিয়ারের সুরতেও তাই। তবে এক্ষেত্রে একটি আপত্তি দেখা দেয়, 'ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়ে' আমরা তা সবিস্তারে আলোচনা করেছি। কাজেই এখানে তার আর পুনরাবৃত্তি করব না। [এ সুরতে] যার 'খিয়ারে শর্ত' ছিল সে যদি পাশ্ববর্তী বাড়িটি [শুফ'আর ভিত্তিতে] গ্রহণ করে তাহলে এটি তার বিক্রয় চুক্তিকে অনুমোদন বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম হলো, যদি ক্রেতা বাড়িটি না দেখে ক্রয় করে। কেননা এ ক্ষেত্রে বিক্রীত পার্শ্ববর্তী বাড়ি শুফ'আর ভিত্তিতে গ্রহণ করার কারণে ক্রেতার 'খিয়ারে রুইয়্যাত' বাতিল হয় না। কারণ হলো, 'খিয়ারে রুইয়্যাত' স্পষ্ট ভাষায় বাতিল করলেও বাতিল হয় না। তাহলে পরোক্ষভাবে বুঝা গেলে কিভাবে বাতিল হবে? [প্রথমোক্ত সুরতে] যদি প্রথম বাড়িটির [অর্থাৎ 'খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে ক্রয়কৃত বাড়িটির] শফী' উপস্থিত হয় তাহলে সে কেবল প্রথম বাড়িটিই গ্রহণ করার অধিকার পাবে; দ্বিতীয় বাড়িটি নয়। কেননা দ্বিতীয় বাড়িটি বিক্রয়কালে প্রথম বাড়িটিতে তার মালিকানা ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِنِ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ : এর পূর্বের ইবারতে আলোচনা করা হয়েছে বিক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করা হলে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে কিনা সে সম্পর্কে। আর আলোচ্য ইবারতে বর্ণনা করা হচ্ছে, ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত'-এর ভিত্তিতে জমি বা বাড়ি বিক্রয় করা হলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে কিনা সে প্রসঙ্গ। মাসআলা হচ্ছে, ক্রেতার 'খিয়ারে শর্ত' থাকবে এই ভিত্তিতে যদি জমি বা বাড়ি বিক্রয় করা হয় তাহলে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরই উক্ত জমি বা বাড়িতে শফী' তার শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ হতে 'খিয়ারে শর্ত' তুলে নেওয়ার উপর শুফ'আর অধিকার নির্ভর করবে না; বরং শুধু বিক্রয় চুক্তি হওয়ার দ্বারাই শুফ'আ সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য, এ মতটি আমাদের ইমামগণের। এটি ইমাম আহমাদ (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি অভিমতের একটি। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকেও দু'টি অভিমত বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে ইমাম মুযানী (র.) এই মতটিই বর্ণনা করেছেন এবং শাফেয়ী মাযহাবের গ্রন্থ 'শরহুল ওজীয'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই মতটিই আমাদের অধিকাংশ মাশায়েখের মতে বিশুদ্ধতম মত। অপর দিকে ইমাম আহমাদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি অভিমত অনুসারে ক্রেতার 'খিয়ারে শর্ত' বাতিল হওয়ার পূর্বে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। ইমাম মালেক (র.)-এর মতও অনুরূপ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে এ মতের অনুকূলে এবং আমাদের মাশায়েখে কেরামের মধ্য হতে আবূ ইসহাক আল মারওয়াযী এ রেওয়ায়েতটিকেই গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنِ الْبَائِعِ بِالْاِتِّفَاقِ : এখান থেকে উক্ত মাসআলায় আমাদের মাযহাবের দলিল বর্ণনা করেছেন। দলিলের সারমর্ম হচ্ছে, ক্রেতার ভেবে-চিন্তে দেখার ইচ্ছাধিকার [খিয়ারে শর্ত] থাকবে। এ শর্তে কোনো কিছু বিক্রয় করা হলে সে বিক্রয় বিক্রীত জিনিসটি বিক্রেতার মালিকানা থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে বাধা প্রদান করে না, এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.) একমত। অর্থাৎ ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' থাকলে বিক্রয়ের পরপরই বিক্রীত জিনিসটি ক্রেতার মালিকানায় চলে আসবে কিনা– এ ব্যাপারে যদিও ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, কিন্তু বিক্রীত জিনিসটি যে বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত।[১]

আর বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রীত জমি বা বাড়িটি বের হয়ে যাওয়ার উপরই শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়া নির্ভর করে। ক্রেতার মালিকানায় তা চলে আসা না আসার উপর নির্ভর করে না। এর কারণ হচ্ছে, শুফ'আর অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জমির মালিকের পক্ষ হতে যখন জমিটি তার মালিকানায় রাখতে অনীহা প্রকাশ পায় তখন শফী' সে জমিটি গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে। আর বিক্রয় করার মাধ্যমে যখন জমিটি মালিকের মালিকানা থেকে বের হয়ে যায় তখন তার এই অনীহা প্রকাশ পায়। কাজেই আমাদের আলোচ্য সুরতে যখন বিক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' নেই, তার পক্ষ থেকে বিক্রয় চুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তার মালিকানা থেকে জমিটি বের হয়ে গেছে। তখন তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। যদিও ক্রেতার মালিকানায় জমিটি প্রবেশ করা না করার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু সে মতবিরোধ শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

---

১. এ মতবিরোধ সম্পর্কে كِتَابُ الْبُيُوْعِ এর- بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ-এর ২য় পৃষ্ঠায় [তথা তৃতীয় খণ্ডের ১৪ নং পৃষ্ঠায়] আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, বিক্রীত জিনিসটি বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে ঠিক; কিন্তু তা ক্রেতার মালিকানায় প্রবেশ করবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে, বিক্রীত জিনিসটি বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে এবং তা ক্রেতার মালিকানায় প্রবেশ করবে। সুতরাং বিক্রীত জিনিসটি যে বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.) একমত।]

قَوْلُهُ عَلٰى مَا مَرَّ : "যার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে"। অর্থাৎ শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়া যে বিক্রীত জিনিসটি বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপর নির্ভর করে এর কারণ ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ আলোচনা মুসান্নিফ (র.) كِتَابُ الشُّفْعَةِ -এর শুরুর দিকে [৩৭৫ নং পৃষ্ঠার শেষে] উল্লেখ করেছেন। সেখানের ইবারতটুকু নিম্নরূপ–

قَالَ وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ ...... وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ إِذَا رَغِبَ الْبَائِعُ عَنْ مِلْكِ الدَّارِ وَالْبَيْعُ يُعَرِّفُهَا وَلِهٰذَا يَكْتَفِيْ بِثُبُوْتِ الْبَيْعِ فِيْ حَقِّهِ حَتّٰى يَأْخُذَهَا الشَّفِيْعُ إِذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِيْ يُكَذِّبُهُ.

এ ইবারতের সারকথা হচ্ছে, বিক্রয়ের পর বিক্রেতার জমিতে যে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় তার কারণ হচ্ছে, মূলত শুফ'আ সাব্যস্ত হয় যখন জমিটির উপর মালিকানা বহাল রাখতে মালিক অনাগ্রহী হয়। আর বিক্রয়ের মাধ্যমে তার এ অনাগ্রহ প্রকাশ পায়। এ কারণেই বিক্রেতার দিকে যদি বিক্রয় চুক্তি হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয় তাহলেই শুফ'আ সাব্যস্ত হয়। চাই ক্রেতার দিকে বিক্রয় চুক্তিটি সাব্যস্ত হোক বা না হোক। যেমন বিক্রেতা যদি স্বীকার করে যে, সে তার জমিটি বিক্রয় করেছে আর ক্রেতা তা অস্বীকার করে তাহলে সে জমিতে শুফ'আ সাব্যস্ত হয়। কেননা বিক্রেতার স্বীকারোক্তির কারণে তার দিকে বিক্রয় সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও যেহেতু বিক্রেতার পক্ষ হতে বিক্রয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তার মালিকানা থেকে জমিটি বের হয়ে গেছে সেহেতু সে জমিতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا أَخَذَهَا فِي الثَّلَاثِ وَجَبَ الْبَيْعُ : "শফী যদি সেই তিন দিনের মধ্যেই বাড়িটি গ্রহণ করে তাহলে বিক্রয় চুক্তিটি বহাল থাকা নিশ্চিত হয়ে যাবে।" এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) 'মতনে' বর্ণিত মূল মাসআলা তথা ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্তের' ভিত্তিতে বিক্রয়ের মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট শুফ'আ সংক্রান্ত আরো কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করছেন। প্রথম মাসআলা হচ্ছে, ক্রেতার ভেবে চিন্তে দেখার ইচ্ছাধিকার থাকবে। এ শর্তে জমি বা বাড়ি বিক্রয় করার পরপরই শফী' তার শুফ'আর অধিকার বলে সে জমি বা বাড়িটি গ্রহণ করতে পারবে। এ বিধান পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং শফী' যদি ক্রেতা যে কয়দিনের জন্য ভেবে চিন্তে দেখার শর্ত করেছে সে কয়দিনের মধ্যেই উক্ত জমি বা বাড়ি গ্রহণ করে নেয় তাহলে ক্রেতা যে ইচ্ছাধিকার [খিয়ারে শর্ত] লাভ করেছিল তার ভিত্তিতে উক্ত বিক্রয় চুক্তিটি বাতিল করতে পারবে না; বরং বিক্রয়-চুক্তিটি তখন বহাল থাকা নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং শফী'র শুফ'আও কার্যকর থাকবে।

[উল্লেখ্য, আলোচ্য মাসাআলায় মুসান্নিফ (র,) أَخَذَهَا فِي الثَّلَاثِ "শফী' যদি তিন দিনের ভিতর তা গ্রহণ করে" কথাটি এ জন্য বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'খিয়ারে শর্ত' তিন দিনের অধিক নির্ধারণ করা সহীহ নয়; তবে সাহেবাইনের মতে তিন দিনের অধিক নির্ধারণ করাও সহীহ।]

قَوْلُهُ لِعَجْزِ الْمُشْتَرِيْ عَنِ الرَّدِّ : "ক্রেতা বিক্রীত বাড়িটি ফেরত দিতে অপারগ হয়ে যাওয়ার কারণে।" অর্থাৎ উক্ত মাসআলায় শফী' বাড়িটি গ্রহণ করার পর বিক্রয় চুক্তিটি বহাল থাকা নিশ্চিত হয়ে যাবে। এ কারণে যে, শফী' বাড়িটি শুফ'আর অধিকার বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। কাজেই ক্রেতার পক্ষে বাড়িটি ফেরত দেওয়া আর সম্ভব নয়। অতএব, বিক্রয় চুক্তি বহাল থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

[উল্লেখ্য, যদি শফী' বাড়িটি গ্রহণ করার পূর্বে ক্রেতা তার ইচ্ছাধিকারের ভিত্তিতে বাড়িটি বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে বিক্রয় চুক্তিটি সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যায়। ফলে তখন আর শফী' তার শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারে না।]

قَوْلُهُ وَلاَ خِيَارَ لِلشَّفِيْعِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ الخ : উক্ত সুরতে অর্থাৎ ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' থাকা অবস্থায় যখন শফী' 'খিয়ারে শর্ত'-এর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই জমিটি গ্রহণ করে সে সুরতে যে 'খিয়ারে শর্ত' ক্রেতার অধিকারে ছিল তা শফী' লাভ করবে না। অর্থাৎ ক্রেতার তো এ ইচ্ছাধিকার ছিল যে, শফী' যদি জমিটি গ্রহণ না করত তাহলে তার 'খিয়ারে শর্ত'-এর সময় পার হয়ে যাওয়ার পূর্বে সে ইচ্ছা করলে জমিটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারত। কিন্তু শফী' জমিটি নেওয়ার পর উক্ত সময় উত্তীর্ণ না হলেও সে বিক্রেতাকে জমিটি ফেরত দিতে পারবে না। যদিও বিক্রয়ের সম্পর্ক ক্রেতার দিক থেকে পরিবর্তিত হয়ে এখন শফী'র সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। তবুও 'খিয়ারে শর্ত'-এর অধিকার সে লাভ করবে না এর কারণ হচ্ছে, 'খিয়ারে শর্ত' বা ভেবে চিন্তে দেখার ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হয় ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক শর্তের ভিত্তিতে। এটি বিক্রয় চুক্তির সত্তাগত কোনো দাবি অনুসারে সাব্যস্ত হয় না। কাজেই যার অনুকূলে এ শর্ত করা হয়েছিল সেই কেবল এটি লাভ করবে অন্য কেউ তা লাভ করবে না। এ শর্তটি করা হয়েছিল ক্রেতার অনুকূলে। সুতরাং শফী' তা লাভ করবে না। কেননা শফী'র পক্ষে তা শর্ত করা হয়নি।

قَوْلُهُ وَإِنْ بِيْعَتْ دَارٌ إِلَى جَنْبِهَا وَالْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আরেকটি মাসআলা বর্ণনা করছেন। মাসআলাটি হচ্ছে, যদি কোনো বাড়ি বা জমি 'খিয়ারে শর্ত'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয় তারপর উক্ত 'খিয়ারে শর্ত'-এর সময় চলাকালেই সে বাড়ি বা জমির পার্শ্বে আরেকটি জমি কেউ বিক্রয় করে তাহলে প্রথম জমি বা বাড়িটি বিক্রয়কালে যার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' ছিল সে এ দ্বিতীয় জমিটিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। যদি বিক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' করা হয়ে থাকে তাহলে সে এ দ্বিতীয় জমিটি শুফ'আর অধিকারের ভিত্তি লাভ করবে। আর যদি ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' করা হয়ে থাকে তাহলে সে এ দ্বিতীয় জমিটিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَظَاهِرٌ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فِي الَّتِيْ يَشْفَعُ بِهَا : উক্ত মাসআলায় প্রথম জমি বা বাড়িটি বিক্রয়কালে যার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' ছিল সে যে দ্বিতীয় জমিটিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে এর কারণ বর্ণনা করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি প্রথম বাড়িটি বিক্রয়কালে বিক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' করা হয়ে থাকে তাহলে সে যে দ্বিতীয় বাড়ি বা জমিটিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে এর কারণ তো স্পষ্ট। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিক্রেতার পক্ষে যদি 'খিয়ারে শর্ত' করা হয় তাহলে বিক্রীত জিনিসটি বিক্রেতার মালিকানায়ই থাকে। যতক্ষণ না সে তার 'খিয়ারে শর্ত'-কে তুলে নেয় কিংবা 'খিয়ারে শর্ত'-এর সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। অতএব, আলোচ্য সুরতে যখন 'খিয়ারে শর্ত'-এর সময় বাকি থাকতেই পার্শ্ববর্তী জমি বা বাড়িটি বিক্রয় হয়েছে তখন প্রথম বাড়িটিতে বিক্রেতারই মালিকানা বহাল ছিল। সুতরাং সেই পার্শ্ববর্তী জমি বা বাড়িটিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। কোনো জমি বা বাড়ি বিক্রয়কালে তার পাশের জমি বা বাড়ির মালিকানা যার থাকে সেই বিক্রীত জমি বা বাড়িতে শুফ'আর অধিকার লাভ করে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِيْ : আর যদি প্রথম বাড়িটি বিক্রয়কালে ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' করা হয়ে থাকে তাহলে পার্শ্ববর্তী বিক্রীত বাড়িতে সেই শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। তবে এক্ষেত্রে তার শুফ'আর অধিকার লাভ হওয়ার কারণ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে তো স্পষ্ট, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ক্রেতার শুফ'আর অধিকার লাভ হওয়ার ব্যাপারে একটি আপত্তি (اِشْكَالٌ) দেখা দেয়। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে ক্রেতার শুফ'আর অধিকার লাভ হওয়ার কারণ স্পষ্ট এজন্য যে, তাঁদের উভয়ের মতে যদি ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' করা হয় তাহলে বিক্রীত জিনিসটি বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে ক্রেতার মালিকানায় প্রবেশ করে। অর্থাৎ এ সুরতে 'খিয়ারে শর্ত'-এর সময় চলাকালে জিনিসটির মালিক ক্রেতাই থাকে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যখন দ্বিতীয় বাড়িটি বিক্রয় হয়েছে তখন প্রথম জমিটির মালিক ক্রেতা। কাজেই দ্বিতীয় বাড়িটিতে তারাই শুফ'আর অধিকার লাভ করবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এ মতে উক্ত সুরতে যে ক্রেতার শুফ'আর অধিকার লাভ করার ক্ষেত্রে একটি আপত্তি দেখা দেয়। আর সেদিকেই মুসান্নিফ (র.) নিম্নের ইবারতে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ وَفِيْهِ إِشْكَالٌ أَوْضَحْنَاهُ فِى الْبُيُوْعِ فَلَا نُعِيْدُهُ : "তবে এক্ষেত্রে একটি আপত্তি দেখা দেয়, আপত্তিটির আলোচনা আমি বিক্রয়ের অধ্যায়ে বিস্তারিত করেছি, কাজেই এখানে আর পুনারাবৃত্তি করব না।" ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে উক্ত মাসআলায় ক্রেতার শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যে আপত্তি (إِشْكَالٌ) দেখা দেয় তা হচ্ছে, তাঁর মতে ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' থাকা অবস্থায় বিক্রীত জিনিসটি ক্রেতার মালিকানায় প্রবেশ করে না। কাজেই ক্রেতার 'খিয়ারে শর্ত'-এর সময়ের মধ্যে যখন পার্শ্ববর্তী [দ্বিতীয়] বাড়িটি বিক্রয় হয়েছে তখন তো প্রথম বাড়িটিতে ক্রেতার মালিকানা ছিল না, কাজেই সে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে দ্বিতীয় বাড়িটিতে কিভাবে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে? শুফ'আর অধিকার লাভ করার জন্যে তো যে জমির ভিত্তিতে তা দাবি করবে সে জমিতে মালিকানা থাকা অপরিহার্য।

মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে এ আপত্তির নিরসন কি হবে তা كِتَابُ الْبُيُوْعِ-এর অধীনে بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ। -এর শেষের দিকে [৩য় খণ্ডের ১৮ নং পৃষ্ঠার শেষে] আলোচনা করেছেন। সেখানে মুসান্নিফ (র.) যা উল্লেখ করেছেন তার সারকথা হচ্ছে, যখন ক্রেতা তার ক্রয়কৃত বাড়ির পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে শুফ'আর দাবি করেছে তখন তার এই শুফ'আর দাবি করা এ কথা প্রমাণ করে যে, সে তার ক্রয়কৃত বাড়িটিতে তার যে 'খিয়ারে শর্ত' ছিল তা সে বাতিল করে দিয়ে তার পক্ষ থেকে ক্রয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে দিয়েছে। কেননা শুফ'আর অধিকার শরিয়তের পক্ষ হতে দেওয়াই হয়েছে প্রতিবেশীত্বের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কাজেই তার ক্রয়কৃত বাড়িটিতে যদি তার মালিকানা না হয় তাহলে প্রতিবেশীর অনিষ্টের প্রশ্নই উঠবে না। সুতরাং ক্রেতার পক্ষ হতে পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে শুফ'আর দাবি করার দ্বারা তার যে 'খিয়ারে শর্ত' ছিল তা বাতিল হয়ে প্রথম বাড়িটিতে তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে। আর এই মালিকানা সাব্যস্ত হবে প্রথম বাড়িটি ক্রয়ের যখন চুক্তি করেছিল তখন থেকে। কেননা 'খিয়ারে শর্ত' তুলে নিলে ক্রয়কৃত জিনিসের মালিকানা সাব্যস্ত ক্রয়ের চুক্তির সময় হতে। অতএব, ক্রেতার পক্ষ থেকে দ্বিতীয় বাড়িটিতে শুফ'আর অধিকার দাবি করার দ্বারা যখন প্রথম বাড়িটিতে তার ক্রয় চুক্তির সময় থেকে মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে তখন উক্ত আপত্তিটির নিরসন হয়ে গেছে। কেননা এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী দ্বিতীয় বাড়িটি বিক্রয়কালে প্রথম বাড়িটিতে ক্রেতার মালিকানা ছিল বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

নিম্নে كِتَابُ الْبُيُوْعِ ১৮ নং পৃষ্ঠা থেকে উক্ত আপত্তির নিরসন সংশ্লিষ্ট ইবারতটুকু উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো–

قَالَ وَمَنِ اشْتَرٰى دَارًا عَلٰى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَبِيْعَتْ دَارٌ أُخْرٰى إِلٰى جَنْبِهَا فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ رِضًا لِأَنَّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ يَدُلُّ عَلٰى اِخْتِيَارِهِ الْمِلْكَ فِيْهَا لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ إِلَّا لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَارِ وَذٰلِكَ بِالْاِسْتِدَامَةِ فَيَتَضَمَّنُ ذٰلِكَ سُقُوْطَ الْخِيَارِ سَابِقًا عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْجِوَارَ كَانَ ثَابِتًا. وَهٰذَا التَّقْرِيْرُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَذْهَبِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خَاصَّةً.

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, وَفِيْهِ اِشْكَالٌ أَوْضَحْنَاهُ فِى الْبُيُوْعِ "এখানে একটি আপত্তি রয়েছে, আপত্তিটি সম্পর্কে আমি বিক্রয়ের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।" প্রকৃতপক্ষে বিক্রয়ের অধ্যায়ে মুসান্নিফ (র.) উক্ত আপত্তির কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি প্রসঙ্গক্রমে সেখানে আপত্তিটির নিরসন উল্লেখ করেছেন। হিদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারগণের কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, যেহেতু জবাব উল্লেখ করলে তার মাঝে প্রশ্নও নিহিত থাকে তাই মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্ধৃতি সঠিক আছে। আর কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, মুসান্নিফ (র.) বলেছেন 'বিক্রয়ের অধ্যায়ে' আলোচনা করেছি। কিন্তু তিনি কোন গ্রন্থের 'বিক্রয়ের অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন তা বলেননি। কাজেই হতে পারে যে, আপত্তিটি তিনি তাঁর كِفَايَةُ الْمُنْتَهِىْ গ্রন্থের বিক্রয়ের অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ জবাবটি যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা অন্য গ্রন্থের আলোচনা যদি মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য হতো তাহলে তিনি এ কথা বলতেন না যে, "এখানে তার পুনারাবৃত্তি করব না।" কারণ এক গ্রন্থে আলোচনা করে অপর এক গ্রন্থে উল্লেখ করলে তাকে তো 'পুনরাবৃত্তি' বলা হয় না। অতএব, প্রথমোক্ত জবাবটিই সঠিক।

قَوْلُهُ وَاِذَا اَخَذَهَا كَانَ اِجَازَةً مِنْهُ لِلْبَيْعِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত সুরতে তথা ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' থাকাবস্থায় পার্শ্ববর্তী বাড়ি বিক্রয় হওয়ার সুরতে ক্রেতা যদি পার্শ্ববর্তী বাড়িটি শুফ'আর ভিত্তিতে গ্রহণ করে। তাহলে তার এ গ্রহণ করার দ্বারা সে প্রথমে যে বাড়িটি 'খিয়ারে শর্ত'-এর ভিত্তিতে ক্রয় করেছিল তাতে তার পক্ষ হতে ক্রয় করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। কাজেই প্রথম বাড়িটি সে এখন আর 'খিয়ারে শর্ত' -এর ভিত্তিতে ফেরত দিতে পারবে না। এর কারণ আমরা একটু পূর্বে 'আপত্তি নিরসনের' আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَرَهَا الخ : উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রেতা 'খিয়ারে শর্ত' থাকা অবস্থায় পার্শ্ববর্তী বাড়িটি শুফ'আর ভিত্তিতে গ্রহণ করলে তার 'খিয়ারে শর্ত' বাতিল হয়ে ক্রয়ের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। এ বিধানের ব্যতিক্রম হচ্ছে 'খিয়ারের রু'ইয়াত'(خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) এর মাসআলা। অর্থাৎ ক্রেতা যদি কোনো একটি বাড়ি না দেখেই ক্রয় করে তারপর তার ক্রয়কৃত বাড়িটির পার্শ্ববর্তী বাড়ি বিক্রয় হয় এবং সে শুফ'আর অধিকারের ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী বাড়িটি গ্রহণ করে তাহলে প্রথম বাড়িটিতে তার যে 'খিয়ারে রু'ইয়াত' তথা দেখার পরে পছন্দ না হলে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার ছিল তা বাতিল হবে না। সুতরাং সে পার্শ্ববর্তী বাড়িটি গ্রহণ করার পর যদি তার ক্রয়কৃত প্রথম বাড়িটি দেখে এবং পছন্দ না হয় তাহলে সে প্রথম বাড়িটি বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ لَا يَبْطُلُ بِصَرِيْحِ الْاِبْطَالِ الخ : উক্ত সুরতে ক্রেতার 'খিয়ারে রু'ইয়াত' তথা দেখার পরে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার বাতিল না হওয়ার কারণ হচ্ছে, কেউ কোনো জিনিস না দেখে ক্রয় করলে তার যে 'খিয়ারে রু'ইয়াত' লাভ হয় তা জিনিসটি সে দেখার পূর্বে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সরাসরি বাতিল করে দেয় তবুও তা বাতিল হয় না। অর্থাৎ ক্রেতা যদি জিনিসটি দেখার পূর্বে বিক্রেতাকে বলে দেয় যে, আমার দেখার পর যে ফেরত দেওয়ার অধিকার রয়েছে তা আমি বাতিল করে দিলাম। দেখার পর আমার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে না। তাহলেও ক্রেতার দেখার পর ফেরত দেওয়ার অধিকার বাতিল হয় না। সে ইচ্ছা করলে জিনিসটি ক্রেতাকে ফেরত দিতে পারে। কেননা 'খিয়ারে রু'ইয়াত' বাতিল হওয়া নির্ভর করে বিক্রীত জিনিসটি দেখার উপর, দেখার পূর্বে তা কোনোভাবে বাতিল হয় না। সুতরাং যখন জিনিসটি দেখার পূর্বে স্পষ্টভাবে 'খিয়ারে রু'ইয়াত' বাতিল করলেও বাতিল হয় না। তখন আমাদের আলোচ্য সুরতে আরো অধিক যুক্তিসঙ্গতভাবে 'খিয়ারে রু'ইয়াত' বাতিল হবে না। কেননা আলোচ্য সুরতে ক্রেতা স্পষ্টভাবে তা বাতিল করেনি। বরং পার্শ্ববর্তী বাড়িটি গ্রহণ করার দ্বারা বুঝা যায় যে, সে তার প্রথম বাড়িটিতে ফেরত দেওয়ার অধিকার বাতিল করতে চায়। আর কর্ম থেকে বাতিল করা বুঝা যাওয়ার বিষয়টি তো সে সরাসরি বাতিল করার চেয়ে অধিক শক্তিশালী নয়। অতএব, যখন সরাসরি বাতিল করলে বাতিল হয় না তখন তার কর্মের কারণে বাতিল না হওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত।

ثُمَّ اِذَا حَضَرَ شَفِيْعُ الدَّارِ الْاُوْلٰى الخ এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আরেকটি মাসআলা বর্ণনা করছেন। মাসআলাটি হচ্ছে, পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ক্রেতা যদি 'খিয়ারে শর্ত'-এর ভিত্তিতে একটি বাড়ি ক্রয় করে তারপর তার ক্রয়কৃত বাড়ির পার্শ্বে আরেকটি বাড়ি বিক্রয় হয়। তাহলে ক্রেতা 'খিয়ারে শর্ত'-এর সময় চলাকালেই দ্বিতীয় বাড়িটি শুফ'আর ভিত্তিতে গ্রহণ করতে পারবে। আলোচ্য ইবারতে বলা হয়েছে যে, ক্রেতা দ্বিতীয় বাড়িটি গ্রহণ করার পর যদি প্রথম যে বাড়িটি সে ক্রয় করেছিল সে বাড়িতে যার শুফ'আর অধিকার রয়েছে সে এসে শুফ'আ দাবি করে তাহলে সে কেবল ক্রেতার প্রথম ক্রয়কৃত বাড়িটিই লাভ করবে। ক্রেতা দ্বিতীয় যে বাড়িটি শুফ'আর অধিকার বলে গ্রহণ করেছে তা প্রথম বাড়িটির শফী' লাভ করবে না।

قَوْلُهُ لِانْعِدَامِ مِلْكِهِ فِى الْاُوْلٰى حِيْنَ بِيْعَتِ الثَّانِيَةُ : কেননা দ্বিতীয় বাড়িটি যখন বিক্রয় করা হয়েছে তখন প্রথম বাড়িটিতে উক্ত শফী'র মালিকানা ছিল না। দ্বিতীয় বাড়িটি হচ্ছে প্রথম বাড়িটির পার্শ্বে অবস্থিত। কাজেই দ্বিতীয় বাড়িটিতে শুফ'আ লাভ করার জন্য দ্বিতীয় বাড়িটি যখন বিক্রয় হয়েছে তখন প্রথম বাড়িটি মালিকানা থাকা আবশ্যক ছিল। কিন্তু প্রথম বাড়িটিতে শফী'র মালিকানা সাব্যস্ত হবে সে বাড়িটি গ্রহণ করার পর। কাজেই দ্বিতীয় বাড়িটি বিক্রয়ের সময় প্রথম বাড়িটিতে তার মালিকানা ছিল না। সুতরাং সে দ্বিতীয় বাড়িটি লাভ করবে না, কেবল প্রথম বাড়িটি লাভ করবে। [অবশ্য যা দ্বিতীয় বাড়িটির সাথে সংলগ্ন তার বাড়ি থাকে তাহলে সে দ্বিতীয় বাড়িটিতেও শুফ'আ লাভ করবে।]

قَالَ : وَمَنِ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ فِيْهَا . أَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِعَدَمِ زَوَالِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَبَعْدَ الْقَبْضِ لِاحْتِمَالِ الْفَسْخِ، وَحَقُّ الْفَسْخِ ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ لِدَفْعِ الْفَسَادِ، وَفِيْ إِثْبَاتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ تَقْرِيْرُ الْفَسَادِ فَلَا يَجُوْزُ. بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِيْ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيْحِ، لِأَنَّهُ صَارَ أَخَصَّ بِهِ تَصَرُّفًا، وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَمْنُوْعٌ عَنْهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি ফাসিদ বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে কোনো একটি বাড়ি ক্রয় করে তাহলে তাতে শুফ'আর কোনো অধিকার থাকবে না। হস্তগত করার পূর্বে থাকবে না, তার কারণ তো হলো, বিক্রেতার মালিকানা এখনও চলে যায়নি। আর হস্তগত করার পর [থাকবে না তার] কারণ হলো, চুক্তিটি রহিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই রহিত করণের অধিকার ফাসেদ হওয়ার বিষয়টি দূর করণার্থে শরিয়তের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত করা হলে ফাসেদ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বহাল রাখা হয়। সুতরাং তা জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম হলো, সঠিক বিক্রয় চুক্তিতে যখন ক্রেতার 'খিয়ারে শর্ত' থাকে [অর্থাৎ সেক্ষেত্রে রহিত করার সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও শুফ'আ সাব্যস্ত হয়]। কেননা এক্ষেত্রে ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুতে অধিকার চর্চা করার ব্যাপারে এককভাবে অধিকারপ্রাপ্ত। আর ফাসেদ বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা অধিকার চর্চার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : وَمَنِ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ فِيْهَا : মাসআলা হচ্ছে, কেউ যদি 'ফাসিদ' চুক্তির মাধ্যমে কোনো বাড়ি বা জমি ক্রয় করে তাহলে উক্ত বাড়ি বা জমিতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। ফাসিদ চুক্তি যেমন, মদের বিনিময়ে জমি ক্রয় করা অথবা বাকির মেয়াদ নির্ধারণ না করে বাকিতে ক্রয় করা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ফাসেদ চুক্তির মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করলে চুক্তিটি সংঘটিত হয়ে যায়। তবে চুক্তিটি প্রত্যাহার করে নেওয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার উপর ওয়াজিব। সহীহ চুক্তির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা হলে চুক্তির পরপরই ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু ফাসেদ চুক্তির মাধ্যমে ক্রয় করলে চুক্তির পরপরই ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। তবে ক্রেতা জিনিসটি হস্তগত করলে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

উল্লেখ্য, আল্লামা আইনী (র.) যখীরা গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয় করলে যে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না এ বিধান হচ্ছে, চুক্তি করার সময়ই যদি চুক্তিটি ফাসেদ হয় সেক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে, ক্রয়ের সময় চুক্তিটি সহীহ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে কোনো কারণে তা ফাসেদ হয়েছে তাহলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। যেমন, দুই জিম্মী [অমুসলিম বাসিন্দা] পরস্পরে জমি ক্রয় বিক্রয় করেছে মদের বিনিময়ে অতঃপর তারা পরস্পরে হস্তগত করার পূর্বেই তাদের উভয়ে কিংবা তাদের একজন মুসলমান হয়ে গেল। তাহলে উক্ত চুক্তিটি তাদের জন্য ফাসেদ চুক্তিতে পরিণত হবে। কেননা মদের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় জিম্মীদের জন্য সহীহ। কিন্তু মুসলামান হওয়ার পর উক্ত মদের আদান প্রদান করা জায়েজ নয়; বিধায় চুক্তিটি এখন ফাসেদ চুক্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ফাসেদ যেহেতু পরে হয়েছে তাই উক্ত জমিটিতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ أَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِعَدَمِ زَوَالِ مِلْكِ الْبَائِعِ : এখান থেকে উক্ত মাসআলার তথা ফাসেদ চুক্তিতে বাড়ি ক্রয় করলে তাতে শুফ'আ সাব্যস্ত না হওয়ার মাসআলার দলিল বর্ণনা করছেন। দলিল হচ্ছে এই যে, ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয় করার পর ক্রেতা জমিটি হস্তগত করার পূর্বে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হচ্ছে, 'ফাসেদ' চুক্তিতে ক্রয় করলে হস্তগত করার পূর্বে জিনিসটি বিক্রেতারই মালিকানায় থাকে। ক্রেতা তা হস্তগত করার পূর্বে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। আর পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, জমি যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَبَعْدَ الْقَبْضِ لِاحْتِمَالِ الْفَسْخِ الخ : আর ক্রেতা উক্ত সুরতে [ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয়ের সুরতে] বাড়িটি হস্তগত করার পরও তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হচ্ছে, ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয় বিক্রয় করার পর চুক্তিটি প্রত্যাহার করে নেওয়া ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কর্তব্য এবং তাদের প্রত্যেকেরই অধিকার থাকে চুক্তিটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার। সুতরাং চুক্তিটি যে কোনো সময়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যাহারের মাধ্যমে রহিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই এমতাবস্থায় তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতার যে চুক্তিটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার রয়েছে এ অধিকারটি শরিয়তের পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। যাতে চুক্তিটিতে যে অন্যায় [ফাসাদ] রয়েছে তা দূর করা হয় চুক্তিটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার মাধ্যমে। এমতাবস্থায় যদি শফী'কে শুফ'আর অধিকার প্রদান করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে বিক্রয় চুক্তিটি বহাল রাখা নিশ্চিত করা। ফলে যে অন্যায়টি [ফাসাদ] শরিয়ত দূর করতে চাচ্ছে তা দূর করার সুযোগ দানের পরিবর্তে আরো নিশ্চিতভাবে তা বহাল করে দেওয়া হয়। কাজেই শরিয়তের পক্ষ হতে এরূপ পরস্পর সাংঘর্ষিক বিধান –তথা একই সাথে একটি অন্যায় দূর করার বিধান দেওয়া আবার তা বহাল রাখার বিধান দেওয়া– হতে পারে না। সুতরাং উক্ত সুরতে ক্রেতা হস্তগত করার পরও তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِيْ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيْحِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্ন হতে পারে যে, উপরের দলিলে বলা হয়েছে যে, চুক্তিটি রহিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে [ফাসিদ চুক্তির ক্ষেত্রে] শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। তাহলে সহীহ বিক্রয় চুক্তিতে যখন ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' থাকে তখনও তো শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার কথা। কেননা ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' থাকলে সে ইচ্ছা করলে চুক্তিটি বাতিল করতে পারে। কাজেই চুক্তিটি রহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথচ পূর্বে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' থাকলে সেক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَارَ أَخَصَّ بِهِ تَصَرُّفًا وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَمْنُوْعٌ عَنْهُ : উক্ত প্রশ্নের জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' থাকার সুরতে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে সুরতে চুক্তিটি বাতিল করার অধিকার থাকে কেবল ক্রেতার, বিক্রেতার এ অধিকার থাকে না এবং ক্রেতার যে চুক্তিটি বাতিল করার অধিকার থাকে তা প্রয়োগ করা কেবল তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। শরিয়তের পক্ষ হতে তার উপর কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। ফলে তার ক্রয়কৃত জমিতে সে একচ্ছত্রভাবে অধিকার চর্চা (اَلتَّصَرُّفُ) করার ক্ষমতা লাভ করে। আর যেহেতু ক্রেতার 'অধিকার চর্চা করার ক্ষমতা' অর্জন হওয়ার কারণেই শফী'কে শুফ'আর অধিকার দেওয়া হয়। সেহেতু এক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ফাসেদ চুক্তির ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত জমিতে ক্রেতার অধিকার চর্চা (تَصَرُّفٌ) করা শরিয়তে পক্ষ হতে নিষেধ। উপরন্তু চুক্তিটি প্রত্যাহার করার অধিকার কেবল ক্রেতার নয়; বরং বিক্রেতারও রয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে ক্রয়কৃত জমিতে ক্রেতার একচ্ছত্র অধিকার চর্চা করার ক্ষমতা অর্জিত হয়নি। সুতরাং তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

[উল্লেখ্য, কারো প্রশ্ন হতে পারে যে, ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয় করার পর ক্রয়কৃত জমিতে ক্রেতার অধিকার চর্চা (اَلتَّصَرُّفُ) করা নিষেধ কিভাবে? কারণ ক্রেতা যদি ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয় করার পর তা অন্যের কাছে বিক্রয় করে ফেলে তাহলে সে বিক্রয় সহীহ হয় এবং ক্রেতা সে দ্রব্য আটকে রাখার অধিকার রাখে না।

এর জবাব হচ্ছে, ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয় করার পর অধিকার চর্চা (اَلتَّصَرُّفُ) করা শরিয়তের পক্ষ হতে নিষেধ। কিন্তু নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ তাতে অধিকার চর্চা করে তা বিক্রয় করে তাহলে বিক্রয়ের বিধান তাতে কার্যকর হবে [ক্রেতার মালিকানা থাকার কারণে]। কেননা অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কাজ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিধান তাতে কার্যকর হয়। যেমন, প্রথম স্বামী তিন তালাক দেওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে হায়েযের অবস্থায় সহবাস করে তাহলে উক্ত সহবাসের ফলে [দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলে] মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়।]

قَالَ : فَإِنْ سَقَطَ حَقُّ الْفَسْخِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، لِزَوَالِ الْمَانِعِ ـ وَإِنْ بِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا وَهِيَ فِيْ يَدِ الْبَائِعِ بَعْدُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، لِبَقَاءِ مِلْكِهِ ـ وَإِنْ سَلَّمَهَا إِلَى الْمُشْتَرِيْ فَهُوَ شَفِيْعُهَا، لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ ـ ثُمَّ إِنْ سَلَّمَ الْبَائِعُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ لَهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، كَمَا إِذَا بَاعَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا سَلَّمَ بَعْدَهُ، لِأَنَّ بَقَاءَ مِلْكِهِ فِي الدَّارِ الَّتِيْ يَشْفَعُ بِهَا بَعْدَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَبَقِيَتْ الْمَاخُوذَةُ بِالشُّفْعَةِ عَلَى مِلْكِهِ ـ وَإِنِ اسْتَرَدَّهَا الْبَائِعُ مِنَ الْمُشْتَرِيْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ لَهُ بَطَلَتْ لِانْقِطَاعِ مِلْكِهِ عَنِ الَّتِيْ يَشْفَعُ بِهَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ ـ وَإِنِ اسْتَرَدَّهَا بَعْدَ الْحُكْمِ بَقِيَتِ الثَّانِيَةُ عَلَى مِلْكِهِ، لِمَا بَيَّنَّا ـ

অনুবাদ : গ্রন্থকার বলেন, [ফাসিদ বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে] পরে যদি বিক্রয় চুক্তিটি রহিত করণের অধিকার বাতিল হয়ে যায় তখন আবার শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা যা প্রতিবন্ধক ছিল তা দূরীভূত হয়ে গেছে। আর যদি এই বাড়িটির পার্শ্বে কোনো সম্পত্তি বিক্রয় হয় এবং বাড়িটি তখনও বিক্রেতারই হাতে থেকে থাকে তাহলে বিক্রেতার [পার্শ্ববর্তী সম্পত্তিতে] শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। কেননা তার মালিকানা তো বহাল রয়েছে। আর যদি বিক্রেতা বাড়িটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে থাকে তাহলে ক্রেতাই পার্শ্ববর্তী সম্পত্তির শফী' হবে। কেননা এখন বাড়িটির মালিকানা ক্রেতারই। অবশ্য [হস্তান্তর না করার সুরতে] বিক্রেতা যদি তার পক্ষে শুফ'আর রায় হওয়ার পূর্বে [বাড়িটি] হস্তান্তর করে ফেলে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। যেমন বিক্রয় করে ফেললে [বাতিল হয়ে যায়]। পক্ষান্তরে রায় হওয়ার পরে হস্তান্তর করলে এর ব্যতিক্রম। কেননা যে বাড়িটির ভিত্তিতে শুফ'আর দাবি করে শুফ'আর রায় হওয়ার পর তাতে মালিকানা থাকা শর্ত নয়। সুতরাং শুফ'আর ভিত্তিতে লব্ধ বাড়িটি বিক্রেতার মালিকানায়ই থেকে যাবে। আর [ফাসিদ চুক্তিতে বিক্রীত বাড়িটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করার পরের সুরতে] ক্রেতার পক্ষে শুফ'আর রায় হওয়ার পূর্বেই যদি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি ফেরত গ্রহণ করে তাহলে [পার্শ্ববর্তী সম্পত্তিতে] ক্রেতার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যে বাড়ির ভিত্তিতে সে শুফ'আ দাবি করেছিল শুফ'আর রায় হওয়ার পূর্বেই সে বাড়ির উপর থেকে তার মালিকানা চলে গেছে। আর যদি রায় হওয়ার পরে ফেরত গ্রহণ করে তাহলে দ্বিতীয় [অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী] সম্পত্তিটি ক্রেতার মালিকানায়ই থেকে যাবে, পূর্ব বর্ণিত কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنْ سَقَطَ حَقُّ الْفَسْخِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ : পূর্বের মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছিল যে, ফাসেদ চুক্তির মাধ্যমে ক্রয়কৃত জমিতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। এখানে বলা হচ্ছে, যদি ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয় করার পর ক্রেতা জমিটি হস্তগত করে তাতে এমন কোনো অধিকার চর্চা (تَصَرُّف) করে যার কারণে চুক্তিটি রহিত করার অধিকার বাতিল হয়ে যায়।

তাহলে সে জমিতে তখন শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। যেমন, ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি সে জমিটি আরেকজনের নিকট বিক্রয় করে ফেলে তাহলে প্রথম বিক্রেতার সাথে সম্পাদিত ফাসেদ চুক্তিটি বহাল থাকা নিশ্চিত হয়ে যায় এবং চুক্তিটি রহিত করার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। এভাবে ফাসেদ চুক্তি রহিত করার অধিকার যদি বাতিল হয়ে যায় তখন সে জমিতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

[উল্লেখ্য, ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি জমিতে গৃহ নির্মাণ করে কিংবা তাতে বৃক্ষ রোপণ করে তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চুক্তি রহিত করার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বাতিল হয় না। আর ক্রেতা জমিটি অন্য কারো কাছে বিক্রয় করে ফেললে সকলের ঐকমত্যে চুক্তিটি রহিত করার অধিকার বাতিল হয়ে যায়।]

قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ : উক্ত সুরতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয় করে ক্রেতা জমি হস্তগত করার পর যে প্রতিবন্ধকতার কারণে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না তা এখন দূর হয়ে গেছে। অর্থাৎ পূর্বের মাসআলার দলিলে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ফাসেদ চুক্তিতে ক্রয় করে ক্রেতা জমি হস্তগত করলে তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। তার কারণ হচ্ছে, চুক্তিটি রহিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য হচ্ছে ফাসেদ চুক্তিটি রহিত করা। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় যখন ক্রেতার কোনো অধিকার চর্চা (تَصَرُّفٌ) -এর কারণে চুক্তিটি রহিত করার সম্ভাবনা দূর হয়ে গেছে তখন শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার পথে যে প্রতিবন্ধকতা ছিল [তথা চুক্তি রহিত হওয়ার সম্ভবনা] তা উঠে গেছে। অতএব, তাতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ بِيْعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا وَهِيَ فِيْ يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ফাসেদ চুক্তিতে জমি বা বাড়ি বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি ফাসেদ চুক্তিতে বাড়ি বিক্রয় করার পর বাড়িটি বিক্রেতার দখলেই থাকে আর এমতবস্থায় সে বাড়িটির পাশে আরেকটি বাড়ি কেউ বিক্রয় করে তাহলে প্রথম বাড়ির বিক্রেতা এই দ্বিতীয় বাড়িটিতে প্রতিবেশীত্বের ভিত্তিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। কেননা প্রথম বাড়িতে তার মালিকানা এখনও বহাল রয়েছে। কারণ ফাসেদ চুক্তিতে কোনো কিছু বিক্রয় করা হলে তা ক্রেতা হস্তগত করার পূর্ব পর্যন্ত তাতে বিক্রেতার মালিকানাই বহাল থাকে [যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে]। সুতরাং প্রথম বাড়িতে যখন বিক্রেতার মালিকানা বহাল আছে তখন পার্শ্ববর্তী বিক্রীত বাড়িতে সেই শুফ'আর অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ سَلَّمَهَا إِلَى الْمُشْتَرِيْ فَهُوَ شَفِيْعُهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ : আর ফাসেদ চুক্তিতে বিক্রয় করার পর যদি বাড়িটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেয় আর এমতাবস্থায় পার্শ্ববর্তী বাড়ি বিক্রয় হয় তাহলে ক্রেতা সেই পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। কেননা প্রথম বাড়িটিতে ক্রেতার মালিকানা অর্জিত হয়েছে। কারণ ফাসেদ চুক্তিতে কোনো কিছু ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি তা হস্তগত করে তখন তাতে ক্রেতার মালিকানা অর্জিত হয় [এ সম্পর্কে كِتَابُ الْبُيُوْعِ -এর ৪৬ নং পৃষ্ঠায় فَصْلٌ فِيْمَا يُكْرَهُ -এর শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে]। সুতরাং পার্শ্ববর্তী বাড়িটি বিক্রয়কালে প্রথম বাড়িটিতে যখন ক্রেতার মালিকানা ছিল তখন ক্রেতাই পার্শ্ববতী বাড়িটিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ سَلَّمَ الْبَائِعُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ لَهُ : উপরে বর্ণিত দু'টি সুরতের প্রথম সুরতে তথা ফাসেদ চুক্তিতে বাড়ি বিক্রয় করার পর বাড়িটি বিক্রেতার দখলে থাকাবস্থায় যদি পার্শ্ববর্তী বাড়ি বিক্রয় হয়। এ সুরতে বিধান উল্লেখ করা হয়েছিল যে, বিক্রেতাই পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। কেননা মালিকানা তারই বহাল রয়েছে। আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ সুরতে বিক্রেতার পক্ষে বিচারক শুফ'আর রায় দেওয়ার পূর্বেই যদি বিক্রেতা প্রথম বাড়িটি [যেটি সে ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় করেছে সেটি] ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেয় তাহলে পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে তার যে শুফ'আর অধিকার অর্জিত হয়েছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যে বাড়ির মালিকানার ভিত্তিতে শুফ'আর অধিকার অর্জিত হয় শুফ'আর রায় হওয়া পর্যন্ত সে বাড়িতে শফী'র মালিকানা বহাল থাকা আবশ্যক। আর এখানে তা বহাল থাকেনি। কেননা ফাসেদ চুক্তিতে বিক্রয় করার পর ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করলে ক্রেতার মালিকানা অর্জিত হয়।

সুতরাং বিক্রেতার মালিকানা যেহেতু রায় হওয়ার পূর্বে চলে গেছে তাই তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। كَمَا إِذَا بَاعَ যেমন, কারো জমির পার্শ্ববর্তী জমি বিক্রয় হওয়ার পর যদি সে তাতে শুফ'আর অধিকার দাবি করে তাহলে সে তা লাভ করে। কিন্তু তার পক্ষে শুফ'আর রায় হওয়ার পূর্বেই যদি সে তার নিজের জমিটি কারো নিকট [সহীহ চুক্তির মাধ্যমে] বিক্রয় করে ফেলে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যায়। কেননা সহীহ চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় করলে বিক্রয়ের সাথে সাথেই ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আর ফাসেদ চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় করলে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করার পর ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَلَّمَ بَعْدَهُ : পক্ষান্তরে উক্ত সুরতে [অর্থাৎ ফাসেদ চুক্তিতে বিক্রয় করার পর বিক্রেতার দখলে বাড়িটি থাকার সুরতে] যদি বিক্রেতার পক্ষে পার্শ্ববর্তী বাড়িটির শুফ'আর রায় হয়ে যায়। তারপর বিক্রেতা প্রথম বাড়িটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে তাহলে পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে সে যে শুফ'আর রায় পেয়েছে তা আর বাতিল হবে না। সে পার্শ্ববর্তী বাড়িটি শুফ'আর ভিত্তিতে নিতে পারবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ بَقَاءَ مِلْكِهِ فِى الدَّارِ الَّتِى يَشْفَعُ بِهَا الخ : উক্ত বিধানের কারণ হচ্ছে, যে বাড়ির মালিকানার ভিত্তিতে শফী' শুফ'আর দাবি করে বিচারক শুফ'আর রায় দেওয়ার পর সে বাড়িতে শফী'র মালিকানা বহাল থাকা শর্ত থাকে না। কাজেই রায় হওয়ার পর সে বাড়িটি শফী'র মালিকানা থেকে চলে গেলে তাতে শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। সুতরাং উক্ত সুরতে বিক্রেতা যেহেতু বাড়িটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করেছে তার পক্ষে পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে শুফ'আর রায় হওয়ার পরে। সেহেতু পার্শ্ববর্তী বাড়িটি শুফ'আর ভিত্তিতে সে গ্রহণ করতে পারবে এবং সেটি তার মালিকানায়ই থাকবে।

قَوْلُهُ وَإِنِ اسْتَرَدَّهَا الْبَائِعُ مِنَ الْمُشْتَرِى قَبْلَ الْحُكْمِ الخ : এ ইবারতে বর্ণিত মাসআলাটি দুই লাইন উপরে বর্ণিত মাসআলা (وَإِنْ سَلَّمَهَا إِلَى الْمُشْتَرِى فَهُوَ شَفِيعُهَا) -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। দুই লাইন উপরে বর্ণনা করা হয়েছিল যে, যদি ফাসিদ চুক্তিতে বাড়ি বিক্রয় করার পর ক্রেতার নিকট বাড়িটি হস্তান্তর করা হয় তারপর সে বাড়ির পার্শ্ববর্তী বাড়ি বিক্রয় হয় তাহলে ক্রেতাই পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বলেন, কিন্তু এ সুরতে যদি ক্রেতার পক্ষে পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে শুফ'আর রায় হওয়ার পূর্বেই বাড়িটি বিক্রেতা ফেরত নিয়ে নেয়। তাহলে ক্রেতার পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে বাড়ির মালিকানার ভিত্তিতে শফী শুফ'আর দাবি করে রায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাতে তার মালিকানা বহাল থাকা আবশ্যক। আলোচ্য সুরতে রায় হওয়ার পূর্বেই যেহেতু বিক্রেতা [ফাসেদ চুক্তি প্রত্যাহার করে] বাড়িটি ফেরত নিয়েছে সেহেতু শফী' তথা ক্রেতা যে বাড়ির মালিকানার ভিত্তিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করেছিল তা তার মালিকানা থেকে চলে গেছে। সুতরাং তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

[উল্লেখ্য, এ সুরতে বিক্রেতাও পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না। কেননা পার্শ্ববর্তী বাড়িটি বিক্রয়কালে প্রথম বাড়িটিতে তার মালিকানা ছিল না, তখন তো বাড়িটি ছিল ক্রেতার মালিকানায়। আর শুফ'আর অধিকার লাভ করার জন্য বিক্রয়ের সময়ে মালিকানা থাকা আবশ্যক।]

قَوْلُهُ وَإِنِ اسْتَرَدَّهَا بَعْدَ الْحُكْمِ بَقِيَتِ الثَّانِيَةُ عَلَى مِلْكِهِ : আর যদি প্রথম বাড়িটি [যেটি ফাসেদ চুক্তিতে বিক্রয় হয়েছে] ক্রেতার দখলে থাকাকালে পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে তার পক্ষে শুফ'আর রায় হয়ে যায়। তারপর বিক্রেতা প্রথম বাড়িটি ফেরত নেয় তাহলে দ্বিতীয় বাড়িটিতে ক্রেতার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না এবং সেটি সে গ্রহণ করে থাকলে তা তার মালিকানায়ই থাকবে।

قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّا : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ বিধানের কারণ তাই যা আমরা ইতো পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর দ্বারা মুসান্নিফ (র.) দুই লাইন উপরে বর্ণিত ইবারত لِأَنَّ بَقَاءَ مِلْكِهِ فِى الدَّارِ الَّتِى يُشْفَعُ بِهَا بَعْدَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উক্ত ইবারতে মুসান্নিফ বলেছিলেন, যে বাড়ির মালিকানার ভিত্তিতে শফী' তার শুফ'আর দাবি করে তার পক্ষে শুফ'আর রায় হওয়ার পরে সে বাড়িতে তার মালিকানা বহাল থাকা শর্ত নয়। কাজেই আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু ক্রেতার পক্ষে পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে শুফ'আর রায় হওয়ার পর প্রথম বাড়িটি বিক্রেতা ফেরত নিয়েছে। সেহেতু পার্শ্ববর্তী বাড়িটিতে ক্রেতার শুফ'আ বহাল থাকবে এবং সে বাড়িটি গ্রহণ করে থাকলে সেটি তার মালিকানায়ই বহাল থাকবে।

قَالَ : وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعِقَارَ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَةِ، لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيْهَا مَعْنَى الْإِفْرَازِ، وَلِهٰذَا يَجْرِىْ فِيْهِ الْجَبْرُ وَالشُّفْعَةُ مَا شُرِعَتْ إِلَّا فِى الْمُبَادَلَةِ الْمُطْلَقَةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন অংশীদারগণ স্থাবর সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয় তখন এই বণ্টনের কারণে তাদের প্রতিবেশীর কোনো শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা বণ্টনের মাঝে স্বীয় অংশ পৃথক করে নেওয়ার অর্থ নিহিত রয়েছে। এ কারণেই তো বণ্টনে রাজি হতে বাধ্য করা যায়। আর শুফ'আ তো শরিয়তে নির্ধারিত হয়েছে কেবল সর্বাঙ্গিকভাবে পারস্পরিক বিনিময় করণের ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعِقَارَ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَةِ : মাসআলা হচ্ছে, যদি কোনো জমি কয়েকজন অংশীদারের শরিকানা মালিকানাধীন হয় আর উক্ত অংশীদারগণ জমিটি তাদের প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বণ্টন করে নেয় তাহলে তাদের এ বণ্টন করার কারণে উক্ত জমির পার্শ্ববর্তী জমির মালিকগণ [তথা প্রতিবেশীগণ] কোনো প্রকার শুফ'আর দাবি করতে পারবে না। অর্থাৎ বিক্রয়ের কারণে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় কিন্তু পূর্ব মালিকানাধীন জমি বণ্টনের কারণে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيْهَا مَعْنَى الْإِفْرَازِ وَلِهٰذَا يَجْرِىْ فِيْهِ الْجَبْرُ الخ : বণ্টনের ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হচ্ছে, বণ্টনের দ্বারা একজনের সম্পদের বিনিময়ে আরেকজনের সম্পদ গ্রহণ করা হয় না। বরং বণ্টনের অর্থ হচ্ছে اَلْإِفْرَازُ অর্থাৎ নিজের অংশকে অপরের অংশ থেকে পৃথক করে নেওয়া। এ কারণে একজন অংশীদার যদি তার অংশ বণ্টন করে নিতে চায় আর অপরজন বণ্টন করতে রাজি না হয় তাহলে বিচারক অপরজনকে বণ্টন করে দিতে বাধ্য করতে পারে। কেননা সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের অংশ নিজের অংশের সাথে মিলিয়ে রাখার অধিকার কারো নেই। যদি বণ্টনের মাঝে বিক্রয় বা 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ'-এর অর্থ থাকত তাহলে বিচারক অপর অংশীদারকে বণ্টনে বাধ্য করতে পারতেন না। কেননা বিক্রয় তথা 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ' এর চুক্তি উভয় পক্ষের সম্মতির উপর নির্ভর করে। বিচারক তাতে কাউকে বাধ্য করতে পারে না।

সুতরাং বণ্টনের অর্থ যেহেতু নিজের সম্পত্তি অন্যের সম্পত্তি হতে পৃথক করা সেহেতু বণ্টনের কারণে কোনো প্রকার শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, শরিয়তে শুফ'আর অধিকার প্রদান করা হয়েছে কেবল সেক্ষেত্রে যেখানে পূর্ণরূপে একজনের সম্পদের বিনিময়ে আরেকজনের সম্পদ আদান প্রদান করার বিষয়টি বিদ্যমান থাকে। আর বণ্টনের ক্ষেত্রে তা নেই।

قَالَ : وَإِذَا اشْتَرٰى دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيْعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْتَرِىْ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيْعِ . لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَعَادَ إِلٰى قَدِيْمِ مِلْكِهِ، وَالشُّفْعَةُ فِىْ إِنْشَاءِ الْعَقْدِ، وَلَا فَرْقَ فِىْ هٰذَا بَيْنَ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ একটি বাড়ি ক্রয় করে আর শফী' শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয়। অতঃপর ক্রেতা 'না দেখার কারণে ইচ্ছাধিকার' কিংবা 'শর্তের কারণে ইচ্ছাধিকার অথবা বিচারকের রায়ের মাধ্যমে 'ত্রুটি জনিত ইচ্ছাধিকার' বলে বাড়িটি ফেরত দেয়। তাহলে শফী'র [পুনরায়] শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা এই ফেরত প্রদানের চুক্তি সর্বতোভাবেই রহিত হয়েছে। কাজেই বাড়িটি বিক্রেতার পূর্বের মালিকানায়ই ফিরে এসেছে। আর শুফ'আ তো সাব্যস্ত হয় নতুন চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে। আর এ ক্ষেত্রে [ক্রেতার] হস্তগত করা বা না করার মাঝে [বিধানের দিক থেকে] কোনো পার্থক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا اشْتَرٰى دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيْعُ الشُّفْعَةَ الخ : মাসআলা হচ্ছে, কেউ যদি কোনো বাড়ি ক্রয় করে এবং শফী' বাড়িটিতে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয়। তারপর আবার ক্রেতা বাড়িটি নিম্নের তিনটি কারণের মধ্য হতে যে কোনো কারণে বিক্রেতাকে ফেরত দেয় তাহলে এই ফেরত দেওয়ার পর শফী' তাতে পুনরায় শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে না। কারণগুলো যথাক্রমে নিম্নরূপ–

১. خِيَارُ رُؤْيَةٍ এর কারণে। অর্থাৎ বাড়িটি যদি ক্রেতা না দেখে ক্রয় করে থাকে। অতঃপর দেখার পর তার পছন্দ না হয় এবং না দেখে ক্রয় করলে দেখার পর যে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার থাকে সেই ইচ্ছাধিকারের ভিত্তিতে বিক্রেতাকে বাড়িটি ফেরত দেয়। তাহলে এই ফেরত দেওয়ার কারণে শফী' নতুনভাবে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না।

২. خِيَارُ شَرْطٍ এর কারণে। অর্থাৎ ক্রেতা যদি বাড়িটি এ শর্তে ক্রয় করে যে, আমার তিন দিন ভেবে চিন্তে দেখার অধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে আমি তিন দিনের ভিতর বাড়িটি ফেরত দিতে পারব। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রেতা যদি خِيَارُ شَرْطٍ -এর ভিত্তিতে বাড়ি ক্রয় করে তাহলে শফী' তাতে শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারে। কিন্তু শফী' যদি তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয় এরপর উক্ত তিন দিনের মধ্যে ক্রেতা বাড়িটি বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে শফী' পুনরায় শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে না।

৩. بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ "বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে 'খিয়ারে আয়েব' -এর ভিত্তিতে ফেরত দিলে।" অর্থাৎ ক্রেতা যদি বাড়িটি ক্রয় করার পর তাতে কোনো ত্রুটি দেখতে পায় এবং এ ত্রুটির কারণে বাড়িটি বিক্রেতাকে ফেরত দেয় বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে তাহলে শফী' পুনরায় উক্ত বাড়িতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না। [আর যদি বিচারকের ফয়সালা ব্যতিরেকে ফেরত দেয় তার বিধান কি হবে সে সম্পর্কে পরবর্তী ইবারতে আলোচনা করা হয়েছে।]

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَعَادَ إِلَى قَدِيْمِ مُلْكِهِ : উক্ত তিন সুরতে বাড়ি ফেরত দিলে শফী' নতুন করে শুফ'আর অধিকার লাভ না করার কারণ হচ্ছে, উক্ত তিনভাবে তথা خِيَارُ رُؤْيَةٍ এর ভিত্তিতে, خِيَارُ شَرْطٍ -এর ভিত্তিতে কিংবা বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে خِيَارُ عَيْبٍ -এর ভিত্তিতে ফেরত দিলে পূর্বের বিক্রয় চুক্তি পরিপূর্ণভাবে রহিত হয়ে যায়, এরূপ ফেরত দেওয়া নতুন চুক্তি বলে গণ্য হয় না। কাজেই পূর্বের বিক্রয়-চুক্তি যখন রহিত হয়ে গেছে তখন বাড়িটি বিক্রেতার পূর্বের মালিকানায় ফেরত এসেছে। নতুন করে তার মালিকানা অর্জিত হয়েছে তা নয়। কেননা রহিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, যেন বিক্রয় চুক্তিটি হয়ই নি। কাজেই শফী' এক্ষেত্রে নতুন করে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না। কেননা শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় কেবল যেখানে চুক্তি সৃষ্টি করে মালিকানা লাভ হয়। এখানে তা হয়নি বরং চুক্তি রহিত হয়ে পূর্বের মালিকানায় বাড়িটি ফিরে এসেছে। অতএব, এক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ فِيْ هٰذَا بَيْنَ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ : "এক্ষেত্রে [ক্রেতার] হস্তগত করা বা না করার মাঝে [বিধানের দিক থেকে] কোনো পার্থক্য নেই।" অর্থাৎ উপরে যে বাড়িটি ফেরত দেওয়ার তিনটি সুরতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে তৃতীয় সুরতটি তথা বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে যদি خِيَارُ عَيْبٍ -এর ভিত্তিতে ফেরত দেয়– এ সুরতে ক্রেতা চাই বাড়িটি হস্তগত করার পরে ফেরত দিক কিংবা হস্তগত না করেই ফেরত দিক উভয় ক্ষেত্রেই একই বিধান। শফী' নতুন করে শুফ'আর অধিকার পাবে না।

এ কথাটি এখানে মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, خِيَارُ عَيْبٍ -এর ভিত্তিতে যদি বিচারকের ফয়সালা ব্যতিরেকে ক্রেতা বাড়িটি ফেরত দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে হস্তগত করা ও না করার মাঝে বিধানের পার্থক্য রয়েছে। হস্তগত না করে ফেরত দিলে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু হস্তগত করার পর ফেরত দিলে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়। এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) পরবর্তী ইবারতে আলোচনা করছেন।

وَإِنْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فَلِلشَّفِيْعِ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِيْ حَقِّهِمَا لِوِلَايَتِهِمَا عَلٰى أَنْفُسِهِمَا وَقَدْ قَصَدَ الْفَسْخَ وَهُوَ بَيْعٌ جَدِيْدٌ فِيْ حَقِّ ثَالِثٍ لِوُجُوْدِ حَدِّ الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِيْ وَالشَّفِيْعُ ثَالِثٌ. وَمُرَادُهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ، لِأَنَّ قَبْلَهُ فَسْخٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ عَلٰى مَا عُرِفَ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَلَا شُفْعَةَ فِيْ قِسْمَةٍ وَلَا خِيَارَ رُؤْيَةٍ وَهُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ لَا شُفْعَةَ بِسَبَبِ الرَّدِّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِمَا بَيَّنَّاهُ، وَلَا تَصِحُّ الرِّوَايَةُ بِالْفَتْحِ عَطْفًا عَلَى الشُّفْعَةِ، لِأَنَّ الرِّوَايَةَ مَحْفُوْظَةٌ فِيْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الْقِسْمَةِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ، لِأَنَّهُمَا يَثْبُتَانِ لِخَلَلٍ فِي الرِّضَاءِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ لُزُوْمُهُ بِالرِّضَاءِ، وَهٰذَا الْمَعْنٰى مَوْجُوْدٌ فِي الْقِسْمَةِ. وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

অনুবাদ : আর যদি [উক্ত সুরতে] ক্রেতা দোষজনিত ইচ্ছাধিকার বলে বিচারকের রায় ব্যতীত ফেরত প্রদান করে কিংবা উভয়ে [সম্মতিক্রমে] বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে শফী'র [পুনরায়] শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা এই ফেরত প্রদান কেবল ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রেই [বিক্রয়] রহিতকরণ বলে গণ্য হয়। যেহেতু তাদের নিজেদের ব্যাপারে তাদের অধিকার রয়েছে, আর তারা উভয়ে চুক্তিটি রহিত করার ইচ্ছা করেছে। কিন্তু রহিতকরণ তৃতীয় পক্ষের ক্ষেত্রে নতুন বিক্রয় বলে গণ্য হয়। কারণ তাতে বিক্রয়ের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। বিক্রয়ের সংজ্ঞা হলো, পরস্পরে সম্মতিক্রমে সম্পদের পরিবর্তে সম্পদ বিনিময় করা। আর শফী' হচ্ছে তৃতীয় পক্ষ। এখানে ফেরত দেওয়ার অর্থ হচ্ছে [ক্রেতা] হস্তগত করার পর ত্রুটিজনিত কারণে ফেরত দেওয়া। কেননা হস্তগত করার পূর্বে ফেরত প্রদান করা হলে তা বিচারকের রায় ব্যতীত হলেও মূল চুক্তিই রহিত করে। যার কারণ পূর্বেই জানা হয়ে গেছে। 'জামিউস সগীর' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বণ্টন ও 'না দেখার কারণে ইচ্ছাধিকার'-এর ক্ষেত্রে কোনো শুফ'আ নেই। এখানে خِيَارُ শব্দের ر অক্ষরটি [قِسْمَةٌ এর উপর عطف হয়ে] যের যুক্ত হবে। অর্থ হচ্ছে 'না দেখার ইচ্ছাধিকার বলে ফেরত দেওয়ার কারণে কোনোরূপ শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। কারণ তা-ই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এখানে [خِيَارٌ শব্দটির ر অক্ষরটি] شُفْعَةٌ শব্দের উপর عَطْف [সম্পর্কিত] হিসেবে যবরযুক্ত পড়ার বর্ণনা সঠিক নয়। কেননা [জামিউস সগীর গ্রন্থের] 'বণ্টন অধ্যায়'-এ এই মর্মে বর্ণনা সংরক্ষিত রয়েছে যে, বণ্টনের ক্ষেত্রে 'না দেখার ইচ্ছাধিকার' ও 'শর্তের কারণে ইচ্ছাধিকার' সাব্যস্ত হবে। কেননা এ দু'টি ইচ্ছাধিকার সাব্যস্তই হয় যে সকল বিষয় অপরিহার্যভাবে কার্যকর হওয়া [চুক্তিকারীর] সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল সে সকল ক্ষেত্রে সন্তুষ্টির মাঝে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকার কারণে। আর এ বিষয়টি বণ্টনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ تَقَايَلَا الْبَيْعَ الخ : এ ইবারতটুকু পূর্বের ইবারতের সাথে সংশ্লিষ্ট। পূর্বের ইবারতে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছিল যে, ক্রেতা বাড়ি ক্রয় করার পর শফী' যদি তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয়, তারপর ক্রেতা বাড়িটি বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে خِيَارُ عَيْبٍ -এর ভিত্তিতে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেয় তাহলে শফী' নতুন করে আবার শুফ'আর দাবি করতে পারবে না। আলোচ্য ইবারতে বলা হয়েছে যে, পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি বিচারকের ফয়সালা ব্যতিরেকে خِيَارُ عَيْبٍ -এর ভিত্তিতে বাড়িটি বিক্রেতাকে ফেরত দেয় তাহলে শফী নতুন করে আবার শুফ'আর দাবি করতে পারবে। ঠিক একইভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিক্রয় চুক্তিটি প্রত্যাহার করে নেয় এবং এর ফলে ক্রেতা বাড়িটি ফেরত দেয় তাহলেও শফী' নতুনভাবে শুফ'আর দাবি করতে পারবে।

[উল্লেখ্য, ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত এবং এক রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আহমাদ (র.)-এর অভিমতও আমাদের মাযহাবের অনুরূপ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিক্রয় চুক্তি যেভাবেই রহিত হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই শফী' পুনরায় শুফ'আর অধিকারী হবে না। এটি ইমাম যুফার ও প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আহমাদ (র.)-এরও অভিমত।]

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِي حَقِّهِمَا لِوِلَايَتِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا : উক্ত দুই সুরতে অর্থাৎ বিচারকের ফয়সালা ছাড়া خِيَارُ عَيْبٍ এর ভিত্তিতে ফেরত দিলে কিংবা উভয়ের সম্মতিক্রমে চুক্তি প্রত্যাহারের মাধ্যমে ফেরত দিলে শফী' কিভাবে নতুন করে শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে তার কারণ বর্ণনা করছেন। কারণ হচ্ছে, উক্ত দুই সুরতে যে ক্রেতা বাড়িটি ফেরত দিয়েছে এটি তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে [অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে] কেবল চুক্তি রহিতকরণ (فَسْخٌ) বলে গণ্য হবে আর অন্যদের ক্ষেত্রে এই ফেরত দেওয়াকে নতুন ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য করা হবে। তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে 'রহিতকরণ' (فَسْخٌ) ধরা হবে, তার কারণ হচ্ছে, তারা উভয়ে এক্ষেত্রে পূর্বের চুক্তিটি রহিত করারই ইচ্ছা করেছে নতুনভাবে ক্রয় বিক্রয় করার ইচ্ছা করেনি। আর প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের ক্ষেত্রে স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করার কর্তৃত্ব থাকে। কাজেই তারা নিজেদের ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে নতুনভাবে ক্রয় বিক্রয়ও করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে পূর্বের চুক্তি রহিত করে জমিটি ফেরত দিতে পারে। অতএব, যখন তারা পূর্বের চুক্তি রহিত করে ফেরত দেওয়া নেওয়ার ইচ্ছা করেছে তখন তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে এই দেওয়া নেওয়াকে পূর্বের চুক্তি 'রহিতকরণ' বলেই গণ্য করা হবে।

আর তৃতীয় পক্ষ তথা শফী'র ক্ষেত্রে উক্ত ফেরত দেওয়াকে নতুনভাবে ক্রয় বিক্রয় বলে গণ্য করা হবে। তার কারণ হচ্ছে, শফী'র উপর ক্রেতা ও বিক্রেতার কোনো কর্তৃত্ব নেই। কাজেই ক্রেতা যে জমিটি বিক্রেতাকে পুনরায় দিয়েছে তা কি ফেরত দেওয়া হিসেবে দিয়েছে নাকি নতুনভাবে ক্রয় বিক্রয় হিসেবে দিয়েছে তা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা কি ইচ্ছা করেছে তা ধর্তব্য হবে না। বরং এখানে বিষয়টি কি হয়েছে তা ধর্তব্য হবে। আর এখানে যে বিষয়টি সংঘটিত হয়েছে তা ক্রয় বিক্রয়ের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ক্রয় বিক্রয়ের সংজ্ঞা হচ্ছে, مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِىْ "পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ আদান প্রদান।" আলোচ্য সুরতে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে ক্রেতা তার জমিটি বিক্রেতাকে দিয়েছে এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য দিয়ে দিয়েছে। কাজেই, এখানে ক্রয় বিক্রয়ের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হচ্ছে। সুতরাং শফী'র ক্ষেত্রে উক্ত ফেরত দেওয়াকে নতুনভাবে ক্রয় বিক্রয় বলে গণ্য করা হবে এবং এর ফলে সে পুনরায় শুফ'আর অধিকার লাভ করবে

قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে 'মতনে' যে বলা হয়েছে وَإِنْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ بِغَيْرِ قَضَاءٍ অর্থাৎ "বিক্রেতা যদি বাড়িটি কোনো ত্রুটির কারণে বিচারকের ফয়সালা ব্যতিরেকে ফেরত দেয় [তাহলে তাতে পুনরায় শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে]"– এখানে ফেরত দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, বাড়িটি হস্তগত করার পরে ফেরত দেওয়া। হস্তগত করার পূর্বে ফেরত দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ বিচারকের ফয়সালা ব্যতীত ক্রেতা কোনো ত্রুটির কারণে বাড়িটি ফেরত দিলে তাতে শফী' পুনরায় শুফ'আর অধিকার লাভ করবে ঠিক, কিন্তু এই অধিকার কেবল তখনই লাভ করবে যখন ক্রেতা বাড়িটি হস্তগত করার পরে বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি বাড়িটি হস্তগত করার পূর্বেই কোনো ত্রুটির কারণে তা বিক্রতাকে ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে তাতে শফী'র পুনারায় শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। এক্ষেত্রে বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে ফেরত দেওয়ার যে বিধান বিচারকের ফয়সালা ব্যতিরেকে ফেরত দেওয়ারও ঠিক একই বিধান, কোনো অবস্থাতেই শফী' পুনরায় শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না। তথা শুফ'আ করার অধিকার লাভ করবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّ قَبْلَهُ فَسْخٌ مِنَ الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ : হস্তগত করার পূর্বে বাড়ি ফেরত দিলে তাতে পুনরায় শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হচ্ছে- কোনো কিছু ক্রয় করার পর তা হস্তগত করার পূর্বেই যদি কোনো ত্রুটির কারণে বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে এর দ্বারা মূল চুক্তিটিই রহিত হয়ে যায়। নতুন ক্রয় বিক্রয় বলে গণ্য করার সম্ভাবনা এখানে থাকে না। কেননা নতুন ক্রয় বিক্রয় হওয়ার জন্য পূর্বের ক্রয় বিক্রয়ের কার্য (اَلصَّفْقَةُ) পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। আর হস্তান্তর না করা পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয়ের কার্য পূর্ণ হয় না। কেননা পূর্ণতা লাভ হয় কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্য ও সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে। এ দু'টি অর্জিত হয় ক্রেতা বস্তুটি হস্তগত করার পরে। সুতরাং হস্তগত করার পূর্বে যেহেতু ক্রয় বিক্রয়ের কার্য পূর্ণতা লাভ করে না সেহেতু ক্রেতার ফেরত দেওয়াকে নতুন ক্রয় বিক্রয় বলে গণ্য করা সম্ভব নয়। কাজেই এরূপ ফেরত দেওয়াকে পূর্বের চুক্তি রহিতকরণ বলেই গণ্য করা হবে। চাই তা বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা ছাড়াই হোক।

قَوْلُهُ عَلَى مَا عُرِفَ : "যার কারণ পূর্বেই জানা হয়েছে।" অর্থাৎ ক্রয় করার পর হস্তগত করার পূর্বেই ফেরত দিলে তাতে মূল চুক্তিটিই যে রহিত হয়ে যায় এর কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা বলে মুসান্নিফ (র.) যে ইবারতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা তিনি بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ -এর শেষে হিদায়া ৩য় খণ্ডের ২৩ নং পৃষ্ঠায় بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ -এর একটু উপরে উল্লেখ করেছেন। সেখানকার ইবারতের সারকথা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। নিম্নে সে ইবারত এবং তৎসংশ্লিষ্ট হাশিয়া বা টীকা উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো-

لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ، لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ. (وَفِي الْحَاشِيَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ تَمَامَ الصَّفْقَةِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِانْتِهَاءِ الْأَحْكَامِ وَالْمَقْصُودِ، وَذٰلِكَ لَا يَكُوْنُ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَثُبُوْتُ مِلْكِ الْيَدِ)

قَوْلُهُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَلَا شُفْعَةَ فِيْ قِسْمَةٍ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত জামিউস সগীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরিকি জমি বণ্টন করার ক্ষেত্রে এবং 'খিয়ারে রুইয়াত'এর ভিত্তিতে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

এ দু'টি ক্ষেত্রে যে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না তা উপরে 'মতনে' উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম মাসআলা তথা বণ্টনের ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার মাসআলা ৭ লাইন উপরে وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعَقَارَ فَلَا شُفْعَةَ الخ -এ ইবারতে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় মাসআলা তথা 'খিয়ারে রুইয়াত' -এর ক্ষেত্রে শুফ'আ না থাকার মাসআলা ৫ লাইন উপরে وَإِذَا اشْتَرٰى دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيْعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْتَرِيْ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ الخ -এ ইবারতে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে উপরে মাসআলা দু'টি উল্লেখ করা সত্ত্বেও 'জামিউস সগীর' গ্রন্থ হতে আলোচ্য ইবারতটুকু মুসান্নিফ (র.) উদ্ধৃত করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, 'জামিউস সগীর'-এর এ ইবারতটুকু দু'ই ভাবে বর্ণিত আছে। তন্মধ্য হতে কোন্ বর্ণনাটি সঠিক এবং কোন্টি সঠিক নয় এবং কেন সঠিক নয় তা এখানে তিনি আলোচনা করতে চেয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَا شُفْعَةَ فِيْ قِسْمَةٍ وَلَا خِيَارَ رُؤْيَةٍ وَهُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ مَعْنَاهُ لَا شُفْعَةَ بِسَبَبِ الرَّدِّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ : এ ইবারতটুকু যে দু'ই ভাবে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্য হতে প্রথম বর্ণনা হচ্ছে, خِيَارٌ শব্দটির ر অক্ষরটি كَسْرَةٌ বা যের সহকারে [তথা خِيَارٌ শব্দটি এর পূর্বের قِسْمَةٌ শব্দের উপর عَطْف]। এই বর্ণনা অনুসারে 'জামিউস সগীর'-এর এ ইবারতের অর্থ হচ্ছে, শরিকি জমি বণ্টন করার ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না, অনুরূপভাবে 'খিয়ারে রুইয়াত'-এর ভিত্তিতে জমি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রেও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো বাড়ি না দেখে ক্রয় করে, আর শফী' তখন তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয়, তারপর ক্রেতা বাড়িটি দেখার পর পছন্দ না হওয়ায় 'খিয়ারে রুইয়াত'-এর অধিকার বলে ফেরত দেয় তাহলে শফী' পুনারায় শুফ'আর অধিকার দাবি করতে পারবে না। এর কারণ মুসান্নিফ (র.) পূর্বে বর্ণনা করেছেন যে, 'খিয়ারে রুইয়াত'-এর ভিত্তিতে ফেরত দেওয়ার ফলে পূর্বের চুক্তিই মূল হতে রহিত হয়ে যায়। একে নতুন চুক্তি হিসেবে গণ্য করার সম্ভাবনা নেই। কেননা নতুন চুক্তি গণ্য হতে পারে কেবল যেখানে উভয়ের সম্মতিক্রমে ফেরত দিতে হয়, অথচ 'খিয়ারে রুইয়াত'-এর ক্ষেত্রে বিক্রেতার সম্মতি ছাড়াই ক্রেতা ফেরত দিতে পারে। কাজেই তা নতুন চুক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং ফেরত দেওয়ার কারণে উক্ত বাড়িতে পুনরায় শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّاهُ : "যার কারণ আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি"– এ কথা বলে মুসান্নিফ (র.) 'খিয়ারে রুইয়াত'-এর ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হিসেবে ৫ লাইন উপরে যে ইবারত উল্লেখ করেছেন তার প্রতি ইশারা করেছেন। ইবারতটুকু হচ্ছে, لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَعَادَ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَالشُّفْعَةُ فِي إِنْشَاءِ الْعَقْدِ। এর সারকথা আমরা সবেমাত্র উল্লেখ করে এসেছি।

قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ الرِّوَايَةُ بِالْفَتْحِ عَطْفًا عَلَى الشُّفْعَةِ الخ : জামিউস সগীর-এর ইবারত وَلَا شُفْعَةَ فِي قِسْمَةٍ وَلَا خِيَارَ رُؤْيَةٍ যে দুইভাবে বর্ণিত হয়েছে তার দ্বিতীয় বর্ণনা হচ্ছে, خِيَارَ শব্দটির ر অক্ষর যবর (فَتْحَةٌ) সহকারে। এ বর্ণনা অনুসারে خِيَارَ رُؤْيَةٍ শব্দটি পূর্বের شُفْعَةَ শব্দের উপর عَطْف। এ বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত ইবারতের অর্থ হচ্ছে, শরিকি জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকারও সাব্যস্ত হবে না এবং 'খিয়ারে রুইয়াত'-ও সাব্যস্ত হবে না। অর্থাৎ অংশীদারগণ যখন তাদের শরিকি জমি নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নিবে তখন সে জমিতে এই বণ্টনের কারণে কেউ শুফ'আ দাবি করতে পারবে না। আর বণ্টন করার পর অংশীদারগণের মধ্য হতে কারো নিজ অংশটুকু দেখার পর তা পছন্দ না হলে 'খিয়ারে রুইয়াত'-এর ভিত্তিতে ফেরত দিয়ে পুনরায় বণ্টন করাতেও পারবে না।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, যবর (فَتْحَةٌ) সহকারে বর্ণিত দ্বিতীয় এই রেওয়ায়েতটি সঠিক নয়। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাবসূত গ্রন্থের كِتَابُ الْقِسْمَةِ [বণ্টন অধ্যায়]-এ এ মর্মে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, শরিকি জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে 'খিয়ারে রুইয়াত' এবং 'খিয়ারে শর্ত' সাব্যস্ত হবে। অথচ 'জামিউস সগীর'-এর যবর (فَتْحَةٌ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী বণ্টনের ক্ষেত্রে 'খিয়ারে রুইয়াত' সাব্যস্ত হবে না। যা মাবসূত-এর বণ্টন অধ্যায়ের রেওয়ায়েতের সাথে বিরোধপূর্ণ। কাজেই বুঝা গেল যে, জামিউস সগীরের ইবারত যের বা كَسْرَةٌ সহকারেই সঠিক, যবর বা فَتْحَةٌ সহকারে সঠিক নয়।

[এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ফখরুল ইসলাম আল্ বাযদাবী (র.) ও আস্ সাদরুশ শহীদ (র.) উভয়ে মুসান্নিফ (র.)-এর এ মতটিই গ্রহণ করে فَتْحَةٌ এর রেওয়ায়েতকে নাকচ করেছেন। পক্ষান্তরে ফকীহ আবুল লাইস আছছমরকন্দী (র.) 'জামিউস সগীর'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে فَتْحَةٌ -এর রেওয়ায়েতকে সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ফখরুদ্দীন কাজী খান (র.) বলেছেন, فَتْحَةٌ -এর রেওয়ায়েত তথা 'খিয়ারে রুইয়াত' সাব্যস্ত না হওয়ার রেওয়ায়েত প্রযোজ্য হবে। যদি শরিকি জিনিস ওজন কিংবা পাত্রের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য বস্তু (مَكِيْلٌ أَوْ مَوْزُوْنٌ) হয়। কেননা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দ্রব্য একই রকম। কাজেই 'খিয়ারে রুইয়াত'-এর ভিত্তিতে ফেরত দিয়ে পুনরায় বণ্টন করলে কোনো লাভ হবে না। অতএব, এক্ষেত্রে 'খিয়ারে রুইয়াত' থাকবে না। পক্ষান্তরে জমি বা বাড়ির অংশসমূহ একেক রকম হয়ে থাকে। কাজেই কোনো অংশ পছন্দ না হলে তা ফেরত দিয়ে পুনরায় বণ্টন করলে পছন্দ অনুযায়ী অংশ নির্ধারণ সম্ভব হবে। অতএব, জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে 'খিয়ারে রুইয়াত' সাব্যস্ত হবে। সুতরাং كَسْرَةٌ -এর রেওয়ায়েত তথা 'খিয়ারে রুইয়াত' সাব্যস্ত হওয়ার রেওয়ায়েত জমি বা বাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।]

قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا يَثْبُتَانِ لِخَلَلٍ فِي الرِّضَاءِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) শরিকি জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে 'খিয়ারে রুইয়াত' ও 'খিয়ারে শর্ত' কেন সাব্যস্ত হবে তা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, 'খিয়ারে রুইয়াত' ও 'খিয়ারে শর্ত' সাব্যস্ত হয় এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পক্ষের সন্তুষ্টিতে ঘাটতি দেখা দেয় অথচ বিষয়টি এমন যে তা কার্যকর হওয়ার জন্য তার সন্তুষ্ট থাকা জরুরি। বণ্টনের বিষয়টি ঠিক এমনই। কেননা কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে শরিকি জমি বণ্টন করে তা অপর পক্ষের উপর কার্যকর করতে পারে না। বরং সকল পক্ষের সন্তুষ্টি আবশ্যক হয়। আর কোনো পক্ষ যদি না দেখে বণ্টন মেনে নেয় কিংবা দু'এক দিন ভেবে দেখার অধিকার থাকবে এ শর্তে যদি বণ্টন মেনে নেয় তাহলে তার পক্ষ হতে ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্টি পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার অংশ না দেখে কিংবা তার ভেবে দেখার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষের সন্তুষ্টি পূর্ণ করার জন্য 'খিয়ারে রুইয়াত' ও 'খিয়ারে শর্ত' সাব্যস্ত হবে। [আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ]

بَابُ مَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ

قَالَ وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيْعُ الْإِشْهَادَ حِيْنَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِإِعْرَاضِهِ عَنِ الطَّلَبِ وَهٰذَا لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ حَالَةَ الْاِخْتِيَارِ وَهِيَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَكَذٰلِكَ إِنْ أَشْهَدَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلٰى أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَلَا عِنْدَ الْعِقَارِ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِيْمَا تَقَدَّمَ .

পরিচ্ছেদ : যে সকল কারণে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যায়

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন শফী' বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত হয় তখন যদি সে [দাবি উত্থাপনের ব্যাপারে] সাক্ষী রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষী রাখা থেকে বিরত থাকে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে দাবি করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেছে। আর সক্ষম হওয়ার শর্ত এই জন্য যে, অনীহা প্রমাণিত হয় কেবল ইচ্ছাকৃত অবস্থায় [বিরত থাকলে]। আর ইচ্ছাকৃত অবস্থা হয় তো সক্ষমতা বিদ্যমান থাকলে'। অনুরূপভাবে যদি সে মজলিসে সাক্ষী রাখে কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতার একজনের নিকট কিংবা বিক্রীত সম্পত্তির নিকট সাক্ষী না রাখে [তাহলেও শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে], ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের পরিচ্ছেদসমূহের সাথে এ পরিচ্ছেদের ধারাবাহিকতার সম্পর্ক : পূর্বের পরিচ্ছেদসমূহে মুসান্নিফ (র.) শুফ'আর অধিকার কোন্ ক্ষেত্রে ও কিভাবে সাব্যস্ত হয় তা আলোচনা করেছেন। সে আলোচনা শেষ করার পর এ পরিচ্ছেদে তিনি শুফ'আর অধিকার কোন্ ক্ষেত্রে ও কিভাবে বাতিল হয়ে যায় তা আলোচনা করেছেন। যেহেতু কোনো বিষয় বাতিল হতে পারে কেবল সাব্যস্ত হওয়ার পরে [কিংবা সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকার পরে] তাই তিনি শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ পূর্বে উল্লেখ করেছেন এবং শুফ'আ বাতিল হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ পরে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيْعُ الْإِشْهَادَ الخ : মাসআলা হচ্ছে, যখন শফী' জমি বিক্রয় হওয়ার সংবাদ জানতে পারবে তখন যদি সে কোনো প্রকার অপারগতা না থাকা সত্ত্বেও 'তাৎক্ষণিক দাবি' (طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ) না করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। তাৎক্ষণিক দাবি (طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ) কিভাবে করতে হয় তা بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُوْمَةِ فِيْهَا -এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। জমি বিক্রয়ের সংবাদ জানার সময় শফী' যদি কোনো প্রকার অপারগতার কারণে 'তাৎক্ষণিক দাবি' করতে না পারে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। যেমন, নামাজে থাকা অবস্থায় কেউ তাকে বিক্রয়ের সংবাদ দিল কিংবা কেউ তার মুখ চেপে ধরল ফলে সে 'তাৎক্ষণিক দাবি' করতে সক্ষম হলো না তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

উল্লেখ্য, وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيْعُ الْإِشْهَادَ - "যদি শফী' সাক্ষী না রাখে" –এ ইবারতে الْإِشْهَادُ দ্বারা طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ বা 'তাৎক্ষণিক দাবি' উদ্দেশ্য, সাক্ষী রাখা উদ্দেশ্য নয়। কেননা শুফ'আর অধিকার বহাল রাখার জন্যে বিক্রয়ের সংবাদ জানার সাথে সাথে 'তাৎক্ষণিক দাবি' করা শর্ত। আর 'তাৎক্ষণিক দাবি' করার সময় সাক্ষী রাখা শর্ত নয়।[১]

---

১. طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ বা তাৎক্ষণিক দাবি করার সময় যে সাক্ষী রাখা শর্ত নয় তা মুসান্নিফ (র.) بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُوْمَةِ فِيْهَا -এর অধীনে ১৭৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। সেখানের ইবারত হচ্ছে– وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ أَشْهَدَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ وَالْإِشْهَادُ فِيْهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ إِنَّمَا هُوَ لِنَفْيِ التَّجَاحُدِ ।

কাজেই কাউকে সাক্ষী না রাখলে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয় না। কিন্তু শফী' যে 'তাৎক্ষণিক দাবি' করেছে তা বিচারকের নিকট প্রমাণ করার জন্য সাক্ষী রাখার প্রয়োজন পড়ে। যদি সাক্ষী না রেখে থাকে তাহলে শফী'কে 'হলফ' করে বলতে হয় যে, সে 'তাৎক্ষণিক দাবি' করেছে। বিচারকের নিকট প্রমাণ করার জন্য যেহেতু 'তাৎক্ষণিক দাবি' করার সময় সাক্ষী রাখার প্রয়োজন পড়ে তাই وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ - এ ইবারতে طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ "তাৎক্ষণিক দাবি" -এর পরিবর্তে اَلْإِشْهَادُ "সাক্ষী রাখা" কথাটি উল্লেখ করেছেন। [দ্র. আল্ বিনায়াহ, আল্ ইনায়াহ, নাতায়েজুল আফকার]

قَوْلُهُ لِإِعْرَاضِهِ عَنِ الطَّلَبِ : এখান থেকে 'মতন'-এর মাসআলার দলিল বর্ণনা করা হচ্ছে। দলিলের সারকথা হচ্ছে, জমি বিক্রয়ের সংবাদ পাওয়ার সময় শফী'র কোনো প্রকার অপারগতা না থাকা সত্ত্বেও সে যদি 'তাৎক্ষণিক দাবি' না করে তাহলে এর দ্বারা জমিটি গ্রহণ করার ব্যাপারে তার অনীহা প্রকাশ পায়। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুফ'আর অধিকার হচ্ছে একটি দুর্বল অধিকার (حَقٌّ ضَعِيْفٌ) যা অনীহা প্রকাশ পেলে বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং বিক্রয় সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে শফী' 'তাৎক্ষণিক দাবি' (طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ) না করলে তার শুফআ'র অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ : এখান থেকে 'মতনে' وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ "সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও" কথাটি যুক্ত করার কারণ বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ শফীর নিকট বিক্রয়ের সংবাদ পৌছার পর সে যদি তাৎক্ষণিক দাবি করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে তাৎক্ষণিক দাবি না করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। "সক্ষম হওয়ার" এই শর্তটি এখানে কেন যুক্ত করা হয়েছে তার কারণ মুসান্নিফ (র.) এ ইবারতে বর্ণনা করেছেন। তিনি এখানে বলেন, মূলত বিক্রয়ের সংবাদ শফীর নিকট পৌছার পর সে যদি জমিটি নিতে অনীহা প্রকাশ করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়। সে যদি 'তাৎক্ষণিক দাবি' না করে তাহলে সে অনীহা প্রকাশ করেছে বলে ধরা হয় এবং শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়। কিন্তু কোনো কাজের প্রতি আগ্রহ বা অনীহা প্রকাশ করা যায় কেবল ইচ্ছা প্রকাশ করার মতো অবস্থায় থাকলে, নতুবা তা সম্ভব হয় না। যেমন কেউ যদি ঘুমন্ত থাকে তাহলে কোনো কাজের প্রতি তার আগ্রহ আছে না কি অনাগ্রহ আছে তা প্রকাশ পাবে না। সুতরাং শফী'র পক্ষ হতে অনীহা প্রকাশ পাওয়ার জন্য সংবাদ পৌছার সময় তার ইচ্ছা প্রকাশ করার মতো অবস্থায় থাকা আবশ্যক। আর ইচ্ছা প্রকাশের অবস্থায় আছে বলে ধরা হয় যদি বিক্রয় সংবাদ তার নিকট পৌছার সময় সে 'তাৎক্ষণিক দাবি' (طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ) করতে সক্ষম থাকে।

قَوْلُهُ : وَكَذٰلِكَ إِنْ أَشْهَدَ فِي الْمَجْلِسِ : "অনুরূপভাবে যদি সে মজলিসে সাক্ষী রাখে কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতার একজনের নিকট কিংবা বিক্রীত সম্পত্তির নিকট সাক্ষী না রাখে [তাহলেও শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে]।" অর্থাৎ শফী'র নিকট বাড়ি বিক্রয়ের সংবাদ পৌছার পর সে যদি 'তাৎক্ষণিক দাবি' (طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ) করে কিন্তু "দৃঢ় করণের দাবি" (طَلَبُ التَّقْرِيْرِ) না করে তাহলেও তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

'দৃঢ় করণের দাবি' (طَلَبُ التَّقْرِيْرِ) করার নিয়ম হচ্ছে শফী', 'তাৎক্ষণিক দাবি করার পর দুইজন সাক্ষী নিয়ে বিক্রীত বাড়ি কিংবা ক্রেতা বা বিক্রেতার নিকট গিয়ে বলবে, ওমুক ব্যক্তি এই বাড়িটি ক্রয় করেছে, আমি এর শুফ'আর অধিকারী। ইতো-পূর্বে আমি এর 'তাৎক্ষণিক দাবি' করেছি, সুতরাং আপনারা এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন। এভাবে সাক্ষী রাখার পর তার শুফ'আর অধিকার দৃঢ়তা লাভ করবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, শফী' যদি এরূপ দাবি করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِيْمَا تَقَدَّمَ : "ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।" অর্থাৎ কিভাবে طَلَبُ التَّقْرِيْرِ করতে হয়, শফী' তা না করলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং طَلَبُ التَّقْرِيْرِ করার পর তার শুফ'আর অধিকার দৃঢ়তা লাভ করে ইত্যাদি বিষয় মুসান্নিফ (র.) পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) এ আলোচনা হিদায়ার মূল গ্রন্থের ৩৯৩ নং পৃষ্ঠার শেষের দিকে بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُوْمَةِ فِيْهَا এর অধীনে করেছেন। সেখানকার ইবারত হচ্ছে নিম্নরূপ-

قَالَ وَإِنْ صَالَحَ ثُمَّ يَنْهَضُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمَجْلِسِ وَيُشْهِدُ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ كَانَ الْمَبِيْعُ فِيْ يَدِهِ .....الخ

قَالَ : وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفْعَتِهِ عَلَى عِوَضٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَرَدَّ الْعِوَضَ، لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ لَيْسَ بِحَقٍّ مُتَقَرِّرٍ فِي الْمَحَلِّ بَلْ هُوَ مُجَرَّدُ حَقِّ التَّمَلُّكِ فَلَا يَصِحُّ الْاِعْتِيَاضُ عَنْهُ وَلَا يَتَعَلَّقُ إِسْقَاطُهُ بِالْجَائِزِ مِنَ الشَّرْطِ فَبِالْفَاسِدِ أَوْلَى فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْإِسْقَاطُ . وَكَذَا لَوْ بَاعَ شُفْعَتَهُ بِمَالٍ لِمَا بَيَّنَّا، بِخِلَافِ الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُتَقَرِّرٌ وَبِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ لِأَنَّهُ إِعْتِيَاضٌ عَنْ مِلْكٍ فِي الْمَحَلِّ . وَنَظِيرُهُ إِذَا قَالَ لِلْمُخَيَّرَةِ اِخْتَارِينِي بِأَلْفٍ أَوْ قَالَ الْعِنِّينُ لِامْرَأَتِهِ اِخْتَارِي تَرْكَ الْفَسْخِ بِأَلْفٍ فَاخْتَارَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَلَا يَثْبُتُ الْعِوَضُ . وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي هٰذَا بِمَنْزِلَةِ الشُّفْعَةِ فِي رِوَايَةٍ وَفِي أُخْرَى لَا تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ وَقِيلَ هٰذِهِ رِوَايَةٌ فِي الشُّفْعَةِ وَقِيلَ هِيَ فِي الْكَفَالَةِ خَاصَّةً . وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি শফী' তার শুফ'আর অধিকারের পরিবর্তে কোনো একটি বিনিময় নিয়ে মীমাংসা করে নেয় তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং বিনিময় বস্তুটিও ফেরত দিতে হবে। কেননা শুফ'আর অধিকার এরূপ অধিকার নয় যা তার সংশ্লিষ্ট স্থানে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। বরং এটি কেবল মালিকানা লাভের একটি অধিকার মাত্র। কাজেই এর পরিবর্তে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা সঠিক হবে না। আর শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেওয়াকে কোনো বৈধ শর্তের সাথেই জুড়ে দেওয়া যায় না। কাজেই ফাসেদ শর্তের সাথে আরো যুক্তিসঙ্গতভাবে জুড়ে দেওয়া যাবে না। অতএব, উক্ত [বিনিময়ের] শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে আর অধিকার ছেড়ে দেওয়া যথাযথভাবে সঠিক থেকে যাবে। অনুরূপভাবে যদি সে শুফ'আর অধিকার কোনো মালের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেয় [তাহলেও শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে, উল্লিখিত একই কারণে। পক্ষান্তরে কিসাস [প্রতিহত্যা]-র বিষয় ভিন্ন। কেননা কিসাস হচ্ছে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত একটি অধিকার। তদ্রূপ তালাক ও আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট স্থানে অর্জিত মালিকানা পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ। আলোচ্য মাসআলার একটি নজির হলো, যদি স্বামী [তালাক গ্রহণে] অধিকার-প্রাপ্তা স্ত্রীকে বলে, তুমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমাকে গ্রহণ করে নাও। কিংবা পুরুষত্বহীন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ [এর অধিকার] পরিত্যাগ কর' তারপর স্ত্রী তাই গ্রহণ করে নেয় তাহলে [উভয় সুরতে] স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং বিনিময় বস্তুও [তথা এক হাজার দিরহামও তাদের প্রাপ্য হিসেবে] সাব্যস্ত হবে না। এই বিধানের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি উপস্থিত করার জামিন গ্রহণ' (كِفَالَةٌ بِالنَّفْسِ) এক রেওয়ায়েত অনুসারে শুফ'আর পর্যায়ভুক্ত। আর আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে জামিন গ্রহণও বাতিল হবে না এবং বিনিময়ের মাল প্রদানও আবশ্যক হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, এটি শুফ'আর ক্ষেত্রেও একটি রেওয়ায়েত। আর কেউ কেউ বলেছেন, না বরং এটি কেবল 'জামিন হওয়ার' ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। যথাস্থানে এ বিষয়টির আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفْعَتِهِ عَلَى عِوَضٍ الخ : মাসআলা হচ্ছে, যদি শফী' ক্রেতার সাথে এ মর্মে সমঝোতা করে যে, শফী' তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিবে আর ক্রেতা এর বিনিময়ে শফী'কে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা কোনো জিনিস প্রদান করবে তাহলে শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং যে টাকা বা জিনিসের বিনিময়ে সমঝোতা করেছিল তা থেকেও সে বঞ্চিত হবে। আর শফী' যদি উক্ত বিনিময়ের টাকা বা জিনিস ইতিমধ্যে গ্রহণ করে থাকে তাহলে তা ফেরত দিয়ে দেবে।

উল্লেখ্য, উল্লিখিত মাসআলায় শফী'র যে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এ ব্যাপারে চার ইমামই একমত। তবে বিনিময়ের টাকা বা জিনিস ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.) এর মত ভিন্ন। তাঁর মতে শফী'র জন্য উক্ত বিনিময়ের টাকা বা জিনিস গ্রহণ করা জায়েজ। -[দ্র: আল- বিনায়াহ]

قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ لَيْسَ بِحَقٍّ مُتَقَرِّرٍ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত মাসআলার দলিল বর্ণনা করেছেন। মাসআলাটিতে দু'টি বিষয় ছিল। একটি হচ্ছে, শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিনিময়ের টাকা বা জিনিস ফেরত দিতে হবে। মুসান্নিফ (র.) বিনিময়ের টাকা কেন ফেরত দিতে হবে তার দলিল প্রথমে বর্ণনা করেছেন।

এ দলিলের সারকথা হচ্ছে- শুফ'আর অধিকার কোনো জিনিসের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার নয়, এটি কেবল মালিকানা লাভ করার [সম্ভাব্য] অধিকার। যেমন বনের পাখির উপর যে কোনো ব্যক্তির মালিকানা লাভ করার যে অধিকার থাকে তা একটি অদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার। আর কোনো জিনিসের উপর যদি কেবল মালিকানা লাভ করার অদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার থাকে সে অধিকারের বিনিময়ে কোনো কিছু গ্রহণ করা জায়েজ নয়। সুতরাং শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়ে তার বিনিময়ে কোনো কিছু গ্রহণ করে থাকলে তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَتَعَلَّقُ إِسْقَاطُهُ بِالْجَائِزِ مِنَ الشَّرْطِ الخ : এখান থেকে দ্বিতীয় বিষয় তথা বিনিময় নিয়ে সমঝোতা করার কারণে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাওয়ার দলিল বর্ণনা করছেন। দলিলটি হচ্ছে, শুফ'আর অধিকার একটি দুর্বল অধিকার। শফী'র পক্ষ থেকে যদি জমিটি গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনোভাবে অনীহা প্রকাশ পায় তাহলেই তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং শফী' যদি বৈধ শর্ত সাপেক্ষে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু শর্তটি বহাল থাকে না। যেমন, শফী' যদি বলে, আমি শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিলাম এই শর্তে যে, বাড়িটি তুমি আমার নিকট ভাড়া দিবে কিংবা আমাকে কিছু দিনের জন্য 'আরিয়ত' হিসেবে থাকতে দিবে, তাহলে তার এই প্রস্তাবের ফলে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং ভাড়া বা 'আরিয়ত' হিসেবেও সে বাড়িটি পাবে না। এর কারণ হচ্ছে, তার এই প্রস্তাবের মাধ্যমে বাড়িটি শুফ'আর মাধ্যমে নেওয়ার প্রতি তার অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। আর অনীহা প্রকাশ পেলে শুফ'আ বাতিল হয়ে যায়। আর অধিকার বাতিল হওয়ার ফলে তা আর কোনো শর্তের সাথে যুক্ত থাকবে না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেওয়া কোনো বৈধ শর্তে যদি হয় [যেমন উপরে বর্ণিত ভাড়া বা 'আরিয়ত' এর শর্তে] তাহলেও তা সেই শর্তের সাথে যুক্ত থাকে না। সুতরাং শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি যদি না জায়েজ শর্তের সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে তো তা আরো অধিক যুক্তিসঙ্গতভাবে সে শর্তের সাথে যুক্ত থাকবে না। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় শফী' টাকা বা কোনো জিনিস পাওয়ার শর্তে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। অথচ শুফ'আর বিনিময়ে টাকা বা কোনো জিনিস গ্রহণ করা নাজায়েজ [যা পূর্বের দলিলে বর্ণনা করা হয়েছে] কাজেই তার এই বিনিময় লাভের শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। সে উক্ত টাকা বা জিনিস গ্রহণ করে থাকলে তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) এর কথা اَلْجَائِزُ مِنَ الشَّرْطِ বা বৈধ শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এরূপ শর্ত, যার মাধ্যমে শুফ'আর জমিটি থেকে উপকার লাভ করার আশা করা হয়। যেমন ইজারা, আরিয়ত, বায়ে তাউলিয়া ইত্যাদি। এগুলোকে বৈধ শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এ কারণে যে, এ শর্তগুলো পূর্ণ হলে সে শুফ'আর জমি থেকে উপকার লাভ করতে পারবে। আবার শুফ'আর মাধ্যমে জমি গ্রহণ করলেও সে এই উপকার লাভ করতে পারত। কাজেই এই শর্তগুলো শুফ'আর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে কোনো বিনিময় লাভ করার শর্ত হচ্ছে নাজায়েজ শর্ত। কেননা এর মাধ্যমে শুফ'আর জমি থেকে উপকার গ্রহণের প্রতি অনীহা প্রকাশ পায়। কাজেই তা শুফ'আর অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি।

قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَ شُفْعَتَهُ بِمَالٍ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শফী' যদি কোনো কিছুর বিনিময়ে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সমঝোতা (صُلْح) করে তাহলে শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে। আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বলছেন, অনুরূপভাবে শফী' যদি কোনো কিছুর বিনিময়ে তার শুফ'আর অধিকার বিক্রয় করে দেয় তাহলেও তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং উক্ত বিনিময় দ্রব্যও সে গ্রহণ করতে পারবে না।

উল্লেখ্য, শুফ'আর অধিকার বিক্রয় করলে শুফ'আ যে বাতিল হয়ে যাবে এ বিধান হচ্ছে যদি শফী' তার অধিকার উক্ত জমি ক্রেতা বা বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করে তাহলে। পক্ষান্তরে সে যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নিকট তার অধিকার বিক্রয় করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। তবে বিক্রয় সহীহ না হওয়ার কারণে বিনিময় দ্রব্য গ্রহণ করতে পারবে না। [বিনায়াহ]

قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّا : "শুফ'আর অধিকার বিক্রয় করার কারণে বাতিল হওয়ার কারণ তাই যা আমরা একটু পূর্বে বর্ণনা করেছি।" মুসান্নিফ (র.) এ কথা বলে দুই লাইন উপরের ইবারত لِاَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ لَيْسَ بِحَقٍّ مُتَقَرِّرٍ فِى الْمَحَلِّ بَلْ هُوَ مُجَرَّدُ حَقِّ التَّمَلُّكِ فَلَا يَصِحُّ الْاِعْتِيَاضُ عَنْهُ এর দিকে ইশারা করেছেন। অর্থাৎ শুফ'আর অধিকার কোনো জিনিসের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কোনো অধিকার নয়। বরং এটি হচ্ছে অন্যের জমিতে শুধুমাত্র মালিকানা লাভ করার অধিকার। কাজেই এর পরিবর্তে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না। কাজেই তা বিক্রয় সহীহ হবে না। উপরন্তু বিক্রয় করার মাধ্যমে তার অনীহা প্রকাশ পাওয়ার ফলে তার শুফ'আ লাভ করার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ لِاَنَّهُ حَقٌّ مُتَقَرِّرٌ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে, কিসাসের অধিকার ও শুফ'আর অধিকার; এদের কোনোটিই সম্পদ নয়। অথচ কিসাসের অধিকার ছেড়ে তার বিনিময়ে সমঝোতার মাধ্যমে কোনো কিছু গ্রহণ করা জায়েজ। সুতরাং শুফ'আ ছেড়ে দিয়ে তার বিনিময়ে কোনো কিছু গ্রহণ করা কেন জায়েজ হবে না?

মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, কিসাসের অধিকার হচ্ছে একটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার। তাই এর পরিবর্তে সমঝোতার মাধ্যমে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ। পক্ষান্তরে শুফ'আর অধিকার হচ্ছে একটি অদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার। তাই এর পরিবর্তে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও অদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকারের পরিচয় হচ্ছে, সমঝোতা করার পর যদি অধিকার সংশ্লিষ্ট জিনিসটির মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয় তাহলে সে অধিকারটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার। আর যদি পরিবর্তন সাধিত না হয় তাহলে সেটি অদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার। কিসাসের ক্ষেত্রে হত্যাকারী ব্যক্তি সমঝোতার পূর্বে مُبَاحُ الدَّمِ অর্থাৎ "হত্যার উপযুক্ত" হিসেবে থাকে। কিন্তু সমঝোতা (صُلْح) এর পর সে আর مُبَاحُ الدَّمِ বা "হত্যার উপযুক্ত" থাকে না। সুতরাং সমঝোতার কারণে যেহেতু এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অতএব কারণে বুঝা গেল কিসাসের অধিকার হচ্ছে একটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার। পক্ষান্তরে শুফ'আর অধিকার সংশ্লিষ্ট জমি সমঝোতার পূর্বে যেরূপ ক্রেতার মালিকানাধীন থাকে তদ্রূপ সমঝোতার পরেও তার মালিকানাধীন থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সমঝোতার কারণে অধিকার সংশ্লিষ্ট জিনিসের মাঝে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। সুতরাং শুফ'আর অধিকার হচ্ছে একটি অদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার (حَقٌّ غَيْرُ مُتَقَرِّرٍ)।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে, যে তালাকের বিনিময়ে এবং গোলামকে আজাদ করার বিনিময়ে কোনো কিছু গ্রহণ করা জায়েজ। অথচ তালাকের অধিকার এবং আজাদ করার অধিকার তো শুফ'আর অধিকারের মতোই। এগুলোর কোনোটিই সম্পদ নয়। সুতরাং তালাক ও আজাদ করার ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ হলে শুফ'আর ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ হবে না কেন?

এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলছেন, তালাক ও আজাদ করার বিষয় এবং শুফ'আর বিষয় এক নয়। কারণ তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য স্ত্রীর সতিত্বের মালিকানা (مِلْكُ الْبُضْعَةِ) থাকে। এমনিভাবে আজাদের ক্ষেত্রে মুনিবের জন্য গোলামের দাসত্বের মালিকানা (مِلْكُ الرَّقَبَةِ) থাকে। কাজেই স্বামী তালাকের বিনিময় গ্রহণ করলে তা হয় সেই সতিত্বের মালিকানার বিনিময়। আর মুনিব আজাদ করার বিনিময় গ্রহণ করলে তা হয় দাসত্বের মালিকানার বিনিময়। তাই এ দুই ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ। পক্ষান্তরে শুফ'আর ক্ষেত্রে জমির উপর শফী'র কোনো প্রকার মালিকানা নেই। তার যে অধিকার রয়েছে সেটি হচ্ছে حَقُّ التَّمَلُّكِ বা ভবিষ্যতে মালিক হওয়ার অধিকার। কাজেই এই অধিকারের পরিবর্তে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ وَنَظِيْرُهُ إِذَا قَالَ لِلْمُخَيَّرَةِ اِخْتَارِيْنِيْ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) শুফ'আর অধিকারের দু'টি নজির উল্লেখ করেছেন। শুফ'আর ন্যায় এ দু'টিও অদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার হওয়ার কারণে এ দু'টির পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নয়। আর এ দু'টি ক্ষেত্রে বিনিময়ের শর্তে অধিকার ছেড়ে দিলে অধিকার ছুটে যায়। কিন্তু বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। প্রথম নজির হচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে প্রথমে বলল اِخْتَارِىْ نَفْسَكِ "তুমি তোমার নিজেকে গ্রহণ কর" [অর্থাৎ "তোমার ইচ্ছে হলে বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও"]। কিন্তু পরক্ষণে স্বামী অনুতপ্ত হলো এবং স্ত্রী যাতে প্রদত্ত এই অধিকার বলে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই অগ্রাধিকার না দেয় সে জন্য সে স্ত্রীকে পুনরায় বলল, اِخْتَارِيْنِىْ بِأَلْفٍ তুমি এক হাজার টাকার বিনিময়ে আমাকে গ্রহণ করে নাও" অর্থাৎ তুমি যদি বিবাহ বিচ্ছেদকে অগ্রাধিকার না দিয়ে আমার সাথে থাকাকেই অগ্রাধিকার দাও তাহলে আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দিব। স্ত্রী যদি স্বামীর এই প্রস্তাব অনুসারে বলে اِخْتَرْتُكَ আমি আপনাকে গ্রহণ করে নিলাম" তাহলে স্বামীপ্রদত্ত পূর্বের ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং স্ত্রী উক্ত এক হাজার টাকা থেকেও বঞ্চিত হয়। সুতরাং স্ত্রীকে اِخْتَارِيْ نَفْسَكِ বলে স্বামী যে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে তা শুফ'আর অধিকারের মতো। কোনো বিনিময়ের শর্তে স্ত্রী এই অধিকার ছেড়ে দিলে অধিকার ছুটে যায় এবং বিনিময় থেকেও বঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয় নজির হচ্ছে, বিবাহের পর স্বামী যদি স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হয় তাহলে স্বামীকে এক বছর সময় দেওয়া হয়। এক বছরের মধ্যে স্বামী স্ত্রীসহবাসে সক্ষম না হলে স্ত্রীকে আদালতের পক্ষ হতে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হয়। সে ইচ্ছে করলে এই স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে পারে আবার ইচ্ছে হলে এই স্বামীর সাথে থাকতেও পারে। স্ত্রী এই ইচ্ছাধিকার পাওয়ার পর স্বামী যদি তাকে বলে তুমি আমার সাথে থাকার দিকটি গ্রহণ করে নাও, আমি তোমাকে এর বিনিময়ে এক হাজার টাকা দিব"। এরপর স্ত্রী যদি এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে তার স্বামীকে গ্রহণ করে তাহলে স্ত্রীর যে বিবাহ বিচ্ছেদ করার ইচ্ছাধিকার ছিল তা বাতিল হয়ে যায় এবং উক্ত এক হাজার টাকা থেকেও সে বঞ্চিত হয়।

উল্লিখিত দু'টি নজিরের ক্ষেত্রে এরূপ বিধানের কারণ হচ্ছে, দু'টি ক্ষেত্রেই স্ত্রী যে অধিকার লাভ করেছিল তা অদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার (حَقٌّ غَيْرُ مُتَقَرِّرٍ) । কেননা স্ত্রী তার স্বামীকে গ্রহণ করে নেওয়ার পূর্বেও স্বামী স্ত্রীর সতিত্বের মালিক ছিল এবং পরেও মালিক রয়েছে। স্ত্রী তার অধিকার ছেড়ে দেওয়ার কারণে স্বামীর মালিকানার মাঝে কোনো রকম পরিবর্তন হয়নি। পূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, যে ক্ষেত্রে অধিকার ছেড়ে দেওয়ার কারণে মালিকানার মাঝে কোনো রকম পরিবর্তন দেখা দেয় না সেটিই হচ্ছে অদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অধিকার (حَقٌّ غَيْرُ مُتَقَرِّرٍ) । আর এরূপ ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ নেই। সুতরাং উপরিউক্ত নজির দুটি শুফ'আর অধিকারের মতো। তাই বিধানও এক।

قَوْلُهُ وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِيْ هٰذَا بِمَنْزِلَةِ الشُّفْعَةِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) كِفَالَةٌ بِالنَّفْسِ -এর বিধানও শুফ'আর বিধানের মতো কি না, এ ব্যাপারে যে রেওয়ায়েতের ভিন্নতা রয়েছে তা বর্ণনা করছেন। كِفَالَةٌ بِالنَّفْسِ -এর মাসআলা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি বিবাদীর পক্ষ থেকে বাদীর নিকট এই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করল যে, সে নির্দিষ্ট সময়ে বিবাদীকে বাদীর সম্মুখে উপস্থিত করে দিবে। তাহলে যে এই দায়িত্ব নিল সে হচ্ছে কাফীল আর বাদী হচ্ছে মাকফুল লাহু। এখন মাকফুল লাহুর অধিকার আছে কাফীলকে বলা যে, তুমি বিবাদীকে উপস্থিত করে দাও। কাফীল যদি বিবাদীকে উপস্থিত করতে অক্ষম না হয় তাহলে বিচারক কাফীলকে আটক করে রাখবেন।

এখন মাসআলা হচ্ছে, কাফীল যদি মাকফুল লাহুকে বলে যে, আমি তোমাকে এক হাজার টাকা প্রদান করব, আর এর বিনিময়ে তুমি আমাকে আমার দায়িত্ব ভার থেকে মুক্ত করে দাও। মাকফুল লাহু এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যদি কাফীলকে দায়িত্বভার (كَفَالَتْ) থেকে মুক্ত করে দেয় তাহলে বিধান কী হবে? এ ব্যাপারে দু'টি রেওয়ায়েত আছে।

প্রথম রেওয়ায়েত হচ্ছে ফকীহ আবূ হাফস (র.)-এর রেওয়ায়েত। তার রেওয়ায়েতটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাবসূত গ্রন্থের كِفَالَةْ، حَوَالَةْ، شُفْعَةْ ও صُلْح এ চারটি অধ্যায়েই বর্ণিত রয়েছে। এই রেওয়ায়েত অনুসারে এ ক্ষেত্রে শুফ'আর মতোই বিধান হবে। অর্থাৎ মাকফুল লাহুর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে কিন্তু উক্ত এক হাজার টাকা সে লাভ করবে না।

আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত হচ্ছে ফকীহ আবূ সোলাইমান (র.)-এর রেওয়ায়েত। তাঁর রেওয়ায়েতটি কেবল মাবসূত এর صُلْح অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এই রেওয়ায়েত অনুসারে আলোচ্য মাসআলায় মাকফুল লাহু উক্ত এক হাজার টাকা লাভ করবে না; তবে অধিকার বহাল থাকবে, كَفَالَتْ বাতিল হবে না। এর কারণ হচ্ছে– কাফালাত শুফ'আর অধিকারের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কাজেই যতক্ষণ না মাকফুল লাহু পূর্ণ সন্তুষ্টিতে স্বেচ্ছায় তা বাতিল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বাতিল হবে না। আলোচ্য সুরতে সে বাতিল করেছিল এক হাজার টাকা পাওয়ার শর্তে। সুতরাং এক হাজার টাকা না পেলে তার পক্ষ হতে পূর্ণ সন্তুষ্টিতে বাতিল করা হয়নি বিধায় তার অধিকার বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ هٰذِهِ رِوَايَةٌ فِي الشُّفْعَةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাশায়েখের কেউ কেউ বলেছেন, উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় রেওয়ায়েত তথা ফকীহ আবূ সোলাইমান (র.)-এর রেওয়ায়েতটি শুফ'আর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ আবূ সোলাইমানের রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোনো কিছুর বিনিময়ে যদি শফী' তার শুফ'আর অধিকার বিক্রয় করে বা সমঝোতার মাধ্যমে ছেড়ে দেয় তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। যেমনিভাবে كِفَالَةٌ بِالنَّفْسِ -এর ক্ষেত্রে বাতিল হয় না।

"পক্ষান্তরে মাশায়েখের কেউ কেউ বলেছেন, ফকীহ আবূ সোলাইমান (র.)-এর রেওয়ায়েত কেবল كِفَالَةٌ بِالنَّفْسِ এর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। শুফ'আর ক্ষেত্রে কেবল একটিই রেওয়ায়েত। আর তা হচ্ছে বিক্রয় বা সমঝোতা করলে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَالَ : وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيْعُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) تُوْرَثُ عَنْهُ . قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ . أَمَّا إِذَا مَاتَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِيْ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَقَبْضِهِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ لِوَرَثَتِهِ . وَهٰذَا نَظِيْرُ الْاِخْتِلَافِ فِيْ خِيَارِ الشَّرْطِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوْعِ . وَلِأَنَّ بِالْمَوْتِ يَزُوْلُ مِلْكُهُ عَنْ دَارِهِ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَقِيَامُهُ وَقْتَ الْبَيْعِ وَبَقَاؤُهُ لِلشَّفِيْعِ إِلَى وَقْتِ الْقَضَاءِ شَرْطٌ، فَلَا يَسْتَوْجِبُ الشُّفْعَةَ بِدُوْنِهِ . وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِيْ لَمْ تَبْطُلْ، لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ بَاقٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ سَبَبُ حَقِّهِ . وَلَا يُبَاعُ فِيْ دَيْنِ الْمُشْتَرِيْ وَوَصِيَّتِهِ . وَلَوْ بَاعَهُ الْقَاضِيْ أَوِ الْوَصِيُّ أَوْ أَوْصَى الْمُشْتَرِيْ فِيْهَا يُوْصِيْهِ فَلِلشَّفِيْعِ أَنْ يُبْطِلَهُ وَيَأْخُذَ الدَّارَ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ وَلِهٰذَا يَنْقُضُ تَصَرُّفَهُ فِيْ حَيَاتِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি শফী' মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তার পক্ষ থেকে এতে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে। হিদায়ার গ্রন্থকার (র.) বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো, যদি সে বিক্রয়ের পর শুফ'আর রায় হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে। পক্ষান্তরে যদি সে বিচারকের রায় দেওয়ার পর মূল্য পরিশোধ ও হস্তগত করার পূর্বে মারা যায় তাহলে শফী'র ওয়ারিশগণের জন্য ক্রয় বিক্রয় [অর্থাৎ শুফ'আর মাধ্যমে মূল্য দিয়ে জমিটি গ্রহণ করা] অপরিহার্য হবে। আলোচ্য মতবিরোধটি 'শর্তের ভিত্তিতে ইচ্ছাধিকার'-এর ক্ষেত্রে মতবিরোধেরই অনুরূপ। এ বিষয়ে 'বিক্রয় অধ্যায়ে' ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো, মৃত্যুর ফলে তার নিজ বাড়িটির উপর হতে শফী'র মালিকানা চলে গেছে আবার ওয়ারিশের মালিকানা এসেছে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে। অথচ শফী'র জন্য বিক্রয়ের সময় মালিকানা থাকা এবং তা রায় হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকা শর্ত। সুতরাং এই শর্তের অবিদ্যমানতায় শুফ'আর অধিকার লাভ হবে না। আর যদি ক্রেতা মৃত্যুবরণ করে তাহলে শুফ'আ বাতিল হবে না। কেননা যে শুফ'আর অধিকারী সে তো বর্তমান আছে এবং তার অধিকার লাভের 'সবব' বা সূত্রের মাঝে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়নি। মৃত ক্রেতার ঋণ পরিশোধের জন্য এবং তার অসিয়ত পূরণার্থেও এই বাড়িটি বিক্রয় করা যাবে না। যদি বিচারক কিংবা অসিয়ত বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাড়িটি বিক্রয়ও করে ফেলে অথবা ক্রেতা এই বাড়িটির ব্যাপারে কোনো অসিয়ত করে গিয়ে থাকে তাহলেও শফী' এগুলো বাতিল করে দিয়ে বাড়িটি গ্রহণ করার অধিকার লাভ করবে। কেননা তার অধিকারই অগ্রগণ্য। এ কারণেই তো ক্রেতা জীবদ্দশায় তাতে কোনো অধিকার চর্চা করে থাকলে তা বাতিল করে দেওয়া হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ : মাসআলা হচ্ছে, ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আমাদের মতে শফী' যদি মারা যায় তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে শফী' মারা গেলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না বরং তার ওয়ারিশগণ উক্ত শুফ'আর অধিকারী হবে।

قَوْلُهُ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মতনে ইমাম কুদূরী (র.) যে উল্লেখ করেছেন আমাদের মতে শফী' মারা গেলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এ বিধান হচ্ছে, যদি বিচারকের পক্ষ হতে শফী'র পক্ষে রায় হওয়ার পূর্বে [কিংবা ক্রেতার পক্ষ হতে শফী'কে স্বেচ্ছায় জমি দিয়ে দেওয়ার পূর্বে] শফী' মারা যায় সে সুরতে। পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে, আদালতের পক্ষ হতে শফী'র পক্ষে রায় হয়ে গেছে কিন্তু মূল্য পরিশোধ করে শফী' জমিটি হস্তগত করার পূর্বে সে মারা যায় তাহলে তার ওয়ারিশগণ মূল্য পরিশোধ করে উক্ত জমিটি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে শফী' মারা যাওয়ার কারণে শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا نَظِيرُ الْاِخْتِلَافِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত মাসআলার দলিল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথমে একটি দলিলের দিকে ইশারা করেছেন এবং পরে আরেকটি দলিল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম দলিলটি সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় আমাদের মাঝে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাঝে যে মতবিরোধ তা "ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়ে" এর خِيَارُ شَرْطٍ -এর ক্ষেত্রে যে মতবিরোধ রয়েছে তারই অনুরূপ। কাজেই সেখানে আমাদের পক্ষে যে দলিল বর্ণনা করা হয়েছে তা আলোচ্য মাসআলায় দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

خِيَارُ شَرْطٍ -এর ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আমাদের মাঝে মতবিরোধ হচ্ছে নিম্নরূপ:

ক্রয় বিক্রয়ের সময় ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে যদি خِيَارُ شَرْطٍ করা হয় তারপর যে কয় দিনের জন্য خِيَارُ شَرْطٍ করা হয়েছে তার মধ্যেই যার পক্ষে خِيَارُ شَرْطٍ করা হয়েছে সে মারা যায়। তাহলে আমাদের মতে তার خِيَارُ شَرْطٍ বাতিল হয়ে যাবে এবং বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ মিরাস হিসেবে উক্ত خِيَارُ شَرْطٍ -এর অধিকারী হবে।

আমাদের পক্ষে এ মাসআলায় দলিল হচ্ছে خِيَارُ شَرْطٍ হলো ইচ্ছা বা এরাদা। আর ইচ্ছা বা এরাদা স্থানান্তরিত হতে পারে না; কাজেই তা মিরাসের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ মিরাস কার্যকর হয় কেবল সে সকল জিনিসের উপর যা স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্য।

আমাদের আলোচ্য শুফ'আর মাসআলাটিও উপরে বর্ণিত خِيَارُ شَرْطٍ -এর মতো। কেননা শুফ'আর ক্ষেত্রে শফী' জমিটি গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করার ইচ্ছাধিকার পায়। কাজেই এটিও একটি خِيَارْ। সুতরাং এই خِيَارْ সে ও মিরাস হিসেবে ওয়ারিশগণ লাভ করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوْعِ : "এ সম্পর্কে 'ক্রয় বিক্রয়'-এ আলোচনা করা হয়েছে।" উল্লেখ্য মুসান্নিফ (র.) خِيَارُ شَرْطٍ এর উক্ত মতবিরোধ সংক্রান্ত মাসআলা ও তার দলিল হিদায়া ৩য় খণ্ডের كِتَابُ الْبُيُوْعِ এর অধীনে بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ -এর ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষে [হিদায়া ৩য় খণ্ডের ১৬ নং পৃষ্ঠায়] উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সেখানকার ইবারতটুকু উল্লেখ করে দেওয়া হলো :

وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يُوْرَثُ عَنْهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَازِمٌ ثَابِتٌ فِي الْبَيْعِ فَيَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالتَّعْيِينِ . وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لَيْسَ إِلَّا مَشِيَّةً وَإِرَادَةً وَلَا يَتَصَوَّرُ انْتِقَالُهُ. وَالْإِرْثُ فِيمَا يَقْبَلُ الْاِنْتِقَالَ .

এ ইবারতের সারকথা আমরা একটু পূর্বে বর্ণনা করেছি।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ بِالْمَوْتِ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ دَارِهِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের আলোচ্য মাসআলার দ্বিতীয় দলিল বর্ণনা করেছেন। এ দলিলের সারকথা হচ্ছে, শফী' যে জমির মালিকানার ভিত্তিতে শুফ'আর দাবি করে শফী' মারা যাওয়ার পর সে জমির মালিকানা আর তার থাকে না। এরপর জমিটির মালিকানা হয় তার ওয়ারিশগণের। অন্য দিকে শুফ'আর অধিকার লাভ করার জন্য শর্ত হচ্ছে, যে জমির ভিত্তিতে শফী' শুফ'আর দাবি করবে সে জমির মালিকানা তার থাকতে হবে বিক্রেতা [পাশের জমি] বিক্রয় করার সময়ে এবং বিচারকের পক্ষ হতে রায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার উক্ত মালিকানা বহাল থাকতে হবে। আর আলোচ্য সুরতে তা নেই। কেননা শফী'র মালিকানা মৃত্যুর কারণে শেষ হয়ে গেছে। আর তার ওয়ারিশগণের মালিকানা [পাশে জমি] বিক্রয়ের পরে অর্জিত হয়েছে। কাজেই শুফ'আর অধিকার লাভ করার শর্ত পূর্ণরূপে বিদ্যমান না থাকার কারণে ওয়ারিশগণ শুফ'আ লাভ করবে না।

قَوْلُهُ وَاِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِىْ لَمْ تَبْطُلْ : পূর্বের মাসআলায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শফী' [রায়ের পূর্বে] মারা গেলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এখানে মুসান্নিফ (র.) বলছেন, পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা [রায়ের পূর্বে কিংবা শফী'র নিকট জমি হস্তান্তরের পূর্বে] মারা যায় তাহলে শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْمُسْتَحِقَّ بَاقٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ سَبَبُ حَقِّهٖ : এ বিধানের কারণ হচ্ছে, কারো কোনো অধিকার বাতিল হতে পারে তার মৃত্যুর কারণে কিংবা যে 'সবব'-এর ভিত্তিতে সে অধিকার লাভ করে সে সববের মাঝে কোনো পরিবর্তন দেখা দিলে। আলোচ্য সুরতে এর কোনোটি হয়নি। কেননা শুফ'আর অধিকারী হচ্ছে শফী' আর সে জীবিত রয়েছে। আর যে সববের ভিত্তিতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে তা হচ্ছে শফী'র মালিকানাধীন জমি বিক্রীত জমির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া। এ সববের মাঝে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কাজেই শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يُبَاعُ فِىْ دَيْنِ الْمُشْتَرِىْ وَوَصِيَّتِهٖ : পূর্বের মাসআলায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রেতা মারা গেলে শফী'র শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। এখানে বলা হচ্ছে যে, ক্রেতা যদি মারা যায় এবং তার উপর ঋণ থাকে আর সে ঋণ পরিশোধ করার জন্য ক্রেতার এই জমিটি বিক্রয় করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে জমিটি বিক্রয় করা যাবে না। তদ্রূপ ক্রেতা যদি মৃত্যুর পূর্বে কোনো অসিয়ত করে যায় এবং সে অসিয়ত পূর্ণ করার জন্য জমিটি বিক্রয় করার প্রয়োজন পড়ে তাহলেও তা বিক্রয় করা যাবে না।

এ বিধান সত্ত্বেও বিচারক যদি ক্রেতার ঋণ পরিশোধ করার জন্য জমিটি বিক্রয় করে দেয় কিংবা 'ওসি' [ক্রেতা যাকে তার অসিয়ত বাস্তবায়ন করার জন্য নিযুক্ত করে] ক্রেতার অসিয়ত পূর্ণ করার জন্য জমিটি বিক্রয় করে অথবা ক্রেতা যদি জমিটি কাউকে দান করার জন্য অসিয়ত করে যায় তাহলে শফী'র এই অধিকার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে উক্ত সমস্ত বিক্রয় ও অসিয়ত বাতিল করে দিয়ে শুফ'আর অধিকার বলে জমিটি নিয়ে নিবে।

قَوْلُهُ لِتَقَدُّمِ حَقِّهٖ وَلِهٰذَا يَنْقُضُ تَصَرُّفَهُ الخ : উপরিউক্ত বিধানগুলোর কারণ হচ্ছে, শফী'র অধিকার ক্রেতার অধিকারের উপর অগ্রগণ্য। সুতরাং ক্রেতার দিক থেকে যারই অধিকার উক্ত জমির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে তাদের অধিকারের উপর শফী'র অধিকার অগ্রগণ্য হবে। ক্রেতার অধিকারের উপর যে শফী'র অধিকার অগ্রগণ্য তার প্রমাণ হচ্ছে, ক্রেতা জীবদ্দশায় যদি তার জমিতে কোনো প্রকার অধিকার চর্চা করে, তাহলে তা বাতিল করে দিয়ে শফী'কে জমি দেওয়া হয়। যেমন– ক্রেতা যদি তার জমি শফী'র পক্ষে রায় হওয়ার পূর্বে কারো নিকট বিক্রয় করে ফেলে কিংবা কাউকে দান করে অথবা কারো নিকট ইজারা দেয় তাহলে তার সকল চুক্তি বাতিল করে দিয়ে জমিটি শফী'কে হস্তান্তর করা হয়। অতএব বুঝা গেল যে শফী'র অধিকার ক্রেতার অধিকারের উপর অগ্রগণ্য। কাজেই ক্রেতার দিক থেকে যার অধিকার জমির সাথে সংশ্লিষ্ট তার অধিকারের উপরও শফী'র অধিকার প্রাধান্য পাবে।

উল্লেখ্য এখানে এই আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে, বিচারক যদি ক্রেতার মৃত্যুর পর তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য জমিটি বিক্রয় করে দেয় তাহলে সে বিক্রয় তো কার্যকর হওয়ার কথা। কেননা বিচারকের বিক্রয় করা তার পক্ষ হয়ে রায় প্রদানেরই সমতুল্য। কাজেই তা কার্যকর হওয়ার কথা।

এ আপত্তির উত্তর হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে বিচারকের পক্ষ হতে বিক্রয় করা তার পক্ষ হতে রায় প্রদান বলে গণ্য হলে তা কার্যকর হবে না। কারণ তার এই রায় প্রদান ইজমার পরিপন্থি। সকল ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শফী'র অধিকার এমন একটি অধিকার যা ক্রেতার পক্ষ হতে যে কোনো চুক্তি বা অধিকার চর্চাকে বাতিল করে দেয়। সুতরাং বিচারকের রায় ইজমার পরিপন্থি হওয়ার কারণে তা কার্যকর হবে না।

قَالَ : وَإِذَا بَاعَ الشَّفِيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضٰى لَهُ بِالشُّفْعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، لِزَوَالِ سَبَبِ الْاِسْتِحْقَاقِ قَبْلَ التَّمَلُّكِ وَهُوَ الْاِتِّصَالُ بِمِلْكِهِ، وَلِهٰذَا يَزُوْلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِشَرَاءِ الْمَشْفُوْعَةِ، كَمَا إِذَا سَلَّمَ صَرِيْحًا أَوْ أَبْرَأَ عَنِ الدَّيْنِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ ، وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الشَّفِيْعُ دَارَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّوَالَ فَبَقِيَ الْاِتِّصَالُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শফী' যে সম্পত্তির ভিত্তিতে শুফ'আ দাবি করে তা যদি তার পক্ষে শুফ'আর রায় হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করে ফেলে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা অধিকার লাভের যা কারণ ছিল তা মালিকানা অর্জনের পূর্বেই আবার চলে গেছে। আর সে কারণটি হলো, তার মালিকানার সাথে বিক্রীত সম্পত্তির সংলগ্নতা। এ কারণেই যদি শুফ'আর অধিকার যুক্ত বাড়িটি ক্রয় হয়েছে না জেনেও যদি শফী' তার স্বীয় বাড়িটি বিক্রয় করে ফেলে তবুও তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যায়। যেমনিভাবে [বিক্রয় সম্পর্কে] না জেনে কেউ যদি শুফ'আর অধিকার স্পষ্ট ভাষায় ছেড়ে দেয় কিংবা ঋণ প্রাপক [সে ঋণ পাবে না জেনে ঋণ গ্রহীতাকে] স্পষ্টভাবে ঋণ মাফ করে দেয় [তাহলেও পূর্বের মতোই বিধান, অর্থাৎ অধিকার বাতিল হবে এবং ঋণ মাফ হয়ে যাবে]। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, শফী' যদি তার পক্ষে 'শর্তের ভিত্তিতে ইচ্ছাধিকার' রেখে তার বাড়িটি বিক্রয় করে [তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না]। কেননা এরূপ বিক্রয় মালিকানা চলে যাওয়াকে বাধা দিয়ে রাখে। ফলে উক্ত সংলগ্নতা বহালই থেকে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا بَاعَ الشَّفِيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ : মাসআলা হচ্ছে, শফী' যদি তার পক্ষে শুফ'আর রায় হওয়ার পূর্বে তার নিজের জমিটি [যে জমিটির ভিত্তিতে সে শুফ'আর দাবি করেছে] বিক্রয় করে ফেলে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِزَوَالِ سَبَبِ الْاِسْتِحْقَاقِ قَبْلَ التَّمَلُّكِ الخ : উক্ত বিধানের দলিল হচ্ছে, শফী' যে শুফ'আর ভিত্তিতে ক্রেতার জমির উপর মালিকানা লাভ করার অধিকার পায় তার 'সবব' হচ্ছে শফী'র মালিকানাধীন জমি ক্রেতার জমির সাথে সংলগ্ন হওয়া। কাজেই শফী' যদি তার মালিকানাধীন জমিটি বিক্রয় করে ফেলে তাহলে ক্রেতার জমির উপর মালিকানা লাভ করার পূর্বেই উক্ত সবব দূর হয়ে যায়। সুতরাং সে আর ক্রেতার জমির উপর মালিকানা লাভ করতে পারবে না। তথা তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا يَزُوْلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِشَرَاءِ الْمَشْفُوْعَةِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'এ কারণেই' অর্থাৎ ক্রেতার জমির উপর শফী'র মালিকানা লাভের পূর্বেই 'সবব' দূর হয়ে গেলে শুফ'আর অধিকার যে বাতিল হয়ে যায় এ কারণেই বিধান হচ্ছে যে, শফী' যদি তার জমিটি বিক্রয় করে ফেলে এমতাবস্থায় যে, সে জানে না তার পার্শ্ববর্তী জমিটি বিক্রয় করা হয়েছে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, এ বিধানটি আমাদের মাযহাব অনুসারে। অন্য তিন ইমাম তথা ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর থেকে একটি করে রেওয়ায়েতও আমাদের মাযহাবের অনুরূপ। পক্ষান্তরে তাঁদের প্রত্যেকের থেকে বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে শফী' যদি তার পার্শ্ববর্তী জমি যে বিক্রয় করা হয়েছে তা না জেনেই তার নিজের জমি বিক্রয় করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। -[দ্র: আল বিনায়াহ]

قَوْلُهُ : كَمَا إِذَا سَلَّمَ صَرِيْحًا أَوْ أَبْرَأَ عَنِ الدَّيْنِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) পূর্বের মাসআলাটির দু'টি নজির উল্লেখ করছেন। পূর্বের মাসআলাটি ছিল শফী' যদি তার পার্শ্ববর্তী জমি বিক্রয় হওয়ার কথা না জেনে তার নিজের জমি বিক্রয় করে ফেলে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

প্রথম নজির হচ্ছে, শফী' জানে না যে তার পার্শ্বের কোন জমিটি বিক্রয় হয়েছে বা জমিটি কোন পার্শ্বে অবস্থিত। কিন্তু সে না জেনেই তার শুফ'আর অধিকার যদি ছেড়ে দেয় তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। পরবর্তীতে জমিটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানার পর যদি সে বলে আমি আগে বুঝতে পারিনি জমি এই পার্শ্বে ছিল কিংবা জমিটি এতটা নিকটে ছিল তাহলে তাকে শুফ'আর অধিকার প্রদান করা হবে না। কেননা অধিকার ছেড়ে দেওয়ার জন্য জানা শর্ত নয়।

দ্বিতীয় নজির হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির অন্য একজনের নিকট ঋণ পাওনা রয়েছে, কিন্তু তার সেটা জানা নেই অথবা জানা আছে ঠিক, কিন্তু কি পরিমাণ পাওনা আছে তা জানা নেই। এমতাবস্থায় পাওনাদার যদি বলে, তোমার নিকট আমার যা পাওনা আছে তা আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম তাহলে তার ঋণ মাফ হয়ে যাবে। পরে যদি জানতে পারে যে, সে যে পরিমাণ পাওনা আছে বলে মনে করছিল প্রকৃত পক্ষে পাওনার পরিমাণ তার চেয়ে বেশি। তবুও সে আর তার ঋণ ফেরত পাবে না। কেননা إِسْقَاطٌ তথা মাফ করে দেওয়া বা অধিকার ছেড়ে দেওয়া কার্যকর হওয়ার জন্য জানা থাকা আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الشَّفِيْعُ دَارَهُ : পূর্বের মতনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শফী' যদি তার নিজের জমি [যার ভিত্তিতে সে শুফ'আর দাবি করছে তা] বিচারকের রায়ের পূর্বেই বিক্রয় করে ফেলে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বলেন, শফী' যদি 'খিয়ারে শর্ত' এর ভিত্তিতে তার নিজের সেই জমিটি বিক্রয় করে ফেলে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। [তবে বিচারকের রায়ের পূর্বে যদি 'খিয়ারে শর্ত' তুলে নিয়ে বিক্রয় নিশ্চিত করে ফেলে তাহলে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।]

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّوَالَ فَيَبْقَى الْاِتِّصَالُ : 'খিয়ারে শর্ত'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করলে শুফ'আর অধিকার বাতিল না হওয়ার কারণ হচ্ছে, বিক্রেতা যদি 'খিয়ারে শর্ত'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করে তাহলে বিক্রীত বস্তু তার মালিকানায়ই বহাল থাকে, যতক্ষণ না সে খিয়ার তুলে নিয়ে বিক্রয় চুক্তি নিশ্চিত করে। কাজেই শফী' যদি তার নিজের পক্ষে 'খিয়ার' থাকবে এ শর্তে নিজের জমিটি কারো কাছে বিক্রয় করে এবং খিয়ারের সময় চলমান থাকে তাহলে জমিটি তার মালিকানায় বহাল থাকে। সুতরাং যে সববের দ্বারা শুফ'আ সাব্যস্ত হয়। তথা ক্রেতার জমির সাথে শফী'র জমির সংলগ্ন হওয়া সে সবব বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

উল্লেখ্য, 'খিয়ারে শর্ত এর ভিত্তিতে শফী' নিজের জমি বিক্রয় করলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। উপরে বর্ণিত এ বিধান হচ্ছে, যদি 'খিয়ারে শর্তটি শফী' তথা বিক্রেতার পক্ষে করা হয়। পক্ষান্তরে খিয়ারের শর্তটি যদি ক্রেতা অর্থাৎ শফী'র যার নিকট তার জমিটি বিক্রয় করবে তার পক্ষে করা হয় তার শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ ক্রেতার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' করে যদি কোনো কিছু বিক্রয় করে তাহলে বিক্রীত জিনিসটি বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায় [অবশ্য ক্রেতার মালিকানায় আসে কি না তা নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে] সুতরাং বিক্রেতা তথা শফী'র মালিকানা থেকে তার জমিটি চলে যাওয়ার কারণে শুফ'আর 'সবব' তথা জমির সংলগ্নতা' আর অবশিষ্ট নেই। অতএব শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَالَ : وَوَكِيلُ الْبَائِعِ إِذَا بَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَوَكِيلُ الْمُشْتَرِيْ إِذَا ابْتَاعَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، وَالْأَصْلُ اَنَّ مَنْ بَاعَ أَوْ بِيْعَ لَهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ، وَمَنِ اشْتَرٰى أَوْ أُبْتِيْعَ لَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ ـ لِأَنَّ الْأَوَّلَ بِأَخْذِ الْمَشْفُوعَةِ يَسْعٰى فِيْ نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالْمُشْتَرِيْ لَا يَنْقُضُ شِرَاهُ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، لِأَنَّهُ مِثْلُ الشِّرَاءِ . وَكَذَالِكَ لَوْ ضَمِنَ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ وَهُوَ الشَّفِيْعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ـ وَكَذَالِكَ إِذَا بَاعَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ فَأَمْضَى الْمَشْرُوْطُ لَهُ الْخِيَارُ الْبَيْعَ وَهُوَ الشَّفِيْعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ، لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِإِمْضَائِهِ، بِخِلَافِ جَانِبِ الْمَشْرُوْطِ لَهُ الْخِيَارُ مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِيْ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিক্রেতার প্রতিনিধি যদি [বাড়িটি] বিক্রয় করে এবং এই প্রতিনিধিই বাড়িটির শফী' হয়ে থাকে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার থাকবে না। আর ক্রেতার প্রতিনিধি যদি [বাড়িটি] ক্রয় করে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার থাকবে। এখানে মূলনীতিটি হলো, যে বিক্রয় করবে কিংবা যার জন্য বিক্রয় করে দেওয়া হবে তার শুফ'আর অধিকার থাকবে না। আর যে ক্রয় করবে কিংবা যার জন্য ক্রয় করা হবে তার শুফ'আর অধিকার থাকবে। কারণ হলো– প্রথম প্রকারের ব্যক্তি শুফ'আ গ্রহণের মাধ্যমে যে বিক্রয় চুক্তিটি তার পক্ষ থেকে পূর্ণতা লাভ করেছিল তা আবার সে ভঙ্গ করতে চাচ্ছে। পক্ষান্তরে ক্রেতা শুফ'আর মাধ্যমে [বাড়িটি] গ্রহণের মাধ্যমে তার ক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করতে যাচ্ছে না। কেননা শুফ'আর মাধ্যমে গ্রহণ করা ক্রয়েরই অনুরূপ। অনুরূপভাবে কেউ যদি বিক্রেতার পক্ষ হতে ক্রেতার জন্য জমির সম্ভাব্য [অন্য কেউ মালিকানা দাবি করলে] ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করে এবং সেই আবার জমিটির শফী' হয় তাহলে তার শুফ'আর অধিকার থাকবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি [জমি] বিক্রয় করে এবং অপর এক ব্যক্তির ইচ্ছাধিকারের শর্ত যুক্ত করে। অতঃপর যার ইচ্ছাধিকারের শর্ত করা হয়েছিল সে বিক্রয় চুক্তিটি অনুমোদন করে দেয় আর এই অনুমোদনকারীই যদি জমিটির শফী' হয়ে থাকে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার থাকবে না। কেননা বিক্রয় চুক্তিটি পূর্ণ হয়েছে তারই অনুমোদনের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে ক্রেতার পক্ষ হতে কারো ইচ্ছাধিকারের শর্ত যুক্ত করা হলে তার পক্ষ থেকে [চুক্তিটি অনুমোদিত হলে] বিষয়টি ভিন্ন হবে [অর্থাৎ সেক্ষেত্রে অনুমোদনকারী শফী' হলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَكِيلُ الْبَائِعِ إِذَا بَاعَ وَهُوَ الشَّفِيْعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) মাসআলা বর্ণনা করেছেন, জমির বিক্রেতা যদি নিজে জমিটি বিক্রয় না করে অন্য এক ব্যক্তিকে তার জমিটি বিক্রয় করে দেওয়ার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, আর এই জমির সাথে উক্ত প্রতিনিধির জমি সংলগ্ন হওয়ার কারণে সে এই জমির শফী' হয়ে থাকে তাহলে বিধান হচ্ছে, উক্ত প্রতিনিধি বিক্রেতার জমিটি বিক্রয় করে দিলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি জমি ক্রয় করার জন্য কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, আর প্রতিনিধি তার জন্য এমন জমি ক্রয় করে দেয় যে, সে নিজেই সে জমির শুফ'আর হকদার তাহলে এই ক্রয় করে দেওয়ার কারণে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। সে উক্ত জমিতে শুফ'আ লাভ করতে পারবে।

قَوْلُهُ : وَالْأَصْلُ أَنَّ مَنْ بَاعَ أَوْ بِيْعَ لَهُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত মাসআলার একটি মূলনীতি বর্ণনা করছেন। মূলনীতিটি হচ্ছে, যে জমি বিক্রয় করবে বা যার পক্ষ থেকে বিক্রয় করা হবে সে নিজেই যদি জমির শফী' হয়ে থাকে তাহলে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না। অপর দিকে যে জমি ক্রয় করবে বা যার পক্ষ থেকে ক্রয় করা হবে সে নিজেই যদি ঐ জমির শফী' হয়ে থাকে তাহলে সে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে।"

মূলনীতিটির ব্যাখ্যা: মূলনীতিটি স্পষ্ট হওয়ার জন্য চারটি উদাহরণ প্রয়োজন।

১. যে বিক্রয় করে এর উদাহরণ হচ্ছে, প্রতিনিধি। জমির মালিক কাউকে যদি বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি বানায় এবং প্রতিনিধি নিজেই যদি ঐ জমির শফী' হয়ে থাকে তাহলে সে জমিটি বিক্রয় করে দিলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।
২. যার পক্ষ হতে বিক্রয় করা হয়, এর উদাহরণ হচ্ছে, মুদারিব। মুদারিব যদি মুদারাবার টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করার পর তা আবার বিক্রয় করতে চায় এবং 'রাব্বুল মাল' ঐ জমিটির শফী' হয়ে থাকে তাহলে মুদারিব জমিটি বিক্রয় করার পর 'রাব্বুল মাল'-এর শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে জমিটি 'রাব্বুল মালের'-এর পক্ষ হতে বিক্রয় করা হয়েছে। কেননা জমিটি তারই মালিকানাভুক্ত ছিল।
৩. যে ক্রয় করে, এর উদাহরণ হচ্ছে, ক্রেতার প্রতিনিধি। ক্রেতা যদি কাউকে জমি ক্রয় করার জন্য প্রতিনিধি বানায়। অতঃপর প্রতিনিধি এমন জমি ক্রয় করে দেয় যার শফী' সে নিজেই তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।
৪. যার জন্য ক্রয় করা হয়, এর উদাহরণ হচ্ছে- মুদারিব। মুদাবিব যদি মুদারাবার টাকা দ্বারা কোনো জমি ক্রয় করে আর "রাব্বুল মাল" ঐ জমিটির শফী' হয়ে থাকে তাহলে ঐ জমির উপর 'রাব্বুল মাল'-এর শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে মুদারিব যে জমিটি ক্রয় করেছে তা 'রাব্বুল মাল'-এর পক্ষ হতে ক্রয় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, উপরে যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বিক্রয় করবে বা যার পক্ষ হতে বিক্রয় করা হবে সে নিজেই ঐ জমির শফী' হলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে- এটি আমাদের মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর মতে, তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। -[দ্র: আল বিনায়াহ]

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ بِأَخْذِ الْمَشْفُوْعَةِ يَسْعٰى فِيْ نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত মূলনীতিটির দলিল বর্ণনা করছেন। দলিল হচ্ছে, প্রথম ব্যক্তি তথা যে জমি বিক্রয় করে বা যার পক্ষ থেকে বিক্রয় করা হয় তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে এ জন্য যে, বিক্রয় চুক্তিটি তার পক্ষ থেকে সম্পাদিত হয়েছে। এখন সে যদি শুফ'আর অধিকারের মাধ্যমে জমিটি গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে জমিটি ক্রয় করতে চাচ্ছে বলে গণ্য হবে। কারণ শুফ'আর মাধ্যমে গ্রহণ করা ক্রয় করারই পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং সে বিক্রয় করার পরপরই আবার ক্রয়ের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করতে চায়। আর বিক্রয়ের পরই তা আর [একই মূল্যে] ক্রয় করতে চাইলে একই ব্যক্তির কাজের মধ্যে تَنَاقُضْ বা বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। কাজেই তা জায়েজ হবে না। অতএব তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তথা যে ক্রয় করে বা যার পক্ষে ক্রয় করা হয় সে নিজেই যদি শফী' হয় তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। তার কারণ হচ্ছে, সে শুফ'আর অধিকার বলে জমিটি গ্রহণ করলে তার কাজের মাঝে বৈপরীত্য تَنَاقُضْ সৃষ্টি হয় না। কেননা শুফ'আর মাধ্যমে গ্রহণ করা ক্রয় করারই অনুরূপ। কাজেই তার কাজের মধ্যে যেহেতু বৈপিরীত্য নেই তাই তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ لَوْ ضَمِنَ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ الخ : পূর্বে মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিক্রেতা যদি জমি বিক্রয় করার জন্য কাউকে প্রতিনিধি বানায় আর সে নিজেই জমির শফী' হয় তাহলে সে জমিটি বিক্রয় করে দিলে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এখানে মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, কেউ যদি বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতাকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, এই জমি যদি প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতার মালিকানাভুক্ত না হয়। বরং অন্য কেউ এসে এর মালিকানা সাব্যস্ত করে তাহলে আমি তার দায় দায়িত্ব বহন করব। তাহলেও বিধান হচ্ছে, যে ব্যক্তি বিক্রেতার পক্ষ হতে এই দায় দায়িত্ব গ্রহণ করল সে নিজেই ঐ জমির শফী' হয়ে থাকলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এ বিধানের কারণ হচ্ছে– এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি যদিও বিক্রেতা নয় কিন্তু বিক্রয় চুক্তিটি তার মাধ্যমেই পূর্ণ হয়েছে। কেননা সে যদি এই দায় দায়িত্ব গ্রহণ না করত তাহলে ক্রেতা জমিটি ক্রয় করতে রাজি হতো না। কাজেই এখন যদি ঐ ব্যক্তি শুফ'আর অধিকার বলে জমিটি গ্রহণ করতে চায় তাহলে তার কাজের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিবে [যার ব্যাখ্যা একটু পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি]। সুতরাং তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ اِذَا بَاعَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهٖ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বের বিধানের মতো একই বিধান হবে যদি বিক্রেতা জমি বিক্রয় করার সময় এরূপ শর্তে বিক্রয় করে যে, বিক্রয় চুক্তিটি ওমুক ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর থাকবে; সে যদি এটি কার্যকর করে তাহলে কার্যকর হবে নতুবা এটি বাতিল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তির ইচ্ছাধিকারের শর্ত করা হয়েছে সে নিজেই যদি জমিটির শফী' হয়ে থাকে এবং বিক্রয় চুক্তিটি কার্যকর করে দেয় তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ لِاَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِاِمْضَائِهٖ : উক্ত বিধানের কারণ হচ্ছে, যদিও এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি বিক্রেতা নয় কিন্তু বিক্রয় চুক্তি তার ইচ্ছার উপর নির্ভর ছিল। সে কার্যকর করার দ্বারা তা চূড়ান্ত হয়েছে। সুতরাং তার দ্বারা বিক্রয় চুক্তিটি পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন যদি সে শুফ'আর অধিকার বলে জমিটি নিতে চায় তাহলে তা হবে জমিটি ক্রয় করার পর্যায়ভুক্ত। ফলে তার কাজের মাঝে বৈপরীত্য (تَنَاقُضْ) দেখা দিবে। অতএব তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ جَانِبِ الْمَشْرُوْطِ لَهُ الْخِيَارُ مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِيْ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি জমি ক্রয় করার সময় এই শর্তে ক্রয় করে যে, ক্রয় চুক্তিটি অমুকের ইচ্ছার উপর নির্ভর থাকবে। সে যদি কার্যকর করে তাহলে কার্যকর হবে নতুবা বাতিল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি যদি চুক্তিটি কার্যকর করে আর সে নিজেই এই জমির শফী' হয়ে থাকে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

এক্ষেত্রে শুফ'আ বাতিল না হওয়ার কারণ হচ্ছে, ঐ ব্যক্তির কাজের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দেয়নি। কেননা তার উপর 'খিয়ার' বা ইচ্ছাধিকারটি এসেছে ক্রেতার পক্ষ থেকে। সুতরাং তার কার্যকর করার দ্বারা ক্রয় পূর্ণতা লাভ করেছে। অতএব সে ক্রেতা হিসেবে গণ্য। অপর দিকে সে যখন তার শুফ'আর অধিকার বলে জমিটি গ্রহণ করবে তখন তাও ক্রয় হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং তার পূর্বে চুক্তিটি কার্যকরণ এবং শুফ'আর ভিত্তিতে জমিটি গ্রহণ একই প্রকারের কার্য হবে। যার মাঝে কোনো বৈপরীত্য (تَنَاقُضْ) দেখা দিবে না। কাজেই তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

قَالَ : وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيْعَ أَنَّهَا بِيْعَتْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا بِيْعَتْ بِأَقَلَّ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيْرٍ قِيْمَتُهَا أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرَ فَتَسْلِيْمُهُ بَاطِلٌ وَلَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَلَّمَ لِاسْتِكْثَارِ الثَّمَنِ فِي الْأَوَّلِ ، وَلِتَعَذُّرِ الْجِنْسِ الَّذِيْ بَلَغَهُ وَتَيَسُّرِ مَا بِيْعَ بِهِ فِي الثَّانِيْ، إِذِ الْجِنْسُ مُخْتَلِفٌ . وَكَذَا كُلُّ مَكِيْلٍ أَوْ مَوْزُوْنٍ أَوْ عَدَدِيٍّ مُتَقَارِبٍ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا بِيْعَتْ بِعَرْضٍ قِيْمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيْهِ الْقِيْمَةُ وَهِيَ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيْرُ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهَا بِيْعَتْ بِدَنَانِيْرَ قِيْمَتُهَا أَلْفٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ . وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَهُ الشُّفْعَةُ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ . وَلَنَا أَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدٌ فِيْ حَقِّ الثَّمَنِيَّةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি শফী'র নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, বাড়িটি এক হাজার দিরহামে বিক্রয় হয়েছে ফলে সে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয়। অতঃপর জানতে পারে যে, জমিটি তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় হয়েছে কিংবা গম বা যবের বিনিময়ে বিক্রয় হয়েছে। যে গমের মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম বা তার চেয়ে অধিক দিরহাম তাহলে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেওয়া বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার অধিকার সাব্যস্ত হবে। কেননা সে তো অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল প্রথমোক্ত সুরতে মূল্য তার মতে বেশি হওয়ার কারণে, আর দ্বিতীয় সুরতে [মূল্য হিসেবে] যে দ্রব্যের সংবাদ তার নিকট পৌঁছেছে তার জোগাড় করতে অপারগ হওয়ার কারণে অথচ যে দ্রব্যে প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় হয়েছে তা [হয়তো] তার জন্য সহজলভ্য ছিল। কেননা [উভয়ের] শ্রেণি এখানে ভিন্ন ভিন্ন। অনুরূপভাবে যে কোনো পাত্র পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য কিংবা কাছাকাছি আকারের গণনা নির্ভর বস্তু [-র ক্ষেত্রেও এই একই বিধান]। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম হলো, যদি সে জানতে পারে যে, বাড়িটি আসবাবপত্রের বিনিময়ে বিক্রয় হয়েছে যার মূল্য এক হাজার দিরহাম কিংবা তার চেয়ে অধিক [অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার শুফ'আ আর সাব্যস্ত হবে না]। কেননা এক্ষেত্রে তার উপর আসবাবপত্রের মূল্য পরিশোধ করাই আবশ্যক হতো। আর মূল্য দিরহাম বা দীনারের মাধ্যমেই [পরিশোধ করতে] হয়। আর যদি জানা যায় যে, বাড়িটি দিনারের বিনিময়ে বিক্রয় হয়েছে যেই দিনারের মূল্য হচ্ছে এক হাজার দিরহাম তাহলে তার শুফ'আর অধিকার থাকবে না। তদ্রূপ যদি সেই দিনারের মূল্য হয় এক হাজার দিরহামের অধিক [তাহলেও শুফ'আর অধিকার থাকবে না]। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে [দীনার সম্পর্কিত সুরতে] শফী'র শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। কেননা দিরহাম ও দিনারের শ্রেণি ভিন্ন। আমাদের দলিল হলো, মুদ্রা দ্রব্য হওয়ার দিক থেকে এ দু'টির শ্রেণি একই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيْعُ أَنَّهَا بِيْعَتْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الخ : এখান থেকে ইমাম কুদূরী (র.) কয়েকটি সুরত উল্লেখ করেছেন যেগুলোতে শফী' যদি বিক্রয়ের সংবাদ পাওয়ার পর বলে যে, আমি শুফ'আর অধিকার ত্যাগ করলাম তবুও তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। সুরতগুলো হচ্ছে– শফী'র নিকট এভাবে সংবাদ পৌঁছল যে, জমিটি 'এক হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে' বিক্রয় করা হয়েছে এবং এ সংবাদ শুনার পর শফী' বলল, তাহলে আমি শুফ'আর অধিকার ত্যাগ করলাম। এরপর জানা গেল যে, জমিটি আসলে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় হয়নি বরং তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় হয়েছে। তাহলে সে যে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে।

অনুরূপভাবে উক্ত সুরতে যদি পরে জানা যায় যে, জমিটি এক হাজার রৌপ্যমুদ্রায় বিক্রয় হয়নি; বরং বিক্রয় হয়েছে নির্দিষ্ট পরিমাণ গম বা যবের বিনিময়ে তবে সেই গমের মূল্য হচ্ছে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রা বা তার চেয়ে বেশি তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে।

উল্লেখ্য, উক্ত গম বা যবের মূল্য এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা বা তার চেয়ে বেশি হলে যেমনিভাবে তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে তেমনিভাবে যদি জানা যায় যে, উক্ত গম বা যবের মূল্য এক হাজার রৌপ্যমুদ্রার চেয়ে কম তাহ'লেও তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। ইমাম কুদূরী (র.) কমের সুরতের কথা উল্লেখ করেননি সম্ভবত এ কারণে যে, মূল্য এক হাজার বা তার চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও যেখানে তার শুফ'আ বাতিল হচ্ছে না সেখানে কম হলে যে বাতিল হবে না তা বোধগম্য হওয়া অতি স্বাভাবিক।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَلَّمَ لِاسْتِكْثَارِ الثَّمَنِ فِي الْأَوَّلِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত মাসআলার দলিল বর্ণনা করছেন। উক্ত মাসআলায় প্রধানত দু'টি সুরত ছিল। এক. এক হাজার রৌপ্যমুদ্রায় বিক্রয় হয়েছে শুনার পর জানা গেল এক হাজারের চেয়ে কম রৌপ্যমুদ্রায় বিক্রয় হয়েছে। দুই. 'এক হাজার রৌপ্যমুদ্রায় বিক্রয় হয়েছে' শুনার পর জানা গেল যে, বিক্রয় হয়েছে গম বা যবের বিনিময়ে। প্রথম সুরতে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল না হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে যখন শুনেছে যে, এক হাজার রৌপ্যমুদ্রায় জমিটি বিক্রয় হয়েছে তখন তার কাছে এই মূল্য [স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে] অধিক মনে হয়েছে। তাই সে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছে। কাজেই এর দ্বারা এটা বুঝা যাবে না যে, সে এর চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় হলেও সে তার অধিকার ছেড়ে দিতো। সুতরাং পরে যখন জানা গেল যে, জমিটি প্রকৃতপক্ষে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রার চেয়ে কমে বিক্রয় হয়েছে তখন তার পূর্বের ত্যাগ করা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَلِتَعَذُّرِ الْجِنْسِ الَّذِيْ بَلَغَهُ الخ : দ্বিতীয় সুরতে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল না হওয়ার কারণ হচ্ছে– এ সুরতে সে শুনেছে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রয় হয়েছে কিন্তু পরে জানা গেছে যে, বিক্রয় হয়েছে নির্দিষ্ট পরিমাণ গম বা যবের বিনিময়ে। এক্ষেত্রে এরূপ ধরে নেওয়া হবে যে, এক হাজার রৌপ্য মুদ্রায় জমিটি বিক্রয় হয়েছে বলে শুনার পর শফী' এই জন্য তার অধিকার ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছে যে, রৌপ্য মুদ্রা পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে যদি গম বা যবের বিনিময়ে বিক্রয় হয়ে থাকলে তা তার পক্ষে সম্ভব হতো। [কেননা অনেক সময় কোনো ব্যক্তির নিকট নগদ অর্থ কড়ি থাকে না কিন্তু ধান, গম ইত্যাদি থাকে এবং এগুলো পরিশোধ করা তার জন্য সহজ হয়]। কাজেই পরে যখন জানা গেল যে, জমিটি গম বা যবের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়েছে–চাই সে গম বা যবের মূল্যে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রার চেয়ে বেশি হোক বা কম হোক তখন ধরা হবে যে, গম বা যব পরিশোধ করে জমি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সে তার অধিকার পরিত্যাগ করেনি। অতএব তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا كُلُّ مَكِيْلٍ أَوْ مَوْزُوْنٍ أَوْ عَدَدِيٍّ مُتَقَارِبٍ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে গম বা যবের ক্ষেত্রে যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে তা শুধু গম বা যবের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে, শফী' প্রথমে শুনেছে জমিটি বিক্রয় হয়েছে মুদ্রা বা কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিন্তু পরে জানতে পারল যে, প্রকৃতপক্ষে উক্ত জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয় হয়নি; বরং বিক্রয় হয়েছে অন্য শ্রেণি (جِنْس) -এর জিনিসের বিনিময়ে এবং ঐ জিনিসের নিম্নের তিন প্রকারের যে কোনো এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত:

১. مَكِيْل পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য,

২. مَوْزُوْن –ওজন পরিমাপিত দ্রব্য,

৩. عَدَدِيٌّ مُتَقَارِبٌ– গণনা নির্ভর দ্রব্য এবং তার আকার পরস্পর প্রায় সমান।

এই প্রকারের কোনো এক প্রকারের দ্রব্যের বিনিময়ে প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় হয়েছে বলে যদি জানতে পারে তাহলে শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

مَكِيْل বা পাত্র পরিমাপিত দ্রব্যের উদাহরণ, যেমন শফী' প্রথমে শুনল যে, জমিটি বিক্রয় হয়েছে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রায় বা গমের বিনিময়ে ফলে সে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিল। কিন্তু পরে জানতে পারল যে, আসলে বিক্রয় হয়েছে লবণের বিনিময়ে তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। এক্ষেত্রে লবণ হচ্ছে مَكِيْل বা পাত্র পরিমাপিত দ্রব্য।

مَوْزُوْن –যা ওজন পরিমাপিত দ্রব্যের উদাহরণ, শফী' প্রথমে শুনল যে, জমিটি বিক্রয় হয়েছে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রায় বা মধুর বিনিময়ে, তাই সে শুফ'আর অধিকার পরিত্যাগ করল। কিন্তু পরে জানতে পারল যে, আসলে বিক্রয় হয়েছে তৈলের বিনিময়ে তাহলেও তার শুফ'আ বাতিল হবে না। এক্ষেত্রে তৈল হচ্ছে ওজন পরিমাপিত দ্রব্য।

عَدَدِىٌّ مُتَقَارِبٌ – বা প্রায় সমান আকারের গণনা নির্ভর দ্রব্যের উদাহরণ হচ্ছে, শফী' প্রথমে শুনল যে জমিটি বিক্রয় হয়েছে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে। তাই সে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিল। কিন্তু পরে জানল যে, প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় হয়েছে ডিমের বিনিময়ে কিংবা আখরোটের বিনিময়ে, তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

এই তিন প্রকারের ক্ষেত্রে শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল না হওয়ার কারণ হচ্ছে– এগুলো ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ বা সদৃশলভ্য দ্রব্য। অর্থাৎ যে জিনিসের বিনিময়ে জমিটি প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় হয়েছে শফী' তার উপর ঠিক অনুরূপ জিনিস দিয়েই জমিটি গ্রহণ আবশ্যক। সুতরাং হতে পারে যে শফী'র পক্ষে ঐ জিনিস পরিশোধ করা সহজ ছিল আর যে সম্পর্কে সে প্রথমে শুনেছিল তা পরিশোধ করা সহজ ছিল না। কাজেই প্রথমে তার অধিকার পরিত্যাগ করার কারণে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا بِيْعَتْ بِعَرْضٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন,পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে, শফী'কে প্রথমে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, জমিটি এক হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়েছে, ফলে সে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু পরে জানা গেল যে, জমিটি প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় হয়েছে কোনো আসবাব-পত্রের বিনিময়ে [বা এমন কোনো জিনিসের বিনিময়ে যা ذَوَاتُ الْقِيَمِ বা 'মূল্য নির্ভর' বস্তুর অন্তর্ভুক্ত] এবং সে আসবাব পত্র বা জিনিসটির মূল্যে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রা বা তার চেয়ে বেশি তাহলে শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সে যে প্রথমে তার অধিকার পরিত্যাগ করেছিল সে পরিত্যাগ বহাল থাকবে। কাজেই শুফ'আ বাতিল হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيْهِ الْقِيْمَةُ وَهِيَ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيْرُ : এর সূরতে শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হওয়ার কারণ হচ্ছে, আসবাব পত্র (عَرْض) বা ذَوَاتُ الْقِيَمِ "মূল্যনির্ভর বস্তু" দ্বারা ক্রেতা জমি ক্রয় করলে সে জমি শফী' গ্রহণ করতে চাইলে তার উক্ত আসবাব বা বস্তুর মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়। উক্ত বস্তুর অনুরূপ বস্তু দিয়ে সে জমিটি গ্রহণ করতে পারে না। কেননা ذَوَاتُ الْقِيَمِ বা মূল্য নির্ভর বস্তুর ক্ষেত্রে একই রকমের বস্তু সহজে পাওয়া যায় না। কাজেই শফী'র উপর যেহেতু উক্ত আসবাব বা বস্তুর মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক ছিল এবং মূল্য পরিশোধ করা হয় রৌপ্য মুদ্রা বা স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কাজেই উক্ত আসবাব বা বস্তুর মূল্যের বিষয়টিই এক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে। সুতরাং শফী' যখন প্রথমে শুনেছে এক হাজার

রৌপ্য মুদ্রায় জমিটি বিক্রয় করা হয়েছে এবং পরে জানতে পেরেছে যে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রা মূল্যের আসবাব পত্রের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়েছে তখন এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, শফী' যদি প্রথমে শুনতো যে আসবাব পত্রের বিনিময়ে বিক্রয় হয়েছে তাহলে সে তার শুফ'আর অধিকার পরিত্যাগ করত না। সে হয়তো উক্ত আসবাবের অনুরূপ আসবাব দিয়ে জমিটি নিতে পারত। কেননা আসবাবের বিনিময়ে বিক্রয় হলে শফী'র আসবাব দিয়ে জমি গ্রহণ করার সুযোগ থাকে না। বরং তার মূল্য পরিশোধ করেই গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। অতএব, এক হাজার রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রয়ের কথা শুনে তার শুফ'আর অধিকার পরিত্যাগ করেছে তার সে 'পরিত্যাগ করা' বহাল থাকবে এবং শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ أَنَّهَا بِيْعَتْ بِدَنَانِيْرَ : এ ইবারতটুকুও পূর্বের ইবারতের সাথে সম্পর্কিত। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি শফী'র নিকট প্রথমে সংবাদ পৌছে জমি বিক্রয় হয়েছে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে, ফলে সে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয়। কিন্তু পরে জানতে পারে যে, জমিটি প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় হয়েছে স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে যার মূল্য হচ্ছে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রা, তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে না। অনুরূপভাবে উক্ত স্বর্ণমুদ্রার মূল্য যদি এক হাজার রৌপ্য মুদ্রার চেয়ে বেশি হয় তাহলেও একই বিধান হবে। অর্থাৎ তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে না।

قَوْلُهُ وَقَالَ زُفَرُ (رح) لَهُ الشُّفْعَةُ : উক্ত মাসআলায় ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। তাঁর মতে, উক্ত মাসআলাই উভয় সুরতের তথা স্বর্ণমুদ্রার মূল্য এক হাজার রৌপ্যমুদ্রার সমান হলেও এবং বেশি হলেও শফী'র শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। প্রথমে রৌপ্যমুদ্রায় বিক্রয় হয়েছে শুনে সে যে তার অধিকার পরিত্যাগ করেছিল তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ (র.)-এরও অভিমত ইমাম যুফার (র.)-এর মতের অনুরূপ।

–[বিনায়াহ]

قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ : ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হচ্ছে, রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা দু'টি ভিন্ন جِنْس [শ্রেণি]-এর দ্রব্য। আর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো جِنْس -এর বিনিময়ে বিক্রয় হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়ার পর শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিলে পরে যদি জানতে পারে যে, অন্য এক جِنْس -এর দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় হয়েছে তাহলে শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হয় না। কাজেই আলোচ্য সুরতে শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

[উল্লেখ্য, রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা যে দু'টি ভিন্ন جِنْس বা শ্রেণির দ্রব্য তার প্রমাণ হচ্ছে– উভয়টি ওজন পরিমাপিত দ্রব্য হওয়া সত্ত্বেও এ দু'টির মাঝে تَفَاضُلْ অর্থাৎ একটির বিনিময়ে অপরটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। যদি একই جِنْس -এর হতো কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হতো না।]

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدٌ فِيْ حَقِّ الثَّمَنِيَّةِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম যুফার (র.)-এর বিপক্ষে আমাদের দলিল হচ্ছে, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা যদিও সত্তাগত দিক থেকে দু'টি ভিন্ন শ্রেণির দ্রব্য, কিন্তু উভয়টি مَقْصُوْد বা "বস্তুর উদ্দেশ্য"-এর দিক থেকে এই جِنْس -এর দ্রব্য বলে গণ্য হবে। উভয় দ্রব্যের 'উদ্দেশ্য' হচ্ছে ثَمَنِيَّةٌ বা 'মুদ্রা হওয়া'। রৌপ্য মুদ্রাকেও মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং স্বর্ণমুদ্রাকে ও মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উভয় দ্রব্যেরই সাধারণ 'উদ্দেশ্য' হচ্ছে মুদ্রারূপে ব্যবহার করা। কাজেই মুদ্রা হওয়ার দিক থেকে উভয়টি মুদ্রা হওয়ার কারণে সাধারণত একটিকে [বিনিময়ের মাধ্যমে] অপরটিতে রূপান্তর করা সহজ। কাজেই এক্ষেত্রে এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না যে, শফী' রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রয় হয়েছে বলে শোনার পর এ কারণে শুফ'আ ছেড়ে দিয়েছে যে, রৌপ্য মুদ্রা পরিশোধ করা তার জন্য হয়তো সহজ ছিল না। পক্ষান্তরে স্বর্ণমুদ্রার কথা জানলে সে হয়ত তার শুফ'আ পরিত্যাগ করত না। কারণ সে সহজে একটিকে অপরটি দ্বারা পরিবর্তন করে পরিশোধ করতে পারত। অতএব, সে প্রথমে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছে তা বহালই থাকবে এবং শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

قَالَ : وَإِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّ الْمُشْتَرِى فُلَانٌ فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ لِتَفَاوُتِ الْجِوَارِ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِى هُوَ مَعَ غَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ غَيْرِهِ، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ لَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهِ وَلَوْ بَلَغَهُ شِرَاءُ النِّصْفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ ظَهَرَ شِرَاءُ الْجَمِيعِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ لِضَرَرِ الشِّرْكَةِ وَلَا شِرْكَةَ ، وَفِي عَكْسِهِ لَا شُفْعَةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي الْكُلِّ تَسْلِيمٌ فِي أَبْعَاضِهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি শফী'কে বলা হয় যে, [জমিটির] ক্রেতা হচ্ছে অমুক ব্যক্তি, ফলে সে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয়। অতঃপর জানতে পারে যে, ক্রেতা অন্য কেউ তাহলে তার শুফ'আর অধিকার থাকবে। কেননা প্রতিবেশীত্বের [আচার ব্যবহারের] মাঝে তারতম্য হয়ে থাকে। আর যদি জানতে পারে যে, ক্রেতা সেই ব্যক্তিই তবে অপর এক ব্যক্তিসহ তাহলে শফী'র অপর ব্যক্তিটির অংশ গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। কেননা অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছে বলে বুঝা যায়নি। আর যদি শফী'র নিকট জমিটির অর্ধেক বিক্রয় হওয়ার সংবাদ পৌঁছে ফলে সে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয় অতঃপর সম্পূর্ণ জমিটি বিক্রয় হওয়ার কথা জানা যায় তাহলে তার শুফ'আর অধিকার থাকবে। কেননা সে অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল অংশীদারিত্বের সমস্যার কারণে অথচ অংশীদারিত্ব ছিল না। আর মাসআলাটি এর বিপরীত হলে জাহিরী রেওয়ায়েত অনুসারে তার শুফ'আর অধিকার থাকবে না। কেননা সম্পূর্ণ জমির অধিকার ছেড়ে দেওয়ার মাঝে তার কিছু অংশের অধিকার ছেড়ে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّ الْمُشْتَرِى فُلَانٌ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) মাসআলা বর্ণনা করেছেন, যদি এমন হয় যে, শফী'কে সংবাদ দেওয়া হয় জমি বিক্রয় হয়েছে বলে এবং জমির ক্রেতা হচ্ছে অমুক ব্যক্তি ফলে সে বলল, তাহলে আমি শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পরে জানা গেল যে, ক্রেতা হিসেবে যার কথা বলা হয়েছে সে প্রকৃতপক্ষে ক্রেতা নয়; বরং ক্রেতা হচ্ছে অন্য এক ব্যক্তি, তাহলে বিধান হচ্ছে শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে।

উল্লেখ্য আলোচ্য মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে দু'টি মত বর্ণিত আছে। একটি হচ্ছে আমাদের মাযহাবের অনুরূপ অর্থাৎ শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। অপরটি হচ্ছে শফী'র শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। শরহুল ওয়াজীয গ্রন্থে প্রথম মতটি গ্রহণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِتَفَاوُتِ الْجِوَارِ : উক্ত মাসআলায় আমাদের মাযহাব অনুসারে শফী'র শুফ'আর অধিকার বহাল থাকার কারণ হচ্ছে, প্রতিবেশী হিসেবে আচার আচরণ ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কেউ প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করে, আবার কেউ প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করে। কাজেই এমন ধরা যেতে পারে যে শফী' প্রথমে ক্রেতা হিসেবে যার কথা শুনেছিল তাকে তার প্রতিবেশী রূপে গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি ছিল না। তাই সে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে, ক্রেতা অন্য ব্যক্তি হলেও সে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। অতএব, পরে যখন প্রকাশ পেয়েছে ক্রেতা অন্য এক ব্যক্তি তখন প্রথমে সে যে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِى هُوَ مَعَ غَيْرِهِ الخ : এ ইবারতটুকু পূর্বের মাসআলার সাথে সম্পর্কিত। [ইমাম কুদূরী (র.) বলেন.] যদি এমন হয় যে, শফী'কে বলা হলো 'ক্রেতা ওমুক ব্যক্তি' ফলে সে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিল, কিন্তু পরে জানা গেল যে ক্রেতা ঐ ব্যক্তি একক নয়; বরং তার সাথে আরো এক ব্যক্তি রয়েছে। তারা দু'জনে জমিটি ক্রয় করেছে তাহলে বিধান হচ্ছে, শফী' প্রথমে যার কথা শুনেছিল তার অংশে শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে। কিন্তু তার সাথে অপর যে ব্যক্তি ক্রয় করেছে তার অংশে শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। সুতরাং অপর ব্যক্তির অংশের যা মূল্য হয় তা পরিশোধ করে শফী'র তার অংশটুকু গ্রহণ করতে পারবে।

উল্লেখ্য ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে আলোচ্য মাসআলায় উভয় ক্রেতার অংশেই শফী'র শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। প্রথমে ক্রেতা হিসেবে যার কথা শুনেছিল তার অংশেও বহাল থাকবে এবং তার সাথে অপর যে ব্যক্তি ক্রয় করেছে তার অংশেও বহাল থাকবে। অর্থাৎ শফী' প্রথমে একজন ক্রেতার কথা শুনে শুফ'আর অধিকার যে ছেড়ে দিয়েছিল তা বাতিল বলে গণ্য হবে। -[আল বিনায়াহ]

لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ لَمْ يُوْجَدْ فِىْ حَقِّهِ الخ – উক্ত মাসআলায় আমাদের মতে অপর ক্রেতার ক্ষেত্রে শুফ'আর অধিকার বাতিল না হওয়ার কারণ হচ্ছে, শফী' যে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল তা ছিল কেবল প্রথমে ক্রেতা হিসেবে যার কথা শুনেছিল তার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে অপর ক্রেতা [যার কথা পরে জানা গেছে]-র ব্যাপারে সে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেনি। কাজেই তার ক্ষেত্রে শফী'র শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ بَلَغَهُ شِرَاءُ النِّصْفِ فَسَلَّمَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) মাসআলা বর্ণনা করেছেন, যদি শফী'র নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, বাড়ির অর্ধেক বিক্রয় করা হয়েছে ফলে সে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয়। কিন্তু পরে জানতে পারে যে সম্পূর্ণ বাড়িটিই বিক্রয় করা হয়েছে তাহলে শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। শফী' যে প্রথমে অর্ধেক বিক্রয়ের কথা শুনে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ لِضَرَرِ الشِّرْكَةِ وَلَا شِرْكَةَ : উক্ত বিধানের কারণ হচ্ছে, শফী' যে প্রথমে অর্ধেক বাড়ি বিক্রয়ের কথা শুনে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল, তা এই ধরা হবে যে, সে বাড়ির অর্ধেক গ্রহণ করে এই বাড়ির মাঝে অন্যের সাথে অংশীদার হতে চায়নি। কেননা সে যদি শুফ'আর মাধ্যমে অর্ধেক বাড়ির মালিক হয় তাহলে অপর অর্ধেক তো পূর্বের মালিকেরই থেকে যাবে। ফলে একই বাড়ির মাঝে তার অন্যের সাথে অংশীদার হতে হবে। সে হয়তো এটা পছন্দ করেনি, তাই সে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরে যখন জানা গেছে যে, সম্পূর্ণ বাড়িটি বিক্রয় করা হয়েছে তখন প্রকাশ পেয়েছে যে, সে সম্পূর্ণ বাড়িটিই গ্রহণ করতে পারে। যে আশঙ্কার কারণে সে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছে তা সঠিক নয়। কাজেই তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। আর প্রথমে যে সে অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَفِىْ عَكْسِهِ لاَ شُفْعَةَ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ : "আর এর বিপরীত ক্ষেত্রে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে তার শুফ'আর অধিকার থাকবে না"। মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে ইমাম কুদূরী (র.) যে মাসআলা বর্ণনা করেছেন মাসআলার সুরত যদি তার বিপরীত হয় অর্থাৎ যদি এমন হয় যে, শফী'র নিকট প্রথমে সংবাদ পৌঁছল যে, সম্পূর্ণ বাড়িটি বিক্রয় হয়েছে ফলে সে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিল, কিন্তু পরে জানতে পারল যে, সম্পূর্ণ বাড়িটি বিক্রয় হয়নি। বরং বাড়ির অর্ধেক বিক্রয় হয়েছে তাহলে 'জাহেরী রেওয়ায়েত' অনুসারে শফী'র শুফ'আর অধিকার থাকবে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শফী' প্রথমে সংবাদ শুনার পর যে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল তা বহালই থাকবে।

উল্লেখ্য মুসান্নিফ (র.) এখানে 'জাহেরী রেওয়ায়েত'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। 'জাহেরী রেওয়ায়েত'-এর বাইরে এখানে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যা তিনি উল্লেখ করেননি। সেটি হচ্ছে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে ছমর ইবনে হাদ্দাদ -এর বর্ণিত রেওয়ায়েত। সেই রেওয়ায়েত অনুসারে আলোচ্য মাসআলায় শফী'র শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর মাযহাবও তাই। –[দ্র: আল বিনায়াহ]

قَوْلُهُ لِاَنَّ التَّسْلِيْمَ فِى الْكُلِّ تَسْلِيْمٌ فِىْ أَبْعَاضِهِ الخ : উক্ত মাসআলায় জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে শফী'র শুফ'আর অধিকার বহাল না থাকার কারণ হচ্ছে, শফী' প্রথমে সম্পূর্ণ বাড়ি বিক্রয় হওয়ার সংবাদ শুনার পর তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। আর সম্পূর্ণ বাড়ির শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিলে বাড়ির যে কোনো অংশের শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেওয়া হয়। কেননা যে কোনো অংশ তো সম্পূর্ণ বাড়িরই অন্তর্ভুক্ত অংশ। সুতরাং পরে যখন শফী' জানতে পেরেছে যে, অর্ধেক বাড়ি বিক্রয় হয়েছে তখন তার পূর্বের অধিকার ছেড়ে দেওয়া এই অর্ধেকের ক্ষেত্রে কার্যকর বলে গণ্য হবে। অতএব, এই অর্ধেকে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, জাহেরী রেওয়ায়েতের বাইরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে যে রেওয়ায়েতটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ (র.)-এরও মাযহাব তার দলিল হচ্ছে, প্রথমে শফী' যে সম্পূর্ণ বাড়ি বিক্রয় হওয়ার সংবাদ শুনে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল তার কারণ এই ধরা হবে যে, সম্পূর্ণ বাড়িটি গ্রহণ করার মতো অর্থ কড়ি তার নিকট ছিল না। তাই সে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে সে যদি জানত যে অর্ধেক বাড়ি বিক্রয় হয়েছে তাহলে সে শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিতো না। সুতরাং পরে যখন জানা গেছে যে, অর্ধেক বাড়ি বিক্রয় হয়েছে তখন তার পূর্বের 'অধিকার ছেড়ে দেওয়াকে' বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। –[আল বিনায়াহ]

فَصْلٌ : অনুচ্ছেদ

قَالَ : وَإِذَا بَاعَ دَارًا إِلَّا مِقْدَارَ ذِرَاعٍ مِنْهَا فِيْ طُوْلِ الْحَدِّ الَّذِيْ يَلِي الشَّفِيْعَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، لِانْقِطَاعِ الْجِوَارِ، وَهٰذِهِ حِيْلَةٌ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ مِنْهُ هٰذَا الْمِقْدَارَ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো একটি বাড়ি বিক্রয় করে এবং তার যে সীমানা শফী'র সাথে সংযুক্ত সেই দিক থেকে লম্বালম্বিভাবে এক গজ পরিমাণ বাদ রেখে দেয় তাহলে শুফ'আর অধিকার থাকবে না। কেননা প্রতিবেশীত্ব কাটা পড়েছে। এটি হচ্ছে একটি কৌশল। অনুরূপভাবে যদি এতটুকু পরিমাণ ক্রেতাকে দান করে হস্তান্তর করে দেয় [তাহলেও শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না]। কারণ তাই যা আমরা বর্ণনা করলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَصْلٌ – এ অনুচ্ছেদে জমি বা বাড়ি বিক্রয় করার এমন কিছু কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে, যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে বিক্রয় করলে শফী' শুফ'আর অধিকার লাভ করতে পারে না। এগুলোকে حِيْلَةٌ বলা হয়। শফী' কখনও জালেম বা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় এমন ফাসেক ব্যক্তি হতে পারে। তখন তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এ সকল কৌশল অবলম্বন করে জমি বা বাড়ি বিক্রয় করার প্রয়োজন পড়ে। সে জন্যই এ অনুচ্ছেদে উক্ত কৌশল সম্পর্কিত সুরতগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا بَاعَ دَارًا إِلَّا مِقْدَارَ ذِرَاعٍ مِنْهَا الخ : ইমাম কুদূরী (র.) মাসআলা বর্ণনা করেছেন। কেউ যদি তার বাড়ি এভাবে বিক্রয় করে যে, যে দিক থেকে উক্ত বাড়ির সাথে শফী'র জমি সংলগ্ন সে দিক থেকে শফী'র জমি বরাবর লম্বভাবে এক হাত পরিমাণ জমি বাদ রাখল। উক্ত এক হাত বাদে অবশিষ্ট বাড়ি ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে দিল তাহলে শফী' শুফ'আর অধিকার লাভ করতে পারবে না।

قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ الْجِوَارِ : উক্ত বিধানের কারণ হচ্ছে, শফী' শুফ'আর অধিকার লাভ করার জন্য শর্ত হচ্ছে, তার জমি বিক্রীত বাড়ি বা জমির সাথে পাশাপাশি সংলগ্ন থাকতে হবে। কিন্তু এখানে তা নেই। কেননা বিক্রেতা শফী'র জমির বরাবর লম্বভাবে এক হাত জমি বিক্রয় না করে রেখে দিয়েছে। ফলে বিক্রীত জমি ও শফী'র জমির মাঝে এক হাত পরিমাণ ব্যবধান রয়েছে। কাজেই বিক্রীত জমি শফী'র জমির সাথে সংলগ্ন নয়। অতএব শফী' শুফ'আর অধিকার লাভ করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَهٰذِهِ حِيْلَةٌ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী বর্ণিত উক্ত সুরতটি হচ্ছে, শফী' যাতে শুফ'আর অধিকার লাভ করতে না পারে তার একটি حِيْلَةٌ বা কৌশল।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ مِنْهُ هٰذَا الْمِقْدَارَ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মতনে যে সুরতটি বর্ণনা করা হয়েছে। শুফ'আর অধিকার বাতিল করার জন্য অনুরূপ আরেকটি সুরত হচ্ছে, শফী'র জমি বরাবর লম্বভাবে এক হাত পরিমাণ জমি প্রথমে ক্রেতাকে 'হেবা' [দান] করবে এবং তা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করবে। ক্রেতা উক্ত এক হাত জমি হস্তগত করার পর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট বাড়িটির অবশিষ্ট অংশ বিক্রয় করে ফেলবে। তাহলে শফী' প্রথম যে এক হাত জমি দান করা হয়েছে তাতেও শুফ'আ অধিকার লাভ করতে পারবে না। কারণ দানকৃত জমিতে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। আবার পরে যে বাড়ির অবশিষ্ট অংশ বিক্রয় করা হয়েছে তাতেও শুফ'আর অধিকার লাভ করতে পারবে না। কারণ অবশিষ্ট অংশটুকু এখন আর শফী'র জমির সাথে সংলগ্ন নয়। বরং তা ক্রেতার দান হিসেবে পাওয়া জমির সাথে সংলগ্ন। কাজেই তাতে শফী' শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না।

قَوْلُهُ لِمَا بَيَّنَّا : "কারণ তাই যা একটু পূর্বে বর্ণনা করেছি" এ কথা বলে মুসান্নিফ (র.) একটু পূর্বের ইবারত لِانْقِطَاعِ الْجِوَارِ -এর দিকে ইশারা করেছেন। অর্থাৎ এ সুরতেও শফী' শুফ'আর অধিকার লাভ না করার কারণ হচ্ছে, শফী'র জমির সাথে বিক্রীত জমির বিচ্ছিন্নতা। কেননা শফী'র জমির সাথে সংলগ্ন এক হাত পরিমাণ জমি দান করার ফলে বিক্রীত জমির সাথে শফী'র জমি সংলগ্ন থাকেনি। কাজেই সে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না।

قَالَ : وَإِذَا ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ ثُمَّ ابْتَاعَ بَقِيَّتَهَا فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ دُوْنَ الثَّانِيْ، لِأَنَّ الشَّفِيْعَ جَارٌ فِيْهِمَا، إِلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي الثَّانِيْ شَرِيْكٌ فَيَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَرَادَ الْحِيْلَةَ إِبْتَاعَ السَّهْمَ بِالثَّمَنِ إِلَّا دِرْهَمًا مَثَلًا وَالْبَاقِيْ بِالْبَاقِيْ . وَإِن ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عِوَضًا عَنْهُ فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ دُوْنَ الثَّوْبِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَخَرُ، وَالثَّمَنُ هُوَ الْعِوَضُ عَنِ الدَّارِ . قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهٰذِهِ حِيْلَةٌ أُخْرٰى تَعُمُّ الْجِوَارَ وَالشَّرْكَةَ فَيُبَاعُ بِأَضْعَافِ قِيْمَتِهٖ وَيُعْطٰى بِهَا ثَوْبٌ بِقَدْرِ قِيْمَتِهٖ، إِلَّا أَنَّهُ لَوْ اِسْتَحَقَّتِ الْمَشْفُوعَةُ يَبْقٰى كُلُّ الثَّمَنِ عَلٰى مُشْتَرِى الثَّوْبِ، لِقِيَامِ الْبَيْعِ الثَّانِيْ، فَيَتَضَرَّرُ بِهٖ . وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُبَاعَ بِالدَّرَاهِمِ الثَّمَنِ دِيْنَارٌ حَتّٰى إِذَا اسْتَحَقَّ الْمَشْفُوْعُ يَبْطُلُ الصَّرْفُ فَيَجِبُ رَدُّ الدِّيْنَارِ لَا غَيْرَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি বাড়ির কোনো [অবণ্টিতভাবে] একটি অংশ নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করে। অতঃপর অবশিষ্ট অংশ ক্রয় করে তাহলে প্রতিবেশীর কেবল প্রথম অংশেই শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে; দ্বিতীয় [তথা অবশিষ্ট] অংশে নয়। কেননা শফী' হচ্ছে উভয় অংশের প্রতিবেশী। কিন্তু ক্রেতা এখন দ্বিতীয় অংশের অংশীদার। কাজেই [দ্বিতীয় অংশে] সে প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। সুতরাং যদি ক্রেতার কৌশল অবলম্বনের ইচ্ছা থাকে তাহলে সে [প্রথমে] একটি অংশ উদাহারণ স্বরূপ– এক দিরহাম– বাদ রেখে সম্পূর্ণ মূল্যে ক্রয় করবে তারপর অবশিষ্ট বাড়ি বাদ রাখা এক দিরহামে ক্রয় করবে। আর যদি ক্রেতা বাড়িটি নির্ধারিত একটি মূল্যে ক্রয় করে। অতঃপর তার পরিবর্তে বিক্রেতাকে কাপড় হস্তান্তর করে তাহলে শফী' শুফ'আ লাভ করবে নির্ধারিত সেই মূল্যেরই বিনিময়ে কাপড়ের বিনিময়ে নয়। কেননা [মূল্যের পরিবর্তে] কাপড় প্রদান হচ্ছে আরেকটি চুক্তি। আর নির্ধারিত মূল্যই হচ্ছে বাড়িটির বিনিময়বস্তু। গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটি হচ্ছে আরেকটি কৌশল, যা প্রতিবেশী ও অংশীদার উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। এর ফলে স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশিতে বিক্রয় করবে। অতঃপর তার পরিবর্তে স্বাভাবিক মূল্যের পরিমাণ কাপড় পরিশোধ করে দিবে। অবশ্য এক্ষেত্রে যদি শুফ'আর বাড়িটির কোনো প্রকৃত মালিক বের হয়ে আসে তাহলে কাপড়ের ক্রেতা [তথা বাড়িটির বিক্রেতা]-র উপর নির্ধারিত সম্পূর্ণ মূল্যই ধার্য হয়ে থাকবে। কেননা দ্বিতীয় বিক্রয় [অর্থাৎ কাপড়ের বিক্রয়] বহালই রয়েছে। কাজেই সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সুতরাং অধিক উপযুক্ত পদ্ধতি হলো, মূল্য হিসেবে নির্ধারিত দিরহামগুলোর পরিবর্তে [বিক্রেতার নিকট] দিনার বিক্রয় করবে। এর ফলে যদি শুফ'আর বাড়িটির মালিক বের হয়ে আসে তাহলে 'সরফ চুক্তিটি' [অর্থাৎ দিরহাম-দিনারের চুক্তিটি] বাতিল হয়ে যাবে। ফলে কেবল [প্রাপ্ত] দিনারগুলোই তাকে ফেরত দিতে হবে, অন্য কিছু নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) মাসআলা বর্ণনা করেছেন। যদি এভাবে ক্রয় বিক্রয় হয় যে, ক্রেতা প্রথমে অবণ্টিতভাবে বাড়ির একটি অংশ ক্রয় করল, যেমন বাড়ির দশ ভাগের এক ভাগ ক্রয় করল একটি নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে, তারপর আরেকটি চুক্তির মাধ্যমে অবশিষ্ট নয় অংশ ক্রয় করল তাহলে উক্ত জমির পার্শ্ববর্তী জমির মালিক কেবল প্রথমে যে এক দশমাংশ বিক্রয় হয়েছে তার উপর শুফ'আর অধিকার লাভ করবে। দ্বিতীয় চুক্তিতে অবশিষ্ট যে নয় অংশ বিক্রয় করা হয়েছে তাতে শুফ'আর অধিকার লাভ করবে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الشَّفِيْعَ جَارٌ فِيْهِمَا إِلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ الخ : উক্ত বিধানের কারণ হচ্ছে, এখানে ক্রেতা প্রথমে এক অংশ ক্রয় করেছে অবণ্টিতভাবে। ফলে তার ক্রয়কৃত অংশ বিক্রেতার অবশিষ্ট জমির সাথে একত্রে মিশে রয়েছে। কাজেই সে বিক্রেতার জমির মাঝে অংশীদার হয়েছে। অন্য দিকে শফী' তথা পার্শ্ববর্তী জমির মালিক বিক্রেতার জমির মাঝে অংশীদার নয়। সে কেবল 'প্রতিবেশীত্বের' ভিত্তিতে শুফ'আর অধিকারী। সুতরাং ক্রেতা যখন বিক্রেতার জমির অবশিষ্ট নয় অংশ ক্রয় করে তখন শফী' সেই নয় অংশে جَارٌ বা প্রতিবেশী হিসেবে শুফ'আর অধিকারী আর ক্রেতা সেই নয় অংশে অংশীদার হিসেবে শুফ'আর অধিকারী। আর শুফ'আর অধ্যায়ের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিক্রীত জমিতে যে ব্যক্তি অংশীদার সে পার্শ্ববর্তী জমির মালিকের উপর শুফ'আর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করে। সুতরাং এখানে ক্রেতা নিজেই অবশিষ্ট নয় অংশ পাওয়ার উপযুক্ত। কাজেই প্রতিবেশী শফী' কেবল প্রথমে বিক্রীত এক অংশে শুফ'আ লাভ করবে; অবশিষ্ট নয় অংশে লাভ করবে না।

قَوْلُهُ وَاِنْ اَرَادَ الْحِيْلَةَ اِبْتَاعَ السَّهْمَ بِالثَّمَنِ إِلَّا دِرْهَمًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে সুরতটি ইমাম কুদূরী (র.) উল্লেখ করেছেন তাতে শফী' কেবল প্রথমে ক্রয়কৃত অংশে শুফ'আ লাভ করতে পারবে। পরে ক্রয়কৃত অবশিষ্ট অংশে শুফ'আ লাভ করবে না। কিন্তু ক্রেতা যদি চায় যে, শফী' প্রথমে ক্রয়কৃত অংশেও যেন শুফ'আ লাভ করতে না পারে তাহলে حِيْلَةٌ বা কৌশল হচ্ছে এই যে, প্রথমে জমির যে অংশটুকু ক্রয় করবে সে অংশ ক্রয় করার সময় মূল্য বেশি নির্ধারণ করবে আর অবশিষ্ট জমি সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করবে। উদাহরণস্বরূপ সম্পূর্ণ জমির মূল্য হচ্ছে এক হাজার দিরহাম। এখন ক্রেতা প্রথমে সম্পূর্ণ জমির দশ ভাগের এক ভাগ ক্রয় করল এবং তার মূল্য ধার্য করল নয় শত নিরানব্বই দিরহাম। অতঃপর দ্বিতীয় চুক্তির মাধ্যমে জমির অবশিষ্ট নয় অংশ ক্রয় করল এবং মূল্য ধার্য করল ১ দিরহাম। তাহলে শফী' যদি জমি নিতে চায় তবে সে কেবল প্রথমে ক্রয়কৃত এক অংশ নিতে পারবে কিন্তু মূল্য পরিশোধ করতে হবে নয় শত নিরানব্বই দিরহাম, যা বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই সে উক্ত এক অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে না।

উল্লেখ্য, এই حِيْلَةٌ বা কৌশলটি ফলপ্রসূ হবে যদি শফী' جَارٌ বা প্রতিবেশী হয় তাহলে। পক্ষান্তরে শফী' যদি বিক্রেতার জমির মাঝে পূর্ব থেকেই অংশীদার হয়ে থাকে তাহলে ফলপ্রসূ হবে না। কেননা 'অংশীদার শফী' প্রথমে বিক্রীত অংশেও শুফ'আ লাভ করবে আবার দ্বিতীয় বার বিক্রীত অংশেও শুফ'আ লাভ করবে। কাজেই প্রথম অংশ যদি তার বেশি মূল্য গ্রহণ করতে হয় তাহলে তার ক্ষতি হবে না। কেননা অবশিষ্ট অংশ সে সামান্য মূল্যেই গ্রহণ করতে পারবে। ফলে সম্পূর্ণ জমিটি সে ন্যায্য মূল্যে লাভ করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَاِنِ ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ دَفَعَ اِلَيْهِ ثَوْبًا الخ : এ ইবারতটুকু دُوْنَ الثَّوْبِ পর্যন্ত মূল مَتْنٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এ অংশটুকুর উপরে দাগ হবে। আমাদের নিকট প্রচলিত নুসখায় এই অংশটুকুতে দাগ নেই। ফলে মনে হতে পারে যে এটি মুসান্নিফ (র.)-এর শরাহ এর ইবারত; আসলে তা নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, ক্রেতা যদি কোনো জমি একটি নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে অতঃপর ক্রেতা সে মূল্য সরাসরি না দিয়ে বিক্রেতার সম্মতিক্রমে তার বিনিময়ে কাপড় বা অন্য কোনো জিনিস প্রদান করে তাহলে শফী' যদি উক্ত জমিটি গ্রহণ করতে চায় তবে প্রথমে যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সে মূল্য পরিশোধ করেই গ্রহণ করতে হবে। উক্ত মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতা যে কাপড় বা জিনিস প্রদান করেছে তা দিয়ে শফী' জমিটি করতে পারবে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ عَقْدٌ اٰخَرُ وَالثَّمَنُ هُوَ الْعِوَضُ عَنِ الدَّارِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত বিধানের কারণ হচ্ছে, ক্রেতা যে এক্ষেত্রে বিক্রেতাকে নির্ধারিত মূল্যের পরিবর্তে কাপড় বা অন্য কোনো জিনিস দিয়েছে তা বিক্রেতার সাথে দ্বিতীয় আরেকটি চুক্তি বলে গণ্য হবে। বিষয়টি এমন হয়েছে যে, বিক্রেতা জমির মূল্য হিসেবে ক্রেতার নিকট যে টাকা প্রাপ্য ছিল সে টাকার বিনিময়ে ক্রেতার নিকট হতে সে উক্ত কাপড় বা জিনিসটি ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং কাপড় প্রদানের বিষয়টি জমি বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। পক্ষান্তরে জমি বিক্রয়ের যা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তাই হচ্ছে জমির বিনিময় বা عَرَضٌ। অতএব, শফী' জমিটি গ্রহণ করতে চাইলে সেই নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করেই গ্রহণ করতে হবে।

قَوْلُهُ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰذِهِ حِيْلَةٌ أُخْرٰى الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে মাসআলাটি বর্ণনা করা হয়েছে এটিও শফী'কে শুফ'আর অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার একটি حِيْلَةٌ বা কৌশল। এ কৌশলটি শফী' যে তিন প্রকারের হয়ে থাকে তাদের সকলের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে এর পূর্বে মতনে যে দু'টি حِيْلَةٌ বা কৌশলের আলোচনা করা হয়েছে তা কেবল প্রতিবেশী শফী' (جَارٌ) -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, তা شَرِيْكٌ فِى الْمَبِيْعِ তথা অংশীদার শফী'-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। আর আলোচ্য কৌশলটি অংশীদার শফী'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ فَيُبَاعُ بِاَضْعَافِ قِيْمَتِهِ وَيُعْطٰى الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) বর্ণিত উক্ত সুরতটিকে ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি শফী'কে শুফ'আর অধিকার হতে বঞ্চিত করার حِيْلَةٌ বা কৌশল হিসাবে গ্রহণ করতে চায় তাহলে তার প্রক্রিয়া হচ্ছে– জমির স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বাড়িয়ে মূল্য ধার্য করবে। অতঃপর সেই ধার্যকৃত মূল্যের বিনিময়ে বিক্রেতা কাপড় [বা অন্য কোনো দ্রব্য] প্রদান করবে যে কাপড়ের মূল্য হবে জমির স্বাভাবিক মূল্যের সমান। এভাবে বিক্রয় করার ফলে ক্রেতা জমির স্বাভাবিক মূল্যই বিক্রেতাকে প্রদান করল। কিন্তু শফী' যদি জমিটি গ্রহণ করতে চায় তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রথমে যে মূল্য ধার্য করেছিল তা পরিশোধ করেই নিতে হবে। যা স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই শফী' জমিটি গ্রহণ করবে না। শফী'র প্রথমে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে জমি নিতে হবে তার কারণ হচ্ছে, জমি যে মূল্যে বিক্রয় করা হয় শফী'র উপর সেই মূল্য পরিশোধ করাই আবশ্যক হয়। এখানে প্রথম যে মূল্য ধার্য করা হয়েছে তাই হচ্ছে জমির নির্ধারিত মূল্য। পক্ষান্তরে ক্রেতা বিক্রেতাকে যে নির্ধারিত মূল্য না দিয়ে তার বিনিময়ে কাপড় প্রদান করেছে তা আরেকটি চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে, যা জমি ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কাজেই তা শফী'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।
উল্লেখ্য, উক্ত সুরতে যে বলা হয়েছে, ক্রেতা নির্ধারিত মূল্যের পরিবর্তে বিক্রেতাকে কাপড় বা অন্য কোনো দ্রব্য প্রদান করবে এতে একটি সমস্যা এই থেকে যায় যে, বিক্রেতার হয়তো নগদ টাকার প্রয়োজন; কাপড় বা অন্য দ্রব্যের প্রয়োজন নেই। ফলে কাপড় বা অন্য দ্রব্য গ্রহণ করা তার জন্য সুবিধাজনক হবে না।

এই সমস্যা দূর করার জন্য উক্ত সুরতে সহজতর পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বাড়িয়ে মূল্য নির্ধারণ করবে। তারপর ক্রেতা জমির যা স্বাভাবিক মূল্য তার চেয়ে সামান্য কম টাকা নগদ পরিশোধ করবে আর অবশিষ্ট টাকার বিনিময়ে কাপড় বা অন্য কোনো দ্রব্য প্রদান করবে। উদাহরণ স্বরূপ জমির স্বাভাবিক মূল্য হচ্ছে এক হাজার টাকা। ক্রেতা ও বিক্রেতা মূল্য নির্ধারণ করল দুই হাজার টাকা। তাহলে ক্রেতা বিক্রেতা ৯৯০/= নয় শত নব্বই টাকা নগদ প্রদান করবে আর অবশিষ্ট মূল্য ১০১০/= এক হাজার দশ টাকার বিনিময়ে এক কেজি ধান, গম বা একটি কাপড় প্রদান করবে। ফলে ক্রেতার পক্ষ হতে নির্ধারিত মূল্য দুই হাজার টাকার বিনিময়ে নয় শত নব্বই টাকা ও এক কেজি ধান দেওয়া হলো যা প্রকৃত পক্ষে এক হাজার টাকার সমান; যা জমির প্রকৃত মূল্য। অপর দিকে বিক্রেতা তার জমির মূল্য [দশ টাকা বাদে] নগদ অর্থে লাভ করল।

قَوْلُهُ : إِلَّا أَنَّهُ لَوِ اسْتُحِقَّتِ الْمَشْفُوعَةُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত حِيْلَةٌ এর সুরতটি যদিও তিন প্রকারের শফীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু এতে একটি জটিলতা দেখা দিতে পারে। জটিলতাটি হচ্ছে, ক্রেতা উক্ত জমিটি ক্রয় করার পর বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত জমির মালিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রমাণিত হয় যে, বিক্রেতা জমিটির প্রকৃত মালিক ছিল না; বরং প্রকৃত মালিক হচ্ছে তৃতীয় এই ব্যক্তি তাহলে বিক্রেতার উপর যত টাকা জমির মূল্য হিসেবে প্রথমে ধার্য করা হয়েছিল ঠিক তত টাকা ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। এক্ষেত্রে সে নির্ধারিত মূল্যের পরিবর্তে যে কাপড় বা অন্য কোনো দ্রব্য গ্রহণ করেছিল তা ফেরত দিলে হবে না। [অবশ্য ক্রেতা স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করলে ভিন্ন কথা]। ফলে এক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেননা নির্ধারিত মূল্য ছিল জমির স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে বেশি এবং তা সে গ্রহণও করেনি। সে গ্রহণ করেছিল স্বাভাবিক মূল্যের সমপরিমাণ কাপড় বা দ্রব্য। অথচ এখন তাকে নির্ধারিত মূল্য ক্রেতাকে ফেরত রূপে প্রদান করতে হবে।

قَوْلُهُ لِقِيَامِ الْبَيْعِ الثَّانِيْ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ : এক্ষেত্রে যে বিক্রেতার উপর প্রথমে ধার্যকৃত মূল্য ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। তার গ্রহণকৃত কাপড় বা দ্রব্য ফেরত দিলে হবে না। এ বিধানের কারণ হচ্ছে, বিক্রেতা যে ক্রেতার নিকট হতে কাপড় বা অন্য দ্রব্য গ্রহণ করেছিল তা ছিল জমির নির্ধারিত মূল্যের পরিবর্তে। এটি ভিন্ন একটি ক্রয় বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয়েছে। অর্থাৎ জমির বিক্রেতা উদাহরণস্বরূপ দুই হাজার টাকার বিনিময়ে উক্ত কাপড় ক্রয় করেছে। পরবর্তীতে যখন জমির প্রকৃত মালিক হিসেবে অন্য ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে তখন বুঝা গেছে জমির বিক্রয় চুক্তিটি সঠিক ছিল না। কাজেই ক্রেতা জমি ফেরত দিবে আর বিক্রেতা মূল্য ফেরত দিবে। অন্য দিকে বিক্রেতা যে ক্রেতার নিকট হতে কাপড় ক্রয় করেছে সে চুক্তিটি তো সঠিক রয়েছে। সুতরাং বিক্রেতা কাপড় ফেরত দেওয়ার অধিকার পাবে না। বরং কাপড় যে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে প্রদান করা হয়েছে সেই দুই হাজার টাকা বিক্রেতা ফেরত দিতে বাধ্য হবে। এভাবে জমির বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُبَاعَ الدَّرَاهِمُ الثَّمَنَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত জটিলতা তথা সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বিক্রেতাকে রক্ষার জন্য যথার্থ পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে ক্রেতা ও বিক্রেতা যে মূল্য নির্ধারণ করবে তার বিনিময়ে বিক্রেতা কাপড় বা অন্য কোনো দ্রব্য না দিয়ে অন্য কোনো মুদ্রা দিবে। যেমন, প্রথমে যদি দিরহাম নির্ধারণ করে থাকে তাহলে তার পরিবর্তে দিনার দিবে, যা স্বাভাবিক মূল্যের সমপরিমাণ। তাহলে পরবর্তীতে যদি জমির মালিক হিসেবে অন্যকোনো ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে তাহলে বিক্রেতার উপর প্রথমে ধার্যকৃত দিরহাম ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে না; বরং তার পরিবর্তে যে দিনার গ্রহণ করেছে তা ফেরত দিলেই চলবে।

এক্ষেত্রে এরূপ বিধানের কারণ হচ্ছে, দিরহামের পরিবর্তে ক্রেতা যে দিনার প্রদান করেছে এটি হচ্ছে 'বায়ে সরফ' (بَيْعُ الصَّرْفِ)। আর 'বায়ে সরফের ক্ষেত্রে যদি কারো নিকট দিরহাম পাওনা থাকে এবং সে উক্ত দিরহামের বিনিময়ে তার নিকট হতে দিনার ক্রয় করে তাহলে তা জায়েজ আছে। কিন্তু পরে যদি প্রমাণিত হয় বা উভয় স্বীকার করে যে আসলে দিরহাম পাওনা ছিল তাহলে দিনার ক্রয়ের চুক্তি তথা 'বায়ে সরফ'টি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যখন জমির মালিক হিসেবে অন্য ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে তখন বুঝা গেল যে ক্রেতার নিকট বিক্রেতার পাওনা ছিল না। কাজেই সে যে ক্রেতার নিকট হতে দিনার গ্রহণ করেছে সে চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে। সুতরাং গৃহীত দিনার জমির ক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দিবে। আর জমির মালিক অন্য ব্যক্তি হওয়ার কারণে জমি বিক্রয় সঠিক হয়নি কাজেই জমির বিক্রেতা ক্রেতার নিকট কিছুই পাবে না।

পক্ষান্তরে পূর্বের সুরতে বিক্রেতা তার পাওনা দিরহামের বিনিময়ে কাপড় গ্রহণ করেছিল। এটি 'বায়ে সরফ'-নয়। আর কেউ যদি তার পাওনা দিরহামের বিনিময়ে কাপড় বা অন্য কোনো দ্রব্য ক্রয় করে এবং প্রমাণিত হয় যে তার কোনো পাওনা ছিল না তাহলে চুক্তিটি বাতিল হয় না। সুতরাং অন্য ব্যক্তি জমির মালিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর যখন প্রমাণিত হয়েছে যে বিক্রেতার পাওনা ছিল না তখন কাপড় ক্রয়ের চুক্তিটি বহালই রয়েছে। ফলে জমির বিক্রেতা কাপড়ের মূল্য হিসাবে সেই পাওনা সমপরিমাণ দিরহাম জমির ক্রেতাকে দিতে বাধ্য হবে।

قَالَ : وَلَا تَكْرَهُ الْحِيْلَةَ فِيْ إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ ، وَتُكْرَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح)، لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَلَوْ أَبَحْنَا الْحِيْلَةَ مَا دَفَعْنَاهُ، وَلِأَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّهُ مَنَعَ عَنْ إِثْبَاتِ الْحَقِّ فَلَا يُعَدُّ ضَرَرًا، وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الْحِيْلَةُ فِيْ إِسْقَاطِ الزَّكٰوةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে শুফ'আর অধিকার বাতিল করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা মাকরূহ হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাকরূহ হবে। কেননা [শরিয়তে] শুফ'আ সাব্যস্ত হয় [প্রতিবেশীত্বের] অসুবিধা দূর করার জন্যই। কাজেই যদি আমরা কৌশল অবলম্বন বৈধ করে দেই তাহলে এই অসুবিধা আমাদের দূর করা হলো না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এক্ষেত্রে সে অন্যের হক সাব্যস্ত হওয়াকে প্রতিহত করেছে। কাজেই এটাকে ক্ষতিসাধন বলে গণ্য করা যায় না। যাকাত রহিতকরণের জন্য কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রেও এই একই মতবিরোধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا تَكْرَهُ الْحِيْلَةَ فِيْ إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ الخ : ইতোপূর্বে মতনে ইমাম কুদূরী (র.) শফী'কে শুফ'আর অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য তিনটি حلية বা কৌশল উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য ইবারতে তিনি শফী'কে শুফ'আর অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য 'হিলা' বা কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ কিনা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, শুফ'আর অধিকার বাতিল করার জন্য 'হিলা' বা কৌশল অবলম্বন করা মাকরূহ হবে না; বরং জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা মাকরূহ হবে।

উল্লেখ্য ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতেও শুফ'আর ক্ষেত্রে 'হিলা' বা কৌশল অবলম্বন করা মাকরূহ। আর ইমাম আহমাদ (র.)-এর মতে 'হিলা' বা কৌশল অবলম্বন করে বিক্রয় করলে শফী'র শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে। তাঁর মতে, জমির মালিক যদি জমিটি 'হেবা' করে কিংবা বিক্রয় করে কিন্তু মূল্য জানা না যায় তাহলে বাজার দর হিসেবে মূল্য পরিশোধ করে শফী' জমিটি গ্রহণ করার অধিকার পাবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে 'হিলা' বা কৌশল অবলম্বন করা মাকরূহ হওয়ার কারণ হচ্ছে, শরিয়ত শফী'কে শুফ'আর অধিকার প্রদান করেছে 'প্রতিবেশীর ক্ষতি' থেকে রক্ষা করার জন্য অর্থাৎ শফী'র শরিকানাধীন জমি কিংবা তার পার্শ্ববর্তী জমি অন্য কোনো ব্যক্তি ক্রয় করে যাতে তাকে অতিষ্ট করতে না পারে সে জন্যই শরিয়ত তাকে শুফ'আর অধিকার প্রদান করেছে। কিন্তু তার সেই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার জন্য যদি 'হিলা' বা কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ সাব্যস্ত করা হয় তাহলে শফী'কে উক্ত ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হবে না। ফলে শরিয়ত যে উদ্দেশ্যে শুফ'আর অধিকার প্রদান করেছে সে উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই 'হিলা' বা কৌশল অবলম্বন করা মাকরূহ হবে।

قَوْلُهُ وَلِأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ مَنَعَ عَنْ إِثْبَاتِ الْحَقِّ فَلَا يُعَدُّ ضَرَرًا : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে 'হিলা' অবলম্বন করা মাকরূহ না হওয়ার কারণ হচ্ছে, ক্রেতা এক্ষেত্রে শফী'র কোনো ক্ষতি করছে না। বরং সে জমিটি ক্রয় করার পর তার মালিকানাধীন জমিতে অন্য কারো অধিকার সাব্যস্ত হতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। আর প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হচ্ছে তার সম্পদকে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার হাত থেকে রক্ষা করা। কাজেই ক্রেতার পক্ষ থেকে 'হিলা' বা কৌশল গ্রহণ করাকে শফী'র প্রতি কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন বলে গণ্য করা যায় না। সুতরাং তা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْحِيْلَةُ فِيْ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে শুফ'আর ক্ষেত্রে যে মতবিরোধের কথা উপরে উল্লেখ করা হলো, জাকাতের ক্ষেত্রেও ঠিক একই মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এমন কোনো 'হিলা' [কৌশল] অবলম্বন করে যার ফলে তার উপর জাকাত ওয়াজিব না হয়, [যেমন বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার সম্পদ বিশ্বস্ত কাউকে 'হেবা' করে দিল, কিছু সময় পর সে পুনরায় 'হেবা'কারীকে তা দান করে দিল] তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উক্ত 'হিলা' মাকরূহ হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাকরূহ হবে। উল্লেখ্য, কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, শুফ'আর ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া আর জাকাতের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া।

مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

قَالَ : وَإِذَا اشْتَرٰى خَمْسَةُ نَفَرٍ دَارًا مِنْ رَجُلٍ فَلِلشَّفِيْعِ أَنْ يَّأْخُذَ نَصِيْبَ أَحَدِهِمْ وَإِنِ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنْ خَمْسَةٍ أَخَذَهَا كُلَّهَا أَوْ تَرَكَهَا ، وَالْفَرْقُ أَنَّ فِى الْوَجْهِ الثَّانِىْ بِأَخْذِ الْبَعْضِ تَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِىْ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ زِيَادَةَ الضَّرَرِ ، وَفِى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَقُوْمُ الشَّفِيْعُ مَقَامَ أَحَدِهِمْ فَلَا تَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ ، وَلَا فَرْقَ فِىْ هٰذَا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ ، هُوَ الصَّحِيْحُ ، إِلَّا أَنَّ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ إِذَا نَقَدَ مَا عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْقُدِ الْأٰخَرُ حِصَّتَهُ كَيْلَا يُؤَدِّىَ إِلٰى تَفْرِيْقِ الْيَدِ عَلَى الْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ ، لِأَنَّهُ سَقَطَتْ يَدُ الْبَائِعِ . وَسَوَاءٌ سَمّٰى لِكُلِّ بَعْضٍ ثَمَنًا أَوْ كَانَ الثَّمَنُ جُمْلَةً ، لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِىْ هٰذَا لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ لَا لِلثَّمَنِ . وَهٰهُنَا تَفْرِيْعَاتٌ ذَكَرْنَاهَا فِىْ كِفَايَةِ الْمُنْتَهٰى .

কতিপয় বিক্ষিপ্ত মাসায়েল

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি পাঁচজন ক্রেতা একজন বিক্রেতার নিকট হতে একটি বাড়ি ক্রয় করে তাহলে শফী' তাদের একজনের অংশ গ্রহণ করার অধিকার লাভ করবে। আর যদি একজন ক্রেতা পাঁচ জন বিক্রেতার নিকট হতে বাড়িটি ক্রয় করে তাহলে শফী' হয় সম্পূর্ণ বাড়িটি গ্রহণ করবে না হয় বাড়িটি ছেড়ে দিবে। উভয় সুরতের মাঝে পার্থক্য হলো, দ্বিতীয় সুরতটিতে কোনো এক অংশ [শফী'] গ্রহণ করলে ক্রেতার চুক্তির মাঝে বিভাজন সৃষ্টি হয়। ফলে সে অতিরিক্ত একটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আর প্রথম সুরতে শফী' ক্রেতাদের একজনের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে। কাজেই চুক্তির মাঝে বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে না। আর এ মাসআলায় শফী'র গ্রহণ করা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে [ক্রেতার] হস্তগত করার আগে বা পরে হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এটিই হচ্ছে বিশুদ্ধ অভিমত। তবে হস্তগত করার আগে হলে শফী' ক্রেতাগণের একজন তার অংশের মূল্য পরিশোধ করলেও শফী' তার অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। যতক্ষণ না অপর ক্রেতাগণও তাদের মূল্য পরিশোধ করে। যাতে বিক্রেতার [বাড়িটির উপর] দখলদারিত্বের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি না হয়। ঠিক যেমন ক্রেতাগণের একজনের মতোই [অর্থাৎ ক্রেতাগণের একজন তার অংশের মূল্য পরিশোধ করলেই তার অংশ নিতে পারে না, যতক্ষণ না অপর ক্রেতাগণ তাদের অংশ পরিশোধ করে]। পক্ষান্তরে [ক্রেতাগণ বাড়িটি] হস্তগত করার পরের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা বিক্রেতার দখলদারিত্ব উঠে গেছে। আর উপরিউক্ত বিধান প্রত্যেক অংশের জন্য আলাদা মূল্য নির্ধারণ করুক বা সম্পূর্ণ বাড়ির মূল্য একত্রে নির্ধারিত হোক উভয় অবস্থায় একই। কেননা এক্ষেত্রে বিবেচ্য হচ্ছে চুক্তির মাঝে বিভাজন সৃষ্টি হওয়া। মূল্যের বিভাজন নয়। এ স্থলে উক্ত বিধানের ভিত্তিতে নির্গত কতিপয় মাসায়েল রয়েছে, আমি সেগুলো 'কিফায়াতুল মুনতাহী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا اشْتَرٰى خَمْسَةُ نَفَرٍ دَارًا مِنْ رَجُلٍ الخ : আলোচ্য ইবারত ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর 'জামিউস সগীর' গ্রন্থ হতে সংগৃহীত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, যদি পাঁচ ব্যক্তি মিলে একটি বাড়ি ক্রয় করে তাহলে শফী' ইচ্ছা করলে উক্ত পাঁচজনের মধ্য হতে যে কোনো একজনের অংশ শুফ'আর ভিত্তিতে গ্রহণ করতে পারবে। এমনিভাবে ইচ্ছা করলে দুই জনের বা সকলের অংশও গ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার উপর সকলের অংশ নেওয়া আবশ্যক নয়। যে কোনো একজনের অংশও সে নিতে পারবে।

পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি যদি একটি পাঁচজনের নিকট হতে ক্রয় করে, অর্থাৎ বাড়িটি পাঁচ জনের শরিকানাধীন ছিল, সে উক্ত পাঁচ জনের নিকট হতে সম্পূর্ণ বাড়িটি ক্রয় করেছে, তাহলে শফী' উক্ত বাড়িটি গ্রহণ করতে চাইলে তার উপর সম্পূর্ণ বাড়ি গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। এক্ষেত্রে সে বিক্রেতাদের মধ্যে হতে কোনো একজনের ভাগে যতটুকু ছিল তা পৃথকভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। হয়তো সম্পূর্ণ বাড়ি গ্রহণ করবে নতুবা শুফ'আর অধিকার পরিত্যাগ করবে।

قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ اَنَّ فِى الْوَجْهِ الثَّانِىْ بِاَخْذِ الْبَعْضِ الخ এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত দু'টি মাসআলায় যে দুই রকম বিধান হয়েছে তার কারণ বর্ণনা করছেন।

দ্বিতীয় সুরতে তথা ক্রেতা যদি পাঁচ ব্যক্তির নিকট হতে বাড়ি ক্রয় করে সে সুরতে শফী'র উপর সম্পূর্ণ বাড়ি গ্রহণ করা আবশ্যক হওয়ার কারণ হচ্ছে, এক্ষেত্রে ক্রেতা যদিও পাঁচজনের নিকট হতে ক্রয় করেছে, কিন্তু সে বাড়িটি একত্রে ক্রয় করেছে। এখন শফী' যদি বাড়ি কিছু অংশ গ্রহণ করে তাহলে ক্রেতার সম্পূর্ণ বাড়ি যে একত্রে ক্রয় করেছিল তার মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হবে। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এই ক্ষতিটি হচ্ছে শরিয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত ক্ষতির চেয়ে অতিরিক্ত ক্ষতি। অর্থাৎ ক্রেতার ক্রয়কৃত বাড়ি যদি শফী' নিয়ে যায় তাতেও ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই ক্ষতিটুকু শরিয়ত শফী'র স্বার্থ রক্ষার্থে অনুমোদন করেছে। এর চেয়ে অতিরিক্ত কোনো ক্ষতি শরিয়ত অনুমোদন করেনি। কাজেই শফী' যদি সম্পূর্ণ বাড়ি না নিয়ে তার একটা অংশ নেয় তাহলে হতে পারে যে অবশিষ্ট বাড়ি ক্রেতার জন্য উপকারে আসবে না; বরং তার চেয়ে সম্পূর্ণ বাড়ি শফী' নিয়ে নিলে তার জন্য ভালো হবে। অতএব, শরিয়তে অনুমোদনকৃত ক্ষতি মেনে নিয়ে শফী'কে সম্পূর্ণ বাড়ি গ্রহণ করতে দেওয়া হবে। কিন্তু তার উপর অতিরিক্ত ক্ষতি ক্রেতার উপর চাপিয়ে দিয়ে শফী'কে বাড়ির কিছু অংশ গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হবে না।

পক্ষান্তরে প্রথম সুরতে তথা পাঁচজন ক্রেতা যদি একটি বাড়ি ক্রয় করে সে সুরতে শফী' যদি উক্ত পাঁচজনের মধ্য হতে একজনের অংশ গ্রহণ করে তাহলে অন্য চারজনের অংশের মাঝে কোনোরূপ বিভক্তি সৃষ্টি হয় না। তাদের অংশ যেভাবে ছিল সেভাবে বহাল থাকে। কেননা এক্ষেত্রে শফী' যার অংশটুকু গ্রহণ করবে তার স্থলেই শফী' স্থলাভিষিক্ত হবে। ফলে ক্রয় চুক্তিটি পূর্বে যেভাবে ছিল পরেও সেভাবেই থাকবে। সুতরাং ক্রেতাদের উপর এক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোনো ক্ষতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। অতএব, তা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ فِىْ هٰذَا بَيْنَ مَا اِذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, প্রথম সুরতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাঁচ ব্যক্তি একই বাড়ি ক্রয় করলে শফী' ইচ্ছা করলে যে কোনো একজনের অংশ গ্রহণ করতে পারবে—এ বিধানের ক্ষেত্রে ক্রেতাগণ বাড়িটি হস্তগত করার পূর্বে এবং হস্তগত করার পরে এ দু'টি বিষয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ ক্রেতাগণ বাড়িটি হস্তগত করে থাকলেও শফী' একজনের অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আবার তারা হস্তগত না করে থাকলেও শফী' একজনের অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এটিই হচ্ছে আমাদের ইমামগণ হতে বর্ণিত সঠিক অভিমত।

[পক্ষান্তরে ইমাম কুদূরী (র.) ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরেক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সে রেওয়ায়েত অনুসারে ক্রেতাগণ বাড়িটি হস্তগত করার পূর্বে শফী' একজনের অংশ গ্রহণ করতে পারবে না আর ক্রেতাগণ বাড়িটি হস্তগত করার পর শফী' ইচ্ছা করলে একজনের অংশ গ্রহণ করতে পারবে।]

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُمْكِنُهُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একই বাড়ি পাঁচজন ক্রেতা ক্রয়ের সুরতে শফী' যেকোনো একজনের অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ক্রেতাগণ বাড়িটি হস্তগত করার পূর্বে এবং হস্তগত করার পরে উভয় অবস্থায় একই বিধান। অর্থাৎ শফী' উভয় অবস্থাতেই শফী' বাড়িটি গ্রহণ করার অধিকার পাবে। কিন্তু ক্রেতাগণ বাড়িটি হস্তগত করার পূর্বে ও হস্তগত করার পরের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে বিধানগত পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্যটি হচ্ছে, ক্রেতার বাড়িটি হস্তগত করার পূর্বের সুরতে যদি একজন ক্রেতা তার অংশের মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করে থাকে। কিন্তু অন্যরা এখনও তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে না থাকে তাহলে শফী' উক্ত একজনের অংশ হস্তগত করতে পারবে না। যতক্ষণ না অন্যরাও তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে। সকল ক্রেতাগণ যখন তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে ফেলবে কেবল তখন শফী' যে কোনো একজনের অংশ হস্তগত করতে পারবে, এর পূর্বে পারবে না।

قَوْلُهُ كَيْلَا يُؤَدِّىْ اِلٰى تَفْرِيْقِ الْيَدِ عَلَى الْبَائِعِ الخ : উক্ত বিধানের কারণ হচ্ছে, যদি অন্যান্য ক্রেতা তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে শফী' একজন ক্রেতার অংশ হস্তগত করে তাহলে একই বাড়ির কিছু অংশ বিক্রেতার দখলে আর কিছু অংশ শফী'র দখলে থাকা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা অন্যান্য ক্রেতারা তাদের মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত বিক্রেতা তার বাড়ি দখলে রাখার অধিকার রাখে। আর যে ক্রেতা তার অংশের মূল্য পরিশোধ করেছে তার অংশ শফী' হস্তগত করলে তা তার দখলে চলে যাবে। ফলে বাড়ির উপর বিক্রেতার দখলদারিত্বের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হবে। আর এটা বিক্রেতার জন্য একটি ক্ষতির বিষয়। কাজেই অন্যান্য ক্রেতারা তাদের মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে শফী'কে একজন ক্রেতার অংশ হস্তগত করার অধিকার প্রদান করা হবে না।

قَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ اَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ : "উক্ত বিধানের ক্ষেত্রে শফী' ঠিক ক্রেতাদের একজনের মতো"। অর্থাৎ কয়েক ক্রেতা যদি একটি বাড়ি ক্রয় করে এবং তাদের মধ্য হতে একজন ক্রেতা তার অংশের মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করে দেয় তাহলে বিধান হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য ক্রেতাগণ তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত একজন ক্রেতা তার অংশ হস্তগত করার অধিকার পাবে না। আলোচ্য মাসআলায় শফী'র বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপ।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে উক্ত বিষয়টি যদি ক্রেতার বাড়িটি হস্তগত করার পর হয় তাহলে বিধান ভিন্ন। অর্থাৎ যদি এমন হয় যে, পাঁচজন ক্রেতা একটি বাড়ি ক্রয় করেছে এবং তারা বাড়িটি বিক্রেতার নিকট হতে হস্তগত করে নিয়েছে। তাহলে বিধান হচ্ছে, এক্ষেত্রে চাই সকল ক্রেতা তাদের মূল্য পরিশোধ করে থাক বা পরিশোধ না করে থাক উভয় অবস্থাতেই শফী' একজন ক্রেতার অংশ গ্রহণ করতে চাইলে তা গ্রহণ করতে পারবে এবং হস্তগত করতে পারবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ سَقَطَتْ يَدُ الْبَائِعِ : কেননা এক্ষেত্রে ক্রেতা যেহেতু বাড়িটি হস্তগত করে নেয় সেহেতু বাড়ির উপরে বিক্রেতার দখলদারিত্ব নেই। কাজেই শফী' যদি একজন ক্রেতার অংশ হস্তগত করে তাহলে বিক্রেতার দখলদারিত্বের মাঝে কোনোরূপ বিভক্তি সৃষ্টি হচ্ছে না। অন্যদিকে ক্রেতাদের দখলদারিত্বের মাঝেও নতুন কোনো বিভক্তি সৃষ্টি হচ্ছে না। কেননা ক্রেতা তো পূর্ব থেকেই পাঁচজন, শফী' একজনের অংশ গ্রহণ করার দ্বারা তার স্থলাভিষিক্ত হবে, নতুনভাবে আর বিভক্তি হবে না। কাজেই শফী' একজন ক্রেতার অংশ হস্তগত করার অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ سَمَّى لِكُلِّ بَعْضٍ ثَمَنًا أَوْ كَانَ الثَّمَنُ جُمْلَةً : এ ইবারতটুকু পূর্বের ইবারত وَلَا فَرْقَ فِيْ هٰذَا الخ –এর সাথে সম্পর্কিত। উক্ত ইবারতে বলা হয়েছিল [পাঁচজন বা একাধিক] ক্রেতা একত্রে বাড়ি ক্রয় করলে শফী' যে কোনো একজনের অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এ বিধানের ক্ষেত্রে ক্রেতাগণ বাড়ি হস্তগত করার পূর্বে ও পরের মাঝে পার্থক্য নেই।

আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত সুরতে তথা পাঁচজন [বা একাধিক] ক্রেতা বাড়ি ক্রয়ের সুরতে শফী' ইচ্ছা করলে যেকোনো একজনের অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা প্রত্যেক ক্রেতার অংশের জন্য মূল্য পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারণ করে থাক বা একত্রে নির্ধারণ করে থাক উভয়ে সুরতেই বিধান এক। অর্থাৎ শফী' উভয় অবস্থাতেই যে কোনো একজন ক্রেতার অংশ গ্রহণ করার অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِيْ هٰذَا لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ الخ : উক্ত বিধানের কারণ হচ্ছে, কোনো একজন ক্রেতার অংশ শফী'র গ্রহণ করার অধিকার থাকা বা না থাকা নির্ভর করে ক্রয় বা বিক্রয়ের মাঝে বিভক্তি হওয়া না হওয়ার উপর; মূল্য বিভক্তি হওয়া না হওয়ার উপর নয়। এ জন্যই একজন ক্রেতা যদি পাঁচ ব্যক্তির নিকট হতে এ চুক্তিতে একটি বাড়ি ক্রয় করে আর শফী' একজন বিক্রেতার অংশ নিতে চায় তাহলে সে তা পারে না। কারণ এতে ক্রেতার ক্রয়ের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়।

পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি দুই চুক্তির মাধ্যমে দুই ব্যক্তির নিকট হতে একটি বাড়ি ক্রয় করে তাহলে শফী' বিক্রেতা দু'জনের যেকোনো একজন অংশ গ্রহণ করতে চাইলে তা গ্রহণ করতে পারবে। কেননা এক্ষেত্রে ক্রয় চুক্তি পূর্ব থেকে ভিন্ন ভিন্ন। ফলে শফী' গ্রহণ করার কারণে কোনো বিভক্তি সৃষ্টি হচ্ছে না।

قَوْلُهُ هٰهُنَا تَفْرِيْعَاتٌ ذَكَرْنَاهَا فِيْ كِفَايَةِ الْمُنْتَهِيْ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে বর্ণিত মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় মাসআলা এখানে রয়েছে। আমি সেগুলো আমার গ্রন্থ 'কিফায়াতুল মুনতাহী'-তে উল্লেখ করেছি।

উল্লেখ্য, উক্ত মাসআলাগুলো ইমাম কারখী (র.) তাঁর মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আইনী (র.) হেদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ আল্ বিনায়াতেও মাসআলাগুলো উল্লেখ করেছেন।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى نِصْفَ دَارٍ غَيْرَ مَقْسُوْمٍ فَقَاسَمَهُ الْبَائِعُ أَخَذَ الشَّفِيْعُ النِّصْفَ الَّذِىْ صَارَ لِلْمُشْتَرِىْ أَوْ يَدَعُ . لِاَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ لِمَا فِيْهَا مِنْ تَكْمِيْلِ الْاِنْتِفَاعِ وَلِهٰذَا يَتِمُّ الْقَبْضُ بِالْقِسْمَةِ فِى الْهِبَةِ وَالشَّفِيْعُ لَا يَنْقُضُ الْقَبْضَ وَاِنْ كَانَ لَهُ نَفْعٌ فِيْهِ يَعُوْدُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ فَكَذَا لَا يَنْقُضُ مَا هُوَ مِنْ تَمَامِهِ بِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَ اَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ نَصِيْبَهُ مِنَ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِىْ الَّذِىْ لَمْ يَبِعْ حَيْثُ يَكُوْنُ لِلشَّفِيْعِ نَقْضُهُ لِاَنَّ الْعَقْدَ مَا وَقَعَ مَعَ الَّذِىْ قَاسَمَ فَلَمْ تَكُنِ الْقِسْمَةُ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ الَّذِىْ هُوَ حُكْمُ الْعَقْدِ بَلْ هُوَ تَصَرُّفٌ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَيَنْقُضُهُ الشَّفِيْعُ كَمَا يَنْقُضُ بَيْعَهُ وَهِبَتَهُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি বণ্টন করা হয়নি এমন বাড়ির অর্ধেক ক্রয় করে। অতঃপর বিক্রেতা [ক্রেতার অংশ] ভাগ করে [পৃথক] করে দেয়। তাহলে শফী' সে অর্ধেক ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে তা নিতে পারবে অথবা তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দিবে। কেননা বণ্টনের দ্বারা কবজ সম্পন্ন হয় । কারণ এর দ্বারা উপকার লাভের বিষয়টি পূর্ণতা লাভ করে। এজন্য হেবার ক্ষেত্রে বণ্টনের দ্বারাই করজ সম্পন্ন হয়। শফী' কবজ প্রতিহত করতে পারে না। যদিও এতে তার লাভের বিষয়টি নিহিত আছে। বেচাকেনার দায়দায়িত্ব অবশ্য বিক্রেতার উপর বর্তাবে। তদ্রূপ শফী' কবজ যার দ্বারা পূর্ণতা পায় তাও প্রতিহত করতে পারে না। কিন্তু তার ব্যতিক্রমি' সুরত হলো, যদি দুই অংশীদারের একজন ইজমালী ঘরের তার অংশ বিক্রি করে । অতঃপর যে বিক্রি করেনি তার থেকে ক্রেতার অংশ ভাগ করে নেয়। এমতাবস্থায় শফী'র বণ্টন বাতিলের অধিকার লাভ হবে। কেননা যার সাথে বণ্টন করেছে তার সাথে বিক্রি চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। সুতরাং এ বণ্টন ঐ কবজের পূর্ণতা বিধানকারী সাব্যস্ত হবে বিক্রয় চুক্তির হুকুমে। বরং এটা মালিকানার ভিত্তিতে এক প্রকার হস্তক্ষেপ। সুতরাং শফী' এটাকে বাতিল করতে পারবে। যেভাবে সে ক্রেতার বেচাকেনা ও হেবাকে বাতিল করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণিত একটি মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মাসআলা এক ব্যক্তি তার বাড়ির অর্ধেক অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রি করল। যে অর্ধেক সে বিক্রি করল তা বিক্রির সময় বন্টন করা ছিল না। বিক্রির পর ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জনের সম্মতিক্রমে ক্রেতার অংশ ভাগ করেছিল। এমতাবস্থায় শফী' উক্ত জমি শুফ'আর হক দাবি করে নিতে পারবে অথবা সে তার হক ছেড়ে দিয়ে নাও নিতে পারে।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য শফী'কে ক্রেতার ভাগে যে অংশ রয়েছে সেটাই নিতে হবে তার সুবিধামতো নিজ জমির পাশের জমি দাবি করতে পারবে না। কেননা যদি শফী' তার সুবিধামতো ভাগ করতে চায় তাহলে তার পূর্বের বন্টন বাতিল করতে হবে। অথচ শফী'র উক্ত বন্টন বাতিল করার কোনো অধিকার নেই। যদিও এটা বাতিল করাতে তার উপকার রয়েছে।

বাতিল করতে না পারার পক্ষে যুক্তি হলো বণ্টনের দ্বারা যে কবজ প্রমাণিত হয়েছে তা প্রথম বেচাকেনার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। উক্ত বেচাকেনা বাতিল করার অধিকার যেহেতু শফী'র নেই তাই বেচাকেনার মাধ্যমে বণ্টনের দ্বারা কবজ্ হয়েছে তা রহিত করার ক্ষমতাও তার জন্য সাব্যস্ত হবে না।

উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) উপরের ইবারতে বণ্টনকে কবজের পূর্ণতা দানকারী সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ বণ্টনের দ্বারাই কবজ হয়ে গেছে একথা সাব্যস্ত হবে। এর সমর্থনে তিনি একটি মাসআলাও উল্লেখ করেছেন।

মাসআলাটি এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার বণ্টন করা হয়নি এমন ঘরের একাংশ অন্য কোনো ব্যক্তিকে হেবা করল। অতঃপর যাকে হেবা করেছে সে উক্ত ঘর কবজ করলে ও সে কবজ দ্বারা হেবা সম্পন্ন হবে না। যে পর্যন্ত না অবণ্টিত ঘর বণ্টন করা হয়। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ হলো যে, হেবার মধ্যে কবজ্ পূর্ণতা লাভ করে বণ্টনের দ্বারা। তদ্রূপ আলোচ্য বেচাকেনার মধ্যে বণ্টনের দ্বারাই কব্জ পূর্ণতা লাভ করবে।

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আগের মাসআলার একটি ব্যতিক্রমি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। আগের মাসআলায় ক্রেতা বিক্রেতা থেকে যে বণ্টন করে নিয়েছিল তা বাতিলের অধিকার শফী'র ছিল না। এখানে যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে শফী'র বণ্টন বাতিল করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

মাসআলাটি এই যে, কোনো একটি বাড়ির দু'জন অংশীদার তথা মালিক রয়েছে। দু'জনের একজন তার অবণ্টিত অংশ বিক্রি করে দিল। অতঃপর এ ক্রেতা যে বিক্রি করেনি তার কাছ থেকে তার খরিদ করা অংশ বুঝে নিল। এ মাসআলার শফী' উক্ত বণ্টন বাতিল করতে পারবে।

এই মাসআলার সাথে আগের মাসআলার পার্থক্য এই যে, আগের মাসআলায় বণ্টন কব্জের পূর্ণতা দানকারী সাব্যস্ত হয়েছিল। কারণ যেখানে বণ্টন করে দিয়েছিল বিক্রেতা নিজে এ মাসআলায় বণ্টন কব্জের পূর্ণতা দানকারী সাব্যস্ত হবে না। কারণ এখানে সে উক্ত বেচা কেনার ক্ষেত্রে আজনবী বা অপরিচিত।

আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা ক্রয়ের দ্বারা যে জমির মালিক হয়েছে সে মালিকানার ভিত্তিতে উক্ত তাসাররুফ করেছে। ইতঃপূর্বে এ কথা বলা হয়েছে যে, ক্রেতা তার মালিকানাধীন জমিতে যে ধরনের হস্তক্ষেপই করুক না কেন শফী'র সে গুলো বাতিল করার অধিকার রয়েছে। এজন্য শফী' ক্রেতার বিক্রি হেবা ইত্যাদি বাতিল করতে পারে। সে অধিকারের ভিত্তিতে আলোচ্য মাসআলায় শফী' ক্রেতার বণ্টন বাতিল করতে পারবে।

এর আগের মাসআলায় বণ্টন করেছিল বিক্রেতা। তাই সেটা বাতিল করার অধিকার শফী'র জন্য সাব্যস্ত হয়নি।

ثُمَّ اِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِى الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الشَّفِيْعَ يَأْخُذُ النِّصْفَ الَّذِىْ صَارَ لِلْمُشْتَرِىْ فِىْ اَىِّ جَانِبٍ كَانَ وَهُوَ الْمَرْوِىُّ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لِاَنَّ الْمُشْتَرِىَ لَا يَمْلِكُ اِبْطَالَ حَقِّهِ بِالْقِسْمَةِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ اِنَّمَا يَأْخُذُهُ اِذَا وَقَعَ فِىْ جَانِبِ الدَّارِ الَّتِىْ يَشْفَعُ بِهَا لِاَنَّهُ لَا يَبْقٰى جَارًا فِيْمَا يَقَعُ فِى الْجَانِبِ الْاٰخَرِ ـ

অনুবাদ : অতঃপর কিতাবে [জামিউস সগীরে] বর্ণিত মাসাআলাটি মুতলাক রাখাতে এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শফী' ক্রেতার জন্য যে অর্ধেক সাব্যস্ত হয়েছে তাই শুফ'আর ভিত্তিতে নিতে পারবে তা যে দিকেই হোক না কেন। আর এরূপই বর্ণিত আছে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে। কেননা ক্রেতা বণ্টনের দ্বারা শফী'র হক বাতিল করতে পারে না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, শফী' যে পাশের জমির মাধ্যমে শুফ'আ দাবি করে সে পাশে জমি হলেই কেবল [শুফ'আর ভিত্তিতে] নিতে পারবে। কেননা অন্য পাশে জমি থাকলে সে প্রতিবেশী সাব্যস্ত হবে না। [অথচ মালিকানায় শরিক না থাকলে প্রতিবেশিত্বের ভিত্তিতেই শুফ'আ প্রমাণিত হয়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত ইবারতে জামিউস সগীরের ইবারতের মর্ম কি? সে বিষয়ে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বিশ্লেষণ করেছেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীরের ইবারত এ ব্যাপারে মুতলাক, সে ইবারতের চাহিদা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, ক্রেতা যে অর্ধাংশের মালিক হোক না কেন তাতে শফী'র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ ক্রেতার অধিকাংশ শফী'র জমির পাশে পড়লে যেমন শফী'র শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। তদ্রূপ তার বিপরীত দিকে পড়লেও তার শুফ'আ প্রমাণিত হবে। কারণ ইবারতে শুফ'আ প্রমাণিত হওয়ার কথাই কেবল আছে। এতে কোনো দিকের উল্লেখ নেই।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মতটি ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে এবং এটাই উত্তম। উত্তম এ জন্য যে, এ মত গ্রহণ করা হলে শফী'র অধিকার নষ্ট হওয়া সম্ভাবনা থাকে না। অন্যথায় হতে পারে বিক্রেতা ও ক্রেতা দু'জনে শফীর অধিকার বাতিল করার উদ্দেশ্যে এমন দিকে ক্রেতাকে অংশ দিল যে দিকে শফী'র ঘর নেই। এরূপ করা হলে শফী'র হক বাতিল হবে। অথচ শরিয়ত কারো হক দেওয়ার পর তা বাতিল করার অবকাশ রাখেনি।

অবশ্য ইতঃপূর্বে যেসব কৌশল (حِيْلَة) এর পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোতে শফী'র হক যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় সে বিষয়ের চেষ্টা হয়েছে। হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা বাতিলের কোনো সুযোগ শরিয়ত রাখেনি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, অবণ্টিত ঘর/বাড়ি বণ্টনের পর ক্রেতার অংশ যদি শফী'র ঘরের পাশে সাব্যস্ত হয় তাহলেই শফী'র শুফ'আর হক প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যদি শফী'র ঘরের অপর পার্শ্বে ক্রেতার অংশ নির্ধারিত হয় তাহলে তার শুফ'আর অধিকার অর্জিত হবে না। কেননা তখন শফী' প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতেও যে শুফ'আ দাবি করে থাকে সে প্রতিবেশীত্ব তো প্রামণিত হয় না। কারণ তার ঘর তো এখন আর ক্রেতার ঘরের পার্শ্বে নেই, বরং অপর পার্শ্বে অবস্থিত।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ دَارًا وَلَهُ عَبْدٌ مَأْذُونٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ هُوَ الْبَائِعُ فَلِمَوْلَاهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ تَمَلُّكٌ بِالثَّمَنِ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشِّرَاءِ وَهٰذَا لِأَنَّهُ مُفِيدٌ لِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ لِلْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ لِمَوْلَاهُ وَلَا شُفْعَةَ لِمَنْ بِيعَ لَهُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার বাড়ি বিক্রি করে আর ব্যবসায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত ঋণগ্রস্ত গোলাম থাকে তাহলে উক্ত গোলামের শুফ'আর অধিকার লাভ হবে। তদ্রূপ গোলাম যখন বিক্রেতা হবে তখন মনিবের শুফ'আর অধিকার লাভ হবে। কেননা শুফ'আর মাধ্যমে জমি গ্রহণ মূল্যের মাধ্যমে মালিকানা লাভেরই নামান্তর। অতএব শুফ'আর মাধ্যমে গ্রহণ করাকে ক্রয়ের মাধ্যমে গ্রহণের পর্যায়ে ধরা হবে। আর তা এজন্য যে এভাবে বেচাকেনা গোলামের জন্য লাভজনক। কেননা সে পাওনাদারদের স্বার্থে লেনদেন করে থাকে। পক্ষান্তরে যখন অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের কাধে কোনো ঋণ না থাকে [তখন মালিক শুফ'আর অধিকার পায়না]। কেননা তখন তো সে মালিকের জন্য বিক্রি করে থাকে। আর যার জন্যে বিক্রি করা হয় সে শুফ'আ লাভ করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র.) এ ইবারতে জামিউস সগীরের একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন।

মাসআলাটি বুঝার আগে আমাদেরকে কয়েকটি কথা জেনে নেওয়া দরকার। আর তা হলো নিম্নরূপ–
যদি কোনো মনিব তার কোনো গোলামকে ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি দেয় তাহলে তাকে তার عَبْدٌ مَأْذُونٌ অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম বলা হয়। উক্ত গোলামের আয়ত্বাধীন যাবতীয় সম্পদ মালিকের সম্পদ বলে গণ্য হয়। সে যেসব বেচাকেনা করে সেগুলো মালিকের বেচাকেনা বলেই সাব্যস্ত হয়। তবে যদি গোলাম ব্যবসা করতে গিয়ে এ পরিমাণ ঋণের মধ্যে আটকে যায়, যা তার মূল্যের সমপরিমাণ। তাহলে তার মনিবের উপর এ পুরো মূল্য আদায় করা অত্যাবশ্যক হয় না। অবশ্য এমতাবস্থায় মনিব ইচ্ছে করলে তার ঋণ শোধ করার উদ্যোগ নিতে পারে। যদি সে ঋণ শোধ করে দেয় তাহলে তা ভালো। গোলাম তারই থাকবে। পক্ষান্তরে যদি সে ঋণ শোধ না করে তাহলে উক্ত গোলাম বিক্রি করে পাওনাদারদের পাওনা শোধ করা হবে।
গোলামের উপর এ পরিমাণ [ঋণ] থাকাবস্থায় গোলামের বেচাকেনা মনিবের বেচাকেনা বলে গণ্য হবে না। বরং তৃতীয় কোনো ব্যক্তির স্বতন্ত্র বেচাকেনা বলে সাব্যস্ত হবে। যা পাওনা দারদের স্বার্থে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।
উক্ত ভূমিকা জেনে নেওয়ার পর মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্ধৃত মাসআলায় আসা যাক। মাসআলার সুরত এই যে, এক অনুমতিপ্রাপ্ত ঋণগ্রস্থ গোলাম ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে একখণ্ড জমি খরিদ করল। উক্ত জমির পাশে তার মনিবের জমি/ বাড়ি আছে। উক্ত গোলাম তার জমিটি এখন বিক্রি করলো, তাহলে তার মনিব উক্ত জমির শুফ'আ দাবি করতে পারবে। তদ্রূপ যদি মনিব তার ঘর/জমি বিক্রি করে তাহলে গোলাম উক্ত জমির শুফ'আ দাবি করতে পারবে।
শুফ'আ দাবির পক্ষে যুক্তি হলো শুফ'আর মাধ্যমে জমি গ্রহণ করা মূল্যের মাধ্যমে জমি ক্রয় করারই নামান্তর। যেহেতু এতে ক্রয়ের দিক রয়েছে তাই একে ক্রয় ধরা হবে। আর অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের সাথে মালিকের ক্রয় বিক্রয় যেহেতু জায়েজ তাই শুফ'আর মাধ্যমে জমি গ্রহণও জায়েজ হবে।
এখন প্রশ্ন হলো যে, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম তো তার মনিবের স্বার্থে বেচাকেনা করে থাকে। যদি এখানেও তাই হয়ে থাকে তাহলে তো শুফ'আর অধিকার পাওয়ার সুযোগ তাকে দেওয়া যায় না।
এর উত্তর এই যে, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যখন তার মূল্য পরিমাণ ঋণে আবদ্ধ থাকে তখন সে তার মনিবের স্বার্থে বেচাকেনা করে না; বরং তখন তার পাওনা পরিশোধের উদ্দেশ্যে পাওনাদারদের স্বার্থে বেচাকেনা করে। অবশ্য যখন তার কোনো ঋণ থাকে না; তখন তার বেচাকেনা তার মনিবের স্বার্থে করে থাকে। তাই এ অবস্থায় সে যদি জমি বিক্রি করে তাহলে তার মনিব শুফ'আ দাবি করতে পারে না। কেননা যার স্বার্থে বিক্রি করা হয় সে শুফ'আ দাবি করতে পারে না।

قَالَ : وَتَسْلِيْمُ الْاَبِ وَالْوَصِيِّ الشُّفْعَةَ عَلَى الصَّغِيْرِ جَائِزٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ هُوَ عَلٰى شُفْعَةٍ إِذَا بَلَغَ، قَالُوْا وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا بَلَغَهُمَا شِرَاءُ دَارٍ بِجِوَارِ دَارِ الصَّبِيِّ، فَلَمْ يَطْلُبَا الشُّفْعَةَ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافُ تَسْلِيْمُ الْوَكِيْلِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ، فِىْ رِوَايَةِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নাবালেগের [অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকের] শুফ'আর অধিকার পিতা কিংবা ওসী কর্তৃক ছেড়ে দেওয়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে জায়েজ। আর ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার (র.)-এর মতে সে বালেগ হলে তার শুফ'আ দাবি করতে পারবে। মাশায়েখ (র.) বলেন, এ ইখতিলাফ তখনও প্রযোজ্য হবে যখন নাবালেগের বাড়ির পাশে কোনো বাড়ি ক্রয় করার খবর তাদের কাছে পৌঁছবে। কিন্তু তারা শুফ'আর দাবি করবে না। তদ্রূপ সে ব্যক্তি কে শুফ'আ দাবি করার উকিল নিয়োগ করা হয়েছে। সে যদি এর দাবি পরিত্যাগ করে তাহলে মাবসূত গ্রন্থের কিতাবুল ওকালাতের বর্ণনানুযায়ী উক্ত মতবিরোধ প্রযোজ্য হবে। আর এ মতটিই সহীহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) নাবালেগ [অপ্রাপ্ত বয়স্ক] শিশুর শুফ'আর অধিকার পিতা ওসী কর্তৃক গ্রহণ করা ও বাদ দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১ম মাসআলা : কোনো নাবালেগ [তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক] শিশুর নিকটাত্মীয় [উদাহরণ স্বরূপ মা] ইন্তেকাল করল। অতঃপর শিশুটি উত্তরাধিকারী সূত্রে স্থাবর সম্পদের মালিক হলো। এমতাবস্থায় তার জমির পার্শ্ববর্তী একটি জমি বিক্রি হলো। তাই শিশুটি এখন শুফ'আর দাবিদার সাব্যস্ত হয়। তবে যেহেতু তার নিজ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার যোগ্যতা নেই। তাই তার অভিভাবক হিসেবে পিতা অথবা পিতার অবর্তমানে ওসী [নিযুক্ত অভিভাবক] উক্ত শুফ'আর দাবি গ্রহণ প্রত্যাখ্যানের দায়িত্বশীল সাব্যস্ত হবে। এ অবস্থায় যদি শিশুর পক্ষে তার পিতা কিংবা ওসী শুফ'আ দাবি পরিত্যাগ করে তাহলে তা শিশুর অধিকার রহিত করবে কি না এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

১ম অভিমত : শায়খাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে উক্ত অভিভাবকদ্বয়ের শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ করা জায়েজ। যদি তারা উক্ত দাবি পরিত্যাগ করে তাহলে শিশুটি ভবিষ্যতে শুফ'আর দাবি করতে পারবে না।

২য় অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে নাবালেগের অভিভাবক কর্তৃক শুফ'আ ছেড়ে দিলে তা নাবালেগের পক্ষ থেকে শুফ'আ বাতিল হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয় না; বরং উক্ত শিশু বালেগ হওয়ার পর তার শুফ'আর দাবি করতে পারবে। ইমামগণের দলিল সামনের ইবারতে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ قَالُوْا وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাশায়েখ বলেছেন, উপরের উল্লিখিত মতবিরোধের সুরত যখন অভিভাবকবর্গ সুস্পষ্টভাবে তাদের শুফ'আ বতিল করে। তদ্রূপ যদি তারা পরোক্ষভাবে শুফ'আ বাতিল করে তাহলেও একই মতবিরোধ রয়েছে। পরোক্ষভাবে শুফ'আ ছেড়ে দেওয়ার সুরত এই যে, নাবালেগেরে পিতা কিংবা ওসীর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, নাবালেগের জমির পাশের জমিটি বিক্রি করা হয়েছে এবং কেউ তা কিনে নিয়েছে। এ খবর শুনে তারা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করল না। তাদের এ অবস্থায় শুফ'আ দাবি না করা পরোক্ষভাবে শুফ'আ ছেড়ে দেওয়া।

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الخ : মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত মতবিরোধের আরেকটি সুরত এ ইবারতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মাবসূত গ্রন্থের কিতাবুল ওকালাহ -এর বর্ণনা অনুযায়ী যদি শুফ'আ দাবি করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করা হয়। আর সে উকিল তার মুআক্কিলের পক্ষে শুফ'আ দাবি না করে তা পরিত্যাগ করে তাহলে শায়খাইনের মতে তার উক্ত শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ মুআক্কিলের পক্ষ থেকে দাবি পরিত্যাগ বলে সাব্যস্ত হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মাঝে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে। তা এই যে, ইমাম সাহেবের মতে, উক্ত দাবি পরিত্যাগ করা জায়েজ। কেননা উকিল মুতলাকভাবে মুআক্কিলের নায়েব হয়েছে।

এ মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত হলো উকিলের দাবি পরিত্যাগ করার দ্বারা মুআক্কিলের দাবি পরিত্যাগ সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত বর্ণনাই বিশুদ্ধ। এ দ্বারা তিনি এ ব্যাপারে বর্ণিত একটি ভিন্নমতকে খণ্ডন করছেন। ভিন্নমতটি এই যে, বর্ণিত আছে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে, আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। সহীহ মত এটাই, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ اَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ لِلصَّغِيْرِ فَلَا يَمْلِكَانِ اِبْطَالَهُ كَدِيَّتِهِ وَقَوَدِهِ وَلِاَنَّهُ شَرَعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَكَانَ اِبْطَالُهُ اِضْرَارًا بِهِ وَلَهُمَا اَنَّهُ فِيْ مَعْنَى التِّجَارَةِ فَيَمْلِكَانِ تَرْكَهُ اَلَا تَرٰى اَنَّ مَنْ اَوْجَبَ بَيْعًا لِلصَّبِيِّ صَحَّ رَدُّهُ مِنَ الْاَبِ وَالْوَصِيِّ وَلِاَنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ وَقَدْ يَكُوْنُ النَّظْرُ فِيْ تَرْكِهِ لِيَبْقَى الثَّمَنُ عَلٰى مِلْكِهِ وَالْوَلَايَةُ نَظَرِيَّةٌ فَيَمْلِكَانِهِ وَسُكُوْتُهُمَا كَاِبْطَالِهِمَا لِكَوْنِهِ دَلِيْلَ الْاَعْرَاضِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল এই যে, শুফ'আর দাবি শিশুর একটি প্রতিষ্ঠিত অধিকার। সুতরাং পিতা ও ওসী এ অধিকার বাতিল করতে পারবে না। যেমন শিশুর দিয়ত ও কেসাস তারা বাতিল করতে পারে না। তাছাড়া শুফ'আর অধিকার বিধিবদ্ধ করা হয়েছে তার ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং যদি বাতিল করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তার ক্ষতি সাধন করা হবে । শায়খাইনের দলিল এই যে, শুফ'আর মধ্যে ব্যবসার প্রকৃতি পাওয়া যায়। সুতরাং [বেচাকেনার মতো] তারা শুফ'আ বাতিল করতে পারবে। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, যদি কেউ নাবালক শিশুর জন্য বেচাকেনার প্রস্তাব করে তাহলে পিতা কিংবা ওসীর জন্য সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সাব্যস্ত হয় এবং তা সহীহও হয়। তাছাড়া শুফ'আর মাধ্যমে কোনো সম্পদ গ্রহণ করার মধ্যে লাভ ও ক্ষতি উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ করার মধ্যে কখনো সুবিবেচনা থাকে যাতে নাবালেগের অর্থ তার মালিকানায় বহাল থাকে। আর পিতা ও ওসীর ওলায়াত তথা অভিভাবকত্বের বিষয়টি তাদের বিবেচনার অধীন। সুতরাং শুফ'আ বাতিল করার অধিকার তাদের অর্জিত হবে। তাকে আর তাদের চুপ থাকা শুফ'আ বাতিল করারই নামান্তর। কেননা চুপ থাকা শুফ'আ উপেক্ষা করার দলিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ ইবারতে প্রথমে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের প্রথম দলিল এই যে, নাবালেগ শিশুর শুফ'আর অধিকার শরিয়ত স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠিত অধিকার। এ অধিকার বাতিল করার যোগ্যতা পিতা কিংবা ওসী কোনো অভিভাবকের নেই। যেমন, শিশু যদি কারো দিয়ত পায় কিংবা তার জন্য কেসাস গ্রহণের সুযোগ আসে তা পিতা কিংবা কোনো অভিভাবক বাতিল করতে পারে না। তদ্রূপ শুফ'আও অভিভাবকগণ বাতিল করতে পারবে না।

দ্বিতীয় দলিল : শুফ'আর অধিকার শরিয়ত এ জন্যই অনুমোদন করেছে যে, এর মাধ্যমে যেন জমি গ্রহণ করে উপকৃত হওয়া যায়। যদি অভিভাবকদের তা বাতিল করা সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তো নাবালেগের ক্ষতি সাধন করা হবে। অতএব উপকারের নিমিত্তে যার যার অনুমোদন তা বাতিল করার সুযোগ অভিভাবকদের দেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ قَوْلُهُمَا أَنَّهُ فِىْ مَعْنَى : এখান থেকে শায়খাইন (র.)-এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। শায়খাইন (র.) বলেন, শুফ'আ বেচাকেনার মতো একটি লেনদেন। কেননা এতে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়। সুতরাং নাবালেগের অভিভাবকের জন্যে শুফ'আর মধ্যে বেচাকেনার মতো প্রস্তাব গ্রহণ করা ও প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার সাব্যস্ত হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি নাবালেগের সম্পত্তির কোনো কিছু ক্রয় করার অথবা বিক্রি করার প্রস্তাব করে তাহলে অভিভাবকের জন্য উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করার/প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার থাকে। অধিকন্তু এতে লাভ ও লোকসান উভয়েরই সম্ভাবনা বিদ্যমান। এমন নয় যে, শুফ'আর মাধ্যমে গ্রহণ করলেই কেবল লাভ হবে অন্যথায় লোকসান হবে। বরং এতেও বেচাকেনার মতো লাভ লোকসানের সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় নাবালেগের অর্থ ব্যয় না করে তা তার মালিকানায় রেখে দেওয়ার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত থাকে। আর অভিভাবকদের যে তত্ত্বাবধান এর দায়িত্বে আছে তা কল্যাণ ও তাদের সুবিবেচনার ভিত্তিতেই তাদের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। সুতরাং তারা শুফ'আ গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান উভয়েরই মালিক হবে।

কেসাস ও দিয়তের বিষয়টি এমন নয়। কেননা কেসাস ও দিয়তের কোনো বিনিময় নেই যে, এগুলোর দাবি ছাড়লে এর বিনিময়ে কিছু থাকবে বা পাওয়া যাবে।

قَوْلُهُ قَوْلُهُمَا وَسُكُوْتُهُمَا الخ : মূল ইবারতে تَسْلِيْم -এর মাসআলা আলোচিত হয়েছে এবং সে আলোকেই পক্ষ ও বিপক্ষের দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। سُكُوْت -এর বিষয়ে যেহেতু কোনো বর্ণনা আসেনি তাই মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লেখ করে দিয়েছেন। যাতে এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন পাঠকের মনে না থাকে। তিনি বলেন, নাবালেগের অভিভাবকের চুপ থাকা তার শুফ'আ প্রত্যাখ্যান করারই নামান্তর। কেননা চুপ থাকা শুফ'আর ব্যাপারে অনাগ্রহের দলিল।

وَهٰذَا إِذَا بِيْعَتْ بِمِثْلِ قِيْمَتِهَا فَإِنْ بِيْعَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهَا بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ قِيْلَ جَازَ التَّسْلِيْمُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ تَمَحَّضَ نَظَرًا وَقِيْلَ لَا يَصِحُّ بِالْإِتِّفَاقِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْأَخْذَ فَلَا يَمْلِكُ التَّسْلِيْمَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ بِيْعَتْ بِأَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهَا مُحَابَاةً كَثِيْرَةً فَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّسْلِيْمُ مِنْهُمَا وَلَا رِوَايَةَ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَاللّٰهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : উপরে উল্লিখিত মাসআলার মতপার্থক্য তখনই প্রযোজ্য হবে যখন [নাবালেগের পার্শ্ববর্তী] জমি বা বাড়ি বাজার দরে বিক্রি হবে। আর যদি পার্শ্ববর্তী জমি বা বাড়ি বাজার দরের চেয়ে এমন বেশি মূল্যে বিক্রি হয় যাতে সাধারণত লোকেরা ধোকা খায় না তাহলে কোনো কোনো ফকীহের মতানুযায়ী সকলের ঐকমত্যে শুফ'আ দাবি পরিত্যাগ করা জায়েজ। কেননা এতে নাবালেগের প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পার প্রকাশ ঘটে। পক্ষান্তরে কেনো কোনো ফকীহ বলেন, সকলের ঐকমত্যে দাবি পরিত্যাগ করা জায়েজ নয়। কেননা এ অবস্থাতে অভিভাবক শুফ'আ গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত নয়। সুতরাং তা বাতিল করার অধিকার তিনি রাখেন না। এ ক্ষেত্রে সে অপরিচিত ব্যক্তির মতো। আর যদি জমি বাজার দরের চেয়ে খুবই কম মূল্যে বিক্রি হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে তাদের দু'জনের শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ করা সহীহ নয়। এ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর বর্ণনা নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী মাসআলায় শায়খাইনের সাথে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যে মতবিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর সুরত স্বাভাবিক বিক্রির সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ যদি নাবালেগের শুফ'আর দাবি চলে এমন জমি বাজার দরে বিক্রি হয় তাহলে পিতা কিংবা ওসী নাবালেগের শুফ'আ দাবি প্রত্যাখ্যান করলে উক্ত মতবিরোধ প্রযোজ্য হবে।

আর যদি উক্ত জমি এমন উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হয় যে মূল্যে ক্রয় করে কোনো মানুষ ঠকতে রাজি হবে না। যেমন, পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের জমি বিশ হাজার টাকায় বিক্রি করা হলো তাহলে উপরিউক্ত মতবিরোধ প্রযোজ্য কিনা? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মাঝে দু'ধরনের অভিমত পাওয়া যায়।

১ম অভিমত: কতিপয় ফকীহ মনে করেন, উল্লিখিত অবস্থায় সকল ইমামের মতে উক্ত শুফ'আর দাবি প্রত্যাখ্যান জায়েজ। কেননা এ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে নাবালেগের প্রতি মমতার প্রকাশ ঘটবে। এখানে শুফ'আর দাবি করত: জমি গ্রহণ করা হলে নাবালেগের প্রতি অবিচার করা হবে।

২য় অভিমত : অন্য কতিপয় ফকীহগণের মতে, সকল ইমামের মতানুযায়ী শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ করা সহীহ নয়। সহীহ না হওয়ার যুক্তি এই যে, শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ করার জন্য প্রথমত শুফ'আর দাবি করা শুদ্ধ হতে হয়। আলোচ্য সুরতে জমির মূল্য অস্বাভাবিক বেশি হওয়াতে উক্ত জমিতে শুফ'আর দাবিই শুদ্ধ নয়। যখন শুফ'আর দাবি শুদ্ধ নয় তখন দাবি পরিত্যাগের প্রশ্নই আসে না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু শুফ'আর দাবি শুদ্ধ নয় তাই অভিভাবকদ্বয় এতে আজনবী [বা অপরিচিত] সাব্যস্ত হবে। আর আজনবীর জন্য শুফ'আর দাবি যেমন সহীহ নয় তদ্রূপ তাদের জন্য শুফ'আ পরিত্যাগ করাও শুদ্ধ নয়।

মাসআলা : যে জমিতে নাবালেগের শুফ'আ দাবি করার অধিকার সাব্যস্ত হয় সে জমি যদি বাজার দরে চেয়ে অনেক কম মূল্যে বিক্রি হয় তাহলে তাতে শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ করা জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর অভিমত হলো, এরূপ দাবি করা নাজায়েজ। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি।

উল্লেখ্য যে, এ মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম যুফার (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথেই আছেন। কারণ তাদের মতে তো স্বাভাবিক মূল্যে বিক্রি করলেও অভিভাবকদ্বয়ের শুফ'আর দাবি ছাড়া নাজায়েজ। কম মূল্যে বিক্রি করলে তো আরো ভালো ভাবেই নাজায়েজ হবে।

বি.দ্র. এ প্রসঙ্গে মাজমাউল আনহার [২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৬৯] গ্রন্থে যে ইবারত বিদ্যমান তা এই যে–

وَفِى الْكَافِىْ إِذَا سَلَّمَ الْاَبُ شُفْعَةَ الصَّغِيْرِ وَالشِّرَاءِ بِاَقَلِّ مِنْ قِيْمَتِهٖ بِكَثِيْرٍ فَمِنَ الْإِمَامِ اَنَّ التَّسْلِيْمَ يَجُوْزُ لِاَنَّهٗ اِمْتِنَاعٌ عَنْ اِدْخَالِهٖ فِىْ مِلْكِهٖ لَا اِزَالَةَ عَنْ مِلْكِهٖ وَلَمْ يَكُنْ تَبَرُّعًا وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ لِاَنَّهٗ بِمَنْزِلَةِ التَّبَرُّعِ بِمَالِهٖ وَلَا رِوَايَةَ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ وَفِى التَّبْيِيْنِ كَلَامٌ فَلْيُطَالِعْ .

অর্থাৎ আল কাফী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি পিতা নাবালেগের শুফ'আ ও ক্রয়ের প্রস্তাব বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম হওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেয় তাহলেও তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী জায়েজ। কেননা শুফ'আর দাবি প্রত্যাখ্যান মূলতঃ শুফ'আর জমি তার মালিকানায় আসার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান, তার মালিকানা থেকে কোনো জিনিস দূর করা নয় এবং এটা দান বলে সাব্যস্ত হবে না।

কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দাবি প্রত্যাখ্যান করা জায়েজ নয়। কেননা দাবি প্রত্যাখ্যান এক প্রকারের অনুদান আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে কোনো বর্ণনা নেই।

كِتَابُ الْقِسْمَةِ

অধ্যায় : ভাগ বাটোয়ারা [কিসমত]

ভূমিকা

পূর্ব অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক : মুসান্নিফ (র.) শুফ'আ অধ্যায় (كِتَابُ الشُّفْعَةِ)-এর পর ভাগ বাটোয়ারা অধ্যায় (كِتَابُ الْقِسْمَةِ) কে উল্লেখ করেছেন। কারণ উভয় বিষয়ের মাঝে বাধ্যতামূলক মালিকানা পরিবর্তন (جَبْر)-এর অর্থ পাওয়া যায়। শফী' যেমন ক্রেতা (مُشْتَرِيْ)-এর সম্মতি ছাড়া তার মালের মালিক হয়ে যায়। এমনিভাবে শরিকানা মালের এক শরিক ভাগ বাটোয়ারার মাধ্যমে অপর শরিকের অংশের মালিক হয়ে যায়। তবে যেহেতু শুফ'আর মাধ্যমে সমষ্টিগত সম্পদের মালিক হয় এবং কিসমতের মাধ্যমে আংশিক সম্পদের মালিক হয়। এ দিক বিবেচনা করে প্রথমে শুফ'আ এবং এরপর কিসমতের অধ্যায়কে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া শুফ'আর অধিকার শরিয়তের দৃষ্টিতে জয়েজ। তবে ভাগ বাটোয়ারার অধিকার শরিয়তের দৃষ্টিতে অনেক ক্ষেত্রে ওয়াজিব হিসেবে প্রথমে জায়েজ বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে এবং এরপর ওয়াজিব বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে । অর্থাৎ প্রথমে নিম্নস্তরের ও এরপর উচ্চস্তরের আলোচনা করা হয়েছে। যাকে اَلتَّرَقِّيْ مِنَ الْاَدْنٰى اِلَى الْاَعْلٰى বলা হয়।

আরেকটি মুনাসাবাত বা সম্পর্ক : অংশীদারি মালিকানা থেকে শুফ'আ ও কিসমত উভয় বিষয়ের উৎপত্তি হয়েছে। কেননা অংশীদারি মালিকানা শুফ'আর মূল ভিত্তি এবং অংশীদারি মালিকানার কারণেই ভাগ বাটোয়ারা করতে হয়, কোনো শরিক যখন মালিকানা ঠিক রেখে অংশীদারিত্বের অবসান চায় সে ভাগ বাটোয়ারার পন্থা অবলম্বন করে এবং কোনো শরিক যখন মালিকানা ত্যাগ করে অংশীদারিত্বের অবসান চায় সে তার অংশকে বিক্রি করে দেয়। এ বিক্রি দ্বারা শুফ'আর সুযোগ সৃষ্টি হয়। তবে প্রথমে শুফ'আ এরপর কিসমতকে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ শুফ'আর দ্বারা পূর্বের অবস্থা ঠিক থাকে। অর্থাৎ শুফ'আর দরুন সম্পদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। পূর্বের মালিকের অধীনে যেমন অবিভক্ত ছিল শফী'র অধীনেও তেমনি অবিভক্ত থেকে যায়। তবে ভাগ বাটোয়ারা এমন নয়, এতে অবিভক্ত সম্পদ বিভক্ত হয়ে যায়। তাই প্রথমে শুফ'আ ও এরপর কিসমতের অধ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। [ফতহুল কাদীর]

কিসমতের আভিধানিক অর্থ :

قِسْمَةٌ শব্দটি اِقْتِسَامٌ মাসদারের ইসম। এর অর্থ "বন্টন" [আল-মু'জামুল ওয়াসীত] কামূস অভিধানে বলা হয়েছে قِسْمَةٌ শব্দটি تَقْسِيْمٌ মাসদারের ইসম। এর অর্থ "অংশ"। তবে যেহেতু এর ইসমে ফায়েল قَاسِمٌ আসে তাই এ শব্দটি قَسَمَ الشَّئَ -এর মাসদার হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

কিসমতের পারিভাষিক অর্থ : جَمْعُ نَصِيْبِ الشَّائِعِ فِيْ مَكَانٍ مُعَيَّنٍ অর্থাৎ শরিকগণের বিস্তৃত মালিকানাকে একস্থানে জমা বা একত্রিত করাকে কিসমত বলে। [ফতহুল কাদীর] অর্থাৎ শরিকি মালিকানায় সকল শরিক সম্মিলিতভাবে মালিক হয়। যেমন পাঁচ শরিক মিলে পাঁচ শতাংশ জমি ক্রয় করল। প্রত্যেক শরিক উক্ত পাঁচ অংশ জমির মালিক। তবে তারা উক্ত পাঁচ শতাংশ জমির নির্ধারিত কোনো অংশের মালিক না। তাদের প্রত্যেকের মালিকানা উক্ত পাঁচ শতাংশ জমিতে বিস্তৃত। কিসমত বা ভাগ বাটোয়ারার মাধ্যমে উক্ত বিস্তৃত মালিকানাকে একস্থানে জমা করা হয়। উক্ত ভাগ বাটোয়ারা দ্বারা প্রতি শরিক তার নির্ধারিত অংশের মালিক হয় এবং প্রত্যেক শরিকের অংশ অপর শরিকদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, এ ধরনের বিস্তৃত মালিকানাকে একস্থানে জমা করাকে কিসমত বলে।

ভাগ বাটোয়ারা কেন করতে হয় (سَبَبُ الْقِسْمَةِ) :

سَبَبُهَا طَلَبُ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ الْاِنْتِفَاعَ بِنَصِيْبِهِ عَلَى الْخُصُوْصِ

কোনো শরিক যখন দাবি করে যে, আমার অংশকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেওয়া হোক যেন আমি এককভাবে তা ভোগ করতে পারি এবং এতে অন্য কোনো শরিকের অধিকার না থাকে। এ ধরনের দাবির কারণে ভাগ বাটোয়ারা করতে হয়। সুতরাং কোনো শরিক ভাগ বাটোয়ারার দাবি না করলে ভাগ বাটোয়ারা করা ঠিক হবে না।

ভাগ বাটোয়ারার মূলভিত্তি (رُكْنُ الْقِسْمَةِ) :

وَرُكْنُهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الْاِفْرَازُ وَالتَّمْيِيْزُ بَيْنَ النَّصِيْبَيْنِ كَالْكَيْلِ فِى الْمَكِيْلَاتِ وَالْوَزْنِ فِى الْمَوْزُوْنَاتِ وَالذَّرْعِ فِى الْمَذْرُوْعَاتِ الْعَدَدِ فِى الْمَعْدُوْدَاتِ .

অর্থাৎ, যা দ্বারা অংশসমূহকে ভাগ করা হয় তাই ভাগ বাটোয়ারার মূলভিক্তি বা রুকন। যেমন পাত্রে মাপা হয় এমন বস্তুকে পাত্রের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করা হয়। ওজনে মাপা হয় এমন দ্রব্যকে ওজনের পরিমাপ দ্বারা ভাগ করা হয়। গজ বা হাত দ্বারা মাপা হয় এমন জিনিসকে গজ বা হাত দ্বারা ভাগ করা হয়। গণনা করে পরিমাপ করা হয় এমন জিনিসকে গণনা করে ভাগ করা হয়। সুতরাং পাত্রের মাপ ওজনের মাপ গজ বা হাতের পরিমাপ গণনা ইত্যাদি কিসমত বা ভাগ বাটোয়ারার রুকন বা মূল ভিত্তি। [ফতহুল কাদীর]

ভাগ বাটোয়ারার শর্ত (شَرْطُ الْقِسْمَةِ) :

ভাগ বাটোয়ারা করার দ্বারা ভাগকৃত জিনিসটি ব্যবহারের অযোগ্য না হওয়া ভাগবাটোয়ারা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। তাই দেয়াল গোসলখানা ইত্যাদি ভাগ করা হয় না।

ভাগবাটোয়ারার বিধান (حُكْمُ الْقِسْمَةِ) :

যৌথ মালিকানা বিশিষ্ট বস্তু বা সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করা ইসলামি শরিয়তে জায়েজ।

ভাগ বাটোয়ারার স্বপক্ষে দলিল :

কুরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে : نَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ (اَلْقَمَرُ، اٰيَة ١٢٨)

অর্থ : তাদেরকে জানিয়ে দাও; তাদের পানির ভাগ নির্ধারিত হয়েছে এবং [ভাগ অনুযায়ী] পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে। – [সূরা কামার, আয়াত–১২৮]

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ (اَلشُّعَرَاءُ، اٰيَة - ١٥٥)

অর্থ: হযরত সালেহ (আ.) বললেন, এ উষ্ট্রির জন্য আছে পানি পানের পালা [নির্ধারিত ভাগ] এবং তোমাদের জন্য পানি পানের পালা [নির্ধারিত ভাগ] –[সূরা শুআরা, আয়াত–১৫৫]

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ (اَلنِّسَاءُ، اٰيَة - ٨)

অর্থ: সম্পত্তি বণ্টনের সময় যখন আত্মীয় স্বজন ও এতিম মিসকিন উপস্থিত হয় তখন তা থেকে কিছু খাইয়ে দাও। –[সূরা নিসা, আয়াত : ৮]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে ভাগ বাটোয়ারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ভাগ বাটোয়ারা বৈধ।

ভাগ বাটোয়ারার বৈধতার সপক্ষে বহু হাদীস রয়েছে–

গ্রন্থকার (র.) এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বলেন,

قَالَ : اَلْقِسْمَةُ فِى الْاَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ مَشْرُوْعَةٌ لِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَاشَرَهَا فِى الْمَغَانِمِ وَالْمَوَارِثِ وَجَرَى التَّوَارُثُ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ ثُمَّ هِىَ لَا تَعْرَى عَنْ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ لِاَنَّ مَا يَجْتَمِعُ لِاَحَدِهِمَا بَعْضُهُ كَانَ لَهُ وَبَعْضُهُ كَانَ لِصَاحِبِهِ فَهُوَ يَأْخُذُهُ عِوَضًا عَمَّا بَقِىَ مِنْ حَقِّهِ فِىْ نَصِيْبِ صَاحِبِهِ فَكَانَ مُبَادَلَةً وَاِفْرَازًا وَالْاِفْرَازُ هُوَ الظَّاهِرُ فِى الْمَكِيْلَاتِ وَالْمَوْزُوْنَاتِ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ ـ

অনুবাদ : হিদায়া গ্রন্থ প্রণেতা (র.) বলেন, শরিকি বস্তুর ভাগ বাটোয়ারা জায়েজ। কেননা নবী করীম ﷺ গনিমতের মাল ও ওয়ারিশের মালের ভাগ বাটোয়ারা করেছেন। এবং তা প্রশ্নাতিত ভাবে ধারাবাহিকতার সাথে চলে আসছে। ভাগ বাটোয়ারার মাঝে মুবাদালা বা বিনিময়ের অর্থ অবশ্যই থাকবে। কেননা [দুইজন শরিকের মাল ভাগ করলে একজনের প্রাপ্ত অংশ প্রকৃত পক্ষে এর আংশিক তার নিজের এবং বাকি আংশিক তার অপর শরিকের। তবে তার অপর শরিকের প্রাপ্ত অংশে তার যে অংশ রয়েছে এর বিনিময়ে তার শরিকের অংশ গ্রহণ করছে। সুতরাং ভাগ বাটোয়ারার মাঝে বিনিময় (مُبَادَلَة) ও পৃথকিকরণ (اِفْرَاز) উভয় অর্থ নিহিত রয়েছে। পাত্র দ্বারা মাপা হয় এমন দ্রব্য ও ওজনে মাপা হয় এমন দ্রব্য বণ্টনের ক্ষেত্রে ইফরায বা পৃথকিকরণের অর্থ সুস্পষ্ট। কারণ এগুলোর পরিমাপে কোনো প্রকার বেশ কম হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَاشَرَهَا فِى الْمَغَانِمِ وَالْمَوَارِثِ :
রাসূল ﷺ গনিমতের মাল বণ্টন করেছেন।

عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا اِلَى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) ـ

অর্থ : মুজাম্মি ইবনে জারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, খায়বারের গনিমতের মাল হুদায়বিয়ায় বায়আত গ্রহণকারী সাহাবীগণের মাঝে ভাগ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ উক্ত মাল আঠারো ভাগ করেছেন। [আবূ দাউদ]

ওরাসাত বা বণ্টন সম্পর্কে হাদীস :

عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلِ قَالَ سُئِلَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنْ اِبْنَةٍ وَبِنْتِ اِبْنٍ وَاُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْاُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنِىْ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَاُخْبِرَ بِقَوْلِ اَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ اَقْضِىْ فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِاِبْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلْاُخْتِ فَاَتَيْنَا اَبَا مُوْسٰى فَاَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لَا تَسْئَلُوْنِىْ مَا دَامَ هٰذَا الْحَبْرُ فِيْكُمْ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

অর্থ : হুযাইল ইবনে শুরাহবীল থেকে বর্ণিত যে, আবূ মূসা (রা.)-কে এক কন্যা, পুত্রের কন্যা একজন ও এক বোনের মিরাছের কথা জিজ্ঞাসা করছিল। তিনি বলেন, কন্যার অংশ অর্ধেক ও বোনের অংশ অর্ধেক। তুমি ইবনে মাসউদের কাছে যাও। আশা করি [উক্ত মাসআলায়] তিনি আমার অনুসরণ করবেন। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো এবং আবূ মূসা (রা.)-এর কথা বলা হলো। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, তবে [আবূ মূসা (রা.)-এর মাসআলা অনুসরণ করলে] আমি গোমরা হয়ে যাব, এবং হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।

উক্ত মাসআলায় নবী করীম ﷺ যে ফয়সালা করেছেন আমি তা করব। কন্যার জন্য অর্ধেক পুত্রের কন্যার জন্য ছয় ভাগের একভাগ যেন [উভয় ভাগ মিলে] দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়। বাকি অংশ বোনের জন্য। আমরা তার [আবূ মূসা (রা.)] কাছে আসলাম এবং ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতামত জানালাম। তিনি বললেন যে, যতদিন তোমাদের মাঝে এ জ্ঞানী আলেম আছেন ততদিন তোমরা আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস কর না। -[বুখারী]

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ الخ : ভাগ বাটোয়ারা সম্পর্কে কোনো ইমাম মুজাতাহিদ কখনো দ্বিমত পোষণ করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, ভাগ বাটোয়ারা জায়েজ হওয়ার বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَكَانَ مُبَادَلَةً وَافْرَازًا الخ : কেননা শরিকি মালিকানায় উভয় শরিক যে কোনো জিনিসের প্রতিটি অংশের মালিক। সুতরাং ভাগ বাটোয়ারা দ্বারা প্রতি শরিক যে অংশ পাবে এর অর্ধেক তার নিজের অপর মালিকের নয়। এ হিসেবে ইফরায বা পৃথকিকরণের অর্থ পাওয়া যায়। অপর বাকি অংশ তার অপর শরিকের ছিল। যা অপর শরিকের কাছে তার যে অংশ আছে এর বিনিময়ে নিচ্ছে। এ হিসেবে মুবাদালা বা বিনিময়ের অর্থ পাওয়া যায়। যেমন রহিম ও করিম দুজনে একত্রিতভাবে চার শতাংশ জমি ক্রয় করল। উভয়ের মালিকানা উক্ত চার শতাংশ জমিতে বিস্তৃত। অর্থাৎ এর প্রতিটি অংশের মালিক রহিম ও করিম। উক্ত জমি ভাগ করার পর উভয় শরিকের ভাগে দুই শতাংশ করে জমি পাইল। প্রতি শরিকের প্রাপ্ত অর্ধেক তার নিজের অপর শরিকের নয়। উক্ত প্রাপ্ত অংশের অর্ধেক অর্থাৎ একশতাংশ জমি যা তার নিজের যৌথ মালিকানা থেকে ভাগ করার দ্বারা পৃথক করা হলো। এ হিসেবে কিসমত বা ভাগ বাটোয়ারার ভিতর ইফরায এর অর্থ পাওয়া যায়। উভয় শরিকের প্রাপ্ত অংশের বাকি অর্ধেক অর্থাৎ বাকি এক শতাংশ বা ভাগ করার পূর্বে অপর শরিক উক্ত অংশের মালিক ছিল। উক্ত অংশ তার যে অংশ অপর শরিকের কাছে রয়েছে এর বিনিময়ে সে গ্রহণ করেছে। এ হিসেবে ভাগ বাটোয়ারা মুবাদালা বা বিনিময়ের অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং কিসমত বা ভাগ বাটোয়ারার মাঝে ইফরায ও মুবাদালা উভয় অর্থ পাওয়া যায়। তবে পাত্র বা ওজনের মাপা হয় এমন জিনিসে ইফরায বা পৃথকিকরণের অর্থে প্রাধান্য রয়েছে।

قَوْلُهُ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ : ওজনের ও পাত্রে মাপা হয় এমন জিনিসের এক অংশের সাথে অপর অংশের কোনো পার্থক্য হয়না। এমন জিনিসের ভাগ বাটোয়ারার প্রতি শরিক বাহ্যিক রূপ ও মূল্যমান (صُوْرَةً وَمَعْنًى) হিসেবে অবিকল তার অংশ গ্রহণ করে। -[বিনায়া : পৃষ্ঠা ৪৮১]

حَتّٰى كَانَ لِاَحَدِهِمَا اَنْ يَّأْخُذَ نَصِيْبَهُ حَالَ غَيْبَةِ صَاحِبِهٖ وَلَوْ اِشْتَرَيَاهُ فَاقْتَسَمَاهُ يَبِيْعُ اَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ مُرَابَحَةً بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَمَعْنَى الْمُبَادَلَةِ هُوَ الظَّاهِرُ فِى الْحَيَوَانَاتِ الْعُرُوْضِ لِلتَّفَاوُتِ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ لِاَحَدِهِمَا اَخْذُ نَصِيْبِهٖ عِنْدَ غَيْبَةِ الْاٰخَرِ وَلَوْ اِشْتَرَيَاهُ فَاقْتَسَمَاهُ لَا يَبِيْعُ اَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ مُرَابَحَةً بِعَدَدِ الْقِسْمَةِ ـ

অনুবাদ : এমন কি এক শরিক অপর শরিকের অনুপস্থিতিতে তার অংশ নিয়ে নিতে পারবে। যদি দুজন মিলে ক্রয় করে তা ভাগ করে নেয় তবে প্রত্যেক শরিক তার অংশকে মুরাবাহাতান অর্থাৎ ক্রয়কৃত মূল্যের অর্ধেকের সাথে লাভ যোগ করে বিক্রি করতে পারবে। জীবজন্তু ও আসবাব পত্রে পার্থক্য থাকার দরুন মুবাদালার অর্থ সুস্পষ্ট। তাই এক শরিক অপর শরিকের অনুপস্থিতিতে তার অংশ নিতে পারবে না। যদি দুজনে মিলে ক্রয় করে ভাগ করে নেয় তবে কোনো শরিক ভাগ করার পর তার অংশকে মুরাবাহাতান বিক্রি করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حَتّٰى كَانَ لِاَحَدِهِمَا اَنْ يَّأْخُذَ نَصِيْبَهُ الخ : ইফরায বা পৃথকিকরণের মাধ্যমে প্রতি শরিক তার প্রকৃত প্রাপ্য অংশকে গ্রহণ করে। তাই ইফরায বা পৃথকিকরণের ক্ষেত্রে এক শরিক তার অংশকে অপর শরিকের অনুপস্থিতিতে নেওয়া জায়েজ হবে। কেননা সে তার অবিকল প্রাপ্য অংশকে গ্রহণ করছে।

ওজনে মাপা হয় বা পাত্রে মাপা হয় এমন জিনিস (مِثْلِىْ) দুজন একসাথে ক্রয় করে তা ভাগ করলে উভয় শরিক তার অংশকে ক্রয়কৃত মূল্যের সাথে লাভ যোগ করে মুরাবাহাতান তার অংশকে ক্রয়কৃত তাওলিয়াতান বিক্রি করতে পারবে। অর্থাৎ শরিয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েজ হবে। এক্ষেত্রে ক্রয়কালীন পূর্ণ মূল্যের অর্ধেক নির্ধারণ করবে। যা তার অংশের পূর্ণমূল্য। এতে করে মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মূল ভিত্তি ক্রয়কৃত মূল্য ঠিক থাকছে।

قَوْلُهُ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ لِاَحَدِهِمَا اَخْذُ نَصِيْبِهٖ عِنْدَ غَيْبَةِ الْاٰخَرِ الخ : বিনিময় বা মুবাদালায় যেহেতু প্রতি শরিক তার প্রাপ্য অংশের বিনিময় গ্রহণ করে। তাই কোনো শরিক তার অংশকে অপর শরিকের অনুপস্থিতিতে নেওয়া তার জন্য জায়েজ হবে না। কেননা মুবাদালার ক্ষেত্রে অপর বিনিময়কারীর মতামত নেওয়া জরুরি। জীবজন্তু বা আসবাব পণ্য যা ওজনের বা পাত্রে মাপা হয় না غَيْر مِثْلِىْ এমন জিনিস দুজনে মিলে ক্রয় করার পর তা ভাগ করলে কোনো শরিক তার অংশকে মুরাবাহাতান বা তাওলিয়াতান বিক্রি করা জায়েজ হবে না। কেননা সে যা ক্রয় করেছিল তা বিক্রি করছে না। মুবাদালার কারণে তার অংশের পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ গাইরে মিছলি পণ্যে মুবাদালার অর্থের প্রাধান্য থাকার দরুন প্রতি শরিক যে অংশ গ্রহণ করে, তা হুবহু অর্ধেক হয় না। তার অংশের মূল্য ক্রয়কালীন পূর্ণমূল্যের অর্ধেক একথা নিশ্চিত বলা যাবে না। সুতরাং মুরাবাহা ও তাওলিয়া জায়েজ হবে না।

وَلَوْ اِشْتَرَيَاهُ : এর "ہ" যমীর দ্বারা প্রথমটি মিছলি বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়টি গাইরে মিছলি বুঝানো হয়েছে।

إِلَّا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَجْبَرَ الْقَاضِيْ عَلَى الْقِسْمَةِ عِنْدَ طَلَبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ لِأَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْإِفْرَازِ لِتَقَارُبِ الْمَقَاصِدِ وَالْمُبَادَلَةُ مِمَّا يَجْرِيْ فِيْهِ الْجَبْرُ كَمَا فِيْ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَهٰذَا لِأَنَّ أَحَدَهُمْ بِطَلَبِ الْقِسْمَةِ يَسْئَلُ الْقَاضِيْ أَنْ يَخُصَّهُ بِالْاِنْتِفَاعِ بِنَصِيْبِهِ وَيَمْنَعُ الْغَيْرُ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِيْ إِجَابَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً لَا يُجْبِرُ الْقَاضِيْ عَلَى قِسْمَتِهَا لِتَعَذُّرِ الْمُعَادَلَةِ بِاعْتِبَارِ فُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَقَاصِدِ وَلَوْ تَرَاضَوْا عَلَيْهَا جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ .

অনুবাদ : তবে হ্যাঁ যদি [ঐ সব জীবজন্তু] এক জাতীয় হয় এবং কোনো শরিক ভাগ বাটোয়ারার দাবি করে তবে বিচারক [অন্য শরিককে] ভাগ বাটোয়ারার জন্য বাধ্য করবেন। কেননা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য হিসেবে কাছাকাছি হওয়ায় এর মাঝে ইফরায বা পৃথকিকরণের অর্থ পাওয়া যায়। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মুবাদালা করা হয়। যেমন করজ পরিশোধের ক্ষেত্রে। তা [বাধ্য করা] এজন্য যে, কোনো শরিক যখন বিচারকের কাছে ভাগ বাটোয়ারের জন্য আবেদন করে যে, তার অংশকে ভোগ করার জন্য পৃথক করে দেওয়া হোক এবং তার প্রাপ্য সত্ব যেন অন্য কেউ ব্যবহার করতে না পারে। এমন আবেদন গ্রহণ করা বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যদি বিক্রির প্রকার [জীবজন্তু] হয়, তবে বিচারক -এর ভাগ বাটোয়ারার জন্য [কোনো শরিককে] বাধ্য করবেন না। কারণ [বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর] ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকায় সমতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে যায়। যদি শরিকগণ সকলে ভাগ বাটোয়ারা করতে সম্মত হয়। তবে তা জায়েজ আছে। কারণ এ অধিকার তাদের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ الخ : মুসান্নিফ (র.)-এর পূর্বের আলোচনা مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ [মুবাদালার অর্থ স্পষ্ট]-এর উপর প্রশ্ন হয় যে, যেহেতু ওজনে বা পাত্রে মাপা হয় না। এমন বস্তু (غَيْرِ مِثْلِيْ) -এর ভাগ বাটোয়ারায় মুবাদালার প্রাধান্য রয়েছে। তাই বিচারকের দায়িত্ব হচ্ছে এ ধরনের বস্তুর ভাগবাটোয়ারায় কাউকে বাধ্য না করা। যেমন কাউকে তার মাল বিক্রি করতে বাধ্য করা যায় না। এর উত্তরে তিনি বলেন , তবে হ্যাঁ উক্ত মাল যদি এক জাতীয় হয় তবে কোনো শরিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অন্য শরিকের ভাগ বাটোয়ারার জন্য বাধ্য করা বিচারকের জন্য বৈধ। কারণ এক জাতীয় হওয়ায় ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে পার্থক্য কম হয়। তাই এতে ইফরাযের অর্থ উল্লেখযোগ্য। -[বিনায়া : ৪৮২ পৃষ্ঠা]

এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, জীবজন্তুর ভাগ বাটোয়ারায় মুবাদালা বা বিনিময় অর্থের প্রাধান্য রয়েছে, ইফরায বা পৃথকিকরণের অর্থের প্রাধান্য নেই। তবে লক্ষণীয় যে, জীবজন্তু এক জাতীয়? না বিভিন্ন প্রকারের? এক জাতীয় হলে, যেমন সবগুলো গরু বা সবগুলো ছাগল। তবে কোনো শরিক ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করলে বিচারক তা গ্রহণ করবেন এবং অন্য শরিককে এর জন্য বাধ্য করবেন। কারণ এক জাতীয় জীবজন্তুর ব্যবহারিক উদ্দেশ্য কাছাকাছি বা এক ধরনের হয়। তাই এক্ষেত্রে ইফরায বা পৃথকিকরণের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া মুবাদালা অনেক সময় বাধ্যতামূলক হয়। যেমন করজ পরিশোধের জন্য বাধ্য করার বিধান রয়েছে। উক্ত পরিশোধকৃত বস্তু বা দ্রব্য ঋণ গ্রহণের কোনো অর্থ হয় না। কেননা ঋণ বা করজ গ্রহণ করা হয় এ জন্য যে নগদ টাকা বা বস্তু না থাকায় ঋণ করে প্রয়োজন মেটাবে। পরবর্তীতে ঋণকৃত উক্ত টাকা বা বস্তুর বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করবে। সুতরাং করজ পরিশোধের মাঝে বিনিময়ের অর্থ রয়েছে এবং তা বাধ্যতামূলক। আর এর জন্য বিচারক যেমন ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্য করতে পারেন এমনিভাবে শরিকি জীবজন্তু এক জাতীয় হলে এবং কোনো অংশীদার যদি রাজি না হয়। তাহলে বিচারক উক্ত অংশীদারকে ভাগ বাটোয়ারার জন্য বাধ্য করবেন। কেননা এক জাতীয় জীবজন্তুর ব্যবহারিক উদ্দেশ্য প্রায় একই রকম বা কাছাকাছি হয়। ভাগ বাটোয়ারার ক্ষেত্রে এতে সমতা রক্ষা করা যায় এবং উক্ত আবেদন বাস্তব সম্মত । এক জাতীয় জীবজন্তু না হলে এর ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়। এতে সমতা রক্ষা করা যায় না এবং উক্ত আবেদন বাস্তব সম্মত না বলে বিচারক অন্য শরিক কে বাধ্য করবেন না।

قَالَ : وَيَنْبَغِى لِلْقَاضِى اَنْ يَنْصُبَ قَاسِمًا يُرْزَقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَقْسِمَ بَيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ اَجْرٍ، لِاَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ يَتِمُّ بِهِ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ فَاَشْبَهَ رِزْقَ الْقَاضِى وَلِاَنَّ مَنْفَعَةَ نَصْبِ الْقَاسِمِ تَعُمُّ الْعَامَّةَ فَتَكُوْنُ كِفَايَتُهُ فِى مَالِهِمْ غُرْمًا بِالْغُنْمِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাজির জন্য উচিত হলো একজন বণ্টনকারী (قَاسِمْ) নিয়োগ করা। বাইতুল মাল [রাষ্ট্রীয় তহবিল] থেকে তার বেতন ভাতা প্রদান করা হবে। যেন সে বিনা পারিশ্রমিকে মানুষের মাঝে [সম্পদ] ভাগ বণ্টন করে দিতে পারে। কেননা ভাগ বাটোয়ারা বিচার কার্যের অন্তর্ভুক্ত। এ হিসেবে যে, এর [ভাগ বাটোয়ারা] মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তি পূর্ণতা লাভ করে । সুতরাং বণ্টন কারীর বেতন ভাতা বিচারকের বেতন ভাতার মতো বলে গণ্য হবে। তা ছাড়া বণ্টনকারী নিয়োগের সুফল সাধারণ মানুষ ভোগ করে। তাই তার বেতন ভাতা সাধারণ মানুষের সম্পদ থেকে দেওয়া হবে। "লাভ যার ক্ষতি তার" নীতির ভিত্তিতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَنْبَغِى لِلْقَاضِى اَنْ الخ : যেহেতু বিচারক বিচার বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যস্ত থাকেন। তাই জমি মাপা বা বণ্টনের কাজে বিভিন্ন স্থানে যাওয়া বিচারকের জন্য কঠিন। সুতরাং উত্তম হলো যে, বিচারক একজন বণ্টনকারী বা কাসেম নিয়োগ করবেন। উক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত কাসেম বা বণ্টনকারী বিনা পারিশ্রমিকে মানুষের ভাগ ভাটোয়ারার কাজ সম্পাদন করবেন। বিচারকের বেতন ভাতা যে ভাবে বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে ভাগ বণ্টনের কাজে নিয়োগকৃত কাসেমের বেতন ভাতা বাইতুল মাল থেকে প্রদান করা হবে। কারণ ভাগ বাটোয়ারা বিচার বিভাগীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত। ভাগ বণ্টনের মাধ্যমে মামলার রায় পূর্ণতা লাভ করে। তাছাড়া ভাগ বাটোয়ারার বেতন ভাতা সাধারণ মানুষের মাল থেকে দেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

غُرْمًا بِالْغُنْمِ অর্থাৎ "ক্ষতিপূরণ যার ভাগে লাভের অংশ তার ভাগে" নীতির ভিত্তিতে বাইতুল মাল যা সাধারণ মানুষের সম্পদ তা থেকে কাসেমের বেতন ভাতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ الخ : প্রকৃত পক্ষে ভাগ বাটোয়ারা করা বিচার কার্যের অন্তর্ভুক্ত না। এমনকি বিচারক নিজ হাতে ভাগ বাটোয়ারা করা তার দায়িত্ব না। বিচারকের দায়িত্ব হচ্ছে ভাগ বাটোয়ারার অনিচ্ছুক শরিককে এর জন্য বাধ্য করা। তবে যেহেতু বিচারক তার অধিকার বলে ভাগ বাটোয়ারায় অনিচ্ছুক শরিককে বাধ্য করেন এবং বিচারক ছাড়া অন্য কারো এ অধিকার নেই। তাছাড়া ভাগ বাটোয়ারা বিচার কার্যকে পূর্ণতা দান করে। অর্থাৎ বিচারের রায় ঘোষণার পর বণ্টনকারী বণ্টন করে দিলে তবেই বিচারের রায় পূর্ণতা লাভ করে। এ হিসেবে ভাগ বাটোয়ারা বিচার কার্যের সাদৃশ্যপূর্ণ বিধায় শরিকদের থেকে পারিশ্রমিক না নেওয়া উত্তম। অন্যদিকে ভাগ বাটোয়ারা বিচার কার্যের অন্তর্ভুক্ত না হিসেবে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ।

قَالَ : فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ نَصَبَ قَاسِمًا بِالْاَجْرِ مَعْنَاهُ بِاَجْرٍ عَلَى الْمُتَقَاسِمِيْنَ لِاَنَّ النَّفْعَ لَهُمْ عَلَى الْخُصُوْصِ وَيُقَدِّرُ اَجْرَ مِثْلِهِ كَيْلَا يَتَحَكَّمُ بِالزِّيَادَةِ وَالْاَفْضَلُ اَنْ يَرْزُقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِاَنَّ اَرْفَقَ بِالنَّاسِ وَاَبْعَدَ عَنِ التُّهْمَةِ وَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ عَدْلًا مَاْمُوْنًا عَالِمًا بِالْقِسْمَةِ لِاَنَّهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ وَلِاَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ وَهِىَ بِالْعِلْمِ وَمِنَ الْاِعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ بِالْاَمَانَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি বিচারক তা [বায়তুল মালের ব্যয়ভারে বণ্টনকারী নিয়োগ] না করেন তবে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে বণ্টনকারী বা কাসেম নির্ধারণ করবেন। অর্থাৎ শরিকগণের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বণ্টনকারী নিযুক্ত হবে। কেননা ব্যক্তিগতভাবে তারাই এর সুফল ভোগ করবে। বিচার সামঞ্জস্যপূর্ণ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দেবেন; যেন জোরপূর্বক অতিরিক্ত পারিশ্রমিক আদায় করতে না পারে। উত্তম হলো বাইতুল মাল থেকে তার বেতন ভাতা দেওয়া। কেননা এটা মানুষের জন্য সুবিধাজনক ও অপবাদ মুক্ত। কাসেম বা বণ্টনকারী নিয়োগে আবশ্যক হলো, [কাসেম বা বন্টনকারী] ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত ও ভাগ বাটোয়ারা সম্পর্কে জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। কেননা এ কাজ বিচারকার্য জাতীয় বিষয়। তাছাড়া [বণ্টনকারীকে উক্ত কাজে] সামর্থ্যবান হতে হবে। আর এটা জ্ঞান বা ইলম দ্বারা হতে হবে। বণ্টনকারীর কথা নির্ভর যোগ্য হতে হবে। তা [নির্ভরযোগ্যতা] বিশ্বস্ততার দ্বারা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ نَصَبَ الخ : যদি বিচারক বাইতুল মালের ব্যয়ভারে বন্টনকারী বা কাসেম নিয়োগ না করেন তবে ন্যায়পরায়ণ ভাগ বাটোয়ারার কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এর জন্য নির্ধারণ করে দেবেন। সে যাদের সম্পদ ভাগ করবে তাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে নিবে। তবে বিচারকের পক্ষ থেকে ন্যায় সঙ্গত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা থাকবে [যেন বণ্টনকারী অতিরিক্ত পারিশ্রমিক আদায়ে সক্ষম না হয়]। তবে বাইতুল মাল থেকে বেতন ভাতা দেওয়া উত্তম। এতে সাধারণ মানুষ বিনা মূল্যে ভাগ বাটোয়ারার সুবিধাভোগ করছে। শরিকদের সাথে লেনদেন করার দ্বারা উৎকোচ গ্রহণের সন্দেহ হতে পারে। বণ্টনকারী এ অপবাদ থেকে মুক্ত থাকবে।

কাসিম বা ভাগ বাটোয়ারাকারীর তিনটি যোগ্যতা থাকতে হবে। ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও ভাগ বাটোয়ারা বিষয়ের জ্ঞান। কেননা ভাগ বাটোয়ারা এক ধরনের বিচারকার্য। সুতরাং তার মাঝে বিচারকের যোগ্যতা অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা থাকতে হবে। ভাগ বাটোয়ারার কাজে সামর্থ্যবান হতে হবে। ভাগ বাটোয়ারা বিষেয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে তা অর্জন করা হবে। এছাড়ও তার কথার উপর মানুষের আস্থা থাকতে হবে; ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার হলে আস্থাশীল হবে।

عَدْلًا مَاْمُوْنًا : عَدْل বা ন্যায়পরায়ণ হওয়ার জন্যে আমানতদার হওয়া জরুরি। আমানতদারী ছাড়া ন্যায়পরায়ণ হওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও মুসান্নিফ (র.) পৃথকভাবে مَاْمُوْنًا উল্লেখ করেছেন। কেননা হতে পারে আমানতদারীর বিষয়টি সুস্পষ্ট না।

-[বিনায়া : পৃ. ৪৮৫]

অথবা مَاْمُوْنًا -এর অর্থ অপবাদ থেকে মুক্ত। অর্থাৎ তার উপর কোনো ধরনের অপবাদের অভিযোগ নেই।

وَلَا يُجْبِرُ الْقَاضِي النَّاسَ عَلٰى قَاسِمٍ وَاحِدٍ مَعْنَاهُ لَا يُجْبِرُ عَلٰى أَنْ يَسْتَأْجِرُوهُ لِأَنَّهُ لَا جَبْرَ عَلَى الْعُقُوْدِ وَلِأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ لَتَحَكَّمَ بِالزِّيَادَةِ عَلٰى أَجْرِ مِثْلِهِ وَلَوِ اصْطَلَحُوْا فَاقْتَسَمُوْا جَازَ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِمْ صَغِيْرٌ فَيَحْتَاجُ إِلٰى أَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ قَالَ : وَلَا يَتْرُكُ الْقُسَّامَ يَشْتَرِكُوْنَ . كَيْلَا تَصِيْرَ الْأُجْرَةُ غَالِيَةً بِتَوَاكُلِهِمْ وَعِنْدَ عَدَمِ الشَّرِكَةِ يَتَبَادَرُ كُلٌّ مِنْهُمْ إِلَيْهِ خِيْفَةَ الْفَوْتِ فَيَرْخُصُ الْأَجْرُ . قَالَ : وَأُجْرَةُ الْقِسْمَةِ عَلٰى عَدَدِ الرُّؤُوْسِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رح) عَلٰى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَحَفْرِ الْبِئْرِ الْمُشْتَرَكَةِ وَنَفَقَةِ الْمَمْلُوْكِ الْمُشْتَرَكِ .

অনুবাদ : এবং কাজি কেবল একজন কাসিমকে সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিবেন না। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে কেবল একজনকে [ভাগ বাটোয়ারার] কাজে নিতে বাধ্য করবে না। কেননা [কোনো ধরনের] চুক্তিতে কাউকে বাধ্য করা যায় না। তাছাড়া যদি [একজন কাসিম] নির্ধারিত হয় তবে সে জোরপূর্বক ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি আদায় করবে। যদি আপোষে নিজেরা ভাগ করে নেয় তবে তা জায়েজ হবে। কিন্তু তাদের মাঝে যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক [শরিক] থাকে তাহলে কাজির হুকুমের প্রয়োজন হবে। কেননা তার [অপ্রাপ্ত বয়স্ক] উপর তাদের [অন্য শরিকগণের] কোনো কর্তৃত্ব নেই। মুসান্নিফ (র.) বলেন, [বিচারক] তাকসীমকারীদেরকে এমনভাবে ছাড়বে না যাতে করে তারা সংগঠিত হয়ে যেতে পারে। যেন তাদের সংগঠিত হওয়ার কারণে পারিশ্রমিকের উচ্চ মূল্য না হয়ে যায়। সংগঠিত না হলে [ভাগ বাটোয়ারার কাজ] হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে কাজ করবে। এতে করে মজুরি সস্তা হবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ভাগ বাটোয়ারার মজুরি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী [শরিকগণের] মাথা পিছু হারে হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত অনুযায়ী [শরিকগণের] অংশের পরিমাণ হিসেবে হবে। কেননা তা [ভাগ বাটোয়ারার মজুরি] মালিকানা বিষয়ক ব্যয়ভার। সুতরাং এর [মালিকানার] পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। যেমন পাত্রের দ্বারা পরিমাপকারী ও ওজনে পরিমাপকারী [কয়াল] এর পারিশ্রমিক, যৌথ কূপ খননের পারিশ্রমিক এবং যৌথ মালিকানাধীন গোলামের খোরপোশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অর্থাৎ, কাজি অংশীদারগণকে এর উপর বাধ্য করবেন না যে, শুধু এ কাসিম দ্বারাই ভাগবাটোয়ারা করতে হবে। কেননা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাগ বাটোয়ারা করা একটি চুক্তি বা عَقْد। কোনো চুক্তিতে কাউকে বাধ্য করা যায় না। যদি কাজির পক্ষ থেকে একজন কাসিমকে ভাগ বাটোয়ারার জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তবে সে একথা মনে করবে যে, আমাকে ছাড়া কেউ কোনো কাসিম পাবে না। তখন সে ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি আদায় করবে।

قَوْلُهُ وَلَوِ اصْطَلَحُوْا الخ : শরিকগণ আপসে নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিলে তা জায়েজ হবে। তবে কোনো শরিক নাবালেগ হলে এবং তার পিতা বা ওসী [নাবালেগ সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে পিতা যাকে অসিয়ত করে গিয়েছেন] না থাকলে কাজির হুকুমের প্রয়োজন হবে। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শরিকের উপর অন্য শরিকগণের কোনো কর্তৃত্ব নেই। অপর পক্ষে কাজি বা বিচারকের সকল মানুষের উপর কর্তৃত্ব আছে। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শরিকের শরিয়ত সম্মত কোনো নায়েব বা অভিভাবক থাকলে কাজির হুকুমের প্রয়োজন হবে না।

তাকসীমকারীগণ যেন সংগঠিত না হতে পারে। এর জন্য বিচারকের পক্ষ থেকে বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে। অন্যথায় তাকসীমকারীগণ উচ্চহারে পারিশ্রমিক দিতে সাধারণ মানুষকে বাধ্য করবে। বিচারকের বিধি নিষেধ আরোপের দরুন যখন সংগঠিত হতে পারবে না। তখন প্রত্যেক কাসিম বা বণ্টনকারী অধিক অর্থ উপার্জনের জন্যে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে কাজ খুজবে। যেন কোনো কাজ তার হাত ছাড়া না হয়। এভাবে পারিশ্রমিকের বাজারদর কমে আসবে।

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَتْرُكُ الْقُسَّامَ يَشْتَرِكُوْنَ الخ : অর্থাৎ বিচারক ভাগ বাটোয়ারার কাজকে সংগঠিত কিছু তাকসীম কারীদের মাঝে এমন ভাবে ছেড়ে দেবে না যে, নির্ধারিত কিছু তাকসীমকারী ছাড়া অন্য কেউ ভাগ বাটোয়ারা করতে পারবে না। কেননা এতে করে তাকসীমকারীগণ সাধারণ মানুষকে উচ্চহারে মজুরি দিতে বাধ্য করবে এবং অংশীদারগণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

[উপরিউক্ত ইবারতে হিদায়ার প্রচলিত কপিসমূহে "قَالَ" শব্দটি আছে ফতহুল কাদীরে নেই।]

قَوْلُهُ قَالَ وَاُجْرَةُ الْقِسْمَةِ الخ : শরিকগণের অংশ কম বেশি হলে তাকসীমকারীর পারিশ্রমিক কি হিসেবে দেওয়া হবে? এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যে কতজন শরিক আছে সকলেই সমান হারে পারিশ্রমিক দেবে। এ ক্ষেত্রে অংশের বেশকম ধর্তব্য হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, অংশের পরিমাণ হিসেবে পারিশ্রমিক ভাগ করা হবে। কেননা ভাগ বাটোয়ারার পারিশ্রমিক মালিকানা বিষয়ক ব্যয় ভার। সুতরাং যার মালিকনা যতটুকু সে ততটুকু পারিশ্রমিকের ব্যয়ভার গ্রহণ করবে। যেমন একখণ্ড জমির পরিমাণ ছয় শতাংশ। এর অর্ধেক অর্থাৎ তিন শতাংশ রাশেদের। এর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দুই শতাংশ তারেকের। আর বাকি অংশ অর্থাৎ এক শতাংশ আসাদের। উক্ত জমির ভাগ বাটোয়ারার ছয়শত টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী প্রতি শরিক দুইশত টাকা হারে পারিশ্রমিক দেবে। ৩ শরিক × ২০০ = ৬০০ অর্থাৎ সকল শরিক সমান হারে দেবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত অনুযায়ী মালিকানার অংশের পার্থক্যের ভিত্তিতে রাশেদ তিনশত টাকা, তারেক দুইশত টাকা ও আসাদ একশত টাকা দেবে। অতঃপর ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে মুসান্নিফ (র.) মালিকানার অংশের বেশ কমের ভিত্তিতে শরিকগণের মাঝে পারিশ্রমিকের হার বেশকম করার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন কয়েকজন শরিক তাদের যৌথ মাল কোনো ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পাত্রদ্বারা (كَيْل) বা ওজন করে পরিমাপ করতে দিল। এ বিষয়ে ইমামগণ একমত যে, মালিকানার আনুপাতিক হারে পারিশ্রমিক দেবে। যেমন যৌথ মালিকানায় কূপ খনন করার পারিশ্রমিক কূপের মালিকানার আনুপাতিক হারে ধরা হবে। অর্থাৎ যে অর্ধেক কূপের মালিক হবে সে পূর্ণ মজুরির অর্ধেক দেবে। যে এক চতুর্থাংশের মালিক হবে সে পূর্ণ মজুরির এক চতুর্থাংশ দেবে। যেমন শরিকি গোলামের খোরপোশ শরিকগণের অংশের আনুপাতিক হারে দিতে হয়।

وَلِأَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْاَجْرَ مُقَابِلٌ بِالتَّمْيِيْزِ وَاَنَّهُ لَا يَتَفَاوَتُ وَرُبَّمَا يَصْعُبُ الْحِسَابُ بِالنَّظَرِ اِلَى الْقَلِيْلِ وَقَدْ يَنْعَكِسُ الْاَمْرُ فَتَعَذَّرَ اِعْتِبَارُهُ فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِاَصْلِ التَّمْيِيْزِ بِخِلَافِ حَفْرِ الْبِيْرِ لِاَنَّ الْاَجْرَ مُقَابِلٌ بِنَقْلِ التُّرَابِ وَهُوَ يَتَفَاوَتُ . وَالْكَيْلُ وَالْوَزْنُ اِنْ كَانَ لِلْقِسْمَةِ قِيْلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقِسْمَةِ فَالْاَجْرُ مُقَابِلٌ بِعَمَلِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَهُوَ يَتَفَاوَتُ وَهُوَ الْعُذْرُ لَوْ اُطْلِقَ وَلَا يُفَصَّلُ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, পারিশ্রমিক হলো, পৃথকিকরণের বিনিময়। এতে বেশকম হয় না। কখনো এমন হয় যে, কম অংশের হিসেবে করা কঠিন হয়। আবার কখনো এর বিপরীত হয়। সুতরাং এর [অংশের বেশকম] ভিত্তিতে [পারিশ্রমিক] নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়। তবে কূপ খননের বিষয়টি এমন নয়। কেননা এর পারিশ্রমিক মাটি পরিবহণের বিনিময় এবং এতে বেশকম হয়। পাত্রের মাপ ও ওজনের মাপ যদি ভাগ বাটোয়ারার জন্যে হয়। তাহলে বলা হবে এ সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। যদি ভাগ বাটোয়ারার জন্য না হয়। তবে মজুরি পাত্রের মাপ ও ওজনের মাপের বিনিময়ে হবে। এতে পার্থক্য রয়েছে। [উক্ত ওজন বা পাত্রের পরিমাপ ভাগ বাটোয়ারার জন্যে কি? না তা কয়ালের সাথে মাপার চুক্তির সময়] যদি উল্লেখ না করা হয় এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দেওয়া হয় তবে তাই [تَفَاوُتٌ বা পার্থক্য] উজর হিসেবে গণ্য হবে [পরিমাপের পরিশ্রমের বেশ কমের ওজরের কারণে পারিশ্রমিকের পার্থক্য হবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِأَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো যে, ভাগ বাটোয়ারার মাধ্যমে প্রত্যেকের অংশকে পৃথক করা হয়। এমনিভাবে বড় অংশকে ছোট অংশ থেকে পৃথক করা হয়। সুতরাং কম অংশ বেশি অংশ পৃথক করা হিসেবে সমান। তাই পারিশ্রমিকও সমান হবে। ভাগ বাটোয়ারায় অনেক সময় ছোট অংশের হিসেব বড় অংশের চেয়ে কঠিন হয় এবং কখনো বড় অংশের হিসেব ছোট অংশের চেয়ে কঠিন হয়। তাই পারিশ্রমিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে পৃথকিকরণ বা تَمْيِيْز কে মূলভিত্তি ধরা হয়েছে যা কখনো বেশকম হয় না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَفْرِ الْبِيْرِ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের স্বপক্ষে যে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, কূপ খননের বিষয়টি এমন নয়। কারণ কূপ খননের পারিশ্রমিক মাটি পরিবহণের বিনিময়ে হয়। কূপ খননের পার্থক্যের কারণে মজুরির পরিমাণে পার্থক্য হয়। যেমন যৌথ মালিকানায় একটি কূপ খনন করা হলো এবং এর বিশ হাত নিচে পানি পাওয়া গেল। উক্ত কূপের তিন চতুর্থাংশ এক শরিকের এবং এক চতুর্থাংশ অন্য শরিকের। প্রথম শরিক পনের হাত মাটি কাটার মজুরি দেবে এবং অপর শরিক পাঁচ হাত মাটি কাটার মজুরি দেবে। এতে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, এটা মাটি পরিবহণের মজুরি।

তাই কূপ খননের কম বেশি হওয়ার কারণে মজুরির পার্থক্য হবে। পূর্বে উল্লিখিত বিষয়টি এমন নয়। এতে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথক করা।

قَوْلُهُ وَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ اِنْ كَانَ الخ : ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) ভাগ বাটোয়ারার মাসআলাটিকে কয়াল [পরিমাপক] এর পারিশ্রমিকের সাথে তুলনা করেছেন। এর উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, পাত্র দ্বারা বা ওজনের পরিমাপ দুই ধরনের হয়। উক্ত পরিমাপ হয়তো ভাগ বাটোয়ারার জন্য হবে। অথবা ভাগ বাটোয়ারার জন্য হবে না। ভাগ বাটোয়ারার জন্য হলে পূর্বের ইখতেলাফ অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী শরিকগণের মাথা পিছু হারে পারিশ্রমিক দিতে হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত অনুযায়ী মালিকানার অংশ হিসেবে পারিশ্রমিক দিতে হবে। যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র.) উক্ত মাসআলায় সাহেবাঈনের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেননি। তাই ভাগ বাটোয়ারার পারিশ্রমিককে কয়ালের পারিশ্রমিকের সাথে তুলনা করে দলিল হিসেবে পেশ করা গ্রহণযোগ্য না। যদি উক্ত পরিমাপ ভাগ বাটোয়ারার জন্য না হয়। বরং উহার পরিমাণ জানার জন্য হয়। তবে মালিকানার অংশ হিসেবে পারিশ্রমিকের হার হবে। যেমন– খালেদ এবং বেলাল দুইজনে মিলে একটি ধানের স্তুপ ক্রয় করল। একজনের উক্ত স্তুপের তিন ভাগে দুই ভাগ, আর অপরজনের তিন ভাগের এক ভাগ, ক্রয়কৃত উক্ত ধানের পরিমাণ জানার জন্য [ভাগ বাটোয়ারার জন্য নয়] ওজন করা হলে মালিকানার অংশের অনুপাতিক হারে পারিশ্রমিক দেবে। অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশের মালিক এক তৃতীয়াংশ মজুরি দেবে এবং দুই তৃতীয়াংশের মালিক দুই তৃতীয়াংশ মজুরি দেবে। কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামতকে সহীহ বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে لِاَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ هُوَ لِلتَّمْيِيْزِ لَا غَيْرُ কেননা সম্পাদিত চুক্তির বিষয় বস্তু হচ্ছে পৃথকিকরণ অন্যকিছু নয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْعُذْرُ الخ : কয়াল বা পরিমাপকের সাথে মাপার চুক্তি করার সময় যদি একথা উল্লেখ না করা হয় যে উক্ত পরিমাপ ভাগ বাটোয়ারার জন্যে? না কেবল সম্পূর্ণ মালের পরিমাপ জানার জন্যে? এ অবস্থায় শরিকগণ কি হারে পারিশ্রমিক দেবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এখানের পরিমাপের বেশ কমের পরিশ্রমের পার্থক্য রয়েছে। তাই অংশের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক দেবে। অর্থাৎ বেশি অংশের শরিক তার অংশ হিসেবে বেশি দেবে এবং কম অংশের শরিক তার অংশ হিসেবে কম দেবে।

قَوْلُهُ لَوْ اَطْلَقَ : একথাটির অপর একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। তা হচ্ছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের যে জবাব দেওয়া হয়েছে যে, ভাগ বাটোয়ারার জন্যে যদি ওজন করা হয় বা পাত্রে মাপা হয় তবে এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ তার মতে মাথাপিছু হারে পারিশ্রমিক দেবে। তবে যদি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে মুতলাকান জবাব দেওয়া হয়। অর্থাৎ উক্ত পরিমাপ ভাগ বাটোয়ারার জন্যে হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় পরিশ্রমের পার্থক্যের ওজর রয়েছে। তাই মালের ওজন করা বেশি কষ্টকর এবং অংশের ওজন করা কম কষ্টকর। এর পার্থক্য সুস্পষ্ট।

وَعَنْهُ أَنَّهُ عَلَى الطَّالِبِ دُوْنَ الْمُمْتَنِعِ لِنَفْعِهِ وَمَضَرَّةُ الْمُمْتَنِعِ . قَالَ : وَاِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ عِنْدَ الْقَاضِيْ وَفِيْ اَيْدِيْهِمْ دَارٌ وَ ضَيْعَةٌ وَادَّعَوْا اَنَّهُمْ وَرِثُوْهَا عَنْ فُلَانٍ لَمْ يَقْسِمْهَا الْقَاضِيْ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) حَتّٰى يُقِيْمُوا الْبَيِّنَةَ عَلٰى مَوْتِهِ وَعَدَدِ وَرَثَتِهِ وَقَالَ صَاحِبَاهُ يَقْسِمُهَا بِاعْتِرَافِهِمْ وَيَذْكُرُ فِيْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ اَنَّهُ قَسَمَهَا بِقَوْلِهِمْ وَاِنْ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ مَا سِوَى الْعَقَارِ وَادَّعَوْا اَنَّهُ مِيْرَاثٌ قَسَمَهُ فِيْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا وَلَوِ ادَّعَوْا فِي الْعَقَارِ اَنَّهُمُ اشْتَرَوْهُ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ . لَهُمَا اَنَّ الْيَدَ دَلِيْلُ الْمِلْكِ وَالْاِقْرَارُ اَمَارَةُ الصِّدْقِ وَلَا مُنَازِعَ لَهُمْ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ كَمَا فِي الْمَنْقُوْلِ الْمَوْرُوْثِ وَالْعَقَارِ الْمُشْتَرٰى وَهٰذَا لِاَنَّهُ لَا مُنْكِرَ وَلَا بَيِّنَةَ اِلَّا عَلَى الْمُنْكِرِ فَلَا يُفِيْدُ اِلَّا اَنَّهُ يَذْكُرُ فِيْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ اَنَّهُ قَسَمَهَا بِاِقْرَارِهِمْ لِيَقْتَصِرَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَتَعَدَّاهُمْ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে মজুরি দেওয়ার দায়িত্ব ভাগ বাটোয়ারার আবেদন কারীর উপর। যে ভাগ বাটোয়ারা করতে চায় না তার উপর [মজুরির দায়িত্ব] না। কারণ [এতে] আবেদনকারীর লাভ রয়েছে। এবং ভাগ বাটোয়ারা বিরোধীর ক্ষতি হয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শরিকগণ যখন বিচারকের কাছে হাজির হয় এবং তাদের দখলে আছে এমন বাড়ি বা জমি সম্পর্কে দাবি করে যে, তারা অমুকের কাছ থেকে ওয়ারিশ হিসেবে পেয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে এবং ওয়ারিশগণের সংখ্যা সম্পর্কে সাক্ষী প্রমাণ হাজির করা ছাড়া তা ভাগ করে দেবে না। এতদ সম্পর্কে সাহেবাইন বলেন, তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বিচারক তা ভাগ করে দেবে এবং ভাগ বাটোয়ারার দলিলে একথা উল্লেখ করে দেবে যে, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। যৌথ সম্পদ যদি অস্থাবর হয় এবং তা মিরাশের সম্পদ বলে দাবি করে, তবে সকলের [তিন ইমাম] মত অনুযায়ী বিচারক তা ভাগ করে দেবে। স্থাবর সম্পদ সম্পর্কে যদি দাবি করে যে, তারা তা ক্রয় করেছে তবে বিচারক তা তাদের মাঝে বণ্টন করে দেবে। সাহেবাঈন (র.)-এর দলিল হচ্ছে যে, দখল মালিকানার দলিল এবং স্বীকারোক্তি সত্যের আলামত বা নিদর্শন। তাছাড়া তাদের বিপক্ষে কেউ বাদী হয়নি। সুতরাং বিচারক তাদের মাঝে তা ভাগ করে দেবে। যেমন, ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পদ ও ক্রয়কৃত স্থাবর সম্পদ [ভাগ] করা হয়। কেননা তাদের বিপক্ষে কোনো বিবাদী নেই। এবং বিবাদী ছাড়া সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তাই সাক্ষ্য প্রমাণ [এ ক্ষেত্রে] অর্থহীন। তবে বিচারক বণ্টন নামায় বা প্রমাণ পত্রে তথা দলিল পত্রে একথা উল্লেখ করে দেবেন যে, উক্ত বণ্টন তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী করা হয়েছে। এতে করে উক্ত বণ্টন কেবল তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَنْهُ اَنَّهُ عَلَى الطَّالِبِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি রেওয়াতকে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ভাগ বাটোয়ারার মজুরি দেওয়ার চাহিদা পূরণ হচ্ছে। এটা তার জন্য লাভজনক। সুতরাং সে মজুরি দেবে। যে ভাগ বাটোয়ারা বিরোধী সে ভাগ বাটোয়ারার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই এর মজুরি সে দেবে না। একথা তখন প্রযোজ্য হবে যখন শরিকগণের একাংশ ভাগ বাটোয়ারার দাবি করে এবং অপর অংশ বিরোধিতা করে। যদি সকল শরিক ভাগ বাটোয়ারার দাবি করে তবে পূর্বে উল্লিখিত আলোচনা অনুযায়ী সকল শরিক ভাগ বাটোয়ারার ব্যয়ভার বহন করবে।

আর মজুরি দেওয়ার বিষয়ে সারকথা হচ্ছে যে, অধিক গ্রহণযোগ্য মত (اَصَحُّ) অনুযায়ী ইমামগণের ঐকমত্যে পাত্রে বা ওজনে মাপা হয় এমন জিনিসের ভাগ বাটোয়োরার মজুরি অংশের আনুপাতিক হারে দেবে। এ ছাড়া জমি বা অন্য কিছুর ভাগ বাটোয়ারার মজুরি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী শরিকগণের মাথাপিছু হারে দেবে ও ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত অনুযায়ী অংশের পরিমাণ হিসেবে দেবে।

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ الخ : উপরিউক্ত আলোচনায় তিনটি মাসআলার উল্লেখ করা হয়েছে।

১. শরিকগণ বিচারকের কাছে হাজির হয়ে স্থাবর সম্পদ সম্পর্কে দাবি করবে যে, অমুকের কাছ থেকে ওয়ারিশ হিসেবে আমরা এ সম্পদ পেয়েছি এবং বিচারকের কাছে উক্ত সম্পদের ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করবে।
২. অস্থাবর সম্পদ সম্পর্কে এ ধরনের দাবি করবে অর্থাৎ অস্থাবর সম্পদ মিরাশের সম্পদ বলে দাবি করবে এবং তা ভাগ করে দেওয়ার আবেদন করবে।
৩. স্থাবর সম্পদ সম্পর্কে ক্রয়সূত্রে মালিকানার দাবি করবে এবং তা ভাগ করে দেওয়ার দাবি করবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ে আমাদের তিন ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেন যে, সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই বিচারক ভাগ করে দেবেন। প্রথম বিষয়টিতে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ও ওয়ারিশগণ সংখ্যার সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে হবে। এ ছাড়া বিচারক তা ভাগ করে দেবে না। সাহেবাইন (র.)-এর মত অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই। শরিকগণের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বিচারক তা ভাগ করে দেবে। তবে বিচারক উক্ত ভাগ বাটোয়ারার দলিলে উল্লেখ করে দেবেন যে, উক্ত বণ্টন শরিকগণের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী করা হয়েছে। যেন কোনো শরিক বাদ পরলে উক্ত বণ্টনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

قَوْلُهُ لَهُمَا اَنَّ الْيَدَ دَلِيْلُ الْمِلْكِ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের সারাংশ হচ্ছে এই যে, জমির দখল শরিকদের জন্য জমির মালিকানার দলিল। শরিকগণের স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য উক্ত মালিকানার কথা সত্য হওয়ার আলামত। তাদের এ দাবির বিপক্ষে কোনো বিবাদী নেই। সুতরাং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসআলায় যেমন বিচারকের জন্য ভাগ বণ্টন করার বিধান রয়েছে। এমনিভাবে প্রথম মাসআলায় সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া বিচারক ভাগ বণ্টন করতে পারবে। তবে বণ্টন নামায় তথা বণ্টনের দলিল পত্রে একথা উল্লেখ করে দেবে যে, উক্ত ভাগবাটোয়ারা শরিকগণের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে করা হয়েছে। দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। যেন উক্ত ভাগ বণ্টন কেবল উপস্থিত শরিকগণের জন্য প্রযোজ্য হয়। ঘটনাক্রমে নতুন কোনো শরিক প্রমাণিত হলে তার জন্য যেন উক্ত বণ্টন নামা প্রযোজ্য হয় না।

উল্লেখ্য যে, ভাগ বাটোয়ারা দুই প্রকার। প্রথমত দলিল প্রমাণ ভিত্তিক ভাগ বাটোয়ারা। দ্বিতীয়ত স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ভাগ বাটোয়ারা প্রথম প্রকার ভাগ বাটোয়ারা অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর দ্বিতীয় প্রকার অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো মৃতব্যক্তি যদি উম্মে ওয়ালাদ [যে বাঁদির গর্ভে মালিকের সন্তান হয়েছে এবং উক্ত বাঁদি মালিকের মৃত্যুর পর আজাদ হয়ে যায়] বা মুদাব্বার গোলাম [যে গোলাম মালিকের মৃত্যুর পর আজাদ হয়ে যায়] রেখে যায় এবং উক্ত উম্মে ওয়ালাদ বা মুদাব্বার গোলাম যদি বিচারকের কাছে আবেদন করে যে, আমাদেরকে আজাদ বলে ফায়সালা দেওয়া হোক। বিচারক শরিকগণের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী উক্ত মৃতব্যক্তির যে মিরাশ বণ্টন করেছে এর উপর ভিত্তি করে উক্ত উম্মে ওয়ালাদ বা মুদাব্বার গোলামকে আজাদ বলে ফয়সালা দেবেন না। বরং উম্মে ওয়ালাদ বা মুদাব্বার গোলামকে তাদের মালিকের মৃত্যুর দলিল প্রমাণ পেশ করার পর তাদেরকে আজাদ বলে ফায়সালা দেবে। কেননা স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ভাগ বাটোয়ারার হুকুম তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। দলিল প্রমাণ অনুযায়ী ভাগ বাটোয়ারা হলে বিচারক উম্মে ওয়ালাদ বা মুদাব্বার গোলামকে তাদের মালিকের মৃত্যুর দলিল প্রমাণ পেশ করতে বলবেন না। বরং ভাগ বাটোয়ারার দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে তাদেরকে আজাদ করে দেবেন। কারণ দলিল প্রমাণ ভিত্তিক ভাগ বাটোয়ারার হুকুম অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

قَوْلُهُ لِيَقْتَصِرَ عَلَيْهِمْ وَلَايَتَعَدَّ هُمْ : মুসান্নিফ (র.) এ বাক্য দ্বারা একথা বুঝিয়েছেন যে, স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ভাগ বাটোয়ারার হুকুম কেবল ভাগ বাটোয়ারার প্রার্থী শরিকগণের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাদের ছাড়া অন্য কারো উপর উক্ত হুকুম প্রয়োগ করা যাবে না। এজন্য বিচারক বণ্টন নামায় একথা উল্লেখ করে দেবে যে, উক্ত বণ্টন উপস্থিত শরিকগণের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে করা হয়েছে। দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে করা হয় নি।

وَلَهُ اَنَّ الْقِسْمَةَ قَضَاءٌ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا التَّرِكَةُ مُبْقَاةٌ عَلَى مِلْكِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ حَتّٰى لَوْ حَدَثَتِ الزِّيَادَةُ تَنْفُذُ وَصَايَاهُ فِيْهَا وَيُقْضٰى دُيُوْنُهُ مِنْهَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَإِذَا كَانَ قَضَاءٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَالْإِقْرَارُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ. وَهُوَ مُفِيْدٌ لِأَنَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ يُنْتَصَبُ خَصْمًا عَنِ الْمُوَرِّثِ وَلَا يَمْتَنِعُ ذٰلِكَ بِإِقْرَارِهِ كَمَا فِى الْوَارِثِ أَوِ الْوَصِىِّ الْمُقِرِّ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مَعَ إِقْرَارِهِ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, উক্ত ভাগ বাটোয়ারা দ্বারা মৃত ব্যক্তির বিপক্ষে ফয়সালা দেওয়া হয়। কেননা পরিত্যক্ত সম্পদ ভাগ বণ্টনের পূর্বে মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকে। এমনকি যদি এতে কোনো ধরনের বর্ধন হয় তবুও। এ বর্ধিত অংশে তার [মৃত ব্যক্তি] অসিয়ত প্রয়োগ হবে। এ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। তবে ভাগ বণ্টনের পর এমন হবে না। যেহেতু এ [ভাগ বণ্টন] দ্বারা মৃত ব্যক্তির বিপক্ষে ফয়সালা করা হয়। সুতরাং স্বীকারোক্তি মৃত ব্যক্তির বিপক্ষে দলিল হিসেবে গণ্য হবে না; বরং প্রমাণ পেশ করতে হবে। এবং তা [প্রমাণ পেশ করা] অনর্থক না। কেননা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো একজন ওয়ারিশকে বিবাদী নির্ধারণ করা হবে। তার [ওয়ারিশের] স্বীকারোক্তির দরুন তা [বিবাদী হওয়া] অবৈধ হবে না। যেমন ওয়ারিশ বা ওসী [মৃত ব্যক্তির উপর] ঋণের কথা স্বীকার করে। তা সত্ত্যেও স্বীকারোক্তিসহ [মৃত ব্যক্তির করজ দাতার] বাইয়েনা বা প্রমাণ তার [ওয়ারিশ বা ওসী] বিপক্ষে কবুল করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُ اَنَّ الْقِسْمَةَ قَضَاءٌ عَلَى الْمَيِّتِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলের সারাংশ হচ্ছে, যেহেতু মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকে। সুতরাং উক্ত পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করাকে মৃত ব্যক্তির বিপক্ষে বিচারকের ফয়সালা বলে গণ্য করা হবে। তাই স্বীকারোক্তি যা পূর্ণাঙ্গ দলিল বলে ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন কিভাবে থাকে? এর উত্তরে বলা হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি কারো জন্য বাঁদির অসিয়ত করল। উক্ত অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করার পূর্বে অসিয়তকৃত বাঁদির গর্ভ থেকে কোনো সন্তান হলো। উল্লিখিত সুরতে মাসআলায় উক্ত সন্তানের ক্ষেত্রে অসিয়তের নিয়মানুযায়ী এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা যাবে। এতে প্রমাণিত হয় যে , পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের পূর্বে মৃতব্যক্তির মালিকানাধীন থাকে।

قَوْلُهُ وَهُوَ مُفِيْدٌ لَا اَنَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ الخ : সাহেবাইন (র.) এর দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত মাসআলায় বাইয়েনা বা প্রমাণ পেশ করা অনর্থক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হচ্ছে যে, উক্ত প্রমাণ পেশ করা অনর্থক না।

ওয়ারিশগণের একজনকে মৃতব্যক্তির নায়েব বা স্থলবর্তী নির্ধারণ করা হবে। তাদের মধ্য থেকে আরেক জনকে মৃত ব্যক্তির বিপক্ষ নির্ধারণ করা হবে। যেন বিচারক এর ভিত্তি ফয়সালা করতে পারে। যদি প্রশ্ন হয় যে, উভয় ওয়ারিশের স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও একজনকে মৃতব্যক্তি প্রতিপক্ষ বানানোর অর্থ কি? এর লাভ কি? এর উত্তরে বলা হবে যে, কোনো ব্যক্তি স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ হতে পারে। যেমন কোনো মৃত ব্যক্তির উপর কোনো ব্যক্তি করজের দাবি করল। মৃত ব্যক্তির ওসী বা ওয়ারিশ উক্ত করজের কথা স্বীকার করছে। তা সত্ত্বেও করজের দাবিদার ব্যক্তি করজ পাওনার স্বপক্ষে যদি দলিল প্রমাণ পেশ করতে চায় তবে বিচারক উক্ত দলিল প্রমাণ গ্রহণ করবেন। কেননা উক্ত মৃত ব্যক্তির এমন পাওনাদার থাকতে পারে, যা সুস্পষ্ট দলির দ্বারা প্রমাণিত। তাই উক্ত করজের দাবিদার চাইতে পারে যে, আমার পাওনা কেবল ওসী বা ওয়ারিশের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হলে চলবে না। যা অন্যান্য পাওনাদার বা ওয়ারিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তাই আমার পাওনার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করব। যেন আমার পাওনা করজ অন্য পাওনাদার ও সকল ওয়ারিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। বিচারক ওসী বা ওয়ারিশের স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও উক্ত করজের দাবিদারের দলিল প্রমাণ বা বাইয়েনা গ্রহণ করবে। তাই যেহেতু ওসী বা ওয়ারিশের স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও উক্ত মাসআলায় বাইয়েনা বা প্রমাণ গ্রহণ করা বিচারকের জন্য বৈধ। সুতরাং দুই ওয়ারিশের একই দাবি ও একই স্বীকারোক্তি হওয়া সত্ত্বেও একজনকে মৃত ব্যক্তির প্রতিপক্ষ বানানো যেতে পারে। প্রতিপক্ষ বানানো সঠিক হলে বাইয়েনা বা প্রমাণ পেশ করা অনর্থক হবে না। কেননা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই বাইয়েনা পেশ করা হয়।

بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ لِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ نَظْرًا لِلْحَاجَةِ إِلَى الْحِفْظِ أَمَّا الْعَقَارُ مُحَصَّنٌ بِنَفْسِهِ وَلِأَنَّ الْمَنْقُولَ مَضْمُونٌ عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي يَدِهِ وَلَا كَذَالِكَ الْعَقَارُ عِنْدَهُ وَبِخِلَافِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَا يَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يُقْسَمْ فَلَمْ تَكُنِ الْقِسْمَةُ قَضَاءً عَلَى الْغَيْرِ .

অনুবাদ : অস্থাবর সম্পদ এমন না। কেননা [এর] হেফাজতের জন্যে বণ্টনের প্রয়োজন আছে। স্থাবর সম্পদের জন্য পৃথক হেফাজতের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া স্থাবর সম্পদ যার হাতে থাকে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব তার থাকে। স্থাবর সম্পদ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এমন না। এবং ক্রয়কৃত সম্পদ এর চেয়ে ভিন্ন। কেননা বিক্রীত পণ্যে বিক্রেতার মালিকানা থাকে না। যদিও তা বণ্টন না করা হয়। সুতরাং [এর বণ্টন] অন্যের বিরুদ্ধে ফয়সালা বলে গণ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ لِأَنَّ الخ : পূর্বে উল্লিখিত তিন মাসআলার দলিল দিতে গিয়ে সাহেবাইন (র.) প্রথম মাসআলাটিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসআলার সাথে কিয়াস করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে, উক্ত কিয়াস সঠিক না। কেননা অস্থাবর সম্পদের হেফাজতের প্রয়োজন রয়েছে। পক্ষান্তরে স্থাবর সম্পদ এমন না। কারণ স্থাবর সম্পদ নিজেই সংরক্ষিত। তাই স্থাবর সম্পদের হেফাজতের প্রয়োজন হয় না। **দ্বিতীয়ত :** অস্থাবর সম্পদ যার হাতে থাকবে উক্ত সম্পদের জিম্মাদার সে নিজেই হবে। এতে মৃত ব্যক্তির কল্যাণ রয়েছে। অর্থাৎ তার সম্পদ বিনষ্ট হবে না। তবে জমি বা স্থাবর সম্পদ এমন না। অর্থাৎ যার দখলে থাকবে সে উক্ত সম্পদের জিম্মাদার হবে না। বরং যার মালিকানা সাব্যস্ত হবে সে উক্ত সম্পদের জিম্মাদার হবে। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, জমি বা স্থাবর সম্পদের ছিনতাই ধর্তব্য না। মোটকথা স্থাবর সম্পদকে অস্থাবর সম্পদের উপর কিয়াস করা সঠিক না। বিক্রীত পণ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিক্রেতা কোনো কিছু বিক্রি করে দিলে সে তার মালিক থাকে না। যদি বিক্রীত পণ্য ক্রেতাদের মাঝে বণ্টন করা নাও হয়। তবুও বিক্রেতা উক্ত বিক্রীত পণ্যের মালিক হবে না। সুতরাং বিচারক বিক্রীত পণ্যের বণ্টন করা দ্বারা অন্যের বিপক্ষে ফয়সালা করছে বলে গণ্য হবে না। প্রথম মাসআলায় মৃত ব্যক্তির স্থাবর সম্পদ বণ্টন করা দ্বারা মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফয়সালা করা বলে গণ্য হবে। সুতরাং স্থাবর সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা অর্থাৎ উপরিউক্ত প্রথম মাসআলাটিকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসআলার উপর কিয়াস করা সঠিক না।

قَالَ : وَاِنِ ادَّعَوا الْمِلْكَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا كَيْفَ انْتَقَلَ اِلَيْهِمْ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ . لِاَنَّهُ لَيْسَ فِى الْقِسْمَةِ قَضَاءٌ عَلَى الْغَيْرِ لِاَنَّهُمْ مَا اَقَرُّوْا بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِمْ قَالَ هٰذِهٖ رِوَايَةُ كِتَابِ الْقِسْمَةِ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ اَرْضٌ اِدَّعَاهَا رَجُلَانِ وَاَقَامَا الْبَيِّنَةَ اَنَّهَا فِىْ اَيْدِيْهِمَا وَاَرَادَا الْقِسْمَةَ لَمْ يَقْسِمْهَا حَتّٰى يُقِيْمَا الْبَيِّنَةَ اَنَّهَا لَهُمَا لِاِحْتِمَالِ اَنْ تَكُوْنَ لِغَيْرِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি তারা মালিকানার দাবি করে এবং একথা বর্ণনা না করে যে, [উক্ত সম্পদ] তাদের মালিকানায় কিভাবে হস্তান্তর হয়েছে। তবে বিচারক তাদের মাঝে ভাগ বণ্টন করে দেবে। কেননা উক্ত ভাগ বাটোয়ার কারো বিপক্ষে ফয়সালা না। কারণ তারা অন্যের মালিকানার কথা স্বীকার করেনি। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটি মাবসূত এর كِتَابُ الْقِسْمَةِ বা ভাগ বাটোয়ারা অধ্যায়-এর বর্ণনা। এবং জামে সাগীরে বলা হয়েছে, কোনো জমির ব্যাপারে যদি দুই ব্যক্তি [মালিকানার] দাবি করে এবং প্রমাণ পেশ করে যে, তা [উক্ত জমি] তাদের দখলে আছে এবং তারা [বিচারকের কাছে] বণ্টন করার আবেদন করে। তবে [বিচারক] তাদের মালিকানার প্রমাণ পেশ করা ছাড়া ভাগ করে দেবেন না। কেননা হতে পারে উক্ত জমি তাদের দুইজনের না। অন্য কারো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি শরিকগণ কিচারকের কাছে কেবল ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করে এবং একথা বর্ণনা না করে যে, কিভাবে তারা উক্ত জমির মালিকানা লাভ করেছে। তবে বিচারক শরিকগণের মাঝে তা বণ্টন করে দেবে। উল্লিখিত মাসআলায় শরিকগণ পূর্ববর্তী মালিকানার কথা উল্লেখ না করায় বিচারকের উক্ত ফয়সালা কারো বিপক্ষে হবে না। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ রেওয়ায়েতটি ইমাম কুদূরী (র.) রচিত মাবসূত এর কিতাবুল কিসমত থেকে উল্লেখ করেছেন। জামেউস সগীরের রেওয়ায়েত যেহেতু বাইয়েনা বা প্রমাণ পেশ করার কথা বলা হয়েছে এবং এটা ব্যতীত বণ্টন করাকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) জামে সগীরের রেওয়ায়েতকে উল্লেখ করে বলেন –

قَوْلُهُ قَالَ وَاِنِ ادَّعَوا الْمِلْكَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا الخ : জামে' সগীরের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, উক্ত দুই ব্যক্তির মালিকানার প্রমাণ পেশ করতে হবে। কেননা উক্ত জমি যদি মিরাশের সম্পদ হয় তবে অন্যের মালিকানা বলে গণ্য হবে। তাই সতর্কতামূলক ভাবে বাইয়েনা বা প্রমাণ পেশ করা ছাড়া বিচারক তা ভাগ করে দেবেন না। এরপর মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত মতামত কোন ইমামের? তিনি বলেন,

ثُمَّ قِيْلَ هُوَ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ خَاصَّةً وَقِيْلَ هُوَ قَوْلُ الْكُلِّ وَهُوَ الْاَصَحُّ لِاَنَّ قِسْمَةَ الْحِفْظِ فِى الْعَقَارِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ اِلَيْهِ وَقِسْمَةَ الْمِلْكِ تَفْتَقِرُ اِلٰى قِيَامِهٖ وَلَا مِلْكَ فَامْتَنَعَ الْجَوَازُ .

অনুবাদ : কেউ বলেন এটি একক ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামত। আবার কেউ বলেন, এটি সকলের [তিন ইমামের] ঐকমত্য। এবং এ বক্তব্য [দ্বিতীয়টি] অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা স্থাবর সম্পদের হেফাজতের জন্য বণ্টনের প্রয়োজন নেই। মালিকানার বণ্টনের জন্যে মালিকানা প্রমাণিত হতে হয় এবং [বাইয়্যেনা বা প্রমাণ ছাড়া] মালিকানার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং [স্থাবর সম্পদ বণ্টনের] বৈধতা হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ قِيْلَ هُوَ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ خَاصَّةً الخ : জামেউস সগীরে উল্লিখিত মাসআলাকে এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একক মতামত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর বর্ণনায় তিন ইমামের ঐকমত্য বলে উল্লেখ হয়েছে। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.)দ্বিতীয় বর্ণনাকে অধিক নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি এর দলিল বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত মাসআলায় বাইয়েনা বা প্রমাণ পেশ করতে হবে কেন?

বিষয়টি বুঝার জন্য প্রথমে জানা প্রয়োজন যে, কিসমত বা ভাগ বাটোয়ারা দুই প্রকার।

১. সম্পদের হেফাজতের জন্য ভাগ করা। উক্ত ভাগ বাটোয়ারাকে কিসমতুল হিফজ বলে।

২. এ জন্য ভাগ বাটোয়ারা করা যেন প্রত্যেক মালিক তার অংশে পৃথকভাবে পূর্ণ কতৃত্ব লাভ করতে পারে এবং এতে অন্য কারো অধিকার না থাকে। উক্ত ভাগ বাটোয়ারাকে কিসমতুল মিল্‌ক বলা হয়। উক্ত মাসআলায় জমি বা স্থাবর সম্পদের ভাগ বাটোয়ারাকে যদি কিসমতুল হিফজ ধরা হয় তবে তা সঠিক হবে না। কারণ জমি বা স্থাবর সম্পদ সংরক্ষিত। এর জন্য পৃথক হেফাজতের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এর জন্য কিসমতুল হিফজের কোনো প্রয়োজন নেই। যদি কিসমতুল মিল্‌ক ধরা হয়। তবে মালিকানা প্রমাণিত হতে হবে। উল্লিখিত মাসআলায় মালিকানা প্রমাণিত হয়নি। তাই কিসমত বা ভাগ বাটোয়ারা করা বৈধ হবে না।

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ هُوَ قَوْلُ الْكُلِّ وَهُوَ الْاَصَحُّ الخ : জামেউস সগীরের দ্বিতীয় কওল বা বক্তব্য অনুযায়ী উক্ত মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.) ঐকমত্য পোষণ করেছেন। পূর্বে উল্লিখিত মাবসূতের কিতাবুল কিসমতের মাসআলার সাথে উক্ত মাসআলার বাহ্যিক ইখতেলাফ আছে বলে মনে হয়। তবে তা সূরতে মাসআলা ভিন্ন হওয়ার কারণে হয়েছে। কিতাবুল কিসমতে বলা হয়েছে যে, দুই ব্যক্তি কোনো জমি বা স্থাবর সম্পদের মালিকানা দাবি করেছে। জামে' সগীরে বলা হয়েছে যে, দুই ব্যক্তি কোনো জমি দখলের দাবি করে। সুতরাং উভয় মাসআলার বর্ণনায় ভিন্নতা রয়েছে। কিতাবুল কিসমতের মাসআলায় বিচারকের কাছে শুরুতেই উক্ত জমির মালিকানা দাবি করা হয়েছে এবং উক্ত জমি তাদের দখলে আছে। যদি অন্য কোনো দাবিদার না থাকে তবে দখলদারের কথা গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা সম্পদ মালিকের বলে গণ্য করা যেতে পারে এবং ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। জামেউস সগীরে উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী যদি দখলের দাবি করে এবং মালিকানা সম্পর্কে কোনো কিছু না বলে। তবে বিচারক মালিকানার প্রমাণ পেশ করা ছাড়া তা ভাগ করে দেবে না। কেননা তারা বিচারকের কাছে স্থাবর সম্পদ ভাগ বাটোয়ারা করে দেওয়ার আবেদন করেছে এবং উক্ত স্থাবর সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে কিছু না বলে কেবল তাদের দখলের কথা বলেছে যা দ্বারা একথা বুঝা যায় যে , মালিকানা তাদের না। এতে করে মালিকানা তাদের না হওয়ার সন্দেহ আরো বেশি হয়। সুতরাং মালিকানার প্রমাণ ছাড়া বিচারক তাদের ভাগ বাটোয়ারার আবেদন গ্রহণ করবেন না। মুসান্নিফ (র.) উক্ত মত বা কওলকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে প্রাধান্য দিয়েছেন।

قَالَ : وَإِذَا حَضَرَ وَارِثَانِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَفَاةِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ اَلدَّارُ فِى أَيْدِيْهِمْ وَمَعَهُمْ وَارِثٌ غَائِبٌ قَسَمَهَا الْقَاضِىْ بِطَلَبِ الْحَاضِرِيْنَ وَيَنْصُبُ وَكِيْلًا يَقْبِضُ نَصِيْبَ الْغَائِبِ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْغَائِبِ صَبِيٌّ يَقْسِمُ وَيَنْصُبُ وَصِيًّا يَقْبِضُ نَصِيْبَهُ لِأَنَّ فِيْهِ نَظْرًا لِلْغَائِبِ وَالصَّغِيْرِ وَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِىْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ عِنْدَهُ أَيْضًا خِلَافًا لَهُمَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী বলেন, যখন দুইজন ওয়ারিশ [বিচারকের কাছে] হাজির হয়ে মৃত ওয়ারিশের সংখ্যা সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করে এবং [ওয়ারাসাতের] বাড়ি তাদের দখলে থাকে তবে বিচারক উপস্থিত [ওয়ারিশ] অংশীদারদের আবেদনের ভিত্তিতে তা [বাড়ি] বণ্টন করে দিবে এবং তিনি একজন উকিল নিযুক্ত করবেন। যিনি অনুপস্থিত ওয়ারিশের অংশ গ্রহণ করবেন। এমনিভাবে যদি অনুপস্থিত ওয়ারিশের স্থলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশ হয় তবে [বিচারক] বণ্টন করে দেবে এবং তিনি [অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য] একজন ওসী নির্ধারণ করবেন। যিনি [ওসী] তার [অপ্রাপ্ত বয়স্ক] অংশ গ্রহণ করবেন। কেননা এতে অনুপস্থিত ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের প্রতি কল্যাণের দৃষ্টি রাখা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট উক্ত সুরতে মাসআলায় দলিল প্রমাণ পেশ করা জরুরি। তবে সাহেবাইনের নিকট এমন না। যেমন এর পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا حَضَرَ الْوَارِثَانِ الخ : বিচারকের কাছে যদি দুইজন ওয়ারিশ হাজির হয়ে একটি বাড়ি সম্পর্কে ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করে এবং যার কাছ থেকে তারা ওয়ারিশ পেয়েছে তার মৃত্যু সম্পর্কে এবং ওয়ারিশের সংখ্যা কতজন ইত্যাদি সম্পর্কে তারা বিচারকের কাছে দলিল প্রমাণ পেশ করে এবং উক্ত বাড়ি যদি তাদের দখলে থাকে। সেই সাথে যদি একজন ওয়ারিশ অনুপস্থিত থাকে। তবে বিচারক উপস্থিত ওয়ারিশগণের আবেদনের ভিত্তিতে তা বণ্টন করে দেবে। অনুপস্থিত ওয়ারিশের প্রাপ্ত অংশ গ্রহণ করার জন্য বিচারক একজন উকিল নিযুক্ত করবেন। অনুরূপভাবে যদি একজন ওয়ারিশ অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশের প্রাপ্ত অংশ গ্রহণ করার জন্য একজন ওসী নির্ধারণ করবেন। এতে করে অনুপস্থিত ওয়ারিশ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশের প্রাপ্য অংশ সংরক্ষিত হয়। এ কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে বিচারক উকিল ও ওসী নির্ধারণ করবেন।

قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الخ : পূর্বে উল্লিখিত মাসআলায় যেমন বলা হয়েছে যে, বাড়ি বা জমি সম্পর্কে ওয়ারাসাতের দাবি করে যদি বিচারকের নিকট ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করা হয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মৃত এবং ওয়ারিশগণের সংখ্যার দলিল প্রমাণ পেশ করা জরুরি। তবে সাহেবাইনের মতে দলিল প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন নেই; বরং তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বণ্টন করে দেবে।

وَلَوْ كَانُوْا مُشْتَرِيَيْنِ لَمْ يَقْسِمْ مَعَ غَيْبَةِ اَحَدِهِمْ وَالْفَرْقُ اَنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مِلْكُ خِلَافَةٍ حَتّٰى يَرُدَّ بِالْعَيْبِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فِيْمَا اشْتَرَاهُ الْمُوْرِثُ اَوْ بَاعَ وَيَصِيْرُ مَغْرُوْرًا بِشِرَاءِ الْمُوْرِثِ فَانْتَصِبَ اَحَدُهُمَا خَصْمًا عَنِ الْمَيِّتِ فِيْمَا فِيْ يَدِهٖ وَالْاٰخَرُ عَنْ نَفْسِهٖ فَصَارَتِ الْقِسْمَةُ قَضَاءً بِحَضْرَةِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ اَمَّا الْمِلْكُ الثَّابِتُ بِالشِّرَاءِ مِلْكٌ مُبْتَدَءٌ وَلِهٰذَا لَا يَرُدُّ بِالْعَيْبِ عَلٰى بَائِعِ بَائِعِهٖ فَلَا يَصْلُحُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنِ الْغَائِبِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ ـ

অনুবাদ : আর যদি তারা [ওয়ারিশ না হয় বরং] মুশতারী বা ক্রেতা হয় তবে বিচারক তাদের মধ্যে যে কোনো একজন ক্রেতা অনুপস্থিত থাকলে বণ্টন করে দেবে না। [দুই মালিকানার মাঝে] পার্থক্য হচ্ছে যে, ওয়ারাসাতের মালিকানা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত। এমনকি [মুরিসের ক্রয়কৃত পণ্য দোষী হওয়ার কারণে] তা ফেরত দিতে পারবে এবং [মুরিসের বিক্রীত পণ্য দোষী হওয়ার কারণে] তাকে [ওয়ারিশ] তা ফেরত দেওয়া যাবে। মুরিস যা ক্রয় করেছিল বা বিক্রি করেছিল [সেগুলো]। মুরিসের [ধোকার] ক্রয়ের দ্বারা ধোকায় পরবে। সুতরাং [ওয়ারাসাতের মালের] একজন ওয়ারিশকে মৃত ব্যক্তির পক্ষ এবং অপরজনকে নিজের পক্ষ নির্ধারণ করা যায়। এতে করে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে [বণ্টনের] ফয়সালা হয়। তবে ক্রয়সূত্রে মালিকানা [পূর্ব সম্পর্কহীন] নতুন মালিকানা। এ কারণে ক্রেতা পণ্যের দোষের কারণে তার বিক্রেতার কাছে [দোষী পণ্য] ফেরত দিতে পারে না। সুতরাং [উক্ত মাসআলায়] উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বাদী হতে পারে না। সুতরাং [এ আলোচনা দ্বারা দুই মালিকানার] পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ كَانُوْا مُشْتَرِيَيْنِ لَمْ الخ : পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছে যে, দুইজন ওয়ারিশ যদি বিচারকের কাছে ওয়ারিশের সম্পদ ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করে এবং তৃতীয় একজন ওয়ারিশ অনুপস্থিত থাকে। তবে বিচারক একজন ওয়ারিশ অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় উক্ত সম্পদ বণ্টন করে দেবে। এর পর আলোচনা করেছেন যে, তবে ভাগ বাটোয়ারার আবেদনকারীগণ যদি ওয়ারাসাত সূত্রে মালিক না হয়ে ক্রয়সূতে মালিক হন। অর্থাৎ ওয়ারিশ না হয়ে ক্রেতা হন। তবে বিচারক যে কোনো একজন ক্রেতা অনুপস্থিত থাকলে তা বণ্টন করে দেবেন না। যদিও উপস্থিত ক্রেতাগণ ক্রয় করা সম্পর্কে দলিল প্রমাণ পেশ করে, তা সত্ত্বেও কোনো একজন ক্রেতা অনুপস্থিত থাকলে বিচারক বা বণ্টন করে দেবেন না। উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্বের মাসআলায় অর্থাৎ ওয়ারিশের মাসআলায় একজন ওয়ারিশ অনুপস্থিত থাকলেও বিচাকর বণ্টন করে দেবেন বলে বলা হয়েছে। কারণ ওয়ারাসাতের মালিকানা হচ্ছে মিলকে খেলাফত। এতে একজন ওয়ারিশকে মুরিস বা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং ওয়ারাসাতের সম্পদের বিষয়ে একজন ওয়ারিশকে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বাদী নির্ধারণ করে অপর ওয়ারিশকে তার নিজের পক্ষ থেকে বিবাদী নির্ধারণ করা হবে। সুতরাং উক্ত মাসআলায় বিচারক উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে বণ্টন করেছেন বলে গণ্য হবে। ক্রয়সূত্রে মালিকানার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো সুযোগ নেই।

কেননা বিক্রেতার সাথে ক্রয়কৃত সম্পদের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং সে বিচারকের সামনে কোনো পক্ষ হতে পারে না এবং উপস্থিত ক্রেতা অনুপস্থিত ক্রেতার প্রতিনিধিত্ব করার কোনো যোগসূত্র নেই। এমতাবস্থায় বিচারক যদি একজন ক্রেতার অনুপস্থিতিতে বণ্টনের ফয়সালা করেন। তবে তা হবে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফয়সালা। যা বৈধ না। ওয়ারাসাতের মাসআলা এমন না। বরং সেই মাসআলায় উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে বণ্টনের ফয়সালা করা হয়।

ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি হতে পারে:

একথা সুস্পষ্ট যে, ওয়ারিশের মালিকানা খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে হয়। আর সপক্ষে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়ে গেছে। যেমন কোনো ব্যক্তি একটি জিনিস ক্রয় করার পর মারা গেল। অতঃপর উক্ত মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ [ক্রয়কৃত] জিনিসটিতে কোনো ত্রুটি পেল এ ত্রুটির কারণে ওয়ারিশ বিক্রেতার কাছে জিনিসটি ফেরত দিতে পারবে। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি একটি পণ্য বিক্রি করে মারা গেল। তার মৃত্যুর পর ক্রেতা উক্ত পণ্যে দোষ দেখতে পেল। উক্ত ক্রেতা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশের কাছে দোষী পণ্য ফেরত দিতে পারবে। ঠিক এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি একটি বাঁদি ক্রয় করার পর মারা যায় এবং তার ওয়ারিশ উক্ত বাঁদিকে উম্মে ওয়ালাদ বানায়। অর্থাৎ উক্ত বাঁদির গর্ভে উক্ত ওয়ারিশের সন্তান জন্ম হয়। এরপর যদি কেউ উক্ত বাঁদির মালিকানা দাবি করে। তাহলে উক্ত সন্তান আজাদ হবে ঠিক। তবে ওয়ারিশ উক্ত মালিককে সন্তানের মূল্য দিবে এবং ওয়ারিশ বাঁদি বিক্রেতার কাছ থেকে বাঁদির মূল্য ফেরত নিবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকলে যা করতে হতো ওয়ারিশ তাই করবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ওয়ারাসাত মিলকে খেলাফত।

সুতরাং ওয়ারাসাত বিষয়ক মাসআলায় ওয়ারিশগণের দখলে যে সম্পদ আছে এ সম্পর্কে একজন ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির খলিফা হবে এবং অপর একজন ওয়ারিশ নিজের পক্ষ অবলম্বন করবে। এতে করে উভয় পক্ষের উপস্থিতি পাওয়া যায় এবং উক্ত বণ্টনের ফয়সালা অনুপস্থিত ওয়ারিশের বিরুদ্ধে হয় না। ক্রয়কৃত সম্পদের মাসআলা এমন না। কেননা ক্রয়ে মিলকে খেলাফত হয় না; বরং ক্রয়সূত্রে মালিকানা হচ্ছে পূর্ব সম্পর্কহীন নতুন মালিকানা। এ জন্য কোনো পণ্যের ক্রেতা সঙ্গত কারণে তার বিক্রেতার কাছে ফেরত দিতে পারে না। সুতরাং দুটি মাসআলায় পার্থক্য রয়েছে।

وَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ فِي يَدِ الْوَارِثِ الْغَائِبِ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ لَمْ يَقْسِمْ وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي يَدِ مُوْدَعِهِ وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي يَدِ الصَّغِيْرِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ وَالصَّغِيْرِ بِاسْتِحْقَاقِ يَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ حَاضِرٍ عَنْهُمَا وَأَمِيْنُ الْخَصْمِ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْهُ فِيْمَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ وَالْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ لَا يَجُوْزُ وَلَا فَرْقَ فِي هٰذَا الْفَصْلِ بَيْنَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَعَدَمِهَا هُوَ الصَّحِيْحُ كَمَا أُطْلِقَ فِي الْكِتَابِ.

অনুবাদ : যদি স্থাবর সম্পদ বা এর কিছু অংশ অনুপস্থিত ওয়ারিশের দখলে থাকে। তবে বিচারক তা বণ্টন করবেন না। অনুরূপভাবে যদি [উক্ত সম্পদ] তার [অনুপস্থিত ওয়ারিশ] আমানতদারের কাছে থাকে। এমনিভাবে যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশদের দখলে থাকে। কেননা উক্ত কিসমত [বন্টন] দ্বারা অনুপস্থিত ওয়ারিশ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়া তাদের দখলি সম্পদের উপর [বিচারকের] ফয়সালা করা হবে। প্রতিপক্ষের আমানতদার এমন বিষয়ে প্রতিপক্ষের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না যাতে প্রতিপক্ষের উপর দায়দায়িত্ব বর্তায়। প্রতিপক্ষের উপস্থিতি ছাড়া [বিচারকের] ফয়সালা করা জায়েজ নেই। উক্ত মাসআলায় দলিল প্রমাণ পেশ করা আর না করার মাঝে সহীহ মত অনুযায়ী কোনো পার্থক্য নেই। যেমন কিতাবে [জামে' সাগীর] বিষয় মুতলাক ভাবে বলা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ الخ : এই মাসআলা পূর্বে উল্লিখিত মাসআলা যথা "স্থাবর সম্পদ যদি উপস্থিত ওয়ারিশদের দখলে থাকে তবে বিচারক তা বণ্টন করে দেবেন" এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত। পূর্বের মাসআলার উপসংহারে মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে উক্ত স্থাবর সম্পদ যদি অনুপস্থিত ওয়ারিশের দখলে থাকে। চায় তা সম্পূর্ণ সম্পদ হোক বা সম্পদের কিছু অংশ হোক। অথবা যদি উক্ত অনুপস্থিত ওয়ারিশের আমানদারের দখলে থাকে। অথবা যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশের দখলে থাকে। উল্লিখিত তিন অবস্থাতেই বিচারক তা বণ্টন করে দেবেন না। এ মর্মে দলিল প্রমাণ পেশ করা হোক বা না করা হোক। কেননা উক্ত মাসআলায় অনুপস্থিত ওয়ারিশ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশ সম্পদের দখলদার এবং তাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধি বা উকিল নেই। এমতাবস্থায় যদি উক্ত সম্পদ বন্টন করা হয়। তবে তা প্রতিপক্ষের কোনো ধরনের প্রতিনিধি ছাড়াই বণ্টন করা হবে। যার ফলে উক্ত বণ্টনের ফয়সালা অনুপস্থিত ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিরুদ্ধে হবে এবং তা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ أَمِيْنُ الْخَصْمِ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْهُ الخ : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সম্পদ যদি অনুপস্থিত বা অপ্রাপ্ত বয়স্কের দখলে থাকে তাহলে কিতাবে উল্লিখিত দলিল যুক্তিযুক্ত। তবে যদি কোনো আমানতদারের কাছে উক্ত সম্পদ গচ্ছিত রাখে। তাহলে উক্ত দলিল যুক্তিযুক্ত না। কারণ উক্ত আমানতদার অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হতে পারবে। এ প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে যে, আমানতদার গচ্ছিত সম্পদের হেফাজতের দায়িত্বশীল। কেউ যদি গচ্ছিত সম্পদের দাবি করে তবে সে এ বিষয়ে অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতিনিধি হতে পারবে না। কেননা তার কাছে সম্পদ আমানত রাখা হয়েছে এর হেফাজতের জন্য। অনুপস্থিত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়ে গচ্ছিত সম্পদে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয়।

قَالَ : وَاِنْ حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ لَمْ يَقْسِمْ وَاِنْ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِاَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُضُوْرِ خَصْمَيْنِ لِاَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ مُخَاصِمًا وَمُخَاصَمًا وَكَذَا مُقَاسِمًا وَمُقَاسَمًا بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ الْحَاضِرُ اِثْنَيْنِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا ـ وَلَوْ كَانَ الْحَاضِرُ صَغِيْرًا وَكَبِيْرًا نَصَبَ الْقَاضِيْ عَنِ الصَّغِيْرِ وَصِيًّا وَقَسَمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الْبَيِّنَةُ وَكَذَا اِذَا حَضَرَ وَارِثٌ كَبِيْرٌ وَمُوْصٰى لَهُ بِالثُّلُثِ فِيْهَا فَطَلَبَا الْقِسْمَةَ وَاَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِيْرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ يَقْسِمُهُ لِاجْتِمَاعِ الْخَصْمَيْنِ الْكَبِيْرِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْمُوْصٰى لَهُ عَنْ نَفْسِهٖ وَكَذَا لِلْوَصِيِّ عَنِ الصَّبِيِّ كَاَنَّهُ حَضَرَ بِنَفْسِهٖ بَعْدَ الْبُلُوْغِ لِقِيَامِهٖ مَقَامَهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি একজন ওয়ারিশ উপস্থিত হয়। তবে বিচারক বণ্টন করবেন না। যদিও দলিল প্রমাণ পেশ করে। কেননা [বণ্টনে] দুই পক্ষের উপস্থিতি জরুরি। কেননা একই ব্যক্তি বাদী, বিবাদী [মুকাসিমও মুকাসাম] হতে পারে না। এমনিভাবে [একই ব্যক্তি] বণ্টন প্রদানকারী ও বণ্টন গ্রহণকারী [মুকাসিম ও মুকাসাম] হতে পারে না। তবে দুইজন উপস্থিত হলে এমন হবে না। যেমন [পূর্বে বিস্তারিত ভাবে] বর্ণনা করেছি। যদি [বিচারকের কাছে] একজন প্রাপ্ত বয়স্ক এবং একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক উপস্থিত হয়। তাহলে বিচারক অপ্রাপ্ত বয়স্কের তরফ থেকে একজন অছি নিযুক্ত করবেন এবং দলিল প্রমাণ পেশ করা হলে তিনি তা বণ্টন করে দেবেন। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশ এবং যার জন্য [মৃতব্যক্তির সম্পদ থেকে] এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অসিয়ত করা হয়েছে এমন ব্যক্তি [বিচারকের কাছে] উপস্থিত হয়, এবং ওয়ারাসাতের ও অসিয়তের দলিল প্রমাণ পেশ করে। তবে দুইপক্ষ পাওয়া যাওয়ায় বিচারক তা বণ্টন করে দেবেন। প্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির পক্ষ [বলে গণ্য হবে] এবং যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সে নিজের পক্ষ [বলে গণ্য হবে]। অনুরূপ ভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষ থেকে অছি। [অছির উপিস্থিতি] যেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালেগ হওয়ার পর নিজে উপস্থিত হলো। কেননা সে তার স্থলাভিষিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَاِنْ حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ الخ : যদি একজন ওয়ারিশ বিচারকের কাছে উপস্থিত হয়। তবে দলিল প্রমাণ পেশ করা সত্ত্বেও বিচারক তা বণ্টন করে দেবেন না। জমি তার দখলে থাকুক বা অন্যের দখলে থাকুক। কেননা ফয়সালা দেওয়ার জন্য দুইপক্ষ উপস্থিত থাকা জরুরি। একজন ওয়ারিশ উপস্থিত হলে সে বাদীও হবে আবার বিবাদীও হবে এবং বণ্টনের দাতা এবং গ্রহীতা হবে এটা হতে পারে না।

قَوْلُهُ عَلٰى مَا بَيَّنَّا : একথা বলে মুসান্নিফ (র.) পূর্বের আলোচনা "وَاِذَا حَضَرَ وَارِثَانِ وَاَقَامَا الْبَيِّنَةَ"-এর প্রতি ইশারা করেছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَاضِرُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا الخ : যদি এমন হয় যে, দুইজন ওয়ারিশ বিচারকের কাছে হাজির হয়েছে। তবে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং অপরজন প্রাপ্ত বয়স্ক। অথবা একজন প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশ এবং অপরজন এমন ব্যক্তি যার জন্য মৃত ব্যক্তি সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করে গিয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দলিল প্রমাণ পেশ করলে বিচারক তাদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দেবেন। তবে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে বিচারক অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষ থেকে একজন অছি বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করবেন। এতে করে বিচারকের ফয়সালায় উভয় পক্ষের উপস্থিতি পাওয়া যাবে। কারণ বাদী বিবাদীর উপস্থিতি ছাড়া বিচারকের ফয়সালা করা যাবে না।

قَوْلُهُ اَلْكَبِيْرِ عَنِ الْمَيِّتِ الْمُوْصٰى لَهُ عَنْ نَفْسِهِ الخ : খসমাইন বা বাদী বিবাদী নির্ধারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রথম সুরতে মাসআলায় প্রাপ্ত বয়স্ক মৃত ব্যক্তির পক্ষ হবে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কের অছি বা তত্ত্বাবধায়ক অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষ হবে। দ্বিতীয় সুরতে মাসআলায় প্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হবে এবং যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সে নিজের পক্ষ হবে। এভাবে দুইপক্ষ নির্ধারণ করা হবে।

قَوْلُهُ كَاَنَّهُ حَضَرَ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُلُوْغِ الخ : যেহেতু অছি বা তত্ত্বাবধায়ক অপ্রাপ্ত বয়স্কের স্থলাভিষিক্ত তাই অছির উপস্থিতিকে বলা হয়েছে। এ যেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালেগ হওয়ার পর সে নিজেই উপস্থিত হয়েছে।

فَصْلٌ فِيْمَا يُقْسَمُ وَمَا لَا يُقْسَمُ

অনুচ্ছেদ : যেসব সম্পদ ভাগ বাটোয়ারা করা যায় এবং যেসব সম্পদ ভাগ বাটোয়ারা করা যায় না।

قَالَ : وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِنَصِيْبِهِ قَسَمَ بِطَلَبِ اَحَدِهِمْ لِاَنَّ الْقِسْمَةَ حَقٌّ لَازِمٌ فِيْمَا يَحْتَمِلُهَا عِنْدَ طَلَبِ اَحَدِهِمْ عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ . وَاِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ اَحَدُهُمْ وَيَسْتَضِرُّ بِهِ الْاٰخَرُ لِقِلَّةِ نَصِيْبِهِ فَاِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثِيْرِ قَسَمَ وَاِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْقَلِيْلِ لَمْ يَقْسِمْ لِاَنَّ الْاَوَّلَ مُنْتَفِعٌ بِهِ فَاعْتُبِرَ طَلَبُهُ وَالثَّانِيْ مُتَعَنِّتٌ فِيْ طَلَبِهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ عَلٰى قَلْبِ هٰذَا لِاَنَّ صَاحِبَ الْكَثِيْرِ يُرِيْدُ الْاِضْرَارَ بِغَيْرِهِ وَالْاٰخَرُ يَرْضٰى بِضَرَرِ نَفْسِهِ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيْدُ فِيْ مُخْتَصَرِهِ اَنَّ اَيَّهُمَا طَلَبَ الْقِسْمَةَ يَقْسِمُ الْقَاضِيْ وَالْوَجْهُ اِنْدَرَجَ فِيْمَا ذَكَرْنَاهُ وَالْاَصَحُّ الْمَذْكُوْرُ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ الْاَوَّلُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [ভাগ করার পর] প্রত্যেক শরিকের প্রাপ্ত অংশ যদি ব্যবহারযোগ্য থাকে। তবে বিচারক যে কোনো একজন শরিকের আবেদনের ভিত্তিতে ভাগ করে দেবে। [অন্য কোনো শরিক অসম্মতি প্রকাশ করা সত্ত্বেও]। কেননা যে সব জিনিসে ভাগ বাটোয়ারার সুযোগ আছে কোনো শরিক [এর ভাগ বাটোয়ারার] আবেদন করলে আমাদের পূর্বের আলোচনা হিসেবে তা অপরিহার্য অধিকার [তা ভাগ করে দেবে]। যদি একজন শরিকের অংশ ব্যবহার উপযোগী হয় এবং অপর জনের অংশ ছোট হওয়ার কারণে ক্ষতি গ্রস্থ [ব্যবহারের অনুপযোগী] হয়। তবে বেশি অংশের শরিক যদি আবেদন করে তবে বিচারক তা ভাগ করে দেবে। যদি কম অংশের শরিক আবেদন করে তবে বিচারক ভাগ করে দেবেন না। কেননা প্রথম শরিকের অংশ ব্যবহার উপযোগী তাই তার আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে এবং দ্বিতীয় শরিক তার আবেদন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই তার আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। জাস্সাস (র.) এই মতের বিপরীত বলেছেন। কেননা বেশি অংশের শরিক [বণ্টনের দ্বারা] অন্যের ক্ষতি করতে চায় এবং অপর শরিক তার নিজের ক্ষতি মেনে নেয়। হাকেম শহীদ (র.) তার মুখতাসার কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, দুই শরিকের যে কেউ আবেদন করলে বিচারক বণ্টন করে দেবেন। পূর্বে যে আলোচনা করেছি তাতেই এর দলিল রয়েছে। অধিক গ্রহণযোগ্য সেটাই যা কিতাবে [কুদূরীতে] উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে প্রথম অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভাগ বটোয়ারার মাসআলাসমূহ দুই ধরনের। কিছু এমন যা ভাগ বাটোয়ারার যোগ্য এবং কিছু ভাগবাটোয়ারার যোগ্য নয়। এ পরিচ্ছেদে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الخ : ভাগ করার পর প্রত্যেক শরিকের অংশ যদি ব্যবহার উপযোগী হয়। তবে যে কোনো একজন শরিক ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করলে বিচারক তা ভাগ করে দেবেন। আর এ ক্ষেত্রে কোনো শরিক ভাগ বাটোয়ারার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালে বিচারক তাকে বাধ্য করতে পারবেন। কেননা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, যে সব জিনিস ভাগ বাটোয়ারার উপযোগী তা ভাগ করা হক্কে লাযেম বা অপরিহার্য অধিকার বলে স্বীকৃত।

قَوْلُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ : এর দ্বারা পূর্বের মাসআলা إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَجْبَرَ الْقَاضِيْ-এর প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ أَحَدُهُمْ الخ : কোনো জিনিসের দুইজন শরিকের একজনের অংশ যদি এত কম হয় যে, ভাগ করার পর তার প্রাপ্য অংশ ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায় এবং অপর শরিকের অংশ বেশি হয় যা ভাগ করার পর তার প্রাপ্য অংশ ব্যবহারের উপযোগী থাকে। উক্ত দুই শরিকের একজন বিচারকের কাছে ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করলে বিচারক তা ভাগ করে দেবেন কি না এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) তিনজনের অভিমত উল্লেখ করেছেন।

১. **ইমাম কুদূরী (র.) এর অভিমত :** বেশি অংশের শরিক যদি ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করে তাহলে বিচারক তা ভাগ করে দেবেন। কম অংশের শরিক যদি ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করে তাহলে বিচারক তা ভাগ করে দেবেন না। কেননা বেশি অংশের শরিকের আবেদন গ্রহণযোগ্য। কারণ বেশি অংশের শরিকের প্রাপ্য অংশ ভাগ করার পর ব্যবহারের উপযোগী থাকবে। কম অংশের শরিকের আবেদন বিচারক গ্রহণ করবেন না। কারণ উক্ত শরিক ভাগ করার দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

২. **জাসসাস (র.) এর অভিমত :** বেশি অংশের শরিকের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তার ভাগ বাটোয়ার আবেদনের দ্বারা অন্যের ক্ষতি হবে। কম অংশের শরিকের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ ভাগ বাটোয়ারার দ্বারা তার যে ক্ষতি হবে সে তা মেনে নিবে।

৩. **হাকেম শহিদ (র.)-এর অভিমত :** তিনি তার মুখতাসার কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে কোনো শরিক ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করবে বিচারক তা গ্রহণ করবেন। পূর্বে উল্লিখিত দুই অভিমতের দলিল তারও দলিল। অর্থাৎ প্রথম অভিমতের দলিল তাঁর অভিমতের একাংশের দলিল এবং দ্বিতীয় অভিমতের দলিল তাঁর অতিমতের অপর অংশের দলিল।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) তিনটি অভিমত থেকে কুদূরী (র.)-এর অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মাজমাউল আনহুর কিতাবে সনদ সহ কুদূরী (র.)-এর অভিমত কে মুফতাবিহি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হিদায়া কিতাবে উল্লিখিত মাসআলায় জাস্সাস (جَصَّاصْ) দ্বারা আবূ বকর জাস্সাস রাযীকে বুঝানো হয়েছে। হিদায়ার বিভিন্ন নুসখা বা কপিতে خَصَّافْ বলা হয়েছে। এ বিষয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুযায়ী জাস্সাস হবে। কেননা কিতাবে উল্লিখিত প্রথম মতামতটি খাস্সাফের।

وَاِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَسْتَضِرُّ لِصِغَرِهِ لَمْ يَقْسِمْهَا اِلَّا بِتَرَاضِيْهِمَا لِاَنَّ الْجَبْرَ عَلَى الْقِسْمَةِ لِتَكْمِيْلِ الْمَنْفَعَةِ وَفِىْ هٰذَا تَفْوِيْتُهَا وَيَجُوْزُ بِتَرَاضِيْهِمَا لِاَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا وَهُمَا اَعْرَفُ بِشَأْنِهِمَا اَمَّا الْقَاضِىْ فَيَعْتَمِدُ الظَّاهِرَ - قَالَ : وَيُقْسَمُ الْعُرُوْضُ اِذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ لِاَنَّ عِنْدَ اِتِّحَادِ الْجِنْسِ يَتَّحِدُ الْمَقْصُوْدُ فَيَحْصُلُ التَّعْدِيْلُ وَلَا يَقْسِمُ الْجِنْسَيْنِ بَعْضَهَا فِىْ بَعْضٍ لِاَنَّهُ لَا فِى الْقِسْمَةِ وَالتَّكْمِيْلُ فِى الْمَنْفَعَةِ - اِخْتِلَاطُ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ فَلَا تَقَعُ الْقِسْمَةُ تَمَيُّزًا بَلْ تَقَعُ مُعَاوَضَةً وَسَبِيْلُهَا التَّرَاضِىْ دُوْنَ جَبْرِ الْقَاضِىْ - وَيَقْسِمُ كُلَّ مَوْزُوْنٍ وَمَكِيْلٍ كَثِيْرٍ اَوْ قَلِيْلٍ وَالْمَعْدُوْدِ الْمُتَقَارِبِ وَتِبْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتِبْرِ الْحَدِيْدِ النُّحَاسِ وَالْاِبِلِ بِانْفِرَادِهَا اَوِ الْبَقَرِ اَوِ الْغَنَمِ وَلَا يَقْسِمُ شَاةً وَبَعِيْرًا وَ بِرْذَوْنًا وَحِمَارًا وَلَا يَقْسِمُ الْاَوَانِىْ لِاَنَّهَا بِاخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ اِلْتَحَقَتْ بِالْاَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ -

অনুবাদ : যদি প্রত্যেক শরিক [বণ্টনকৃত] অংশ ছোট হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহলে বিচারক তা ভাগ করে দেবেন না। তবে উভয়ের সম্মতিতে ভাগ করে দেবেন। কেননা মানফা'ত বা লাভকে পূর্ণতা দান করার জন্য ভাগ বাটোয়ারায় বাধ্য করা হয়। উক্ত ভাগ বাটোয়ারা দ্বারা মানফা'ত বা লাভকে নষ্ট করা হয় এবং তাদের সম্মতিতে তা জায়েজ আছে। কেননা এটা তাদের অধিকার এবং তারা দুইজন তাদের অবস্থা সম্পর্কে বেশি জানে। বিচারক বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন। কুদূরী (র.) বলেন, অস্থাবর সম্পদ [বাধ্যতামূলক ভাবে] ভাগ করে দেওয়া হবে। যদি এক জাতীয় হয়। কেননা এক জাতীয় হলে [ব্যবহারিক] উদ্দেশ্য এক হয়। তাই ভাগ করার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা যায় এবং মানফা'আত বা লাভের ক্ষেত্রে পূর্ণতা হাসিল হয়। বিচারক দুই জাতীয় জিনিসকে একটির অংশের বিনিময়ে অন্যটির অংশকে ভাগ করে দেবে না। কারণ দুই জাতীয় জিনিসের এক সাথে মিশ্রণ হয় না। তাই উক্ত বণ্টন দ্বারা পৃথকিকরণ হবে না; বরং তা হবে বিনিময়। এর জন্য নিয়ম হচ্ছে [উভয়ের] সম্মতি। বিচারকের বাধ্য করার দ্বারা তা হয় না। ওজনে মাপা হয় এবং পাত্রে মাপা হয় এমন জিনিস বিচারক [বাধ্যতামূলক ভাবে] ভাগ করে দেবেন। [পরিমাণে] বেশি হোক বা কম হোক এবং গণনা করে পরিমাপ করা হয় এমন কাছাকাছি ধরনের জিনিস (مَعْدُوْد مُتَقَارِبْ) এবং সোনা রূপার টুকরা এবং লোহা ও তামার টুকরো এবং শুধু উট বা গরু বা ছাগল [এগুলো বিচারক বাধ্যতামূলক ভাগ করে দেবেন]। বিচারক [বাধ্যতামূলক ভাবে] ভাগ করে দেবেন না, ছাগল ও উটকে এবং ঘোড়া ও গাধাকে এবং বিচারক [বিভিন্ন ধরনের] পাত্রকে [বাধ্যতামূলক ভাবে] ভাগ করে দেবেন না। কারণ পাত্র তৈরি করার পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন জাতীয় বলে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি ভাগ করার দরুণ উভয়ের অংশ এত ছোট হয় যে, তাদের দুই জনেরই ক্ষতি হয়। তাহলে বিচারক তা ভাগ করে দেবেন না। তবে যদি উভয় শরিক ভাগ করতে সম্মত হয় তাহলে বিচারক তা ভাগ করে দেবেন। কেননা শরিকের অংশের মানফা'ত বা উপকারিতা পূর্ণতা দান করার জন্য ভাগ বাটোয়ারায় বাধ্য করা হয়। এখানে যেহেতু তা হচ্ছে না। বরং উভয় শরিকের ক্ষতি হচ্ছে তাই বিচারক ভাগ করবেন না। তবে উভয় শরিক সম্মত হলে বিচারক ভাগ করে দেবেন। কারণ এটা তাদের হক্ব এ সম্পর্কে তারাই ভালো জানে। বিচারক বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফয়সালা দেবেন। বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের ক্ষতি হয়। তাই একজন ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করলে বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে বিচারক ভাগ করে দেবেন না। তবে উভয় শরিক ভাগ বাটোয়ারা চাইলে বাহ্যিক অবস্থা ধর্তব্য হবে না। যেহেতু উভয় শরিক ভাগ করতে আগ্রহী। তাই বুঝা যায় যে, এতে তাদের কোনো লাভ আছে। তাই বিচারক ভাগ করে দেবেন।

আল্লামা যাইলাঈ (র.) তাবঈন কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, উভয় শরিক ভাগ চাইলেও বিচারক তা ভাগ করে দেবেন না।

قَوْلُهُ قَالَ وَيَقْسِمُ الْعُرُوضَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الخ : শরিকগণ অস্থাবর সম্পদের ভাগ বাটোয়ারা চাইল এবং তা যদি এক জাতীয় হয়। যেমন কাপড়। তাহলে এক জাতীয় হওয়ায় বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা যায় এবং মানফা'আত বা লাভ পূর্ণতা লাভ করে। যা ভাগ বাটোয়ারার মূল উদ্দেশ্য। তাই বিচারক তা ভাগ করে দেবেন। পক্ষান্তরে কোনো শরিক ভাগ বাটোয়ারায় রাজি না হলে বিচারকের জন্য তার উপর জোরপূর্বক ভাগ করে দেওয়া জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَقْسِمُ الْجِنْسَيْنِ بَعْضَهَا الخ : পূর্বে উল্লিখিত মাসআলায় এক জাতীয় জিনিস হলে কোনো শরিক ভাগ বাটোয়ারা রাজি না হলে বিচারকের জন্য তাকে বাধ্য করার অধিকার আছে। তবে দুই জাতীয় জিনিস হলে কোনো শরিক রাজি না হলে বিচারকের জন্য তাকে বাধ্য করার অধিকার নেই। যেমন কিছু গরু এবং কিছু ছাগল আছে। এগুলো একটি আরেকটির সাথে মিশবে না। সুতরাং এগুলোকে ভাগ করলে তা تَمْيِيْز বা পৃথকীকরণ হবে না; বরং একটির সাথে অপরটির বিনিময় করা হবে এবং বিনিময়ের জন্য কাউকে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং এর জন্য সহজ পন্থা হচ্ছে সকল শরিক রাজি হলে তবেই ভাগ বাটোয়ারা করা জায়েজ হবে। এ ছাড়া ভাগ বাটোয়ারা করা জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَيَقْسِمُ كُلَّ مَوْزُوْنٍ وَمَكِيْلٍ كَثِيْرٍ أَوْ قَلِيْلٍ الخ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার তাফসীল বর্ণনা করেছেন এবং বিচারক কোন কোন জিনিস বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ বাটোয়ারা করতে পারবেন এবং কোন কোন জিনিস বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ বাটোয়ারা করতে পারবেন না। এর বিবরণ পেশ করেছেন। এ সম্পর্কেই তিনি বলেন–

* ওজনে মাপা হয় বা পাত্রে মাপা এমন জিনিস কম হোক বা বেশি হোক বিচারক তা বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করে দিতে পারবেন।
* এমনিভাবে যেসব জিনিসের সাইজ বা ধরন তথা আকার-আকৃতি কাছাকাছি এবং গণনা করে পরিমাপ করা হয়। এ ধরনের জিনিস বিচারক বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করতে পারবেন। যেমন ডিম, কলা ইত্যাদি।
* সোনা, রূপার টুকরো বা লোহা, তামার টুকরো অর্থাৎ যা দ্বারা কোনো কিছু বানানো হয়নি এগুলোকে বিচারক বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করতে পারবেন। কেননা এগুলোর এক অংশ অপর অংশের সমান মূল্যবান হয়।
* যৌথ সম্পদ যদি সবগুলো উট অথবা গরু বা ছাগল হয়। তবে বিচারক তা বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করে দিতে পারবেন। এগুলো এক জাতীয় হওয়ায় এর মাঝে পার্থক্য কম হবে।
* যৌথ মালিকানা সম্পদ যদি এমন হয় যে, কিছু ছাগল ও কিছু উট বা কিছু ঘোড়া ও কিছু গাধা। এগুলোতে বেশি পার্থক্য থাকায় বিচারক বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করতে পারবেন না। কারণ ভাগ করার সময় একজনকে ঘোড়া দিলে অপর জনকে গাধা দিলে এতে দুই শরিকের অংশে বিস্তর পার্থক্য হবে। সুতরাং এগুলোকে ভাগ করার নিয়ম হলো পৃথকভাবে শুধু ঘোড়াগুলোকে ভাগ করবে এবং পৃথকভাবে শুধু গাধাগুলোকে ভাগ করবে।
* পাত্র যদিও একই ধাতব পদার্থ দ্বারা তৈরি করা হয়। আকার আকৃতির পার্থক্যের কারণে এগুলোকে ভিন্ন জাতীয় জিনিস বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং এগুলোকে বিচারক বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করে দিতে পারবেন না। যেমন থালা, বাটি ও পিরিচ ইত্যাদি।

وَيَقْسِمُ الثِّيَابَ الْهَرَوِيَّةَ لِاتِّحَادِ الصِّنْفِ . وَلَا يَقْسِمُ ثَوْبًا وَاحِدًا لِاشْتِمَالِ الْقِسْمَةِ عَلَى الضَّرَرِ اِذْ هِيَ لَا تَتَحَقَّقُ اِلَّا بِالْقَطْعِ . وَلَا ثَوْبَيْنِ اِذَا اخْتَلَفَتْ قِيْمَتُهُمَا لِمَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ اِذَا جَعَلَ ثَوْبٌ بِثَوْبَيْنِ اَوْ ثَوْبٌ وَرُبْعُ ثَوْبٍ بِثَوْبٍ وَثَلٰثَةِ اَرْبَاعِ ثَوْبٍ لِاَنَّهُ قِسْمَةُ الْبَعْضِ دُوْنَ الْبَعْضِ وَذٰلِكَ جَائِزٌ . وَقَالَ : اَبُوْ حَنِيْفَةَ لَا يَقْسِمُ الرَّقِيْقَ وَالْجَوَاهِرَ لِتَفَاوُتِهِمَا وَقَالَا يَقْسِمُ الرَّقِيْقَ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ كَمَا فِى الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ وَرَقِيْقِ الْمَغْنَمِ .

অনুবাদ : বিচারক হরবী কাপড় [বাধ্যতামূলক ভাবে] ভাগ করে দেবেন। এক জাতীয় হওয়ার কারণে। বিচারক একটি কাপড় কে ভাগ করবেন না। কেননা এতে ক্ষতি রয়েছে। কারণ [কাপড়] কাটা ছাড়া তা হয় না। এবং বিচারক এমন দুটি কাপড় ভাগ করবেন না [যে দু'টি কাপড়ের] মূল্যে ব্যবধান রয়েছে। এর দলিল [পূর্বে] বর্ণনা করেছি। তবে তিনটি কাপড় হলে, যদি একটি কাপড়ের বদলে দুটি কাপড় দেওয়া হয় অথবা একটি কাপড় এবং এর সাথে একটি কাপড়ের এক চতুর্থাংশ দেওয়া হয় এবং এর বদলে একটি কাপড় এবং একটি কাপড়ের এক চতুর্থাংশ দেওয়া হয়। [তবে বিচারক তা ভাগ করে দেবেন]। কেননা এতে আংশিক ভাগ করা হলো এবং আংশিক ভাগ করা হলো না এবং তা জায়েজ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, গোলাম এবং দামী পাথর বিচারক ভাগ করে দেবেন না। এদের মাঝে পার্থক্য থাকার কারণে। সাহেবাইন (র.) বলেন, বিচারক গোলাম ভাগ করে দেবেন, উভয়টি একই জাতীয় হওয়ার কারণে। যেমন উট, ছাগল ও গনিমতের গোলাম ভাগ করে দেওয়া হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَقْسِمُ الثِّيَابَ الْهَرَوِيَّةَ الخ : খুরাসানের এক শহরের নাম হেরাত। হেরাতের তৈরি কাপড়কে হরবী কাপড় বলে। যেমন আমাদের দেশে বেনারসি শাড়ী, রাজশাহীর সিল্ক পাব না বা বাবুর হাটের কাপড় ইত্যাদি বলা হয়। হরবী কাপড় এব জাতীয় হওয়ার কারণে বিচারক বাধ্যতামূলক ভাবে তা বণ্টন করতে পারবেন।

قَوْلُهُ وَلَا يَقْسِمُ ثَوْبًا وَاحِدًا الخ : যদি একটি কাপড় হয়। যেমন একটি জামা বা একটি পায়জামা। এ ধরনের একটি কাপড়কে কাটা ছাড়া ভাগ করা যাবে না। কেটে ভাগ করার পর কারো অংশ ব্যবহারের উপযোগী থাকবে না। সুতরাং উভয় শরিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই বিচারক বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করতে পারবেন না।

قَوْلُهُ وَلَا ثَوْبَيْنِ اِذَا اخْتَلَفَتْ الخ : যদি দুটি কাপড় হয় এবং দুটি কাপড়ের মূল্যে পার্থক্য থাকে। তবে বিচারক তা বাধ্যতামূলকভাবে ভাগ করে দিতে পারবেন না। যেমন একটি শেরওয়ানী যার মূল্য বেশি এবং একটি জামা যার মূল্য কম।

এ দুটো কাপড়কে সমান ভাগ করতে হলে দুটো কাপড়কেই কাটতে হবে। কাপড় দুটো কাটলে যে উভয় শরিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে একথা সবাই বুঝে। সুতরাং এ ভাবে ভাগ করা যাবে না। "لِـمَا بَيَّنَّا" কথাটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) ইশারা করেছেন পূর্বে উল্লিখিত কওল "بَلْ تَقَعُ مُعَاوَضَةً وَسَبِيْلُهَا التَّرَاضِيْ" -এর প্রতি। অর্থাৎ যদি দুটি কাপড়ের মূল্যে পার্থক্য থাকে। তবে উভয় শরিকের মূল্যে সমতা রক্ষা করতে কাপড় কেটে ভাগ করা উভয় শরিকের জন্য ক্ষতিকর। তাই কম মূল্যের কাপড়ের সাথে নগদ টাকা যোগ করে বেশি মূল্যের কাপড়ের মূল্যের সমান করতে হবে। উক্ত টাকা শরিকগণের যৌথ সম্পদ নয়। বরং বেশি দামের কাপড়ের বাড়তি মূল্যের বিনিময় হিসেবে দেওয়া হবে। সুতরাং এ টাকা ভাগ বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত হবে না। তা হবে বিনিময় এ কথার দিকে ইশারা করেছেন لِـمَا بَيَّنَّا বলে। অর্থাৎ আমি পূর্বে যা বলেছি, তা হবে বিনিময় এবং এর ভাগ করার পন্থা হলো উভয় শরিকের সম্মতির মাধ্যমে ভাগ করা।

কাপড় যদি তিনটি হয় তাহলে বাধ্যতামূলক ভাবে তা ভাগ করা যাবে। যেমন তিনটি কাপড়। এর একটি কাপড়ের মূল্য অপর দুটি কাপড়ের মূল্যের সমান। এমতাবস্থায় বেশি দামের একটি কাপড় এবং অপরজনকে কমদামী দুটি কাপড় ভাগ করে দেওয়া হবে। তাহলে কোনো কাপড় কাটতে হবে না এবং উভয় শরিকের ভাগ সমান হবে। যদি তিনটি কাপড় এমন হয় যে, এর মধ্যে একটি শেরওয়ানী যার মূল্য তেরশত টাকা, একটি জামা যার মূল্য এগারশত টাকা এবং একটি পায়জামা যার মূল্য চারশত টাকা। এ ক্ষেত্রে বিচারক এক শরিককে তেরশত টাকা মূল্যের শেরওয়ানী দেবেন এবং অপর শরিককে এগারশত টাকা মূল্যের জামা দেবেন। পায়জামা চার ভাগের এক ভাগের মালিক হবেন শেরওয়ানী ওয়ালা শরিক এবং পায়জামার চার ভাগের তিন ভাগের মালিক হবে জামা ওয়ালা শরিক। তবে পায়জামা দুই শরিকের মাঝে যৌথ থাকবে এবং শেরওয়ানী ও জামা দুইজনকে ভাগ করে দেওয়া হবে। মুসান্নিফ (র.) এ কথাটিকে এভাবে বলেছেন "قِسْمَةُ الْبَعْضِ دُوْنَ الْبَعْضِ" অর্থাৎ যৌথ সম্পদের কিছু অংশের ভাগ হওয়া এবং কিছু অংশে ভাগ না হওয়া এবং তা জায়েজ আছে। উক্ত ভাগ বাটোয়ারায় উভয় শরিকের প্রাপ্য অংশের মূল্য চৌদ্দশত টাকা হবে।

قَوْلُهُ قَالَ : اَبُوْ حَنِيْفَةَ لَا يُقَسَّمُ الخ : গোলাম এবং ক্রীত দাসের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। এমনিভাবে মূল্যবান মনিরত্ন দামি পাথরের মাঝে ব্যবধান অনেক বেশি। তাই বিচারক এগুলাকে বাধ্যতামূলকভাবে ভাগ করতে পারবেন না। তবে সাহেবাইন (র.) বলেন, যেহেতু গোলাম এক জাতীয় তাই বিচারক এগুলো বাধ্যতামূলকভাবে ভাগ করে দিতে পারবেন। এর দলিল পেশ করেন। যেমন উট, বকরির মাঝে সামান্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে ভাগ করা হয়। এমনিভাবে গনিমতের গোলামও ভাগ করা হয়। তাই গোলাম বা ক্রীতদাস ভাগ করা জায়েজ হবে।

وَلَهُ اَنَّ التَّفَاوُتَ فِى الْاٰدَمِيِّ فَاحِشٌ لِتَفَاوُتِ الْمَعَانِى الْبَاطِنَةِ فَصَارَ كَالْجِنْسِ الْمُخْتَلَفِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانَاتِ لِاَنَّ التَّفَاوُتَ فِيْهَا يَقِلُّ عِنْدَ اِتِّحَادِ الْجِنْسِ اَلَا تَرٰى اَنَّ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ جِنْسَانِ وَمِنَ الْحَيَوَانَاتِ جِنْسٌ وَاحِدٌ ـ بِخِلَافِ الْمَغَانِمِ لِاَنَّ حَقَّ الْغَانِمِيْنَ فِى الْمَالِيَّةِ حَتّٰى كَانَ لِلْاِمَامِ بَيْعُهَا وَقِسْمَةُ ثَمَنِهَا وَهٰهُنَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ الْمَالِيَةِ جَمِيْعًا فَافْتَرَقَا ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে যে, [মানুষের] অন্তর্নিহিত গুণাবলির পার্থক্যের কারণে মানুষের মাঝে পার্থক্য অনেক বেশি। সুতরাং বিভিন্ন জাতীয় বলে গণ্য হবে। তবে জীবজন্তু এমন না। এগুলো এক জাতীয় হলে পার্থক্য কম হয়। দেখ না? মানুষের মধ্যে নর–নারী দুই জাতীয় বলে গণ্য হয়। আর জীবজন্তুর ক্ষেত্রে এক জাতীয় বলে গণ্য হয়। গনিমতের মালের বিপরীত। কারণ গনিমত প্রাপ্তগণ শুধু গনিমতের মালের মূল্যের হকদার। এমনকি ইমামুল মুসলিমীন বা খলিফা ইচ্ছা করলে তা বিক্রি করে তাদেরকে মূল্য দিয়ে দিতে পারেন। এ মাসআলায় গোলামের সত্তা ও গোলামের মূল্য উভয় বিষয় সম্পৃক্ত। সুতরাং দুটি বিষয়ে ব্যবধান আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَهُ اَنَّ التَّفَاوُتَ الخ **:** ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলের সারমর্ম হচ্ছে যে, সাহেবাইন (র.)-এর দলিলে মানুষকে জীবজন্তুর উপর কিয়াস করা ঠিক হয়নি। কারণ জীবজন্তুর মাঝে পার্থক্য কম থাকায় এক জাতীয় বলে গণ্য করা হয়। মানুষের মাঝে অন্তর্নিহিত গুণাবলি ও যোগ্যতার বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এ কারণে ফক্বীহগণ মানুষের মাঝে পুরুষ ও মহিলাকে দুই জাতীয় বলে গণ্য করেছেন এবং জীবজন্তুকে এক জাতীয় বলে গণ্য করেছেন।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَغَانِمِ لِاَنَّ حَقَّ الْغَانِمِيْنَ الخ **:** সাহেবাইন (র.) ভাগ বাটোয়ারার সাধারণ গোলামকে কিয়াস করেছেন গনিমতের গোলামের উপর। এ কিয়াস সঠিক নয়। কেননা গনিমতের মালে মুজাহিদগণ মূল্য হিসেবে এর অংশের অধিকারী হন। ভাগ বাটোয়ারায় শরিকগণ ঐ গোলাম ও গোলামের মূল্য উভয়ের হকদার হন। এ কারণেই ইমাম তথা খলিফা ইচ্ছা করলে গনিমতের গোলাম বিক্রি করে এর মূল্য মুজাহিদগণকে ভাগ করে দিতে পারেন। বিচারক তা পারবেন না। তাই গনিমতের গোলামের উপর ভাগ বাটোয়ারার গোলাকে কিয়াস করা ঠিক হবে না।

فَاَمَّا الْجَوَاهِرُ فَقَدْ قِيْلَ اِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ لَايَقْسِمُ كَاللَّالِى وَالْيَوَاقِيْتِ وَقِيْلَ لَايَقْسِمُ الْكِبَارَ مِنْهَا لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ وَيَقْسِمُ الصِّغَارَ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ وَقِيْلَ يَجْرِى الْجَوَابُ عَلٰى اِطْلَاقِهِ لِاَنَّ جَهَالَةَ الْجَوَاهِرِ اَفْحَشُ مِنْ جَهَالَةِ الرَّقِيْقِ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ عَلٰى لُؤْلُؤَةٍ اَوْ يَاقُوْتَةٍ اَوْ خَالَعَ عَلَيْهَا لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَيَصِحُّ ذٰلِكَ عَلٰى عَبْدٍ فَاَوْلٰى اَنْ لَّا يُجْبَرَ عَلَى الْقِسْمَةِ .

অনুবাদ : এবং মূল্যবান পাথর সম্পর্কে [এক বর্ণনায়] বলা হয়েছে যে, যদি বিভিন্ন জাতীয় হয়। যেমন মুক্তা এবং ইয়াকৃত পাথর। তবে বিচারক তা ভাগ করে দিবেন না। [আরেক বর্ণনায়] বলা হয়েছে যে, এগুলোর বড় বড় গুলোকে বিচারক ভাগ করে দিবেন না অধিক পার্থক্যের কারণে। আর ছোটগুলোতে পার্থক্য কম থাকায় তা ভাগ করে দিবেন। [অপর বর্ণনায়] বলা হয়েছে যে, শর্তহীন ভাবে [এক জাতীয়, বিভিন্ন জাতীয়, ছোট, বড় ইত্যাদি শর্ত ছাড়া সর্বাবস্থায়] ভাগ করে দেবেন না। কেননা মূল্যবান পাথরের [মূল্য সম্পর্কে] অজ্ঞতা [জাহালত] গোলামের [মূল্যের] অজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশি। দেখ না? যদি মুক্তা বা ইয়াকৃত পাথর দ্বারা বিয়েতে মহর নিধারণ করা হয়। অথবা মুক্তা বা ইয়াকৃত পাথর দ্বারা খোলার বদল নির্ধারণ করা হয়। তবে তা সহীহ হবে না। অথচ গোলাম দ্বারা নির্ধারণ করলে তা সহীহ হবে। সুতরাং মুক্তা ও ইয়াকৃত পাথর বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করার প্রশ্নই আসে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاَمَّا الْجَوَاهِرُ فَقَدْ قِيْلَ اِذَا الخ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মনিরত্ন ভাগ বাটোয়ারার অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করা যাবে না। পরবর্তীতে আরও তিনটি অভিমত বর্ণনা করেছেন।

প্রথম অভিমত : যদি এক জাতীয় না হয় তাহলে বিচারক বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করতে পারবেন না। যেমন ইয়াকৃত পাথর এবং মুক্তা দুটি ভিন্ন জাতীয় পাথর। তাই এগুলোকে বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করা যাবে না।

দ্বিতীয় অভিমত : বড় পাথরে পার্থক্য বেশি থাকে এবং ছোট পাথরে পার্থক্য কম থাকে। তাই বড় পাথর বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করা জায়েজ হবে না এবং ছোট পাথর বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করা জায়েজ হবে।

তৃতীয় অভিমত : যে কোনো মূল্যবান পাথর বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করা যাবে না। কারণ মূল্যবান পাথরের মূল্যের অজ্ঞতা গোলামের মূল্যের অজ্ঞতার চেয়ে বেশি। তাই যেহেতু বাধ্যতামূলক ভাবে গোলাম ভাগ করা জায়েজ নেই, সেস্থলে মূল্যবান পাথর বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করা কিছুতেই জায়েজ হবে না। গোলামের পার্থক্যের চেয়ে মূল্যবান পাথরের পার্থক্য বেশি।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) কথাটি এভাবে বুঝিয়েছেন যে, বিবাহের মহরে যদি গোলাম উল্লেখ করা হয় তবে তা সহীহ হবে। তবে যদি মূল্যবান পাথরকে মহর হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেমন, ইয়াকৃত বা মুক্তা তবে সঠিক হবে না। কারণ ফকীহগণ গোলাম এবং মূল্যবান পাথরের মাঝে পার্থক্য করে থাকেন।

قَالَ : وَلَا يُقْسَمُ حَمَّامٌ وَلَا بِئْرٌ وَلَا رَحًى اِلَّا اَنْ يَتَرَاضَى الشُّرَكَاءُ وَكَذَا الْحَائِطُ بَيْنَ الدَّارَيْنِ . لِاَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الضَّرَرِ فِى الطَّرَفَيْنِ اِذْ لَا يَبْقٰى كُلُّ نَصِيْبٍ مُنْتَفِعًا بِهِ اِنْتِفَاعًا مَقْصُوْدًا فَلَا يَقْسِمُ الْقَاضِىْ بِخِلَافِ التَّرَاضِىْ لِمَا بَيَّنَّا . قَالَ : وَاِذَا كَانَتْ دُوْرٌ مُشْتَرَكَةٌ فِىْ مِصْرٍ وَاحِدٍ قَسَّمَ كُلَّ دَارٍ عَلٰى حِدَتِهَا فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا اِنْ كَانَ الْاَصْلَحُ لَهُمْ قِسْمَةَ بَعْضِهَا فِىْ بَعْضٍ قَسَّمَهَا . وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ اَلْاَقْرِحَةُ الْمُتَفَرِّقَةُ الْمُشْتَرَكَةُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গোসলখানা, কূপ ও যাঁতা [আটা বা শষ্য পেষাই করা চাক্কি] ভাগ করা যাবে না। তবে শরিকগণ রাজি হলে ভাগ করা যাবে। এমনিভাবে দুই বাড়ির মাঝের দেয়াল ভাগ করা যাবে না। কেননা এতে উভয় শরিক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ [ভাগ করার পর] কোনো অংশই সত্যিকার অর্থে ব্যবহারের উপযোগী থাকে না। সুতরাং বিচারক ভাগ করে দেবে না। তবে উভয় শরিক রাজি হলে ভাগ করে দেবে। যার দলিল পূর্বে বর্ণনা করেছি। কুদূরী (র.) বলেন, যদি একই শহরে কয়েকটি শরিকানা বাড়ি হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী প্রতিটি বাড়িকে পৃথকভাবে ভাগ করা হবে। সাহেবাঈন (র.) বলেন, যদি বিচারক বাড়ির বিনিময়ে অপর একটি বাড়িকে ভাগ করে দেওয়া শরিকগণের জন্য ভালো মনে করেন তবে এ ভাবে ভাগ করবেন। ভিন্ন ভিন্ন অনাবাদি শরিকানা জমির ভাগ বাটোয়ারায় এ মতানৈক্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يُقْسَمُ حَمَّامٌ وَلَا بِئْرٌ وَلَا رَحًى الخ : যদি এমন জিনিস হয় ভাগ করার পর তা ব্যবাহারের উপযোগী থাকে না। অর্থাৎ এ জিনিস দ্বারা যে কাজ করা হয় তা আর করা যায় না। এ ধরনের জিনিস বিচারক বাধ্যতামূলক ভাবে ভাগ করতে পারবেন না। যেমন গোসল খানা, কূপ ও যাঁতা। তবে শরিকগণ রাজি হলে তা করতে পারবেন।

قَوْلُهُ قَالَ : وَاِذَا كَانَتْ دُوْرٌ الخ : পৃথকভাবে প্রতিটি বাড়ি বণ্টন করাকে কিসমতে ফরদ বলা হয়। সবকয়টি বাড়িকে এক সাথে করে বণ্টন করাকে কিসমতে জমা বলা হয়। যেমন একই শহরে দুই জনের শরিকানা চারটি বাড়ি আছে। প্রতিটি বাড়িকে দুই ভাগ করে উভয় শরিককে অর্ধেক করে দেওয়াকে কিসমতে ফরদ (قِسْمَةُ فَرْدٍ) বলা হয়। চারটি বাড়িকে একসাথে ভাগ করে উভয় শরিককে দুটি করে দেওয়াকে কিসমতে জমা (قِسْمَةُ الْجَمْعِ) বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রত্যেকটি বাড়িকে পৃথকভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ কিসমতে ফরদ হবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদি কিসমতে ফরদকে ভালো মনে করেন তাই করবেন। যদি কিসমতে জমাকে ভালো মনে করেন, তবে তাই করবেন।

لَهُمَا اَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ اِسْمًا وَصُوْرَةً نَظْرًا اِلَى اَصْلِ السُّكْنٰى اَجْنَاسٌ مَعْنًى نَظْرًا اِلَى اِخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ وَوُجُوْهِ السُّكْنٰى فَيُفَوَّضُ التَّرْجِيْحُ اِلَى الْقَاضِىْ ـ

অনুবাদ : সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো যে, বাড়ি বসবাসের উপযোগিতা হিসেবে নাম ও আকৃতির ক্ষেত্রে এক জাতীয়। ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ও সুযোগ সুবিধার ব্যবধান হিসেবে গুণগত ভাবে এক জাতীয় না। সুতরাং [ভাগ বাটোয়ারার ক্ষেত্রে এক জাতীয় ও বিভিন্ন জাতীয় হওয়ার] প্রাধান্য দেওয়ার দায়িত্ব বিচারকের হাতে ন্যস্ত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَهُمَا اَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ اِسْمًا الخ : যে কোনো বাড়িতে বসবাস করা যায়। তবে কোনো বাড়িতে এমন সুযোগ সুবিধা থাকে যা অন্য বাড়িতে থাকে না। যেমন পানি, রাস্তা ও মসজিদের কাছে হওয়া ইত্যাদি। পূর্বে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এক জাতীয় জিনিস এক সাথে ভাগ করা হবে এবং বিভিন্ন জাতীয় জিনিস পৃথক ভাবে ভাগ করা হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন যে, বাড়ির ক্ষেত্রে তাই আমরা বিষয়টিকে বিচারকের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়েছি। বিচারক ভালো মনে করলে এক জাতীয় গণ্য করে কিসমতের জমা করতে পারেন। অথবা ভালো মনে করলে বিভিন্ন জাতীয় গণ্য করে কিসমতে ফরদ করতে পারেন। যদি বসবাস উপযোগিতাকে দেখা হয় তবে নাম ও আকৃতি হিসেবে এক জাতীয় বুঝা যায়। যদি বাড়ির সুযোগ সুবিধাও গুণগত মান দেখা হয়। তবে বিভিন্ন জাতীয় বলে গণ্য হবে। সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতে উভয় অবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

وَلَهُ اَنَّ الْاِعْتِبَارَ لِلْمَعْنٰى وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ وَيَخْتَلِفُ ذٰلِكَ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ وَالْمَحَالِّ الْجِيْرَانِ وَالْقُرْبِ اِلَى الْمَسْجِدِ وَالْمَاءِ اِخْتِلَافًا فَاحِشًا فَلَا يُمْكِنُ التَّعْدِيْلُ فِى الْقِسْمَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে যে, গুণগত মান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাই মৌলিক উদ্দেশ্য হয়। শহর ও এলাকার পার্থক্যের কারণে এবং প্রতিবেশীর কারণে, মসজিদ ও পানি কাছে হওয়ার কারণে [বাড়ির গুণগত মানে] ব্যাপক পার্থক্য হয়। তাই এতে ভাগ বাটোয়ারা সমতা রক্ষা করা সম্ভব না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُ اَنَّ الْاِعْتِبَارَ لِلْمَعْنٰى وَهُوَ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে, গুণগত মান (مَعْنٰى) এবং ব্যবহারিক উদ্দেশ্যই ধর্তব্য হয়। এ কথা সুস্পষ্ট যে, শহর এবং এলাকার পরিবর্তনের কারণে ঘর বাড়ির ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ও গুণগত মানের বিস্তর পার্থক্য হয়। এমনিভাবে প্রতিবেশীর কারণে মসজিদ, পানি ইত্যাদি কাছে ও দূরে হওয়ার মধ্যে বেশি পার্থক্য হয়। যেহেতু এ ধরনের পার্থক্য হয়। তাই কয়েকটি বাড়িকে একসাথে ভাগ করে দিলে যেমন দুই শরিকের চারটি বাড়ি আছে। ভাগ করে প্রতি শরিককে দুইটি করে বাড়ি দিলে উক্ত ভাগ সমান হবে না। অথচ সমতা রক্ষা করা ভাগ বাটোয়ারার মূল উদ্দেশ্য। যেহেতু বাড়ির সুযোগ সুবিধার পার্থক্য অনেক বেশি। তাই বাড়ি ক্রয় করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করা জায়েজ নেই। এমনিভাবে বিয়েতে মহর হিসেবে বাড়ি উল্লেখ করলে এর দ্বারা মহর নির্ধারণ করা সহীহ হবে না। বাড়ির মাসআলার মতোই কাপড় ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা এবং বিয়েতে কাপড়কে মহর হিসেবে নির্ধারণ করা ঠিক নয়।

তবে যদি দুইজন শরিকের একটি বাড়ি থাকে এবং উক্ত বাড়িতে কয়েকটি কামরা থাকে। তবে সবকটি কামরা এক সাথে ভাগ করা যাবে। যেমন ছয় কামরা বিশিষ্ট বাড়িকে দুই শরিককে সমান ভাগ করে প্রতি শরিককে তিনটি করে কামরা দিলে তা জায়েজ হবে। কারণ প্রতি কামরাকে ভাগ করা হলে উভয়ের ক্ষতি হবে।

وَلِهٰذَا لَا يَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِشِرَاءِ دَارٍ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلٰى دَارٍ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِيْهِمَا فِى الثَّوْبِ بِخِلَافِ الدَّارِ الْوَاحِدَةِ اِذَا اخْتَلَفَ بُيُوْتُهَا لِاَنَّ فِىْ قِسْمَةِ كُلِّ بَيْتٍ عَلٰى حِدَةٍ ضَرَرًا فَقُسِمَتِ الدَّارُ قِسْمَةً وَاحِدَةً ـ

অনুবাদ : এ জন্যই বাড়ি ক্রয় করার ক্ষেত্রে উকিল নিযুক্ত করা জায়েজ নেই। এমনিভাবে যদি কেউ বিয়েতে মহর হিসেবে বাড়ি উল্লেখ করে। তবে তার মহর নির্ধারণ সহীহ হবে না। যেমন এ দুই বিষয়ে [উকিল নিযুক্ত করণ এবং বিয়ের মহর নির্ধারণ] কাপড়ের হুকুম। কিন্তু একই বাড়িতে যদি কয়েকটি ঘর থাকে, তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। কেননা প্রতিটি ঘরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বণ্টন করাতে বিরাট ক্ষতি রয়েছে। কাজেই বাড়িটি যৌথভাবেই বণ্টন করা হবে।

قَالَ (رضـ) وَتَقْيِيْدُ الْوَضْعِ فِى الْكِتَابِ اِشَارَةٌ اِلَى اَنَّ الدَّارَيْنِ اِذَا كَانَتَا فِىْ مِصْرَيْنِ لَاتَجْمَعَانِ فِى الْقِسْمَةِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَةُ هِلَالٍ (رحـ) عَنْهُمَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهُ يُقْسَمُ اَحَدُهُمَا فِى الْاُخْرٰى . وَالْبُيُوْتُ فِىْ مَحَلَّةٍ اَوْ مِحَالٍ تُقْسَمُ قِسْمَةً وَاحِدَةً لِاَنَّ التَّفَاوُتَ فِيْمَا بَيْنَهَا يَسِيْرٌ وَالْمَنَازِلُ الْمُتَلَازِقَةُ كَالْبُيُوْتِ وَالْمُتَبَايِنَةُ كَالدُّوْرِ لِاَنَّهُ بَيْنَ الدَّارِ وَالْبَيْتِ عَلٰى مَامَرَّ مِنْ قَبْلُ فَاَخَذَ شِبْهًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ .

অনুবাদ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, কুদূরী (র.) মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে কিতাবে [একই শহরের হওয়ার] শর্তযুক্ত করে ইশারা করেছেন যে, যদি দুটি বাড়ি দুই শহরে হয় তবে সাহেবাইন (র.)-এর নিকট এক সাথে ভাগ করা হবে না। হিলাল (র.) সাহেবাইন (র.)-এর কাছ থেকে এ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ (র.)-এর কাছ থেকে এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে ভাগ করা যাবে। এক মহল্লার বা ভিন্ন ভিন্ন মহল্লার কামরাসমূহ এক সাথে ভাগ করা হবে। কেননা এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কম। এক সাথে লাগানো বাসার হুকুম কামরার মতো এবং পৃথক পৃথক বাসার হুকুম বাড়ির মতো। কেননা বাসা, কামড়া এবং বাড়ির মাঝামাঝি। যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বাসা উভয়টির সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : تَقْيِيْدُ الْوَضْعِ فِى الْكِتَابِ الخ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, কুদূরী (র.) মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে فِىْ مِصْرٍ وَاحِدٍ কথাটি উল্লেখ করে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, যদি বাড়ি দুই শহরে হয় তবে সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত অনুযায়ীও একসাথে ভাগ করা যাবে না। সাহেবাইন (র.)-এর কাছ থেকে হিলাল (র.) এ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ (র.)-এর কাছ থেকে অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এ ধরনের দুই শহরের বাড়ি এক সাথে ভাগ করা যাবে। দুররে মুখতার কিতাবের মুসান্নিফ (র.) বলেন, "وَفِىْ مِصْرَيْنِ قَوْلُهُمَا كَقَوْلِهِ" অর্থাৎ দুই শহরে হলে সাহেবাইনের মতামত ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতোই। –[শামী : খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা– ১৬৬]

قَوْلُهُ وَالْبُيُوْتُ فِىْ مَحَلَّةٍ اَوْ مَحَالٍ : বাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর কামরা বা ঘর সম্পর্কে তিনি বলেন, কামরার হুকুম আর বাড়ির হুকুম এক না। এগুলোর মাঝে পার্থক্য কম। তাই একই মহল্লায় হোক বা ভিন্ন ভিন্ন মহল্লায় হোক। এগুলোকে মিলিয়ে ভাগ বাটোয়ারা করা যাবে। বাসা বা মনজিল যা বাড়ি থেকে ছোট এবং কামরা থেকে বড়। এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু বাসা বা মনজিল কামরা এবং বাড়ির মাঝামাঝি। তাই বাসার হুকুমের ক্ষেত্রেও তা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ কামরার সাথে সাদৃশ্য আছে বলে মিলিত বাসার হুকুম কামরার মতো। এক সাথে মিলিয়ে ভাগ বাটোয়ারা করা যাবে। বাড়ির সাথে সাদৃশ্য আছে বলে বাসার হুকুম বাড়ির মতো। পৃথক পৃথক বাসা এক সাথে মিলিয়ে ভাগ করা যাবে না। বাসা বা মনজিল এক সাথে মিলিত থাকলে তা এক সাথে মিলিয়ে ভাগ করা যাবে এবং পৃথক পৃথক থাকলে এক সাথে মিলিয়ে ভাগ করা যাবে না। বরং প্রতিটি বাসাকে পৃথক ভাবে ভাগ করতে হবে। بَيْتٌ ـ مَنْزِلٌ ـ دَارٌ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) হিদায়া তৃতীয় খণ্ডে بَابُ الْحُقُوْقِ এ আলোচনা করছেন। এতে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে এমন বাসস্থানকে دَارٌ বলা হয়েছে। বাড়ির সুযোগ সুবিধার তুলনায় কিছু কম হলে একে مَنْزِلٌ বলা হয়েছে। কেবল রাত্রি যাপন বা অবস্থান করা যায় এমন ঘরকে بَيْتٌ বলা হয়েছে।

قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ دَارًا وَضَيْعَةً أَوْ دَارًا وَحَانُوْتًا قَسَمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى حِدَةٍ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَعَلَ الدَّارَ وَالْحَانُوْتَ جِنْسَيْنِ وَكَذَا ذَكَرَ الْخَصَّافُ وَقَالَ فِيْ إِجَارَاتِ الْأَصْلِ أَنَّ إِجَارَةَ مَنَافِعِ الدَّارِ بِالْحَانُوْتِ لَا تَجُوْزُ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى أَنَّهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَيُجْعَلُ فِي الْمَسْئَلَةِ رِوَايَتَانِ أَوْ تَبْنِيْ حُرْمَةَ الرِّبٰوا هُنَالِكَ عَلٰى شُبْهَةِ الْمُجَانَسَةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বাড়ি এবং জমি অথবা বাড়ি এবং দোকান যদি [শরিকি] হয় তবে বিচারক তা পৃথক ভাবে ভাগ করবেন। এখতেলাফে জিন্‌স [এক জাতীয় না] হওয়ার দরুন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, কুদূরী (র.) বাড়ি এবং দোকানকে দুই জাতীয় বলে গণ্য করেছেন। এবং খাস্‌সাফ (র.) ও এমনই উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত কিতাবে ইজারা অধ্যায়ে বলেছেন যে, দোকানের বিনিময়ে বাড়ি ভাড়া দেওয়া জায়েজ নেই। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এ দু'টি এক জাতীয় (جِنْس) । এ হিসেবে উক্ত মাসআলায় দু'টি বর্ণনা (رِوَايَةٌ) আছে বলে ধরে নিতে হবে। অথবা এক জাতীয় হওয়ার সন্দেহ (شُبْهَةُ الْمُجَانِس) কে সুদের হারাম হওয়ার জন্য ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ دَارًا الخ : বাড়ি এবং জমি এমনিভাবে বাড়ি এবং দোকান এক জাতীয় না। ইমাম কুদূরী (র.) এবং খাস্‌সাফ (র.) একথা উল্লেখ করেছেন। তাই এগুলোকে এক সাথে ভাগ বাটোয়ারা করা যাবে না। বরং পৃথক ভাবে করতে হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত কিতাবে একটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, দোকান এবং বাড়ি এক জাতীয় বা এক জিনসের। মাসআলাটি হচ্ছে, দোকান ভাড়া হিসেব ভোগ করার বিনিময়ে বাড়ি ভাড়া দেওয়া নাজায়েজ। মুসান্নিফ (র.)-এ বিষয়টিকে দুই ভাবে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, হয়তো একথা মানতে হবে যে, বাড়ি এবং দোকান এক জাতীয় অথবা এক জাতীয় না, দু ধরনেরই বর্ণনা রয়েছে। অথবা একথা বলা হবে যে, বাড়ি এবং দোকান প্রকৃত পক্ষে এক জাতীয় না। তবে এক জাতীয় হওয়ার সন্দেহ রয়েছে, এ হিসেবে সুদের সন্দেহ হয়। সুদের ক্ষেত্রে সুদের সন্দেহ প্রকৃত সুদের মতো হারাম। এ বিষয়টি বিবেচনা করে দোকানের বিনিময়ে বাড়ি ভাড়া দেওয়া নাজায়েজ বলা হয়েছে। যদিও বাড়ি এবং দোকান প্রকৃত পক্ষে এক জাতীয় বা এক জিন্‌স নয়।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উক্ত মাসআলায় সুদের সন্দেহ (شُبْهُ رِبٰوا) কিভাবে হয়? তাহলে এর উত্তরে বলা হবে যে, যদি বাড়ি এবং দোকানকে এক জিন্‌স বলে গণ্য করা হয়। তবে বেশ কম করা (تَفَاضُلْ) জায়েজ হলেও এক জিন্‌স হওয়ার দরুন বাকি লেনদেন করা জায়েজ হবে না। ভাড়ার লেনদেন এক সাথে নগদ হয় না। বরং পর্যায়ক্রমে ভোগ ব্যবহারের সময় অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা ভাড়া পাওনা হতে থাকে। যা নগদ না বরং বাকির অন্তর্ভুক্ত। বিস্তারিত জানার জন্য ইনায়াহ, নাতায়েজুল আফকার ও মাজমাউল আনহুর কিতাবে দেখা যেতে পারে।

فَصْلٌ فِىْ كَيْفِيَةِ الْقِسْمَةِ

قَالَ : وَيَنْبَغِي لِلْقَاسِمِ اَنْ يُصَوِّرَ مَايَقْسِمُهُ لِيُمْكِنَهُ حِفْظُهُ وَيَعْدِلُهُ يَعْنِى يُسَوِّيْهِ عَلٰى سِهَامِ الْقِسْمَةِ وَيُرْوٰى يَعْزِلُهُ اَىْ يَقْطَعُهُ بِالْقِسْمَةِ عَنْ غَيْرِهِ وَيَذْرَعُهُ لِيَعْرِفَ قَدْرَهُ وَيَقُوْمُ الْبِنَاءُ لِحَاجَتِهِ اِلَيْهِ فِىْ الْاٰخِرَةِ وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيْبٍ عَنِ الْبَاقِىْ بِطَرِيْقِهِ وَشِرْبِهِ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ لِنَصِيْبِ بَعْضِهِمْ بِنَصِيْبِ الْبَعْضِ تَعَلُّقٌ فَتَنْقَطِعُ الْمُنَازَعَةُ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْقِسْمَةِ عَلَى التَّمَامِ ـ

অনুচ্ছেদ : ভাগ বাটোয়ারার পদ্ধতি সম্পর্কে

অনুবাদ : কাসেমের [বণ্টনকারীর] জন্য উচিত হলো যে, যা ভাগ বণ্টন করছে এর একটা চিত্র [ম্যাপ] এঁকে নেওয়া। যেন তা স্মরণ রাখা সম্ভব হয় এবং বণ্টনের ভাগ হিসেবে সমান সমান করবে। এক বর্ণনায় বলা হয় যে, বণ্টনের ভাগ এক অংশকে অপর অংশ থেকে পৃথক করে ফেলবে এবং [দৈর্ঘ্যপ্রস্থ] পরিমাপ করবে। যেন পরিমাণ জানা যায়। দালানের মূল্য নির্ধারণ করবে। কেননা শেষ পর্যায়ে এর প্রয়োজন হবে। প্রতিটি অংশকে অন্য অংশ থেকে রাস্তা এবং পানির ব্যবস্থাসহ পৃথক করবে। যেন এক অংশের সাথে অপর অংশের কোনো সম্পর্ক না থাকে। এতে করে ঝগড়ার অবসান ঘটবে। এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ভাগ বাটোয়ারা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসান্নিফ (র.) প্রথমে কোন জিনিস ভাগ বাটোয়ারার আওতায় পরে এবং কোন জিনিস ভাগ বাটোয়ারার আওতায় পরে না তা বর্ণনা করেছেন। এরপর এতদ সম্পর্কিত বিস্তারিত পদ্ধতি ও আনুষাঙ্গিক বিষয়ে বর্ণনা প্রদান করেছেন।

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَنْبَغِىْ لِلْقَاسِمِ اَنْ يُصَوِّرَ الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) বন্টনকারীর জন্য ভাগ বাটোয়ারার এমন কিছু নিয়মের বর্ণনা করেছেন, যার দ্বারা বণ্টনের কাজ সহজ ও সুষ্ঠু হবে । তিনি বলেন, যে জমি ভাগ করা হবে প্রথমে এর একটি নকশা বা ম্যাপ কাগজে এঁকে নিতে হবে। যেন পুরো বিষয়টি তার স্মরণ থাকে। অতঃপর অংশীদারের সংখ্যা হিসেবে যত ভাগ করা প্রয়োজন সে অনুযায়ী সমান ভাবে ভাগ করে নিবে। জমির পরিমাণ জানার জন্য মাপ দিবে। যেহেতু জমির প্রতিটি অংশের মূল্যমান সমান করার জন্য ঘর দরজার মূল্য নির্ধারণ করার প্রয়োজন হতে পারে তাই তা প্রথমে করে নিবে। যেন কোনো ধরনের বিরোধের সুযোগ না থাকে। যদি সম্ভব হয় তবে প্রতিটি অংশের রাস্তা এবং পানির ব্যবস্থা পৃথকভাবে করে দিবে।

ثُمَّ يُلَقِّبُ نَصِيبًا بِالْأَوَّلِ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ بِالثَّانِيْ وَالثَّالِثِ عَلٰى هٰذَا ثُمَّ يُخْرِجُ الْقُرْعَةَ فَمَنْ خَرَجَ اِسْمُهُ اَوَّلًا فَلَهُ السَّهْمُ الْأَوَّلُ وَمَنْ خَرَجَ ثَانِيًا فَلَهُ السَّهْمُ الثَّانِيْ ـ وَالْاَصْلُ اَنْ يَنْظُرَ فِيْ ذٰلِكَ اِلٰى اَقَلِّ الْاَنْصِبَاءِ حَتّٰى اِذَا كَانَ الْاَقَلُّ ثُلُثًا جَعَلَهَا اَثْلَاثًا وَاِنْ كَانَ سُدُسًا جَعَلَهَا اَسْدَاسًا لِيُمْكِنَ الْقِسْمَةُ وَقَدْ شَرَحْنَاهُ مُشْبِعًا فِيْ كِفَايَةِ الْمُنْتَهٰى بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ : এরপর [সামনের] অংশের নামকরণ করবে "প্রথম অংশ" বলে এবং এর সাথেরটিকে "দ্বিতীয় অংশ" এবং এর সাথেরটিকে "তৃতীয় অংশ" এমনি ভাবে [নামকরণ করবে] এরপর লটারি দেবে। প্রথমে যার নাম উঠবে সে প্রথম অংশ পাবে। দ্বিতীয় বার যার নাম উঠবে সে দ্বিতীয় অংশ পাবে। ভাগ বাটোয়ারার নিয়ম হলো যে, এতে সবচেয়ে কম অংশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কম অংশ যদি এক তৃতীয়াংশ হয়। তবে তিনভাগে ভাগ করতে হবে। যদি ছয় ভাগের একভাগ হয় তবে ছয় ভাগে ভাগ করতে হবে। যেন ভাগ করার সুযোগ হয়। এ বিষয়ে কেফায়াতুল মুনতাহী কিতাবে আল্লাহ পাকের রহমতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ يُلَقِّبُ نَصِيبًا بِالْأَوَّلِ الخ : জমি ভাগ করার পর একদিক থেকে নামকরণ এভাবে করা হবে যে, প্রথম অংশের পাশেরটির নাম দ্বিতীয় অংশ। এর পাশেরটির নাম তৃতীয় অংশ। এরপর লটারীর মাধ্যমে প্রথমে যার নাম উঠবে সে প্রথম অংশ পাবে। এমনিভাবে এরপর যার নাম উঠবে সে দ্বিতীয় অংশ পাবে। এ ভাবে সকল শরিককে তাদের অংশ দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَالْاَصْلُ اَنْ يَنْتَظِرَ فِيْ ذٰلِكَ اَقَلَّ الخ : সকল শরিক সমান অংশীদার হলে শরিকগণের সংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করবে। অর্থাৎ যতজন শরিক ততটি ভাগ করবে। একথা সুস্পষ্ট। তবে যদি শরিকগণের অংশের পরিমাণে পার্থক্য থাকে তবে কত ভাগ করতে হবে? এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) নিয়ম বলে দিয়েছেন যে, সবচেয়ে ছোট অংশের প্রতি লক্ষ্য করে ভাগ করতে হবে। সবচেয়ে ছোট অংশের পরিমাণ যতটুকু ততটুকু করে সম্পূর্ণ জমি ভাগ করতে হবে। এতে করে সকল শরিকের অংশের হিসাব মিলে যাবে। তিনজন শরিকের সকলের অংশ সমান হলে তিন ভাগ করলেই প্রতি শরিক তার প্রাপ্য অংশ পেয়ে যাবে। এটি সহজ হিসাব। তবে যদি এমন হয় যে, একজনের অর্ধেক অংশ দ্বিতীয়জনের তিন ভাগের এক ভাগ এবং তৃতীয় জনের ছয় ভাগের একভাগ। এ ক্ষেত্রে মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণ জমিকে ছয় ভাগ করা হবে। যার অর্ধেক অংশ সে ছয়ভাগ কৃত অংশের তিন ভাগ নিবে। দ্বিতীয়জন দুই অংশ নিবে। আর তৃতীয়জন পাবে এক অংশ। এভাবে প্রত্যেকে তার প্রাপ্য অংশ পাবে। এবং হিসেবও মিলে যাবে। অথবা যদি শরিক চারজন হয়। একজন অর্ধেকের মালিক। আরেক জন তিন ভাগের একভাগের মালিক। অপর দুইজনের উভয়ে বার ভাগের এক ভাগ করে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জমিকে বার ভাগে ভাগ করতে হবে। যার অর্ধেক জমি সে ছয় অংশ নিবে। যার তিন ভাগের এক ভাগ সে চার অংশ নিবে। বাকি দুজন এক অংশ করে নিবে। এভাবে সকল শরিক সঠিক প্রাপ্য অংশ পাবে এবং হিসেবও মিলে যাবে। মুসান্নিফ (র.) এ বিষয়ে কেফায়াতুল মুনতাহী কিতাবে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

وَقَوْلُهُ فِى الْكِتَابِ وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيْبٍ بِطَرِيْقِهِ وَشِرْبِهِ بَيَانُ الْاَفْضَلِ فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ اَوْ لَمْ يُمْكِنْ جَازَ عَلٰى مَا نَذْكُرُهُ بِتَفْصِيْلِهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْقُرْعَةُ لِتَطْيِيْبِ الْقُلُوْبِ وَاِزَاحَةِ تُهْمَةِ الْمَيْلِ حَتّٰى لَوْ عَيَّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ نَصِيْبًا مِنْ غَيْرِ اِقْتِرَاعٍ جَازَ لِاَنَّهُ فِى مَعْنَى الْقَضَاءِ فَيَمْلِكُ الْاِلْزَامَ.

অনুবাদ : কুদূরী (র.) যা বলেছেন "وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيْبٍ بِطَرِيْقِهِ وَشِرْبِهِ" অর্থাৎ প্রত্যেক অংশকে রাস্তা ও পানির ব্যবস্থাসহ পৃথক করবে। উত্তম নিয়ম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিচারক যদি তা না করে অথবা যদি তা করা সম্ভব না হয়। তাহলেও জায়েজ হবে। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। লটারি মানসিক সান্তনা ও স্বজন প্রীতির অপবাদ দূর করার জন্য দেওয়া হয়। যদি বিচারক লটারি ছাড়া প্রত্যেক শরিকের অংশ নির্ধারণ করে দেয় তাহলেও জায়েজ হবে। কেননা ভাগ বাটোয়ারা বিচার কার্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিচারক বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ فِى الْكِتَابِ وَيُفْرِزُ كُلَّ الخ : কুদূরী (র.) যে কথা বলেছেন তা হলো, রাস্তা ও পানির ব্যবস্থা সহ প্রতিটি অংশকে পৃথক করবে। আর এটা কোনো বাধ্যতামূলক আইন নয়; বরং এটা উত্তম। বিচারক যদি তা না করেন বা অবস্থা এমন হয় যে, রাস্তা এবং পানির ব্যবস্থা পৃথক করা যায় না। তাহলেও তা জায়েজ হবে। এটা কোনো অপরিহার্য নিয়ম না। লটারির বিষয়টিও বাধ্যতামূলক না। বিচারক ইচ্ছে করলে লটারি নাও দিতে পারেন। লটারির দ্বারা শরিকগণের মানসিক সান্ত্বনা হয় এবং বিচারক স্বজনপ্রীতির অপবাদ থেকে রেহাই পান। লটারির মাধ্যমে অংশ নির্ধারণ করলে কেউ আর এ কথা বলতে পারবেনা যে, বিচারক অমুককে ভালো অংশ দিয়েছে বা পক্ষপাতিত্ব করেছে। লটারির মাধ্যমে বিচারকের অংশ নির্ধারণ করা বিচারকের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। ইচ্ছা করলে বিচারক লটারি ছাড়া শরিকগণের অংশ নির্ধারণ করে দিতে পারেন। ভাগ বাটোয়ারা বিচারকার্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই বিচারক বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা বলে লটারি ছাড়া শরিকগণের মাঝে অংশ নির্ধারণ করে দিতে পারেন। যদি বিচারক ভাগ বাটোয়ারা না করে; বরং অন্য কাসেম বা ভাগ বন্টনকারী তা করে সেও শরিকগণের মাঝে অংশ নির্ধারণ করতে পারবে। কেননা সে বিচারকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে ভাগবাটোয়ারা করছে।

قَالَ : وَلَا يَدْخِلُ فِى الْقِسْمَةِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ اِلَّا بِتَرَاضِيْهِمْ لِاَنَّهُ لَا شِرْكَةَ فِى الدَّرَاهِمِ وَالْقِسْمَةُ مِنْ حُقُوْقِ الْاِشْتِرَاكِ وَلِاَنَّهُ يَفُوْتُ بِهِ التَّعْدِيْلُ فِى الْقِسْمَةِ لِاَنَّ اَحَدَهُمَا يَصِلُ اِلَى عَيْنِ الْعِقَارِ وَدَرَاهِمِ الْاٰخَرِ فِىْ ذِمَّتِهِ وَلَعَلَّهَا لَا تُسَلَّمُ لَهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন শরিকগণের সম্মতি ছাড়া দিরহাম দিনারকে ভাগ বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত করবে না । কেননা দিরহামে কোনো ধরনের অংশীদারিত্ব নেই । এবং ভাগ বাটোয়ারা অংশীদারিত্ব সম্পর্কীয় বিষয় । তা ছাড়া এর দ্বারা ভাগ বাটোয়ারার সমতা ঠিক রাখা যাবে না । কেননা এতে করে এক শরিক প্রকৃত জমি পাবে এবং তার কাছে অপর শরিকের দিরহাম পাওনা থাকবে । এমনও হতে পারে যে, তাকে দিরহাম আর দেওয়া হবে না ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَدْخِلُ فِى الْقِسْمَةِ الدَّرَاهِمَ الخ : জমি ভাগ বাটোয়ারায় শরিকগণের সম্মতি ছাড়া দিরহাম দিনার বা টাকা পয়সাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না । কেননা জমিতে শরিকগণের অংশীদারিত্ব আছে । দিরহাম দিনারে কোনো অংশীদারিত্ব নেই যে জিনিসে অংশীদারিত্ব থাকে তা ভাগ করা হয় । সুতরাং জমি ভাগ করা হবে । দিরহাম দিনারকে ভাগ বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত করা হবে না । তাছাড়া ভাগ বাটোয়ারায় দিরহাম দিনারকে শামিল করলে ভাগ বাটোয়ারায় সমতা রক্ষা করা যায় না । এতে দেখা যায় যে, এক শরিক জমি পেল । সে তার প্রাপ্য অংশ তাৎক্ষণিক পেয়ে তার কাছে যে দিরহাম জমির বিনিময়ে অন্য শরিকের পাওনা হয় । তা সে তাৎক্ষণিক পায় না । তার কাছে পাওনা হয় । তাই উভয় শরিকের প্রাপ্ত অংশ সমান হয় না । এমনও হতে পারে তার প্রাপ্য দিরহাম তাকে দেওয়া হবে না । যেমন একটি বাড়ির যৌথ মালিক দুই ব্যক্তি । তারা তাদের বাড়িটিকে ভাগ করতে চায় । এক শরিক যেদিকে ঘর দরজা বেশি সে অংশটি নিতে চায় এবং এর বিনিময়ে অপর শরিককে টাকা দিতে চায় । কিন্তু অপর শরিক উক্ত ঘর দরজার বিনিময়ে টাকা নিতে চায় না; বরং জমি নিতে চায় । এ অবস্থায় বিচারক তাকে টাকা নিতে বাধ্য করবেন না । কেননা বাড়ির ঘর দরজা এবং জমিতে অংশীদারিত্ব রয়েছে । টাকায় অংশীদারিত্ব নেই । সুতরাং তাদের সম্মতি ছাড়া বিচারক ভাগ বাটোয়ারায় টাকা বা দিরহামকে অন্তর্ভুক্ত করবেন না । তবে বিশেষ প্রয়োজনে টাকা বা দিরহামকে ভাগ বাটোয়ারা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । এ বিষয়ে মাজমাউল আনহুর ২য় খণ্ড ৪৭৫ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে ।

وَاِذَا كَانَ اَرْضٌ وَبِنَاءٌ فَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ يَقْسِمُ كُلَّ ذٰلِكَ عَلٰى اِعْتِبَارِ الْقِيْمَةِ لِاَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اِعْتِبَارُ الْمُعَادَلَةِ اِلَّا بِالتَّقْوِيْمِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ يَقْسِمُ الْاَرْضَ بِالْمَسَاحَةِ لِاَنَّهُ هُوَ الْاَصْلُ فِى الْمَمْسُوْحَاتِ ثُمَّ يُرَدُّ مَنْ وَقَعَ الْبِنَاءُ فِىْ نَصِيْبِهِ اَوْ مَنْ كَانَ نَصِيْبُهُ اَجْوَدَ دَرَاهِمَ عَلَى الْاٰخَرِ حَتّٰى يُسَاوِيْهِ فَتَدْخُلُ الدَّرَاهِمُ فِى الْقِسْمَةِ ضَرُوْرَةً كَالْاَخِ لَا وَلَايَةَ لَهُ فِى الْمَالِ ثُمَّ يَمْلِكُ تَسْمِيَةَ الصِّدَاقِ ضَرُوْرَةَ التَّزْوِيْجِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهُ يُرَدُّ عَلٰى شَرِيْكِهِ بِمُقَابَلَةِ الْبِنَاءِ مَايُسَاوِيْهِ مِنَ الْعَرْصَةِ وَاِذَا بَقِىَ فَضْلٌ وَلَا يُمْكِنُ تَحْقِيْقُ التَّسْوِيَةِ بِاَنْ لَا تَفِىَ الْعَرْصَةُ بِقِيْمَةِ الْبِنَاءِ حِيْنَئِذٍ يُرَدُّ لِلْفَضْلِ دَرَاهِمَ لِاَنَّ الضَّرُوْرَةَ فِىْ هٰذَا الْقَدْرِ فَلَا يُتْرَكُ الْاَصْلُ اِلَّا بِهَا وَهٰذَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ الْاَصْلِ ـ

অনুবাদ : যদি [শরিকানা সম্পদ] জমি এবং বাড়ি হয়। তবে এ বিষয়ে আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রতিটি অংশের মূল্যমান হিসেবে ভাগ করা হবে। কেননা মূল্য নির্ধারণ ছাড়া সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, জমিকে আয়তন পরিমাপ দ্বারা ভাগ করা হবে। কেননা জমির পরিমাপে এটাই আসল। এরপর যার অংশে দালান কোঠা পরবে বা যার অংশ বেশি দামি হবে সে অপর শরিককে দিরহাম ফেরত দিবে। যেন [মূল্যমান হিসেবে] তার অংশ সমান হয় এ ক্ষেত্রে দিরহামকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে ভাগ বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যেমন বোনের মালের উপর ভাইয়ের কোনো অভিভাবকত্ব নেই। তা সত্ত্বেও বোনের বিবাহের প্রয়োজনে ভাই মহর নির্ধারণের মালিক হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, দালান কোঠার বিনিময়ে সে তার অপর শরিককে এর মূল্যের পরিমাণ বাড়ির খালি জায়গা দিবে। যদি এর চেয়ে বেশি হয় এবং সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয়। দালান কোঠার মূল্যের সাথে খালি জায়গা না কুলোয়। তখন অতিরিক্ত টুকুর জন্য দিরহাম ফেরত দিবে। কেননা এতটুকুই প্রয়োজন । সুতরাং এ প্রয়োজন ছাড়া আসল নিয়ম বাদ দেওয়া যাবে না। উক্ত বর্ণনা মাবসূতের বর্ণনা অনুযায়ী হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا كَانَ اَرْضٌ وَبِنَاءٌ فَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) الخ : এমন যৌথ মালিকানাধীন বাড়ি যার একদিকে দালান কোঠা আর অপর দিকে খালি জায়গা। এমন শরিকি বাড়ির ভাগ বাটোয়ারার প্রয়োজন হলে বিচারক তা কিভাবে ভাগ করবেন? এ বিষয়ে মুসান্নিফ (র.) তিন ইমামের অভিমত বর্ণনা করেছেন।

১. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, বাড়ির খালি জায়গা , দালান কোঠা সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করে মূল্যমান হিসেবে ভাগ বাটোয়ারা করা হবে। কেননা এ ছাড়া সমান ভাবে ভাগ করা যাবে না। আয়তনের মাপ দ্বারা সমতা রক্ষা হবে না।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, প্রথমে বাড়িটিকে আয়তন পরিমাপ দ্বারা ভাগ করা হবে। এরপর দেখা হবে কোন ভাগে দালান কোঠা পরেছে। অথবা কোনো ভাগের মূল্য বেশি? সে হিসেবে এক শরিক অপর শরিক কে দিরহাম দিবে যেন উভয় শরিকের ভাগ সমান হয়। যদিও ভাগ বাটোয়ারায় দিরহাম দিনারকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। উক্ত মাসআলায় বিশেষ প্রয়োজনে দিরহাম দিনারকে ভাগ বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর জন্য মুসান্নিফ (র.) মিছাল পেশ করেন। তিনি বলেন, যেমন ভাই যখন বিবাহের অভিভাবক হয় তখন সে মহর নির্ধারণেরও মালিক হয়। যদিও বোনের সম্পদের উপর ভাইয়ের কোনো ধরনের অভিভাবকত্ব নেই তা সত্ত্বেও যেহেতু ভাই বোনের বিবাহের অলি বা অভিভাবক হয়। তাই বোনের সম্পদে যদিও ভাইয়ের কোনো অভিভাবকত্ব নেই তবুও বিবাহের প্রয়োজনে বোনের মহর নির্ধারণ করা ভাইয়ের জন্য জায়েজ। এমনিভাবে বিশেষ প্রয়োজনে ভাগ বাটোয়ারায় দিরহাম দিনারকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যার ভাগে দালান কোঠা পরবে সে খালি জায়গা দ্বারা দালান কোঠার বিনিময় দিবে। তা যদি না কুলোয় অর্থাৎ খালি জায়গা যদি দালান কোঠার মূল্যের চেয়ে কম হয় তাহলে দালান কোঠার বিনিময়ের সমান করার জন্য বাকি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দিরহামকে ভাগ বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কেননা اَلضَّرُوْرَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ। প্রয়োজনের পরিমাণ মাফিক প্রয়োজনের অনুমোদন হয় এবং উক্ত মাসআলায় এতটুকুই প্রয়োজন।

قَالَ : فَإِنْ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلٌ فِيْ نَصِيبِ الْآخَرِ أَوْ طَرِيْقٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْقِسْمَةِ فَإِنْ أَمْكَنَ صَرْفُ الطَّرِيْقِ وَالْمَسِيْلِ عَنْهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَطْرِقَ وَيُسِيْلَ فِيْ نَصِيبِ الْآخَرِ . لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَحْقِيْقُ مَعْنَى الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فُسِخَتِ الْقِسْمَةُ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مُخْتَلِفَةٌ لِبَقَاءِ الْاِخْتِلَاطِ فَتُسْتَأْنَفُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ حَيْثُ لَا يَفْسُدُ فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهُ تَمَلُّكُ الْعَيْنِ وَإِنَّهُ يُجَامِعُ تَعَذُّرًا لِانْتِفَاعٍ فِي الْحَالِ أَمَّا الْقِسْمَةُ لِتَكْمِيْلِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَتِمُّ ذٰلِكَ إِلَّا بِالطَّرِيْقِ .

অনুবাদ : কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক যদি শরিকগণের মাঝে এমন ভাবে ভাগ করে দেয় যে, একজনের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা রাস্তা অন্য শরিকের অংশের ভেতরে হয় এবং তা বণ্টন চুক্তিতে উল্লেখ না করা হয়। তবে যদি রাস্তা এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অন্যের অংশ থেকে ফেরানো সম্ভব হয়। তবে অন্যের অংশের ভেতরে রাস্তা বানানো বা ড্রেন বানানোর তার অধিকার নেই। কেননা অন্যের ক্ষতি ছাড়াই ভাগ বাটোয়ারা ঠিক রাখা সম্ভব। আর যদি ফেরানো সম্ভব না হয় তবে ভাগ বাটোয়ারা রহিত করা হবে। কেননা সম্পদের মিশ্রণ থাকার দরুন ভাগ বাটোয়ারা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। তাই পুনরায় ভাগ বাটোয়ারা করা হবে। তবে বিক্রি (بَيْع) এমন না। কারণ তা এ অবস্থায় রহিত হয় না। কেননা বিক্রির উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্ধারিত পণ্যের মালিক হওয়া। তা উপস্থিত ব্যবহারের উপযোগী না হলেও হতে পারে। তবে ভাগ বাটোয়ারা করা হয় ভোগ ব্যবহারের পূর্ণতার জন্য। তা রাস্তা ব্যতীত পূর্ণতা হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنْ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ وَلِأَحَدِهِمْ الخ : যদি বিচারক শরিকগণের মাঝে জমি ভাগ করে দেয় এবং উক্ত ভাগ বাটোয়ারা রাস্তা এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা না হয়। তবে এমন ভাবে ভাগ করা হবে যে, এক শরিক অপর শরিকের অংশের ভেতরে রাস্তা এবং ড্রেন ব্যবহার করে। তবে এখানে দেখতে হবে, অপর শরিকের জায়গা ছাড়া রাস্তা এবং ড্রেন করা সম্ভব কিনা। যদি তা করা সম্ভব হয়। তবে তাই করতে হবে। অর্থাৎ নিজের অংশের ভেতরে রাস্তা এবং ড্রেন বানিয়ে নিতে হবে। অন্যের অংশে রাস্তা এবং ড্রেন বানানো যাবে না। কেননা অন্যের ক্ষতি না করে রাস্তা এবং ড্রেনকে ভাগ বাটোয়ারায় পৃথক করা সম্ভব। এবং ভাগ বাটোয়ারা করা হয় পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ ব্যবহারের সুযোগ করার জন্য। তা এখানে সম্ভব। সুতরাং তাই করতে হবে। আর যদি তা না হয়। অর্থাৎ অন্যের অংশের ভেতর দিয়ে ছাড়া রাস্তা এবং ড্রেন করা সম্ভব না হয় তবে উক্ত ভাগ বাটোয়ারাকে রহিত করা হবে। বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ঠিক থাকায় বিক্রয় ফাসেদ হবে না। কারণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকানা লাভ করা। মালিকানার জন্য বর্তমানে ব্যবহারের উপযোগী হওয়া শর্ত না। তাই বেচাকেনা ঠিক থাকবে।

وَلَوْ ذَكَرَ الْحُقُوْقَ فِي الْوَجْهِ الْاَوَّلِ كَذٰلِكَ الْجَوَابُ لِاَنَّ مَعْنَى الْقِسْمَةِ الْاِفْرَازُ وَالتَّمْيِيْزُ وَتَمَامُ ذٰلِكَ بِاَنْ لَا يَبْقٰى لِكُلِّ وَاحِدٍ تَعَلُّقٌ بِنَصِيْبِ الْاٰخَرِ وَقَدْ اَمْكَنَ تَحْقِيْقُهٗ بِصَرْفِ الطَّرِيْقِ وَالْمَسِيْلِ اِلٰى غَيْرِهٖ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَيُصَارُ اِلَيْهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ اِذَا ذُكِرَ فِيْهِ الْحُقُوْقُ حَيْثُ يَدْخُلُ فِيْهِ مَا كَانَ لَهٗ مِنَ الطَّرِيْقِ وَالْمَسِيْلِ لِاَنَّهٗ اَمْكَنَ تَحْقِيْقُ مَعْنَى الْبَيْعِ وَهُوَ التَّمْلِيْكُ مَعَ بَقَاءِ هٰذَا التَّعَلُّقِ بِمِلْكِ غَيْرِهٖ ـ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِيْ يَدْخُلُ فِيْهَا لِاَنَّ الْقِسْمَةَ لِتَكْمِيْلِ الْمَنْفَعَةِ ذٰلِكَ بِالطَّرِيْقِ وَالْمَسِيْلِ فَيَدْخُلُ عِنْدَ التَّنْصِيْصِ بِاِعْتِبَارِهٖ وَفِيْهَا مَعْنَى الْاِفْرَازِ وَذٰلِكَ بِانْقِطَاعِ التَّعَلُّقِ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا فَبِاعْتِبَارِهٖ لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيْصٍ بِخِلَافِ الْاِجَارَةِ حَيْثُ يَدْخُلُ فِيْهَا بِدُوْنِ التَّنْصِيْصِ لِاَنَّ كُلَّ الْمَقْصُوْدِ الْاِنْتِفَاعُ وَذٰلِكَ لَا يَحْصُلُ اِلَّا بِاِدْخَالِ الشِّرْبِ وَالطَّرِيْقِ فَيَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ ـ

অনুবাদ : এবং যদি প্রথম সূরতে মাসআলায় অধিকার (حُقُوْق) -এর কথা উল্লেখ করে তবে এর উত্তর পূর্বের মতোই। কারণ ভাগ বাটোয়ারার অর্থ হচ্ছে পৃথক করা এবং আলাদা করা। তা পরিপূর্ণ হবে যখন এক শরিকের অংশের সাথে অপর শরিকের কোনো ধরনের সম্পর্ক না থাকবে। তা রাস্তা এবং ড্রেনকে অন্যের ক্ষতি না করে অপর শরিকের অংশের বাহিরে ফিরিয়ে দিয়ে করা সম্ভব। সুতরাং তাই করতে হবে। তবে বিক্রয় এমন না। তাতে যদি অধিকার (حُقُوْق) -এর কথা উল্লেখ করা হয় তবে রাস্তা এবং ড্রেন যে অধিকার সমূহ আছে তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ বিক্রয়ের অর্থ ঠিক রাখা সম্ভব হবে। অর্থাৎ অন্যের মালিকানার সাথে সম্পর্ক সহকারে মালিকানা অর্জন করা তো সম্ভব। দ্বিতীয় সূরতে মাসআলায় রাস্তা এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাগ বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ ভাগ বাটোয়ারা ভোগ ব্যবহারকে পরিপূর্ণ করার জন্য করা হয়। সুতরাং স্পষ্ট উল্লেখ করার দ্বারা ভোগ ব্যবহারে পূর্ণতা হিসেবে রাস্তা এবং ড্রেন ভাগ বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে পৃথকীকরণের অর্থও রয়েছে। এ হিসেবে উল্লেখ না করলে রাস্তা এবং ড্রেন ভাগ বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে ইজারা বা ভাড়া এমন নয়। কারণ এর মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোগ ব্যবহার করা। রাস্তা এবং পানির ব্যবস্থা ছাড়া এর উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। সুতরাং উল্লেখ করা ছাড়াই তা এতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرَ الْحُقُوْقَ فِى الْوَجْهِ الخ : যদি এমন হয় যে ভাগ বাটোয়ারায় রাস্তা এবং ড্রেন পৃথক ভাবে করা সম্ভব এবং ভাগ বাটোয়ারায় حُقُوْق অর্থাৎ অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়। যেমন একথা বলা হলো তোমার অংশ রাস্তাও ড্রেনের অধিকারসহ। এ অবস্থায় রাস্তা এবং ড্রেন পৃথক করা জরুরি। কারণ এগুলো পৃথক করা ছাড়া ভাগ বাটোয়ারার উদ্দেশ্য ঠিক থাকে না।

উপরিউক্ত সুরতে মাসআলা যদি ক্রয়-বিক্রয়ে হয়। তবে রাস্তা এবং ড্রেন অন্যদিকে ফেরানোর প্রয়োজন নেই। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য এভাবে ঠিক থাকে। রাস্তা এবং ড্রেনের কথাটি অধিকার হিসেবে গণ্য হবে। রাস্তা এবং ড্রেনের অধিকার উক্ত জমি ক্রয়ের শর্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং তা অন্যের জায়গায় থাকবে।

قَوْلُهُ وَفِى الْوَجْهِ الثَّانِى يَدْخُلُ فِيْهَا الخ : ভাগ বাটোয়ারার দুইটি বিষয় রয়েছে। একটি ভোগ ব্যবহারকে পরিপূর্ণ করা (تَكْمِيْلُ مَنْفَعَتْ) আর অপরটি পৃথকীকরণ! দ্বিতীয় সূরতের মাসআলায় অর্থাৎ রাস্তা ও ড্রেনসহ ভাগ করা যায় না। এমতাবস্থায় উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। রাস্তা ও ড্রেনকে ভাগ বাটোয়ারায় উল্লেখ করা হলে ভোগ ব্যবহার বা তাকমীলে মানফা'আতের প্রতি লক্ষ্য করে একে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাস্তা ও ড্রেনকে উল্লেখ না করা হলে পৃথকিকরণ বা ইফরাযের প্রতি লক্ষ্য করে একে ভাগ বাটোয়ারার অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। বরং বণ্টন রহিত করে পুনরায় বণ্টন করা হবে। তবে ইজারা বা ভাড়ার বিষয়টি এর চেয়ে ভিন্ন। এতে রাস্তা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হোক বা না হোক রাস্তা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ ইজারার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোগ ব্যবহার করা এবং তা রাস্তা ও পানি ব্যবস্থা ছাড়া হয় না। সুতরাং এগুলো কোনো ধরনের উল্লেখ ছাড়াই ইজারা বা ভাড়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَلَوْ اِخْتَلَفُوْا فِىْ رَفْعِ الطَّرِيْقِ بَيْنَهُمْ فِى الْقِسْمَةِ اِنْ كَانَ يَسْتَقِيْمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ طَرِيْقٌ يَفْتَحُهُ فِىْ نَصِيْبِهِ قَسَمَ الْحَاكِمُ مِنْ غَيْرِ طَرِيْقٍ يَرْفَعُ لِجَمَاعَتِهِمْ ـ لِتَحَقُّقِ الْاِفْرَازِ بِالْكُلِّيَّةِ دُوْنَهُ ـ وَاِنْ كَانَ لَا يَسْتَقِيْمُ ذٰلِكَ رَفَعَ طَرِيْقًا بَيْنَ جَمَاعَتِهِمْ لِيَتَحَقَّقَ تَكْمِيْلُ الْمَنْفَعَةِ فِيْمَا وَرَاءَ الطَّرِيْقِ ـ وَلَوْ اِخْتَلَفُوْا فِىْ مِقْدَارِهِ جُعِلَ عَلٰى عَرْضِ بَابِ الدَّارِ وَطُوْلِهِ لِاَنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِهِ وَالطَّرِيْقُ عَلٰى سِهَامِهِمْ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِاَنَّ الْقِسْمَةَ فِيْمَا وَرَاءَ الطَّرِيْقِ لَا فِيْهِ ـ وَلَوْ شَرَطُوْا اَنْ يَكُوْنَ الطَّرِيْقُ بَيْنَهُمَا اَثْلَاثًا جَازَ وَاِنْ كَانَ اَصْلُ الدَّارِ نِصْفَيْنِ ـ لِاَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى التَّفَاضُلِ جَائِزَةٌ بِالتَّرَاضِىْ ـ

অনুবাদ : রাস্তা ছাড়ার বিষয়ে যদি শরিকগণের মাঝে মতানৈক্য হয়। আর জমি যদি এমন হয় যে প্রতি শরিক তার অংশে রাস্তা করে নিতে পারবে। তবে বিচারক শরিকদের জন্য রাস্তা করা ছাড়াই ভাগ করে দিবে। কেননা এতে রাস্তা ছাড়াই পূর্ণাঙ্গ পৃথকীকরণ হচ্ছে। যদি এমন না হয় যে, সকলেই নিজ নিজ রাস্তা বের করে নিতে পারবে। তবে সকল শরিকের মাঝখানে বিচারক রাস্তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিবে। যেন রাস্তার জায়গা বাদ দিয়ে বাকি জায়গা ভোগ ব্যবহারের পূর্ণতা হয়। শরিকগণ যদি রাস্তার পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য করে। তবে বাড়ির মূল দরজার সমান প্রস্ত এবং এর মতো উঁচু করা হবে। কারণ এতে প্রয়োজন মিটবে। রাস্তার জায়গা শরিকগণের অংশের আনুপাতিক হারে হবে। যেমনটি ভাগ করার পূর্বে ছিল। কেননা রাস্তা বাদ দিয়ে ভাগ বাটোয়ারা করা হবে। যদি শরিকগণ শর্ত আরোপ করে যে, রাস্তা একজনের এক তৃতীয়াংশ এবং অপরজনের দুই তৃতীয়াংশ তবে তা জায়েজ হবে। যদিও মূল বাড়ির ভাগ অর্ধেক অর্ধেক হয়। কেননা শরিকগণের সম্মতি ক্রমে বেশকম করে ভাগ করা জায়েজ আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اِخْتَلَفُوْا فِىْ رَفْعِ الطَّرِيْقِ الخ : শরিকগণের মাঝে যদি রাস্তার বিষয়ে মতভেদ হয়। কেউ রাস্তার জন্য জায়গা ছাড়তে রাজি আছে আবার কেও রাজি না। তাহলে বিচারক লক্ষ্য করে দেখবে যে, প্রতি শরিক নিজ নিজ জায়গা দিয়ে রাস্তা করে চলতে পারবে কি না। যদি এমন হয় যে, সকলেই নিজ নিজ জায়গা দিয়ে চলতে পারবে তবে বিচারক রাস্তা ছাড়াই তা ভাগ করে দেবেন। এতে কোনো সমস্যা হবে না।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ لَا يَسْتَقِيْمُ ذٰلِكَ الخ : যদি জমি এমন হয় সকল শরিকের পক্ষে রাস্তা বের করা সম্ভব না। তবে বিচারক সকলের জন্য সম্মিলিত একটি রাস্তার জায়গা রেখে বাদ বাকি জায়গা ভাগ করে দিবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ لَا يَسْتَقِيْمُ ذٰلِكَ الخ : শরিকগণের মাঝে যদি মতভেদ দেখা দেয় যে, রাস্তার পরিমাণ কতটুকু হবে। তবে বাড়ির মূল গেটের সমান প্রশস্ত রাখা হবে। প্রতি শরিকের অংশের আনুপাতিক হারে রাস্তার জায়গা ছাড়া হবে। কারণ রাস্তার জায়গা হবে না। রাস্তার জায়গা বাদ দিয়ে যেন বাকি জায়গা পূর্বের আনুপাতিক হারে পায়। একথা ধরে নিতে হবে রাস্তার জায়গা ভাগ করা হচ্ছে না। রাস্তা বাদ দিয়ে বাকি জায়গা ভাগ করা হচ্ছে। তবেই শরিকগণের অংশ ঠিক থাকবে।

তবে সকলের সম্মতিক্রমে যদি অংশের পার্থক্য হয় তবে তা জায়েজ হবে। যেমন একটি বাড়ির দুইজন মালিক। উভয়ের অংশ সমান। অর্ধেক অর্ধেক। এক্ষেত্রে যদি সম্মতিক্রমে এক শরিক রাস্তার এক তৃতীয়াংশ এবং অপর শরিক দুই তৃতীয়াংশ দেয় তবে তা জায়েজ হবে। কারণ শরিকগণের সম্মতিক্রমে ভাগ বাটোয়ারা বেশকম করা যেতে পারে।

কিতাবে "طُوْل" শব্দ দ্বারা উচ্চতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাস্তার উচ্চতা বাড়ির মূল গেটের সমান হবে।

قَالَ : وَإِذَا كَانَ سِفْلٌ لَا عِلْوَ عَلَيْهِ وَعِلْوٌ لَا سِفْلَ لَهُ وَسِفْلٌ لَهُ عِلْوٌ قُوِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ وَقُسِّمَ بِالْقِيْمَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِغَيْرِ ذٰلِكَ . قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ اَنَّهُ يُقْسَمُ بِالذَّرْعِ . لِمُحَمَّدٍ اَنَّ السِّفْلَ يَصْلُحُ لِمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ الْعِلْوُ مِنْ اِتِّخَاذِهِ بِيْرَ مَاءٍ اَوْ سَرْدَابًا اَوْ اَصْطَبْلًا اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّعْدِيْلُ اِلَّا بِالْقِيْمَةِ . وَهُمَا يَقُوْلَانِ اَنَّ الْقِسْمَةَ بِالذَّرْعِ هِيَ الْاَصْلُ لِاَنَّ الشِّرْكَةَ فِي الْمَذْرُوْعِ لَا فِي الْقِيْمَةِ فَيُصَارُ اِلَيْهِ مَا اَمْكَنَ وَالْمَرْعِيُّ التَّسْوِيَةُ فِي السُّكْنٰى لَا فِي الْمَرَافِقِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِيْمَا بَيْنَهُمَا فِيْ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ بِالذَّرْعِ . فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) ذِرَاعٌ مِنْ سِفْلٍ بِذِرَاعَيْنِ مِنْ عِلْوٍ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ قِيْلَ اَجَابَ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلٰى عَادَةِ اَهْلِ عَصْرِهِ اَوْ اَهْلِ بَلَدِهِ فِيْ تَفْضِيْلِ السِّفْلِ عَلَى الْعِلْوِ وَاسْتِوَائِهِمَا وَتَفْضِيْلِ السِّفْلِ مَرَّةً وَالْعِلْوِ اُخْرٰى وَقِيْلَ هُوَ اِخْتِلَافُ مَعْنًى .

অনুবাদ : আল্লামা কুদূরী (র.) বলেন, যদি [যৌথ বাড়ি] এমন হয় যে বাড়ির নিচের তলা শরিকগণের। উপরের তলা তাদের না এবং বাড়ির অন্য অংশে উপরের তলা তাদের নিচের তলা তাদের না। আরেক অংশে নিচের তলা এবং উপরের তলা তাদের। তবে বাড়ির প্রত্যেক অংশের পৃথক পৃথক ভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং মূল্যমান হিসেবে ভাগ করা হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হবে না। মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত অভিমত ইমাম মুহাম্মদ (র.) আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আয়তনের পরিমাপে ভাগ করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে যে, নিচ তলা যে সব কাজের উপযুক্ত উপরের তলা সে সব কাজের উপযুক্ত নয়। যেমন পানির কূপ খনন, ভূগর্ভস্থ [আন্ডার গ্রাউন্ড] কক্ষ নির্মাণ, আস্তাবল [ঘোড়াশালা] বানানো ইত্যাদি। সুতরাং মূল্য নির্ধারণ ছাড়া ভাগ বাটোয়ারায় সমতা রক্ষা করা যাবে না। শায়খাইন (র.) আয়তনের পরিমাপই হচ্ছে আসল। কারণ আয়তনের পরিমাপে অংশীদারিত্ব আছে। মূল্যে অংশিদারিত্ব নেই। তাই যথা সম্ভব এটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। [ভাগ বাটোয়ারায়] লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে বাসস্থান। সুযোগ সুবিধা নয়। আবার শায়খাইন (র.)-এর মাঝে আয়তনে পমিাপের পদ্ধতিতে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, নিচ তলার এক হাতের বিনিময়ে উপরের তলার দুই হাত হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, এক হাতের বিনিময়ে এক হাত। কারো মতে, প্রত্যেকে নিজের যুগ বা তার শহরের প্রচলন হিসেবে বলেছেন যে, নিচ তলা উপর তলার চেয়ে প্রাধান্য হবে। উভয় তলার মান সমান হবে। কখনো নিচ তলার প্রাধান্য হবে। আবার কখনো উপরের তলার প্রাধান্য হবে। কারো মতে, তাদের মাঝে মৌলিকভাবে মতানৈক্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا كَانَ سِفْلٌ لَا عِلْوَ عَلَيْهِ وَعِلْوٌ الخ : যেমন একটি বাড়ির তিনটি বিল্ডিং এর দুইজন যৌথ মালিক। তবে এর প্রথমটির নিচতলা তাদের। উপরের তলা তাদের না। দ্বিতীয়টিতে উপরের তলা তাদের। নিচতলা তাদের না। তৃতীয়টির নিচতলা উপরের তলা উভয়টি তাদের উল্লিখিত মালিকানাধীন অংশের দুই শরিক যদি তাদের বাড়িকে ভাগ বাটোয়ারা করার জন্য বিচারকের নিকট আবেদন করে। বিচারক তা কিভাবে করবেন?

এবিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, প্রতিটি বিল্ডিং এর পৃথক ভাবে মূল্য নির্ধারণ করে মূল্যমান হিসেবে ভাগ করা হবে। ইমাম কুদূরী (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উক্ত অভিমতকে উল্লেখ করেছেন এবং এর উপর ফতোয়া। উল্লিখিত বর্ণনায় একথা বুঝে আসে যে, পুরো বাড়িটিকে মূল্যমানের ভিত্তিতে ভাগ করা হবে। তবে শামী, মাজমাউল আনহুর কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিল্ডিংকে মূল্যমান হিসেবে ভাগ করা হবে। এ ছাড়া বিল্ডিং এর জমি, খালি জায়গা আয়তনের পরিমাপ হিসেবে ভাগ করা হবে।

قَوْلُهُ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে মূল্য হিসেবে ভাগ করা হবে। শায়খাইন (র.)-এর অভিমত হচ্ছে আয়তনের পরিমাপ হিসেবে ভাগ করা হবে।

قَوْلُهُ لِمُحَمَّدٍ اَنَّ السِّفْلَ يَصْلُحُ لِمَا لَا الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে যে, নিচ তলায় কূপ খনন করা যায়। আন্ডার গ্রাউন্ড নির্মাণ করা যায়। গরু, ঘোড়া, হাতি ইত্যাদির ঘর বানানো যায়। আরও এমন কিছু কাজ করা যায়, যা উপরের তলায় করা যায় না। ভাগ বাটোয়ারায় মূল্যমানে সমতা রক্ষা করা উদ্দেশ্য। তাই যেহেতু নিচ তলা এবং উপরের তলার মাঝে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য রয়েছে। তাই মূল্য নির্ধারণ ছাড়া ভাগ বাটোয়ারায় সমতা রক্ষা করা যাবে না।

ইতঃপূর্বে ইমাম মুহাম্মদ (র.) দলিল দিয়েছেন যে, জমি, দালান ভাগ করা ভাগ বাটোয়ারার আসল কাজ। এখানে শায়খাইন (র.) সেই দলিল দিয়েছেন যে, অংশীদারিত্ব হচ্ছে আয়তনের মাপে। মূল্যে অংশীদারিত্ব নেই। যে জিনিসে অংশীদারিত্ব আছে সে জিনিস বণ্টন করা হবে। মূল্যকে মূল্য বণ্টন করা হবে না। সুতরাং আয়তনের পরিমাপকে যথাসম্ভব প্রাধান্য দেওয়া হবে। বাসস্থান হিসেবে নিচ তলা উপর তলা সমান সুযোগ সুবিধা লক্ষ্যণীয় বিষয় না। সুতরাং আয়তনের পরিমাপকে যথাসম্ভব প্রাধান্য দেওয়া হবে। এ বিষয়ে শায়খাইন ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে আয়তনের পরিমাপের পদ্ধতিতে উভয়ের অভিমত ভিন্ন ভিন্ন।

قَوْلُهُ فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ذِرَاعٌ مِنْ سِفْلٍ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, নিচ তলার এক হাত দোতলার দুই হাতের সমান। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, নিচতলার এক হাত দোতলার এক হাতের সমান। এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম পর্যালোচনা করেছেন যে, আইম্মায়ে ছালাছ, অর্থাৎ তিন ইমাম কিসের ভিত্তিতে ইখতিলাফ করেছেন? কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ ইখতিলাফ মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতে হয়েছে। প্রত্যেকে দলিলকে প্রমাণ দ্বারা আপন অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কেউ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সকলেই নিজ নিজ যুগের। এবং শহরের প্রচলিত নিয়ম হিসেবে হুকুম বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র.) কূফার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নিচ তলাকে দোতলার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বাগদাদের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নিচ তলা এবং দোতলাকে সমান বলে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ এক হাতের বিনিময়ে একহাত বলে গণ্য করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তার এলাকার প্রচলিত নিয়মে লক্ষ্য করেছেন যে, এ বিষয়ে মানুষের পছন্দ বিভিন্ন ধরনের। কেউ নিচ তলাকে প্রাধান্য দেয়। কেউ দোতলাকে প্রাধান্য দেয়। বিশেষ করে শীত ও গরমের কারণে এতে যথেষ্ট পার্থক্য হয়। তাই তিনি মূল্যমান হিসেবে ভাগ করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুসান্নিফ (র.) "فِيْ تَفْضِيْلِ السِّفْلِ" [নিচ তলার প্রাধান্য] -এর কথা বলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলের দিকে ইশারা করেছেন। "وَاسْتِوَائِهِمَا" [উভয় তলা সমান] একথা বলে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর দলিলের দিকে ইশারা করেছেন। "تَفْضِيْلُ السِّفْلِ مَرَّةً وَالْعِلْوِ اُخْرٰى" [কখনো নিচ তলার প্রাধান্য, কখনো উপরের তলার প্রাধান্য] একথা বলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলের দিকে ইশারা করেছেন।

وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّ مَنْفَعَةَ السِّفْلِ تَرْبُوْ عَلٰى مَنْفَعَةِ الْعِلْوِ بِضِعْفِهِ لِأَنَّهَا تَبْقٰى بَعْدَ فَوَاتِ الْعِلْوِ وَمَنْفَعَةُ الْعِلْوِ لَا تَبْقٰى بَعْدَ فِنَاءِ السِّفْلِ وَكَذَا السِّفْلُ فِيْهِ مَنْفَعَةُ الْبِنَاءِ وَالسُّكْنٰى وَفِى الْعِلْوِ السُّكْنٰى لَا غَيْرُ اِذْ لَا يُمْكِنُهُ الْبِنَاءُ عَلٰى عِلْوِهٖ اِلَّا بِرِضَاءِ صَاحِبِ السِّفْلِ فَيُعْتَبَرُ ذِرَاعَانِ مِنْهُ بِذِرَاعٍ مِنَ السِّفْلِ ـ وَلِاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّ الْمَقْصُوْدَ اَصْلُ السُّكْنٰى وَهُمَا يَتَسَاوِيَانِ فِيْهِ وَالْمَنْفَعَتَانِ مُتَمَاثِلَانِ لِاَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنْ يَفْعَلَ مَا لَا يَضُرُّ بِالْاٰخَرِ عَلٰى اَصْلِهٖ ـ

অনাবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের দলিল হচ্ছে যে, নিচ তলার সুযোগ সুবিধা উপরের তলার চেয়ে দ্বিগুণ। কারণ উপরের তলা না থাকলেও নিচ তলা ঠিক থাকে। নিচ তলা ধ্বংস হয়ে গেলে উপরের তলা ঠিক থাকে না। এমনিভাবে নিচতলা বাসস্থান এবং গৃহ নির্মাণের সুযোগ সুবিধা রয়েছে। উপরের তলায় কেবল বাসস্থানের সুবিধা রয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোনো সুযোগ সুবিধা নেই। কেননা নিচ তলার মালিকের সম্মতি ছাড়া উপরের তলার মালিক উপরের তলায় ঘর বানাতে পারবে না। সুতরাং নিচ তলার এক হাতের বিনিময়ে উপরের তলার দুই হাত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দলিল হচ্ছে, বাড়ির উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল বাসস্থান। এ হিসেবে উভয় তলা সমান। উভয় তলার সুযোগ সুবিধাও সমান। কারণ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিয়ম হিসেবে উভয় তলার মালিক এমন কাজ করতে পারবে, যা অপরের জন্য ক্ষতিকর না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَوَجْهُ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলের সারকথা হচ্ছে, উপরের তলার চেয়ে নিচ তলার সুযোগ সুবিধা দ্বিগুণ। তাই এ হিসেবে ভাগ করা হবে।

قَوْلُهٗ وَلِاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّ الْمَقْصُوْدَ الخ : ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর দলিল হচ্ছে যে, বাড়ির আসল উদ্যেশ্য হচ্ছে বাসস্থান। এ হিসেবে নিচ তলা এবং উপরের তলা সমান। সুযোগ সুবিধার দিক দিয়েও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উভয় তলা সমান। কারণ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, উভয় তলার মালিক এমন সব কাজ করতে পারবে, যা অপরের জন্য ক্ষতিকর নয়। এ হিসেবে উপরের তলার মালিক গৃহ নির্মাণ করতে পারবে। তবে তা এমন হতে হবে যে. নিচতলার কোনো ক্ষতি হয় না।

নিচ তলার মালিক গৃহ নির্মাণ করলেও উপরের তলার কোনো ক্ষতি হয় এমনভাবে করতে পারবে না। মূলত ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে উক্ত ইখতেলাফ উল্লিখিত কায়দার ভিত্তিতে হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী উপরের তলায় কোনো ধরনের নির্মাণ কাজ করা মালিকের জন্যে বৈধ না এবং নিচ তলা মালিকের জন্যে তা বৈধ। এ হিসেবে তিনি ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ অর্থাৎ নিচ তলার এক হাত উপরের তলার দুই হাতের সমান বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী উভয় তলার মালিকের জন্য নির্মাণ কাজ করা বৈধ। এ হিসাবে তাঁর অভিমত হচ্ছে ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ অর্থাৎ নিচতলার এক হাত উপরের তলার এক হাতের সমান। উক্ত মত পার্থক্যের ভিত্তিতে ইমামদ্বয়ের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে।

وَلِمُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِالْاِضَافَةِ اِلَيْهِمَا فَلَا يُمْكِنُ التَّعْدِيْلُ اِلَّا بِالْقِيْمَةِ وَالْفَتْوٰى الْيَوْمَ عَلٰى قَوْلِ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَوْلُهٗ اَلَّا يَفْتَقِرُ اِلَى التَّفْسِيْرِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলিল হচ্ছে যে, মানফা'ত বা সুযোগ সুবিধা শীত গরমের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন ধরনের হয়। সুতরাং মূল্য নির্ধারণ ছাড়া ভাগ বাটোয়ারার সমতা রক্ষা করা সম্ভব না। বর্তমানে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতের উপর ফতোয়া এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতে ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلِمُحَمَّدٍ اَنَّ الْمَنْفَعَةَ الخ : গরমকালে রাতে উপরের তলা ভালো মনে হয় এবং দুপুরে নিচ তলা ভালো মনে হয়। আবার শীতকালে রাতে নিচ তারা ভালো মনে হয় এবং দুপুরে রোদের সুবিধার্থে উপরের তলা ভালো মনে হয়। যেহেতু শীত, গরম, দিন, রাত ইত্যাদির পার্থক্যের দরুন সুযোগ সুবিধার পার্থক্য হয়। তাই মূল্য নির্ধারণ ছাড়া ভাগ বাটোয়ারায় সমতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট। এর কোনো ধরনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত ব্যাখ্যা ছাড়া সহজে বুঝে আসে না। এ বিষয়ে তাঁর নিয়ম হচ্ছে উপরের তলার দুই হাতের বিনিময়ে নিচ তলার এক হাত। এ হিসেবে যদি এক শরিকের শুধু উপরের তলা হয় এবং অপর শরিকের পূর্ণবাড়ি [বাইতে কামেল] হয়। তবে ৩৩ $\frac{১}{৩}$ হাত পূর্ণবাড়ি [বাইতে কামেল] এর সমান উপর তলার ১০০ হাত হবে। কারণ উভয় অংশের উপরের তলার ৩৩ $\frac{১}{৩}$ হাত সমান পূর্ণবাড়ি [বাইতে কামেল] এর নিচ তলার ৩৩ $\frac{১}{৩}$ হাত উপরের তলার ৬৬ $\frac{২}{৩}$ হাতের সমান। কেননা নিচ তলার এক হাত উপরের তলার দুই হাতের সমান। এ নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণবাড়ি ৩৩ $\frac{১}{৩}$ হাত শুধু উপরের তলার ১০০ হাতের সমান হবে। যদি শুধু নিচ তলা ১০০ হাত হয় তবে পূর্ণবাড়ি [বাইতে কামেল]-এর ৬৬ $\frac{২}{৩}$ হাতের সমান হবে। কারণ উভয় অংশের ৬৬ $\frac{২}{৩}$ হাত সমান সমান হবে। শুধু নিচ তলার অংশের বাকি ৩৩ $\frac{১}{৩}$ হাত পূর্ণবাড়ি [বাইতে কামেল] উপরের তলার ৬৬ $\frac{২}{৩}$ হাতের সমান হবে। সুতরাং একশত হাত শুধু নিচলা পূর্ণবাড়ি [বাইতে কামেল]- এর ৬৬ $\frac{২}{৩}$ হাতের সমান হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর অভিমতের ব্যাখ্যা সহজ। কারণ তার অভিমত অনুযায়ী নিচতলার একহাত উপরের তলার এক হাতের সমান। এ হিসেবে একশত হাত নিচতলা পূর্ণবাড়ি [বাইতে কামেল] হাতের সমান এর পঞ্চাশ হাতের সমান হবে। মুসান্নিফ (র.) নিম্নের ইবারতে এর বর্ণনা করে বলেন—

وَتَفْسِيرُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَسْئَلَةِ الْكِتَابِ أَنْ يَجْعَلَ بِمُقَابَلَةِ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنَ الْعِلْوِ الْمُجَرَّدِ ثَلْثَةً وَّثَلْثُونَ وَثُلُثُ ذِرَاعٍ مِنَ الْبَيْتِ الْكَامِلِ لِأَنَّ الْعِلْوَ مِثْلُ نِصْفِ السِّفْلِ فَثَلْثَةٌ وَّثَلْثُونَ وَثُلُثٌ مِنَ السِّفْلِ سِتَّةٌ وَّسِتُّونَ وَثُلُثَانِ مِنَ الْعِلْوِ وَمَعَهُ ثَلْثَةٌ وَّثَلْثُونَ وَثُلُثُ ذِرَاعٍ مِنَ الْعِلْوِ فَبَلَغَتْ مِائَةُ ذِرَاعٍ تُسَاوِيْ مِائَةً مِنَ الْعِلْوِ الْمُجَرَّدِ وَيَجْعَلُ بِمُقَابَلَةِ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنَ السِّفْلِ الْمُجَرَّدِ مِنَ الْبَيْتِ الْكَامِلِ سِتَّةً وَّسِتُّونَ وَثُلُثَا ذِرَاعٍ لِأَنَّ عِلْوَهُ مِثْلَ نِصْفِ سِفْلِهِ فَبَلَغَتْ مِائَةُ ذِرَاعٍ كَمَا ذَكَرْنَا . وَتَفْسِيرُ قَوْلِ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنْ يَجْعَلَ بِإِزَاءِ خَمْسِيْنَ ذِرَاعًا مِنَ الْبَيْتِ الْكَامِلِ مِائَةُ ذِرَاعٍ مِنَ السِّفْلِ الْمُجَرَّدِ أَوْ مِائَةُ ذِرَاعٍ مِنَ الْعِلْوِ الْمُجَرَّدِ لِأَنَّ السِّفْلَ وَالْعِلْوَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ فَخَمْسُوْنَ ذِرَاعًا مِنَ الْبَيْتِ الْكَامِلِ بِمَنْزِلَةِ مِائَةِ ذِرَاعٍ خَمْسُوْنَ مِنْهَا سِفْلٌ وَخَمْسُوْنَ مِنْهَا عِلْوٌ .

অনুবাদ : কিতাবে উল্লিখিত মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, শুধু উপরের তলার ১০০ হাতকে পূর্ণবাড়ি [বাইতে কামেল] এর ৩৩ $\frac{১}{৩}$ হাতের সমান বলে গণ্য করা হবে। কারণ উপরের তলা নিচ তলার অর্ধেকের সমান। সুতরাং পূণবাড়ির নিচ তলার ৩৩ $\frac{১}{৩}$ হাত উপরের তলার ৬৬ $\frac{২}{৩}$ হাতের সমান এবং এর সাথে পূর্ণবাড়ির উপরের তলা ৩৩ $\frac{১}{৩}$ হাত যোগ করা হবে। এতে করে ১০০ শত হবে। যা শুধু উপরের তলার ১০০ হাতের সমান। শুধু নিচ তলার ১০০ হাতকে পূর্ণবাড়ি [বাইতে কামেল] এর ৬৬ $\frac{২}{৩}$ হাতের সমান বলে গণ্য করা হবে। কারণ উপরের তলা নিচতলার অর্ধেক। এ হিসেবে পূর্ণবাড়ি ১০০ হাত হবে। যেমন পূর্বের মাসআলায় আলোচনা করেছি। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর অভিমতের ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, পঞ্চাশ হাত পূর্ণবাড়ির সমান শুধু নিচ তলার একশত হাত হবে অথবা শুধু উপরের তলার একশত হাত হবে। কারণ নিচ তলা এবং উপরের তলা তার নিকট সমান। সুতরাং পূর্ণবাড়ির পঞ্চাশ হাত একশত হাত বলে গণ্য হবে। নিচ তলার পঞ্চাশ হাত এবং উপরের তলার পঞ্চাশ হাত।

قَالَ : وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَقَاسِمُوْنَ وَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا . قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰذَا الَّذِيْ ذَكَرَهُ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَا تُقْبَلُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) اَوَّلاً وَبِهٖ قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) وَذَكَرَ الْخَصَّافُ (رح) قَوْلَ مُحَمَّدٍ (رح) مَعَ قَوْلِهِمَا وَقَاسِمَا الْقَاضِيْ وَغَيْرُهُمَا سَوَاءٌ .

অনুবাদ : ইমাম কদূরী (র.) বলেন, বণ্টন ইচ্ছুক শরিকগণের মাঝে যদি মতানৈক্য দেখা দেয় এবং দুইজন বণ্টনকারী এ বিষয়ে সাক্ষী দেয়। তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, কুদূরী (র.) যা বলেছেন তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। এটা ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর পূর্বের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। খাসসাফ (র.) মুহাম্মদ (র.)-এর এ অভিমত কে শায়খাইন (র.)-এর অভিমতের সাথে বলে উল্লেখ করেছেন। বিচারকের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত বণ্টনকারী এবং অন্য বণ্টনকারী এ বিষয়ে একই রকম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَقَاسِمُوْنَ الخ : বণ্টনকারী শরিকগণের মাঝে ভাগ বাটোয়ারা করে দেওয়ার পর শরিকগণের মাঝে যদি মতানৈক্য দেখা দেয়। যেমন কোনো শরিক বলল, আমি আমার অংশ পাইনি। বাড়ির এ জায়গাটা আমার অংশে ছিল। এ বিষয়ে দুইজন বণ্টনকারী সাক্ষী দিল যে, সে তার অংশ নিয়েছে। এ বিষয়ে বণ্টনকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে কি না। এ সম্পর্কে কুদূরী (র.) বলেন যে, তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। তিনি উক্ত মাসআলায় কোনো ইখতিলাফের কথা উল্লেখ করেননি। এতে বুঝা যায় যে, খাসসাফ (র.) উক্ত মাসআলায় ইখতিলাফ নেই বলে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কুদূরী (র.) তা গ্রহণ করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত মাসআলায় ইখতিলাফ আছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বণ্টনকারীগণের সাক্ষ্য কবুল করা হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর প্রথম অভিমত এটাই ছিল। শায়খাইন (র.)-এর নিকট তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে।

বিচারকের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত বণ্টনকারী এবং শরিকগণের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগকৃত বণ্টনকারী উক্ত সাক্ষ্য প্রদানে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

لِمُحَمَّدٍ (رحـ) أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فِعْلِ أَنْفُسِهِمَا فَلَا تُقْبَلُ كَمَنْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ فَشَهِدَ ذٰلِكَ الْغَيْرُ عَلَى فِعْلِهِ . وَلَهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِمَا وَهُوَ الْاِسْتِيْفَاءُ وَالْقَبْضُ لَا عَلَى فِعْلِ أَنْفُسِهِمَا لِأَنَّ فِعْلَهُمَا التَّمْيِيْزُ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ مَشْهُوْدًا بِهِ لِمَا أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ بِالْقَبْضِ وَالْاِسْتِيْفَاءُ وَهُوَ فِعْلُ الْغَيْرِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে যে, বণ্টনকারীদ্বয় তাদের নিজেদের কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই কবুল করা হবে না। এটা এমন হলো যেমন কোনো ব্যক্তি তার নিজেদের গোলাম আজাদ করার জন্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কোনো ফে'ল বা কাজকে শর্ত করে দিল। উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি তার নিজের কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হচ্ছে যে, কাসেম বা বণ্টনকারী অন্যের কাজের উপর সাক্ষী দিয়েছে। আর তা হচ্ছে আদায় করা এবং হস্তগত করা। তাদের নিজের কাজের বিষয়ে সাক্ষী দেয়নি কারণ তাদের কাজ হচ্ছে পৃথক করা। এ বিষয়ে সাক্ষী দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। অথবা তাদের কাজ এমন যে, সাক্ষী হয় না। কেননা উক্ত পৃথকীকরণ [শরিকগণের জন্য] বাধ্যতামূলক না। তা বাধ্যতামূলক হয় [শরিকগণের পক্ষ থেকে] হস্তগত করার দ্বারা এবং আদায় করার দ্বারা, তা অন্যের কাজ। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فِعْلِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে যে, কাসেম বা বণ্টনকারীদ্বয় তাদের নিজেদের কাজের উপর সাক্ষ্য দিচ্ছে। নিজের কাজের উপর কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমন করীম বলল, রহিম যদি আজ দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে তবে আমার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে গোলাম দাবি করল যে, আমি আজাদ হয়ে গেছি। কারণ রহিম দুই রাকাত নফল নামাজ পড়েছে। রহিম সাক্ষী দিল যে, আমি দুই রাকাত নফল নামাজ পড়েছি। যেন গোলাম আজাদ হয়ে যায়। যেহেতু রহিম তার নিজের কাজের বিষয়ে সাক্ষী দিয়েছে তাই তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনিভাবে বণ্টনকারী বা কাসেমের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فِعْلِ الخ : শায়খাইন (র.)-এর দলিলের সারাংশ হচ্ছে যে, কারো নিজের কাজের উপর নিজের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। তবে কাসেম বা বণ্টনকারী শরিকগণের অংশ বুঝে নেওয়ার বিষয়ে যে সাক্ষী দেবে তা নিজের কাজের উপর নিজের সাক্ষ্য না; বরং অন্যের কাজের উপর সাক্ষ্য। কারণ বণ্টনকারীর কাজ হচ্ছে এক অংশ থেকে অন্য অংশকে পৃথক করা। এ কাজ সে করেছে এবং শরিকগণের কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেনি। সকলেই জানে যে, কাসেম এক অংশ থেকে অন্য অংশকে পৃথক করেছে। এর জন্য কোনো ধরনের সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। বরং শরিকগণের মাঝে প্রাপ্য অংশ আদায় করার বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। যেমন কোনো শরিক বলছে, আমার প্রাপ্য অংশ থেকে অমুক জিনিস বাদ পরেছে। শরিকগণের উক্ত মতভেদ বণ্টনকারী যে সাক্ষী দেবে তা নিজের কাজের উপর সাক্ষী না; বরং অন্যের কাজের উপর সাক্ষী। সুতরাং তা কবুল করা হবে। অথবা এভাবে বলা যায় যে, পৃথকীকরণ যা বণ্টনকারীর কাজ, তা সাক্ষী দেওয়ার প্রয়োজন হয় এমন নয়। কেননা পৃথক করার দ্বারা কোনো শরিকের জন্য তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। কবজা বা আদায় করা দ্বারা তা হয়। সুতরাং পৃথক করার দ্বারা কাউকে বাধ্য করা হয় না। তাই পৃথক করা এমন কাজ যা সাক্ষীর যোগ্য বলে গণ্য হয় না।

বি. দ্র. - যে বিষয় সম্পর্কে সাক্ষী দেওয়া হয় তাকে مَشْهُوْدٌ بِهٖ বলা হয়। বণ্টনকারীকে قَاسِمٌ বলা হয় এবং ভাগ বাটোয়ারা করতে ইচ্ছুক শরিককে مُتَقَاسِمٌ বলা হয়। উপরে উল্লিখিত বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে, পৃথক করার দ্বারা কোনো শরিকের জন্য তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। তা শরিকগণের মতামতের ভিত্তিতে ভাগ করা হলে প্রযোজ্য হবে। বিচারক বা তার প্রতিনিধি ভাগ বাটোয়ারা করলে শরিকগণের জন্য তা বাধ্যতামূলক হবে এবং তা মানতে তারা বাধ্য থাকবে।

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ (رحـ) إِذَا قَسَمَا بِأَجْرٍ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِلَيْهِ مَالَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ (رحـ) لِأَنَّهُمَا يَدَّعِيَانِ إِيْفَاءَ عَمَلٍ اِسْتُوْجِرَا عَلَيْهِ فَكَانَتْ شَهَادَةً صُوْرَةً وَدَعْوٰى مَعْنًى فَلَا تُقْبَلُ ـ إِلَّا أَنَّا نَقُوْلُ هُمَا لَا يَجُرَّانِ بِهٰذِهِ الشَّهَادَةِ إِلٰى أَنْفُسِهِمَا مَغْنَمًا لِاتِّفَاقِ الْخُصُوْمِ عَلٰى إِيْفَائِهِمَا الْعَمَلَ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ وَهُوَ التَّمْيِيْزُ وَإِنَّمَا الْاِخْتِلَافُ فِي الْاِسْتِيْفَاءِ فَانْتَفَتِ التُّهْمَةُ ـ

অনুবাদ : ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন, যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বণ্টনকারীদ্বয় ভাগ বাটোয়ারা করে তবে সকলের ঐকমত্যে তাদের সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না। কোনো কোনো আলেম উক্ত অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা বণ্টনকারীদ্বয় [সাক্ষী দ্বারা] তাদের উপর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অর্পিত কাজ পূর্ণ করার দাবি করছে। সুতরাং তা বাহ্যিক রূপে সাক্ষী বলে গণ্য হবে, মৌলিক অর্থে দাবি বলে গণ্য হবে। তাই তাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে আমরা বলি যে, বণ্টনকারীদ্বয় উক্ত সাক্ষীকে তাদের লাভের দিকে নিয়ে যাবে না। কারণ বাদী বিবাদী শরিকগণের এ বিষয়ে একমত যে, বণ্টনকারীদ্বয় তাদের উপর অর্পিত কাজ তারা সম্পন্ন করেছে। আর তা হচ্ছে পৃথকীকরণ। তাদের মাঝে মতানৈক্য হচ্ছে, শরিকগণের অংশ আদায় করা নিয়ে। সুতরাং বণ্টনকারীগণের উপর আর কোনো অপবাদ রইল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ (رحـ) إِذَا قَسَمَا بِأَجْرٍ الخ : ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন, বণ্টনকারীদ্বয়কে যদি ভাগ বাটোয়ারার কাজে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ করা হয় তবে তাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তারা উক্ত সাক্ষী দ্বারা তাদের কাজ শেষ করার দাবি করছে। সুতরাং বাহ্যিকভাবে এটা সাক্ষী মনে হলেও প্রকৃত অর্থে এটা তাদের কাজ পূর্ণ করার দাবি করছে। নিয়ম হচ্ছে যে, কোনো দাবিদারের দাবির স্বপক্ষে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই তাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّا نَقُوْلُ هُمَا لَا يَجُرَّانِ بِهٰذِهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর অভিমতের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। যদি কেউ মনে করে যে, বণ্টনকারীদ্বয় উক্ত সাক্ষী দ্বারা ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিল করছে। টাকা উপার্জনের কাজে উক্ত সাক্ষীকে ব্যবহার করছে। তবে তা ঠিক হবে না। কেননা শরিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, বণ্টনকারীদ্বয় তাদের ভাগ বটোয়ারার কাজ সম্পন্ন করেছে। এতে কারো দ্বিমত নেই। বরং মতভেদ হচ্ছে, শরিকগণের প্রাপ্য অংশ আদায় করা নিয়ে। সুতরাং বণ্টনকারীগণের উপর আর কোনো অপবাদ থাকছে না। তাই টাকার বিনিময়ে হোক বা বিচারকের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত হোক। যে কোনো বণ্টনকারীর সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে।

وَلَوْ شَهِدَ قَاسِمٌ وَاحِدٌ لَا تُقْبَلُ لِاَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْدِ غَيْرُ مَقْبُوْلَةٍ - عَلَى الْغَيْرِ وَلَوْ اَمَرَ الْقَاضِيْ اَمِيْنَهُ بِدَفْعِ الْمَالِ اِلَى اٰخَرَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْاَمِيْنِ فِيْ دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُقْبَلُ فِي اِلْزَامِ الْاٰخَرِ اِذَا كَانَ مُنْكِرًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

অনুবাদ : যদি একজন বণ্টনকারী সাক্ষী দেয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা অন্য লোকের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। যদি বিচারক তার দায়িত্বশীলকে অপর ব্যক্তিকে মাল দিতে বলে। উক্ত দায়িত্বশীলদের বক্তব্য তার নিজের দায়মুক্তির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। অপর ব্যক্তি তা অস্বীকার করলে তার উপর দায় চাপানোর ক্ষেত্রে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ্ পাক ভালো জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইসলামে এক ব্যক্তির সাক্ষীকে অন্যের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার বিধান নেই। পূর্বের আলোচনায় বণ্টনকারীর সাক্ষী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে দুইজন বণ্টনকারী হিসেবে আলোচনা হয়েছে। যদি একজন বণ্টনকারী সাক্ষী দেয়। তবে ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, একজনের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না। এক ব্যক্তির সাক্ষী অন্যের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। মুসান্নিফ (র.)-এর একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন বিচারক যদি তার কোনো দায়িত্বশীল লোককে বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে মাল দিয়ে দাও। এরপর সে ব্যক্তি যদি মালের কথা অস্বীকার করে তবে উক্ত দায়িত্বশীলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এ বিষয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তির দায়মুক্তির ক্ষেত্রে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ তার বক্তব্য দ্বারা সে উক্ত মালের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে। অপর ব্যক্তি যে মাল নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছে উক্ত দায়িত্বশীলের বক্তব্য দ্বারা মালের দায়িত্ব তাঁর উপর চাপানো যাবে না। নিজকে বাঁচানোর জন্যে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। একে حُجَّةٌ دَافِعَةٌ বলা হয়। অপরের উপর দায়ভার চাপানোর জন্য তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। একে حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ বলা হয়। সুতরাং উক্ত একজন দায়ীত্বশীলের বক্তব্য حُجَّةٌ دَافِعَةٌ হবে। حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ হবে না।

بَابُ دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقِسْمَةِ وَالْاِسْتِحْقَاقِ فِيْهَا

قَالَ : وَاِذَا ادَّعٰى اَحَدُهُمُ الْغَلَطَ وَزَعَمَ اَنَّ مِمَّا اَصَابَهُ شَيْئًا فِيْ يَدِ صَاحِبِهٖ وَقَدْ اَشْهَدَ عَلٰى نَفْسِهٖ بِالْاِسْتِيْفَاءِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِاَنَّهٗ يَدَّعِىْ فَسْخَ الْقِسْمَةِ بَعْدَ وُقُوْعِهَا فَلَا يُصَدَّقُ اِلَّا بِحُجَّةٍ فَاِنْ لَمْ تَقُمْ لَهٗ بَيِّنَةٌ اِسْتَحْلَفَ الشُّرَكَاءُ فَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ جَمَعَ بَيْنَ نَصِيْبِ النَّاكِلِ وَالْمُدَّعِىْ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمَا عَلٰى قَدْرِ اَنْصِبَائِهِمَا لِاَنَّ النُّكُوْلَ حُجَّةٌ فِىْ حَقِّهٖ خَاصَّةً فَيُعَامَلَانِ عَلٰى زَعْمِهِمَا قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَنْبَغِىْ اَنْ لَّا تُقْبَلَ دَعْوَاهُ اَصْلًا لِتَنَاقُضِهٖ وَاِلَيْهِ اَشَارَ مِنْ بَعْدُ ـ

পরিচ্ছেদ : বন্টনের মাঝে ভুল এবং অধিকার দাবি প্রসঙ্গে

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো এক পক্ষ বণ্টনের মাঝে ভুলের দাবি করে বলে যে, তাঁর অংশে যা এসেছিল তার কিছু অংশ অপর পক্ষের দখলে রয়ে গেছে। তাহলে সে নিজের ব্যাপারে উসূলের স্বীকারোক্তি প্রদান করে থাকলে বিনা দলিলে ঐ দাবিতে তাকে সত্যায়ন করা হবে না। কারণ সে বণ্টন সম্পন্ন হওয়ার পর তা বাতিলের দাবি করছে, তাই বিনা দলিলে তাকে সত্যায়ন করা হবে না। সুতরাং যদি তার কাছে দলিল না থাকে তাহলে সকল শরিকদেরকে কসম করানো হবে। তাদের মধ্য হতে কেউ কসম করতে অস্বীকার করলে তার অংশকে দাবিদারের অংশের সাথে মিলিয়ে উভয়ের প্রাপ্য অনুসারে বণ্টন করা হবে। কারণ কসম অস্বীকার বিশেষভাবে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে দলিল সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং উভয়ের সাথে তাদের ধারণা অনুসারেই ব্যবহার করা হবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এরূপ দাবিদারের দাবি মোটেই গ্রহণ করা উচিত না। তাতে বৈপরীত্য থাকার কারণে। আর পরবর্তীতে এরই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বণ্টনের পক্ষসমূহের মধ্য থেকে কোনো এক বা একাধিক পক্ষ যদি বণ্টনের মাঝে ভুল হওয়ার দাবি করে কিংবা বণ্টনের পর বণ্টিত সম্পত্তির মাঝে অন্য কারো অধিকার প্রকাশিত হয় তখন কাজির জন্য কি করণীয় হবে? আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

যেহেতু বণ্টনের মাঝে ভুল ভ্রান্তি কিংবা বণ্টিত সম্পত্তির মাঝে অধিকারের দাবি বণ্টন সংক্রান্ত বিধিমালার অপ্রধান বিষয় তাই বণ্টন সংক্রান্ত মৌলিক মাসআলাসমূহের পরবর্তীতে এগুলোকে আলোচনায় আনা হয়েছে।

বণ্টনের মাঝে ভুলের দাবি উত্থাপিত হলে করণীয় : আল ইনায়া গ্রন্থকার গায়াতুল বয়ানের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কে একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তার সার সংক্ষেপ হলো– বণ্টনের পক্ষদ্বয়ের মাঝে হয়তো বণ্টন দ্বারা অর্জিত সম্পত্তির পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিবে, কিংবা বণ্টন সম্পন্ন হওয়ার পর এর সাথে সম্পৃক্ত অন্য কোনো বিষয়ে পক্ষদ্বয়ের মতবিরোধ সৃষ্টি হবে। প্রথম সুরতে বাদী পক্ষের দাবিতে যদি কোনো বৈপরীত্য না থাকে তাহলে উভয়পক্ষকে কসম করানোর মাধ্যমে বণ্টন বাতিল করে দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে বাদী পক্ষকে বাইয়্যিনাহ পেশ করতে বলা হবে। সে বাইয়্যিনাহ পেশ করতে অক্ষম হলে বিবাদীর উপর কসম আরোপ করা হবে। আলোচ্য ইবারতের মাসআলাটি এই মূলনীতির দ্বিতীয় সুরতের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَإِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمْ : উপরিউক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে আলোচ্য ইবারতের সূরতে মাসআলা হলো, বণ্টননামায় অংশীদারদের কেউ যদি বণ্টনের মাঝে ভ্রান্তি হয়েছে বলে দাবি তোলে এবং বলে যে, বণ্টনের মাধ্যমে আমার ভাগে যে পরিমাণ অংশ এসেছিল তার কিছু অংশ অমুকের দখলে চলে গেছে। সুতরাং সে যদি বণ্টনের সময় নিজের অংশ বুঝে পাওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকে তাহলে এখন তার এই দাবি বাইয়্যিনাহ ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না।

কারণ বণ্টনকার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর সে এখন তা বাতিল হওয়ার দাবি করছে। আর اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ -এর বিধি অনুসারে বাইয়্যিনাহ ছাড়া তার এ দাবিকে সত্যায়ন করা হবে না।

আর যদি তার কাছে এ দাবির স্বপক্ষে কোনো বাইয়্যিনাহ বিদ্যমান না থাকে তাহলে সকল অংশীদারকে কসম করতে বলা হবে। সুতরাং যদি সকলে কসম করে ফেলে তাহলে মামলা খারিজ হয়ে যাবে। আর অংশীদারদের মধ্য থেকে কেউ যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে তার অংশকে উক্ত দাবিদারের অংশের সাথে মিলিয়ে উভয়ের প্রাপ্য হিস্‌সা অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হবে।

কারণ কসম অস্বীকার করাটা অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে একটি প্রমাণ। কেননা যদি সে সত্যিকার অর্থেই দাবিদারের প্রাপ্য অংশ দখল করে না রাখত তাহলে অবশ্যই সে কসম করতে সম্মত হতো। সুতরাং কসম করতে অস্বীকার করে সে যেহেতু একথা প্রমাণ করল যে, আমার ধারণায় আমি তার প্রাপ্য অংশকে দখল করে রেখেছি, আর দাবিদারের ধারণাও এটাই তাই উভয়ের যৌথ ধারণা মতেই তাদের মুয়ামালাকে সম্পন্ন করা হবে।

قَوْلُهُ قَالَ (رضـ) يَنْبَغِيْ أَنْ لَّا تُقْبَلَ دَعْوَاهُ : এই ইবারতে মুসান্নিফ (র.) কুদূরী (র.) থেকে বর্ণিত আলোচ্য মাসআলায় নিজের মন্তব্য তোলে ধরে বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) -এর বক্তব্য অনুসারে এখানে বাইয়্যিনাহ পেশ করতে সমর্থ হলে, বণ্টনে ভ্রান্তির দাবিকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। অথচ কোনো সুরতেই এরূপ দাবি গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কথা। কারণ তার দাবির মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়, কেননা প্রথমে সে বণ্টনের পরপর নিজের হক সম্পূর্ণভাবে বুঝে পাওয়ার স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিল, তারপর এখন আবার নিজের অংশ অন্যের দখলে থেকে যাওয়ার দাবি তুলছে। যা তার পূর্ববর্তী দাবিতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আর দাবিদারের দাবির মাঝে কোনোরূপ বৈপরীত্য পাওয়া গেলে সে দাবিই সঠিক হয় না। ফলে এরূপ দাবি সর্বদাই অগ্রাহ্য হয়ে থাকে। চাই দাবিদার তার এ দাবির স্বপক্ষে বাইয়্যিনাহ পেশ করতে সমর্থ হোক বা না হোক।

পরবর্তী মাসআলায় ইমাম কুদূরী (র.) -এর নিম্নোক্ত ইবারত وَإِنْ قَالَ أَصَابَنِيْ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا فَلَمْ يُسَلِّمْهُ إِلَيَّ وَلَمْ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْاِسْتِيْفَاءِ থেকেও একথার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ এই ইবারতে يَشْهَدْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْاِسْتِيْفَاءِ -এর শর্ত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যদি দাবিদার ব্যক্তি বণ্টনের পর আপন হিসসা বা অংশ বুঝে পাওয়ার স্বীকারোক্তি প্রদান করে থাকে তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

মুদ্দাকথা হলো, আলোচ্য মাসআলায় বাইয়্যিনার ভিত্তিতে বণ্টনে ভ্রান্তির দাবিদারের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এ ব্যাপারে ইমাম কুদূরী (র.) -এর অভিমতের সাথে হিদায়া গ্রন্থকার দ্বিমত পোষণ করেন।

আল মাবসূত এবং ফাতাওয়ায়ে কাজীখান থেকে মুসান্নিফ (র.)-এর মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) তার আল ইনায়া গ্রন্থে আল্লামা হাকিম শহীদ (র.) রচিত আল কাফী গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি মাসআলার মাধ্যমে হিদায়া গ্রন্থকারের অভিমতটিকে প্রাধান্য দেন। আল কাফীতে রয়েছে– ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, কেউ মারা গেলে যদি তার একটি ঘর মিরাশ স্বরূপ রেখে যায়। আর তাই দুই ছেলে উত্তরাধিকারী সূত্রে এই ঘরের মালিক হয় এবং ঘরকে উভয়ের মাঝে বণ্টন পূর্বক প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ অংশ দখল করে নেয় এবং এই বণ্টন যথাযথ হওয়া ও প্রত্যেকে তাদের হিস্‌সা বা অংশকে দখল করার পক্ষে সাক্ষী রেখে থাকে তারপর যদি তাদের কেউ এই মর্মে দাবি করে যে, আমার হিস্‌সার কিছু অংশ অপরের দখলে রয়ে গেছে, তাহলে তার এই দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ আইনী (র.) বলেন, আল কাফী -এর এই মাসআলা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নিজের অংশ পরিপূর্ণ হস্তগত হওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদানের পর এর বিপরীতে তার কোনো বাইয়্যিনাহ গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমনটি হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন। –[আল বিনায়াহ - ৫৪০]

হিদায়া গ্রন্থকারের এ মতের পক্ষে যুক্তি ছিল যে, এখানে দাবিদারের দাবির মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। আর দাবিতে বৈপরীত্য থাকলে সে দাবির পক্ষে কোনো বাইয়্যিনাহ গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে শরহুল বিকায়াহ গ্রন্থকার আল্লামা সদরুশ শরিয়াহ (র.) হিদায়া গ্রন্থকারের এই অভিমতের উল্লেখ করার পর বলেন, এখানে মৌলিকভাবে দাবিদারের দাবির মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ দাবিদার প্রথমে হয়তো বণ্টনকারীর ন্যায়নিষ্ঠার উপর ভিত্তি করে নিজের হক বুঝে পাওয়ার স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিল, পরে যখন পরিপূর্ণভাবে নিরীক্ষণের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো তখন তার কাছে ভুল ধরা পরল। ফলে তার বাইয়্যিনাহর মাধ্যমে সত্য বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পূর্বের ভুল স্বীকারোক্তির কারণে তাকে পাকড়াও করা যাবে না। অনুরূপ কথা দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতারেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই দাবির মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। এই কারণে ইমাম কুদূরীর মতটিকে উপেক্ষা করাও ঠিক নয়। –[দ্রষ্টব্য : নাতায়িজুল আফকার– ৪৫৮]

وَإِنْ قَالَ قَدِ اسْتَوْفَيْتُ حَقِّيْ اَخَذْتَ بَعْضَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ خَصْمِهِ مَعَ يَمِيْنِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِيْ عَلَيْهِ الْغَصْبَ وَهُوَ مُنْكِرٌ وَإِنْ قَالَ اَصَابَنِيْ اِلٰى مَوْضِعِ كَذَا فَلَمْ يُسَلِّمْهُ اِلَيَّ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْاِسْتِيْفَاءِ وَكَذَّبَهُ شَرِيْكُهُ تَحَالَفَا وَفُسِخَتِ الْقِسْمَةُ لِأَنَّ الْاِخْتِلَافَ فِيْ مِقْدَارِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ فَصَارَ نَظِيْرُ الْاِخْتِلَافِ فِيْ مِقْدَارِ الْمَبِيْعِ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا مِنْ اَحْكَامِ التَّحَالُفِ فِيْمَا تَقَدَّمَ.

অনুবাদ : আর যদি বলে যে, আমি আমার হক বুঝে পেয়েছি, কিন্তু তুমি তার কিছু অংশ দখল করে নিয়েছ। তাহলে কসম সাপেক্ষে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ সে তার বিরুদ্ধে গসবের দাবি করছে। আর সে [প্রতিপক্ষ] তার এ দাবিকে অস্বীকার করছে। আর যদি বলে যে, ঐ স্থানটি পর্যন্ত আমার ভাগে এসেছিল, কিন্তু সে আমার কাছে তা হস্তান্তর করেনি। আর সে যদি নিজের হক বুঝে পাওয়ার কথা স্বীকার না করে থাকে। এমতাবস্থায় তার শরিক পক্ষ তাকে মিথ্যারোপ করলে উভয়কে কসম করতে হবে এবং বণ্টন বাতিল করা হবে। কারণ বণ্টনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অংশের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং তার উদাহরণ হলো বিক্রিত পণ্যের পরিমাণ সংক্রান্ত মতবিরোধের মতো। যা আমরা উভয় পক্ষের কসম সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করে এসেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য ইবারতে দুটি মাসআলা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমটির সূরতে মাসআলা হলো–

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ قَدِ اسْتَوْفَيْتُ حَقِّيْ الخ : দুই শরিকের মাঝে একটি বাড়ি বণ্টন করা হলো। কিছুদিন পর তাদের একজন দাবি করলো বণ্টনের মাধ্যমে আমি আমার হক যথাযথভাবেই বুঝে পেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তা থেকে কিছু অংশ জবরদখল করে নিয়েছ। এমতাবস্থায় যদি সে তার এ দাবির স্বপক্ষে কোনো বাইয়্যিনাহ পেশ করতে সক্ষম না হয় তাহলে কসম সাপেক্ষে প্রতিপক্ষের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ সে তার প্রতিপক্ষ শরিকের বিরুদ্ধে গসবের দাবি তুলছে। আর প্রতিপক্ষ তার এ দাবিকে অস্বীকার করছে। তাই প্রতিপক্ষ হলো মুনকির। আর কায়দা হলো বাদী বাইয়্যিনাহর মাধ্যমে তার দাবি প্রমাণ করতে না পারলে কসম স্বাপেক্ষে বিবাদী বা মুনকিরের কথা গ্রহণযোগ্য হয়।

দ্বিতীয় মাসআলা :

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ اَصَابَنِيْ اِلٰى مَوْضِعِ كَذَا الخ : দুই শরিকের কেউ যদি বলে যে, বণ্টনের ভিত্তিতে ঐ সীমানা পর্যন্ত আমার ভাগে এসেছে, কিন্তু আমার শরিক পক্ষ তা জবর দখল করে রেখেছে, আমার হাতে তা হস্তান্তর করেনি। আর তার শরিক পক্ষ যদি তার এ দাবি অস্বীকার করে, এমতাবস্থায় দাবিদার ব্যক্তি বণ্টনের পর নিজের অংশ বুঝে পাওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান না করে থাকলে উভয় শরিককে কসম করানোর মাধ্যমে বণ্টনকে বাতিল করে দেওয়া হবে। কারণ এখানে বণ্টনের মাধ্যমে অর্জিত হিস্সার পরিমাণ নিয়ে উভয়ের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। তাই পূর্বে বর্ণিত মূলনীতি অনুসারে উভয় পক্ষের কসম বিনিময়ের মাধ্যমে বণ্টন বাতিল ঘোষণা করা হবে। কেননা বণ্টনের দ্বারা অর্জিত হিস্সার পরিমাণ সংক্রান্ত মতবিরোধটা বিক্রীত পণ্যের পরিমাণ সংক্রান্ত মতবিরোধের মতো। আর যেহেতু বিক্রীত পণ্যের পরিমাণ নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে– اِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادَّا হাদীসের ভাষ্য অনুসারে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মাঝে কসম বিনিময়ের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তিকে রহিত করতে হয়। তাই এ মাসআলার উপর কিয়াস করে আলোচ্য মাসআলায়ও উভয় শরিকের কসম বিনিময়ের মাধ্যমে বণ্টনকে রহিত করতে হবে। উভয় পক্ষের মাঝে কসম বিনিময় সংক্রান্ত মাসআলা পূর্বে মূল কিতাবের ২০৯ পৃষ্ঠায় দাবি উত্থাপন অধ্যায়ে كِتَابُ الدَّعْوٰى -এর মাঝে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

وَلَوْ اِخْتَلَفَا فِي التَّقْوِيْمِ لَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهِ لِاَنَّهُ دَعْوَى الْغَبْنِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِهِ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الْقِسْمَةِ لِوُجُوْدِ التَّرَاضِيْ اِلَّا اِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ بِقَضَاءِ الْقَاضِيْ وَالْغَبْنُ فَاحِشٌ لِاَنَّ تَصَرُّفَهُ مُقَيَّدٌ بِالْعَدْلِ .

অনুবাদ : যদি শরিক দুইজন সম্পদের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে মতবিরোধ করে, তাহলে তাদের বক্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। কেননা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। এরূপ অভিযোগ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয় না। তদ্রূপ বণ্টনের ক্ষেত্রেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এখানে বণ্টন প্রার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি রয়েছে। তবে বণ্টন যদি বিচারকের ফয়সালা অনুপাতে হয় এবং পক্ষপাতিত্ব যদি খুব বেশি হয় [তাহলে এ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে।] কারণ বিচারকের হস্তক্ষেপে ন্যায়পরায়ণতা বিদ্যমান থাকা শর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উক্ত বিধানের সূরতে মাসআলা হলো, যেমন– যায়েদ ও আমর এই দুইজন শরিকানার ভিত্তিতে একশত বকরির মালিক ছিল। বকরির পালের মাঝে ছোট বড় মিশ্রিত থাকায় তারা বকরিগুলোর মূল্য নির্ধারণ পূর্বক উভয়ের মাঝে বণ্টন করল। বণ্টনের মাধ্যমে যায়েদের ভাগে পয়তাল্লিশটি ও আমরের ভাগে পঞ্চান্নটি করে বকরি এলো। এখন যদি যায়েদ এই দাবি তোলে যে, বকরির ভুল মূল্য নির্ধারণ হয়েছে। ফলে আমার ভাগে বকরি কম এসেছে। তাহলে যায়েদের এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ সে তার এ দাবির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণকারীদের উপর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ দিচ্ছে। আর বিক্রয় চুক্তিতে এরূপ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং বণ্টনের ক্ষেত্রেও তা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত না। কেননা বিক্রয় ও বণ্টন উভয় ক্ষেত্রেই বকরি বা পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে উভয় পক্ষের সম্মতি বিদ্যমান ছিল। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের সূরত হলো, যেমন কেউ গরু ক্রয় করল, যে গরুটি মৌলিকভাবে চল্লিশ হাজার বা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মূল্য নির্ধারণের উপযোগী ছিল। এখন ক্রেতা যদি এ অভিযোগ তোলে যে গরুর দাম বলার ক্ষেত্রে বিক্রেতা তার নিজের পক্ষপাতিত্ব করেছে বলে আমি ধোকাগ্রস্থ হয়েছি। এখন এ গরু আমি ফেরত দিয়ে বিক্রয় রহিত করতে চাই। তাহলে সে ক্রেতার এরূপ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আইনের দৃষ্টিতে সে বিক্রয় বাতিল করতে পারবে না। কারণ গরু ক্রয় করার সময় উভয়ের সন্তুষ্টি ক্রমেই তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।

তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও বকরির মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। তার কারণ হলো বণ্টনের পূর্বে মূল্য নির্ধারণের সময় তাতে উভয় পক্ষেরই সন্তুষ্টি বিদ্যমান ছিল। উল্লেখ্য যে, যদি শরিকদ্বয় নিজেরাই বণ্টনকার্য সম্পাদন করে তাহলেই কেবল এই বিধান কার্যকর হবে। কিন্তু যদি [কাজি] বিচারকের ফয়সালাক্রমে এই বণ্টন কার্য সম্পন্ন করা হয় এবং পক্ষপাতিত্বও যদি খুব বেশি হয়। একটি বকরি আসলে [৫০০] পাঁচশত টাকা মূল্য নির্ধারণের উপযোগী সে জায়গায় তার মূল্য ধরা হলো ৫০০০ [পাঁচ হাজার] টাকা তাহলে এমন সুরতে মূল্য নির্ধারণে ভুলের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ কাজি কর্তৃক কোনো কাজ সম্পাদিত হওয়ার কাজটি ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা সাথে সম্পাদিত হওয়া। তাই বেশি পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে কাজি কর্তৃক ঐ কাজটি ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পাদিত না হওয়া সাব্যস্ত হওয়ায় ঐ সুরতে মূল্য নির্ধারণে ভ্রান্তির দাবি গ্রহণযোগ্য হবে।

অধমের মতে, কাজির ফয়সালা ব্যতিরেকে উভয় শরিকের সন্তুষ্টিক্রমে বণ্টনের সুরতেও যদি বেশি পরিমাণ পক্ষপাতিত্ব ধরা পরে তাহলে এই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগেও বণ্টন বাতিল করা হবে। যেমনটি ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লিখিত আছে।

–[শামী : ৫/১৬৯]

وَلَوْ اِقْتَسَمَا دَارًا وَاَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ طَائِفَةً فَادَّعَى اَحَدُهُمَا بَيْتًا فِىْ يَدِ الْاٰخَرِ اَنَّهُ مِمَّا اَصَابَهُ بِالْقِسْمَةِ وَاَنْكَرَ الْاٰخَرُ فَعَلَيْهِ اِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ لِمَا قُلْنَا وَاِنْ اَقَامَا الْبَيِّنَةَ يُؤْخَذُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِىْ لِاَنَّهُ خَارِجٌ وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ تَتَرَجَّحُ عَلٰى بَيِّنَةِ ذِى الْيَدِ وَاِنْ كَانَ قَبْلَ الْاِشْهَادِ عَلَى الْقَبْضِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا وَكَذَا اِذَا اخْتَلَفَا فِى الْحُدُوْدِ وَاَقَامَا الْبَيِّنَةَ يَقْضِىْ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِالْجُزْءِ الَّذِىْ هُوَ فِىْ يَدِ صَاحِبِهِ لِمَا بَيَّنَّا وَاِنْ قَامَتْ لِاَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قُضِىَ لَهُ وَاِنْ لَمْ تَقُمْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا تَحَالَفَا كَمَا فِى الْبَيْعِ .

অনুবাদ : যদি দুই শরিকের মধ্যে কোনো বাড়ি বণ্টন হয় এবং এ বণ্টনে তারা এক একটি অংশ প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় তাদের একজন অন্যজনের দখলে বিদ্যমান কোনো একটি ঘরের ব্যাপারে এ মর্মে দাবি করে যে, বণ্টনের মাধ্যমে সে এটি প্রাপ্ত হয়েছিল [কিন্তু অপরজন তাকে তা হস্তান্তর করেনি] আর অপরজন যদি তার এ দাবি অস্বীকার করে, তাহলে বাদীর উপর আবশ্যক হবে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর যদি তারা উভয়েই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাহলে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বাদীর এখানে দখলদারিত্ব নেই। আর যার দখলদারিত্ব নেই তার সাক্ষ-প্রমাণ দখলদার ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আর যদি সম্পত্তি বুঝে পাওয়ার স্বীকারোক্তির পূর্বেই [এরূপ দাবি উত্থাপন করা] হয় তাহলে তারা উভয়ে কসম বিনিময়ের মাধ্যমে বণ্টনকে রহিত করবে। অনুরূপভাবে যদি তারা সীমানা নিয়ে মতবিরোধ করে এবং উভয়ই স্ব স্ব পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাহলে প্রত্যেকের জন্যই ঐ অংশের ফয়সালা দেওয়া হবে, যা তার প্রতিপক্ষের দখলে রয়েছে। ঐ কারণে যা আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি। আর যদি তাদের কেবল একজনের সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তার পক্ষে ফয়সালা দেওয়া হবে। আর কারো পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়া গেলে উভয়ের মাঝে কসম বিনিময় করা হবে। যেমনটি বেচাকেনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা : দুই শরিকের মাঝে একটি ঘর বণ্টন করা হলো, প্রত্যেকের ভাগেই একটি করে অংশ হলো। এখন যদি কেউ অন্যের দখলস্থ কোনো এক অংশের ব্যাপারে এই দাবি করে যে, ঐ অংশটি আমার ভাগে এসেছিল, আর প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করে, তাহলে মাসআলাটির দুই সুরত হতে পারে। যথা–

১. হয়তো নিজ নিজ অংশ কব্জা করার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদানের পূর্বেই এরূপ দাবি তোলা হবে। ২. অথবা কব্জা করার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদানের পর এরূপ দাবি তোলা হবে।

যদি কজার ব্যাপারে স্বীকারোক্তির পূর্বে এরূপ দাবি তোলা হয় তাহলে উভয়পক্ষের মাঝে কসম বিনিময়ের মাধ্যমে বণ্টনকে বাতিল করে দেওয়া হবে। আর কজার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদানের পর এরূপ দাবি তোলা হলে দাবিদারের পক্ষে আবশ্যক হবে তার দাবির স্বপক্ষে বাইয়্যিনাহ পেশ করা। কারণ বণ্টন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর সে তা বাতিলের দাবি করছে। আর কোনো দাবি বাইয়্যিনাহ ছাড়া গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং যদি সে বাইয়্যিনাহ পেশ করতে পারে তাহলে তার পক্ষে ফয়সালা দেওয়া হবে। অন্যথায় নয়। আর যদি উভয় পক্ষই বাইয়্যিনাহ পেশ করে তাহলে দখলদারের তুলনায় অদখলদারের বাইয়্যিনাহ গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ বাইয়্যিনাহ পেশ করার উদ্দেশ্য হলো যা প্রমাণিত নয় তা প্রমাণ করা। আর দখলদারের দখলটিই যেহেতু তার পক্ষের একটি প্রমাণ তাই তার পক্ষ থেকে প্রমাণ হিসেবে বাইয়্যিনাহ পেশ করলে তা গ্রহণ করা হবে না।

قَوْلُهُ : وَكَذَا إِذَا اخْتَلَفَا فِى الْحُدُوْدِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, অনুরূপভাবে যদি দুই শরিকের মাঝে সীমানা নিয়ে মতবিরোধ হয় এবং উভয়েই তাদের দাবির স্বপক্ষে বাইয়্যিনাহ পেশ করে তাহলে প্রত্যেকের জন্য তাদের বিপক্ষে দখলস্থ অংশের ব্যাপারে ফয়সালা দেওয়া হবে।

উদাহরণ স্বরূপ খালেদ ও যায়েদ শরিকানার ভিত্তিতে একটি বাড়ির মালিক। বাড়ি বণ্টন করলে উভয়ে এক একটি অংশ পেল। উভয়ের সীমানাতেই একটি করে ঘর রয়েছে যা তার প্রতিপক্ষ দখল করে আছে। এখন প্রত্যেকেই দাবি করল যে, আমার অংশের ভিতর যে ঘরটি রয়েছে সেটি আমার। আর প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করলো। এমতাবস্থায় যদি উভয়ে তাদের দাবির স্বপক্ষে বাইয়্যিনাহ পেশ করতে পারে তাহলে উভয়ের পক্ষে তার অংশে অবস্থিত প্রতিপক্ষের দখলস্থ ঘরের ব্যাপারে ফয়সালা দেওয়া হবে। আর শুধু এক পক্ষ বাইয়্যিনাহ পেশ করতে সমর্থ হলে তার পক্ষেই ফয়সলা হবে। আর যদি কেউ বাইয়্যিনাহ পেশ করতে না পারে তাহলে উভয়ের কসম বিনিময়ের মাধ্যমে বণ্টন বাতিল করা হবে।

فَصْلٌ : قَالَ وَاِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضَ نَصِيْبِ اَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لَمْ تَفْسَخِ الْقِسْمَةَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَرَجَعَ بِحِصَّةِ ذٰلِكَ فِىْ نَصِيْبِ صَاحِبِهِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَكَرَ الْاِخْتِلَافَ فِىْ اِسْتِحْقَاقِ بَعْضٍ بِعَيْنِهِ وَهٰكَذَا ذُكِرَ فِى الْاَسْرَارِ وَالصَّحِيْحُ اَنَّ الْاِخْتِلَافَ فِىْ اِسْتِحْقَاقِ بَعْضٍ شَائِعٍ مِنْ نَصِيْبِ اَحَدِهِمَا فَاَمَّا فِىْ اِسْتِحْقَاقِ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ لَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ بِالْاِجْمَاعِ وَلَوْ اِسْتَحَقَّ بَعْضَ شَائِعٌ فِى الْكُلِّ تُفْسَخُ بِالْاِتِّفَاقِ هٰذِهِ ثَلٰثَةُ اَوْجُهٍ ـ

অনুচ্ছেদ : হক তথা মালিকানা দাবি করার মাসাইল

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [বণ্টনের পর] যদি দুই শরিকের মধ্যে কোনো একজনের অংশের নির্দিষ্ট কিয়দংশের ব্যাপারে অন্য কোনো মালিক বের হয়ে আসে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, এতে বণ্টন বাতিল হবে না। এ অবস্থায় সে তার হিসসা পরিমাণ অপর শরিকের অংশ থেকে নিয়ে নিবে। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, উক্ত অবস্থায় বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) নির্দিষ্ট কিয়দংশের মালিক বেরিয়ে আসার সুরতে ইমামদ্বয়ের মতভেদ উল্লেখ করেন। "আসরার" গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, দুই শরিকের কোনো একজনের অবিভাজ্য কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে এলে ইমামদের এ মতভেদ প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি নির্দিষ্ট কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে আসে তাহলে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে উক্ত বণ্টন বাতিল হবে না। আর যদি পূর্ণ সম্পত্তির অবিভাজ্য কিয়দংশের ব্যাপারে মালিক বের হয়ে আসে তাহলে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায়ে উক্ত বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে। এ হিসেবে এখানে তিনটি অবস্থা হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য পরিচ্ছেদে বণ্টনের মাঝে ভুলের দাবি সংক্রান্ত মাসাইলের আলোচনা শেষ করার পর এই অনুচ্ছেদে মুসান্নিফ (র.) বণ্টন সম্পন্ন করার পর বণ্টিত সম্পত্তিতে অন্য আরেকজন হকদার বেরিয়ে আসলে করণীয় কি হবে? এই সংক্রান্ত মাসাইল আলোচনা করতে চাচ্ছেন।

قَوْلُهُ وَاِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضَ نَصِيْبِ الخ :

মাসআলা : যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তিকে তাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার পর সেই সম্পত্তিতে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির আংশিক মালিকানা প্রমাণিত হয় তাহলে তার তিনটি সুরত হতে পারে। যথা–

১. হয়তো দুই শরিকের যে কোনো একজন বা উভয়জনের অংশ থেকে নির্দিষ্ট কোনো অংশের মালিকানা প্রমাণিত হবে।

২. অথবা উভয়ের অংশ হতে অনির্দিষ্ট কোনো অংশের মালিকানা প্রমাণিত হবে।

৩. কিংবা দুজনের মধ্য হতে যে কোনো একজনের অংশ থেকে অনির্দিষ্ট কোনো অংশের মালিকানা প্রমাণিত হবে।

প্রথম সুরতে বণ্টিন সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশে তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানা প্রমাণিত হওয়ার কারণে ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে বণ্টন বাতিল সাব্যস্ত হবে না; বরং বণ্টন বহাল থাকা অবস্থায়ই তৃতীয় ব্যক্তিকে তার চিহ্নিত অংশ দিয়ে দেওয়া হবে। এবং যার অংশ থেকে তৃতীয় ব্যক্তির সম্পত্তি বিয়োগ হলো সে তার অপর শরিকের কাছ থেকে তার হিসসা অনুপাতে সে পরিমাণ সম্পত্তি ফেরত নিয়ে নিবে। যেমন যায়েদ ও খালিদ তাদের পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে প্রাপ্ত একটি জমি উভয়ের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে নিল। যথা এই ছকের মাঝে যায়েদ বাম পার্শ্বে ও খালিদ ডান পার্শ্বের অংশ গ্রহণ করলো। কিছুদিন পর পাশের বাড়ির ওয়ালিদ এসে দাবি করলো যে, এই জমিতে এই দাগের ভিতরের জমিটুকু আমার এবং কাজির দরবার থেকে সে মামলার মাধ্যমে প্রমাণ করে নিজের পক্ষে ফয়সালা নিয়ে এলো। এমতাবস্থায় ওয়ালিদকে তার নির্ধারিত দাগের ভিতরের অংশ দিয়ে দেওয়া হবে এবং খালিদ স্বীয় অংশ থেকে ওয়ালিদকে দেওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পরিমাণ জমি যায়েদের অংশ থেকে ফেরত নিয়ে নিবে এবং পূর্বের বণ্টনকে রহিত করবে না।

আর দ্বিতীয় সুরতে অর্থাৎ যদি তৃতীয় ব্যক্তি উভয়ের অংশে বিস্তৃত অনির্দিষ্ট কোনো অংশের মালিক প্রমাণিত হয় তাহলে ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রকারের মালিকানা প্রকাশ পাওয়ার দরুন তাদের বণ্টন বাতিল সাব্যস্ত হবে এবং হকদার তৃতীয় ব্যক্তির হক আদায়ের পর সম্পত্তিকে নতুনভাবে পুনরায় বণ্টন করতে হবে। যেমন– যায়েদ ও খালিদ তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি জমি তাদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করল। বণ্টন সম্পন্ন হওয়ার পর একজন এসে দাবি করল যে, আমি তোমার বোন। সুতরাং এই জমিতে উত্তরাধিকার সূত্রে আমারও অধিকার রয়েছে এবং তারা দুজনও তার একথাকে স্বীকার করে নিল। এমতাবস্থায় তৃতীয় আরেকজন হকদার প্রমাণিত হওয়ায় যায়েদ ও খালিদ যেভাবে জমিটি তাদের মাঝে ভাগ করে নিয়েছিল সে বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে। কারণ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ -এর হিসেবে তাদের বোন তাদের উভয়ের অংশ থেকে এক পঞ্চমাংশ জমি প্রাপ্য হয়েছে। যা নির্দিষ্ট নয়; বরং উভয়ের অংশে বিস্তৃত। আর তৃতীয় সুরতে অর্থাৎ বণ্টন সম্পন্ন হওয়ার পর দু'জনের মধ্য থেকে যে কোনো একজনের অংশ থেকে অনির্দিষ্ট অংশের যদি কোনো হকদার বেরিয়ে আসে তাহলে এই সুরতে বণ্টন বাতিল হবে কি না এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এরূপ হকদার বেরিয়ে আসার দ্বারা বণ্টন বাতিল হবে না; বরং উভয় শরিকের এ ব্যাপারে এখতিয়ার থাকবে। হয়তো হকদারের হক বুঝিয়ে দেওয়ার পর যার অংশ থেকে হকদারের হক বিয়োগ হয়েছে সে অপর শরিকের কাছ থেকে সে পরিমাণ অংশ তার হিসসা অনুযায়ী ফেরত নিয়ে নিবে। অথবা উভয়ে স্বেচ্ছায় এ বণ্টনকে বাতিল করে দিয়ে নতুনভাবে বণ্টন করবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, এই সুরতে বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং হকদারের হক দিয়ে দেওয়ার পর বণ্টনকে আবার নবায়ন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, মনে করি রাস্তার ধারে অবস্থিত একটি বাড়ি যা যায়েদ ও খালিদের যৌথ মালিকানায় ছিল। উভয়ে তা তাদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করল। যায়েদ রাস্তার ধারের অংশ নিল। আর খালিদ পেছনের অংশ নিল। বাড়িটিকে তারা ২০ [বিশ] কাঠা জমি পেয়ে ১০ [দশ] কাঠা করে উভয়ের মাঝে বণ্টন করেছিল। কিছুদিন পর আব্দুর রহমান নামে তৃতীয় এক ব্যক্তি এসে দাবি করল যে, এ বাড়িতে আমি ক্রয়সূত্রে রাস্তার পাশ থেকে চার কাঠা জমির মালিক। যা আমি যায়েদ ও খালেদ উভয়ের বাবা আব্দুস সামাদের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম। যায়েদ ও খালিদ তার এই দাবিকে মেনে নিল। সুতরাং এই সুরতে মাসআলায় আব্দুর রহমান এই বাড়ির রাস্তার পার্শ্ব থেকে চার কাঠা জমির হকদার সাব্যস্ত হলো যার পুরুটাই যায়েদের অংশে অবস্থিত। কিন্তু আব্দুর রহমানের এই চার কাঠা জমি যায়েদের অংশের দশ কাঠা জমির মধ্য থেকে কোনো দিক থেকে নিবে তা নির্দিষ্ট নয়। ফলে এ চার কাঠা জমি চিহ্নিত করার পূর্ব পর্যন্ত তা যায়েদের দশ কাঠা জমির পুরোটাতেই বিস্তৃত। যাকে কিতাবে جُزْءٌ شَائِعٌ তথা অনির্দিষ্ট বা অবিভাজ্য অংশ বলা হয়েছে। সুতরাং আব্দুর রহমানকে যায়েদের বর্তমান অংশ থেকে চার কাঠা জায়গায় নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করে দেওয়ার পর যায়েদ ও খালিদের পূর্ব ফয়সালাকৃত বণ্টন বহাল থাকবে কিনা সেটি হলো এখন প্রশ্ন। কারণ আব্দুর রহমানকে তার হক বুঝিয়ে দেওয়ার পর তারা দুই ভাইয়ের মধ্যে বাড়িটি ১৬ [ষোল] কাটা জায়গা হিসেবে বণ্টিত হওয়ার কথা, যা থেকে উভয়ে ৮ [আট] কাঠা জায়গা করে পাবে।

অথচ পূর্বে তারা বাড়িটিকে ২০ [বিশ] কাঠা জায়গা হিসেবে বণ্টন করেছিল। যার ফলে যায়েদের ভাগে এখন ৬ [ছয়] কাঠা জায়গা অবশিষ্ট আছে। আর খালিদের ভাগে ১০ [দশ] কাঠা। সুতরাং এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সিদ্ধান্ত হলো, পূর্বের বণ্টনই বহাল থাকবে এবং যায়েদ খালিদের অংশ থেকে দুই কাঠা জায়গা ফেরত নিয়ে নিবে। তাহলেই উভয়েই নিজ নিজ অংশ হিসেবে ৮ [আট] কাঠা করে পেয়ে যাবে। তবে তারা দুই ভাই যদি বণ্টনকে নবায়ন করতে চায় তাহলে তাদের জন্য এ অধিকার থাকবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সিদ্ধান্ত হলো, আব্দুর রহমানের হক তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর যায়েদ ও খালিদের পূর্ব ফয়সালাকৃত বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে এবং বাড়িটিকে তাদের মাঝে আবার নতুনভাবে বণ্টন করতে হবে।

قَوْلُهُ قَالَ (رض) ذَكَرَ الْاِخْتِلَافَ فِي اِسْتِحْقَاقِ بَعْضٍ الخ : মোটকথা বণ্টন সম্পন্ন হওয়ার পর বণ্টিত সম্পত্তিতে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি হকদার প্রমাণিত হলে মাসআলার উপরে বর্ণিত তিনটি সুরতের প্রথম ও দ্বিতীয় সুরতে ইমামদের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই। কেবল শুধু তৃতীয় সুরতে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তবে ইমাম কুদূরী (র.) তাঁর মুখতাসারুল কুদূরীতে ইমামদের এই মতভেদটিকে প্রথম সুরতের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিভাজ্য অংশের হকদার প্রমাণিত হওয়ার সুরতে তিনি ইমামদের উপরিউক্ত মতভেদ উল্লেখ করেন, যা আমরা কিতাবের [মতন] মূল ইবারতে দেখতে পাচ্ছি। অথচ এই সুরতে কারো কোনো মতভেদ নাই। সুতরাং এটি ইমাম কুদূরী (র.)-এর একটি ভুল।

হিদায়া গ্রন্থকার তার ذَكَرَ الْاِخْتِلَافَ فِيْ اِسْتِحْقَاقِ এই ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.)-এর এই ভুলটির প্রতিই ইঙ্গিত করেন। এবং মাসআলার তিনটি সুরতই উল্লখ করেন যাতে কোনো সুরতে মতভেদ আছে বা নাই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি আরো বলেন যে, এ ভুলটি কেবল ইমাম কুদূরী একাই করেননি; বরং কাজি আবূ যায়দ আদ দাবূসী (র.) [ইন্তেকাল ৪৩০] ও তার ইশারাতুল আসরার নামক কিতাবে এই ভুলটি করেছেন।

উল্লেখ যে, এখানে মুসান্নিফ (র.) আল্লামা আবূ যায়েদ আদ দাবূসী রচিত আল আসরার গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তাতে যে ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন সে ক্ষেত্রে আন নিহায়াহ গ্রন্থকার আল্লামা সাকনাকী (র.) বলেন, যে মুসান্নিফ (র.) -এর এই উদ্ধৃতিটি সঠিক নয়। কারণ আসরার গ্রন্থে আলোচ্য মাসআলার তৃতীয় সুরতেই ইমামদের মতবিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বরং সেখানে جُزْءٌ شَائِعٌ -এর কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। তদ্রূপ মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরী (র.) কর্তৃক যে ভুলের কথা এখানে তুলে ধরেছেন আল ইনায়াহ গ্রন্থকার আল্লামা আকমালুদ্দীন বাবরতী (র.) -এর মতে, তাও সঠিক নয়। কারণ কুদূরীর وَاِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضُ نَصِيْبِ اَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ এই উক্তিটি নিশ্চিতভাবে প্রথম সুরতকে বুঝায় না; বরং তার তৃতীয় সুরত কে উদ্দেশ্য করারও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কেননা কুদূরীর ইবারতে اِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضُ نَصِيْبِ اَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ -এর بِعَيْنِهِ শব্দটিকে যদি بَعْضُ -এর সাথে সম্পৃক্ত ধরা হয় তাহলে তা দ্বারা প্রথম সুরত উদ্দেশ্য হয়। যাতে ইমামদের কোনো মতানৈক্য নেই তাই একথাটা কুদূররীর ভুল বলে সাব্যস্ত হয়। আর যদি بِعَيْنِهِ শব্দটিকে نَصِيْبِ اَحَدِهِمَا -এর সাথে সম্পৃক্ত ধরা হয় তাহলে তার মূল ইবারত এই দাড়ায় যে, وَاِذَا اسْتَحَقَّ فِيْ بَعْضٍ شَائِعٍ فِيْ نَصِيْبِ اَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ এমতাবস্থায় এই ইবারত দ্বারা তৃতীয় সুরত উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারত থেকে যেহেতু একটি সঠিক মর্ম ও অপর একটি ভুল মর্ম উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এটাকে ইমাম কুদূরী (র.)-এর ভুল বলা উচিত হবে না; বরং ভুল মর্মটি বাদ দিয়ে তার সঠিক মর্মটি গ্রহণ করাই এখানে অধিক যুক্তিযুক্ত। এ ছিল আল-ইনাইয়াহ গ্রন্থকার আল্লামা আকমালুদ্দীন বাবরতী (র.)-এর মন্তব্য। তবে আল্লামা আকমালুদ্দীন বাবরতী (র.) কর্তৃক কুদূরীর ইবারতের এই ব্যাখ্যাকে ওলামায়ে কেরাম গ্রহণ করেননি

কারণ মুসান্নিফ (র.) কুদূরীর ইবারতকে যে ব্যাখ্যা ধরে নিয়েছেন যদিও তা একেবারে নিশ্চিত নয় কিন্তু বাহ্যিকভাবে একজন সমঝধার বা জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর ইবারত থেকে এ ব্যাখ্যাই বুঝে থাকবেন। ১. কেননা যদি إِذَا اسْتَحَقَّ فِيْ بَعْضِ نَصِيْبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ইবারতের بِعَيْنِهِ শব্দটিকে بَعْضِ -এর সাথে সম্পৃক্ত না করা হয় তাহলে এ বিধানটি بَعْضِ مُعَيَّنٍ -এর ক্ষেত্রে হবে না بَعْضِ مُشَاعٍ -এর ক্ষেত্রে হবে এ বিষয়টি মাসআলায় অস্পষ্ট থেকে যায়। ফলে মাসআলার ধরনই পাল্টে যাবে। ২. এছাড়াও যদি بِعَيْنِهِ শব্দটিকে نَصِيْبُ أَحَدِهِمَا -এর সাথে সম্পৃক্ত ধরা হয় তাহলে হবে تَاكِيْد -এর জন্য। পক্ষান্তরে যদি তাকে بَعْضِ -এর সাথে সম্পৃক্ত ধরা হয় তাহলে তা নতুন একটি অর্থ তথা تَاسِيْس -এর জন্য হবে। আর আরবি সাহিত্যে শব্দকে تَاكِيْد -এর অর্থে ধরার তুলনায় تَاسِيْس-এর অর্থে ধরা উত্তম। ৩. এ ছাড়াও যে সকল স্থানে এরূপ قَيْد [শর্ত] উল্লেখ করা হয় যাকে তার পূর্ববর্তী দুটি বিষয়ের যে কোনো একটির সাথে সম্পৃক্ত ধরে নেওয়ার সাথে থাকে সে সকল ক্ষেত্রে قَيْد টিকে مُضَاف -এর সম্পৃক্ত ধরাই হলো বৈয়াকরণিক নিয়ম। সমূহ কারণেই আল্লামা কাযী যাদাহ (র.) তার নাতায়িজুল আফকার নামক গ্রন্থে আল্লামা বাবরতী (র.)-এর উপরিউক্ত মন্তব্যকে খণ্ডন করে বলেন, কুদূরীর ইবারতের যে ভুলের কথা মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন সেটাই সঠিক। সুতরাং যিনি এ ক্ষেত্রে মুসান্নিফ (র.)-এর ভুল ধরেছেন তিনিই আসলে ভুলের মাঝে নিপতিত আছেন। তদ্রূপ মুসান্নিফ (র.) কর্তৃক আল আসরার গ্রন্থের উদ্ধৃতিকে যিনি ভুল সাব্যস্ত করেছেন সেটিও ঠিক নয়। কারণ আল আসরার গ্রন্থে আল্লামা আবূ যায়েদ আদ দাবূসী (র.) প্রথমে جُزْء مُعَيَّنٌ -এর মাঝে হকদার বেরিয়ে আসার সুরতকে উল্লেখ করে তাতে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) মতানৈক্য উল্লেখ করেন। তারপর একথাও স্পষ্ট করেছেন যে, এটি মৌলিকভাবে বিশুদ্ধমত নয়; বরং বিশুদ্ধ মত হলো ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর এই মতানৈক্য হলো যে কোনো একজনের جُزْء شَائِعٌ -এর ক্ষেত্রে হকদার বেরিয়ে আসার সুরতে। আল আসরারের ইবারত হলো–

إِذَا اقْتَسَمَ رَجُلَانِ دَارًا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اسْتُحِقَّ مِنْ نَصِيْبِ أَحَدِهِمَا بَيْتٌ مُعَيَّنٌ لَمْ يَبْطُلِ الْقِسْمَةُ وَلٰكِنْ يَتَخَيَّرِ الْقِسْمَةِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ . إِنْ شَاءَ ضَرَبَ مِنْ نَصِيْبِ صَاحِبِهِ بِمَا يُسَاوِيْ صَاحِبَهُ . وَإِنْ شَاءَ اسْتَأْنَفَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يُسْتَأْنَفُ الْقِسْمَةُ . وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ مُضْطَرِبٌ . وَالصَّحِيْحُ أَنَّ الْإِخْتِلَافَ فِيْ اِسْتِحْقَاقِ بَعْضٍ شَائِعٍ فِيْ نَصِيْبِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ مُحَمَّدًا ذَكَرَ الْخِلَافَ فِيْ اِسْتِحْقَاقِ نِصْفِ مَا فِيْ يَدِ أَحَدِهِمَا فِيْ كِتَابِ الْأَصْلِ . وَكَذَا ذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِيْ وَالطَّحَاوِيْ وَالْكَرْخِيْ فِيْ مُخْتَصَرِيْهِمَا وَصَاحِبُ الذَّخِيْرَةِ كُلُّهُمْ ذَكَرُوْا عَلٰى سُؤَالٍ وَاحِدٍ . وَالنِّصْفُ اِسْمٌ لِلشَّائِعِ لَا مُحَالَةَ .

অতএব এই ইবারতের আলোকে মুসান্নিফ (র.) هٰكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَسْرَارِ বলে আসরার গ্রন্থের যে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন এটিকে মুসান্নিফ (র.)-এর ভুল সাব্যস্ত করা সঠিক হবে না; বরং কেবল মাত্র এতটুকু বলা সম্ভব হতে পারে যে, আল আসরার গ্রন্থে মাসআলাটিকে ভুল উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তিনি সঠিক বিষয়টিকে দলিলের সাথে স্পষ্ট করে তুলেছেন। আর মুসান্নিফ (র.)ও আল আসরারের উদ্ধৃতি দিয়ে এটা বুঝাননি যে, তিনি ভুল উল্লেখ করেছেন; বরং মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই ছিল যে, আসরার গ্রন্থে প্রথম সুরতেও মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা বিশুদ্ধ মত নয়। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَذَكَرَهُ اَبُوْ سُلَيْمَانَ مَعَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَاَبُوْ حَفْصٍ مَعَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ الْاَصَحُّ لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّ بِاسْتِحْقَاقِ بَعْضٍ شَائِعٍ ظَهَرَ شَرِيْكٌ ثَالِثٌ لَهُمَا وَالْقِسْمَةُ بِدُوْنِ رِضَاهُ بَاطِلَةٌ كَمَا اِذَا اسْتُحِقَّ بَعْضٌ شَائِعٌ فِى النَّصِيْبَيْنِ وَهٰذَا لِاَنَّ بِاسْتِحْقَاقِ جُزْءٍ شَائِعٍ يَنْعَدِمُ مَعْنَى الْقِسْمَةِ وَهُوَ الْاِفْرَازُ لِاَنَّهُ يُوْجِبُ الرُّجُوْعَ بِحِصَّتِهِ فِىْ نَصِيْبِ الْاٰخَرِ شَائِعًا بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ وَلَهُمَا اَنَّ مَعْنَى الْاِفْرَازِ لَا يَنْعَدِمُ بِاسْتِحْقَاقِ جُزْءٍ شَائِعٍ فِىْ نَصِيْبِ اَحَدِهِمَا وَلِهٰذَا جَازَتِ الْقِسْمَةُ عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ فِى الْاِبْتِدَاءِ بِاَنْ كَانَ النِّصْفُ الْمُقَدَّمُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ثَالِثٍ وَالنِّصْفُ الْمُؤَخَّرُ بَيْنَهُمَا لَا شِرْكَةَ لِغَيْرِهِمَا فَاقْتَسَمَا عَلٰى اَنَّ لِاَحَدِهِمَا مَا لَهُمَا مِنَ الْمُقَدَّمِ وَرُبُعَ الْمُؤَخَّرِ يَجُوْزُ فَكَذَا فِى الْاِنْتِهَاءِ صَارَ كَاسْتِحْقَاقِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ الشَّائِعِ فِى النَّصِيْبَيْنِ لِاَنَّهُ لَوْ بَقِيَتِ الْقِسْمَةُ لَتَضَرَّرَ الثَّالِثُ بِتَفَرُّقِ نَصِيْبِهِ فِى النَّصِيْبَيْنِ اَمَّا هٰهُنَا لَا ضَرَرَ بِالْمُسْتَحِقِّ فَافْتَرَقَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটি উল্লেখ করেনি। অবশ্য আবূ সুলাইমান (র.) তাকে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর সাথে উল্লেখ করেছেন। আর আবূ হাফস (র.) তাকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সাথে উল্লেখ করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) -এর যুক্তি হলো, অবিভাজ্য কিয়দাংশের মালিক বের হওয়ায় তারা দুজনের মালিকানায় তৃতীয় একজন মালিক প্রকাশ পেল। ফলে তার সম্মতি ছাড়া বণ্টন বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমনটি ঘটে থাকে উভয়ের অবিভাজ্য অংশে মালিক বের হয়ে আসলে। এর কারণ হলো, অবিভাজ্য অংশের মালিক বের হয়ে আসার কারণে বণ্টনের অর্থ শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তা হলো পৃথক করণ। কেননা এ অবিভাজ্য অংশের মালিকানা অপরের অংশ থেকে সে পরিমাণ অবিভাজ্য সম্পত্তি ফেরত নেওয়াকে আবশ্যক করে। নির্দিষ্ট অংশের মালিক বের হয়ে আসার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। আর তরফাইনের যুক্তি হলো, একজনের অংশ থেকে অবিভাজ্য কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসার দ্বারা [বণ্টন থেকে] পৃথকীকরণের অর্থ রহিত হয় না। আর এ কারণেই [একটি বাড়িকে] শুরুতেই এই পন্থায় বণ্টন করা জায়েজ হয়। যে [বাড়িটির] সামনের অর্ধেক দুই শরিক ও তৃতীয় ব্যক্তির [হকদার]-এর মাঝে শরিকানাধীন ছিল। আর পিছনের অর্ধেক তাদের দুইজনের মাঝে শরিকানাধীন ছিল। যেখানে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির অংশ নেই। যদি তারা উভয়ে এভাবে বণ্টন করে যে, তার সামনের অর্ধেক তাদের দুজনের যে অংশ রয়েছে তাসহ পিছনের অংশের এক চতুর্থাংশ তাদের একজন নিয়ে নিবে, তাহলে তা বৈধ। তদ্রূপ পরিশেষেও এরূপ বণ্টন বৈধ হবে। সুতরাং তার উদাহরণ হলো, নির্দিষ্ট অংশের মালিক বের হয়ে আসার মতো। পক্ষান্তরে উভয়ের অবিভাজ্য অংশে মালিক বের হয়ে আসার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কারণ এ অবস্থায় বণ্টন বহাল থাকলে তৃতীয় ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। উভয়ের অংশের মাঝে তার অংশটুকু বিভাজ্য হয়ে যাওয়ার কারণে। তবে আলোচ্য এই মাসআলায় হকদার ব্যক্তির কোনো ক্ষতি হয় না। তাই উভয় মাসআলায় পার্থক্য হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُحَمَّدٍ (رح) الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) আলোচ্য মাসআলায় ইমামদের মতামত উল্লেখ করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রায় কি ছিল? তিনি তা আলোচনায় আনেন নি। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ছাত্র আবূ সুলাইমান জূযজানী (র.)[1] বলেন যে, এই মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর সাথে একমত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অপর ছাত্র আবূ হাফস আল কাবীর (র.)[2] বলেন যে, এই মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রায় হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে আবূ হাফস আল কাবীর (র.)-এর মতটিই বিশুদ্ধতম।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) -এর দলিল : বণ্টন সম্পন্ন হওয়ার পর দুই শরিকের কোনো একজনের অংশ থেকে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি অনির্দিষ্ট কিয়দংশের হকদার সাব্যস্ত হলে, তাদের বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনরায় নতুনভাবে বণ্টন করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর এই দাবির স্বপক্ষে যুক্তিভিত্তিক দলিল হলো− আমরা পূর্বে বলে এসেছি যে, আলোচ্য মাসআলার তিনটি সুরতের মধ্য থেকে দ্বিতীয় সুরতে অর্থাৎ যদি উভয় শরিকের অংশ থেকে অনির্দিষ্ট কিয়দংশের হকদার বেরিয়ে আসে তাহলে ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে বণ্টন বাতিল সাব্যস্ত হয়। কারণ এই সুরতে হকদার ব্যক্তি তৃতীয় একজন শরিক সাব্যস্ত হবে। আর নিয়ম হলো কোনো একজন শরিকের সম্মতি ছাড়া যে বণ্টন সম্পন্ন করা হয় নীতিগতভাবে সে বণ্টন বাতিল হয়ে যায়। ঠিক হুবহু এই কারণটিই আমরা যে কোনো এক শরিকের অংশ থেকে অনির্দিষ্ট কিয়দংশের হকদার বেরিয়ে আসার সুরতে [তৃতীয় সুরতে] পেয়ে থাকি। বিধায় এই সুরতেও আমরা সেই অনুরূপ হুকুমই আবর্তিত করব।

একটি বিষয় অবশিষ্ট রইল তাহলো ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর এই বক্তব্য থেকে বুঝা গেল যে, তিনি মাসআলার তৃতীয় সুরতটিকে দ্বিতীয় সুরতের সাথে কিয়াস করেছেন এবং উভয় সুরতেই তৃতীয় শরিক তথা হকদার ব্যক্তির অসম্মতির দরুন বণ্টনকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। এখানে প্রশ্ন হলো, হকদার ব্যক্তির অসম্মতির দরুন বণ্টনকে বাতিল সাব্যস্ত করার পিছনে হেতুটা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, وَهٰذَا لِأَنَّ بِاسْتِحْقَاقِ جُزْءٍ شَائِعٍ অর্থাৎ বণ্টনের উদ্দেশ্য হলো اَلْإِفْرَازُ তথা প্রত্যেক শরিকের অংশকে অপর শরিকের অংশ থেকে পৃথক পৃথক করে দেওয়া। আর অনির্দিষ্ট অংশে কেউ হকদার হলে এ উদ্দেশ্যটি পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয় না। কারণ [شَائِعٌ শব্দটির অর্থই হলো− বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। এই হিসেবে جُزْء شَائِعٌ -এর হকদার সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ যদি [এক ثُلُثٌ] তিন ভাগের এক ভাগে তার হক বা অধিকার সাব্যস্ত হয় তার অর্থ হবে প্রতিটি মালিকানার এক তৃতীয়াংশের সে মালিক।] এমতাবস্থায় যে শরিকের অংশে সে جُزْء شَائِعٌ অনির্দিষ্ট কিয়দাংশের হকদার হবে, তার সাথে বণ্টনের মাধ্যমে তাকে তার নিজের অংশ আলাদা করে নিতে হবে। অনুরূপ যেই শরিক নিজের অংশ থেকে হকদারের হক পরিশোধ করবে সেও তার অপর শরিকের কাছ থেকে হকদারকে দেওয়া অংশ থেকে নিজের অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট যেই অংশ ফেরত পাবে সেটাও جُزْء شَائِعٌ [অনির্দিষ্ট] থেকে যাবে। ফলে যেই উদ্দেশ্যে সে বণ্টন করেছিল তার এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না; বরং তার সম্পদে অপর শরিকের অংশীদারিত্ব থেকেই যাবে। তাই বণ্টন নবায়ন করাই উত্তম। পক্ষান্তরে যদি হকদার ব্যক্তি (جُزْء مُعَيَّنٌ) নির্দিষ্ট কিয়দংশের হকদার হয় তাহলে তাকে হকদারের অংশ পরিশোধ করার জন্য বণ্টনের মুখোমুখি হতে হবে না। এমনিভাবে তার শরিক থেকেও সে নির্দিষ্ট অংশ ফেরত নিতে পারবে। ফলে এই সুরতে বণ্টনের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সাধিত হয় বিধায় এই সুরতে বণ্টন বাতিল করার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

---

১. আবূ সুলাইমান আল জুযজানী, তার মূল নাম হলো− মূসা ইবনে সুলাইমান, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কাছ থেকে তিনি ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। বাদশাহ মামুনুর রশীদের যুগে তার হাতে কাজির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তার লিখিত কিতাবসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য কিতাব হলো− ১. আস সিয়ারুস সাগীর, ২. কিতাবুস সালাত ইত্যাদি। দুইশত হিজরির পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. আবূ হাফস আল কাবীর, তাঁর মূল নাম হলো− আহমদ ইবনে হাফস। তিনি ইমাম বুখারী (র.) -এর যুগে ইমাম বুখারী (র.)-এর উস্তাদতুল্য ছিলেন। বুখারাতে তাঁর অনেক ছাত্র ছিল। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কাছ থেকে তিনি সরাসরি ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। ২১৭ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। −[মুকাদ্দামাতুল হিদায়া, ৩য় খণ্ড : পৃ. ৬]

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল : পক্ষান্তরে এই সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বণ্টন বহাল থাকার কথা বলেন, এ দাবির পক্ষে যুক্তি হলো, এক শরিকের অংশে جُزْء شَائِعٌ-এর মাঝে কেউ হকদার সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারা বণ্টনের উদ্দেশ্যকে বহাল রাখা সম্ভব। তাই এই অজুহাতে বণ্টন বাতিল করা অনাবশ্যক।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যায়েদ ও খালিদ শরিকানা ভিত্তিতে দু-খণ্ড বাড়ির মালিক। এই দুই খণ্ডের মাঝে প্রথম খণ্ডে যে জায়গাটুকু রয়েছে তার অর্ধেক হলো যায়েদ ও খালিদ দুইজনের শরিকানা, আর অবশিষ্ট অর্ধেকের মালিক হলো সাজিদ। দ্বিতীয় খণ্ডের মালিক কেবল তারা দুইজন। তাতে অন্য কোনো শরিক নেই। এমতাবস্থায় বণ্টনের সময় যদি তারা এভাবে বণ্টন করে যে, প্রথম খণ্ডের মাঝে যায়েদের শরিকানা যে অর্ধেকাংশ রয়েছে তা সম্পূর্ণ যায়েদকে দেওয়া হলো এবং তার সাথে তৃতীয় খণ্ডের এক চতুর্থাংশ দেওয়া হলো। যেমন ছকের মাঝে লক্ষ্য করি

প্রথম খণ্ড		দ্বিতীয় খণ্ড	
সাজিদ	যায়েদ	যায়েদ	খালিদ

প্রথমেই যদি কোনো দুই শরিক এভাবে কোনো সম্পত্তিকে বণ্টন করে তাহলে সকলের মতেই এরূপ বণ্টন বৈধ। কারণ এতে উভয় শরিকের সম্পত্তিকে পৃথক পৃথক করণের অর্থ যথাযথভাবে পাওয়া গেছে। সুতরাং যদি বণ্টন সম্পন্ন করার পর একজনের অংশের অনির্দিষ্ট কিয়দংশ কেউ হকদার সাব্যস্ত হয়, তাহলেও বণ্টিত সম্পত্তি উপরিউক্ত আকারই ধারণ করবে এবং বণ্টনের উদ্দেশ্যও তাতে যথাযথভাবে সাধিত হবে। সুতরাং প্রথম সুরতে এই বণ্টন যদি বৈধ হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় সুরতে তার বৈধতার ব্যাপারে সমস্যাটিকে কোথায়? মনে করি, উপরের ছকের উভয় খণ্ডকেই যায়েদ ও খালিদ তাদের মালিকানা সম্পত্তি মনে করতো এবং সে হিসেবে ভাগ করে যায়েদ প্রথম খণ্ড নিল আর খালিদ দ্বিতীয় খণ্ড নিল। অতঃপর তাদের এ বণ্টন সম্পূর্ণ হওয়ার পর সাজিদ এসে প্রথম খণ্ডের অর্ধেকের হক দাবি করল এবং তার হক সাব্যস্ত হয়ে গেলে যায়েদের অংশ অর্থাৎ প্রথম খণ্ডের অর্ধেক সাজিদকে দিয়ে দিল এবং সে খালিদের খণ্ড থেকে এক চতুর্থাংশ নিয়ে নিল। তাহলে এরূপ বণ্টনের সুরতে তো বণ্টনের অর্থ কোনোক্রমেই রহিত হয় না। অথচ এটাই তো আমাদের আলোচ্য মাসআলা। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) এই বাতিল হয়ে যাওয়ার পক্ষে মত পেশ করেননি, যেমনটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতটিকেই প্রাধান্য দেন।

তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, উপরে যে সুরত বের করা হয়েছে এরূপ সুরত তো মাসআলার দ্বিতীয় সুরত তথা উভয় শরিকের অংশে جُزْء شَائِعٌ -এর হকদার বের হয়ে আসার সুরতেও মেনে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে সেই সুরতে ওলামায়ে কেরাম সকলেই বণ্টন বাতিল হয়ে যাওয়ার ফয়সালা দেন কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো– এই সুরতে বণ্টন বাতিল করার প্রয়োজীয়তা হলো হকদার ব্যক্তিকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো। অর্থাৎ যদি এই সুরতে বণ্টনকে বহাল রাখা হয় তাহলে যেহেতু সে উভয় শরিকের অংশ থেকে جُزْء شَائِعٌ হয়ে যাবে। তথা কিছু জমি এই শরিকের ভাগে পরবে আর বাকিটা অন্যের ভাগে পরবে। আর যেহেতু তার হকটা مُشَاعٌ বা বিস্তৃত তাই দুই শরিক একই পাশ থেকে তাকে দিতে অসম্মতও হতে পারে। পক্ষান্তরে এক শরিকের অংশে যদি হকদারের হকটা সীমাবদ্ধ থাকে চাই তা (مُعَيَّنٌ) নির্দিষ্ট হোক বা (مُشَاعٌ) অনির্দিষ্ট হোক এমতাবস্থায় হকদারের অংশটুকু দুই জায়গায় বিক্ষিপ্ত হয় না। আর এই পার্থক্যের কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) এই দুই সুরতের মাঝে বিধানগত পার্থক্য নির্ণয় করে থাকেন।

মোটকথা হলো– আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাঝে এই মতানৈক্যের মৌলিক কারণ হলো মাসআলার দ্বিতীয় সুরতে অর্থাৎ উভয় শরিকের অংশে جُزْء مُشَاعٌ -এর হকদার বের হয়ে আসার সুরতে ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে বণ্টন বাতিল হওয়ার ফয়সালা গ্রহণের কারণ নির্ণয়ে মতাদর্শগত ব্যবধান। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ঐ সুরতে বণ্টন বাতিল হওয়ার কারণ হলো [مُسْتَحِقٌّ বা] হকদার ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, তাতে বণ্টন বাতিল হওয়ার কারণ হলো বণ্টনের মূল মাকসাদ বা উদ্দেশ্য তথা পৃথকীকরণ বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। তিনি এই সম্ভাবনাটিকে খুব বড় করে দেখছেন। কারণ বণ্টনের দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য হাসিল না হলো তাহলে এ বণ্টনকে বহাল রেখে কোনো লাভ নেই। তাই তিনি এ বণ্টন বাতিল হয়ে যাওয়ার পক্ষে ফয়সালা দেন এবং পুনরায় নতুন করে বণ্টন করার পরামর্শ দেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এই সম্ভাবনাটির তুলনায় হকদার ব্যক্তি তার হক নিয়ে কোনো ধরনের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনাটিকে অনেক বড় করে দেখেন এবং যেখানে এ বিষয়টি যথাযথ পাওয়া গেছে সেখানে বার বার বণ্টনের ঝামেলা পোহানো থেকে মুক্ত থাকার পরাশমর্শ দেন। এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এই সুরতে বণ্টন বাতিল না হওয়ার পক্ষে ফয়সালা করার অর্থ এই নয় যে, বণ্টনকে বহাল রাখতেই হবে, বরং তার অর্থ হলো তাদের জন্য বণ্টন বহাল রাখার অধিকার থাকবে এবং যদি চায় তারা এ বণ্টনকে বাতিলও করতে পারবে। তবে বণ্টন বাতিল করাটা আবশ্যক নয়।

وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا أَخَذَ أَحَدُهُمَا الثُّلُثَ الْمُقَدَّمَ مِنَ الدَّارِ وَالْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ مِنَ الْمُؤَخَّرِ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ ثُمَّ اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْمُقَدَّمِ فَعِنْدَهُمَا إِنْ شَاءَ نَقَضَ الْقِسْمَةَ دَفْعًا لِعَيْبِ التَّشْقِيصِ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبُعِ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمُؤَخَّرِ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتُحِقَّ كُلُّ الْمُقَدَّمِ رَجَعَ بِنِصْفِ مَا فِي يَدِهِ فَإِذَا اسْتُحِقَّ النِّصْفُ رَجَعَ بِنِصْفِ النِّصْفِ وَهُوَ الرُّبُعُ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ وَلَوْ بَاعَ صَاحِبُ الْمُقَدَّمِ نِصْفَهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّ النِّصْفُ الْبَاقِي رَجَعَ بِرُبُعِ مَا فِي يَدِ الْآخَرِ عِنْدَهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا وَسَقَطَ خِيَارُهُ بِبَيْعِ الْبَعْضِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) مَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ نِصْفِ مَا بَاعَ لِصَاحِبِهِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَنْقَلِبُ فَاسِدَةً عِنْدَهُ وَالْمَقْبُوضُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَمْلُوكٌ فَنَفَذَ الْبَيْعُ فِيهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ فَيَضْمَنُ نِصْفَ نَصِيبِ صَاحِبِهِ.

অনুবাদ : সুরতে মাসআলা হলো, যদি [একটি] বাড়ির সম্মুখ ভাগের এক তৃতীয়াংশ দুই শরিকের যে কোনো একজন গ্রহণ করে আর পিছনের ভাগের দুই তৃতীয়াংশ অপরজন গ্রহণ করে এবং উভয় ভাগের মূল্য সমান সমান হয়ে থাকে। অতঃপর সামনের ভাগের মাঝে কেউ অর্ধেকের হকদার সাব্যস্ত হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, দ্বিখণ্ডিত হওয়ার দোষকে দূরীকরণের লক্ষ্যে সে চাইলে বণ্টনকে বাতিল করতে পারবে। আর যদি চায় তাহলে পিছনের ভাগে অবস্থিত অপর শরিকের অংশ থেকে এক চতুর্থাংশ ফেরত নিবে। কারণ যদি সম্মুখভাগের পূর্ণ সম্পত্তির কেউ হকদার সাব্যস্ত হতো তাহলে সে তার কাছ থেকে অর্ধেক সম্পত্তি ফেরত নিতে পারত। অতএব যখন অর্ধেকের হকদার সাব্যস্ত হলো তাই সে অর্ধেকের অর্ধেক ফেরত নিবে। আর তা হলো এক চতুর্থাংশ জুযকে কুলের উপর কিয়াস করার ভিত্তিতে। আর যদি সম্মুখভাগের দখলদার তার অর্ধেক বিক্রি করে দেয়। অতঃপর কেউ অবশিষ্ট অর্ধেকের হকদার সাব্যস্ত হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, সে অপর শরিকের কাছ থেকে এক চতুর্থাংশ ফেরত নিয়ে নিবে। সেই কারণে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং কিছু অংশ বিক্রি করে দেওয়ার কারণে তার [বণ্টন বাতিল করার] এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, অপর শরিকের হাতে যা রয়েছে তা উভয়ের মাঝে সমভাবে বণ্টিত হবে এবং সে অপর শরিকের জন্য তার বিক্রয়কৃত অর্ধেক অংশের মূল্যের জামিন হবে। কারণ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, [হকদার সাব্যস্ত হওয়ার কারণে] বণ্টন ফাসিদ সাব্যস্ত হয়েছে। আর ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে যা হস্তগত হয় তাতে মালিকানা সাব্যস্ত হয় ফলে তাতে বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে। আর [এরূপ বিক্রয়] তা বাজার মূল্যের ভিত্তিতে দায়বদ্ধ হয়ে থাকে বিধায় সে [বিক্রেতা] তার অপর শরিকের অংশ হিসেবে অর্ধেক [বাজার মূল্যের] জামিন হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শরিকানা সম্পত্তিকে বণ্টন করার পর যদি কোনো এক শরিকের অংশে কেউ جزء شائع -এর হকদার সাব্যস্ত হয়। তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যার অংশ থেকে হকদার সাব্যস্ত হয়েছে তার জন্য বণ্টনকে বাতিল করা ও না করা উভয়েরই অধিকার থাকবে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য ইবারতে কয়েকটি সূরতে মাসআলা ও তার সমাধান উল্লেখ করেন।

সূরতে মাসআলা : ১. মনে করি একটি বাড়ির সম্মুখভাগের মূল্য তার পেছনের ভাগের তুলনায় দ্বিগুণ। সুতরাং বাড়িটিকে যদি দুই শরিকের মাঝে এভাবে করা হয় যে, তার সম্মুখভাগ থেকে যে গ্রহণ করবে। সে পাবে মূল বাড়ির এক তৃতীয়াংশ। আর পেছনের দিক থেকে যে গ্রহণ করবে সে পাবে অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ। তাহলে উভয়ের ভাগের মূল্যমান সমান হবে। সুতরাং যদি এভাবে বণ্টন করা হয় এবং বণ্টন সম্পন্ন করার পর যদি বাড়ির সম্মুখ ভাগের অর্ধেক অংশের অন্য কোনো হকদার বেরিয়ে আসে। তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, তাদের ঐ বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে। এবং হকদারের হক পরিশোধ করার পর বাড়ির বাকি অংশটুকু উভয় শরিকের মাঝে পুনরায় নতুন করে বণ্টন করতে হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এই সূরতে পূর্বের বণ্টনকে ইচ্ছা করলে তারা বহাল রাখতেও পারবে। আর ইচ্ছা হলে এই বণ্টন বাতিল করে নতুনভাবে আবার বণ্টন করতে পারবে। আর এক্ষেত্রে সম্মুখভাগ গ্রহণকারীর মতামতই প্রাধান্য পাবে। সুতরাং যদি বণ্টনকে বহাল রাখে তাহলে সে পেছনের অংশ থেকে এক চতুর্থাংশ ফেরত পাবে। কারণ যদি সম্মুখ ভাগের পুরোটারই অন্য কেউ হকদার হয়ে যেত তাহলে সে পেছনের অংশ থেকে অর্ধেক অংশ ফেরত পেত। তাই যেহেতু সম্মুখভাগের অর্ধেকের অংশীদার বেরিয়ে এসেছে তাই সে পেছনের ভাগের অর্ধেকের অর্ধেক ফেরত পাবে। আর অর্ধেকের অর্ধেকই এক চতুর্থাংশ বলে ব্যক্ত করা হয়। আর এ হিসাবটি অতি সহজেই বুঝে আসে আংশিক সম্পত্তিতে হকদার সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টিকে পূর্ণ সম্পত্তিতে হকদার বেরিয়ে আসার সূরতের সাথে কিয়াস করার মাধ্যমে।

আর যদি সম্মুখভাগ গ্রহণকারী শরিক বণ্টনকে বাতিল করতে চায় তাহলে তার এ অধিকারও থাকবে। কারণ যদি বণ্টন বহাল রাখা হয় তাহলে সম্মুখভাগে যে গ্রহণ করেছে তার অংশটুকু দুই খণ্ডতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর একজনের বাড়ির অংশ দুটি খণ্ডতে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা এটা কখনো তার জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে। এছাড়া এটা একটা দোষও বটে। তাই এই ক্ষতিকে যদি সে রোধ করতে চায় তাহলে তার জন্য এর পথ খোলা থাকা উচিত। আর এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) দুটিই অধিকার দিয়েছেন যাতে সে লাভ ও লোকসান উভয় দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সূরতে মাসআলা : ২. قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ نِصْفَ نَصِيبِ صَاحِبِهِ : নাতায়িজুল আফকারের ইবারতে فَيَضْمَنُ نِصْفَ نَصِيبِ صَاحِبِهِ রয়েছে। আর আল ইনায়াহ -এর ইবারতও অনুরূপই। তবে আমাদের সাধারণ নুসখাসমূহের ইবারত হলো فَيَضْمَنُ النِّصْفَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ। এখানে নাতায়িজুল আফকারের নুসখা অনুসারে ইবারতকে বিশুদ্ধ করার জন্য অনেক দূরবর্তী তাবীলের আশ্রয় নিতে হয়। আর আমাদের সাধারণ নুসখা অনুসারে ইবারতের শুদ্ধতা খুবই স্পষ্ট কারণ اَلنِّصْفَ - مَوْصُوْف আর نَصِيبَ صَاحِبِهِ তার صِفَتْ হবে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে– সম্মুখভাগে গ্রহণকারী ঐ অর্ধেক মূল্যের জামিন হবে যা তার সাথির অংশ ছিল। আর যদি বাড়ি বণ্টন করে দেওয়ার পর সম্মুখভাগ গ্রহণকারী শরিক তার নিজের অংশের অর্ধেক বিক্রি করে দেওয়ার পর সম্মুখভাগের বাকি অর্ধেকে কোনো হকদার বের হয়ে আসে। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, সম্মুখভাগ গ্রহণকারীর জন্য শুধু একটি মাত্র পথ থাকবে। আর তা হলো পেছনের ভাগ থেকে এক চতুর্থাংশ ফেরত নিয়ে নেওয়া। কারণ নিজের অধিকাংশকে বিক্রি করে দেওয়ার কারণে তার বণ্টন বাতিল করার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। আর এ সূরতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, এই সূরতেও বণ্টিত সম্পত্তিতে جُزْء شَائِعٌ -এর হকদার সাব্যস্ত হওয়ার কারণে বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে। তাই অপর শরিকের হাতে যে সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে তাকে উভয়ে সমানভাবে ভাগ করে নিবে। আর সম্মুখভাগে গ্রহণকারী তার অংশের যে অর্ধেক বিক্রি করছে তার বাজার মূল্যের অর্ধেক অপর শরিককে ফেরত দিবে। কারণ বণ্টন বাতিল হয়ে যাওয়ার দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, সে যে অংশটুকু নিজের মালিকানা মনে করে বিক্রি করে ছিল তাতে তার মালিকানা সঠিক হয়নি; বরং তা উভয় শরিকের যৌথ মালিকানাভুক্তই ছিল। তাই তার এ বিক্রয় ছিল যথাসিদ্ধ বিক্রয়। আর ফাসিদ বিক্রয় চুক্তিতে মাল কব্জা করে ফেললে ক্রেতার জন্য সে মালের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। বিধায় সে বিক্রয় সংঘটিত হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। আর এরূপ বিক্রয়ে বিক্রয়কারী সাধারণত বিক্রীত পণ্যের বাজার মূল্য মালের মূল মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। সুতরাং তার শরিক যেহেতু জমির মালিক ছিল তাই তার বাজার মূল্য শরিককে ফেরত দিতে হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

---

১. ক্রেতা ও বিক্রেতা কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যকে ثَمَنٌ বলা হয়। আর কোনো বস্তুর মৌলিক উপযুক্ত দাম যেটা হয় তাকে قِيْمَةٌ বা বাজার মূল্য বলা হয়। সুতরাং উপরিউক্ত মাসআলায় সম্মুখভাগ গ্রহণকারীর উপর তার বিক্রীত অংশের বাজারমূল্য ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। বিক্রয়মূল্য ফেরত দেওয়া আবশ্যক নয়।

قَالَ : وَلَوْ وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ ثُمَّ ظَهَرَ فِى التَّرِكَةِ دَيْنٌ مُحِيطٌ رُدَّتِ الْقِسْمَةُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ لِلْوَارِثِ وَكَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُحِيطٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالتَّرِكَةِ إِلَّا إِذَا بَقِىَ مِنَ التَّرِكَةِ مَا بَقِىَ بِالدَّيْنِ وَرَاءَ مَا قُسِمَ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ فِى إِيْفَاءِ حَقِّهِمْ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ أَدَّاهُ الْوَرَثَةُ مِنْ مَالِهِمْ وَالدَّيْنُ مُحِيطٌ أَوْ غَيْرُ مُحِيطٍ جَازَتِ الْقِسْمَةُ لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدْ زَالَ وَلَوِ ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمِيْنَ دَيْنًا فِى التَّرِكَةِ صَحَّ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ لَا تَنَاقُضَ إِذِ الدَّيْنُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنٰى وَالْقِسْمَةُ تُصَادِفُ الصُّوْرَةَ وَلَوِ ادَّعٰى عَيْنًا بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ لَمْ يُسْمَعْ لِلتَّنَاقُضِ إِذِ الْإِقْدَامُ عَلَى الْقِسْمَةِ اِعْتِرَافٌ بِكَوْنِ الْمَقْسُوْمِ مُشْتَرَكًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [মৃতব্যক্তির পরিত্যাজ্য] সম্পত্তি [ওয়ারিশদের মধ্যে] বণ্টন হয়ে যাওয়ার পর পরিত্যাজ্য সম্পত্তির উপর যদি এমন ঋণের কথা প্রকাশ পায় যা পুরা সম্পত্তি গ্রাস করে নেয়, তাহলে পূর্ব বণ্টন রদ তথা বাতিল করে দেওয়া হবে। কেননা এ ঋণ ওয়ারিশদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতিবন্ধক। এমনিভাবে ঋণ যদি তার সমুদয় মালকে গ্রাস করে না নেয় তাহলেও [বণ্টন বাতিল করে দেওয়া হবে]। পাওনাদারদের অধিকার এ সম্পত্তির সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে। তবে যদি বণ্টিত সম্পত্তি ছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে এ পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে যা দ্বারা পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। তাহলে বণ্টন বাতিল করা হবে না। কারণ এ অবস্থায় পাওনাদারের হক আদায় করার জন্য কৃত বণ্টনকে বাতিল করার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি বণ্টনের পর পাওনাদারগণ তাদের পাওনা মাফ করে দেয় অথবা ওয়ারিশগণ যদি তাদের মাল থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেয়, চাই ঋণ পূর্ণ সম্পত্তি গ্রাস করে নিক বা না নিক, এ অবস্থায় বণ্টন জায়েজ [কার্যকর] থাকবে। কেননা বণ্টনের ক্ষেত্রে যা প্রতিবন্ধক ছিল তা দূর হয়ে গেছে। যদি বণ্টন প্রার্থীদের একজন পরিত্যাজ্য সম্পত্তিতে ঋণ আছে বলে দাবি করে, তাহলে তার এ দাবি সহীহ [গ্রহণযোগ্য] হবে। কারণ এতে [প্রথমে সম্পদ বণ্টন করা এবং পরে ঋণের দাবি করতে] কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা ঋণের সম্পর্ক হলো পরিত্যাজ্য সম্পদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে। আর বণ্টনের সম্পর্ক হলো সম্পদের বাহ্যিক অবস্থার সাথে। আর যদি [ওয়ারিশদের কোনো একজন পরিত্যাজ্য সম্পত্তিতে] নির্দিষ্ট কোনো একটি মালের মালিকানা দাবি করে, তা যে কোনো উপায়েই হোক না কেন, তাহলে তার এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এক্ষেত্রে তার [দাবি ও কর্মের] মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। কারণ বণ্টনের পদক্ষেপ গ্রহণের মাঝে মালটি শরিকানা হওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ মারা গেলে তার ওয়ারিশদের উপর সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো তার পরিত্যাজ্য সম্পদ থেকে মৃত ব্যক্তির কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা। তারপর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে যদি তার উপর কোনো ঋণ থেকে থাকে প্রথমে তা পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর যদি সে কোনো অসিয়ত করে গিয়ে থাকে তাহলে অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে সে অসিয়ত পূর্ণ করতে হবে। এরপর অবশিষ্ট সম্পত্তি সকল ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করতে হবে কুরআনে বর্ণিত প্রত্যেক ওয়ারিশদের হক অনুসারে।

কিন্তু যদি কখনো এরূপ ঘটনা ঘটে যে, ব্যক্তির মৃত্যুর পর পরই ওয়ারিশগণ সম্পত্তিকে নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নিল। অতঃপর জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ ছিল, তাহলে এমতাবস্থায় এ ঋণ মৃত ব্যক্তির পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তিকে গ্রাস করুক বা না করুক উভয় সুরতেই বণ্টন বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ ঋণ যদি পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তিকে গ্রাসকারী হয় তাহলে ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের মালিকানাই সাব্যস্ত হবে না। আর যে মালে ব্যক্তির মালিকানাই সাব্যস্ত হয়নি। সে মালকে বণ্টন করা কি করে বৈধ হবে? আর ঋণ যদি সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তিকে গ্রাসকারী না হয়; বরং আংশিক ত্যাজ্য সম্পত্তিকে গ্রাসকারী হয় তাহলে এ সুরতে বণ্টন বাতিল হওয়ার কারণ হলো, ত্যাজ্য সম্পত্তিতে পাওনাদারদের হক সম্পৃক্ত হওয়া। কেননা কোনো মালের মাঝে যদি কয়েকজন মানুষ হকদার হয় তাহলে সকল হকদারদের মধ্য থেকে কারো অনুপস্থিতিতে কিংবা অসম্মতিতে সে মালের বণ্টন বৈধ হয় না।

তবে এ সুরতে যদি বণ্টনকৃত সম্পত্তি ছাড়া ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্য থেকে আরো এমন কোনো সম্পদ বাকি থাকে, যা দ্বারা পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। তাহলে এ সুরতে বণ্টন বাতিল সাব্যস্ত হবে না। কারণ এ সুরতে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করার জন্য বণ্টন বাতিল করার কোনো প্রয়োজন নেই। তদ্রূপ যদি বণ্টন করার পর পাওনাদারগণ মৃত ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় ঋণমুক্ত করে দেয়। কিংবা ওয়ারিশগণ নিজেদের মাল থেকে পাওনাদারদের পাওনাকে পরিশোধ করে দেয় তাহলেও বণ্টন বাতিল সাব্যস্ত হবে না; বরং সে বণ্টন শুদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হবে। কারণ এ দুই সুরতে বণ্টন বিশুদ্ধ হওয়ার যে বিষয়টি বাধা ছিল তা দূর হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَلَوِ ادَّعٰى اَحَدُ الْمُتَقَاسِمِيْنَ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, বণ্টন প্রার্থীদের কেউ যদি মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ঋণের দাবি করে তাহলে এ দাবি সঠিক হবে। কিন্তু যদি ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কোনো বস্তুকে নিজের বলে দাবি করে তাহলে এ দাবি সঠিক হবে না। সুতরাং যদি কোনো বণ্টন প্রার্থী বলে যে, মৃত ব্যক্তির কাছে আমি পাঁচ হাজার টাকা ঋণ বাবদ পাওনা আছি তাহলে তার এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো বণ্টন প্রার্থী এ দাবি করে যে, মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির মাঝে যে একটি ঘোড়া রয়েছে সেটি আমার ঘোড়া। তাহলে তার এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। চাই সে তার এ দাবির স্বপক্ষে যে কোনো কারণই উল্লেখ করুক না কেন। কেননা সকল ওয়ারিশদের ঐকমত্যে মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করার উদ্যোগ নেওয়ার মাঝে সকলের পক্ষ থেকেই এ কথার স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, ত্যাজ্য সম্পত্তির সম্পূর্ণটাই সকল ওয়ারিশদের শরিকানা। তার কোনো অংশের মাঝে কারো কোনো একক অধিকার নেই। সুতরাং সকলের পক্ষ থেকে এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদানের পর কোনো শরিক যদি ত্যাজ্য সম্পত্তির কোনো অংশে তার একক অধিকারের দাবি করে তাহলে তার দাবি বিপরীতমুখী হবে। আর এরূপ দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি বণ্টনের উদ্যোগ নেওয়ার পর ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর দাবি করলে এটা বিপরীতমুখী দাবি হিসেবে অগ্রাহ্য হয়ে থাকে তাহলে ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ঋণের দাবি করাটাও তো বিপরীতমুখী দাবি তাই এ দাবিটিও অগ্রাহ্য হওয়া উচিত ছিল। তাহলে এ দাবিটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, বণ্টনের উদ্যোগ নেওয়ার পর ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ঋণের দাবি করলে এটা বিপরীতমুখী দাবি হয় না। কারণ বণ্টনের সম্পর্ক হলো বাহ্যিক মালের সাথে। তাই বণ্টনের উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে বাহ্যিক সকল মাল বণ্টনযোগ্য এবং শরিকানা হওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি মৃত ব্যক্তির জিম্মায় কোনো ঋণ না থাকাকে আবশ্যক করে না। কেননা ঋণটা হলো একটি আভ্যন্তরীণ বিষয় যার সম্পর্ক হলো মালিয়াতের সাথে। তাই বণ্টনের উদ্যোগ নেওয়ার পর ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোনো ঋণের দাবি করলে এ দাবি বিপরীতমুখী না হওয়ার দরুন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর মালিকানার দাবি করলে তা বিপরীতমুখী দাবি হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা সত্যিকার অর্থেই যদি সে এ বস্তুর মালিক হতো তাহলে বণ্টনের উদ্যোগ নেওয়ার পূর্বেই সে এই মালের দাবি করতো।

مُهَايَاةٌ -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ :
مُهَايَاةٌ শব্দটি هَيْئَةٌ মূলধাতু থেকে উদগত বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার। هَيْئَةٌ বলা হয় اَلْحَالَةُ الظَّاهِرَةُ الْمُتَهَيِّئُ لِلشَّيْءِ প্রস্তুতকৃত কোনো বস্তুর বাহ্যিক রূপকে। একই ধাতু থেকে بَاب تَفَاعُلٌ -এর মাসদার হলো اَلتَّهَايُؤُ যার শাব্দিক অর্থ হলো– যে কোনো দুই পক্ষের সন্তুষ্টিক্রমে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। মৌলিক অর্থে هَيْئَةٌ বলা হয় বস্তুর রূপ বা অবস্থাকে। আর দুই শরিক কোনো বস্তুর একই রূপ বা অবস্থা থেকে উপকৃত হওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াকে تَهَايُؤٌ বলা হয়। ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় هِىَ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ তথা বস্তু থেকে অর্জিত সুবিধাদি বণ্টন করাকে مُهَايَاةٌ বলা হয়। –[নাতায়িজুল আফকার ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৬]

মুসান্নিফ (র.) ইতঃপূর্বে বস্তু জাতীয় জিনিসের বণ্টন সম্পর্কিত আহকাম ও বিধি-বিধানের আলোচনা শেষ করার পর এই অনুচ্ছেদে উপযোগ (اَعْرَاضٌ) জাতীয় জিনিসের বণ্টন সম্পর্কিত আলোচনা করতে চাচ্ছেন। কারণ উপসর্গসমূহ বস্তু জগতেরই فَرْعٌ বা শাখা-প্রশাখা।

তবে মুসান্নিফ (র.) -এর জন্য এখানে উচিত ছিল এই মাসআলাসমূহকে فَصْلٌ তথা অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত না করে ভিন্ন পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা। কারণ পূর্ববর্তী আলোচনা হলো بَابُ دَعْوَى الْغَلَطِ وَالْاِسْتِحْقَاقِ বণ্টনের মাঝে ভুল কিংবা হকদার সাব্যস্ত হওয়ার দাবি সংক্রান্ত, যার সাথে مُهَايَاتٌ বা সুবিধাদি বণ্টনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এ বিষয়টিকে ভিন্ন بَابٌ বা পরিচ্ছেদে আনাটাই ছিল অধিকতর যুক্তিযুক্ত। হ্যাঁ, তবে এরূপ বলা যেতে পারে যে, এটা كِتَابُ الْقِسْمَةِ বণ্টন অধ্যায়ের একটি অনুচ্ছেদ। পূর্ববর্তী بَابٌ পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

اَلْمُهَايَاةُ جَائِزَةٌ اِسْتِحْسَانًا لِلْحَاجَةِ اِلَيْهِ اِذْ يَتَعَذَّرُ الْاِجْتِمَاعُ عَلَى الْاِنْتِفَاعِ فَاَشْبَهَ الْقِسْمَةَ وَلِهٰذَا يَجْرِىْ فِيْهِ جَبْرُ الْقَاضِىْ كَمَا يَجْرِىْ فِى الْقِسْمَةِ اِلَّا اَنَّ الْقِسْمَةَ اَقْوٰى مِنْهُ فِى اسْتِكْمَالِ الْمَنْفَعَةِ لِاَنَّهُ جَمْعُ الْمَنَافِعِ فِىْ زَمَانٍ وَاحِدٍ وَالتَّهَايُؤُ جَمْعٌ عَلَى التَّعَاقُبِ وَلِهٰذَا لَوْ طَلَبَ اَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ الْقِسْمَةَ وَالْاٰخَرُ الْمُهَايَاةَ يَقْسِمُ الْقَاضِىْ لِاَنَّهُ اَبْلَغُ فِى التَّكْمِيْلِ وَلَوْ وَقَعَتْ فِيْمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ثُمَّ طَلَبَ اَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ يَقْسِمُ وَتَبْطُلُ الْمُهَايَاةُ لِاَنَّهُ اَبْلَغُ وَلَا يَبْطُلُ التَّهَايُؤُ بِمَوْتِ اَحَدِهِمَا وَلَا بِمَوْتِهِمَا لِاَنَّهُ لَوْ اِنْتَقَضَ لَاسْتَانَفَهُ الْحَاكِمُ وَلَا فَائِدَةَ فِى النَّقْضِ ثُمَّ الْاِسْتِيْنَافِ .

অনুবাদ : ইসতিহসানের ভিত্তিতে সুবিধাদি বণ্টন করা জায়েজ। এর প্রয়োজন বিদ্যমান থাকার কারণে। কেননা একই সাথে সকলে সুবিধা ভোগ করাটা কখনো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, ফলে তা [মূল বস্তু] বণ্টনের নামান্তর। আর এ কারণেই এক্ষেত্রে কাজির বাধ্য বাধকতাও প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমনটি প্রয়োগ হয় [মূল বস্তু] বণ্টনের ক্ষেত্রে। তবে সুবিধা বণ্টনের তুলনায় মূল বস্তুর বন্টন পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হওয়ার দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী। কেননা قِسْمَةٌ মূল বস্তুর বণ্টন হলো এ সকল সুবিধাকে একত্রিত করা। আর تَهَايُؤٌ সুবিধা বণ্টন হলো যথাক্রমে সুবিধাসমূহকে একত্রিত করা। আর এ কারণেই যদি দুই শরিকের একজন মূলবস্তু বণ্টনের দাবি করে আর অপরজন সুবিধা বণ্টনের দাবি করে তাহলে কাজি মূল বস্তুকে বণ্টন করে দিবে। কেননা পূর্ণতার ক্ষেত্রে মূল বস্তুর বণ্টনই অধিক শ্রেয়। আর যদি এমন কোনো বস্তুর সুবিধা বণ্টন করা হয় যার মূলবস্তু বণ্টন করা সম্ভব। এরপর দুই শরিকের কেউ তাকে [মূল বস্তুকে] বণ্টন করার দাবি তোলে তাহলে কাজি মূল বস্তুকে বণ্টন করে দিবে। আর [পূর্ব প্রকাশিত] সুবিধা বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে। কারণ মূল বস্তুর বণ্টন অধিক উপযোগী। আর দুই শরিকের কোনো একজন মারা গেলে مُهَايَاةٌ সুবিধা বণ্টন বাতিল হবে না। উভয় শরিক মারা গেলেও নয়। কারণ যদি সুবিধা বণ্টন বাতিল হয়ে যায় তাহলে কাজিকে নতুন করে পুনরায় বণ্টন করে দিতে হবে। আর কোনো জিনিসকে বাতিল করার পর পুনরায় সম্পাদন করার মাঝে কোনো ফায়দা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রথমেই এ বিষয়টি জেনে রাখা উচিত যে, এই অনুচ্ছেদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মাসআলা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর রচিত মাবসূত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর জামেউস সাগীর নামক কিতাবে এগুলো উল্লেখ করেন নি। ইমাম কুদূরী (র.) ও তাঁর মুখতাসার গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেননি। আর হিদায়া কিতাবের মূল [মতন] বিদায়াতুল মুবতাদী কিতাবটির মাসআলাসমূহ যেহেতু ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত জামেউস সাগীর ও কুদূরী রচিত মুখতাসার গ্রন্থ থেকে গৃহীত

তাই বিদায়াতুল মুবতাদীতেও মুসান্নিফ (র.) এ মাসআলাগুলো উল্লেখ করেননি। আর হিদায়া যেহেতু বিদায়াতুল মুবতাদীর [শরাহ] ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাই মূল গ্রন্থে এ মাসআলাসমূহ উল্লেখ না থাকার দরুন হিদায়াতেও এ মাসআলাসমূহ উল্লেখ না থাকা দরকার ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত ফায়দার জন্য মুসান্নিফ (র.) মাবসূত থেকে এখানে এই মাসআলাসমূহ উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ : اَلْمُهَايَاةُ جَائِزَةٌ اِسْتِحْسَانًا : কিয়াসের দাবি অনুসারে مُهَايَاةٌ বা সুবিধা বণ্টন জায়েজ না হওয়ার কথা। কারণ স্থান বা কালের ভিত্তিতে বস্তুর পরিবর্তে বস্তু থেকে অর্জিত مَنَافِعُ সুবিধাকে বণ্টন করার নাম হলো مُهَايَاةٌ যাতে একই জিন্সের দুটি বস্তুর একটিকে অপরটির বিনিময়ের পরিবর্তন করার কারণে সুদের সম্ভাবনা রয়েছে। আর যে জিনিসের মাঝে সুদের সম্ভাবনা থাকে তা সাধারণত না জায়েজ হয়। তাই مُهَايَاةٌ ও না জায়েজ হওয়া দরকার। কিন্তু ইসতিহসানের ভিত্তিতে ওলামায়ে কেরাম তাকে জায়েজ বলেছেন। কারণ কুরআন ও হাদীসে مُهَايَاةٌ জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে অনেক প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। যথা–

১. সূরা শুআরা -এর ১৫৫ নং আয়াতে রয়েছে– قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ উল্লিখিত আয়াতে সামূদ সম্প্রদায়ে অবস্থিত একটি কূপের বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। যে কূপটির পানি দিয়ে গোত্রের সকলেই উপকৃত হতো। তাদের পশুদেরকে সেখান থেকে পানি পান করাতো। হযরত সালেহ (আ.) কে মু'জিজাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা যে উটটি প্রদান করেছিলেন তা যেদিন ঐ কূপ থেকে পানি পান করতো সেদিন অন্যান্য লোকেরা ঐ কূপে তাদের পশুদের পান করানোর জন্য পানি পেত না। তাই তিনি তাদের মাঝে ঐ কূপের সুবিধা অর্থাৎ পানি পান করানোর দিন বণ্টন করে দেন। ফুকাহাগণের পরিভাষায় এরূপ বণ্টনকেই مُهَايَاةٌ বলা হয়। সুতরাং কুরআনে যেহেতু এ বিষয়টি বর্ণনা করার পর তা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলা হয়নি। তাই উসূলে ফিকহের নীতি অনুসারে আমাদের শরিয়তেও এ বিষয়টি বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

২. এছাড়া বদরের যুদ্ধে হুজুর ﷺ যখন সাহাবীদের নিয়ে বের হয়েছিলেন তখন তাদের সাথে অল্প কঁয়েকটি উট ছাড়া অন্য কোনো বাহন ছিল না। শুধু হযরত মুসআব বিন উমাইর ও মিকদাদ ইবনুল আসআদ (রা.) এই দুই সাহাবীর কাছে দুটি ঘোড়া ছিল। এছাড়া যে পরিমাণ উট বা উটনী ছিল তা সকলের জন্য বাহন হিসেবে যথেষ্ট ছিল না বিধায় তিনজন করে পালাক্রমে এক একটি উটের উপর আরোহণ করেছিলেন। এ হাদীস থেকেও مُهَايَاةٌ বা مَنَافِعُ বণ্টন জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩. এছাড়া হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন– كُنَّا نَتَنَاوَبُ فِىْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ অর্থাৎ, আমরা রাসূল ﷺ -এর যুগে সাদকার উটের উপর পালাক্রমে বণ্টন করে নিয়ে ব্যবহার করতাম। এই হাদীসটিও مُهَايَاةٌ জায়েজ হওয়ার পক্ষে একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

৪. এছাড়া যুক্তির আলোকেও তা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারটি অনুমান করা যায়। কারণ সকল বস্তুকেই সৃষ্টি করা হয়েছে যেন মানুষ তার থেকে উপকৃত হতে পারে। সুতরাং যদি কোনো বস্তু শরিকানাধীন হয়ে থাকে তাহলে তার থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকারটি উভয়ের শরিকানাধীন হবে। আর একই বস্তু থেকে একই সময়ে দুই শরিক একসাথে উপকৃত হওয়াটা অসম্ভব। তাই উভয়ের সাথে ভোগাধিকারকে সময় ভিত্তিক বা স্থান ভিত্তিক ভাগ করাটা অযৌক্তিক নয়। কারণ এভাবে ভাগ করা না জায়েজ হলে ঐ বস্তু থেকে উপকৃত হওয়াই অসম্ভব হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা বস্তুকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যের মাঝে ব্যাঘাত ঘটবে। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত দলিলসমূহের পাশাপাশি উপরিউক্ত যৌক্তিক কারণে কিয়াসসম্মত না হওয়া সত্ত্বেও ওলামায়ে কেরাম مُهَايَاةٌ জায়েজ হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দেন। –[আল বিনায়াহ- ৫৫৫]

قَوْلُهُ اِنْ يَتَعَذَّرَ الْاِجْتِمَاعُ عَلَى الْاِنْتِفَاعِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, مُهَايَاةٌ -এর বিষয়টি قِسْمَةٌ -এর সদৃশ। তাই قِسْمَةٌ -এর মতো مُهَايَاةٌ কেও জায়েজ বলা উচিত। কারণ কোনো عَيْن মূলবস্তু শরিকানাধীন হলে যেমনিভাবে এক্ষেত্রে বস্তুটিকে উভয়ে একই সাথে ব্যবহার করা অসম্ভব হওয়ার কারণে তাকে বণ্টন করে দেওয়া বৈধ। ঠিক তেমনিভাবে কোনো শরিকানাধীন مُشْتَرَى বস্তুর সুবিধা مَنَافِعُ কে একই সাথে পরিপূর্ণভাবে উভয়ে ভোগ করা অসম্ভব হওয়ার কারণে ভোগাধিকার বণ্টন করে নেওয়াও বৈধ হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে قِسْمَةٌ -এর ক্ষেত্রে যদি দুই শরিকের কোনো একজন বণ্টন অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে কাজির জন্য যেমনিভাবে জোরপূর্বক ঐ বস্তুকে বণ্টন করে দেওয়া বৈধ হয় তেমনিভাবে যদি কোনো এক শরিক কাজির নিকট مُهَايَاةٌ -এর আবেদন করে আর অপর শরিক তাতে অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে কাজির জন্য জোরপূর্বক উক্ত বস্তুর مَنَافِعُ কে বণ্টন করে দেওয়া বৈধ হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ يَجْرِىْ فِيْهِ الخ : এখানে , যমীরের مَرْجِعْ হলো مُهَايَاةٌ - تَهَايُؤْ মাসদার দ্বারা তা'বীল করে مُذَكَّرْ -এর ضَمِيْر ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّ الْقِسْمَةَ اَقْوٰى مِنْهُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, مُهَايَاةٌ যদিও قِسْمَةٌ -এর সদৃশ কিন্তু قِسْمَةٌ -এর দাবিটা مُهَايَاةٌ -এর দাবির তুলনায় অধিক শক্তিশালী। কেননা مُهَايَاةٌ -এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার মালিকানা থেকে যথাক্রমে অল্প অল্প করে উপকৃত হতে পারে। পক্ষান্তরে قِسْمَةٌ বা বণ্টনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মালিকানার উপকার বা সুবিধাটা যে রূপ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় مُهَايَاةٌ -এর মাধ্যমে সেরূপ পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা সম্ভব হয় না। আর এ কারণেই যদি দুই শরিকের মধ্য থেকে একজন কাজির নিকট قِسْمَةٌ বণ্টনের দাবি করে আর অপরজন مُهَايَاةٌ -এর দাবি করে তাহলে কাজি قِسْمَةٌ বণ্টনের দাবিকে গ্রহণ করবে। তদ্রূপ যে জিনিসকে বণ্টন করা সম্ভব এরূপ কোনো জিনিসের মধ্যে যদি প্রথমে مُهَايَاةٌ [সুবিধা বণ্টন] করে দেওয়া হয় তারপর দুই শরিকের কেউ قِسْمَةٌ [বণ্টন] -এর দাবি করে আর অপর শরিক এতে অসম্মত থাকে তাহলে কাজি তাদের মাঝে তা تَقْسِيْم [বণ্টন] করে দিবে এবং পূর্ব সম্পাদিত مُهَايَاةٌ [সুবিধা বণ্টন] বাতিল হয়ে যাবে। কারণ قِسْمَةٌ বা বণ্টনের দাবি مُهَايَاةٌ বা সুবিধা বণ্টনের দাবির তুলনায় অধিক জোড়ালো ও শক্তিশালী হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ التَّهَايُؤُ بِمَوْتِ الخ : দুই শরিকের কোনো একজন কিংবা উভয় শরিক যদি মারা যায় তাহলে مُهَايَاةٌ চুক্তি বাতিল হবে না। কারণ এমনও হতে পারে যে, যদি কাজি বাতিল করে দেয় তাহলে যে কোনো এক শরিকের কিংবা মৃত শরিকের ওয়ারিশগণ পুনরায় এসে مهاياة -এর আবেদন জানাবে। তাহলে পুনরায় তাদের মাঝে مُهَايَاةٌ চুক্তিকে নবায়ন করতে হবে। আর কোনো চুক্তিকে এমনিতে ভেঙ্গে দিয়ে আবার তা নবায়ন করার মাঝে কোনো ফায়দা নেই। তাই পূর্বচুক্তি বহাল রাখাই উত্তম। হ্যাঁ যদি ওয়ারিশগণ চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার আবেদন করে তাহলে ভাঙ্গা যেতে পারে।

وَلَوْ تَهَايَئَا فِى دَارٍ وَاحِدَةٍ عَلٰى اَنْ يَسْكُنَ هٰذَا طَائِفَةً وَهٰذَا طَائِفَةً اَوْ هٰذَا عُلُوَّهَا وَهٰذَا اَسْفَلَهَا جَازَ لِاَنَّ الْقِسْمَةَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ جَائِزَةٌ فَكَذَا الْمُهَايَاةُ وَالتَّهَايُؤُ فِى هٰذَا الْوَجْهِ اِفْرَازٌ لِجَمِيْعِ الْاَنْصِبَاءِ لَا مُبَادَلَةٌ وَلِهٰذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّاقِيْتُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ اَنْ يَشْتَغِلَ مَا اَصَابَهُ بِالْمُهَايَاةِ شُرِطَ ذٰلِكَ فِى الْعَقْدِ اَوْلَمْ يُشْتَرَطْ لِحُدُوْثِ الْمَنَافِعِ عَلٰى مِلْكِهِ ـ

অনুবাদ : যদি দুই শরিক একটি সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করে যে, একজন ঘরের এক পার্শ্বে বসবাস করবে আর অপরজন ঘরের অপর পার্শ্বে বসবাস করবে। অথবা এভাবে বণ্টন করল যে, একজন ঘরের উপর তলায় বাস করবে আর অপরজন ঘরের নীচ তলায় বাস করবে তাহলে এরূপ বণ্টন বৈধ হবে। কারণ এভাবে মূলবস্তু বণ্টন করা বৈধ। তাই সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই ধরনের বণ্টন বৈধ হবে। আর এভাবে সুবিধা বণ্টন করা হলে তা [উভয় শরিকের মালিকানায়] প্রত্যেক অংশকে পৃথককরণ ধরা হবে তা [একজনের অংশকে অপরের অংশের বিনিময়ে] পরিবর্তন ধরা হবে না। আর এ কারণেই তাতে সময় নির্ধারণ করার শর্ত করা হয় না। আর প্রত্যেক শরিকের জন্যই সুবিধা বণ্টন চুক্তির মাধ্যমে তার প্রাপ্ত অংশকে ভাড়া দেওয়ার অধিকার থাকবে, চুক্তির মাঝে এরূপ শর্ত থাকুক কিংবা নাই থাকুক। সুবিধাদি তার মালিকানায় হওয়ার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مُهَايَاةٌ [বা সুবিধা বণ্টন] দুইভাবে হতে পারে। যথা–

১. مُهَايَاةٌ بِالْمَكَانِ বা স্থানভিত্তিক সুবিধা বণ্টন। যেমন দুই ব্যক্তির শরিকানাভুক্ত একটি বাড়ি বা ঘরের সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করা হলো যে, একজন ঘরের এক পার্শ্বে বসবাস করবে। আর অপরজন অপর পার্শ্বে বসবাস করবে।
২. مُهَايَاةٌ بِالزَّمَانِ বা কালভিত্তিক সুবিধা বণ্টন যেমন– দুই ব্যক্তির শরিকানা একটি ঘরের সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করা হলো যে একজন একমাস তাতে বাস করবে, আর অপরজন তাতে পরের মাস বাস করবে।

প্রকাশ থাকে যে, যে সকল ক্ষেত্রে قِسْمَةٌ বা মূল বস্তুকে বণ্টন করা সম্ভব সে সকল ক্ষেত্রে مُهَايَاةٌ بِالْمَكَانِ স্থানভিত্তিক সুবিধা বণ্টন ও مُهَايَاةٌ بِالزَّمَانِ কালভিত্তিক সুবিধা বণ্টন উভয়টি জায়েজ। পক্ষান্তরে যে সকল ক্ষেত্রে قِسْمَةٌ মূলবস্তু বণ্টন করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে শুধু কেবল কালভিত্তিক সুবিধা বণ্টন তথা مُهَايَاةٌ بِالزَّمَانِ জায়েজ। –[আল বিনায়াহ : ৫৫৫]

قَوْلُهُ : وَلَوْ تَهَايَأَ فِىْ دَارٍ وَاحِدٍ الخ : এই ইবারতে مُهَايَاةٌ بِالْمَكَانِ তথা স্থানভিত্তিক সুবিধা বণ্টনের একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এর সূরতে মাসআলা হলো– যদি দুই শরিক কোনো একটি ঘরের সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করে যে একজন ঘরের এক পার্শ্বে থাকবে আর অপরজন অপর পার্শ্বে থাকবে। কিংবা একজন ঘরের উপরের তলায় থাকবে আর অপরজন নিচতলায় থাকবে। তাহলে এরূপ সুবিধা বণ্টন বৈধ হবে। কারণ এই পন্থায় মূল ঘরকে যদি বণ্টন করা হতো তাহলে বণ্টন বৈধ হতো তাই সুবিধা বণ্টনও বৈধ হবে। সুতরাং যদি দুই শরিকের কোনো একজন কাজির নিকট গিয়ে এরূপ সুবিধা বণ্টন করে তাহলে অপর শরিক অসম্মত হলেও কাজির জন্য জোরপূর্বক এরূপ সুবিধা বণ্টন করে দেওয়া জায়েজ হবে। চাই এরূপ বণ্টনে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হোক বা না হোক। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.) -এর অভিমতও এটাই। মাবসূত গ্রন্থে মাসআলাটিকে আরেকটু স্পষ্ট করে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি এরূপ বণ্টনের পর কোনো কারণে ঘরের উপর তলা ভেঙ্গে পরে তাহলে বণ্টনের মাধ্যমে যে উপরের তলা নিয়েছিল সে নিচতলার শরিকের সাথে নিচতলাতে বাস করার অধিকারী হবে। কারণ সে উপরতলা বসবাসের উপযোগী থাকার শর্তে নিচতলা থেকে নিজের অধিকারকে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিল। তাই এখন উপরতলা বসবাসের উপযোগী না থাকায় নিচতলাতে সে তার পূর্ব অধিকারকে ফেরত পাবে। এবং তার ওয়ারিশরগণও এক্ষেত্রে তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَالتَّهَايُؤُ فِي هٰذَا الْوَجْهِ اِفْرَازٌ : পূর্বে একথা আলোচিত হয়েছিল যে, বণ্টনের মাঝে اِفْرَازٌ তথা দুই শরিকের একজনের অংশকে অপরজনের অংশ থেকে পৃথককরণ ও مُبَادَلَة তথা দুই শরিকের একজনের অংশকে অপরজনের অংশের বিনিময়ে পরিবর্তন করণ উভয়টিই বিদ্যমান থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে اِفْرَازٌ পৃথককরণের অর্থটি বেশি পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে مُبَادَلَة একজনের অংশের বিনিময়ে অপরজনের অংশের পরিবর্তনের অর্থটি বেশি পাওয়া যায়। তবে مُهَايَاةٌ সুবিধা বণ্টনের উল্লিখিত সুরতে مُبَادَلَة [একের অংশকে অপরের অংশের বিনিময়ে পরিবর্তন] এর অর্থ মোটেই পাওয়া যায় না; বরং এখানে পুরোটাই اِفْرَازٌ বা [একের অংশকে অপরের অংশ থেকে] পৃথক করণ। তবে হ্যাঁ যদি একটি ঘরের مُهَايَاةٌ بِالزَّمَانِ সময়ভিত্তিক সুবিধা বণ্টন করা হতো তাহলে তাতে সম্পূর্ণভাবে مُبَادَلَة একজনের অংশকে অপরের অংশের বিনিময়ে পরিবর্তনের অর্থ পাওয়া যেতো। এক্ষেত্রে اِفْرَازٌ পৃথককরণের অর্থ মোটেই নেই। যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে তার অপর শরিকের অংশটিকে ঋণ হিসেবে উপভোগ করছে এবং পরবর্তী মাসে অপর শরিকের বাড়িতে তা পরিশোধ করছে।

মোটকথা উপরিউক্ত সূরতে মাসআলায় সুবিধাবণ্টনে مُبَادَلَة [একজনের অংশের বিনিময়ে অপরজনের অংশকে পরিবর্তন করা হয়েছে একথা] বলা যাবে না। কারণ যদি مُبَادَلَة বলা হয় তাহলে একই জিনিসের দুটি বিষয়ের একটিকে অপরটির বিনিময়ে مُبَادَلَة [পরিবর্তন] করতে গেলে তাতে সুদের সম্ভাবনা থাকে। বিধায় এরূপ [পরিবর্তন] مُبَادَلَة জায়েজ হতো না। এছাড়াও যদি এটা مُبَادَلَة হতো তাহলে তাতে সময় নির্ধারণ করা আবশ্যক হতো। কেননা مُبَادَلَة -এর সুরতে প্রত্যেক শরিক অপর শরিকের ভাগের যে সুবিধাটি ভোগ করবে, বিনিময়ের ভিত্তিতে সে তার মালিকানা লাভ করতে হবে। যেন সে তার ভাগে শরিকের যে অংশটি রয়েছে তাকে শরিকের ভাগে অবস্থিত নিজের অংশটির বিনিময়ে ভাড়া নিয়েছে এবং এরূপ ইজারা [ভাড়া] -এর ভিত্তিতে সে নিজের অবস্থিত শরিকের অংশটির সুবিধা ভোগ করার মালিক হয়েছে। আর এরূপ ইজারা বা ভাড়ার ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করা আবশ্যক হয়ে থাকে। অথচ আলোচ্য মাসআলায় مُهَايَاةٌ সহীহ হওয়ার জন্য সময় নির্ধারণের কোনো শর্ত করা হয়নি। আর এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এরূপ مُهَايَاةٌ -এর মাঝে مُبَادَلَة -এর অর্থ নেই; বরং পুরোটাই এখানে اِفْرَازٌ বা পৃথককরণ। তাই এখানে একই জিনসের দুটি বিষয়ের একটিকে অপরটির দ্বারা পরিবর্তন করার মাঝে সুদের সম্ভাবনা রয়েছে বলে مُهَايَاةٌ জায়েজ না হওয়ার কথা। এরূপ প্রশ্ন করা অবান্তরই বটে।

قَوْلُهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ اَنْ يَسْتَغِلَّ مَا اَصَابَهُ الخ : সুবিধা বণ্টনকারী শরিকদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্যই বণ্টনের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিজ নিজ অংশকে ভাড়া দেওয়ার অধিকার থাকবে। চুক্তির মাঝে এরূপ কোনো শর্ত থাকুক বা না থাকুক। কেননা বণ্টনের কারণে প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের সুবিধাদির মালিক হয়ে গেছে এবং তার অংশ থেকে যে সকল সুবিধাদি উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলো প্রত্যেকের নিজ নিজ মালিকানায় উৎপন্ন হচ্ছে। আর নিজ মালিকানায় উৎপন্ন সুবিধাকে ব্যক্তি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই ব্যবহার করতে পারে। চাই সে নিজেই তা উপভোগ করুক অথবা অন্যের কাছে ভাড়া দিয়ে উপভোগ করুক। তবে ইমাম আবূ আলী শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কোনো ঘরের সুবিধা বণ্টন করা হলে যদি বণ্টন চুক্তির সময় ভাড়া দেওয়ার শর্ত না করে থাকে তাহলে উভয় শরিকের কারো জন্যই নিজ অংশকে ভাড়া দেওয়ার অধিকার থাকবে না। পক্ষান্তরে শামসুল আয়িম্মা সারাখসী (র.) বলেন, আহনাফের জাহেরী অভিমত হলো, উভয় শরিক ভাড়া দেওয়ার অধিকারী হবে। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে وَلِكُلِّ وَاحِدٍ اَنْ يَسْتَغِلَّ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) আবূ আলী শাফেয়ী (র.)-এর ঐ অভিমতটিকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন।

-[আল বিনায়াহ- ৫৫৮, আল ঈনায়াহ- ৪৬৭,৪৬৮]

وَلَوْ تَهَايَأَ فِيْ عَبْدٍ وَاحِدٍ عَلٰى اَنْ يَخْدِمَ هٰذَا يَوْمًا وَهٰذَا يَوْمًا جَازَ وَكَذَا هٰذَا فِي الْبَيْتِ الصَّغِيْرِ لِاَنَّ الْمُهَايَاةَ قَدْ تَكُوْنُ فِي الزَّمَانِ وَقَدْ تَكُوْنُ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانِ وَالْاَوَّلُ مُتَعَيَّنٌ هٰهُنَا ـ

অনুবাদ : যদি দুই শরিক কোনো একজন গোলামের সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করে যে, সে একদিন একজনের সেবা করবে এবং আরেকদিন অপরজনের সেবা করবে, তাহলে এরূপ সুবিধা বণ্টন জায়েজ হবে। তদ্রূপ যদি কোনো ছোট ঘরের সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করে তাহলে তাও জায়েজ হবে। কারণ সুবিধা বণ্টন কখনো কালের ভিত্তিতে হয়ে থাকে আবার কখনো স্থানের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর এখানে প্রথম প্রকারটি নির্ধারিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের ইবারতে مُهَايَاةٌ بِالْمَكَانِ তথা স্থানভিত্তিক সুবিধা বণ্টনের উদাহরণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছিল। আর এখানে مُهَايَاةٌ بِالزَّمَانِ তথা কালভিত্তিক সুবিধা বণ্টনের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। উক্ত বিধানের সূরতে মাসআলা হলো– দুই ব্যক্তির শরিকানায় একটি গোলাম রয়েছে, এখন যদি শরিকদ্বয় গোলামটির সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করে যে, সে একদিন তাদের যে কোনো একজনের সেবা করলে পরের দিন অপরজনের সেবা করবে। অনুরূপ যদি দুইজনের শরিকানায় একটি ছোট্ট ঘর থাকে যাতে একই সাথে দুইজন শরিকের বসবাস করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় যদি তারা এ ঘরটির সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করে যে একবছর এ ঘরটিতে একজন বাস করবে আর পরের বছর তাতে অপরজন বাস করবে। তাহলে এরূপ বণ্টন জায়েজ হবে। কেননা এরূপ সুবিধা বণ্টনকেই مُهَايَاةٌ بِالزَّمَانِ বা কালভিত্তিক সুবিধা বণ্টন বলা হবে।

উল্লেখ্য যে, مُهَايَاةٌ بِالزَّمَانِ বা কালভিত্তিক সুবিধা বণ্টনে সুবিধাটা একজনের পর অপরজনের জন্য পালাক্রমে আসে। এবং যেই তা ভোগ করে সে সম্পূর্ণ সম্পত্তির সুবিধাকে একাই ভোগ করতে পারে। পক্ষান্তরে مُهَايَاةٌ بِالْمَكَانِ তথা স্থানভিত্তিক সুবিধা বণ্টনে একই সাথে উভয়ে তাদের শরিকানা সম্পত্তির সুবিধাকে উপভোগ করতে পারে। কিন্তু এ সুরতে সম্পূর্ণ সম্পত্তির সুবিধা একজনে এক সাথে ভোগ করতে পারে না; বরং প্রত্যেকেই আংশিক ভোগ করে থাকে।

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِى التَّهَايُؤِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِىْ مَحَلٍّ مُحْتَمِلُهُمَا يَأْمُرُهُمَا الْقَاضِىْ بِاَنْ يَتَّفِقَا لِاَنَّ التَّهَايُؤَ فِى الْمَكَانِ اَعْدَلُ وَفِى الزَّمَانِ اَكْمَلُ فَلَمَّا اخْتَلَفَتِ الْجِهَةُ لَابُدَّ مِنَ الْاِتِّفَاقِ فَاِنِ اخْتَارَاهُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ يَقْرَعُ فِى الْبِدَايَةِ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ.

অনুবাদ : স্থানভিত্তিক ও কালভিত্তিক সুবিধা বণ্টন নিয়ে যদি দুই শরিকের মতবিরোধ হয়। এমন কোনো ক্ষেত্রে যেখানে উভয়টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে কাজি তাদেরকে একমত হতে বলবেন। কারণ স্থান ভিত্তিক সুবিধা বণ্টন অধিক নিরপেক্ষ আর কালভিত্তিক সুবিধাবণ্টন অধিক পরিপূর্ণ। সুতরাং যেহেতু পন্থার ভিন্নতা দেখা দিল তাই [উভয়ের] একমত হওয়া অত্যাবশ্যক। অতএব যদি তারা কালভিত্তিক সুবিধা বণ্টনকে গ্রহণ করে তাহলে শুরুতে অপবাদ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্য লটারী দিয়ে নিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত বিধানের সূরতে মাসআলা হলো, যথা যায়েদ ও আমরের শরিকানাধীন একটি ঘর রয়েছে যার সুবিধাকে তারা উভয়ের মাঝে বণ্টন করতে চায়। তবে কোন প্রকারের সুবিধা বণ্টন করবে এ নিয়ে উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিল। সুতরাং যায়েদ বলল, যে আমি এখানে مُهَايَاةٌ بِالْمَكَانِ বা স্থানভিত্তিক সুবিধা বণ্টন করতে চাই। আর আমর বলল যে, আমি এখানে مُهَايَاةٌ بِالزَّمَانِ বা কালভিত্তিক সুবিধা বণ্টন করতে চাই। সুতরাং এরূপ মতবিরোধ নিয়ে যদি উভয় শরিকই কাজির শরণাপন্ন হয় তাহলে কাজি কার পক্ষে ফয়সালা দেবেন? এক্ষেত্রে মুসান্নিফ (র.) বলেন, কাজির উচিত হলো– এ সকল ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা না করে উভয় শরিককে যে কোনো একটি ব্যাপারে একমত হতে বলা। কারণ উভয় প্রকার مُهَايَاةٌ-ই ভিন্ন ভিন্ন বিবেচনায় একটি অপরটির তুলনায় প্রণিধানযোগ্য। তাই কাজির পক্ষ থেকে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া খুবই কঠিন। কারণ ইনসাফ ভিত্তিক নিরপেক্ষ ও সমবণ্টন করতে গেলে দেখা যায় স্থানভিত্তিক বণ্টনই এর জন্য অধিক উপযোগী। কিন্তু স্থানভিত্তিক বণ্টন করলে কোনো শরিকই সম্পূর্ণ বস্তুটি থেকে উপকৃত হতে পারবে না; বরং উভয়কেই আংশিকভাবে ভাগ করে নিতে হবে। পক্ষান্তরে কালভিত্তিক বণ্টন করা হলে পরিপূর্ণ সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শীতকালে ঘরের প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকে আর গরমকালে কম, তাই কালভিত্তিক বণ্টনের মাধ্যমে যে শীতকালে ঘরটিকে ব্যবহার করবে সে বেশি সুবিধাভোগ করবে আর গরমকালে যে ব্যবহার করবে সে কম সুবিধাভোগ করবে। কিন্তু এ প্রকার বণ্টনের মাধ্যমে প্রত্যেক শরিকই নিজ নিজ পালাতে ভোগ দখলের সময়ে ঘর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হতে পারে। বিধায় এদিক বিবেচনায় কালভিত্তিক বণ্টন প্রণিধানযোগ্য। সুতরাং যেহেতু উভয় প্রকার বণ্টনই ভিন্ন ভিন্ন দিক বিবেচনায় স্ব স্ব স্থান উপযোগী তাই কাজির পক্ষ থেকে যে কোনো এক প্রকারের বণ্টনকে প্রাধান্য না দিয়ে শরিকদ্বয়ের হাতে এটা ছেড়ে দেওয়াই অধিকতর শ্রেয়। সুতরাং যদি তারা উভয়ে যে কোনো এক প্রকারের বণ্টনের ব্যাপারে একমত হয় তাহলে কাজি সে অনুপাতেই তাদের মাঝে সুবিধা বণ্টন করবে। আর স্থানভিত্তিক বণ্টনের ব্যাপারে একমত হলে স্থানভিত্তিক বণ্টন করবে। আর কালভিত্তিক বণ্টনের ব্যাপারে একমত হলে কালভিত্তিক বণ্টন করবে। কিন্তু কথা হলো, যদি কালভিত্তিক বণ্টন করতে হয় তাহলে একজন আগে ভোগ করতে হবে এবং অপরজন তার পরে। সুতরাং প্রশ্ন থাকে যে, কাজি কাকে আগে ভোগ করতে দিবে আর কাকে পরে? এই প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ ব্যাপারে কাজি লটারীর মাধ্যমে এটা নির্বাচন করবে যে, কে আগে ভোগ করবে আর কে পরে ভোগ করবে। কারণ যদি লটারী ছাড়া কাজি নিজের পক্ষ থেকে যে কোনো একজনের ব্যাপারে আগে ভোগ করার ফয়সালা দিয়ে দেয়। তাহলে কাজি এক্ষেত্রে অপর পক্ষ থেকে [সম্ভাবনা রয়েছে যে,] অপবাদের শিকার হতে পারে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَلَوْ تَهَايَئَا فِي الْعَبْدَيْنِ عَلٰى اَنْ يَخْدِمَ هٰذَا هٰذَا الْعَبْدُ وَالْاٰخَرُ الْاٰخَرَ جَازَ عِنْدَهُمَا لِاَنَّ الْقِسْمَةَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ جَائِزَةٌ عِنْدَهُمَا جَبْرًا مِنَ الْقَاضِيْ بِالتَّرَاضِيْ فَكَذَا الْمُهَايَاةُ وَقِيْلَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) لَا يَقْسِمُ الْقَاضِيْ وَهٰكَذَا رُوِيَ عَنْهُ لِاَنَّهُ لَا يَجْرِيْ فِيْهِ الْجَبْرُ عِنْدَهُ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ يَقْسِمُ الْقَاضِيْ عِنْدَهُ اَيْضًا لِاَنَّ الْمَنَافِعَ مِنْ حَيْثُ الْخِدْمَةِ قَلَّمَا تَتَفَاوَتُ بِخِلَافِ اَعْيَانِ الرَّقِيْقِ لِاَنَّهَا تَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا عَلٰى مَا تَقَدَّمَ ـ

وَلَوْ تَهَايَئَا فِيْهِمَا عَلٰى اَنَّ نَفَقَةَ كُلِّ عَبْدٍ عَلٰى مَنْ يَأْخُذُهُ جَازَ اِسْتِحْسَانًا لِلْمُسَامَحَةِ فِيْ اِطْعَامِ الْمَمَالِيْكِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْكِسْوَةِ لِاَنَّهُ لَا يُسَامَحُ فِيْهَا ـ

অনুবাদ : যদি শরিকদ্বয় দুটি গোলামের সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করে যে, এই গোলামটি এই শরিকের খেদমত করবে আর অন্য গোলামটি অপর শরিকের খেদমত করবে। তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে, এরূপ বণ্টন জায়েজ হবে। কারণ সাহেবাইনের মতে, উভয় শরিকের সন্তুষ্টিক্রমে কিংবা কাজির পক্ষ থেকে জবরদস্তিমূলক এরূপ মূল বস্তুর বণ্টন জায়েজ। তদ্রূপ সুবিধা বণ্টনও জায়েজ হবে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, কাজি এরূপ [সুবিধা] বণ্টন করবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এরূপ বর্ণনাও রয়েছে। কারণ তাঁর মতে, এক্ষেত্রে জরবদস্তি প্রয়োগ করা যায় না। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো– ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে [কাজি এরূপ সুবিধা] বণ্টন করতে পারবে। কারণ খেদমতের ক্ষেত্রে সুবিধাদির মাঝে খুব কমই পার্থক্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মূল গোলামের ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ এক্ষেত্রে খুব বেশি ব্যবধান হয়ে থাকে যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।
আর যদি দুই গোলামের মাঝে তারা এভাবে সুবিধা বণ্টন করে যে, যে যেই গোলামটি নিবে তার খাবারের দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে, তাহলে ইসতিহসানের ভিত্তিতে এটা জায়েজ হবে। গোলামের খাবারের ব্যাপারে শিথিলতা থাকার কারণে। তবে কাপড়ের ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ তাতে শিথিলতা করা হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে একথা আলোচিত হয়েছিল যে, مُهَايَاةٌ [সুবিধা বণ্টন] এর ব্যাপারটি হলো قِسْمَةٌ [মূলবস্তু বণ্টন]-এর ন্যায়। সুতরাং যে সকল শরিকানা মালের ক্ষেত্রে যে সকল সুরতে قِسْمَةٌ [মূলবস্তু বণ্টন] জায়েজ হবে। ঠিক সে সকল মালের ক্ষেত্রে সে সকল ক্ষেত্রে مُهَايَاةٌ [সুবিধা বণ্টন]ও জায়েজ হবে। আর আমরা জানি যে, শরিকানা বস্তু যদি একই জিনসের হয় তাহলে তাকে কাজির জন্য কোনো একজন শরিকের আবেদনে জোরপূর্বক বণ্টন ও উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিক্রমে বণ্টন উভয় প্রকারের বণ্টনেরই অধিকার থাকে। তবে যদি বস্তুটি এমন হয় যাকে বণ্টন করা হলে তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকে না। তাহলে কাজির জন্য জোরপূর্বক বণ্টন করে দেওয়ার অধিকার থাকবে না; বরং উভয় শরিক সম্মত হলেই কেবল বণ্টন করতে পারবে অন্যথায় নয়। যেমন কোনো গোসলখানা, দেয়াল কিংবা ছোট্ট ঘর ইত্যাদি। আর যদি শরিকানা বস্তুটা ভিন্ন জিনসের হয় তাহলে তাকে কেবল উভয় শরিকের সন্তুষ্টিক্রমেই বণ্টন সম্ভব, জোরপূর্বক বণ্টন বৈধ হবে না। –[আল বিনায়াহ– ১১/৪০১]

এই মূলনীতির ভিত্তিতে কোনো দুই শরিকের নিকট যদি কতগুলো কৃতদাস থাকে তাহলে সেগুলোকে বণ্টন করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মানুষের মাঝে যেহেতু তাদের অন্তর্নিহিত যোগ্যতার তারতম্যের কারণে তাদের পরস্পরের মাঝে বিপুল ব্যবধান হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেকটি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন জিনসের মতো হওয়ায় তিনি বলেন যে, একাধিক গোলাম বা কৃতদাস শরিকানা হলে যে কোনো এ শরিকের পক্ষ থেকে বণ্টনের আবেদনে তাদেরকে জোরপূর্বক বণ্টন করা বৈধ হবে না। আর সাহেবাইনের মতে, এই সুরতে এক শরিকের পক্ষ থেকে বণ্টনের আবেদন করা হলে অপর শরিকের সম্মতিতে যেমন বণ্টন করা জায়েজ হবে, তদ্রূপ জোরপূর্বক বণ্টনও জায়েজ হবে। কারণ মানুষ সকলেই এক জিনসের মতো। যেমনটি আমরা পূর্বে কিতাবুল কিসমতের আওতায় মূল কিতাবের ৪/৪১৪ নং পৃষ্ঠায় পড়ে এসেছি। আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) তারই সদৃশ আরেকটি মাসআলা مُهَايَأَة বা সুবিধা বণ্টনের বিধান আলোচনা করতে চাচ্ছেন।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَهَايَئَا فِي الْعَبْدَيْنِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, যদি দুই ব্যক্তি শরিকানা ভিত্তিতে দুটি গোলামের মালিক হয় এবং তারা গোলামটির সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করে যে, এই গোলামটি এই শরিকের খেদমত করবে এবং অপরটি অপর শরিকের খেদমত করবে, তাহলে এরূপ সুবিধা বণ্টন বৈধ হবে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, সরাসরি গোলাম দুটিকে দুই অংশীদারের মাঝে تَقْسِيْم বণ্টন করার ব্যাপারে যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তদ্রূপ গোলামের সুবিধাদি বণ্টনের ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। আলোচ্য মাসআলায় সুবিধা বণ্টন জায়েজ হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে মোট তিনটি অভিমত রয়েছে। তা হলো−

১. সাহেবাইন (র.)-এর মতে এ ধরনের সুবিধা বণ্টন জায়েজ হবে। সুতরাং দুই শরিকের কোনো একজন যদি এরূপ সুবিধা বণ্টনের দাবি করে তাহলে অপর শরিক তাতে সম্মত থাকুক বা না থাকুক উভয় অবস্থাতেই কাজির জন্যে এরূপ সুবিধা বণ্টন করে দেওয়া বৈধ হবে। কারণ গোলাম দুটি একই জিনসের। আর এক জিনসের শরিকানা সম্পদকে উভয় শরিকের সম্মতিতে যেমন বণ্টন করা যায়। তদ্রূপ যে কোনো এক শরিকের অসম্মতিতে জোরপূর্বকও বণ্টন করা যায়। তাই এ দুটি গোলামের সুবিধাকেও বণ্টন করা যাবে।
২. মাশায়েখদের কেউ কেউ বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, কাজি এরূপ সুবিধা বণ্টন করবে না। কারণ গোলাম দুটি এক জিনসের হলেও যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে দুই গোলামের মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক। তাই এ দিক বিবেচনা করে বিচার করা হলে গোলাম দুটি দুই জিনসের মতো। আর শরিকানার সম্পর্ক দুই জিনসের হলে বিচারক সে সম্পদকে উভয় শরিকের সম্মতি ব্যতিরেকে বণ্টন করে দেওয়ার অধিকার রাখে না। আল্লামা খাসসাফ সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এ বর্ণনাটি পাওয়া যায়।
৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশুদ্ধ মত হলো, এই সুরতে সুবিধা বণ্টন বৈধ হবে। কারণ সেবার ধরন বিবেচনায় গোলামের সুবিধার মাঝে তেমন বেশি ব্যবধান থাকে না। তাই তা এক জিনসের সম্পদের মতো। পক্ষান্তরে সরাসরি গোলামকে বণ্টন করার ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ গোলামে গোলামে বেশি ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক। তাই তা দুই জিনসের মতো।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَهَايَئَا فِيْهِمَا عَلٰى اَنَّ الخ : দুটি গোলাম যদি দুই জনের শরিকী মাল হয় তাহলে দুই গোলামের খাবার দাবার ও প্রয়োজনীয় পোশাক দেওয়ার দায়িত্বও উভয়ের উপর শরিকানা ভিত্তিতে বণ্টিত হবে। এখন যদি দুজন এরূপ চুক্তি করে নেয় যে, গোলামটি যার খেদমত করবে তার উপর তার খাবার ও পোশাকের দায়িত্ব বর্তাবে। তাহলে এরূপ চুক্তি বৈধ হবে কিনা?
এই প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, খাবারের ব্যাপারে এরূপ চুক্তি করলে তা বৈধ হবে। পক্ষান্তরে পোশাকের ব্যাপারে তা বৈধ হবে না। কারণ খাবারের ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবধান কমই হয়ে থাকে। এছাড়াও খাবারের ব্যাপারে মানুষ একটু শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু পোশাকের ব্যাপারে মানুষ তেমন শিথিলতা প্রদর্শন করে না; বরং কার্পণ্য প্রদর্শন করে, এছাড়াও কাপড়ে ব্যবধানও অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই খাবারের ব্যাপারটিকে ইসতিহসানের ভিত্তিতে জায়েজ করা হয়েছে। এদতভিন্ন যেহেতু উভয় গোলামের পোশাকের ব্যবস্থা করা উভয় শরিকের উপর সমানভাবে আবশ্যক। তাই যদি এরূপ চুক্তি করে নেয় তাহলে যেন প্রত্যেক শরিকই তার গোলামকে দেওয়া অর্ধেক কাপড়ের বিনিময়ে অপর শরিকের পক্ষ থেকে অপর গোলামকে দেওয়া অর্ধেক কাপড়ের বিনিময়ে ক্রয় করছে। আর এরূপ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। কারণ তাতে বিক্রয় পণ্য ও মূল্য অজ্ঞাত রয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি নির্দিষ্ট কোনো কাপড়ে নির্ধারিত করে নেয় তাহলে কাপড়ের ব্যাপারে এরূপ চুক্তি ইসতিহসানের ভিত্তিতে বৈধ হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

وَلَوْ تَهَايَنَا فِيْ دَارَيْنِ عَلٰى اَنْ يَسْكُنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَارًا جَازَ وَيُجْبِرُ الْقَاضِيْ عَلَيْهِ اَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِاَنَّ الدَّارَيْنِ عِنْدَهُمَا كَدَارٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ قِيْلَ لَا يُجْبِرُ عِنْدَهُ اِعْتِبَارًا بِالْقِسْمَةِ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ لَا يَجُوْزُ التَّهَايُؤُ فِيْهِمَا اَصْلًا بِالْجَبْرِ لِمَا قُلْنَا وَبِالتَّرَاضِيْ لِاَنَّهُ بَيْعُ السُّكْنٰى بِالسُّكْنٰى بِخِلَافِ قِسْمَةِ رَقَبَتِهِمَا لِاَنَّ بَيْعَ بَعْضِ اَحَدِهِمَا بِبَعْضِ الْاٰخَرِ جَائِزٌ وَجْهُ الظَّاهِرِ اَنَّ التَّفَاوُتَ يَقِلُّ فِي الْمَنَافِعِ فَيَجُوْزُ بِالتَّرَاضِيْ وَيَجْرِيْ فِيْهِ جَبْرُ الْقَاضِيْ وَيُعْتَبَرُ اِفْرَازًا اَمَّا يَكْثُرُ التَّفَاوُتُ فِيْ اَعْيَانِهِمَا فَاعْتُبِرَ مُبَادَلَةً.

অনুবাদ : যদি দুই শরিক দুটি ঘরের সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করে যে, তাদের প্রত্যেকে এক একটি ঘরে বসবাস করবে তাহলে তা জায়েজ হবে। কাজি [এরূপ সুবিধা বণ্টনে] জবরদস্তি করতে পারবে। সাহেবাইনের মতে বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। কারণ দুটি ঘর তাদের নিকট একটি ঘরের মতো। আর বলা হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, কাজি এক্ষেত্রে জবরদস্তি করতে পারবে না। মূলবস্তু বণ্টনের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ঘরের মাঝে [এরূপ] সুবিধা বণ্টন মোটেই জায়েজ হবে না। জোরপূর্বক ও নয়। সেই কারণ যা আমরা উল্লেখ করলাম। উভয় শরিকের] সম্মতিতেও নয়। কারণ এটা হলো ঘরের বসবাসের সুবিধার বিনিময়ে আরেকটি ঘরের সুবিধাকে ক্রয়-বিক্রয়। পক্ষান্তরে এ দুটি ঘরে সত্তাতে বণ্টনের ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা একটি ঘরের কিয়াদংশকে অপর একটি ঘরের কিয়দংশের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ। জাহেরী মতের কারণ হলো সুবিধাদির ক্ষেত্রে ব্যবধান খুব কম হয়ে থাকে। তাই উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিক্রমে তার বণ্টন বৈধ হবে এবং এতে কাজির বাধ্য বাধকতাও জায়েজ হবে এবং এটাকে اِفْرَازٌ [পৃথককরণ] ধরা হবে। তবে ঘর দুটির সত্তার মাঝে পার্থক্য অনেক বেশি বিধায় তাকে مُبَادَلَةٌ [একটির বিনিময়ে অপরটিকে] পরিবর্তন ধরা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা : মনে করি যায়েদও আমর শরিকানা ভিত্তিতে দুটি ঘরের মালিক। এখন তারা যদি ঘর দুটির সুবিধাকে এভাবে বণ্টন করে যে, যায়েদ একটি ঘরে বাস করবে আর আমর অপর ঘরটিতে বাস করবে। তাহলে এই সুবিধা বণ্টন বৈধ হবে কিনা? এই মাসআলার সমাধান দিতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন সকলের মতেই এ সুবিধাবণ্টন বৈধ হবে। উভয়ের সন্তুষ্টিক্রমেও বৈধ হবে এবং কাজির পক্ষ থেকে জোরপূর্বক বণ্টন করা হলেও তা বৈধ হবে। তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সাহেবাইনের নীতি অনুসারে উপরিউক্ত সমাধানটি এখানে সহজেই বুঝে আসে। কারণ এখানে দুটি ঘর একই জিনসের বস্তু হওয়ার কারণে একটি ঘর করে উভয়ের মাঝে বণ্টন করা সাহেবাইনের মতে জায়েজ বিধায় এক একটি ঘরের সুবিধাকেও এভাবে উভয়ের মাঝে বণ্টন করা জায়েজ হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নীতি অনুসারে তো এরূপ সুবিধা বণ্টন না জায়েজ হওয়ার কথা। কেননা তিনি শহর, মহল্লা, প্রতিবেশী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে দুটি ঘরের মধ্য থেকে একটির সাথে অপরটির অনেক ব্যবধান থাকার দরুন উল্লিখিত পন্থায় ঘর বণ্টনকে বৈধ মনে করেন না। তাই এ পন্থায় ঘরের সুবিধা বণ্টনও বৈধ না হওয়ার কথা। তাহলে এই মাসআলায় তিনি সাহেবাইনের সাথে একমত হলেন কি করে?

এই প্রশ্নের সমাধানে মুসান্নিফ (র.) বলেন,...... وَجْهُ الظَّاهِرِ অর্থাৎ, ঘরের সত্তাকে বণ্টন করা আর ঘরের সুবিধা বণ্টন করা দুটির বিধান এক হওয়া আবশ্যক নয়। কারণ সত্তাগত দিক থেকে শহর, মহল্লা, প্রতিবেশি, গ্যাস, পানি ইত্যাদির সুবিধাদির দিক দিয়ে দুটি ঘরের মাঝে অনেক ব্যবধান হয়ে থাকে। বিধায় ঘর দুটি দুই জিনসের মতো। আর দুই জিনসের সম্পত্তিকে শরিকদের মাঝে জোরপূর্বক বণ্টন করা জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে ঘর দুটিতে বসবাসের সুবিধাদির দিক দিয়ে তেমন বেশি ব্যবধান থাকে না বিধায় তা একই জিনসের মতো। আর একই জিনসের সম্পদ শরিকদের মাঝে সম্মতিক্রমে বা জোরপূর্বক উভয় সুরতেই বণ্টন করা যায়। তাই এ সুরতে সুবিধা বণ্টনের মাঝেও কোনো অসুবিধা নেই। ফলেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) উপরিউক্ত সুরতে সুবিধা বণ্টনের বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। চাই তা উভয়ের সম্মতিতে হোক বা জোরপূর্বক উভয় অবস্থাতেই বণ্টন করা যায়। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ঘর দুটির সত্তা বণ্টনের ক্ষেত্রে বণ্টনকে مُبَادَلَةٌ ধরা হবে। আর সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে বণ্টনকে اِفْرَازٌ ধরা হবে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উল্লিখিত অভিমতটি হলো জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে। তবে এছাড়াও উক্ত মাসআলার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আরো দুটি অভিমত পাওয়া যায়। ....وَقَدْ قِيلَ বলে মুসান্নিফ (র.) তাই উল্লেখ করতে চাচ্ছেন।

প্রথম অভিমতটি হলো– উল্লিখিত সুরতে শুধু কেবল উভয় শরিকের সম্মতিক্রমে مُهَايَأَةٌ বা সুবিধা বণ্টন জায়েজ হবে। একজনের দাবির ভিত্তিতে অপরজনের উপর জোরপূর্বক এ সুবিধা বণ্টন বৈধ হবে না। এটা ইমাম কারখী (র.)-এরও অভিমত। কারণ ঘর দুটির সত্তাকে বণ্টন করার ক্ষেত্রে যেহেতু ঘর দুটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নীতি অনুযায়ী দুই জিনসের মতো। তাই এর উপর কিয়াস করে সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে ঘর দুটিকে দুই জিনসের ধরা হবে। আর দুই জিনসের শরিকানা সম্পদকে উভয়ের মাঝে জোরপূর্বক বণ্টন করে দেওয়া যায় না।

আর দ্বিতীয় মতটি হলো এই সুরতে সুবিধা বণ্টন উভয়ের সম্মতিতে কিংবা জোরপূর্বক কোনো সুরতেই জায়েজ হবে না। কারণ এই সুরতে বসবাসের অধিকারের বিনিময়ে বসবাসের অধিকারকে বিক্রয় করা হয়ে থাকে আর তা জায়েজ নেই। কারণ তাতে একই জিনসের একটি বস্তুকে পক্ষান্তরে একটি ঘরের সত্তাকে আরেকটি ঘরের সত্তার বিনিময়ে বিক্রয় করার ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ একটি ঘরের কিয়দংশকে আরেকটি ঘরের কিয়দংশের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েজ ।

এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দিকে নিসবতকৃত এ অভিমতটি হলো নাওয়াদিরের বর্ণনা। যার জাহেরী রেওয়ায়েত সর্বাধিক প্রণিধানযোগ্য।

وَفِي الدَّابَّتَيْنِ لَا يَجُوْزُ التَّهَايُؤُ عَلَى الرُّكُوْبِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَعِنْدَهُمَا يَجُوْزُ اِعْتِبَارًا بِقِسْمَةِ الْأَعْيَانِ وَلَهُ أَنَّ الْاِسْتِعْمَالَ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الرَّاكِبِيْنَ فَإِنَّهُمْ بَيْنَ حَاذِقٍ وَأَخْرَقَ وَالتَّهَايُؤُ فِي الرُّكُوْبِ فِيْ دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ يَخْدِمُ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا يَتَحَمَّلُ زِيَادَةً عَلَى طَاقَتِهِ وَالدَّابَّةُ تَحْمِلُهَا .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, দুটি বাহনের মাঝে আরোহণ সুবিধান বণ্টন বৈধ নয়। আর সাহেবাইনের মতে তা জায়েজ হবে। মূলবস্তু বণ্টনের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো আরোহণকারীদের মাঝে ব্যবধান থাকার কারণে বাহনকে ব্যবহারের মাঝেও ব্যবধান হয়ে থাকে। কারণ আরোহণকারীগণ পারদর্শী ও আনাড়ি এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। আর একটি বাহনের আরোহণ সুবিধা বণ্টনের ব্যাপারেও এই মতভেদ রয়েছে। সেই কারণে যা আমরা বর্ণনা করলাম। পক্ষান্তরে গোলামের ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ সে নিজ ইচ্ছায় খেদমত করে থাকে ফলে নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু বহন করবে না। কিন্তু বাহন তা বহন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِي الدَّابَّتَيْنِ لَا يَجُوْزُ الخ : **সূরতে মাসআলা :** যায়েদ ও আমর শরিকানা ভিত্তিতে দুটি ঘোড়ার মালিক। সুতরাং তারা যদি এই চুক্তি করে যে, একটি ঘোড়াকে যায়েদ বাহন হিসেবে ব্যবহার করবে আর অপরটি আমর ব্যবহার করবে। তাহলে এরূপ সুবিধা বণ্টন চুক্তি জায়েজ হবে কিনা? এ মাসআলার সমাধানে মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এরূপ বণ্টন تهايؤ বা সুবিধা বণ্টন চুক্তি জায়েজ নেই। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা জায়েজ। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো মূল বস্তু বণ্টনের উপর কিয়াস। অর্থাৎ ঘোড়া দুটি এক জিনসের সম্পদ তাই এ দুইটি ঘোড়ার মূলসত্তাকে একটি একটি করে উভয়ের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া বৈধ হবে। তাই তার সুবিধাকেও এপন্থায় বণ্টন করা বৈধ হওয়া উচিত।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ঘোড়ার উপর আরোহণকারী যেহেতু বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে তাই আরোহণের পারস্পরিক তারতম্যের কারণে ঘোড়ার ক্ষয়ক্ষতিও কমবেশি হবে। যেমন মনে করি দুই অংশীদারের মধ্য থেকে একজন ঘোড়ায় আরোহণে খুবই পারদর্শী তাই তার আরোহণের দরুন ঘোড়ার কেনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু অপর শরিক এমনও হতে পারে যে, ঘোড়ায় আরোহণের ব্যাপারে একদম আনাড়ি ফলে তার আরোহণের অপারদর্শিতার দরুন তার ব্যবহারে মারাও যেতে পারে। তাহলে যেহেতু এটা শরিকানা সম্পদ তাই অপর শরিকও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং আরোহীদের পার্থক্যের দরুন ঘোড়া দুটির মাঝে অনেক পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ায় তা দুই জিনসের নামান্তর। আর দুই জিনসের সম্পদকে উভয় শরিকের সম্মতি ছাড়া কাজি বণ্টন করে দিতে পারেন না।

আর যদি দুই শরিকের মালিকানায় একটি ঘোড়া থাকে। আর তারা এ মর্মে চুক্তি করে যে, ঘোড়াটিতে একজন এ সপ্তাহ আরোহণ করবে আর অপরজন পরবর্তী সপ্তাহে আরোহণ করবে। তাহলে এই চুক্তির বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারেও ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর উপরিউক্ত মতভেদ রয়েছে। মতভেদের কারণ সেটাই যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, একটি বাহনে পালাক্রমে আরোহণের চুক্তি যদি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট না জায়েজ হয় তাহলে একটি গোলাম পালাক্রমে দুই শরিকের খেদমত করবে এই মর্মে চুক্তিও না জায়েজ হবে। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) গোলামের ক্ষেত্রে এটাকে জায়েজ বলেন কেন?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, ঘোড়া হলো চতুষ্পদ জন্তু তাই তার উপর যে পরিমাণ বোঝা দেওয়া হোক না কেন? তা সে টানতে প্রস্তুত। কেননা অতিরিক্ত বোঝা টানায় অসম্মতি প্রকাশ করা তার জন্যে সম্ভব নয়। তাকে যা দেওয়া হবে তা-ই সে বহন করে নিবে ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই ঘোড়ার ক্ষেত্রে এরূপ চুক্তি অবৈধ রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে গোলাম যেহেতু নিজ ইচ্ছায় বোঝা বহন করে ও খেদমত করে তাই অধিক বোঝা বহনের মাধ্যমে সে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বিধায় এটাকে জায়েজ বলা হয়েছে।

وَأَمَّا التَّهَايُؤُ فِي الْاِسْتِعْمَالِ يَجُوْزُ فِي الدَّارِ الْوَاحِدَةِ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ وَالدَّابَّةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَجُوْزُ وَ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ النَّصِيْبَيْنِ يَتَعَاقَبَانِ فِي الْاِسْتِيْفَاءِ وَالْاِعْتِدَالِ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ فِي الْعَقَارِ ـ وَتَغَيُّرُهُ فِي الْحَيَوَانَاتِ لِتَوَالِي أَسْبَابِ التَّغَيُّرِ عَلَيْهَا فَتَفُوْتُ الْمُعَادَلَةُ ـ

অনুবাদ : আর সুবিধা বণ্টন ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে হলে, একটি ঘরের ব্যাপারে হলে তা বৈধ হবে। জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে। তবে একটি গোলাম বা একটি বাহনের ক্ষেত্রে তা বৈধ নয়। আর পার্থক্যের কারণ হলো উসূল করার দিক থেকে প্রত্যেকের হিসসা বা অংশটা পালাক্রমে হয়ে থাকে। অথচ বর্তমানে তার স্বাভাবিকতা বহাল আছে। [ববিষ্যতে তা বহাল থাকাটা নিশ্চিত নয়] আর বাস্তবতা হলো স্থাবর সম্পত্তিতে তা [পরেও] বহাল থাকা। আর প্রাণীদের ক্ষেত্রে তা পরিবর্তিত হওয়া, ধারাবাহিকভাবে তাতে পরিবর্তনের কারণসমূহ আবর্তিত হওয়ার কারণে। ফলে তাতে সামঞ্জস্যতা বিঘ্নিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا التَّهَايُؤُ فِي الْاِسْتِعْمَالِ الخ : সূরতে মাসআলা : যায়েদ ও আমর শরিকানা ভিত্তিতে একটি ঘরের মালিক। সুতরাং তারা যদি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, ঘরটিকে এক মাসের জন্যে যায়েদ ভাড়া দিবে এবং তার ভাড়া উসূল করে নিজে ভোগ করবে। আর পরের মাসে তাকে আমর ভাড়া দিবে এবং ভাড়া উসূল করে নিজে ভোগ করবে। তাহলে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে তাদের এ সুবিধা বণ্টন চুক্তি বৈধ হবে। তবে যদি এমন হয় যে, তারা শরিকানা ভিত্তিতে একটি ঘোড়া বা একটি গোলামের মালিক এবং তারা গোলাম বা ঘোড়াটিকে উল্লিখিত পন্থায় ভাড়া দিয়ে পালাক্রমে সুবিধাভোগ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাদের এই সুবিধা বণ্টন বৈধ হবে না।

মাসআলা দুটির মাঝে বিধানগত এ পার্থক্যের কারণ হলো, উভয় শরিক যেহেতু ঘর, গোলাম কিংবা ঘোড়ার মাঝে সমানভাবে অংশীদার তাই তার সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে যেন সর্বাবস্থায় ইনসাফ ভিত্তিক সমবণ্টন হয় এর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। ঘরের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সুরতের বণ্টনে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা সম্ভব। কারণ একমাসের ভেতর ঘরের সার্বিক অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্তরে ঘোড়া কিংবা গোলামের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। কেননা এমনও হতে পারে যে, প্রথম মাসে এক শরিক তাকে মজুরি খাটিয়ে লাভ করল, আর পরবর্তী মাসে অপর শরিকের পালা আসা মাত্রই গোলাম অসুস্থ হয়ে পড়ল। অনুরূপ ঘোড়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে। তাহলে এমতাবস্থায় এক শরিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং উভয়ের মাঝে সমবণ্টন সম্ভব হবে না। বিধায় ঘরের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পন্থায় সুবিধার বণ্টন জায়েজ আর ঘোড়া বা গোলামের ক্ষেত্রে তা নাজায়েজ হবে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

وَلَوْ زَادَتِ الْغِلَّةُ فِيْ نَوْبَةِ اَحَدِهِمَا عَلَيْهَا فِيْ نَوْبَةِ الْاٰخَرِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الزِّيَادَةِ لِيَتَحَقَّقَ التَّعْدِيْلُ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ التَّهَايُئُ عَلَى الْمَنَافِعِ فَاسْتَغَلَّ اَحَدُهُمَا نَوْبَتَهُ زِيَادَةً لِاَنَّ التَّعْدِيْلَ فِيْمَا وَقَعَ عَلَيْهِ التَّهَايُؤُ حَاصِلٌ وَهُوَ الْمَنَافِعُ فَلَا تَضُرُّهُ زِيَادَةُ الْاِسْتِغْلَالِ مِنْ بَعْدُ .

অনুবাদ : যদি দুই শরিকের মধ্য থেকে যে কোনো একজনের পালাক্রমে এসে ঘরের ভাড়ার পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে অতিরিক্ত ভাড়ায় উভয় শরিকই অংশীদার হবে। যাতে করে উভয়ের মাঝে সমতা বিধান হয়। পক্ষান্তরে সুবিধাভোগের উপর তাহায়ুর চুক্তিতে দুই শরিকের কেউ তার পালাক্রমে অতিরিক্ত মূল্যে ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারটি এর বিপরীত। কেননা যে বিষয়ের উপর তাহায়ু চুক্তি হয়েছিল তাতে সমতা অর্জিত হয়েছে। আর তা হলো সুযোগ সুবিধাদি। তারপর [অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর] ভাড়ার পরিমাণে বৃদ্ধি তার [চুক্তির] বিশুদ্ধতাকে বিঘ্নিত করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَتِ الْغِلَّةُ نَوْبَةِ اَحَدِهِمْ الخ : **সূরতে মাসআলা :** যায়েদ ও আমর শরিকানা ভিত্তিতে একটি ঘরের মালিক। এখন তারা যদি ঘরটির সুবিধা বণ্টন করতে গিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, যায়েদ ঘরটিকে একমাস ভাড়া দিয়ে ভাড়া উসূল করে তা ভোগ করবে। আর আমর আরেক মাস ভাড়া দিয়ে তা সে নিজে ভোগ করবে। এখন যদি এমন হয় যে, যায়েদ তার [ভাড়ায় খাটানোর] সময়ে ঘরটিকে একশত টাকায় ভাড়া দিল। আর আমর তার [ভাড়ায় খাটানোর] সময়ে ঘরটিকে দুইশত টাকায় ভাড়া দিল। এমতাবস্থায় আমরের [ভাড়ায় খাটানোর] সময়ে অতিরিক্ত ভাড়া হিসেবে প্রাপ্ত একশত টাকায় যায়েদ ও আমর উভয়ের মাঝে সমতা রক্ষা করার জন্যে অতিরিক্ত অংশে উভয়কে অংশীদার করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে যদি তারা এই মর্মে تَهَايُؤْ -এর চুক্তি করে যে, ঘরটির যাবতীয় সুবিধাদি যায়েদ একমাস ভোগ করবে আর আমর একমাস ভোগ করবে। আর উভয়েই তাদের নিজ নিজ পালাক্রমে তাতে নিজে বসবাস না করে তাদের ভাড়ায় খাটায় তালে কেউ যদি তার নিজস্ব পালাক্রমে অতিরিক্ত ভাড়া অর্জন করে তাতে অপর শরিক অংশীদার হবে না। কারণ এখানে কেবল প্রত্যেক শরিক একমাস করে ঘরের সুবিবধা ভোগ করার চুক্তি হয়েছে। আর একমাস সময়ের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমতা অর্জিত হয়ে গেছে। ভাড়া দেওয়ার উপর চুক্তি হয়নি। তাই ভাড়ার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা আবশ্যক হবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَالتَّهَايُؤُ عَلَى الْإِسْتِغْلَالِ فِى الدَّارَيْنِ جَائِزٌ اَيْضًا فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ فَضُلَ غِلَّةُ اَحَدِهِمَا لَا يَشْتَرِكَانِ فِيْهِ بِخِلَافِ الدَّارِ الْوَاحِدَةِ وَالْفَرْقُ اَنَّ فِى الدَّارَيْنِ مَعْنَى التَّمْيِيْزِ وَالْإِفْرَازُ رَاجِحٌ لِاتِّحَادِ زَمَانِ الْإِسْتِيْفَاءِ وَفِى الدَّارِ الْوَاحِدَةِ يَتَعَاقَبُ الْوُصُوْلُ فَاعْتُبِرَ قَرْضًا وَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ فِىْ نَوْبَتِهِ كَالْوَكِيْلِ عَنْ صَاحِبِهِ فَلِهٰذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَكَذَا يَجُوْزُ فِى الْعَبْدَيْنِ عِنْدَهُمَا اِعْتِبَارًا بِالتَّهَايُؤِ فِى الْمَنَافِعِ وَلَا يَجُوْزُ عِنْدَهُ لِاَنَّ التَّفَاوُتَ فِىْ اَعْيَانِ الرَّقِيْقِ اَكْثَرُ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ فِى الْعَبْدِ الْوَاحِدِ فَاَوْلٰى اَنْ يُمْتَنَعَ الْجَوَازُ وَالتَّهَايُؤُ فِى الْخِدْمَةِ جُوِّزَ ضَرُوْرَةً وَلَا ضَرُوْرَةَ فِى الْغِلَّةِ لِاِمْكَانِ قِسْمَتِهَا لِكَوْنِهَا عَيْنًا وَلِاَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ التَّسَامُحُ فِى الْخِدْمَةِ وَالْإِسْتِقْصَاءُ فِى الْإِسْتِغْلَالِ فَلَا يَتَقَاسَانِ وَلَا يَجُوْزُ فِى الدَّابَّتَيْنِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَالْوَجْهُ مَا بَيَّنَّاهُ فِى الرُّكُوْبِ ـ

অনুবাদ : দুটি ঘরকে ভাড়া দেওয়ার মাধ্যমে তার সুবিধা বণ্টনও জাহেরী রেওয়ায়েতে জায়েজ আছে। ঐ কারণে যা আমরা বর্ণনা করেছি। আর যদি দুই শরিকের কোনো একজনের ভাড়ার পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে তাতে উভয়ে অংশীদার হবে না। পক্ষান্তরে একটি ঘরের ব্যাপার ভিন্ন। আর ভিন্নতার কারণ হলো দুটি ঘরের মাঝে পৃথকীকরণের অর্থ প্রাধান্য পায়। উসুল করার কাল এক হওয়ার কারণে। আর একটি ঘরে পালাক্রমে উসুল করা হয়ে থাকে। তাই তাকে ঋণ ধরা হবে এবং প্রত্যেককে তার পালায় তার সঙ্গীর পক্ষ থেকে উকিল মনে করা হবে। আর এ কারণেই অতিরিক্ত অংশ থেকে তার হিসসাকে তার কাছে ফেরত দিতে হবে। তদ্রূপ সাহেবাইনের মতে দুটি গোলামকে ভাড়া দেওয়ার মাধ্যমে সুবিধা বণ্টন চুক্তিও বৈধ হবে। মানাফে' বণ্টনের তাহায়ু চুক্তির উপর কিয়াস করে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে না। কেননা একটি গোলামের মাঝে কালভিত্তিক সুবিধা বণ্টনের ব্যবধানের তুলনায় দুটি গোলামের সত্তাগত ব্যবধান অনেক বেশি। তাই তার বৈধতা বাধাগ্রস্ত হওয়াই অধিক কাম্য। আর খেদমতের জন্যে সুবিধা বণ্টনকে জায়েজ করা হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে। আর ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের বণ্টন করা বৈধ হওয়ার কারণে। কেননা এটা একটি সত্তাগত বস্তু। এছাড়াও বাস্তবতা হলো খেদমতের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে আর ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে হয় কষাকষি। তাই একটিকে আরেকটির উপর কিয়াস করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, দুটি বাহনের [অর্থাৎ বাহনকে ভাড়া দেওয়ার মাধ্যমে সুবিধা বণ্টন চুক্তি] মাঝে তা জায়েজ নেই। সাহেবাইনের মতের বিপরীতে। কারণ সেটাই যা আরোহণ -এর ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالتَّهَايُؤُ عَلَى الْاِسْتِغْلَالِ فِى الخ : যদি শরিকদ্বয় দুটি ঘরের মালিক হয় এবং এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রত্যেকেই একটি করে ঘর নিয়ে নিবে এবং তাকে ভাড়ায় খাটাবে। তাহলে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ সুবিধা বন্টন বৈধ হবে। তবে এ অবস্থায় যদি কোনো শরিক তার ভাগের ঘরটিকে ভাড়ায় খাটিয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারে তাহলে এই বেশি অংশে অপর শরিক অংশীদার হবে না। পক্ষান্তরে যদি তাদের শরিকানায় শুধুমাত্র একটি ঘর থাকে এবং তাকে একমাস করে প্রত্যেকে ভাড়ায় খাটিয়ে লাভ করার চুক্তি করে থাকে তাহলে একজনের পালায় বেশি ভাড়া লাভ করলে অপর শরিকও তাতে অংশীদার হবে।

মাসআলা দুটির মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো– দুটি ঘরের সুরতে শরিকদ্বয় উভয়েই এক সময়ে তাদের মালিকানা থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারে। তাই এই সুরতে إِفْرَازٌ বা পৃথকীকরণের অর্থ বেশি পাওয়া যায়। অর্থাৎ যেন প্রত্যেক শরিককেই এ অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তোমার অধীনে ঘরটি থেকে অর্জিত যাবতীয় মুনাফা তোমার প্রাপ্য, অপর শরিক থেকে তুমি তাকে পৃথক করে নাও। সুতরাং এমতাবস্থায় ঘর থেকে সে যে ভাড়া প্রাপ্ত হবে এটা তার প্রাপ্য মুনাফার পরিবর্তে সে প্রাপ্ত হয়েছে। তাই এটা সে একাই পাবে। অপর শরিকের তাতে কোনো অধিকার থাকবে না। পক্ষান্তরে একটি ঘরের সুরতে দুই শরিক একই সাথে তার থেকে উপকৃত হতে পারে না। বরং একজনকে অপরজনের আগে কিংবা পরে তার মুনাফা অর্জন করতে হয়। ফলে প্রথমে যে ভোগ করবে মনে করা হবে সে তার নিজের অংশটি ভোগ করছে এবং তার সাথির অংশটিও ঋণ হিসেবে গ্রহণ করছে। আর ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে তার সাথির উকিল হিসেবে ভাড়া উসূল করছে এবং পরবর্তী কিস্তিতে তাঁর সাথির পালায় অর্জিত মুনাফা থেকে প্রাপ্ত নিজের অংশ দিয়ে এই ঋণ পরিশোধ করবে। সুতরাং পরবর্তী কিস্তিতে যদি ভাড়া হিসেবে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জিত হয় তাহলে প্রথম ভোগকারী শরিক তার ঋণের পরিমাণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ নিজে প্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে মুনাফা ভোগকারী শরিকের উপর প্রথম কিস্তিতে নিজের অংশ থেকে শরিককে দেওয়া ঋণের পরিমাণ রেখে দেওয়ার পর উদ্ধৃত অংশ প্রথম কিস্তির শরিকের কাছে ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে।

لِمَا بَيَّنَّا বলে পূর্বের মাসআলায় বর্ণিত وَالْاِعْتِدَالُ ثَابِتٌ فِى الْحَالِ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। দলিলের ব্যাখ্যা সেখানে দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ وَكَذَا يَجُوْزُ فِى الْعَبْدَيْنِ : সুরতে মাসআলা : দুই ব্যক্তি শরিকানা ভিত্তিতে দুটি গোলামের মালিক। তারা যদি এই চুক্তি করে যে, প্রত্যেকে একটি করে গোলামকে নিয়ে মজুরি খাটিয়ে উপার্জন করবে এবং উপার্জিত মুনাফা নিজে ভোগ করবে। তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে, এ চুক্তি বৈধ হবে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এরও একই অভিমত। তারা গোলামকে মজুরি খাটিয়ে উপার্জন করার مُهَايَاة চুক্তিকে সুবিধা ভোগ করার জন্যে দুই গোলামের সুবিধা বন্টন চুক্তির সাথে কিয়াস করেন। অর্থাৎ পূর্বে বলা হয়েছিল যে, দুই শরিকের শরিকানা দুই গোলামের সুবিধাকে যদি শরিকদ্বয় এভাবে বণ্টন করে যে, একজন এক শরিকের খেদমত করবে আর অপরজন অপর শরিকের খেদমত করবে। তাহলে এই সুবিধা বণ্টন যেমন বৈধ হবে তদ্রূপ প্রত্যেক শরিক একটি করে গোলামকে মজুরি খাটিয়ে উপার্জন করার চুক্তি করলে তাও বৈধ হবে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ চুক্তি বৈধ হবে না। কারণ যদি দুই শরিকের মাঝে একটি মাত্র গোলাম থাকে এবং তাতে তারা এভাবে চুক্তি করে যে, একমাস গোলামটিকে মজুরি খাটিয়ে একজন উপার্জন কবে এবং পরের মাসে আরেকজন উপার্জন করবে। তাহলে দুই মাসের উপার্জনের মাঝে অনেক ব্যবধান হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এই সুরতকে সর্বসম্মতিক্রমে ওলামায়ে কেরাম নাজায়েজ বলেছেন। আর আমরা জানি যে, এক গোলামের এক মাসের ব্যবধানে উপার্জনের যে ব্যবধান স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। একই মাসে দুই গোলামের উপার্জনের ব্যবধান এর চেয়ে আরো অনেক বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

কারণ দুই গোলামের যোগ্যতা ও শারিরীক শক্তির পার্থক্য থাকায় এমনও হতে পারে যে, একজন মাসে দশ হাজার টাকা উপার্জন করতে সক্ষম। আর আরেকজন দশ টাকাও উপার্জন করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এক গোলামের ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যবধানের দরুন এরূপ চুক্তি না জায়েজ হলে দুই গোলামের ক্ষেত্রে তা না জায়েজ হওয়াটাই অধিক শ্রেয়। কারণ তাতে ব্যবধান আরো অনেক বেশি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি উল্লিখিত ব্যবধানের কারণে এরূপ বণ্টন নাজায়েজ হয় তাহলে খেদমতের জন্যে দুই গোলাম হোক বা এক গোলাম হোক উভয় সুরতে এরূপ বণ্টনকে জায়েজ বললেন কেন? অথচ খেদমতের ক্ষেত্রেও তো এরূপ ব্যবধান হতে পারে। যথা এক গোলাম খুবই দুর্বল যে খেদমতে সক্ষম নেয়। অথবা একটি গোলামই এক শরিকের খেদমতের পালায় সে সুস্থ সবল ছিল কিন্তু অপর শরিকের পালায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। অতএব দেখা গেল উপার্জনের ক্ষেত্রে যেমন বেশ কম হয় তেমনি সেবাদান বা খেদমতেও কম বেশি হয়। তাহলে উভয়ের জায়েজ আর নাজায়েজের মধ্যে তফাৎটা কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, খেদমতের ক্ষেত্রে এরূপ বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু গোলামকে মজুরি খাটানোর ক্ষেত্রে এরূপ চুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ উভয় গোলামকে যৌথভাবে মজুরি খাটিয়ে মূল মুনাফা বণ্টন করা সম্ভব। পক্ষান্তরে গোলামের খেদমতটিকে এভাবে ভাগ করা সম্ভব নয়। বিধায় খেদমতের ব্যাপারে তা জায়েজ হবে এবং ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে তা নাজায়েজ হবে। আর এটাই হলো জায়েজ এবং নাজায়েজ হওয়ার মধ্যে তফাৎ। এছাড়াও খেদমতের ব্যাপারে প্রত্যেকেই কিছুটা ছাড় দেওয়ার মানসিকতা রাখে। পক্ষান্তরে মজুরি খাটিয়ে উপার্জিত মুনাফার অংশে কেউ ছাড় দিতে প্রস্তুত থাকে না; বরং এক্ষেত্রে কষাকষি করা হয়ে থাকে। তাই খেদমতের ব্যাপারটির সাথে মজুরি খাটানো মাসআলার কিয়াস করা যাবে না।

قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ فِي الدَّابَّتَيْنِ : সূরতে মাসআলা : যদি দুটি ঘোড়া যায়েদ ও আমরের মাঝে [যৌথভাবে থাকে] এবং তারা প্রত্যেকে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, একটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জন করবে। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে না। আর সাহেবাঈন (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে। উভয় পক্ষের দলিল পূর্ব وَفِي الدَّابَّتَيْنِ لَا يَجُوزُ التَّهَايُؤُ عَلَى الرُّكُوبِ। এই ইবারতের আলোচনায় পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

وَلَوْ كَانَ نَخْلٌ اَوْ شَجَرٌ اَوْ غَنَمٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَتَهَايَئَا عَلٰى اَنْ يَاْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَائِفَةً يَسْتَثْمِرُهَا اَوْ يَرْعَاهَا وَيَشْرَبُ اَلْبَانَهَا لَا يَجُوْزُ لِاَنَّ الْمُهَايَاةَ فِى الْمَنَافِعِ ضَرُوْرَةُ اَنَّهَا لَا تَبْقٰى فَيَتَعَذَّرُ قِسْمَتُهَا وَهٰذِهٖ اَعْيَانٌ بَاقِيَةٌ يَرِدُ عَلَيْهَا الْقِسْمَةُ عِنْدَ حُصُوْلِهَا وَالْحِيْلَةُ اَنْ يَبِيْعَ حِصَّتَهٗ مِنَ الْاٰخَرِ ثُمَّ يَشْتَرِىْ كُلَّهَا بَعْدَ مُضِيِّ نَوْبَتِهٖ اَوْ يَنْتَفِعُ بِاللَّبَنِ بِمِقْدَارٍ مَعْلُوْمٍ اِسْتِقْرَاضًا لِنَصِيْبِ صَاحِبِهٖ اِذْ قَرْضُ الْمُشَاعِ جَائِزٌ ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : যদি দুই শরিকের মধ্যে কোনো খেজুর গাছ অথবা অন্য কোনো গাছ কিংবা বকরির পাল থাকে এবং তারা এমর্মে সুবিধা বণ্টন করে যে, তাদের উভয়েই তার কিছু অংশ নিয়ে নিবে এবং তার ফল খাবে কিংবা বকরি চড়াবে এবং তার দুধ পান করবে তাহলে তা জায়েজ হবে না। কারণ সুবিধাদির বণ্টনের বৈধতা এজন্যে ছিল যে তা বাকি থাকে না, তাই তা বণ্টন করা অসম্ভব হতো। পক্ষান্তরে এ জিনিসগুলো হলো অবশিষ্ট থাকার মতো বস্তু, যা অর্জিত হওয়ার পর বণ্টিত করার উপযোগিতা রাখে। তবে [এক্ষেত্রে জায়েজ হওয়ার জন্য] কৌশল হলো নিজের অংশটাকে অপর শরিকের কাছে বিক্রি করে দিবে এবং তার পালা অতিবাহিত হয়ে গেলে সবগুলো আবার কিনে নিবে। অথবা অপর শরিকের অংশ থেকে ঋণ হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ দুধের দ্বারা উপকৃত হবে। কারণ মিশ্রিত অংশ থেকে ঋণ গ্রহণ জায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ كَانَ نَخْلٌ اَوْ شَجَرٌ اَوْ غَنَمٌ الخ : কায়দা হলো, বস্তু থেকে অর্জিত যে সকল সুবিধা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না অর্থাৎ অস্তিত্বে আসার সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায় সে সকল সুবিধাকে অস্তিত্বে আসার পর বণ্টন করা অসম্ভব হওয়ায় প্রয়োজনের তাগিদে তাকে অস্তিত্বে আসার পূর্বে ভাগ বাটোয়ারা করা বৈধ। পক্ষান্তরে যে সকল সুবিবধা অস্তিত্বে আসার পর স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে সে সকল সুবিবধাকে অস্তিত্বে আসার পূর্বে বণ্টন বৈধ হবে না। আলোচ্য ইবারতে এই নীতির অনুসরণেই একটি সূরতে মাসআলা পেশ করা হয়েছে।

সূরতে মাসআলা : মনে করি যায়েদ ও ওমরের অংশীদারিত্বে একটি খেজুর বাগান কিংবা অন্য কোনো ফলের বাগান অথবা এক খামাড় বকরির পাল আছে। এখন যদি তারা এ মর্মে চুক্তি করে যে, যায়েদ বাগানের কিছু গাছের পরিচর্যা করবে এবং তার ফলমূল থেকে অর্জিত মুনাফা ভোগ করবে। তদ্রূপ ওমরও কিছু গাছের পরিচর্যা করবে এবং তার ফলমূল থেকে অর্জিত মুনাফা ভোগ করবে। অথবা বকরির পালের ক্ষেত্রে অনুরূপ চুক্তি করল। তাহলে তাদের এ চুক্তি জায়েজ হবে না। কারণ এখানে গাছ থেকে যে ফলমূল উৎপন্ন হবে অথবা বকরি থেকে যে দুধ আসবে এগুলো তার থেকে অর্জিত এমন সুবিধা যা অস্তিত্বে আসার পর সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায় না; বরং কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। ফলে তার মূল সত্তাকে বণ্টন করা সম্ভব বিধায় অস্তিত্বে আসার পূর্বে তাকে বণ্টন করা যাবে না।

তবে হ্যাঁ, যদি কখনো এরূপ বণ্টনের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে এক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতির যে কোনো একটিকে অবলম্বন করে জায়েজ পন্থায় এ সুবিধা ভোগ করা যেতে পারে। যথা–

প্রথম পদ্ধতি : তারা যদি পালাক্রমে সুবিধা ভোগের জন্যে বণ্টন করে থাকে তাহলে যায়েদের ভোগাধিকারের সময় ওমর তার অংশটাকে যায়েদের কাছে বিক্রি করে দিবে এবং এই মৌসুমের পূর্ণফল থেকে অর্জিত মুনাফা যায়েদ ভোগ করবে এবং মৌসুমের শেষে পরবর্তী মৌসুম আসার পূর্বেই ওমরের কাছে যায়েদ নিজের অংশকে বিক্রয় করে দিবে এবং ফলমূল থেকে অর্জিত সকল মুনাফা ওমর ভোগ করবে। অনুরূপ কৌশল বকরির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : এক মৌসুমে যায়েদ বাগানে উৎপাদিত সকল ফলমূলের মুনাফা ভোগ করবে এবং এতে আমরের যে অংশটুকু রয়েছে তা হিসেব করে ঋণ হিসেবে নিজে নিয়ে নিবে। অতঃপর পরবর্তী মৌসুমে আমর এই মৌসুমে তার নিজস্ব অংশের সাথে পূর্ববর্তী মৌসুমের যায়েদের নিকট প্রাপ্য ঋণের পরিমাণসহ নিয়ে নিবে। আর এরূপ ঋণ নেওয়া বৈধ আছে। বিস্তৃত অংশ থেকে ঋণ দেওয়া যায়।

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَلْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَاطِلَةٌ اِعْلَمْ اَنَّ الْمُزَارَعَةَ لُغَةً مُفَاعَلَةٌ مِنَ الزَّرْعِ وَفِى الشَّرِيْعَةِ هِىَ عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ وَهِىَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا جَائِزَةٌ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ عَلٰى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ وَلِاَنَّهُ عَقْدُ شَرِكَةٍ بَيْنَ الْمَالِ وَالْعَمَلِ فَيَجُوْزُ اِعْتِبَارًا بِالْمُضَارَبَةِ وَالْجَامِعُ دَفْعُ الْحَاجَةِ فَاِنَّ ذَا الْمَالِ قَدْ لَا يَهْتَدِىْ اِلَى الْعَمَلِ وَالْقَوِىُّ عَلَيْهِ لَا يَجِدُ الْمَالَ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ اِلٰى اِنْعِقَادِ هٰذَا الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ دَفْعِ الْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَ دُوْدِ الْقَزِّ مُعَامَلَةً بِنِصْفِ الزَّوَائِدِ لِاَنَّهُ لَا اَثَرَ هُنَاكَ لِلْعَمَلِ فِىْ تَحْصِيْلِهَا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ شِرْكَةٌ ـ

অনুবাদ : [ইমাম কুদূরী (র.) বলেন,] ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশের বিনিময়ে মুযারা'আত বা বর্গাচাষ করা নাজায়েজ। জ্ঞাতব্য যে, مُزَارَعَةٌ শব্দটি আভিধানিকভাবে ز . ر . ع ধাতু থেকে উৎকলিত বাবে مُفَاعَلَة -এর مَصْدَرٌ [ক্রিয়ামূল]। শরিয়তের পরিভাষায় উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ে চাষাবাদের চুক্তি করাকে মুযারা'আত [বর্গাচাষ] বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, বর্গাচাষ [চুক্তি] ফাসিদ [অবৈধ]। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, তা জায়েজ। কেননা বর্ণিত আছে যে, اِنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ عَلٰى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ ـ অর্থাৎ, 'নবী করীম ﷺ খায়বরের অধিবাসীদের সাথে তাদের ভূমি হতে যে পরিমাণ ফল-ফলাদি উৎপাদিত হবে এর অর্ধেক তাকে তথা মুসলমানদেরকে দেওয়ার শর্তে বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।' অধিকন্তু বর্গাচাষ হলো, মাল ও শ্রম সমন্বিত একটি অংশীদারিত্বমূলক চুক্তি। কাজেই মুযারাবাত চুক্তির [যাতে মাল ও শ্রমের সমন্বয় রয়েছে] ন্যায় বর্গাচাষও জায়েজ। আর এ ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমন্বয়কারী (عِلَّتْ) কারণ হলো, মানুষের প্রয়োজন পূরণ। কেননা সম্পদশালী ব্যক্তি কখনো [এমনও হতে পারে যে,] শ্রমবিমুখ যে শ্রম দিতে জানে না। আবার শ্রম দিতে সক্ষম ব্যক্তিও [এমন হতে পারে যে, শ্রম দিয়ে কোনো কিছু উৎপাদন করার মতো] মাল পায় না। তাই এ দুই ধরনের লোকের মাঝে এরূপ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তরে বকরি, মুরগি ও রেশমের পোকা লাভের অর্ধেক প্রদানের চুক্তিতে বর্গা দেওয়ার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা এসব ক্ষেত্রে এই লাভ অর্জনের জন্য শ্রমের কোনো প্রভাব নেই। তাই এখানে কোনো অংশীদারিত্ব পাওয়া যায়নি।

وَلَهُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَهِيَ الْمُزَارَعَةُ لِأَنَّهُ إِسْتِيْجَارٌ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ عَمَلِهِ فَيَكُوْنُ فِيْ مَعْنٰى قَفِيْزِ الطَّحَّانِ وَلِأَنَّ الْأَجْرَ مَجْهُوْلٌ أَوْ مَعْدُوْمٌ وَكُلُّ ذٰلِكَ مُفْسِدٌ وَمُعَامَلَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهْلَ خَيْبَرَ كَانَ خَرَاجُ مُقَاسَمَةٍ بِطَرِيْقِ الْمَنِّ وَالصُّلْحِ وَهُوَ جَائِزٌ وَإِذَا فَسَدَتْ عِنْدَهُ فَإِنْ سَقَى الْأَرْضَ وَكَرَبَهَا وَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ فِيْ مَعْنٰى إِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ وَهٰذَا إِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِهِ فَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ وَالْخَارِجُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَلِلْآخَرِ الْأَجْرُ كَمَا فَصَّلْنَا إِلَّا أَنَّ الْفَتْوٰى عَلٰى قَوْلِهِمَا لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا وَلِظُهُوْرِ تَعَامُلِ الْأُمَّةِ بِهَا وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ بِالتَّعَامُلِ كَمَا فِي الْإِسْتِصْنَاعِ.

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, ঐ হাদীস যা [হুজুর ﷺ থেকে হযরত জাবের (রা.) সূত্রে] বর্ণিত আছে যে, إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ মুখাবারাহ থেকে নিষেধ করেছেন।' আর মুখাবারাহ হলো মুযারা'আ বা বর্গাচাষ। এছাড়াও তাতে ব্যক্তির শ্রম দ্বারা অর্জিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ে তাকে মজুর নিয়োগ করা হয়ে থাকে, ফলে তা অর্থগত দিক থেকে قَفِيْزُ الطَّحَّانِ -এর নামান্তর। এতদভিন্ন অন্যভাবে বলা যায় যে, এ [বর্গাচাষের] ক্ষেত্রে [শ্রমিকের] পারিশ্রমিক অজ্ঞাত থাকে অথবা থাকেই না, আর এ জাতীয় প্রত্যেকটি বিষয়ই চুক্তিকে বিনষ্টকারী। পক্ষান্তরে খায়বরবাসীর সাথে হুজুর ﷺ -এর চুক্তিটি ছিল খারাজে মুকাসামাহ [বা এমন ভূমি কর যা উৎপাদিত ফসল থেকে বণ্টন ভিত্তিক আদায় করা হতো।] যা ছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক ও সন্ধির খাতিরে। আর এরূপ খারাজ বা ভূমি কর নেওয়া বৈধ আছে। সুতরাং যখন ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট এরূপ চুক্তি বাতিল, তাই যদি কেউ [এরূপ চুক্তিভিত্তিক] জমিতে সেচ প্রদান করে এবং চাষাবাদ করে আর জমিতে কোনো ফসল উৎপাদিত না হয়। তাহলে সে [চাষী] তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। কারণ এটা একটি বাতিলকৃত ইজারা চুক্তির ন্যায়। আর এ পন্থা হলো বীজ জমির মালিকের পক্ষ থেকে হলে, আর যদি বীজ তার [শ্রমিকের] পক্ষ থেকে হয় তাহলে তাকে জমির সমপরিমাণ ইজারা বাবদ মূল্য প্রদান করতে হবে। আর উভয় সুরতেই উৎপাদিত ফসল বীজ প্রদানকারী পাবে। কারণ এটা তারই মালিকানা সম্পত্তির বর্ধিত অংশ। আর অপরজন পাবে পারিশ্রমিক। যেমনটি আমরা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তবে ফতোয়া সাহেবাইন (র.) -এর কথার উপর। মানুষের এরূপ চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন বিদ্যমান থাকার কারণে এবং উম্মতের মাঝে এরূপ প্রচলন প্রকাশিত হওয়ার কারণে। আর প্রচলনের দ্বারা কিয়াসকে বর্জন করা যায়। যেমনটি হয় অর্ডার নেওয়া মালের ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুযারা'আত-এর আভিধানিক অর্থ : مُزَارَعَةٌ [মুযারা'আত] শব্দটি আরবি زَرْعٌ মূলধাতু থেকে সংগৃহীত بَابِ مُفَاعَلَة -এর মাসদার [ক্রিয়ামূল]। زَرْعٌ শব্দের অর্থ হলো- اِلْقَاءُ الْحَبِّ فِى الْاَرْضِ 'জমিনে শস্য রোপণ করা।' আর بَابِ مُفَاعَلَة -এর বৈশিষ্ট্য হলো, তা দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কোনো কাজ করাকে বুঝায়। সেই হিসেবে مُزَارَعَةٌ শব্দের অর্থ দাঁড়ায়– দুজন মিলে যৌথভাবে শস্য রোপণ করা ও উৎপাদন করা।

মুযারা'আত-এর পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায়– هِىَ عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ অর্থাৎ, 'উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ে চাষাবাদের চুক্তি করাকে مُزَارَعَةٌ [মুযারা'আত] বলা হয়।

মুযারা'আত-এর হুকুম : ফুকাহায়ে কেরাম জমির মালিক ও শ্রমিকের যৌথ উদ্যোগে ফসল উৎপাদন করার [مُزَارَعَةٌ -এর] মোট তিনটি সুরত আলোচনা করেন। যথা–

প্রথম সুরত : একজনের জমি ও অপরজনের শ্রম দেওয়ার চুক্তিতে এই শর্তে চাষাবাদ করা হবে যে, উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাপ তাদের যে কোনো একজন নেবে। আর বাকি অংশ অপরজন নেবে। যেমন– জমির মালিক শ্রমিককে বলল যে, ঐ জমিটি তোমাকে চাষের জন্য দিয়ে দিলাম এই শর্তে যে, প্রতিবার চাষে উৎপাদিত ফসল থেকে আমাকে দশ মণ পরিমাণ দিয়ে দেবে। শরিয়তে দৃষ্টিতে مُزَارَعَةٌ [মুযারা'আত] -এর এ পন্থাটি সম্পূর্ণ বাতিল কোনো ফকীহের নিকটই তা জায়েজ নেই। কারণ তাতে সুদের সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা এ সুরতে এমনও হতে পারে যে, জমিতে শুধু কেবল ঐ পরিমাণ ফসলই উৎপাদিত হয়েছে যা মালিক শর্ত করে রেখেছেন। কিংবা তার চেয়েও কম। ফলে শ্রমিক পক্ষ ধোঁকাগ্রস্ত হবে। অনুরূপভাবে যদি জমির মালিক জমির নির্দিষ্ট কোনো একটি অংশকে নির্ধারণ করে দিয়ে বলে যে, এ অংশে যে পরিমাণ ফসল আসবে তা আমাকে দিয়ে দেবে। তাহলে এটাও উপরিউক্ত সুরতেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ নাজায়েজ হবে। কারণ হতে পারে যে, ঐ অংশ ব্যতীত জমিতে আর কোথাও ফসল হলো না। আর এমন ঘটনা ঘটা অসম্ভব না।

দ্বিতীয় সুরত : আর দ্বিতীয় সুরত হলো, জমির মালিক কর্তৃক শ্রমিকের নিকট জমিকে উৎপাদিত ফসল ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া। যেমন– মালিক বলল যে, এই জমিটি তোমাকে চাষাবাদের জন্য একশত টাকার বিনিময়ে প্রদান করলাম। মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ সকলেই এ সুরতকে জায়েজ বলেছেন।

তৃতীয় সুরত : আর তৃতীয় সুরত হলো, জমিতে উৎপাদিত ফসলের অনির্ধারিত অংশ প্রদানের শর্তে চাষাবাদের জন্য দেওয়া। যেমন– মালিক বলল, এই জমিটি তোমাকে চাষাবাদের জন্য দিলাম এই শর্তে যে, তার উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ অথবা অর্ধেক ফসল আমাকে দিয়ে দেবে। আর বাকি অংশ তুমি ভোগ করবে। উপরিউক্ত কিতাবের ইবারতে এই সুরতটির কথাই বলা হয়েছে।

مُزَارَعَةٌ বা বর্গাচাষের এই সুরত জায়েজ হবে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের চারটি মত রয়েছে। যথা–

১. এরূপ বর্গাচাষ কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াই জায়েজ হবে। এ মত পোষণ করেন হানাফী মাযহাবের মধ্য থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের মধ্য থেকে ইবনুল মুনযির, আল্লামা খাত্তাবী ও আল্লামা মাওয়ারদী (র.) ও আরো কয়েকজন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) -এর মাযহাবও এটাই।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.), হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) -এর অভিমত এটাই। এছাড়া হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) পরিবারের সকল ব্যক্তিবর্গ এবং হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, ত্বাউস, আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ, মূসা ইবনে ত্বালহা, ইমাম যুহরী ও ইবনে আবী লাইলাসহ আরো অনেক তাবেয়ীগণ এ মত পোষণ করতেন।

২. এরূপ বর্গাচাষ [বিনা শর্তে] বাতিল এবং নাজায়েজ। এ মতটি হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম যুফার (র.) -এর। হযরত ইকরামা, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখয়ী (র.) -এর থেকেও এরূপ অভিমতের বর্ণনা পাওয়া যায়।

৩. তৃতীয় মত হলো, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর। তিনি বলেন যে, কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে এরূপ বর্গাচাষ জায়েজ হবে। শর্তসমূহ নিম্নরূপ–

ক. مُزَارَعَةٌ চুক্তিটি مُسَاقَاةٌ [মুসাকাত] -এর চুক্তির অধীনে হতে হবে।

খ. مُسَاقَاةٌ ও مُزَارَعَةٌ উভয় চুক্তির শ্রমিক একই ব্যক্তি হতে হবে।

গ. مُسَاقَاةٌ ও مُزَارَعَةٌ উভয়টি চুক্তি একই সাথে হতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন চুক্তিতে হলে مُزَارَعَةٌ জায়েজ হবে না।

ঘ. চুক্তির মাঝে مُزَارَعَةٌ -এর কথা مُسَاقَاةٌ -এর পূর্বে উল্লেখ করা যাবে না।

ঙ. ভিন্ন ভিন্ন চুক্তিতে مُسَاقَاةٌ ও مُزَارَعَةٌ [বাগানে পানি দেওয়া ও খালি জমি চাষাবাদ করা] অসম্ভব হতে হবে।

চ. مُزَارَعَةٌ চুক্তিতে বীজ দেওয়ার দায়িত্ব জমির মালিকের উপর হতে হবে। শ্রমিকের উপর হতে পারবে না।

ছ. কারো কারো মতে, বাগানে লাগানো আছে এমন জমির তুলনায় খালি জমির পরিমাণ কম হতে হবে। তবে বিশুদ্ধ দু-মত অনুযায়ী এই শর্তটি আবশ্যক নয়।

৪. চুতর্থ অভিমত হলো, ইমাম মালেক (র.) -এর। তিনি বলেন, مُسَاقَاةٌ চুক্তির অধীনে হলে مُزَارَعَةٌ বা বর্গাচাষ চুক্তি বৈধ হবে। অন্যথায় তা বৈধ নয়। তবে مُسَاقَاةٌ চুক্তির অধীনে مُزَارَعَةٌ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বাগানের খালি জমির পরিমাণ গাছ লাগানো আছে এরূপ জমির পরিমাণের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের বেশি না হতে হবে।

মোটকথা হলো, উৎপাদিত ফসলের আংশিক দেওয়ার শর্তে বর্গাচাষ চুক্তি ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.) -এর মতে জায়েজ নেই [তবে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট مُسَاقَاةٌ -এর আওতাধীন হলে কিছু শর্ত সাপেক্ষে তার বৈধতার সুরত রয়েছে।]

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে তা বিনা শর্তে জায়েজ। এই ভিত্তিতে মূল মাযহাব হলো দুটি– ১. নাজায়েজ, ২. জায়েজ।

নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে দলিলসমূহ : যে সকল ওলামায়ে কেরাম ও ইমামগণ উপরিউক্ত বর্গাচাষ পন্থাকে নাজায়েজ বলেন, তাঁদের দলিল নিম্নরূপ–

١. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوْا يَزْرَعُوْنَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

অর্থাৎ হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জমির উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ, অথবা এক চতুর্থাংশ কিংবা অর্ধেক ফসল দেওয়ার শর্তে বর্গাচাষ করতেন। তখন হুজুর ﷺ বললেন, কারো কাছে কোনো জমি থাকলে সে যেন তা নিজেই চাষ করে, অথবা কাউকে চাষ করার জন্য এমনিতেই দিয়ে দেয়, যদি তা করতে না পারে, তাহলে সে যেন নিজের জমি নিজের কাছেই রাখে। –[বুখারী শরীফ : হাদীস নং ২৩৪০, মুসলিম শরীফ : হাদীস নং ৩৯১৮]

২. মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। –[দ্রষ্টব্য : হাদীস নং ৩৯৩১]

৩. এছাড়া হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন–

كُنَّا لَا نَرَى بِالْخَبْرِ بَأْسًا حَتّٰى كَانَ عَامَ أَوَّلٍ، فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ.

অর্থাৎ আমরা বর্গাচাষকে কোনো রূপ খারাপ মনে করতাম না। এক পর্যায়ে রাফে ইবনে খাদীজ বললেন যে, হুজুর ﷺ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। –[মুসলিম– ৩৯৩৫]

৪. অনুরূপভাবে হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) থেকে এ হাদীসটি আরো বিস্তারিতভাবে মুসলিম শরীফ ও আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। যথা–

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّ عُمُوْمَتَهُ اَتَاهُ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اَنْفَعُ لَنَا وَاَنْفَعُ. قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ وَلَا يُكَارِيْهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ وَبِطَعَامٍ مُسَمًّى - (مُسْلِم رَقْم : ٣٩٤٥، أَبُوْ دَاوُدَ : ٣٣٩٦)

অর্থাৎ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর যুগে বর্গাচাষ করে থাকতাম। অতঃপর তিনি বলেন, একদা তাঁর চাচা তার কাছে এসে বললেন, রাসূল ﷺ এমন একটি বিষয় থেকে নিষেধ করলেন, যা আমাদের জন্যে উপকারী ছিল, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য আমাদের জন্য এর চেয়েও অধিক বেশি উপকারী। তিনি বলেন, আমরা বললাম, সেটা কি বিষয়? তিনি বললেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, কারো কাছে কোনো জমি থাকলে সে যেন তা নিজেই চাষ করে অথবা তার অন্য কোনো ভাইকে চাষ করতে দেয় এবং এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ কিংবা নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে যেন ভাড়া না দেয়। –[মুসলিম– ৩৯৪৫, আবূ দাউদ– ৩৩৯৫]

৫. এছাড়া হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ অর্থাৎ হুজুর ﷺ বর্গাচাষ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

এসব হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের আলোচ্য মাসআলায় বর্ণিত বর্গাচাষ পদ্ধতি নাজায়েজ। আর এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এ বর্গাচাষ পদ্ধতিকে নাজায়েজ বলেছেন।

৬. এছাড়া যদি উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ে বর্গাচাষ করা হয় তাহলে এটা হবে শ্রমিকের শ্রম দ্বারা অর্জিত বস্তুর মাধ্যমে তার মজুরি আদায় করা। আর এটা হবে قَفِيْزُ الطَّحَّانِ -এর মাসআলার ন্যায়। আর হাদীস শরীফে আছে যে, نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَفِيْزِ الطَّحَّانِ 'হুজুর ﷺ قَفِيْزُ الطَّحَّانِ থেকে নিষেধ করেছেন।' তাই বর্গাচাষ ও নিষিদ্ধ হবে।

قَفِيْزُ الطَّحَّانِ -এর ব্যাখ্যা হলো, যেমন কেউ তার কিছু গম পেষণ করে আটা বানানোর জন্য কাউকে মজুর রাখল। এখন যদি তার পেষণকৃত আটা থেকে তার মজুরি এভাবে নির্ধারণ করে যে, প্রতি মন আটা পেষণ করার বিনিময়ে তোমাকে দুই কেজি করে আটা দেওয়া হবে, তাহলে এটা নাজায়েজ হবে।

৭. এছাড়া এরূপ বর্গাচাষের ক্ষেত্রে শ্রমিকের পারিশ্রমিক অজ্ঞাত থাকে। আর অজ্ঞাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করা হলে সে নিয়োগ বৈধ নয়।

এ সকল কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.) উক্ত বর্গাচাষ পন্থাকে বৈধ বলেননি।

জায়েজ হওয়ার পক্ষে দলিল : যে সকল ওলামায়ে কেরাম বর্গাচাষ পন্থাকে জায়েজ বলেন, তাঁদের দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীস– ١. اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ.

অর্থাৎ হুজুর ﷺ খায়বরের অধিবাসী ইহুদিদের কাছে খায়বরের জমিতে উৎপাদিত ফসল বা ফলমূলের অর্ধেক দেওয়ার শর্তে বর্গাচাষের জন্য দিয়েছিলেন। –[মুসলিম]

অতএব যদি এরূপ বর্গাচাষ জায়েজ না হতো তাহলে রাসূল ﷺ তা কখনো করতেন না। সুতরাং বর্গাচাষ জায়েজ হওয়ার জন্য এই হাদীসটি যথেষ্ট। আর এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এর জায়েজের পক্ষে ফতোয়া দেন এবং নবী করীম ﷺ -এর যুগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সমস্ত উম্মত এরূপ বর্গাচাষের উপর আমল করে আসছে।

এমনকি ইমাম বুখারী (র.) بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهٖ নামক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেন–

قَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ : مَا بِالْمَدِيْنَةِ اَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ اِلَّا يَزْرَعُوْنَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ .

অর্থাৎ হযরত আবূ জা'ফর বাকের (র.) থেকে কায়েস ইবনে মুসলিম নকল করে বলেন যে, মদিনার এমন কোনো মুহাজিরের ঘর ছিল না, যে ঘরের অধিবাসীরা বর্গাচাষ করত না।

২. এছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর নিম্নোক্ত হাদীসটির মাধ্যমেও কেউ কেউ বর্গাচাষ জায়েজ হওয়ার পক্ষে দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন–

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَخْوَانِنَا النَّخْلَ، قَالَ لَا، فَتَكْفُوْنَا الْمُؤْنَةَ نُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا .

অর্থাৎ আনসারীগণ হুজুর ﷺ -এর কাছে আবেদন করলেন যে, আমাদের সম্পদগুলোকে আমাদের ও আমাদের মুহাজির ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দিন। রাসূল ﷺ [তা করতে অসম্মতি জানালেন এবং] বললেন, না। তখন আনসারগণ মুহাজিরদেরকে বললেন, তোমরা বাগানে আমাদের পরিবর্তে পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রম ব্যয় করে যাবে, বিনিময়ে আমরা তোমাদেরকে উৎপাদিত ফলে শরিক করব। তখন মুহাজিরগণ বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

এটা ছিল আনসারী সাহাবীগণের পক্ষ থেকে মুহাজিরদের প্রতি বর্গাচাষের প্রস্তাব, যা মুহাজিররা মেনে নিলেন। হুজুর ﷺ ও তা থেকে নিষেধ করলেন না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তখনও জায়েজ ছিল।

৩. এছাড়া কিয়াসের দৃষ্টিতেও বর্গাচাষ জায়েজ হওয়ার কথা। কারণ মানুষ কখনো এমন হয়ে থাকে যার কাছে জমি আছে কিন্তু তাতে শ্রম দিয়ে তার চাষাবাদ করার মতো তার সামর্থ্য নেই। আবার এমন লোকও রয়েছে যার শ্রম দেওয়ার সামর্থ্য আছে কিন্তু চাষাবাদ করার মতো কোনো জমি নেই। তাই এই দুই ধরনের মানুষের যৌথ উদ্যোগে জমি চাষাবাদের মাধ্যমে নিজ নিজ অর্থনৈতিক প্রয়োজন পুরা করতে মানুষ বাধ্য। আর যদি এ পন্থা না জায়েজ হয় তাহলে অনেক জমি তার মালিক কর্তৃক শ্রম দেওয়ার অভাবে পতিত পরে থাকবে এবং অনেক শ্রমজীবীও জমির অভাবে বেকারত্বে ভুগবে এবং রাষ্ট্রে দেখা দেবে অর্থনৈতিক অভাব। তাই এই অর্থনৈতিক দৈন্যতা থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচানোর লক্ষ্যে উপরিউক্ত বর্গাচাষ পন্থা জায়েজ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আর এরূপ প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেই সকল ইমামগণ মুদারাবা ভিত্তিক ব্যবসাকে বৈধ বলে থাকেন। তাই এর উপর কিয়াস করে বর্গাচাষকেও বৈধ বলা উচিত।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রশ্ন : এ পর্যায়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ওলামায়ে কেরামের উভয় পক্ষ তাঁদের নিজ নিজ মাযহাবের সপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ কিছু হাদীস ও যুক্তির উদ্ধৃতি দিলেন। তাহলে তাঁরা কি তাঁদের প্রতিপক্ষরা যে সকল হাদীস পেশ করেছেন তা জানতেন না? যদি জেনেই থাকেন তাহলে সেগুলোর ব্যাপারে তাঁদের মন্তব্য কি?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে বলব, উভয় পক্ষের দলিল হিসেবে আমরা যে সকল হাদীসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করলাম, বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসগুলো পারস্পরিকভাবে বিপরীতমুখী হওয়ার কারণে প্রত্যেক ইমামই তাঁদের নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুসারে এক প্রকারের হাদীসকে এই মাসআলার মূল সমাধান মনে করেছেন এবং এর বিপরীত হাদীসগুলোকে বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শনের ভিত্তিতে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা করে তার উপরও আমল করতে চেষ্টা করেন। যাতে হাদীসের পারস্পরিক বৈপরীত্য দূর হয়ে যায়। কারণ মৌলিকভাবে রাসূলের হাদীস একটি অপরটির বিপরীত হতে পারে না। বরং আমাদের জ্ঞান ও বুঝের স্বল্পতার দরুন আমাদের কাছে তা বিপরীতমুখী মনে হয়।

সেই ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.) مُزَارَعَة নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোকে এই মাসআলার মূল সমাধান হিসেবে মেনে নিয়ে مُزَارَعَة নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া দেন। আর খায়বরের ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসের সাথে যেন তার কোনো বৈপরীত্য না থাকে সে মতে তার ভিন্ন মর্ম নির্ধারণ করেন।

সুতরাং ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, খায়বরের ঘটনা এবং আনসারীদের ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসে مُزَارَعَة টা ছিল مُسَاقَاة -এর অধীনে। আর مُسَاقَاة -এর অধীনে مُزَارَعَة চুক্তি আমাদের নিকটও বৈধ। অতঃপর আমদের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দুই প্রকার হাদীসের মাঝে আর কোনো বৈপরীত্য থাকে না।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট তার ব্যাখ্যা হলো–

১ খায়বরবাসীদের সাথে مُزَارَعَةٌ চুক্তি সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তা মূলত مُزَارَعَةٌ ই ছিল না। বরং তা ছিল خَرَاج مُقَاسَمَة অর্থাৎ খায়বর বিজয়ের পর ইহুদিদেরকে হুজুর ﷺ দয়া করে সেখানেই অবস্থান করতে দেন এবং তাদের উপর মাথা পিছু বাৎসরিক টেক্স ধার্য করার পরিবর্তে উৎপাদিত ফসলের উপর টেক্স ধার্য করে দেন। যেন সেখানকার সকল জমি চাষের ফলে যে ফসল উৎপাদিত হবে তার অর্ধেক মুসলমানদের দিয়ে দিতে হবে। আর মুসলিম শাসকের জন্য তার বিজীত এলাকায় মাথা পিছু টেক্স خَرَاجُ الْوَظِيفَة কিংবা خَرَاج مُقَاسَمَة ধার্য করার অধিকার থাকে।

তবে খায়বরের ঘটনার সাথে এ ব্যাখ্যাটি যথোপযোগী নয়। কারণ خَرَاج مُقَاسَمَة -এর ব্যাখ্যাটি কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন খায়বরের সকল জমির মালিকানা ইহুদিদের হাতে থাকে। পক্ষান্তরে জমি যদি মুসলমানদের মালিকানাধীন হয় তাহলে তাতে خَرَاجْ টেক্স ধার্য করবে কিভাবে? আর বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, খায়বরের জমি মুসলমানদের মালিকানাধীন ছিল। ইহুদিদের মালিকানায় নয়। যেমন–

১. মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর বর্ণনায় রয়েছে–

وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَارَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا .

২. অনুরূপ আবূ দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর হাদীসে রয়েছে–

اِفْتَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَقَالَ اَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ فَأَعْطَانَاهَا عَلٰى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ ....

৩. আবূ দাউদ শরীফে হযরত বাশীর ইবনে ইয়াসার (রা.) -এর বর্ণনায় রয়েছে–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَهَا سِتَّةً وَثَلَاثِيْنَ سَهْمًا جَمْعًا ..... فَلَمَّا صَارَتِ الْاَمْوَالُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ يَكْفُوْنَهُمْ عَمَلَهَا فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْيَهُوْدَ فَعَامَلَهُمْ .

এ সকল বর্ণনা থেকে সমষ্টিগতভাবে একথা বের হয়ে আসে যে, খায়বর বিজয়ের পর মুসলমানগণ সেখানকার সর্বপ্রকারের জমি-জমার মালিকানা লাভ করে এবং রাসূল ﷺ সকলের মাঝে তা বণ্টনও সম্পন্ন করে ফেলেন, তারপর যখন মুসলমানগণ নিজ নিজ অংশ নিয়ে নেওয়ার পর দেখতে পেল যে, তাদের জমি চাষ করার মতো কোনো লোক নেই। অপর দিকে সে সকল জমি চাষের ব্যাপারে ইহুদিদের অভিজ্ঞতাও ছিল বেশি এবং তারা রাসূল ﷺ -এর কাছে এ মর্মে আবেদনও করল যে, আমরা এ সকল জমি অর্ধেক ফসল দেওয়ার বিনিময়ে চাষ করে দেব। এই শর্তে আমাদেরকে খায়বর থেকে বের করে না দিয়ে এখানেই থাকতে দেওয়া হোক। তখন হুজুর ﷺ তাদের এ আবেদন গ্রহণ করলেন এই শর্তে যে, আমাদের যত দিন ইচ্ছা তোমাদেরকে এখানে থাকতে দেব এবং যখন ইচ্ছা তখন তোমাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব। সুতরাং এই শর্ত সাপেক্ষেই তাদের সাথে বর্গাচাষ চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। তাই এটাকে خَرَاج مُقَاسَمَة বলে ব্যাখ্যা করা মোটেও শুদ্ধ হবে না।

২. তবে কোনো কোনো হানাফী আলেম ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পক্ষে খায়বরের ঘটনার ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, খায়বরের ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, مُزَارَعَةٌ জায়েজ। আর অন্যান্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, তা নাজায়েজ। সুতরাং হাদীস দুটি পারস্পরিকভাবে বিরোধপূর্ণ হওয়ায় এক প্রকারের হাদীসকে অপর প্রকারের হাদীসের উপর تَرْجِيْح [প্রাধান্য] দিতে হবে। আর আমরা দেখি যে, খায়বরের হাদীসটি হলো حَدِيْث فِعْلِيْ আর অন্যান্য হাদীসগুলো হলো حَدِيْث قَوْلِيْ আর حَدِيْث قَوْلِيْ টি حَدِيْث فِعْلِيْ -এর উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বিধায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) খায়বরের হাদীসকে مَرْجُوْح [মারজূহ] হিসেবে বাদ দিয়ে নাজায়েজ হওয়ার পক্ষের হাদীসগুলো গ্রহণ করেন।

তবে এই উত্তরও এখানে চলবে না। কারণ খায়বরের হাদীসে- " ... نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذٰلِكَ ... وَلَهُمُ الشَّطْرُ " পর্যন্ত এটা قَوْل [কওল] ছিল। তাই তাকে শুধু فِعْلِيٌّ বলা যাবে না। এ ছাড়াও এটাই কিভাবে সম্ভব হয় যে, হুজুর ﷺ একটি বিষয়ে নিষেধ করার পর নিজে আবার তার উপর আমল করবেন এবং সারা জীবনই তাঁর কথার বিপরীত আমলের উপর অটল থাকবেন? অথচ উসূলে ফিকহের নীতি হলো, যে فِعْل -এর উপর নিয়মিত আমল পাওয়া যায় তা قَوْل -এরই মতো। তাই খায়বরের কাহিনীকে فِعْلِيٌّ বলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

৩. আবার কেউ কেউ এই উত্তর দিয়ে থাকেন যে, খায়বরের কাহিনী থেকে জায়েজ প্রমাণিত হয়। আর এর বিপরীত অন্যান্য হাদীস থেকে নাজায়েজ প্রমাণিত হয়। আর কায়দা হলো জায়েজ প্রমাণিত হয় এরূপ বিধানের অপেক্ষা নাজায়েজ প্রমাণকারী হাদীস প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

তবে এ উত্তরও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এ কায়দা কেবল ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিপরীতমুখী দুটি হাদীসের কোনটি পরের তা জানা না থাকে। অথচ এখানে খায়বরের ঘটনা হলো পরের তা নিশ্চিতভাবে জানা রয়েছে। কারণ রাসূলের ইন্তেকাল পর্যন্ত ঐ বর্গাচাষ চুক্তি বহাল ছিল। আর পরের বিধান কোনটি তা জানা গেলে তাই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

মোটকথা, খায়বরের ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পক্ষে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তা সন্তোষজনক না হওয়ায় মুতাআখখিরীন হানাফী ওলামায়ে কেরাম এ মাসআলায় সাহেবাইনের মতের উপর ফতোয়া প্রদান করেন। কারণ রাসূল ﷺ -এর যুগ থেকে নিয়ে তাবেয়ীগণের যুগের শেষ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে এরূপ مُزَارَعَةٌ বা বর্গাচাষের প্রচলন ছিল। আর আজও তা বহাল আছে। আর সমাজে কোনো বিষয় প্রচলন থাকলে এর ভিত্তিতে কিয়াসকে বর্জন করা যায়। তাই এখানে শ্রমিকের পারিশ্রমিকের অজ্ঞতার কারণে مُزَارَعَةٌ -কে নাজায়েজ বলা যাবে না। যেমনিভাবে إِسْتِصْنَاعٌ তথা অর্ডারের মালের ক্ষেত্রে সমাজের প্রচলন থাকার কারণে (مَبِيْع) বিক্রয় পণ্যের অজ্ঞতার কারণে তাকে নাজায়েজ বলা হয় না।

বাকি রইল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে উদ্ধৃত مُزَارَعَةٌ নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সাহেবাইন কি বলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, যে সকল হাদীসের মধ্য থেকে কোনো হাদীসেই مُزَارَعَةٌ -এর আলোচ্য সুরত [অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের جُزْء شَائِعٌ -এর ভিত্তিতে বর্গাচাষ করা] -কে নিষেধ করা হয়নি; বরং কিছু হাদীসে مُزَارَعَةٌ -এর প্রথম সুরত [তথা জমির মালিকের বা শ্রমিকের জন্যে নির্ধারিত অংশ বরাদ্দ থাকার শর্তে বর্গাচাষ করা] -কে নিষেধ করা হয়েছে। যা সাহেবাইনসহ সকল ইমামদের নিকটই নিষিদ্ধ, তা জায়েজ হওয়ার কথা কেউ বলেন না। আর অন্যান্য সব হাদীসে مُزَارَعَةٌ -এর প্রতি স্বাভাবিক যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা দ্বারা مُزَارَعَةٌ -কে হারাম করা উদ্দেশ্য নয়; বরং পরামর্শমূলক ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিষেধ করেছিলেন। তাই সে نَهْي টা نَهْيٌ تَحْرِيْمٌ নয়; বরং نَهْيٌ تَنْزِيْهٌ وَاِرْشَادٌ ছিল।

উপরে বর্ণিত পাঁচটি হাদীসের মধ্যে তৃতীয় ও পঞ্চম হাদীসে مُزَارَعَةٌ -এর বিশেষ পন্থা তথা প্রথম সুরতকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ হাদীসের রাবী স্বয়ং রাফে ইবনে খাদীজ থেকেই এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফে ৩৯৫২ ও ৩৯৫৩ নং হাদীসে রয়েছে-

كُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ عَلٰى اَنَّ لَنَا هٰذِهٖ وَلَهُمْ هٰذِهٖ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ هٰذِهٖ وَلَمْ تُخْرِجْ هٰذِهٖ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ وَاَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا .

অর্থাৎ আমরা এইভাবে জমি বর্গাচাষের জন্য এইভাবে দিতাম যে, জমির এই অংশের ফসল আমার হবে আর ঐ অংশের ফসল তোমার হবে। অবস্থা দৃষ্টে দেখা যায় কখনো এমন হতো যে, এ অংশে তো ফসল জন্মাত আর ঐ অংশে জন্মাত না। তখন রাসূল ﷺ আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। তবে মুদ্রার বিনিময়ে চাষাবাদ করানো থেকে তিনি আমাদেরকে কখনো নিষেধ করেননি।

এছাড়া নাসায়ী শরীফের ৩৯৬৩ নং হাদীসে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে এবং আবূ দাউদ শরীফের ৩৩৯১ নং হাদীসে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

আর উপরিউক্ত ১, ২ ও ৪ নং হাদীসে مُزَارَعَةٌ সম্পর্কে যে নিষেধ বর্ণিত হয়েছে তার দ্বারা مُزَارَعَةٌ -কে হারাম সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। আর এর প্রমাণ পাওয়া যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আবূ দাউদ শরীফের ৩৩৮৯ নং হাদীস থেকে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلٰكِنْ قَالَ لِيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُوْمًا .

অর্থাৎ হযরত আমর ইবনে দীনার বলেন, ইবনে ওমর (রা.)-কে আমি বলতে শুনলাম যে, আমরা এত দিন যাবৎ مزارعة তে কোনো সমস্যা মনে করতাম না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রাফে ইবনে খাদীজকে একথা বলতে শুনলাম যে, হুজুর ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন। আমর ইবনে দীনার বলেন, একথা আমি তাউস (র.)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে বলেছেন যে, রাসূল ﷺ এ থেকে নিষেধ করেননি; বরং একথা বলেছেন যে, তোমাদের কেউ নিজের জমি অন্যকে নির্দিষ্ট ভাড়া নিয়ে দেওয়ার তুলনায় যেন এমনিতেই দিয়ে দেয়। এটা তার জন্য অনেক উত্তম।

এ হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, যে সকল হাদীস এক তৃতীয়াংশ এক চতুর্থাংশের বিনিময়ে مُزَارَعَةٌ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এসব ছিল কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য। নিষেধ বা হারাম করা উদ্দেশ্য ছিল না।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে مُزَارَعَةٌ -কে যে قَفِيْزُ الطَّحَّانِ -এর সাথে কিয়াস করা হয়েছে সেই কিয়াস এখানে প্রযোজ্য হবে না। এর কারণ হলো قَفِيْزُ الطَّحَّانِ -এর বিষয়টি সরাসরি خِلَافُ قِيَاسٍ নস দ্বারা প্রমাণিত। আর নস যদি خِلَافِ قِيَاسٍ [কিয়াস সম্মত না] হয় তাহলে তার উপর অন্য কোনো মাসআলাকে কিয়াস করা যায় না।

এতদভিন্ন مزارعة -এর সামাজিকভাবে ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। আর কায়দা বা নিয়ম হলো– সমাজে যে জিনিসের প্রচলন থাকে তাতে নস না থাকলে সামাজিক প্রচলনটাই তা জায়েজ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এখানে বিশেষভাবে এ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট مُزَارَعَةٌ নাজায়েজ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এটা করা একেবারে নিষিদ্ধ এবং কেউ করলে সে গুনাহগার হবে; বরং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তা নাজায়েজ হওয়ার অর্থ হলো 'তা মাকরূহ' তিনি কঠিনভাবে مُزَارَعَةٌ থেকে কখনো নিষেধ করেননি। কারণ ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) স্বয়ং নিজেই مُزَارَعَةٌ সংক্রান্ত অনেক মাসআলার সমাধান দিয়েছেন, [যা আমরা হিদায়া গ্রন্থে ও অন্যান্য গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকি।] খুলাসাতুল ফাতওয়ায় একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা মুযারা'আতকে জায়েজ বলেন, তাদের মতানুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ সকল মাসআলা ইস্তেম্বাত করেছেন। কারণ তিনি জানতেন যে, মানুষ তার ফতোয়াকে এ ব্যাপারে গ্রহণ করবে না। –[শামী ৫/১৭৪]

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, হিদায়া গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর নিকট مُزَارَعَةٌ জায়েজ নেই, অথচ ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এ সংক্রান্ত অনেক মাসআলার সমাধান পেয়ে থাকি। আবার কারো কারো বক্তব্যে একথাও পেয়ে থাকি যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) জানতেন যে, মানুষ তার ফতোয়া মানবে না। বিধায় তিনি এ সকল মাসআলা যারা জায়েজ বলেন তাদের মতানুসারে ইস্তেম্বাত করেছেন। এসব কথা আমার বহুদিন যাবৎ বুঝে আসত না। হঠাৎ حَاوِي الْقُدْسِيْ [হাবী আল কুদসী] গ্রন্থে দেখতে পেলাম– كَرِهَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ [ইমাম আবূ হানীফা (র.) তা অপছন্দ করতেন, কঠোরভাবে তিনি তা নিষেধ করেননি।] একথাটি পাওয়ার পর আমার মনে প্রশান্তি পেলাম এবং কেন তিনি মুযারা'আতকে বাতিল বলা সত্ত্বেও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলা ইস্তেম্বাত করেন তার হেতু বুঝে আসল যে, কোনো কোনো বিষয় কখনো বাতিল হয় কিন্তু তা করলে গুনাহ হয় না। আর এরূপ বিষয়ের জন্যও কিছু আহকাম নির্ধারণ করে রাখা উচিত। কারণ যদি কেউ তা করে তাহলে তার সমাধান কি হবে তা জানা থাকা আবশ্যক। –[ফয়যুল বারী ৩/২৯৫]

ثُمَّ الْمُزَارَعَةُ لِصِحَّتِهَا عَلٰى قَوْلِ مَنْ يُجِيْزُهَا شُرُوْطٌ أَحَدُهَا كَوْنُ الْأَرْضِ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ لَا يَحْصُلُ دُوْنَهُ وَالثَّانِىْ أَنْ يَكُوْنَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْمُزَارِعُ مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِهٖ لِأَنَّ عَقْدًا مَا لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنَ الْأَهْلِ وَالثَّالِثُ بَيَانُ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلٰى مَنَافِعِ الْأَرْضِ أَوْ مَنَافِعِ الْعَامِلِ وَالْمُدَّةُ هِىَ الْمِعْيَارُ لَهَا لِتُعْلَمَ بِهَا وَالرَّابِعُ بَيَانُ مَنْ عَلَيْهِ الْبَذْرُ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ وَإِعْلَامًا لِلْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَنَافِعُ الْأَرْضِ أَوْ مَنَافِعُ الْعَامِلِ وَالْخَامِسُ بَيَانُ نَصِيْبِ مَنْ لَا بَذْرَ مِنْ قِبَلِهٖ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ عِوَضًا بِالشَّرْطِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْمًا وَمَا لَا يُعْلَمُ لَا يُسْتَحَقُّ شَرْطًا بِالْعَقْدِ وَالسَّادِسُ أَنْ يُخَلِّىَ رَبُّ الْأَرْضِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَامِلِ حَتّٰى لَوْ شُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الْأَرْضِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ لِفَوَاتِ التَّخْلِيَةِ وَالسَّابِعُ الشَّرْكَةُ فِى الْخَارِجِ بَعْدَ حُصُوْلِهٖ لِأَنَّهُ يَنْعَقِدُ شَرْكَةً فِى الْاِنْتِهَاءِ فَمَا يَقْطَعُ هٰذِهِ الشَّرْكَةَ كَانَ مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ وَالثَّامِنُ بَيَانُ جِنْسِ الْبَذْرِ لِيَصِيْرَ الْأَجْرُ مَعْلُوْمًا .

অনুবাদ : অতঃপর যারা বর্গাচাষকে জায়েজ বলেন, তাদের মতে বর্গাচাষের বিশুদ্ধতার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে প্রথম শর্ত হলো, জমি চাষাবাদ উপযোগী হতে হবে। কেননা এছাড়া বর্গাচাষের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। দ্বিতীয় শর্ত হলো, জমির মালিক ও চাষী উভয়েই আকদ তথা বর্গাচাষের চুক্তি সম্পাদন করার যোগ্য হতে হবে। এ শর্তটি কেবল বর্গাচাষের সাথেই খাস নয়। কেননা চুক্তি সম্পাদনকারী যোগ্য না হলে কোনো আকদ বা চুক্তিই সহীহ হবে না। তৃতীয় শর্ত হলো, বর্গাচাষের সময়সীমা উল্লেখ থাকতে হবে। কেননা এটা ভূমির কিংবা চাষীর মুনাফার উপর একটি চুক্তি। আর সময়সীমা হলো সেই মুনাফার মাপকাঠি, যার দ্বারা ঐ মুনাফা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। চতুর্থ শর্ত হলো, বীজ কে দেবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। ঝগড়া খতম করার জন্য এবং কোন জিনিসের উপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা কি ভূমির মুনাফা না চাষীর মুনাফা এ সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য। পঞ্চম শর্ত হলো, যার পক্ষ হতে বীজ সরবরাহ করা হবে না, তার অংশ কি পরিমাণ হবে, তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। কেননা সে তো শর্তের কারণেই তার অংশের হকদার হয়ে থাকে। তাই তার অংশটি জানা থাকা আবশ্যক। কারণ যে জিনিস অজ্ঞাত, আকদের মধ্যে শর্ত করার ভিত্তিতে তার হকদার হওয়া যায় না। ষষ্ঠ শর্ত হলো, জমির মালিক কর্তৃক জমিকে সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত করে দেওয়া। সুতরাং যদি জমির মাঝে মালিকের কর্মের শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে জমি সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত না হওয়ার কারণে আকদ বা চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। সপ্তম শর্ত হলো, ফসল উৎপাদনের পর উৎপাদিত ফসলে উভয়ের শরিকানা থাকতে হবে। কেননা পরিণামে বর্গাচাষ হচ্ছে একটি অংশীদারি চুক্তি। সুতরাং যে জিনিস এ অংশীদারিত্বকে বাতিল করবে তা চুক্তিকেও বিনষ্ট করে দেবে। অষ্টম শর্ত হলো, বীজ কি হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। যাতে বিনিময় জানা হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যারা مُزَارَعَةٌ [বর্গাচাষ] -কে জায়েজ বলেন, তাদের নিকট তা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মোট আটটি শর্ত রয়েছে। শর্তসমূহ নিম্নরূপ–

১. জমি চাষাবাদ উপযোগী হওয়া।
২. জমির মালিক ও শ্রমিক উভয়েই আকদ বা চুক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত হওয়া।
৩. মুযারা'আত -এর সময়সীমা নির্ধারিত থাকা।
৪. বীজ কে দেবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা।
৫. যে বীজ দিচ্ছে না সে ফসলের কি পরিমাণ অংশ পাবে তা উল্লেখ থাকা।
৬. শ্রমিকের জন্য জমিকে সম্পূর্ণ অবমুক্ত করে দেওয়া।
৭. উৎপাদিত ফসলে উভয়ে শরিক থাকা।
৮. বীজ নির্ধারিত থাকা।

এ আটটি শর্তের মধ্য থেকে কোনো একটি শর্ত না পাওয়া গেলে مُزَارَعَةٌ বা বর্গাচাষ চুক্তি বিশুদ্ধ হবে না। তবে কয়েকটি শর্তের ক্ষেত্রে সামান্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। যথা–

দ্বিতীয় শর্ত। এই শর্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো গোলাম কিংবা বালক যদি مُزَارَعَةٌ চুক্তি করে তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে না। কিন্তু গোলাম যদি তার মনিবের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হয় তদ্রূপ বালক যদি তার অলির পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হয় তাহলে তাদের মাধ্যমে সম্পাদিত বর্গাচাষ চুক্তি বিশুদ্ধ হবে।

তদ্রূপ তৃতীয় শর্ত মুযারা'আহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তার সময়সীমা নির্ধারণ করার শর্ত করা হয়েছে। তবে আমাদের দেশে এ শর্তের প্রয়োজন নেই। কেননা উরফ তথা সমাজের প্রচলন মাধ্যমে তা নির্ধারিত আছে। কারণ এদেশে ফসল রোপণ ও ফসল কাটার মৌসুম নির্দিষ্ট থাকে। বছরের ভিন্নতায় মৌসুমের ভিন্নতা হয় না। তবে যেসব এলাকায় মৌসুম নির্ধারিত থাকে না; বরং একেক বছর একেক মৌসুমে রোপণ হয় এবং ফসল পরিপক্ক হওয়ার জন্যও সময়ের কমবেশ হয় সে সকল এলাকায় মুযারা'আহ -এর জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) কূফা নগরী ও তার আশপাশের অবস্থার উপর ভিত্তি করে মুযারা'আহ -এর ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণের শর্ত আরোপ করেছেন। কারণ সে এলাকার মৌসুমের শুরু শেষ ঠিক থাকত না। –[আল বিনায়া ১১/৪৮২, শামী ৫/১৭৪]

চতুর্থ শর্ত বীজ কে দেবে তা নির্দিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, এ শর্তটি কেবল ঐ সকল এলাকার জন্যে প্রযোজ্য যে সকল এলাকায় বীজ কে দেবে এ ব্যাপারে সামাজিক কোনো নির্দিষ্ট প্রচলন নেই। তবে যে সকল এলাকায় এরূপ প্রচলন আছে যে, জমির মালিকই বীজ দিয়ে থাকে কিংবা শ্রমিকের পক্ষ থেকে বীজ দেওয়া হয় তাহলে সে সকল এলাকায় এ শর্তের প্রয়োজন নেই; বরং সমাজের প্রচলনই সে সকল এলাকার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এবং ইমাম আহমদ (র.) এর একটি অভিমত অনুসারে বীজ যদি জমির মালিকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় তাহলেই কেবল মুযারা'আহ বিশুদ্ধ হবে। অন্যথায় মুযারা'আহ বিশুদ্ধ হবে না বলে অভিমত পাওয়া যায়। সুতরাং এই মত অনুসারে বীজ কে দেবে তা বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

তবে অপর এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, চাষী কিংবা মালিক দুই পক্ষের যে কোনো এক পক্ষ থেকে বীজ দেওয়া যেতে পারে। আমাদের ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সহ অনেক হাদীস বিশারদের মতো এটাই। হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল মুগনী'তে এটাকেই ইমাম আহমদ (র.) -এর বিশুদ্ধ অভিমত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ হুজুর ﷺ খায়বরবাসীদের সাথে তাদের নিজের পক্ষ থেকে বীজ দিয়ে বর্গাচাষ করার চুক্তি করেছিলেন। মুযারা'আত সংক্রান্ত মাসায়েলের ক্ষেত্রে এই হাদীসটিই মূল। –[আল বিনায়া ১১/৪৮৩]

قَوْلُهُ إِعْلَامًا لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ... : বলে মুসান্নিফ (র.) ৪নং শর্তটি করার কারণ কি তা বলতে চাচ্ছেন। অর্থাৎ মুযারা'আত চুক্তিটি কোন জিনিসের উপর হচ্ছে? এটি কি জমির সুবিধার উপর ভিত্তি করে চুক্তি হচ্ছে নাকি শ্রমিকের সুবিধা গ্রহণের জন্যে চুক্তি করা হবে? সুতরাং যদি জমির মালিক বীজ দেবে তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাহলে বুঝা যাবে যে, সে শ্রমিকের অভাবে শ্রমিকের কাছ থেকে শ্রম সুবিধা পাওয়ার জন্য এই মর্মে মুযারা'আতের চুক্তি করেছে যে, তোমার এই শ্রমের বিনিময়ে আমি তোমাকে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট একাংশ দিয়ে দেব। এমতাবস্থায় مَعْقُوْد عَلَيْه হবে 'শ্রমিকের শ্রম' আর বিনিময় হবে 'ফসল'। আর যদি শ্রমিক নিজে বীজ দেয় তাহলে বুঝা যাবে যে, জমির অভাবে এ জমির সুবিধা ভোগ করার জন্য জমির মালিকের সাথে এই মর্মে মুযারা'আতের চুক্তি করেছে যে, তোমার এই জমির সুবিধা ভোগ করার বিনিময়ে আমি তোমাকে আমার এই বীজ থেকে উৎপাদিত ফসলের অংশ দেব। এমতাবস্থায় مَعْقُوْد عَلَيْه হবে 'জমির সুবিধা' আর বিনিময় হবে 'ফসল'। আর যেহেতু مَعْقُوْد عَلَيْه অজ্ঞাত থাকলে কোনো আকদ বা চুক্তি বিশুদ্ধ হয় না। তাই مَعْقُوْد عَلَيْه কি তা নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করার জন্য বীজ কে দেবে তা নির্ধারিত করা আবশ্যক হবে।

৫নং শর্তে বলা হয়েছে, যে বীজ দেবে না সে উৎপাদিত ফসল থেকে কি পরিমাণ অংশ পাবে তাও চুক্তির শুরুতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কারণ সে বীজের মালিককে যে সুবিধাটা দেবে [অর্থাৎ জমি ব্যবহারের সুবিধা বা শ্রম] তা এমন বস্তু যার স্থায়িত্ব আলাদা করে দেখানো সম্ভব নয়। আর যে সকল জিনিসের স্থায়িত্বকে আলাদা করে দেখানো সম্ভব না তা অস্তিত্বে আসার পূর্বে যদি তার কোনো বিনিময়ের শর্ত না করা হয় তাহলে দাতা তার কোনো মূল্য পাওয়ার হকদার হয় না। তাই তার বিনিময়কে নিশ্চিত করার জন্য চুক্তির সময়ই কি পরিমাণ বিনিময় পাবে তা নির্দিষ্ট করতে হবে। যদি নির্দিষ্ট করা না হয় তাহলে শর্তের ভিত্তিতে চুক্তি থেকে সে কোনো বিনিময় পাবে না। এ কথাটিকেই মুসান্নিফ (র.) .. لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ عِوَضًا بِالشَّرْطِ দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন।

এখানে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যে বীজ দেবে সে উৎপাদিত ফসল থেকে কি পরিমাণ অংশ পাবে যদি তা নির্ধারণ করা হয়ে যায়, আর অপর পক্ষের অংশ 'স্পষ্ট' করে বলা না হয় তাহলেও মুযারা'আত চুক্তি শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ একজনের অংশ নির্ধারণ করার মাধ্যমে অপরজনের অংশ এমনিতেই নির্ধারিত হয়ে যায়।

৬নং শর্তে বলা হয়েছে, জমিকে শ্রমিকের কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়া। সুতরাং যদি এমন কোনো শর্ত করা হয় যার দ্বারা শ্রমিক জমিনে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে مُزَارَعَةٌ বিশুদ্ধ হবে না। তদ্রূপ যদি مُزَارَعَةٌ তে এরূপ শর্ত করা হয় যে, শ্রমিক ও মালিক উভয়েই তাতে শ্রম দিয়ে ফসল ফলাবে তাহলেও এই مُزَارَعَةٌ চুক্তি বিশুদ্ধ হবে না। কারণ এতে জমির মালিকের দখল জমিতে অবশিষ্ট থেকে যায় এবং শ্রমিকের জন্য পরিপূর্ণভাবে জমিকে অবমুক্ত করা হয় না। আর যদি ঘটনা এমন হয় যে, জমিতে ফসলের [বীজ বপন করার] ক্ষেত লাগানোর পর চারা গজিয়ে গেছে। তারপর জমির মালিক কোনো শ্রমিকের হাতে তাকে বর্গাচাষের ভিত্তিতে দিয়ে দিল তাহলে তাও জায়েজ হবে। তবে তাকে মুয়ামালাহ (مُعَامَلَة) বলা হবে। মুযারা'আত (مُزَارَعَةٌ) বলা হবে না।

আর যদি বিষয়টা এমন হয় যে, ফসল কাটার উপযোগী হয়ে গেছে। এরপর মালিক কারো কাছে বর্গাচাষের জন্য দিয়ে দিল তাহলে তাকে মুয়ামালাহ বলেও জায়েজ করার কোনো সুরত নেই। –[শামী ৫/১৭৫]

৭নং শর্ত হলো, জমির উৎপাদিত ফসলে উভয়ে শরিক হওয়া। সুতরাং এই শরিকানাতে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী সকল শর্তের কারণেই مُزَارَعَةٌ বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন– শর্ত করা হলো যে, উৎপাদিত ফসলের মধ্য থেকে প্রথমে মালিক দশ মণ নেওয়ার পর যা বাকি থাকবে তাতে উভয়ে সমান অংশীদার হবে। তাহলে এই مُزَارَعَةٌ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮নং শর্ত হলো, কি ফসল রোপণ করা হবে তা নির্দিষ্ট করা। কারণ চুক্তির মাঝে পণ্য যেমন নির্ধারণ করতে হয় তেমনি বিনিময় কি হবে তাও নির্ধারণ করতে হয়। তার ফসলটাই হলো এখানে বিনিময়। এছাড়া কোনো কোনো ফসল জমির জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। তাই মালিক তাতে নারাজ থাকার সম্ভাবনা থাকার দরুন পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে।

قَالَ : وَهِيَ عِنْدَهُمَا عَلٰى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ لِأَنَّ الْبَقَرَ اٰلَةُ الْعَمَلِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَاجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ بِإِبْرَةِ الْخَيَّاطِ وَإِنْ كَانَ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ لِأَنَّهُ اِسْتِيْجَارُ الْأَرْضِ بِبَعْضٍ مَعْلُوْمٍ مِنَ الْخَارِجِ فَيَجُوْزُ كَمَا إِذَا اسْتَاجَرَهَا بِدَرَاهِمَ مَعْلُوْمَةٍ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ مِنَ الْاٰخَرِ جَازَتْ لِأَنَّهُ اِسْتَاجَرَهُ لِلْعَمَلِ بِاٰلَةِ الْمُسْتَاجِرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَاجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ ثَوْبَهُ بِإِبْرَتِهِ أَوْ طَيَّانًا لِيُطَيِّنَ بِمَرِّهِ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ لِاٰخَرَ فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَهٰذَا الَّذِيْ ذَكَرَهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাহেবাইন (র.) -এর মতে, বর্গাচাষ সাধারণত চারভাবে হতে পারে–

১. যদি জমি ও বীজ একজনের এবং গরু [বর্তমানে চাষযন্ত্রে বা চাষের জন্যে প্রদেয় টাকা] ও শ্রম অন্যজনের হয় তাহলে এ বর্গাচাষ জায়েজ হবে। কেননা গরু কৃষিযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটা এমন হলো, যেন সে কোনো একজন দর্জিকে [কর্মচারী] নিয়োগ করল তার নিজস্ব সুঁই দ্বারা সেলাই করার জন্য।

২. যদি জমি একজনের এবং শ্রম, গরু ও বীজ অপরজনের হয় তাহলে তাও জায়েজ। কেননা এটি হলো উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট কিয়দংশের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়ার মতো। কাজেই তা জায়েজ হবে। যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহামের [টাকার] বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া জায়েজ।

৩. আর যদি জমি, বীজ ও গরু একজনের এবং শ্রম অপরজনের হয় তাহলেও [বর্গাচাষ] জায়েজ হবে। কেননা এতে জমির মালিক নিজ যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষীকে [শ্রমিক] নিয়োগ করেছে। এটা এমন হলো, যেন কেউ তার নিজস্ব সুঁই দিয়ে কাপড় সেলাই করে দেওয়ার জন্য কোনো দর্জিকে শ্রমিক নিয়োগ করল। অথবা যেন কেউ তার নিজস্ব হাতিয়ার দিয়ে বাড়ি প্লাস্টার করে দেওয়ার জন্য কোনো প্লাস্টারকারী ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করল।

৪. আর যদি জমি ও গরু একজনের আর বীজ ও শ্রম অপরজনের হয় তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এটা হলো জাহেরী রেওয়ায়েতের কথা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَهِيَ عِنْدَهُمَا عَلٰى أَرْبَعَةِ الخ : প্রকাশ থাকে যে, ফসল ফলানোর জন্যে চারটি জিনিসের দরকার হয়ে থাকে যথা– জমি, বীজ, শ্রম ও গরু বা চাষযন্ত্র। সুতরাং যদি এক ব্যক্তিই এই চারটির সরবরাহ করতে পারে তাহলে তো ভালো। আর যদি এক ব্যক্তি এসবগুলোর সরবরাহ করতে না পারে এবং উৎপাদিত ফসলের অংশ দেওয়ার শর্তে অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে ফসল উৎপাদন করতে রাজি হয় তাহলে তাকেই মুযারা'আহ বা বর্গাচাষ বলে। সুতরাং তারা উভয়ে হয়তো সমহারে এই চারটি বস্তুর সরবরাহ করবে কিংবা একজন বেশি অংশের সরবরাহ করবে আর অপরজন কম অংশের যোগান দেবে। যদি উভয়ে সমহারে সরবরাহ করে তাহলে তার দুই সুরত পরিলক্ষিত হয় যথা–

১. একজন জমি ও বীজ সরবরাহ করবে আর অপরজন গরু সরবরাহ করবে ও শ্রম দেবে। [এটা হলো কিতাবে উল্লিখিত প্রথম সুরত।]

২. একজন জমি এবং গরু সরবরাহ করবে আর অপরজন বীজ সংগ্রহ করবে এবং শ্রম দেবে। [এটা কিতাবের চতুর্থ সুরত।]

আর যদি একজন বেশি আর অপরজন কম হারে সরবরাহ করে তাহলে তারও দুই সুরত দেখা যায়। যথা–

১. একজন শুধু জমি দেবে আর সবকিছু অপরজন সরবরাহ করবে।

অথবা ২. একজন শুধু শ্রম দেবে আর অপরজন বাকি সবকিছু যোগান দেবে। [এ দুটি হলো যথাক্রমে কিতাবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুরত।] এই চার সুরতের মুযারা'আর মধ্য থেকে দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ কিতাবের চতুর্থ সুরত ব্যতীত অবশিষ্ট তিন সুরত জায়েজ। আর দ্বিতীয় সুরতের ব্যাপার হলো মতবিরোধপূর্ণ। জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে তা নাজায়েজ, আর নাওয়াদিরে বর্ণিত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে তাও জায়েজ।

জাহেরী রেওয়ায়েতে তিন সুরত জায়েজ আর এক সুরত নাজায়েজ হওয়ার কারণ জানতে হলে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি নীতি প্রথমে বুঝে নিতে হবে। আর তা হলো–

১. মুযারা'আহটা চুক্তি হিসেবে মৌলিকভাবে ইজারা [বা ভাড়া দেওয়া]-র চুক্তি। যা অবশেষে শরিকানাতে পরিণত হয়। অর্থাৎ যেন বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তি তার এ বীজ থেকে যে ফসল উৎপাদিত হবে তার কিয়দংশের বিনিময়ে অপর শরিক থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলোকে ভাড়া [ইজারা] দিচ্ছে। আর কিয়াসের দৃষ্টিতে এরূপ ইজারা চুক্তি জায়েজ নেই। কারণ তাতে (أُجْرَةٌ) বিনিময় (مَجْهُوْل) অজ্ঞাত বা অজানা থাকে।

২. তবে শ্রমিকের শ্রম কিংবা জমির সুবিধাকে এই পন্থায় [অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ে] ইজারা দেওয়ার বৈধতা (خِلَافُ قِيَاسٍ) তথা কিয়াসের বিপরীতে সরাসরি নস (نَصّ) দ্বারা প্রমাণিত[১]। এছাড়া মুযারা'আহ সংগঠিত হওয়ার অন্য দুইটি উপকরণ তথা বীজ ও গরুকে এই পন্থায় ইজারা দেওয়ার বৈধতা কোথাও পাওয়া যায় না।

৩. আর যে জিনিস খেলাফে কিয়াস নস দ্বারা প্রমাণিত হয় তার উপর অন্যকোনো জিনিসকে কিয়াস করা যায় না। তাই যেই মুযারা'আহ চুক্তির মাঝে শ্রমিকের শ্রম কিংবা জমির সুবিধাকে বীজদাতার কাছে তার বীজ থেকে উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ে ভাড়া [ইজারা] দেওয়া হবে তা বৈধ হবে। কারণ শ্রম কিংবা জমির সুবিধাকে এই পন্থায় ভাড়া দেওয়া খেলাফে কিয়াস হলেও তা নস দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে যেই মুযারা'আহ চুক্তির মাঝে শ্রম কিংবা জমি ছাড়া অন্য কোনো উপকরণ [যথা গরু] কে উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য হবে সেই মুযারা'আহ চুক্তি অবৈধ হবে। কেননা তাকে এই পন্থায় ভাড়া দেওয়ার বৈধতা কোনো নস দ্বারা প্রমাণিত নেই এবং যা নস দ্বারা প্রমাণিত তার উপর কিয়াস করাও যাবে না। কেননা সেই নসটি খেলাফে কিয়াস।

---

১. জমিকে উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ে ইজারা দেওয়ার বিষয়টি হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের মাঝে শ্রমিকের পক্ষ থেকে বীজ সরবরাহ করে মুযারা'আহ চুক্তির প্রচলন ছিল। আর শ্রমিকের পক্ষ থেকে বীজ দেওয়া হলে শ্রমিক জমিকে ইজারা গ্রহণকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

আর শ্রমিকের শ্রমকে এই পন্থায় ইজারা দেওয়ার বিষয়টিও সাহাবায়ে কেরামের আমল ও তখনকার প্রচলনের দ্বারা প্রমাণিত। কারণ তারা কখনো কখনো জমির মালিকের উপর বীজ সরবরাহের শর্ত করে থাকত। যেন জমির মালিক আপন বীজ নিজের জমিতে রোপণ করে ফসল ফলানোর জন্য ফসলের একাংশের বিনিময়ে শ্রমিকের শ্রমকে ইজারা বা ভাড়া নিল। তাছাড়া খায়বর অধিবাসীদের সাথে হুজুর ﷺ যে মুযারা'আহ চুক্তি করেছিলেন তাতে তাদের উপর বীজ সরবরাহের দায়িত্ব ছিল। যেন মুসলমানদের নিজস্ব জমিতে নিজস্ব বীজ রোপণ করে ফসল উৎপাদনের জন্য খায়বরবাসী ইহুদিদের শ্রমকে উৎপাদিত ফসলের অংশের বিনিময়ে ইজারা নিয়েছিল। সুতরাং যেহেতু উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ে শুধু কেবল জমির সুবিধা কিংবা শ্রমিকের সুবিধাকে ইজারা দেওয়া নস দ্বারা প্রমাণিত। তাই এ দুটির কোনো একটি ছাড়া অন্যকিছুকে মুখ্য করে ইজারা দেওয়া হলে মুযারা'আহ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। তদ্রূপ জমি এবং শ্রম উভয়টিকে একই সাথে ইজারা দিলেও তা বাতিল হবে। কারণ নস দ্বারা শুধু যে কোনো একটিকে ইজারা দেওয়ার বিষয় প্রমাণিত।

৪. তবে যে জিনিসের ইজারা দেওয়ার ব্যাপারটি খেলাফে কিয়াস নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তার [تَابِعٌ হিসেবে] অন্তর্ভুক্ত করে যদি সেই জিনিসকেও উল্লিখিত পন্থায় ইজারা দেওয়া হয়। যার বৈধতার ব্যাপারে নস পাওয়া যায়নি [যেমন গরু] তাহলে এই ইজারা বৈধ হবে। কারণ (تَابِعٌ) অন্তর্ভুক্ত করা হলে (تَابِعٌ) অন্তর্ভুক্ত বিষয়টিকে ইজারা দেওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে না। তবে যেই (غَيْر مَنْصُوْص خِلَاف قِيَاسْ) নস বিহীন খেলাফে কিয়াস বিষয়টিকে مَنْصُوْص -এর تَابِعٌ বানানো হবে। সেটি তার تَابِعٌ হওয়ার যোগ্য হতে হবে। আর যোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো দুটি বস্তু একই জিনসের হওয়া। শ্রমিকের শ্রম আর গরু দুটি হলো এক জিনস। তদ্রূপ বীজকে শ্রমিকের تَابِعٌ বা অধীনে নিয়ে ইজারা দেওয়া যাবে না।

৫. বীজ থেকে উৎপাদিত ফসল যেহেতু বিনিময় হবে তাই মুযারা'আহর ইজারাতে বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তি ইজারা গ্রহণকারী (مُسْتَاجِرْ) সাব্যস্ত হবে।

এই পাঁচটি বিষয়কে সামনে রেখে যদি আমরা কিতাবে বর্ণিত মুযারা'আহর চারটি সুরতের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই–

প্রথম সুরতে জমির মালিক নিজের জমিতে ফসল ফলানোর জন্য বীজ সরবরাহ করেছে এবং শ্রমিককে তার চাষযন্ত্রসহ ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ে ইজারা নিয়েছে। এখানে শ্রমযন্ত্র তথা গরু হলো শ্রমিকের تَابِعٌ তা মুখ্য নয়। আর গরু ও শ্রমিক এক জিনসের হওয়ার কারণে গরুকে শ্রমিকের تَابِعٌ বানানো সম্ভব। তাই এ প্রকার মুযারা'আহ জায়েজ।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সুরতে শ্রমিক নিজের পক্ষ থেকে বীজ সরবরাহ করে ফসল ফলানোর জন্য কোনো জমিদারের নিকট থেকে উৎপাদিত ফসলের অংশ দেওয়ার শর্তে জমি ভাড়া নিয়েছে এবং নিজের গরু দিয়ে চাষ করে ফসল উৎপাদন করেছে। তাই এই সুরতও বৈধ হবে।

আর তৃতীয় সুরতে জমির মালিক নিজের জমিতে ফসল ফলানোর জন্য বীজ এবং গরু সরবরাহ করেছে শুধু সে নিজে শ্রম দিতে অক্ষম হওয়ায় উৎপাদিত ফসলের অংশ দেওয়ার শর্তে কোনো শ্রমিককে ইজারা নিয়েছে। তাই তাও জায়েজ হবে।

পক্ষান্তরে চতুর্থ সুরতে চাষি আপন বীজ দিয়ে ফসল ফলানোর জন্য কোনো জমিদারের কাছ থেকে উৎপাদিত ফসলের অংশ দেওয়ার শর্তে জমি এবং গরুকে ইজারা নিতে চাচ্ছে। আর আমরা পূর্বে জেনেছি যে, উৎপাদিত ফসলের অংশ দেওয়ার শর্তে গরুকে পৃথকভাবে ইজারা নেওয়া বা দেওয়া জায়েজ নেই। আর জমির تَابِعٌ হিসেবেও এখানে ইজারা নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ تَابِعٌ বানানোর জন্য শর্ত হলো দুটি বস্তু একই জিনসের হতে হবে। এখানে গরু এবং জমি এক জিনসের নয়; বরং ভিন্ন জিনসের।

বাকি রইল ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর কথা, তিনি প্রথম সুরতের উপর কিয়াস করে এই সুরতকেও জায়েজ বলেন। তাঁর যুক্তি হলো, যদি জমির মালিক বীজ এবং গরু উভয়ের সরবরাহ করে তাহলে যেহেতু মুযারা'আহ জায়েজ হয় তাই যদি বীজ বাদ দিয়ে শুধু কেবল গরুর সরবরাহ করে তাহলেও তা জায়েজ হওয়া দরকার। এ দলিলের জবাব হলো, এটা قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ অর্থাৎ এই কিয়াস সঠিক নয়। কারণ প্রথম সুরতে জমির সাথে বীজকে تَابِعٌ বানিয়ে ইজারা দেওয়া সম্ভব। কারণ উভয়টি এক জিনসের বস্তু। তদুপরি বীজ সরবরাহকারীকে ইজারা গ্রহণকারী ধরা হলে তো কোনো কথাই নেই। কারণ এমতাবস্থায় জমির মালিক শুধু কেবল গরু এবং শ্রমিককে ইজারা নিয়েছে। আর শ্রমিক ও গরু উভয়টিই প্রাণী হিসেবে এক জাতীয়, তাই একটিকে অপরটির تَابِعٌ বা অধীনস্ত বানিয়ে ইজারা দেওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে চতুর্থ সুরতে গরুকে জমির تَابِعٌ বানিয়ে ইজারা দেওয়া সম্ভব নয়। অনুরূপ জিনসের ভিন্নতার কারণে বীজকেও শ্রমিকের تَابِعٌ বানিয়ে ইজারা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রথম সুরতের সাথে চতুর্থ সুরতের কিয়াস করা উচিত হবে না।

وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ يَجُوْزُ اَيْضًا لِاَنَّهُ لَوْ شُرِطَ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ عَلَيْهِ يَجُوْزُ فَكَذَا اِذَا شُرِطَ وَحْدَهُ وَصَارَ كَجَانِبِ الْعَمَلِ وَجْهُ الظَّاهِرِ اَنَّ مَنْفَعَةَ الْبَقَرِ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْاَرْضِ لِاَنَّ مَنْفَعَةَ الْاَرْضِ قُوَّةٌ فِيْ طَبْعِهَا يَحْصُلُ بِهَا النَّمَاءُ وَمَنْفَعَةُ الْبَقَرِ صَلَاحِيَّةٌ يَقَامُ بِهَا الْعَمَلُ كُلُّ ذٰلِكَ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلَمْ تَتَجَانَسَا فَتَعَذَّرَ اَنْ تُجْعَلَ تَابِعَةً لَهَا بِخِلَافِ جَانِبِ الْعَامِلِ لِاَنَّهُ تَجَانَسَتِ الْمَنْفَعَتَانِ فَجُعِلَتْ تَابِعَةً لِمَنْفَعَةِ الْعَامِلِ وَهٰهُنَا وَجْهَانِ اٰخَرَانِ لَمْ يَذْكُرْهُمَا اَحَدُهُمَا اَنْ يَكُوْنَ الْبَذْرُ لِاَحَدِهِمَا وَالْاَرْضُ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ لِاٰخَرَ وَاَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِاَنَّهُ يَتِمُّ شِرْكَةٌ بَيْنَ الْبَذْرِ وَالْعَمَلِ وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ وَالثَّانِيْ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْبَذْرِ وَالْبَقَرِ وَاَنَّهُ لَا يَجُوْزُ اَيْضًا لِاَنَّهُ لَا يَجُوْزُ عِنْدَ الْاِنْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الْاِجْتِمَاعِ وَالْخَارِجُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ فِيْ رِوَايَةٍ اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْمُزَارَعَاتِ الْفَاسِدَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِصَاحِبِ الْاَرْضِ وَيَصِيْرُ مُسْتَقْرِضًا لِلْبَذْرِ قَابِضًا لَهُ بِاتِّصَالِهِ بِاَرْضِهِ .

তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বর্ণনা মতে, এভাবে বর্গাচাষ করাও জায়েজ। কেননা জমির মালিকের উপর যদি বীজ ও গরু সরবরাহের শর্ত করা হয় তাহলে যেমন জায়েজ হয় তদ্রূপ শুধু গরু সরবরাহের শর্ত করা হলেও জায়েজ হবে। সুতরাং এটা চাষীর গরু সরবরাহের শর্ত করার মতো হলো। জাহেরী রেওয়ায়েতের যুক্তি হলো, গরুর উপকারিতা আর জমির উপকারিতা দুটি এক জাতীয় জিনিস নয়। কেননা জমির উপকারিতা জমিতে অন্তর্নিহিত স্বভাবজাত এমন একটি শক্তির নাম যার দ্বারা উদ্ভিদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর গরুর উপকারিতা হলো গরুর মধ্যকার এমন একটি যোগ্যতার নাম যার দ্বারা কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ সবই আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই এগুলো এক জাতীয় জিনিস নয়। কাজেই গরুর উপকারিতাকে জমির উপকারিতার সাথে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না। পক্ষান্তরে গরুর উপকারিতাকে চাষীর উপকারিতার সাথে সংশ্লিষ্ট করার ব্যাপারটি একটু ভিন্ন। কারণ দুটি একই জাতীয় বস্তু ফলে তাকে [গরুর উপকারিতাকে] চাষীর উপকারিতার সাথে সংশ্লিষ্ট করা যাবে। এখানে আরো দুটি অবস্থা হতে পারে, যা তিনি [ইমাম কুদূরী] উল্লেখ করেননি। একটি হলো, বীজ একজনের পক্ষ থেকে হবে আর জমি, গরু ও শ্রম অপরজনের পক্ষ থেকে হবে। এ সুরত জায়েজ হবে না। কেননা এ অংশীদারিত্বের চুক্তি পূর্ণতা লাভ করেছে বীজ এবং শ্রমের সমন্বয়ে। আর এ ব্যাপারে শরিয়তের কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি। আর দ্বিতীয়টি হলো, বীজ ও গরু একজনের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা [এবং অপর পক্ষ থেকে হবে জমি ও শ্রম] এ সুরতও জায়েজ নেই। কেননা একজনের পক্ষ থেকে শুধু একটি [তথা বীজ কিংবা গরু] হলে যেমন জায়েজ নেই তেমনি তার সাথে আরেকটি একত্রিত করা হলেও [যেমন– বীজ ও গরু] তা জায়েজ হবে না। আর উভয় সুরতেই এক বর্ণনা মতে উৎপাদিত ফসল বীজ সংগ্রহকারীর হবে। অন্যান্য ফাসিদ বর্গাচাষের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে। আর অপর বর্ণনা মতে উৎপাদিত ফসল পাবে জমির মালিক। আর বীজ তার উপর ঋণ হিসেবে গণ্য হবে, যা তার জমির সাথে মিশে গেছে বলে সে তা কবজা [গ্রহণ] করে নিয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ كُلُّ ذٰلِكَ بِخَلْقِ اللّٰهِ الخ : এই ইবারতের সাথে পূর্বাপরের দলিলের কোনো সম্পর্ক নেই; বরং মুসান্নিফ (র.) পূর্বে যখন জমির সুবিধাকে তার অন্তর্নিহিত একটি যোগ্যতা বলেছেন। তাই কেউ কেউ হয়তো এই ধারণা করতে পারেন যে, হয়তো তাবেঈ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। এই সন্দেহ থেকে নিজকে বাঁচানোর জন্য كُلُّ ذٰلِكَ بِخَلْقِ اللّٰهِ বলেছেন।

قَوْلُهٗ وَهُهُنَا وَجْهَانِ اٰخَرَانِ : উক্ত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) অতিরিক্ত আরো নাজায়েজ মুযারা'আর দুই সুরত আলোচনা করেন। এই দুই সুরতের সারকথা হলো, শ্রমিক কিংবা জমিকে মুযারা'আর পন্থায় ইজারা দেওয়ার কথা নস দ্বারা প্রমাণিত। তবে উভয়টিকে একই সাথে একজনের নিকট ইজারা দেওয়ার কথা নস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই তা নাজায়েজ হবে।

–[আল ইনায়া ৮/৪৭৮]

قَوْلُهٗ وَالْخَارِجُ فِى الْوَجْهَيْنِ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ : মুযারা'আহ যদি ফাসিদ হয় তাহলে এইরূপ মুযারা'আর চুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের হকদার কে হবে এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে, বীজ সরবরাহকারী তার হকদার হবে। আর দ্বিতীয় বর্ণনা মতে জমির মালিক ফসলের মালিক হবে এবং বীজ সরবরাহকারী থেকে ঋণসূত্রে তাকে বীজের মালিক ধরা হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তো কবজা করা আবশ্যক, আর এখানে তো জমির মালিক বীজকে কবজা করেনি তাহলে তা ঋণসূত্রে তার হস্তগত হয়েছে এ কথা কি করে বলা সম্ভব? এর উত্তর হলো যেহেতু জমির সাথে বীজ মিলে গেছে তাই এরূপ মিলে যাওয়ার মাধ্যমে এমনিতেই তা জমির মালিকের কবজার এসে গেছে, তাই ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নতুন করে কবজা করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ দুটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন আল্লামা সদরুশ শরীআহ (র.)। তবে ফাতাওয়ায়ে শামী, দুররুল মুখতার, বাদাইউস সানাঈ ও মাজমাউল আনহুরসহ হানাফীর অন্যান্য কিতাবে দ্বিতীয় বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়নি; বরং সেখানে কেবল প্রথম বর্ণনাটিই উল্লেখ আছে। আর এতে বলা হয়েছে ফাসিদ সকল মুযারা'আতেই বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তি সমস্ত ফসলের মালিক হবে। অতঃপর যদি বীজওয়ালা জমির মালিক হয়ে থাকে তাহলে চাষিকে তার উপযুক্ত মজুরি দিয়ে দেবে। আর যদি চাষি নিজেই বীজ সরবরাহ করে থাকে তাহলে জমির মালিককে জমির উপযুক্ত ভাড়া দিয়ে দেবে. আর কিয়াসের দাবি এটাই। কারণ সমস্ত ফসল বীজ থেকে উৎপাদিত কিংবা বীজের বর্ধিত অংশ। আর জমি তাকে উৎপাদন বা বর্ধন করার একটি মাধ্যম মাত্র।

قَالَ : وَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ اِلَّا عَلٰى مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ لِمَا بَيَّنَّا وَاَنْ يَكُوْنَ الْخَارِجُ شَائِعًا بَيْنَهُمَا تَحْقِيْقًا لِمَعْنَى الشَّرِكَةِ فَاِنْ شَرَطَا لِاَحَدِهِمَا قُفْزَانًا مُسَمَّاةً فَهِيَ بَاطِلَةٌ لِاَنَّ بِهٖ تَنْقَطِعُ الشَّرِكَةُ لِاَنَّ الْاَرْضَ عَسَاهَا لَا تَخْرُجُ اِلَّا هٰذَا الْقَدْرُ وَصَارَ كَاشْتِرَاطِ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ لِاَحَدِهِمَا فِي الْمُضَارَبَةِ وَكَذَا اِذَا شَرَطَا اَنْ يَرْفَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ بَذْرَهٗ وَيَكُوْنَ الْبَاقِيْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاَنَّهٗ يُؤَدِّيْ اِلٰى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِيْ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ اَوْ فِيْ جَمِيْعِهٖ بِاَنْ لَمْ يَخْرُجْ اِلَّا قَدْرُ الْبَذْرِ وَصَارَ كَمَا اِذَا شَرَطَا رَفْعَ الْخَرَاجِ وَالْاَرْضُ خَرَاجِيَّةٌ وَاَنْ يَكُوْنَ الْبَاقِيْ بَيْنَهُمَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদের উল্লেখ করা ব্যতীত বর্গাচাষ চুক্তি বিশুদ্ধ হবে না। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি এবং [বর্গাচাষ চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য] উৎপাদিত ফসলে উভয় শরিকের অবিভাজ্য অংশীদারিত্ব আবশ্যক অংশীদারিত্বের অর্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। সুতরাং যদি ভূমির মালিক এবং চাষী উভয়ে মিলে কোনো একজনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কফীয [বিশেষ ধরনের পরিমাপ] এর শর্তে বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদন করে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ এরূপ শর্তের দরুন অংশীদারিত্ব ব্যাহত হয়। কেননা এমনও হতে পারে যে, জমিতে কেবল এ পরিমাণ ফসলই উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং এটা মুযারাবা চুক্তির মাঝে কোনো একজনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহাম শর্ত করার মতো হলো। [যা জায়েজ নেই।] অনুরূপভাবে ভূমির মালিক এবং চাষি যদি এই শর্তে বর্গাচাষ করে যে, বীজদাতা বীজ পরিমাণ শস্য উঠিয়ে নেওয়ার পর অবশিষ্ট শস্য তাদের মাঝে আধা-আধি করে বণ্টন করা হবে। [তাহলে তাও বাতিল বলে গণ্য হবে।] কেননা এরূপ শর্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল অথবা সম্পূর্ণ ফসলের মাঝে অংশীদারিত্বকে বাতিল করার দিকে ঠেলে দেয়। যেমন– এমনও হতে পারে যে, জমি থেকে কেবল বীজ পরিমাণ ফসলই উৎপাদিত হলো। সুতরাং এটা এমন হলো যেমন খারাজী ভূমির ক্ষেত্রে ভূমি মালিক এবং চাষি এরূপ শর্ত করে বর্গাচাষ চুক্তি করল যে, খারাজ নিয়ে যাওয়ার পর যা বাকি থাকবে তা তারা উভয়ে ভাগ করে নেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে বর্গাচাষ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আটটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখানে ইমাম কুদূরী (র.) আলোচ্য ইবারতে সেই আটটি শর্তের মধ্য থেকে তৃতীয় ও সপ্তম শর্তটির আলোচনা করেছেন।

তৃতীয় শর্তটি ছিল বর্গাচাষের সময় নির্ধারণ করা। এ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কথা পূর্বে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। আর সপ্তম শর্তটি ছিল, উভয় শরিক উৎপাদিত ফসলে (مُشَاعٌ) অবিভাজ্য ভিত্তিতে অংশীদার হওয়া। আর নিয়ম হলো, কোনো শর্ত সাপেক্ষে কোনো জিনিসকে জায়েজ করা হলে ঐ শর্তের অনুপস্থিতিতে ঐ বিষয়টি নাজায়েজ হয়ে যায়। এই ভিত্তিতে ইমাম কুদূরী (র.) আলোচ্য ইবারতে সপ্তম শর্তটির আলোকে আটটি সূরতে মাসআলার আলোচনা করেন। যার মধ্য থেকে ছয়টিতে এই শর্তটির অনুপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিকে আবশ্যক করে এমন শর্ত বিদ্যমান থাকায় বর্গাচাষ চুক্তি ফাসিদ সাব্যস্ত হয়। আর দুটি সূরতে মাসআলায় উক্ত শর্তটি বিদ্যমান থাকার কারণে বর্গাচাষ চুক্তি বিশুদ্ধ হবে। নিম্নে এ আটটি মাসআলার বিবরণ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হলো–

১. জমির মালিক ও চাষি উভয়ে মিলে যদি এই শর্তে বর্গাচাষ করে যে, উৎপাদিত ফসল থেকে এত কফীয [পরিমাপের একটি বিশেষ পদ্ধতির নাম] পরিমাণ আমি নেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তুমি নেবে, অথবা এত কফীয তুমি নেওয়ার পর যা বাকি থাকবে তা আমি নেব। তাহলে এই বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ এমনও হতে পারে যে, জমিতে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি ফসলই উৎপাদিত হলো না। আর যদি এমনটি হয় তাহলে ফসলের মাঝে উভয়ের অবিভাজ্য শরিকানার শর্ত বহাল থাকে না। বিধায় এ চুক্তি নাজায়েজ হবে।

এর উদাহরণ হলো, ঐ মুযারাবা চুক্তির মতো যেখানে টাকার মালিক মুযারিবকে এই শর্তে ব্যবসা করার জন্য টাকা দিল যে, এই টাকা থেকে যে লাভ আসে তার থেকে [উদাহরণস্বরূপ] দুই হাজার টাকা প্রতি মাসে আমাকে দেওয়ার পর যা লাভ বাকি থাকে তা তুমি ভোগ করবে। এরূপ মুযারাবা চুক্তি নাজায়েজ। কারণ হতে পারে কোনো মাসে দুই হাজার টাকাই কেবল লাভ আসল। এমতাবস্থায় চুক্তির ভিত্তিতে টাকা গ্রহীতার কি অবস্থা হবে?

* قَفِيْز - একটি বিশেষ পরিমাপকে বলা হয়, যা প্রাচীনকালে আরবদেশগুলোতে প্রচলিত ছিল। আল্লামা ইবনে মানযূর (র.) লিসানুল আরবে উল্লেখ করেন- اَلْقَفِيْزُ مِنَ الْمَكَايِيْلِ مَعْرُوْفٌ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيْكَ عِنْدَ اَهْلِ الْعِرَاقِ অর্থাৎ কফীয হলো, প্রসিদ্ধ একটি বিশেষ পরিমাপ যা ইরাক অধিবাসীদের নিকট আট মাককূক সমপরিমাণ হয়ে থাকে।

এক মাককূক = দেড় সা বা ৪ কেজি ৬৪৭ গ্রাম ও ৪২০ মিলিগ্রাম। সে অনুপাতে এক কফীয = ৩৭ কেজি ৭৯১ গ্রাম ও ৩৬ মিলিগ্রাম। মু'জামুল ফুকাহাতে এটাকেই কফীযে শরয়ী বলা হয়েছে।

এটা হলো কফীযে ইরাকীর পরিমাপ। এছাড়া আরেক প্রকার কফীয কফীযে হাশেমী নামেও পরিচিত আছে, যা মদিনা ও তার আশেপাশে প্রচলিত ছিল। আল্লামা শামী (র.) হিদায়া এর বরাত দিয়ে তার পরিমাণ এক 'সা' তথা ৩ কেজি ১৪৯ গ্রাম ২৮০ মিলিগ্রাম নির্ধারণ করেছেন। -[আল আওযামুল মাহমূদাহ- ৫২]

قَوْلُهُ وَكَذَا اِذَا شَرَطَا اَنْ يَرْفَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ بَذْرَهُ : ২. দ্বিতীয় সূরতে মাসআলা হলো, যদি এই শর্ত করে যে, যে ব্যক্তি বীজ সরবরাহ করবে, উৎপাদিত ফসল থেকে তার বীজ পরিমাণ ফসল তাকে প্রথমে দেওয়ার পর যা বাকি থাকবে তা উভয়ের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করা হবে। তাহলে এইরূপ বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল হবে। কারণ এতে উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অবিভাজ্য অংশীদারিত্ব পাওয়া যায় না। কেননা যদি জমিতে বীজ পরিমাণ ফসলের চেয়ে বেশি ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে তাহলে ফসলের কিছু অংশের মাঝে [বীজ পরিমাণ] যে বীজ সরবরাহ করবে না তার অংশ থাকবে না। আর যদি কেবল বীজ পরিমাণ ফসলই জন্মায়, তাহলে পূর্ণ ফসলের মাঝে যে বীজ সরবরাহ করেনি তার অংশ থাকবে না। ফলে উভয়ের মাঝে অবিভাজ্য অংশীদারিত্ব পাওয়া যায়নি।

সুতরাং এ মাসআলার উদাহরণ হবে উৎপাদিত ফসল থেকে খেরাজ [ট্যেক্স] আদায়ের পর বাকি ফসল উভয় শরিকের মাঝে সমভাবে বণ্টিত হওয়ার শর্তে বর্গাচাষ চুক্তি করার মতো। অর্থাৎ এইরূপ বর্গাচাষ যেমন নাজায়েজ তদ্রূপ উৎপাদিত ফসল থেকে বীজ পরিমাণ ফসল বীজ সরবরাহকারীকে দেওয়ার পর বাকি ফসল উভয়ের মাঝে সমবণ্টন করার শর্তে বর্গাচাষও জায়েজ নেই।

* এখানে মনে রাখতে হবে যে, খেরাজ দুই প্রকার। যথা- খেরাজে ওজিফা ও খেরাজে মুকাসামাহ। খেরাজে ওজিফা বলা হয় যদি ফসল উৎপাদনের জমিতে বাৎসরিক হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পয়সা খেরাজ ধার্য করা হয়। আর যদি জমিতে উৎপাদিত ফসলের অবিভাজ্য অংশকে [যথা- অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ] খেরাজ ধার্য করা হয় তাকে খেরাজে মুকাসামাহ বলা হয়। খেরাজে ওজিফাকে আদায়ের পর অবশিষ্ট ফসলকে বণ্টন করার শর্তে বর্গাচাষ জায়েজ নেই। এই প্রকারের কথাই কিতাবে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি খেরাজে মুকাসামাহকে পরিশোধ করার পর বাকি ফসল উভয়ের মাঝে বণ্টন করার শর্ত করা হয় তাহলে এই বর্গাচাষ জায়েজ হবে।

* অনুরূপ যদি বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তি এইরূপ শর্ত করে যে, উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ আমি নেওয়ার পর যা বাকি থাকবে তা উভয়ের মাঝে সমানভাবে বণ্টিত হবে। কারণ এখানে এক দশমাংশ অবিভাজ্য হওয়ার দরুন বীজওয়ালার জন্য তা বরাদ্দ করা হলেও এর কারণে উৎপাদিত ফসলে উভয় শরিকের অবিভাজ্য অংশীদারিত্বে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেমনটি হয়ে থাকে উশরী জমিতে উৎপাদিত ফসল থেকে উশর আদায় করার পর বাকি ফসল উভয়ের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করার শর্তে বর্গাচাষ করলে।

بِخِلَافِ مَا اِذَا شَرَطَ صَاحِبُ الْبَذْرِ عُشْرَ الْخَارِجِ لِنَفْسِهِ اَوْ لِلْاٰخَرِ وَالْبَاقِى بَيْنَهُمَا لِاَنَّهُ مُعَيَّنٌ مُشَاعٌ فَلَا يُؤَدِّى اِلَى قَطْعِ الشَّرْكَةِ كَمَا اِذَا شَرَطَا رَفْعَ الْعُشْرِ وَقِسْمَةَ الْبَاقِى بَيْنَهُمَا وَالْاَرْضُ عُشْرِيَّةٌ قَالَ : وَكَذٰلِكَ اِنْ شَرَطَا مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَالسَّوَاقِى مَعْنَاهُ لِاَحَدِهِمَا لِاَنَّهُ اِذَا شُرِطَ لِاَحَدِهِمَا زَرْعُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ اَفْضٰى ذٰلِكَ اِلَى قَطْعِ الشَّرْكَةِ لِاَنَّهُ لَعَلَّهُ لَا يَخْرُجُ اِلَّا مِنْ ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ وَعَلٰى هٰذَا اِذَا شُرِطَ لِاَحَدِهِمَا مَا يَخْرُجُ مِنْ نَاحِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِاٰخَرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَاحِيَةٍ اُخْرٰى وَكَذَا اِذَا شُرِطَ لِاَحَدِهِمَا التِّبْنُ وَلِلْاٰخَرِ الْحَبُّ ـ

অনুবাদ : পক্ষান্তরে যদি বীজদাতা এরূপ শর্ত করে যে, উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ সে নিজে রাখবে অথবা অপরজন নেবে, তারপর বাকি অংশ উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন। [অর্থাৎ এ সুরত বৈধ।] কেননা এটা নির্দিষ্ট হলেও [মোশা] অবিভাজ্য, ফলে তা শরিকানাকে বাতিল করার দিকে ঠেলে দেয় না। যেমনটি হয়ে থাকে উশরী ভূমিতে উশর আদায়ের পর বাকি অংশ উভয়ের মাঝে বণ্টন করার শর্ত করা হলে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অনুরূপ যদি তারা নালার পাশে উৎপাদিত ফসলের শর্ত করে অর্থাৎ যে কোনো একজনের জন্য [তাহলেও বর্গাচাষ চুক্তি বিশুদ্ধ হবে না।] কেননা যদি কোনো একজনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো জায়গার ফসলের শর্ত করা হয় তাহলে এটা অংশীদারিত্বকে বাতিল করার দিকে ঠেলে দেবে। কারণ হতেও পারে যে ঐ নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত আর কোথাও ফসল উৎপাদিত হলো না। এরই উপর অনুমান করা যেতে পারে যদি তারা তাদের একজনের জন্য নির্দিষ্ট এক পার্শ্বের উৎপাদিত ফসল ও অপরজনের জন্য অপর পার্শ্বের উৎপাদিত ফসলের শর্ত করে। [অর্থাৎ এটাও জায়েজ নয়।] অনুরূপ যদি তাদের কোনো একজনের জন্য খড় এবং অপরজনের জন্য শস্যের শর্ত করা হয় [তবে তা জায়েজ হবে না।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ اِنْ شَرَطَا مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ : ৩. তৃতীয় সূরতে মাসআলা হলো, নালা কিংবা পরনালাবিশিষ্ট জমিতে যদিও জমির মালিক ও চাষি এই শর্তে বর্গাচাষ করে যে, এই নালায় যেসব ফসল উৎপন্ন হবে তা জমির মালিক নেবে আর অন্য সকল জমির ফসল চাষি নেবে অথবা এর বিপরীত সুরতে বর্গাচাষের শর্ত করল তাহলে এই বর্গাচাষ বাতিল বলে গণ্য হবে। তদ্রূপ যদি এরূপ শর্তে বর্গাচাষ চুক্তি করে যে, জমির এই পাশে যে ফসল জন্মাবে তা চাষির আর ঐ পাশে যে ফসল জন্মাবে তা জমির মালিকের তাহলে এ বর্গাচাষ চুক্তিও বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ এ সকল সুরতে নির্দিষ্ট কোনো স্থানের উৎপাদিত ফসল যে কোনো একজনের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হচ্ছে। বিধায় এতে উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অবিভাজ্য অংশীদারিত্ব বহাল থাকে না। কেননা এমনও হতে পারে যে, শুধু একজনের স্থানেই ফসল হলো আর অপরজনের নির্দিষ্ট স্থানে কিছুই উৎপাদিত হলো না।

* এখানে اَلْمَاذِيَانَاتُ ও اَلسَّوَاقِيْ দুটি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। مَاذِيَانَاتٌ শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে সংগৃহীত আরবি مُعْرَبٌ শব্দ, আর اَلسَّوَاقِيْ আরবি سَاقِيَةٌ -এর বহুবচন। দুটি শব্দের উভয়টিই নালার চেয়ে বড় আর নদী বা নহরের চেয়ে ছোট খাল বা জলাশয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে শব্দ দুটি একটি অপরটির প্রতিশব্দ। কারো কারো মতে, مَاذِيَانَاتٌ -এর চেয়ে ছোট খালকে سَاقِيَةٌ বলা হয়।

আল্লামা আহমদ ইবনুল মুযাফফার রাযী (র.) তাঁর রচিত কুদূরী কিতাবে এ সংক্রান্ত কিছু ফাওয়ায়েদের মাঝে উল্লেখ করেন যে, বড় খাল বা নদীকে مَاذِيَانَاتٌ বলে, আর তার থেকে যে সকল নালা বা পরনালা বেরিয়ে যায় বিভিন্ন জমিতে পানি সেচের জন্য তাকে سَوَاقِيْ বলে। –[প্রান্ত-টীকা– ২]

قَوْلُهُ وَكَذَا اِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا التِّبْنُ ... : ৪. উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অবিভাজ্য অংশীদারিত্ব না থাকলে বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল হওয়ার চতুর্থ সুরত বা নিয়ম হলো, একজনের জন্য শুধু খড় আর অপরজনের জন্য সম্পূর্ণ ফসলের শর্তে বর্গাচাষ চুক্তি করা। কারণ এ সুরতে এমনও হতে পারে যে, জমিতে প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের কারণে এমন বিপর্যয় আসবে যার ফলে জমিতে শুধু খড়গুলো ছাড়া আর কোনো ফসলই উৎপাদিত হবে না, যার ফলে অবিভাজ্য অংশীদারিত্বে ব্যাঘাত ঘটবে।

এছাড়া যেহেতু ফসলই হলো বর্গাচাষের মূল উদ্দেশ্য, তাই যদি এই ফসলেই এক শরিক অংশীদার না হয় তাহলে কি করে এইরূপ শর্তসহ বর্গাচাষ জায়েজ হবে।

৫. তদ্রূপ যদি এরূপ শর্ত করে যে, খড় উভয়ে ভাগ করে নেবে আর ফসল একজনই ভোগ করবে তাহলেও [মৌলিক উদ্দেশ্য তথা] ফসলের মাঝে উভয়ের অংশীদারিত্ব না থাকায় এই চুক্তি জায়েজ হবে না।

৬. তবে যদি শুধু শস্যকে আধা-আধি বণ্টনের শর্ত করে আর খড়ের ব্যাপারে কোনো আলোচনাই না করে তাহলে এই বর্গাচাষ চুক্তি জায়েজ হবে। কারণ শস্যই হলো বর্গাচাষের মূল উদ্দেশ্য। আর এই সুরতে এর মাঝে উভয়ের অবিভাজ্য অংশীদারিত্ব পাওয়া গেছে। তবে এই সুরতে খড়-এর হকদার কে হবে এ ব্যাপারে ইমাম কুদূরী (র.) -এর অভিমত হলো, তা বীজ সরবরাহকারী পাবে। আর বলখের অধিবাসী মাশায়েখগণের মতে, তাও উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। ইমাম কুদূরীর মতটি এখানে কিয়াস সম্মত। কারণ খড় হলো বীজের বর্ধিত অংশ, বীজ হলো তার মূল। আর যে মূলের মালিক হয় সে উক্ত মূলের বর্ধিত অংশেরও মালিক হবে। আর এর জন্য তার কোনো শর্ত করার প্রয়োজন নেই।

পক্ষান্তরে মাশায়েখে বলখের মতটি হলো তাদের এলাকার উরফ বা প্রচলন অনুসারে আর উরফের কারণে কিয়াসকে বর্জন করা যেতে পারে; বরং যে বিষয়ে চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয় সরাসরি কিছু বলেনি সেসব ক্ষেত্রে উরফের উপর আমল করাই উচিত। এছাড়াও শস্য হলো বর্গাচাষের মূল উদ্দেশ্য। আর খড় হলো তারই সাথের সম্পৃক্ত একটি বিষয়। আর মূলের সাথে কোনো শর্ত আরোপ করা হলে তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদির সাথেও ঐ শর্ত প্রযোজ্য হয়ে থাকে। সুতরাং মূল তথা শস্যকে যেহেতু আধা-আধি ভাগ করার শর্ত করা হয়েছে তাই খড়কে আধা-আধি ভাগ করতে হবে।

৭. অনুরূপ যদি শস্যকে আধা-আধি বণ্টন করার শর্ত করে আর খড় সম্পূর্ণ বীজওয়ালা পাবে এই শর্ত করে তাহলেও তা জায়েজ হবে। কারণ যে সকল শর্ত আকদের দাবির বিপরীত সে সকল শর্তের কারণে আকদ ফাসিদ হয়। আর এখানে খড়কে বীজ ওয়ালার জন্য শর্ত করা এটা আকদের দাবির বিপরীত কোনো শর্ত নয়; বরং এটাই আকদের দাবি।

৮. পক্ষান্তরে যদি খড়কে ঐ শরিকের জন্য শর্ত করা যে বীজ সরবরাহ করেনি তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ যে বীজ সরবরাহ করেনি সে তার [বর্গাচাষের] শর্তের ভিত্তিতে ফসলে অংশীদার হয়। শর্ত না করলে সে অংশীদারিত্বের যোগ্যতা রাখে না। আর যে শর্তের ভিত্তিতে সে খড়ের হকদার হতে চাচ্ছে সেই শর্তটি হলো ফাসিদ শর্ত। কারণ এরূপ শর্তের দ্বারা [মুযারা'আহ বিশুদ্ধ হওয়ার সপ্তম শর্ত তথা] উভয়ের অবিভাজ্য অংশীদারিত্ব বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা এমনও হতে পারে যে, জমি থেকে শুধু খড়ই পাওয়া গেল, কোনো ফসল তাতে জন্মাল না।

অতএব, صُلْبُ عَقْدٍ [চুক্তির মূল] -এর মাঝে ফাসিদ শর্ত থাকার দরুন এইরূপ চুক্তি নাজায়েজ হবে।

لِاَنَّهٗ عَسٰى يُصِيْبُهٗ اٰفَةٌ فَلَا يَنْعَقِدُ الْحَبُّ وَلَا يَخْرُجُ اِلَّا التِّبْنُ وَكَذَا اِذَا شَرَطَ التِّبْنَ نِصْفَيْنِ وَالْحَبَّ لِاَحَدِهِمَا بِعَيْنِهٖ لِاَنَّهٗ يُؤَدِّيْ اِلٰى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِيْمَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ وَهُوَ الْحَبُّ وَلَوْ شَرَطَ الْحَبَّ نِصْفَيْنِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلتِّبْنِ صَحَّتْ لِاشْتِرَاطِهِمَا الشَّرِكَةَ فِيْمَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ ثُمَّ التِّبْنُ يَكُوْنُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ لِاَنَّهٗ نَمَاءُ مِلْكِهٖ وَفِيْ حَقِّهٖ لَا يَحْتَاجُ اِلَى الشَّرْطِ وَالْمُفْسِدُ هُوَ الشَّرْطُ وَهٰذَا سُكُوْتٌ عَنْهُ وَقَالَ مَشَايِخُ بَلْخَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ التِّبْنُ بَيْنَهُمَا اَيْضًا اِعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ فِيْمَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ وَلِاَنَّهٗ تَبَعٌ لِلْحَبِّ وَالتَّبَعُ يَقُوْمُ بِشَرْطِ الْاَصْلِ وَلَوْ شَرَطَا الْحَبَّ نِصْفَيْنِ وَالتِّبْنَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ صَحَّتْ لِاَنَّهٗ حُكْمُ الْعَقْدِ وَاِنْ شَرَطَا التِّبْنَ لِلْاٰخَرِ فَسَدَتْ لِاَنَّهٗ شَرْطٌ يُؤَدِّيْ اِلٰى قَطْعِ الشَّرِكَةِ بِاَنْ لَّا يَخْرُجَ اِلَّا التِّبْنُ وَاسْتِحْقَاقُ غَيْرِ صَاحِبِ الْبَذْرِ بِالشَّرْطِ ـ

অনুবাদ : কেননা হতে পারে ফসলের উপর এমন বিপর্যয় আসবে যার ফলে কোনো শস্যই উৎপাদিত হবে না এবং খড় ছাড়া আর কিছুই গজাবে না তথা অবশিষ্ট থাকবে না। তদ্রূপ যদি খড় আধা-আধি করে এবং শস্য নির্দিষ্ট কোনো একজনের প্রাপ্তির জন্যে শর্ত করা হয়। কেননা এরূপ শর্ত [বার্গাচাষের] মুখ্য বস্তু তথা শস্যের মাঝে অংশীদারিত্বকে বাতিল করার দিকে ঠেলে দেয়। তাই এটাও অবৈধ। তবে যদি তারা শস্য আধা-আধি করে বণ্টন করে নেওয়ার শর্ত করে এবং খড় সম্পর্কে কোনো আলোচনাই না করে তাহলে বর্গাচাষ চুক্তি বিশুদ্ধ হবে। কারণ তারা মৌলিক বিষয়ের [অর্থাৎ শস্যের] মাঝে অংশীদারিত্বের শর্ত আরোপ করেছে। এ অবস্থায় বীজদাতা ব্যক্তি খড়ের মালিক হবে। কেননা এটি তার মালিকানাধীন বস্তুরই বর্ধিত অংশ। আর তার [অর্থাৎ বীজদাতার] ক্ষেত্রে শর্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ শর্তই হলো চুক্তিকে বিনষ্টকারী। আর এখানে তা থেকে চুপ থাকা হয়েছে। আর মাশায়েখে বলখ (র.) বলেন, খড় উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষ যে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলেনি সে বিষয়ে উরফ তথা প্রচলিত রীতির উপর কিয়াস করে তারা একথা বলেন। এছাড়াও খড় হলো শস্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু আর মূলের শর্ত তার সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপরও আরোপিত হয়ে থাকে। আর যদি তারা এই শর্ত করে যে, শস্য আধা-আধি বণ্টিত হবে এবং খড় বীজ সরবরাহকারী পাবে তাহলে [এই শর্ত] বিশুদ্ধ হবে। কারণ এটা [বর্গাচাষ] চুক্তিরই দাবি। তবে যদি অপরজনের জন্য খড়ের শর্ত করে তাহলে চুক্তি ফাসিদ হবে। কারণ এটা এমন একটি শর্ত যা অংশীদারিত্বকে বাতিল করার দিকে ঠেলে দেয়। যেমন জমি থেকে খড় ছাড়া আর কিছুই উৎপাদিত হলো না। অথচ বীজ যে সরবরাহ করেনি সে শর্তের ভিত্তিতে হকদার হয়ে থাকে।

قَالَ : وَإِذَا صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِ لِصِحَّةِ الْاِلْتِزَامِ وَإِنْ لَمْ تُخْرِجِ الْأَرْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ شَرِكَةً وَلَا شَرِكَةَ فِي غَيْرِ الْخَارِجِ وَإِنْ كَانَتْ إِجَارَةً فَالْأَجْرُ مُسَمًّى فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا فَسَدَتْ لِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ فِي الذِّمَّةِ وَلَا تَفُوتُ الذِّمَّةُ بِعَدَمِ الْخَارِجِ قَالَ وَإِذَا فَسَدَتْ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَاسْتِحْقَاقُ الْأَخَرِ بِالتَّسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ فَبَقِيَ النَّمَاءُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ قَالَ : وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى مِقْدَارِ مَا شُرِطَ لَهُ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِسُقُوطِ الزِّيَادَةِ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ لِأَنَّهُ اِسْتَوْفَى مَنَافِعَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَتُهَا إِذْ لَا مِثْلَ لَهَا وَقَدْ مَرَّ فِي الْإِجَارَاتِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বর্গাচাষ চুক্তি যদি সঠিকভাবে সম্পাদিত হয় তবে উৎপাদিত ফসল শর্ত সাপেক্ষে বণ্টন করা হবে। কেননা তারা যা অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছে তা সঠিকই হয়েছে। আর জমিতে কোনো ফসল উৎপাদিত না হলে চাষি কিছুই পাবে না। কেননা সে তো অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ফসলের হকদার হবে। আর এ অংশীদারিত্ব তো উৎপাদিত ফসল ছাড়া অন্য কিছুতে নেই। আর যদি তা ইজারা হয়ে থাকে তাহলে তার শ্রমিকের পারিশ্রমিক তো নির্ধারিত আছে ফলে সে এ নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ছাড়া অন্য কিছুর অধিকারী হতে পারবে না। অপরপক্ষে বর্গাচাষ ফাসিদ হলে তার ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা [এই সুরতে] ন্যায্য পারিশ্রমিক জমির মালিকের জিম্মায় ওয়াজিব হয়। আর যে জিনিস জিম্মায় ওয়াজিব হয় তা ফসল উৎপাদন না হওয়ার কারণে ছুটে যায় না বা তার অধিকার নষ্ট হয় না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর যদি বর্গাচাষ ফাসিদ হয়ে যায়, তাহলে বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তি [সমস্ত] উৎপাদিত ফসলের মালিক হবে। কেননা এগুলো তার মালিকানাধীন বস্তুরই বর্ধিত অংশ। আর অপর ব্যক্তির [ফসলের] অধিকার প্রমাণিত হয় চুক্তির মাধ্যমে। অথচ চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে, ফলে বীজ থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ফসল পুরোটাই বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তির জন্য থেকে যাবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জমির মালিক যদি বীজ দিয়ে থাকে তাহলে চাষি তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। তবে চাষির জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছিল এ পারিশ্রমিকের পরিমাণ তার চেয়ে অধিক হতে পারবে না। কারণ এর অতিরিক্ত পরিমাণ বাদ যাওয়ার ব্যাপারে সে নিজেই রাজি হয়েছে। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, সে [চাষি] তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে তার পরিমাণ যতই হোক না কেন। কেননা জমির মালিক ফাসিদ আকদের মাধ্যমে তার [চাষির] মুনাফাকে পুরোপুরি আদায় করে নিয়েছে, ফলে তার উপর এ মুনাফার পূর্ণ মূল্য দেওয়া আবশ্যক হবে। কেননা মুনাফার অনুরূপ কোনো কিছু নেই [যা দিয়ে সে তার বদলা দেবে] ইজারা অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্গাচাষ পদ্ধতি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত এবং কোন কোন সুরতে বর্গাচাষ বিশুদ্ধ হবে ও কোন কোন সুরতে বিশুদ্ধ হবে না এ সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করার পর মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য ইবারতে বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ বর্গাচাষের হুকুম বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ

১. বর্গাচাষ চুক্তি বিশুদ্ধ হলে এ চুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের বণ্টন প্রক্রিয়া কি হবে?

২. যদি ফসল উৎপাদিত না হয় তাহলে চাষি তার শ্রমের বিনিময় হিসেবে কিছু পাবে কিনা?

৩. বর্গাচাষ চুক্তি অশুদ্ধ হলে উৎপাদিত ফসলের হকদার কে হবে?

৪. অশুদ্ধ বর্গাচাষ চুক্তি ভিত্তিক ফসলের অধিকারী ব্যক্তির জন্য সে ফসল ভোগ করা বৈধ হবে কি না? যদি বৈধ না হয় তাহলে তা কি করবে?

যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ সহকারে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য ইবারতে এ সকল মাসআলার সঠিক সমাধান তুলে ধরেন।

قَوْلُهُ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ ... : এখানে প্রথম মাসআলার সমাধান তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ বর্গাচাষ চুক্তিতে উৎপাদিত ফসলকে যে প্রক্রিয়ায় বণ্টন করার শর্ত করা হয়েছিল সে প্রক্রিয়ায়ই বণ্টন করা হবে। কারণ শরিয়তের দৃষ্টিতে তাদের চুক্তি যেহেতু বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে তাই এ চুক্তিতে যে প্রক্রিয়ায় ফসল বণ্টন করাকে তারা নিজেদে উপর ধার্য করে নিয়েছে সে প্রক্রিয়ায় বণ্টন করার ক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনোরূপ বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এ কথাটাই মুসান্নিফ (র.) لِصِحَّةِ الْاِلْتِزَامِ বলে বুঝাতে চেয়েছেন।

قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُخْرِجِ الْأَرْضُ شَيْئًا فَلَا ... : ইবারতে মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় মাসআলার সমাধান উল্লেখ করেন। অর্থাৎ যদি বিশুদ্ধ বর্গাচাষ চুক্তিতে জমিতে কোনো ফসল উৎপাদিত না হয় তাহলে চাষি কিছুই পাবে না। কারণ চাষি ফসলের হকদার হয়েছিল অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। আর উৎপাদিত ফসল ছাড়া অন্যকোনো বিষয়ে উভয়ের অংশীদারিত্বের কোনো চুক্তি তাদের মালে হয়নি। সুতরাং যেহেতু ফসলই উৎপাদিত হয়নি আর এছাড়া অন্যকোনো জিনিসের হকদারও নয়। তাই ফসল উৎপাদিত না হলে সে কিছুই পাবে না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, বর্গাচাষ চুক্তি তো চুক্তির শুরুর বিবেচনায় ইজারা স্বরূপ, আর কেউ কাউকে শ্রমিক হিসেবে ইজারা নিলে তার মজুরি প্রদান করা তার উপর আবশ্যক হয়। সেই ভিত্তিতে বিশুদ্ধ বর্গাচাষও ভূমি মালিকের উপর চাষিকে তার মজুরি দিয়ে দেওয়া আবশ্যক হওয়ার কথা। এই প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন– وَإِنْ كَانَتْ إِجَارَةً فَالْأَجْرُ مُسَمًّى অর্থাৎ যদি এটা মনে করা হয় যে, বর্গাচাষ চুক্তিটা একদিক বিবেচনায় ইজারা চুক্তি তাহলেও ভূমি মালিকের উপর চাষির কোনো মজুরি দেওয়া আবশ্যক হবে না। কারণ চুক্তির মাঝে চাষির মজুরি কি হবে তা উল্লেখ করা ছিল। তা হলো উৎপাদিত ফসলের অংশবিশেষ। আর যেহেতু সে প্রাপ্ত হয়নি তাই অন্য কোনো মজুরি পাওয়ার সে হকদার হবে না।

প্রশ্ন হতে পারে যে, কেউ যদি নির্দিষ্ট কোনো মজুরি ধার্য করে কাউকে মজুর রাখে এবং তার মাধ্যমে নিজের কাজ সমাপ্ত করানোর পর তার মজুরি তার হাতে হস্তান্তর করার পূর্বেই তা [হালাক হয়ে যায়] ধ্বংস বা হারিয়ে যায় তাহলে মালিকের উপর ঐ শ্রমিককে পুনরায় তার ন্যায্য মজুরি দেওয়া আবশ্যক হয়। সুতরাং এই মাসআলায়ও যেহেতু ফসলের মাঝে চাষির মজুরি নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু চাষির হাতে তা হস্তান্তরের পূর্বেই ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, তাই ভূমি মালিকের উপর চাষিকে তার ন্যায্য মূল্য দিয়ে দেওয়া আবশ্যক হওয়া উচিত। এই প্রশ্নের উত্তর হলো, এ মাসআলায় চাষির মজুরি তার কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার পর তা নষ্ট হয়েছে, তাই মালিককে পুনরায় তার মজুরি দেওয়া আবশ্যক হবে না। কথাটির ব্যাখ্যা হলো, চাষির মজুরি হলো জমির উৎপাদিত ফসল যার মূলে রয়েছে বীজ। সুতরাং বীজ যেহেতু চাষির হাতে এসে গেছে, যেন সে তার মজুরি পেয়ে গেছে, তারপর তা তার হাতে নষ্ট হয়েছে। আর শ্রমিকের মজুরি তার হাতে দিয়ে দেওয়ার পর হারিয়ে গেলে মালিকের উপর পুনরায় মজুরি দেওয়া আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا فَسَدَتْ ... : তদ্রূপ বর্গাচাষ চুক্তি [ফাসিদ] অশুদ্ধ হলেও চাষি তার ন্যায্য পারিশ্রমিকের হকদার হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্গাচাষের সাথে তাকে কিয়াস করা যাবে না। কারণ বর্গাচাষ ফাসিদ হলে জমিতে ফসল হোক বা না হোক চাষির শ্রমের পারিশ্রমিক জমির মালিকের জিম্মায় আবশ্যক হয়। ফলে ফসল না হওয়ার কারণে যা জিম্মায় আবশ্যক হয়েছে তা তার থেকে রহিত হবে না। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ বর্গাচাষের চাষির পারিশ্রমিকটা ভূমি মালিকের জিম্মায় আবশ্যক হয় না; বরং জমির ফসলের উপর আবশ্যক হয়। ফলে নষ্ট হয়ে গেলে সে কারো কাছে কিছুই প্রাপ্য থাকে না।

قَوْلُهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ ... : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) তৃতীয় মাসআলার সমাধান উল্লেখ করেন। অর্থাৎ বর্গাচাষ যদি অশুদ্ধ হয় তাহলে উৎপাদিত সম্পূর্ণ ফসলের হকদার হবে বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তি। কারণ উৎপাদিত ফসল সবই বীজের বর্ধিত অংশ। তাই যে বীজের মালিক সে তার থেকে বর্ধিত অংশের মালিক হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। তবে যে বীজ সরবরাহ করেনি সে বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদনের কারণে ঐ ফসলের কিয়দংশের হকদার হয়ে থাকে। সুতরাং যেহেতু এখানে চুক্তিই শুদ্ধ হয়নি তাই সে ফসলের হকদার হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা রাখে না। ফলে সম্পূর্ণ ফসলের মালিক বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তিই থেকে যাবে।

অতএব যদি জমির মালিক নিজেই বীজ সরবরাহ করে থাকে তাহলে সে সমস্ত উৎপাদিত ফসলের মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু এমতাবস্থায় সে ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে যেহেতু শ্রমিকের কাছ থেকে তার শ্রমের সুবিধা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে নিয়েছে তাই তার উপর শ্রমিকের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া আবশ্যক হবে। কারণ শ্রমের পরিবর্তে অনুরূপ শ্রম ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

তদ্রূপ শ্রমিক যদি বীজ সরবরাহ করে থাকে তাহলে সে সমস্ত উৎপাদিত ফসলের মালিক হয়ে যাবে এবং ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে জমির সুবিধা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দেওয়ার কারণে তাকে ন্যায্য ভাড়া প্রদান করতে হবে। কেননা জমির যে সুবিধা সে ভোগ করে নিয়েছে তার অনুরূপ বস্তু ফেরত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে যদি জমির মালিক কর্তৃক শুধু জমি ও গরু সরবরাহ করার কারণে বর্গাচাষ ফাসিদ হয়ে থাকে তাহলে বীজ সরবরাহকারীর উপর জমি ও গরু উভয়ের ন্যায্য ভাড়া আদায় করা আবশ্যক হবে।

মোটকথা, সকল প্রকার ফাসিদ বর্গাচাষ চুক্তির মাঝেই বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণ ফসলের হকদার হবে এবং অপর পক্ষ যে যে জিনিস এই বর্গাচাষের মাঝে বিনিয়োগ করেছে তার ন্যায্য মূল্য কিংবা ভাড়ার হকদার হবে। তবে এক্ষেত্রে যদি তার বিনিয়োগকৃত শ্রমের মূল্য বা জমি কিংবা গরুর ভাড়ার পরিমাণ উৎপাদিত ফসল থেকে তার জন্যে যে পরিমাণ অংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে সেই বেশি অংশটুকু তাকে দেওয়া হবে কিনা এ ব্যাপারে আমাদের ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে, উৎপাদিত ফসল থেকে যে পরিমাণ তার জন্য শর্ত করা হয়েছিল তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য কিংবা জমির ন্যায্য ভাড়ার পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হলে বেশি অংশ সে প্রাপ্য হবে না। কারণ বর্গাচাষ চুক্তির মাধ্যমে সে যে অতিরিক্ত মূল্য কিংবা ভাড়াকে বাদ দিতে সে সম্মত ছিল।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, তার ন্যায্য মূল্য বা ভাড়া যে পরিমাণ হবে তাই তাকে দিতে হবে। চাই তার পরিমাণ উৎপাদিত ফসল থেকে তার জন্য শর্তকৃত অংশের পরিমাণ থেকে যতই বেশি হোক না কেন। কারণ বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তি তার শ্রম, জমি ও গরু ইত্যাদি থেকে পরিপূর্ণ সুবিধাই ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে অবৈধভাবে আদায় করে নিয়েছে। তাই তার উপর আবশ্যক ছিল সেই সুবিধাগুলোকে হুবহু ফেরত দেওয়া। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, তাই তাকে তার মূল্য বা ন্যায্য ভাড়া পরিপূর্ণভাবেই দিতে হবে।

وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِ أَرْضِهِ لِأَنَّهُ إِسْتَوْفَى مَنَافِعَ الْأَرْضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَيَجِبُ رَدُّهَا وَقَدْ تَعَذَّرَ وَلَا مِثْلَ لَهَا فَيَجِبُ رَدُّ قِيْمَتِهَا وَهَلْ يُزَادُ عَلَى مَا شُرِطَ لَهُ مِنَ الْخَارِجِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ حَتَّى فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَعَلَى الْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّ لَهُ مُدْخَلًا فِي الْإِجَارَةِ وَهِيَ إِجَارَةٌ مَعْنًى وَإِذَا اسْتَحَقَّ رَبُّ الْأَرْضِ الْخَارِجَ لِبَذْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ طَابَ لَهُ جَمِيْعُهُ لِأَنَّ النَّمَاءَ حَصَلَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوْكَةٍ لَهُ وَإِنِ اسْتَحَقَّهُ الْعَامِلُ أَخَذَ قَدْرَ بَذْرِهِ وَقَدْرَ أَجْرِ الْأَرْضِ وَتَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ لِأَنَّ النَّمَاءَ يَحْصُلُ مِنَ الْبَذْرِ وَيَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَفَسَادُ الْمِلْكِ فِي مَنَافِعِ الْأَرْضِ أَوْجَبَ خُبْثًا فِيْهِ فَمَا سَلِمَ لَهُ بِعِوَضٍ طَابَ لَهُ وَمَا لَا عِوَضَ لَهُ تَصَدَّقَ بِهِ .

অনুবাদ : আর যদি চাষির পক্ষ থেকে বীজ প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে মালিক তার জমির ন্যায্য ভাড়া পাবে। কেননা সে [চাষি] ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে ভূমির মুনাফা পরিপূর্ণরূপেই অর্জন করে নিয়েছে, তাই তার উপর ওয়াজিব হলো সে মুনাফাকে ফেরত দেওয়া, কিন্তু তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব, আর তার অনুরূপ কোনো বস্তুও নেই। অতএব তাকে তার মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে। তবে জমির মালিকের জন্য [উৎপাদিত ফসল থেকে] যে পরিমাণ প্রদানের শর্ত করা হয়েছিল তার অধিক দেওয়া যাবে কিনা এ বিষয়টি ফকীহগণের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ, আমরা এবিষয়টি বর্ণনা করে এসেছি। আর যদি এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে জমি ও গরু সরবরাহ করার কারণে বর্গাচাষ ফাসিদ হয়ে থাকে তাহলে চাষির উপর জমি ও গরুর ন্যায্য ভাড়া দেওয়া আবশ্যক হবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা গরুও ইজারাস্বরূপ প্রদান করা হয়ে থাকে, আর বর্গাচাষও অর্থগত দিক থেকে ইজারার মতোই। ফাসিদ বর্গাচাষের ক্ষেত্রে বীজ সরবরাহ করার কারণে যদি জমির মালিক উৎপাদিত ফসলের হকদার হয় তাহলে তার জন্য সম্পূর্ণ উৎপাদিত ফসল গ্রহণ করা জায়েজ হবে। কেননা বর্ধিত ফসল তার মালিকানা জমিতেই উৎপাদিত হয়েছে। আর যদি চাষি সম্পূর্ণ ফসলের হকদার হয় তাহলে সে বীজ ও জমির ভাড়ার সমপরিমাণ গ্রহণ করবে এবং অতিরিক্ত অংশ সদকা করে দেবে। কারণ এ অতিরিক্ত অংশ বীজ থেকে অর্জিত হয়েছে আর জমি থেকে উদ্গত হয়েছে। আর জমি থেকে অর্জিত মুনাফার মালিকানায় অশুদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বিনিময়ের ভিত্তিতে যা এ অশুদ্ধতামুক্ত রয়েছে তা তার জন্য হালাল হবে। আর যার কোনো বিনিময় দেওয়া হয়নি তা সে সদকা করে দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا اسْتَحَقَّ رَبُّ الْأَرْضِ الْخَارِجَ ... : এই ইবারতে মুসান্নিফ (র.) চতুর্থ মাসআলার সমাধান উল্লেখ করছেন। তা হলো, উপরের বর্ণনা অনুসারে অশুদ্ধ বর্গাচাষ চুক্তির মাঝে বীজ সরবরাহ করার কারণে হয়তো জমির মালিক সমস্ত ফসলের মালিক হবে কিংবা চাষি সমস্ত ফসলের মালিক হবে। সুতরাং যদি জমির মালিক সমস্ত ফসলের মালিক হয় তাহলে তার জন্য সেই ফসল ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে জায়েজ হবে। কারণ তার বীজ থেকে উৎপাদিত ফসলের এ বর্ধিত অংশ তার নিজস্ব জমি থেকেই উদ্গত হয়েছে।

আর যদি চাষি বীজ সরবরাহ করার কারণে সমস্ত ফসলের মালিক হয় তাহলে তার জন্য সমস্ত ফসল ভোগ করা জায়েজ হবে না; বরং সে যে পরিমাণ বীজ দিয়েছিল এবং জমির ভাড়া বাবদ যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করেছে ফসলের মধ্য থেকে সে পরিমাণ রেখে বাকি ফসল সদকা করে দেওয়া আবশ্যক হবে। কারণ ফসল যদিও বীজের বর্ধিত অংশ কিন্তু জমিনের সহযোগিতা ছাড়া উদ্গত ও উৎপাদিত হতে পারে না। অথচ বর্গাচাষ চুক্তি বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে জমি থেকে সে যে সুবিধাটি ভোগ করে নিয়েছে তা ছিল অবৈধ। ফলে জমির সুবিধার মালিকানা অবৈধ হওয়ার কারণে এ অবৈধ মালিকানা থেকে অর্জিত লাভটা ভোগ করাও তার জন্য অবৈধ হবে। তাই জমির ভাড়া হিসেবে যা সে পরিশোধ করেছে সে পরিমাণ ফসলের সাথে বীজ যে পরিমাণ ছিল তা যোগ করে যে পরিামণ হয় তা ব্যতীত অবশিষ্ট ফসল তার জন্য ভোগ করা বৈধ হবে না।

তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, চাষি জমি থেকে যে সুবিধা ভোগ করেছে বর্গাচাষ চুক্তি অবৈধ হওয়ার কারণে তা ভোগ করা ছিল অবৈধ। কিন্তু যখন সে ফসল উৎপাদনের পর জমির ভাড়া পরিশোধ করে দিল তখন তো তা জায়েজ হয়ে যাওয়ার কথা। যেমনিভাবে প্রথম থেকে জমি ইজারা নিয়ে তাতে ফসল চাষ করলে তা জায়েজ হয়ে থাকে।

এছাড়া যদি জমির সুবিধা ভোগ অবৈধ হওয়ার কারণে চাষির জন্য এ অবৈধ সুবিধার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল ভোগ করা নাজায়েজ হয় তাহলে জমির মালিকের জন্য অবৈধভাবে শ্রমিকের সুবিধা ভোগ করার কারণে এই অবৈধ সুবিধার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল ভোগ করা নাজায়েজ হওয়ার কথা। কিন্তু তা জায়েজ হলো কি করে?

এ প্রশ্ন দুটির মধ্য থেকে 'ইনায়া' গ্রন্থকার আল্লামা আকমালুদ্দীন বরকতী (র.) দ্বিতীয় প্রশ্নটি উল্লেখ করে তার উত্তরে বলেন যে, এখানে জমি ও শ্রম উভয়ের সুবিধা অন্যায়ভাবে ভোগ করা হলেও জমির সুবিধার তুলনায় শ্রমিকের সুবিধাটাকে গৌণ করে দেখা হয়েছে। কারণ শ্রমিকের সুবিধা ছাড়া জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব। কিন্তু জমি ছাড়া বীজ থেকে কখনো ফসল ফলানো সম্ভব নয়। সুতরাং যেহেতু বীজ থেকে জমি ছাড়া কোনোক্রমেই ফসল জন্মানো সম্ভব নয়, তাই ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্জিত জমির সুবিধায় অর্জিত ফসল বীজওয়ালার জন্য ভোগ করা বৈধ হবে না।

আর প্রথম প্রশ্নটির উত্তর কিংবা তার উল্লেখ কোনো শরাহতে বা ব্যাখ্যা গ্রন্থে পাওয়া যায়নি; বরং হানাফী ফিকহশাস্ত্রের কিতাবাদিতে যথা দুররুল মুখতার, ফতোয়ায়ে শামী ও বাদাইউস সানাইতে মাসআলাটিকে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে ওলামায়ে কেরামের কোনো দ্বিমত উল্লেখ করা হয়নি।

قَالَ : وَإِذَا عَقَدَتِ الْمُزَارَعَةَ فَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِنَ الْعَمَلِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْمُضِيُّ فِي الْعَقْدِ إِلَّا بِضَرَرٍ يَلْزَمُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا لِيَهْدِمَ دَارَهُ وَإِنِ امْتَنَعَ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَمَلِ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ بِالْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ ضَرَرٌ وَالْعَقْدُ لَازِمٌ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ عُذْرٌ يُفْسَخُ بِهِ الْإِجَارَةَ فَيُفْسَخُ بِهِ الْمُزَارَعَةَ . قَالَ : وَلَوْ امْتَنَعَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ مِنْ قِبَلِهِ وَقَدْ كَرَبَ الْمُزَارِعُ الْأَرْضَ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِيْ عَمَلِ الْكِرَابِ قِيْلَ هٰذَا فِي الْحُكْمِ أَمَّا فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى يَلْزَمُهُ اِسْتِرْضَاءُ الْعَامِلِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ فِيْ ذٰلِكَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যদি বীজদাতা শ্রম বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকে তাহলে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। কেননা তার জন্য নিজের কোনো ক্ষতি সাধন করা ব্যতীত চুক্তি করা সম্ভব নয়। সুতরাং এটা এমন হলো যেন কেউ নিজের একটি ঘর ধসিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করল [এরপর সে [অর্থাৎ মালিক] ঘর ভাঙ্গা থেকে বিরত রইল তাহলে কাজি তাকে ঘর ভাঙ্গার জন্য বাধ্য করবে না]। আর যদি বীজ সরবরাহকারী নয় এমন ব্যক্তি শ্রম বিনিয়োগ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তাহলে কাজি তাকে শ্রম বিনিয়োগে বাধ্য করতে পারবে। কেননা চুক্তি পূর্ণ করাতে তার কোনো ক্ষতি নেই। অথচ চুক্তি পুরা করা তার উপর অপরিহার্য। যেমন– ইজারা চুক্তি পূর্ণ করা অপরিহার্য। তবে যদি এমন কোনো ওজর বা অসুবিধা এসে যায়, যার দরুন ইজারা রহিত হয়ে যায়। এ জাতীয় কারণ দেখা দিলে বর্গাচাষ চুক্তিও রহিত হয়ে যাবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, চাষি জমিতে চাষ কার্য সম্পূর্ণ করার পর যদি জমির মালিক বর্গাচাষে অসম্মতি জানায় এমতাবস্থায় যে বীজ সরবরাহের দায়িত্ব তার উপর ধার্য করা হয়েছিল, তাহলে চাষি তার চাষের বিনিময়ে কিছুই পাবে না। বলা হয়, এটি হচ্ছে আইনের কথা। কিন্তু নৈতিকতার দৃষ্টিতে জমির মালিকের উপর আবশ্যক হবে চাষি ব্যক্তিকে রাজি-খুশি করানো। কেননা সে চাষিকে এর [বর্গাচাষের চুক্তি করার] মাধ্যমে ধোঁকা দিয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোন প্রকারের বর্গাচাষ চুক্তিকে চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের উপর বহাল রাখা আবশ্যক আর কোন ধরনের চুক্তি বহাল রাখা আবশ্যক নয়; বরং তাদের যে কেউ ইচ্ছা করলে তা বাতিল করতে পারে, আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) এ বিষয়ে আলোচনা করছেন।

এক্ষেত্রে বিধান হলো, বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যদি চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষের কেউ তা বাতিল করতে চায় তাহলে তার দুই সুরত হতে পারে। জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে কেউ এমন ইচ্ছা পোষণ করবে অথবা বীজ রোপণ করার পর বর্গাচাষ বাতিল করার ইচ্ছা করবে। সুতরাং যদি বীজ জমিতে রোপণ করার পর দুই পক্ষের কেউ বর্গাচাষ বাতিল করতে চায় তাহলে তার জন্য তখন তা বাতিল করা বৈধ হবে না; বরং কাজি তাকে বিনিয়োগ চালিয়ে যেতে বাধ্য করবে। তবে যদি এমন কোনো ওজর-আপত্তি দেখা দেয় যেরূপ ওজর-আপত্তির কারণে ইজারা চুক্তিকে বাতিল করা জায়েজ তাহলে তা বাতিল করতে পারবে।

আর যদি বীজ জমিতে বপন করার পূর্বে কেউ এ চুক্তি বাতিল করতে চায় তাহলে বীজদাতার জন্য তা বৈধ হবে। আর যে বীজ সরবরাহ করেনি তার জন্য তা বৈধ হবে না। সুতরাং যে বীজ সরবরাহ করেনি সে যদি বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর [বীজ রোপণের পূর্বে] শ্রম বিনিয়োগ করতে অস্বীকার করে তাহলে কাজি তাকে শ্রম বিনিয়োগে বাধ্য করবেন। কারণ চুক্তি পূর্ণ করলে তার তাৎক্ষণিক কিংবা পরবর্তীতে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। তবে যদি তার এমন কোনো ওজর-আপত্তি থাকে যে আপত্তির কারণে ইজারা চুক্তিকে বাতিল করা যায় তাহলে কাজি তাকে শ্রম বিনিয়োগে বাধ্য করতে পারবেন না।

পক্ষান্তরে যদি বীজদাতা ব্যক্তি জমিতে তার বীজ রোপণের পূর্বে শ্রম বিনিয়োগ করতে অস্বীকার করে তাহলে কাজি তাকে শ্রম বিনিয়োগে বাধ্য করতে পারবেন না। কারণ তার পক্ষে চুক্তিকে বহাল রাখতে হলে সাময়িক কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। যেমন যে বীজ সে বপন করার ইচ্ছা করেছিল হতে পারে সে বীজ তার ঘরের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা এরূপ অন্য এমন কোনো প্রয়োজন এসে গেছে যেখানে সে তা ব্যবহার করলে নগদ উপকৃত হতে পারে। অথচ এখানে তা বপন করলে সে তার থেকে নগদ উপকার লাভ করতে সক্ষম নয়। আর এটা তার এক ধরনের ক্ষতি।

সুতরাং এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে তার কোনো একটি ঘর ধসিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রমিককে ইজারা রাখল। তারপর তা ধসিয়ে দিতে অসম্মত হলো। এ সুরতে শ্রমিকগণ যদি কাজির নিকট বিচার প্রার্থী হয় তাহলে কাজি ঐ ঘরের মালিককে ঘর ধসানোর কাজে বাধ্য করতে পারবেন না। কারণ এতে ঘরের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তদ্রূপ উপরিউক্ত বর্গাচাষেও যদি বীজদাতাকে চুক্তি বহাল রাখতে বাধ্য করা হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে তাকে বাধ্য করা বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ وَلَوِ امْتَنَعَ رَبُّ الْاَرْضِ الخ : আলোচ্য বিধানের সুরতে মাসআলা হলো, কেউ কারো সাথে বর্গাচাষের চুক্তি করল। উক্ত চুক্তিতে একথা ধার্য করা হলো যে, জমির মালিক বীজ সরবরাহ করবে। সুতরাং চুক্তি মতো চাষি জমিকে চাষ করে বীজ বপনের উপযোগী করে তুলল। এ মুহূর্তে যদি বীজ সরবরাহকারী জমির মালিক বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল করতে চায়, তাহলে উপরে বর্ণিত বিধান অনুসারে তাকে চুক্তি বহাল রাখতে বাধ্য করা যাবে না। সুতরাং বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল করেই দিতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো চাষি যে বর্গাচাষ করার আশায় জমিতে হালচাষ করল এবং জমিকে বীজ বপনের উপযোগী করে তুলল সে এর কোনো বিনিময় পাবে কিনা?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, চাষি বিচারের দৃষ্টিতে তার হালচাষের বিনিময় হিসেবে কিছুই পাওয়ার অধিকার রাখে না। কারণ সে হালচাষ করতে গিয়ে নিজের যে পরিমাণ শ্রমটুকু ব্যয় করেছে এটা হলো একটি [মানফা'আত বা] সুবিধা মাত্র, চুক্তি করা ব্যতীত যার কোনো মূল্যমান থাকে না। আর চুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশ দ্বারা তার মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু চুক্তি ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে ফসল তো আর হয়নি, তাই সে এই শ্রমের কোনো বিনিময় পাওয়ার হকদারও নয়।

তবে ওলামায়ে কেরাম বলেন, এই বিধান তো হলো আইনের দৃষ্টিতে কিন্তু নৈতিকতার দৃষ্টিতে জমির মালিকের উপর দায়িত্ব হলো চাষিকে তার এ শ্রমের কিছু বিনিময় দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া। কারণ সে বর্গাচাষের কথা বলে তাকে ধোঁকা দিয়েছে যার ফলে সে অযথা নিজের শ্রম ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে দুনিয়ার আইনে সে কোনো বিনিময় প্রাপ্য না হলেও আল্লাহর আদালতে সে জমির মালিকের কাছ থেকে এই শ্রমের বিনিময় প্রাপ্য।

قَالَ : وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ اِعْتِبَارًا بِالْإِجَارَةِ وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ فِي الْإِجَارَاتِ فَلَوْ كَانَ دَفَعَهَا ثَلٰثَ سِنِيْنَ فَلَمَّا نَبَتَ الزَّرْعُ فِي السَّنَةِ الْأُوْلٰى وَلَمْ يَسْتَحْصِدْ حَتّٰى مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ تُرِكَ الْأَرْضُ فِيْ يَدِ الْمُزَارِعِ حَتّٰى يَسْتَحْصِدَ الزَّرْعُ وَيَقْسِمُ عَلَى الشَّرْطِ وَتَنْتَقِضُ الْمُزَارَعَةُ فِيْمَا بَقِيَ مِنَ السَّنَتَيْنِ لِأَنَّ فِيْ إِبْقَاءِ الْعَقْدِ فِي السَّنَةِ الْأُوْلٰى مُرَاعَاةَ الْحَقَّيْنِ بِخِلَافِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ ضَرَرٌ بِالْعَامِلِ فَيُحَافَظُ فِيْهِمَا عَلَى الْقِيَاسِ وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ بَعْدَ مَا كَرَبَ الْأَرْضَ وَحَفَرَ الْأَنْهَارَ اِنْتَقَضَتِ الْمُزَارَعَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ إِبْطَالُ مَالٍ عَلَى الْمُزَارِعِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ بِمُقَابَلَةِ مَا عَمِلَ كَمَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের কোনো একজন মারা যায় তাহলে বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ইজারার উপর কিয়াস করে এ বিধান দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ইজারা অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং যদি ভূমির মালিক [উদাহরণ স্বরূপ] তিন বছরের জন্য জমি বর্গা দিয়ে থাকে এবং প্রথম বছর ফসল উদ্গত হওয়ার পর তা কাটার পূর্বেই যদি জমির মালিক মারা যায় তাহলে ফসল কাটা পর্যন্ত এ জমি চাষির হাতেই থাকবে। ফসল কাটার পর তা শর্ত মোতাবেক বণ্টন করা হবে। আর বাকি দুই বছরের ক্ষেত্রে বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা প্রথম বছরে চুক্তি বহাল রাখার কারণ হলো উভয় পক্ষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের হুকুম এর থেকে ভিন্নতর। কেননা [বর্গাচাষ বাতিল করে দিলে] এতে চাষীর কোনো ক্ষতি নেই। ফলে এ দু বছরের ক্ষেত্রে [বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল করার মাধ্যমে] কিয়াসকে অক্ষুণ্ন রাখা হবে। জমিতে হাল চাষ ও পানির নালা খনন করার পর বীজ বপনের পূর্বেই যদি জমির মালিক মারা যায়। তাহলে বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এতে চাষির কোনো মাল নষ্ট করা হয় না এবং চাষি এতে যে শ্রম বিনিয়োগ করেছে তার বিনিময়ে সে কিছুই পাবে না। যেমন এ সম্পর্কে আমরা অচিরেই বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ : চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের কোনো একজন মারা গেলে বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এই মূলনীতির আওতায় মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য ইবারতে কয়েকটি সূরতে মাসআলা তুলে ধরেন। তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হলো নিম্নরূপ–

১. বর্গাচাষ চুক্তি চলাকালে যদি চুক্তি সম্পাদনকারী দুজনের মধ্য থেকে চাষি মারা যায় তাহলে সর্বাবস্থায় বর্গাচাষ চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। আর যদি জমির মালিক মারা যায় তাহলে দেখতে হবে জমিতে বীজ বপনের আগে মারা গেছে না বীজ বপনের পরে মারা গেছে।

২. যদি বীজ রোপণ করার পূর্বে জমিতে হালচাষ করার পর মারা যায়, তাহলে বর্গাচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং চাষি জমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে যে শ্রম দিয়েছে তার কোনো বিনিময় পাবে না।

৩. আর যদি বীজ বপনের পর জমিতে ফসল উদ্গত হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলেও বর্গাচাষ বাতিল হয়ে যাবে এবং চাষি কোনো বিনিময় পাবে না।

৪. আর যদি ফসল উদ্গত হওয়ার পর ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে জমির মালিক মারা যায় তাহলে ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত চাষির হাতে জমি থাকবে। অর্থাৎ চুক্তি বাতিল হওয়াকে ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে। আর ফসল কাটা হলে চাষি ও জমির মালিকের ওয়ারিশদের মাঝে তা বণ্টন করা হবে।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত চার সুরতের সকল সুরতেই জমির মালিক কিংবা চাষি মারা যাওয়ার সাথে সাথে বর্গাচুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়াই হলো কিয়াসের দাবি। ইজারার উপর কিয়াস করে বর্গাচুক্তিতেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। কারণ বর্গাচুক্তিতেও এক ধরনের ইজারা রয়েছে।

আর ইজারা চুক্তির দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষ মারা গেলে চুক্তি বাতিল হওয়ার কারণ হলো– এতে চুক্তির মাধ্যমে একজনের প্রাপ্য সুবিধা কিংবা পারিশ্রমিকের মালিক আরেকজনকে বলতে হয়, কারণ ব্যক্তি মারা গেলে তার মালিকানাধীন সব কিছুরই মালিক হয় তার ওয়ারিশগণ। আর একজনের পারিশ্রমিক কিংবা প্রাপ্য সুবিধার মালিক আরেকজন হওয়া জায়েজ নেই। সুতরাং ইজারার ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের একজন মারা গেলে ইজারা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। তাই বর্গাচুক্তির মাঝেও ঠিক একই বিধান প্রযোজ্য হবে। কারণ এটাও এক প্রকার ইজারা। এই ভিত্তিতে উল্লিখিত চার সুরতের সকল সুরতেই মারা যাওয়ার সাথে সাথে বর্গাচুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু শুধু কেবল চতুর্থ সুরতে চাষির স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে ইসতিহসানের ভিত্তিতে ফসল কাটা পর্যন্ত চুক্তিকে বহাল রাখা হয়েছে। কারণ চুক্তি বাতিল হয়ে গেলে এই সুরতে চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পক্ষান্তরে বাকি তিন সুরতে চাষির কোনো হক নষ্ট হয় না। বিধায় তাতে চুক্তি বহাল রাখারও কোনো প্রয়োজন নেই।

এ কথাটি বুঝানোর জন্যই ইমাম কুদূরী (র.) ... فَلَوْ كَانَ دَفَعَهَا ثَلَاثَ سِنِيْنَ এই ইবারতে উল্লিখিত উদাহরণটি পেশ করেন। অর্থাৎ তিন বছরের জন্য বর্গা দেওয়ার পর প্রথম বছর ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়ার আগে জমির মালিক মারা গেলে ঐ বছরের ফসল কাটা পর্যন্ত ইসতিহসানের ভিত্তিতে চুক্তি বহাল থাকবে। আর পরবর্তী দুই বছরের জন্য চুক্তি ঠিক রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই পরবর্তী দুই বছরের চুক্তি কিয়াসের দাবি অনুসারে বাতিল সাব্যস্ত হবে।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, চুক্তি বাতিল হওয়ার অর্থ হলো মরে যাওয়া ব্যক্তির সাথে কৃত চুক্তির ভিত্তিতে বর্গাচাষ এখন আর চলবে না; বরং বর্গাদার ব্যক্তির উচিত হবে জমির মালিকের ওয়ারিশদের সাথে পুনরায় চুক্তি নবায়ন করে নেওয়া। যদি তারা পূর্বের চুক্তিতে সম্মতি দিয়ে দেয় তাহলেও যথেষ্ট হবে।

আর যেসব সুরতে বর্গাচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে সেসব সুরতে চাষি জমি চাষাবাদ করতে গিয়ে যে শ্রম ব্যয় করেছে তার কোনো মূল্য সে এ জন্য পাবে না যে, তার শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ফসলের কিয়দংশের মাধ্যমে। সুতরাং যেহেতু ফসল হয়নি তাই বিনিময়ও পাবে না।

قَوْلُهُ عَلٰى مَا نُبَيِّنُهُ اِنْشَاءَ اللّٰهُ : দ্বারা পরবর্তীতে উল্লিখিত لِاَنَّ الْمَنَافِعَ اِنَّمَا تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ ইবারতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَإِذَا فُسِخَتِ الْمُزَارَعَةُ بِدَيْنٍ فَادِحٍ لَحِقَ صَاحِبَ الْأَرْضِ فَاحْتَاجَ إِلَى بَيْعِهَا فَبَاعَ جَازَ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِمَا كَرَبَ الْأَرْضَ وَحَفَرَ الْأَنْهَارَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ إِنَّمَا تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ وَهُوَ إِنَّمَا قُوِّمَ بِالْخَارِجِ فَإِذَا انْعَدَمَ الْخَارِجُ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَلَوْ نَبَتَ الزَّرْعُ وَلَمْ يَسْتَحْصِدْ لَمْ تُبَعِ الْأَرْضُ فِي الدَّيْنِ حَتَّى يُسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ لِأَنَّ فِي الْبَيْعِ إِبْطَالَ حَقِّ الْمُزَارِعِ وَالتَّأْخِيرُ أَهْوَنُ مِنَ الْإِبْطَالِ وَيُخْرِجُهُ الْقَاضِي مِنَ الْحَبْسِ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بِالدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَمَّا امْتَنَعَ بَيْعُ الْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ هُوَ ظَالِمًا وَالْحَبْسُ جَزَاءُ الظُّلْمِ ـ

অনুবাদ : জমির মালিক যদি বড় কোনো ঋণের দায়গ্রস্ততার দরুন জমি বিক্রি করার প্রয়োজন বোধ করে এবং বর্গাচুক্তি ভঙ্গ করে জমি বিক্রি করে দেয় তাহলে এটা জায়েজ হবে। যেমন ইজারার ক্ষেত্রে জায়েজ হয় এবং এমতাবস্থায় চাষি জমি চাষাবাদ করা ও জমিতে নালা খনন করার বিনিময় স্বরূপ জমির মালিকের কাছ থেকে কোনো কিছুরই দাবি করতে পারবে না। কারণ এ জাতীয় সুবিধাদি চুক্তির মাধ্যমে মূল্যমান সম্পন্ন হয়ে থাকে, আর চুক্তিতে উৎপাদিত ফসলের মাধ্যমে তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং ফসলই যেহেতু [উৎপাদিত] হলো না, তাই [এর বিনিময় হিসেবে] অন্য কিছু দেওয়া আবশ্যক হবে না। আর যদি ফসল উদ্‌গত হয়ে যায়, কিন্তু এখনো তা কাটার উপযোগী হয়নি এমতাবস্থায় [জমির মালিক ঋণের দায়ে জমি বিক্রয় করার প্রয়োজন বোধ করে তাহলে] ঋণের দায়ে জমি বিক্রয় করা যাবে না যতদিন যাবৎ ফসল কাটা না হবে। কারণ [এ অবস্থায়] জমি বিক্রি করা হলে এতে চাষির অধিকার নষ্ট হবে। আর চাষির অধিকার নষ্ট করার তুলনায় ঋণদাতার পাওনা একটু বিলম্বে আদায় করা অধিক সহজ। এমতাবস্থায় যদি জমির মালিক ঋণের দায়ে বন্দি হয়ে থাকে তাহলে কাজি তাকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে দেবে। কারণ এমতাবস্থায় জমি বিক্রি করা যেহেতু নিষিদ্ধ তাই সে জালিম সাব্যস্ত হবে না। অথচ জুলুমের শাস্তি হিসেবেই জেলখানায় বন্দি করা হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে বলা হয়েছিল যে, যে সকল ওজর-আপত্তির কারণে ইজারা চুক্তিকে বাতিল করা যায় সে সকল ওজর-আপত্তির কারণে বর্গাচুক্তিকেও বাতিল করা যাবে। আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) এমনই একটি ওজরের কথা আলোচনা করেন। আর তা হলো, ঋণের দায়গ্রস্ততায় নিপতিত জমির মালিক তার বর্গা দেওয়া জমিকে বিক্রি করে বর্গাচুক্তি বাতিল করে দিতে পারবে কিনা?

উক্ত দ্বন্দ্ব নিরসন কল্পে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ঋণের দায়গ্রস্ততায় নিপতিত ইজারাদাতা ব্যক্তি যেহেতু তার ইজারায় দেওয়া জমিকে বিক্রি করে ইজারা চুক্তি ভেঙ্গে দিতে পারে। তাই যে ব্যক্তি নিজের জমিকে বর্গাচাষের জন্যে দিয়ে রেখেছে তার জন্যও বড় ধরনের ঋণের দায়ে বর্গাচুক্তিকে বাতিল করে দিয়ে নিজের জমি বিক্রি করে দেওয়া জায়েজ হবে।

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, বর্গাচুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর শ্রমিক যদি তার কিছু শ্রম জমিতে বিনিয়োগ করে ফেলে তখন এই বর্গাচুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তার সম্ভাব্য তিনটি সুরত হতে পারে–

১. হয়তো চাষি জমিতে হালচাষ করার পর বীজ বপনের পূর্বে জমি বিক্রির প্রয়োজন দেখা দেবে।

২. অথবা জমিতে হালচাষ করার পর বীজ বপনের পর তা উদ্গত হওয়ার পূর্বে জমি বিক্রির প্রয়োজন দেখা দেবে।

৩. কিংবা ফসল উদ্গত হওয়ার পর তা কাটার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে জমি বিক্রির প্রয়োজন দেখা দেবে।

ইমাম কুদূরী (র.) এখানে এই তিন সুরতের মধ্য থেকে প্রথম ও তৃতীয় সুরতের হুকুম বর্ণনা করেন। আর দ্বিতীয় সুরতের কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং প্রথম সুরতে জমির মালিকের জন্য ঋণের দায়ে জমিকে বিক্রি করে দিয়ে বর্গাচুক্তি বাতিল করে দেওয়া জায়েজ হবে এবং এমতাবস্থায় চাষির জন্য জমির মালিকের নিকট তার জমিতে চাষ করা ও তাতে পানির নালা খনন করা বাবদ দেওয়া শ্রমের বিনিময় স্বরূপ কোনো কিছু চাওয়ার অধিকার থাকবে না। কারণ চাষি জমিতে হালচাষ ও নালা খনন বাবদ যে শ্রম বিনিয়োগ করেছে এগুলো হলো [মানাফে] সুবিধাদি, কোনো প্রকার চুক্তি ছাড়া এমনিতে তার কোনো মূল্যমান নেই; বরং চুক্তির মাধ্যমে এ জাতীয় শ্রম ব্যয় করার পূর্বে তার কোনো মূল্য নির্ধারণ করা হলে শ্রম বিনিয়োগের পরে সে ঐ নির্ধারিত মূল্যের হকদার হয়। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলায় এ জাতীয় শ্রমের বিনিময় হিসেবে ভবিষ্যতে উৎপাদিত ফসলের একাংশকে নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিধায় সে ফসল উৎপাদিত হলে ফসলের একাংশের হকদার হতো। কিন্তু যেহেতু জমির মালিকের ওজরের কারণে চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ায় কোনো ফসলই উৎপাদিত হলো না। তাই চাষি তার শ্রমের বিনিময় হিসেবে আর কিছুই পাবে না। তবে নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে জমির মালিকের উপর উচিত চাষিকে কিছু বিনিময় দিয়ে সন্তুষ্ট করে দেওয়া।

* আর দ্বিতীয় সুরতের [অর্থাৎ জমিতে বীজ বপনের পর তা উদ্গত হওয়ার পূর্বে ঋণের কারণে জমি বিক্রি করার প্রয়োজন দেখা দিলে সে তা বিক্রি করতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে] কোনো বিধান ইমাম কুদূরী (র.) আলোচনা করেননি। মুসান্নিফ (র.)ও তার বিধান উল্লেখ করেননি।

তবে এই সুরতে জমি বিক্রয় জায়েজ হবে কিনা এ ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কারো কারো মতে, বিক্রয় করা জায়েজ হবে। আর কারো কারো মতে তা জায়েজ হবে না।

যারা জায়েজের পক্ষে বলেন তাদের যুক্তি হলো, জমিতে বীজ বপন করার মাঝে বীজওয়ালার তাৎক্ষণিক কোনো লাভ থাকে না বিধায় জমিতে বীজ ফেলার অর্থ হলো তা নষ্ট করে দেওয়া, যেন ফসল উদ্গত হওয়ার পূর্বে জমির নিচে বীজওয়ালার কোনো জিনিসই নেই। তাই এ অবস্থায় জমির মালিক কর্তৃক জমি বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। আর যারা বিক্রয় না জায়েজ হওয়ার কথা বলেন তাদের যুক্তি হলো, জমিতে বীজ বপন অর্থ হলো তাকে বাড়ানোর জন্য জমির নিচে তা গচ্ছিত রাখা। বীজকে নষ্ট করা নয়। ফলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বীজওয়ালার মালিকানা বস্তু জমিতে গচ্ছিত আছে বলে যদি তা বিক্রি করে দেওয়া হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে এ অবস্থায় জমি বিক্রি করা জায়েজ হবে না।

ফতোয়া আল আত্তাবীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি এ সুরতে বীজ চাষির হয়ে থাকে এবং সে অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং বীজ বপন করার কারণে জমির যে পরিমাণ মূল্য বেশি এসেছে তা বীজওয়ালা পাবে। আর যদি সে অনুমতি না দেয় তাহলে বিক্রয় স্থগিত থাকবে।

* আর তৃতীয় সুরতে অর্থাৎ ফসল উদ্গত হওয়ার পর যদি তা কাটার উপযুক্ত হওয়ার আগেই জমি বিক্রয়ের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে এমতাবস্থায় জমির মালিকের জন্য জমি বিক্রয় করা বৈধ হবে না; বরং ফসল কাটা পর্যন্ত জমি বিক্রয়কে বিলম্বিত করতে হবে এবং ফসল কাটা হয়ে গেলে জমি বিক্রি করে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করবে। আর যদি পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করতে এ কয়দিন বিলম্ব করার কারণে তাকে জেলে নেওয়া হয় তাহলে কাজি তাকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন। কারণ সে যেহেতু জমি বিক্রির ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাই ঋণ আদায়ে বিলম্ব করার কারণে সে জালিম সাব্যস্ত হবে না। অথচ জেলের শাস্তি দেওয়া হয় তাকেই যে জুলুম করে।

উল্লেখ্য যে, এই সুরতে ফসল কাটা পর্যন্ত জমি বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, যদি এ অবস্থায় জমি বিক্রয় করা হয় তাহলে চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ চাষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার তুলনায় ঋণ আদায়ে বিলম্ব করাটা অধিকতর সহজ।

قَالَ : وَإِذَا نَقَضَتْ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ عَلَى الْمُزَارِعِ أَجْرُ مِثْلِ نَصِيْبِهِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّرْعِ عَلَيْهِمَا عَلَى مِقْدَارِ حُقُوْقِهِمَا مَعْنَاهُ حَتَّى يَسْتَحْصِدَ لِأَنَّ فِي تَبْقِيَةِ الزَّرْعِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ تَعْدِيْلُ النَّظْرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَيُصَارُ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا كَانَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ إِنْتَهَى بِإِنْتِهَاءِ الْمُدَّةِ وَهٰذَا عَمَلٌ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالزَّرْعُ بَقْلٌ حَيْثُ يَكُوْنُ الْعَمَلُ فِيْهِ عَلَى الْعَامِلِ لِأَنَّ هُنَاكَ أَبْقَيْنَا الْعَقْدَ فِيْ مُدَّتِهِ وَالْعَقْدُ يَسْتَدْعِي الْعَمَلَ عَلَى الْعَامِلِ أَمَّا هٰهُنَا الْعَقْدُ قَدْ إِنْتَهَى فَلَمْ يَكُنْ هٰذَا إِبْقَاءُ ذٰلِكَ الْعَقْدِ فَلَمْ يَخْتَصَّ الْعَامِلُ بِوُجُوْبِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ফসল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই যদি বর্গাচাষের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে চাষির উপর [তখন থেকে নিয়ে] ফসল কাটা পর্যন্ত সময়ে তার প্রাপ্য অংশের সমপরিমাণ জমির ন্যায্য ভাড়া পরিশোধ করা আবশ্যক। আর ফসলের খাতে যত খরচ হবে সমুদয় খরচ তারা উভয়ে নিজ নিজ হক অনুসারে নির্বাহ করবে। অর্থাৎ ফসল কাটা পর্যন্ত তারা এ ব্যয় নির্বাহ করতে থাকবে। কেননা ন্যায্য ভাড়া পরিশোধের বিনিময়ে জমিতে ফসল বাকি রাখতে দেওয়ার মাঝে উভয় পক্ষের প্রতিই ইনসাফপূর্ণ সমতা বিধান সম্ভব, ফলে এ নীতিই অবলম্বন করা হবে। আর [মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত ভূমির মালিকও চাষি] উভয়কেই এতে শ্রম বিনিয়োগ করতে হবে এর কারণ হলো, মেয়াদ শেষ হওয়ার মাধ্যমে তাদের চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ফলে এ শ্রম বিনিয়োগ হবে উভয়ের শরিকী মালের মাঝে শ্রম বিনিয়োগ। পক্ষান্তরে যদি ফসল কাঁচা থাকা অবস্থায় জমির মালিক মারা যায় তাহলে [ফসল পাকা পর্যন্ত] চাষিকেই শ্রম বিনিয়োগ করতে হবে। কারণ এ সুরতে আমরা চুক্তিকে এর মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকি রেখেছি। আর চুক্তি চাষির শ্রম বিনিয়োগের দাবি রাখে। কিন্তু [মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার] এ মাসআলায় চুক্তি যেহেতু শেষ হয়েছে তাই এক্ষেত্রে চুক্তিকে আর ঠিক রাখা সম্ভব হচ্ছে না, কাজেই এতে শ্রম বিনিয়োগ শুধু কেবল চাষিরই কর্তব্য হবে না। [বরং উভয়কেই সমানভাবে শ্রম বিনিয়োগ করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বেই বলা হয়েছিল যে, বর্গাচাষ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য বর্গাচুক্তির মাঝে তার মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে। যদি ঐ মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তাহলে বর্গাচুক্তিও নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং যদি কখনো এমন হয় যে, জমিতে ফসল এখনো কাচা রয়েছে, কাটার উপযুক্তও হয়নি, এমতাবস্থায় বর্গাচাষ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল এবং চুক্তিও শেষ হয়ে গেল। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর বর্গাদার ব্যক্তি তার ফসলের অংশকে তা পাকা এবং কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত ঐ জমিতে রাখার কোনো অধিকার রাখে না। তাই যদি এই মুহূর্তে তাকে ফসল কেটে নিয়ে যেতে বলা হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কারণ কাঁচা ফসল তার কোনো কাজে আসবে না। আর যদি ফসল পাকা পর্যন্ত তা জমিতে রাখতে দেওয়া হয় তাহলে জমির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও তাকে কোনো প্রকার লাভ ব্যতীত জমিকে ফসল পাকা পর্যন্ত আটকে রাখতে হচ্ছে। অথচ এ সময় সে অন্য কোনো লাভজনক খাতে জমিটি বিনিয়োগ করতে পারত। সুতরাং এ সুরতে ফসল পাকা পর্যন্ত জমিতে ফসল রাখতে দেওয়া হবে কিনা? এবং দেওয়া হলে তার কি পন্থা হতে পারে? আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) যৌক্তিক কারণসহ এ সকল মাসআলার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন।

মাসআলার সারসংক্ষেপ হলো, ফসল কাঁচা থাকা অবস্থায় বর্গাচুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বর্গাচুক্তি যদিও নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ অবস্থায় জমিতে যে ফসল থাকে জমির মালিক তার কিয়দংশের মালিক হয় আর বর্গাদার তার অবশিষ্ট অংশের মালিক সাব্যস্ত হয়। সুতরাং জমির মালিক যে অংশের মালিক তা পাকা পর্যন্ত জমিতে বিদ্যমান রাখা হলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বর্গাদারের জন্য তার অংশকে পাকা পর্যন্ত জমিতে বিদ্যমান রাখা নিয়ে হলো সমস্যা। তাই এই সমস্যার সমাধান কল্পে বর্গাদারের জন্য আবশ্যক হবে সে যে পরিমাণ ফসল পাবে তা যে পরিমাণ জমি দখল করে রেখেছে চুক্তি শেষ হওয়ার পর থেকে ফসল পাকা পর্যন্ত সময়ে ঐ পরিমাণ জমির ন্যায্য ভাড়া যা আসে তা জমির মালিককে পরিশোধ করে দেওয়া। তাহলে কোনো পক্ষই আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

সুতরাং যদি জমির মালিক ভাড়া গ্রহণ পূর্বক ফসল পাকা পর্যন্ত তা জমিতে রাখতে সম্মত না হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে কাচা ফসলই কেটে নিতে চায় তাহলে তার এ অধিকার থাকবে না। কারণ এতে বর্গাদার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু যদি বর্গাদার ভাড়া আদায় করে ফসল পাকা পর্যন্ত তাকে জমিতে রাখতে সম্মত না হয় এবং কাঁচা ফসলই কেটে নিতে চায় তাহলে দেখতে হবে জমির মালিক তার এ মতের সাথে একমত কিনা। যদি জমির মালিকও কাঁচা ফসল কেটে নিতে রাজি হয়ে যায় তাহলে তা কাঁচা অবস্থাতেই কেটে ফেলতে হবে এবং উভয়ের মাঝে তা শর্ত মোতাবেক বণ্টিত হবে। আর যদি জমির মালিক এ অবস্থায় ফসল কেটে ফেলতে সম্মত না হয় তাহলে বর্গাদারকে ফসল পাকা পর্যন্ত ভাড়া আদায় পূর্বক তা জমিতে রাখার জন্য বাধ্য করা যাবে না; বরং জমির মালিকের এ সুরতে দুটি বিষয়ের এখতিয়ার থাকবে। হয়তো সে বর্গাদার যে পরিমাণ ফসল পাবে তার মূল্য তাকে পরিশোধ করে দিয়ে খেতের সমস্ত ফসলের মালিক হয়ে যাবে। কিংবা বর্গাদারের পক্ষ থেকে কাজির নির্দেশে জমি পরিচর্যার যাবতীয় খরচ আদায় করে ফসলকে পাকিয়ে তুলবে এবং ফসল বণ্টনের সময় বর্গাদারের অংশ থেকে ঐ পরিমাণ ফসল উসুল করে নেবে যে পরিমাণ খরচ তার জমির ভাড়া ও ফসল পরিচর্যার জন্য খাটিয়েছিল। আর এরূপ তিনটি এখতিয়ারের প্রত্যেকটির মাধ্যমেই ভূমি মালিকের ক্ষতিকে দূর করা সম্ভব।

অতএব যদি তারা উভয়ে ফসল পাকা পর্যন্ত তা জমিতে রাখার ক্ষেত্রে একমত হয় তাহলে ফসলের পরিচর্যা বাবদ যে খরচ লাগবে তা উভয়েই তাদের নিজ নিজ অংশ অনুপাতে নির্বাহ করবে। কারণ আকদ যেহেতু শেষ হয়েছে তাই ফসল পরিচর্যার দায়িত্বও বর্গাদারের জিম্মা থেকে উঠে গেছে। তাই এখন তা হলো শরিকানা মালের মতো। শরিকানা মালের পরিচর্যা বাবদ খরচ যেমনি শরিকদ্বয়ের উভয়কে তাদের অংশ অনুপাতে নির্বাহ করতে হয় তদ্রূপ এখানেও তাই হবে। পক্ষান্তরে যদি আকদ অবশিষ্ট থাকত তাহলে ফসলের পরিচর্যা বাবদ খরচ বর্গাদারকে নির্বাহ করতে হতো। কারণ আকদ চাষির উপর শ্রম নির্বাহ ও ফসলের পরিচর্যাকে আবশ্যক করে। যেমনটি হয়ে থাকে জমির মালিক ফসল কাঁচা থাকা অবস্থায় মারা গেলে। কারণ তখন চাষির দিকে লক্ষ্য করে আকদকে বহাল রাখা হয়।

فَإِنْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَأَمْرِ الْقَاضِيْ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَرَادَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّرْعَ بَقْلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ لِأَنَّ فِيْهِ إِضْرَارًا بِالْمُزَارِعِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُزَارِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَقْلًا قِيْلَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ إِقْلَعِ الزَّرْعَ فَيَكُوْنُ بَيْنَكُمَا أَوْ أَعْطِهِ قِيْمَةَ نَصِيْبِهِ أَوْ أَنْفِقْ أَنْتَ عَلَى الزَّرْعِ وَارْجِعْ بِمَا تُنْفِقُهُ فِيْ حِصَّتِهِ لِأَنَّ الْمُزَارِعَ لَمَّا امْتَنَعَ مِنَ الْعَمَلِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ لِأَنَّ إِبْقَاءَ الْعَقْدِ بَعْدَ وُجُوْدِ الْمُنْهِيْ نَظَرٌ لَهُ وَقَدْ تَرَكَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ وَرَبُّ الْأَرْضِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هٰذِهِ الْخِيَارَاتِ لِأَنَّ بِكُلِّ ذٰلِكَ يَسْتَدْفِعُ الضَّرَرَ .

অনুবাদ : সুতরাং যদি তাদের একজন অপরজনের অনুমতি ছাড়া এবং বিচারকের নির্দেশ ব্যতিরেকে এতে [টাকা পয়সা বা শ্রম] ব্যয় করে তাহলে এ ব্যয় নফল বা অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তাদের কেউই অপরজনের উপর কোনো কর্তৃত্ব রাখে না। যদি জমির মালিক কাঁচা অবস্থায়ই ফসল কেটে নিতে চায় তাহলে তার এ অধিকার থাকবে না। কেননা এতে চাষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে। কিন্তু যদি চাষি ব্যক্তি কাচা অবস্থায় ফসল কেটে নিতে চায় তাহলে জমির মালিককে বলা হবে হয়তো তুমিও ফসল কেটে নাও, তারপর তা তোমাদের মাঝে ভাগাভাগি হয়ে যাবে। অথবা চাষিকে তার অংশের মূল্য দিয়ে দাও, কিংবা ফসল পাকা পর্যন্ত তুমি তার খরচ চালিয়ে যাও তারপর যা খরচ করবে সে পরিমাণ তার অংশ থেকে নিয়ে নেবে। কারণ চাষি যেহেতু শ্রম দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছে তাই তাকে আর এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। কেননা সমাপ্তকারী কারণ পাওয়া যাওয়ার পর চুক্তিকে অবশিষ্ট রাখা হয়েছিল কৃষকের প্রতি দয়া প্রদর্শনপূর্বক। কিন্তু সে নিজেই যেহেতু তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনকে পরিত্যাগ করেছে। [তাই চুক্তি বাকি রাখার আর কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না।] আর জমির মালিককে উল্লিখিত এখতিয়ারসমূহ দেওয়ার কারণ হলো এর প্রতিটির দ্বারাই ক্ষতিকে দূর করা সম্ভব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে বর্গাচুক্তি নিঃশেষ হওয়ার পর জমিতে থেকে যাওয়া কাঁচা ফসলের খরচ নির্বাহের ক্ষেত্রে একজন অপরজনের অনুমতি কিংবা কাজির ফয়সালা ছাড়া তার অংশও নিজের পক্ষ থেকে বহন করে তাহলে সে স্বেচ্ছাদানকারী সাব্যস্ত হবে। ফলে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে তা পরে ফেরত নিতে পারবে না। কারণ একজন ব্যক্তি কোনো প্রকার কর্তৃত্ব ছাড়া অপরের পক্ষ থেকে ফেরত নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো কিছু খরচ করতে পারে না। আর বর্গাচাষের দুই পক্ষের কেউ কারো উপর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব রাখে না। তাই তার এ খরচ স্বেচ্ছাদান হিসেবে সাব্যস্ত হবে। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে তা ফেরত নিতে পারবে না।

وَلَوْ مَاتَ الْمُزَارِعُ بَعْدَ نَبَاتِ الزَّرْعِ فَقَالَتْ وَرَثَتُهُ نَحْنُ نَعْمَلُ إِلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ الزَّرْعُ وَأَبَى رَبُّ الْأَرْضِ فَلَهُمْ ذٰلِكَ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَلَا أَجْرَ لَهُمْ بِمَا عَمِلُوْا لِأَنَّا أَبْقَيْنَا الْعَقْدَ نَظَرًا لَهُمْ فَإِنْ أَرَادَ وَاقْلَعَ الزَّرْعَ لَمْ يُجْبَرُوْا عَلَى الْعَمَلِ لِمَا بَيَّنَّا وَالْمَالِكُ عَلَى الْخِيَارَاتِ الثَّلٰثَةِ لِمَا بَيَّنَّا .

অনুবাদ : জমিতে ফসল উদ্‌গত হওয়ার পর যদি বর্গাদার [চাষি] ব্যক্তি মারা যায় এবং তার ওয়ারিশগণ বলে যে, ফসল কাটার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত আমরা জমিতে শ্রম বিনিয়োগ করে যাব, তাহলে তাদের এ অধিকার থাকবে। ভূমির মালিক তা অস্বীকার করলেও। কেননা এতে ভূমি মালিকের কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তাদের এই শ্রম নির্বাহের কারণে তারা কোনো কিছুর হকদার হবে না। কারণ তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেই আমরা [ফকীহগণ] চুক্তিকে বহাল রেখেছি।

আর যদি তারা [বর্গাদারের ওয়ারিশগণ] কাচা অবস্থাতেই ফসল কেটে নিতে চায় তাহলে তাদেরকে শ্রম বিনিয়োগে বাধ্য করা যাবে না। সেই কারণে যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। আর ভূমির মালিককে তিন ধরনের এখতিয়ার দেওয়া হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বেই বলা হয়েছিল যে, বর্গাচুক্তির পক্ষদ্বয়ের কোনো একজন যদি মারা যায়, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সেই ভিত্তিতে যদি বর্গাদার মারা যায় তাহলেও কিয়াস অনুযায়ী বর্গাচুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু যদি বর্গাদারের মৃত্যু এমন সময় হয় যখন ফসল জমিতে উদ্‌গত হয়ে গেছে এখনো তা পরিপক্ব হয়নি এবং বর্গাদারের ওয়ারিশগণ বর্গাদারের স্থলে জমিতে শ্রম বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে তাদের উপকারের দিকে লক্ষ্য করে ইসতিহসানের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত বর্গাচুক্তি অবশিষ্ট থাকবে বলে ফতোয়া দেন। সুতরাং যদি বর্গাদারের ওয়ারিশগণ শ্রম দিতে রাজি হয় তাহলে তাদের জন্য এ অধিকার থাকবে এবং এক্ষেত্রে জমির মালিক যদি কোনো দ্বিমত পোষণ করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ওয়ারিশদের দাবিকে গ্রহণ করা হলে জমির মালিকের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধিত হয় না। অথচ ফসল উদ্‌গত হওয়ার সাথে সাথেই বর্গাদার ঐ ফসলের একাংশের মালিক হয়ে গেছে এবং তার মৃত্যুর কারণে তার ওয়ারিশগণ সে অংশের মালিকানা লাভ করেছে এবং বর্গাচাষের মেয়াদও অবশিষ্ট রয়েছে। তাই এ অবস্থাতে জমির মালিকের কথার ভিত্তিতে চুক্তিকে ভেঙ্গে দিলে ওয়ারিশগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তাদের এ ক্ষতিকে রোধ করার জন্য চুক্তিকে বহাল রাখার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আর যদি ওয়ারিশগণ তৎক্ষণাৎ কাঁচা ফসলই কেটে নিতে চায় তাহলে তাদের এ অধিকারও থাকবে। ফসল পাকা পর্যন্ত জমিতে তাকে রাখার জন্য এবং শ্রম দেওয়ার জন্য তাদের বাধ্য করা যাবে না। হ্যাঁ, এ সুরতে জমির মালিকের ক্ষতি দূর করার লক্ষ্যে তাকে উপরে বর্ণিত ঐ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটিকে গ্রহণের জন্য এখতিয়ার দেওয়া হবে। যা পূর্বে বলা হয়েছে।

অর্থাৎ ১. কাঁচা ফসল কেটে নিতে সম্মত হওয়া।

অথবা, ২. ওয়ারিশদেরকে তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে দিয়ে নিজে সমস্ত ফসলের মালিক হয়ে যাওয়া।

কিংবা, ৩. ওয়ারিশদরে পক্ষ থেকে খরচ চালিয়ে যাওয়া এবং ফসলের অংশ থেকে তা উসুল করে নেওয়া।

قَالَ : وَكَذٰلِكَ اُجْرَةُ الْحَصَّادِ وَالرَّفَّاعِ وَالدَّيَّاسِ وَالتَّذْرِيَةِ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ فَاِنْ شَرَطَاهُ فِى الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْعَامِلِ فَسَدَتْ وَهٰذَا الْحُكْمُ لَيْسَ بِمُخْتَصٍّ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الصُّوْرَةِ وَهُوَ اِنْقِضَاءُ الْمُدَّةِ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ بَلْ هُوَ عَامٌّ فِىْ جَمِيْعِ الْمُزَارَعَاتِ وَوَجْهُ ذٰلِكَ اَنَّ الْعَقْدَ يَتَنَاهٰى بِتَنَاهِى الزَّرْعِ لِحُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ فَيَبْقٰى مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَقْدَ فَيَجِبُ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِمَا وَاِذَا شَرَطَ فِى الْعَقْدِ ذٰلِكَ وَلاَ يَقْتَضِيْهِ وَفِيْهِ مَنْفَعَةٌ لاَحَدِهِمَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ كَشَرْطِ الْحَمْلِ وَالطَّحْنِ عَلَى الْعَامِلِ وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ يَجُوْزُ اِذَا شَرَطَ ذٰلِكَ عَلَى الْعَامِلِ لِلتَّعَامُلِ اِعْتِبَارًا بِالْاِسْتِصْنَاعِ وَهُوَ اِخْتِيَارُ مَشَائِخِ بَلْخٍ قَالَ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ السَّرْخَسِىُّ هٰذَا هُوَ الْاَصَحُّ فِىْ دِيَارِنَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অনুরূপভাবে [অর্থাৎ ফসল পাকার আগে বর্গাচুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে যেমনিভাবে ফসল পাকা পর্যন্ত তার পরিচর্যা ও সুরক্ষা বাবদ যাবতীয় খরচের দায় দায়িত্ব বর্তায় ঠিক তদ্রূপ ফসল কাটা, মাঠে স্তুপ দেওয়া, মাড়ানো এবং ফসল উড়ানোর খরচও আনুপাতিক হারে উভয়ের উপর বর্তাবে। সুতরাং ভূমির মালিক ও চাষি যদি বর্গাচুক্তির মাঝে এসব ব্যয় চাষির উপর বর্তাবে বলে শর্ত করে তাহলে বর্গাচুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। এই বিধান উক্ত মাসআলা তথা ফসল পাকার আগে বর্গাচুক্তির মেয়াদ অতিক্রম হয়ে যাওয়ার সাথে খাস নয়; বরং এ বিধান বর্গাচুক্তির সকল সুরতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ ফসল পরিপক্ক হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই বর্গাচুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। কেননা এতেই চুক্তির উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। ফলে [পরিপক্ক হয়ে যাওয়ার পর] তা উভয়ের শরিকী মাল হিসেবে [জমিতে] পরে থাকে। কোনো প্রকার চুক্তি ব্যতিরেকে। তাই এ অবস্থায় যা খরচ হবে তার ব্যয়ভার উভয়েরই বহন করতে হবে। এমতাবস্থায় যদি আকদের ঐ রূপ শর্ত [অর্থাৎ এইসব খরচ চাষির উপর বর্তাবে বলে শর্ত] করা হয়। অথচ আকদ এরূপ কোনো শর্তের দাবি রাখে না এবং এতে [চুক্তির পক্ষদ্বয়ের] কোনো একজনের লাভও রয়েছে তাহলে তা আকদকে ফাসিদ করে দেবে। চাষির বোঝা বহন করে এনে দেওয়ার বা পিষে দেওয়ার শর্ত আরোপ করার মতো। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি চাষির উপর এ জাতীয় কিছুর শর্ত আরোপ করা হয় তাহলে (اِسْتِصْنَاعْ) অর্ডারী মালের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে (تَعَامُلْ اُمَّتْ) অব্যাহত আমল থাকার কারণে তা জায়েজ হবে। বলখের মাশাইখে কেরাম এ মতটিকেই অবলম্বন করেছেন। শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.) বলেন, আমাদের দেশের জন্য এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত।

فَالْحَاصِلُ اَنَّ مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ قَبْلَ الْاِدْرَاكِ كَالسَّقْيِ وَالْحِفْظِ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ وَمَا كَانَ مِنْهُ بَعْدَ الْاِدْرَاكِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ عَلَيْهِمَا فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَاَشْبَاهِهِمَا عَلٰى مَا بَيَّنَّاهُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ عَلَيْهِمَا وَالْمُعَامَلَةُ عَلٰى قِيَاسِ هٰذَا مَا كَانَ قَبْلَ اِدْرَاكِ الثَّمَرِ مِنَ السَّقْيِ وَالتَّلْقِيْحِ وَالْحِفْظِ فَهُوَ عَلٰى الْعَامِلِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْاِدْرَاكِ كَالْجُدَادِ وَالْحِفْظِ فَهُوَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ شَرَطَ الْجُدَادَ عَلَى الْعَامِلِ لَا يَجُوْزُ بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّهُ لَا عُرْفَ فِيْهِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ عَلَيْهِمَا لِاَنَّهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ وَلَا عَقْدَ وَلَوْ شَرَطَ الْحَصَادَ فِى الزَّرْعِ عَلٰى رَبِّ الْاَرْضِ لَا يَجُوْزُ بِالْاِجْمَاعِ لِعَدَمِ الْعُرْفِ فِيْهِ وَلَوْ اَرَادَ قَصْلَ الْقَصِيْلِ اَوْ جَدَّ التَّمْرِ بُسْرًا اَوْ اِلْتِقَاطِ الرُّطَبِ فَذٰلِكَ عَلَيْهِمَا لِاَنَّهُمَا اَنْهَيَا الْعَقْدَ لَمَّا عَزَمَا عَلَى الْقَصْلِ وَالْجُدَادِ بُسْرًا فَصَارَ كَمَا بَعْدَ الْاِدْرَاكِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

মোদ্দাকথা হলো, জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে ফসল পাকার আগে যে সকল কাজ রয়েছে যেমন পানি সিঞ্চন করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদি এগুলো চাষির উপর বর্তাবে। আর ফসল পাকার পরে এবং বণ্টনের পূর্বে যে কাজ রয়েছে যথা ফসল কাটা, মাড়াই করা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব উভয়ের উপর বর্তাবে। যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। আর বণ্টনের যাবতীয় কাজও উভয়ের উপর বর্তাবে। এর উপর কিয়াসের ভিত্তিতে বাগ-বাগিচার বর্গাচুক্তির ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে। অর্থাৎ ফল পাকার পূর্বের যে কাজ আছে যথা বাগানে পানি সিঞ্চন, গাছের প্রজনন কর্ম করা এবং ফলের রক্ষণাবেক্ষণ করা এসব দায়িত্ব চাষির উপর বর্তাবে। আর ফল পাকার পরের যে সকল কাজ রয়েছে যথা– ফল উত্তোলন করা এবং তা হেফাজত করা ইত্যাদি সবই উভয়ের উপর বর্তাবে। সুতরাং যদি ফল পারার দায়িত্ব চাষির উপর হবে বলে শর্ত করা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা জায়েজ হবে না। এরূপ কোনো প্রচলন না থাকার কারণে। আর বণ্টনের পরের যে কাজ রয়েছে তা উভয়ের উপর বর্তাবে। কেননা তখন এটা শরিকী মাল এবং আকদ বা চুক্তিও আর অবশিষ্ট থাকে না। যদি জমির মালিকের উপর ফসল কেটে দেওয়ার শর্ত করা হয় তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ হবে। এরূপ কোনো প্রচলন না থাকার কারণে। যদি তারা ফসল কাঁচা থাকতে তা কেটে ফেলতে চায়, অথবা খেজুর আধাপাকা অবস্থায় পেরে ফেলতে ইচ্ছা করে, অথবা পাকা খেজুর গাছ থেকে [না পেরে তা] কুড়িয়ে নিতে চায় তাহলে এর ব্যয় তাদের উভয়ের উপর বর্তাবে। কেননা তারা কাঁচা ফসল কাটা বা আধপাকা খেজুর পারার সংকল্প করার মাধ্যমে চুক্তিকে শেষ করে দিয়েছে। সুতরাং তা ফসল পাকার পরবর্তী অবস্থার হুকুমের ন্যায় হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত বিধানের সূরতে মাসআলা হলো, জমির ফসল পাকার পূর্বেই যদি বর্গাচুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তাহলে জমির মালিক ও বর্গাদারের করণীয় কি হবে এ সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য ইবারতে বলতে চাচ্ছেন যে, ফসল কাঁচা থাকা অবস্থায় বর্গাচুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর জমিতে ঐ ফসল পাকার জন্য রেখে দেওয়া হলে ফসলের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ যেমন উভয়কে নিজ নিজ ফসলের অংশ অনুসারে সরবরাহ করতে হবে। ঠিক তদ্রূপ ঐ ফসল পাকার পর তা কাটা, বাড়ির আঙ্গিনায় এনে জমা করা, মাড়ানো এবং তা উভয়ে পরিষ্কার করা ইত্যাদিতে যে খরচ হবে সে খরচও জমির মালিক ও চাষি উভয়ের উপর বর্তাবে।

মুসান্নিফ (র.) এ বিধানটি শুধু কেবল এ সুরতের ক্ষেত্রেই নয়; বরং বর্গাচাষের সকল সুরতেই অর্থাৎ ফসল পাকার পূর্বে বর্গাচুক্তির মেয়াদ শেষ হোক কিংবা ফসল কাঁচা থাকতেই মেয়াদ শেষ হোক সর্বাবস্থায় ফসল কাটা, বাড়িতে বহন করে আনা, তা মাড়ানো এবং পরিষ্কার করা বাবদ যাবতীয় খরচ উভয়ের উপর বর্তাবে। কারণ ফসল পরিপক্ক হয়ে গেলে বর্গাচুক্তি এমনিতেই পূর্ণ হয়ে যায়, তাই ফসল পাকার পর জমিতে থাকা অবস্থায়ই সে ফসলে উভয়ের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাই ফসল পাকার পর বাকি থাকে প্রত্যেক শরিকের তার মালিকানাধীন সম্পদকে হস্তগত করা ও সংরক্ষণ করা। তাই এ দায়িত্ব বর্গাদারের উপর বর্তাবে না।

সুতরাং যদি বর্গাচুক্তির মাঝে এ শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় যে, বর্গাদারকে নিজ খরচে ফসল কেটে মাড়িয়ে পরিষ্কার করে জমির মালিকের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে, তাহলে এ চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কারণ مُزَارَعَةٌ বা বর্গাচুক্তি হলো দুজনের যৌথ উদ্যোগে ফসল উৎপাদনের চুক্তি। তাই যে সকল কাজ করলে ফসল উৎপাদিত হবে এবং ফসলের ফলন বেশি হবে এবং ফসল পাকা পর্যন্ত তা নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে ফসলকে রক্ষা করবে, ঐ সকল কাজই কেবল বর্গাচুক্তির অন্তর্গত হবে এবং সেগুলো এককভাবে চাষিকে নিজ খরচে আঞ্জাম দিতে হবে। পক্ষান্তরে যে সকল কাজ ফসলের উৎপাদন, ফলন বৃদ্ধি ও সুরক্ষার সাথে সম্পৃক্ত নয় সে সকল কাজ বর্গাচুক্তির দাবির অন্তর্ভুক্ত হবে না। ফলে যদি কেউ চুক্তির দাবির বিপরীতে এমন কোনো শর্ত চুক্তির সাথে যোগ করে যাতে দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষের কল্যাণ বা স্বার্থ নিহিত থাকে তাহলে এরূপ ফাসিদ শর্তের দরুন বর্গাচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর ফসল কাটা, মাড়ানো, উড়ানো ও বাড়িতে আনা ইত্যাদি কার্য যেহেতু ফসল উৎপাদন, ফসল বৃদ্ধি ও সুরক্ষার সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাই চাষির উপর এ শর্ত আরোপ করলেও বর্গাচুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

কোন ধরনের কাজ বর্গাচুক্তির দাবির অন্তর্গত আর কোন ধরনের কাজ বর্গাচুক্তির দাবির অন্তর্গত নয় তা চিহ্নিত করার জন্য মুসান্নিফ (র.) বর্গাচুক্তির সাথে সম্পৃক্ত সকল কাজকে তিন ভাগে ভাগ করেন। যেমন–

১. প্রথম প্রকারে ঐ সকল কাজ যা ফসল পাকার পূর্বে করা হয়। এইসব বর্গাচুক্তির অন্তর্গত। যেমন– জমিতে পানি দেওয়া, হাল চাষ করা, আগাছা থেকে পরিষ্কার রাখা, সার ও কীটনাশক ঔষধ দেওয়া ও গরু-ছাগলের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করা ইত্যাদির খরচ ও দায় দায়িত্ব চাষির উপর বর্তাবে।

২. আর যে সকল কাজ ফসল পরিপক্ক হয়ে যাওয়ার পর বণ্টন করার পূর্ব পর্যন্ত করতে হয় সেগুলো চুক্তির অন্তর্গত নয়। যেমন– ফসল কাটা, মাড়ানো ইত্যাদি। এ জাতীয় কাজের দায় দায়িত্ব ও খরচ উভয়ের উপর বর্তাবে।

৩. ফসল বণ্টনের পর যে কাজ করতে হয় তাও উভয়ের দায়িত্বে বর্তাবে।

এ হলো জাহেরী রেওয়ায়েতের বিধান। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর এক বর্ণনা মতে, সে কালের ঐ এলাকার সমাজের প্রচলন অনুসারে যদি কেউ ফসল কাটা, বাড়িতে আনা ও মাড়ানো ইত্যাদির দায় দায়িত্ব চাষির উপর বর্তাবে বলে শর্ত করে তাহলে তাও জায়েজ হবে। অর্ডারের মালের বিধানের উপর কিয়াস করে তিনি এ ফতোয়া প্রদান করেন।

শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.) এই মতটিকেই অতি বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। দুররুল মুখতারেও এ মতটিকে বিশুদ্ধ বলেছে এবং ফতোয়া এর উপরেই। –[শামী : ৯ / ৪০৮]

আর যদি এসব কাজের দায়িত্ব জমির মালিকের উপর শর্ত করে দেওয়া হয় তাহলে তা বৈধ হবে না। কারণ সমাজে এর কোনো প্রচলন নেই।

আর বাগান বর্গার বিষয়টিকেও হুবহু এর উপর কিয়াস করা যেতে পারে।

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

অধ্যায় : মুসাকাত

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَلْمُسَاقَاةُ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ بَاطِلَةٌ وَقَالَا جَائِزَةٌ اِذَا ذُكِرَ مُدَّةٌ مَعْلُوْمَةٌ وَسُمِّىَ جُزْءٌ مِنَ الثَّمَرَةِ مُشَاعًا وَالْمُسَاقَاةُ هِىَ الْمُعَامَلَةُ فِى الْاَشْجَارِ وَالْكَلَامُ فِيْهَا كَالْكَلَامِ فِى الْمُزَارَعَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, উৎপন্ন ফল ফলাদির কিয়দংশের বিনিময়ে মুসাকাত তথা বাগান বর্গা দেওয়া জায়েজ নয়। এরূপ করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের উল্লেখ থাকে এবং ফল ফলাদির কিয়দংশের কথা অবিভক্তভাবে উল্লেখ করা হয়, তাহলে মুসাকাত জায়েজ হবে। [যেমন– উৎপন্ন ফল ফলাদির অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি]। বস্তুত গাছ গাছালি বাগ বাগিচা ভাগে বা বর্গা দেওয়ার নামই হলো মুসাকাত। মুযারাআ -এর ন্যায় মুসাকাতের ব্যাপারেও বিভিন্ন ধরনের আলোচনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসাকাত -এর সংজ্ঞা : গাছ-গাছালি, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি বর্গা দেওয়াকে আরবিতে মুসাকাত বলে। যেমন– কেউ গাছ লাগিয়ে বাগান করে এই বলে তা কাউকে হাওয়ালা বা অর্পণ করল যে, তুমি এটি দেখাশুনা করবে, প্রয়োজনে এতে পানি [প্রয়োজনীয় পরিচার্যা] দেবে। অতঃপর বাগানে যখন ফল আসবে তখন আমরা তা ভাগাভাগি করে নেব। অথবা বাগান পূর্ব থেকেই ছিল, মৌসুম আসা পর্যন্ত তাকে বর্গা দিল। এই মুসাকাতকে মুআমালাতও বলে।

মুযারাআত ও মুসাকাত উভয়ের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। কেননা মুযারাআত এবং মুসাকাত উভয়টিই বর্গাচাষের অন্তর্ভুক্ত। বর্গাচাষের চুক্তি ফসলের ক্ষেত্রে হলে মুযারাআত এবং বাগানের ক্ষেত্রে হলে মুসাকাত।

ইনায়া প্রণেতা বলেন, মুসাকাতকে মুযারাআতের পূর্বে উল্লেখ করাই ছিল অধিক যুক্তি সঙ্গত। কেননা অনেক ওলামায়ে কেরাম মুসাকাতের বৈধতার মত পোষণ করেন। হাদীস থেকেও সরাসরি মুসাকাতের বৈধতা প্রমাণিত হয়। রাসূল ﷺ খায়বরবাসীর সাথে মুসাকাত চুক্তি করেছিলেন। পক্ষান্তরে মুযারাআতের বৈধতাকে অনেক পূর্বসূরি আলেম অস্বীকার করেছেন। স্পষ্ট কোনো হাদীসও মুযারাআত সম্পর্কে পাওয়া যায় না।

এত কিছু সত্ত্বেও মুযারাআতকে মুসাকাতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে দুটি কারণে–

১. মুযারাআত তথা ফসলি জমি বর্গা দেওয়ার ঘটনা অধিক হারে সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং মুযারাআতের বিধি বিধান জানার অধিক প্রয়োজন দেখা দেওয়ার দরুন তাকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. মুসাকাতের তুলনায় মুযারাআতের মাসআলা মাসায়েল অধিক হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ قَالَ : اَبُو حَنِيْفَةَ (رح) ... : ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, মুসাকাত তথা বাগান বর্গা দেওয়া যদিও তা উৎপন্ন ফল ফলাদির কিয়দংশের বিনিময়ে হয় তথাপি তা বাতিল। ইমাম যুফার (র.)ও এরূপ মত পোষণ করেন।

অপর পক্ষে সাহেবাইন (র.) মুসাকাতকে জায়েজ বলেন। আর এ ব্যাপারে সাহেবাইনের মতের উপরই ফতোয়া।

কিন্তু সাহেবাইনের মতানুসারে মুসাকাত জায়েজ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। আর সে শর্তগুলোকে মুযারাআত অধ্যায়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মুযারাআত অধ্যায়ে উল্লিখিত শর্তগুলো মুসাকাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য চারটি বিষয়ে মুসাকাত তথা বাগান বর্গা দেওয়া মুযারাআত তথা জমিন বর্গা দেওয়া থেকে ভিন্ন। যথা–

১. মুসাকাত তথা বাগানের বর্গার ক্ষেত্রে বর্গা গ্রহণকারী যদি চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরে কাজ থেকে বিরত থাকে এবং শ্রম না দেয় তাহলে তাকে বর্গাদানকারী তথা বাগান মালিকের বাধ্য করার অধিকার থাকে। পক্ষান্তরে মুযারাআত তথা জমিন বর্গা দেওয়ার পরে বীজওয়ালা যদি চুক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বীজ বপন না করে তাহলে তাকে বীজ ছড়াতে বাধ্য করা যাবে না।

২. মুসাকাত তথা বাগান বর্গা দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে ফলগুলিকে কোনো বিনিময় ছাড়া গাছে রেখে দেওয়া হবে এবং শ্রমদাতাই শ্রম দিয়ে যাবে। আর তাকে তার শ্রমের উপর পৃথক কোনো বিনিময় দেওয়া হবে না। এর বিপরীত জমিন বর্গা দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের পরে যদি ফসল জমিতে রাখতে হয় তাহলে বর্গাদাতাকে অবশ্যই পৃথক বিনিময় দিতে হবে। আর শ্রমদাতা অপর চুক্তিকারীও যদি সময়ের পরে শ্রম দেয় তাহলে সে তার শ্রমের জন্য পূর্বের চুক্তির বাইরে ভিন্ন পারিশ্রমিক পাবে।

৩. মুসাকাতের ক্ষেত্রে যদি বাগান অন্য কারো হক বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে শ্রমদাতা বর্গাগ্রহণকারীকে তার শ্রমের অনুরূপ বিনিময় দেওয়া হবে। চুক্তিতে নির্ধারিত বিনিময় দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে মুযারাআত তথা জমিন বর্গা দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি বর্গা দেওয়ার পরে অন্য কোনো হকদার সাব্যস্ত হয় সে ক্ষেত্রে বর্গাগ্রহণকারীকে ফসলের মূল্য দেওয়া হবে।

৪. মুসাকাত চুক্তিতে সূক্ষ্ম যুক্তির ভিত্তিতে সময়সীমা বর্ণনা করা আবশ্যক নয়। কেননা ফল প্রত্যেক বৎসর একই সময় ধরে। পক্ষান্তরে মুযারাআত চুক্তিতে সময়সীমা বর্ণনা করা আবশ্যক। কেননা ফসল আগে বুনলে আগে হয় পরে বুনলে পরে হয়। অবশ্য যদি ফসলেরও সময়সীমা নির্ধারিত থাকে অর্থাৎ এমন হয় যে, ঐ ফসল কোনো নির্ধারিত সময়েই উৎপাদিত হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে মুযারাআতও সময়সীমা বর্ণনা ছাড়া জায়েজ হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ফাতাওয়ায়ে শামী [৯ / ৪১৩] [মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত]

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلْمُعَامَلَةُ جَائِزَةٌ وَلَا يَجُوْزُ الْمُزَارَعَةُ اِلَّا تَبْعًا لِلْمُعَامَلَةِ لِاَنَّ الْاَصْلَ فِيْ هٰذَا الْمُضَارَبَةِ وَالْمُعَامَلَةِ اَشْبَهُ بِهَا لِاَنَّ فِيْهِ شِرْكَةٌ فِي الزِّيَادَةِ دُوْنَ الْاَصْلِ وَفِي الْمُزَارَعَةِ لَوْ شُرِطَ الشِّرْكَةُ فِي الرِّبْحِ دُوْنَ الْبَذْرِ بِاَنْ شَرَطَ رَفْعَهُ مِنْ رَاسِ الْخَارِجِ يُفْسِدُ فَجَعَلْنَا الْمُعَامَلَةَ اَصْلًا وَجَوَّزْنَا الْمُزَارَعَةَ تَبْعًا لَهَا كَالشِّرْبِ فِيْ بَيْعِ الْاَرْضِ وَالْمَنْقُوْلِ فِيْ وَقْفِ الْعِقَارِ ـ وَشَرْطُ الْمُدَّةِ قِيَاسٌ فِيْهَا لِاَنَّهَا اِجَارَةٌ مَعْنًى كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ وَفِي الْاِسْتِحْسَانِ اِذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّةَ يَجُوْزُ وَيَقَعُ عَلٰى اَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ لِاَنَّ الثَّمَرَ لِاِدْرَاكِهَا وَقْتٌ مَعْلُوْمٌ وَقَلَّ مَا يَتَفَاوَتُ وَيَدْخُلُ فِيْهَا مَا هُوَ الْمُتَيَقَّنُ ـ

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুসাকাত জায়েজ, কিন্তু মুযারাআত জায়েজ নয়। তবে মুসাকাত -এর تَابِعْ বা অনুগামী হলে মুযারাআত জায়েজ। কেননা এই [পারস্পরিক সহযোগিতামূলক লেনদেনের বৈধতার] ব্যাপারে আসল হচ্ছে মুযারাবা। আর মুযারাবার সাথে মুসাকাত অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা মুসাকাতের মধ্যে বর্ধিত অংশেই শুধু অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়, মূল বিষয়ের মধ্যে হয় না। আর মুযারাআর ক্ষেত্রে যদি লভ্যাংশের মধ্যে অংশীদারিত্বের শর্ত করা হয়, বীজের মধ্যে অংশীদারিত্ব না থাকে। যেমন শর্ত করা হলো যে, উৎপন্ন ফসল থেকে প্রথমে বীজ পরিমাণ ফসল নিয়ে নেওয়া হবে [তারপর তা বণ্টন করা হবে] তাহলে মুযারাআত ফাসিদ হয়ে যাবে। কাজেই মুসাকাতকে আমরা আসল ধার্য করে মুযারাআকে এর تَابِعْ বা এর সংশ্লিষ্ট হিসেবে জায়েজ সাব্যস্ত করেছি। যেমন– ওয়াকফের ক্ষেত্রে অস্থাবর সম্পদও তাবে বা অনুগামী হিসেবে এর সাথে শামিল হয়ে যায়। [এভাবে মুযারাআত ও মুসাকাত -এর তাবে বা অনুগামী হিসেবে জায়েজ।] মুসাকাতের মধ্যে [নির্দিষ্ট সময়] মুদ্দতের শর্ত করা কিয়াসের দাবি। কেননা অর্থগত দিক থেকে এটি একটি ইজারা। যেমন মুযারাআর মধ্যে মুদ্দতের কথা উল্লেখ থাকা শর্ত। কিন্তু ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে যদি মুসাকাত -এর মধ্যে মুদ্দতের কথা বর্ণনা করা না হয় তবুও তা জায়েজ হবে এবং এই আকদ প্রথমবার উৎপাদিত ফল ফলাদির মধ্যে প্রযোজ্য হবে। কেননা ফল পাকার তথা পরিপক্ক হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে সাধারণত কম ব্যবধানই হয়ে থাকে। আর এই মুসাকাত এর মধ্যেও যা নিশ্চিত তাই শামিল হবে। [আর সেটি হলো প্রথমবারের উৎপাদিত ফল ফলাদি। কাজেই এই চুক্তি প্রথমবারের ফল ফলাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) الخ **:** এখান থেকে বাগান বর্গা দেওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত এবং দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুযারাআত তথা জমিন বর্গা দেওয়া জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে মুসাকাত তথা বাগান বর্গা দেওয়া জায়েজ। তবে যদি মুযারাআত মুসাকাতের তাবে বা অনুগামী হয় তাহলে তাবে হওয়ার ভিত্তিতে মুযারাআ জায়েজ। যেমন– একটি বাগান বর্গা দিল, সেই বাগানের একপাশে বাগানের সাথে লাগোয়া কিছু জমি খালি পড়ে আছে, এই জমিতে যদি বাগানের মালিক বাগানের তাবে হিসেবে মুসাকাত চুক্তি সম্পন্ন করে তাহলে জায়েজ হবে। অন্যথায় শুধু মুযারাআত জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيْ هٰذَا الْمُضَارَبَةِ الخ : এই ইবারতে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর উল্লিখিত মতের সপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে। যার সারকথা এই যে, মুযারাআত এবং মুসাকাত উভয় চুক্তিই পারস্পরিক সহযোগিতামূলক লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত। আর পারস্পরিক সহযোগিতামূলক লেনদেনের বৈধতার ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে মুদারাবা চুক্তি। মুদারাবা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ এবং তার বৈধতার প্রমাণ স্পষ্টভাবে বিভিন্ন হাদীসে বিদ্যমান। কিয়াসের ভিত্তিতে যেসব চুক্তি মুদারাবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলিও মুদারাবার মতো বৈধ হবে। সুতরাং মুযারাআত এবং মুসাকাতের মধ্যে যেটা মুদারাবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সেটাই জায়েজ হবে।

এখন আপনি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, মুদারাবার সাথে মুসাকাতের সাদৃশ্য মুযারাআর তুলনায় অধিক স্পষ্ট। তার কারণ মুদারাবা চুক্তিতে মূলধনে মুদারিব তথা শ্রমিকের কোনো অংশীদারিত্ব থাকে না; বরং লভ্যাংশে অংশীদারিত্ব থাকে। অনুরূপ মুসাকাতেও মূলধন তথা বাগানে শ্রমিকের কোনো অংশীদারিত্ব থাকে না; বরং ফলে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে মুযারাআত তথা জমিন বর্গা দেওয়ার ক্ষেত্রে মূলধন তথা বীজে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়। এমনকি যদি বীজের মালিক অংশীদারিত্বকে প্রত্যাখ্যান করে এই শর্ত করে যে, আমার উৎপাদিত ফসল থেকে প্রথমে আমার বীজ পরিমাণ ফসল আমাকে দিয়ে দিতে হবে, তাহলে মুযারাআ চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। সুতরাং একথা সাব্যস্ত হলো যে, মুসাকাত যেহেতু মুদারাবার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ তাই তা জায়েজ, আর মুযারাআত যেহেতু ততটা সাদৃশ্যপূর্ণ না তাই তা নাজায়েজ।

হ্যাঁ, তবে অনুগামিতার পদ্ধতিতে মুযারাআত জায়েজ। আর স্বতন্ত্র এবং অনুগামিতার ভিত্তিতে অনেক সময় হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন− স্বতন্ত্রভাবে নালা বিক্রয় জায়েজ নয়, কিন্তু জমিনের অনুগামী করে জায়েজ। তদ্রূপ অস্থাবর সম্পত্তি স্বতন্ত্রভাবে ওয়াকফ করা জায়েজ নেই কিন্তু জমিনের অনুগামী করে জায়েজ।

قَوْلُهُ وَشَرْطُ الْمُدَّةِ الخ : উপরে উল্লিখিত মূল মতনে সাহেবাইনের মত বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, যদি চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের উল্লেখ থাকে তাহলে মুসাকাত জায়েজ। অর্থাৎ বাগান বর্গা দেওয়া জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করা। যদি নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করা না হয় তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

হেদায়া প্রণেতা বলেন, মুসাকাত চুক্তিতে মেয়াদ উল্লেখের শর্ত করা এটা কিয়াসের তাকাজা বা দাবি। কেননা মুসাকাত ইজারা চুক্তির মতো; বরং মুসাকাত চুক্তিও গুণগত দিক বিবেচনায় এক ধরনের ইজারা। তার কারণ মুসাকাত চুক্তিতে শ্রমিককে ইজারা নেওয়া হয়। আর যখন মুসাকাত ইজারা সাব্যস্ত হলো, আর ইজারা শুদ্ধ হওয়ার জন্য মেয়াদ উল্লেখ করা শর্ত হয় তখন মুসাকাত চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্যও নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করা শর্ত হবে।

সুতরাং যদি মুসাকাত চুক্তিতে চুক্তির নির্দিষ্ট মেয়াদের কথা উল্লেখ না করে তাহলে ফাসিদ বা বাতিল বলে গণ্য হওয়া যুক্তি ও কিয়াসের দাবি। আর এ মতই পোষণ করেন ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)।

বাকি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) মুসাকাত তথা বাগান বর্গা দানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে শর্ত করেন যে, তা কমপক্ষে এতটুকু সময়ের জন্য হবে যে, সে সময়ের মাঝে ফল পাকতে বা পরিপক্ক হতে পারে।

قَوْلُهُ وَفِى الْاِسْتِحْسَانِ الخ : কিয়াসের দাবি যে দাবির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে আর তাতে বলা হয়েছে যে, মুসাকাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে। যদি চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ না করে তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু اِسْتِحْسَانٌ তথা সূক্ষ্ম যুক্তির দাবি হলো, যদি মুসাকাত চুক্তিতে চুক্তির সময় কোনো মেয়াদ উল্লেখ না করে তথাপি চুক্তি শুদ্ধ এবং জায়েজ হয়ে যাবে। তাই বলে তা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে না; বরং এই চুক্তি প্রথমবার ফল-ফলাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। اَبُو ثَوْرٍ আবূ ছাওর এবং আরো অন্যান্য ফকীহদের অভিমত তাই এবং এর উপরই আমাদের মাযহাবের ফতোয়া। তার কারণ হলো, ফল পাকার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। আর সেই সময়ে সাধারণত খুব কম ব্যবধানই হয়ে থাকে। যেমন কোনো একটি ফল সাধারণত বৈশাখে পাকে। কখনো ব্যবধান হলে হয়তো জৈষ্ঠে পাকলো। কিন্তু এমন হয় না যে অন্য সময় বৈশাখে পাকে আর কোনো বৎসর নিয়ম ভঙ্গ করে সেই ফল কার্তিক মাসে গিয়ে পাকলো। আর ফিকহের একটি কায়দা বা মূলনীতি স্বীকৃত اَلثَّابِتُ عَادَةً كَالثَّابِتِ شَرْطًا সুতরাং কখন ফল পাকবে তা জানা আছে। সামান্য উনিশ-বিশ বা বেশ কম সাধারণত ঝগড়া বাঁধে না। কাজেই মুসাকাত চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ না করলেও যেহেতু ফল পাকার একটা নির্ধারিত সময় থাকে তাই চুক্তিটি শুদ্ধ হবে এবং তার মেয়াদ হবে প্রথমবারের ফল পাকার আগ পর্যন্ত।

وَإِدْرَاكُ الْبَذْرِ فِي أُصُوْلِ الرَّطْبَةِ فِي هٰذَا بِمَنْزِلَةِ إِدْرَاكِ الثِّمَارِ لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُوْمَةً فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ لِأَنَّ اِبْتِدَاءَهُ يَخْتَلِفُ كَثِيْرًا خَرِيْفًا وَصَيْفًا وَ رَبِيْعًا وَالْاِنْتِهَاءُ بِنَاءٌ عَلَيْهِ فَتَدْخُلُهُ الْجَهَالَةُ . وَبِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ غَرْسًا قَدْ عَلَّقَ وَلَمْ يَبْلُغِ الثَّمَرُ مُعَامَلَةً حَيْثُ لَا يَجُوْزُ إِلَّا بِبَيَانِ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِقُوَّةِ الْأَرَاضِيْ وَضُعْفِهَا تَفَاوُتًا فَاحِشًا . وَبِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ نَخِيْلًا أَوْ أُصُوْلَ رَطْبَةٍ عَلٰى أَنْ يَقُوْمَ عَلَيْهَا أَوْ أَطْلَقَ فِي الرَّطْبَةِ تَفْسُدُ الْمُعَامَلَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِذٰلِكَ نِهَايَةٌ مَعْلُوْمَةٌ لِأَنَّهَا تَنْمُوْ مَا تُرِكَتْ فِي الْأَرْضِ فَجُهِلَتِ الْمُدَّةُ .

অনুবাদ : উল্লেখ্য যে, গান্দনা [এক প্রকারের ঘাস] এর মূলে বীজ পরিপক্ক হওয়ার বিষয়টি মুদ্দত বর্ণনার ক্ষেত্রে ফল পাকার মতোই। কেননা এরও একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রেও মুদ্দত বর্ণনা করা শর্ত নয়। কিন্তু ফসলের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। এই জন্য যে এর সূচনার সময়টি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে– হেমন্ত, গ্রীষ্ম এবং বসন্ত ইত্যাদি মৌসুমের ব্যবধানের কারণে। আর শেষ সময়টি যেহেতু সূচনা কালের উপরই নির্ভরশীল, এ হিসেবে ফসলের সময়সীমার ব্যাপারে জাহালাত তথা অজ্ঞতা বিদ্যমান। [কাজেই ফসলের মুদ্দতের বর্ণনা অত্যাবশ্যক।] এমনিভাবে যদি কেউ জমিতে চারা লাগিয়ে তা মুসাকাতের ভিত্তিতে কারো কাছে ন্যস্ত করে, অথচ ঐ গাছগুলো তখনো ফল দেওয়ার পর্যায়ে পৌছেনি, তাহলেও [মুদ্দত বর্ণনা করা ব্যতিরেকে] এ লেনদেন জায়েজ হবে না। কিন্তু মুদ্দত বা সময়সীমা বর্ণনা করে দিলে তা জায়েজ হবে। কেননা জমির উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হওয়া এবং দুর্বল হওয়ার প্রেক্ষিতে গাছের ফল দেওয়ার সময়ের মধ্যেও মারাত্মক ধরনের ব্যবধান হয়ে থাকে। এমনিভাবে যদি কেউ মুসাকাতের ভিত্তিতে এই শর্তে কাউকে খেজুর বৃক্ষ বা গন্দনা গোড়া প্রদান করে যে, সে এটি দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করবে অথবা গন্দনার গোড়া কোনো শর্ত ছাড়াই প্রদান করে, তাহলে এ লেনদেনও ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কেননা এরও কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। কারণ এটি জমিতে যতদিন থাকবে ততদিন কেবল বাড়তেই থাকবে। এই হিসেবে এর মুদ্দতও মাজহুল তথা অজ্ঞাত থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِدْرَاكُ الْبَذْرِ فِي أُصُوْلِ الرَّطْبَةِ الخ : ইবারতে উল্লিখিত رَطْبَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ– আর্দ্র, ভেজা যা শুষ্ক নয়। কিন্তু এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো رَطْبَةٌ নামে ঘাস জাতীয় এক ধরনের উদ্ভিদ, যা শীতের মৌসুমে উৎপন্ন হয়। প্রতিটি শাখায় তিনটি করে পাতা থাকে। এর ফলের রং অনেকটা বানাফসাহ ফলের রঙের মতো। এই ফল বনে জঙ্গলে একাকী উৎপন্ন হয়। আবার এর চাষ করা যায়। চাষ করা হলে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এমনকি বৎসরে আটবারও কাটা যায়। একবার কাটলে কিছু দিনের মাঝেই আবার তার কাণ্ড বেরিয়ে আসে। কৃষক বৎসরের শেষবার গ্রীষ্মের শুরুর দিকে বীজের জন্য রেখে দেয়। বিস্তারিত দেখুন اَلْمُنْجِدُ এবং كُتُبُ الْاَنْصَرِ এবং অন্যান্য লোগাত অভিধান ও ফিকহের কিতাবসমূহে।

بَذْرٌ অর্থ– বীজ, خَرِيْفٌ অর্থ– হেমন্তকাল, صَيْفٌ অর্থ– গ্রীষ্ম ঋতু আর رَبِيْعٌ অর্থ হলো– বসন্তকাল।

এতো গেল শব্দের ব্যাখ্যা এবার মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। সুরতে মাসআলা হলো, رَطْبَةٌ বা গান্দনা ঘাসের যখন শেষকাল এসে গেল তখন জমির মালিক কোনো শ্রমিককে বলল যে, তুমি এই رَطْبَةٌ ঘাসের হেফাজত কর। যখন ঘাসে বীজ এসে যাবে তখন তা আমার ও তোমার মাঝে বণ্টন করা হবে। তো মুসান্নিফ (র.) বলেন, এই চুক্তি নির্দিষ্ট সময়সীমা বর্ণনা করা ছাড়াই জায়েজ হবে। কেননা যেভাবে ফল পাকার একটা নির্ধারিত সময় থাকে তদ্রূপ এই ঘাসের বীজ আসারও একটা নির্ধারিত সময় আছে। তাই সময়সীমা নির্ধারণ অত্যাবশ্যক হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الزَّرْعِ الخ : এখানে زَرْعٌ দ্বারা مُزَارَعَةٌ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ফসলি জমি বর্গা দেওয়ার মাসআলা ভিন্ন। কেননা সে ক্ষেত্রে ফসলের সূচনা কবে হবে সেটাই অজানা। আর যখন শুরুটাই অজানা তখন শেষটাও অজানা থাকল। কাজেই ফসলি জমি বর্গা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের উল্লেখ থাকতে হবে। তা না হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

বি. দ্র. ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আমাদের দেশে ফসলের শুরু শেষ জানা থাকে তাই সময়সীমা নির্ধারণ ছাড়াও জমিন বর্গা দেওয়া জায়েজ হওয়ার উপরে ফতোয়া হবে।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الخ : মাসআলার সুরত এই যে, এক ব্যক্তি একটা চারা গাছ লাগাল এবং সেটাকে অন্যের নিকট হাওয়ালা বা অর্পণ করে দিল। এই শর্তের ভিত্তিতে যে, তুমি এই চারা গাছটার দেখাশোনা করবে, পরিচর্যা করবে এরপর এই গাছ থেকে যে ফল আসবে তা তোমার এবং আমার মাঝে বণ্টন করা হবে। তাহলে এই চুক্তি ফাসিদ হবে। কেননা কোনো কোনো জমিন এত উর্বর হয় যে, যদি তাতে এই চারা লাগানো হয় তাহলে দুই বৎসরেই ফল দেয়। আর কোনো কোনো জমিন এত অনুর্বর হয় যে, তাতে সাত বৎসরে ফল আসে। সুতরাং সময় নির্ধারণ না করলে তাতে সীমাতিরিক্ত অজ্ঞতা থাকে তাই সময় বর্ণনা ছাড়া এই চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ نَخِيْلًا الخ : মাসআলার সুরত এই যে, কেউ কাউকে মুসাকাতের ভিত্তিতে কোনো খেজুর গাছ দিল অথবা গন্দনার গোড়া দিল আর এই শর্ত করল যে, তুমি এটার দেখাশোনা করবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন এর গোড়া থাকে। যখন এই বৃক্ষ শেষ হয়ে যাবে অথবা গন্দনার গোড়া তার উৎপাদন বৃদ্ধি করবে না তখন পর্যন্ত এই চুক্তির মেয়াদ থাকবে। এভাবে শর্তের ভিত্তিতে চুক্তি করলে সে চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

বি. দ্র. মাসআলার যেই সুরত এখানে বর্ণনা করা হলো সেই অনুসারে মুসান্নিফের ইবারতের মাঝে কিছুটা সংযোজন জরুরি। তা না হলে ইবারত অশুদ্ধ বলে মনে হয়। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, 'জেনে রেখ, মুসান্নিফ (র.) তার ভাষ্যে এমন দুটি কয়েদ ছেড়ে দিয়েছেন যা উল্লেখ না করলেই নয়।' সুতরাং মুসান্নিফের বক্তব্য– بِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ نَخِيْلًا أَوْ أُصُوْلَ رَطْبَةٍ عَلٰى أَنْ يَقُوْمَ عَلَيْهَا -এর পরে আরেকটি কথা বাড়াতে হবে। আর তা হলো– حَتّٰى تَذْهَبَ أُصُوْلُهَا وَيَنْقَطِعَ نَبَاتُهَا আর তা না হলে কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ فِي الرَّطْبَةِ الخ : অর্থাৎ গন্দনার ক্ষেত্রে কোনো শর্ত উল্লেখ না করলেও একই বিধান। অর্থাৎ যদি এই শর্ত উল্লেখ না করে যে, যতদিন এর গোড়া থেকে গন্দনা উৎপন্ন হবে ততদিন এই চুক্তি থাকবে। এমন উল্লেখ না করে শুধু একথা বলে যে, তুমি এই গন্দনার দেখাশোনা করবে আর حَتّٰى تَذْهَبَ أُصُوْلُهَا -এর কয়েদ না লাগায়। তো সে ক্ষেত্রেও চুক্তিটি ফাসিদ বলে গণ্য হবে। তার কারণ এই যে, গন্দনাকে যতদিন জমিনে রেখে দেওয়া হতো ততদিন তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তার উৎপাদন থামবে না। কাজেই সে ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ অজ্ঞাত থাকল। আর মেয়াদ অজ্ঞাত থাকলে আর তা এমন সীমাতিরিক্ত হলে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়।

বি. দ্র. আল্লামা আইনী (র.) বলেন, তবে যদি গন্দনা উৎপাদনের একটা পর্বকে আরেকটা পর্ব থেকে পৃথক করা যায়, তাহলে শর্তমুক্ত রাখার সুরতে সূক্ষ্ম যুক্তির আলোকে চুক্তি শুদ্ধ বলে গণ্য হবে। আর চুক্তির মেয়াদ প্রথম পর্বের ফসল পর্যন্ত ধার্য হবে। এই মাসআলা বর্ণনায় হিদায়া গ্রন্থ প্রণেতার ইবারতে কিছুটা অস্পষ্টতা বিদ্যমান। হিদায়ার ইবরাতের তুলনায় بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ কিতাবের ইবারত অধিক স্পষ্ট। নিচে তা উল্লেখ হলো–

وَلَوْ دَفَعَ أَرْضًا لِيَزْرَعَ فِيْهَا الرِّطَابَ أَوْ دَفَعَ أَرْضًا فِيْهَا أُصُوْلُ رَطْبَةٍ ثَابِتَةٍ وَلَمْ يُسَمِّ الْمُدَّةَ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَيْسَ لِابْتِدَاءِ نَبَاتِهِ وَلَا لِانْتِهَاءِ جَذِّهِ وَقْتٌ مَعْلُوْمٌ فَالْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةٌ وَإِنْ كَانَ وَقْتُ جَذِّهِ مَعْلُوْمًا يَجُوْزُ وَيَقَعُ عَلَى الْجَذَّةِ الْأُوْلٰى كَمَا فِي الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ . (بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ ٦ / ١٨٦)

বাদায়ের এই ইবারতে উপরিউক্ত মাসআলাটি খুব স্পষ্ট।

وَيُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْجُزْءِ مُشَاعًا لِمَا بَيَّنَّا فِى الْمُزَارَعَةِ إِذْ شَرْطُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ وَإِنْ سَمَّيَا فِى الْمُعَامَلَةِ وَقْتًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ الثَّمَرَ فِيهَا فَسَدَتِ الْمُعَامَلَةُ لِفَوَاتِ الْمَقْصُوْدِ وَهُوَ الشَّرِكَةُ فِى الْخَارِجِ وَلَوْ سَمَّيَا مُدَّةً قَدْ يَبْلُغُ الثَّمَرُ فِيهَا وَقَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا جَازَتْ لِأَنَّا لَا نَتَيَقَّنُ بِفَوَاتِ الْمَقْصُوْدِ ـ

অনুবাদ : মুসাকাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, অবিভক্ত অংশ جُزْءٌ مُشَاعٌ -এর কথা এখানে উল্লেখ করতে হবে। এর কারণ আমরা মুযারাআর ভিতর বর্ণনা করেছি। কেননা নির্দিষ্ট অংশবিশেষের কথা শর্ত করা হলে, তাতে অংশীদারিত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদি বাগান বর্গাদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই মুসাকাত চুক্তির মধ্যে এমন সময়ের কথা উল্লেখ করে, যে সময়ের মধ্যে বাগানে ফল ধরবে না বলে তারা উভয়েই জানে, তাহলে মুসাকাত চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য তথা উৎপাদিত ফল-ফলাদিতে অংশীদারিত্ব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে। আর যদি তারা এমন সময়ের কথা উল্লেখ করে যে সময়ের ভিতরে কদাচিৎ ফল এসে যায়, আবার কখনো এর থেকে বিলম্বও হয়, তাহলে মুসাকাত চুক্তি জায়েজ হবে। কেননা এ অবস্থায় উদ্দেশ্য হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الخ : মুযারাআতে একথা বলা হয়েছে যে, উৎপাদিত ফসল অবিভক্ত হিসেবে উভয়ের মাঝে মুশতারাক থাকবে। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ চুক্তিটি এমন হতে হবে যে, উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের একভাগ অথবা দুই ভাগের একভাগ একজনের আর বাকিটা আরেকজনের। মুযারাআ অধ্যায়ে যেমন এই শর্ত করা হয়েছে, ঠিক তেমনি মুসাকাতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ শর্ত আবশ্যক। পক্ষান্তরে যদি এমন শর্ত করা হয় যে, এক মন অমুকের আর বাকিটুকু উভয়ের মাঝে অংশীদারিত্ব হবে তাহলে এই শর্ত ফাসিদ বলে গণ্য হবে এবং এর ফলে চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা অংশীদারিত্বের যে শর্ত ছিল তা খতম হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَإِنْ سَمَّيَا فِى الْمُعَامَلَةِ الخ : মাসআলার সুরত এই যে, বর্গাদাতা এবং গ্রহীতা চুক্তিতে এমন একটা সময় নির্ধারণ করল যে সময়ের মধ্যে ফল আসা সম্ভব নয়, তাহলে এই চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। তার কারণ মুসাকাতের উদ্দেশ্যই হলো ফল ফলানো। আর যখন মুসাকাত চুক্তিতে এত অল্প সময় নির্ধারণ করল যাতে ফল না আসা সুনিশ্চিত, তখন উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। কাজেই চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ سَمَّيَا مُدَّةً قَدْ يَبْلُغُ الخ : যদি এমন সময়সীমা বর্ণনা করে যে সময়ের মাঝে কখনো ফল এসে যায় আবার কখনো আসে না। তাহলে চুক্তি ফাসিদ হবে না। তার কারণ এই সুরতে চুক্তির লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং চুক্তি ফাসিদ হবে না; বরং তার হুকুম হবে যা সামনের ইবারতে আসছে।

ثُمَّ لَوْ خَرَجَ فِى الْوَقْتِ الْمُسَمّٰى فَهُوَ عَلَى الشَّرِكَةِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ اِنْ تَاَخَّرَ فَلِلْعَامِلِ اَجْرُ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ لِاَنَّهُ تَبَيَّنَ الْخَطَاءُ فِى الْمُدَّةِ الْمُسَمَّاةِ فَصَارَ كَمَا اِذَا عَلِمَ ذٰلِكَ فِى الْاِبْتِدَاءِ بِخِلَافِ مَا اِذَا لَمْ يَخْرُجْ اَصْلًا لِاَنَّ الذِّهَابَ بِاٰفَةٍ فَلَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ الْمُدَّةِ فَيَبْقَى الْعَقْدُ صَحِيْحًا وَلَا شَئَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى صَاحِبِهٖ ۔

অনুবাদ : এমতাবস্থায় যদি ফল ফলাদি চুক্তিতে উল্লিখিত মেয়াদের ভিতর এসে যায়, তাহলে এ ফল ফলাদি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেই ভাগবণ্টন করা হবে, চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে। আর যদি ফল আসতে [এর থেকে] বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে আমিল [বাগান পরিচর্যাকারী ব্যক্তি] তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে, মুসাকাত চুক্তি ফাসিদ হওয়ার কারণে। যেহেতু উল্লিখিত ও অনির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে স্পষ্টভাবে ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে, তাই এই হিসেবে বিষয়টি এমন হয়ে গেল, যেন তারা ফল না আসার কথাটি প্রথম থেকেই জানত। পক্ষান্তরে যদি বাগানে আদৌ ফল না আসে, তাহলে চুক্তি ফাসিদ হবে না। কেননা ফল না আসার বিষয়টি [আসমানি] বিপর্যয়ের কারণেই হয়ে থাকে। অতএব এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুদ্দত বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি ছিল না। সুতরাং চুক্তি সহীহ থাকবে। আর এ অবস্থায় কারো জন্য কারো উপর কোনো প্রকার পাওনা-দেনাও অপরিহার্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ لَوْ خَرَجَ فِى الْوَقْتِ الخ : যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল যদি সেই সময়ের মাঝে ফল এসে যায় তাহলে তো চুক্তি সহীহ হবে। আর ফল চুক্তি অনুযায়ী তাদের দুজনের মাঝে বণ্টিত হবে। আর যদি ফল না আসে তাহলে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। তাই চুক্তি অনুযায়ী ফল তাদের উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে না; বরং ফলের মালিক হবে বাগানের মালিক। আর বর্গাগ্রহীতা যে এত দিন শ্রম দিল এর জন্যে অনুরূপ শ্রমের যে বিনিময় হয় সেই বিনিময় পাবে। কেননা যদি এতটুকু সময় নির্ধারণ করত যে সময়ের ব্যাপারে শুরুতেই নিশ্চিতভাবে জানা থাকত যে, সে সময়ের মাঝে ফল আসবে না। তবে সেই সব ক্ষেত্রে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যেত। তদ্রূপ যখন নির্ধারিত সময়ে ফল আসল না তখন এটাও এমন হয়ে গেল যে, এতটুকু সময় নির্ধারণ করেছে, যে সময়ের মাঝে ফল আসে না। কাজেই এই চুক্তিও ফাসিদ হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, যদি একেবারেই ফল না আসে, তাহলে এটা এ কথার আলামত বা নিদর্শন বহন করবে যে, নির্ধারণ তো ঠিক ছিল কিন্তু কোনো আপদ এসেছে যার কারণে ফল আসেনি। তো সে ক্ষেত্রে চুক্তি শুদ্ধ হবে। কাজেই সে ক্ষেত্রে শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময় পাবে না। কারণ তার সাথে চুক্তি হয়েছিল এই মর্মে যে, বাগানে যে ফল আসবে সেই ফল তোমার মাঝে এবং আমার মাঝে বণ্টিত হবে। কোনো বিনিময় দেওয়ার চুক্তি তো হয়নি।

قَالَ : وَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِى النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَالْكَرْمِ وَالرِّطَابِ وَاُصُوْلِ الْبَاذِنْجَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) فِى الْجَدِيْدِ لَا تَجُوزُ اِلَّا فِى الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ لِاَنَّ جَوَازَهَا بِالْاَثَرِ وَقَدْ خَصَّهُمَا وَهُوَ حَدِيْثُ خَيْبَرَ وَلَنَا اَنَّ الْجَوَازَ لِلْحَاجَةِ وَقَدْ عَمَّتْ وَاَثَرُ خَيْبَرَ لَا يَخُصُّهُمَا لِاَنَّ اَهْلَهَا يَعْمَلُوْنَ فِى الْاَشْجَارِ وَالرِّطَابِ اَيْضًا وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ فَالْاَصْلُ فِى النُّصُوْصِ اَنْ تَكُوْنَ مَعْلُوْلَةً سِيَّمَا عَلٰى اَصْلِهٖ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খেজুর গাছ, অন্যান্য বৃক্ষ, আঙ্গুর বাগান, তরি-তরকারি এবং বেগুন গাছ মুসাকাত হিসেবে প্রদান করা জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পরবর্তী অভিমত হলো, কেবল মাত্র আঙ্গুর এবং খেজুর বৃক্ষের ক্ষেত্রেই মুসাকাত জায়েজ হবে। কেননা মুসাকাত-এর বৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং হাদীসে এই দু ধরনের বৃক্ষের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সে হাদীস হলো, খায়বরের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস। আমাদের [হানাফীদের] দলিল হলো, মুসাকাত-এর বৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এবং এ প্রয়োজন হচ্ছে ব্যাপক [উপরিউক্ত সমস্ত গাছের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য]। আর খায়বরবাসী ইহুদিরা সব ধরনের গাছ-গাছালিই রোপণ করতো এবং তরি-তরকারি চাষাবাদ করত। সর্বোপরি বিষয়টি যদি তাই হয়, যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র.) ধারণা করেছেন, তাহলেও আমরা বলব যে, নুসূস [হাদীস] -এর মধ্যে আসল হলো مَعْلُوْلٌ بِالْعِلَّةِ হওয়া। বিশেষভাবে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মূলনীতি অনুসারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ تَجُوْزُ الْمُسَاقَاةُ الخ : এখান থেকে কোন কোন বস্তুতে মুসাকাত বা বাগান বর্গা দেওয়া জায়েজ হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বাগানের যে কোনো বৃক্ষ যথা আঙ্গুর গাছ, খেজুর গাছ অথবা যে কোনো গাছ হোক তা বর্গা দেওয়া জায়েজ আছে। এমনকি তরি-তরকারি এবং বেগুন প্রভৃতিতেও মুসাকাত চুক্তি করা জায়েজ। আর ইমাম কুদূরী (র.) যে বৈধতার কথা বললেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পুরনো অভিমত হলো, ফলদার যে কোনো বৃক্ষে মুসাকাত জায়েজ। আর অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেন ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ছাওরী এবং আওযায়ী (র.)-এরও।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পরবর্তী পরিবর্তিত অভিমত হলো, মুসাকাত শুধুমাত্র আঙ্গুর এবং খেজুর গাছের ক্ষেত্রেই জায়েজ। অন্য কোনো ফল এবং তরি-তরকারিতে মুসাকাত জায়েজ নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, মুসাকাতের বৈধতা খায়বরের হাদীসের কারণে। যে হাদীসে আছে যে, খায়বর বিজয়ের পর রাসূল ﷺ সেখানকার ইহুদি সম্প্রদায়কে এই শর্তে তথায় বহাল রাখেন যে, তারা খায়বরের ভূমি চাষাবাদ করবে এবং বিনিময়ে উৎপাদিত ফল এবং ফসলাদি থেকে অর্ধাংশ পাবে। যেমন হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

قَالَ اَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ عَلٰى اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ـ

(بخاری ٢ / ٦١٠ رَقْمُ الْحَدِيْثِ ٤٢٤٨)

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যেই খায়বরের হাদীসের দ্বারা মুসাকাতের বৈধতা সাব্যস্ত হয়, যুক্তির দাবি হলো, সেই হাদীসে যতটুকু জায়েজ করা হয়েছে ততটুকুর মাঝেই বৈধতা সীমাবদ্ধ থাকবে। আর একথা স্বীকৃত যে, খায়বরে আঙ্গুর এবং খেজুর চাষ করা হতো। সুতরাং অন্য কিছুতে মুসাকাত জায়েজ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্যের বিপক্ষে আমাদের দলিল হলো, মুসাকাতের বৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। আর প্রয়োজন যেভাবে ঐ দুই বৃক্ষের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অন্য সকল বৃক্ষের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ বিদ্যমান। সুতরাং প্রয়োজনের কারণে যদি আঙ্গুর এবং খেজুর গাছে মুসাকাত জায়েজ হয় তাহলে প্রয়োজনের কারণে অন্যান্য বৃক্ষের ক্ষেত্রেও মুসাকাত জায়েজ হবে এটাই স্বাভাবিক কথা।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের জবাব এই যে, **প্রথমত** আমরা একথা মানি না যে, খায়বরে রাসূল ﷺ শুধু এই দুই বৃক্ষের ক্ষেত্রে মুসাকাত করেছিলেন, আর খায়বরের চাষিরা এছাড়া অন্য কিছু আবাদ করত না; বরং তারা অন্যান্য বৃক্ষ এবং সবজি, তরি-তরকারিও আবাদ করত এবং সেগুলোতেও রাসূল ﷺ মুসাকাত চুক্তি সম্পন্ন করেছেন। সুতরাং যেই হাদীসে খায়বর দ্বারা আঙ্গুর এবং খেজুর বৃক্ষে মুসাকাত জায়েজ হয়েছে সেই খায়বরের হাদীস দ্বারাই অন্যান্য বৃক্ষ এবং সবজি তথা তরি-তরকারিতেও মুসাকাতের বৈধতা সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয়ত যদি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, হাদীসে খায়বরে শুধু খেজুর এবং আঙ্গুরের কথা আছে, অন্যান্য বৃক্ষের কথা নেই, তথাপি একথা বলা সঙ্গত হবে না যে, যেহেতু অন্যান্য বৃক্ষের কথা হাদীসে নেই কাজেই অন্যান্য বৃক্ষের ক্ষেত্রে মুসাকাত জায়েজ হবে না; বরং শুধু ঐ দুই বৃক্ষের মাঝেই মুসাকাতের বৈধতা সীমাবদ্ধ থাকবে। কেননা স্বভাবতই এই প্রশ্ন আসবে যে, এই দুই ধরনের বৃক্ষের ক্ষেত্রে মুসাকাত জায়েজ হওয়ার কারণ কি? নিঃসন্দেহে উত্তর আসবে সেই কারণ মানুষের প্রয়োজন। সুতরাং যেখানেই প্রয়োজন দেখা দেবে, সেখানেই মুসাকাত জায়েজ হবে। আর প্রয়োজন সব ধরনের বৃক্ষেই বিদ্যমান কাজেই সব ধরনের বৃক্ষের ক্ষেত্রেই মুসাকাত বৈধ হবে এটা হলো বাস্তবতা।

আর আমরা যে বললাম, হাদীসে খায়বরে মুসাকাত কেন জায়েজ হলো এই প্রশ্ন আসবে তার কারণ উসূলে ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি রয়েছে– اَلْاَصْلُ فِى النُّصُوْصِ اَنْ تَكُوْنَ مَعْلُوْلَةً অর্থাৎ নুসূসের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো এই যে, তা কারণ সম্বলিত হবে। অর্থাৎ তার একটা বাহ্যিক কারণ থাকতে হবে। শরিয়ত যখন কোনো বিধান আরোপ করল তখন সেখানে অবশ্যই একটা কারণ আছে। বিশেষভাবে ইমাম শাফেয়ী (র.) এই মূলনীতিতে অধিক দৃঢ়। তিনি এই মূলনীতিতে কোনো ছাড় দেন না। আহনাফ বলে যে, যদিও কারণ সম্বলিত হওয়াই নুসূসের ক্ষেত্রে আসল, তথাপি কারণ সম্বলিত হওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা উসূলে ফিকহের কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে। মোদ্দাকথা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মূলনীতি অনুসারেই আমরা একথা বুঝতে পারলাম যে, হাদীসে যে দুই বৃক্ষের ক্ষেত্রে মুসাকাত বৈধ হওয়ার কথা উল্লেখ আছে সেই দুই বৃক্ষের মাঝেই বৈধতার হুকুম সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং সেখানে হুকুমের যে কারণ পাওয়া যায় সেই কারণ অন্য যে কোনো স্থানে পাওয়া যাবে সেখানেও একই হুকুম সাব্যস্ত হবে।

وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ اَنْ يُخْرِجَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِاَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِى الْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ وَكَذَا لَيْسَ لِلْعَامِلِ اَنْ يَتْرُكَ الْعَمَلَ بِغَيْرِ عُذْرٍ بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ بِالْاِضَافَةِ اِلَى صَاحِبِ الْبَذْرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ ـ

অনুবাদ : আঙ্গুর বাগানের মালিকের জন্য চাষিকে বিনা কারণে বের করে দেওয়ার এখতিয়ার নেই। কেননা চুক্তি পূর্ণ করাতে তার কোনো ক্ষতি নেই। এমনিভাবে চাষির জন্যও বিনা কারণে কাজ বর্জন করার এখতিয়ার নেই। পক্ষান্তরে মুযারাআর ক্ষেত্রে বীজ দাতা ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে কোনোরূপ বাধ্য করা যাবে না, ঐ তফসীল মোতাবেক, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الخ : যদি কোনো ওজর বা অসুবিধা না থাকে তাহলে বাগানের মালিক শ্রমিককে বের করতে পারবে না। কেননা চুক্তিকে পূর্ণ করাতে মালিকের কোনো ক্ষতি নেই। তদ্রূপ যদি কোনো ওজর বা অসুবিধা না থাকে তাহলে শ্রমিক কাজ ছেড়ে দিতে পারবে না।

পক্ষান্তরে মুযারাআর ক্ষেত্রে বিজের মালিকের উপর কোনো বাধ্য বাধকতা ছিল না অর্থাৎ চুক্তির পর যদি বীজওয়ালা বলে আমি জমিতে বীজ বপন করব না তবে তার সে এখতিয়ার থাকবে। তাকে বীজ বুনতে বাধ্য করা হবে না। কেননা জমিতে বীজ ছড়ানোর দ্বারা তার তাৎক্ষণিক ক্ষতি হয়। আর মুসাকাতে এ ধরনের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তার কারণ এখানে তো গাছ আগে থেকে লাগানো থাকেই। সুতরাং এখানে দু পক্ষের উপরই চুক্তিটিকে সম্পূর্ণ করা আবশ্যক হয়ে যায়। আর মুযারাআতের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে লেখক বলেছেন−

وَاِذَا عَقَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِنَ الْعَمَلِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ... الخ

قَالَ : فَإِنْ دَفَعَ نَخْلاً فِيْهِ تَمَرٌ مُسَاقَاةً وَالتَّمَرُ يَزِيْدُ بِالْعَمَلِ جَازَ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ إِنْتَهَتْ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا عَلَى هٰذَا إِذَا دَفَعَ الزَّرْعَ وَهُوَ بَقْلٌ جَازَ وَلَوْ إِسْتَحْصَدَ وَأَدْرَكَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِالْعَمَلِ وَلَا أَثَرَ لِلْعَمَلِ بَعْدَ التَّنَاهِيْ وَالْإِدْرَاكِ فَلَوْ جَوَّزْنَاهُ لَكَانَ إِسْتِحْقَاقًا بِغَيْرِ عَمَلٍ وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ ذٰلِكَ لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ إِلَى الْعَمَلِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি মুসাকাতের ভিত্তিতে এমন খেজুর বাগান কাউকে প্রদান করে, যাতে খেজুর রয়েছে এবং যা কর্ম তথা পরিচর্যার কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে তা জায়েজ হবে। কিন্তু খেজুর যদি পরিপক্ক হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে জায়েজ হবে না। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী কিয়াসের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, কেউ যদি কাউকে কোনো শস্য ক্ষেত্র প্রদান করে এবং ফসল কাঁচা থাকে, তবে তা জায়েজ হবে। কিন্তু ফসল যদি কাটার উপযুক্ত হয়ে যায় এবং পরিপক্ক হয়ে যায়, তবে জায়েজ হবে না। কেননা চাষি ফসলাদির হকদার হয় কর্মের কারণে। অথচ ফসল পরিপক্ক হয়ে যাওয়ার পর চাষির কর্মের কোনো চিহ্নই ফসলের মধ্যে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায়ও যদি আমরা এ লেনদেন বৈধ বলি, তাহলে চাষি কর্ম ছাড়াই ফসলের হকদার হচ্ছে। অথচ কর্ম ছাড়া ফসলের হকদার হওয়া সম্বন্ধে শরিয়তে কোনো দলিল বিদ্যমান নেই। পক্ষান্তরে সময়ের পূর্বেই যদি কাউকে ফসলী জমি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা জায়েজ হবে। কেননা এ অবস্থায় চাষি কর্তৃক শ্রম বিনিয়োগের আবশ্যকতা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَإِنْ دَفَعَ نَخْلاً فِيْهِ الخ : বর্গা গ্রহীতা তার শ্রমের কারণেই উৎপাদিত ফলের ভাগ পায়, তাই উৎপাদিত ফলের মাঝে বর্গা গ্রহীতার চিহ্ন স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক। কেননা শ্রম ছাড়া কিসের ভিত্তিতে সে ফলের হকদার হবে। ফলের হকদার তো তখনই হবে যখন তার কিছু শ্রম থাকবে। সুতরাং যখন তার কোনো শ্রম থাকবে না তখন মুসাকাত চুক্তি শুদ্ধ হবে না। সুতরাং যদি এমন হয় যে, বাগানে ফল এসে গেছে এবং যতটুকু বড় হওয়ার হয়ে গেছে এরপর বাগানের মালিক বর্গা গ্রহীতার হাতে সোপর্দ করে তাহলে তা জায়েজ হবে না।

হ্যাঁ, যদি ফল পরিপূর্ণ বৃদ্ধি না পেয়ে থাকে; বরং বর্গা গ্রহীতার কাজের দ্বারা তা পরিপূণ বৃদ্ধি পায় তাহলে তা জায়েজ। এই একই বিধান মুযারাআত তথা জমিন বর্গা দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

قَالَ : وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُسَاقَاةُ فَلِلْعَامِلِ اَجْرُ مِثْلِهِ لِاَنَّهُ فِىْ مَعْنَى الْاِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَصَارَتْ كَالْمُزَارَعَةِ اِذَا فَسَدَت ـ قَالَ : وَتَبْطُلُ الْمُسَاقَاةُ بِالْمَوْتِ لِاَنَّهَا فِىْ مَعْنَى الْاِجَارَةِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيْهَا ـ فَاِنْ مَاتَ رَبُّ الْاَرْضِ وَالْخَارِجُ بُسْرٌ فَلِلْعَامِلِ اَنْ يَقُوْمَ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يَقُوْمُ قَبْلَ ذٰلِكَ اِلٰى اَنْ يُدْرِكَ التَّمَرَ وَاِنْ كَرِهَ ذٰلِكَ وَرَثَةُ رَبِّ الْاَرْضِ اِسْتِحْسَانًا فَيَبْقَى الْعَقْدُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَلَا ضَرَرَ فِيْهِ عَلَى الْاٰخَرِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুসাকাত চুক্তি যদি ফাসিদ হয়ে যায়, তবে চাষি তার ন্যায্য পারিশ্রমিকের হকদার হবে। কেননা এ অবস্থায় এটি ফাসিদ ইজারার অর্থে গণ্য হবে। এমনিভাবে মুযারাআত ফাসিদ হলে যা হয়, এটিও তার অনুরূপ হয়ে যাবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মৃত্যুর কারণে মুসাকাত বাতিল হয়ে যায়। কেননা অর্থগত দিক থেকে মুসাকাত ইজারার অনুরূপই। আর ইজারার আলোচনায় আমরা এ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছি। যদি ফল ফলাদি অর্ধ পাকা অবস্থায় ভূমি মালিক মারা যায়, তবে চাষি ফল ফলাদি পাকা বা পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত এর তত্ত্বধান করে যাবে, যেমন মালিক মারা যাওয়ার আগে সে করছিল। যদিও এ বিষয়টিকে ভূমি মালিকের ওয়ারিশগণ অপছন্দ করে। এ হুকুম ইসতিহসানের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। কাজেই আকদ বা চুক্তি বাকি থাকবে। এতে চাষির উপর থেকে ক্ষতি দূর হয়ে যাবে। আর এ অবস্থায় ওয়ারিশগণেরও কোনো ক্ষতি নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ-এর ক্ষেত্রে যেমন اَجِيْر তার اُجْرَتْ مِثْلِيَّةٌ পায় তদ্রূপ মুসাকাতে ফাসিদার ক্ষেত্রেও عَامِلْ তারা اُجْرَتْ مِثْل পাবে। কেননা মুসাকাত ইজারার মতো। আর মুসাকাতে ফাসিদার হুকুমও অভিন্ন।

قَوْلُهُ قَالَ وَتَبْطُلُ الْمُسَاقَاةُ بِالْمَوْتِ الخ : চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের মৃত্যুর কারণে ইজারা যেমনিভাবে বাতিল হয়ে যায়, অনুরূপভাবে মুসাকাতও বাতিল হয়ে যাবে। আর মৃত্যুর কারণে ইজারা কেন বাতিল হয়, এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার (র.) বলেন, এতদসম্পর্কে ইজারা অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاِنْ مَاتَ رَبُّ الْاَرْضِ الخ : যদিও ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর দ্বারা মুসাকাত বাতিল হয়ে যায়। কেননা তা ইজারার মতো, তথাপি তা ছিল কিয়াস। এখানে যা বলা হচ্ছে তা হলো ইসতিহসান। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, যদি জমিনের মালিক মারা যায় তাহলে বর্গা গ্রহীতা রীতিমতো বাগানের দেখাশুনা করবে। অর্থাৎ চুক্তি অবশিষ্ট থাকবে। এমন কি ওয়ারিশগণ অপছন্দ করলেও চুক্তি ফাসিদ হবে না। মাসআলার এই সমাধান কিয়াসের বিপরীতে ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম যুক্তির ভিত্তিতে। কিয়াস তো স্পষ্ট যে, ইজারা যেমন মৃত্যু দ্বারা ফাসিদ এটাও ফাসিদ হবে। কারণ এটা ইজারার মতোই। আর সূক্ষ্ম যুক্তি এই যে, যদি এখন চুক্তি ফাসিদ হয় আর বর্গা গ্রহীতা শ্রম ছেড়ে দেয় তাহলে বাগানের ক্ষতি হবে আর তাতে উভয় পক্ষের ক্ষতি হবে। সুতরাং উভয় পক্ষের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চুক্তিটিকে বহাল রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

وَلَوْ الْتَزَمَ الْعَامِلُ الضَّرَرَ يَتَخَيَّرُ وَرَثَةُ الْاٰخَرِ بَيْنَ اَنْ يَقْتَسِمُوْا الْبُسْرَ عَلَى الشَّرْطِ وَبَيْنَ اَنْ يُعْطُوْهُ قِيْمَةَ نَصِيْبِهِ مِنَ الْبُسْرِ وَبَيْنَ اَنْ يُنْفِقُوْا عَلَى الْبُسْرِ حَتّٰى يَبْلُغَ فَيَرْجِعُوْا بِذٰلِكَ فِىْ حِصَّةِ الْعَامِلِ مِنَ التَّمَرِ لِاَنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ اِلْحَاقُ الضَّرَرِ بِهِمْ وَقَدْ بَيَّنَّا نَظِيْرَهٗ فِى الْمُزَارَعَةِ وَلَوْ مَاتَ الْعَامِلُ فَلِوَرَثَتِهِ اَنْ يَقُوْمُوْا عَلَيْهِ وَاِنْ كَرِهَ رَبُّ الْاَرْضِ لِاَنَّ فِيْهِ النَّظْرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَاِنْ اَرَادُوْا اَنْ يَصْرِمُوْهُ بُسْرًا كَانَ صَاحِبُ الْاَرْضِ بَيْنَ الْخِيَارَاتِ الثَّلٰثَةِ الَّتِىْ بَيَّنَّاهَا ـ

অনুবাদ : যদি চাষি ব্যক্তি নিজের ক্ষতিকে স্বীকার করে নেয়, তাহলে ভূমি মালিকের ওয়ারিশদেরকে এখতিয়ার দেওয়া হবে– ১. হয়তো তারা এ অর্ধ পাকা ফলই ভাগ বণ্টন করে নেবে। ২. অথবা, তার [চাষির] অংশের এই অর্ধ পাকা ফলের যে মূল্য, তা তাকে দিয়ে দেবে। ৩. অথবা, এ অর্ধ পাকা ফল পাকা পর্যন্ত যা খরচ লাগবে, তা তারা করে যাবে। এরপর চাষির পাকা খেজুরের অংশ থেকে তারা এই পরিমাণ উসূল করে নিয়ে নেবে। কেননা এতে তাদের কোনো ক্ষতি নেই। মুযারাআর মধ্যে এর নজির আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। যদি আমিল তথা চাষি মারা যায়, তাহলে ওয়ারিশগণ বাগানের তত্ত্বাবধান চালিয়ে যেতে পারবে। যদিও ভূমি মালিক তা অপছন্দ করে। কেননা এতে উভয়কুল রক্ষা পায়। আর যদি চাষির ওয়ারিশগণ এই অর্ধ পাকা খেজুরই কেটে নেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে ভূমি মালিকের উপরিউক্ত তিন অবস্থার যে কোনো একটি গ্রহণ করার ব্যাপারে এখতিয়ার বা ইচ্ছাধিকার থাকবে। যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ الْتَزَمَ الْعَامِلُ الضَّرَرَ الخ : মাসআলার সুরত এই যে, বাগানের মালিকের মৃত্যুর পরে বর্গা গ্রহীতা চাষি যদি আর কাজ করতে না চায় এবং সে নিজের ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত থাকে অর্থাৎ সে পুরোপুরি পাকার পূর্বেই যেমন আছে তেমনটাই ভাগ বাটোয়ারা করার কথা বলে, তাহলে যেহেতু এক্ষেত্রে জমির মালিকের ওয়ারিশদের লোকসান হয় তাই জমির মালিকের ওয়ারিশদের উপরিউক্ত তিনটি এখতিয়ার থাকবে। যেগুলোকে লেখক মুযারাআত অধ্যায়ে বর্ণনা করে এসেছেন। এখানেও বর্ণনা করেছেন। মূল ইবারতেই তা স্পষ্ট, নতুন করে ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

قَوْلُهٗ وَلَوْ مَاتَ الْعَامِلُ الخ : চাষি মারা গেলে চাষির ওয়ারিশগণ ফল দেখাশুনা করবে। কেননা তাতে চাষির ওয়ারিশ এবং জমির মালিক উভয় পক্ষের উপকার নিহিত রয়েছে।

قَوْلُهٗ فَاِنْ اَرَادُوْا ان الخ : যদি চাষির ওয়ারিশগণ আর দায়িত্বভার নিতে না চায়; বরং কাচা ফল পেড়ে উত্তোলন করে নিতে চায়, সে ক্ষেত্রে জমির মালিকের উপরোল্লিখিত তিন অবস্থার যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার এখতিয়ার বা ইচ্ছাধিকার থাকবে। কেননা যদি চাষির ওয়ারিশদের কাঁচা ফল পাড়ার অনুমতি হয়ে যায় তাহলে জমির মালিকের লোকসান হয়ে যায়। কাজেই জমির মালিককে উক্ত তিন অবস্থার মাঝে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। সে যে কোনো একটাকে গ্রহণ করতে পারবে।

وَاِنْ مَاتَا جَمِيْعًا فَالْخِيَارُ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ وَهٰذَا خِلَافُهُ فِيْ حَقٍّ مَالِيٍّ وَهُوَ تَرْكُ الثِّمَارِ عَلَى الْاَشْجَارِ اِلٰى وَقْتِ الْاِدْرَاكِ لَا اَنْ يَّكُوْنَ وِرَاثَةً فِى الْخِيَارِ فَاِنْ اَبٰى وَرَثَةُ الْعَامِلِ اَنْ يَقُوْمُوْا عَلَيْهِ كَانَ الْخِيَارُ فِيْ ذٰلِكَ اِلٰى وَرَثَةِ رَبِّ الْاَرْضِ عَلٰى مَا وَصَفْنَا .

অনুবাদ : যদি চুক্তি সম্পাদনকারী বাগানের মালিক এবং চাষি উভয়েই মারা যায়, তাহলে উপরিউক্ত এখতিয়ার চাষির ওয়ারিশদের জন্য সাব্যস্ত হবে। কেননা তারাই চাষির স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি। বস্তুত এটি হলো আর্থিক হকের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব। আর আর্থিক প্রতিনিধিত্ব হলো ফল পাকা পর্যন্ত এগুলোকে গাছের উপর রেখে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এটি এখতিয়ার প্রাপ্তির মধ্যে উত্তরাধিকার আইনের প্রয়োগ নয়। অপর পক্ষে যদি চাষির ওয়ারিশগণ বাগান তত্ত্বাবধান করতে অসম্মতি প্রকাশ করে তবে এ অবস্থায় ভূমি মালিকের ওয়ারিশগণের এখতিয়ার থাকবে। ঐ প্রক্রিয়ায়, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ مَاتَا جَمِيْعًا الخ : যদি চাষি এবং জমির মালিক উভয়েই মারা যায় তাহলে উপরিউক্ত এখতিয়ার চাষির ওয়ারিশদের জন্য সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ উভয়ের মৃত্যু হলে চাষির ওয়ারিশগণ ইচ্ছা করলে যথারীতি বাগান আবাদ করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে চাষ ছেড়েও দিতে পারে। আর চাষির ওয়ারিশগণ যখন কাজ ছেড়ে দেবে তখন জমির মালিকের ওয়ারিশদের ঐ তিনটি এখতিয়ার মিলবে, যেগুলির আলোচনা বারংবার হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا خِلَافُهُ فِيْ حَقٍّ مَالِيٍّ الخ : এ ইবারতে একটি আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়েছে। আপত্তিটি হলো, আপনি ইতঃপূর্বে একাধিক জায়গায় বলে এসেছেন যে, এখতিয়ারের ক্ষেত্রে কোনো উত্তরাধিকার চলে না। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ধনসম্পত্তিতে যেমন মিরাশ হয় তার এখতিয়ারের ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না। একথা স্বয়ং লেখক একাধিক স্থানে বলে এসেছেন অথচ এখানে চাষির এখতিয়ারকে তার ওয়ারিশদের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। তো এখানে কিভাবে এখতিয়ারের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগ হলো?

মুসান্নিফ (র.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এটি এখতিয়ার প্রাপ্তির মধ্যে উত্তরাধিকার আইনের প্রয়োগ নয়; বরং এটি হলো আর্থিক হকের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব।

قَالَ : وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُعَامَلَةِ وَالْخَارِجُ بُسْرٌ أَخْضَرُ فَهٰذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ وَلِلْعَامِلِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ يُدْرِكَ لٰكِنْ بِغَيْرِ أَجْرٍ لِأَنَّ الشَّجَرَ لَا يَجُوزُ اسْتِيجَارُهُ بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ فِي هٰذَا لِأَنَّ الْأَرْضَ يَجُوزُ اسْتِيجَارُهَا وَكَذٰلِكَ الْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ هٰهُنَا وَفِي الْمُزَارَعَةِ فِي هٰذَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ عَلَى الْعَامِلِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهٰهُنَا لَا أَجْرَ فَجَازَ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْعَمَلُ كَمَا يَسْتَحِقُّ قَبْلَ انْتِهَائِهَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ফল অর্ধ-পাকা থাকা অবস্থায়ই যদি মুসাকাতের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে এ মাসআলা এবং প্রথমোক্ত মাসআলা উভয়টি একই ধরনের হবে। এ পর্যায়ে ফল পাকা পর্যন্ত চাষি ব্যক্তি এ বাগানের তত্ত্বাবধান করতে পারবে, তবে এই তত্ত্বাবধানের জন্য কোনো পারিশ্রমিক পাবে না। কেননা গাছ-গাছালি ইজারা দেওয়া জায়েজ নেই। কিন্তু এই অবস্থায় মুযারাআর হুকুম এর থেকে ভিন্নতর। কেননা জমি ইজারা দেওয়া জায়েজ। এমনিভাবে মুসাকাতের ক্ষেত্রে কাজের সমস্ত দায়দায়িত্ব আমিল তথা চাষির উপর। আর মুযারাআর ক্ষেত্রে এই অবস্থায় কাজের দায় দায়িত্ব বর্গাদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপর। কেননা বর্গাচাষের ক্ষেত্রে মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর চাষির উপর ভূমির ন্যায্য ইজারা ওয়াজিব হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে চাষির উপর এককভাবে কোনো দায় দায়িত্ব বর্তাবে না। আর আলোচ্য মাসআলায় চাষির জন্য কোনো পারিশ্রমিক নেই। কাজেই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগে তার উপর যেমন কাজের দায়িত্ব ছিল, অনুরূপভাবে মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কাজের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الخ : মুযারাআর ক্ষেত্রে যদি মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যায় আর ফসল কাঁচা থেকে যায় তাহলে চাষিকে তার নিজের অংশের ভাড়া দিতে হয় আর শ্রম উভয়ের জিম্মায় হয়। কিন্তু যদি মুসাকাতে এই সুরত আসে অর্থাৎ ফল কাঁচা থাকতেই মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে চাষির উপর কোনো ভাড়া আসবে না। কেননা গাছ ভাড়া দেওয়া জায়েজ নেই।

আর যখন চাষির উপর ভাড়া ওয়াজিব নয়, তখন জমির মালিকের উপর শ্রম আসবে না; বরং শ্রমিক স্বাভাবিক কাজ কম করতে থাকবে যেমনটি সে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে করতেছিল।

সারকথা, যেখানে চাষির উপর ভাড়া আসে না সেখানে কাজ তার জিম্মাতেই অর্থাৎ চাষির উপরই। আর যেখানে ভাড়া আসে সেখানে কাজ উভয়ের জিম্মায় হবে। শুধু চাষির উপর নয়।

قَالَ : وَتَنْفَسِخُ بِالْاَعْذَارِ لِمَا بَيَّنَّا فِى الْاِجَارَاتِ وَقَدْ بَيَّنَّا وُجُوْهَ الْعُذْرِ فِيْهَا وَمِنْ جُمْلَتِهَا اَنْ يَكُوْنَ الْعَامِلُ سَارِقًا يَخَافُ عَلَيْهِ سَرِقَةَ السَّعْفِ وَالثَّمَرِ قَبْلَ الْاِنَاءِ يَلْزَمُ صَاحِبُ الْاَرْضِ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ فَيَنْفَسِخُ بِهِ وَمِنْهَا مَرَضُ الْعَامِلِ اِذَا كَانَ يُضْعِفُهُ عَنِ الْعَمَلِ لِاَنَّ فِى اِلْزَامِهِ اِسْتِيْجَارُ الْاُجَرَاءِ زِيَادَةُ ضَرَرٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ فَيَجْعَلُ ذٰلِكَ عُذْرًا وَلَوْ اَرَادَ الْعَامِلُ تَرْكَ ذٰلِكَ الْعَمَلِ هَلْ يَكُوْنُ عُذْرًا فِيْهِ رِوَايَتَانِ وَتَاوِيْلُ اِحْدٰهُمَا اَنْ يَشْتَرِطَ الْعَمَلَ بِيَدِهِ فَيَكُوْنُ عُذْرًا مِنْ جِهَتِهِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুসাকাত চুক্তি রহিত হয়ে যায় ওজরের কারণে। এর কারণ আমরা ইজারা অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এবং সেখানে ওজরের সম্ভাব্য দিকসমূহ সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করেছি। সে ওজরসমূহ থেকে কতিপয় ওজর নিম্নে উল্লেখ করা হলো– ১. চাষি একজন চোর। তার ব্যাপারে আশঙ্কা আছে যে, হয়তো সে ফল-ফলাদি পাকার আগেই গাছের ডাল এবং কাঁচা ফল কেটে নিয়ে যাবে। এ অবস্থায়ও যদি আবাদ বহাল রাখা হয়, তবে এতে বাগানের মালিকের এমন ক্ষতি হবে, যা সে তার নিজের উপর অবধারিত করেনি। কাজেই এ অবস্থায় মুসাকাত চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। ২. অথবা চাষি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। [এ অবস্থায়ও চুক্তি রহিত হয়ে যাবে।] যদি এ অসুখের কারণে সে কাজ করতে দুর্বল হয়ে পড়ে। কেননা এ অবস্থায়ও যদি তাকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ে শ্রমিকদেরকে কাজে খাটানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। অথচ এরূপ করাকে সে তার নিজের উপর অবধারিত করেনি। কাজেই এটিকে [অসুস্থতাকে] ওজর হিসেবে গণ্য করা হবে। চুক্তি সম্পাদনের পর যদি চাষি নিজেই কাজ না করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, তবে তা ওজর হিসেবে স্বীকৃত হবে কিনা, এ সম্বন্ধে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। সে দুই বর্ণনার একটির ব্যাখ্যা হলো এই যে, যদি চুক্তিতে চাষির নিজ হস্তে কর্ম সম্পাদনের শর্ত করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে এটি ওজর হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَنْفَسِخُ بِالْاَعْذَارِ الخ : যদি কোনো ওজর বা গ্রহণযোগ্য সমস্যা চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রতিবন্ধক হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে যেভাবে ইজারা চুক্তিকে রহিত করে দেওয়া হয় তদ্রূপ মুসাকাতকেও রহিত করে দেওয়া হবে।

চুক্তি সম্পাদনের প্রতিবন্ধকতার দৃষ্টান্ত : যেমন– চাষি যদি চোর হয়, আর এই আশঙ্কা থাকে যে, বাগানের সব ফল এবং কাঠ নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে। অথবা চাষি এত অসুস্থ যে, কাজ করতে আর সক্ষম না। তো সে ক্ষেত্রে চুক্তি রহিত করে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ فِى الزَّامِهِ اِسْتِيْجَارَ الْاُجَرَاءِ الخ : গ্রন্থকার (র.) এখান থেকে একটি আপত্তির উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য করেছেন। আপত্তিটি উপরে এভাবে বলা হলো যে, চাষি যদি এরূপ অসুস্থ হয় যে কারণে কাজ করতে পারে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে চুক্তি রহিত করে দেওয়া হবে। কারণ এরূপ অবস্থায়ও যদি তাকে কাজ করতে বাধ্য করা হয় তাহলে তাকে অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া হবে, যা প্রকারান্তরে চাষিরর উপর জুলুম করা। এ কথার উপর আপত্তি এই যে, এ অসুস্থতার ওজরের কারণে চুক্তি রহিত করতে হবে কেন? বরং চুক্তিকে বহাল রেখে চাষিকে বলা হবে যে, তোমার দায়িত্বে যেহেতু শ্রম সুতরাং তুমি যদি নিজে না পার তাহলে অন্য শ্রমিক লাগিয়ে দায়িত্ব আঞ্জাম দাও। এমনটি হলে তো চুক্তি রহিত করার প্রয়োজন পড়ে না!

উপরিউক্ত আপত্তির উত্তর এই যে, চাষি চুক্তিতে এমন কিছু নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়নি। সুতরাং যা সে নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়নি তা তার উপর চাপানো অযৌক্তিক হবে। কাজেই এ চুক্তিটিকে রহিত করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে অবশিষ্ট না।

قَوْلُهُ وَلَوْ اَرَادَ الْعَامِلُ الخ : এখানে আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন এবং এতে বলেছেন যে, চাষি যদি চাষের কাজ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা করে তাহলে কি এটা কোনো ওজর বলে গণ্য হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলায় দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এ বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, এমনটি কোনো ওজর রূপে পরিগণিত হবে না। সুতরাং তাকে কাজ করতে বাধ্য করা হবে। কেননা চুক্তি সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। কোনো ওজর ছাড়া তা রহিত করা যায় না। আর ওজর বলে এমন কিছুকে বুঝায় যার দ্বারা কোনো ক্ষতি সাধন হয়। আর এখানে তো এমন কিছু নেই। সুতরাং এখানে কোনো ওজর নেই। আর যখন কোনো ওজর এখানে থাকল না, তখন চুক্তিটিকেও রহিত করা যাবে না। সুতরাং তাকে চাষে বাধ্য করা হবে এবং তার এই কাজ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছাটিকে আপত্তি রূপে গ্রহণ করা হবে না।

আরেক বর্ণনায় চাষির এই কাজ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছাটাকে ওজর রূপে গ্রহণ করা হবে। কেননা চাষ কার্যে শরীরে চাপ পড়ে যা তার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং তা ওজরের সংজ্ঞায় পড়ে। আর যখন তা ওজর হলো তখন এই চুক্তিকে আর বহাল রাখা হবে না; বরং তা রহিত করে দেওয়া হবে। তবে যদি চাষি চুক্তির সময়ে নিজের হাতে কাজ করার শর্ত না করে সে ক্ষেত্রে তার এই কাজ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা কোনো ওজর হবে না। কেননা সে এই কাজ না করতে পারলেও অন্য শ্রমিকদের কে দিয়ে করাবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে চুক্তিটি রহিত করা হবে না।

وَمَنْ دَفَعَ اَرْضًا بَيْضَاءَ اِلٰى رَجُلٍ سِنِيْنَ مَعْلُوْمَةً يَغْرِسُ فِيْهَا شَجَرًا عَلٰى اَنْ تَكُوْنَ الْاَرْضُ وَالشَّجَرُ بَيْنَ رَبِّ الْاَرْضِ وَالْغَارِسِ نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ ذٰلِكَ لِاشْتِرَاطِ الشَّرْكَةِ فِيْمَا كَانَ حَاصِلًا قَبْلَ الشَّرْكَةِ لَا بِعَمَلِهِ وَجَمِيْعُ الثَّمَرِ وَالْغَرْسِ لِرَبِّ الْاَرْضِ وَلِلْغَارِسِ قِيْمَةُ غَرْسِهِ وَاَجْرُ مِثْلِهِ فِيْمَا عَمِلَ لِاَنَّهُ فِيْ مَعْنٰى قَفِيْزِ الطَّحَّانِ اِذْ هُوَ اِسْتِيْجَارٌ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ عَمَلِهِ وَهُوَ نِصْفُ الْبُسْتَانِ فَيَفْسُدُ وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْغِرَاسِ لِاتِّصَالِهَا بِالْاَرْضِ فَيَجِبُ قِيْمَتُهَا وَاَجْرُ مِثْلِهِ لِاَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيْ قِيْمَةِ الْغِرَاسِ لِتَقَوُّمِهَا بِنَفْسِهَا وَفِيْ تَخْرِيْجِهَا طَرِيْقٌ اٰخَرُ بَيَّنَّاهُ فِيْ كِفَايَةِ الْمُنْتَهِيْ وَهٰذَا اَصَحُّهُمَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য খালি ভূমিতে বৃক্ষের চারা রোপণ করার জন্য কাউকে তা এ শর্তে প্রদান করে যে, এই জমি এবং বৃক্ষ ভূমি মালিক ও চারা রোপণকারী ব্যক্তিদ্বয়ের মাঝে আধা-আধি করে বণ্টন করা হবে, তাহলে এ চুক্তি জায়েজ হবে না। কেননা চুক্তিতে এমন বিষয়ে [জমিতে] অংশীদারিত্বের শর্ত করা হয়েছে, যা তাদের সাথে যৌথ শ্রম বিনিয়োগের পূর্ব হতেই বিদ্যমান আছে। যেখানে চাষির কর্মের কোনো দখল নেই। এহেন অবস্থায় ভূমি মালিকই সমস্ত ফল-ফলাদি এবং চারাসমূহের অধিকারী হবে। আর বৃক্ষ রোপণকারী ব্যক্তি তার রোপণকৃত চারাসমূহের মূল্য এবং তার কর্মের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হবে। কেননা এ বিষয়টি অর্থগত দিক থেকে আটা পেষণকারী ব্যক্তির কাফীযের ন্যায় হয়ে গেছে। কেননা এখানে শ্রমিককে তার শ্রম দ্বারা অর্জিত বস্তুর কিয়দংশের বিনিময়ে ভাড়া গ্রহণ করা হয়েছে। আর তা হলো বাগানের অর্ধাংশ। সুতরাং এ চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে। তবে চারা যেহেতু বাগানে লাগানো হয়েই গেছে, তাই তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব। কাজেই এ অবস্থায় চারার মূল্য এবং শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা চাষিকে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। কেননা চাষির পারিশ্রমিক চারার মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না এ কারণে যে, চারার স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। এ মাসআলার উদ্ধৃতি অন্যভাবেও রয়েছে, যা আমি কিফায়াতুল মুনতাহী গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। তবে এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে এ দুয়ের মধ্যে বিশুদ্ধতম। আল্লাহই সর্বাধিকপরিজ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ دَفَعَ أَرْضًا الخ : মাসআলার সুরত এই যে, কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য উদাহরণত দশ বৎসরের জন্য বৃক্ষের চারা রোপণ করতে কোনো একটা খালি জমি কাউকে এই শর্তে প্রদান করল যে, এই জমি এবং এই জমিতে গাছ লাগানোর পর যে সব গাছ উৎপাদিত হবে তার সব কিছু জমির মালিক এবং চারা রোপণকারী উভয়ের মাঝে আধা-আধি করে বণ্টন করা হবে। এ সুরতে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন যে, এই চুক্তি জায়েজ হবে না।

হিদায়াগ্রন্থ প্রণেতা এই চুক্তি জায়েজ না হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এই মাসআলাটিকে দুইটি কিয়াসের ভিত্তিতে না জায়েজ বলা যেতে পারে। প্রথম কিয়াসের সারকথা এই হলো, এই মাসআলার চুক্তিতে এমন বিষয়ে [জমিতে] অংশীদারিত্বের শর্ত করা হয়েছে, যা তাদের যৌথ শ্রম বিনিয়োগের পূর্ব হতেই বিদ্যমান। ঐ জমি অর্জনে চাষির কর্মের কোনো দখল নেই। আর شِرْكَتْ বা অংশীদারিত্ব হয় সেই ক্ষেত্রে যেখানে বস্তু এখনও অর্জিত হয়নি; বরং শ্রমের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। পূর্ব থেকে অর্জিত বস্তুতে অংশীদারিত্ব হয় না। আর কোথাও যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে চুক্তিকে ফাসিদ বলা হয়।

এর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, قَفِيْزُ الطَّحَّانِ অর্থাৎ আটা পেষণকারী কফীয না জায়েজ। যার সুরত হলো নিম্নরূপ, এক ব্যক্তি তার গম কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে বলল, তুমি এই গম পিষে আটা বানিয়ে দাও, বিনিময়ে তুমি ঐ পিষা আটা থেকেই এক কফীয আটা নিয়ে নেবে। তো এই ধরনের চুক্তি সম্পূর্ণরূপে নাজায়েজ। আর এর অবৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং যে চুক্তি قَفِيْزُ الطَّحَّانِ -এর মতো হবে সেটাও ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

এখন লক্ষ্য করুন আলোচ্য মালআলাটি قَفِيْزُ الطَّحَّانِ -এর মতোই হচ্ছে। তার কারণ قَفِيْزُ الطَّحَّانِ -এ শ্রমিককে তার শ্রম দ্বারা অর্জিত বস্তুর কিয়দংশের বিনিময়ে ভাড়া গ্রহণ করা হয়। এই মাসআলাতেও তাই করা হচ্ছে। কারণ এখানেও তার শ্রম দ্বারা যে জমি চাষ করা হচ্ছে সেই জমিরই অর্ধাংশ দ্বারা তার পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। যদিও দুই মাসআলায় সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। তথাপি মূল কার্যকারণে উভয় মাসআলা একই রকম। কাজেই قَفِيْزُ الطَّحَّانِ যেমন নাজায়েজ তদ্রূপ আলোচ্য সুরতও নাজায়েজ। এই গেল প্রথম কিয়াস। দ্বিতীয় কিয়াসের কথা বলতে গিয়ে হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতা বলেন–

وَفِيْ تَخْرِيْجِهَا طَرِيْقٌ آخَرُ بَيَّنَّاهُ فِيْ كِفَايَةِ الْمُنْتَهِيْ الخ

অর্থাৎ এই মাসআলার সমাধানে পৌঁছার আরেকটি পথ আছে। যাকে আমরা কিফায়াতুল মুনতাহী নামক কিতাবে বর্ণনা করেছি। এই ইবারতে তিনি দ্বিতীয় কিয়াসের দিকে ইশারা করেছেন। কিন্তু এখানে তা বর্ণনা করেননি। ইনায়া গ্রন্থপ্রণেতা সেই কিয়াসটির সারাংশ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এই মাসআলাটিতে মূলত এমন হয়েছে যে, জমির মালিক চাষির কাছ থেকে অর্ধেক জমির বিনিময়ে অর্ধেক চারা খরিদ করে নিয়েছে। তাই এটা নাজায়েজ হওয়ার কারণ এই যে, জমির মালিক যে অর্ধেক চারা কিনল, সেই অর্ধেক চারা তো চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সময় অনুপস্থিত। সুতরাং পণ্য অস্তিত্বে না থাকলে যেমন চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায় এখানেও যেহেতু তখনও চারা অস্তিত্বহীন তাই এ চুক্তিও ফাসিদ হয়ে যাবে। তাহলে এটা ফাসিদ হওয়ার কারণ হলো جَهَالَتْ বা অজ্ঞতা। قَفِيْزُ الطَّحَّانِ -এর মতো হওয়ার কারণে নয়। হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, এই দুই কিয়াসের মধ্যে প্রথম কিয়াসটি অধিক বিশুদ্ধ। তার কারণ প্রথমটি তার দৃষ্টান্তের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

كِتَابُ الذَّبَائِحِ

অধ্যায় : জবাইকৃত পশু প্রসঙ্গ

পূর্বাপরের সাথে সম্পর্ক : كِتَابُ الذَّبَائِحِ -এর পূর্বে রয়েছে كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ আর তার পূর্বে রয়েছে كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ. হিদায়া কিতাবের অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণ كِتَابُ الذَّبَائِحِ -এর সাথে كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ -এর সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন। যদিও যুক্তি অনুযায়ী كِتَابُ الذَّبَائِحِ -এর সাথে তার পূর্ববর্তী كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ -এর মাঝের সম্পর্ক বর্ণনা করা উচিত ছিল। তাদের বর্ণনামতে ذَبَائِحُ ও مُزَارَعَةٌ -এর মাঝে সম্পর্ক এরূপ যে, উভয়ের মাঝে ভবিষ্যতে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমানে বাহ্যত পশু ও শস্যদানা বিনষ্ট করা হয়। কেননা مُزَارَعَةٌ -এর মাঝে খাওয়ার উপযুক্ত শস্যদানা বাহ্যত মাটিতে পুঁতে রাখার মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। কিন্তু তা করা হয় ভবিষ্যতে অনেক অনেক বেশি শস্যদানা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে; তদ্রূপ ذَبَائِحُ -এর মধ্যে জবাই করার মাধ্যমে বাহ্যত পশুর প্রাণহানি ঘটে, কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পশুর গোশত ভক্ষণ করা, যা পশু থেকে উপকৃত হওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ব্যাখ্যাকারগণের এভাবে সম্পর্ক বর্ণনা করাতে আপত্তি রয়েছে। কেননা যুক্তি অনুযায়ী كِتَابُ الذَّبَائِحِ এবং তার পূর্ববর্তী كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ -এর মাঝের সম্পর্ক বর্ণনা করা উচিত। তাছাড়া তাদের বর্ণিত উক্ত মুনাসাবাত كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ -এর মাঝে প্রয়োগ করা যায় না। কেননা مُسَاقَاةٌ -এর মাঝে বর্তমানে বাহ্যত কোনো কিছু বিনষ্ট করা হয় না।

উক্ত আপত্তির উত্তরে نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ -এর লেখক বলেন, ব্যাখ্যাকারগণ مُسَاقَاةٌ ও مُزَارَعَةٌ -কে একটি বিষয়ের হুকুমের অধীন গণ্য করেছেন শর্তসমূহ ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের কারণে। কিংবা তারা مُسَاقَاةٌ -কে مُزَارَعَةٌ -এর تَابِعٌ বা অনুগামী গণ্য করেছেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী ذَبَائِحُ ও مُزَارَعَةٌ -এর মাঝে বর্ণিত সম্পর্ক مُسَاقَاةٌ ও ذَبَائِحُ -এর মাঝের সম্পর্ক বলে গণ্য হবে। এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় বিখ্যাত ফাতওয়া গ্রন্থগুলোর বর্ণনা বিন্যাসে। যেমন- اَلْمُحِيطُ ، اَلذَّخِيرَةُ ও فَتَاوٰى قَاضِيخَانْ প্রত্যেকটি কিতাবে كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ -এর একটি পরিচ্ছেদে مُسَاقَاةٌ -কে উল্লেখ করা হয়েছে, مُسَاقَاةٌ -কে আলাদা অধ্যায় [كِتَابٌ] আকারে উল্লেখ করা হয়নি। ভাষ্যগ্রন্থ বিনায়াতে مُسَاقَاةٌ ও ذَبَائِحُ -এর মাঝে এভাবে মুনাসাবাত দেখানো হয়েছে যে, উভয়ের মাঝে বৈপরীত্যপূর্ণ একটি সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ مُسَاقَاةٌ ও ذَبَائِحُ পরস্পর বিপরীত। مُسَاقَاةٌ -এর মাঝে খেজুর ও অন্যান্য গাছকে পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে তরতাজা করা হয় আর ذَبَائِحُ -এর মাঝে পশুর জীবননাশ করা হয়।

তিনি বলেন, এরূপ বৈপরীত্যের সম্পর্ক مُزَارَعَةٌ ও ذَبَائِحُ -এর মাঝেও রয়েছে। مُزَارَعَةٌ -এর মধ্যে ভূমি কর্ষণ করে উর্বর করা হয় বা মৃত জমিকে জীবন দান করা হয়, আর ذَبَائِحُ -এর মধ্যে পশুর জীবন নিঃশেষ করা হয়।

ভূমিকা : ذَبَائِحُ শব্দটি ذَبِيحَةٌ -এর বহুবচন। ذَبِيحَةٌ শব্দের অর্থ- জবাইকৃত পশু। তদ্রূপ ذِبْحٌ [ذَالٌ -এর নীচে যের ও بَاءٌ সাকিন] অর্থ- জবাইকৃত পশু। ذِبْحٌ শব্দটি পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 'আমি তার পরিবর্তে জবাই করার এক মহান পশু দিলাম।'

ذَبِيحٌ শব্দটি فَعِيلٌ -এর ওযনে مَذْبُوحٌ [জবাইকৃত] -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ذَبِيحَةٌ হচ্ছে এর স্ত্রীবাচক শব্দ।

اَلذَّبْحُ শব্দের ধাতুগত অর্থ- ভেঙ্গে ফেলা, ছিদ্র করা। বাব হলো فَتَحَ يَفْتَحُ.

ذَبْحٌ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ- গলার শাহ রগ কেটে ফেলা বা জবাই করা।

اَلذَّكَاةُ শব্দটিও জবাই করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ذَكَاةٌ -এর মূলার্থ- আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হওয়া, উত্তপ্ত হওয়া, ধারালো ও শাণিত হওয়া, পবিত্র হওয়া। ذَكَى الشَّاةَ وَنَحْوَهَا অর্থ- বকরি ইত্যাদি জবাই করল। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এর ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন- إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ এবং ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ 'মায়ের জবাই গর্ভের বাচ্চার জবাই সাব্যস্ত হয়।'
মোটকথা, ذَكَاةٌ শব্দের মূল দুটি অর্থের সাথে জবাইয়ের সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়, এজন্য ذَكَاةٌ শব্দটিকে জবাইয়ের অর্থে ব্যবহার করা হয়। ১. ছুরি বা চাকুর ধারের সাহায্যে পশুর দ্রুত মৃত্যু ঘটে। ২. জবাইয়ের মাধ্যমে পশু থেকে প্রবাহিত রক্ত বের হয়ে পশু পবিত্র হয়।

قَالَ : اَلذَّكَاةُ شَرْطُ حِلِّ الذَّبِيْحَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَلِاَنَّ بِهَا يَتَمَيَّزُ الدَّمُ النَّجِسُ مِنَ اللَّحْمِ الطَّاهِرِ وَكَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُّ يَثْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ فِى الْمَاْكُوْلِ وَغَيْرِهِ فَاِنَّهَا تُنْبِئُ عَنْهَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَاةُ الْاَرْضِ يُبْسُهَا ـ

অনুবাদ : হিদায়ার লেখক বলেন, পশু হালাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে জবাই করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- তবে তোমরা যাকে জবাই করেছ [তা হালাল]। তাছাড়া এর দ্বারা পবিত্র গোশ্ত থেকে নাপাক রক্ত পৃথক হয়ে যায়। জবাই দ্বারা যেমন হালাল হওয়া নিশ্চিত হয় তদ্রূপ এর দ্বারা হালাল গোশতের প্রাণী ও হারাম গোশতের প্রাণীর মাঝে পবিত্রতা নিশ্চিত হয়। কেননা ذَكَاةٌ শব্দটি পবিত্রতার অর্থ প্রদান করে। এ অর্থে রাসূল ﷺ -এর বাণী- ذَكَاةُ الْاَرْضِ يُبْسُهَا অর্থাৎ ভূমির পবিত্রতা শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা [হাসিল হয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَلذَّكَاةُ شَرْطُ الخ : হিদায়ার লেখক ইবারতের শুরুতে যখন قَالَ শব্দটি লিখেন তখন এর দ্বারা তিনি সাধারণভাবে মুখতাসারুল কুদূরী কিংবা জামিউস সাগীরের ইবারতের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকেন। তার নিজের ইবারত হলে তিনি قَالَ ছাড়াই ইবারত উল্লেখ করেন। আলোচ্য ইবারত তার নিজস্ব, সে মতে এখানে তার قَالَ না লিখাই পূর্বরীতি অনুযায়ী সমীচীন ছিল; কিন্তু এখানে তিনি স্বভাব-বিরুদ্ধভাবে قَالَ শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং قَالَ -এর সর্বনাম দ্বারা তিনি নিজের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। হিদায়ার লেখক বলেন, পশু হালাল হওয়ার শর্ত হলো তা জবাই করা। জবাই করা হলে হালাল গোশতের পশু খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। এর দলিল কুরআনের সূরা মায়িদার ৩নং আয়াত- আয়াতে حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ الخ -এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পশু খাওয়ার অযোগ্য বা হারাম ঘোষণা করার পর اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে পশু তোমরা জবাই কর তা খাওয়ার উপযুক্ত বা হালাল। আয়াতে ঘোষিত বিভিন্ন ধরনের হারাম প্রাণীর বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা জবাইকৃত পশুকে اِسْتِثْنَاء করেছেন। আর একথা বলা বাহুল্য যে, হারাম থেকে যা اِسْتِثْنَاء করা হয় তা অবশ্যই হালাল।

قَوْلُهُ وَلِاَنَّ بِهَا يَتَمَيَّزُ الدَّمُ النَّجِسُ الخ : লেখক এ ইবারত দ্বারা যৌক্তিক দলিল পেশ করছেন। তিনি বলেন, রক্ত হারাম, যা উল্লিখিত আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ]। রক্ত হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে রক্ত নাপাক। কিন্তু গোশ্ত পাক। জবাই এর পূর্বে নাপাক রক্ত পবিত্র গোশ্তের সাথে মিশে থাকে। জবাই করার দ্বারা পশুর সব রক্ত শরীর থেকে বের হয়ে যায়। সুতরাং জবাই করা জরুরি, যাতে পবিত্র গোশ্ত অপবিত্র রক্ত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, যেহেতু জবাই এর উদ্দেশ্য পশুর শরীর থেকে অপবিত্র রক্ত পৃথক করা তাই সেসব প্রাণীকে খাওয়ার জন্য জবাই করার প্রয়োজন হবে না যাতে প্রবাহিত রক্ত নেই। যেমন সর্বপ্রকার মাছ ও পঙ্গপাল ইত্যাদি।

قَوْلُهُ كَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُّ يَثْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ الخ : লেখক বলেন, হালাল গোশতের প্রাণী যেমন জবাই এর দ্বারা হালাল বা খাওয়ার উপযুক্ত হয় তদ্রূপ যেসব প্রাণীর গোশ্ত হালাল নয় তা জবাই এর দ্বারা পবিত্র হয়। কারণ ذَكَاةٌ শব্দের মধ্যে পবিত্রতার অর্থ রয়েছে। আর ذَكَاةٌ শব্দের অর্থ যে পবিত্রতা, তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- ذَكَاةُ الْاَرْضِ يُبْسُهَا অর্থাৎ যখন জমিনে পতিত নাপাকের সিক্ততা শুকিয়ে যায় তখন জমিন পবিত্র হয়ে যায়। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ذَكَاةٌ শব্দের মধ্যে পবিত্রতার অর্থ রয়েছে।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা–

আল্লামা আইনী (র.) বলেন, হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী নয়। এটি মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ এর বাণী বা হাদীস। একই শব্দে হাদীসটিকে হিদায়ার লেখক بَابُ الْاَنْجَاسِ-এর মধ্যেও উল্লেখ করেছেন এবং তিনি উভয় স্থানে রাসূল ﷺ-এর হাদীসরূপে উল্লেখ করেছেন। بَابُ الْاَنْجَاسِ-এর টীকায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন–

لَمْ اَرَهُ مَرْفُوْعًا وَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَ اَبِى شَيْبَةَ مِنْ قَوْلِ اَبِىْ جَعْفَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنِيْفَةِ وَاَبِىْ قِلَابَةَ قَالَا اِذَا جَفَّتِ الْاَرْضُ فَقَدْ ذَكَتْ وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ جُفُوْفُ الْاَرْضِ طُهُوْرُهَا .

অর্থাৎ হাদীসটি আমি مَرْفُوْع রূপে পাইনি। তবে এটি আবূ বকর ইবনে শায়বার কিতাবে আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলীর উক্তিরূপে বর্ণিত আছে। এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ ও আবূ কিলাবা (র.) থেকে বর্ণিত আছে "যখন মাটি শুকিয়ে যায় তখন পবিত্র হয়ে যায়।" আর অনুরূপ আরেকটি হাদীস আবূ কিলাবা থেকে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকেও বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর বক্তব্য থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, এটি রাসূল ﷺ -এর হাদীস নয়। এতটুকু পর্যন্ত তার বক্তব্য আল্লামা আইনী (র.)-এর সাথে মিলে যায়। তবে আল্লামা আইনী হুবহু শব্দে এটিকে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহর বাণী বলেছেন, আর ইবনে হাজার আসকালানী এটাকে আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (র.)-এর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এ অর্থে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (র.)-এর হাদীসও নকল করেছেন।

মোটকথা আল্লামা আইনী (র.) ও ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মাঝে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (র.)-এর উক্তির ব্যাপারে সামান্য মতপার্থক্য থাকলেও তারা এ বিষয়ে একমত যে, ذَكَاةُ الْاَرْضِ يُبْسُهَا - এ হাদীসটি রাসূল ﷺ -এর বাণী নয়।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এতটুকু প্রমাণ হয় যে, উল্লিখিত উক্তিটি রাসূল ﷺ -এর হাদীস নয়; বরং তাবেয়ীগণের বক্তব্য। তবে যেহেতু এর বিপক্ষে রাসূল ﷺ ও সাহাবাগণের কোনো বক্তব্য নেই তাই এ বিষয়ে তাবেয়ীগণের বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। তাছাড়া পাক-নাপাকীর মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা যে নিজ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত দিবেন না– এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা এ ব্যাপারে অবশ্যই কোনো সাহাবীর বক্তব্য শুনে তাই বর্ণনা করেছেন, এটাই আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি।

উপরন্তু আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি সহীহ হাদীস হাদীসগ্রন্থগুলোতে খুঁজে পাই যা দ্বারা শুকিয়ে যাওয়ার ফলে মাটি পবিত্র হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ হয়। তার থেকে বর্ণিত হাদীসটি এই–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ عَزَبًا اَبِيْتُ فِى الْمَسْجِدِ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُوْلُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ .

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি অবিবাহিত ছিলাম, মসজিদে রাত্রিযাপন করতাম। আর তখন কুকুর মসজিদের মাঝ দিয়ে গমনাগমন করত এবং পেশাব করত। কিন্তু সাহাবাগণ তাতে [পবিত্রতার উদ্দেশ্যে] পানি ঢালতেন না।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ ও তার সাহাবাগণ নাপাকী মাটিতে শুকিয়ে যাওয়াকে মাটির পবিত্রতা ধরে নিতেন। যদি এরূপ মনে না করতেন এবং পানি ঢেলে দেওয়াকে পবিত্রতার একমাত্র উপায় সাব্যস্ত করতেন তাহলে তাদের নাপাক স্থানে নামাজ আদায় করা আবশ্যক হতো। কেননা তখন মসজিদ আকারে ছোট ছিল এবং মুসল্লি দ্বারা তা পূর্ণ হয়ে যেত।

যেহেতু রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জেনে শুনে নাপাক স্থানে নামাজ আদায় করবেন– এ কথা কল্পনা করা যায় না। তাই এ কথা বলা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই যে, রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ নাপাকী শুকিয়ে যাওয়াকেই মাটি পবিত্রতার কারণ মনে করতেন। আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে সর্বাধিক জানেন।

وَهِيَ اِخْتِيَارِيَّةٌ كَالْجَرْحِ فِيْمَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ وَاضْطِرَارِيَّةٌ وَهِيَ الْجَرْحُ فِيْ اَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنَ الْبَدَنِ وَالثَّانِيْ كَالْبَدَلِ عَنِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ لَا يُصَارُ اِلَيْهِ اِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْاَوَّلِ وَهٰذَا اٰيَةُ الْبَدْلِيَّةِ وَهٰذَا لِاَنَّ الْاَوَّلَ اَعْمَلُ فِيْ اِخْرَاجِ الدَّمِ وَالثَّانِيْ اَقْصَرُ فِيْهِ فَاَكْتَفٰى بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْاَوَّلِ اِذِ التَّكْلِيْفُ بِحَسْبِ الْوُسْعِ ـ

অনুবাদ : [জবাই দু'প্রকার] ইচ্ছাধীন [আয়ত্বাধীন পশু] জবাই। যেমন বুকের উপরদেশ ও চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে আঘাত করা। [দ্বিতীয় প্রকার] অনিবার্য জবাই। আর তা হচ্ছে শরীরের যে কোনো স্থানে আঘাত করা। দ্বিতীয় প্রকার প্রথম প্রকারের বিকল্পের মতো। কেননা প্রথম প্রকারে অক্ষম না হলে দ্বিতীয় প্রকারে গমন করা হয় না। আর এটা বদল বা বিকল্পের আলামত। আর তা এই জন্য যে, প্রথম প্রকার রক্ত বের করার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। আর দ্বিতীয় প্রকার এ ব্যাপারে কম কার্যকর। প্রথম প্রকারে অক্ষম হলে দ্বিতীয় প্রকার যথেষ্ট হবে। কেননা শরিয়তের বিধান সামর্থ্যানুযায়ী হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهِيَ اِخْتِيَارِيَّةٌ كَالْجَرْحِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে জবাই এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হিদায়ার লেখক বলেন, জবাই দুই প্রকার: ১. اِخْتِيَارِيَّة ২. اِضْطِرَارِيَّة
ذَكَاة اِخْتِيَارِيَّة -এর পরিচয় সম্পর্কে লেখক বলেন, পশুর বুকের উপরিভাগ থেকে নিয়ে চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে তথা গলার মধ্যে আঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করা হচ্ছে ذَكَاة اِخْتِيَارِيَّة ; উল্লেখ্য যে, ذَكَاة اِخْتِيَارِيَّة -কে স্বাভাবিক অবস্থার জবাই বলেও অভিহিত করা হয়।
আর ذَكَاة اِضْطِرَارِيَّة হচ্ছে অস্বাভাবিক অবস্থার জবাই বা অনিবার্য জবাই। পশু যখন আয়ত্বাধীন না হয় বা আয়ত্ব থেকে ছুটে পালিয়ে যায় তখন অনিবার্য জবাই করা হয়; এ প্রকার জবাই এর কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান নেই; বরং শরীরের যে কোনো স্থানে আঘাত করার মাধ্যমে এ জবাই কার্যকর করা হয়ে থাকে।
জবাই এর ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের জবাই হচ্ছে আসল ও মূল। জবাইকারী প্রথম প্রকারের জবাই করতে সক্ষম হলে দ্বিতীয় প্রকারের জবাই তার জন্য বৈধ হবে না।
লেখক বলেন, দ্বিতীয় প্রকারের জবাই তথা ذَكَاة اِضْطِرَارِيَّة হলো প্রথম প্রকারের জবাই -এর বিকল্পের মতো।
উল্লেখ্য যে, লেখক দ্বিতীয় প্রকারের জবাইকে كَالْبَدَلِ عَنِ الْاَوَّلِ অর্থাৎ প্রথম প্রকারের বিকল্প বলেননি; বরং বিকল্পের মতো বলেছেন। বিকল্পের মতে বলার কারণ হচ্ছে বিকল্প বা বদল নির্ধারণ হয় কুরআন/হাদীসের দলিলের সাহায্যে, অথচ আমাদের আলোচ্য ذَبْح اِضْطِرَارِيْ বিকল্প হওয়ার কোনো দলিল পাওয়া যায়নি। তবে এর মধ্যে বিকল্প বা বদল হওয়ার আলামত পাওয়া গেছে। আর তা হলো প্রথম প্রকারে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় প্রকারে জবাই গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি প্রথম প্রকার জবাই-এ অক্ষম হবে তার জন্য কেবল দ্বিতীয় অবস্থা গ্রহণ করা বৈধ।
প্রথম প্রকার জবাই-এ সক্ষম ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় অবস্থাতে যাওয়া বৈধ না হওয়ার কারণ হচ্ছে– প্রথম প্রকার তথা গলা কেটে জবাই পশুর নাপাক রক্ত বের করার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। দ্বিতীয় প্রকার তথা যে কোনো স্থানে আঘাত করে জবাই করা রক্ত বের করার ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের চেয়ে কম কার্যকর। সুতরাং প্রথম প্রকার জবাই করতে অক্ষম হলে দ্বিতীয় প্রকার জবাই করবে। কেননা শরিয়তের হুকুম মানুষের সক্ষমতার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের বাণী– لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কাজের ভার দেন না। –[সূরা বাকারা : ২৮৬]
মোটকথা উপরিউক্ত দুই প্রকার জবাইয়ের মধ্যে প্রথম প্রকার জবাই হলো মূল আর দ্বিতীয় প্রকার জবাই তার বিকল্প বা বদলের মতো। কেননা দ্বিতীয় প্রকার জবাই প্রথম প্রকার অসম্ভব হলে বৈধ হয়।

وَمِنْ شَرْطِهِ اَنْ يَكُوْنَ الذَّابِحُ صَاحِبَ مِلَّةِ التَّوْحِيْدِ اِمَّا اِعْتِقَادًا كَالْمُسْلِمِ اَوْ دَعْوًى كَالْكِتَابِيِّ وَاَنْ يَكُوْنَ حَلَالًا خَارِجَ الْحَرَمِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ : وَ ذَبِيْحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلَالٌ لِمَا تَلَوْنَا وَلِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَيَحِلُّ اِذَا كَانَ يَعْقِلُ التَّسْمِيَةَ وَالذَّبْحَةَ وَيَضْبُطُ وَاِنْ كَانَ صَبِيًّا اَوْ مَجْنُوْنًا اَوْ اِمْرَأَةً اَمَّا اِذَا كَانَ لَا يَضْبُطُ وَلَا يَعْقِلُ التَّسْمِيَةَ وَالذَّبْحَةَ لَا تَحِلُّ لِاَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيْحَةِ شَرْطٌ بِالنَّصِّ وَ ذٰلِكَ بِالْقَصْدِ بِمَا ذَكَرْنَا وَالْاَقْلَفُ وَالْمَخْتُوْنُ سَوَاءٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَاِطْلَاقُ الْكِتَابِيِّ يَنْتَظِمُ الْكِتَابِيَّ الذِّمِّيَّ وَالْحَرْبِيَّ وَالْعَرَبِيَّ وَالتَّغْلِبِيَّ لِاَنَّ الشَّرْطَ قِيَامُ الْمِلَّةِ عَلٰى مَا مَرَّ .

অনুবাদ : জবাইয়ের একটি শর্ত হলো জবাইকারী হয়তো বিশ্বাসগতভাবে একত্ববাদে বিশ্বাসী হবে, যেমন মুসলমান। অথবা দাবিগতভাবে একত্ববাদে বিশ্বাসী হবে, যেমন আসমানি কিতাবের অনুসারী। [আরেকটি শর্ত হলো] জবাইকারী হালাল-হারামের সীমানার বাইরে হবেন। এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুসলমান ও আসমানি কিতাবের অনুসারীর জবাইকৃত পশু আমাদের বর্ণিত আয়াতের ভিত্তিতে হালাল। আরেকটি দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ আহলে কিতাবীদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল। জবাইকৃত পশু হালাল হবে যখন জবাইকারী বিসমিল্লাহ এবং উত্তমরূপে জবাই করা জানবে, আর জবাইয়ের শর্তাদি আয়ত্ত থাকবে। যদিও সে শিশু, উন্মাদ ও স্ত্রী হোক না কেন? তবে যদি জবাইকারী [জবাইয়ের শর্তাদি] আয়ত্ত না করে এবং বিসমিল্লাহ না জানে তাহলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। কেননা জবাইয়ের পশুর উপর বিসমিল্লাহ বলা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত শর্ত। আর তা ইচ্ছা করার দ্বারাই হয়ে যাবে। আর ইচ্ছা শুদ্ধ হবে আমাদের বর্ণিত পন্থায়। এক্ষেত্রে খৎনাকৃত ব্যক্তি ও খৎনাবিহীন ব্যক্তি আমাদের বর্ণিত দলিলের ভিত্তিতে একই পর্যায়ের। আসমানি কিতাবের অনুসারী শব্দটি নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করার কারণে এতে জিম্মি, হারবী, আরবী, তাগলিবী সব আসমানি কিতাবের অনুসারী অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেননা শর্ত হচ্ছে মিল্লাতী বা একত্ববাদী হওয়া এর বর্ণনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنْ شَرْطِهِ اَنْ يَكُوْنَ الذَّابِحُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে শুদ্ধ জবাইয়ের শর্তাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে যে শর্তটির কথা আলোচনা করা হয়েছে তা হলো জবাইকারী তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে। তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার বিষয়টি এখানে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আকিদা বা বিশ্বাসগতভাবে তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া, যেমন- মুসলমানগণ আকিদাগতভাবেই একত্ববাদে বিশ্বাসী। অথবা দাবিগতভাবে একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া, যেমন– কিতাবী বা আসমানি কিতাবের অনুসারীগণ, তারা দাবি করে যে, তারা একত্ববাদে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে মাজূসী ও অগ্নিপূজারীগণ, সনাতন ধর্ম বা হিন্দুরা কোনোভাবেই একত্ববাদে বিশ্বাসী নয়, তারা একত্ববাদে বিশ্বাস করেই না; বরং তারা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার দাবিও করে না।

মোটকথা জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য জবাইকারী অবশ্যই প্রকৃত তাওহীদে বিশ্বাসী কিংবা তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়ার দাবিদার হতে হবে। সুতরাং মুসলমান ও আসমানি কিতাবের অনুসারীদের জবাইকৃত পশু হালাল হবে। আর অগ্নি ও মূর্তিপূজারীদের জবাইকৃত পশু কিছুতেই হালাল হবে না।

قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُوْنَ حَلَالًا خَارِجَ الْحَرَمِ الخ : লেখক এ ইবারত দ্বারা জবাই এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তের উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে জবাইকারী হালাল তথা মুহরিম না হওয়া। কারণ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যদি কেউ শিকারী জন্তু জবাই করে তাহলে তা হালাল হবে না।

উল্লেখ্য যে, জবাইকারী হালাল হওয়ার শর্তটি শিকারী জন্তুর সাথে খাস। যদি জবাইকারী শিকারী ছাড়া পালিত পশু জবাই করে তাহলে তা হালাল হবে।

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে জবাইকৃত শিকারী পশু হারামের সীমানার মধ্যে জবাই না হতে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তটিকে সংক্ষেপে এভাবে ব্যক্ত করা যায় যে, মুহরিম বা ইহরাম পরিধানকারী ব্যক্তির জবাইকৃত শিকারী পশু হালাল নয়- চাই হারামের সীমানার মধ্যে জবাই হোক কিংবা হারামের সীমানার বাইরে জবাই হোক।

পক্ষান্তরে হালাল ব্যক্তির শিকারী পশু যদি হারামের সীমানার মধ্যে সে জবাই করে তাহলে তা খাওয়া হালাল নয়।

লেখক বলেন, উপরিউক্ত বিশদ বিবরণ অচিরেই আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ قَالَ وَذَبِيْحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلَالٌ الخ : এ ইবারতটি ইমাম কুদূরী (র.)-এর মুখতাসারুল কুদূরী থেকে নেওয়া হয়েছে। এ ইবারতের মধ্যে ইমাম কুদূরী (র.) হিদায়ার লেখক কর্তৃক সামান্য আগে বর্ণিত জবাই -এর প্রথম শর্তটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) অবশ্য শর্তাকারে আলোচনা না করে মাসআলা বর্ণনা করার আঙ্গিকে আলোচনা করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুসলমান ও আসমানি কিতাবের অনুসারীদের জবাইকৃত পশু হালাল। হিদায়ার লেখক ইমাম কুদূরী (র.) এ মাসআলার দু'টি দলিল প্রদান করেছেন। প্রথম দলিল তিনি ইতঃপূর্বে জবাই -এর শর্তের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। এজন্য তিনি সেই দলিলের প্রতি لِمَا تَلَوْنَا বলে ইঙ্গিত করেছেন।

সেই দলিলটি হচ্ছে إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ আয়াতটি।

এখানে আরেকটি দলিল তিনি উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো কুরআনের আয়াত- وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ.

ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে রেওয়ায়াত করেন যে, আয়াতের طعام শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য ذبائح বা জবাইকৃত পশুসমূহ। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো "যাদের কিতাব দান করা হয়েছে তাদের জবাইকৃত পশু হালাল।

লেখকের দ্বিতীয় দলিল দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আহলে কিতাব বা আসমানি কিতাবের অনুসারীদের জবাইকৃত পশু হালাল। এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে এসে যায় যে, যারা বর্তমান যুগে নিজেদের আসমানি কিতাবের অনুসারী বলে দাবি করে, তারা তো মুশরিক তথা আল্লাহর সাথে শিরক্ করে, তাদের জবাইকৃত পশুও কি খাওয়া যাবে?

এর উত্তর হলো, হ্যাঁ, তাদের জবাইকৃত পশুও খাওয়া হালাল। যদি তারা জবাই এর সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই না করে। কিন্তু যদি জবাই এর সময় অন্য কারো নাম বলে তাহলে তাদের জবাইকৃত পশু হালাল হবে না।

قَوْلُهُ وَيَحِلُّ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ التَّسْمِيَةَ الخ : এটি হিদায়ার লেখকের ইবারত। তিনি এ ইবারতে জবাইয়ের আরেকটি শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর তা হলো জবাইকারী ব্যক্তিকে জবাইয়ের সময় তাসমিয়া অর্থাৎ বিসমিল্লাহ জানতে হবে। অর্থাৎ জবাইকারীকে একথা জানতে হবে যে, জবাইকৃত পশু হালাল হবে বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নামের দ্বারা।

এরপর তিনি বলেন, জবাই-এর জন্য জবাইকারীর জবাইকৃত পশুর উপর পূর্ণ আয়ত্ব থাকতে হবে। তারপর শুদ্ধ জবাই এর জন্য যেসব শর্তাবলি দরকার সেগুলোও জবাইকারীকে জানতে হবে।

সুতরাং কোনো শিশু, উন্মাদ কিংবা মহিলা যদি উল্লিখিত শর্তাবলি জানে ও তদনুযায়ী পশু জবাই করে তাহলে সেই জবাইকৃত পশু খাওয়া বৈধ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, এখানে উন্মাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বল্পবুদ্ধির লোক বা নিতান্ত নির্বোধ। কারণ উন্মাদের ইচ্ছা করার যোগ্যতাই নেই।

قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَضْبِطُ الخ : লেখক বলেন, যদি কোনো জবাইকারীর জবাইয়ের শর্তাবলি আয়ত্তে না থাকে এবং বিসমিল্লাহ ও জবাই করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে জবাইকৃত পশু খাওয়ার জন্য হালাল হবে না। কেননা জবাইকৃত পশুর উপর আল্লাহর নাম নেওয়া কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত শর্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الخ 'তোমরা যে পশুর উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা খেও না। কেননা এটা গুনাহ।' –[সূরা আনআম : ১২১]

লেখক বলেন, এখানে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নামের ইচ্ছা করা, এরপর মুখে উচ্চারণ করা হলে ভালো, তবে যদি কেউ মুখে উচ্চারণ না করে তাহলেও জবাইকৃত পশু হালাল হয়ে যাবে। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার দ্বারা যে ইচ্ছা উদ্দেশ্য তার প্রতি লেখক ইঙ্গিত করেছেন يَعْقِلُ التَّسْمِيَةَ শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ যখন জবাইকারীর আল্লাহর নামের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে তাতেই তার জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْأَقْلَفُ وَالْمَخْتُونُ سَوَاءٌ لِمَا ذَكَرْنَا : লেখক বলেন, জবাইকারী খৎনাকারী ও খৎনাবিহীন হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ খৎনাকারীর জবাই যেমন শুদ্ধ তদ্রূপ যে ব্যক্তি খৎনা করেনি তার জবাইও শুদ্ধ হবে। উভয়ের জবাই শুদ্ধ হওয়ার দলিল হচ্ছে আমাদের বর্ণিত আয়াতদ্বয়, উল্লিখিত আয়াতদ্বয় মুতলাক বা নিঃশর্ত অবস্থায় রয়েছে। আয়াতদ্বয়ে খৎনাকারী হতে হবে এমন কোনো শর্তযুক্ত করা হয়নি।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আয়াত মুতলাক হওয়ার পর লেখক আলাদা করে খৎনাবিহীন ও খৎনাকারী এ দুয়ের উল্লেখ কেন করলেন?

এর উত্তর হচ্ছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর বিপরীত একটি বর্ণনা রয়েছে, আর তা হলো তিনি খৎনাবিহীন লোকদের জবাইকৃত পশু মাকরূহ মনে করতেন। তার সেই মতটি যে গ্রহণযোগ্য নয় তার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য লেখক প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছেন।

দিরায়াহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, খৎনাবিহীন লোকের জবাই শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে জমহূর ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই। তবে এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন : شَهَادَةُ الْأَقْلَفِ وَذَبِيحَتُهُ لَا يَجُوزُ 'খৎনাবিহীন লোকের সাক্ষ্য ও জবাই শুদ্ধ নয়।' ইমাম আহমদ (র.)-এর থেকেও অনুরূপ একটি মত রয়েছে।

মোটকথা তাদের এই ভিন্নমত যেহেতু আয়াতের মোকাবিলা করতে সক্ষম নয় এজন্য আমরা তা গ্রহণ করিনি। উল্লেখ্য যে, বোবা লোকের জবাই শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِطْلَاقُ الْكِتَابِيِّ الخ : এখান থেকে লেখক ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ-এর ব্যাখ্যা করেছেন।

লেখক বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) كِتَابِيّ অর্থাৎ আসমানি কিতাবের অনুসারী হওয়ার কথাটি মুতলাকভাবে উল্লেখ করেছেন আর মুতলাক বা নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করার কারণে সব ধরনের আসমানি কিতাবের অনুসারী তাতে অন্তর্ভুক্ত হবেন। যেমন– ১. জিম্মি অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী কিতাবী। ২. হারবী অর্থাৎ অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী কিতাবী। ৩. আরবী অর্থাৎ আরবি ভাষাভাষী কিতাবী। ৪. তাগলিবী অর্থাৎ সিরিয়ার অধিবাসী কৃষক শ্রেণির কিতাবী।

মোটকথা, সবধরনের আসমানি কিতাবের অনুসারীদের জবাইকৃত পশু খাওয়া হালাল।

قَالَ : وَلَا تُوكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِيْ نِسَائِهِمْ وَلَا أٰكِلِيْ ذَبَائِحِهِمْ وَلِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي التَّوْحِيْدَ فَانْعَدَمَتِ الْمِلَّةُ اِعْتِقَادًا وَ دَعْوًى . قَالَ : وَالْمُرْتَدِّ لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلٰى مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ بِخِلَافِ الْكِتَابِيِّ إِذَا تَحَوَّلَ إِلٰى غَيْرِ دِيْنِهِ لِأَنَّهُ يُقَرُّ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فَيُعْتَبَرُ مَا هُوَ عَلَيْهِ عِنْدَ الذَّبْحِ لَا مَا قَبْلَهُ قَالَ : وَالْوَثَنِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ الْمِلَّةَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এবং মাজূসী [অগ্নি-উপাসক] -এর জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, তাদের [অগ্নি-উপাসকদের] সাথে আহলে কিতাবদের মতো আচরণ কর। তবে মহিলাদের বিবাহ করবে না এবং তাদের জবাইকৃত পশু খাবে না। তাছাড়া মাজূসী একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করে না। ফলে তার মাঝে বিশ্বাসগত ও দাবিগতভাবে একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এবং মুরতাদের জবাইকৃত পশু [খাওয়া যাবে না]। কেননা তার কোনো ধর্ম নেই। যে ধর্মে সে এসেছে তাতে তাকে গণ্য করা হবে না। তবে আসমানি কিতাবের অনুসারী মুরতাদের হুকুম ভিন্ন, যখন সে তার ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মে চলে যায়। কেননা আমাদের মতে সে বর্তমান ধর্মে গণ্য হবে। সুতরাং জবাইয়ের সময় সে যে ধর্মে রয়েছে তার ধর্তব্য হবে। তার পূর্ববর্তী ধর্ম ধর্তব্য হবে না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মূর্তিপূজারীর জবাইকৃত পশুও [খাওয়ার যোগ্য নয়]। কেননা সে একত্ববাদে বিশ্বাসী নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا تُوكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে যে সকল লোকের জবাইকৃত পশু হালাল নয় তাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখক ইমাম কুদূরীর ইবারত নকল করেন। ইমাম কুদূরী বলেন, মাজূসীর জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না। অর্থাৎ হালাল নয়। ইমাম কুদূরীর এ ইবারত মূলত হিদায়ার লেখকের বয়ানকৃত প্রথম শর্তের ব্যাখ্যা। মুসান্নিফ (র.) বলেছিলেন, জবাইকারীর জন্য একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক। আর মাজূসী যেহেতু একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় এজন্য তার জবাইকৃত পশু হালাল নয়।

মাজূসী বলা হয় অগ্নি-উপাসক কিংবা সূর্যপূজারীকে। তারা একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার দাবিও করে না। হিদায়ার লেখক এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করেন।

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِيْ نِسَائِهِمْ وَلَا أٰكِلِيْ ذَبَائِحِهِمْ

'রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা মাজূসীদের সাথে আসমানি কিতাবের অনুসারীদের মতো আচরণ কর। তবে তাদের মেয়েদের বিবাহ করো না এবং তাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করো না।' বর্ণিত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, মাজূসীদের জবাইকৃত পশু হালাল নয়।

উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা : আল্লামা যাইলায়ী (র.) হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেন– এ শব্দে হাদীসটি গরীব [غَرِيْب]।

আব্দুর রাযযাক ও ইবনে আবী শায়বা তাদের মুসান্নাফদ্বয়ে হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন–

عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى مَجُوسِيِّ هَجَرَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ .

তাদের উল্লিখিত হাদীস দ্বারা একই বিষয় প্রমাণ হয়। সুতরাং বলা যায় মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য ভিন্নসূত্রে প্রমাণিত আছে, তবে তিনি যে শব্দে উল্লেখ করেছেন সেই শব্দে হাদীসের কিতাবগুলোতে বিষয়টি নেই।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি সনদ বর্ণনা করে বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا نَزَلْتُمْ بِنَاسٍ نَبَاطِيٍّ فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوا وَإِنْ كَانَ مِنْ مَجُوسِيٍّ فَلَا تَأْكُلُوا .

'তোমরা যখন নাবাতী এলাকার লোকদের কাছে যাবে তাদের থেকে গোশ্ত কিনলে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত খরিদ করে খেতে পার। আর যদি সে গোশ্ত কোনো মাজূসীর জবাইকৃত হয় তাহলে তা খেয়ো না।' এরপর হিদায়ার লেখক যৌক্তিক দলিল পেশ করেন এ বলে যে, মাজূসী বা অগ্নি-উপাসক একত্ববাদের দাবি করে না। ফলে তার মাঝে একত্ববাদী হওয়ার বিশ্বাসগত কিংবা দাবিগত সম্ভাবনা অনুপস্থিত। আর যার মাঝে একত্ববাদী হওয়ার সম্ভাবনা নেই তার জবাইকৃত পশু হালাল নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুরতাদের জবাইকৃত পশুও হালাল নয়। মুরতাদের জবাইকৃত পশু হালাল না হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের কারো দ্বিমত নেই।

সাধারণত মুরতাদ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করেছে কিংবা শুধু ইসলাম ত্যাগ করেছে। মুরতাদ ইসলাম ধর্ম ছেড়ে কোনো ধর্ম গ্রহণ করে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। ফলে মুরতাদ ধর্মবিহীন মূর্তি পূজারীর মতো হয়ে যায়। সুতরাং ধর্মবিহীন লোকের মতো তার জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكِتَابِيِّ إِذَا تَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِ الخ : পক্ষান্তরে যদি এক আসমানি কিতাবের অনুসারী অন্য আসমানি কিতাবের অনুসরণ শুরু করে দেয় তাহলে তার ধর্মের স্থানান্তর গ্রহণযোগ্য হবে।

যেমন– কোনো ইহুদি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করল কিংবা কোনো খ্রিস্টান ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করল তাহলে ভিন্নধর্ম গ্রহণকারীর জবাইও গ্রহণযোগ্য হবে।

তবে যদি কোনো আসমানি কিতাবের অনুসারী অগ্নি-উপাসক হয়ে যায় তাহলে তার জবাই কিছুতেই হালাল হবে না। এটা সকলের মত। কোনো কিতাবী ভিন্ন আসমানি গ্রন্থের অনুসরণ করলে আমাদের আহনাফের মতানুসারে তার ধর্মান্তর গ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, তার ধর্মান্তর গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তার মতে ভিন্নধর্ম গ্রহণের সাথে সাথে তার জিম্মি হওয়ার চুক্তি রহিত হয়ে যায়। ফলে সে হত্যার উপযুক্ত হয়ে যায়। অতএব, কোনো ধরনের ধর্মান্তর গ্রহণযোগ্য হবে না।

এরপর লেখক বলেন, জবাইকারীর ধর্মান্তরের পরের অবস্থা গ্রহণযোগ্য; পূর্ববর্তী অবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং মুরতাদের পূর্ববর্তী অবস্থা ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ وَالْوَثَنِيُّ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মূর্তিপূজারীর জবাইকৃত পশুও হালাল নয়। কেননা মূর্তিপূজারী একত্ববাদে বিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসগত কিংবা দাবিগত কোনোভাবেই নয়।

قَالَ : وَالْمُحْرِمُ يَعْنِي مِنَ الصَّيْدِ وَكَذَا لَا يُؤْكَلُ مَا ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْإِطْلَاقُ فِي الْمُحْرِمِ يَنْتَظِمُ الْحِلَّ وَالْحَرَمَ وَالذَّبْحُ فِي الْحَرَمِ يَسْتَوِيْ فِيْهِ الْحَلَالُ وَالْمُحْرِمُ وَهٰذَا لِأَنَّ الذَّكَاةَ فِعْلٌ مَشْرُوْعٌ وَهٰذَا الصَّنِيْعُ مُحَرَّمٌ فَلَمْ تَكُنْ ذَكَاةً بِخِلَافِ مَا إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ غَيْرَ الصَّيْدِ أَوْ ذَبَحَ فِي الْحَرَمِ غَيْرَ الصَّيْدِ صَحَّ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَشْرُوْعٌ إِذِ الْحَرَمُ لَا يُؤْمِنُ الشَّاةَ وَكَذَا لَا يَحْرُمُ ذَبْحُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ - قَالَ : وَإِنْ تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا فَالذَّبِيْحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا أُكِلَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) أُكِلَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) لَا تُؤْكَلُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْمُسْلِمُ وَالْكِتَابِيُّ فِيْ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ سَوَاءٌ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ إِرْسَالِ الْبَازِيْ وَالْكَلْبِ وَعِنْدَ الرَّمْيِ -

---

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইহরাম পরিধানকারীর জবাইকৃত পশুও খাওয়া যাবে না। অর্থাৎ শিকারী পশু। তদ্রূপ হারামের সীমানার ভিতরে জবাইকৃত শিকারী পশুও খাওয়া যাবে না। মুহরিম [مُحْرِمْ] শব্দটি নিঃশর্তভাবে উল্লেখের দ্বারা হারাম ও হিল্ল উভয়স্থান এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হারামের সীমানায় জবাই এর ক্ষেত্রে হালাল ও মুহরিম উভয়ই সমান। এর কারণ এই যে, জবাই শরিয়ত অনুমোদিত একটি কাজ, আর এ কাজটি হারাম। অতএব, এটা জবাই সাব্যস্ত হবে না। তবে যদি মুহরিম শিকারী ছাড়া অন্য পশু জবাই করে কিংবা হারামের সীমানায় শিকারী ছাড়া অন্য পশু জবাই করা হয় তাহলে তা বৈধ সাব্যস্ত হবে। কেননা এটা বৈধ কাজ। তাছাড়া হারাম শরীফ বকরি [ও গৃহপালিত পশু] কে নিরাপত্তা দেয় না। তদ্রূপ মুহরিমের জন্য এর জবাই হারাম নয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি জবাইকারী ইচ্ছাকৃতভাবে [জবাই -এর সময়] আল্লাহর নাম না নেয় তাহলে জবাইকৃত পশু মৃত, খাওয়ার অযোগ্য। আর যদি আল্লাহর নাম ভুলে ছেড়ে দেয় তাহলে সেই পশু খাওয়া যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উভয় অবস্থায় উক্ত পশু খাওয়া যাবে। আর ইমাম মালেক (র.) বলেন, উভয় অবস্থাতে জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না। মুসলমান ও আহলে কিতাব আল্লাহর নাম না নেওয়ার ক্ষেত্রে সমান। একই মতবিরোধ [শিকারী] বাজপাখি, [প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত] কুকুর প্রেরণ ও তীর নিক্ষেপের সময় আল্লাহর নাম না নেওয়া হলে প্রযোজ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالْمُحْرِمُ يَعْنِيْ مِنَ الصَّيْدِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে মুহরিমের জবাইকৃত পশু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুহরিমের জবাইকৃত পশু খাওয়া হালাল নয়। হিদায়ার লেখক ইমাম কুদূরীর ইবারতের সাথে مِنَ الصَّيْدِ -এর শর্তারোপ করেন। অর্থাৎ মুহরিমের শিকারী জন্তু খাওয়া বৈধ নয়। তবে যদি মুহরিম পালিত জন্তু জবাই করে তাহলে তা খাওয়া বৈধ হবে।

লেখক বলেন, হারামের সীমানায় জবাইকৃত যে কোনো শিকারী পশু খাওয়া বৈধ নয়। চাই জবাইকারী মুহরিম হোক কিংবা হালাল হোক।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতে মুহরিম শব্দটি মুতলাক বা নিঃশর্ত অবস্থায় আছে। মুতলাক থাকার কারণে এর অর্থ ব্যাপক হবে। হারামের মুহরিম ও হারামের সীমানার বাইরে হালাল স্থানের মুহরিম সকলেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবেন। কেননা জবাই করা শরিয়ত অনুমোদিত একটি বৈধ কাজ। পক্ষান্তরে মুহরিম ব্যক্তির শিকারী পশু জবাই একটি অবৈধ কাজ। অতএব, শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ একটি কাজের দ্বারা জবাইকৃত পশু হালাল নয়।

তদ্রূপ হারামের সীমানায় জবাইকৃত শিকারী পশু হালাল নয় চাই কোনো হালাল ব্যক্তি তা জবাই করুক কিংবা মুহরিম। কেননা হারামের মধ্যে শিকারী পশু বধ করা হারাম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী হচ্ছে– وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হারামের সীমানার মধ্যে কোনো শিকারী পশু জবাই করা নিষিদ্ধ। অতএব, যে ব্যক্তি হারামের সীমানার মধ্যে পশু জবাই করবে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা জবাই সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ : লেখক বলেন, যদি মুহরিম শিকারী নয় এমন পালিত পশু জবাই করে তাহলে তা বৈধ হয়ে যাবে। তদ্রূপ যদি হারামের সীমানার মধ্যে কেউ পালিত পশু জবাই করে তাহলে তার জবাই বৈধ হবে এবং তাঁর জবাইকৃত পশু হালাল হয়ে যাবে। কেননা উভয় অবস্থায় জবাই একটি বৈধ কাজ। অর্থাৎ মুহরিমের জন্য পালিত পশু জবাই করা এবং হারামের সীমানার মাঝে পালিত পশু জবাই করা বৈধ কাজ। কেননা হারামের এলাকা পালিত বকরি ও অন্যান্য পশুকে নিরাপত্তা দেয়নি। নিরাপত্তা দিয়েছে শুধুমাত্র শিকারী পশুকে। কুরআনের আয়াতে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা শুধুমাত্র শিকারী পশুর ব্যাপারে; পালিত পশুর ব্যাপারে কুরআনে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি, এজন্য পালিত পশুকে জবাই করা বৈধ হবে।

লেখক বলেন, পালিত পশু জবাই করা যেমন সাধারণের জন্য অবৈধ নয় তদ্রূপ মুহরিমের জন্যও অবৈধ নয়। কেননা মৌলিকভাবে জবাই করা একটি বৈধ কাজ। আয়াতের মাধ্যমে জবাই নিষিদ্ধ হয়েছে শুধুমাত্র শিকারী পশুর ব্যাপারে। অতএব, জবাই এর অবৈধতা পালিত পশুর মাঝে সম্প্রসারিত হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ وَإِنْ تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক জবাই -এর অন্যতম শর্ত জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, "যদি জবাইকারী জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে জবাইকৃত পশু মৃত জন্তুর মতো হয়ে যাবে এবং তা খাওয়া যাবে না। আর যদি জবাইকারী তা ভুলক্রমে ছেড়ে দেয় তাহলে জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে।" এ মাসআলার ব্যাপারে মুসলমান ও আহলে কিতাবের অনুসারী সকলেই সমান। এ মাসআলা হানাফী মাযহাবানুসারে বর্ণনা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, জবাইকারী ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলক্রমে যেভাবেই আল্লাহর নাম ছেড়ে দিক ত'র জবাইকৃত পশু হালাল হয়ে যাবে।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় জবাইকৃত পশু খাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ইমাম আহমদ (র.)ও উক্ত মত পোষণ করেন।

অবশ্য ইবনে কুদামা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মুগনী -এ উল্লেখ করেন যে, ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, ইচ্ছাকৃতভাবে জবাই -এর সময় আল্লাহর নাম না নেওয়া হলে সেই জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম বাদ পড়লে জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে। মুগনীতে বর্ণিত ইমাম মালেক (র.)-এর এ মতটি আমাদের মাযহাবের অনুরূপ।

বিনায়া গ্রন্থের মুসান্নিফের মতে, ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ মত আমাদের মাযহাবের অনুরূপ।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ইমাম কুদূরী (র.) ইমাম কারখী (র.) কর্তৃক প্রণীত "মুখতাসার" -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ভুলক্রমে আল্লাহর নাম ছেড়ে দেওয়ার মাসআলায় সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে।

হযরত আলী (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া হলে উক্ত জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে। আর ইবনে ওমর (রা.) বলেন, তা খাওয়া যাবে না।

উল্লেখ যে, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ভুলক্রমে বিস্‌মিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার মাসআলাতে মতবিরোধ হওয়া এই ইঙ্গিত বহন করে যে, ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ বর্জন করার ব্যাপারে সাহাবাদের মাঝে ইজমা ছিল। অর্থাৎ সব সাহাবা মনে করতেন যে, ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া হলে সেই জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না।

প্রকাশ থাকে যে, কোনো জবাইকারী ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দিয়েছে– তখনই বলা হবে, যখন সে একথা জানবে যে, জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া শর্ত এবং জবাইয়ের সময় তার মনে থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর নাম না নেয়।

আর যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নাম নেওয়া শর্ত– এ কথা না জানে, তাহলে সে ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ পরিত্যাগকারীর মতো হলো।

ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, মুসলমান ও আহলে কিতাব আল্লাহর নাম বর্জন করার ব্যাপারে একই পর্যায়ের।

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الخ : লেখক বলেন, জবাই করার স্বাভাবিক এই পদ্ধতিতে বিসমিল্লাহ না বলার যে মতবিরোধ তা জবাই এর অন্যান্য সুরতেও রয়েছে। কিতাবে তিনটি সুরত উল্লেখ করা হয়েছে। যথা–

ক. কোনো ব্যক্তি শিকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করল। আর তার নিক্ষেপিত তীরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শিকারী মারা গেল।

খ. কোনো ব্যক্তি শিকারের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর প্রেরণ করল। তারপর কুকুরের আক্রমণে জন্তুটি মারা গেল।

গ.কোনো শিকারী/বাজপাখি/ ঈগল প্রেরণ করল, অতঃপর উক্ত শিকারী পাখি দ্বারা আরেকটি পাখি মারা পড়ল।

উপরিউক্ত তিন সুরতে যদি পাখি/কুকুর প্রেরণকারী কিংবা তীর নিক্ষেপকারী বিসমিল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শিকারকৃত জন্তু খাওয়া অবৈধ হবে আর ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নাম ছেড়ে দিলে শিকারকৃত জন্তু খাওয়া বৈধ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, উভয় অবস্থাতে শিকারকৃত পশু/পাখি খাওয়ার উপযুক্ত।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, উভয় অবস্থায় তা খাওয়ার অযোগ্য।

وَهٰذَا الْقَوْلُ مِنَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) مُخَالِفٌ لِلْاِجْمَاعِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَهُ فِيْ حُرْمَةِ مَتْرُوْكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا وَاِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَتْرُوْكِ التَّسْمِيَةِ نَاسِيًا فَمِنْ مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ يَحْرُمُ وَمِنْ مَذْهَبِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُ يَحِلُّ بِخِلَافِ مَتْرُوْكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا وَلِهٰذَا قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَالْمَشَائِخُ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ اِنَّ مَتْرُوْكَ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا لَا يَسَعُ فِيْهِ الْاِجْتِهَادُ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِيْ بِجَوَازِ بَيْعِهِ لَا يَنْفُذُ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْاِجْمَاعِ .

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ মতটি ইজমা -এর বিরোধী। কেননা তার পূর্ববর্তী লোকদের মাঝে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম বর্জন করা হয়েছে যে পশু [জবাই] এর মধ্যে তাতে [খাওয়ার অযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে] কোনো মতপার্থক্য নেই। তাদের মাঝে মতবিরোধ কেবল ভুলক্রমে বিস্‌মিল্লাহ বা আল্লাহর নাম ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মাযহাব হচ্ছে এ জাতীয় পশু খাওয়া হারাম, হযরত আলী (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মাযহাব হচ্ছে খাওয়া হালাল। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ বর্জন করার ব্যাপারে [কোনো মতপার্থক্য নেই]। এজন্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং মাশায়েখ (র.) বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া পশুর ব্যাপারে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। যদি বিচারক এমন পশুর বিক্রয় বৈধ হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন [তবুও] তা কার্যকর হবে না। কেননা তা ইজমা -এর বিরোধী সিদ্ধান্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذَا الْقَوْلُ مِنَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতটি পূর্ববর্তী ইবারতের সাথে সংশ্লিষ্ট। পূর্ববর্তী ইবারতে যে পশুর জবাই -এ ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ বর্জন করা হয়েছে তার ব্যাপারে ইমামগণের মতপার্থক্যের কথা আলোচনা করা হয়েছিল। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, এরূপ জবাইকৃত পশু খাওয়া হালাল। হিদায়ার লেখক ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের ব্যাপারে আলোচ্য ইবারতে মন্তব্য করেন যে, তার এ মতটি ইজমায়ে উম্মতের খেলাফ। কারণ তার পূর্ববর্তী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেয়ীদের মাঝে যে পশুতে ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তার বৈধতার প্রশ্নে কোনো মতপার্থক্য নেই। অর্থাৎ সে পশু অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। অতএব, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এ মতটি সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ইজমা বিরোধী।

প্রকাশ থাকে যে, স্বীকৃত ইজমা এর বিরোধী কোনো বক্তব্য কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতটি অগ্রহণযোগ্য।

লেখক বলেন, অবশ্য সাহাবাগণের মাঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে যে পশুর জবাই এর মাঝে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সে পশু হালাল হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, এরূপ পশুও খাওয়ার অযোগ্য বা হারাম; অন্যদিকে হযরত আলী (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মাযহাবে এরূপ পশু খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতের ব্যাপারে আল্লামা আবূ বকর আর রাযী (র.) আল আহকামে উল্লেখ করেন যে, জনৈক কসাই একটি বকরি জবাই করে কিন্তু জবাইয়ের সময় সে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়। এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রা.) অবগত হয়ে তার গোলামকে আদেশ করেন যে, সে যেন সেই কসাই এর কাছে দাঁড়ায় এবং যখন কোনো লোক গোশত খরিদ করতে আসে তাকে বলে দেয় যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) তোমাকে বলেছেন– এই বকরিটি সঠিকভাবে জবাই করা হয়নি। সুতরাং এর গোশত খরিদ করো না।

পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মাযহাব সম্পর্কে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়–

فِيْ مُوَطَّا مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنِ الَّذِيْ يَنْسٰى أَنْ يُسَمِّيَ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَلٰى ذَبِيْحَتِهٖ فَقَالَ يُسَمِّي اللّٰهَ وَيَأْكُلُ وَلَا بَأْسَ .

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়ার কথা ভুলে গেছে।

তিনি বললেন, সে বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নিবে। আর এতে কোনো সমস্যা নেই। এ বর্ণনার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ভুলক্রমে কেউ বিসমিল্লাহ ছেড়ে দিলে তার জবাইকৃত জন্তু খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। হযরত আলী (রা.)-এর সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَتْرُوْكِ التَّسْمِيَةِ الخ : লেখক বলেন, ইচ্ছাকৃত আল্লাহর নাম ছেড়ে দেওয়ার মাসআলা ভিন্ন। অর্থাৎ এ মাসআলায় সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কারো মতভেদ নেই। সকলের মতেই এরূপ পশু খাওয়া যায়।

উল্লিখিত বিষয়ে ইজমা হওয়ার কারণে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মাশায়েখ (র.) বলেন, স্বেচ্ছায় যে পশুর জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে -তার মাসআলায় ইজতিহাদ বা যুক্তি [قِيَاسٌ] -এর আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং যদি কোনো বিচারক ভুলক্রমে এমন জবাইয়ের ক্ষেত্রে জবাইকৃত পশু বিক্রির রায় প্রদান করে তাহলে তার সে রায় কার্যকর হবে না। কেননা বিচারকের এ রায় ইজমা -এর সাথে সাংঘর্ষিক। আর বিচারকের যে রায় কুরআন, হাদীস ও ইজমার বিরোধী হয় সে রায় প্রত্যাখ্যান করা হবে। ইজমা হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের মতো শক্তিশালী দলিল। বিচারকের রায় কুরআন ও হাদীস বিরোধী হলে যেমন অগ্রহণযোগ্য হয় তদ্রূপ ইজমা বিরোধী হলেও অগ্রহণযোগ্য হবে।

لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ وَلِاَنَّ التَّسْمِيَةَ لَوْ كَانَتْ شَرْطًا لِلْحِلِّ لَمَا سَقَطَتْ بِعُذْرِ النِّسْيَانِ كَالطَّهَارَةِ فِىْ بَابِ الصَّلٰوةِ وَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا فَالْمِلَّةُ اُقِيْمَتْ مَقَامَهَا كَمَا فِى النَّاسِىْ وَلَنَا الْكِتَابُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَلْاٰيَةُ نَهْىٌ وَهُوَ لِلتَّحْرِيْمِ وَالْاِجْمَاعُ وَهُوَ مَا بَيَّنَّا وَالسُّنَّةُ وَهُوَ حَدِيْثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِىْ اٰخِرِهٖ فَاِنَّكَ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى كَلْبِ غَيْرِكَ وَعَلَّلَ الْحُرْمَةَ بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস– اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ -মুসলমান আল্লাহর নাম নিয়েই জবাই করে [মুখে] বিসমিল্লাহ বলুক অথবা নাই বলুক। আর এই কারণেও [বৈধ] যে, যদি বিসমিল্লাহ হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হতো, তাহলে ভুলে যাওয়ার ওজর দ্বারা তা রহিত হতো না -যেমন নামাজের জন্য পবিত্রতা। আর যদি এমনিতে শর্ত হয়ে থাকে তাহলে একত্ববাদী হওয়াকে এর স্থলবর্তী করা হবে যেমন করা হয়ে থাকে বিস্মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে। আমাদের দলিল – কুরআনের আয়াত। সেই আয়াতটি মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ (اَلْاٰيَةُ) যে পশুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়নি তা খেয়ো না। আয়াতটি নিষেধবাণী। আর নিষেধবাণী হারাম করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এবং [আমাদের দলিল-] ইজমা। আর এর আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। আর হাদীস [আমাদের দলিল]। আর সেটা হচ্ছে আদী ইবনে হাতেম আত্তাঈ [রা.] -এর বর্ণিত হাদীস। রাসূল ﷺ হাদীসের শেষাংশে বলেন, فَاِنَّكَ سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى كَلْبِ غَيْرِكَ তুমি তোমার [প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত] কুকুরে বিস্‌মিল্লাহ বলেছ, অন্যের কুকুরে বিস্‌মিল্লাহ বলোনি। [এখানে] রাসূল ﷺ বিস্‌মিল্লাহ না বলাকে হারামের কারণ বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَذْبَحُ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে পূর্বে উল্লিখিত তিন ইমামের মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহনাফের দলিলের আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : রাসূল ﷺ -এর হাদীস اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ -এ হাদীসের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বিস্‌মিল্লাহ জবাই -এর সময় না বলা হলে কোনো সমস্যা নেই। [কারণ মুসলমান তো আল্লাহ তা'আলার নামে জবাই করে] হাদীসের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করা বা ভুলক্রমে বিস্‌মিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া উভয় প্রকারই শামিল রয়েছে। অর্থাৎ হাদীস মুতলাক। সুতরাং ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ বর্জন করা হলেও জবাইকৃত পশু খাওয়া বৈধ হবে।

উল্লেখ্য যে, হিদায়ার লেখক কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি এই শব্দে গরীব। অর্থাৎ এই শব্দে হাদীসটি পাওয়া যায় না। তবে হাদীসটির বক্তব্য অন্যসূত্রে প্রমাণিত রয়েছে। যেমন–

اَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِىْ ثُمَّ الْبَيْهَقِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْقَلِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْجَزْرِىْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ يَكْفِيْهِ اِسْمُهُ فَاِنْ نَسِىَ اَنْ يُسَمِّىَ حِيْنَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَاْكُلْ .

এ হাদীসের দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব প্রমাণিত হয়। তবে এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ সম্পর্কে ইবনে কাত্তান বলেন, তিনি شَدِيْدُ الْغَفْلَةِ [অসচেতন]। অন্যরা مَعْقَلُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ সম্পর্কে বলেন, যদিও মুসলিম (র.) তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তবুও তিনি এ হাদীস টি মারফূ'রূপে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। হাদীসটির مَوْقُوْفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -এর সূত্র অধিক মজবুত। যেমন–

رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَبْدُ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِىْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا ذَبَحَ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَلْيَاْكُلْ فَاِنَّ الْمُسْلِمَ فِيْهِ اَسْمَاءٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ .

এ ধরনের আরেকটি হাদীস নিম্নরূপ–

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ اَلرَّجُلُ مِنَّا يَذْبَحُ وَيَنْسٰى اَنْ يُسَمِّىَ اللّٰهَ قَالَ اسْمُ اللّٰهِ عَلٰى قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ .

এ ধরনের আরো হাদীস হাদীসগ্রন্থগুলোর মাঝে বর্ণিত আছে। মোটকথা, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য হাদীসগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে না হলেও অস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যৌক্তিক দলিল : যদি বিস্‌মিল্লাহ কে শর্ত বলা হয় তাহলে তো তা অজুর মতো হয়ে যাবে। অর্থাৎ নামাজের জন্য অজু যেরূপ শর্ত তেমন হয়ে যাবে। অজু ইচ্ছাকৃত কিংবা ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে নামাজ হয় না তদ্রূপ এখানেও ভুলক্রমে কিংবা ইচ্ছাকৃত বিস্‌মিল্লাহ ছেড়ে দিলে জবাই শুদ্ধ না হওয়া উচিত। কারণ মূলনীতি হচ্ছে اِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ যখন শর্ত অনুপস্থিত তখন مَشْرُوْطٌ ও অবিদ্যমান হবে। যেহেতু এখানে ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দিলে জবাই হয়ে যায় তাহলে বিস্‌মিল্লাহ বলা শর্ত হবে না। যেহেতু বিস্‌মিল্লাহ বলা শর্ত নয় সেহেতু বিস্‌মিল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলেও জবাইকৃত পশু হারাম হবে না; বরং এ পশু খাওয়া হালাল থাকবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় যুক্তি : তিনি বলেন, যদি বিস্‌মিল্লাহ বলা শর্তও হয় তবুও ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্‌মিল্লাহ ছেড়ে দিলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে। কেননা তখন তার হুকুম বিস্মৃত ব্যক্তির মতো হবে। বিস্মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একত্ববাদে বিশ্বাস বিস্‌মিল্লাহর স্থলবর্তী হয়। সুতরাং এখানেও একত্ববাদে বিশ্বাস তার বিস্‌মিল্লাহ বলার স্থলবর্তী হবে।

আহনাফের দলিল : কুরআনের আয়াত– وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ - "যে পশুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তার কোনো অংশ তোমরা খেয়ো না।" আয়াতটি নিষেধবাণী সম্বলিত। নিষেধাজ্ঞা নিষেধকৃত বিষয়ের হারাম হওয়াকে প্রমাণ করে।

নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মুতলাকভাবে হারাম করা হয়। বিষয়টি আরো মজবুত হয় আয়াতের পরবর্তী অংশ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ -এর দ্বারা। তাছাড়া আয়াতের নিষেধাজ্ঞাকে তাকীদ করা হয়েছে (مِنْ لِلتَّبْعِيْضِ) দ্বারা। কেননা نَهِىْ -এর পরে مِنْ আসলে نَهِىْ -এর ক্ষেত্রে مُبَالَغَةْ -এর অর্থ পাওয়া যায়। আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অর্থ তখন প্রত্যেকটি جُزْءٌ -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আয়াতের وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ -এর "ه" সর্বনামের ক্ষেত্রে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো "ه" সর্বনাম দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে খাওয়া (أَكْل) -এর দিকে তখন আয়াতের অর্থ হবে এমন পশু খাওয়া হারাম, অথবা "ه" সর্বনামের ইঙ্গিত হবে জবাইকৃত পশুর দিকে তাহলে অর্থ হবে জবাইকৃত পশুটি ফিস্‌ক বা হারাম। দ্বিতীয় অর্থের সমর্থন আরেকটি আয়াতে পাওয়া যায়। আয়াতটি হলো أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ মোটকথা, আয়াতের মধ্যে এ কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, জবাইকৃত পশুটি হারাম হয়েছে জবাইয়ের সময় বিস্‌মিল্লাহ বা আল্লাহর নাম না নেওয়ার কারণে।

উল্লেখ্য যে, আয়াতের মধ্যে আল্লাহর নামের ذِكْر দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুখে তা উচ্চারণ করা। আয়াতের মধ্যে ও এর ইঙ্গিত রয়েছে। আয়াতের শব্দ হলো لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বা اَلذِّكْرُ عَلَيْهِ। আর আরবি ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী اَلذِّكْرُ عَلَيْهِ দ্বারা মৌখিক জিকির বা উচ্চারণকে বুঝানো হয়।

আহ্‌নাফের দ্বিতীয় দলিল : ইজমায়ে উম্মত। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পূর্ববর্তী যুগে সাহাবা ও তাবেয়ীগণের যুগের সকলেই ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া প্রাণী হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন। এ ব্যাপারে তাদের কারো থেকে দ্বিমত পাওয়া যায় না।

আহ্‌নাফের তৃতীয় দলিল : নিম্নোক্ত হাদীস–

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ أُرْسِلُ كَلْبِيْ وَأُسَمِّيْ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّيْ أُرْسِلُ كَلْبِيْ فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لَا أَدْرِيْ أَيُّهُمَا أَخَذَهُمَا فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى كَلْبٍ آخَرَ أَخْرَجَ هٰذَا الْحَدِيْثَ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ ـ

আদী ইবনে হাতেম (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি [রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে] বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি [শিকারের উদ্দেশ্যে] আমার কুকুর প্রেরণ করি এবং বিস্‌মিল্লাহ বলি [প্রেরণের সময়]। রাসূল ﷺ বললেন, যখন তুমি বিস্‌মিল্লাহ বলে কুকুর প্রেরণ করবে, তারপর যদি সেটি শিকার ধরে হত্যা করে তাহলে তা থেকে তুমি ভক্ষণ কর। আর যদি কুকুর শিকারকৃত জন্তু থেকে কোনো অংশ খেয়ে ফেলে তাহলে তুমি তা খেয়ো না। কেননা এক্ষেত্রে সে শিকার ধরেছে নিজের জন্য। তিনি বলেন, কখনো আমি আমার কুকুর পাঠাই তারপর [শিকারকৃত জন্তুর কাছে] অন্য কুকুরকেও পাই [এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?] রাসূল ﷺ বললেন, তুমি সে জন্তুটি খেয়ো না। কারণ তুমি তোমার কুকুরে বিস্‌মিল্লাহ বলেছ অন্য কুকুরে তো বিসমিল্লাহ বলোনি।

একই অর্থের আরেকটি হাদীস ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই–

قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهِ وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ أَيُّهُمَا قَتَلَ ـ

এ হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, বিস্‌মিল্লাহ বলা হয়নি এমন কুকুর হত্যা করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে রাসূল ﷺ শিকারি জন্তুটি খেতে নিষেধ করেছেন।

মোটকথা উপরিউক্ত দুটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিস্‌মিল্লাহ বা আল্লাহর নাম যে জন্তুর উপর নেওয়া হয়নি তা খাওয়া হালাল নয়।

وَمَالِكٌ (رحـ) يَحْتَجُّ بِظَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا إِذْ لَا فَصْلَ فِيهِ وَلٰكِنَّا نَقُولُ فِي اعْتِبَارِ ذٰلِكَ مِنَ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفٰى لِأَنَّ الْإِنْسَانَ كَثِيرُ النِّسْيَانِ وَالْحَرَجُ مَدْفُوعٌ وَالسَّمْعُ غَيْرُ مَجْرًى عَلٰى ظَاهِرِهِ إِذْ لَوْ أُرِيدَ بِهِ لَجَرَتِ الْمُحَاجَّةُ وَظَهَرَ الْاِنْقِيَادُ وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَالْإِقَامَةُ فِي حَقِّ النَّاسِيْ وَهُوَ مَعْذُورٌ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فِي حَقِّ الْعَامِدِ وَلَا عُذْرَ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلٰى حَالَةِ النِّسْيَانِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মালেক (র.) আমাদের বর্ণিত আয়াতের জাহেরী অর্থের সাহায্যে দলিল পেশ করেন। কেননা আয়াতের মধ্যে [ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত এ দু'য়ের] কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আমরা বলি আয়াতকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করলে এমন সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে যা সুস্পষ্ট। কেননা মানুষ অধিক বিস্মৃত হয়। [শরিয়তে] সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। আয়াতের সাধারণ অর্থ প্রচলিত নয়। যদি প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য করা হতো তাহলে এ নিয়ে সালাফের মাঝে বির্তক হতো এবং এ পক্ষের আত্মসমর্পণ প্রকাশ পেত [কিন্তু তা হয়নি; বরং] প্রথম যুগেই এ ব্যাপারে মতপার্থক্য দূর হয়ে গেছে। ওজরগ্রস্ত বিস্মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে [একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়াকে বিস্‌মিল্লাহ বলার] স্থলবর্তী করার ইচ্ছা পোষণকারীর ক্ষেত্রে– অথচ তার ওজর নেই- স্থলবর্তী করার ইঙ্গিত বহন করে না। আর তিনি [ইমাম শাফেয়ী (র.)] যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা বিস্মৃত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَالِكٌ يَحْتَجُّ بِظَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا الخ : আলোচ্য ইবারতে ইমাম মালেক (র.) -এর মাযহাবের দলিল সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কিতাবের ইবারতের দাবি মতে ইমাম মালেক (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতিপক্ষ। যেহেতু জাহেরী ইবারত অনুযায়ী ইমাম মালেক (র.) আহনাফের প্রতিপক্ষ তাই ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল সম্পর্কে লেখক এখানে আলোচনা করেছেন।

লেখক বলেন, ইমাম মালেক (র.) আমাদের বর্ণিত কিতাবুল্লাহ -এর দলিলের বাহ্যিক বা সাধারণ অর্থের সাহায্যে দলিল পেশ করেন। অর্থাৎ কুরআনের আয়াত– وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো যে পশুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা ভুলক্রমে সে পশুর কোনো অংশ তোমরা খেয়ো না।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে বিশেষ অর্থ খাস নয়, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ বর্জন করা হলে তোমরা খেয়ো না; বরং আয়াতে উভয় প্রকারই অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, যেহেতু আয়াত মুতলাকভাবে উভয় প্রকার বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়াতে হারাম হওয়ার দাবি করে তাই ইমাম মালেক (র.) বলেন, বিসমিল্লাহ ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে ঐ পশু খাওয়ার অনুপোযুক্ত হবে যেমনিভাবে বিসমিল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে পশু খাওয়া হালাল হয় না।

হিদায়ার মুসান্নিফের মতো ইনায়া গ্রন্থের লিখক ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল এভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাব আহনাফের মতো, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখও করেছি। [এটা হিদায়ার অপর ভাষ্যকার বিনায়ার মুসান্নিফের বক্তব্য।]

ইমাম মালেক (র.)-এর দলিলের জবাবে আমাদের বক্তব্য : যদি আয়াতের বাহ্যিক অর্থানুযায়ী ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে লোকজন কে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করা হবে। অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার সুরতেও যদি জবাইকৃত পশু হারাম হয়ে যায় তাহলে মানুষের বিপদ বেড়ে যাবে এবং শরিয়তের হুকুম সংকীর্ণ হয়ে যাবে।

অথচ কুরআনের অন্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তের মাঝে সংকীর্ণতা নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ "তিনি [আল্লাহ] দীনি ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।" যদি ইমাম মালেক (র.)-এর মতানুযায়ী ভুলে যাওয়ার সুরতকেও যদি হারামের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয় তাহলে এ আয়াত وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ -এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে। অতএব, উভয় আয়াতের বৈপরীত্য [تَعَارُضْ] -কে বিদূরীত করার উদ্দেশ্যে বলা হবে وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ -এর মধ্যে ভুলে যাওয়ার অবস্থাটি অন্তর্ভুক্ত নয়।

قَوْلُهُ اَلسَّمْعُ غَيْرُ مُجْرًى عَلٰى ظَاهِرِهٖ : এ বাক্য দ্বারা লেখক ইমাম মালেক (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। اَلسَّمْعُ দ্বারা উদ্দেশ্য اَلْمَسْمُوْعُ فِيْ هٰذَا الْبَابِ مِنَ الْاٰيَةِ وَالْحَدِيْثِ এ অধ্যায়ে বর্ণিত কুরআনে আয়াত ও হাদীস। লেখক বলেন, এ অধ্যায়ে বর্ণিত আয়াত ও হাদীসসমূহ জাহেরী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এর প্রমাণ হলো সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন কেউই আয়াত ও হাদীসমূহকে জাহেরী অর্থে গ্রহণ করেননি।

যদি আয়াতের জাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরামের যে অংশ ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া প্রাণীকে হারাম মনে করতেন তারা অন্যদের উপর এ আয়াতের সাহায্যে দলিল পেশ করতেন। আর তাদের দলিল গ্রহণযোগ্য হতো নিশ্চিতভাবে। কেননা আয়াত অকাট্য দলিল। তখন অন্যরা তাদের এ দলিল মেনে নিতে বাধ্য হতো এবং তাদের দলিল অস্বীকার করার কোনো সুযোগই থাকত না। আর তখন সাহাবাগণের মাঝে মতবিরোধ থাকত না।

যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার মাসআলায় মতবিরোধ হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা হারাম হওয়ার পক্ষে মত পোষণ করতেন তারা এ আয়াত দ্বারা হারাম হওয়ার দলিল দেননি। যদি তারা এ আয়াত দ্বারা দলিল দিতেন তাহলে তাদের দলিল বেশি শক্তিশালী হতো এবং তাদের মতবিরোধ বহাল থাকত না। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা এ আয়াতকে ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ বলা হয়নি এমন প্রাণী হারাম হওয়ার দলিল মনে করতেন না।

قَوْلُهُ وَالْاِقَامَةُ فِيْ حَقِّ النَّاسِيْ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রথমে তার যৌক্তিক দলিলের উত্তর দেওয়া হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) স্বেচ্ছায় বিস্‌মিল্লাহ বর্জনকারীকে বিস্মৃত ব্যক্তির উপর কিয়াস করেছিলেন। তার এ কিয়াসের উত্তরে লেখক বলেন, তাঁর কিয়াসটি যথাযথ হয়নি। কেননা কিয়াস -এর জন্য مَقِيْس ও مَقِيْس عَلَيْه উভয়ের এক পর্যায়ের হওয়া শর্ত। এখানে বিস্মৃত ব্যক্তি ও স্বেচ্ছায় আল্লাহর নাম বর্জনকারী এক নয়। একজন শরিয়তের দৃষ্টিতে مَعْذُوْرٌ অন্যজন مَعْذُوْر নয়। ইসলামি শরিয়তে ভুলে যাওয়াকে ওজর হিসেবে ধরে বিস্মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি থেকে রেহাই দিয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- رُفِعَ عَنْ اُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ 'আমার উম্মত থেকে বিস্মৃত হওয়া ও অসতর্কতাজনিত ভুল ক্ষমা করা হয়েছে।'

রোজাদারের ক্ষেত্রে আমরা দেখি ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি রোজা ভেঙ্গে ফেলে তার উপর কাজা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে যারা ভুলক্রমে কোনো কিছু খেয়ে ফেলে তাদের রোজা শুদ্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং যেহেতু বিস্মৃত ব্যক্তি এবং ইচ্ছাকৃত আল্লাহর নাম বর্জনকারী একপর্যায়ের নয় তাই তাদের একজনকে অন্যজনের উপর কিয়াস করা সঠিক নয়।

قَوْلُهُ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ الخ : এখান থেকে লেখক ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাব দিয়েছেন। লেখক বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণিত হাদীসটি মুতলাক নয়; বরং হাদীসটি ভুলে যাওয়ার অবস্থার সাথে খাস।

আমাদের এ ব্যাখ্যার দলিল আরেকটি হাদীসে রয়েছে। হাদীসটি রাশেদ ইবনে সাঈদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তার বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ অংশটি রয়েছে। অর্থাৎ যখন সে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম বর্জন না করে।

সেহেতু তার বর্ণিত হাদীস ভুলে যাওয়ার অবস্থার সাথে খাস তাই তার হাদীস আমাদের বিপক্ষে দলিল হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর হাদীসের আরেকটি জবাব হচ্ছে হাদীসটি ضَعِيْف এবং হাদীসটির مَوْقُوْف ও مَرْفُوْع হওয়ার ব্যাপারে اِضْطِرَابٌ রয়েছে। যেহেতু তার দলিলের হাদীস ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসের তুলনায় দুর্বল তাই হাদীস দ্বারা তার মাযহাব শক্তিশালী হচ্ছে না।

ভাষ্যগ্রন্থ বিনায়াতে একটি হাদীস দ্বারা আহনাফের উপর প্রথমে আপত্তি করা হয়েছে বিনায়ার ভাষ্যকার এর সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। আমরা এখানে সেই আপত্তি ও তার উত্তর হুবহু উপস্থাপন করছি–

যদি আপনি আপত্তি করেন– ইমাম বুখারী (র.) তার সনদে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছেন, বেদুঈনরা নতুন মুসলমান হয়েছে, তারা আমাদের কাছে জবাইকৃত পশুর গোশত নিয়ে আসে। আমাদের তো জানা থাকে না তারা বিসমিল্লাহ বলে জবাই করেছে নাকি বিসমিল্লাহ না বলে জবাই করেছে, রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খেয়ো –যদি জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ বলা শর্ত হতো তাহলে রাসূল ﷺ সন্দেহ থাকা অবস্থায় জবাইকৃত পশু খাওয়ার আদেশ করতেন না।

উত্তর : আমরা বলি, এ হাদীস তো আহনাফের দলিল। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে কিনা? এ ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ার কারণে রাসূল ﷺ -কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছেন। এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, তাদের ধারণায় বিসমিল্লাহ বলা হালাল হওয়ার শর্ত ছিল। যদি শর্ত না হতো তাহলে হযরত আয়েশা (রা.) এ ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন না। এরপর রাসূল সেই সন্দেহপূর্ণ জন্তু খাওয়ার আদেশ করেছেন মুসলমানের জাহেরী অবস্থার ভিত্তিতে। আর জাহেরী অবস্থা হচ্ছে কোনো মুসলমান ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ বর্জন করবে না। অতএব, এ হাদীস দ্বারা আহনাফের মাযহাবই প্রমাণিত হচ্ছে।

ثُمَّ التَّسْمِيَةُ فِيْ ذَكَاةِ الْاِخْتِيَارِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَهُوَ عَلَى الْمَذْبُوْحِ وَفِي الصَّيْدِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الْاِرْسَالِ وَالرَّمْيِ وَهُوَ عَلَى الْاٰلَةِ لِاَنَّ الْمَقْدُوْرَ لَهُ فِي الْاَوَّلِ الذَّبْحُ وَفِي الثَّانِي الرَّمْيُ وَالْاِرْسَالُ دُوْنَ الْاِصَابَةِ فَيُشْتَرَطُ عِنْدَ فِعْلٍ يَقْدِرُ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا اَضْجَعَ شَاةً وَسَمّٰى فَذَبَحَ غَيْرَهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ لَا يَجُوْزُ وَلَوْ رَمٰى اِلٰى صَيْدٍ وَسَمّٰى وَاَصَابَ غَيْرَهُ حَلَّ وَكَذَا فِي الْاِرْسَالِ وَلَوْ اَضْجَعَ شَاةً وَسَمّٰى ثُمَّ رَمٰى بِالشَّفْرَةِ وَ ذَبَحَ بِاُخْرٰى اُكِلَ وَلَوْ سَمّٰى عَلٰى سَهْمٍ ثُمَّ رَمٰى بِغَيْرِهٖ صَيْدًا لَا يُؤْكَلُ.

অনুবাদ : অতঃপর ইখতিয়ারী জবাইয়ের মধ্যে জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা শর্ত। আর এ বিসমিল্লাহ জবাইকৃত পশুর উপর বলা হবে। আর শিকারের ক্ষেত্রে [কুকুর/বাজপাখি] প্রেরণের এবং তীর নিক্ষেপের সময়। আর এ বিসমিল্লাহ বলা হবে হাতিয়ারের উপর। কেননা প্রথম অবস্থায় তার আয়ত্বাধীন বিষয় হচ্ছে জবাই আর দ্বিতীয় অবস্থায় তীর নিক্ষেপ এবং শিকারী প্রেরণ লক্ষ্যভেদ করা নয়। সুতরাং [বিসমিল্লাহ বলা] শর্ত করা হবে এমন কাজের যার উপর তার ক্ষমতা চলে। অতএব, যদি কোনো জবাইকারী বকরিকে শুইয়ে দেয় এবং বিসমিল্লাহ বলে; কিন্তু সেই বিসমিল্লাহ দিয়ে অন্য একটি বকরি জবাই করে তাহলে তার জবাই শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে যদি একটি শিকারকে তীর নিক্ষেপ করে বিসমিল্লাহ বলে; কিন্তু সেটা অন্য শিকারকে আঘাত করে তাহলেও সেই শিকার হালাল হয়ে যাবে। শিকারী প্রেরণের বিষয়টি ও এমনই। যদি জবাইকারী বকরি শোয়ায় এবং বিসমিল্লাহ্ বলে অতঃপর ছুরি নিক্ষেপ করে [তার পরিবর্তে] অন্য ছুরি দিয়ে জবাই করে তাহলে খাওয়া যাবে। আর যদি একটি তীরে বিস্‌মিল্লাহ বলে অন্য তীর শিকারের প্রতি নিক্ষেপ করে তাহলে উক্ত শিকার খাওয়া যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ التَّسْمِيَةُ فِيْ ذَكَاةِ الْاِخْتِيَارِ الخ : আলোচ্য ইবারতে জবাইয়ের জন্য যে বিসমিল্লাহ বলা শর্ত, তার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে জবাই দু'প্রকার। ১. ইখতিয়ারী জবাই বা স্বাভাবিক অবস্থার জবাই। ২. জরুরি অবস্থার জবাই। লেখক প্রথমে ইখতিয়ারী জবাইয়ের বিস্‌মিল্লাহ বলার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। লেখক বলেন, ইখতিয়ারী জবাই -এ জবাইয়ের মুহূর্তে বিস্‌মিল্লাহ বলা শর্ত। তখন বিস্‌মিল্লাহ বা আল্লাহর নাম বলা হবে জবাইকৃত পশুর উপর। উল্লেখ্য যে, এখানে বিস্‌মিল্লাহ দ্বারা জবাইয়ের বিসমিল্লাহ উদ্দেশ্য। যদি জবাইকারী যে কোনো কাজের শুরুতে সে বিস্‌মিল্লাহ বলা হয় তা উদ্দেশ্য করে বিস্‌মিল্লাহ বলে তাহলে এর দ্বারা তার জবাইকৃত পশু হালাল হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার জবাই হলো– ذَكَاةُ اِضْطِرَارِيٌّ বা জরুরি অবস্থার জবাই। এ ধরনের জবাই -এ তীর নিক্ষেপের সময়/কুকুর কিংবা বাজপাখি প্রেরণের সময় বিস্‌মিল্লাহ বলতে হবে। এ প্রকারে বিসমিল্লাহ বলা হয় জবাইয়ের অস্ত্রের উপর, জবাইয়ের পশুর উপর নয়।

শরিয়তের পক্ষ থেকে বিসমিল্লাহ বলার হুকুম হচ্ছে জবাইকারীর আয়ত্বাধীন কাজের উপর। প্রথম প্রকার জবাইয়ের অবস্থায় জবাইকারী যেহেতু স্বাভাবিক জবাই করতে সক্ষম তাই জবাইকারীকে জবাই করার সময় জবাইয়ের পশুর উপর বিস্‌মিল্লাহ বলার হুকুম করা হয়েছে। পক্ষান্তরে জরুরি অবস্থার জবাইয়ে যেহেতু জবাইকারী সরাসরি জবাই করতে সক্ষম নয়, অর্থাৎ জবাইয়ের পশু তার আয়ত্বাধীন নয়; বরং জবাইকারী তীর নিক্ষেপ করতে অথবা কুকুর কিংবা বাজ ইত্যাদি পাখি প্রেরণ করতে সক্ষম, এজন্য শরিয়ত তাকে তীর নিক্ষেপের সময় কিংবা শিকারী প্রেরণের সময় বিস্‌মিল্লাহ বলার আদেশ করেছে।

মোটকথা স্বাভাবিক অবস্থার জবাই -এ বিস্‌মিল্লাহ বলার ক্ষেত্র হচ্ছে জবাইয়ের পশু, আর জরুরি অবস্থার জবাইয়ে বিস্‌মিল্লাহ বলার ক্ষেত্র হচ্ছে অস্ত্র বা মাধ্যম।

বিস্‌মিল্লাহ বলার ক্ষেত্র দু'ধরনের জবাইয়ে ভিন্ন হওয়ার কারণে বেশকিছু মাসআলা এদের থেকে বের হয় যা পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ। নিম্নে ৫ টি মাসআলা উল্লেখ করা হলো–

ক. একটি বকরিকে জবাই করার উদ্দেশ্যে শোয়ানো হলো অতঃপর জবাইয়ের উদ্দেশ্যে বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নাম নেওয়া হলো, তারপর পূর্বের বকরির স্থলে অন্য বকরি শুইয়ে দ্বিতীয়বার বিস্‌মিল্লাহ না বলে জবাই করা হলো, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বকরিটি জবাইকারীর ও অন্যদের জন্য হালাল হবে না। কারণ এটি ইখতিয়ারী জবাই, এতে বিস্‌মিল্লাহ বলার ক্ষেত্র হচ্ছে জবাইয়ের পশু। আলোচ্য সুরতে জবাইকারী যেহেতু দ্বিতীয় বকরির উপর বিস্‌মিল্লাহ পড়েনি তাই তার জবাইকৃত দ্বিতীয় বকরি হালাল হয়নি।

খ. কোনো শিকারকে লক্ষ্য করে বিস্‌মিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করল কিন্তু উক্ত তীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে অন্য শিকারকে আঘাত করল এবং আঘাতে শিকারটি বধ হলো তাহলে শিকারটি হালাল হয়ে যাবে। যদিও এটিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করা হয়নি। কেননা এটি জরুরি জবাইয়ের অন্তর্ভুক্ত। এতে বিস্‌মিল্লাহ বলার ক্ষেত্র হচ্ছে তীর। আর তীরের উপর নিক্ষেপকারী বিস্‌মিল্লাহ উচ্চারণ করেছে। অতএব, উক্ত তীর যে শিকারকে আঘাত করবে সেই শিকার হালাল হয়ে যাবে।

গ. কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর অথবা শিকারী পাখিকে যদি বিস্‌মিল্লাহ বলে প্রেরণ করে তাহলেও তীরের মতো হুকুম হবে। কারণ কুকুর/শিকারী পাখি জরুরি জবাইয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. কোনো ব্যক্তি জবাই করার উদ্দেশ্যে একটি বকরি শোয়ালো, অতঃপর হাতে ছুরি নিয়ে বিস্‌মিল্লাহ বলে জবাই করতে উদ্যত হলো। তারপর হাতের ছুরিটি ফেলে অন্য ছুরি দিয়ে জবাইয়ের কাজ সমাধা করল তাহলে তার জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং উক্ত পশু হালাল হয়ে যাবে।

ঙ. কোনো একটি শিকার কে লক্ষ্য করে তীর হাতে নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে বিস্‌মিল্লাহ বলা হলো অতঃপর উক্ত তীরটি ফেলে দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য একটি তীর নিক্ষেপ করা হলো, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় তীরটি যদি কোনো শিকারকে বধ করে তাহলে দ্বিতীয় তীরের মাধ্যমে শিকারকৃত পশুটি হালাল হবে না। কেননা দ্বিতীয় তীরে বিস্‌মিল্লাহ বলা হয়নি।

قَالَ : وَيُكْرَهُ اَنْ يَذْكُرَ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى شَيْئًا غَيْرَهُ وَاَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ الذَّبْحِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ وَهٰذِهِ ثَلٰثُ مَسَائِلَ اِحْدٰيهَا اَنْ يَذْكُرَ مَوْصُوْلًا لَا مَعْطُوْفًا فَيُكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ الذَّبِيْحَةُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِمَا قَالَ وَنَظِيْرُهُ اَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِاَنَّ الشِّرْكَةَ لَمْ تُوْجَدْ فَلَمْ يَكُنِ الذَّبْحُ وَاقِعًا لَهُ اِلَّا اَنَّهُ يُكْرَهُ لِوُجُوْدِ الْقِرَانِ صُوْرَةً فَيُتَصَوَّرُ بِصُوْرَةِ الْمُحَرَّمِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আল্লাহর নামের সাথে [জবাইয়ের সময়] অন্য নাম নেওয়া মাকরূহ। [তদ্রূপ] জবাইয়ের সময় "হে আল্লাহ ! অমুকের জবাই কবুল করুন" বলাও মাকরূহ। এখানে তিনটি মাসআলা রয়েছে। এর একটি হচ্ছে [অন্যের নাম] আল্লাহর নামের সাথে মিলিতভাবে আত্ফবিহীন নেওয়া হবে। [এ অবস্থায়] তা মাকরূহ হবে জবাইকৃত পশু হারাম হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ইবারতের দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। এর উপমা এই যে, জবাইকারী বলল– بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ [এটি মাকরূহ হবে হারাম হবে না] কেননা এতে অংশীদারিত্ব পাওয়া যায়নি, আর তাই জবাই রাসূল ﷺ -এর জন্য হয়নি। কিন্তু বাহ্যিকভাবে আল্লাহর নামের সাথে অন্যের নামের মিলনের সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। সুতরাং এটি হারামের আকৃতি ধারণ করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيُكْرَهُ اَنْ يَذْكُرَ مَعَ اسْمِ الخ : আলোচ্য মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রণীত জামিউস সাগীর থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ মাসআলাটি বিস্‌মিল্লাহ বলা সংক্রান্ত।

তিনি বলেন, জবাইয়ের সময় বিস্‌মিল্লাহ -এর সাথে অন্য নাম বলা মাকরূহ। অদ্রূপ বিস্‌মিল্লাহ -এর সাথে اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ "হে আল্লাহ ! অমুকের পক্ষে কবুল করুন" বলাও মাকরূহ।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলার বিশ্লেষণে বলেন, মাসআলাটির তিনটি সুরত হতে পারে।

প্রথম সুরত : জবাইকারী আল্লাহর নামের সাথে অন্য নাম মিলিতভাবে উল্লেখ করবে আত্ফ না করে, এ অবস্থায় আল্লাহর নামের সাথে অন্য নাম মিলানোর কারণে মাকরূহ হবে, তবে জবাইকৃত জন্তু হালাল সাব্যস্ত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর ইবারতে এই সুরতটির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

প্রথম সুরতের উদাহরণ– بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, এভাবে বলা মাকরূহ। তবে জবাইকৃত পশু হালাল।

পশু হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে শিরক পাওয়া যাচ্ছে না। যদি জবাইকারী আল্লাহর সাথে মুহাম্মদ ﷺ -কে শরিক করার ইচ্ছা করত তাহলে مُحَمَّدٍ শব্দের নিচে যের সহকারে [যেমন "আল্লাহ" শব্দের নিচে যের রয়েছে] বলত। অথচ জবাইকারী এখানে مُحَمَّدٌ শব্দটিকে পেশ সহকারে বলেছে।

যেহেতু এখানে অংশীদারিত্বের বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি সেহেতু জবাই মুহাম্মদ ﷺ -এর পক্ষে করা হয়নি, শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়েছে। সুতরাং জবাইকৃত পশু হালাল হয়ে যাবে।

মাকরূহ হওয়ার কারণ হচ্ছে বাহ্যিকভাবে আল্লাহর নামের সাথে অন্য নাম সরাসরি মিলানো। এরূপ মিলানোকে লেখক হারামের আকৃতি ধারণ করা বলে মন্তব্য করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এখানে মাকরূহ দ্বারা উদ্দেশ্য মাকরূহে তাহরীমি। আরো অবশিষ্ট দু'টি সুরত লেখক সামনের ইবারতে পেশ করছেন।

وَالثَّانِيَةُ اَنْ يُذْكَرَ مَوْصُوْلاً عَلٰى وَجْهِ الْعَطْفِ وَالشَّرِكَةِ بِاَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاسْمِ فُلَانٍ اَوْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ وَفُلَانٍ اَوْ بِسْمِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ بِكَسْرِ الدَّالِ فَتَحْرُمُ الذَّبِيْحَةُ لِاَنَّهُ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَالثَّالِثَةُ اَنْ يَقُوْلَ مَفْصُوْلاً عَنْهُ صُوْرَةً وَمَعْنًى بِاَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ وَقَبْلَ اَنْ يُضْجِعَ الذَّبِيْحَةَ اَوْ بَعْدَهٗ وَهٰذَا لَا بَاْسَ بِهٖ لِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ بَعْدَ الذَّبْحِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ هٰذِهٖ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِىَ بِالْبَلَاغِ ـ

অনুবাদ : দ্বিতীয় সুরত এই যে, [আল্লাহর নামের সাথে অন্য নাম] উল্লেখ করা আত্‌ফ ও অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে মিলিতভাবে হবে। যেমন বলা হবে– بِسْمِ اللّٰهِ وَاسْمِ فُلَانٍ 'আল্লাহর নামে এবং অমুকের নামে।' অথবা বলা হবে– بِسْمِ اللّٰهِ وَفُلَانٍ 'আল্লাহ এবং অমুকের নামে।' অথবা বলা হবে– (بِسْمِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ بِكَسْرِ الدَّالِ) আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ -এর নামে। [এ অবস্থায়] مُحَمَّدٌ -এর دَالْ -এর নিচে যের হবে। সুতরাং [উপরিউক্ত উদাহরণগুলোতে] জবাইকৃত পশু হারাম হবে। কেননা পশুকে জবাই করা হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে। আর তৃতীয় সুরত এই যে, [আল্লাহর নামের সাথে অন্য নাম] বলা শব্দগত ও অর্থগতভাবে পৃথকাকারে। যেমন বিস্‌মিল্লাহ বা আল্লাহর নামের পূর্বে পশুকে শোয়ানোর পূর্বে অথবা পরে অন্যের নাম বলা। আর এ প্রকারে কোনো সমস্যা নেই। কেননা রাসূল ﷺ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি জবাইয়ের পরে বলেছেন– اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ هٰذِهٖ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِىَ بِالْبَلَاغِ অর্থাৎ, হে আল্লাহ এ পশুগুলোকে মুহাম্মদের উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল করুন, যারা আপনার একত্ববাদের এবং আমার রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالثَّانِيَةُ اَنْ يُذْكَرَ مَوْصُوْلاً الخ : আলোচ্য ইবারতে আল্লাহর নামের সাথে অন্য নাম যোগ করে জবাই করার যে তিনটি সুরত রয়েছে -এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুরতের আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সুরত : আল্লাহর নামের সাথে অন্য নাম عَطْف ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মিলিয়ে উল্লেখ করা হবে। ইবারতে এ সুরতের তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

১. بِسْمِ اللّٰهِ وَاسْمِ فُلَانٍ আল্লাহর নামে এবং অমুকের নামে।
২. بِسْمِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ আল্লাহ ও অমুকের নামে।
৩. بِسْمِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর নামে।
উল্লেখ্য যে, এ উদাহরণে مُحَمَّدٌ -এর دَالْ -এর নিচে যের পড়া হবে।

লেখক বলেন, দ্বিতীয় সুরতে জবাইকৃত পশু হারাম সাব্যস্ত হবে। কেননা এ সুরতে غَيْرُ اللّٰهِ -এর নামে পশু জবাই করা হয়েছে। আর যে পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে সরাসরি কিংবা আল্লাহর নামের সাথে মিলিয়ে অন্য নামে জবাই করা হয় তা হারাম হয়ে যায়।

দলিল : কুরআনের আয়াত– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের, মাংস, এবং যেসব জন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়।

–[সূরা মায়েদা : ৩]

তৃতীয় সুরত : জবাইকারী আল্লাহর নামের সাথে অন্য নাম শাব্দিকভাবে এবং অর্থগতভাবে আলাদা করে বলবে।

যেমন– ক. অন্য নাম বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নাম নেওয়ার পূর্বে বলবে কিংবা জন্তু শোয়ানোর পূর্বে বলবে।

খ. জবাই করার পর অন্য নাম নিল। তৃতীয় সুরতে জবাইকৃত পশু হালাল থাকবে এবং এভাবে অন্যের নাম নেওয়ার কারণে কোনো ক্ষতির শিকার হবে না। এর দলিল রাসূল ﷺ -এর আমল বা হাদীস। বর্ণিত হাদীসটি এখানে সনদসহ উল্লেখ করা হলো–

وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ يَطَأُ فِيْ سَوَادٍ فَاَتٰى بِهٖ لِيُضَحّٰى فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اِشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ فَاَخَذَهَا وَاَخَذَ الْكَبْشَ فَاَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الضَّحَايَا

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি শিং বিশিষ্ট খচ্চর যাতে কালো রঙের মিশ্রণ ছিল আনার আদেশ করলেন। অতঃপর জবায়ের উদ্দেশ্যে সেটা আনা হলো। তারপর রাসূল ﷺ বললেন, হে আয়েশা ! ছুরি আন এবং সেটাকে পাথরে ঘষা দাও। তিনি তাই করলেন। তারপর রাসূল ﷺ সেটিকে নিলেন এবং খচ্চরটিকে ধরে শোয়ালেন। তারপর জবাই করলেন, এরপর বললেন– بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ

এ হাদীস দ্বারা আল্লাহর নামের সাথে সামান্য বিলম্বে দোয়া পাঠ করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। অতএব, জবাইয়ের সময় আল্লাহর নামের আগে-পরে কোনো কিছু বলাতে কোনো সমস্যা নেই।

এ প্রসঙ্গে মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি দোয়া করার কিংবা تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ বলার ইচ্ছা থাকে তাহলে সেটা আল্লাহর নামের সাথে বলা উচিত নয়; বরং জবাইয়ের আগে কিংবা জবাই করার পরে বলা উচিত।

وَالشَّرْطُ هُوَ الذِّكْرُ الْخَالِصُ الْمُجَرَّدُ عَلٰى مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَرِّدُوا التَّسْمِيَةَ حَتّٰى لَوْ قَالَ عِنْدَ الذَّبْحِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ لَا يَحِلُّ لِاَنَّهُ دُعَاءٌ وَ سُؤَالٌ وَلَوْ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوْ سُبْحَانَ اللّٰهِ يُرِيْدُ التَّسْمِيَةَ حَلَّ وَلَوْ عَطَسَ عِنْدَ الذَّبْحِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا يَحِلُّ فِيْ اَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ لِاَنَّهُ يُرِيْدُ بِهِ الْحَمْدَ لِلّٰهِ عَلٰى نِعْمَةٍ دُوْنَ التَّسْمِيَةِ وَمَا تَدَاوَلَتْهُ الْاَلْسِنُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَهُوَ قَوْلُهُ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مَنْقُوْلٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ـ

অনুবাদ : শর্ত হচ্ছে অন্যসব থেকে মুক্ত খালিস আল্লাহর নাম নেওয়া। যেমনটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন– "তোমরা আল্লাহর নামকে অন্য সবকিছু থেকে মুক্ত কর, এমনকি যদি [জবাইকারী] জবাইয়ের সময় বলে– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ "হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর" তাহলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। কারণ এটি তো দোয়া ও প্রার্থনা। আর যদি আল্লাহর নাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে আলহামদু লিল্লাহ অথবা সুবহানাল্লাহ বলে তাহলে জবাইকৃত পশু হালাল হয়ে যাবে। আর যদি জবাইয়ের সময় হাঁচি দেয় এবং আলহামদু লিল্লাহ বলে তাহলে অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী জবাই সহীহ হবে না। কেননা সে [এ অবস্থায়] আল্লাহর নিয়ামতের উপর আল্লাহর প্রশংসা করেছে, বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নাম নেয়নি। জবাইয়ের সময় লোকেরা যা বলে অভ্যস্ত তা হলো– بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ এটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ -এর তাফসীরে বর্ণিত। উক্ত আয়াতের অর্থ হলো– "সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় [জবাইয়ের সময়] তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ কর।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالشُّرُوْطُ هُوَ الذِّكْرُ الْخَالِصُ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করার মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুরহান উদ্দীন আলী ইবনে আবূ বকর (র.) বলেন, শর্ত হচ্ছে খালিস আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা, তার সাথে অন্য কারো নাম যুক্ত না করা।

এ মাসআলার দলিল পেশ করেন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি বাণী দ্বারা। বাণীটি এই- جَرِّدُوا التَّسْمِيَةَ তোমরা [জবাইয়ের সময়] আল্লাহর নামকে অন্য সব নাম থেকে মুক্ত কর।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের আপত্তি রয়েছে। তারা বলেন لَا اَصْلَ لَهُ -এর কোনো ভিত্তি নেই। আল্লামা যায়লায়ী نَصْبُ الرَّايَةِ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেন, হাদীসটি গরীব। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) দিরায়াতে এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, لَمْ اَجِدْهُ আমি হাদীসটি কোথাও পাইনি।

লেখক বলেন, কেউ যদি জবাই -এর সময় اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ বলে তাহলে তার জবাই শুদ্ধ হবে না। কেননা এটা দোয়া ও প্রার্থনা।

এরপর লেখক বলেন, যদি কেউ আল্লাহর নাম উচ্চারণের নিয়তে আলহামদু লিল্লাহ [اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ] অথবা সুবহানাল্লাহ [سُبْحَانَ اللّٰهِ] বলে তাহলে তার জবাইকৃত পশু হালাল সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে যদি কেউ হাঁচি দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের উদ্দেশ্যে জবাইয়ের সময় আলহামদু লিল্লাহ বলে তাহলে তার এ আলহামদুলিল্লাহ বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী জবাইকে বৈধ করতে পারবে না। কেননা সে এখানে আলহামদু দ্বারা আল্লাহর নাম উচ্চারণের নিয়ত করেনি।

লেখক বলেন, সাধারণ পর্যায়ে লোকেরা জবাইয়ের সময় এ বাক্য বলে অভ্যস্ত - بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ; এ বাক্যটির প্রমাণ লেখকের মতে কুরআনের একটি আয়াতের তাফসীর, যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ - এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এখানে فَاذْكُرُوا দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বলা।

এ প্রসঙ্গের আরেকটি বর্ণনা হচ্ছে–

عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ قَالَ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَنْحَرَ الْبُدْنَةَ فَاَقِمْهَا ثُمَّ قُلِ اللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ سَمِّ ثُمَّ انْحَرْهَا .

এ প্রসঙ্গে আরেকটি মারফূ' হাদীস রয়েছে, হাদীসটি সিহাহ সিত্তাহ -এর সব মুসান্নিফ তাঁদের নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّىْ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ الْيُمْنٰى وَيُسَمِّىْ يُكَبِّرُ وَيَضَعُ رِجْلَهٗ عَلٰى اَكْتَافِهِمَا وَفِىْ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ يَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

শেষোক্ত হাদীসটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, রাসূল ﷺ নিজে জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার বলেছেন।

শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র.) বলেন, بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (بِدُوْنِ وَاوْ) বলা মোস্তাহাব। কেননা তাসমিয়ার মাঝে وَاوْ নেই। তবে তার এ বক্তব্যের উপর অনেকে আপত্তি করে বলেন, যেহেতু স্বয়ং হাদীসে واو সহ উল্লেখ আছে, তাই হাদীসের অনুসরণের উদ্দেশ্যে وَاوْ সহ উল্লেখ করা বা উচ্চারণ করা উত্তম হবে।

قَالَ : وَالذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ لَا بَأْسَ بِالذَّبْحِ فِي الْحَلْقِ كُلِّهِ وَسْطِهِ وَأَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الذَّكَاةُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ وَلِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَجْرَى وَالْعُرُوْقِ فَيَحْصُلُ بِالْفِعْلِ فِيْهِ اِنْهَارُ الدَّمِ عَلَى أَبْلَغِ الْوُجُوْهِ فَكَانَ حُكْمُ الْكُلِّ سَوَاءً ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গলা ও বুকের উপরিভাগের মাঝামাঝি জায়গায় জবাই করা হবে। জামিউস সাগীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পুরো গলার যে কোনো স্থানে, মাঝে উপরিভাগে ও নিম্নভাগে জবাই করাতে কোনো সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে দলিল হচ্ছে রাসূল ﷺ-এর হাদীস– اَلذَّكَاةُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ জবাই করার স্থান বুকের উপরিভাগ ও চোয়ালের দু'হাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা। তাছাড়া গলা হচ্ছে নালী ও রগসমূহের সংযোগস্থল। সুতরাং এতে জবাই সম্পন্ন করার দ্বারা রক্ত প্রবাহের কাজ সর্বোত্তম পন্থায় কার্যকর হবে। অতএব, গলার সব জায়গার হুকুম সমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে জবাইয়ের আদর্শ স্থান কোনটি সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত প্রথমে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, اَلذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ এ ইবারতের ব্যাখ্যায় বিনায়ার মুসান্নিফ বলেন– اَلْمُرَادُ بِذٰلِكَ مَحَلُّ الذَّبْحِ; সুতরাং ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতের অর্থ হবে– জবাইয়ের স্থান বুকের উপরিভাগ ও গলার মাঝামাঝি জায়গা।

জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গলার যে কোনো জায়গার মাঝে, উপরে ও নিচে জবাই করাতে কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ গলার যে কোনো জায়গায় জবাই করা বৈধ।

মাবসূত গ্রন্থের ইবারত হলো– اَلذَّبْحُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ অর্থাৎ, জবাই করার স্থান হলো বুকের উপরিভাগ ও চিবুকের মধ্যবর্তী জায়গা।

اَللَّبَّةُ اللَّحْيَانُ -এর তাফসীরে বলা হয়েছে– اَللَّبَّةُ رَأْسُ الصَّدْرِ وَاللَّحْيَانِ الذَّقْنُ অর্থাৎ, لَبَّةٌ হচ্ছে সিনার উপরিভাগ আর لِحْيَانٌ হলো চিবুক।

ইনায়া গ্রন্থের লেখক বলেন, হিদায়ার লেখক এখানে জামিউস সাগীরের ইবারতকে এনেছেন ইমাম কুদূরীর ইবারতের ব্যাখ্যার জন্য। কেননা কুদূরীর ইবারতে বলা হয়েছে– اَلذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ গলা ও সিনার মধ্যবর্তী স্থানে হলো জবাইয়ের জায়গা। অথচ এ দু'য়ের মাঝে এমন কোনো জায়গা নেই - যা জবাইয়ের স্থান বলে গণ্য হতে পারে।

কারো কারো মতে, জামিউস সাগীর -এর ইবারত আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে জামিউস সাগীর ও মাবসূতের ইবারতে পরস্পর বৈপরীত্য দূর করা। কারণ মাবসূতের বর্ণনার (اَلذَّبْحُ بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ) দ্বারা বুঝা যায়– গলার উপরিভাগে কাটলেও জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে জামিউস সাগীরের বর্ণনায় বলা হয়েছে গলা হলো জবাইয়ের স্থান। দুই কিতাবের দুরকম ইবারতের মতপার্থক্য জামিউস সাগীরের এ ইবারত দ্বারা দূর হয়ে যায় যে, গলার যে কোনো জায়গায় জবাই করলে জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে।

হিদায়ার লেখক বলেন, জবাইয়ের প্রকৃতস্থান যে সিনার উপর থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এর দলিল হলো– রাসূল ﷺ-এর বাণী : রাসূল ﷺ বলেন, اَلذَّبْحُ بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ অর্থাৎ, জবাইয়ের স্থান সিনার উপরিভাগ থেকে চিবুক [এর নিচ] পর্যন্ত। এ হাদীস দ্বারা ঐসব ব্যক্তির মতামত প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় যারা বলে, গলার উপরে, চিবুকের নিচে জবাই করলে জবাই শুদ্ধ হবে না। এরপর হিদায়ার লেখক যৌক্তিক দলিল পেশ করেছেন।

দলিল : গলার পুরোটাই এবং গলার উপরে চিবুকের নিচের অংশ হচ্ছে নালী ও রগসমূহের সংযোগস্থল। এর যে কোনো অংশ কাটা হবে এর দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হবে দ্রুততার সাথে এবং সম্পূর্ণভাবে। যেহেতু জবাইয়ের দ্বারা গোশত থেকে নাপাক রক্ত আলাদা করা উদ্দেশ্য তাই এ স্থান কাটা হলে উদ্দেশ্য সফল হবে যথার্থভাবে।

উল্লেখ্য যে, مَجْرٰى -এর তরজমা করা হয়েছে "নালী" দ্বারা। এখানে مَجْرٰى দ্বারা দুটি নালী উদ্দেশ্য ১. খাদ্যনালী ২. শ্বাসনালী।

قَالَ : وَالْعُرُوْقُ الَّتِىْ تُقْطَعُ فِى الذَّكَاةِ اَرْبَعَةٌ اَلْحُلْقُوْمُ وَالْمِرْئُ وَالْوَدْجَانِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَفْرِ الْاَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ وَهِىَ اِسْمُ جَمْعٍ وَاَقَلُّهُ الثُّلُثُ فَيَتَنَاوَلُ الْمِرْئَ وَالْوَدْجَيْنِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِىِّ (رحـ) فِى الْاِكْتِفَاءِ بِالْحُلْقُوْمِ وَالْمِرْئِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَطْعُ هٰذِهِ الثَّلٰثَةِ اِلَّا بِقَطْعِ الْحُلْقُوْمِ فَيَثْبُتُ قَطْعُ الْحُلْقُوْمِ بِاقْتِضَائِهٖ وَبِظَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا يَحْتَجُّ مَالِكٌ (رحـ) وَلَا يَجُوْزُ الْاَكْثَرُ مِنْهَا بَلْ يُشْتَرَطُ قَطْعُ جَمِيْعِهَا وَعِنْدَنَا اَنَّ قَطْعَهَا حَلَّ الْاَكْلُ وَاِنْ قَطَعَ اَكْثَرَهَا فَكَذٰلِكَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَابُدَّ مِنْ قَطْعِ الْحُلْقُوْمِ وَالْمِرْئِ وَاحِدِ الْوَدْجَيْنِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জবাইয়ের মধ্যে যেসব রগ কাটতে হয় তা চারটি। কণ্ঠনালী, খাদ্যনালী ও ওয়াদজান [গলার দুপাশের দুটি মোটা রগ]। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَفْرِ الْاَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ অর্থাৎ তোমরা যা দিয়ে ইচ্ছে রগগুলো কেটে দাও। এখানে اَوْدَاجٌ শব্দটি বহুবচন। এর সর্বনিম্ন সংখ্যা তিন। সুতরাং হাদীসে খাদ্যনালী ও ওয়াদাজান শামিল রয়েছে। এ হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে দলিল, তার খাদ্যনালী ও কণ্ঠনালী কাটা যথেষ্ট মনে করার ব্যাপারে। তবে উপরিউক্ত তিনটি রগ কাটা সম্ভব হয় না কণ্ঠনালীকে বাদ দিয়ে। ফলে হাদীস দ্বারা পরোক্ষভাবে কণ্ঠনালী কাটার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আমাদের উল্লিখিত হাদীসের জাহেরী অর্থানুযায়ী ইমাম মালেক (র.) দলিল পেশ করেন। তিনি অধিকাংশ রগ কর্তনকে বৈধ মনে করেন না; বরং সব রগ কাটার শর্তারোপ করেন। আমাদের মতে, যদি সব রগ কেটে দেয় তাহলে খাওয়া বৈধ। তদ্রূপ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যদি অধিকাংশ রগ কেটে দেয়। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, কণ্ঠনালী, খাদ্যনালী ও ওয়াজদানের একটি রগ কাটা আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَالْعُرُوْقُ الَّتِىْ تُقْطَعُ الخ : আলোচ্য ইবারতে জবাইয়ের মধ্যে কতগুলো রগ ও নালী কাটা আবশ্যক- সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হিদায়ার লেখক ইমাম কুদূরী (র.)-এর যেটুকু ইবারত চয়ন করেছেন তা এই قَالَ وَالْعُرُوْقُ الَّتِىْ تُقْطَعُ فِى الذَّكَاةِ اَرْبَعَةٌ اَلْحُلْقُوْمُ وَالْمِرْئُ وَالْوَدْجَانِ অর্থাৎ, যেসব রগ জবাইয়ের মধ্যে কাটা হয় তা চারটি। ১. কণ্ঠনালী ২. খাদ্যনালী ও ৩,৪. ওয়াদজান অর্থাৎ গলার দু'পাশের মোটা দুটি রগ।

حُلْقُوم، مِرِّئ ও وَدْجَان -এর তাহকীক :

১. حُلْقُوم -এর মূল হলো حَلْق । এতে وَاو এবং مِيْم অতিরিক্ত যোগ করে حُلْقُوْم করা হয়েছে। শ্বাসনালী কে حُلْقُوْم বলা হয়। এর অপর নাম [বাংলায়] কণ্ঠনালী।

২. مِرِّئ -এর মূল م ـ ر ا বর্তমানরূপ م ـ ر ى ـ ء । اَلْعُبَاب গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, مِرِّئُ الْجَزُوْرِ وَالشَّاةِ لِلْمُتَّصِلِ بِالْحُلْقُوْمِ الَّذِىْ يَجْرِىْ فِيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالْجَمْعُ مُرِى مِثَالُ سَرِيْرٍ وَسُرُرٌ বকরি ও উটের مِرِّئ বলা হয় কণ্ঠনালীর সাথে মিলিত নালীকে, যাতে খাবার ও পানীয় মুখ থেকে পেটে স্থানান্তরিত হয়।

৩. اَلْوَدْجَانِ শব্দটি وَدْج -এর দ্বিবচন, اَلصَّنْعَانِىْ বলেন اَلْوَدْجُ /اَلْوِدَاجُ হচ্ছে ঘাড়ের দুটি রগ। এর দ্বিবচন اَلْوَدْجَانِ লাইস (لَيْث) বলেন, اَلْوَدْجُ عَرَقٌ مُتَّصِلٌ مِنَ الرَّأْسِ اِلَى النَّحْرِ ওয়াদাজ হচ্ছে মাথা থেকে বুকে প্রসারিত একটি রগ। শব্দটির বহুবচন اَوْدَاجٌ।

মোটকথা, উপরিউক্ত চারটি রগ জবাই -এর সময় কাটা আবশ্যক পর্যায়ের।

জবাইয়ের মধ্যে উপরিউক্ত রগ কাটার দলিল হলো হাদীসে রাসূল ﷺ নিম্নোক্ত–

হাদীস– اَفْرِالْاَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ যা দিয়ে ইচ্ছা [জবাই এর মধ্যে] রগসমূহ কাট। হাদীসটি এই শব্দে غَرِيْبٌ । অর্থাৎ এরূপ শব্দে হাদীসটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এরূপ অর্থে একটি হাদীস ইমাম আবূ দাউদ (র.), ইমাম নাসায়ী (র.) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) বর্ণনা করেছেন। সেই হাদীসটি সনদসহ নিম্নরূপ–

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرِيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنَّ اَحَدَنَا اَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّيْنٌ اَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ فَقَالَ اِمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

এ হাদীসের শেষভাগে اِمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ [তুমি যা ইচ্ছা তা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত কর] বাক্যটি হিদায়ার লেখক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সমার্থক। হযরত আদী ইবনে হাতিমের এ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য, হাদীসের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবে শব্দের সামান্য হেরফেরসহ বর্ণিত আছে।

লেখক হাদীসের দ্বারা দলিল বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, হাদীসের اَوْدَاجٌ শব্দটি বহুবচন। আর বহুবচন হতে হলে সর্বনিম্ন তিন সংখ্যার প্রয়োজন হয়।

অতএব, হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনটি রগ কমপক্ষে কাটতে হবে। সেই তিনটি রগ হচ্ছে দু'টি ওয়াদাজ ও খাদ্যনালী। وَدْج -এর দুটি রগ শব্দের চাহিদানুযায়ী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারপর গুরুত্বের বিবেচনা করে খাদ্যনালীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ রগটির অন্তর্ভুক্ত দ্বারা বহুবচন হয়েছে। এরপর যেহেতু এ তিনটি রগ কণ্ঠনালীকে বাদ দিয়ে কাটা যায় না তাই আবশ্যিকভাবে কিংবা হাদীসের পরোক্ষ ইঙ্গিতে কণ্ঠনালীও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِىِّ (رح) فِى الْاِكْتِفَاءِ الخ : লেখক বলেন, রাসূল ﷺ -এর বাণী তথা اَفْرِ الْاَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বিপক্ষে দলিল।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জবাইয়ের মধ্যে খাদ্যনালী ও কণ্ঠনালী কাটা হলে জবাই সম্পন্ন হয়ে যাবে। তিনটি রগ কাটা তার মতে আবশ্যক নয়। যেহেতু হাদীস দ্বারা কমপক্ষে তিনটি রগ কাটার আবশ্যকীয়তা প্রমাণ হয় তাই হাদীসের বক্তব্য ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাবকে খণ্ডন করছে।

মোটকথা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য যেহেতু হাদীস বিরোধী তাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَطْعُ هٰذِهِ الثَّلَاثَةِ الخ : এ ইবারতের বিষয়বস্তু আমাদের আলোচনায় গত হয়েছে। লেখক মূলত এ ইবারত দ্বারা একটি আপত্তির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

আপত্তি এই যে, আপনাদের বক্তব্যানুযায়ী اَوْدَاجٌ শব্দটি বহুবচন, যার সর্বনিম্ন সংখ্যা তিন। অতএব, হাদীসের দ্বারা তিনটি রগ ও নালী কাটার শর্তারোপ করেছেন তা কিসের ভিত্তিতে?

উত্তর : হাদীসের দ্বারা তিনটি রগ কাটার বিষয় প্রমাণিত সন্দেহাতীতভাবে। কিন্তু সে তিনটি রগ কণ্ঠনালী কাটা ব্যতীত কাটা সম্ভব নয়। অতএব, কণ্ঠনালী কাটার বিষয়টি اِقْتِضَاءُ النَّصِّ হিসেবে প্রমাণিত হলো। আর اِقْتِضَاءٌ দ্বারা কোনোকিছু প্রমাণিত হওয়া نَصٌّ -এর দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার মতোই।

সুতরাং যেন রাসূল ﷺ যেন সুস্পষ্টভাবে কণ্ঠনালী কাটতে বলেছেন এ ব্যাপারে একটি যুক্তি এই যে, কণ্ঠনালী কাটার দ্বারা প্রবাহিত রক্ত দ্রুত বের হয়ে যায়। আর জবাই দ্বারা নাপাক প্রবাহিত রক্ত বের করাই উদ্দেশ্য।

তাছাড়া প্রবাহিত রক্ত বিলম্বে বের হলে জবাইকৃত পশুর যাতনা দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই প্রবাহিত রক্ত দ্রুত বের করা ও পশুকে কষ্ট দেওয়া থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কণ্ঠনালী কাটা বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ وَبِظَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا يَحْتَجُّ مَالِكٌ (رحـ) : লেখক এ বাক্যটি দ্বারা ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল পেশ করেছেন।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জবাইকৃত পশুর চারটি রগ কাটা আবশ্যক। এর কোনো একটি রগ কাটা না হলে জবাই শুদ্ধ হবে না এবং জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না।

ইমাম মালিক (র.) আমাদের বর্ণিত চারটি রগ কাটা জরুরি হওয়া সংক্রান্ত বক্তব্যের বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা দলিল পেশ করেন। তার মতে চারটি থেকে তিনটি রগ কাটা হলেও জবাই শুদ্ধ হবে না।

ইমাম মালেক (র.) -এর মাযহাব সংক্রান্ত এ মতটি মাবসূত কিতাবের ব্যাখ্যাকার শায়খুল ইসলাম খাওয়াহির যাদাহ -এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি মাবসূত -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম মালিক (র.) -এর মাযহাব এরূপই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মালিকী মাযহাবের বিখ্যাতগ্রন্থ اَلتَّفْرِيْعُ এ বর্ণিত আছে যে, তিনটি রগ কাটলেই যথেষ্ট হবে। সে মতে ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাব আহনাফের অনুরূপ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَعِنْدَنَا اِنْ قَطَعَهَا حَلَّ الْاَكْلُ الخ : লেখক বলেন, যদি কেউ জবাইয়ের সময় উল্লিখিত চারটি রগ কাটে তাহলে তার জন্য জবাইকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে। আর যদি কেউ অধিকাংশ রগ কাটে অর্থাৎ চারটির স্থলে তিনটি রগ কাটে তাহলেও তার জন্য জবাইকৃত পশু হালাল হয়ে যাবে। চারটির স্থলে তিনটি রগ কাটলে যথেষ্ট হয়ে যাবে – এতটুকুতে হানাফী মাযহাবের সকল ইমাম একমত। তাদের মাঝে মতবিরোধ এই বিষয়ে যে, কোন তিনটি কাটা লাগবে। এ ব্যাপারে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হচ্ছে যে কোনোটি রগ কাটলেই জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে জবাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য কণ্ঠনালী ও খাদ্যনালী কাটা আবশ্যক, আর ওয়াজদানের দু'রগের একটি রগ কাটতে হবে। সুতরাং যদি কোনো জবাইকারী কণ্ঠনালী কিংবা খাদ্যনালী বাদ দিয়ে তিনটি রগ কাটে তাহলে সেই পশু খাওয়ার জন্য হালাল হবে না।

قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰكَذَا ذَكَرَ الْقُدُوْرِىُّ (رحـ) اَلْاِخْتِلَافَ فِىْ مُخْتَصَرِهٖ وَالْمَشْهُوْرُ فِىْ كُتُبِ مَشَائِخِنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ اَنَّ هٰذَا قَوْلُ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَحْدَهٗ وَقَالَ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَاِنْ قَطَعَ نِصْفَ الْحُلْقُوْمِ وَنِصْفَ الْاَوْدَاجِ لَمْ يُؤْكَلْ وَاِنْ قَطَعَ الْاَكْثَرَ مِنَ الْاَوْدَاجِ وَالْحُلْقُوْمِ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ اُكِلَ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيْهِ ـ

অনুবাদ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) তার "মুখতাসারুল কুদূরী" গ্রন্থে অনুরূপ মতবিরোধ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের মাশায়েখগণের কিতাবসমূহে প্রসিদ্ধ হলো– এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত [তরফাইনের -এর মত নয়]। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে বলেন, যদি কণ্ঠনালীর অর্ধেক এবং আওদাজের অর্ধেক কাটা হয় তাহলে জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না, আর যদি জবাইকারী পশুর মৃত্যুর পূর্বে আওদাজ ও কণ্ঠনালীর বেশিরভাগ কেটে দেয় তাহলে খাওয়া বৈধ হবে। এ ব্যাপারে তিনি কোনো মতপার্থক্য বর্ণনা করেননি। অবশ্য এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়েত [বর্ণনা] রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰكَذَا ذَكَرَ الْقُدُوْرِىُّ (رحـ) اَلْاِخْتِلَافَ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) পূর্বে আলোচিত অধিকাংশ রগ কাটা সংক্রান্ত ইমামগণের মতপার্থক্য সম্পর্কে বলেন, পূর্বে উল্লিখিত ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে সৃষ্ট মতপার্থক্য ইমাম কুদূরী (র.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তার কিতাব মুখতাসারুল কুদূরীতে এভাবে মতপার্থক্য উল্লেখ করেছেন।

লেখক বলেন, আমাদের মাশায়েখ তাদের কিতাবসমূহে মতবিরোধটি ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। তাদের কিতাবের ভাষ্য অনুযায়ী এ ব্যাপারে মতবিরোধ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তিনটি রগ কাটা যথেষ্ট হবে যদি খাদ্যনালী ও কণ্ঠনালী কাটা হয় -অন্যথায় নয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, যে কোনো তিনটি রগ কাটলে জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে।

মাশায়েখে কেরামের কিতাবে এ মতবিরোধে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উল্লেখ নেই। ইমাম মুহাম্মদ কার মতের অনুসরণ করেন, তাও জানা যায়নি। এরপর হিদায়ার লেখক ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীরের একটি মাসআলা উল্লেখ করেন।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি জবাইয়ের সময় কণ্ঠনালী অর্ধেক এবং আওদাজের অর্ধেক কাটে তাহলে উক্ত জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। আর যদি উক্ত রগগুলোর অধিকাংশ কেটে ফেলে তাহলে তার জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং জবাইকৃত পশু হালাল সাব্যস্ত হবে। তবে অধিকাংশ রগ কাটার বিষয়টি জবাইকৃত পশুর মৃত্যুর আগে নিশ্চিতভাবে হতে হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এই মাসআলা আলোচনার সময় কোনো মতপার্থক্যের উল্লেখ করেননি। তবে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। লেখক সামনের ইবারতে সেই রেওয়ায়েতসমূহ আলোচনা করেছেন।

فَالْحَاصِلُ اَنَّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِذَا قَطَعَ الثُّلُثَ اَىَّ ثُلُثٍ كَانَ يَحِلُّ وَبِهٖ كَانَ يَقُوْلُ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) اَوَّلاً ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مَا ذَكَرْنَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَنَّهٗ يَعْتَبِرُ اَكْثَرَ كُلِّ فَرْدٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْهَا اَصْلٌ بِنَفْسِهٖ لِاِنْفِصَالِهٖ عَنْ غَيْرِهٖ وَلِوُرُوْدِ الْاَمْرِ بِفَرْيِهٖ فَيَعْتَبِرُ اَكْثَرَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْهَا ـ

অনুবাদ : [লেখক বলেন] সারকথা এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যদি [জবাইকারী] যে কোনো তিনটি রগ কেটে দেয় তাহলে পশু হালাল হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) প্রথমদিকে এরূপ মতই পোষণ করতেন। অতঃপর তিনি আমাদের উল্লিখিত মতের দিকে ফিরে আসেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রত্যেকটি রগের অধিকাংশ কাটার উপর মাসআলা বর্ণনা করেছেন। এরূপ ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও বর্ণিত আছে। কেননা প্রত্যেকটি রগ স্বতন্ত্র -একটি রগ আরেকটি রগ থেকে পৃথক হওয়ার কারণে। যেহেতু প্রত্যেকটির রগ হাদীসে কাটতে বলা হয়েছে। অতএব, প্রতিটি রগের অধিকাংশ কর্তন করা আবশ্যক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَالْحَاصِلُ اَنَّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِذَا قَطَعَ الخ : উপরের ইবারতে লেখক রগ কাটা সংক্রান্ত কয়েকটি রেওয়ায়েতের উল্লেখ করে তার পর্যালোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত উল্লেখ করে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উল্লিখিত চারটি রগ থেকে যে কোনো তিনটি রগ কাটা হলে জবাই শুদ্ধ হবে এবং জবাইকৃত পশু হালাল হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) প্রথমদিকে এ মতই পোষণ করতেন। পরবর্তীতে তিনি ইতিপূর্বে সাহেবাইন (র.)-এর মত হিসেবে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেদিকে ফিরে যান। অর্থাৎ খাদ্যনালী, কণ্ঠনালী ও ওয়াজদানের একটি রগ কাটতেই হবে।

اَلْعِنَايَةُ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর থেকে মোট তিনটি বর্ণনা রয়েছে। এ তিনটি মতের তৃতীয় মতটি হচ্ছে কণ্ঠনালী এবং তার সাথে যে কোনো একটি রগ কাটা আবশ্যক। আর বাকি দুটি ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রত্যেকটি রগের অধিকাংশ কাটা আবশ্যক মনে করেন। অর্থাৎ তার মতে, চারটি রগই সম্পূর্ণ না হলেও অধিকাংশ কাটতে হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অনুরূপ একটি বর্ণনা ইমাম আযম (র.) সম্পর্কেও বর্ণিত আছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল : চারটি রগের প্রত্যেকটি রগই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেননা একটি রগ অন্যটি থেকে পৃথক অবস্থানে রয়েছে।

তাছাড়া যেহেতু প্রত্যেকটি রগ কাটতে বলা হয়েছে তাই প্রত্যেকটিকে কাটতে হবে। তবে لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ অর্থাৎ অধিকাংশ সম্পূর্ণ এর হুকুম রাখে -এ হিসেবে প্রত্যেকটি রগের অধিকাংশ কাটা হলে সব রগ কেটে দেওয়া হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে।

وَلِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْ قَطْعِ الْوَدْجَيْنِ اِنْهَارُ الدَّمِ فَيَنُوْبُ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ اِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْرَى الدَّمِ اَمَّا الْحُلْقُوْمُ يُخَالِفُ الْمَرِئَ فَاِنَّهٗ مَجْرَى الْعَلَفِ وَالْمَاءِ وَالْمَرِئُ مَجْرَى النَّفْسِ فَلَابُدَّ مِنْ قَطْعِهِمَا وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْاَكْثَرَ يَقُوْمُ مَقَامَ الْكُلِّ فِىْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاَحْكَامِ وَاَىُّ ثَلٰثٍ قَطَعَهَا فَقَدْ قَطَعَ الْاَكْثَرَ مِنْهَا وَمَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ يَحْصُلُ بِهَا وَهُوَ اِنْهَارُ الدَّمِ الْمَسْفُوْحِ وَالتَّوْحِيَةُ فِىْ اِخْرَاجِ الرُّوْحِ لِاَنَّهٗ لَا يَحْيٰى بَعْدَ قَطْعِ مَجْرَى النَّفْسِ اَوِ الطَّعَامِ وَيَخْرُجُ الدَّمُ بِقَطْعِ اَحَدِ الْوَدْجَيْنِ فَيَكْتَفِىْ تَحَرُّزًا عَنْ زِيَادَةِ التَّعْذِيْبِ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَطَعَ النِّصْفَ لِاَنَّ الْاَكْثَرَ بَاقٍ فَكَاَنَّهٗ لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا اِحْتِيَاطًا لِجَانِبِ الْحُرْمَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দলিল হলো– ওয়াদজানের দু'টি রগ [ঘাড়ের মোটা দু'টি রগ] কাটার উদ্দেশ্য হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা। সুতরাং এর একটি অপরটির স্থলবর্তী হবে। কেননা দু'টির প্রত্যেকটি রক্ত প্রবাহের স্থান। আর কণ্ঠনালী তো খাদ্যনালীর বিপরীতে। কেননা তা খাদ্যও পানি প্রবাহের স্থান আর مَرِئ হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহের মাধ্যম। অতএব, উভয়টি কাটা আবশ্যক। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল এই যে, শরিয়তের অনেক বিধি-বিধানে অধিকাংশ সম্পূর্ণ -এর স্থলাভিষিক্ত হয়। [উল্লিখিত চারটি রগ থেকে] যে ব্যক্তি তিনটি রগ কাটবে সে তো অধিকাংশ কাটল। তাছাড়া উদ্দেশ্য তো তিনটি রগ কাটার দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রবাহিত রক্ত বের করা ও রূহ [প্রাণ] বের করার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করা। কেননা কণ্ঠনালী ও খাদ্যনালী কেটে ফেলার পর পশু জীবিত থাকতে পারে না। তাছাড়া যেহেতু ওয়াদজানের একটি রগ কাটার দ্বারা রক্ত বের হয়ে যায় তাই প্রাণীকে অধিক কষ্ট দান থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি কাটাকে যথেষ্ট মনে করা হবে। তবে যদি অর্ধেক [চারটির দু'টি] কাটা হয় [তাহলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে না।] কেননা অধিকাংশই বাকি রয়ে গেছে [কাটা হয়নি] এবং যেন কোনো কিছুই কাটা হয়নি। [এ বিধান দেওয়া হবে] সতর্কতাবশত হারাম হওয়ার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّ الْمَقْصُوْدَ الخ : আলোচ্য ইবারতে পূর্বে উল্লিখিত মতবিরোধের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, ওয়াদজ -এর দু'টি রগ কাটার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রবাহিত নাপাক রক্ত অপসারণ করা।

যেহেতু দু'টি রগ দিয়েই রক্ত প্রবাহিত হয় তাই দু'টির স্থলে একটি কাটলেও রক্ত বের হয়ে যাবে। আর তখন একটি রগ অপর রগের স্থলাভিষিক্ত হবে।

মোটকথা একটি রগের কর্তনের দ্বারা প্রবাহিত নাপাক রক্ত বের হওয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় তাই একটি রগ কাটাই যথেষ্ট হবে।

পক্ষান্তরে শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র দু'টি নালী, একটির কাজ অন্যটি দ্বারা সাধিত হয় না। শ্বাসনালী [حُلْقُوْم] হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচলের জন্য, আর খাদ্যনালী [مَرِئ] হচ্ছে খাদ্যও পানি চলাচলের জন্য। যেহেতু এ দু'টি নালী সম্পূর্ণ পৃথক তাই প্রত্যেকটিকে কাটতে হবে।

উল্লেখ্য যে, হেদায়ার ইবারতে ভুলক্রমে حُلْقُوْمٌ -এর ব্যাখ্যা খাদ্যনালী দ্বারা করা হয়েছে, আর مَرِيْ -এর ব্যাখ্যা শ্বাসনালী দ্বারা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ এখানে যা করা হয়েছে তার বিপরীত, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : শরিয়তের অনেক বিধি-বিধানের যে কোনো বিষয়ের সিংহভাগ বা অধিকাংশকে সম্পূর্ণ বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশকে সম্পূর্ণ বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ [اَكْثَرْ] কে সম্পূর্ণ [كُلْ] -এর স্থলবর্তী করা শরিয়তের একটি স্বীকৃত বিষয় । এখানে সেদিকে লক্ষ্য করেই তিনটি রগ কাটাকে ধর্তব্য করা হয়েছে। কেননা জবাইকারী যে কোনো তিনটি রগ কাটলে সে মূলত অধিকাংশ রগ কেটেছে বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ চারটি রগ [كُلْ] -এর অধিকাংশ [اَكْثَرْ] হচ্ছে তিন। সুতরাং যে ব্যক্তি তিনটি রগ কাটল সে অধিকাংশ রগ কেটেছে -এ ভিত্তিতে তার জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে।

তাছাড়া জবাইয়ের উদ্দেশ্যও তিন রগ কাটার দ্বারা হাসিল হয়। জবাইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রবাহিত রক্ত বের করা ও প্রাণ বা রূহ বের করার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করা। এ দু'টি উদ্দেশ্য তিনটি রগ কাটার দ্বারাই অর্জিত হয়। কেননা শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালী কাটার পর কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না। আর ওয়াদজ -এর দু'টি রগের একটি কাটলেই রক্ত বের হয়ে যায়। সুতরাং পশুকে বেশি কষ্টের মুখোমুখি না করে তিনটি রগ কাটাই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ যেহেতু তিনটি রগ কাটার দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় সেহেতু চতুর্থ রগটি কাটা –অতিরিক্ত কাজ বলে গণ্য হবে। আর এটিকে কাটতে গেলে জবাই -এর পশুর কষ্ট হবে। অথচ এ কষ্টের কোনো উপকারিতা নেই।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَطَعَ النِّصْفَ : লেখক এ ইবারত দ্বারা ভিন্ন একটি মাসআলার অবতারণা করেছেন।

মাসআলা : যদি কোনো জবাইকারী চারটি রগের স্থলে দু'টি রগ কাটে তাহলে তার জবাই শুদ্ধ হবে না। আর তার এ দু'রগ কাটা কোনো রগ না কাটার নামান্তর। অর্থাৎ যে ব্যক্তি চারটির স্থলে দু'টি রগ কাটলো সে যেন কোনো রগই কাটেনি। কেননা তার অধিকাংশ রগ কাটা হয়নি।

প্রশ্ন : দুটি রগ কাটা সত্ত্বেও কোনো রগ কাটা হয়নি বলে কেন গণ্য করা হবে?

উত্তর : দু'টি রগ কাটা এবং অবশিষ্ট দু'টি রগ না কাটা -এ সুরতে হালাল হওয়া ও হারাম হওয়ার উভয়দিক সমানভাবে পাওয়া গিয়েছে। আর উসূলে ফিক্‌হ -এর নিয়মানুযায়ী হালাল ও হারাম সমান্তরালে চলে আসলে সেক্ষেত্রে হারামের প্রাধান্য [تَرْجِيْحٌ] হয়। সেই নিয়মানুযায়ী হারামকে এখানে প্রাধান্য দিয়ে বলা হয়েছে [যেন] সে কোনো রগ কাটেনি।

বিশেষ পর্যালোচনা : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর উক্তিটি এখানে অধিকতর নিরাপদ। কেননা এখানে শুধুমাত্র প্রাণ ও রক্ত বের করাই উদ্দেশ্য নয়। প্রাণ ও রক্ত তো বকরিকে দু'টুকরো করার দ্বারাও বের হয়। এখানে তো মূল উদ্দেশ্য শরিয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা। এ ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশ যা আমরা হাদীসের মাধ্যমে অবগত হয়েছি তা হলো– اَوْدَاجٌ [বা রগসমূহ] কে কর্তন করা। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, اَوْدَاجٌ দ্বারা এখানে চারটি রগ ও নালী উদ্দেশ্য।

জবাইয়ের মধ্যে যদি উক্ত চারটি রগই কাটা হয় তাহলে সেটা হবে সর্বোত্তম পর্যায়ের জবাই। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ন্যূনতম তিনটি রগ ও নালী কাটতে হবে। গলায় তিন ধরনের রগ ও নালী রয়েছে। যথা– কণ্ঠনালী, খাদ্যনালী ও রক্ত প্রবাহের রগ বা ওয়াদজ। তিনটি কাটা হলে তিন প্রকারের রগ ও নালী কাটা হয়ে যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত যেহেতু এটাই, তাই তার মত অধিকতর নিরাপদ।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) যে মূলনীতির আলোকে যে কোনো তিনটি রগ কাটার কথা বলেছেন তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি বলেন, তিন হচ্ছে চারের সিংহভাগ, আর সিংহভাগ বা অধিকাংশের উপর সম্পূর্ণ বিষয়ের বিধান দেওয়া হয়। অতএব, যে তিনটি কাটল সে যেন সবই কাটল।

ইমাম আযাম (র.)-এর এ নীতি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন আমরা দেখি সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত, কোনো ব্যক্তি যদি উপরিউক্ত নীতির ভিত্তিতে সাত আয়াতের পরিবর্তে পাঁচ আয়াত পড়ে তাহলে তা বৈধ হওয়া উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ ভুল করে তার নামাজান্তে সাহু সিজদা দিতে হয়। অর্থাৎ পাঁচ আয়াত পড়ার দ্বারা সূরা ফাতিহা পড়া হয়েছে বলা হবে না। অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, উপরিউক্ত মূলনীতিটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

মোটকথা আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব অধিক গ্রহণযোগ্য।

قَالَ : وَيَجُوزُ الذَّبحُ بِالظُّفْرِ وَالسِّنِّ وَالْقَرْنِ اِذَا كَانَ مَنْزُوعًا حَتّٰى لَا يَكُوْنَ بِاَكْلِهِ بَأْسٌ اِلَّا اَنَّهُ يُكْرَهُ هٰذَا الذَّبحُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلْمَذْبُوحُ مَيْتَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَاَفْرَى الْاَوْدَاجَ مَاخَلَا الظُّفْرِ وَالسِّنِّ فَاِنَّهُمَا مُدَى الْحَبْشَةِ وَلِاَنَّهُ فِعْلٌ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ فَلَا يَكُوْنُ ذَكَاةً كَمَا اِذَا ذَبَحَ بِغَيْرِ الْمَنْزُوْعِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَيُرْوٰى اَفْرِ الْاَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمَنْزُوْعِ فَاِنَّ الْحَبْشَةَ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ وَلِاَنَّهُ اٰلَةٌ جَارِحَةٌ فَيَحْصُلُ بِهِ مَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ وَهُوَ اِخْرَاجُ الدَّمِ وَصَارَ كَالْحَجَرِ وَالْحَدِيْدِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَنْزُوْعِ لِاَنَّهُ يَقْتُلُ بِالثِّقْلِ فَيَكُوْنُ فِيْ مَعْنَى الْمُنْخَنِقَةِ وَاِنَّمَا يُكْرَهُ لِاَنَّ فِيْهِ اِسْتِعْمَالُ جُزْءِ الْاٰدَمِيِّ وَلِاَنَّ فِيْهِ اِعْسَارًا عَلَى الْحَيَوَانِ وَقَدْ اَمَرْنَا فِيْهِ بِالْاِحْسَانِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নখ, দাঁত ও শিং দ্বারা জবাই করা বৈধ, যদি এগুলো শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। অতএব, এগুলো দ্বারা জবাইকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। তবে এরূপ জবাই করা মাকরূহ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, [এভাবে] জবাইকৃত পশু মৃতজন্তু [এর পর্যায়ে] কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং রগ ও নালীসমূহ কাটে নখ ও দাঁত ব্যতীত যা হাবশীদের ছুরি হিসেবে গণ্য হয়। তাছাড়া এভাবে জবাই করা একটি অননুমোদিত কাজ। অতএব, এটি জবাই সাব্যস্ত হবে না। যেমন– শরীর থেকে অবিচ্ছিন্ন নখ দ্বারা জবাই করলে জবাই সাব্যস্ত হয় না। আমাদের দলিল : রাসূল ﷺ -এর হাদীস– اَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ অর্থাৎ, 'তুমি যা ইচ্ছে রক্ত প্রবাহিত কর।' আরো বর্ণিত আছে– اَفْرِ الْاَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ তুমি যা ইচ্ছে রগসমূহ কাট। আর তিনি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা অবিচ্ছিন্ন নখ সম্পর্কিত [কর্তিত নখ সম্পর্কিত নয়]। কেননা হাবশী বা আবিসিনিয়ার লোকেরা এরূপ করত। [আর আমাদের যৌক্তিক দলিল হচ্ছে] এগুলো আঘাত করার অস্ত্র, সুতরাং এর দ্বারা উদ্দেশ্য তথা রক্তপ্রবাহের কাজ অর্জিত হবে। অতএব, এটা পাথর কিংবা লোহার মতো হয়ে গেল। তবে অবিচ্ছিন্ন নখ এর বিধান এর বিপরীত। কেননা জবাইকারী এতে চাপ দিয়ে পশুকে হত্যা করে। ফলে এটা কুরআনে বর্ণিত اَلْمُنْخَنِقَةُ [যা কণ্ঠরোধে মারা যায়] -এর অর্থে হবে। [বিচ্ছিন্ন নখ দ্বারা জবাই] অবশ্য মাকরূহ হবে মানুষের অঙ্গ এতে ব্যবহারের কারণে। তাছাড়া এতে পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়। অথচ [জবাই -এর] পশুর প্রতি আমাদের ইহসান করার নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجُوْزُ الذَّبْحُ بِالظُّفْرِ الخ : আলোচ্য ইবারতে জবাই করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে তার আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর কিতাবে উল্লেখ করেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি মানুষ বা অন্য প্রাণীর বিচ্ছিন্ন নখ, দ্বারা অন্য প্রাণী জবাই করে, আর নখ এতটা ধারালো হয় যে, এর দ্বারা সেই প্রাণীর গলার রগসমূহ কেটে যায় তাহলে উক্ত নখ দ্বারা জবাই করা শুদ্ধ হবে।

তদ্রূপ যদি কোনো প্রাণীর বিচ্ছিন্ন দাত/শিং ধারালো হয় আর তা দ্বারা সে অন্য প্রাণী জবাই করে তাহলেও তার জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে।

তদ্রূপ কোনো প্রাণীর ধারালো হাড় দ্বারা অন্য প্রাণীর জবাই বৈধ হবে এবং উপরিউক্ত বস্তুগুলোর সাহায্যে জবাইকৃত পশু খাওয়া বৈধ হয়ে যাবে। তবে এসব বস্তু দ্বারা জবাই করা মাকরূহ। ইমাম মালেক (র.)-ও এরূপ মত পোষণ করেন।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, এসব বস্তুর দ্বারা জবাই করা পশু মৃত জন্তুর হুকুমে। অর্থাৎ মৃতজন্তু যেমন খাওয়া অবৈধ তদ্রূপ এসব বস্তুর দ্বারা জবাইকৃত পশু খাওয়া অবৈধ। ইমাম আহমদ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে একমত পোষণ করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর হাদীস। রাসূল ﷺ এসব বস্তুর ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন–

كُلْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَاَفْرَى الْاَوْدَاجَ مَاخَلاَ الظُّفْرِ وَالسِّنِّ فَاِنَّهُمَا مُدَى الْحَبْشَةِ .

যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং গলার রগসমূহ কাটে তার মাধ্যমে জবাই করা পশু খাও। তবে নখ ও দাঁতের সাহায্যে জবাই করা পশু খেয়ো না। কেননা এগুলো হাবশীদের ছুরি [প্রকৃত ছুরি নয়]।

এ হাদীস মূলত দু'টি হাদীসের সমন্বিত হাদীস– মন্তব্য করেন বিনায়া গ্রন্থের লেখক। সেই দু'টি হাদীসের প্রথম হাদীস যা সিহাহ সিত্তার ছয় ইমামই তাঁদের নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَكُوْنُ فِى الْمَغَازِىْ فَلاَ يَكُوْنُ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَ ذُكِرَ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا اَوْ ظُفْرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ .

আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমি তাকে তখন জিজ্ঞাসা করলাম ! আমরা যুদ্ধে থাকাকালে আমাদের সাথে জবাই -এর ছুরি থাকে না। এমতাবস্থায় আমরা জবাই -এর জন্য কি ব্যবহার করতে পারি? তিনি বললেন, যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় সেই পশু খেতে পার। যদি রক্ত প্রবাহিতকারী বস্তুটি দাঁত ও নখ না হয়। এর কারণ আমি এখনি বলছি। আর তা হলো দাঁত হচ্ছে হাড় আর নখ হচ্ছে হাবশীদের ছুরি।

দ্বিতীয় হাদীসটি ইবনে আবূ শায়বা তাঁর মুসান্নাফে উল্লেখ করেন–

حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الذَّبْحِ بِاللِّيْطَةِ فَقَالَ كُلْ مَا اَفْرَى الْاَوْدَاجَ اِلاَّ سِنًّا اَوْ ظُفْرًا .

অর্থাৎ, হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (র.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে নারিকেলের ধারালো খোল দ্বারা জবাই করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, দাঁত ও নখ ছাড়া যা রক্ত প্রবাহিত করে তার দ্বারা জবাই করা পশু খাও।

উপরিউক্ত দু'টি হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নখ ও দাঁতকে ছুরি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। যদি তা ব্যবহার করা হয় তাহলে তা পশুকে হালাল করবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যুক্তি : নখ ও দাঁত ইত্যাদি দ্বারা জবাই করা শরিয়তসম্মত নয়। অতএব, এগুলো দ্বারা জবাই করা হলে তা জবাই সাব্যস্ত হবে না। মোটকথা অবিচ্ছিন্ন নখ দ্বারা জবাই করলে যেমন জবাই করা পশু হালাল হয় না তদ্রূপ বিচ্ছিন্ন নখ দ্বারা জবাই করা হলেও তা খাওয়া হালাল হবে না।

আহনাফের দলিল : রাসূল ﷺ -এর হাদীস اَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ 'তুমি যা দিয়ে ইচ্ছে রক্ত প্রবাহিত কর।' অন্য বর্ণনায় এসেছে اَفْرِ الْاَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ 'তুমি যা দিয়ে ইচ্ছে রগসমূহ কাট।'

আহনাফের হাদীসের দলিল প্রসঙ্গে বিনায়ার লেখক বলেন, এ প্রসঙ্গে আহনাফের শক্তিশালী দলিল হচ্ছে ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস নিম্নে সনদসহ হাদীসটি উদ্ধৃতি করা হলো–

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ تَرْعٰى بِسَلْعٍ فَاَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ مَوْتِهَا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ لِاَهْلِهِ لَا تَاْكُلُوْا حَتّٰى اٰتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ حَتّٰى اَرْسَلَ اِلَيْهِ مَنْ يَسْاَلُهُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ اَوْ بَعَثَ اِلَيْهِ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِاَكْلِهَا .

এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, যেসব বস্তু ধারালো হয় এবং এর দ্বারা জবাই -এর কাজ চলে তার দ্বারাই জবাই করা যায় এবং এরূপ কিছু দ্বারা জবাই করলে জবাইকৃত পশু হালাল হয়। যেমন আমরা দেখছি এ হাদীসের মধ্যে পাথরের ধারালো অংশ দ্বারা বকরি জবাই করা হলে রাসূল ﷺ এ বকরির গোশতকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

তদ্রূপ কেউ যদি বিচ্ছিন্ন ধারালো নখ/দাঁত দ্বারা কোনো পশু জবাই করে তাহলে তা খাওয়া বৈধ হবে। অর্থাৎ আলোচ্য হাদীসে পাথরের খণ্ড দ্বারা যেরূপ এবং যে কারণে জবাই করা বৈধ হয়েছে তদ্রূপ এবং সেই একই কারণে নখ ও দাঁত দ্বারা জবাই করা বৈধ হবে।

তবে যদি কেউ অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ হাতের নখ দ্বারা পশু জবাই করে তাহলে সে পশুর জবাই বৈধ হবে না এবং জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। কেননা হাদীসের ভাষায় এরূপ নখ হাবশীদের ছুরি। অর্থাৎ হাবশা বা আবিসিনিয়ার লোকেরা হাতের নখ দ্বারা পশু/পাখি জবাই করত যা শরিয়ত অনুমোদিত ছিল না।

قَوْلُهُ مَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى الخ : লেখক এ বাক্যে দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে বর্ণিত হাদীসের জবাব দিয়েছেন। লেখক বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস মুতলাক নয়; বরং তার পক্ষে বর্ণিত হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন নখ সম্পর্কে বর্ণিত। কেননা হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে নখ হচ্ছে হাবশীদের ছুরি। আর হাবশীরা ছুরি হিসেবে অবিচ্ছিন্ন নখ তথা হাতের নখকে ব্যবহার করত। তারা বিচ্ছিন্ন নখকে ছুরি হিসেবে ব্যবহার করত না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসের মধ্যে বিচ্ছিন্ন নখের কথা বলা হয়নি।

হাবশীরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী যেভাবে জবাই করত তাতে জবাই হতো না ; বরং তাদের জবাইকৃত প্রাণীটি মৃত্যুবরণ করত। তারা নখ দ্বারা চাপ দিয়ে এবং দাঁত দ্বারা কামড়ে পশু/পাখি বধ করত।

হাদীসের মধ্যে قَرْن বা শিংয়ের উল্লেখ করা হয়নি। তবে হাদীসে যে ইল্লতের ভিত্তিতে নখ ও দাঁতকে নিষেধ করা হয়েছে সেই ইল্লত অবশ্য শিং -এর মাঝে পাওয়া যায় না। আর সে হিসেবে শিং দ্বারা জবাই মাকরূহ না হওয়াই উচিত। কেননা শিংকে হাবশীরা ছুরি হিসেবে ব্যবহার করত না। তাছাড়া শিং দ্বারা জবাই -এর সুরত একটিই। আর তা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন শিং। অবিচ্ছিন্ন বা শরীরের সাথে যুক্ত শিং দ্বারা জবাই করা সম্ভব নয়। অথচ দাঁত ও নখের মাঝে অবিচ্ছিন্ন অবস্থাতে জবাই করা সম্ভব। অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় জবাই এর মাঝে বল প্রয়োগে জবাই করা হয়। আর বলপ্রয়োগে জবাই করতে গেলে পূর্ণ রক্ত প্রবাহের পূর্বেই প্রাণীর মৃত্যু ঘটে– যা মূলত নখ ও দাঁতের দ্বারা জবাই নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। আর এ বিষয়টি শিং -এর মাঝে অবিদ্যমান। আর তাই শিং দ্বারা জবাই বৈধ হওয়া উচিত এবং এর মাঝে কোনো মতবিরোধ না থাকা বাঞ্ছনীয়।

আহনাফের যৌক্তিক দলিল : শিং, নখ ও দাঁত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যদি ধারালো হয় তাহলে প্রত্যেকটিই আঘাত সৃষ্টিকারী অস্ত্র। অর্থাৎ এগুলোর দ্বারা আঘাত করা যায় এবং রক্ত প্রবাহিত করা যায়। অতএব, এগুলোর দ্বারা জবাই -এর উদ্দেশ্য অর্জন করা তথা রক্ত প্রবাহিত করা ও রক্ত বের করা সম্ভব। ফলে এগুলো ধারালো লোহার ছুরির মতো এবং ধারালো প্রস্তরখণ্ডের মতো হয়ে গেল।

মোটকথা যেহেতু এ সবের দ্বারা লোহার অস্ত্রাদির মতো রক্ত প্রবাহিত করা সম্ভব সেহেতু এগুলোর দ্বারা জবাই বৈধ হওয়াতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَنْزُوْعِ : লেখক বলেন, অবিচ্ছিন্ন নখ ও দাঁতের হুকুম এর থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন নখ ও দাঁত দ্বারা জবাই করা হলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। কেননা এ অবস্থায় জবাইকারী বলপ্রয়োগ করে জবাই করে। বলপ্রয়োগ করে জবাই করা আর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা একই পর্যায়ের। সুতরাং مُنْخَنِقَة বা শ্বাসরোধ করে হত্যা করা যেমন অবৈধ তদ্রূপ বলপ্রয়োগ করে জবাই করাও অবৈধ হবে।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا يُكْرَهُ لِأَنَّ فِيْهِ اسْتِعْمَالَ الخ : লেখক বলেন, বিচ্ছিন্ন নখ ও দাঁত দ্বারা জবাই যদিও জায়েজ; কিন্তু এর দ্বারা জবাই করা মাকরূহ হবে। মাকরূহ হওয়ার কারণ হচ্ছে নখ ও দাঁত মানুষের শরীরের অঙ্গবিশেষ। মানুষের অঙ্গকে জবাই ইত্যাদির কাজে ব্যবহার করাতে মানুষের সম্মানের হানি ঘটে। মানুষের অমর্যাদা হওয়ার কারণে এগুলো ব্যবহার করা মাকরূহ হবে। মাকরূহ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এসব বস্তু দ্বারা জবাই করতে গেলে পশুর কষ্ট হয়। কারণ এগুলো তো লোহার অস্ত্রের ন্যায় হবে না কিছুতেই। শরিয়ত জবাইয়ের কাজে পশুর প্রতি আমাদের ইহসান করার আদেশ দিয়েছে এবং কষ্ট দিতে বারণ করেছে। যেহেতু এসব বস্তু দ্বারা জবাই করলে এতে পশুর কষ্ট হয় তাই এসব দ্বারা জবাই করা মাকরূহ হবে।

قَالَ : وَيَجُوزُ الذَّبْحُ بِاللِّيْطَةِ وَالْمَرْوَةِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ الْقَائِمَ وَالظُّفُرُ الْقَائِمُ فَإِنَّ الْمَذْبُوحَ بِهِمَا مَيْتَةٌ لِمَا بَيَّنَّا وَنَصَّ مُحَمَّدٌ (رحـ) فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَلَى أَنَّهَا مَيْتَةٌ لِأَنَّهُ وَجَدَ فِيهِ نَصًّا وَمَا لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصًّا يَحْتَاطُ فِي ذٰلِكَ فَيَقُولُ فِي الْحِلِّ لَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الْحُرْمَةِ يَقُولُ يُكْرَهُ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নারিকেলের ধারালো খোল, ধারালো পাথর ও রক্ত প্রবাহিত করা যায় এমন সব অস্ত্র দ্বারা জবাই করা বৈধ। তবে শরীরের সাথে যুক্ত দাঁত ও নখ দ্বারা জবাই করা বৈধ নয়। কেননা এ দু'টি দ্বারা জবাইকৃত পশু আমাদের বর্ণিত দলিলের ভিত্তিতে মৃত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) আল জামিউস সাগীর গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এমন পশু মৃত হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং তিনি এ ব্যাপারে কোনো হাদীস পেয়েছেন অবশ্যই। কেননা যে ব্যাপারে তিনি সুস্পষ্ট হাদীস পাননি, তার হুকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। [সেসব বিষয় বর্ণনার সময়] হালাল হলে তিনি বলেন, لَا بَأْسَ بِهِ [এতে কোনো অসুবিধা নেই।] আর হারামের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, এটা মাকরূহ হবে কিংবা এটা খাওয়া যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجُوزُ الذَّبْحُ بِاللِّيْطَةِ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নারিকেলের ধারালো খোল এবং এক ধরনের সাদা শক্ত পাথর যা ধারালো হয়ে থাকে তার দ্বারা জবাই করা বৈধ। এরপর তিনি বলেন, যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করতে পারে ধারালো ও শাণিত হওয়ার কারণে তার দ্বারা জবাই করা জায়েজ।

তবে শরীরের সাথে সংযুক্ত দাঁত ও নখ দ্বারা জবাই করা জায়েজ নয়। এ মাসআলা পূর্বের ইবারতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) আল জামিউস সাগীর গ্রন্থের সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, স্বস্থানে বহাল দাঁত ও নখ দ্বারা জবাইকৃত পশু মৃত বলে গণ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পরিষ্কারভাবে মৃত বলে ফয়সালা প্রদান করা এ ইঙ্গিত বহন করে যে, ইমাম আযম (র.) এ ব্যাপারে কোনো হাদীস অবশ্যই পেয়ে থাকবেন যা তার মৃত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। যদি তিনি এরূপ হাদীস না পেতেন তাহলে তিনি এরূপ পরিষ্কারভাবে সিদ্ধান্ত দিতেন না। কেননা তাঁর কিতাব লেখার ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যে বিষয়ে তিনি দলিল না পান সে বিষয়কে সতর্কতার সাথে বর্ণনা করেন। তিনি দলিল না পাওয়া অবস্থায় হারাম বর্ণনার ক্ষেত্রে يُكْرَهُ 'মাকরূহ হবে' অথবা أَمْرٌ لَا يُؤْكَلُ 'খাওয়া যাবে না' বলেন। আর হালাল বর্ণনার ক্ষেত্রে لَا بَأْسَ بِهِ 'কোনো সমস্যা নেই' বলেন।

আলোচ্য মাসআলা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত নখ ও দাঁত দ্বারা জবাইকৃত পশুকে মৃত বলেছেন তাতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ বিষয়ে কোনো হাদীস অবশ্যই পেয়েছেন।

قَالَ : وَيَسْتَحِبُّ اَنْ يَحِدَّ الذَّابِحُ شَفْرَتَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَةَ وَلْيَحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ وَيَكْرَهُ اَنْ يَضْجِعَهَا ثُمَّ يَحِدَّ الشَّفْرَةَ لِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلًا اَضْجَعَ شَاةً وَهُوَ يَحِدُّ شَفْرَتَهُ فَقَالَ لَقَدْ اَرَدْتَ اَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَّا حَدَدْتَهَا قَبْلَ اَنْ تَضْجَعَهَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জবাইকারীর জন্য তার ছুরি শাণিত করে নেওয়া মোস্তাহাব। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বস্তুর প্রতি অনুগ্রহ করা [তোমাদের উপর] ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে উত্তমরূপে হত্যা কর। আর যখন কোনো পশু জবাই করবে উত্তমভাবে জবাই করবে। তোমাদের প্রত্যেক জবাইকারী যেন তার ছুরিকে ধার দেয় এবং তার জবাইকৃত পশুকে আরাম দেয়। পশুকে শোয়ানোর পর ছুরি ধার দেওয়া মাকরূহ। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন বকরি শোয়ানোর পর ছুরি শাণিত করছে। অতঃপর তিনি [তাকে] বললেন, তুমি এটিকে কয়েকটি মৃত্যু দিতে চাও ? কেন তুমি এটিকে শোয়ানোর পূর্বে ছুরি শাণিত করলে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَسْتَحِبُّ اَنْ يَحِدَّ الذَّابِحُ شَفْرَتَهُ الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক জবাইয়ের একটি আদবের কথা আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারত উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন– وَيَسْتَحِبُّ اَنْ يَحِدَّ الذَّابِحُ شَفْرَتَهُ 'আর মোস্তাহাব হচ্ছে জবাইকারী প্রথমে তার ছুরিকে শাণিত ও ধারালো করবে।'

এরপর হিদায়ার মুসান্নিফ এ ইবারতের পক্ষে রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীস পেশ করেন। হাদীসটি সনদসহ এখানে উদ্ধৃত করা হলো–

عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ اَدِيَةَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَةَ وَلْيَحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ ـ

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বস্তুর প্রতি অনুগ্রহ করা আবশ্যক করেছেন যখন তোমরা কাউকে হত্যা কর তাকে উত্তম পন্থায় হত্যা কর। আর যখন তোমরা কোনো পশুকে জবাই কর সেটিকে ভালোভাবে জবাই কর।

তোমাদের প্রত্যেকেই যেন [জবাই এর পূর্বে] তার ছুরিকে শাণিত করে এবং তার জবাই -এর পশুকে আরাম দেয়। অর্থাৎ অধিক যন্ত্রণা না দেয়।

হাদীসটি ইমাম বুখারী ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। আর তাদের প্রায় সকলেই হাদীসটিকে ذَبَائِحْ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম তিরমিযী (র.) আলোচ্য হাদীসটিকে কিসাস পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসে পশুকে আরাম পৌছানো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পশুর যন্ত্রণা যেন কম হয় সে ব্যাপারে চেষ্টা করা। যেমন– ১. পশুকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করা। ২. দ্রুত জবাই করা ৩. জবাই করার জন্য শোয়ানোর পর বিলম্ব না করা ইত্যাদি।

মাসআলা : পশুকে শোয়ানোর পর ছুরি ধার করা মাকরূহ। এ মাসআলা টি মূলত ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতেরই ব্যাখ্যা।

হিদায়ার লেখক মাসআলাটি প্রমাণিত করার জন্য একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি সনদসহ এখানে উদ্ধৃত করা হলো–

عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا اَضْجَعَ شَاةً يُرِيْدُ اَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحِدُّ شَفْرَتَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَتُرِيْدُ اَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَّا حَدَدْتَهَا قَبْلَ اَنْ تَضْجَعَهَا .

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জবাই করার উদ্দেশ্যে একটি বকরি শোয়ালো। তারপর সে তার ছুরি ধার দিচ্ছিল। এটা দেখে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি এটিকে কয়েকবার মৃত্যু দিতে চাও? তুমি কেন এটিকে শোয়ানোর পূর্বে ছুরি ধার করলে না। হাদীসটি এভাবে হাকিম (র.) তাঁর মুসতাদরাকে "কুরবানি" পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)-এর শর্ত মুতাবিক হয়েছে। আর আমাদের হিদায়ার লেখক যে শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন সেভাবে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে হজ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। হাদীসটি অবশ্য মুরসালরূপে বর্ণিত। যেমন–

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلًا اَضْجَعَ شَاةً الخ

এ প্রসঙ্গের আরেকটি হাদীস ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে। হাদীসটি এই–

عَنْ اَبِىْ لَهِيْعَةَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ جَبْرَئِيْلَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُحَدَّ الشِّفَرَةُ وَاَنْ تَوَارٰى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ اِذَا ذَبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ .

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন– যেন ছুরিকে ধার করা হয় এবং তা চতুষ্পদ জন্তু থেকে লুকিয়ে রাখা হয়। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো প্রাণী জবাই করে সে যেন প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

মোটকথা, উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পশু জবাই করার পূর্বে যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ জবাইয়ের ছুরি ইত্যাদি যেন শাণিত করে রাখা হয়। আর জবাইয়ের জন্য পশুকে শোয়ানোর পর যেন এসব ছুরি ধারানো ও অন্যান্য কাজ না করা হয়।

قَالَ : وَمَنْ بَلَغَ بِالسِّكِّيْنِ النُّخَاعَ اَوْ قَطَعَ الرَّأْسَ كُرِهَ لَهُ ذٰلِكَ وَتُؤكَلُ ذَبِيْحَتُهُ وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ قَطَعَ مَكَانَ بَلَغَ وَالنُّخَاعُ عِرْقٌ اَبْيَضُ فِيْ عَظْمِ الرَّقَبَةِ اَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ اِذَا ذُبِحَتْ وَتَفْسِيْرُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَقِيْلَ مَعْنَاهُ اَنْ يُمَدَّ رَأْسُهُ حَتّٰى يَظْهَرَ مَذْبَحُهُ وَقِيْلَ اَنْ يَكْسِرَ عُنُقَهُ قَبْلَ اَنْ يَسْكُنَ مِنَ الْاِضْطِرَابِ وَكُلُّ ذٰلِكَ مَكْرُوْهٌ وَهٰذَا لِاَنَّ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ وَفِيْ قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةُ تَعْذِيْبِ الْحَيَوَانِ بِلَا فَائِدَةٍ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَالْحَاصِلُ اَنَّ مَا فِيْهِ زِيَادَةُ اِيْلَامٍ لَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ فِي الذَّكَاةِ مَكْرُوْهٌ وَيُكْرَهُ اَنْ يَجُرَّ مَا يُرِيْدُ ذَبْحَهُ بِرِجْلِهِ اِلَى الْمَذْبَحِ وَاَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ قَبْلَ اَنْ تَبْرُدَ يَعْنِىْ تَسْكُنَ مِنَ الْاِضْطِرَابِ وَبَعْدَهُ لَا اَلَمَ فَلَا يُكْرَهُ النَّخْعُ وَالسَّلْخُ اِلَّا اَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنًى زَائِدٍ وَهُوَ زِيَادَةُ الْاَلَمِ قَبْلَ الذَّبْحِ اَوْ بَعْدَهُ فَلَا يُوْجِبُ التَّحْرِيْمَ فَلِهٰذَا قَالَ تُؤْكَلُ ذَبِيْحَتُهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ ছুরি নুখা [نُخَاع] পর্যন্ত পৌছে দেয় কিংবা মাথা কেটে ফেলে তাহলে তা মাকরূহ হবে। তবে সেই জবাইকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে। কোনো কোনো অনুলিপিতে بَلَغَ -এর স্থলে قَطَعَ রয়েছে। نُخَاعٌ হচ্ছে ঘাড়ের হাড়ের মধ্যে সাদা রগ। মাকরূহ হওয়ার কারণ এই যে, মহানবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বকরি জবাই করার সময় তার নুখা কাটতে নিষেধ করেছেন। এর ব্যাখ্যা আমরা উল্লেখ করেছি। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে পশুর মাথা এমনভাবে টেনে ধরা যাতে জবাই এর স্থান প্রতিভাত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, পশুর নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার পূর্বে তার ঘাড় মটকে দেওয়া। উপরিউক্ত সব সুরতই মাকরূহ। আর এটা এ কারণে যে, এসব সুরতে এবং মাথা কাটার অবস্থায় পশুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া হচ্ছে অনর্থকভাবে। মোটকথা এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে যে কাজে পশুকে অধিক কষ্ট প্রদান করা হয় অথচ তা জবাইয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নয় তা করা মাকরূহ। অনুরূপভাবে যে পশুকে জবাই করার ইচ্ছা করা হয়েছে তাকে তার পা ধরে জবাইয়ের স্থানে টেনে নেওয়া মাকরূহ। আর বকরিকে শান্ত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার পূর্বে নুখা করা মাকরূহ। তবে এর পরে যেহেতু কোনো কষ্ট হয় না তাই ঘাড় মটকানো এবং চামড়া টেনে তোলা মাকরূহ নয়। প্রকাশ থাকে যে, যেহেতু উল্লিখিত মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি অতিরিক্ত কারণে অর্থাৎ জবাইয়ের পূর্বে বা পরে অতিরিক্ত কষ্ট প্রদান করা, অতএব, তা হারামকে ওয়াজিব করে না। ফলে সেই জবাইকৃত পশু হারাম হবে না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উক্ত জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ بَلَغَ بِالسِّكِّيْنِ النُّخَاعَ الخ : আলোচ্য ইবারতে জবাইয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হিদায়ার লেখক ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত এনেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি জবাইয়ের সময় তার ছুরি পশুর নুখা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় বা কেটে দেয় অথবা মাথা কেটে দেয় তার জবাই মাকরূহ হয়। নুখা [نُخَاعٌ] -এর ব্যাখ্যা সামনে করা হবে।

হিদায়ার লেখক বলেন, কোনো কোনো অনুলিপিতে وَمَنْ بَلَغَ بِالسِّكِّيْنِ -এর স্থলে وَمَنْ قَطَعَ بِالسِّكِّيْنِ রয়েছে। তখন অর্থ হবে যে ব্যক্তি ছুরি দ্বারা নুখা কেটে দেয়–

نُخَاعٌ-এর ব্যাখ্যা : نُخَاعٌ -এর ব্যাখ্যায় লেখক প্রথমত বলেন– نُخَاعٌ عِرْقٌ أَبْيَضُ فِيْ عَظْمِ الرَّقَبَةِ 'নুখা বলা হয় ঘাড়ের হাঁড়ে অবস্থিত একটি সাদা রগকে।' রগটি মেরুদণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত।

২. কেউ কেউ বলেন, নুখা বলা হয় পশুর মাথাকে টেনে লম্বা করাকে যাতে তার জবাই করার স্থান প্রকাশিত হয়।

৩. কেউ কেউ বলেন, نُخَاعٌ বলা হয় জবাইয়ের পর পশুর নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার পূর্বে তার ঘাড় মটকে দেওয়া।

লেখক نُخَاعٌ -এর যথার্থ পরিচয় সম্পর্কে বলেন, সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে সেটাই যা আমরা প্রথমে উল্লেখ করেছি।

এরপর نُخَاعٌ -এর হুকুম সম্পর্কে লেখক বলেন, নুখা এর ব্যাখ্যায় যতগুলো সুরত উল্লেখ করা হয়েছে এর সবগুলোই মাকরূহ। তদ্রূপ জবাইয়ের সময় সম্পূর্ণ মাথা কেটে ফেলাও মাকরূহ। কারণ এতে পশুকে অনর্থকভাবে অপ্রয়োজনীয় শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আর এটা আমাদের পূর্বে উল্লিখিত হাদীস অনুযায়ী মাকরূহ।

লেখক বলেন, উপরের আলোচনা থেকে এ মূলনীতি দাঁড়ায় যে, জবাইয়ের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় যে কোনো অতিরিক্তি কষ্ট পশুকে প্রদান করা মাকরূহ।

লেখক বলেন, যে পশুকে জবাই করার ইচ্ছা করা হয়েছে তাকে জবাইয়ের স্থানে নেওয়ার পূর্বে বেঁধে নেওয়া এবং তারপর তার পা টেনে জবাইয়ের স্থানে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ।

তদ্রূপ জবাই করার পর পশুর নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার পূর্বেই ঘাড় মটকে দেওয়া মাকরূহ। তবে জবাইয়ের পর পশু ঠাণ্ডা ও স্থির হয়ে যাওয়ার পর ঘাড় মটকানো মাকরূহ নয়। কেননা নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পশুকে আঘাত বা কষ্ট দেওয়া সম্ভব নয়। [ইতিপূর্বে প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার কারণে।] আর তাই এরপর ঘাড় মটকানো এবং চামড়া ছিড়ে ফেলা মাকরূহ নয়।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنًى زَائِدٍ : এখান থেকে মাকরূহ হওয়ার পরও গোশত খাওয়া বৈধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, আলোচ্য মাসআলাগুলোতে মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি একটি অতিরিক্ত বিষয়, মৌলিক কোনো বিষয় নয়। আর তা হচ্ছে জবাইয়ের পূর্বে কিংবা পরে পশুকে অপ্রয়োজনীয় কষ্ট প্রদান করা।

মোটকথা যেহেতু মাকরূহ হওয়ার কারণ একটি অতিরিক্ত বিষয় এ জন্য গোশত খাওয়া হারাম হবে না। আর এ কারণেই ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এমন প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে।

নিম্নে আলোচ্য ইবারতে বর্ণিত জবাইয়ের মাকরূহ কাজগুলো সংক্ষেপে দেওয়া হলো–

ক. জবাই করার সময় ঘাড়ের সাদা রগ পর্যন্ত ছুরি পৌঁছে যাওয়া কিংবা সেই রগ কেটে দেওয়া।

খ. জবাইয়ের সময় পশুর মাথাকে টেনে লম্বা করা যাতে জবাইয়ের স্থান প্রকাশ পায়।

গ. জবাইয়ের পর নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার পূর্বেই ঘাড় মটকে দেওয়া।

ঘ. জবাইয়ের সময় পুরো গলা কেটে মাথা আলাদা করে ফেলা।

ঙ. পশুর পা ধরে টেনে জবাই এর স্থানে নিয়ে যাওয়া।

চ. নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার পূর্বেই চামড়া ছিলানো।

قَالَ : وَاِنْ ذَبَحَ الشَّاةَ مِنْ قَفَاهَا فَبَقِيَتْ حَيَّةً حَتّٰى قَطَعَ الْعُرُوْقَ حَلَّ لِتَحَقُّقِ الْمَوْتِ مَا هُوَ ذَكَاةٌ وَيُكْرَهُ لِاَنَّ فِيْهِ زِيَادَةَ الْاَلَمِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَصَارَ كَمَا اِذَا جَرَحَهَا ثُمَّ قَطَعَ الْاَوْدَاجَ وَاِنْ مَاتَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْعُرُوْقِ لَمْ تُؤْكَلْ لِوُجُوْدِ الْمَوْتِ بِمَا لَيْسَ بِذَكَاةٍ فِيْهَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ বকরিকে ঘাড়ের দিক থেকে জবাই করে এবং তা জীবিত থাকে- তারপর সবগুলো রগ কেটে দেওয়া হয় তাহলে জবাই এর দ্বারা মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার কারণে পশুটি হালাল হয়ে যাবে। তবে এ পদ্ধতি মাকরূহ। কেননা এতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে পশুকে অধিক কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। ফলে এটা যেন এমন হলো যে, পশুকে প্রথমে আঘাত করে তার রগসমূহ কাটা হচ্ছে। আর যদি রগসমূহ কাটার পূর্বেই পশুর মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে যায় তাহলে জবাই ব্যতীত অন্যভাবে মৃত্যু হওয়ার কারণে বকরিটি খাওয়া যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِنْ ذَبَحَ الشَّاةَ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে জবাইয়ের আরেকটি মাকরূহ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক এখানে ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত চয়ন করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো বকরিকে ঘাড়ের দিক থেকে জবাই করা হয়, আর সেটা রগসমূহ কাটার আগ পর্যন্ত জীবিত থাকে; অতঃপর রগ কাটার দ্বারা তার মৃত্যু হয় তাহলে জবাইকৃত পশু হালাল হয়ে যাবে। তবে সুন্নতের পরিপন্থি পদ্ধতিতে জবাই করায় এবং পশুকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়ার কারণে মাকরূহ হবে।

বিনায়া গ্রন্থের মুসান্নিফ এখানে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মাসআলা আলোচনা করেছেন-

মাসআলা : ইমাম কারখী (র.) তাঁর মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, যদি কেউ তরবারির আঘাতে উটের মাথা কে পৃথক করে ফেলে এবং আঘাতের সময় বিসমিল্লাহ বলে তাহলে তাতে দু'অবস্থা- ১. যদি সে কণ্ঠনালী বা গলার দিক দিয়ে আঘাত করে তাহলে সেই উটের গোশত খাওয়া বৈধ হবে। তবে সে এভাবে জবাই [নহর] করার কারণে কাজটি মাকরূহ হবে।

২. যদি আঘাতকারী গর্দানের দিক থেকে আঘাত করে এবং উটের মৃত্যুর পূর্বে তার কণ্ঠনালী ও রগসমূহ কেটে ফেলে তাহলে তা খাওয়া যাবে। তবে এভাবে আঘাত করার কারণে মাকরূহ হবে। এ মাসআলা বকরি ও অন্যান্য সব পশুর জবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) আরো বলেন, যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে [জবাইয়ের সময়] বকরির মাথা সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলে তাহলেও বকরি খাওয়া বৈধ। তবে সে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করার কারণে গুনাহগার হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-ও অনুরূপ মন্তব্য করেন।

قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِ الْمَوْتِ مَا هُوَ ذَكَاةٌ : এ বাক্যটি দ্বারা লেখক বকরি খাওয়া বৈধ হওয়ার দলিল বর্ণনা করেছেন। লেখক বলেন, ইমাম কুদূরী কর্তৃক বর্ণিত উল্লিখিত পন্থায় [ঘাড়ের দিক দিয়ে জবাই শুরু করে মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার আগেই রগসমূহ কাটা তথা] জবাই করলেও গোশত হালাল হবে। কারণ বকরিটির মৃত্যু হয়েছে জবাই -এর দ্বারা। অর্থাৎ রগসমূহ কাটার দ্বারা।

ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) এরূপ মত পোষণ করেন। তবে এ পদ্ধতির জবাই মাকরূহ হবে পশুকে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়ার কারণে। যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا اِذَا جَرَحَهَا ثُمَّ قَطَعَ الْاَوْدَاجَ الخ : লেখক বলেন, উপরিউক্ত পদ্ধতির জবাই -এর উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি যে কোনো কারণে প্রথমে জবাই -এর পশুটিকে আঘাত করল তারপর পশুটিকে জবাই করল। এরূপ করার কারণে যেমন পশু খাওয়া বৈধ হয়; কিন্তু মাকরূহ হয় তদ্রূপ আমাদের উল্লিখিত সুরতটিতেও পশু খাওয়া জায়েজ হবে মাকরূহ সহকারে।

قَوْلُهُ وَاِنْ مَاتَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْعُرُوْقِ : লেখক বলেন, যদি কেউ গর্দানের দিক থেকে পশুকে আঘাত করে তারপর সেই পশুটির গলার রগসমূহ কাটার আগেই পশুটির মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে সেই পশু খাওয়া হালাল হবে না। কারণ পশুটির মৃত্যু হয়েছে জবাই ব্যতীত অন্য পন্থায়।

قَالَ : وَمَا اسْتَأْنَسَ مِنَ الصَّيْدِ فَذَكَاتُهُ الذَّبْحُ وَمَا تَوَحَّشَ مِنَ النَّعَمِ فَذَكَاتُهُ الْعَقْرُ وَالْجَرْحُ لِاَنَّ ذَكَاةَ الْاِضْطِرَارِ اِنَّمَا يُصَارُ اِلَيْهِ عِنْدَ الْعِجْزِ عَنْ ذَكَاةِ الْاِخْتِيَارِ عَلٰى مَا مَرَّ وَالْعِجْزُ مُتَحَقِّقٌ فِى الْوَجْهِ الثَّانِىْ دُوْنَ الْاَوَّلِ وَكَذَا مَا تَرَدّٰى مِنَ النَّعَمِ فِىْ بِئْرٍ وَوَقَعَ الْعِجْزُ عَنْ ذَكَاةِ الْاِخْتِيَارِ لِمَا بَيَّنَّا وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) لَا يَحِلُّ بِذَكَاةِ الْاِضْطِرَارِ فِى الْوَجْهَيْنِ لِاَنَّ ذٰلِكَ نَادِرٌ وَنَحْنُ نَقُوْلُ الْمُعْتَبَرُ حَقِيْقَةُ الْعَجْزِ وَقَدْ تَحَقَّقَ فَيُصَارُ اِلَى الْبَدَلِ كَيْفَ وَاِنَّا لَا نُسَلِّمُ النُّدْرَةَ بَلْ هُوَ غَالِبٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো শিকার [বন্য জন্তু] পোষ মেনে নেয় তাহলে তা হালাল হবে জবাই দ্বারা। পক্ষান্তরে যে গৃহপালিত পশু শিকারে পরিণত হয় তাহলে হালাল হবে রক্তাক্ত ও আঘাত করার দ্বারা। কেননা ইখতিয়ারী জবাই -এ অক্ষম হলে অনিবার্য জবাই [ذَكَاةُ اِضْطِرَارِىْ] -এর পথ অবলম্বন করা হয়। এর বর্ণনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আলোচ্য মাসআলার দ্বিতীয় সুরতে অক্ষমতা পাওয়া যায়, প্রথম সুরতে পাওয়া যায় না। তদ্রূপ যদি কোনো পালিত পশু যদি কূপ [অথবা গভীর গর্তে] পতিত হয়, আর এতে ইখতিয়ারী জবাই -এর অক্ষমতা নিশ্চিত হয় [তাহলে এতে অনিবার্য জবাই কার্যকর করা হবে] আমাদের বর্ণিত পূর্ববর্তী দলিলের ভিত্তিতে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, উল্লিখিত দু'টি সুরতে অনিবার্য জবাই বৈধ হবে না। কারণ এ ধরনের ঘটনা বিরল প্রকৃতির। [ফলে এতে হুকুমের তারতম্য ঘটবে না]। আমরা [আহনাফ] বলি [অনিবার্য জবাই বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে] মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে অক্ষমতা। আর তা এখানে নিশ্চিতভাবে পাওয়া গেছে। অতএব, বিকল্প পথ অবলম্বন করা হবে। তাছাড়া কি করে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে? যেখানে আমরা এরূপ বিষয়কে বিরল হিসেবে মানছি না; বরং এরূপ তো সচরাচরই ঘটে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَا اسْتَأْنَسَ مِنَ الصَّيْدِ الخ : চলমান ইবারতে পূর্বে উল্লিখিত জবাইয়ের দু'টি পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, জবাই দু প্রকার– ১. ذَكَاةٌ اِخْتِيَارِىْ বা স্বাভাবিক অবস্থার জবাই। ২. ذَكَاةٌ اِضْطِرَارِىْ তথা জরুরি বা অনিবার্য অবস্থার জবাই।

পশুও দু প্রকার– ১. বন্যপশু, যাকে শিকার [صَيْدٌ] বলা হয়।

২. সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত, যেমন, ভেড়া, ছাগল, উট ও গরু। এগুলোকে نَعَمٌ বা গৃহপালিত পশু বলা হয়।

প্রথম প্রকারের পশুতে সাধারণভাবে অনিবার্য জবাই -এর পথ অবলম্বন করতে হয় আর গৃহপালিত পশুতে ইখতিয়ারী জবাই প্রয়োগ করা হয়।

সাধারণ নিয়মের বিপরীতে কখনো গৃহপালিত পশু বন্যপশুতে পরিণত হয় আবার কখনো বন্যপশু পোষ মানে এবং গৃহপালিত পশুর মতো হয়ে যায়। বক্ষ্যমাণ ইবারতে শেষোক্ত পশুদ্বয়ের জবাই -এর হুকুম আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যেসব বন্যপশু পোষ মানে তা খাওয়ার জন্য হালাল হবে জবাই দ্বারা। অর্থাৎ এ ধরনের পশুকে ইখতিয়ারী জবাই করতে হবে। এতে এখন আর অনিবার্য জবাই প্রয়োগ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে যদি কোনো গৃহপালিত পশু যেমন– গরু, মহিষ ইত্যাদি বনের পশুদের সাথে মিশে বন্যপশুতে পরিণত হয় -যাকে এখন পোষ মানানো যায় না। এ ধরনের পশুকে অনিবার্য জবাই বা ইযতিরারী জবাই এর মাধ্যমে বধ করা হবে। কেননা ইযতিরারী জবাই হলো বিকল্প বা বদল আর ইখতিয়ারী জবাই বা স্বাভাবিক অবস্থার জবাই হচ্ছে মূল জবাই। মূল জবাই -এ অক্ষম হলে বিকল্পের দিকে যাওয়া হয়।

আমাদের আলোচ্য মাসআলায় বন্যপশুতে রূপান্তরিত হওয়া গৃহপালিত পশুতে যেহেতু ইখতিয়ারী জবাই সম্ভব নয় তাই বিকল্প তথা ইযতিরারী জবাই অবলম্বন করা হবে।

আর ইযতিরারী জবাই হচ্ছে পশুকে দূর হতে আঘাত করা বা রক্তাক্ত করা। মোটকথা যেভাবেই তাকে বধ করা হোক না কেন তাকে ইযতিরারী জবাই বলে গণ্য করা হবে।

লেখক বলেন, যে সব গৃহপালিত পশু কূপ কিংবা গভীর গর্তে নিপতিত হয় তাতে ইযতিরারী জবাই প্রয়োগ করা হবে। কেননা কূপ বা গভীর খাদে পড়ে যাওয়ার কারণে এতে ইখতিয়ারী জবাই প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

এ মাসআলায় আমাদের সাথে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) একমত।

পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (র.) উপরিউক্ত উভয় সুরতে অর্থাৎ গৃহপালিত পশু বন্যপশুতে রূপান্তরিত হওয়া ও বন্যপশু পালিত পশুতে রূপান্তরিত হওয়ার সুরতে আমাদের মতের সাথে একমত নন। তিনি মনে করেন, এ দু'অবস্থায় তাদের পূর্ববর্তী হুকুম বহাল থাকবে। তাঁর সাথে ইমাম লাইছ ও রাবিআ (র.) একমত পোষণ করেন।

তাঁর দলিল এই যে, এরূপ ঘটনা বিরল বা দুষ্প্রাপ্য। আর তাই এক্ষেত্রে তাদের মূল হুকুমে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

আমাদের দলিল : ইযতিরারী জবাইয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে ইখতিয়ারী জবাইয়ে অপারগতা। অর্থাৎ যদি কেউ ইখতিয়ারী জবাই করতে অক্ষম হয় তাহলে তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে ইযতিরারী জবাই। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু ইখতিয়ারী জবাই -এ অক্ষমতা পাওয়া গিয়েছে তাই ইযতিরারী জবাই -এর হুকুম দেওয়া হবে।

তাছাড়া ইমাম মালেক (রা.) কর্তৃক এরূপ ঘটনা কে বিরল আখ্যা দেওয়া সমীচীন নয়; বরং এরূপ ঘটনা ঘটছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আমরা প্রায়ই শুনি যে, অমুক এলাকায় অমুক ব্যক্তি হরিণ পালছে এবং হরিণ তার মালিকের পোষ মেনেছে। এ ব্যাপারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীস রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ 'নিশ্চয় গৃহপালিত জন্তুর মাঝে এক ধরনের বন্যতা বা বুনো ভাব রয়েছে যেমন রয়েছে বনের পশুর মাঝে।'

এই হাদীসের মাঝে সুস্পষ্টভাবে রাসূল ﷺ এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, গৃহপালিত পশুর মাঝে বুনো ভাব রয়েছে।

পরিস্থিতির শিকার হওয়া অবস্থায় গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে যে ইযতিরারী জবাই অবলম্বন করা হয় তা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো–

رَوٰى مُسْلِمٌ عَنْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نَصَبْتُ الْقُدُوْرَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقُدُوْرِ فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ بَعِيْرٌ مِنْ اِبِلِ الْقَوْمِ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ اِلَّا خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَنَّ هٰذِهٖ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهٖ هٰكَذَا وَاَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ اَيْضًا بِاِسْنَادِهٖ اِلٰى عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

হযরত আবানাহ তার দাদা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে [কোনো এক সফরে ছিলাম] ইতোমধ্যে আমাদের পাতিলগুলো চুলায় বসানো হয়েছিল। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, পাতিল খালি করতে। অতঃপর তাই করা হলো। তারপর রাসূল ﷺ আমাদের মাঝে গনিমতের পশু বণ্টন করলেন। ইতিমধ্যে উপস্থিত লোকদের হাত থেকে একটি উট পালিয়ে গেল। সে সময় লোকদের মাঝে একটি মাত্র ছোট ঘোড়া ছিল [ভালো কোনো ঘোড়া ছিল না যা দিয়ে দৌড়িয়ে উটকে ধরা যেত] সুতরাং আমাদের একজন তীর নিক্ষেপ করে সেটাকে ধরে ফেলল। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, এই উটটির মাঝে বন্যতা আছে , যেমন বন্যতা আছে বন্যপশুর মাঝে। তোমাদের কোনো পশু যদি এভাবে পালিয়ে যায় তাহলে সেটাকে এ পদ্ধতিতে আটকাবে।

এ সম্পর্কিত আরো কয়েকটি হাদীস এখানে দেওয়া হলো–

قَالَ الْبُخَارِيُّ (رحـ) فِيْ صَحِيْحِهٖ مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا اَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِيْ يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ وَفِيْ بَعِيْرٍ تَرَدّٰى فِيْ بِئْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ .

ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেন যে, যেসব চতুষ্পদ জন্তু পালিয়ে যায় সেগুলো বন্য জন্তুর পর্যায়ে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইরশাদ করেন, তোমার আয়ত্বাধীন যে পশু তোমাকে অপারগ করে দিবে তা শিকার বা বন্য জন্তুর পর্যায়ে গণ্য হবে। আর যে উট কূপে পতিত তাকে যেভাবে পার জবাই কর।

উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ইযতিরারী জবাই বৈধ এবং বিষয়টি বিভিন্ন হাদীস দ্বারা এমনভাবে প্রমাণিত যা অস্বীকারের সুযোগ নেই; তবে ইমাম মালেক (র.) কিভাবে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

وَفِي الْكِتَابِ أُطْلِقَ فِيمَا تَوَحَّشَ مِنَ النَّعَمِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) أَنَّ الشَّاةَ إِذَا نَدَّتْ فِي الصَّحْرَاءِ فَذَكَاتُهَا الْعَقْرُ وَإِنْ نَدَّتْ فِي الْمِصْرِ لَا تَحِلُّ بِالْعَقْرِ لِأَنَّهَا لَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا فَيُمْكِنُ اَخْذُهَا فِي الْمِصْرِ فَلَا عَجْزَ وَالْمِصْرُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ فِي الْبَقَرِ وَالْبَعِيْرِ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ اَنْفُسِهِمَا فَلَا يَقْدِرُ عَلٰى اَخْذِهِمَا وَاِنْ نَدَّا فِي الْمِصْرِ فَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ وَالصِّيَالُ كَالنَّدِّ اِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلٰى اَخْذِهٖ حَتّٰى لَوْ قَتَلَهُ الْمَصُوْلُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُرِيْدُ الذَّكَاةَ حَلَّ اَكْلُهُ ـ

অনুবাদ : কুদূরী কিতাবে গৃহপালিত পশুর বন্য হওয়ার বিষয়টি মুতলাক বা শর্তহীনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বকরি যদি পলায়ন করে ময়দানে বা মরুভূমিতে চলে যায় তাহলে তার জবাই এর পদ্ধতি হচ্ছে [দূর থেকে] আঘাত করা। আর যদি শহরের মধ্যে পালিয়ে যায় তাহলে [দূর থেকে] আঘাত করা জায়েজ হবে না। কেননা এ অবস্থায় বকরি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না; বরং তাকে শহরের মাঝে ধরে ফেলা সম্ভব। অতএব, এতে অপারগতা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে গরু ও উটের ক্ষেত্রে শহর এবং অন্যস্থান সবই সমান। কেননা এ দুটি তার নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। ফলে এদের ধরতে সক্ষম হবে না। যদি উট ও গরু শহরে পালিয়ে যায় তবুও তাদের ক্ষেত্রে অপারগতা পাওয়া যাচ্ছে। পশুর আক্রমণ পলায়নের পর্যায়ে। আক্রমণকারী পশুকে হত্যা না করা পর্যন্ত আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় যদি সে জবাই করে [আঘাত করে] তাহলে তা খাওয়া বৈধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِي الْكِتَابِ أُطْلِقَ فِيمَا الخ : চলমান ইবারতে গৃহপালিত পশু বন্য হয়ে গেলে কিভাবে জবাই করতে হয়? তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পিছনের ইবারতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, [ইমাম কুদূরী (র.) বলেন,] গৃহপালিত পশু পালিয়ে বন্য হয়ে গেলে তার ক্ষেত্রে ইযতিরাবী জবাই চলবে। এ বিধান যে কোনো পশুর বেলায় প্রযোজ্য ছিল এবং এ বিধান যে কোনো স্থানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল।

লেখক বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) কর্তৃক বর্ণিত এ মাসআলাটি মুতলাক বা নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ (র.) থেকে এ মাসআলা মুতলাকভাবে বর্ণিত নয়। তিনি বকরির বিধানকে উট, গরু ও মহিষের বিধান থেকে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, যদি কোনো বকরি ময়দান বা মরুভূমিতে পালিয়ে যায় তাহলে তাকে দূর থেকে আঘাতের মাধ্যমে হালাল করা যাবে অর্থাৎ এ ধরনের বকরির ক্ষেত্রে ইযতিরারী জবাই চলবে।

পক্ষান্তরে যে বকরি পালিয়ে শহরে বা জনপদে ঢুকে পড়বে তার ক্ষেত্রে ইযতিরারী জবাই চলবে না। কেননা সে শহর ও জনপদের ভিতরে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না; বরং এক সময় তাকে ধরা পড়তেই হবে। যেহেতু শহরের ভিতরে বকরিকে ধরে ফেলা সম্ভব তাই তার ক্ষেত্রে ইযতিরারী জবাইয়ের যে শর্ত অর্থাৎ অক্ষমতা তা পাওয়া না যাওয়ার কারণে ইযতিরারী জবাই বৈধ হবে না।

গরু ও উটের মাসআলা এর থেকে ভিন্ন। গরু ও উট যদি শহরের মধ্যেও পালিয়ে যায় তাহলে তার মধ্যে ইযতিরারী জবাই জায়েজ হবে। কেননা গরু ও উট শহরের / জনপদের মধ্যেও নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। আর তাই এদের ধরা সম্ভব হয় না। ধরা সম্ভব হলেও তা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

মোটকথা, গরু, মহিষ ও উটের ক্ষেত্রে শহর, বন-জঙ্গল ও মরুভূমি সবই সমান। আর তাই যদি তা পলায়ন করে তাহলে সর্বাবস্থায় ইযতিরারী জবাই শুদ্ধ হয়।

এরপর লেখক বলেন, যদি উট, গরু ও মহিষ কারো উপর আক্রমণে উদ্যত হয়, অতঃপর যদি আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করার স্বার্থে সেই প্রাণীর উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে দু-অবস্থা–

১. আক্রান্ত ব্যক্তি উক্ত পশুটিকে হত্যা করার সময় জবাইয়ের নিয়ত করবে।

২. আক্রান্ত ব্যক্তি উক্ত পশুটিকে হত্যা করার সময় জবাইয়ের নিয়ত করবে না।

প্রথম অবস্থায় পশু খাওয়া বৈধ হবে। দ্বিতীয় অবস্থায় বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ অন্যের এমন পশুকে জবাইয়ের নিয়তে হত্যা করে তাহলেও দু-অবস্থা–

১. যার পশু হত্যা করা হয়েছে সে উক্ত পশু নিয়ে নেবে, তাহলে তার জন্য সে পশু খাওয়া বৈধ হবে।

২. পশুর মালিক পশু গ্রহণ করবে না, এমতাবস্থায় উক্ত হত্যাকারী জরিমানা আদায় করত নিজে উক্ত জন্তু ভক্ষণ করতে পারবে।

قَالَ : وَالْمُسْتَحَبُّ فِى الْإِبِلِ النَّحْرُ فَإِنْ ذَبَحَهَا جَازَ وَيُكْرَهُ وَالْمُسْتَحَبُّ فِى الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الذَّبْحُ فَإِنْ نَحَرَهُمَا جَازَ وَيُكْرَهُ أَمَّا الْإِسْتِحْبَابُ فِيْهِ لِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ الْمُتَوَارِثَةِ وَلِاجْتِمَاعِ الْعُرُوْقِ فِيْهَا فِى الْمَنْحَرِ وَفِيْهِمَا فِى الْمَذْبَحِ وَالْكَرَاهَةُ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَهِىَ لِمَعْنًى فِىْ غَيْرِهِ فَلَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ وَالْحِلَّ خِلَافًا لِمَا يَقُوْلُهُ مَالِكٌ (رحـ) إِنَّهُ لَا يَحِلُّ قَالَ : وَمَنْ نَحَرَ نَاقَةً أَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً فَوَجَدَ فِى بَطْنِهَا جَنِيْنًا مَيِّتًا لَمْ يُؤْكَلْ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ وَهٰذَا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالْحَسَنِ ابْنِ زِيَادٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ إِذَا تَمَّ خِلْقَتُهُ أُكِلَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উটের ক্ষেত্রে নহর করা মোস্তাহাব। যদি উটকে জবাই করে তা জায়েজ হবে, তবে মাকরূহ -এর সাথে। গরু ও বকরির ক্ষেত্রে জবাই করা মোস্তাহাব। যদি কেউ এগুলোকে নহর করে তাহলে মাকরূহ -এর সাথে জায়েজ সাব্যস্ত হবে। উটের মাঝে নহর মোস্তাহাব হওয়ার কারণ হচ্ছে যুগ-পরম্পরায় চলে আসা সুন্নত অনুযায়ী হওয়া এবং নহর করার স্থানে রগসমূহের একত্র হওয়া। আর গরু ও বকরির মাঝে রগসমূহ একত্র হয়েছে জবাইয়ের স্থান উভয় ক্ষেত্রে [জবাই ও নহর] মাকরূহ হওয়ার কারণ হচ্ছে সুন্নতের অনুসরণ না করা। মাকরূহ হওয়াটা ভিন্ন কারণে হচ্ছে, সুতরাং তা জায়েজ ও বৈধ হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। তবে এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, [জবাই -এর ক্ষেত্রে নহর আর নহর -এর ক্ষেত্রে জবাই -এর কারণে] পশু হালাল হবে না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ উষ্ট্রী নহর করে অথবা গাভি জবাই করে তার পেটে মৃত বাচ্চা পায় তাহলে তার গায়ে পশম উঠুক কিংবা না উঠুক তা খাওয়া যাবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম যুফার ও হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি গর্ভস্থিত বাচ্চাটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় তাহলে খাওয়া যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও তাই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالْمُسْتَحَبُّ فِى الْإِبِلِ النَّحْرُ الخ : পশুভেদে জবাই দু-ধরনের কিংবা বলা যায় বৈধ পদ্ধতি হিসেবে শরিয়ত দু-ভাবে পশু বধ করার আদেশ করেছে– ১. জবাই করা ও ২. নহর করা।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উটের ক্ষেত্রে মোস্তাহাব হচ্ছে নহর করা।

অর্থাৎ উট দাঁড়ানো অবস্থায় তার বুকের উপরিভাগের রগসমূহ ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে কেটে দেওয়া। তবে যদি কেউ উটকে জবাই করে অর্থাৎ শোয়ায়ে জবাইয়ের স্থান কেটে দেয় তাহলে তা বৈধ হয়ে যাবে। তবে উটকে জবাই করা মাকরূহ।

উট বা উষ্ট্রীকে নহর করা মোস্তাহাব হওয়ার কারণ দুটি–

১. রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নতের অনুসরণ। তাঁরা সকলেই উটকে নহর করতেন।

২. দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে উটের রগসমূহ একত্র হওয়ার স্থান হচ্ছে নহরের স্থান। অতএব, যখন উটকে নহর করা হবে তখন দ্রুত উটের রক্ত বের হবে, ফলে তার মৃত্যু সহজ হয়ে যাবে। আর হাদীসে সুন্দর ও সহজ পদ্ধতিতে পশুকে আরাম দিয়ে জন্তুকে বধ করার আদেশ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে উটকে নহর না করে জবাই করা মাকরূহ হয় সুন্নতের অনুসরণ না করাতে এবং জবাইয়ের মাধ্যমে উটকে কষ্ট দেওয়ার কারণে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গরু, মহিষ ও বকরির ক্ষেত্রে মোস্তাহাব হচ্ছে জবাই করা। যদি কেউ জবাইয়ের পরিবর্তে নহর করে তাহলে তা মাকরূহ হবে, যদিও নহর করা জায়েজ।

এগুলোর ক্ষেত্রে জবাই মোস্তাহাব হওয়ার কারণও তাই অর্থাৎ সুন্নতের অনুসরণ ও সহজ পদ্ধতিতে পশুকে আরাম দিয়ে বধ করা। এগুলোকে নহর করা মাকরূহ হওয়ার কারণ হচ্ছে, সুন্নতের অনুসরণ না করা এবং নহরের মাধ্যমে এগুলোকে কষ্ট দেওয়া।

হিদায়ার লেখক বলেন, যেহেতু উল্লিখিত মাসআলাগুলোতে মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি জবাই বা নহরের সাথে সংযুক্ত নয়; বরং ভিন্ন একটি কারণে, [অর্থাৎ সুন্নতের অনুসরণ না হওয়া] তাই জবাইয়ের ক্ষেত্রে নহর ও নহরের জবাই শুদ্ধ ও জায়েজ হয়ে যাবে। সেই সাথে উক্ত জন্তুটি খাওয়া হালাল হবে।

এ মাসআলায় ইমাম মালেক (র.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এরূপ করা হলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে না।

উল্লেখ্য যে, شَرْحُ الْأَقْطَعِ গ্রন্থের লেখক বলেন– وَعَنْ مَالِكٍ (رحـ) إِذَا ذَبَحَ الْبُدْنَ لَمْ يُؤْكَلْ অর্থাৎ 'ইমাম মালেক (র.) থেকে বর্ণিত যে, যদি কোনো উটকে জবাই করা হয় তাহলে তা খাওয়া বৈধ নয়।'

পক্ষান্তরে كِتَابُ التَّفْرِيْعِ -এর মধ্যে আবুল কাসেম ইবনে হিলাব বলেন, গরু ও বকরিকে জবাই করা আর উটকে নহর করা উত্তম। যদি কেউ প্রয়োজনে উটকে জবাই করে তাহলে তা খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। তদ্রূপ যদি নিষ্প্রয়োজনেও তা করে তবুও খাওয়া যাবে। আর যে ব্যক্তি বকরিকে নহর করল কোনো প্রয়োজনে তাহলে তা খাওয়া যাবে। যদি সে অপ্রয়োজনে নহর করে তাহলে সেই বকরির গোশত খাওয়া মাকরূহ হবে। অর্থাৎ মাকরূহ -এর সাথে খাওয়া জায়েজ।

قَوْلُهُ وَمَنْ نَحَرَ نَاقَةً أَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ উষ্ট্রী নহর করে অথবা গাভি জবাই করে তার পেটে মৃত বাচ্চা পায় তাহলে উক্ত বাচ্চার পশম উঠুক কিংবা না উঠুক ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী তা খাওয়া জায়েজ নয়।

ইমাম যুফার ও হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) একই মত পোষণ করেন।

সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যদি গর্ভস্থিত বাচ্চাটির সব অঙ্গ পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তা খাওয়া অবৈধ নয়।

ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) অনুরূপ মত পোষণ করেন। মাবসূত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি পূর্ণাঙ্গ হয় এবং শরীরে পশম গজায় তাহলে তা খাওয়া যাবে। অন্যথায় তা খাওয়ার উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে না।

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْأُمِّ حَقِيْقَةً لِأَنَّهُ يَتَّصِلُ بِهَا حَتّٰى يُفْصَلَ بِالْمِقْرَاضِ وَيَتَغَذّٰى بِغِذَائِهَا وَيَتَنَفَّسُ بِتَنَفُّسِهَا وَكَذَا حُكْمًا حَتّٰى يَدْخُلَ فِي الْبَيْعِ الْوَارِدِ عَلَى الْأُمِّ وَيَعْتِقُ بِإِعْتَاقِهَا وَإِذَا كَانَ جُزْءٌ مِنْهَا فَالْجَرْحُ فِي الْأُمِّ ذَكَاةٌ لَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ ذَكَاتِهِ كَمَا فِي الصَّيْدِ ـ وَلَهُ أَنَّهُ أَصْلٌ فِي الْحَيٰوةِ حَتّٰى يُتَصَوَّرَ حَيَاتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَعِنْدَ ذٰلِكَ يُفْرَدُ بِالذَّكَاةِ وَلِهٰذَا يُفْرَدُ بِإِيْجَابِ الْغُرَّةِ وَيَعْتِقُ بِإِعْتَاقٍ مُضَافٍ إِلَيْهِ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَبِهِ وَهُوَ حَيَوَانٌ دَمَوِيٌّ وَمَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الذَّكَاةِ وَهُوَ التَّمْيِيْزُ بَيْنَ الدَّمِ وَاللَّحْمِ لَا يَتَحَصَّلُ بِجَرْحِ الْأُمِّ إِذْ هُوَ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِخُرُوْجِ الدَّمِ عَنْهُ فَلَا يُجْعَلُ تَبَعًا فِيْ حَقِّهِ بِخِلَافِ الْجَرْحِ فِي الصَّيْدِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِخُرُوْجِهِ نَاقِصًا فَيُقَامُ مَقَامَ الْكَامِلِ فِيْهِ عِنْدَ التَّعَذُّرِ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَحَرِّيًا لِجَوَازِهِ كَيْلَا يَفْسُدَ بِاسْتِثْنَائِهِ وَيَعْتِقُ بِإِعْتَاقِهَا كَيْلَا يَنْفَصِلَ مِنَ الْحُرَّةِ وَلَدٌ رَقِيْقٌ ـ

অনুবাদ : [সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল] রাসূল ﷺ -এর হাদীস- ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ 'গর্ভস্থিত বাচ্চার ক্ষেত্রে তার মায়ের জবাই তার জন্য যথেষ্ট।' তাছাড়া এটি প্রকৃতপক্ষে মায়ের অংশ। কেননা এটি মায়ের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত যে, তাকে কাঁচি দ্বারা কেটে পৃথক করা হয়। মায়ের খাদ্য থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং মায়ের শ্বাসের সাহায্যে শ্বাস নেয়। তদ্রূপ হুকমিভাবে তা মায়েরই অংশ। তাই মায়ের উপর যে বিক্রি আরোপিত হয় তাতে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মাকে আজাদ করার দ্বারা এটি আজাদ হয়। যখন এটি তার মায়ের অংশ সাব্যস্ত হলো তখন গর্ভস্থিত বাচ্চাকে জবাই করতে অক্ষম হলে মায়ের [উপর জবাইয়ের উদ্দেশ্যে] আঘাত তার জন্য জবাই সাব্যস্ত হবে, যেমন শিকার বা বন্যপশুতে [স্বাভাবিক জবাই করতে অক্ষম হলে ইযতিযারী জবাই কার্যকর করা হয়।] ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, গর্ভস্থিত বাচ্চা প্রাণসত্তা হওয়ার দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আর তাই মায়ের মৃত্যুর পরও তার জীবিত থাকা সম্ভব। আর তখন তার জবাই আলাদাভাবেই করতে হবে। আর এজন্যই দাস/দাসী প্রদান করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে এটি স্বতন্ত্র গণ্য হয়ে থাকে। তার প্রতি স্বতন্ত্রভাবে আজাদ করার নিসবত [সম্বন্ধ] করা হলে তা আজাদ হয়ে যায়। তার জন্য কিংবা তার পক্ষে অসিয়ত করা সহীহ হয়। আর তা একটি প্রবহমান রক্তবিশিষ্ট প্রাণী। জবাই দ্বারা উদ্দেশ্যই হচ্ছে রক্ত থেকে গোশতকে পৃথক করা। আর তা কিছুতেই মাকে আঘাত করার [জবাই করার] দ্বারা অর্জিত হবে না। কেননা তা তার থেকে রক্ত প্রবাহের সবব হয় না। সুতরাং গর্ভস্থিত বাচ্চাকে রক্ত বের হওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অনুগামী করা যাবে না। শিকার বা বন্যজন্তুর উপর আঘাত করার বিষয়টি এমন নয়। কেননা তা শিকার থেকে অপূর্ণাঙ্গভাবে রক্ত বের হওয়ার সবব। অতএব, [বন্যপশুর ক্ষেত্রে] অপরিপূর্ণ রক্ত বের হওয়াকে পরিপূর্ণ রক্ত বের হওয়ার স্থলবর্তী করা হবে অপারগতার কারণে। আর মায়ের বিক্রয়ের মাঝে এটি অন্তর্ভুক্ত হয় বিক্রয় প্রক্রিয়াটিকে বৈধতা দানের জন্য, যাতে [বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] মা থেকে ভিন্ন করার দ্বারা বিক্রয়টি ফাসেদ না হয়। আর মাকে আজাদ করার দ্বারা গর্ভস্থিত বাচ্চা আজাদ হয় এজন্য যে, যাতে স্বাধীনা মা থেকে গোলাম বাচ্চা জন্ম না নেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ الخ : আলোচ্য ইবারতে সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল আলোচনা করা হয়েছে। সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল- قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ 'রাসূল ﷺ বলেন, গর্ভস্থিত বাচ্চার জবাই তার মায়ের জবাই দ্বারা আদায় হয়ে যায়।' হাদীসটি এগারোজন সাহাবী রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও হযরত আবূ আইয়ূব (রা.) প্রমুখ।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র.)-এর হাদীসটি সনদসহ নিম্নে দেওয়া হলো-

عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِى الْوَدَاكِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ . أَخْرَجَ هٰذَا الْحَدِيْثَ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهٰذَا لَفْظُ التِّرْمِذِىِّ .

وَلَفْظُ أَبِىْ دَاوُدَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ فِىْ بَطْنِهَا الْجَنِيْنُ أَنُلْقِيْهِ أَمْ نَأْكُلُ ؟ فَقَالَ كُلُوْهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ .

ইমাম আবূ দাউদ (র.) কর্তৃক বর্ণিত শব্দগুলো হচ্ছে- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা উষ্ট্রীকে নহর করি, গাভি অথবা বকরিকে জবাই করি- কখনো এদের পেটে তাদের গর্ভস্থিত বাচ্চা পাই। আমরা কি এটাকে ফেলে দেব? নাকি আমরা তা খেয়ে ফেলব ? রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা চাইলে তা খেতে পার। কেননা এর মায়ের জবাই দ্বারা এর জবাই -এর কাজ হয়ে যায়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র.)-এর মতো অন্যান্য সাহাবীগণও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, মায়ের জবাই দ্বারা গর্ভস্থিত বাচ্চার জবাই সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

যৌক্তিক দলিল : গর্ভস্থিত বাচ্চা প্রকৃতিগতভাবে [حَقِيْقَةً] ও হুকমিভাবে মায়ের অংশবিশেষ। যেহেতু উভয় দিক থেকে মায়ের অংশ সাব্যস্ত হলো, তাহলে মায়ের জবাই দ্বারা তার জবাই সম্পন্ন হওয়া যুক্তির দাবি।

حَقِيْقَةً বা প্রকৃতিগতভাবে মায়ের অংশ এভাবে যে, গর্ভস্থিত বাচ্চা মায়ের নাড়ির সাথে সংযুক্ত, তাই তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে মায়ের নাভি কেটে আলাদা করতে হয়।

তাছাড়া মায়ের খাদ্যের মাধ্যমে গর্ভস্থিত বাচ্চা খাদ্য লাভ করে এবং মায়ের শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে সেও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। অতএব, গর্ভস্থিত বাচ্চা মায়ের অংশ হবে বৈ কি!

(حُكْمِىٌّ) হুককিভাবে মায়ের অংশ এভাবে যে, মাকে বিক্রি করা হলে জানীন বা গর্ভস্থিত বাচ্চা বিক্রি হয়ে যায় -আলাদা করে তার ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তি করা হয় না।

তদ্রূপ মায়ের আজাদ হওয়ার দ্বারা বাচ্চা আজাদ হয়ে যায়। মোটকথা যেহেতু গর্ভস্থিত বাচ্চা মায়ের অংশবিশেষ হওয়া প্রমাণিত হলো। অতএব, মায়ের জবাইয়ের দ্বারা বাচ্চার জবাই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

এর উদাহরণ হচ্ছে শিকার বা বন্যজন্তু। বন্যজন্তুর মাঝে ইখতিয়ারী জবাই সম্ভব না হওয়াতে শরিয়ত ইযতিরারী জবাইয়ের আদেশ করেছে। তদ্রূপ গর্ভস্থিত বাচ্চার ক্ষেত্রে জবাই সম্পাদন অসম্ভব হওয়াতে শরিয়ত তার মায়ের জবাইকে তার জবাই সাব্যস্ত করেছে।

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّهُ أَصْلٌ فِى الْحَيٰوةِ الخ : চলমান ইবারতে গর্ভস্থিত বাচ্চার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের দলিল প্রদান করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হচ্ছে- মায়ের জবাই দ্বারা গর্ভস্থিত বাচ্চার জবাই সম্পন্ন হয় না।

ইমাম আযম (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, গর্ভস্থিত বাচ্চা সত্তাগতভাবে একটি ভিন্ন প্রাণী। তার ভিন্ন প্রাণ রয়েছে। আর তাই মায়ের মৃত্যুর পর তার বেঁচে থাকা সম্ভব। [আর কখনো কখনো তা বেঁচেও থাকে।]

আর এটা বলা বাহুল্য যে, কোনো বস্তুর অংশবিশেষ সেই বস্তু থেকে পৃথক করার পর এবং সেই বস্তুর মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর জীবিত থাকতে পারে না।

স্বতন্ত্র প্রাণসত্তার অধিকারী হলে ভিন্নভাবে সেই প্রাণীর জবাই করতে হয়। অতএব, গর্ভস্থিত বাচ্চাকে ভিন্নভাবে জবাই করতে হবে। এরপর লেখক গর্ভস্থিত বাচ্চা ভিন্ন প্রাণী হওয়ার কারণে তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় মা থেকে পৃথক হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ করেন।

ক. **মাসআলা :** যদি দুজন মহিলা পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, অতঃপর তাদের একজন অপর [গর্ভবতী] জনকে লাথি মারল। আর এ লাথি দ্বারা যদি শুধুমাত্র গর্ভস্থিত বাচ্চাটি মারা যায়, তাহলে আঘাতকারী মহিলার উপর غُرَّةٌ অর্থাৎ একটি দাস-দাসী প্রদান করা ওয়াজিব হবে। সে দাস-দাসীটির দাম পাঁচশত দিরহাম হতে হবে। [এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা جِنَايَاتٌ অধ্যায়ে আসবে।] এ মাসআলায় শুধুমাত্র বাচ্চার মৃত্যুর কারণে দাস-দাসী ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে যে, গর্ভস্থিত বাচ্চাটির প্রাণ স্বতন্ত্র এবং এটি একটি ভিন্ন প্রাণী।

খ. **মাসআলা :** যদি কোনো মনিব তার দাসীর গর্ভস্থিত বাচ্চা সম্পর্কে বলে যে, সে আজাদ, তবে বাচ্চাটি আজাদ হয়ে যাবে; কিন্তু তার মা আজাদ হবে না। এর দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, বাচ্চাটি স্বতন্ত্র সত্তা।

গ. **মাসআলা :** যদি কেউ অসিয়ত করে যে, এ মহিলার পেটে যে বাচ্চা আছে তাকে আমার এ পরিমাণ মাল দেবে, তাহলে তার এ অসিয়ত বাচ্চার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

তদ্রূপ যদি কেউ তার গাভীর পেটে অবস্থিত বাচ্চাটি সম্পর্কে অসিয়ত করে বলে যে, আমার গাভীর পেটের বাচ্চাটি অমুককে হাদিয়া দিলাম তাহলে তার অসিয়তও কার্যকর হবে। এ শেষোক্ত দুটি মাসআলাও প্রমাণ করে যে, গর্ভস্থিত বাচ্চার জীবন তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং তার জীবন মা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

যেহেতু উপরিউক্ত মাসআলাগুলো দ্বারা গর্ভস্থিত বাচ্চার পৃথক ও স্বতন্ত্র জীবন হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ হলো, তাই এটিকে আলাদাভাবে জবাই করতে হবে।

এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আরেকটি যুক্তি এই যে, গর্ভস্থিত বাচ্চা প্রবহমান রক্তবিশিষ্ট একটি প্রাণী। আর জবাই দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ জাতীয় প্রাণীর শরীরের মাঝে যে, প্রবহমান নাপাক রক্ত আছে তা দূর করত গোশতকে পাক করা। এ কথা বলা বাহুল্য যে, মাকে জবাই করার দ্বারা বাচ্চার দেহস্থ রক্ত বের হয়নি। অতএব, রক্ত বের হওয়ার ক্ষেত্রে বাচ্চাটি মায়ের অনুবর্তী করা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। সুতরাং বাচ্চার নাপাক রক্ত বের করার জন্য আলাদা করে বাচ্চাকে জবাই করতে হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجَرْحِ فِي الصَّيْدِ الخ : এখান থেকে লেখক সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, সাহেবাইন (র.) গর্ভস্থিত বাচ্চাকে বন্যজন্তুর উপর কিয়াস করে বলেছিলেন যে, বন্যজন্তুর মাঝে যেমন অপারগতার কারণে ইযতিরারী জবাইকে ইখতিয়ারী জবাই -এর স্থলাভিষিক্ত করা রয়েছে তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় বাচ্চার জবাইয়ে এ অপারগতার কারণে মায়ের জবাইকে বাচ্চার জবাই ধরে নেওয়া হয়েছে।

এর উত্তরে ইমাম আযম (র.)-এর বক্তব্য হচ্ছে, আপনার এ কিয়াস যথার্থ নয়। কেননা ইযতিরারী বা অনিবার্য জবাইয়ে তো রক্ত প্রবাহিত হয় যদিও তা স্বাভাবিক জবাইয়ের চেয়ে কম। অপারগতার কারণে আংশিক রক্ত বের হওয়াকে সম্পূর্ণ রক্ত বের হওয়ার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে গর্ভস্থিত বাচ্চার তো এক ফোঁটা রক্তও বের হয়নি। আর এটা তো স্পষ্ট যে, মায়ের রক্ত বের হওয়ার দ্বারা বাচ্চার রক্ত বের হয় না। মোটকথা যেহেতু বাচ্চার রক্ত সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক কিছুই বের হয়নি তাই তাকে বন্যজন্তুর উপর কিয়াস করা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا يَدْخُلُ فِى الْبَيْعِ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক তাদের আরেকটি দলিলের জবাব দিচ্ছেন। সাহেবাইন (র.) বলেছিলেন, গর্ভস্থিত বাচ্চা যে মায়ের অংশ তার দলিল হচ্ছে, মায়ের বিক্রির সাথে বাচ্চাও বিক্রি হয়ে যায়।

[ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে] লেখক বলেন, ইতঃপূর্বে আমরা বাচ্চার স্বতন্ত্র জীবন হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করেছি, যা দ্বারা তার মা থেকে ভিন্ন হওয়া প্রমাণ হয়। মায়ের বিক্রির মধ্যে এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে– মায়ের অংশবিশেষ হওয়ার কারণে এমন হয় না; বরং বিক্রয়-চুক্তিকে ফাসিদ হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য মায়ের বিক্রির সাথে একে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেননা যদি বিক্রয়-চুক্তি থেকে বাচ্চাটিকে পৃথক করে দেওয়া হয় তাহলে বিক্রয়-চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যাবে। সুতরাং বিক্রয়-চুক্তি রক্ষা করার জন্য মায়ের সাথে গর্ভস্থিত বাচ্চাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَعْتِقُ بِاِعْتَاقِهَا كَيْلَا الخ : লেখক বলেন, মায়ের সাথে বাচ্চা আজাদ হওয়ার দ্বারাও মায়ের অংশ প্রমাণ হয় না। কারণ মায়ের সাথে আজাদ হওয়ার আদেশ করা হয়েছে, যাতে একজন স্বাধীনা [আজাদ] নারীর গর্ভ থেকে গোলাম শিশু জন্ম না নেয়। যেহেতু সন্তান স্বাধীন বা আজাদ ও গোলাম হওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অনুসরণ করে তাই মায়ের সন্তানের আজাদ হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

লেখক এখানে সাহেবাইন (র.)-এর দলিল– 'সন্তান মায়ের খাদ্য দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে' এর উত্তর দেননি।

এর উত্তর এই যে, আমরা এ কথা মানতে রাজি নই যে, গর্ভস্থিত বাচ্চা মায়ের খাদ্য দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে, বরং এটা তো একটা সাময়িক অবস্থা যার সাহায্যে বাচ্চার শরীর গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ বাচ্চার খাবার আল্লাহ তাঁর অপার কুদরতের সাহায্যে প্রদান করে থাকেন।

লেখক এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে কোনো হাদীস পেশ করেননি, এমনকি সাহেবাইন কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের কোনো জবাবও দেননি।

এ প্রসঙ্গে জনৈক তাবেয়ীর বক্তব্য পাওয়া যায় যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর كِتَابُ الْاٰثَارِ -এ উল্লেখ করেছেন। এখানে তা পেশ করা হলো– قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَا تَكُوْنُ ذَكَاةُ نَفْسٍ ذَكَاةَ نَفْسَيْنِ

'হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.) বলেন, একটি প্রাণের জবাই দু-প্রাণের জন্য যথেষ্ট নয়।' অর্থাৎ মাকে জবাই করার দ্বারা গর্ভস্থিত বাচ্চার জবাই সম্পন্ন হয় না এবং সেই জবাই দ্বারা বাচ্চাকে খাওয়া বৈধ হবে না।

একটি গুরুতর আপত্তি : কেউ কেউ আপত্তি করে বলেন, একজন তাবেয়ীর বক্তব্য দিয়ে কি করে একটি সহীহ হাদীসের মোকাবিলা হতে পারে?

উত্তর : মূলত এ হাদীস দ্বারা ইমাম আ'যম (র.) তাঁর মাযহাবের দলিল পেশ করেননি; বরং তাঁর দলিল কুরআনের আয়াত ও অন্য সহীহ মারফূ' হাদীস।

প্রথম দলিল : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ..... اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জবাই করা ব্যতীত মৃতজন্তু খাওয়া বৈধ নয়। আয়াতটি সব পশুর ব্যাপারে মুতলাক। অর্থাৎ যে কোনো পশু জবাই করা ব্যতীত খাওয়া জায়েজ নয়। প্রত্যেক পশু খাওয়া বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে তা জবাই করা।

দলিলের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, আয়াতের মধ্যে মৃতজন্তু খাওয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের চলমান মাসআলায় গর্ভস্থিত বাচ্চা যেহেতু মৃত অবস্থায় মায়ের পেট থেকে বের হয়েছে তাই তা অন্যান্য মৃতের মতো।

যে কোনো মৃতজন্তু খাওয়া শরিয়তে বৈধ নয় [যা উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে]। অতএব, গর্ভস্থিত বাচ্চা মাকে জবাই করার পর মৃত অবস্থায় বের হলে তা খাওয়াও বৈধ হবে না।

দ্বিতীয় দলিল : রাসূল ﷺ -এর বাণী- إِلَّا أَنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ 'জবাই কেবলমাত্র গলা ও বুকের উপরিভাগের মাঝখানে।'

হাদীসের সারকথা হচ্ছে, জবাই সম্পন্ন হওয়ার জন্য গলা ও বুকের উপরিভাগের মধ্যবর্তী স্থানটি কাটতে হবে। এ অংশ ব্যতীত জবাই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যদি গর্ভস্থিত বাচ্চার ক্ষেত্রে গলা ও বুকের মাঝের অংশ কাটা ব্যতীত জবাই সম্পন্ন হয়ে যায় বলে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে এ হাদীসের সাথে ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ -এর সাথে সংঘর্ষ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) اَلذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ হাদীসটিকে গ্রহণ করেন আর তাঁদের দলিল সংক্রান্ত হাদীসটির একটি ব্যাখ্যা পেশ করেন, যা আমরা একটু পরে উল্লেখ করব।

সাহেবাইন (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর হাদীসের জবাব : اَلْعِنَايَةُ গ্রন্থের মুসান্নিফ (র.) বলেন, তাদের বয়ানকৃত হাদীসটি মূলত দলিলের যোগ্যই নয়। কেননা হাদীসের দ্বিতীয় অংশ- ذَكَاةُ أُمِّهِ -কে দু-ভাবে পড়া হয়-

১. بِالنَّصْبِ অর্থাৎ যবর সহকারে। তাহলে নিঃসন্দেহে হাদীসটির দ্বিতীয় অংশ تَشْبِيْه -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ধরে নেওয়া হবে।

২. بِالرَّفْعِ অর্থাৎ পেশ সহকারে, তাহলে ও হাদীসটির দ্বিতীয় অংশ تَشْبِيْه -এর জন্য ধরা হবে।

হযরত কাকী (র.) বলেন, হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গর্ভস্থিত বাচ্চার জবাইকে তার মায়ের জবাই -এর সাথে তুলনা করা। অর্থাৎ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ كَذَكَاةِ أُمِّهِ 'গর্ভস্থিত বাচ্চার জবাই তার মায়ের জবাইয়ের মতো।'

যেমন কবি বলেন- فَعَيْنَاكَ عَيْنَاهَا وَجِيْدُكَ جِيْدُهَا * لٰكِنَّ عَظْمَ السَّاقِ مِنْكَ دَقِيْقٌ

অর্থাৎ তোমার চোখ তার চোখের মতো ....।

বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি তাশবীহ উদ্দেশ্য না হতো তাহলে হাদীসটি এমন হতো- ذَكَاةُ الْأُمِّ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ 'মায়ের জবাই হচ্ছে গর্ভস্থিত বাচ্চার জবাই।' যেমন বলা হয়- لِسَانُ الْوَزِيْرِ لِسَانُ الْأَمِيْرِ

তাছাড়া যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তারা যে অর্থটি গ্রহণ করেছেন তা নেওয়া যেমন সম্ভব তদ্রূপ আমাদের বর্ণিত অর্থ নেওয়াও সম্ভব, তাহলে হাদীসটি مُشْتَرَكٌ বা একাধিক অর্থবিশিষ্ট সাব্যস্ত হয়। আর একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময় শব্দ বা বাক্য দ্বারা দলিল পেশ করা বৈধ নয়।

হাদীসের দ্বিতীয় জবাব এই যে, হাদীস দ্বারা আমরা মেনে নিলাম মৃত বাচ্চা হালাল হওয়া প্রমাণ হয়। পক্ষান্তরে অন্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা মৃতজন্তু হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। অতএব, আলোচ্য মাসআলায় হালাল ও হারামের মাঝে تَعَارُض [সংঘর্ষ] বিদ্যমান।

এক্ষেত্রে আমাদের ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী হালাল ও হারামের মাঝে বৈরিতা পাওয়া গেলে হারামের تَرْجِيْح [প্রাধান্য] হয়। অতএব, আমরা এখানে হারামের প্রাধান্য দানের ভিত্তিতে গর্ভস্থিত মৃত বাচ্চাকে খাওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করছি।

উল্লেখ্য যে, এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতটি অধিক বিশুদ্ধ এবং তাঁর মতের উপরই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

فَصْلٌ فِيْمَا يَحِلُّ اَكْلُهُ وَمَا لَا يَحِلُّ

অনুচ্ছেদ : যেসব পশু খাওয়া হালাল এবং যেসব পশু খাওয়া হালাল নয়

ভূমিকা : এ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের পশু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যাদের কতগুলো খাওয়া হালাল নয়, আবার কতগুলো খাওয়া হালাল।

পূর্বাপরের সাথে সম্পর্ক : লেখক প্রথমে ذَكَاةٌ [জবাই] সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ পর্যায়ে তিনি مَاكُوْلَاتٌ বা খাওয়ার উপযুক্ত বিভিন্ন পশু সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেছেন। কেননা জবাই বৈধকরণের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে খাওয়ার উপযোগী করা। প্রথমে তিনি জবাই এর আলোচনা করেছেন। কেননা জবাই হচ্ছে খাওয়ার উপযুক্ত পশু তথা مَاكُوْل -এর জন্য شَرْط আর শর্ত তার مَشْرُوْط -এর আগে আসে।

সমালোচনা : আতরাসী (র.) বলেন, বক্ষ্যমাণ অনুচ্ছেদের মাসআলাগুলো كِتَابُ الصَّيْدِ তথা শিকার অধ্যায়ে উল্লেখ করা সমীচীন ছিল। কেননা তিনি এ অনুচ্ছেদে যা উল্লেখ করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা ব্যতীত সবই শিকার -এর অন্তর্ভুক্ত।

জবাব : লেখক এ অনুচ্ছেদে যা উল্লেখ করেছেন সবই শিকার সংক্রান্ত নয়; বরং লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে যা খাওয়ার উপযুক্ত এবং যা খাওয়ার উপযুক্ত নয় তা বর্ণনা করা, এদের প্রত্যেকটির মাঝে জবাই আবশ্যক। প্রথম প্রকারের মধ্যে জবাই করার প্রয়োজন সেই জন্তু হালাল করার জন্য আর দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে জবাই করা হয় সেই জন্তুর গোশ্‌ত ও চামড়া পাক করার জন্য। সুতরাং বলা যায় এ বিষয়টিকে ذَبَائِحُ অধ্যায়ে সংযোজন করা যথাযথ হয়েছে।

قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ اَكْلُ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُوْرِ لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُوْرِ وَكُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَقَوْلُهُ مِنَ السِّبَاعِ ذَكَرَ عَقِيْبَ النَّوْعَيْنِ فَلْيَنْصَرِفْ اِلَيْهِمَا فَيَتَنَاوَلُ سِبَاعَ الطُّيُوْرِ وَالْبَهَائِمِ لَاكُلَّ مَالَهُ مِخْلَبٌ اَوْ نَابٌ وَالسَّبُعُ كُلُّ مُخْتَطِفٍ مُنْتَهِبٍ جَارِحٍ قَاتِلٍ عَادٍ عَادَةً.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী ও থাবাবিশিষ্ট হিংস্র পাখি খাওয়া জায়েজ নেই। কেননা রাসূল ﷺ থাবাবিশিষ্ট প্রত্যেক পাখি এবং দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী খেতে নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ এ হাদীসে مِنَ السِّبَاعِ শব্দটিকে উভয় প্রকার [পাখি ও জন্তু]-এর পরে উল্লেখ করেছেন। অতএব, উভয়ের সাথে এর সম্পর্ক হবে। সুতরাং হাদীস পাখি ও চতুষ্পদ জন্তুর শ্রেণিভুক্ত সব হিংস্র প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করবে– যে কোনো ধরনের থাবা ও দাঁতবিশিষ্ট প্রাণী বা পাখিকেই শামিল করবে না। হিংস্র প্রাণী [سِبَاعٌ] বলা হয় যা স্বভাবত থাবা মারে, ছিনিয়ে নেয়, আহত করে, হত্যা করে এবং আক্রমণ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ اَكْلُ ذِىْ نَابٍ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে কোন ধরনের প্রাণী খাওয়া নাজায়েজ সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখক ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) উল্লেখ করেন যে, দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং থাবা বা পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি খাওয়া হালাল নয়।

দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন প্রাণী যারা আক্রমণের সময় তাদের দাঁত আক্রান্তের উপর বসিয়ে দেয়।

ইমাম কারখী (র.) তাঁর মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, হিংস্র দাঁতবিশিষ্ট প্রাণী হচ্ছে সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, হায়েনা, শিয়াল ও বনবিড়াল ইত্যাদি।

থাবা বা পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি যেমন বাজপাখি, ঈগল, শকুন, সাদা-কালো রঙবিশিষ্ট কাক ও মৃতভোগী কালো কাক ইত্যাদি।

মোটকথা দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু এবং থাবাবিশিষ্ট হিংস্র পাখি খাওয়া নাজায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র) অনুরূপ মত পোষণ করেন।

ইমাম মালেক (র.)-এর কতিপয় অনুসারী ও ইমাম শা'বী (র.)-এর মতে, দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশু খাওয়া জায়েজ। তাঁরা কুরআনের আয়াত– قُلْ لَّا اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا দ্বারা দলিল পেশ করেন।

ইমাম মালেক (র.), ইমাম লাইছ (র.) ও ইমাম আওযায়ী (র.) প্রমুখের মতে, কোনো পাখি খাওয়া হারাম নয়।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবুদ্ দারদা (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ মত পোষণ করতেন।

জমহুর ওলামায়ে কেরামের দলিল : কিতাবে উল্লিখিত হাদীসটি সনদসহ এরূপ–

اَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِى الصَّيْدِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী ও পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।

ইবনে কাত্তান (র.) হাদীসটির উপর আপত্তি করে বলেন, হাদীসের রাবী মায়মূন হাদীসটি সরাসরি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে শুনেননি; বরং তিনি শুনেছেন সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, আর সাঈদ (র.) শুনেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে। আবূ দাঊদ শরীফে হাদীসটির সনদ এরূপই আছে–

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। হাদীসটি এই–

حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ اَخْرَجَهُ اَبُو دَاوُدَ فِي الْاَطْعِمَةِ عَنْهُ مَرْفُوعًا : وَحَرَامٌ عَلَيْكُمُ الْحُمُرُ الْاَهْلِيَّةُ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ـ

এ সংক্রান্ত আরেকটি হাদীস হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। হাদীসটি হচ্ছে–

فِي مُسْنَدِ اَحْمَدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ـ

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত হাদীসগুলোর বক্তব্য প্রায় একই। হাদীসগুলো মুসলিম শরীফ, আবূ দাঊদ শরীফ ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রথমাংশ সিহাহ সিত্তার সবগুলো কিতাবে বর্ণিত আছে। যেমন–

عَنْ اَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ـ

রাসূল ﷺ দাঁতবিশিষ্ট জন্তু খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সবকটি গ্রন্থে রয়েছে।

আর শুধুমাত্র মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে নিম্নোক্ত হাদীসটি–

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَاَكْلُهُ حَرَامٌ ـ

قَوْلُهُ مِنَ السِّبَاعِ : হিদায়ার সম্মানিত লেখক ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) ذِي نَابٍ ও ذِي مِخْلَبٍ উভয় প্রকারের পর اَلسِّبَاعُ বা হিংস্র প্রাণী হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয় যে, শুধুমাত্র দাঁতবিশিষ্ট কিংবা থাবাবিশিষ্ট হলেই সেই প্রাণী খাওয়ার অনুপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে না; বরং সেই পশু ও পাখি হিংস্র প্রকৃতির হতে হবে।

যেমন আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, পাখির মধ্যে কবুতরের থাবা আছে; কিন্তু কবুতর হিংস্র নয় তাই কবুতর খাওয়া বৈধ। তদ্রূপ উট দাঁতবিশিষ্ট; কিন্তু উট নিরীহ প্রাণী তাই উট খাওয়া বৈধ।

قَوْلُهُ وَالسَّبُعُ كُلُّ مُخْتَطِفٍ مُنْتَهِبٍ جَارِحٍ قَاتِلٍ الخ : লেখক এ ইবারত দ্বারা হিংস্র প্রাণীর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, হিংস্র প্রাণীর মাঝে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে– ১. থাবা মারে – এটা পাখিদের বৈশিষ্ট্য। ২. ছিনিয়ে নেয়। ৩. আক্রমণ করে আহত করে। ৪. নিহত বা হত্যা করে ৫. আক্রমণ করে। আর এ কাজগুলো হিংস্র প্রাণী বা পাখিরা স্বভাববশত করে থাকে।

সুতরাং যদি কোনো হিংস্র প্রাণী তার স্বাভাবিক স্বভাব ছেড়ে এমন হয়ে যায় যে, কাউকে আক্রমণ করে না, আহত বা নিহত করে না তাহলে সেই হিংস্র পশুটি তখন আর হিংস্র পশুরূপে সাব্যস্ত হবে না।

وَمَعْنَى التَّحْرِيْمِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ كَرَامَةُ بَنِىْ اٰدَمَ كَيْلَا يَعْدُ وَشَئٌ مِنْ هٰذِهِ الْاَوْصَافِ الذَّمِيْمَةِ اِلَيْهِمْ بِالْاَكْلِ وَيَدْخُلُ فِيْهِ الضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ فَيَكُوْنُ الْحَدِيْثُ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيِّ (رح) فِىْ اِبَاحَتِهِمَا وَالْفِيْلُ ذُوْ نَابٍ فَيُكْرَهُ وَالْيَرْبُوْعُ وَابْنُ عُرْسٍ مِنَ السِّبَاعِ الْهَوَامِ وَكَرِهُوْا اَكْلَ الرَّخَمِ وَالْبُغَاثِ لِاَنَّهُمَا يَاْكُلَانِ الْجِيْفَ .

অনুবাদ : এসব প্রাণী হারাম হওয়ার [প্রকৃত কারণ] আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন, [তবে বাহ্যিক] কারণ মানুষেরই প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যাতে তাদের এই নিকৃষ্ট দোষাবলি মানুষের মাঝে সেগুলো খাওয়ার মাধ্যমে সংক্রমিত না হয়। হিংস্য প্রাণীর মধ্যে হায়েনা [গণ্ডার] ও খেঁকশিয়ালও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। কারণ তিনি এ দুটি খাওয়া বৈধ বলেন। হাতি দাঁতবিশিষ্ট, অতএব, তা খাওয়া মাকরূহ। জংলী ইঁদুর ও বেজি হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত, এগুলো ভূমির অভ্যন্তরে বাস করে [এগুলো খাওয়াও হারাম।] মানুষখেকো পাখি ও শকুনি খাওয়াকে ফকীহগণ মাকরূহ বলেছেন। কেননা এগুলো মৃত-লাশ খায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَعْنَى التَّحْرِيْمِ الخ : প্রথমে হেদায়ার মুসান্নিফ শায়খ বুরহানুদ্দীন দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশু ও থাবাবিশিষ্ট হিংস্র পাখি খাওয়া হারাম হওয়ার কারণ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, হারাম হওয়ার প্রকৃত কারণ তো আল্লাহ তা'আলা জানেন। তবে আমরা মনে করি, সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য এটি জরুরি বিষয়। কারণ মানুষকে যদি এসব প্রাণী ভক্ষণ করার অনুমতি প্রদান করা হতো তাহলে এসব হিংস্র প্রাণীর বুনো স্বভাব মানুষের মাঝে সংক্রমিত হতো।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক জিনিসের মাঝে আল্লাহ কিছু বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছেন, মানুষ যখন সেই বস্তু বা পশু খায় তখন তার মাঝে সেই বস্তু বা জীবের প্রভাব সংক্রমিত হয়। এজন্যই হাদীসে পাকে ইরশাদ করা হয়েছে– لَا يُرْضِعُ لَكُمُ الْحَمْقٰى فَاِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِىْ তোমাদের যেন কোনো নির্বোধ মহিলা দুধ পান না করায়। কেননা দুধের সাহায্যে [স্বভাব-প্রকৃতি] সংক্রমিত হয়।

قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِيْهِ الضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ : লেখক বলেন, হারাম ও নিষিদ্ধ প্রাণীদের মাঝে হায়েনা [অন্য মতে গণ্ডার] ও খেকশিয়াল অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ দুটি প্রাণী হিংস্র পশুর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এ দুটি পশুর ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এগুলো খাওয়া হালাল ও মুবাহ।

হেদায়ার লেখক বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতটির বিপক্ষে আমাদের পূর্ববর্ণিত (نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) হাদীসটি দলিল।

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) মনে করেন হায়েনা খাওয়া মুবাহ।

আর ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে খেঁকশিয়াল খাওয়া মুবাহ।

তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অধিকাংশ বর্ণনামতে খেঁকশিয়াল খাওয়া হারাম; ইমাম মালেক (র.)-এর মতও তাই।

ضَبُعٌ বা হায়েনার ব্যাপারে তিন ইমামের দলিল :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) عَنِ الضَّبُعِ اَصَيْدٌ هِىَ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَنْتَ سَاَلْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ ـ

এ হাদীসের দ্বারা এতটুকু প্রমাণ হয় যে, ضَبُع বা হায়েনা হচ্ছে صَيْد বা শিকার। আর তাদের মতে صَيْد দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَاْكُوْل অর্থাৎ যা খাওয়ার যোগ্য।

তাদের সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূলবিরোধ কুরআনের আয়াত يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ -এর তাফসীর নিয়ে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শিকার দ্বারা উদ্দেশ্য এমন সব জন্তু যা খাওয়ার উপযুক্ত। এজন্যই তিনি বলেন, যদি কোনো মুহরিম ব্যক্তি হিংস্র প্রাণী ইত্যাদি যা খাওয়া যায় না তাকে হত্যা করে তাহলে তার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না।

পক্ষান্তরে আহনাফের মতে হিংস্র প্রাণী বা যা খাওয়ার উপযুক্ত নয় এমন প্রাণী হত্যা করা হলেও জাযা প্রদান করতে হবে। কেননা আহনাফের মতে صَيْد [শিকার] বলা হয় যা জন্মগতভাবে বন্য ও মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকার চেষ্টা করে। এই অর্থের ভিত্তিতে হায়েনাকে শিকার বলা চলে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে থেকে এখানে বলা হয় যে, হযরত জাবির (রা.) হায়েনা খাওয়ার বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটি খাওয়া নিশ্চিতভাবে অবৈধ হলে তো তিনি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন না।

উত্তর : হযরত জাবির (রা.)-এর বক্তব্য দ্বারা তো আহনাফের মতই যুক্তিযুক্ত হয়। কেননা তিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছেন اَصَيْدٌ هِىَ؟ এটা কি শিকার? রাসূল ﷺ বলেছেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেছেন– এটা কি খাওয়া যাবে? রাসূল ﷺ বলেছেন, হ্যাঁ।

এ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, صَيْد বা শিকার মানেই খাওয়ার উপযুক্ত নয়, যদি তাই হতো তাহলে হযরত জাবির (রা.) রাসূল ﷺ -কে এটি খাওয়া সম্পর্কে পুনরায় প্রশ্ন করতেন না।

এখানে একটি আপত্তি দেখা দেয় এভাবে যে, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে কাবীরে صَيْد শব্দের অর্থ مَاْكُوْل বলে উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর মতের সপক্ষে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন–

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا.

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমুদ্রের صَيْد সর্বদা এবং স্থলভাগের صَيْد ইহরাম ছাড়া অন্য অবস্থায় খাওয়া জায়েজ। যেহেতু স্থলভাগ ও সমুদ্রে এমন প্রাণীও আছে যা খাওয়া নিশ্চিতভাবে হারাম সেহেতু আয়াতে صَيْد দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খাওয়ার উপযুক্ত প্রাণী।

ইমাম রাযী (র.)-এর দলিলের জবাবে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন, আয়াতের মধ্যে صَيْد শব্দটির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, اِصْطِيَادٌ বা শিকার করা। আর اِضَافَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য فِىْ। সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ এই হবে–

اُحِلَّ لَكُمُ الْاِصْطِيَادُ فِى الْبَحْرِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْاِصْطِيَادُ فِى الْبَرِّ

'তোমাদের জন্য সমুদ্রে শিকার হালাল করা হয়েছে। আর স্থলভাগে শিকার হারাম করা হয়েছে।'

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) মাছ খাওয়া সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছেন– صَيْد দ্বারা উদ্দেশ্য اِصْطِيَادٌ বা শিকার করা।

হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীসের জবাব : হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। তাঁর বর্ণিত হাদীসটি পবিত্র কুরআনের আয়াত وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [তাদের উপর নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ হারাম করা হয়েছে] দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অথবা হযরত জাবির (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি আমাদের বর্ণিত সহীহ মাশহুর হাদীসের বিপরীত। তাঁর হাদীসটি আমাদের বর্ণিত হাদীসের সমকক্ষ নয়।

তাছাড়া আমাদের বর্ণিত হাদীসটি অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত। আর এ হাদীসটি কেবল হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত।

قَوْلُهُ وَالْفِيلُ ذُو نَابٍ فَيُكْرَهُ : হাতি দাঁতবিশিষ্ট। হাতির মাঝে হিংস্র প্রাণীর যাবতীয় গুণাবলি বিদ্যমান, তবে হাতি অন্য প্রাণী বধ করে সেই প্রাণীর গোশত খায় না। যেহেতু হাতির মাঝে হিংস্র হওয়ার বৈশিষ্ট্যাবলি রয়েছে; কিন্তু অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর মতো আক্রমণ করে না ও ছিড়ে খায় না তাই ওলামায়ে কেরাম হাতি খাওয়া মাকরূহ বলেছেন।

বিনায়া গ্রন্থের লেখকের মতে মাকরূহ দ্বারা এখানে মাকরূহ তাহরীমী উদ্দেশ্য, এটাই অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

قَوْلُهُ وَالْيَرْبُوعُ وَابْنُ عُرْسٍ الخ : লেখক বলেন, জংলী ইঁদুর ও বেজি হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী জংলী ইঁদুর খাওয়া মুবাহ। কেননা এব্যাপারে মূলনীতি হলো মুবাহ হওয়া, তাছাড়া এটি হারাম হওয়ার পক্ষে কেউ কোনো রেওয়ায়েত পেশ করেননি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, বেজি খাওয়া মুবাহ। কেননা এর গুই সাপের মতো দাঁত নেই।

আহনাফের মতে, এগুলো সরীসৃপ জাতীয় হিংস্র প্রাণী। সুতরাং এ সংক্রান্ত হাদীসের আওতায় এটি নিষিদ্ধ হবে। তাছাড়া এগুলো খাওয়া হারাম নয়, তবে মাকরূহ।

قَوْلُهُ كَرِهُوا أَكْلَ الرَّخَمِ الخ : লেখক বলেন, ফিকহশাস্ত্রবিদগণের মতে মানুষখেকো পাখি (رَخَمٌ) ও শকুন খাওয়া মাকরূহ। رَخَمٌ শব্দটি رَخَمَةٌ -এর বহুবচন। আবূ হাতেম সিজিস্তানী أَسْمَاءُ الطَّيْرِ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, رَخَمَةٌ হচ্ছে নাপাক [ও মৃত ভক্ষণকারী] পাখিবিশেষ, এগুলো শিকারি হয় না। এর গায়ের রঙ সাদা। এর অপর নাম أَنُوقٌ; আরবি প্রবাদে বলা হয়– أَبْعَدُ مِنْ بَيْضِ الْأَنُوقِ

اَلْبُغَاثُ হচ্ছে মেটে রঙের পাখি। এটি শিকার করে না। অভিধানশাস্ত্রের ইমাম আসমাঈ (র.) বলেন, আরবি প্রবাদে এটি একটি নিকৃষ্ট পাখি। দেখতে অনেকটা বাজপাখির মতো। অহংকারী নিকৃষ্ট লোকদের ক্ষেত্রে এটিকে ব্যবহার করা হয়। এটিও মৃত জন্তু ভক্ষণ করে। আমাদের দেশীয় ভাষায় একে শকুন / শকুনি বলা হয়।

بُغَاثٌ সম্পর্কে একটি প্রবাদ এরূপ– إِنَّ الْبُغَاثَ بِأَرْضِنَا يَسْتَنْسِرُ মোটকথা যেহেতু শকুনি ও বুগাছ মৃতজন্তু ভক্ষণ করে তাই এগুলো কুরআন শরীফে বর্ণিত خَبَائِثُ -এর অন্তর্ভুক্ত। ফকীহগণের মতে এগুলো খাওয়া মাকরূহে তাহরীমী।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِغُرَابِ الزَّرْعِ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ الْحَبَّ وَلَا يَأْكُلُ الْجِيفَ وَلَيْسَ مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ قَالَ : وَلَا يُؤْكَلُ الْأَبْقَعُ الَّذِي يَأْكُلُ الْجِيفَ وَكَذَا الْغُدَافُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্ষেতের কাক খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এটি শস্যদানা খায়, নাপাক-মৃত জন্তু খায় না এবং এগুলো হিংস্র পাখির অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আবকা অর্থাৎ সাদা-কালো মিশ্র রঙের কাক, যা সাধারণত মৃত জন্তু খায় তা খাওয়া বৈধ নয়। তদ্রূপ গিদাফ খাওয়ার হুকুম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِغُرَابِ الزَّرْعِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্ষেতের কাক অর্থাৎ কাকের চেয়ে আকারে ছোট সাদা রঙের এক প্রকারের কাক যা কেবলই শস্যদানা ভক্ষণ করে তা খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

এসব কাক নাপাক-মৃতজন্তু খায় না এবং এদের আচরণের মধ্যে হিংস্রতার কোনো আলামত থাকে না তাই এগুলোর মধ্যে হারাম বা মাকরূহে তাহরীমি হওয়ার কোনো কিছু নেই।

উল্লেখ্য যে, মৃতজন্তু বা নাপাক ভক্ষণ করলে এটি خَبَائِثْ -এর অন্তর্ভুক্ত হতো, যা কুরআনের ভাষায় হারাম। যেমন বলা হয়েছে- يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

আর যদি এটি হিংস্র প্রাণীভুক্ত হতো তাহলে তা পূর্বে উল্লিখিত হাদীসের দ্বারা মাকরূহ সাব্যস্ত হতো।

প্রকাশ থাকে যে, কাক মোট তিন ধরনের।

ক. যে কাক শুধু শস্য খায়, এটি খাওয়া কারো মতে মাকরূহ নয়।

খ. যে কাক শুধুমাত্র মৃত ও নাপাক খায়, তা খাওয়া মাকরূহ।

গ. যে কাক শস্য ও নাপাক উভয়ই খায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা খাওয়া মাকরূহ নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে খাওয়া মাকরূহ।

জ্ঞাতব্য : হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (র.) -এর উপর বিদআতপন্থিরা যে সব আপত্তি করেছিল তাদের মধ্যে এও ছিল যে, তিনি কাক খাওয়া হালাল হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন।

মূলত তিনি শস্যভোগী কাক খাওয়া বৈধ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছিলেন, যা ফকীহগণের মতে বৈধ। তার সমালোচনাকারীরা এটিকে সাধারণ নাপাকভোগী কাকের ব্যাপারে ধরে নিয়ে তার উপর সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছিল।

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يُؤْكَلُ الْأَبْقَعُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাদা-কালো মিশ্র রঙের কাক খাওয়া নাজায়েজ। এ কাক আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায় না, এ কাকগুলোর ঘাড় তুলনামূলকভাবে পায়ের রঙ থেকে উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

এসব কাক খাওয়া নাজায়েজ হওয়ার কারণ হচ্ছে এ সব কাক নাপাক খাওয়াতে অভ্যস্ত।

তদ্রূপ غُدَافْ গিদাফ নামীয় এক ধরনের কাক- যা তীব্র গরমের সময় দেখা যায়। ইবনে ফারিমের মতানুযায়ী এর পা খুব মোটা ও লম্বা হয়ে থাকে। যেহেতু গিদাফ আবকা' -এর মতো নাপাক ভক্ষণে অভ্যস্ত তাই এটি খাওয়াও মাকরূহ।

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لَا بَأْسَ بِاَكْلِ الْعَقْعَقِ لِاَنَّهُ يَخْلِطُ فَاَشْبَهَ الدَّجَاجَةَ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ يَكْرَهُ لِاَنَّ غَالِبَ اَكْلِهِ الْجِيْفَ قَالَ : وَيَكْرَهُ اَكْلَ الضَّبُعِ وَالضَّبِّ وَالسُّلَحْفَاةِ وَالزُّنْبُوْرِ وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا اَمَّا الضَّبُعُ فَلِمَا ذَكَرْنَا وَاَمَّا الضَّبُّ فَلِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَائِشَةَ (رضـ) حِيْنَ سَأَلَتْهُ عَنْ اَكْلِهِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (رحـ) فِيْ اِبَاحَتِهِ وَالزُّنْبُوْرُ مِنَ الْمُؤْذِيَاتِ وَالسُّلَحْفَاةُ مِنْ خَبَائِثِ الْحَشَرَاتِ وَلِهٰذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ وَاِنَّمَا تَكْرَهُ الْحَشَرَاتُ كُلُّهَا اِسْتِدْلَالًا بِالضَّبِّ لِاَنَّهُ مِنْهَا ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আক'আক (عَقْعَقْ) খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এগুলো পাক ও নাপাক উভয় প্রকার খাদ্য খায়। ফলে এটি মুরগির মতো হয়ে গেল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটি খাওয়া মাকরূহ; কেননা এটি অধিকাংশ সময় অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হায়েনা, গুইসাপ, কচ্ছপ, ভিমরুল ও যাবতীয় কীট খাওয়া মাকরূহ। হায়েনার আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। হায়েনা -এর [মাকরূহ হওয়ার] দলিল এই যে, রাসূল ﷺ-কে হযরত আয়েশা (রা.) তা খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাকে নিষেধ করেন। এটিকে মুবাহ মনে করার ব্যাপারে হাদীসটি তার বিপক্ষে দলিল। ভীমরুল হচ্ছে ক্ষতিকারক প্রাণী, আর কচ্ছপ নিকৃষ্ট কীট। এজন্যই এটিকে মেরে ফেললে মুহরিমের উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না। সব ধরনের কীট খাওয়া মাকরূহ দলিল গ্রহণ করা হয়ে থাকে গুইসাপের [মাকরূহ হওয়া] থেকে। কেননা গুইসাপ কীটের অর্ন্তগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لَا بَأْسَ بِاَكْلِ الْعَقْعَقِ الخ : আলোচ্য ইবারতে আরো কয়েক প্রকার জন্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যা খাওয়া শরিয়তসিদ্ধ নয়। প্রথমে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উদ্ধৃতি নকল করে বলা হয়েছে তিনি বলেন, আক'আক খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে যে, এটি মুরগির মতো পাক-নাপাক সব খায়।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, এটি মুরগির মতো নয়। কারণ এটি বেশিরভাগ সময় নাপাক ভক্ষণ করে। অর্থাৎ পবিত্র খাদ্যের থেকে অপবিত্র খাদ্য বেশি গ্রহণ করে বিধায় এটি খাওয়া মাকরূহ।

আক'আক এর পরিচয় :

আল্লামা তাহতাবী (র.) عَقْعَقْ -কে جَعْفَرْ -এর উচ্চারণে বলা হবে বলে উল্লেখ করেন। এর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, এটি কবুতরের সমান কাকের আকৃতি বিশিষ্ট লম্বা লেজ বিশিষ্ট এক ধরনের পাখি। এর গায়ের রঙ সাদা-কালো মিশ্রিত।

বিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ কামূস– এ উল্লেখ করা হয় যে, عَقْعَقْ শব্দটি قَنْفَزْ -এর উচ্চারণে পঠিত হবে। উর্দুতে একে মুহুবা বলা হয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হায়েনা, গুইসাপ, কচ্ছপ, ভীমরুল ও কীট খাওয়া মাকরূহ। ضَبُع বা হায়েনা/গণ্ডার খাওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। اَلضَّبُّ বলা হয় গুইসাপকে। গুইসাপ খাওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন,

এটা খাওয়া মুবাহ বৈধ। আহনাফের মতে গুইসাপ খাওয়া মাকরূহে তাহরিমী। মাকরূহ হওয়ার দলিল হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস। হাদীসটি সনদসহ নিম্নরূপ–

رَوٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُهْدِىَ لَهُ ضَبٌّ فَلَمْ يَاْكُلْ فَسَاَلَتْهُ عَنْ اَكْلِهِ فَنَهَاهَا عَنْ اَكْلِهِ فَجَاءَ سَائِلٌ عَلَى الْبَابِ فَاَرَادَتْ عَائِشَةُ اَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ ﷺ تُعْطِيْهِ مَا لَا تَاْكُلِيْنَهُ ؟

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -এর কাছে একবার একটি গুইসাপ হাদিয়া আসে। রাসূল ﷺ সেটি না খাওয়াতে হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺ -কে এর খাওয়ার বিধান জিজ্ঞাসা করেন। রাসূল ﷺ তাকে তা খেতে বারণ করেন। এরপর একজন ভিক্ষুক দরজায় আসলে হযরত আয়েশা (রা.) তাকে সেটি দেওয়ার ইচ্ছা করেন। এটা দেখে রাসূল ﷺ তাকে বলেন, তুমি যেটা খাওনি তা কি আরেক জনকে খাওয়ার জন্য দেবে?

রাসূল ﷺ কর্তৃক এ নিষেধাজ্ঞা হারাম হওয়ার প্রতি দিকনির্দেশ করে। এ হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে দলিল। উল্লেখ্য যে, এ মাসআলায় ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে রয়েছেন। এমনকি ইমাম ত্বাহাবী (র.) তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ শরহে মা'আনী আল আছার-এ গুইসাপ খাওয়ার বৈধ হওয়ার দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি সেখানে বলেন– لَا بَأْسَ بِاَكْلِ الضَّبِّ অর্থাৎ 'গুইসাপ খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।' তিনি আরো বলেন, এটা আমাদের [আহনাফের] মাযহাব।

আইম্মায়ে ছালাছা -এর দলিল বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস–

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ وَهِىَ خَالَتُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوْذًا فَاَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ اِلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ فِى النِّسْوَةِ الْحُضُوْرِ وَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَدْ مَنَّ لَهُ فَقُلْنَ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ اَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِىْ فَاَجِدُنِىْ اَعَافُهُ فَاَجْتَرَرْتُهُ فَاَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ اِلَىَّ فَلَمْ يَنْهَهُ.

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাসূল ﷺ স্বভাবগত কারণে গুইসাপের গোশত খাননি। কিন্তু পরক্ষণেই যখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ খেলেন তাকে বাধাও দেননি। যদি এটা খাওয়া মাকরূহে তাহরীমি বা হারাম হতো তাহলে রাসূল ﷺ হযরত খালিদকে খেতে নিষেধ করতেন।

এ হাদীসের জবাবে আহনাফ বলেন, এ হাদীস দ্বারা গুইসাপ খাওয়ার বৈধতা প্রমাণ হয়। আর হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা হারাম প্রমাণিত হয়। কোন হাদীস কবেকার -কোন তারিখের তা জানা যায়নি। অতএব, হারাম প্রমাণকারী হাদীসকে বিলম্বিত ধরে নেওয়া সমীচীন।

তাছাড়া আমাদের মাযহাবের একটি মূলনীতি এই যে, হালাল ও হারামের মাঝে সংঘর্ষ হলে হারামের তারজীহ হয় সে হিসেবেও হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস আমলযোগ্য।

زُنْبُوْرٌ বা ভীমরুলের ব্যাপারে হুকুম হচ্ছে– এটা কষ্টদানকারী কীট। এ কারণে এটা খাওয়া মাকরূহ সাব্যস্ত হবে। আর سُلَحْفَاةٌ বা কচ্ছপ হচ্ছে নিকৃষ্ট কীট। চার ইমামের মতে কচ্ছপ খাওয়া মাকরূহে তাহরীমি। দাউদ জাহেরী (র.)-এর মতে কচ্ছপ খাওয়া হালাল।

ইবনুল জুল্লাবের মতে কাকরা, কচ্ছপ ও ব্যাঙ খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম মালেক (র.) থেকেও অনুরূপ একটি অভিমত পাওয়া যায়।

তবে দ্বিমত পোষণকারী এসব আলেমের মত গ্রহণযোগ্য নয়। এদের বিপক্ষে দলিল সামনে আলোচিত হবে।

হেদায়ার মুসান্নিফ কচ্ছপ খাওয়া মাকরূহ হওয়ার পক্ষে আরেকটি দলিল এই দেন যে, ভীমরুল কষ্টদায়ক প্রাণী এবং কচ্ছপ কীটের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে সেটা হত্যা করলে মুহরিমের জরিমানা দিতে হয় না। যদি এগুলো এরূপ না হতো তাহলে এগুলোকে হত্যা করলে মুহরিমের উপর জরিমানা-ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক হতো।

কীট ও মাটিতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ খাওয়া মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল হচ্ছে এগুলো গুইসাপের অনুরূপ। অর্থাৎ গুইসাপ খাওয়া যে দলিলের ভিত্তিতে মাকরূহ একই দলিলের ভিত্তি অন্যান্য কীট খাওয়াও মাকরূহ। সর্বোপরি এগুলো خَبَائِثُ নিকৃষ্ট জীবসমূহের অন্তর্গত। আর خَبَائِثُ খাওয়া হারাম। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারীমের নির্দেশ হচ্ছে يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের উপর নিকৃষ্ট প্রাণীকে হারাম করেছেন।

قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ اَكْلُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَالْبِغَالِ لِمَا رَوٰى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَهْدَرَ الْمُتْعَةَ وَحَرَّمَ لُحُوْمَ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ : وَيَكْرَهُ لَحْمُ الْفَرَسِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِىُّ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ وَلَا بَاْسَ بِاَكْلِهٖ لِحَدِيْثِ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَاَذِنَ فِىْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গৃহপালিত গাধা এবং খচ্চর খাওয়া জায়েজ নেই। কারণ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। আর হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ খায়বর যুদ্ধকালে 'মুতা' বিবাহকে বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) আরো বলেন, আর ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়া মাকরূহ। এটা ইমাম মালেক (র.)-এরও অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেন– نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَاَذِنَ فِىْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ অর্থাৎ, রাসূল ﷺ খায়বর যুদ্ধকালে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন আর ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَلَا يَجُوْزُ اَكْلُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ الخ : আলোচ্য ইবারতে গাধা, ঘোড়া ও খচ্চরের গোশতের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে গাধা ও খচ্চর সম্পর্কে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত নকল করেন, তিনি বলেন, গৃহপালিত গাধা ও খচ্চর -এর গোশত খাওয়া নাজায়েজ।

এ নাজায়েজ হওয়ার দলিল হচ্ছে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস। সনদসহ হাদীসটি এরূপ–

اَخْرَجَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِىْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِىْ كَرِبَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ جَدِّهٖ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ . (هٰذَا لَفْظُ ابْنِ مَاجَةَ)

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা খেতে নিষেধ করেছেন।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে দ্বিতীয় যে হাদীসটি পেশ করেন তা হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। লেখকের উদ্ধৃত হাদীসটি এরূপ– عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَهْدَرَ الْمُتْعَةَ وَحَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ . রাসূল ﷺ খায়বর যুদ্ধকালে মুতা বিবাহকে বাতিল করেন এবং গৃহপালিত গাধার গোশতকে হারাম করেন।

এ হাদীসটি ভিন্ন শব্দে বুখারী ও মুসলিমে এরূপ বর্ণিত আছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ اِبْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ .

মোটকথা উপরিউক্ত হাদীসগুলোর সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে গাধা ও খচ্চর খাওয়ার অবৈধতা প্রমাণ হয়। এরপর ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারত নকল করে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়া মাকরূহ। ইমাম মালেক (র.)ও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম আহমদ ইবনে হান্বল (র.) ও একই মত পোষণ করেন।

সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল :

حَدِيْثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَاَذِنَ فِىْ لُحُومِ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ . রাসূল ﷺ অর্থাৎ, খায়বর যুদ্ধকালে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) "খায়বর যুদ্ধ" এবং "যাবাইহ" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম মুসলিম (র.) ذَبَائِح অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

উল্লিখিত হাদীসটি মুসলিমে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ, তবে বুখারীতে اَذِنَ -এর স্থানে رَخَّصَ শব্দটি রয়েছে।

মোটকথা হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেছে এবং হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত।

لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِيْنَةً خَرَجَ مَخْرَجَ الْإِمْتِنَانِ وَالْأَكْلُ مِنْ أَعْلٰى مَنَافِعِهَا وَالْحَكِيْمُ لَا يَتْرُكُ الْإِمْتِنَانَ بِأَعْلَى النِّعَمِ وَيَمْتَنُّ بِأَدْنَاهَا وَلِأَنَّهُ اٰلَةُ إِرْهَابِ الْعَدُوِّ فَيُكْرَهُ أَكْلُهُ إِحْتِرَامًا لَهُ وَلِهٰذَا يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ فِي الْغَنِيْمَةِ وَلِأَنَّ فِيْ إِبَاحَتِهِ تَقْلِيْلُ اٰلَةِ الْجِهَادِ وَحَدِيْثُ جَابِرٍ مُعَارِضٌ بِحَدِيْثِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَالتَّرْجِيْحُ لِلْمُحَرِّمِ ثُمَّ قِيْلَ الْكَرَاهَةُ عِنْدَهُ كَرَاهَةُ تَحْرِيْمٍ وَقِيْلَ كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَمَّا لَبَنُهُ فَقَدْ قِيْلَ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْ شُرْبِهِ تَقْلِيْلُ اٰلَةِ الْجِهَادِ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী– وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِيْنَةً الخ 'আর তোমাদের আরোহণের জন্য এবং সৌন্দর্যের জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন।' এ আয়াতটি অনুগ্রহ বর্ণনার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর খাওয়া হচ্ছে এর সর্বোত্তম উপকার। মহাজ্ঞানী প্রভু সর্বোত্তম নিয়ামত বাদ দিয়ে এর চেয়ে নিচু স্তরের নিয়ামত বর্ণনা করবেন না। তাছাড়া ঘোড়া শত্রুকে সন্ত্রস্ত করার মাধ্যম, অতএব এটি খাওয়া মাকরূহ হবে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। এজন্যই ঘোড়ার জন্য গনিমতের অংশ সাব্যস্ত করা হয়। অধিকন্তু এর খাওয়া বৈধ করাতে জিহাদের অস্ত্র কমিয়ে ফেলা হবে। আর হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীস খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। [এক্ষেত্রে] প্রাধান্য হয় হারামকারী দলিলের। অতঃপর কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মাকরূহে তাহরীমী। আবার অন্যদের মতে এটি মাকরূহে তানযীহী। প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। আর মাদী ঘোড়ার দুধের ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা দুধ পান করলে জিহাদের অস্ত্রের স্বল্পতা দেখা দেয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ الخ : উপরের ইবারতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইমাম আ'যম (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশ্ত মাকরূহ। তাঁর দলিল : [কুরআনের আয়াত] وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِيْنَةً আয়াতটিতে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার উপকারিতার কথা আল্লাহ আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের উপর কি অনুগ্রহ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। এদের দ্বারা দু'টি উপকার পাওয়া যায়। ১. এদের পিঠে সওয়ার হওয়া যায়/এদের পিঠে বোঝা বহন করা যায়। ২. এগুলো দ্বারা এগুলোর মালিকের শোভা বর্ধন হয়। এ দু'টি ছাড়া অন্যকোনো উপকার লাভ করার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, পশুর গোশত খাওয়া বৈধ হওয়া পশুর থেকে লাভ করা সবচেয়ে বড় উপকার।

যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, আর তিনি এ আয়াতের সাহায্যে তাঁর নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব, যদি গোশত খাওয়া বৈধ হতো তাহলে আল্লাহ সবচেয়ে বড় নিয়ামত হিসেবে তা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। কেননা মহাজ্ঞানী রাব্বুল আলামীন সবচেয়ে বড় অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করবেন না; বরং ছোটখাটো নিয়ামতের কথা উল্লেখ করবেন– এটা হতে পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ বক্তব্যের উপর একটি আপত্তি এটা আসতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে গোশত খাওয়া বৈধ হওয়া সংক্রান্ত নিয়ামতের কথা উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে সাধারণ নিয়ামতের উল্লেখ করার দ্বারা এমনিতেই বড় নিয়ামতের কথা বুঝা যায়। যেমন সূরা বনী ইস্রাঈলে পিতা-মাতা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ তুমি তাদের উফ [বিরক্তিসূচক শব্দ] পর্যন্ত বলবে না। এর দ্বারা প্রহার করা ও গালি দেওয়া ইত্যাদিও স্বাভাবিকভাবে হারাম বুঝা যায়।

উত্তর : আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরে বিনায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ আপত্তি তখনই সঠিক বলে ধরে নেওয়া হত যখন আয়াতে সাধারণভাবে/কোনো একভাবে নিয়ামতের উল্লেখ করা উদ্দেশ্য হতো। কিন্তু এ আয়াতের বিষয়টি এমন নয়; বরং এ আয়াতে বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য। আর তাই এখানে বড় নিয়ামতের অনুল্লেখ মোটেও কাম্য নয়। এখানে যে, বড় নিয়ামতের উল্লেখ করা উদ্দেশ্য তা বুঝা যায় কুরআনের আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা। এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ অতঃপর এর উপর عطف করা হয়েছে وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ। এ দু'য়ের মাঝে কোন ধরনের مَنَافِعُ তা উল্লেখ করা হয়নি এরপর যখন لِتَرْكَبُوهَا-কে উল্লেখ করা হলো তখন এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হলো যে, مَعْطُوف عَلَيْه-এর হুকুমই হচ্ছে مَعْطُوف-এর হুকুম।

মোটকথা যেহেতু এখানে নিয়ামতের বর্ণনা উদ্দেশ্য, তাই মহাজ্ঞানী রাব্বুল আলামী কর্তৃক সবচেয়ে বড় নিয়ামত অনুল্লেখ থাকবে এটা অনুমান করা অসমীচীন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যৌক্তিক দলিল এই যে, ঘোড়া [বিশেষভাবে অতীতকালে] শত্রুবাহিনীর মাঝে ভীতি সঞ্চার করত। অতএব, ঘোড়া হচ্ছে সম্মানের পাত্র। সুতরাং জবাই করার মাধ্যমে এর অসম্মান করা যাবে না। গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে একে জবাই করাটা এর জন্য অসম্মানজনক।

ঘোড়া শত্রুবাহিনীর মাঝে ভীতির সঞ্চার করত বলেই রাসূল ﷺ ঘোড়ার জন্য গনিমতের একটা অংশ সাব্যস্ত করেছিলেন। অর্থাৎ রাসূল ﷺ ঘোষণা করেছিলেন অশ্বারোহীগণ দু'অংশ পাবে, আর পদাতিকগণ এক অংশ পাবে, আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অশ্বারোহীর বর্ধিত অংশ তার ঘোড়া বা অশ্বের কারণেই হয়েছে।

ঘোড়ার গোশত না খাওয়ার ব্যাপারে তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে ঘোড়ার গোশত খাওয়া বৈধ সাব্যস্ত করা হলে জিহাদের অস্ত্রের ঘাটতি দেখা দিবে। আর জিহাদের অস্ত্র কমানো শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে উদ্ধৃত হাদীসের জবাব।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীস হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের হাদীসের বিপরীত।

হযরত খালিদের হাদীস– إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত খালিদের হাদীস দ্বারা ঘোড়ার গোশত হালাল না হওয়া বুঝা যায়। পক্ষান্তরে আলোচ্য হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীস (أَذِنَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ) দ্বারা হালাল হওয়া বুঝা যায়।

মোটকথা দু'হাদীস মুখোমুখি অবস্থায় –একটি দ্বারা হালাল প্রমাণিত হয় আর অন্যটি দ্বারা হারাম প্রমাণিত হয়। হালাল ও হারামের মাঝে বিরোধ দেখা দিলে হানাফী মাযহাবে হারামের প্রাধান্য হয়। সে মতে হযরত খালিদ (রা.)-এর হাদীস ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আমল যোগ্য, আর হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীস পরিত্যাজ্য।

একটি আপত্তি : হযরত খালিদ (রা.)-এর হাদীস সনদের দিক থেকে দুর্বল, পক্ষান্তরে হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীস সনদের দিক থেকে সবল ও বিশুদ্ধ। নিয়মানুযায়ী দুর্বল ও শক্তিশালী হাদীসের মাঝে বিরোধ গ্রহণযোগ্য হয় না। এক্ষেত্রে শক্তিশালী হাদীস এমনিতেই প্রাধান্য লাভ করে।

আবার কারো কারো মতে হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীস দ্বারা হযরত খালিদ (রা.)-এর হাদীস মানসূখ [রহিত] হয়ে গেছে। কেননা হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীসে رَخَّصَ /أَذِنَ শব্দ রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম হাযামী তার কিতাবে উল্লেখ করেন যে, اَلرُّخْصَةُ এবং اَلْإِذْنُ শব্দ দু'টি এ কথারই ইঙ্গিতবহন করে যে, প্রথম দিকে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। অবশ্য যদি এরূপ শব্দ না থাকত তাহলে নিশ্চিতভাবে রহিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হতো না।

আবার কেউ কেউ বলেন, এ ব্যাপারে কোনো রহিতকরণ বা নসখ হয়নি; বরং গোশত বৈধ হওয়া সংক্রান্ত হাদীসটির উপরই আমল করা হবে –হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়া এবং এর বর্ণনাকারী বেশি হওয়ার কারণে।

আপত্তির জবাব : বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের হাদীসের সনদ উত্তম নির্ভরযোগ্য। এজন্যই ইমাম আবূ দাঊদ (র.) হাদীসটিকে তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখ করার পর হাদীসের উপর যয়ীফ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। আর ইমাম আবূ দাঊদ (র.) যে হাদীসের উপর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন তা তাঁর মতে কমপক্ষে حَسَنٌ -এর পর্যায়ে হয়ে থাকে।

ইমাম নাসায়ী হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বলেন যে, এর সনদ এরূপ–

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنِي بَقِيَّةُ أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ -

অন্য অনুলিপিতে أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ -এর স্থলে حَدَّثَنِي ثَوْرٌ আছে।

এ বর্ণনাতে بَقِيَّةُ বর্ণনা করেছেন إِخْبَارٌ/تَحْدِيْثٌ শব্দ দ্বারা। আর بَقِيَّةُ যখন এরূপ শব্দ দ্বারা হাদীস বয়ান করেন তখন তা নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়। ইবনে মা'ঈন, আবূ হাতেম, আবূ যুর'আ এবং নাসায়ী (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীন এমনটিই বলেছেন।

ইবনে আ'দী (র.)-এর মতে بَقِيَّةُ যখন সিরিয়া/শামের মুহাদ্দিসীন থেকে বর্ণনা করেন তখন সে হাদীস নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হয়।

بَقِيَّةُ (র.) বর্ণনা করেন صَالِحٌ থেকে। তার সম্পর্কে ইবনে হিব্বান (র.) বলেন যে, তিনি নির্ভরযোগ্য। আর ইয়াহইয়ার পিতা মিকদাম সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (র.) মন্তব্য করেন যে, তিনি ও তার পিতা দু'জনেই নির্ভরযোগ্য।

মোটকথা এভাবে বিবেচনা করলে হাদীসটি হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীসের সাথে মোকাবিলার উপযুক্ত হয়।

বিনায়া গ্রন্থের মুসান্নিফ আরো বলেন যে, أَذِنَ ও رَخَّصَ শব্দ দ্বারা হযরত খালিদ (রা.)-এর হাদীস রহিতকরণের প্রতি দলিল দেওয়া সঠিক নয়। কারণ এও সম্ভব যে, রাসূল ﷺ তাদের এ সব খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন তাদের ক্ষুধার্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আর বিষয়টি বিশুদ্ধ বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় খায়বারে পৌঁছেছিলেন। অতএব, এটা অসম্ভব নয় যে, রাসূল ﷺ তাদের উপস্থিত ক্ষুধা নিবারণের জন্য ঘোড়ার গোশত হারাম হওয়া সত্ত্বেও সাময়িকভাবে তা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। বাকি রইল রাসূল ﷺ শুধুমাত্র ঘোড়া খাওয়ার অনুমতি দিলেন কেন ? এর উত্তর হচ্ছে সে সময়টাতে ঘোড়াই তাদের নাগালে ছিল।

হযরত খালিদের হাদীসের ব্যাপারে আরেকটি বড় আপত্তি করা হয়। আর তা হচ্ছে– তিনি মুসলমান হয়েছেন খায়বর যুদ্ধের পর। অতএব, খায়বার যুদ্ধ চলাকালে তাঁর এ হাদীস কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ? এর উত্তরে আমরা বলব– হযরত খালিদ (রা.) খায়বার যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন এ কথা নিশ্চিত নয়; বরং সীরাতে ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আ'স (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হুদায়বিয়ার পর ও খায়বার যুদ্ধের অনেক আগে।

–[ইবনে হিশাম, খ. পৃ. ২৭৭-৭৮]

কারো কারো মতে তো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন পঞ্চম হিজরিতে। মোটকথা এ আপত্তি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় যে, হযরত খালিদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন খায়বারের পর, অতএব, তাঁর খায়বার যুদ্ধকালীন সময়ের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ قِيلَ الْكَرَاهَةُ عِنْدَهُ الخ : এ ইবারত দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশত কোন ধরনের মাকরূহ? তা নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, তার মতে মাকরূহে তানযিহী, অন্য কেউ কেউ বলেন, মাকরূহে তাহরীমি।

সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে আমরা ইখতিলাফের উৎস নিয়ে আলোচনা করতে চাই। বিনায়া গ্রন্থের মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের ব্যাপারে এমন মতবিরোধ হওয়ার কারণ হচ্ছে তার থেকে বর্ণিত ইবারতের বিভিন্নতা। এ ব্যাপারে মাবসূত কিতাবের বর্ণনা এরূপ যে, فِى كِتَابِ الصَّيْدِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ (رحـ) رَخَّصَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِى لَحْمِ الْخَيْلِ فَأَمَّا أَنَا فَلَا يُعْجِبُنِى أَكْلُهُ অর্থাৎ, 'ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কতিপয় আলেম ঘোড়ার গোশত খাওয়ার বৈধতা দেন, তবে আমার কাছে এর গোশত খাওয়া ভালো মনে হয় না।' এ ইবারত দ্বারা মাকরূহে তানযিহী মনে হয়। অন্যদিকে জামিউস সাগীরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মাকরূহ বলা হয়েছে। অর্থাৎ মাকরূহে তাহরীমী।

কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) একদা জিজ্ঞাসা করেন যে, إِذَا قُلْتَ فِى شَيْءٍ أَكْرَهُ فَمَا رَأْيُكَ فِيْهِ ؟ অর্থাৎ, যখন কোনো ব্যাপারে আপনি "আমি মাকরূহ মনে করি" বলেন, -এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি হয়ে থাকে? উত্তরে তিনি বলেন, মাকরূহে তাহরীমি।

আব্দুর রহীম কিরমানী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এ মাসআলায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম যে, এটি মাকরূহে তাহরীমি হবে না কি তানযিহী? অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে স্বপ্নে দেখলাম -তিনি আমাকে বলছেন : হে আব্দুর রাহীম মাকরূহে তাহরীমি।

অন্যদিকে ফখরুল ইসলাম এবং আবুল মাঈন (র.) উল্লেখ করেন যে, সহীহ কথা এই যে, এটির গোশত মাকরূহে তানযিহী। কেননা মাকরূহ হওয়ার দ্বারা পশুটির সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে যাতে এটি খাওয়ার দ্বারা জিহাদের অস্ত্র কমে না যায়। আর মাকরূহে তানযিহী হওয়ার কারণেই এর ঝুটা জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী পবিত্র।

ইমাম কাযী খান ফাতওয়ায়ে সুগরায় উল্লেখ করেন এর গোশত মাকরূহে তানযিহী। এর দলিল হিসেবে তিনি বলেন, كِتَابُ الصَّلٰوةِ -এর মধ্যে ঘোড়ার পেশাবকে যে পশুর গোশত খাওয়া জায়েজ, তার সমপর্যায়ের বলা হয়েছে।

হিদায়ার মুসান্নিফ হযরত শায়খ বুরহানুদ্দীনের মতে মাকরূহে তাহরীমি হওয়ার বিষয়টি অধিকতর মজবুত।

قَوْلُهُ وَأَمَّا لَبَنُهُ فَقَدْ قِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ الخ : মাদী ঘোড়ার দুধের ব্যাপারে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেন যে, এর দুধ পান করা অনেকের মতে বৈধ বা হালাল। যারা হালাল বলেন, তাদের দলিল হলো যেহেতু এর দ্বারা জিহাদের অস্ত্র হ্রাস পায় না তাই এর দুধ খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

এ ব্যাপারে ইমাম কাযী খান (র.)-এর মন্তব্য হচ্ছে– এর দুধ অন্যান্য হালাল প্রাণীর দুধের মতো। তবে কেউ এর দুধ খাওয়াও মাকরূহ বলেছেন।

এ ব্যাপারে ফতওয়া হচ্ছে এর দুধ খাওয়া মাকরূহে তানযীহী।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَلَ مِنْهُ حِينَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مَشْوِيًّا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ بِالْأَكْلِ مِنْهُ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا مِنْ أَكَلَةِ الْجِيفِ فَأَشْبَهَ الظَّبْيَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খরগোশ খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা রাসূল ﷺ-কে খরগোশ হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি এর থেকে সামান্য ভক্ষণ করেন– এবং তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে তা থেকে খাওয়ার আদেশ করেন। তাছাড়া খরগোশ হিংস্রপ্রাণীভুক্তও নয় এবং যেসব প্রাণী নাপাক ভক্ষণ করে এর মধ্যেও গণ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ الخ : আলোচ্য ইবারতে খরগোশ খাওয়ার বিধান আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খরগোশ খাওয়া জায়েজ। জায়েজ হওয়ার পক্ষে তিনি দলিল হিসেবে রাসূল ﷺ -এর হাদীস পেশ করেন যে, রাসূল ﷺ -এর কাছে একটি খরগোশ হাদিয়া আসলে তিনি তা থেকে কিছু অংশ ভক্ষণ করেন এবং রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের তা খেতে আদেশ করেন।

এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লামা যাইলাঈ (র.) نَصْبُ الرَّايَة কিতাবে উল্লেখ করেন যে, সম্ভবত হিদায়ার মুসান্নিফ দু'টি হাদীসকে একত্রিত করে এক সাথে [رِوَايَةً بِالْمَعْنٰى হিসেবে] বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এখানে হাদীস দু'টি। একটি হাদীস ইমাম বুখারী (র.) তাঁর কিতাবে সংকলন করেছেন। হাদীসটি এরূপ–

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَغَلَبُوا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَوْ قَالَ فَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَأَكَلَ مِنْهُ ؟ قَالَ وَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ فَقَبِلَهُ .

এ হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল ﷺ খরগোশকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করেছেন।

এ সম্পর্কিত আরেকটি হাদীস হচ্ছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَزَادَ فِي لَفْظٍ وَقَالَ فَإِنِّي لَوِ اشْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূল ﷺ -এর কাছে একটি ভুনা খরগোশ নিয়ে আসল এবং তা রাসূল ﷺ -এর সামনে পেশ করল । রাসূল ﷺ তার হাত গুটিয়ে রাখলেন এবং সেই গোশত খেলেন না; বরং তিনি সাহাবীদের তা খাওয়ার আদেশ করলেন। অন্যস্থানে এ হাদীসের শেষাংশে কিছু ইবারত বেশি পাওয়া যায়। বেশিটুকু হচ্ছে "আমার যদি আগ্রহ থাকত তাহলে আমি তা খেতাম।

লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে দুই হাদীসের কোনোটিতে রাসূল ﷺ খরগোশ খেয়েছেন তা প্রমাণিত হয় না। অথচ হিদায়ার মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ তা খেয়েছেন বলে বর্ণনা করেন। অবশ্য রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে খাওয়ার আদেশ করেন এবং নিজের না খাওয়ার ওজর বর্ণনা করেন। এর দ্বারা প্রাণীটির হালাল হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.)-এর পর এটির গোশত হালাল হওয়ার ব্যাপারে যৌক্তিক দলিল বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খরগোশ যেহেতু হিংস্রপ্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং নাপাক ভক্ষণকারী জন্তুদের দলভুক্তও নয় তাই এটি হরিণের মতো হয়ে গেল। হরিণ খাওয়া যেমন হালাল এটি খাওয়াও তেমনি হালাল সাব্যস্ত হবে।

قَالَ : وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَهُرَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ إِلَّا الْآدَمِيَّ وَالْخِنْزِيرَ فَإِنَّ الذَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِيهِمَا أَمَّا الْآدَمِيُّ فَلِحُرْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَالْخِنْزِيرُ لِنَجَاسَتِهِ كَمَا فِي الدِّبَاغِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) اَلذَّكَاةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي جَمِيعِ ذٰلِكَ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي إِبَاحَةِ اللَّحْمِ أَصْلًا وَفِي طَهَارَتِهِ وَطَهَارَةِ الْجِلْدِ تَبَعًا وَلَا تَبَعَ بِدُونِ الْأَصْلِ وَصَارَ كَذَبْحِ الْمَجُوسِيِّ وَلَنَا أَنَّ الذَّكَاةَ مُؤَثِّرَةٌ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ وَالدِّمَاءِ السَّيَّالَةِ وَهِيَ النَّجَسَةُ دُونَ ذَاتِ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَإِذَا زَالَتْ طَهُرَ كَمَا فِي الدِّبَاغِ وَهٰذَا حُكْمٌ مَقْصُودٌ فِي الْجِلْدِ كَالتَّنَاوُلِ فِي اللَّحْمِ وَفِعْلُ الْمَجُوسِيِّ إِمَاتَةٌ فِي الشَّرْعِ فَلَابُدَّ مِنَ الدِّبَاغِ وَكَمَا يَطْهُرُ لَحْمُهُ يَطْهُرُ شَحْمُهُ حَتّٰى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَا يُفْسِدُهُ خِلَافًا لَهُ وَهَلْ يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ قِيلَ لَا يَجُوزُ اِعْتِبَارًا بِالْأَكْلِ وَقِيلَ يَجُوزُ كَالزَّيْتِ إِذَا خَالَطَهُ وَدَكُ الْمَيْتَةِ وَالزَّيْتُ غَالِبٌ لَا يُؤْكَلُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় না সেগুলো যদি জবাই করা হয় তাহলে তার চামড়া ও গোশত পাক হয়ে যায়, তবে মানুষ ও শূকর এর ব্যতিক্রম। কেননা জবাই এদের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষের মাঝে [না করার কারণ] মানুষের প্রতি সম্মান এবং এর মর্যাদার কারণে। আর শূকরের মাঝে নাপাকীর কারণে। যেমন– চামড়া দাবাগাতের [পরিশোধনের] ক্ষেত্রে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এদের মাঝে জবাই কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না। কেননা জবাই গোশত পবিত্রকরণের মাধ্যমে বৈধ করে। আর গোশত ও চামড়ার পবিত্রতা অনুগত হিসেবে। আসল বা মূল ব্যতীত অনুগতের মাঝে হুকুম আসে না। [অর্থাৎ যেহেতু গোশত পাক হচ্ছে না সুতরাং তার অনুগতরূপে চামড়াও পাক হবে না।] সুতরাং এটা অগ্নিপূজারীর জবাইয়ের মতোই হলো। আমাদের দলিল এই যে, জবাই তরল জাতীয় বস্তু এবং প্রবাহিত রক্ত বের করার ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখে। আর এগুলোই অপবিত্র। চামড়া ও গোশত মূলত অপবিত্র নয়। সুতরাং যখন এগুলো পৃথক হয়ে যায় তখন গোশত ও চামড়া পাক হয়ে যায় যেমন দাবাগাতের ক্ষেত্রে পাক হয়। আর এ [চামড়া পবিত্রতার] হুকুম চামড়ার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য, যেমন গোশতের মধ্যে খাওয়া উদ্দেশ্য। আর অগ্নিপূজারীর জবাই শরিয়তের দৃষ্টিতে মেরে ফেলার নামান্তর। সুতরাং এর মাঝে দাবাগাত করতে হবে। [জবাই এর দ্বারা] যেমন এর গোশত পাক হয় তদ্রূপ এর চর্বিও পাক হয়, সুতরাং যদি তা অল্প পানিতে পতিত হয় তাহলে তাকে নাপাক করবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে খাওয়া ব্যতীত অন্যকাজে উপকৃত হওয়া যাবে কি ? [এ ব্যাপারে] কেউ কেউ খাওয়ার উপর কিয়াস করে বলেন, যাবে না। কেউ কেউ বলেন, যাবে। যেমন যাইতুনের তেলের সাথে মৃত জন্তুর চর্বি মিশ্রিত হলে এবং যাইতুনের পরিমাণ বেশি হলে খাওয়া যায় না বটে; কিন্তু খাওয়া ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে হারাম প্রাণীর জবাই এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় না এগুলোকে হারাম প্রাণী বলা হয়। এসব প্রাণী যদি জবাই করা হয় তাহলে এর চামড়া ও গোশত পবিত্র বলে গণ্য হবে। এ হুকুম থেকে মানুষও শূকর আলাদা। অর্থাৎ যদি মানুষ ও শূকরকে জবাই করা হয় তবুও এর চামড়া ও গোশত পাক হবে না।

মানুষের ক্ষেত্রে পাক না হওয়ার কারণ হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ ......الخ অর্থাৎ, আমি মানব-সন্তানকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছি। আর কোনো জিনিসকে ব্যবহার উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত করা তাকে এক ধরনের অসম্মান করারই নামান্তর।

আর শূকর পাক না হওয়ার কারণ হচ্ছে এটি মৌলিকভাবেই নাপাক, এটাকে কোনোভাবেই পাক করা যায় না।

উল্লেখ্য যে, জবাই -এর দ্বারা পাক হওয়ার অর্থ হালাল হওয়া নয়, বরং এসব পশু পাক হওয়া সত্ত্বেও হারামই থাকবে।

قَوْلُهُ كَمَا فِى الدِّبَاغِ : অর্থাৎ যেমন দাবাগত দ্বারা হারাম জন্তুর চামড়া পাক হয় তদ্রূপ জবাই -এর দ্বারা হারাম পশুর চামড়া পাক হবে। এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব ভিন্ন। তিনি বলেন, জবাই দ্বারা হারাম প্রাণীর গোশত ও চামড়া পাক হবে না। তার মতে জবাই এসব প্রাণীর মাঝে কোনোই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি বলেন, জবাই দ্বারা মূলত গোশত হালাল হয়। আর গোশত হালাল হলে এর অনুবর্তী হিসেবে গোশত ও চামড়া পবিত্র হয়ে যায়। আলোচ্য মাসআলায় জবাই দ্বারা যেহেতু গোশত হালাল হচ্ছে না যা আসল বা প্রধান, সুতরাং এর অনুবর্তীরূপে চামড়া ও গোশত পবিত্র হবে না। কেননা আসল বা মূল বিষয় পাওয়া না গেলে অনুবর্তী বিষয় পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, যেহেতু বিষয়টি এরূপ তাই এটি অগ্নিপূজারীর জবাইয়ের মতো হলো।

অর্থাৎ অগ্নিপূজারীর জবাই দ্বারা যেমন পশু হালাল এবং পাক হয় না তদ্রূপ হারাম প্রাণী জবাই করার দ্বারা পশু হালাল ও পবিত্র হয় না।

আহনাফের দলিল এই যে, জবাই করার দ্বারা জবাইকৃত প্রাণীর মাঝে যেসব তরল বস্তু আছে বিশেষভাবে প্রবাহিত রক্ত বের হয়ে যায়। প্রবাহিত রক্ত ও তরল বিষয়গুলোই নাপাক। যখন জবাই দ্বারা এ সব বিষয় বের হয়ে যায় তখন গোশত ও চামড়া পাক হয়ে যায়। চামড়া ও গোশত মূলগতভাবে নাপাক নয়; বরং এদের নাপাক বলার কারণ হচ্ছে নাপাকীর সাথে সংশ্লিষ্টতা। যখন এ সংশ্লিষ্টতা দূর হয়ে যায় তখন এগুলো পাক হয়ে যায়। দাবাগত বা চামড়া পরিশোধনের মধ্যে একইভাবে চামড়া পাক হয়। সেখানে নাপাকী শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা চামড়া পাক হয়।

قَوْلُهُ وَهٰذَا حُكْمٌ مَقْصُوْدٌ الخ : এ বাক্য দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য খণ্ডন করা হয়েছে। তিনি বলেন, জবাইয়ের মূল কার্যকারিতা হচ্ছে গোশত হালাল করার ব্যাপারে, আর গোশত ও চামড়ার পবিত্রতা এর অনুগামী বিষয়। এ বক্তব্যের জবাবে লেখক বলেন, চামড়ার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্রতা যেমন গোশতের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হচ্ছে খাওয়া। অর্থাৎ গোশতের ক্ষেত্রে খাওয়া যেমন মূল উদ্দেশ্য তদ্রূপ চামড়ার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্রতা। সারকথা এ দাঁড়ালো যে, চামড়া ও গোশতের পবিত্রতা গোশত পবিত্র বা হালাল হওয়ার অনুগামী কোনো বিষয় নয়; বরং প্রত্যেকটি মূল বিষয় এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ বিষয়। সুতরাং যখন জবাই পাওয়া গেল তখন যদি জবাইকৃত পশুটি যদি হালাল প্রাণী হয় তাহলে সেই প্রাণীর সবকিছুই পবিত্র হবে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে। আর যদি জবাইকৃত প্রাণী হারাম প্রাণী হয় তাহলে তার গোশত ও চামড়া উভয়ই পাক হবে। তবে পাক হওয়ার অর্থই কিন্তু খাওয়ার জন্য বৈধ হওয়া নয়।

قَوْلُهُ وَفِعْلُ الْمَجُوسِيِّ اِمَاتَةٌ فِى الشَّرْعِ الخ : এ ইবারত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আরেকটি বক্তব্যের খণ্ডন করা হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, যেহেতু হারাম প্রাণী জবাই করার দ্বারা গোশত হালাল হয় না। অতএব, হারাম প্রাণী জবাই করা অগ্নিপূজারীর জবাইয়ের মতো হলো।

এর জবাবে লেখক বলেন, অগ্নিপূজারীর জবাই শরিয়তে স্বীকৃত জবাই নয়। অতএব, তার জবাই পশু মেরে ফেলারই নামান্তর।

সুতরাং তার জবাই যা শরিয়ত স্বীকৃত নয়– এর উপর শরিয়ত স্বীকৃত জবাইকে কিয়াস করা মোটেও সমীচীন নয়।

قَوْلُهُ فَلَابُدَّ مِنَ الدِّبَاغِ : লেখক বলেন, যেহেতু অগ্নিউপাসকের জবাই মেরে ফেলার নামান্তর তাই সেই পশুর চামড়া পাক করার জন্য দাবাগত করা আবশ্যক।

قَوْلُهُ وَكَمَا يَطْهُرُ لَحْمُهُ يَطْهُرُ الخ : লেখক বলেন, জবাই দ্বারা যেমন– গোশত পাক হয় তদ্রূপ চর্বিও পাক হয়। সুতরাং জবাইকৃত হারাম পশুর চর্বির কোনো অংশ যদি সামান্য পানির মধ্যে পড়ে যায় তাহলে সে পানি নাপাক হয়ে যায় না। সামান্য পানি যদি নাপাক না হয় তাহলে বেশি পানি নাপাক হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।

এ মাসআলাতে ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিমত রয়েছে। কেননা তাঁর মতে হারাম প্রাণীর গোশত ও চামড়া যেমন পাক হয় না তদ্রূপ এর চর্বিও পাক হয় না।

قَوْلُهُ وَهَلْ يَجُوزُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ الخ : এ ইবারত দ্বারা লেখক নতুন একটি মাসআলার অবতারণা করেছেন। মাসআলা এই যে, যেসব হারাম প্রাণী জবাই দ্বারা পাক হয়ে যায় সেসব প্রাণীর চর্বি খাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপকারী কাজে যেমন- জ্বালানি তেল হিসেবে ব্যবহার ও চামড়ায় তেল মাখা ইত্যাদি কাজে লাগানো যাবে কিনা?

এর উত্তরে লেখক দু'টি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথমত এই যে, হারাম প্রাণীর চর্বি যেমন খাওয়া যায় না, তদ্রূপ অন্যকোনো উপকারী কাজেও লাগানো যায় না।

দ্বিতীয় মত এই যে, চর্বি অন্যান্য উপকারী কাজে লাগানো যায়। যেমন– উক্ত চর্বি জ্বালানি তেল হিসেবে ব্যবহার করা চলে।

এ মতের প্রবক্তাগণ কিয়াস করেন অন্য একটি মাসআলার উপর। মাসআলাটি এই যে, যাইতুনের তেলে যদি মৃত জন্তুর চর্বি তেল হিসেবে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং পরিমাণে যাইতুনের তেল বেশি থাকে তাহলে তা নাপাক হয়ে যাওয়া এবং খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা চলে। অর্থাৎ নাপাক হওয়া এবং খাওয়া অযোগ্য হওয়া এখানে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় পবিত্র চর্বি জ্বালানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করাও নাজায়েজ হবে না; বরং যুক্তির বিবেচনায় এতে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকাও উচিত নয়। কারণ আলোচ্য চর্বি জবাই করার দ্বারা পাক হয়ে গেছে। আর যাইতুনের তেল মৃত জন্তুর চর্বি মিশ্রিত হয়ে নাপাক হয়ে গেছে। নাপাক বা অপবিত্র বস্তু যদি জ্বালানো বৈধ হয় তাহলে পবিত্র বস্তু অবশ্যই জ্বালানো বৈধ হবে।

উল্লেখ্য যে, হিদায়ার গ্রন্থকার দুই মতের কোনোটি উত্তম তা বর্ণনা করেননি। তবে তাঁর নীতি অনুযায়ী দ্বিতীয় মতটিই উত্তম বলে প্রতীয়মান হয়। আর তা এভাবে যে, তিনি দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে তাঁর কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য বিষয়কে পরে উল্লেখ করেন। আর কম গ্রহণযোগ্য মতটিকে প্রথমে উল্লেখ করেন। অতএব, আলোচ্য মাসআলায় জবাইকৃত হারাম প্রাণীর চর্বি খাওয়া ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।

قَالَ : وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءِ إِلَّا السَّمَكُ وَقَالَ مَالِكٌ (رح) وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِإِطْلَاقِ جَمِيعِ مَا فِي الْبَحْرِ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمُ الْخِنْزِيرَ وَالْكَلْبَ وَالْإِنْسَانَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ (رح) أَنَّهُ أَطْلَقَ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَالْخِلَافُ فِي الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَاحِدٌ لَهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ وَلِأَنَّهُ لَا دَمَ فِي هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذِ الدَّمَوِيُّ لَا يَسْكُنُ الْمَاءَ وَالْمُحَرَّمُ هُوَ الدَّمُ فَأَشْبَهَ السَّمَكَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাছ ছাড়া পানিতে বসবাসকারী কোনো প্রাণীই খাওয়া যাবে না। আর ইমাম মালেক (র.) ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের এক জামাত সমুদ্র অর্থাৎ পানিতে যেসব প্রাণী জন্মে, এর সব হালাল হওয়ার প্রবক্তা। তাদের কেউ কেউ শূকর, কুকুর ও মানুষকে বাদ দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সবগুলোকে হালাল বলেন। খাওয়া ও বেচাকেনার ক্ষেত্রে মতবিরোধ একই। তাদের দলিল : আল্লাহর ইরশাদ 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে -ব্যাখ্যাবিহীনভাবে' এবং রাসূল ﷺ -এর বাণী– সমুদ্রের ব্যাপারে -এর পানি পবিত্র এবং মৃত হালাল। তাছাড়া [যৌক্তিক দলিল হলো] এ সব প্রাণীর মধ্যে [প্রবহমান] রক্ত নেই। কেননা প্রবহমান রক্তের প্রাণী পানিতে বসবাস করতে পারে না। আর হারামকারী বস্তু রক্ত, সুতরাং তা মাছের মতোই হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءِ الخ : আলোচ্য ইবারতে পানিতে বসবাসকারী মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাছ ছাড়া পানির আর কোনো প্রাণীই খাওয়ার উপযুক্ত নয়। এটা আহনাফের মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (র.), ইবনে আবী লায়লা (র.), আসহাবে জাওয়াহের ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একমত অনুযায়ী সামুদ্রিক তথা পানিতে বসবাসকারী সব প্রাণীই হালাল বা খাওয়ার উপযুক্ত। এমনকি সামুদ্রিক শূকর, কুকুর ও মানুষও খাওয়া জায়েজ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আরেক মত হচ্ছে পানির যাবতীয় জন্তুই হালাল, এটা ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি অভিমত।

قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ فِي الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَاحِدٌ : লেখক বলেন, সামুদ্রিক সব প্রাণীর ব্যাপারে মতবিরোধ আহনাফের সাথে অন্যান্য ইমামগণের যে হয়েছে তা খাওয়ার উপযুক্ত হওয়া এবং বেচাকেনার উপযুক্ত হওয়া উভয় ব্যাপারেই। অর্থাৎ আহনাফের মতে, এ সব প্রাণী খাওয়া যেমন নাজায়েজ তদ্রূপ বেচাকেনা করাও নাজায়েজ।

পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (র.) সহ অন্য ইমামগণের মতে খাওয়া ও বেচাকেনা উভয়ই জায়েজ।

১. **অন্যান্য ইমামগণের দলিল** : কুরআনের আয়াত أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাবার হালাল করা হয়েছে।" আয়াতে সমুদ্র তথা পানিতে বসবাসকারী জন্তুদের নিঃশর্তভাবে হালাল করা হয়েছে। কোনো প্রাণীকে খাস করা হয়নি। আয়াত মুতলাক হওয়ার দ্বারা সব ধরনের প্রাণীই হালাল বুঝা যায়।

২. **দ্বিতীয় দলিল** : রাসূল ﷺ -এর হাদীস : هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ হাদীসটি এখানে সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী (র.) ও ইমাম নাসায়ী (র.) হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সনদসহ এখানে উদ্ধৃত করা হলো−

عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنَ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ وَابْنَ بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

এ হাদীসে রাসূল ﷺ -কে জনৈক সাহাবী সমুদ্রের পানির পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন, এর পানি পবিত্র এবং এর সব জন্তু হালাল।

এ হাদীস দ্বারাও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সমুদ্র তথা পানিতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ হালাল।

৩. **তৃতীয় দলিল** : কিয়াস বা যুক্তি। পানিতে বসবাসকারী প্রাণীদের দেহে প্রবহমান রক্ত নেই, প্রবহমান রক্তবিশিষ্ট জন্তুসমূহ পানিতে বসবাস করতে পারে না। কেননা রক্তের প্রকৃতি হচ্ছে গরম আর পানি হচ্ছে ঠাণ্ডা তাই রক্তবিশিষ্ট প্রাণী পানিতে থাকতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, প্রাণীসমূহ হারামকারী হচ্ছে প্রবহমান নাপাক রক্ত। যেহেতু তা এসব প্রাণীর মাঝে অবিদ্যমান তাই এসব প্রাণী মাছের মতোই হলো। সুতরাং এগুলো মাছের মতো হালাল বা খাওয়ার উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَمَا سِوَى السَّمَكِ خَبِيثٌ وَنَهَى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ دَوَاءٍ يُتَّخَذُ فِيهِ الضِّفْدَعُ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السَّرَطَانِ وَالصَّيْدُ الْمَذْكُورُ فِيمَا تَلَا مَحْمُولٌ عَلَى الْاِصْطِيَادِ وَهُوَ مُبَاحٌ فِيمَا لَا يَحِلُّ وَالْمَيْتَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيمَا رُوِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَكِ وَهُوَ حَلَالٌ مُسْتَثْنًى مِنْ ذٰلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ـ

অনুবাদ : আমাদের দলিল মহান আল্লাহর বাণী- وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ 'তাদের উপর নিকৃষ্ট জিনিসসমূহ হারাম করা হয়েছে।' মাছ ব্যতীত অন্য যেসব প্রাণী আছে তা নিকৃষ্ট প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। রাসূল ﷺ এমন ঔষধকে নিষিদ্ধ করেছেন যাতে ব্যাঙ দেওয়া হয়েছিল, এবং রাসূল ﷺ কাকরা বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করেছেন। [তাদের বর্ণিত আয়াতে] উল্লিখিত শিকার দ্বারা উদ্দেশ্য শিকার করা [সামুদ্রিক প্রাণী ধরা]। আর তা হারাম প্রাণীর ক্ষেত্রেও বৈধ। আর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে মৃত জন্তু দ্বারা উদ্দেশ্য [মৃত] মাছ। আর তা হালাল এবং সমস্ত মৃত প্রাণী থেকে মুস্‌তাস্‌না বা ব্যতিক্রম। এর দলিল : রাসূল ﷺ -এর বাণী : আমাদের জন্য দু'টি মৃত প্রাণী এবং দু'ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত দু'টি প্রাণী হচ্ছে মাছ ও পঙ্গপাল। আর রক্ত সম্বলিত বস্তু হচ্ছে যকৃত ও প্লীহা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে হিদায়ার চলমান মাসআলায় আহনাফের দলিল উপস্থাপন করছেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহনাফের মতে মাছ ছাড়া পানিতে বসবাসকারী কোনো প্রাণী খাওয়া হালাল নয়। প্রথম দলিল কুরআনের আয়াত- وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ অর্থাৎ, আর তাদের উপর হারাম করা হয়েছে নিকৃষ্ট বস্তু ও প্রাণীসমূহ।

মাছ ব্যতীত অন্যসব প্রাণী নিকৃষ্ট প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ নিকৃষ্ট (خَبِيثٌ) বলা হয় যাদের স্বভাবে নিকৃষ্টতা আছে কিংবা যেসব প্রাণীকে লোকেরা নিকৃষ্ট মনে করে। মাছ ব্যতীত অন্যসব সামুদ্রিক প্রাণীর মাঝে উভয়টি বিষয় বিদ্যমান। অতএব, মাছ ছাড়া অন্যসব প্রাণী খাওয়া অবৈধ-হারাম সাব্যস্ত হচ্ছে।

দ্বিতীয় দলিল : রাসূল ﷺ -এর হাদীস - نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَوَاءٍ يُتَّخَذُ فِيهِ الضِّفْدَعُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الطِّبِّ) রাসূল ﷺ এমন ঔষধ খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন যাতে ব্যাঙের কোনো অংশ দেওয়া হয়। এ হাদীসটির বক্তব্য সপ্রমাণিত। নিম্নের সনদসহ হাদীসটি বিস্তারিত উদ্ধৃত করা হলো-

عَنْ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ (رض) أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا ـ

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে জনৈক ডাক্তার রাসূল ﷺ-কে ব্যাঙের সাহায্যে ঔষধ তৈরির অনুমতি চাইলে রাসূল ﷺ এ উদ্দেশ্যে ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেন।

এ হাদীসের আলোকে আলোচনা করতে গিয়ে হাফেজ মুনযিরী উল্লেখ করেন যে, এতে ব্যাঙ খাওয়া হারাম হওয়ার দলিল পাওয়া যাচ্ছে।

তৃতীয় দলিল : نَهٰى عَنْ بَيْعِ السَّرَطَانِ অর্থাৎ, রাসূল ﷺ কাকড়া বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিনায়া গ্রন্থের মুসান্নিফ বলেন, হাদীসটি প্রসিদ্ধ কোনো হাদীসগ্রন্থে নেই এবং এর কোনো ভিত্তিও নেই।

আইম্মায়ে ছালাছার বর্ণিত দলিলের জবাব :

আহনাফের পক্ষ থেকে أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ -এ আয়াতের জবাবে হিদায়ার মুসান্নিফ বলেন, আয়াতে صَيْد শব্দটি মাসদারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্য সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করা হালাল করেছেন। সুতরাং যে কোনো ধরনের শিকার আয়াতের দ্বারা জায়েজ হলো। মোটকথা সমুদ্রের হালাল প্রাণী যেমন শিকার করা জায়েজ তদ্রূপ হারাম প্রাণীও শিকার করা বৈধ। আয়াতের মধ্যে صَيْد শব্দ দ্বারা প্রাণীসমূহ উদ্দেশ্য নয়। অতএব, আয়াত দ্বারা সামুদ্রিক প্রাণীসমূহ খাওয়া বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয় না; বরং সামুদ্রিক সব প্রাণীর শিকার বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয়। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনাও করা হয়েছে যে, আয়াতে মুহরিমের জন্য বা ইহরামের অবস্থায় কোন ধরনের শিকার জায়েজ এবং কোন ধরনের নাজায়েজ তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, কোন প্রকার শিকার বৈধ এবং কোন প্রকার অবৈধ আয়াতে তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় আয়াতের পরবর্তী অংশ দ্বারা যেখানে বলা হয়েছে وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ এবং সমুদ্রের খাবার অর্থাৎ হালাল জন্তু হালাল করা হয়েছে। অতএব, আগের صَيْدُ الْبَحْرِ অংশ দ্বারা হালাল জন্তু যে উদ্দেশ্য নয় তা প্রমাণিত হয়ে যায়।

এখানে একটি আপত্তি এমন করা যায় যে, আপনার এ ব্যাখ্যায় একটু সমস্যা আছে। আর তা হচ্ছে طَعَامُهُ -এর সর্বনামের مَرْجِعْ হচ্ছে صَيْد ; صَيْد -এর অর্থ যদি আপনার ব্যাখ্যা অনুযায়ী اِصْطِيَادْ [শিকার করা] নেওয়া হয় তাহলে তো এর مَرْجِعْ যে صَيْد এ কথা বলা যায় না। এর উত্তর হচ্ছে আয়াতের طَعَامْ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছ। কেননা সামুদ্রিক খাবার বলতে মাছকে বুঝানো হয়। আর ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ হচ্ছে بَحْر বা সমুদ্র। অতএব, طَعَامُهُ -এর অর্থ হবে সমুদ্রের খাবার তথা মাছকে হালাল করা হয়েছে।

সারকথা হচ্ছে আয়াতে صَيْد শব্দ দ্বারা মাসদার তথা শিকার করা বুঝানো হয়েছে। আর তা হারাম প্রাণীর ক্ষেত্রেও বৈধ হওয়াতে কোনো সমস্যাও নেই। কেননা অনেক সময় খাদ্য ছাড়া অন্য প্রয়োজনেও মানুষ হারাম প্রাণী শিকার করতে বাধ্য হয়।

قَوْلُهُ وَالْمَيْتَةُ الْمَذْكُوْرَةُ فِيْمَا رُوِىَ الخ : এ ইবারত দ্বারা হিদায়ার মুসান্নিফ প্রতিপক্ষের বর্ণিত হাদীসের জবাব দিচ্ছেন। হাদীসটি হচ্ছে هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় সামুদ্রিক মৃতজন্তুসমূহ খাওয়া হালাল।

এর জবাবে আহনাফের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, হাদীসে বর্ণিত মৃত দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত মাছ, মৃত যে কোনো প্রাণী নয়। মৃত যে কোনো প্রাণী হালাল না হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ তোমাদের জন্য সব ধরনের মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। এ আয়াত থেকে মাছের হুকুমকে পৃথক করা হয়েছে। এর প্রমাণ হচ্ছে পূর্বে উল্লিখিত হাদীস ও রাসূল ﷺ -এর বিখ্যাত আরেকটি হাদীস। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

আমাদের জন্য দু'টি মৃত প্রাণী ও রক্তসম্বলিত দু'টি বস্তু হালাল করা হয়েছে। মৃত দু'টি প্রাণী হচ্ছে মাছ ও পঙ্গপাল। আর রক্ত সম্বলিত দু'টি বস্তু হচ্ছে যকৃত ও প্লীহা। হাদীসটি ইবনে মাযাহ শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ : وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّافِي مِنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّ مَيْتَةَ الْبَحْرِ مَوْصُوفَةٌ بِالْحِلِّ بِالْحَدِيثِ وَلَنَا مَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوا وَمَا لَفَظَهُ الْمَاءُ فَكُلُوا وَمَا طَفَا فَلَا تَأْكُلُوْا وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِثْلُ مَذْهَبِنَا وَمَيْتَةُ الْبَحْرِ مَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ لِيَكُونَ مَوْتُهُ مُضَافًا إِلَى الْبَحْرِ لَا مَا مَاتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মৃত ভাসমান মাছ খাওয়া মাকরূহ। আমাদের বর্ণিত মুতলাক হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এসব মাছ খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। [অর্থাৎ মাকরূহ নয়]। তাছাড়া সমুদ্রের মৃত জন্তু [মাছ ইত্যাদি] বিশেষভাবে হালাল করা হয়েছে। আমাদের দলিল হযরত জাবির (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস। তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ বলেছেন– পানি শুকিয়ে যে মাছ পাওয়া যায় তা খাও এবং যে মাছ পানি [এর স্রোত ডাঙ্গায়] নিক্ষেপ করে তা খাও; কিন্তু যে মাছ পানিতে [মরে] ভেসে যায় তা খেয়ো না। সাহাবাদের এক জামাত থেকে আমাদের মাযহাবের অনুরূপ বিষয় বর্ণিত আছে। [আর হাদীসে বর্ণিত] সমুদ্রের মৃত জন্তু দ্বারা উদ্দেশ্য যাকে সমুদ্র ডাঙ্গায় নিক্ষেপ করে [অতঃপর তা মারা যায়] যাতে মৃত্যুর নিসবত সমুদ্রের প্রতি করা যায়, এমন মাছ [উদ্দেশ্য] নয় যা সমুদ্রে দুর্ঘটনা ছাড়া [এমনিতেই] মারা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّافِي مِنْهُ الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক ভাসমান মৃত মাছের হুকুম আলোচনা করেছেন। এ মাসআলায় আহনাফের বক্তব্য হচ্ছে এ জাতীয় মাছ খাওয়া মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে এরূপ মাছ খাওয়া মাকরূহ নয়। তাদের দলিল পূর্বে বর্ণিত হাদীস هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ সমুদ্রের মৃত মাছ হালাল। এ হাদীসের দ্বারা যে কোনো মৃত মাছ হালাল হওয়া প্রমাণ হয় চাই সেটা ভাসমান হোক অথবা ডাঙ্গায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যাক. তাদের পক্ষে আরো বলা হয় যে, হাদীসে বিশেষভাবে সমুদ্রের মৃত মাছ হালাল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব, মৃত ভাসমান মাছ হালাল হওয়ার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

আহনাফের দলিল : হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীস–

رَوٰى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوْهُ وَمَا لَفَظَهُ الْمَاءُ فَكُلُوا وَمَا طَفَا فَلَا تَأْكُلُوْا .

হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা যায়লাঈ (র.) মন্তব্য করেন যে, এই শব্দে হাদীসটি যয়ীফ। তার এ মন্তব্য সঠিক হলেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ এ জাতীয় বক্তব্য অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ উভয়ে তাদের কিতাবে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন–

عَنْ يَحْيٰى بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَلْقَى الْبَحْرُ اَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوْهُ.

রাসূল ﷺ বলেন, সমুদ্র যা নিক্ষেপ করে কিংবা যা তার বের হয়ে আসে তা খাও। আর যা তাতে মারা যায় এবং ভেসে উঠে তা খেয়ো না।

এ হাদীসটির ব্যাপারে ও যথেষ্ট সমালোচনা রয়েছে। সারকথা হচ্ছে উপরিউক্ত বিষয়টি রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত। যদিও হাদীস দুটির মধ্যে সনদগত দুর্বলতা রয়েছে। কেননা সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত থেকে এই অভিমত পাওয়া যায় যে, তারা ভাসমান মৃত মাছকে মাকরূহ মনে করতেন। তারা রাসূল ﷺ থেকে এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত পেয়েছেন বলেই এর খাওয়া মাকরূহ মনে করতেন।

যেমন ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে হযরত জাবির, হযরত আলী (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ ভাসমান মৃত মাছ খাওয়া মাকরূহ মনে করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তাবেয়ীগণের মধ্যে ইবনুল মুসায়্যিব, আবুশ্ শা'ছা, তাউস ও ইমাম জুহরী (র.) এদের ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, এরা এ প্রকারের মাছ কে মাকরূহ মনে করতেন। মুহাদ্দিস আব্দুর রায্যাক (র.)-ও তাঁর মুসান্নাফে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهٗ مَيْتَةُ الْبَحْرِ مَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ الخ : এখান থেকে লেখক প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব দিচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর পক্ষে বলা হয়েছিল যে, হাদীসে তো বিশেষভাবে সমুদ্রের মৃতপ্রাণীকে হালাল বলা হয়েছে। সুতরাং মৃত ভাসমান মাছ হালাল হবে।

এর জবাবে লেখক বলেন, সমুদ্রে মৃত দ্বারা উদ্দেশ্য সমুদ্রের কারণে যে মাছ মারা গেছে। অর্থাৎ যে মাছকে সমুদ্রের তীরে নিক্ষেপ করেছে এবং এভাবে নিক্ষেপ করার কারণেই মাছটি মারা গেছে। এমন মাছ নয়, যা সমুদ্রে এমনিতে মারা গেছে। এমন মাছের মৃত্যুর সম্বন্ধ তো সমুদ্রের দিকে করা যায় না। অথচ ইবারতে মাছের মৃত্যুর নিসবত [সম্বন্ধ] সমুদ্রের দিকেই করা হয়েছে।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجِرِّيْثِ وَالْمَارْمَاهِيْ وَاَنْوَاعِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ بِلَا ذَكَاةٍ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) لَا يَحِلُّ الْجَرَادُ اِلَّا اَنْ يَقْطَعَ الْاَخِذُ رَأْسَهُ وَيَشْوِيَهُ لِاَنَّهُ صَيْدُ الْبَرِّ وَلِهٰذَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ جَزَاءٌ يَلِيْقُ بِهِ فَلَا يَحِلُّ اِلَّا بِالْقَتْلِ كَمَا فِيْ سَائِرِهِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জিররীছ ও মারমাহী এবং সব ধরনের মাছ ও পঙ্গপাল জবাই ব্যতীত খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম মালেক (র.) বলেন, পঙ্গপাল হালাল হবে না যে পর্যন্ত শিকারী এর মাথা না কাটে এবং ভুনা না করে। কেননা এটা স্থলভাগের শিকার। এ কারণেই তো ইহরামকারীর উপর একে হত্যা করলে এর উপযুক্ত জাযা দিতে হয়। সুতরাং এটি হালাল হবে না হত্যা করা ব্যতীত, যেমন স্থলভাগের অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে হালাল হয় না। তাঁর বিপক্ষে [আমাদের] দলিল হচ্ছে আমাদের পূর্বে বর্ণিত হাদীস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجِرِّيْثِ الخ : উপরের ইবারতে বিভিন্ন প্রকারের মাছ ও পঙ্গপাল জবাই ব্যতীত খাওয়া যায়– এ সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। মাছের এক প্রকারের নাম জিররীছ (جِرِّيْث)। এ মাছ কালো রঙের হয়ে থাকে। আর মারমাহী হচ্ছে সাপের মতো লম্বা অনেকটা আমাদের দেশের লইট্যা প্রজাতির মতো মাছ। এ উভয় প্রকার মাছের মধ্যেই গণ্য। এছাড়া অন্যান্য যে কোনো মাছ ও পঙ্গপাল [যা যাফাড়িং চেয়ে আকৃতিতের কিছু বড় হয় এবং ঝাঁকে ঝাকে চলাফেরা করে] জবাই করা ছাড়াই খাওয়া যাবে। অর্থাৎ এ দু'টি প্রাণীকে জীবিত বা মৃত যেভাবেই পাওয়া যাক সেভাবে ইচ্ছা খাওয়া যাবে।

কিন্তু ইমাম মালেক (র.)-এর মতে পঙ্গপাল কে জবাই করতে হবে। অর্থাৎ পঙ্গপাল ধরে তার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে খাওয়া চলবে, অন্যথায় তা খাওয়া যাবে না। কেননা পঙ্গপাল স্থলভাগের একটি প্রাণী। স্থলভাগের যে কোনো হালাল প্রাণী খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার জন্য জবাই করতে হয়। অতএব, পঙ্গপাল এর ব্যতিক্রম হবে না। তিনি আরো বলেন, পঙ্গপাল স্থলভাগের প্রাণী হওয়ার কারণেই তো কোনো ইহরামকারী যদি পঙ্গপালকে হত্যা করে তাহলে তার উপর জাযা বা ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয়। অবশ্য তার মধ্যে দম ওয়াজিব হয় না; বরং তার অনুপাতে সদাকাহ করতে হয়।

আমাদের তথা আহনাফের দলিল হচ্ছে পূর্বে বর্ণিত হাদীস–

اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ اَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَاَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ .

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় মৃত মাছ খাওয়া যেমন বৈধ তদ্রূপ মৃত পঙ্গপাল খাওয়াও বৈধ। এ হাদীস ইমাম মালেক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল সাব্যস্ত হচ্ছে। এছাড়া ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে ইরশাদ করেন–

بَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ ذَكَاةُ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَاحِدَةٌ .

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মাছ ও পঙ্গপালের জবাই এক ধরনের। অর্থাৎ উভয়ই জবাই ব্যতীত খাওয়া চলে।

وَسُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْجَرَادِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْأَرْضِ وَفِيْهَا الْمَيِّتُ وَغَيْرُهُ فَقَالَ كُلْهُ كُلَّهُ وَهٰذَا عُدَّ مِنْ فَصَاحَتِهِ وَدَلَّ عَلٰى إِبَاحَتِهِ وَإِنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ بِخِلَافِ السَّمَكِ إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ اٰفَةٍ لِأَنَّا خَصَّصْنَاهُ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي الطَّافِيْ .

অনুবাদ : হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো পঙ্গপাল সম্পর্কে, যা লোকেরা জমিন থেকে ধরে থাকে, এগুলোর কতকগুলো মৃত এবং কতকগুলো জীবিত। তিনি বললেন, সব খাও। এটি হযরত আলী (রা.)-এর ফাসাহাতের [বাগ্মীতার] অন্তর্গত বাক্য এবং এটি পঙ্গপালের বৈধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছে যদিও তা এমনিতে মারা গিয়ে থাকে। তবে মাছ এর ব্যতিক্রম। যখন তা মারা যায় বিপদ ছাড়া [এমনিতে]। এ কারণেই আমরা মাছকে খাস করেছি এ হাদীসের কারণে যা ইরশাদ হয়েছে মৃত ভাসমান মাছের ব্যাপারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَسُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْجَرَادِ الخ : আলোচ্য ইবারতে মৃত পঙ্গপালের হালাল হওয়ার প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা.) -এর একটি বাণী দ্বারা দলিল দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, পঙ্গপাল জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় এবং মাছ জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় খাওয়া হালাল [একমাত্র ভাসমান মৃত মাছ ছাড়া।]

হযরত আলী (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল যে, আমাদের কেউ কেউ তো জমিন থেকে পঙ্গপাল ধরে। এদের মধ্যে কিছু থাকে মৃত, আবার কিছু থাকে জীবিত। এমতাবস্থায় এ [উভয় ধরনের] পঙ্গপালগুলো তার জন্য হালাল হবে কি ? উত্তরে হযরত আলী (রা.) বললেন– كُلْهُ كُلَّهُ সব খাও অর্থাৎ জীবিত এবং মৃত সবই খাও।

অতঃপর লেখক বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি كُلْهُ كُلَّهُ একটি ফাসাহাত তথা বাগ্মীতাপূর্ণ বাক্য। কেননা তিনি [শাব্দিকভাবে] একই ধরনের দু'টি শব্দ দ্বারা দু'টি ভিন্ন বিষয়ের জবাব দিয়েছেন। তার প্রথম শব্দ أَكَلَ يَأْكُلُ থেকে كُلْهُ আদেশসূচক শব্দ। আর "ه" সর্বনাম এর مَرْجِعْ হচ্ছে جَرَادٌ বা পঙ্গপাল। আর দ্বিতীয় كُلَّهُ হচ্ছে "ه" -এর তাকিদ।

হযরত আলী (রা.) উক্তিমূল দিক [যা এখানে উদ্দেশ্য তা হচ্ছে] সব ধরনের পঙ্গপাল হালাল হওয়ার বিষয়টি। যদিও পঙ্গপাল এমনিতে মারা গিয়ে থাকে। যদি কারো আঘাতে মারা না পড়ে তা সত্ত্বেও তা হালাল হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ السَّمَكِ إِذَا مَاتَ الخ : এখানে লেখক সব মৃত মাছের বিষয়টি এমন নয় বলে মন্তব্য করছেন। তিনি বলেন, যে মাছ এমনিতে মরে পানিতে ভেসে উঠে তা খাওয়া জায়েজ নয়। হাদীসের শব্দ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ -এর চাহিদা অনুযায়ী যদিও মৃত ভাসমান মাছ ও হালাল হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু অন্য হাদীস যা ভাসমান মৃত মাছের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে -এর কারণে ভাসমান মৃত মাছ এর হুকুম ভিন্ন। পক্ষান্তরে যেহেতু সাধারণ মৃত পঙ্গপালের ব্যাপারে কোনো হাদীস বর্ণিত নেই তাই এটি হালাল থাকবে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের কারণে।

ثُمَّ الْاَصْلُ فِي السَّمَكِ عِنْدَنَا اَنَّهُ إِذَا مَاتَ بِآفَةٍ يَحِلُّ كَالْمَأْخُوْذِ وَإِذَا مَاتَ حَتْفَ اَنْفِهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لَا يَحِلُّ كَالطَّافِي وَتَنْسَحِبُ عَلَيْهِ فُرُوْعٌ كَثِيْرَةٌ بَيَّنَّاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي وَعِنْدَ التَّاَمُّلِ يَقِفُ الْمُبَرِّزُ عَلَيْهَا مِنْهَا إِذَا قُطِعَ بَعْضُهَا فَمَاتَ يَحِلُّ اَكْلُ مَا أُبِيْنَ وَمَا بَقِيَ لِاَنَّ مَوْتَه بِآفَةٍ وَمَا أُبِيْنَ مِنَ الْحَيِّ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَمَيْتَتُهُ حَلَالٌ وَفِي الْمَوْتِ بِالْحَرِّ وَالْبَرْدِ رِوَايَتَانِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

অনুবাদ : [হিদায়ার লেখক বলেন] মাছের ব্যাপারে আমাদের মূলনীতি এই যে, যদি মাছ কোনো কারণে/বিপদে পড়ে মারা যায় তাহলে তা ধরা মাছের মতো হালাল। আর যদি এমনিতে হঠাৎ করে মারা যায় তাহলে তা ভাসমান মাছের মতো হালাল নয়। এই মূলনীতির উপর অনেকগুলো শাখা মাসআলা বের হয় যা আমি কিফায়াতুল মুনতাহী কিতাবে উল্লেখ করেছি। চিন্তা-ভাবনা করলে এসব শাখা মাসআলায় অবগতি লাভ করবে পারদর্শী লোকেরা। সেসব মাসআলার মধ্য হতে একটি মাসআলা হচ্ছে যদি কোনো মাছের কোনো অংশ কেটে নেওয়া হয় যাতে সেটি মারা যায় তাহলে বিচ্ছিন্ন করা অংশটুকু এবং যা বাকি রয়েছে উভয় খাওয়া হালাল সাব্যস্ত হবে। কেননা মাছটির মৃত্যু বিপদ তথা কেটে নেওয়ার দ্বারা হয়েছে। জীবন্ত কোনো পশুর কোনো অংশ কেটে নেওয়া হলে সে অংশটুকু মৃত সাব্যস্ত হয়। তবে মাছের মৃত অংশতো হালাল। তীব্র গরম বা শীতে মারা যাওয়া মাছের ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে [অর্থাৎ এক বর্ণনা মতে হালাল, অন্য মতে হারাম।] আল্লাহ সঠিক বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْاَصْلُ فِي السَّمَكِ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে মাছের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেন, মাছের ব্যাপারে একটি মূলনীতি এই যে, মাছ যদি বিশেষ কোনো কারণে মারা যায় তাহলে সে মাছ ধরা মাছের মতো হবে অর্থাৎ সেই মাছ খাওয়া হালাল হবে।

আর যদি কোনো কারণে না সরে বরং এমনিতেই মারা যায় তাহলে সেই মাছ ভাসমান মৃত মাছের মতো খাওয়ার অযোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়।

লেখক বলেন, এই মূলনীতির উপর অনেকগুলো শাখা মাসআলা বের হয়। আর জ্ঞানী বা দূরদর্শী লোক মূলনীতির ভিত্তিতে সেই মাসআলার সমাধান বের করে নেন।

এরপর লেখক সেই উদ্ভাবিত মাসআলাসমূহ থেকে দু'টি মাসআলা আলোচনা করেন−

প্রথম মাসআলা : প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে এই যে, একব্যক্তি একটি জীবিত মাছের একাংশ কেটে নিল, যার কারণে মাছটি তৎক্ষণাৎ মারা গেল। সুতরাং মাছটি সুনির্দিষ্ট আঘাতেই মারা পড়ল। অতএব, এ অবস্থায় অবশিষ্ট মাছটিও হালাল এবং কেটে নেওয়া টুকরাও হালাল হবে।

মাছটির হালাল হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট। অর্থাৎ মাছটি তার থেকে একাংশ কেটে নেওয়ার কারণে মারা গেছে। বাকি রইল কেটে নেওয়া টুকরাটি হালাল হবে কিভাবে? কারণ যে কোনো জীবিত প্রাণীর কেটে নেওয়া অংশ মৃত সাব্যস্ত হয়। সেই হিসেবে এখানে তা মৃত। আর মৃত মাছ যেভাবে হালাল সেইভাবে কেটে নেওয়া মৃত অংশও হালাল।

দ্বিতীয় মাসআলা : এক মাছের পেটে আরেকটি ছোট মাছ পাওয়া গেল। অথবা মাছকে পানি সজোরো আঘাত করে মেরে ফেলল। এমতাবস্থায় উভয় প্রকার মাছ খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা উভয় অবস্থায় মৃত্যুর সম্বন্ধ হচ্ছে একটি বাহ্যিক কারণের দিকে। আর তা হচ্ছে একটি মাছ আরেকটি মাছকে গলধকরণ এবং পানির আঘাত। এ জাতীয় আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِي الْمَوْتِ بِالْحَرِّ وَالْبَرْدِ رِوَايَتَانِ : লেখক বলেন, কোনো মাছ যদি প্রচণ্ড গরমে কিংবা তীব্র শীতে মারা যায় তাহলে সে মাছ খাওয়া যাবে কিনা? এ ব্যাপারে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা মতে এমন মাছ খাওয়া যাবে কারণ, এটি বিশেষ কারণে মারা গেছে। এটা এমন হলো যে, পানি যেন মাছটিকে শুকনো স্থানে ফেলে দিয়েছে, আর তাতে মাছটির মৃত্যু হয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ণনা মতে এরূপ মাছ খাওয়া যাবে না। কেননা গরম ও শীত মৌসুমের বৈশিষ্ট্য। এমন বৈশিষ্ট্যের কারণে মাছের মৃত্যু হয় না সাধারণত।

উল্লেখ্য যে, ইমাম কুদূরী (র.) দুটি মতকে কারো প্রতি সম্বন্ধ না করে মুতলাকভাবে উল্লেখ করেছেন। শাইখুল ইসলাম খাওয়াহির যাদাহ (র.) كِتَابُ الصَّيْدِ -এ উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে খাওয়া যাবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে খাওয়া যাবে।

الْعُيُوْنُ গ্রন্থেও এরূপ বলা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন—

إِذَا قَتَلَهَا بَرْدُ الْمَاءِ أَوْ حَرُّهُ لَمْ يُؤْكَلْ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّافِيْ .

যদি মাছকে পানির শীতলতা কিংবা উষ্ণতা মেরে ফেলে তাহলে তা খাওয়া যাবে না। তখন এটা ভাসমান মৃত মাছের পর্যায়ে গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, খাওয়া যাবে। কেননা মাছটি বিপদে মারা পড়েছে।

মাসআলা : আলকাফী কিতাবে বলা হয়েছে যে, কোনো অগ্নি উপাসকের শিকার ও তার জবাইকৃত জন্তু খাওয়া যাবে না। তবে যেসব প্রাণীর মাঝে জবাইয়ের প্রয়োজন হয় না যেমন মাছ ও পঙ্গপাল ইত্যাদি সেসব খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। এমনিভাবে এক্ষেত্রে মুরতাদের শিকার করা মাছ ও পঙ্গপালও খাওয়া যাবে।

মাসআলা : কোনো মুসলমান যদি অগ্নিউপাসকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর দ্বারা কোনো পশু শিকার করে তাহলে সে জন্তু খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

মাসআলা : যদি কেউ কোনো বকরি কিংবা গরু জবাই করে, অতঃপর সেই পশুটি নড়াচড়া করে/ এর থেকে রক্ত বের হয় তাহলে এ পশুটি খাওয়া হালাল। আর যদি নড়াচড়া না করে এবং রক্তও বের না হয় তাহলে পশুটি হালাল হবে না। এ মাসআলা তখনই কার্যকর হবে যখন জবাইয়ের সময় পশুটি জীবিত ছিল কিনা তা জানা না যায়। আর যদি জবাইয়ের সময় পশুটির মৃত না হওয়ার বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে পশুটি হালাল গণ্য হবে।

জ্ঞাতব্য : মাজমাউল আনহার গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৯৬ পৃষ্ঠায় গরম ও শীতের কারণে মারা যাওয়া পশুর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ফতোয়া এগুলো হালাল হওয়ার উপর। অর্থাৎ শীত/গরমে মারা যাওয়া মাছ হালাল।

كِتَابُ الْأُضْحِيَةِ

অধ্যায় : কুরবানি

পূর্বাপরের সাথে সম্পর্ক : পূর্বের অধ্যায়ের সাথে এ অধ্যায়ের সম্পর্ক গভীর। পূর্বে জবাই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে কুরবানি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। পরিভাষাগতভাবে জবাই হলো عام [আ'ম] আর কুরবানি হচ্ছে খাস। প্রথমে আম তথা ব্যাপকতর বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তারপর খাস -এর আলোচনা করা হয়েছে। খাসের পূর্বে আ'মের আলোচনা এজন্য অধিকতর উপযুক্ত যে, আ'ম খাসের অংশ বিশেষ হয়ে থাকে। আর অংশ বা جزء তার كل (সমগ্র) -এর আগে আসে। সে হিসেবে প্রথমে জবাইয়ের অধ্যায় আগে আনা হয়েছে অতঃপর কুরবানির অধ্যায় আনা হয়েছে।

এ দু'টির মাঝে আ'ম ও খাস -এর সম্পর্ক এভাবে যে, হালাল যে কোনো পশু খাওয়ার উপায় হচ্ছে জবাই। আর এ জবাই যে কোনো সময় যে কোনো হালাল পশুর ক্ষেত্রে হতে পারে। অতএব, এটি ব্যাপক। কিন্তু কুরবানি হচ্ছে বিশেষ সময়ে বিশেষ হালাল পশুর জবাই। যেহেতু কুরবানি সময় ও ক্ষেত্র উভয়ের সাথে নির্দিষ্ট সুতরাং তা খাস বা সংকীর্ণ হবে বৈকি।

এ অধ্যায়ের পর কিতাবুল কারাহিয়্যাহ –[মাকরূহ বিষয়সমূহের আলোচনা] কুরবানির ক্ষেত্রে কখনো কখনো মাকরূহ বিষয় চলে আসে তাই এরপর মাকরূহ বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

اَلْأُضْحِيَةُ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ :

অভিধানে أُضْحِيَةٌ বলা হয় ইয়ামুল আয্হায় [তথা যিলহজের দশ ও তার পরবর্তী দুই দিনে] যে পশুকে জবাই করা হয়।

أُضْحِيَةٌ শব্দটি أُفْعُولَةٌ -এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং أُضْحِيَةٌ -এর মূল ছিল أُضْحُوِيَةٌ; وَاوْ ও يَاء একত্র হয়েছে, প্রথমটি (وَاوْ) সাকিন, وَاوْ -কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে একটিকে অপরটির মাঝে ইদগাম করা হয়েছে। এর বহুবচন أَضَاحِيُّ।

বিখ্যাত ভাষাবিদ আযমাঈ (র.) বলেন, أُضْحِيَةٌ শব্দটি চারভাবে পড়া হয়– ১. هَمْزَه -এর উপর পেশ ২. هَمْزَه -এর নিচে যের ৩. ضَحِيَةٌ (هَمْزَه ব্যতীত) هَدِيَّةٌ -এর ওযনে ৪. أَضْحَاةٌ। এই ওযনের বহুবচন أَضْحٰى ব্যবহৃত হয়। যেমন أَرْطَاةٌ -এর বহুবচন أَرْطٰى ব্যবহৃত হয়।

ইমাম ফাররা (র.) বলেন, أُضْحِيَةٌ শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

শরয়ী পরিভাষায় أُضْحِيَةٌ বলা হয়– عِبَادَةٌ عَنْ ذَبْحِ حَيَوَانٍ مَخْصُوصٍ فِيْ وَقْتٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ
অর্থাৎ ছওয়াবের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রকারের পশু বিশেষ সময়ে [কুরবানির দিনগুলোতে] জবাই করা।

أُضْحِيَةٌ -এর শর্ত হচ্ছে– ১. মুসলমান হওয়া ২. সাবালক হওয়া ৩. মুসাফির না হওয়া এবং ৪. সুনির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক হওয়া।

এর সবব হচ্ছে কুরবানির দিন আসা। কুরবানির দিন যে এর সবব তা ইযাফত দ্বারা বুঝা যায়। কেননা বস্তুসমূহকে তার সববের দিকে ইযাফত করা হয়। অতঃপর যেহেতু সববের তাকরার হয় তাই বারবার কুরবানি করতে হয়, এর সবব সময় বলা হলে কেউ যদি আপত্তি করে যে, তাহলে তো সময়ের আগমনের সাথে সকলের উপর ওয়াজিব হবে। এমনকি দরিদ্র লোকদের উপরও তা আবশ্যক হবে।

এর উত্তর -ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হচ্ছে ধনাঢ্যতা বা নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া। [উল্লেখ্য যে, এতে قُدْرَةٌ مُمَكِّنَةٌ শর্ত, قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ শর্ত নয়। বিস্তারিত বিশ্লেষণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।]

কুরবানির হুকুম হচ্ছে দুনিয়াতে ওয়াজিব আদায়ের মাধ্যমে দায়িত্বমুক্ত হওয়া এবং আখেরাতে অশেষ ছওয়াব লাভ করা।

কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার দলিল : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এ আয়াতের তাফসীরে কাশ্শাফ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, নামাজ দ্বারা ঈদের নামাজ এবং اِنْحَرْ দ্বারা কুরবানি বা নহর করা উদ্দেশ্য।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (র.) বলেন, নামাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈদের নামাজ, আর নহর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উট নহর করা।

কুরবানি সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ.

অর্থাৎ রাসূল ﷺ দুটি দুম্বা কুরবানি করতেন এবং আমি [আনাস]ও দুটি দুম্বা কুরবানি করি।

তা ছাড়া কুরবানির ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রমাণিত।

قَالَ : اَلْاُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيْمٍ مُوْسِرٍ فِىْ يَوْمِ الْاَضْحٰى عَنْ نَفْسِهٖ وَعَنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ اَمَّا الْوُجُوْبُ فَقَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَ زُفَرَ وَالْحَسَنِ وَاِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ وَعَنْهُ اَنَّهَا سُنَّةٌ ذَكَرَهٗ فِى الْجَوَامِعِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىْ وَ ذَكَرَ الطَّحَاوِىُّ (رحـ) اَنَّ عَلٰى قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاجِبَةٌ وَعَلٰى قَوْلِ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهٰكَذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ الْاِخْتِلَافَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ঈদুল আযহার দিনে সচ্ছল, নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী মুসলমানের উপর কুরবানি ওয়াজিব, তার নিজের এবং ছোট সন্তানদের পক্ষ থেকে। ওয়াজিব হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.), ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর এক মতানুযায়ী। তাঁর থেকে আরেকটি মত রয়েছে সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে। যা তিনি তাঁর কিতাব জাওয়ামেতে উল্লেখ করেছেন। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত। ইমাম ত্বাহাবী (র.) উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুযায়ী ওয়াজিব। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এভাবে মতবিরোধ উল্লেখ করেছেন কতিপয় মাশাইখ (র.)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ اَلْاُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ الخ : আলোচ্য ইবারতে اُضْحِيَّة তথা কুরবানির হুকুম ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধসহ আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানি করা ওয়াজিব প্রত্যেক স্বাধীন, নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী, সচ্ছল-বিত্তশালী মুসলমানের উপর। এ ওয়াজিব সে কুরবানির দিনগুলোতে নিজের এবং নিজ ছোট নাবালেগ সন্তানের পক্ষে আদায় করবে।

ইবারতে প্রথমত স্বাধীন হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। কেননা এটা একটা সম্পদের ইবাদত, আর তা মালিকানা বা স্বত্ব ব্যতীত আদায় হয় না। যেহেতু দাসের কোনো মালিকানা নেই তাই এ ইবারতের জন্য স্বাধীন হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত মুসলমান হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। কেননা কুরবানি হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগি আর তা কাফেরের মাঝে কল্পনাও করা যায় না।

তৃতীয়ত মুসাফির না হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। কেননা মুসাফিরের পক্ষে তা আদায় করা কষ্টকর হবে।

চতুর্থত সচ্ছল বা বিত্তশালী হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ শর্ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন– مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে অথচ কুরবানি করল না .....। দরিদ্র লোকের যেহেতু সামর্থ্য নেই তাই তাদের উপর কুরবানি করা আবশ্যক পর্যায়ের নয়।

قَوْلُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ : এ কথাটির সম্পর্ক وَاجِبَةٌ -এর সাথে। সুতরাং অর্থ হবে তার নিজের পক্ষ থেকে এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে ওয়াজিব।

হিদায়ার লেখক বলেন, ওয়াজিব হওয়ার মতটি ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.) , ইমাম যুফার ও হাসান (র.)-এর। তাদের সাথে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর একটি মতও পাওয়া যায়। এছাড়া ইমাম মালেক (র.), লাইছ (র.) ও আওযায়ী (র.) প্রমুখের মতও ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর আরেকটি মত ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে, তিনি তাঁর রচিত اَلْجَوَامِعُ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কুরবানি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতেও কুরবানি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-সহ আরো অনেকে এই অভিমত পোষণ করেন।

قَوْلُهُ وَ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ : লেখক এখান থেকে ইমাম ত্বাহাবী (র.)-এর মত উল্লেখ করেন যে, তিনি তাঁর রচিত কিতাবে উপরিউক্ত মাসআলায় মতবিরোধটি ভিন্ন আঙ্গিকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কুরবানি ওয়াজিব। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে কুরবানি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। লেখক আরো বলেন, কতিপয় মাশায়েখ মতবিরোধটিকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা এই যে, ইমাম কুদূরী (র.)-এর বর্ণনা মতে কুরবানির ব্যাপারে মতবিরোধ তারফাইনের সাথে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর। পক্ষান্তরে ইমাম ত্বাহাবী (র.) -এর বর্ণনা মতে মতবিরোধ ইমাম আ'যমের সাথে সাহেবাইন (র.)-এর। সুন্নত ও ওয়াজিব উভয় মতাবলম্বীর দলিল সামনের ইবারতে উল্লেখ করা হচ্ছে।

وَجْهُ السُّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُضَحِّيَ مِنْكُمْ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَاَظْفَارِهِ شَيْئًا وَالتَّعْلِيْقُ بِالْاِرَادَةِ يُنَافِي الْوُجُوْبَ وَلِاَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْمُقِيْمِ لَوَجَبَتْ عَلَى الْمُسَافِرِ لِاَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَظَائِفِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكٰوةِ وَصَارَ كَالْعَتِيْرَةِ وَ وَجْهُ الْوُجُوْبِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا وَمِثْلُ هٰذَا الْوَعِيْدِ لَا يَلْحَقُ بِتَرْكِ غَيْرِ الْوَاجِبِ وَلِاَنَّهَا قُرْبَةٌ يُضَافُ اِلَيْهَا وَقْتُهَا يُقَالُ يَوْمَ الْاَضْحٰى وَ ذٰلِكَ يُؤْذِنُ بِالْوُجُوْبِ لِاَنَّ الْاِضَافَةَ لِلْاِخْتِصَاصِ وَهُوَ بِالْوُجُوْدِ وَالْوُجُوْبُ هُوَ الْمُفْضِيْ اِلَى الْوُجُوْدِ ظَاهِرًا بِالنَّظْرِ اِلَى الْجِنْسِ غَيْرَ اَنَّ الْاَدَاءَ يَخْتَصُّ بِاَسْبَابٍ يَشُقُّ عَلَى الْمُسَافِرِ اِسْتِحْضَارُهَا يَفُوْتُ بِمَضِيِّ الْوَقْتِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ ـ

অনুবাদ : সুন্নাতের দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানি করার ইচ্ছা করেছে সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে। ইচ্ছার সাথে কুরবানিকে শর্ত করা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থি। আর তাছাড়া যদি তা নিজ এলাকায় অবস্থানকারীর উপর ওয়াজিব হয় তাহলে তো মুসাফিরের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা এ দু'ব্যক্তি আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে ভিন্নতর হয় না, যেমন– জাকাত [এর বেলায় দু'জনের মাঝে কোনো তারতম্য নেই।] ফলত: এটি (কুরবানি) আতীরা -এর মতোই হলো। আর ওয়াজিব হওয়ার দলিল রাসূল ﷺ-এর হাদীস : যে ব্যক্তি (কুরবানির) সামর্থ্য রাখে অথচ সে কুরবানির ব্যবস্থা করল না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। ওয়াজিব নয় এমন কাজ বর্জন করার সাথে এ জাতীয় সতর্কবাণী যুক্ত করা হয় না। অধিকন্তু এটি একটি ইবাদত, যার সাথে এর সময়ের সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয় ইয়ামুল আয্হা। আর এটা ওয়াজিব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা সম্বন্ধ (ইযাফত) করা হয় খাস করার উদ্দেশ্যে। আর তা খাস তখনই হবে যখন কুরবানি অস্তিত্ববান [শরিয়তের] মুকাল্লাফ তথা মানুষের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করলে [দেখা যায় যে,] ওয়াজিব বা আবশ্যকতাই কুরবানিতে অস্তিত্ববান [বা অবশ্যম্ভাবী] করে তোলে। তবে এর আদায় এমন উপায়-উপকরণের সাথে সম্পর্কিত যার ব্যবস্থাকরণ মুসাফিরের জন্য কষ্টসাধ্য। আর তা সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে ফওতও হয়ে যায়। সুতরাং তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে না। যেমন জুমা [ওয়াজিব হয় না]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجْهُ السُّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اَرَادَ الخ : আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) প্রথমে কুরবানি সুন্নত হওয়ার মতাবলম্বীদের দলিল আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাদের দলিল পেশ করেছেন।

সুন্নাত হওয়ার মতাবলম্বীদের প্রথম দলিল রাসূল ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীস–

مَنْ اَرَادَ اَنْ يُضَحِّيَ مِنْكُمْ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَاَظْفَارِهِ شَيْئًا

অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্য হতে যে কুরবানি করার ইচ্ছা করবে সে যেন তার কোনো চুল-পশম ও নখ না কাটে।' হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) ছাড়া অনেকে বর্ণনা করেছেন। বিশেষভাবে ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র.)-সহ অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; সনদসহ নিম্নে হাদীসটি উল্লেখ করা হলো–

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأى هِلَالَ ذِي الْحَجَّةِ مِنْكُمْ وَاَرَادَ اَنْ يُّضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَاَظْفَارِهِ ـ

وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ বা দলিল বর্ণনা করা হয় এভাবে যে, হাদীসটি রাসূল ﷺ কুরবানির কাজটিকে ইচ্ছার সাথে যুক্ত করেছেন। আর কোনো কাজকে ইচ্ছা বা ইরাদার সাথে যুক্ত করা এর ওয়াজিব না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

এ সম্পর্কিত আরেকটি হাদীস যা মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ করা হয়েছে তা এই–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ اَلْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحٰى ـ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেন, তিনটি বিষয় আমার জন্য ফরজ, অথচ তা তোমাদের জন্য নফল। ১. বিতিরের নামাজ ২. কুরবানি করা ৩. চাশ্তের নামাজ।'

এ হাদীসের রাবী আবূ জানব আল্ কালবী -এর ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনের আপত্তি রয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল : যুক্তি বা কিয়াস। আর তা এই যে, আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে মুসাফির ও মুকীম উভয়ে সমান। যেমন জাকাত একটি আর্থিক ইবাদত। এতে মুসাফির ও মুকীম এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। মুকীমের উপর যেমন জাকাত ওয়াজিব হয় তদ্রূপ মুসাফিরের উপরও জাকাত ওয়াজিব হয়। যেহেতু কুরবানি করা আর্থিক ইবাদত, আর তা মুসাফিরের উপর ওয়াজিব হয় না। সুতরাং এটা মুকীমের উপরও ওয়াজিব হবে না।

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে আতীরা (عَتِيْرَةٌ) এটিও মুসাফির ও মুকীম কারো উপরই ওয়াজিব হয় না। অর্থাৎ ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে উভয়ে সমান।

আতীরা বলা হয় জাহেলী যুগে এবং ইসলামের সূচনাকালে রজব মাসে আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জবাইকৃত বকরি। প্রথমে এ বিধান ওয়াজিব ছিল, পরে কুরবানির হুকুম দেওয়া হলে এ বিধান রহিত হয়ে যায়। বর্তমানে মুকীম ও মুসাফির কারো উপরই এ বিধান কার্যকর নয়।

ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে মত পোষণকারী ইমাম আযম (র.)-এর দলিল।

প্রথম দলিল : হাদীসে রাসূল ﷺ – مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

অর্থাৎ 'যে কুরবানি করার সামর্থ্য রাখে, অথচ কুরবানি করে না। সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে।' হাদীসটি ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত। সনদসহ হাদীসটি এরূপ–

عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهٗ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَاَبُوْ يَعْلَى الْمُوْصِلِيْ فِيْ مَسَانِيْدِهِمْ ـ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِيْ سُنَنِهٖ وَالْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ ـ

এ হাদীসটি মাওকূফ ও মারফূ' উভয়রূপে বর্ণিত আছে।

এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে اَلتَّنْقِيْحُ গ্রন্থের মুসান্নিফ বলেন, ইবনে মাজাহ বর্ণিত হাদীসের প্রত্যেক বর্ণনাকারী বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। এদের মধ্যে শুধুমাত্র عَبْدُ بْنُ عَيَّاشٍ اَلْقِتْبَانِيْ আছেন, যার থেকে ইমাম মুসলিম একা বর্ণনা করেছেন; কিন্তু ইমাম বুখারী (র.) করেননি।

এ হাদীসের দ্বারা দলিল বর্ণনা করা হয় এভাবে যে, যারা কুরবানি সামর্থ্য রাখে অথচ কুরবানি দেয় না রাসূল ﷺ তাদের ঈদগাহে উপস্থিত না হওয়ার কড়া নির্দেশ জারি করেছেন। এ জাতীয় ধমক বা সতর্কবাণী কেবলমাত্র আবশ্যকীয় কোনো কাজ বর্জন করার কারণে দেওয়া হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানি অবশ্যই ওয়াজিব। যদি তা হতো রাসূল ﷺ এমন কড়া ধমক দিতেন না।

এ সংক্রান্ত দ্বিতীয় হাদীস–

اَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ بْنِ نَيَّارٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِي جَذْعَةً قَالَ اِذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ ـ

রাসূল ﷺ এ হাদীসে জবাই করার আদেশ প্রদান করেছেন। সাধারণভাবে ওয়াজিব ও ফরজের মধ্যে আদেশসূচক বাক্য ব্যবহার করা হয়।

আরেকটি হাদীস–

اَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ شَرِيْكٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الْمُكْتِبُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَسَخَ الْاَضْحٰى كُلَّ ذَبْحٍ وَرَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ ـ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেছেন, কুরবানি অন্যসব জবাইকে এবং রমজান অন্যসব রোজাকে মানসূখ করে দিয়েছে।'

এ হাদীসগুলো দ্বারা কুরবানি ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ হয়।

এরপর হিদায়ার লেখক যৌক্তিক দলিল পেশ করেন। বলার সময় ইযাফত তথা সম্বন্ধ করে يَوْمُ الْاَضْحٰى বলা হয়। এ যুক্ত শব্দে কুরবানি (ضُحٰى) শব্দটির প্রতি يَوْمُ বা সময়কে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধ করা হয়েছে খাস ও নির্দিষ্ট করার জন্যে। অর্থাৎ এ দিনটি বা দিনগুলো কুরবানির সাথে খাস ও নির্দিষ্ট। আর এ খাস হওয়া এভাবে প্রমাণ হয় যখন কুরবানি সেই দিন/দিনগুলোতে পাওয়া যাবে।

যদি কুরবানিকে সুন্নত বলা হয় তাহলে এমন সুরত হওয়া অসম্ভব নয় যে, সকলে [সুন্নত হওয়ার কারণে] কুরবানি ছেড়ে দিল। আর তখন সেই দিন/ দিনগুলোতে কুরবানি না পাওয়া যাওয়াতে সেই দিন/দিনগুলোকে কুরবানির সাথে খাস/নির্দিষ্ট করা হলো না। এজন্যই কুরবানির অস্তিত্ববান হওয়ার জন্য কুরবানি ওয়াজিব ও আবশ্যক হওয়া দরকার, যাতে খাস ও নির্দিষ্ট করা প্রমাণ হয়। যেমন يَوْمُ الْجُمُعَةِ জুমার দিন; এতে জুমা ওয়াজিব। وَقْتُ الظُّهْرِ যোহরের ওয়াক্ত, এতে যোহরের নামাজ ফরজ ও شَهْرُ رَمَضَانَ এতে রমজান তথা রোজা ফরজ।

قَوْلُهُ غَيْرَ اَنَّ الْاَدَاءَ يَخْتَصُّ بِاَسْبَابٍ : এ ইবারত দ্বারা সুন্নতের মতাবলম্বীদের আপত্তির জবাব দেওয়া হচ্ছে। তাদের আপত্তি এই ছিল যে, আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে মুকীম ও মুসাফিরের মাঝে কোনো তারতম্য হয় না। সে হিসেবে মুসাফিরের উপরও কুরবানি ওয়াজিব হওয়া চাই।

এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে, কুরবানি করার জন্য কতিপয় উপায়-উপকরণের তথা শর্তাদির প্রয়োজন। আর সেই শর্তাদির যথাযথ ব্যবস্থা করা মুসাফিরের পক্ষে সম্ভব নয় অথবা খুব কষ্টসাধ্য। তাছাড়া কুরবানি করার সময়ও সুনির্দিষ্ট। এ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কুরবানি করার সুযোগ থাকে না। এজন্য শরিয়ত মুসাফিরকে কুরবানি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

কুরবানির বিশেষ শর্তাদি যেমন– ত্রুটিমুক্ত কুরবানির পশুর ব্যবস্থা করা, শহরে ইমাম সাহেব ঈদের নামাজ পড়ানো শেষ করেছেন এ বিষয় নিশ্চিত করা ইত্যাদি। তাছাড়া যথাসময়ে পর্যাপ্ত টাকার ব্যবস্থা করা। এই বিষয়গুলো এমন যে, মুসাফিরের পক্ষে এ সবগুলোর যথাযথ ব্যবস্থা কষ্টকর।

قَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ : লেখক বলেন, মুসাফিরের জন্য জুমার নামাজ রহিত হওয়ার মতো কুরবানির বিষয়টি। অর্থাৎ জুমার নামাজের শর্তাদি কঠিন হওয়ার কারণে যেমন মুসাফিরের উপর জুমা ওয়াজিব নয়, তদ্রূপ তার উপর কুরবানির শর্তাদি কঠিন হওয়ার কারণে কুরবানিও ওয়াজিব নয়।

জ্ঞাতব্য : হাজী সাহেবান মিনা প্রান্তরে যেহেতু মুসাফির বলে গণ্য হন তাই তাদের উপর কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। তবে তামাত্তু' ও কিরান হজ আদায়কারীদের উপর তামাত্তু ও কিরানের কারণে দমে শুকর আদায় করা ওয়াজিব।

وَالْمُرَادُ بِالْاِرَادَةِ فِيْمَا رُوِيَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ مَا هُوَ ضِدُّ السَّهْوِ لَا التَّخْيِيْرُ وَالْعَتِيْرَةُ مَنْسُوْخَةٌ وَهِيَ شَاةٌ تُقَامُ فِيْ رَجَبَ عَلٰى مَا قِيْلَ ـ

অনুবাদ : হাদীসে উল্লিখিত ইরাদা বা ইচ্ছা দ্বারা উদ্দেশ্য -আল্লাহই বেশি জানেন ভুলে যাওয়ার বিপরীত হওয়া। এর দ্বারা কুরবানির ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। আতীরা রহিত হয়ে গেছে। কথিত আছে, আতীরা বলা হয় রজব মাসে যে বকরি জবাই করা হয়, তাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْاِرَادَةِ فِيْمَا الخ : আলোচ্য অংশে হিদায়ার মুসান্নিফ সুন্নতের পক্ষে মত বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসের জবাব দিয়েছেন। তারপর তিনি আতীরার পরিচয় উল্লেখ করেছেন, ইতিপূর্বে বলা হয়েছিল যে, হাদীসে বর্ণিত مَنْ اَرَادَ اَنْ الخ দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয় যে, কুরবানি ওয়াজিব নয়। কারণ ইরাদা বা ইচ্ছা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থি। এ কথার জবাবে লেখক বলেন, اِرَادَةٌ বা ইচ্ছার মর্মার্থ আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন। তবে আমাদের মতে, হাদীসে ইরাদার উদ্দেশ্য দৃঢ় ইচ্ছা করা যা ভুলে যাওয়ার বিপরীত শব্দ। ভুলে যাওয়ার বিপরীত শব্দ আরবিতে قَصَدَ। সুতরাং হাদীসের ইবারত যেন এমন مَنْ قَصَدَ اَنْ يُضَحِّيَ مِنْكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুরবানির দৃঢ় ইচ্ছা করেছে।

হাদীসের ইরাদার অর্থ স্বাধীনতা নয়। অর্থাৎ ইরাদার অর্থ এই যে, কুরবানি করা এবং না করার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকবে। উপরে ইরাদার যে অনুবাদ করা হলো তাতে ওয়াজিব না হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যেমন কেউ বলল : مَنْ اَرَادَ الصَّلٰوةَ فَلْيَتَوَضَّأْ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নামাজের ইচ্ছা করে সে যেন অজু করে। স্বাভাবিকভাবেই এ বাক্যের অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তির নামাজ পড়া বা না পড়ার স্বাধীনতা রয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْعَتِيْرَةُ مَنْسُوْخَةٌ : এ বাক্য দ্বারা লেখক প্রতিপক্ষের একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। তারা বলেছিল যে, আতীরা -এর মতো হয়ে গেল, যা মুকীম ও মুসাফির কারো উপরই ওয়াজিব নয়।

উত্তরে লেখক বলেন, যেহেতু আতীরার বিধান রহিত হয়ে গেছে। তাই তার ওয়াজিব না হওয়ার উপর দলিল প্রদান করা চলে না।

আর আতীরা যে মানসূখ এ ব্যাপারে হাদীসে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়।

সিহাহ সিত্তাহ -এর ছয় লেখক তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন−

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ ـ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেন, মাদী জন্তুর প্রথম বাচ্চা উৎসর্গ করার এবং আতীরা জবাই করার বিধান আর নেই।'

قَوْلُهُ وَهِيَ شَاةٌ تُقَامُ فِيْ رَجَبَ : এখান থেকে লেখক আতীরা (عَتِيْرَةٌ) -এর সংজ্ঞা উল্লেখ করেন যে, আতীরা হচ্ছে [জাহেলী যুগে ও ইসলামের সূচনাকালে] রজব মাসে জবাই করা বকরি। তারা রজব মাসের সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এরূপ করত।

কোনো কোনো গ্রন্থে বলা হয়েছে আতীরা একটি মূর্তি, যার সামনে তারা বকরিটি জবাই করত। যেহেতু আতীরার সংজ্ঞায় মতবিরোধ রয়েছে তাই লেখক عَلٰى مَا قِيْلَ বলেছেন।

وَاِنَّمَا اِخْتَصَّ الْوُجُوْبَ بِالْحُرِّيَّةِ لِاَنَّهَا وَظِيفَةٌ مَالِيَّةٌ لَا تَتَادَّى اِلَّا بِالْمِلْكِ وَالْمَالِكُ هُوَ الْحُرُّ وَبِالْاِسْلَامِ لِكَوْنِهَا قُرْبَةً وَبِالْاِقَامَةِ لِمَا بَيَّنَّا وَالْيَسَارُ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ اشْتِرَاطِ السَّعَةِ وَمِقْدَارُهُ مَا يَجِبُ بِهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَقَدْ مَرَّ فِى الصَّوْمِ وَالْوَقْتُ وَهُوَ يَوْمُ الْاَضْحٰى لِاَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِهِ وَسَنُبَيِّنُ مِقْدَارَهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى . وَتَجِبُ عَنْ نَفْسِهِ لِاَنَّهُ اَصْلٌ فِى الْوُجُوْبِ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّاهُ وَعَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيْرِ لِاَنَّهُ فِىْ مَعْنٰى نَفْسِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ كَمَا فِىْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَهٰذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَ رُوِىَ عَنْهُ اَنَّهُ لَا يَجِبُ عَنْ وَلَدِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ لِاَنَّ السَّبَبَ هُنَاكَ رَأْسٌ يَمُوْنُهُ وَيَلِىْ عَلَيْهِ وَهُمَا مَوْجُوْدَانِ فِى الصَّغِيْرِ وَهٰذِهِ قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ وَالْاَصْلُ فِى الْقُرَبِ اَنْ لَا تَجِبَ عَلَى الْغَيْرِ بِسَبَبِ الْغَيْرِ وَلِهٰذَا لَا تَجِبُ عَنْ عَبْدِهِ وَاِنْ كَانَ يَجِبُ عَنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ .

অনুবাদ : [কুরবানি] ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি স্বাধীন ব্যক্তির সাথে খাস-নির্দিষ্ট। কেননা এটা সম্পদের ইবাদত; যা মালিকানা ব্যতীত আদায় হয় না। আর মালিক তো কেবল স্বাধীন ব্যক্তিই হতে পারে এবং কুরবানি মুসলমানের সাথে খাস। কেননা এটা একটা ইবাদত [আর ইবাদত ইসলাম ব্যতীত আদায় হয় না।] আর কুরবানিকে নিজ এলাকায় অবস্থান করা অবস্থার সাথে খাস করা হয়েছে -এর কারণ ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আর স্বচ্ছলতার সাথে খাস করার বিষয়টি আমাদের বর্ণিত হাদীসের মাঝে শর্ত করা হয়েছে। আর সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে যার দ্বারা সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হয়। আর এ সংক্রান্ত আলোচনা রোজা অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সময় হচ্ছে আয্‌হার দিন। কেননা কুরবানি সেই দিনের সাথে খাস। এর পরিমাণ আমরা সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। কুরবানি নিজের পক্ষ থেকে করা ওয়াজিব। কেননা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সেই মূল বা আসল -যার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। এবং তার ছোট [নাবালেগ] সন্তানের পক্ষে কুরবানি করা ওয়াজিব। কেননা ছোট সন্তানাদি নিজের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। অতএব, ছোট সন্তান তার সাথে যুক্ত হবে। যেমন– সদকাতুল ফিত্‌রের মাঝে। এটি হাসান ইবনে যিয়াদ কর্তৃক বর্ণিত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর সন্তানের পক্ষে ওয়াজিব হবে না। আর এটাই জাহেরী রেওয়ায়েত। সদকাতুল ফিত্‌রের বিষয়টি এমন নয়। কেননা তাতে সবব হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার সে ভরণপোষণ করে এবং যার উপর তার পূর্ণ কর্তৃত্ব চলে। আর এ উভয়টি ছোট নাবালেগ সন্তানের মাঝে পাওয়া যায়। তাছাড়া এটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে তা অন্যের উপর অন্যের কারণে ওয়াজিব হয় না। আর এজন্যই কুরবানি নিজ গোলামের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয় না। যদিও গোলামের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الْوُجُوْبُ بِالْحُرِّيَّةِ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে কুরবানি আদায়কারীর জন্য যেসব শর্তাবলি প্রযোজ্য সেসব শর্তাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত ছিল–

اَلْاُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيْمٍ مُوْسِرٍ فِىْ يَوْمِ الْاَضْحٰى

এ ইবারতে প্রথমত শর্ত করা হয়েছে স্বাধীন হওয়ার। অর্থাৎ কুরবানি আদায়কারী স্বাধীন ব্যক্তি হবে; গোলাম হবে না। এই শর্তের তাৎপর্য এই যে, কুরবানি সম্পদের উপর আরোপিত একটি ইবাদত। সম্পদের মালিকানা ছাড়া সম্পদের ইবাদত আদায় করা সম্ভব নয়। যেহেতু গোলামের মধ্যে মালিক হওয়ার যোগ্যতাই নেই; বরং গোলাম নিজেই অন্যের অধিকারভুক্ত এবং মালিকানাধীন তাই গোলামের পক্ষে এই ইবাদত করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে মুসলমান হওয়া। মুসলমান হওয়ার শর্তটি যে কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ কাফের কোনো ইবাদতের যোগ্য নয়। আল্লাহর ইবাদত মুসলমানের সাথে খাস।

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে মুকিম হওয়া বা কুরবানি আদায়কারী নিজ এলাকায় অবস্থান করা। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, কুরবানির ক্ষেত্রে এমন শর্তাদি রয়েছে যা মুসাফিরের পক্ষে কষ্টসাধ্য।

৪র্থ শর্ত বিত্তবান বা সচ্ছল হওয়া। কেননা মালের ইবাদত মাল ছাড়া ওয়াজিব হয় না। তাছাড়া হাদীসের মধ্যে সামর্থ্য থাকার শর্ত করা হয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে– مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি কুরবানি করার সামর্থ্য রাখে অথচ কুরবানি করে না .....।'

৫ম শর্ত কুরবানির ওয়াক্ত বা সময় হওয়া। অর্থাৎ কুরবানির জন্য কুরবানির দিনসমূহ আগমন করা জরুরি। সেই দিনগুলো ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় কুরবানি করা চলে না।

قَوْلُهُ وَمِقْدَارُهُ مَا يَجِبُ بِهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ : আলোচ্য অংশে লেখক উল্লেখ করেন যে, কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য এমন পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হওয়া আবশ্যক যার দ্বারা কোনো মানুষের উপর সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হয়।

উল্লেখ্য যে, সদকায়ে ফিত্‌রের নিসাব আর জাকাতের নিসাব এক নয়। ১. জাকাতের নিসাবের মধ্যে সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া আবশ্যক; কিন্তু সদকায়ে ফিত্‌রের মধ্যে এরূপ শর্ত নেই। ২. জাকাতের নিসাবের মধ্যে নিসাব পরিমাণ মাল হওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরি। পক্ষান্তরে সদকায়ে ফিত্‌রের মাঝে এরূপ শর্ত নেই।

৩. সদকায়ে ফিত্‌রের নিত্যপ্রয়োজনীয় মাল ও জাকাতের নিত্যপ্রয়োজনীয় মালের মাঝেও পার্থক্য আছে।

অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, সদকায়ে ফিত্‌র, কুরবানি ও হজের নিসাব قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ -এর দ্বারা হয়ে যায়; কিন্তু জাকাতের নিসাব হওয়ার জন্য قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, যদি কোনো কৃষকের কাছে দু'টি হালের বলদ থাকে, যাদের সে পুরো বছর হালের জন্য চালায় না; বরং এক মৌসুম কিংবা দুই মৌসুম চালায় এতদ্বসত্ত্বেও তার এ বলদ দু'টি মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু বলে গণ্য হবে এবং এগুলোর কারণে তার উপর জাকাত প্রদান করা আবশ্যক হবে না।

قَوْلُهُ وَتَجِبُ عَنْ نَفْسِهِ الخ : উপরের ইবারতে লেখক কাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব হয় তা আলোচনা করছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন, কুরবানি নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের ছোট সন্তান তথা নাবালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয়। এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরবানি সদকায়ে ফিতরের মতো। সদকায়ে ফিতর যেমন নিজের উপর ও নিজের নাবালেগ সন্তানের উপর ওয়াজিব হয় তদ্রূপ কুরবানিও ব্যক্তির নিজের উপর ও নিজ সন্তানের উপর ওয়াজিব হয়।

ব্যক্তি তথা মুকাল্লাফের উপর ওয়াজিব হওয়ার বিষয় তো সুস্পষ্ট যে, তার উপর শরিয়তের হুকুম আরোপিত হয়েছে। সুতরাং সে তো ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তি। আর ছোট সন্তানের পক্ষ থেকে এজন্য আদায় করবে যে, তারাও তারই হুকুমে।

উল্লেখ্য যে, ছোট নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ থেকে কুরবানি আদায় করা ওয়াজিব কিনা এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর থেকে দু ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এইমাত্র উল্লিখিত বর্ণনাটি হাসান ইবনে যিয়াদ সূত্রে বর্ণিত।

অন্য বর্ণনাটি জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী। জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হচ্ছে ছোট বাচ্চাদের পক্ষ থেকে কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। আল্লামা কাযীখানের মতে জাহেরী রেওয়ায়েতের উপরই ফতোয়া।

স্মর্তব্য যে, প্রথম মত অনুযায়ী ছোট নাবালেগ বাচ্চাদের ব্যাপারে কুরবানি ও সদকায়ে ফিতর একই বুঝা যায়। অর্থাৎ সদকায়ে ফিতর যেমন ছোট নাবালেগ বাচ্চাদের পক্ষ থেকে আদায় করতে হয়, তদ্রূপ নাবালেগ বাচ্চাদের পক্ষ থেকে কুরবানিও করতে হয়। পক্ষান্তরে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী ছোট নাবালেগ বাচ্চাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়, তবে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। কুরবানি ও সদকায়ে ফিতর আলাদা হওয়ার কারণ কি? এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখক বলেন, সদকাতুল ফিতরের সবব বা কার্যকারণ হচ্ছে অধীনস্থ লোকদের ভরণপোষণ এবং তত্ত্বাবধান অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি / ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে যাদের সে [মুকাল্লাফ] ভরণপোষণ দেয় এবং যাদের তত্ত্বাবধান করে। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি তার ছোট নাবালেগ সন্তানদের ভরণপোষণ দেয় এবং তত্ত্বাবধান করে তাই প্রত্যেক ব্যক্তির তার ছোট নাবালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা জরুরি।

কিন্তু কুরবানি বা বিশেষ দিনে পশু জবাই করার বিষয়টি এমন নয়। কারণ কুরবানি একটি খালেস ও পূর্ণাঙ্গ ইবাদত। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, ইবাদত কোনো ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির কারণে ওয়াজিব হয় না।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا لَا تَجِبُ عَنْ عَبْدِهِ الخ : লেখক বলেন, যেহেতু কুরবানি একটি খালেস ইবাদত এবং তা অন্যের কারণে কারো উপর ওয়াজিব হয় না তাই গোলামের পক্ষ থেকে কুরবানি করা মনিবের উপর ওয়াজিব হবে না। অথচ গোলামের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা মনিবের উপর ওয়াজিব হয়। সুতরাং এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুরবানি সদকাতুল ফিতরের মতো নয়।

উল্লেখ্য যে, ছোট-নাবালেগ বাচ্চাদের পক্ষ থেকে কুরবানি ওয়াজিব হওয়া বা না হওয়া সংক্রান্ত এ আলোচনা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ছোট-নাবালেগ বাচ্চার কাছে স্বতন্ত্র নেসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকবে। আর যদি কোনো নাবালেগ বাচ্চার কাছে মাল থাকে তাহলে তার বিধান কি হবে– এর ব্যাখ্যা সামনে আসছে।

وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيْرِ مَالٌ يُضَحِّيْ عَنْهُ أَبُوْهُ أَوْ وَصِيُّهُ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ يُضَحِّيْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لاَ مِنْ مَالِ الصَّغِيْرِ فَالْخِلاَفُ فِيْ هٰذَا كَالْخِلاَفِ فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَقِيْلَ لاَ يَجُوْزُ التَّضْحِيَةُ مِنْ مَالِ الصَّغِيْرِ فِيْ قَوْلِهِمْ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ تَتَأَدّٰى بِالْإِرَاقَةِ وَالصَّدَقَةُ بَعْدَهَا تَطَوُّعٌ فَلاَ يَجُوْزُ ذٰلِكَ مِنْ مَالِ الصَّغِيْرِ وَلاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَّأْكُلَ كُلَّهُ وَالْأَصَحُّ أَنْ يُّضَحِّيَ مِنْ مَالِهِ وَيَأْكُلُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهُ وَيُبْتَاعُ بِمَا بَقِيَ مَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ.

অনুবাদ : যদি ছোট-নাবালেগ সন্তানের কাছে সম্পদ থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে তার পিতা [যদি থাকেন] কুরবানি করবে অথবা [যদি তার পিতা না থাকেন তাহলে পিতা কর্তৃক নিযুক্ত] তার অভিভাবক তার সম্পদ থেকে কুরবানি করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, [পিতা] নিজ সম্পদ থেকে কুরবানি করবে, নাবালেগ সন্তানের সম্পদ থেকে নয়। এ মতবিরোধ সদকাতুল ফিত্‌রের মতবিরোধের মতো। কেউ কেউ বলেন, তাদের সকলের মতেই কুরবানি নাবালেগ সন্তানের মাল থেকে করা বৈধ নয়। কেননা [এক্ষেত্রে] ইবাদত আদায় হয় কুরবানির পশুর রক্ত প্রবাহিতকরণ [জবাই]-এর মাধ্যমে। আর জবাইয়ের পর [গোশত] দান করা [তা নফল কাজ] আর নাবালেগের মাল থেকে নফল [স্বতঃস্ফূর্ত] দান নাজায়েজ। আর তার পক্ষে সব গোশত ভক্ষণ করাও সম্ভব নয়। সবচেয়ে বিশুদ্ধমত এই যে, নাবালেগ বাচ্চার মাল থেকেই কুরবানি করবে। সে তা থেকে যতটুকু সম্ভব খাবে, আর অবশিষ্ট গোশতের বিনিময়ে এমন বস্তু খরিদ করা হবে যা থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيْرِ مَالٌ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে লেখক ছোট-নাবালেগ সন্তানের স্বতন্ত্র কুরবানি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যদি কোনো নাবালেগ বাচ্চার মালিকানাধীন এই পরিমাণ মাল থাকে যাতে কুরবানি ওয়াজিব হয়ে যায় তাহলে সেই বাচ্চার উপর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে যাবে। বাকি রইল তার এ কুরবানি কার মাল থেকে আদায় করা হবে? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। শাইখাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, এরূপ ক্ষেত্রে নাবালেগ বাচ্চার থেকে তার পিতা কুরবানি করবেন। যদি কোনো বাচ্চার পিতা না থাকেন কিংবা কাছে না থাকেন তাহলে তার উপর নিযুক্ত অভিভাবক নাবালেগের সম্পদ থেকে কুরবানি করবে।

অন্যদিকে ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে নাবালেগের সম্পদ থেকে কুরবানি করা হবে না; বরং পিতা তার নিজ সম্পদ থেকে নাবালেগ বাচ্চার পক্ষ থেকে কুরবানি আদায় করবে। তাদের মতে নাবালেগের সম্পদ থেকে কুরবানি করা তার সম্পদ বিনষ্ট করারই নামান্তর। শরিয়ত নাবালেগের সম্পদ সংরক্ষণ করার আদেশ দিয়েছে।

قَوْلُهُ فَالْخِلَافُ فِيْ هٰذَا كَالْخِلَافِ فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ : হেদায়ার মুসান্নিফ শায়েখ বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবূ বকর (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় শাইখাইন ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে যে মতভেদ একই ধরনের মতভেদ তাদের মাঝে রয়েছে সদকাতুল ফিত্‌রের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ যদি নাবালেগ সন্তানের কুরবানির নেসাব পরিমাণ মাল থাকে তাহলে শাইখাইনের মতে, তার নিজ মালে সদকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও অন্যান্য ইমামগণের মতে নাবালেগের পক্ষ থেকে কুরবানি করবে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ لَا يَجُوْزُ التَّضْحِيَةُ مِنْ مَالِ الخ : লেখক বলেন, কেউ কেউ বলেন, অর্থাৎ মাবসূত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নাবালেগের মাল থেকে কুরবানি করা কারো মতেই জায়েজ নেই।

এ উক্তির পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে হেদায়ার টীকাতে লেখা হয়েছে যে, যদি কুরবানি দ্বারা পশু বধ করা তথা মাল বিনষ্ট করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে পিতার পক্ষে ছোট সন্তানের মাল নষ্ট করার অধিকার নেই। যেমন পিতা সন্তানের গোলাম আজাদ করার অধিকার রাখেন না।

আর যদি বলা হয় কুরবানির উদ্দেশ্য হচ্ছে পশু জবাই করার পর এর গোশত সদকা বা দান করা। তাহলে এ দানটি নফলদান বলে গণ্য হবে। আর যেহেতু নফল দান নাবালেগের মাল থেকে করা যায় না, তাই তাও করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ اَنْ يَأْكُلَهُ كُلَّهُ : ইবারতটি দ্বারা একটি আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে। আপত্তিটি এই যে, নাবালেগের মাল থেকে কুরবানি করা তার মাল বিনষ্ট করার নামান্তর হবে কেন ? নাবালেগ বাচ্চা জবাই করা পশুর গোশত খাবে, তাহলে তো তার মাল বিনষ্ট করা হলো না।

এ আপত্তির জবাবে হিদায়ার লেখক বলেন, একজন নাবালেগের পক্ষে এত গোশত খাওয়া সম্ভব নয়। হয়তো সে সামান্য পরিমাণই খাবে, আর বাকিটুকু নষ্ট হবে। ফলে এভাবে নাবালেগের মাল নষ্টই হবে বৈকি!

قَوْلُهُ وَالْاَصَحُّ اَنْ يُضَحِّيَ مِنْ مَالِهِ : হিদায়ার মুসান্নিফ শায়েখ বুরহানুদ্দীন (র.) বলেন, এ দুইমতের মতে বিশুদ্ধতর অভিমত হচ্ছে নাবালেগের মাল থেকেই নাবালেগের কুরবানি করতে হবে। কুরবানিকৃত পশুর যতটুকু গোশত বাচ্চা খেতে পারে তা খাবে। [প্রয়োজনে কিছু গোশত সংরক্ষণ করে রাখা হবে যাতে পরে সে খেতে পারে। আর অবশিষ্ট গোশত বিক্রি করে তার জন্য এমন বস্তু খরিদ করা হবে যার মূল বাকি থাকে। যেমন বাচ্চার জন্য খাট, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি বানানো যেতে পারে, যা সে বহুদিন ব্যবহার করতে পারবে।

জ্ঞাতব্য : এ মাসআলায় ফতোয়া জাহেরী রেওয়ায়েতের উপর। জাহেরী রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, যে বাচ্চার কুরবানির নেসাব পরিমাণ মাল আছে, তার উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়। সুতরাং তার পক্ষ থেকে তার পিতা কুরবানি করবেন না এবং তার মাল থেকেও কুরবানি করা জায়েজ হবে না। ফতোয়ায়ে শামী, ফতোয়ায়ে কাযীখান ও আলমগীরিতে এর উপরই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

قَالَ : وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةً اَوْ يَذْبَحُ بَقَرَةً اَوْ بُدْنَةً عَنْ سَبْعَةٍ وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا تَجُوْزُ اِلَّا عَنْ وَاحِدٍ لِاَنَّ الْاِرَاقَةَ وَاحِدَةٌ وَهِىَ الْقُرْبَةُ اِلَّا اَنَّا تَرَكْنَاهُ بِالْاَثَرِ وَهُوَ مَا رُوِىَ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَلَا نَصَّ فِى الشَّاةِ فَبَقِىَ عَلَىٰ اَصْلِ الْقِيَاسِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি বকরি জবাই করবে। অথবা একটি গাভী [গরু] কিংবা উট জবাই করবে সাতজনের পক্ষ থেকে। কিয়াসের দাবি হলো একাধিক লোকের পক্ষ থেকে জায়েজ না হওয়া। কেননা রক্ত প্রবাহিতকরণ তো একটিই। আর এটাই হচ্ছে ইবাদত। কিন্তু আমরা কিয়াসকে বর্জন করেছি হাদীসের কারণে। আর হাদীসটি হচ্ছে যা হযরত জাবের (রা.)-এর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে একটি গরু সাতব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং একটি উট সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে জবাই করেছি। তবে [বকরি একাধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করা] -এর কোনো দলিল নেই। ফলে তা মূল কিয়াসের উপরই বাকি আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ الخ : আলোচ্য অংশে লেখক প্রথম ইমাম কুদূরীর ইবারত নকল করে কুরবানির একটি পশুতে কতজন শরিক হতে পারবে -এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানিদাতা তার নিজের পক্ষ থেকে এবং ছোট-নাবালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরি জবাই করবে। আর যদি গরু কিংবা উট জবাই করে তাহলে সাতজন কুরবানিদাতার পক্ষ থেকে কুরবানি আদায় হবে। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, কিয়াসের দাবি বা যুক্তি অনুযায়ী সাতজন কুরবানিদাতার পক্ষ থেকে একটি গরু/উট আদায় না হওয়াই উচিত। কারণ কুরবানির মধ্যে ইবাদতের দিক হচ্ছে পশু জবাই। আর এখানে পশু জবাই হচ্ছে একটি। অর্থাৎ ইবাদত হচ্ছে একটি। একটি ইবাদত একজনের পক্ষ থেকেই আদায় হওয়া যুক্তিযুক্ত, একাধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

লেখক বলেন, উপরিউক্ত কিয়াস বা যুক্তিকে আমরা হাদীসের কারণে পরিহার করেছি। হাদীসটি হযরত জাবির (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত। হাদীসটি সনদসহ এরূপ–

عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَ عَنْ سَبْعَةٍ هٰكَذَا اَخْرَجَ اَبُوْ دَاوُدَ فِى الْاُضْحِيَّةِ وَالنَّسَائِىُّ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْبَقَرُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ .

অর্থাৎ 'হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে হুদাইবিয়া প্রান্তরে সাতজনের পক্ষ থেকে উট এবং গরু জবাই করেছি। ইমাম নাসায়ী (র.) -এর বর্ণনানুযায়ী রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট সাতজনের পক্ষ থেকে।' হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) ব্যতীত সকল মুহাদ্দিসই তাঁদের রচিত কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত আছে–

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَحْمَدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَضْحٰى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْجَزُوْرِ عَشَرَةً .

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি দ্বারাও গরুতে একাধিক কুরবানিদাতা অংশগ্রহণের বৈধতা প্রমাণ হয়। তবে এ হাদীসে উল্লিখিত উটের মধ্যে দশজন শরিক হওয়ার বিষয়টি অবশ্য আমলযোগ্য নয়। হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীসটি অধিকতর বিশুদ্ধ হওয়াতে ওলামায়ে কেরাম এ হাদীসের শেষাংশের ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আর তা এই যে, উটের গোশত বণ্টনে দশজনকে শরিক করা হয়েছিল, কুরবানির মধ্যে নয়।

قَوْلُهُ وَلَا نَصَّ فِى الشَّاةِ فَبَقِىَ الخ : লেখক বলেন, উট ও গরুর বেলায় আমরা কিয়াসকে পরিহার করেছি হাদীসের কারণে। বকরির ব্যাপারে যেহেতু কোনো হাদীস পাওয়া যায়নি। তাই এর ব্যাপারে কিয়াস কার্যকর থাকবে। কিয়াস এই ছিল যে, জবাই যেহেতু একটি তাহলে একজনের কুরবানিই আদায় হবে। একাধিক ব্যক্তির একটি জবাইতে অংশগ্রহণ বৈধ হবে না।

উল্লেখ্য যে, হিদায়ার মুসান্নিফের বক্তব্য বকরির ব্যাপারে কোনো দলিল নেই -এ কথাটি আপত্তির ঊর্ধ্বে নয়। কারণ বকরির ব্যাপারেও হাদীস পাওয়া যায়। মুহাদ্দিস আল হাকেম নিম্নসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন–

عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ زَهْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَ ذَهَبَتْ بِهٖ اُمُّهٗ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهٗ وَ دَعَا لَهٗ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُضَحِّىْ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيْعِ اَهْلِهٖ وَقَالَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ .

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে– ১. বকরির ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর আমল রয়েছে। ২. রাসূল ﷺ একটি বকরি পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছেন। অবশ্য এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বিনায়ার মুসান্নিফ আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল আইনী (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূল ﷺ বকরির ছওয়াব পুরো পরিবারের উদ্দেশ্যে হেবা করেছেন। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, একটি বকরি অনেকের পক্ষ থেকে কুরবানিরূপে আদায় করেছেন।

وَتُجُوزُ عَنْ خَمْسَةٍ اَوْ سِتَّةٍ اَوْ ثَلٰثَةٍ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ (رحـ) فِي الْاَصْلِ لِاَنَّهُ لَمَّا جَازَ عَنْ سَبْعَةٍ فَعَمَّنْ دُوْنَهُمْ اَوْلٰى وَلَا تَجُوْزُ عَنْ ثَمَانِيَةٍ اَخْذًا بِالْقِيَاسِ فِيْمَا لَا نَصَّ فِيْهِ وَكَذَا اِذَا كَانَ نَصِيْبُ اَحَدِهِمْ اَقَلَّ مِنَ السَّبْعِ لَا يَجُوْزُ عَنِ الْكُلِّ لِاِنْعِدَامِ وَصْفِ الْقُرْبَةِ فِي الْبَعْضِ وَسَنُبَيِّنُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অনুবাদ : এবং [গরু ও উট] পাঁচজন অথবা ছয়জন কিংবা তিনজনের পক্ষ থেকেও বৈধ হয়– বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কেননা যখন সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে [গরু ও উট] কুরবানি করা বৈধ তখন তো এর চেয়ে কম ব্যক্তি থেকে আরো উত্তমভাবে বৈধ হবে। তবে আটজনের পক্ষ থেকে কুরবানি করা জায়েজ হবে না সে বিষয়ে দলিল নেই তাতে কিয়াসের উপর আমল করার ভিত্তিতে। তদ্রূপ যদি কোনো একজনের অংশ এক সপ্তমাংশের চেয়ে কম হয়– তখন কারো পক্ষ থেকে কুরবানি জায়েজ হবে না। কেননা কতকের [একজনের] মাঝে ইবাদতের দিকটি না পাওয়া যাওয়ার কারণে। ইনশাআল্লাহ সামনে এর বিশদ বিবরণ আমরা আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَجُوزُ عَنْ خَمْسَةٍ الخ : আলোচ্য অংশে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) গরু ও উটের মধ্যে যে একাধিক কিন্তু সাতজনের কম লোক শরিক হতে পারে তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ ইবারত দ্বারা প্রমাণ করেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, পাঁচ, অথবা ছয় কিংবা তিনজনের পক্ষ থেকে কুরবানি করা জায়েজ। কেননা সাতজনের মধ্যে যেহেতু জায়েজ হওয়া হাদীসের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে সাতজনের কমের মাঝে অবশ্যই জায়েজ হবে। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোনো এক ব্যক্তির অংশ যাতে এক সপ্তমাংশের চেয়ে কম না হয়। কেননা এক সপ্তমাংশের কম শরিয়ত অনুমোদিত নয়। যদি এক সপ্তমাংশের কমে কুরবানি করে তাহলে কারো পক্ষ থেকে কুরবানি বৈধ হবে না। কারণ কুরবানির ক্ষেত্রে শরিয়ত অনুমোদিত সর্বনিম্ন অংশ হচ্ছে সাতের এক এর চেয়ে কম অংশ শরিয়ত অনুমোদিত নয়। যদি কোনো গরু/উটে এমন ব্যক্তি যুক্ত হয় যার অংশ সপ্তমাংশ থেকে কম তাহলে তার কারণে অন্য সকলের কুরবানি বাতিল হয়ে যাবে।

যদি গরু/উটের মধ্যে সাতজনের বেশি কুরবানিদাতা শরিক হতে চায় তাহলে তা বৈধ হবে না। কারণ যুক্তি-বিরুদ্ধভাবে হাদীস দ্বারা সর্বোচ্চ সংখ্যা সাত পর্যন্ত জানা গিয়েছে। সুতরাং সাতের অধিক ব্যক্তি এক জন্তুতে শরিক হতে পারবে না।

وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) تَجُوْزُ عَنْ اَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ وَلَا تَجُوْزُ عَنْ اَهْلِ بَيْتَيْنِ وَاِنْ كَانُوْا اَقَلَّ مِنْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اَضْحَاةٌ وَعَتِيْرَةٌ قُلْنَا الْمُرَادُ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ قَيِّمُ اَهْلِ الْبَيْتِ لِاَنَّ الْيَسَارَ لَهُ يُؤَيِّدُهُ مَا يُرْوٰى عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اَضْحَاةٌ وَعَتِيْرَةٌ وَلَوْ كَانَتِ الْبُدْنَةُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ تَجُوْزُ فِى الْاَصَحِّ لِاَنَّهُ لَمَّا جَازَ ثَلٰثَةُ الْاَسْبَاعِ جَازَ نِصْفُ السَّبْعِ تَبْعًا لَهُ وَاِذَا جَازَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَقِسْمَةُ اللَّحْمِ بِالْوَزْنِ لِاَنَّهُ مَوْزُوْنٌ وَلَوِ اقْتَسَمُوْا جُزَافًا لَا يَجُوْزُ اِلَّا اِذَا كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْاَكَارِعِ وَالْجِلْدِ اِعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মালেক (র.) বলেন, একটি কুরবানির জন্তু [গরু/উট] একটি পরিবারের পক্ষ থেকে জায়েজ হয়ে যায়, যদিও সে পরিবারের কুরবানিদাতা সাতজনের অধিকও হয়। কিন্তু সংখ্যায় সাতজনের চেয়ে কম হলেও দুই পরিবারের পক্ষ থেকে জায়েজ হয় না। রাসূল ﷺ-এর এই হাদীসের কারণে [তিনি বলেন] প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রত্যেক বছর একটি কুরবানি ও আতীরা প্রদান করা ওয়াজিব। আমরা বলি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন– পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কেননা বিত্ততো তারই। এ ব্যাখ্যাটিকে সমর্থন করে আরেকটি হাদীস। প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রত্যেক বছর একটি কুরবানি ও একটি আতীরা প্রদান করা ওয়াজিব। যদি একটি উট দু'ব্যক্তির মাঝে অর্ধার্ধি অবস্থায় কুরবানি করে তাহলে বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী জায়েজ। কেননা যেহেতু তিন সপ্তমাংশ জায়েজ তাহলে সাতের অর্ধাংশ ও জায়েজ হবে। আর যখন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কুরবানি জায়েজ তখন গোশতের বণ্টন ওজন করে করা হবে। কেননা গোশত ওজনী বস্তু। যদি কুরবানির অংশীদারগণ অনুমান করে বণ্টন করে তাহলে জায়েজ হবে না। কিন্তু যদি গোশতের সাথে কিছু পায়া এবং চামড়া থাকে তাহলে বিক্রির উপর কিয়াস করে তা জায়েজ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) تَجُوْزُ عَنْ اَهْلِ بَيْتٍ الخ : উপরের ইবারতে লেখক আলোচ্য মাসআলায় ইমাম মালেক (র.)-এর মতবিরোধ তুলে ধরেন। ইমাম মালেক (র.) বলেন, যেসব জন্তু কুরবানি করা যায় তাতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে কুরবানিদাতাগণ একই পরিবারভুক্ত কিনা? যদি কুরবানি দাতাগণ একই পরিবারভুক্ত হয় তাহলে সাতজনের অধিক ব্যক্তি একই জন্তুতে শরিক হতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি তারা একই পরিবারভুক্ত না হয় তাহলে সাতজনের কম হলেও একজন্তুতে শরিক হতে পারবে না।

ইমাম মালেক (র.)-এর দলিল– قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ اَضْحَاةٌ وَعَتِيْرَةٌ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেন, প্রত্যেক পরিবারের উপর একটি কুরবানি এবং আতীরা প্রদান করা ওয়াজিব।' হাদীসটি সুনানে আরবাআতে তাখরীজ করা হয়েছে। সনদসহ হাদীসটি এরূপ–

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اَبِىْ رَمْلَةَ حَدَّثَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وُقُوْفًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اَضْحَاةٌ وَعَتِيْرَةٌ اَتَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ هِىَ الَّتِىْ يَقُوْلُ النَّاسُ لَهَا الرَّجَبِيَّةُ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ.

এ হাদীসের জবাব দুভাবে দেওয়া যায়। প্রথমত جَوَابٌ اِنْكَارِىْ দ্বিতীয়ত جَوَابٌ تَسْلِيْمِىْ। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় পদ্ধতিতে জবাব দিয়েছেন।

جَوَابٌ اِنْكَارِىْ হচ্ছে হাদীসটি সহীহ নয়। শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেছেন হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইবনে বাত্তাল বলেন, হাদীসের রাবী আবূ রামলাহ মাজহূল।

قَوْلُهُ الْمُرَادُ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ الخ : এখান থেকে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় জবাব উল্লেখ করছেন। তিনি বলেন, اَهْلَ بَيْتٍ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য ঘরের বা পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কুরবানি শুধুমাত্র তার পক্ষ থেকেই আদায় হবে, সকলের পক্ষ থেকে নয়। কারণ কুরবানি তো তার উপরই ওয়াজিব হয়েছে। কারণ পরিবারের যাবতীয় সম্পদ যার ভিত্তিতে কুরবানি ওয়াজিব হয়েছে তাতো গৃহকর্তার।

এরপর হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের কৃত এ ব্যাখ্যাটির সমর্থন পাওয়া যায় একটি হাদীস থেকে। হাদীসটি এই– عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اَضْحَاةٌ وَعَتِيْرَةٌ অর্থাৎ, 'মুসলমানের উপর প্রত্যেক বছর একটি কুরবানি ও আতীরা ওয়াজিব।' হিদায়ার লেখক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যে হাদীসটি এনেছেন তা নির্ভরযোগ্য নয়। অতএব এ হাদীসটি উপস্থাপন করা ঠিক হয়নি।

অবশ্য এ জবাবটি ছাড়াও অন্য জবাব দেওয়া হয়। যেমন বলা হয়, হাদীসে বর্ণিত اَضْحَاةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য উট বা গরু। আর উট ও গরুতে একাধিক কুরবানিদাতা শরিক হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتِ الْبَدَنَةُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ الخ : হিদায়ার লেখক এখান থেকে এমন একটি মাসআলা উল্লেখ করছেন যার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ হয়েছে।

نَوَازِلُ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, কাযী আহমদ ইবনে মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যদি একটি উট দুজনে এভাবে কুরবানি করে যে, তাদের প্রত্যেকে অর্ধেক অংশের ভাগীদার, প্রত্যেকের অংশ পড়বে [$৩\frac{১}{২} + ৩\frac{১}{২} = ৭$] সাড়ে তিন করে এমতাবস্থায় তাদের কুরবানি সহীহ হবে কিনা?

উত্তরে কাযী সাহেব বললেন, না। কেননা সাড়ে তিন করে অংশ হওয়ার কারণে এককেজনের অংশে আধা অংশ পড়ছে। একটি ভাগের অর্ধেকের মধ্যে যেহেতু কুরবানি সহীহ হয় না তাই তাদের উক্ত কুরবানি সহীহ হবে না।

অন্যদিকে ফকীহ আবুল লাইস এবং সদরুশ শহীদ (র.) প্রমুখ বলেন, কাযী সাহেবের কথা সঠিক নয়; বরং অর্ধার্ধি হলেও কুরবানি সহীহ হয়ে যাবে। হিদায়ার মুসান্নিফ শায়েখ বুরহান উদ্দীন (র.) এ দুটি মতের মধ্যে দ্বিতীয় মতটিকে অধিকতর সহীহ বা বিশুদ্ধ বলেছেন। এর কারণ এই যে, যদি কেউ শুধু সাতের একাংশের অর্ধেক কুরবানি করে তাহলে তা বৈধ হয় না। এখানে অর্ধাংশকে তিনাংশের অনুগামী করা হয়েছে। যেহেতু তিনাংশের মধ্যে কুরবানি বিশুদ্ধ হয়ে যায়। তাই তার অনুগামী অর্ধাংশের মধ্যে কুরবানি সহীহ হয়ে যাবে। তাছাড়া এখানে অর্ধাংশের শরিক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য ইবাদতের মধ্যে অধিক হারে অংশগ্রহণ করা। এটি ঐ ব্যক্তির মতো নয় যে, অর্ধাংশের শরিক হওয়ার দ্বারা গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করেছে।

উল্লেখ্য যে, বহু বিষয় আমরা এমন দেখতে পাই যে, এগুলো স্বতন্ত্রভাবে তো নাজায়েজ; কিন্তু অনুগামী হিসেবে আবার জায়েজ। যেমন এক ব্যক্তি একটি বকরি জবাই করল, অতঃপর তার পেট থেকে একটি বাচ্চা বের হলো তাহলে সেই ব্যক্তির উপর বাচ্চাটিও কুরবানি দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদিও স্বতন্ত্রভাবে এরূপ বাচ্চা কুরবানি দেওয়া নাজায়েজ।

وَلَو اشْتَرٰى بَقَرَةً يُرِيْدُ اَنْ يُّضَحِّىَ بِهَا عَنْ نَفْسِهٖ ثُمَّ اَشْرَكَ فِيْهَا سِتَّةً مَعَهٗ جَازَ اِسْتِحْسَانًا وَفِى الْقِيَاسِ لَا يَجُوْزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رح) لِاَنَّهٗ اَعَدَّهَا لِلْقُرْبَةِ فَيَمْنَعُ عَنْ بَيْعِهَا تَمَوُّلًا وَالْاِشْرَاكُ هٰذِهٖ صِفَتُهٗ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّهٗ قَدْ يَجِدُ بَقَرَةً سَمِيْنَةً يَشْتَرِيْهَا وَلَا يَظْفَرُ بِالشُّرَكَاءِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَاِنَّمَا يَطْلُبُهُمْ بَعْدَهٗ فَكَانَتِ الْحَاجَةُ اِلَيْهِ مَاسَّةً فَجَوَّزْنَاهُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَقَدْ اَمْكَنَ لِاَنَّهٗ بِالشِّرَاءِ لِلتَّضْحِيَةِ لَا يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ وَالْاَحْسَنُ اَنْ يَّفْعَلَ ذٰلِكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ لِيَكُوْنَ اَبْعَدَ عَنِ الْخِلَافِ وَعَنْ صُوْرَةِ الرُّجُوْعِ فِى الْقُرْبَةِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّهٗ يَكْرَهُ الْاِشْرَاكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ لِمَا بَيَّنَّا ـ

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি নিজে কুরবানি করার ইচ্ছায় একটি গাভী [গরু] খরিদ করে অতঃপর তাতে আরো ছয়জনকে তার সাথে শরিক করে নেয় তাহলে তা ইস্‌তিহসান হিসেবে জায়েজ হবে। কিয়াসানুযায়ী তা নাজায়েজ। এটাই ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত। কেননা সে পশুটিকে ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করেছে। অতএব, সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে এটাকে বিক্রি করতে তাকে বাধা দেওয়া হবে। অন্যকে অংশীদার করার ক্ষেত্রে বিষয়টি এরূপই হয়। ইস্‌তিহসানের দলিল এই যে, কখনো স্বাস্থ্যবান গরু পেয়ে সেটাকে খরিদ করে ফেলে। অথচ ক্রয়ের সময় শরিক খোঁজার মতো ফুরসত পাওয়া যায় না। সে পরে শরিকদের খুঁজে নেয়। সুতরাং এ জাতীয় প্রয়োজন অনিবার্য হয়। তাই আমরা সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে বৈধ সাব্যস্ত করেছি। আর এখানে সংকট দূর সম্ভবও। কেননা কুরবানির উদ্দেশ্যে ক্রয় বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করে না। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে ক্রয়ের পূর্বে অংশীদার তালাশ করা যাতে মতভেদ থেকে দূরে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে অবস্থান পরিবর্তন থেকে দূরে থাকা যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রয়ের পরে অংশীদার করা মাকরূহ উপরিউক্ত কারণে যা আমরা বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَو اشْتَرٰى بَقَرَةً يُرِيْدُ الخ : উপরের ইবারতে লেখক একজন কুরবানিদাতা কর্তৃক এমন জন্তু খরিদ করা যাতে একাধিক ব্যক্তি শরিক হতে পারে এবং খরিদ করার পর অংশীদার গ্রহণ করার মাসআলা আলোচনা করেছেন।

লেখক বলেন, যদি কেউ একটি গরু নিজে কুরবানি করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে অতঃপর অন্য ছয় ব্যক্তিকে তার সাথে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে তার এ কাজটি জায়েজ হবে ইস্‌তিহসান হিসেবে। যদিও কিয়াসানুযায়ী কাজটি নাজায়েজ হয়। ইমাম যুফার (র.) কিয়াসের পক্ষে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিয়াস বা যুক্তি এই যে, কুরবানিদাতা পশুটি খরিদ করার মাধ্যমে পশুটিকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেছে। সুতরাং গরুটির অংশবিশেষ বিক্রির মাধ্যমে সম্পদ লাভ করতে তাকে বাধা দেওয়া হবে। আলোচ্য মাসআলায় গরু খরিদ করার পর শরিক গ্রহণ করা ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করার পর তা থেকে মাল লাভ করারই নামান্তর। সুতরাং এ কাজ করা তার জন্য সঠিক বলে বিবেচিত হবে না।

وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ বা ইসতিহসানের দলিল এই যে, কখনো পরিস্থিতি এমন হয় যে, কুরবানিদাতা পছন্দনীয় মোটাতাজা গরু পেয়ে যায় এবং সেটিকে তৎক্ষণাৎ না কিনলে তা হাতছাড়া হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির পক্ষে অংশীদার খোঁজার মতো অবস্থা থাকে না তাই সে ভাবে যে, আগে খরিদ করে নিই, পরে অংশীদার খুঁজে নেওয়া যাবে। মোটকথা প্রথমে নিজের জন্য খরিদ করে পরে অংশীদার খোঁজার মতো পরিস্থিতি দেখা দেয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি শরিয়তের পক্ষ থেকে আগে শরিক নেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় তাহলে এক ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি হবে। এরূপ সঙ্কট দূর করার উদ্দেশ্যে প্রথমে জন্তু কিনে পরে অংশীদার নেওয়ার বিষয়টিকে শরিয়ত অনুমোদন দিয়েছে। আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু এ সঙ্কট দূর করাতে কোনো বাধা নেই তাই উপরিউক্ত সুরতকে শরিয়ত অনুমোদন দিয়েছে। বাধা নেই এভাবে যে, মাসআলাগত কোনো জন্তু কুরবানির জন্য খরিদ করার পর বিক্রি করার ক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই। সুতরাং কোনো কুরবানিদাতা যদি কুরবানির উদ্দেশ্যে পশু খরিদ করে তাতে অংশীদার নেয় তাও নাজায়েজ বা অবৈধ হবে না।

قَوْلُهُ وَالْاَحْسَنُ اَنْ يَفْعَلَ الخ : লেখক বলেন, যদিও ইস্‌তিহ্‌সান হিসেবে এরূপ করার অবকাশ আছে তাতে এটা উত্তম পদ্ধতি নয়। উত্তম হচ্ছে প্রথমে শরিক খুঁজে পরে পশু খরিদ করা। এরূপ করা হলে মতবিরোধ থেকে বাঁচা যাবে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে অবস্থান পরিবর্তন করা তথা প্রথমে পুরো পশু কুরবানি করার মনস্থ করে পরে পশুর একাংশ কুরবানি করা থেকেও বাঁচা যাবে।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পশু নিজের জন্য ক্রয় করার পর তাতে অন্য শরিক নেওয়া মাকরূহ। مُخْتَصَرُ الْكَرْخِيْ ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) উপরের মাসআলায় যে, জায়েজ হওয়ার কথা আলোচনা করেছেন তা ধনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ধনীর জন্য কুরবানির পশু খরিদ করার পর তাতে অন্য অংশীদার নিতে পারবে; কিন্তু দরিদ্র তথা কুরবানির নেসাব পরিমাণ মালের মালিক নয় যে ব্যক্তি, সে যদি কুরবানির পশু নিজের জন্য খরিদ করে তার জন্য তাতে অন্য শরিক গ্রহণ করার অবকাশ নেই। যদি এরূপ ব্যক্তি পশু খরিদ করে তাহলে পুরোটাই কুরবানি করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। আর সে যা তার নিজের উপর ওয়াজিব করে তা তার থেকে বাতিল করা যাবে না।

ধনীর মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি পশু খরিদ করার পর যদি অন্য কাউকে শরিক করে তাহলে তার উচিত হবে অন্যদের থেকে পাওয়া অর্থ দান করে দেওয়া।

আশরাফুল হিদায়াতে বর্তমনা যুগের একটি সূরতে মাসআলা আলোচনা করে বলেন, বর্তমানে অনেকে কুরবানি করার উদ্দেশ্যে উদাহরণস্বরূপ চার হাজার টাকায় একটি পশু খরিদ করে পরে আট হাজার টাকা মূল্য ধরে চারজন শরিক নেয় অর্থাৎ পশুটিকে শরিকদের কাছে মুনাফা নিয়ে বিক্রি করে– এরূপ করার কোনো সুযোগ শরিয়তে নেই। এ জাতীয় ক্ষেত্রে যদি লাভ নেওয়ারই ইচ্ছা করে তাহলে তার জন্য উচিত হবে সেই পশুতে নিজেকে অংশীদার হিসেবে না রাখা। অর্থাৎ এমন লোকদের কাছে লাভ নিয়ে বিক্রি করবে যারা তার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কুরবানি করছে না।

قَالَ : وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيْرِ وَالْمُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ لِمَا بَيَّنَّا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ اِذَا كَانَا مُسَافِرَيْنِ وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَلَا أُضْحِيَّةٌ قَالَ : وَوَقْتُ الْاُضْحِيَّةِ يَدْخُلُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِاَهْلِ الْاَمْصَارِ الذَّبْحُ حَتّٰى يُصَلِّيَ الْاِمَامُ الْعِيْدَ فَاَمَّا اَهْلُ السَّوَادِ فَيَذْبَحُوْنَ بَعْدَ الْفَجْرِ . وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيْحَتَهُ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ الْاُضْحِيَةُ غَيْرَ اَنَّ هٰذَا الشَّرْطَ فِيْ حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَهُوَ الْمِصْرِيُّ دُوْنَ اَهْلِ السَّوَادِ وَلِاَنَّ التَّاخِيْرَ لِاحْتِمَالِ التَّشَاغُلِ بِهِ عَنِ الصَّلٰوةِ وَلَا مَعْنٰى لِلتَّاخِيْرِ فِيْ حَقِّ الْقَرَوِيِّ وَلَا صَلٰوةَ عَلَيْهِ وَمَا رَوَيْنَاهُ حُجَّةٌ عَلٰى مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ فِيْ نَفْيِ الْجَوَازِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ قَبْلَ نَحْرِ الْاِمَامِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দরিদ্র এবং মুসাফিরের উপর কুরবানি নেই। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) যখন সফররত অবস্থায় থাকতেন, তখন তাঁরা কুরবানি করতেন না। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুসাফিরের উপর জুমা ও কুরবানি ওয়াজিব নয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানির সময় ইয়ামুন নাহর [জিলহজ মাসের দশ তারিখ] -এর সুবহে সাদিক উদয়ের সাথে শুরু হয়। তবে শহরবাসীদের জন্য ইমাম ঈদের নামাজ পড়ানোর আগে [কুরবানির পশু] জবাই করা বৈধ নয়। তবে পল্লী অঞ্চলের যেখানে ঈদের জামাত হয় না] লোকেরা সুবহে সাদিক উদয়ের পর [তাদের পশু] জবাই করতে পারবে। এ ব্যাপারে মূল দলিল হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর হাদীস– যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে [কুরবানির পশু] জবাই করবে সে যেন তার কুরবানি পুনরায় করে। আর যে ব্যক্তি নামাজের পর জবাই করে তার কুরবানি পূর্ণ হয়ে যায় এবং সে মুসলমানদের সুন্নত অনুযায়ী কাজ করল আর রাসূল ﷺ বলেন, এই [ঈদের] দিনে আমাদের প্রথম ইবাদত হচ্ছে নামাজ, অতঃপর কুরবানি, তবে এই শর্ত কেবল তাদেরই বেলায় যাদের জন্য ঈদের নামাজ রয়েছে। এমন ব্যক্তি হচ্ছে শহরের অধিবাসী, পল্লীগ্রামের লোক নয়। তাছাড়া কুরবানি বিলম্বিত করার বিধান তো এজন্য যে, কুরবানির কাজে ব্যস্ত হয়ে যেন লোকজন নামাজ বিলম্বিত না করে দেয়। পল্লীবাসীদের ক্ষেত্রে কুরবানি বিলম্বিত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অথচ তাদের ঈদের নামাজ নেই। আমরা যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর বিপক্ষে দলিল হবে– তাঁরা ইমাম সাহেব নামাজ আদায় করার পর তার কুরবানি করার পূর্বে জনসাধারণের কুরবানিকে নাজায়েজ বলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيْرِ الخ : আলোচ্য ইবারতে যাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়– এমন লোকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর কুরবানির শুরু সময় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুসাফির ও দরিদ্র ব্যক্তির উপর কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে আমরা কাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব হয় বা কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি শর্ত? সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

পূর্বেই বলা হয়েছে হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন– مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُضَحِّ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি কুরবানি করার সামর্থ্য রাখে সে যেন কুরবানি করে।' যেহেতু দরিদ্র বা স্বল্পমালের অধিকারী ব্যক্তির সামর্থ্য নেই তাই তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে না। আর মুকীম বা নিজ এলাকায় অবস্থানকারী ব্যক্তির উপর কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিও ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে মতবিরোধ রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত দলিলও বয়ান করা হয়েছে।

তাছাড়া এখানে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) সফর অবস্থায় ইসলামের প্রথম দু'খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) ও ওমর (রা.)-এর আমল উল্লেখ করেছেন যে, তারা উভয়ে সফর অবস্থায় কুরবানি করতেন না।

তবে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) কর্তৃক উল্লিখিত এই ইবারত– أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ إِذَا كَانَا مُسَافِرَيْنِ হাদীসের কিতাবগুলোতে পাওয়া যায় না এবং কোনো মুহাদ্দিস এরূপ ইবারত উল্লেখ করেননি।

কেউ কেউ অবশ্য আবূ শুরাহাহ্ আল গিফারী থেকে বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত শব্দে–

إِنَّهُ قَالَ اَدْرَكْتُ اَوْ رَأَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُضَحِّيَانِ

অর্থাৎ 'তিনি বলেন, আমি আবূ বকর (রা.) ও ওমর (রা.)-কে দেখেছি/পেয়েছি যে, তাঁরা [সফর অবস্থায়] কুরবানি করতেন না।'

এরপর লেখক হযরত আলী (রা.)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তা এই যে–

عَنْ عَلِيٍّ (رض) لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَلَا اُضْحِيَّةٌ .

আল্লামা যাইলাঈ (র.) বলেন, এটিও হাদীসশাস্ত্রের কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না। তবে এ ধরনের একটি' হাদীসে মারফূ' হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা আমরা জুমা পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। হাদীসটি এই–

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ وَلَا اَضْحٰى وَلَا فِطْرَ اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ .

এরপর হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) কুরবানি শুরু সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত উদ্ধৃতি করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানির সময় শুরু হয় ঈদের দিন সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার দ্বারা। তবে এ সময়ে শহরবাসীগণ অর্থাৎ যেখানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় -কুরবানি করতে পারবে না। ইমাম সাহেব ঈদের জামাত পড়ানো পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবেন। ইমাম সাহেব ঈদের জামাত পড়ানোর পূর্বে তাদের জন্য কুরবানি করা নাজায়েজ।

তবে যেসব এলাকায় ঈদের জামাত হয় না অর্থাৎ একেবারেই পল্লী এলাকা, সেসব এলাকার লোকেরা সুবহে সাদিকের পরপরেই তাদের কুরবানির পশু জবাই করতে পারবে। শহরবাসীরা ঈদের জামাতের পূর্বে কুরবানি করতে পারবে না। এ সংক্রান্ত হাদীসের কারণে, যা আমরা সামনের ইবারতে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ ذَبَحَ الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক পূর্ববর্তী মাসআলা অর্থাৎ ঈদের জামাতের পূর্বে কুরবানি করা যে শহরবাসীদের জন্য অবৈধ তার দলিল পেশ করেছেন। দলিল হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর হাদীস–

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيْحَتَهُ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানির পশু জবাই করে সে যেন পুনরায় পশু জবাই করে আর যে নামাজের পর জবাই করবে তার জবাই পূর্ণতা লাভ করবে।' হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন। হযরত বারা ইবনে আযিব (র.) থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত–

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ضَحّٰى خَالِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِىْ جَزْعَةٌ مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا وَلَا يَصْلُحُ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ضَحّٰى قَبْلَ الصَّلٰوةِ لَا يَجُوْزُ وَمَنْ ضَحّٰى بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

একই অর্থের আরেকটি হাদীস ইমাম বুখারী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيُعِدْ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَقَدْ اَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

সম্ভবত হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) এই হাদীসটি চয়ন করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীসটি হচ্ছে– قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ الْاُضْحِيَّةُ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেন, এই [ঈদের দিনে] আমাদের প্রথম ইবাদত হচ্ছে নামাজ, অতঃপর কুরবানি।' এই হাদীসটিও ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র.) তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। একই ধরনের আরেকটি হাদীস হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهٖ فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِاَهْلِهٖ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِىْ شَيْءٍ .

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেন, এই [ঈদের] দিনে আমরা প্রথমে যে কাজটি করব তা হচ্ছে আমরা ঈদের নামাজ পড়ব, অতঃপর আমরা ঘরে ফিরে আসব এবং কুরবানির পশু জবাই করব। যে ব্যক্তি এরূপ করল সে আমাদের তরিকা-সুন্নত অনুযায়ী কাজ করল। আর সে ব্যক্তি এর পূর্বে পশু জবাই করে ফেলল, তার এ পশুটি পারিবারিক গোশত খাওয়ার জন্য হলো যা সে সময়ের পূর্বেই জবাই করে ফেলেছে। তার এ পশুটি কুরবানির সাথে সম্পর্কিত নয়।

মোটকথা উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে স্থানে ঈদের জামাত হবে সে এলাকার লোকদের জন্য ঈদের জামাতের পূর্বে কুরবানির পশু জবাই করা বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ غَيْرَ اَنَّ هٰذَا الشَّرْطَ : লেখক বলেন, হাদীসের আলোকে যে শর্তের আলোচনা করা হয়েছে যে, ঈদের জামাতের পর কুরবানি করতে হবে– এ শর্তটি তাদের বেলায় প্রযোজ্য, যাদের উপর ঈদের নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। আর ঈদের নামাজ আদায় করা ওয়াজিব হচ্ছে শহুরে এবং এমন গ্রাম্য লোকদের উপর যেসব গ্রামে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তবে যেসব এলাকায় ঈদের জামাত হয় না সেসব লোকদের জন্য উপরিউক্ত শর্ত প্রযোজ্য নয়। কেননা কুরবানির পশুর জবাই বিলম্বিত করার যে বিধান দেওয়া হয়েছে তাতো নামাজে লিপ্ততার মধ্যে ব্যাঘাত না ঘটার জন্য। অর্থাৎ কুরবানিদাতা পশু জবাই করতে গিয়ে যেন নামাজের ক্ষতি না করে। তাই নামাজের পর কুরবানির পশু জবাই করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। যেহেতু প্রত্যন্ত পল্লীবাসীর উপর ঈদের জামাত ওয়াজিবই নয় তাই তাকে কেন জবাই বিলম্বিত করতে বলা হবে? সুতরাং তাকে বিলম্ব করার হুকুম শরিয়ত দেয়নি, তাই সে সুবহে সাদিকের পর যে কোনো সময় কুরবানির পশু জবাই করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَمَا رَوَيْنَاهُ حُجَّةٌ عَلَى الخ : এখান থেকে নতুন একটি বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছেন। বিষয়টি হচ্ছে, হিদায়ার লেখকের দাবি মতে কুরবানির পশু জবাই করার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাব আমাদের থেকে ভিন্ন। তাঁদের মাযহাবে ঈদের জামাতের ইমাম যিনি হবেন তিনি যদি কুরবানি না করেন তাদের সাধারণের কুরবানি করা জায়েজ হবে না। হিদায়ার লেখক বলেন, এ দুই ইমামের পক্ষ থেকে এরূপ শর্ত করা উচিত নয় এবং তাঁদের এ মাযহাব আমাদের বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থি। আমরা যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছি তাতে ঈদের জামাতের পূর্বে পশু জবাই না করার কথা বলা হয়েছে এবং ঈদের জামাতের পর জবাই করাকে সুন্নতের অনুযায়ী আমল বলা হয়েছে। সুতরাং ইমামের কুরবানির পর কুরবানি দিতে হবে এরূপ শর্ত লাগানো হাদীস বিরোধী কাজ বলে গণ্য হবে।

কিন্তু ভাষ্যগ্রন্থ বিনায়ার মুসান্নিফ আল্লামা আইনী হিদায়ার লেখকের উপর আপত্তি করে বলেন যে, তিনি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাবের কথা যেভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর মাযহাব মূলত এমন নয়। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম কর্তৃক কুরবানি করার পর সাধারণ লোকেরা কুরবানি করতে হবে এমন কথা বলেননি; বরং তিনি শর্ত করেছেন যে, ইমাম সাহেব ঈদের নামাজের পর ঈদের খুতবা শেষ করার আগে কেউ যেন কুরবানি না করে। তবে তাঁর এ মতটির বিপক্ষেও আমাদের বর্ণিত হাদীসগুলো দলিল হতে পারে। কারণ রাসূল ﷺ নামাজের পর কুরবানি করতে বলেছেন, খুতবার কথা রাসূল ﷺ উল্লেখ করেননি।

হিদায়ার গ্রন্থকার শায়খ বুরহানুদ্দীন ইমাম মালেক (র.)-এর যে মাযহাব বর্ণনা করেছেন তা অবশ্য সঠিকভাবেই বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক (র.) ইমাম কুরবানি করার আগে অন্যরা কুরবানি করা জায়েজ মনে করেন না। তবে ইমাম মালেকের অনুসারী ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে যে, ইমাম দ্বারা কি উদ্দেশ্য। কারো মতে, ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য আমীরুল মু'মিনীন। কারো মতে, শহরের আমীর বা প্রশাসক। আবার অনেকে উদ্দেশ্য করেন ঈদগাহের ইমামকে।

ইমাম মালেক (র.)-এর এ মতটির ব্যাপারে ইবনে হাযম (র.) বলেন, তাঁর এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি কোনো দলিলভিত্তিক অভিমত নয়।

বিনায়া গ্রন্থে এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে কতিপয় মাসআলা আলোচনা করেছেন–

মাসআলা : যদি কোনো শহরে ঈদের নামাজ ফিতনা [অরাজকতা]-র কারণে কিংবা বিদ্রোহী লোকদের প্রাধান্য বিস্তারের কারণে অথবা বাদশাহ বা বাদশাহের কোনো প্রতিনিধি যদি না থাকে তাহলে সে শহরের লোকেরা তাদের কুরবানি দ্বিপ্রহরের পর করবে। কেননা এর পূর্বে নামাজ পড়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য 'ফতোয়ায়ে ওয়াল ওয়ালাজী'তে বর্ণিত আছে এ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি শহরের কোনো প্রশাসক না থাকে তাহলে আর কেউ সুবহে সাদেকের পরেই কুরবানি করে ফেলে তাহলে তা জায়েজ হয়ে যাবে। এটাই গ্রহণযোগ্য অভিমত। কেননা এ শহরটি প্রত্যন্ত পল্লীর হুকুমে গণ্য হয়।

মাসআলা : ফতোয়ায়ে কুবরায় বর্ণিত আছে যে, যদি ঈদের নামাজ সঠিকভাবে কিংবা ভুলভাবেও সম্পন্ন হয়ে যায় তারপর সেই দিন কুরবানি করা জায়েজ হয়ে যাবে।

মাসআলা : যদি ইমাম কোনো অনিবার্য কারণে প্রথম দিন ঈদের নামাজ পড়াতে সক্ষম না হন, অতঃপর দ্বিতীয় দিন নামাজ পড়ানোর উদ্দেশ্যে ইদগাহে রওয়ানা করেন, ইতোমধ্যে যদি ইমাম সাহেবের নামাজ পড়ানোর পূর্বেই কেউ কুরবানি করে ফেলে তাহলে তার কুরবানি সহীহ গণ্য হবে। কেননা নামাজের মাসনূন সময় প্রথম দিন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার দ্বারাই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এরপর নামাজ কাযা হিসেবে আদায় করা হচ্ছে। অতএব, এ নামাজ কুরবানির ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়।

মাসআলা : যদি ইমাম সাহেব অজু ছাড়াই ঈদের নামাজ পড়ান, অতঃপর লোকেরা তাদের পশু জবাই করার পূর্বে ইমাম সাহেব বিষয়টি স্মরণ করতে না পারেন তাহলে লোকদের কুরবানি সহীহ হয়ে যাবে।

তবে এ ব্যাপারে ঘোষণা দেওয়ার পর অর্থাৎ পুনর্বার জামাত হওয়ার ঘোষণা শোনার পর যদি কেউ নামাজের পূর্বে জবাই করে তাহলে তার জবাই সহীহ হবে না। আর যদি কেউ ঘোষণা না শুনে জবাই করে তাহলে তার জবাই সহীহ হয়ে যাবে। তবে ইতোমধ্যে যদি সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যায় তাহলে ঘোষণা শোনার পরও নামাজের পূর্বে কুরবানি করা সহীহ হবে। [যাখীরাহ এবং কাযীখানে মাসআলাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।]

ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِيْ ذٰلِكَ مَكَانُ الْاُضْحِيَةِ حَتّٰى لَوْ كَانَتْ فِى السَّوَادِ وَالْمُضَحِّيْ فِى الْمِصْرِ يَجُوْزُ كَمَا انْشَقَّ الْفَجْرُ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَجُوْزُ اِلَّا بَعْدَ الصَّلٰوةِ وَحِيْلَةُ الْمِصْرِيِّ اِذَا اَرَادَ التَّعْجِيْلَ اَنْ يَبْعَثَ بِهَا اِلٰى خَارِجِ الْمِصْرِ فَيُضَحِّيْ بِهَا كَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهٰذَا لِاَنَّهَا تَشْبَهُ الزَّكٰوةَ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ قَبْلَ مَضِيِّ اَيَّامِ النَّحْرِ كَالزَّكٰوةِ بِهَلَاكِ النِّصَابِ فَيُعْتَبَرُ فِى الصَّرْفِ مَكَانُ الْمَحَلِّ لَا مَكَانُ الْفَاعِلِ اِعْتِبَارًا بِهَا بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ لِاَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ .

অনুবাদ : স্মর্তব্য যে, এ ক্ষেত্রে [অর্থাৎ কুরবানির পশু কখন জবাই করা হবে] ধর্তব্য হবে কুরবানির পশু অবস্থানের জায়গা। সুতরাং যদি কুরবানির পশু পল্লীতে থাকে আর কুরবানিদাতা থাকে শহরে তাহলে সুবহে সাদিক হওয়া মাত্রই কুরবানি করা জায়েজ হবে। আর যদি বিষয়টি এর বিপরীত হয় [অর্থাৎ কুরবানিদাতা গ্রামে, আর কুরবানির পশু শহরে হয়] তাহলে নামাজের পরে ব্যতীত কুরবানি করা জায়েজ হবে না। আর যদি শহুরে ব্যক্তি কুরবানি তাড়াতাড়ি করতে চায় তাহলে এই কৌশল অবলম্বন করতে পারে যে, পশুটিকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিবে যাতে সুবহে সাদিক উদিত হওয়া মাত্রই কুরবানি করা যায়। আর এরূপ করা এ কারণে সম্ভব যে, কুরবানি জাকাত সদৃশ। এভাবে যে, কুরবানির পশু/মাল যদি কুরবানির দিনগুলো গুজরান হওয়ার পূর্বে হালাক বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেই ব্যক্তির কুরবানি রহিত হয়ে যায় যেমন জাকাতের মাল তথা নিসাব বিনষ্ট হয়ে গেলে জাকাত রহিত হয়ে যায়। অতএব, জাকাতের উপর কিয়াস করে বলা হবে যে, কুরবানি আদায় হওয়ার ক্ষেত্রে কুরবানির পশুর অবস্থানের জায়গা ধর্তব্য [কুরবানিদাতা বা] কর্তার জায়গা ধর্তব্য নয়। অবশ্য সদকাতুল ফিত্‌রের বিষয়টি এমন নয়। কেননা সদকাতুল ফিত্‌র ঈদুল ফিত্‌রের দিন সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলেও রহিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِيْ ذٰلِكَ مَكَانُ الْاُضْحِيَةِ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে হিদায়ার মুসান্নিফ পূর্বে বর্ণিত মাসআলার সাথে সম্পর্কিত মাসআলা আলোচনা করেছেন। পূর্বে বলা হয়েছিল যে, যে স্থানে ঈদের জামাত হয় না, সেখানে ঈদের দিন সুবহে সাদিক হওয়া মাত্রই কুরবানি করা জায়েজ হবে। তবে যেখানে ঈদের জামাত হয় সেখানে ঈদের জামাতের পূর্বে কুরবানি করা সহীহ নয়। আলোচ্য ইবারতে লেখক বলেন, সময়ের এ পার্থক্য ধর্তব্য হবে কুরবানির পশুর অবস্থানের ভিত্তিতে, কুরবানিদাতার অবস্থানের ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ কুরবানির পশু যদি গ্রামে থাকে তাহলে গ্রামের সময় ধর্তব্য আর যদি পশু শহরে থাকে তাহলে শহরের সময় ধর্তব্য।

মাসআলাটির চারটি সুরত হতে পারে–

১. কুরবানিদাতা ও কুরবানির পশু উভয়ে শহরে অবস্থান করছে। এ অবস্থায় ঈদের জামাতের পূর্বে কুরবানি করা যাবে না।

২. কুরবানিদাতা ও পশু উভয়ে এমন স্থানে অবস্থান করছে যেখানে ঈদের জামাত হয় না। এমতাবস্থায় সুবহে সাদিক হওয়া মাত্রই কুরবানি করা যাবে।

৩. কুরবানির পশু পল্লীগ্রামে আর কুরবানিদাতা শহরে। এ অবস্থায় কুরবানির পশুর অবস্থানের ভিত্তিতে সুবহে সাদিক হওয়া মাত্রই কুরবানি করা যাবে।

৪. কুরবানির পশু শহরে, কুরবানিদাতা গ্রামে। এমতাবস্থায় কুরবানির পশুর অবস্থানের ভিত্তিতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে কুরবানি সহীহ হবে না। কুরবানিদাতা যে গ্রামে অবস্থান করছে তাতে কোনো ফায়দা হবে না। অর্থাৎ কুরবানিদাতা গ্রামে অবস্থানের কারণে কুরবানির পশু আগে জবাই করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَحِيْلَةُ الْمِصْرِيِّ اِذَا اَرَادَ الخ : লেখক এখানে শহুরে ব্যক্তির দ্রুত কুরবানি করার একটি কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, যদি কোনো শহুরে ব্যক্তি দ্রুত কুরবানি করার ইচ্ছা করে তাহলে সে এই কৌশল অবলম্বন করতে পারে যে, কুরবানির পশুটিকে গ্রামে এমনস্থানে পাঠিয়ে দিবে যেখানে ঈদের জামাত হয় না। সেখানে পশুটিকে সুবহে সাদিক হওয়ামাত্রই কুরবানি করা যাবে। এভাবে দ্রুত কুরবানির একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِاَنَّهَا تُشْبِهُ الزَّكٰوةَ : লেখক এখানে কুরবানির ক্ষেত্রে কুরবানির পশুর অবস্থান ধর্তব্য কেন এবং কুরবানিদাতার অবস্থান ধর্তব্য নয় কেন -এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক বলেন, এরূপ হওয়ার কারণ হচ্ছে কুরবানির সাথে জাকাতের সাদৃশ্য। উল্লেখ্য যে, নিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে কুরবানির সাথে জাকাতের সদৃশ্যতা নেই; বরং সদকাতুল ফিত্‌রের সাথে সদৃশ্যতা আছে। কেননা সদকাতুল ফিত্‌র ও কুরবানি উভয়ের মধ্যে قُدْرَةٌ مُمْكِنَةٌ শর্ত। পক্ষান্তরে জাকাতের নিসাব নির্ধারিত হওয়ার ক্ষেত্রে قُدْرَةٌ مُيَسِّرَةٌ শর্ত। তবে কুরবানি ভিন্ন একটি ব্যাপারে জাকাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তা হচ্ছে জাকাতের মধ্যে মহল বা বস্তুর বিষয়টি লক্ষণীয় -জাকাতদাতার বিষয়টি লক্ষণীয় নয়, তদ্রূপ কুরবানির মধ্যে কুরবানির পশুর অবস্থান লক্ষণীয়; কুরবানিদাতার অবস্থান লক্ষণীয় নয়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, কারো সম্পদ/নিসাব বিনষ্ট হয়ে গেলে যেমন জাকাত রহিত হয়ে যায়, তদ্রূপ কুরবানির দিন বাকি অবস্থায় যদি কুরবানির পশু বা মাল বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে কুরবানির ওয়াজিব হওয়া ও আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়। এদিক থেকে কুরবানি জাকাতের অনুরূপ হলো। জাকাতের মধ্যে জাকাত প্রদানকারীর অবস্থান বিবেচনা করা হয় না; বরং মহল বা জায়গার অবস্থা বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ জাকাতের মাল যে স্থানে থাকবে, সেখানের দরিদ্রদেরকে জাকাতের মাল প্রদান করা হবে। জাকাতের মাল এমন স্থানে প্রদান করা আবশ্যক হবে না যে এলাকায় জাকাত প্রদানকারী অবস্থান করছে।

কুরবানির বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য যে, কুরবানির পশু যে এলাকায় থাকবে সে স্থানের অবস্থা ধর্তব্য হবে; যে এলাকায় কুরবানিদাতা থাকবে সে এলাকার অবস্থা ধর্তব্য হবে না।

بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ : লেখক বলেন, সদকাতুল ফিত্‌রের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। সুতরাং যদি ঈদের দিন সুবহে সাদিক হওয়ার পর কোনো ব্যক্তির মাল বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার উপর থেকে সদকাতুল ফিত্‌র রহিত হবে না। কারণ সদাকাতুল ফিত্‌রের মধ্যে সাদকা আদায়কারীর অবস্থা বিবেচনা করা হয়। মহল বা মালের অবস্থা বিবেচনা করা হয় না। কেননা সদকাতুল ফিত্‌র জাকাতের সাথে সাদৃশ্য রাখে না।

وَلَوْ ضَحَّى بَعْدَ مَا صَلَّى اَهْلُ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُصَلِّ اَهْلُ الْجَبَّانَةِ اَجْزَاهُ اِسْتِحْسَانًا لِاَنَّهَا صَلٰوةٌ مُعْتَبَرَةٌ حَتّٰى لَوِ اكْتَفَوْا بِهَا اَجْزَاتْهُمْ وَكَذَا عَلٰى هٰذَا عَكْسُهُ وَقِيْلَ هُوَ جَائِزٌ قِيَاسًا وَاِسْتِحْسَانًا ـ

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদের লোকদের ঈদের নামাজ আদায় করার পর কুরবানির পশু জবাই করে, অথচ ঈদগাহের লোকেরা ঈদের জামাত আদায় করেনি তাহলে ইস্‌তিহ্‌সান হিসেবে তার কুরবানি বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা মসজিদের ঈদের জামাতের [শরিয়তে] গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এমনকি যদি লোকেরা মসজিদের জামাতকে যথেষ্ট মনে করে তাও তাদের জন্য সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। এর বিপরীত অবস্থাতে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ কেউ বলেন– এ [বিপরীত] অবস্থাতো কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সান উভয় বিবেচনায় বৈধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْضَحّٰى بَعْدَ مَا صَلّٰى الخ : উপরের ইবারতে লেখক দুটি মাসআলা আলোচনা করেছেন। প্রথম মাসআলা এই যে, যদি কোনো এলাকায় ঈদগাহ ব্যতীত মসজিদে ঈদের জামাত হয়। যেমন আমাদের দেশে ঘনবসতিপূর্ণ বড় বড় সব শহরগুলোতে ঈদগাহ ছাড়াও বহু মসজিদে ঈদের জামাত হয়। আর পূর্বযুগে শহরের প্রশাসক বা আমীর দুর্বল ও বৃদ্ধলোকদের জন্য যারা শহরের বাইরে ঈদগাহে যেতে সক্ষম হতো না শহরের ভিতরে মসজিদে নামাজের ব্যবস্থা করতেন।

মোটকথা যেভাবেই হোক যদি কোনো এলাকায় ঈদগাহে নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ঈদের জামাত শহরের মসজিদগুলোতে হয়ে যায়, অতঃপর লোকেরা তাদের কুরবানির পশু জবাই করে ফেলে তাহলে ইস্‌তিহ্‌সান বা সূক্ষ্ম কিয়াস হিসেবে তাদের এ জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা এসব লোকের মসজিদে আদায় করা এ নামাজ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য বা সঠিক বলে বিবেচিত। যেহেতু নামাজ সঠিক বলে বিবেচিত। অতএব, এ নামাজের পর যে কুরবানি করা হবে তাও সঠিক বিবেচিত হবে। লেখক বলেন, এ নামাজ এমন গ্রহণযোগ্য যে, যদি তারা ঈদগাহে না যেয়ে সকলেই মসজিদে নামাজ আদায় করে, তাহলে সকলের নামাজই হয়ে যাবে। তাদের ঈদগাহে যাওয়া ওয়াজিব হবে না। যদি তাদের এ নামাজ গ্রহণযোগ্যই না হতো তাহলে তাদের ঈদগাহে যাওয়ার আদেশ করা হতো। যেহেতু শরিয়ত তাদের ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দেয় না তাতে বুঝা গেল তাদের আদায় করা মসজিদের নামাজ হয়ে গেছে।

কিয়াসের দাবি অনুযায়ী উল্লিখিত নামাজ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কুরবানি আদায় হওয়া এবং না হওয়ার উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এজাতীয় ক্ষেত্রে সতর্কতামূলকভাবে নাজায়েজ হওয়ার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। উভয় দিক এভাবে যে, সে নামাজের পর জবাই করেছে এ হিসেবে তো তার কুরবানি সহীহ হয়। পক্ষান্তরে সে ঈদগাহে জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তার কুরবানির পশু জবাই করে ফেলেছে এ হিসেবে তার কুরবানি শুদ্ধ না হওয়াই উচিত।

লেখক বলেন, যদি বিষয়টি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ শহরের লোকেরা মসজিদে নামাজ আদায় করেনি, ইতিমধ্যে ঈদগাহের নামাজ শেষ হয়ে গেছে তাহলেও তার কুরবানি সঠিক বলে বিবেচিত হবে। এটিও সূক্ষ্মকিয়াস হিসেবে সঠিক বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ هُوَ جَائِزٌ قِيَاسًا وَاِسْتِحْسَانًا : লেখক বলেন, কতিপয় আলেমের মতে বিপরীত অবস্থাটি অর্থাৎ যদি ঈদগাহের নামাজ শেষ হয়ে যায়; কিন্তু শহরের মসজিদের নামাজ শেষ না হয় এমতাবস্থায় কুরবানি করা হলে সূক্ষ্ম কিয়াস [ইসতিহ্‌সান] এবং কিয়াস উভয় দৃষ্টিতে সহীহ বিবেচিত হবে। কেননা ঈদের নামাজ আদায় করার মাসনূন তরীকা হচ্ছে শহরের সব লোক ঈদগাহে নামাজ আদায়ের জন্য যাবে। সুতরাং ঈদগাহের নামাজ হচ্ছে আসল আর বিপরীত অবস্থায় ঈদগাহের লোকেরা নামাজ আদায় করে ফেলেছে। অতএব, কুরবানি কিয়াসানুযায়ী সহীহ হয়ে যায়। ইস্‌তিহ্‌সান হিসেবেও হয়ে যায় যে, যে নামাজ ঈদগাহে আদায় করা হয়েছে তাতো গ্রহণযোগ্য নামাজ অবশ্যই। আর গ্রহণযোগ্য নামাজের পর কুরবানি করা চলে.– তা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

قَالَ : وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهٗ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ بَعْدَهٗ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ كُلُّهَا اَيَّامُ ذَبْحٍ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالُوْا اَيَّامُ النَّحْرِ ثَلٰثَةٌ اَفْضَلُهَا اَوَّلُهَا وَقَدْ قَالُوْهُ سِمَاعًا لِاَنَّ الرَّاْىَ لَا يَهْتَدِيْ اِلَى الْمَقَادِيْرِ وَفِي الْاَخْبَارِ تَعَارُضٌ فَاَخَذْنَا بِالْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ الْاَقَلُّ وَاَفْضَلُهَا اَوَّلُهَا كَمَا قَالُوْا وَلِاَنَّ فِيْهِ مُسَارَعَةً اِلٰى اَدَاءِ الْقُرْبَةِ وَهُوَ الْاَصْلُ اِلَّا لِمُعَارِضٍ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর কুরবানি তিন দিন করা জায়েজ। কুরবানির ঈদের দিন এবং তার পরবর্তী দুই দিন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ঈদের দিনের পর তিন দিন [মোট চার দিন]। রাসূল ﷺ -এর এ হাদীসের কারণে যে, তিনি বলেছেন, তাশরীকের দিনগুলো সবই কুরবানির দিন। আমাদের দলিল এই হাদীস যা হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, কুরবানির দিন তিন দিন এর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে প্রথম দিন। তারা তো [রাসূল ﷺ থেকে] শুনেই বলেছেন। কেননা রায় বা মতামত দিয়ে সময় নির্ধারণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আর হাদীসে এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। অতএব, আমরা সুনিশ্চিতটি গ্রহণ করেছি। আর নিশ্চিত হচ্ছে কম সংখ্যাটি। আর সর্বোত্তম দিন হচ্ছে প্রথম দিন যেমনটি তারা [সাহাবীগণ] বললেন। অধিকন্তু এতে ইবাদত পালন করার ক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করা হয়। এর বিপরীত কিছু না পাওয়া গেলে এরূপ করাই মূল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক কুরবানি কয়দিন করা শরিয়তে অনুমোদিত এবং কখন করা উত্তম? এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত এনে বলেন, 'কুরবানির দিন হচ্ছে তিন দিন। কুরবানির ঈদের দিন অর্থাৎ জিলহজ মাসের দশ তারিখ এবং তার পরবর্তী দুই দিন।' মোটকথা, কুরবানির দিন হচ্ছে জিলহজ মাসের দশ, এগারো এবং বারো তারিখ।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতভেদের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, কুরবানির দিন [চার দিন, ঈদের দিন এবং] এরপর তিন দিন। অর্থাৎ জিলহজ মাসের দশ, এগারো, বারো ও তেরো তারিখ। মোট এ চার দিন কুরবানি করা যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল– قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ كُلُّهَا اَيَّامُ ذَبْحٍ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেছেন, তাশরীকের দিনগুলোই কুরবানির দিন।' এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (র.) তাঁর মুসনাদে এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত সূত্রে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ـ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেছেন, তাশরীকের দিনগুলো সবগুলোই জবাইয়ের দিন এবং আরাফার ময়দানের সব অংশ অবস্থানের জায়গা।'

আহনাফের পক্ষ থেকে এ হাদীসের উত্তরে বলা হয় হাদীসটি সনদের দিক থেকে বিপুলভাবে সমালোচিত। এ হাদীস দলিল দেওয়ার যোগ্য নয়। হাদীসটি সম্পর্কে কিতাবুল হজ্জে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য আলোচ্য মাসআলায় আহনাফের সাথে ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-ও রয়েছেন। এ দুটি মত ছাড়াও আরো বিভিন্ন মত অন্যান্য ইমামগণ থেকে বর্ণিত আছে।

আহনাফের দলিল- رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ) اَنَّهُمْ قَالُوْا اَيَّامُ النَّحْرِ ثَلٰثَةٌ اَفْضَلُهَا اَوَّلُهَا . অর্থাৎ 'হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, কুরবানির দিন তিন দিন। সর্বোত্তম দিন হচ্ছে প্রথম দিন।'

এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লামা যাইলাঈ (র.) বলেন, এভাবে এ তিন সাহাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত নেই। তাঁর ভাষ্য হচ্ছে هٰذَا غَرِيْبٌ جِدًّا। তবে এ বক্তব্য সাহাবায়ে কেরামের কারো কারো থেকে বর্ণিত আছে। যেমন ইমাম মালেক (র.) মুআত্তায়ে মালেকে বর্ণনা করেন- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الْاَضْحٰى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْاَضْحٰى . অর্থাৎ 'হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, ঈদুল আযহার পর কুরবানির দিন হলো দুদিন।'
তাছাড়া مَالِكٌ بَلَغَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ كَانَ يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ অর্থাৎ, ইমাম মালেক (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে অনুরূপ উক্তি বর্ণনা করেন।

ইমাম কারখী (র.) তাঁর মুখতাসার কিতাবে নিম্নোক্ত সনদে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-
حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَعُبَادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَسَدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَيَّامُ النَّحْرِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ اَوَّلُهُنَّ اَفْضَلُهُنَّ .
হযরত আলী (রা.) বলতেন, কুরবানির দিন হলো তিনদিন, এর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে প্রথমদিন। এছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক (রা.), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, সাঈদ ইবনে যুবাইর, হাসান বসরী ও ইব্রাহীম নাখঈ (র.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। মোটকথা, হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) যে শব্দে যাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন যদিও এ শব্দে হাদীসটি পাওয়া যায় না; কিন্তু এ বক্তব্য ঐ সকল সাহাবী (র.) এবং অন্যদের থেকে অনুরূপ শব্দে প্রমাণিত রয়েছে।
এরপর হিদায়ার লেখক বলেন, সাহাবায়ে কেরাম থেকে যে বক্তব্য প্রমাণিত তা তাদের রায় বা মতামত নয়; বরং তারা রাসূল ﷺ -থেকে শুনেই তা বর্ণনা করেছেন। কেননা শরিয়তের কোনো বিষয়ের পরিমাণ/সময় নির্ধারণ মতামত দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। এ সব বিষয় অবশ্যই শরিয়তদাতার পক্ষ থেকে নির্দেশিত হতে হয়।
যেহেতু আলোচ্য মাসআলায় সাহাবাদের বক্তব্য কুরবানির সময় নির্ধারণ করছে, অতএব, তাদের এ বক্তব্য রাসূল ﷺ থেকে শ্রুতই হবে। সুতরাং তাদের বক্তব্য মানেই রাসূল ﷺ -এর হাদীস।
قَوْلُهُ وَفِى الْاَخْبَارِ تَعَارُضٌ فَاَخَذْنَا بِالْمُتَيَقَّنِ الخ : লেখক বলেন, যদি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর হাদীসটিকে সহীহ ধরেও নেওয়া হয়, তবে এর দ্বারা হাদীস পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত হয়। যুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা.) এ হাদীস দ্বারা কুরবানির দিন চারদিন প্রমাণিত হয়। আর হযরত আলী (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর হাদীস দ্বারা তিনদিন বলে প্রমাণিত হয়।
এমতাবস্থায় আমরা অধিকতর নিশ্চিত বিষয়টি গ্রহণ করলে নিরাপদ থাকতে পারব। আর অধিকতর বা সুনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে তিনদিন- অর্থাৎ দশ, এগারো ও বারো তারিখ। তের তারিখ সন্দেহপূর্ণ। কোনো বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয়, আবার অন্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয় না। তাই নিরাপদ অবস্থানে থাকার উদ্দেশ্যে আমরা তিনদিনের হাদীসগুলোকে গ্রহণ করব। তাছাড়া তিনদিনের বিষয় উভয় মাযহাবের দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়; কিন্তু চারদিনের বিষয় একপক্ষের দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়। অতএব, তিনদিন গ্রহণ করাই উত্তম।
قَوْلُهُ وَاَفْضَلُهَا اَوَّلُهَا كَمَا قَالُوْا : লেখক বলেন, কুরবানির তিনদিনের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে প্রথমদিন। প্রথমদিন হলো ইয়াওমুন্ নাহর বা জিলহজের দশ তারিখ।
উত্তম হওয়ার দলিল হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম প্রথমদিনটিকে উত্তম বলেছেন। দ্বিতীয়ত প্রথম দিন কুরবানি করাতে ইবাদতের ক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করা হয়। ইবাদতের ক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করা উত্তম। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে- وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতি দ্রুততার সাথে অগ্রসর হও। অধিকন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করাই হচ্ছে আসল যদি বিলম্ব করার পক্ষে অন্য কোনো দলিল না থাকে। যদি বিলম্ব করার পক্ষে কোনো দলিল থাকে সেক্ষেত্রে বিলম্ব করা উত্তম হবে। যেমন ফজরের ও জোহরের নামাজ বিলম্ব করার কথা হাদীসে পাওয়া যায়-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ وَاَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

মোটকথা বিলম্ব করার ক্ষেত্রে কোনো দলিল না পাওয়া গেলে যে কোনো ইবাদত দ্রুত আদায় করা উত্তম।

وَيَجُوْزُ الذَّبْحُ فِيْ لَيَالِيْهَا اِلَّا اَنَّهُ يُكْرَهُ لِاِحْتِمَالِ الْغَلَطِ فِيْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَاَيَّامُ النَّحْرِ ثَلٰثَةٌ وَاَيَّامُ التَّشْرِيْقِ ثَلٰثَةٌ وَالْكُلُّ يَمْضِىْ بِاَرْبَعَةٍ اَوَّلُهَا نَحْرٌ لَا غَيْرُ وَاٰخِرُهَا تَشْرِيْقٌ لَا غَيْرُ وَالْمُتَوَسِّطَانِ نَحْرٌ وَتَشْرِيْقٌ وَالتَّضْحِيَةُ فِيْهَا اَفْضَلُ مِنَ التَّصَدُّقِ بِثَمَنِ الْاُضْحِيَةِ لِاَنَّهَا تَقَعُ وَاجِبَةً اَوْ سُنَّةً وَالتَّصَدُّقُ تَطَوُّعٌ مَحْضٌ فَتَفْضُلُ عَلَيْهِ وَلِاَنَّهَا تَفُوْتُ بِفَوَاتِ وَقْتِهَا وَالصَّدَقَةُ تُؤْتٰى بِهَا فِى الْاَوْقَاتِ كُلِّهَا فَنَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الطَّوَافِ وَالصَّلٰوةِ فِيْ حَقِّ الْاٰفَاقِىْ .

অনুবাদ : এই দিনগুলোর রাতে জবাই করা জায়েজ। তবে রাতের অন্ধকারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে মাকরূহ। কুরবানির দিন তিন দিন এবং তাশরীকের দিনও তিন দিন। সবগুলো অতিক্রান্ত হয় চার দিনে। এর প্রথম হচ্ছে কুরবানির [ঈদের] দিন। আর শেষ দিন হচ্ছে শুধুমাত্র তাশরীকের। মাঝের দুদিন কুরবানি ও তাশরীক উভয়ের। এ দিনগুলোতে কুরবানির অর্থ দান করা থেকে কুরবানির পশু জবাই করা উত্তম। কেননা পশুটি হয়তো ওয়াজিব হবে [ধনীদের জন্য] নয়তো সুন্নত হবে [দরিদ্রদের ক্ষেত্রে] আর দান করা তো মোস্তাহাব কাজ মাত্র। সুতরাং এর উপর পশু জবাই করা উত্তম গণ্য হবে। কেননা এটি সময় চলে যাওয়ার দ্বারা ফওত-বাতিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সদকা তো সব সময় প্রদান করা যায়। সুতরাং কুরবানি আফাকী অর্থাৎ মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্যে তওয়াফও [নফল] নামাজের মতো হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ الذَّبْحُ فِىْ لَيَالِيْهَا الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক কুরবানির দিনগুলোর রাতে জবাই করার বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক বলেন, কুরবানির দিনগুলোর রাতে পশু জবাই করা বৈধ। তবে রাতগুলোতে জবাই করা মাকরূহ। রাতগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাঝের দুই রাত। অর্থাৎ এগারো ও বারো তারিখের দিবাগত রাত।

ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর বর্ণনানুযায়ী রাতে কুরবানি করা জায়েজ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ
অর্থাৎ 'তারা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু জবাই করার সময়।' –[সূরা হজ্জ : ২৮] এ আয়াতের দ্বারা দিনের বেলায় কুরবানি করার কথা প্রমাণিত হয়।

এর জবাবে আহনাফের পক্ষ থেকে বলা হয়– রাত (لَيْلٌ) তো দিনের অনুগামী। এ হিসেবে রাতও কুরবানির সময় বলে গণ্য হয়। এজন্যই সকলের ঐকমত্যে রাতের বেলায় রমী তথা কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েজ।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّهُ يُكْرَهُ لِاِحْتِمَالِ الْغَلَطِ الخ : লেখক বলেন, রাতে কুরবানি করা জায়েজ, তবে রাতের অন্ধকারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনার কারণে মাকরূহ। ভুল বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন– জবাই করার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে, অথবা বকরি ইত্যাদি চেনার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে।

লেখক বলেন, কুরবানি করার দিন হচ্ছে তিন দিন, তদ্রূপ তাশরীকের দিনও তিন দিন। অবশ্য কুরবানি ও তাশরীকের দিন উভয় মিলে হয় চার দিন। তা এভাবে যে, প্রথম দিন হচ্ছে শুধু কুরবানির দিন। জিলহজের দশ তারিখ শুধু কুরবানির দিন। আর চতুর্থ দিন হচ্ছে শুধু তাশরীকের দিন, কুরবানি চতুর্থ দিন চলে না। মাঝের দুদিন তথা এগারো ও বারোই জিলহজ হচ্ছে কুরবানি ও তাশরীকের দিন।

লেখক বলেন, কুরবানির দিনগুলোতে কুরবানির পশু জবাই করা কুরবানির মাল দান করে দেওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ কুরবানি করা জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী [যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত] ওয়াজিব। কুরবানি করা হলে ওয়াজিব আদায় হবে। অথবা কুরবানি করার দ্বারা সুন্নত আদায় হয়। কারণ ইমাম শাফেয়ী (র.) ও সাহেবাইন (র.) -এর মতানুযায়ী কুরবানি করা সুন্নত। মোটকথা, কুরবানি করার দ্বারা হয়তো ওয়াজিব আদায় হয়, নয়তো সুন্নত আদায় হয়।

পক্ষান্তরে কুরবানির মাল দান করা নফল কাজ। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম ও সলফের মধ্যে কুরবানি করার সাধারণ অভ্যাস ছিল। তাদের কেউ কুরবানির মাল দান করেননি। সুতরাং উভয় বিবেচনায় কুরবানি করা উত্তম। একে তো ওয়াজিব বা সুন্নত কাজ নফলের চেয়ে উত্তম। দ্বিতীয়ত: সাহাবায়ে কেরাম ও সলফের সকলের আমল কুরবানির পশু জবাই করা। তৃতীয় দলিল এই যে, কুরবানির পশু সময় চলে গেলে জবাই করা যায় না। অন্যদিকে দান তো সব সময় / সারা বছরেই করা যায়। কুরবানির বিষয়টি আফাকী তথা মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীর ক্ষেত্রে তওয়াফের মতো। অর্থাৎ আফাকী যে মক্কায় এসেছে তার জন্য নফল নামাজ আদায় করার চেয়ে নফল তওয়াফ করা উত্তম। কারণ নফল নামাজ তো সে তার বাড়িতেও আদায় করতে পারবে; কিন্তু তওয়াফ তো সে মক্কায় থাকা অবস্থাতেই করতে হবে। মক্কা থেকে চলে গেলে তার তওয়াফের সুযোগ থাকবে না। তদ্রূপ কুরবানির দিনগুলোর পর কুরবানির সুযোগ থাকবে না। কিন্তু নফল দান তো সারা বছরই করা যাবে। তাই আফাকীর তওয়াফের মতো তারও কুরবানিই করা উচিত; নফল দান করা উচিত হবে না।

وَلَوْ لَمْ يُضَحِّ حَتّٰى مَضَتْ اَيَّامُ النَّحْرِ اِنْ كَانَ اَوْجَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ اَوْ كَانَ فَقِيْرًا وَقَدْ اِشْتَرَى الْاُضْحِيَّةَ تَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةً وَاِنْ كَانَ غَنِيًّا تَصَدَّقَ بِقِيْمَتِهٖ شَاةً اِشْتَرٰى اَوْ لَمْ يَشْتَرِ لِاَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَتَجِبُ عَلَى الْفَقِيْرِ بِالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ عِنْدَنَا فَاِذَا فَاتَ الْوَقْتُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ اِخْرَاجًا لَهٗ عَنِ الْعُهْدَةِ كَالْجُمُعَةِ تُقْضٰى بَعْدَ فَوَاتِهَا ظُهْرًا وَالصَّوْمِ بَعْدَ الْعَجْزِ فِدْيَةً ـ

অনুবাদ : যদি কুরবানি না করে, আর ইতোমধ্যে কুরবানির দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে যদি নিজের উপর কুরবানি ওয়াজিব করে থাকে কিংবা দারিদ্র হওয়া সত্ত্বেও কুরবানির পশু ক্রয় করে থাকে তাহলে সে কুরবানির পশুটিকে জীবিত অবস্থাতে দান করে দেবে। আর যদি সে ধনী হয় তাহলে সে কুরবানির পশু খরিদ করুক কিংবা নাই করুক একটি বকরির সমমূল্য দান করে দিবে। কেননা ধনীর উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। আর দরিদ্র ব্যক্তির উপর কুরবানির নিয়তে কুরবানির পশু ক্রয় করার দ্বারা ওয়াজিব হয়। সুতরাং যখন সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় তার উপর আরোপিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য সদকা করা ওয়াজিব হয়। যেমন– জুমা [এর জামাত] ছুটে গেলে জোহর দ্বারা কাজা করা হয় কিংবা রোজার অপরাগতার পর ফিদিয়াহ দ্বারা কাজা করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْلَمْ يُضَحِّ حَتّٰى مَضَتْ اَيَّامُ الخ : উপরের ইবারতে লেখক কুরবানির দিনগুলোর মাঝে যদি কেউ কুরবানি করতে সক্ষম না হয় তাহলে তার উপর কি বিধান আরোপিত হবে তা আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকার (র.) বলেন, কুরবানিদাতা কয়েক ধরনের হতে পারে–

১. কোনো ব্যক্তি নিজের উপর কুরবানি ওয়াজিব করল। যেমন– সে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর কুরবানি ওয়াজিব করলাম/আল্লাহর কসম! আমি এ বছর কুরবানি করব/আমি একটি বকরি কুরবানি করার মানত করলাম, -যে ব্যক্তি এভাবে নিজের উপর কুরবানি ওয়াজিব করল সে দরিদ্রও হতে পারে/বিত্তবানও হতে পারে।

২. দরিদ্র তথা কুরবানি যার উপর ওয়াজিব হয়নি এমন ব্যক্তি যদি কুরবানি করার নিয়তে কোনো পশু ক্রয় করে থাকে তাহলে তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে যায়।

উপরিউক্ত দু'ধরনের ব্যক্তি যদি কুরবানির দিনগুলোতে কুরবানি করতে সক্ষম না হয় তাহলে কুরবানির পশু জীবিত সদকা করে দিবে।

৩. এমন বিত্তবান ব্যক্তি যার উপর তার বিত্তের কারণে কুরবানি ওয়াজিব হয়েছে সে যদি কুরবানির দিনগুলোতে কুরবানি করতে সক্ষম না হয় তাহলে একটি বকরি সমমূল্যের টাকা সদকা করে দিবে।

قَوْلُهُ وَتَجِبُ عَلَى الْفَقِيْرِ بِالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, আহনাফের ফকিহগণের মতে, কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যদি কুরবানি করার নিয়তে কুরবানির পশু খরিদ করে তাহলে তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মতে, যদি দরিদ্র ব্যক্তি কুরবানির পশু ক্রয় করে তাহলেও তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব হয় না।

প্রকাশ থাকে যে, কুরবানির পশু কুরবানির জন্য সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যদি কেউ মানত করে যে, সে এই পশুটি কুরবানি করবে/দরিদ্র ব্যক্তি যদি কুরবানির নিয়তে পশু ক্রয় করে তাহলে ঐ পশু কুরবানি করাই ওয়াজিব হয়। -এটা জাহেরী রেওয়ায়েতের মাসআলা।

এ মাসআলার দলিল হচ্ছে একটি হাদীস। রাসূল ﷺ একদা হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) কে এক দিনার দিয়ে তাঁর জন্য একটি বকরি কিনতে পাঠান। তিনি দিনার দিয়ে একটি বকরি খরিদ করে দু'দিনারে সেটা বিক্রি করে দেন। অতঃপর এক দিনার দিয়ে আরেকটি বকরি খরিদ করেন। তারপর বকরি এবং এক দিনার নিয়ে রাসূল ﷺ -এর কাছে ফিরে আসেন এবং রাসূল ﷺ -কে ঘটনার বৃত্তান্ত শোনান। রাসূল ﷺ [ঘটনা শুনে তাঁর জন্য দোয়া করে] বলেন, আল্লাহ তোমার ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বরকত দান করুন। তারপর বলেন, তুমি বকরিটিকে কুরবানি কর এবং দিনার [মুনাফাকৃত অর্থ] টি দান করে দাও।

উক্ত হাদীসের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যদি শুধুমাত্র নিয়ত দ্বারা কুরবানি করা ওয়াজিব না হতো তাহলে রাসূল ﷺ মুনাফাকৃত দিনারটি দান করার আদেশ করতেন না। এ হাদীসের দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, কুরবানির পশু বিক্রি করা জায়েজ।

قَوْلُهُ فَاِذَا فَاتَ الْوَقْتُ وَجَبَ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি কুরবানির দিনগুলো চলে গেল বা সময় শেষ হয়ে গেল অথচ কুরবানিদাতা কুরবানি করতে সক্ষম হলো না, তখন কুরবানিদাতার উপর আরোপিত ওয়াজিব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কুরবানির জন্য ক্রয়কৃত জীবিত পশু দান করা কুরবানির দাতার জন্যে ওয়াজিব হবে যদি কুরবানিদাতা দরিদ্র ব্যক্তি হয়ে থাকে। আর যদি কুরবানিদাতা বিত্তবান হয় তাহলে তার উপর একটি বকরি সমমূল্যের টাকা দান করা ওয়াজিব। চাই সে বকরি ক্রয় করুক কিংবা নাই করুক।

قَوْلُهُ كَالْجُمُعَةِ تَقْضٰى بَعْدَ فَوَاتِهَا ظُهْرًا الخ : এই ইবারতে গ্রন্থকার (র.) কুরবানির সময় পার হওয়ার পর কুরবানির পশু/মূল্য দান করাকে জুমার নামাজ ও রোজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব সে যদি জুমার নামাজের জামাতে শরিক হতে না পারে তাহলে সে জোহরের নামাজ আদায় করে জুমা কাজা করবে। এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখতে সম্পূর্ণ অপারগ বা অক্ষম হয়ে যায় তাহলে সে প্রতি রোজার পরিবর্তে একটি সদকাতুল ফিত্র পরিমাণ দান করবে যা তার রোজার কাযা বলে গণ্য হবে।

মোটকথা এ দু'টি ইবাদত অপারগতার অবস্থাতে যেমন বিকল্প আছে । তদ্রূপ কুরবানির অপারগতায় বিকল্প আছে।

قَالَ : وَلَا يُضَحّٰى بِالْعَمْيَاءِ وَالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ الَّتِىْ لَا تَمْشِىْ اِلَى الْمَنْسَكِ وَلَا الْعَجْفَاءِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَجْزِىْ فِى الضَّحَايَا اَرْبَعَةٌ اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرْجُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِىْ لَا تُنْقِىْ قَالَ : وَلَا تَجْزِىْ مَقْطُوْعَةُ الْاُذُنِ وَالذَّنَبِ اَمَّا الْاُذُنُ فَلِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَشْرِفُوْا الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ اَىْ اُطْلُبُوْا سَلَامَتَهُمَا وَاَمَّا الذَّنَبُ فَلِاَنَّهٗ عَضْوٌ كَامِلٌ مَقْصُوْدٌ فَصَارَ كَالْاُذُنِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অন্ধ, কানা ও এমন লেংড়া জন্তু যা কুরবানির স্থান পর্যন্ত হেটে যেতে পারে না এমন পশু কুরবানি করা যাবে না এবং কুরবানি করা যাবে খুবই দুর্বল পশুকে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন চার ধরনের পশু কুরবানির উপযুক্ত নয়। যথা– ১. কানা- যার কানা হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। ২. লেংড়া -যার লেংড়া হওয়ার বিষয় সুস্পষ্ট। ৩. রোগাক্রান্ত -যার রোগাক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার এবং ৪. দুর্বল ও ক্ষীণকায় জন্তু যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কান ও লেজ কাটা পশু কুরবানির উপযুক্ত নয়। কানের বিষয়টি এ কারণে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন- তোমরা চোখ ও কান অক্ষত আছে কি না ভালোভাবে দেখে নাও। অর্থাৎ এগুলোর পূর্ণাঙ্গতা খুঁজে নাও। আর লেজের বিষয়টি এ কারণে যে, লেজ একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্দেশ্যপূর্ণ অঙ্গ। সুতরাং এটি কানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَلَا يُضَحّٰى بِالْعَمْيَاءِ الخ : আলোচ্য ইবারতে ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারত নকল করে হেদায়া গ্রন্থকার (র.) এমন সব প্রাণীর বর্ণনা দিয়েছেন যেগুলোকে কুরবানি দেওয়া চলে না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল পশু কুরবানি দেওয়া জায়েজ সেগুলোর মধ্যে যদি কোনো পশু অন্ধ কিংবা কানা হয় তাহলে তা কুরবানি দেওয়া যায় না। তদ্রূপ এমন লেংড়া পশু, যা কুরবানির স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না তাও কুরবানি করার উপযুক্ত নয়।

উল্লেখ্য যে, আগের কালে/এখনো কোথাও কোথাও কুরবানির সকল পশু একস্থানে যেমন বড় ময়দানে/কসাই খানায় কুরবানি করা হয়। সেসব জায়গাতে কুরবানির পশু হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এ জন্য বলা হয়েছে যে, পশু কুরবানির স্থান পর্যন্ত হেঁটে পৌছতে সক্ষম নয়।

এমনিভাবে খুবই দুর্বল বা ক্ষীণকায় পশু কুরবানি করা নাজায়েজ।

ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতের পক্ষে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) রাসূল ﷺ-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تَجْزِىْ فِى الضَّحَايَا اَرْبَعَةٌ اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرْجُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِىْ لَا تُنْقِىْ ـ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন, কুরবানির মধ্যে চার ধরনের পশু উপযুক্ত নয় যথা– ১. কানা- যার কানা হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। ২. লেংড়া- যার লেংড়া হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। ৩. রোগাক্রান্ত যার রোগী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। ৪. ক্ষীণকায় বা অতি দুর্বল- যার হাড়ের ভিতরের মজ্জা শুকিয়ে গেছে।

উক্ত হাদীসটি সুনানের চার কিতাবেই বর্ণিত আছে। হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত–

عَنْ شُعْبَةَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوْزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ اَضَاحِيْ فَقَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصَابِعِيْ اَقْصَرُ مِنْ اَصَابِعِهِ وَاَنَامِلِيْ اَقْصَرُ مِنْ اَنَامِلِهِ فَقَالَ اَرْبَعٌ لَا تَجُوْزُ فِى الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيْرُ الَّتِىْ لَا تُنْقِىْ .

উপরিউক্ত হাদীসের মধ্যে লক্ষণীয় দিক হচ্ছে এই যে, রাসূল ﷺ প্রতিটি বিষয়ের সাথে اَلْبَيِّنُ -এর শর্তারোপ করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে এর দ্বারা কুরবানি নাজায়েজ হবে। কারণ সামান্য ত্রুটি থেকে প্রাণীকূল মুক্ত নয়। তাই দোষটি যখন গুরুতর হবে তখন এর দ্বারা কুরবানি নাজায়েজ হবে, এর আগে নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) আরো বলেন, কানকাটা ও লেজকাটা পশুর কুরবানিও সহীহ নয়। এ সম্পর্কে দলিল দিতে গিয়ে হিদায়ার মুসান্নিফ শায়েখ বুরহানুদ্দীন (র.) বলেন, কানকাটা নাজায়েজ হওয়ার দলিল হলো এ সংক্রান্ত রাসূল ﷺ -এর হাদীস। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– اِسْتَشْرِفُوْا الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ اَىْ اُطْلُبُوْا سَلَامَتَهَا অর্থাৎ, 'তোমরা চোখ ও কান ভালোভাবে দেখে নাও। অর্থাৎ অক্ষত কান ও চোখ দেখে কুরবানির পশু ক্রয় কর।'

ভাষ্যকার আল্লামা আইনী (র.) বলেন, হাদীসটি দুজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। প্রথমত: হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। আর তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসটি সনদসহ নিম্নরূপ–

عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ .

হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে পশুর চোখ ও কান ভালোভাবে দেখতে বলেছেন। হযরত হুযাইফা (রা.) -এর হাদীসটি নিম্নরূপ–

اَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِىْ فِىْ مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيْرِ الْمُلَائِيِّ الْقُرَشِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُخْرُفٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَتَشَرَّفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ . هٰذَا بِلَفْظِ الْبَزَّارِ وَقَالَ الطَّبَرَانِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ .

উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা কান অক্ষত পশু নির্বাচন করার জোর তাকিদ বুঝা যায়। সুতরাং কান কাটা পশু কুরবানি করা জায়েজ হবে না।

লেজ সম্পর্কে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, কানের মতো লেজও যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ অঙ্গ এবং লেজ উদ্দেশ্যপূর্ণ এজন্য লেজ কানের হুকুম রাখবে। সুতরাং কানকাটা পশু যেমন কুরবানির জন্য জায়েজ হয় না, তদ্রূপ লেজকাটা পশুও কুরবানির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَالَ : وَلَا الَّتِيْ ذَهَبَ اَكْثَرُ اُذُنِهَا وَ ذَنَبِهَا وَاِنْ بَقِيَ اَكْثَرُ الْاُذُنِ وَالذَّنَبِ جَازَ لِاَنَّ لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ بَقَاءً وَ ذِهَابًا وَلِاَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيْرَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَجُعِلَ عَفْوًا وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فِيْ مِقْدَارِ الْاَكْثَرِ فَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ عَنْهُ وَاِنْ قَطَعَ مِنَ الذَّنَبِ اَوِ الْاُذُنِ اَوِ الْعَيْنِ اَوِ الْاَلْيَةِ الثُّلُثُ اَوْ اَقَلَّ اَجْزَاهُ وَاِنْ كَانَ اَكْثَرَ لَمْ يَجْزِهِ لِاَنَّ الثُّلُثَ تَنْفُذُ فِيْهِ الْوَصِيَّةُ مِنْ غَيْرِ رِضَاءِ الْوَرَثَةِ فَاعْتُبِرَ قَلِيْلًا وَفِيْمَا زَادَ لَا تَنْفُذُ اِلَّا بِرِضَاهُمْ فَاعْتُبِرَ كَثِيْرًا وَ يُرْوٰى عَنْهُ الرُّبُعُ لِاَنَّهُ يَحْكِيْ حِكَايَةَ الْكَمَالِ عَلٰى مَا مَرَّ فِي الصَّلٰوةِ وَيُرْوٰى الثُّلُثُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ حَدِيْثِ الْوَصِيَّةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল পশুর কান অথবা লেজের অধিকাংশ নেই তা কুরবানির জন্য উপযুক্ত পশু নয়। আর যদি কান ও লেজের অধিকাংশ থাকে আর অল্প পরিমাণ না থাকে তাহলে কুরবানি করা জায়েজ হয়ে যাবে। কেননা কোনো অঙ্গ থাকা ও না থাকা উভয় অবস্থায় অধিকাংশ পরিপূর্ণের হুকুম রাখে। আর সামান্য ত্রুটি থেকে বাঁচা সম্ভব নয় তাই সামান্য ত্রুটি ক্ষমার যোগ্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে 'অধিকাংশ পরিমাণের' ব্যাপারে রেওয়ায়েতগুলো পরস্পর বিরোধপূর্ণ। জামিউস সাগীর গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি লেজ, কান অথবা চোখ কিংবা নিতম্বের এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম কাটা হয় তাহলে সে পশুর কুরবানি জায়েজ। যদি এক তৃতীয়াংশের বেশি হয় তাহলে জায়েজ হবে না। এর কারণ হলো, এক তৃতীয়াংশের মধ্যে উত্তরাধিকারীদের সন্তুষ্টি ছাড়াই অসিয়ত করলে তা কার্যকর হয়। সুতরাং তা অল্পই গণ্য হয়। তার চেয়ে যা বেশি হয় তাতে তাদের সন্তুষ্টি ছাড়া কার্যকর হয় না। সুতরাং তা বেশি বলে গণ্য। আবার ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক চতুর্থাংশ। কেননা সেটা পূর্ণতার পরিচয় বহন করে, যার বর্ণনা নামাজের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কেননা রাসূল ﷺ অসিয়তের ব্যাপারে বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ [দান কর]। এক তৃতীয়াংশই বেশি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا الَّتِيْ ذَهَبَ اَكْثَرُ اُذُنِهَا الخ : উপরের ইবারতে গ্রন্থকার (র.) যেসব পশুর কান বা লেজের অংশবিশেষ কাটা হয় তার মাসআলা আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল পশুর লেজ বা কানের অধিকাংশ কাটা হয় তা দ্বারা কুরবানি করা সহীহ নয়। আর যদি অধিকাংশ কান / লেজ অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা দ্বারা কুরবানি করা চলে। এখন একটি প্রশ্ন জাগে যে, অধিকাংশ থাকা বা না থাকাকে জবাই শুদ্ধ হওয়ার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গ্রন্থকার (র.) বলেন, শরিয়তে أَكْثَرُ বা অধিকাংশকে পূর্ণাঙ্গের স্থলাভিষিক্ত করেছে। কোনো জিনিসের যদি অধিকাংশ থাকে তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গই আছে বলে গণ্য হবে। আলোচ্য মাসআলায় যদি কান / লেজের অধিক বা বেশি অংশ বিদ্যমান থাকে তাহলে পুরো কান / লেজ আছে বলে ধরে নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি অধিকাংশ না থাকে তাহলে লেজ নেই একথাই ধরে নেওয়া হবে। লেখকের بَقَاءً এবং ذَهَابًا দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। অধিকাংশ পূর্ণাঙ্গের হুকুমে ধরার আরেকটি কারণ হচ্ছে সামান্য দোষ-ত্রুটি মুক্ত বা একেবারেই দোষমুক্ত পশু পাওয়া যাওয়া এক দুরূহ ব্যাপারে। আর শরিয়ত এমন কোনো বিষয়ের আদেশ করে না যা বান্দার জন্য কঠিন; বরং বান্দার জন্য সহজ / সহজতর বিষয়ের আদেশ করা হয়েছে। হাদীসে রয়েছে– اَلدِّيْنُ يُسْرٌ দীন তথা ধর্ম হচ্ছে সহজ।

قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) : গ্রন্থকার বলেন, অধিকাংশ নির্ধারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্যান্য ইমামের মত আছেই। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রথম মত : জামিউস সাগীর গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত ইবারতটি এরূপ যে, যদি কোনো পশুর লেজ / কান / চোখ কিংবা নিতম্বের এক তৃতীয়াংশ কিংবা তার চেয়ে কম কাটা হয় তাহলে সে পশু কুরবানির উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে। আর যদি এক তৃতীয়াংশের বেশি কাটা হয় তাহলে এর দ্বারা কুরবানি চলবে না।

আলোচ্য বর্ণনার প্রমাণ এই যে, এক তৃতীয়াংশকে তিনি কম / বেশির মাপকাঠি বানিয়েছেন। অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম হলে কম, এর চেয়ে বেশি হলে বেশি বলে সাব্যস্ত হবে।

এ বর্ণনার পক্ষে দলিল দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, কোনো মৃত ব্যক্তির অসিয়ত কার্যকর করতে যদি তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম প্রয়োজন হয় তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের সন্তুষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার হয় না। কেননা এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম সামান্য বা কমের হুকুমে। পক্ষান্তরে যদি মৃতের অসিয়ত কার্যকর করতে এক তৃতীয়াংশের বেশি সম্পদের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা কার্যকর করতে তার উত্তরাধিকারীদের অনুমতির দরকার হয়। কেননা এর চেয়ে বেশি পরিমাণ সম্পদ বেশি সম্পদ বলে গণ্য হয়।

দ্বিতীয় মত : ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অধিকাংশ নির্ধারণে যে দ্বিতীয় মতটি পাওয়া যায় তা শুজা' (شُجَاعٌ) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনাটি হচ্ছে, এক চতুর্থাংশও বেশি। এক চতুর্থাংশের কম কাটা হলে সে পশু জবাই করা চলবে। যদি এক চতুর্থাংশ পরিমাণও কাটা হয় তাহলে তা দ্বারা কুরবানি চলবে না। এর দলিল হচ্ছে, ইতঃপূর্বে সালাত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, এক চতুর্থাংশ পূর্ণাঙ্গের হুকুম রাখে। যেমন সতরের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, যদি কারো নামাজে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ সতর খোলা থাকে তাহলে তার নামাজ হবে না। তদ্রূপ নাপাকীর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তির কাপড়ের এক চতুর্থাংশ নাপাক থাকে তাহলে সেই কাপড় দ্বারা নামাজ চলবে না। এ দুটি মাসআলায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শরিয়ত এক চতুর্থাংশকে বেশি বলে গণ্য করেছে। ইবনে শুজা' 'কিতাবুল মানাসিক'এ উল্লেখ করেন যে, إِنَّ الرُّبُعَ إِذَا ذَهَبَ لَمْ يَجُزْ 'যদি এক চতুর্থাংশ কাটা যায় তাহলে সে পশুর দ্বারা কুরবানি চলবে না।'

তৃতীয় মত : ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তৃতীয় যে মতটি পাওয়া যায় তা হলো, এক তৃতীয়াংশ হয়ে গেলে তা বেশি বলে গণ্য হবে। আর তার চেয়ে কম হলে তা কম বলে বিবেচিত হবে। এ মতের দলিল দেওয়া হয় একটি হাদীস দ্বারা। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) তাঁর মালের সর্বশেষ এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করতে চাইলে রাসূল ﷺ তাকে বলেন– اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ অর্থাৎ, 'হ্যাঁ এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করতে পার। তবে এক তৃতীয়াংশ অনেক / বেশি।' এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার ছয় কিতাবেই বর্ণিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'অসিয়ত' অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, হযরত সদরুশ শহীদের মতে, প্রথম মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ এটা জাহেরী রেওয়ায়েতের মতো।

وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) اِذَا بَقِىَ الْاَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ اَجْزَاهُ اِعْتِبَارًا لِلْحَقِيْقَةِ عَلٰى مَا تَقَدَّمَ فِى الصَّلٰوةِ وَهُوَ اِخْتِيَارُ الْفَقِيْهِ اَبِى اللَّيْثِ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ (رحـ) اَخْبَرْتُ بِقَوْلِىْ اَبَا حَنِيْفَةَ (رحـ) فَقَالَ قَوْلِىْ هُوَ قَوْلُكَ قِيْلَ هُوَ رُجُوْعٌ مِنْهُ اِلٰى قَوْلِ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقِيْلَ مَعْنَاهُ قَوْلِىْ قَرِيْبٌ مِنْ قَوْلِكَ وَفِىْ كَوْنِ النِّصْفِ مَانِعًا رِوَايَتَانِ عَنْهُمَا كَمَا فِىْ اِنْكِشَافِ الْعَضْوِ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) .

অনুবাদ : আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যখন [কান বা লেজের] অর্ধেকের বেশি অবশিষ্ট থাকে তখন এর দ্বারা কুরবানি হয়ে যায়। তারা এটা বলেছেন হাকীকতের ভিত্তিতে, যার বর্ণনা সালাত অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) এ মতটি পছন্দ করেছেন। অধিকন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আমি আমার এই অভিমতের কথা ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-কে জানালে তিনি আমাকে বলেন, এই ব্যাপারে তোমার মতই আমার মত। কেউ কেউ বলেন, তার এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে ফিরে গেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আমার মত তোমার মতের কাছাকাছি। অর্ধাংশ [কাটা হওয়া কুরবানির জন্য] প্রতিবন্ধক হওয়ার ব্যাপারে সাহেবাইন (র.) থেকে দু ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন সতরের কোনো অঙ্গের অর্ধাংশ খোলার ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে দু ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ الخ : আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার (র.) 'অধিকাংশের পরিমাণ' নির্ধারণে সাহেবাইন (র.) -এর মতামত আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে ইমাম আ'যম (র.) থেকে তিনটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছিল।

সাহেবাইন (র.) বলেন, অর্ধেকের বেশি লেজ/কান যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে তার দ্বারা কুরবানি চলবে। আর যদি অর্ধেকের কম অবশিষ্ট থাকে তথা অর্ধেকের বেশি কাটা পড়ে যায় তাহলে তার দ্বারা কুরবানি করা চলবে না।

তাঁদের দলিল হচ্ছে, হাকীকতের বাস্তবতার অনুসরণ। বাস্তবে কোনো জিনিস অর্ধেকের বেশি থাকলে তাকে বেশি বলা হয় আর অর্ধেকের কম থাকলে তাকে কম বলা হয়। কারণ অল্প ও বেশি দুটি পরস্পর বিপরীত শব্দ যা নির্ধারিত অর্ধেকের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَا تَقَدَّمَ فِى الصَّلٰوةِ الخ : এর অর্থ হচ্ছে তাদের এরূপ বক্তব্য সালাত অধ্যায়ে সতরের কোন অঙ্গ কতটুকু খোলা হলে নামাজ নষ্ট হবে তাতে গিয়েছে। তাঁরা সেখানে বলেছেন, অর্ধেকের বেশি হলে নামাজ নষ্ট হবে, আর অর্ধেকের কম হলে নামাজ নষ্ট হবে না। বরং তার দায়িত্ব থেকে নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

হিদায়ার সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) বলেন, ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র.) সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতকে পছন্দ করেছেন। সাথে সাথে তিনি জামিউস সাগীরের ভাষ্যগ্রন্থে এ দাবিও করেছেন যে, ইমাম আযম (র.) সাহেবাইন (র.)-এর মতামতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন।

এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর একটি বক্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য ও তাৎপর্যময়। তিনি বলেন– أَخْبَرْتُ بِقَوْلِيْ أَبَا حَنِيْفَةَ (رحـ) فَقَالَ قَوْلِيْ هُوَ قَوْلُكَ . অর্থাৎ 'আমি আমার মতামতটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সামনে পেশ করলে তিনি বলেন, আমার মত আর তোমার মত একই মত।'

قَوْلِيْ هُوَ قَوْلُكَ -এর ব্যাখ্যায় কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলেন, এই কথাটির মাধ্যমে মূলত ইমাম আযম (র.) সাহেবাইন (র.)-এর মত গ্রহণ করেছেন, যার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কেননা তাঁর মত ছিল এক তৃতীয়াংশের বেশি হলে সেটা বেশি, অন্যথায় সেটা কম। এখন অর্ধাংশকে তার মত বলার অর্থ হচ্ছে তাঁর আগের মত তিনি প্রত্যাহার করেছেন।

قَوْلِيْ هُوَ قَوْلُكَ -এর ব্যাখ্যায় অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেছেন -এর অর্থ হচ্ছে তোমার মত আর আমার মত কাছাকাছি। অর্থাৎ আমার মত হচ্ছে এক তৃতীয়াংশের বেশি হলে অধিকাংশ আর তোমার মত হচ্ছে অর্ধেকের বেশি হলে অধিকাংশ- সুতরাং এ দুটি কাছাকাছি মত।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো যদি ঠিক অর্ধেক পরিমাণ কাটা হয় তাহলে কি হবে? এ ব্যাপারে সাহেবাইন (র.) থেকে দু'ধরনের অভিমত পাওয়া যায়–

প্রথম মত : এব্যাপারে প্রথম অভিমত হচ্ছে অর্ধেক কাটা হলে এর দ্বারা কুরবানি চলবে না। কারণ অর্ধেকের কম হলে মাফ বা কুরবানি চলবে। যেহেতু অর্ধেক অল্প নয় তাই অর্ধেক ত্রুটি মাফ হবে না অর্থাৎ অর্ধেক কাটা হলে কুরবানি চলবে না।

দ্বিতীয় মত : দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে অর্ধেক হলে মাফ অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ কাটা হলেও কুরবানি চলবে। কেননা অর্ধেকের বেশিকে শরিয়ত নিষিদ্ধ করেছে। অর্ধেক যেহেতু বেশি নয় তাই অর্ধেক পরিমাণ কাটা হলেও তা দ্বারা কুরবানি চলবে।

মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, অর্ধেক পরিমাণ কাটা হলেও এর দ্বারা কুরবানি চলবে না। সেখানে দলিলরূপে বলা হয়েছে যে, যখন জায়েজ ও নাজায়েজের দলিল বরাবর হয়। এমতাবস্থায় না জায়েজ কে সতর্কতার উদ্দেশ্যে প্রাধান্য দেওয়া হবে। কেননা নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই সতর্কতা নিহিত রয়েছে।

قَوْلُهُ كَمَا فِيْ اِنْكِشَافِ الْعَضْوِ الخ : লেখক বলেন, অর্ধেক মাফ হওয়ার ব্যাপারে যেমন সাহেবাইন (র.) -এর থেকে দুটি মত পাওয়া যায় তদ্রূপ নামাজের মধ্যে কোনো সতরের অঙ্গের অর্ধেক খুলে গেলে তাতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকেও দু'টি মত পাওয়া যায়। এক মতে অর্ধেক মাফ। অন্যমতে অর্ধেক মাফ নয়।

বিশেষ নোট – আল্লামা শামী (র.) বলেন, এক তৃতীয়াংশ এবং তার চেয়ে কম হলে তা অল্প বলে গণ্য হবে। আর যদি এক তৃতীয়াংশের বেশি হয় তাহলে তা বেশি গণ্য হবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন, এর উপর ফতোয়া।

তদ্রূপ ইবনুস সুলতান كَنْزُ الدَّقَائِقِ -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন–

اَلثُّلُثُ وَمَا دُوْنَهُ قَلِيْلٌ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ كَثِيْرٌ هُوَ الصَّحِيْحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى .

অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ এবং তার চেয়ে কম হচ্ছে অল্পাংশ আর তার চেয়ে বেশি হলে তা অধিকাংশ। এটা সহীহ মত এবং এর উপরই ফতোয়া।

ثُمَّ مَعْرِفَةُ الْمِقْدَارِ فِيْ غَيْرِ الْعَيْنِ مُتَيَسَّرٌ وَالْعَيْنُ قَالُوْا تُشَدُّ الْعَيْنُ الْمَعِيْبَةُ بَعْدَ أَنْ لَا تَعْتَلِفَ الشَّاةُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُقَرَّبُ الْعَلَفُ إِلَيْهَا قَلِيْلًا قَلِيْلًا فَإِذَا رَأَتْهُ مِنْ مَوْضِعٍ أُعْلِمَ عَلٰى ذٰلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ تُشَدُّ عَيْنُهَا الصَّحِيْحَةُ وَقُرِّبَ إِلَيْهَا الْعَلَفُ قَلِيْلًا قَلِيْلًا حَتّٰى إِذَا رَأَتْهُ مِنْ مَكَانٍ أُعْلِمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ ثُلُثًا فَالذَّاهِبُ الثُّلُثُ وَإِنْ كَانَ نِصْفًا فَالنِّصْفُ ـ قَالَ : وَيَجُوْزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْجَمَّاءِ وَهِيَ الَّتِيْ لَا قَرْنَ لَهَا لِأَنَّ الْقَرْنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَقْصُوْدٌ وَكَذَا مَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ لِمَا قُلْنَا وَالْخَصِيِّ لِأَنَّ لَحْمَهَا أَطْيَبُ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحّٰى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ ـ

অনুবাদ : প্রকাশ থাকে যে, চোখ ব্যতীত অন্য যে কোনো অঙ্গে পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ। চোখের ব্যাপারে মাশায়েখগণ বলেন, প্রথমে [উদাহরণস্বরূপ] বকরিটিকে এক/দু'দিন ঘাস দেওয়া হবে না। তারপর এর সমস্যাযুক্ত চোখটি বেঁধে ফেলা হবে [আর সমস্যামুক্ত ভালো চোখটি খোলা রাখা হবে]। এরপর ঘাস কিছুদূর থেকে সামান্য-সামান্য করে তার সামনে আনা হবে। যখন সে কোনো একটি স্থানে ঘাস দেখতে পাবে সে স্থানটিকে চিহ্নিত করা হবে। অতঃপর তার ভালো চোখটিকে বেঁধে ফেলে অল্প অল্প করে ঘাস তার নিকটবর্তী করা হবে। যখন সে কোনো একটি স্থানে ঘাস দেখতে পাবে এবার সেই স্থানটিও চিহ্নিত করা হবে। তারপর উভয়স্থানের দূরত্ব লক্ষ্য করা হবে তথা পরিমাপ করা হবে। যদি দেখা যায় উভয় চিহ্নিত স্থানের মাঝে এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ পার্থক্য তাহলে ধরে নেওয়া হবে চোখের দৃষ্টি এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে। আর যদি পার্থক্য হয় অর্ধেক তাহলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে অর্ধেক। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শিংবিহীন (جَمَّاء) পশু কুরবানি করা জায়েজ। আর জাম্মা বলা হয় যে পশুর শিং উঠে নাই। কেননা শিং -এর সাথে কোনো উদ্দেশ্য জড়িত নয়। তদ্রূপ ভাঙ্গা শিংবিশিষ্ট প্রাণীর কুরবানি জায়েজ। সেই একই কারণে যা আমরা বর্ণনা করেছি। আর খাসীকৃত পশুর কুরবানিও জায়েজ। কেননা খাসীকৃত পশুর গোশত উপাদেয়। তাছাড়া সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ সাদা-কালো মিশ্র রঙের খাসীকৃত দুটি ভেড়া জবাই করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ مَعْرِفَةُ الْمِقْدَارِ فِيْ غَيْرِ الْعَيْنِ الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক কুরবানির পশু কোন অঙ্গের মাঝে কি পরিমাণ ত্রুটি তা নির্ধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

লেখক বলেন, চোখ ছাড়া অন্য অঙ্গ যেমন কান, লেজ ও শিং ইত্যাদি বাহ্যত যা দৃষ্টিগোচর হয় এর ত্রুটি নির্ধারণ করা সহজ। চোখের দৃষ্টিশক্তি কতটা হ্রাস পেয়েছে তা নির্ধারণ বা পরিমাপ করা একটি জটিল কাজ। অধুনা কালে মানুষের দৃষ্টিশক্তি মাপার ক্ষেত্রে যদিও প্রযুক্তির যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়েছে তথাপি পশু-পাখির দৃষ্টিশক্তি পরিমাপের ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি হয়নি বললেই চলে। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য ইবারতে তাঁর যুগের পশু পাখির দৃষ্টি শক্তি পরিমাপের একটি বিশেষ পদ্ধতির কথা আলোচনা করেছেন যা খুবই যুক্তিসম্মত।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, ধরে নিল একটি বকরির এক চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। তার সেই চোখের দৃষ্টিশক্তি যদি একেবারেই না থাকে তাহলে সেটি কানা বলে বিবেচিত হবে। আর সেক্ষেত্রে যে, সেটি জবাইয়ের অযোগ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি তার সে চোখটিতে দৃষ্টিশক্তি থাকে তাহলে কি পরিমাণ আছে তা যাচাই করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেমন– প্রথমে বকরিটির এক-দু'দিনের খাবার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে যাতে তার ক্ষুধা ভালোভাবে লাগে। অতঃপর তার সমস্যাযুক্ত চোখটি বেঁধে ভালো চোখটি খোলা রাখতে হবে। অতঃপর কিছু দূর থেকে তার খাবারের ঘাস-পানি ধীরে ধীরে সামনে আনতে হবে। যতটুকু আসার পর বা যে স্থানটি আনার পর সে তার ভালো চোখ দ্বারা খাবার দেখতে পাবে সে স্থানটি চিহ্নিত করতে হবে।

তারপর ভালো চোখটি বেঁধে সমস্যাযুক্ত চোখ খুলে দিতে হবে এবং সেই একইস্থান থেকে তার ঘাস-পানি ধীরে ধীরে আনতে হবে। এবার যে স্থানে সে খারাপ চোখ দিয়ে দেখতে পাবে সেই স্থানটিতেও চিহ্ন দিবে। এখন দেখতে হবে এ দু'স্থানের মাঝের দূরত্ব কতখানি। সেই দূরত্ব মেপে দৃষ্টিশক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম দফাতে বকরিটি ভালো চোখ দিয়ে তিন গজ দূরে ঘাস-পানি থাকতে দেখেছিল। এরপর তার কমদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ দ্বারা একগজ দূরে থাকতে ঘাস-পানি দেখেছিল। এ দুয়ের মাঝে দুই তৃতীয়াংশের পার্থক্য, অর্থাৎ ভালো চোখ দ্বারা দেখতে পায় তিনগুণ আর কমদৃষ্টির চোখ দ্বারা দেখতে পায় একগুণ। সুতরাং তার এক চোখ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে দুই তৃতীয়াংশ।

পক্ষান্তরে যদি ভালো চোখ দ্বারা তিন গজ দূরত্বে দেখার পর কমদৃষ্টির চোখ দ্বারা দেড় গজ থাকতে দেখে তাহলে এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য হলো অধিকাংশের। সুতরাং তার এক চোখ অর্ধেক দৃষ্টি হারিয়েছে তা প্রমাণিত হবে।

তদ্রূপ যদি কমদৃষ্টির চোখ দ্বারা দুই গজ থাকতে দেখে তাহলে দুই দৃষ্টির পার্থক্য হবে এক তৃতীয়াংশের। অর্থাৎ এর কমদৃষ্টির চোখের দৃষ্টি হারিয়েছে এক তৃতীংশ আর অবশিষ্ট আছে দুই তৃতীয়াংশ।

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجُوزُ اَنْ يُضَحَّى بِالْجَمَّاءِ الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক এমন দু প্রকারের পশুর আলোচনা করেছেন যা জবাই করা জায়েজ।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে জন্তুর শিং একেবারেই উঠেনি তা কুরবানি করা জায়েজ। এ ব্যাপারে কোনো ইমামের দ্বিমতও নেই। এ ধরনের জন্তুকে আরবিতে جَمَّاءُ 'জাম্মা' বলে। তদ্রূপ যে জন্তুর শিং ভেঙ্গে গেছে তাও কুরবানি করা চলে। এর দলিল হিসেবে হিদায়ার লেখক বলেন, যেহেতু শিং এর সাথে কুরবানির কোনো উদ্দেশ্য জড়িত নয় তাই এটি না থাকা কিংবা ভাঙ্গা হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

অবশ্য যদি কোনো প্রাণীর শিং গোড়া থেকে উঠে যায় এবং এর প্রভাব মাথার খুলি পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে সে পশু কুরবানির উপযুক্ত থাকে না।

অতঃপর লেখক বলেন, খাসী করা জন্তু কুরবানি করা বৈধ। খাসী করা পশুর গোশত খুব সুস্বাদু হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে হিদায়ার লেখক হাদীসে রাসূল ﷺ দ্বারা দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ দুটি খাসী করা সাদা-কালো মিশ্র রঙের ভেড়া জবাই করেন। এ হাদীসটি রাসূল ﷺ থেকে পাঁচজন সাহাবী বর্ণনা করেন–

১. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি এরূপ–

اَخْرَجَ اَبُوْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ عَيَّاشٍ الْمَعَافِرِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ .

২. হযরত আয়েশা (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস নিম্নরূপ–

رَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُضَحِّىَ اِشْتَرٰى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ .

এ ছাড়া হযরত আবূ রাফে' এবং আবুদ দারদা (রা.) থেকে অনুরূপ শব্দে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

وَالثَّوْلَاءِ وَهِيَ الْمَجْنُوْنَةُ وَقِيْلَ هٰذَا إِذَا كَانَتْ تَعْتَلِفُ لِأَنَّهُ لَا يَخِلُّ بِالْمَقْصُوْدِ أَمَّا إِذَا كَانَتْ لَا تَعْتَلِفُ لَا تَجْزِيْهِ وَالْجَرْبَاءُ إِنْ كَانَتْ سَمِيْنَةً جَازَ لِأَنَّ الْجَرْبَ فِي الْجِلْدِ وَلَا نُقْصَانَ فِي اللَّحْمِ وَإِنْ كَانَتْ مَهْزُوْلَةً لَا تَجُوْزُ لِأَنَّ الْجَرْبَ فِي اللَّحْمِ فَانْتَقَصَ وَأَمَّا الْهَتْمَاءُ وَهِيَ الَّتِيْ لَا أَسْنَانَ لَهَا فَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ يَعْتَبِرُ فِي الْأَسْنَانِ الْكَثْرَةَ وَالْقِلَّةَ وَعَنْهُ إِنْ بَقِيَ مَا يُمْكِنُ الْاِعْتِلَافُ بِهِ أَجْزَاهُ لِحُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ وَالسَّكَّاءِ وَهِيَ الَّتِيْ لَا أُذُنَ لَهَا خِلْقَةً لَا تَجُوْزُ إِنْ كَانَ هٰذَا لِأَنَّ مَقْطُوْعَ أَكْثَرِ الْأُذُنِ إِذَا كَانَ لَا يَجُوْزُ فَعَدِيْمُ الْأُذُنِ أَوْلٰى .

অনুবাদ : আর ছাওলা অর্থাৎ উম্মাদ পশুর কুরবানি জায়েজ। কেউ কেউ বলেন, এ ধরনের পশু তখনই কুরবানি জায়েজ যখন তা ঘাস-পানি গ্রহণ করে। কারণ এমতাবস্থায় উদ্দেশ্য হাসিলে কোনো সমস্যা হয় না। তবে যদি তা ঘাস-পানি গ্রহণ না করে তাহলে কুরবানির উপযুক্ত হবে না। জারবা (جَرْبَاءُ) তথা চর্ম রোগাক্রান্ত পশু কুরবানির জন্য বৈধ হবে যদি পশুটি মোটা তাজা হয়। কেননা চর্মরোগ হয় ত্বকে, গোশতে কোনো সমস্যা থাকে না। আর যদি তা কৃশকায় হয় তাহলে তা কুরবানির উপযুক্ত হবে না। কেননা তখন পাঁচড়া হবে গোশতের মাঝে। সুতরাং মূলে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আর হাতমা অর্থাৎ দাঁতবিহীন পশুর ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দাঁতের ব্যাপারে অধিকাংশ ও অল্পাংশ থাকাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। আবার তাঁর থেকে আরেকটি মত এমনও বর্ণিত আছে যে, যদি এ পরিমাণ দাঁত অবশিষ্ট থাকে যার দ্বারা ঘাস খেতে পারে, তাহলে উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার কারণে এর দ্বারা কুরবানি চলবে। আর সাক্কা তথা জন্মগতভাবে কানহীন পশুর দ্বারা কুরবানি জায়েজ হবে না, যদি বাস্তবিকই এমন হয়ে থাকে। কেননা যখন অধিকাংশ কান কর্তিত পশু জবাই করা চলে না। তখন কানহীন পশুতো আরো নিশ্চিতভাবে কুরবানির জন্য জায়েজ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّوْلَاءُ وَهِيَ الْمَجْنُوْنَةُ وَقِيْلَ هٰذَا الخ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য অংশে আরো কয়েক প্রকার পশুর কথা বর্ণনা করেছেন, যাদের কুরবানি করা চলে এবং কতককে কুরবানি করা চলে না।

প্রথম তিনি আলোচনা করেন ثَوْلَاءُ তথা উন্মাদ বা পাগলা পশু সম্পর্কে। পশুর ক্ষেত্রে উন্মাদ বা পাগলা হওয়ার অর্থ চরম অবাধ্য পশুকে, যা এদিক সেদিক উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় পালিয়ে বেড়ায়। লেখক বলেন, যদি পশু তার খাদ্য তথা ঘাস-পানি গ্রহণ করে তাহলে এর খাওয়া চলবে। কেননা এ জাতীয় পাগলামি উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। তবে যদি পাগলামির কারণে খাদ্য পর্যন্ত গ্রহণ না করে তাহলে এ দ্বারা কুরবানির কাজ চলবে না।

এরপর হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, جَرْبَاءُ বা চর্মরোগে চরমভাবে আক্রান্ত পশু কুরবানি করা চলবে যদি সেটি মোটা তাজা হয়। আর যদি ক্ষীণকায় ও হাড্ডিসার হয় তাহলে সে পশু দ্বারা কুরবানি করা যাবে না। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, যদি পশুটি মোটা তাজা হয় তাহলে পশুটির পাঁচড়া চামড়ার সাথে হবে অভ্যন্তরে গোশতের মাঝে এর কোনো প্রভাব পতিত হবে না। ফলে এর গোশত খাওয়া চলবে। যেহেতু গোশতই খাওয়া হয়, আর তাতে রোগ নেই। সুতরাং সেই পশু জবাই করাতে কোনো সমস্যা নেই। পক্ষান্তরে যদি পশুটি হাড্ডিসার-অতি ক্ষীণকায় হয় তাহলে ধরে নেওয়া হবে পশুটির রোগ গোশতের মাঝে ছড়িয়ে গেছে। আর এজন্য পশুটি শুকিয়ে ক্ষীণকায় হয়ে গেছে। সেহেতু এর গোশত রোগাক্রান্ত বলে সাব্যস্ত হবে তাই পশুটি কুরবানির উদ্দেশ্যে জবাই করা চলবে না।

هَتْمَاءُ বলা হয় দাঁতবিহীন পশুকে। এ সম্পর্কে গ্রন্থকার (র.) বলেন, যে পশুর দাঁত মোটেই নাই তা কুরবানির উপযুক্ত নয়। অবশ্য যদি অসম্পূর্ণ দাঁত থাকে তাহলে তার বিধান কি হবে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে দু ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা–

প্রথম বর্ণনা : যে পশুর দাঁত অসম্পূর্ণ যদি সেই পশুর অধিকাংশ দাঁত থাকে তাহলে সেই পশু কুরবানির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। কারণ দাঁতসমূহ সমষ্টিগতভাবে একটি অঙ্গসদৃশ। ইতঃপূর্বে কান, লেজ ও চোখ ইত্যাদির ব্যাপারে আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যদি অসম্পূর্ণ এসব অঙ্গে অধিকাংশ থাকে তাহলে এর দ্বারা কুরবানি চলে। অতএব, দাঁতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সুতরাং যদি দাঁত অধিকাংশ থাকে তাহলে এর দ্বারা কুরবানি চলবে অন্যথায় কুরবানি চলবে না।

দ্বিতীয় বর্ণনা : এ পরিমাণ দাঁত থাকা যার দ্বারা ঘাস চাবাতে সক্ষম হয়। কেননা দাঁতের উদ্দেশ্য হচ্ছে চাবানোর কাজ করা। যেহেতু যে পরিমাণ দাঁত আছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে সেহেতু এ পরিমাণ দাঁত থাকায় সে পশুটি কুরবানির উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ وَالسَّكَّاءِ هِيَ الَّتِيْ لَا أُذُنَ : লেখক বলেন, সাককা (سَكَّاءُ) অর্থাৎ যে পশুর জন্মগতভাবে কান নেই তবে তা কুরবানির উপযুক্ত নয়। কেননা তার উদ্দেশ্য পূর্ণ দুটি অঙ্গই নেই।

অতঃপর লেখক বলেন, পশুর ক্ষেত্রে যদিও এ বিষয়টি খুবই বিরল তা সত্ত্বেও যদি কোনো পশুর মাঝে এরূপ পরিলক্ষিত হয় তাহলে তা কুরবানির উপযুক্ত হবে না। অবশ্য পাখিদের মাঝে কান না থাকার বিষয়টি বিরল নয়।

উল্লেখ্য যে, এখানে কোনো কোনো আলেম সাককা -এর অর্থ করেছেন খুবই ছোট কানবিশিষ্ট পশু। যদি এরূপই হয় তাহলে এর দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ হয়ে যাবে।

প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী নাজায়েজ হওয়ার কারণ সম্পর্কে হিদায়ার লেখক বলেন, কোনো অঙ্গের অধিকাংশ না থাকাতে যেখানে কুরবানি বাতিল হয়ে যায় সেখানে কোনো অঙ্গ যদি সম্পূর্ণই না থাকে তাহলে তা কুরবানির অনুপযুক্ত হবে তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

وَهٰذَا الَّذِیْ ذَکَرْنَا اِذَا کَانَتْ هٰذِهِ الْعُیُوْبُ قَائِمَةً وَقْتَ الشِّرَاءِ وَلَوْ اِشْتَرَاهَا سَلِیْمَةً ثُمَّ تَعَیَّبَتْ بِعَیْبٍ مَانِعٍ اِنْ کَانَ غَنِیًّا عَلَیْهِ غَیْرَهَا وَاِنْ کَانَ فَقِیْرًا تَجْزِیْهِ هٰذِهِ لِاَنَّ الْوُجُوْبَ عَلَی الْغَنِیِّ بِالشَّرْعِ اِبْتِدَاءً لَا بِالشِّرَاءِ فَلَمْ تَتَعَیَّنْ بِهٖ وَعَلَی الْفَقِیْرِ بِشِرَائِهٖ بِنِیَّةِ الْاُضْحِیَّةِ فَتَعَیَّنَتْ وَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ ضَمَانُ نُقْصَانِهٖ کَمَا فِیْ نِصَابِ الزَّکٰوةِ.

অনুবাদ : উপরে পশুর বিভিন্ন অঙ্গের দোষক্রটি সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তা তখনই কার্যকর হবে যখন পশু কেনার সময় এসব থাকবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ পশু খরিদ করে দোষমুক্তরূপে। অতঃপর তা এমন দোষযুক্ত হয় যা কুরবানির জন্য প্রতিবন্ধক তাহলে যদি কুরবানিদাতা বিত্তবান হয় তবে এর পরিবর্তে অন্য একটি কুরবানি করতে হবে [অর্থাৎ ওয়াজিব হবে]। আর যদি কুরবানিদাতা দরিদ্র হয় তাহলে এ [দোষযুক্ত] পশুটিই যথেষ্ট হবে। কেননা বিত্তবানের উপর কুরবানি শরিয়তের বিধানের কারণে প্রথম থেকেই ওয়াজিব, [শুধুমাত্র] ক্রয়ের কারণে নয়। সুতরাং এ পশুটিই তার জন্য নির্দিষ্ট নয়। অন্যদিকে দরিদ্র ব্যক্তির উপর কুরবানির নিয়তে পশু খরিদ করার কারণে ওয়াজিব হয়েছে। তাই খরিদকৃত পশুটি কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে [এখন দোষযুক্ত হলেও এটিই কুরবানি করতে হবে] এবং তার উপর জাকাতের নেসাবের মতো ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিদায়া গ্রন্থের গ্রন্থকার শায়েখ আল্লামা বুরহান উদ্দিন (র.) বলেন, ইতঃপূর্বে আলোচিত বিভিন্ন প্রকার দোষে দুষ্ট জন্তুগুলোর ব্যাপারে যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা বিত্তবান ও দরিদ্রদের জন্যে ভিন্ন হতে পারে। লেখক বলেন, যদি উপরিউক্ত দোষগুলো ক্রয়ের সময় বিদ্যমান থাকে তাহলে উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে যদি ক্রয়ের সময় জন্তু সুস্থ-ক্রটিমুক্ত হয় পরে এর মাঝে এমন দোষ দেখা দেয় যার কারণে কুরবানির অযোগ্য বিবেচিত হয় তাহলে কুরবানিদাতা বিত্তবান হলে তার এই পশুর পরিবর্তে অন্য আরেকটি পশু জবাই করা আবশ্যক বা ওয়াজিব হয়। আর যদি কুরবানিদাতা দরিদ্র হয়, [যার উপর কুরবানি ওয়াজিব হয় না] তাহলে ঐ পশুটিই তার জন্য কুরবানি করা চলবে। পরিবর্তন করা দরকার হবে না।

ধনী ও গরিবের মাঝে এ পার্থক্য হওয়ার কারণ হচ্ছে ধনী-বিত্তবানদের উপর কুরবানি ওয়াজিব হয় তাদের সম্পদের কারণে, শুধুমাত্র কুরবানির পশু খরিদ করার কারণে কুরবানি ওয়াজিব হয়নি। আর যে পশুটি খরিদ করা হয়েছে তা কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে দরিদ্র– যার উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়; বরং সে কুরবানির পশু কুরবানির নিয়তে খরিদ করার দ্বারা নিজের উপর ওয়াজিব করেছে। তার জন্য সেই পশুটি কুরবানির সাথে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তাই তাকে ঐ দোষযুক্ত পশুটিই কুরবানি করা আবশ্যক হয়, আলাদা বা নতুন পশু খরিদ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দোষের কারণে পশুটির কোনো ক্ষতিপূরণ কুরবানিদাতাকে দিতে হবে কিনা? এর উত্তরে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, এর জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। লেখক ক্ষতিপূরণ আবশ্যক না হওয়ার ব্যাপারে একে জাকাতের নেসাবের সাথে উপমা দিয়েছেন। যেমন কোনো ব্যক্তির ত্রিশ হাজার টাকার উপর এক বছর পূর্তি হয়েছে। এখন তার উপর এ ত্রিশ হাজার টাকার জাকাত দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু জাকাত দেওয়ার পূর্বেই তার পনেরো হাজার টাকা যে কোনোভাবে বিনষ্ট হয়ে গেল তাহলে এ ব্যক্তি পনেরো হাজার টাকার জাকাত দেবে। তার বিনষ্ট হওয়া পনেরো হাজার টাকার জাকাত তাকে দিতে হবে না। তদ্রূপ দরিদ্র ব্যক্তির কুরবানির পশুর মাঝে যে ক্ষতি ক্রটির কারণে সৃষ্টি হয়েছে তাও দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রদান করতে হবে না।

وَعَنْ هٰذَا الْاَصْلِ قَالُوْا اِذَا مَاتَتِ الْمُشْتَرَاةُ لِلتَّضْحِيَةِ عَلَى الْمُوْسِرِ مَكَانَهَا اُخْرٰى وَلَا شَيْءَ عَلَى الْفَقِيْرِ وَلَوْ ضَلَّتْ اَوْ سُرِقَتْ فَاشْتَرٰى اُخْرٰى ثُمَّ ظَهَرَتِ الْاُوْلٰى فِىْ اَيَّامِ النَّحْرِ عَلَى الْمُوْسِرِ ذَبْحُ اِحْدٰيهُمَا وَعَلَى الْفَقِيْرِ ذَبْحُهُمَا وَلَوْ اَضْجَعَهَا فَاضْطَرَبَتْ فَانْكَسَرَ رِجْلُهَا فَذَبَحَهَا اَجْزَاهُ اِسْتِحْسَانًا عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ لِاَنَّ حَالَةَ الذَّبْحِ وَمُقَدَّمَاتِهِ مُلْحَقَةٌ بِالذَّبْحِ فَكَاَنَّهُ حَصَلَ بِهِ اِعْتِبَارًا وَحُكْمًا وَكَذَا لَوْ تَعَيَّبَتْ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ فَانْفَلَتَتْ ثُمَّ اُخِذَتْ مِنْ فَوْرِهِ وَكَذَا بَعْدَ فَوْرِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) لِاَنَّهُ حَصَلَ بِمُقَدَّمَاتِ الذَّبْحِ ـ

অনুবাদ : উপরিউক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে ফকীহগণ বলেন, যদি কুরবানির জন্য খরিদকৃত পশু মারা যায় তাহলে বিত্তবান ব্যক্তির উপর তদস্থলে অন্য একটি পশু জবাই করা ওয়াজিব। কিন্তু [এমতাবস্থায়] দরিদ্র ব্যক্তির উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি পশুটি হারিয়ে যায় কিংবা চুরি হয়ে যায়। অতঃপর সে আরেকটি পশু খরিদ করার পর কুরবানির দিনগুলোতেই যদি প্রথমটি দেখা যায় তাহলে ধনী ব্যক্তির উপর একটি কুরবানি করাই ওয়াজিব। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তির উপর উভয়টি জবাই করা ওয়াজিব। আর যদি কুরবানিদাতা পশুটিকে শোয়ানোর পর প্রচণ্ডভাবে নড়াচড়ার কারণে এর পা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর সেটিকে জবাই করে তাহলে তাই কুরবানির ক্ষেত্রে আমাদের মতে যথেষ্ট হবে। এ ব্যাপারে ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা জবাইয়ের অবস্থা এবং তার পূর্ববর্তী কাজগুলো মূল জবাই সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এ ত্রুটি শরিয়তের হুকুম এবং কিয়াস উভয়দৃষ্টিতে জবাই এর কারণে হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। তদ্রূপ যদি এ অবস্থাতে দোষযুক্ত হয় এবং পালিয়ে যায়, অতঃপর তৎক্ষণাৎ কিংবা কিছুটা বিলম্বে ধরে এনে জবাই করা হয়। এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর ভিন্নমত রয়েছে। [ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হচ্ছে] কেননা তার এ ত্রুটি তো জবাইয়ের পূর্ববর্তী প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে গিয়ে সংঘটিত হয়েছে। তাই এতে কুরবানি সংক্রান্ত কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَنْ هٰذَا الْاَصْلِ قَالُوْا اِذَا مَاتَ الخ : আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার (র.) পূর্ববর্তী মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক বলেন, পূর্ববর্তী মূলনীতির ভিত্তিতে অর্থাৎ বিত্তবান, যার উপর কুরাবানি করা ওয়াজিব তার জন্য একটি পশু কুরবানি করাই ওয়াজিব। তার কুরবানির পশু খরিদ দ্বারা কুরবানি ওয়াজিব হয় না। পক্ষান্তরে দরিদ্র ব্যক্তি, যার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব নয়, সে নিজের উপর কুরবানির পশু খরিদ করার দ্বারা কুরবানি ওয়াজিব করেছে। এ মূলনীতির ভিত্তিতে ফকীহগণ বলেন, যদি কুরবানির উদ্দেশ্যে খরিদকৃত পশু মারা যায় তাহলে ধনীর উপর তদস্থলে আরেকটি পশু কুরবানি করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে দরিদ্র ব্যক্তির উপর মৃত জন্তুটির পরিবর্তে আরেকটি পশু কুরবানি করা ওয়াজিব নয়।

পক্ষান্তরে কুরবানির পশু যদি হারিয়ে যায় কিংবা চুরি হয়ে যায়। অতঃপর কুরবানিদাতা তদস্থলে অন্য একটি পশু খরিদ করে, তারপর আবার পূর্ববর্তী হারিয়ে যাওয়া / চুরি হয়ে যাওয়া পশুটি কুরবানির দিনগুলোতেই পাওয়া যায় তাহলে ধনী ও দরিদ্রভেদে মাসআলা ভিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ধনী ব্যক্তির উপর একটি পশু কুরবানি করাই ওয়াজিব। কারণ তার উপর একটি কুরবানিই ওয়াজিব হয়েছে। পক্ষান্তরে দরিদ্র ব্যক্তির উপর কুরবানি ওয়াজিব হয় খরিদ করার দ্বারা। সেহেতু আলোচ্য মাসআলায় দরিদ্র ব্যক্তি দুটি পশুই খরিদ করেছে কুরবানি করার উদ্দেশ্যে, তাই তার উপর দুটি পশুই কুরবানি করা ওয়াজিব।

এরপর হিদায়ার লেখক জবাইয়ের সময়ে আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হওয়া দোষের বিধান আলোচনা করেন।

লেখক বলেন, যদি কুরবানিদাতা কুরবানির পশুটিকে জবাইয়ের উদ্দেশ্যে শোয়ানোর পর পশুটি চরমভাবে পা ছুড়ে মারার কারণে তার পা ভেঙ্গে যায়, এরপর এ ভাঙ্গা পা-বিশিষ্ট পশুটিকে কুরবানিদাতা জবাই করে তাহলে ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস হিসেবে পশুটির জবাই আহনাফের ইমামগণের মতে জায়েজ হয়ে যাবে। এ মাসআলায় ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। ইমাম আহমদ (র.) ও জাহেরী মাযহাবের অনুসারীদের মতও তাই। তারা বলেন, যেহেতু পশুটি জবাইয়ের আগে ত্রুটিযুক্ত হয়ে গেছে তাই এর দ্বারা [অন্য সকল ত্রুটিযুক্ত পশুর মতো] কুরবানি বৈধ হবে না।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলায় পা ভেঙ্গে যাওয়ার দ্বারা ত্রুটিযুক্ত হওয়ার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র এ ত্রুটি উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং সব ধরনের ত্রুটি এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য– যার কারণে কুরবানি করা চলে না।

আহনাফের দলিল এই যে, জবাই করার সময় এবং এর পূর্ববর্তী কাজগুলো জবাইয়ের মধ্যে গণ্য হয়। অতএব, জবাই করার সময় এর পূর্ববর্তী কাজগুলোর দ্বারা যে ত্রুটি দেখা দেবে তা জবাইয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। সুতরাং জবাইয়ের পূর্বে পশুটি ত্রুটিযুক্ত ছিল একথা প্রমাণ হয় না। অধিকন্তু কুরবানির পশু কুরবানির উদ্দেশ্যে শোয়ানোর পর হাত-পা প্রচণ্ডভাবে নাড়াচাড়া করে, আর তার এ নাড়াচাড়ার দ্বারা অনেক সময় ত্রুটি সৃষ্টি হয়, ফলে এটা এমন একটা সমস্যা হলো যা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। আর এটা তো জবাইয়ের অবস্থার মধ্যে গণ্য। সুতরাং এটাকে মূল জবাইয়ের মধ্যে গণ্য করা হবে। মূল জবাইয়ের কাজে যেমন কোনো ত্রুটি হলে তা ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হয়, তদ্রূপ জবাইয়ের অবস্থা বা তার ঠিক আগ মুহূর্তের কোনো কাজ দ্বারা ত্রুটি / ক্ষতের সৃষ্টি হলে তাও ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হবে। অতএব, এ ত্রুটি যুক্ত ও শরিয়তের হুকুম উভয় দিক থেকে জবাইয়ের দ্বারা হয়েছে সাব্যস্ত হবে।

বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলাকে আরেকটি মাসআলার সাথে তুলনা করে বলেন, এটি অর্ধেক গোলাম আজাদ করার মতো হলো, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি তার অর্ধেক গোলাম যিহারের কাফফারায় আজাদ করে অতঃপর বাকি অর্ধেক আজাদ করে তাহলে তা জায়েজ হয়ে যায়। যদিও অর্ধেক আজাদ করার দ্বারা ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ঐ ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় কাফফারা দ্বারা ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে তাই পুরো আজাদ হওয়াতে কোনো সমস্যা হবে না। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায় ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে জবাইয়ের অবস্থাতে, তাই ত্রুটি জবাইয়ের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ لَوْ تَعَيَّبَتْ فِيْ هٰذِهِ الخ : লেখক বলেন, তদ্রূপ কোনো পশু যদি জবাইয়ের পূর্ববর্তী কোনো কাজের দ্বারা আহত ও ত্রুটিযুক্ত হয় অতঃপর সেটি বাঁধনমুক্ত হয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটাকে ধরে জবাই করা হয় তাহলে এর জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা সকল ইমামের ঐকমত্যের মাসআলা। পক্ষান্তরে যদি সেই পশুটিকে তৎক্ষণাৎ ধরা সম্ভব না হয় কিছু বিলম্বে জবাই করা হয় তাহলে এর জবাই শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এরূপ অবস্থাতেও জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা তার এ ত্রুটি জবাইয়ের পূর্ববর্তী আবশ্যক কাজ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, তা যেন জবাই দ্বারা সৃষ্ট ত্রুটির অনুরূপ।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটি উল্লেখ করেননি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল এই যে, যখন বিলম্ব হয়ে গেল তখন সেই কাজ যা দ্বারা পশুটি ত্রুটিযুক্ত হয়েছে– জবাইয়ের সবব বলে গণ্য হবে না; বরং এ অবস্থায় ত্রুটিটি জবাই ভিন্ন অন্য কাজ দ্বারা সংঘটিত হয়েছে তা ধরে নেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে জবাইয়ের পূর্বে পশুটি ত্রুটিযুক্ত হয়েছে তা সাব্যস্ত হবে। আর কুরবানিতে যেহেতু ত্রুটিযুক্ত পশু জবাই করা নাজায়েজ তাই এ পশুটি জবাই করাও নাজায়েজ হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্যের উপর আমল করা হলে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। কারণ তাঁর বক্তব্য অধিক উত্তম ও যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ সঠিক পথ অনুসরণ করার তৌফিক দিন।

قَالَ : وَالْأُضْحِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لِأَنَّهَا عُرِفَتْ شَرْعًا وَلَمْ تُنْقَلِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ : يَجْزِيْ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا إِلَّا الضَّأْنَ فَإِنَّ الْجِذْعَ مِنْهُ يَجْزِيْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَحُّوْا بِالثَّنَايَا إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَذْبَحِ الْجِذْعَ مِنَ الضَّأْنِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجِذْعُ مِنَ الضَّأْنِ قَالُوْا وَهٰذَا إِذَا كَانَتْ عَظِيْمَةً بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثُّنْيَانِ يَشْتَبِهُ عَلَى النَّاظِرِ مِنْ بَعِيْدٍ وَالْجِذْعُ مِنَ الضَّأْنِ مَا تَمَّتْ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فِيْ مَذْهَبِ الْفُقَهَاءِ وَذَكَرَ الزَّعْفَرَانِيُّ أَنَّهُ ابْنُ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَالثَّنِيُّ مِنْهَا وَمِنَ الْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ وَمِنَ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ ابْنُ خَمْسِ سِنِيْنَ وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوْسُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ وَالْمَوْلُوْدُ بَيْنَ الْأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ يَتْبَعُ الْأُمَّ لِأَنَّهَا هِيَ الْأَصْلُ فِي التَّبَعِيَّةِ حَتّٰى إِذَا نَزَا الذِّئْبُ عَلَى الشَّاةِ يُضَحّٰى بِالْوَلَدِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানি করা হবে উট, গরু ও বকরি দ্বারা। কেননা কুরবানির বিষয়টি শরিয়তের মাধ্যমে জানা গিয়েছে। আর রাসূল ﷺ থেকে এ পশুগুলো ছাড়া অন্য পশু দ্বারা কুরবানি করার কথা বর্ণিত হয়নি এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকেও এমন কিছু বর্ণিত হয়নি। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এসব পশু ثَنِيٌّ বা তদূর্ধ্ব বয়সী হলে তাকে কুরবানি করা চলে। তবে ভেড়া [ও দুম্বা] এর ব্যতিক্রম। কেননা ভেড়া [ও দুম্বার]-র ছয় মাস বয়সী বাচ্চা দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ। দলিল হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর হাদীস, তিনি বলেন– ضَحُّوْا بِالثَّنَايَا إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَذْبَحِ الْجِذْعَ مِنَ الضَّأْنِ 'তোমরা ثَنِيٌّ পর্যায়ের পশু জবাই কর। তবে তোমাদের কারো পক্ষে সেটা করা যদি কষ্টকর হয় তাহলে সে ভেড়া [ও দুম্বা]-র ছয় মাস বয়সী বাচ্চা তদস্থলে জবাই করতে পার। রাসূল ﷺ অন্যত্র বলেন– نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجِذْعُ مِنَ الضَّأْنِ 'ছয় মাস বয়সী ভেড়ার বাচ্চা চমৎকার কুরবানির জন্তু।' মাশায়েখে কেরাম বলেন, এ বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন পশুটি এমন মোটাতাজা হবে যে, এটি ছানীর সাথে যদি মিশ্রিত হয়ে যায় তাহলে তা দূরবর্তী দর্শকের কাছে সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। ফকীহগণের পরিভাষায় ভেড়ার جِذْعٌ বলা হয় পূর্ণ ছয় মাস বয়সী বাচ্চাকে। ইমাম যা'আফরানী (র.)-এর মতে সাতমাস বয়সী বাচ্চাকে جِذْعٌ বলা হয়। ভেড়া ও বকরির এক বছর বয়সী বাচ্চাকে ثَنِيٌّ বলা হয়। আর দু বছর বয়সী গরুকে ثَنِيٌّ বলা হয়। উটের ثَنِيٌّ পাঁচ বছর বয়সী বাচ্চাকে বলা হয়। আর মহিষ গরুর হুকুমে গণ্য হবে। কেননা মহিষ গরু জাতীয়। যে বাচ্চা গৃহপালিত জন্তু ও বন্য জন্তুর মিলনে জন্ম হয়েছে তা পরিচয়ের ক্ষেত্রে মায়ের অনুগামী হবে। কেননা অনুগামী হওয়ার ক্ষেত্রে মা-ই হচ্ছে মূল। এজন্যই যদি কোনো নেকড়ে বকরির উপর উপগত হয় [এবং এর দ্বারা বাচ্চা জন্মায়] তাহলে বাচ্চাটিকে [বকরির বাচ্চা হিসেবে] কুরবানি করা চলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالْاُضْحِيَّةُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ الخ : আলোচ্য ইবারতে কোন ধরনের পশু কুরবানি করা যায় এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত নকল করেন– ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উট, গরু ও বকরি কুরবানি করা চলে। গরুর সাথে মহিষ ও বকরির সাথে ভেড়া ও দুম্বা অন্তর্ভুক্ত হবে। এ তিন প্রকার বা ছয় প্রকার প্রাণী ছাড়া অন্য প্রাণী জবাই করে কুরবানি করা যাবে না। এর দলিল হচ্ছে- কুরবানি একটি শরয়ী বিধান। শরিয়তের বিধি-বিধান যেভাবে এবং যতটুকু শরিয়ত কর্তৃক জানা যায় তার চেয়ে কম বেশি করার কোনো অবকাশ নেই। কুরবানির ব্যাপারে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আমল যা বর্ণিত আছে তা এ তিন ধরনের/ছয়ধরনের পশুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতএব, তাদের থেকে বর্ণিত এ তিন প্রকার/ছয়প্রকারের পশু ছাড়া অন্য পশু দ্বারা কুরবানি করা বৈধ নয়।

এরপর ইমাম কুদূরী (র.) ন্যূনতম কত বছর বয়সী পশু কুরবানির করা জায়েজ তা বর্ণনা করেছেন। ثَنِيٌّ -এর কম হলে এর দ্বারা কুরবানি করা বৈধ। তবে ভেড়ার ক্ষেত্রে ছানীর কম হলেও কুরবানি বৈধ হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি ভেড়ার বাচ্চা জাযা (جِذْع) তথা ছয়মাস বয়সী হয় তাহলেও এর দ্বারা কুরবানি করা যায়। অবশ্য অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে জাযা কুরবানির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় না। আহনাফের সাথে ইমাম মালেক (র.) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) একই মত পোষণ করেন।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হচ্ছে ভেড়া ও বকরির একবছর পূর্ণ না হলে এর দ্বারা কুরবানি করা নাজায়েজ।

ভেড়ার জাযা এর কুরবানি বৈধ হওয়ার দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

ضَحُّوْا بِالثَّنَايَا اِلَّا اَنْ يَعْسُرَ عَلٰى اَحَدِكُمْ فَلْيَذْبَحِ الْجِذْعَ مِنَ الضَّاْنِ ـ

'তোমরা কুরবানির পশুসমূহ ছানী হলে কুরবানি কর। তবে যদি তোমাদের কারো পক্ষে ছানী কুরবানি করা কষ্টকর হয় তাহলে সে ভেড়ার জাযা কুরবানি করতে পারে।'

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেন–

عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوْا اِلَّا مُسِنَّةً اِلَّا اَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جِذْعَةً مِنَ الضَّاْنِ ـ (اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা মুসিন্না (مُسِنَّةً) ব্যতীত কুরবানি করো না। তবে যদি তোমাদের কারো পক্ষে মুসিন্না কুরবানি করা কঠিন হয়ে যায় তাহলে সে ভেড়ার ছয়মাস বয়সী বাচ্চা [জাযা] কুরবানি করতে পারে।

এর দলিল হিসেবে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা এই যে, نِعْمَتِ الْاُضْحِيَّةُ الْجِذْعُ مِنَ الضَّاْنِ। অর্থাৎ, ভেড়ার জাযা চমৎকার কুরবানির জন্তু। এ হাদীসে রাসূল ﷺ জাযা তথা ছয়মাস বয়সী ভেড়ার বাচ্চাকে কুরবানির উত্তম পশু আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং জাযা দ্বারা কুরবানি সহীহ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর কিতাবে সংকলন করেছেন। নিম্নোক্ত সনদে হাদীসটি তিরমিযীতে এভাবে আছে–

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ كِبَاشٍ قَالَ جَلَبْتُ جِذْعًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَكَسَدَتْ عَلَىَّ فَلَقِيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نِعْمَ اَوْ نِعْمَتِ الْاُضْحِيَّةُ الْجِذْعُ مِنَ الضَّاْنِ قَالَ فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ وَقَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ـ

হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মাওকূফরূপেও বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর اَلْعِلَلُ الْكَبِيْرُ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল [ইমাম বুখারী (র.)] কে এ হাদীসের মান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হাদীসটি عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসটি মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন। আর অন্যরা হাদীসকে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি [ইমাম তিরমিযী] বলেন, এরপর আমি তাঁকে আবূ কিয়াস -এর নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এর উত্তর দেননি। –[সূত্র - نَصْبُ الرَّايَةِ]

মোটকথা হিদায়ার মুসান্নিফ কর্তৃক উদ্ধৃত দু'টি হাদীসই সহীহ। দু'টি হাদীস দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে ভেড়ার ছয়মাস বয়সী বাচ্চা দ্বারা কুরবানি শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

ফকীহগণ কোন ধরনের জাযা কুরবানির উপযুক্ত এ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন যে. যদি জাযা এমন মোটাতাজা হয় যে, এটি যদি ছানী ভেড়ার পালের সাথে অবস্থান করে. আর দূর থেকে কোনো দর্শক জাযাটিকে দেখে ছানীসমূহ থেকে আলাদা না করতে পারে তাহলে এর দ্বারা কুরবানি করা চলবে। পক্ষান্তরে যদি জাযা এমন মোটা তাজা না হয়; বরং এমন হয় যে, দূর থেকে কেউ একে দেখামাত্র অল্পবয়সী বলে ধারণা করতে পারে তাহলে এর দ্বারা কুরবানি করা চলবে না।

وَالْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ مَا تَمَّتْ لَهُ سِتَّةُ الخ : লেখক বলেন, ফকীহগণের মাযহাবানুযায়ী জাযা এমন বাচ্চাকে বলা হয় যার বয়স ছয়মাস পূর্ণ হয়ে সাতমাসে পদার্পণ করেছে। ইমাম কুদূরী (র.) অন্যত্র جذع -এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন যে, ফকীহগণ বলেছেন – বকরি/ভেড়ার জাযা বলা হয় পূর্ণ ছয়মাস বয়সী বাচ্চাকে, আর বকরি/ভেড়ার ছানী বলা হয় এমন বাচ্চাকে যার একবছর পূর্ণ হয়েছে। আর গরুর জাযা বলা হয় একবছর বয়সী বাছুরকে। আর ছানী বলা হয় দু'বছর বয়সী বাছুরকে। উটের জাযা বলা হয় চারবছর বয়সী উটকে। আর ছানী বলা হয় পাঁচবছর বয়সী উট/উটনীকে।

পক্ষান্তরে আবূ আব্দুল্লাহ যা'আফরানী বলেন, [ভেড়ার] জাযা বলা হয় এমন বাচ্চাকে যার বয়স সাতমাস পূর্ণ হয়ে আটমাস শুরু হয়েছে।

আবূ আলী দাক্কাকের মতে ভেড়ার জাযা বলা হয় যার আটমাস পূর্ণ হয়ে নয়মাস শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বকরির একবছর পূর্ণ না হলে কুরবানি করা বৈধ হবে না। তদ্রূপ গরুর বয়স দু'বছর পূর্ণ হয়ে তিনবছর শুরু না হলে এর দ্বারা কুরবানি করা চলবে না।

স্মতর্ব্য যে, লেখক আলোচ্য মাসআলায় فِيْ مَذْهَبِ الْفُقَهَاءِ অর্থাৎ ফকীহগণের মাযহাবানুযায়ী -এ কথা যুক্ত করেছেন। এর দ্বারা তাঁর এ ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, অভিধান শাস্ত্রবিদদের মতে এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়; বরং শুধুমাত্র ফকীহগণের ব্যাখ্যানুযায়ী ভেড়ার ছয় মাস বয়সী বাচ্চাকে জাযা বলা হয়। অভিধানবিদগণের মতে পূর্ণ একবছর বয়সী ভেড়ার বাচ্চাকে জাযা বলা হয়।

قَوْلُهُ وَالثَّنِيُّ مِنْهَا وَمِنَ الْمَعْزِ الخ : আলোচ্য অংশে বিভিন্ন জন্তু কতবছর বয়সে ছানী (ثَنِيٌّ) হয় লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন।

লেখক বলেন, ভেড়া ও বকরির বাচ্চা একবছর বয়সী হলে তাকে ছানী বলা হয়। গরু ও মহিষের বাচ্চা দু'বছর বয়সী হলে তা ছানী হয়। পক্ষান্তরে উট পাঁচ বছর বয়সী হলে ছানীরূপে গণ্য হয়। তিনি বলেন, এ সব প্রাণীর ছানী কুরবানি করার যোগ্য হয়। মূলত ছানী হলো কুরবানির এমন পশু যা এইমাত্র উপযুক্ত হয়েছে এমন বাচ্চা। ছানী হওয়ার পূর্বে কোনো কুরবানির পশু কুরবানির উপযুক্ত হয় না। ন্যূনতম কত বয়স হলে কুরবানির জন্তুগুলো কুরবানির উপযুক্ত হয়? লেখক ছানীর আলোচনা করে তা বর্ণনা করেছেন। শুধুমাত্র ভেড়ার জাযা এর ব্যতিক্রম। তাই লেখক ছানীদের থেকে পৃথকভাবে এর হুকুম বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَالْمَوْلُوْدُ بَيْنَ الْأَهْلِيِّ الخ : লেখক বলেন, বন্যপ্রাণী ও গৃহপালিত প্রাণীর মিলনে যে জন্তু জন্মায় তা মায়ের অনুবর্তী হবে। অর্থাৎ যদি কোনো গৃহপালিত ছাগল/ছাগী বন্য হরিণের সাথে মিলিত হয় অতঃপর মিশ্র প্রজাতির বাচ্চা জন্ম হয় তাহলে দেখতে হবে উভয় প্রাণীর মধ্যে ছানাটির মা কোনো প্রজাতির। যদি মা গৃহপালিত হয় অর্থাৎ ছাগী হয় তাহলে সে বাচ্চা গৃহপালিত বলে গণ্য হবে এবং এর দ্বারা কুরবানি বৈধ হবে। যদি ছানাটির মা হরিণী হয় তাহলে এর দ্বারা কুরবানি চলবে না।

حَتّٰى إِذَا نَزَا الذِّئْبُ লেখক বলেন, যদি কোনো চিতা বকরির উপর উপগত হয় আর এর ফলে বকরি বাচ্চা প্রসব করে তাহলে সেই বাচ্চাটি [কুরবানির উপযুক্ত হলে] কুরবানি করা যাবে।

অবশ্য এ মাসআলায় অন্য তিন ইমামের ভিন্নমত রয়েছে।

আমাদের দলিল হচ্ছে প্রসবকৃত বাচ্চার ক্ষেত্রে মায়ের অবস্থা গ্রহণযোগ্য ও লক্ষণীয়।

কারো কারো মতে এক্ষেত্রে প্রসবকৃত বাচ্চার অবস্থাই বিবেচ্য হবে। সুতরাং যদি কোনো বকরি হরিণের বাচ্চা প্রসব করে তাহলে সেই বাচ্চা কুরবানির উপযুক্ত হবে না। এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় خُلَاصَةُ الْفَتَاوٰى গ্রন্থের একটি মাসআলা থেকে সেখানে বলা হয়েছে যদি কোনো কুকুর বকরির উপর উপগত হয় তাহলে বকরির প্রসবকৃত বাচ্চা কোনোক্রমেই কুরবানির উপযুক্ত হবে না। অবশ্য যদি পুরুষ প্রাণীটির গোশত হালাল হয়। আর মাদি প্রাণীটি কুরবানির জন্তু হয় তাহলে যদি বাচ্চাটি মায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তবে সেই বাচ্চা কুরবানি করা চলবে। যেমন যদি কোনো হরিণ বকরির উপর উপগত হয় তারপর বকরিটি তার অনুরূপ বাচ্চা প্রসব করে তাহলে সেই বাচ্চা কুরবানি করা জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে যদি বাচ্চাটি তার মায়ের [বকরির] অনুরূপ না হয়; বরং হরিণের অনুরূপ হয় তাহলে সেই বাচ্চা কুরবানি করা যাবে না।

قَالَ : وَاِذَا اشْتَرٰى سَبْعَةٌ بَقَرَةً لِيُضَحُّوْا بِهَا فَمَاتَ اَحَدُهُمْ قَبْلَ النَّحْرِ وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ اِذْبَحُوهَا عَنْهُ وَعَنْكُمْ اَجْزَاهُمْ وَاِنْ كَانَ شَرِيْكُ السِّتَّةِ نَصْرَانِيًّا اَوْ رَجُلًا يُرِيْدُ اللَّحْمَ لَمْ يَجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ وَجْهُهُ اَنَّ الْبَقَرَةَ تَجُوْزُ عَنْ سَبْعَةٍ لٰكِنَّ مِنْ شَرْطِهِ اَنْ يَكُوْنَ قَصْدُ الْكُلِّ الْقُرْبَةَ وَاِنِ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُهَا كَالْاُضْحِيَّةِ وَالْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ عِنْدَنَا لِاتِّحَادِ الْمَقْصُوْدِ وَهُوَ الْقُرْبَةُ وَقَدْ وُجِدَ هٰذَا الشَّرْطُ فِى الْوَجْهِ الْاَوَّلِ لِاَنَّ التَّضْحِيَةَ عَنِ الْغَيْرِ عُرِفَتْ قُرْبَةً اَلَا تَرٰى اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَحّٰى عَنْ اُمَّتِهٖ عَلٰى مَا رَوَيْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يُوْجَدْ فِى الْوَجْهِ الثَّانِيْ لِاَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَيْسَ مِنْ اَهْلِهَا وَكَذَا قَصْدُ اللَّحْمِ يُنَافِيْهَا وَاِذَا لَمْ يَقَعِ الْبَعْضُ قُرْبَةً وَالْاِرَاقَةُ لَا تَتَجَزّٰى فِىْ حَقِّ الْقُرْبَةِ لَمْ يَقَعِ الْكُلُّ اَيْضًا فَامْتَنَعَ الْجَوَازُ وَهٰذَا الَّذِىْ ذَكَرَهٗ اِسْتِحْسَانٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি সাত ব্যক্তি কুরবানি করার উদ্দেশ্যে একটি গরু ক্রয় করে অতঃপর তাদের একজন পশু জবাই করার পূর্বে মারা যায় এবং তার উত্তরাধিকারীগণ বলে যে, তোমরা তাঁর [মৃত ব্যক্তির] এবং তোমাদের পক্ষ থেকে কুরবানি কর তাহলে তাদের জন্য কুরবানি শুদ্ধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি ছয়জনের অংশীদার ব্যক্তিটি খ্রিস্টান হয় কিংবা এমন ব্যক্তি হয় যে কেবল গোশত খাওয়ার নিয়ত করেছে তাহলে তাদের কারোর কুরবানি সহীহ হবে না। এর কারণ এই যে, গরু কুরবানি করা যায় সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তবে এর শর্ত হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়ত কেবল ইবাদত তথা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হতে হবে। যদিও ইবাদতের মধ্যে পদ্ধতিগত ভিন্নতা থাকে। যেমন কেউ কুরবানির নিয়ত করল, কেউ কেরানের দমের নিয়ত করল, কিংবা কেউ তামাত্তু' -এর দমের নিয়ত করল। আমাদের মতে উদ্দেশ্যের ঐক্য হওয়ার কারণে কুরবানি সহীহ হবে। আর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদত। আর এ শর্তটি প্রথম অবস্থায় পাওয়া গেছে। কেননা অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানি করা যে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত তা প্রমাণিত বিষয়। [এ ক্ষেত্রে] লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছেন। এ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় অবস্থায় এ শর্তটি পাওয়া যায়নি। কেননা খ্রিস্টান ইবাদতের যোগ্য নয়। তদ্রূপ গোশত খাওয়ার ইচ্ছা ইবাদতের পরিপন্থি বিষয়। যখন অংশ বিশেষ ইবাদত হচ্ছে না। আর রক্ত প্রবাহিত করার কাজ ইবাদত হিসেবে অবিভাজ্য। সুতরাং এটি কারো পক্ষ থেকে ইবাদত সাব্যস্ত হবে না। অতএব, আলোচ্য কুরবানি নাজায়েজ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) যা উল্লেখ করলেন তা হচ্ছে ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا اشْتَرٰى سَبْعَةٌ بَقَرَةً الخ : আলোচ্য অংশে একাধিক ব্যক্তির অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে জন্তু কুরবানি করা হয় তার শর্তাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম কুদূরী (র.) বর্ণিত প্রথম যে মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে তা এই যে, একটি গরু সাত ব্যক্তি মিলে কুরবানি করার ইচ্ছা করল। অতঃপর কুরবানি করার পূর্বেই একজন শরিক ইন্তেকাল করল। স্বাভাবিকভাবেই সেই [মৃত] শরিকের অংশের বর্তমান মালিক হলো তাঁর উত্তরাধিকারীগণ। এমতাবস্থায় তাঁর উত্তরাধিকারীগণ অন্য ছয় শরিককে তাদের সম্মতির কথা জানাল অর্থাৎ তারা বলল, আপনারা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করুন তাহলে তাদের সকলের পক্ষ থেকে কুরবানি সহীহ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো শরিক খ্রিস্টান হয় কিংবা এমন ব্যক্তি হয় যে গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানিতে অংশগ্রহণ করে তাহলে কারো কুরবানিই শুদ্ধ হবে না।

এ ব্যাপারে প্রথমে দুটি বিষয় অনুধাবন করতে হবে–

১. কুরবানি একটি ইবাদত, যা শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য হয়ে থাকে। এতে জাগতিক কোনো বিষয়ের ইচ্ছা এর ইবাদতের দিকটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২. কোনো কোনো প্রাণীর মধ্যে শরিয়তের পক্ষ থেকে সাতজন ব্যক্তি শরিক হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাতজনেরই ইবাদতের নিয়তে কুরবানির পশুর মধ্যে অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ কুরবানির পশু একটি এবং জবাই বা রক্ত প্রবাহিত করার কাজও একটিই, তাই কোনো একজন ভিন্নমত পোষণ করলে এর দ্বারা সকলের কুরবানি বাতিল হয়ে যাবে।

উপরিউক্ত দুটি মূলনীতির আলোকে উপরে বর্ণিত দুটি মাসআলার বিধান স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর তা এই যে, প্রথম মাসআলায় মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারীগণের অনুমতি পাওয়ার পর সকলের কুরবানি শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানি করা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ এবং ইবাদত হিসেবে গণ্য। স্বয়ং রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছেন। এ সংক্রান্ত হাদীস মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ يَطَاءُ فِىْ سَوَادٍ لِيُضَحِّىَ بِهٖ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اِسْتَحِدِّيْهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ فَاَخَذَهَا وَاَخَذَ الْكَبْشَ فَاَضْجَعَهٗ ثُمَّ ذَبَحَهٗ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ ضَحّٰى .

এ হাদীসের শেষভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ একটি ভেড়া তাঁর নিজের, পরিবারের এবং উম্মতের সকলের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছেন।

মুসান্নিফ (র.) عَلٰى مَا رَوَيْنَاهُ مِنْ قَبْلُ-এর দ্বারা এ হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ وَلَمْ يُوْجَدْ فِى الْوَجْهِ الثَّانِىْ : লেখক বলেন, দ্বিতীয় অবস্থায় তথা যদি কুরবানিদাতা সাতজনের সপ্তম ব্যক্তিটি খ্রিস্টান হয়ে যায় কিংবা গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানি করে থাকে তাহলে শর্তটি অর্থাৎ 'কুরবানির জন্তু পুরোটাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য জবাই করতে হবে' পাওয়া গেল না।

কেননা খ্রিস্টান ইবাদত করার উপযুক্তই নয়। [ইবাদতের জন্য ঈমান শর্ত, খ্রিস্টানের তো ঈমান নেই] আর গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে যে কুরবানি করেছে তাতেও ইবাদত বা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিষয়টি নেই।

লেখক বলেন, যেহেতু একাংশে কুরবানির নিয়ত অবিদ্যমান, আর পশু জবাই করাটা একক বা অবিভাজ্য একটি কাজ তাই পুরো কুরবানি কারো জন্য ইবাদতের বা কুরবতের জন্য হবে না। অতএব, হাদীসের বিধান অনুযায়ী পুরো উট বা গরু একটি পশু হিসেবে গণ্য হবে। আর একটি পশুতে ভিন্ন নিয়ত করা হলে সেই নিয়তের কারণে ইবাদত বা কুরবতের বিষয়টি বাধাগ্রস্ত হবে। সবশেষে লেখক বলেন, উল্লিখিত মাসআলা যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লেখ করেছেন তা ইস্‌তিহ্‌সান বা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে।

وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَجُوْزَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لِاَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِالْاِتْلَافِ فَلَا يَجُوْزُ عَنْ غَيْرِهِ كَالْاِعْتَاقِ عَنِ الْمَيِّتِ لٰكِنَّا نَقُوْلُ اَلْقُرْبَةُ قَدْ تَقَعُ عَنِ الْمَيِّتِ كَالتَّصَدُّقِ بِخِلَافِ الْاِعْتَاقِ لِاَنَّ فِيْهِ اِلْزَامُ الْوَلَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ ـ

অনুবাদ : আর কিয়াসের দাবি হচ্ছে ইতিপূর্বে উল্লিখিত প্রথম মাসআলাটি বৈধ না হওয়া। এ মতটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত। কেননা এটা হচ্ছে মাল নষ্ট করে নফল কাজ সম্পাদন করা। আর এরূপ অন্যের পক্ষ থেকে করা বৈধ নয়। যেমন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে গোলাম আজাদ করা [বৈধ নয়] পক্ষান্তরে আমাদের বক্তব্য হলো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইবাদতের কাজ করা চলে। যেমন তার পক্ষ থেকে সদকা করা যায়। অবশ্য আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এতে মৃত ব্যক্তির উপর ওলা [মীরাছ] অপরিহার্য করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَجُوْزَ الخ : পূর্ববর্তী ইবারতে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করা জায়েজ বলা হয়েছিল ইস্‌তিহ্‌সান বা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। আলোচ্য ইবারতে এ মাসআলার কিয়াসের দিকটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

লেখক বলেন, কিয়াসের বিবেচনায় মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের অনুমতি সত্ত্বেও তার পক্ষ থেকে কুরবানি করা নাজায়েজ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এ মত পোষণ করেন বলে তার থেকে রেওয়ায়েত পাওয়া যায়।

কিয়াসের ব্যাখ্যা এই যে, কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মালের মালিক হয়ে যায় উত্তরাধিকারীগণ। অতঃপর উত্তরাধিকারী কর্তৃক মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে নফল কাজের মাধ্যমে মাল নষ্ট করা। আর এ ব্যাপারে শরিয়তের বিধান হচ্ছে নফল কাজের মাধ্যমে মাল নষ্ট করা নিজের পক্ষ থেকে বা নিজের জন্য জায়েজ, অন্যের পক্ষ থেকে সেটা নাজায়েজ। যেহেতু মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করা নফল কাজ এবং এর মাধ্যমে মাল ব্যয়িত হচ্ছে, তাই এটাও নাজায়েজ।

এ মাসআলার নজির হচ্ছে মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে গোলাম আজাদ করা। কারণ সেটাও নফল কাজ এবং এর দ্বারা মাল খরচ করা হয়। যেহেতু মৃতের পক্ষ থেকে গোলাম আজাদ করা নাজায়েজ, অতএব, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করাও নাজায়েজ হবে।

উক্ত কিয়াসের জবাবে লেখক বলেন, ইস্‌তিহ্‌সানের ভিত্তিতে আমরা আলোচ্য সুরতটি জায়েজ বলি। এ মাসআলায় ইস্‌তিহ্‌সান বা সূক্ষ্ম কিয়াস হচ্ছে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আর্থিক ইবাদত সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকা করা এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ করা ইত্যাদি। মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে এরূপ আর্থিক ইবাদত করতে পারেন। অতএব, আলোচ্য মাসআলায় মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানি করার অনুমতি প্রদান করার মাধ্যমে মৃতের পক্ষ থেকে ইবাদত সংঘটিত করতে পারে। যদি এরূপ করা হয় তাহলে এটি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি আর্থিক ইবাদত সাব্যস্ত হবে। আর যখন অন্যান্য জীবিত ব্যক্তির মতো মৃতের অংশটি ইবাদতের জন্য হবে তখন কুরবানি বৈধ হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْاِعْتَاقِ : লেখক বলেন, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে গোলাম আজাদ করা বৈধ নয়। এর উপর কুরবানিকে কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ اِعْتَاقٌ বা গোলাম আজাদ করার ক্ষেত্রে আজাদকৃত গোলামের মিরাস যাকে ওলা (وَلَاء) বলা হয়, এর মালিক হয় আজাদকারী। মৃতের পক্ষ থেকে আজাদ করা হলে মৃত ব্যক্তির মাঝে মালিক হওয়ার যোগ্যতা মৃত্যু দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যদি এখন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে গোলাম আজাদ করা বৈধ সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তার উপর ওলার মালিকানা আরোপ করা হবে। অথচ তা করা শরিয়তে নাজায়েজ। পক্ষান্তরে মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানি করা হলে মৃত ব্যক্তির উপর কোনো কিছু আরোপ করা হয় না। এজন্য কুরবানি বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই।

وَلَوْ ذَبَحُوهَا عَنْ صَغِيْرٍ فِى الْوَرَثَةِ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ جَازَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ قُرْبَةٌ وَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَذَبَحَهَا الْبَاقُوْنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَرَثَةِ لَا يُجْزِيْهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَعْضُهَا قُرْبَةً وَفِيْمَا تَقَدَّمَ وُجِدَ الْإِذْنُ مِنَ الْوَرَثَةِ فَكَانَ قُرْبَةً .

অনুবাদ : যদি কুরবানির পশুর অংশীদার ছোট শিশু হয় কিংবা উম্মে ওয়ালাদ হয়, অতঃপর তার পক্ষ থেকে অন্যরা [তাঁর পিতা অথবা তার মনিব] পশু জবাই করে তাহলে তা বৈধ সাব্যস্ত হবে। এর কারণ আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এটা আর্থিক ইবাদত [সুতরাং অন্যের পক্ষ থেকে তা করা যায়]। যদি কোনো শরিক মারা যায় তারপর অন্যরা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের অনুমতি ব্যতীত পশু জবাই করে ফেলে তাহলে তা বৈধ হবে না। কেননা তখন কুরবানির পশুর কিছু অংশ ইবাদতের জন্য হলো না। আর পূর্বের মাসআলাগুলোতে মৃতের উত্তরাধিকারীগণের অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল, যার কারণে তা 'কুরবত' বা ইবাদত সাব্যস্ত হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ ذَبَحُوهَا عَنْ صَغِيْرٍ الخ : আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) পূর্ববর্তী মাসআলাগুলোর সাথে সম্পর্কিত আরো দুটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম মাসআলা : যদি কোনো কুরবানির পশুতে একাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে, আর তাদের মাঝে কোনো নাবালেগ শিশু থাকে কিংবা উম্মে ওয়ালাদ থাকে, অতঃপর কুরবানির পশু জবাইয়ের পূর্বে তাদের মৃত্যু হয় এবং নাবালেগ শিশুর পক্ষ থেকে তার পিতা এবং উম্মে ওয়ালাদের পক্ষে তার মনিব পশু জবাই করে বা জবাইয়ের অনুমতি প্রদান করে তাহলে তা করা বৈধ সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ তাদের পশু জবাই সহীহ হবে এবং উক্ত পশু ইবাদতের জন্য হবে। এ মাসআলার দলিল হলো ইতঃপূর্বে বর্ণিত ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস। আর তা এই যে, মুসলমান শিশু বা উম্মে ওয়ালাদ ইবাদতের উপযুক্ত। অতএব, তাদের পক্ষ থেকে নফল সদকা করা যাবে।

পক্ষান্তরে কিয়াস অনুযায়ী এরূপ করা নাজায়েজ। কেননা কুরবানির পশু জবাই একটি অবিভাজ্য ইবাদত। আলোচ্য সুরতে কুরবানির পশুর একাংশ নফল কিংবা তাতে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে হচ্ছে। অতএব, পুরো পশুটিই এরূপ নফল বা গোশত খাওয়ার জন্য হবে। অথচ অন্য শরিকগণ তাদের ওয়াজিব কুরবানি করার জন্য পশু জবাই করছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ الخ : এ ইবারত থেকে লেখক দ্বিতীয় মাসআলার আলোচনা শুরু করেছেন।

দ্বিতীয় মাসআলা : মাসআলা এই যে, কয়েকজন সম্মিলিতভাবে একটি পশু জবাই করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করল এবং পশুও ক্রয় করল, অতঃপর তাদের এক শরিক ইন্তেকাল করল। এরপর যদি অন্য শরিকগণ মৃত শরিকের উত্তরাধিকারীগণ থেকে অনুমতি না নিয়েই তার নামে পশুটি জবাই করে তাহলে তাদের কুরবানি সহীহ হবে না। কারণ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের অনুমতি না নেওয়ার কারণে মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানিটি ইবাদত বলে গণ্য হয়নি। আর কোনো একজনের ইবাদতের নিয়ত না থাকলে কারো কুরবানি আদায় হয় না।

অবশ্য এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তাঁরা বলেন, কুরবানি জায়েজ হওয়ার জন্য সকলের ইবাদতের নিয়ত করা আবশ্যক নয়। যেহেতু তাঁদের মতে সকলের ইবাদতের নিয়ত আবশ্যক নয়। তাই ইবাদতের নিয়ত না থাকলে তাতে তাদের কোনো সমস্যা হবে না।

পক্ষান্তরে আহনাফের মতে যেহেতু প্রত্যেকের ইবাদতের নিয়ত থাকা জরুরি তাই যে কোনো একজনের ইবাদতের নিয়ত না পাওয়া গেলে কারো কুরবানি সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ فِيْمَا تَقَدَّمَ الخ : লেখক (র.) বলেন, এ মাসআলার অনুরূপ পূর্বের মাসআলায় কুরবানি বৈধ হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কারণ সেখানে মৃতের উত্তরাধিকারীগণ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। আর তাই তা ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয়েছে।

قَالَ : وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْاَضْحِيَةِ وَيُطْعِمُ الْاَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ وَيَدَّخِرُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيْ فَكُلُوْا مِنْهَا وَادَّخِرُوْا وَمَتٰى جَازَ اَكْلُهٗ وَهُوَ غَنِيٌّ جَازَ اَنْ يُوْكِلَ غَنِيًّا وَيُسْتَحَبُّ اَنْ لَا يَنْقُصَ الصَّدَقَةُ عَنِ الثُّلُثِ لِاَنَّ الْجِهَاتَ ثَلٰثٌ اَلْاَكْلُ وَالْاِدِّخَارُ لِمَا رَوَيْنَا وَالْاِطْعَامُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ فَانْقَسَمَ عَلَيْهَا اَثْلَاثًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানিদাতা কুরবানির গোশত [নিজে] খাবে, ধনী ও দরিদ্র [সকল] -কে খাওয়াবে এবং [প্রয়োজনানুযায়ী] সংরক্ষণ করে রাখবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের আমি কুরবানির গোশত থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা খাও এবং সংরক্ষণ করে রাখ।' তাছাড়া যখন ধনীদের জন্য কুরবানির গোশত খাওয়া জায়েজ, তখন তা অন্য ধনীকে খাওয়ানোও জায়েজ হবে। আর মোস্তাহাব হচ্ছে, দানের গোশত একতৃতীয়াংশের কম না হওয়া। কেননা কুরবানির গোশতের মাঝে তিনটি বিষয় রয়েছে– ১. খাওয়া ২. আমাদের বর্ণিত দলিলের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা এবং ৩. অন্যকে খাওয়ানো। এর দলিল মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী– তোমরা খাওয়াও অল্পতুষ্ট এবং প্রার্থনাকারীকে। সুতরাং কুরবানির গোশত এ তিনটি খাতে তিনভাগে বণ্টিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْاُضْحِيَةِ الخ : আলোচ্য ইবারতে ওয়াজিব কুরবানির গোশত কিভাবে বণ্টন করবে এর আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, কুরবানিদাতা তার কুরবানির পশুর গোশত নিজে খাবে। ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে খাওয়াবে এবং কিছু পরবর্তীদিনগুলোতে খাওয়ার জন্য জমা ও সংরক্ষণ করে রাখবে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলাটি ওয়াজিব কুরবানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি কোনো ব্যক্তি মান্নতের কুরবানি করে তাহলে তার জন্য নিজ কুরবানির গোশত খাওয়া বৈধ নয়। এটা তিন ইমামেরই অভিমত। ইমাম আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার মান্নতের কুরবানির পশুর গোশত খেতে চায় তাহলে তার জন্য খাওয়া জায়েজ।

আহনাফের ফতোয়ার কিতাব اَلذَّخِيْرَةُ -এ বর্ণিত আছে যে, কোনো ধনী মান্নতকারীর জন্য মান্নতের গোশত খাওয়া বৈধ নয়। কেননা মান্নতের সবব হচ্ছে সদকা। আর নিয়মানুযায়ী সদকাকারীর জন্য তার সদকা থেকে খাওয়া নাজায়েজ। অতএব, সদকাকারী নিজে তা থেকে খেতে পারবে না। সুতরাং যদি সদকাকারী তার সদকা থেকে কোনোকিছু খায় তাহলে সেই পরিমাণ বা তার মূল্য সদকা করে দেওয়া তার জন্য আবশ্যক।

ত্বাহাবী কিতাবের ভাষ্যকার লিখেন যে, চার ধরনের পশুর গোশত সকলের খাওয়া বৈধ– ১. কুরবানির পশুর গোশত ২. তামাত্তু'র পশুর গোশত ৩. কিরানের পশুর গোশত এবং ৪. নফল কুরবানির পশুর গোশত, যদি সেই পশু কুরবানির স্থানে পৌছে। এছাড়া কাফফারার পশু, মান্নতের পশু ও নফল কুরবানির পশু যদি তা জবাইয়ের স্থানে না পৌছে তাহলে তা খাওয়া বৈধ হবে না।

উল্লেখ্য যে, নিজ কুরবানির পশুর গোশত খাওয়া মোস্তাহাব। আর জাহেরী মাযহাবের অনুসারীদের মতে তা ওয়াজিব। –[বিনায়া]

قَوْلُهُ وَلْيُطْعِمِ الْاَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ : লেখক বলেন, কুরবানির পশুর গোশত ধনী ও গরিব সকলকেই খাওয়াবে। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيْ فَكُلُوْا مِنْهَا وَادَّخِرُوْا
অর্থাৎ 'আমি তোমাদের কুরবানি গোশত [তিন দিনের পর] খেতে নিষেধ করেছিলাম। সুতরাং এখন তা [তিন দিনের পর] খেতে পার এবং সংরক্ষণ করে রাখ।'

আল্লামা আইনী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসটি ছয়জন সাহাবী থেকে বর্ণিত। প্রথম সাহাবী হযরত জাবির (রা.), তাঁর হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই–

عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوْا .

দ্বিতীয় সাহাবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.), তাঁর হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর কিতাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন– عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ لَا تَاْكُلُوْا لَحْمَ الْاَضَاحِىْ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَشَكَوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ كُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَاحْبِسُوْا وَادَّخِرُوْا .

এ সংক্রান্ত তৃতীয় হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত আয়েশা (রা.) এর হাদীসটিও ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّاسَ يَدَّخِرُوْنَ الْاَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَحْمِلُوْنَ فِيْهَا الْوَدَكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوْا نَهَيْتَ اَنْ تُؤْكَلَ لُحُوْمُ الْاَضَاحِىْ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ قَالَ اِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ اَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِىْ دَفَّتْ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا .

এছাড়া এ সংক্রান্ত হাদীস হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) ও বুরাইদা (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদীস দ্বারা কুরবানির গোশত দীর্ঘদিন পর্যন্ত রেখে খাওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু গোশত সংরক্ষণ করে রাখার বিষয়টিও সেই সাথে প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ وَمَتٰى جَازَ اَكْلُهُ وَهُوَ غَنِىٌّ الخ : লেখক এ ইবারত দ্বারা ধনী ব্যক্তিকে কুরবানির গোশত খাওয়ানো জায়েজ হওয়ার যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। লেখক বলেন, যখন কুরবানিদাতার জন্য কুরবানির গোশত খাওয়া শুধু বৈধ নয়; বরং মোস্তাহাব। অথচ সে ধনী ও মালদার। সুতরাং অন্য ধনী ব্যক্তিকে কুরবানির গোশত খাওয়ানো বৈধ সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ لَا يَنْقُصَ الصَّدَقَةُ عَنِ الثُّلُثِ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মোস্তাহাব হচ্ছে দানের অংশ তিনভাগের একভাগ হওয়া –তার চেয়ে কম না হওয়া। অর্থাৎ কুরবানিদাতা তার কুরবানির গোশতকে তিনভাগে ভাগ করবে। একভাগ নিজে খাওয়ার জন্য রাখবে, একভাগ নিজ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের জন্য সংরক্ষণ করবে এবং একভাগ গরিব-মিসকিনদের প্রদান করবে বা খাওয়াবে।

এ তিনভাগে ভাগ করার বিষয়টি হাদীস শরীফ ও কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। খাওয়া ও সংরক্ষণ করার বিষয়টি পূর্বে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। হাদীসের মধ্যে– فَكُلُوْا مِنْهَا وَادَّخِرُوْا শব্দ রয়েছে। যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে খাওয়া ও সংরক্ষণ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

আর গরিব-মিসকিনদের খাওয়ানো বা প্রদান করার বিষয়টি কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। কুরআনের আয়াত اَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ 'আর তোমরা আহার করাও, যে প্রার্থনাকারী নয় তাকে এবং যে প্রার্থনা করে তাকেও।' অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ 'তোমরা খাওয়াও দুঃস্থ-অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে।'

পরবর্তী আয়াতে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে। ১. قَانِعٌ ও ২. مُعْتَرٌّ। উল্লেখ্য যে, قَانِعٌ ও مُعْتَرٌّ-এর দু'রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। قَانِعٌ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কাশ্শাফে লেখা হয়েছে هُوَ الرَّاضِىْ بِمَا عِنْدَهُ وَبِمَا يُعْطٰى مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি তার কাছে যা আছে এবং প্রার্থনা ব্যতীত যা পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে তাকে قَانِعٌ বলা হয়।' আর مُعْتَرٌّ বলা হয় যে প্রার্থনা করে। পক্ষান্তরে বিনায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে– اَلْقَانِعُ هُوَ السَّائِلُ مِنَ الْقُنُوْعِ অর্থাৎ قَانِعٌ বলা হয় প্রার্থনাকারীকে। আর مُعْتَرٌّ বলা হয় যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র যায় কিন্তু চায় না। মোটকথা উভয় আয়াত দ্বারা দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের খাওয়ানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

অতএব, কুরবানির গোশতকে তিনভাগে ভাগ করত একভাগ দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া মোস্তাহাব। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখা উচিত যে, দানের অংশ যেন এক তৃতীয়াংশের চেয়ে কম না হয়।

قَالَ : وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا اَوْ يَعْمَلُ مِنْهُ اٰلَةً تَسْتَعْمِلُ فِى الْبَيْتِ كَالنَّطْعِ وَالْجِرَابِ وَالْغِرْبَالِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الْاِنْتِفَاعَ بِهِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَشْتَرِىَ بِهِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِى الْبَيْتِ بِعَيْنِهِ مَعَ بَقَائِهِ اِسْتِحْسَانًا وَ ذٰلِكَ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ لِلْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبْدَلِ وَلَا يَشْتَرِىْ بِهِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ اِلَّا بَعْدَ اِسْتِهْلَاكِهِ كَالْخَلِّ وَالْاَبَازِيْرِ اِعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ بِالدَّرَاهِمِ وَالْمَعْنٰى فِيْهِ اَنَّهُ تَصَرُّفٌ عَلٰى قَصْدِ التَّمَوُّلِ وَاللَّحْمُ بِمَنْزِلَةِ الْجِلْدِ فِى الصَّحِيْحِ وَلَوْ بَاعَ الْجِلْدَ اَوِ اللَّحْمَ بِالدَّرَاهِمِ اَوْ بِمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ اِلَّا بَعْدَ اِسْتِهْلَاكِهِ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ اِنْتَقَلَتْ اِلٰى بَدَلِهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানির পশুর চামড়া দান করে দিবে, কেননা চামড়া কুরবানির অংশবিশেষ। অথবা চামড়া দিয়ে ঘরে ব্যবহার করার কোনো আসবাব তৈরি করবে। যেমন দস্তরখান, মশক, বিছানা ইত্যাদি। কেননা চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া [তা ব্যবহার করা] হারাম নয়। ইসতিহসানের দলিলের ভিত্তিতে চামড়া দ্বারা এমন বস্তু খরিদ করা যাবে যা সত্তা অক্ষুণ্ন রেখে ব্যবহার করা যায়। আর এগুলো চামড়ার অনুরূপ যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কেননা স্থলবর্তী তার মূলের হুকুম রাখে। তবে এমন বস্তু [চামড়া দ্বারা] খরিদ করা যাবে না যার মূল অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায় না। যেমন, সিরকা, মসলা ইত্যাদি। শেষোক্ত মাসআলাটিকে দিরহাম [টাকা-পয়সা] এর বিনিময়ে চামড়া বিক্রি করার মাসআলার উপর কিয়াস করা হয়েছে। এরূপ হওয়ার কারণ হচ্ছে এভাবে বিক্রি করা মূলত মাল হাসিলের উদ্দেশ্যে লেনদেন করার নামান্তর। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী গোশত চামড়ার হুকুমের অনুরূপ। যদি কেউ চামড়া কিংবা গোশত টাকা-পয়সার বিনিময়ে অথবা এমন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করে যা অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায় না -এমতাবস্থায় সে উক্ত মূল্য সদকা করে দিবে। কেননা এখানে ইবাদতের বিষয়টি বদল বা স্থলবর্তীর দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا الخ : আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) কুরবানির পশুর চামড়ার বিধান আলোচনা করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানির চামড়া সদকা-দান করে দিবে। কারণ কুরবানির পশুর চামড়া উক্ত পশুর অংশবিশেষ। অতএব, তা ছওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করে দিবে। অথবা কুরবানিদাতা সেই চামড়া দ্বারা এমন কিছু তৈরি করবে যা ঘরে ব্যবহারের উপযুক্ত। যেমন, দস্তরখান, চামড়ার পাত্র, বিছানা ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, চামড়া বা চামড়াজাত দ্রব্য ব্যবহার করা হারাম নয়।

তাছাড়া যদি কেউ চামড়ার বিনিময়ে এমন বস্তু খরিদ করতে চায় যার মূল অক্ষুণ্ন রেখে ব্যবহার করা যায় তাও খরিদ করে সে ব্যবহার করতে পারবে। এটা করা যাবে ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। যেমন কেউ চামড়া বিক্রি করে বাক্স, টেবিল, চেয়ার, নামাজের খাট ইত্যাদি বানাল বা খরিদ করল, তাহলে এসব সে ব্যবহার করতে পারবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের এসব করা নাজায়েজ। তাঁদের দলিল হচ্ছে রাসূল ﷺ চামড়ার কসাইকে [বিনিময় হিসেবে] প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলের এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বিক্রয়ও নিষিদ্ধ হয়। কারণ এটি বিক্রয়ের হুকুমের অন্তর্গত।

আহনাফের দলিল এই যে, এখানে উপকৃত হওয়ার বিষয়টি ব্যাপক। সুতরাং চামড়া বা চামড়ার বদল কোনো বস্তু মূল অক্ষুণ্ন রেখে যেভাবেই উপকৃত হোক না কেন তা অবৈধ হবে না।

আলোচ্য মাসআলায় কেউ যদি চামড়ার বিনিময়ে এমন বস্তু খরিদ করতে চায় যার মূল অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায় তাহলে তা খরিদ করে উপকৃত হওয়া যাবে। যেমন কেউ চামড়ার বিনিময়ে চেয়ার, টেবিল, বাক্স ইত্যাদি খরিদ করল কিংবা বানাল তাহলে তা জায়েজ হবে। কারণ এসব বস্তুর মূল অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে এর বিনিময়ে কোনো খাদ্যদ্রব্য বা যা মূল অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায় না, তা খরিদ করা যাবে না।

এ মাসআলার দলিল এই যে, لِأَنَّ لِلْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبْدَلِ 'বদল তার মুবদালের হুকুম রাখে।' এখানে مُبْدَلٌ হচ্ছে চামড়া, আর তার বদল হচ্ছে এমন বস্তুসমূহ যার মূল অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায়। সুতরাং চামড়া যেমন ব্যবহার করা যায় তদ্রূপ তার বদল চেয়ার ইত্যাদিও ব্যবহার করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলায় কিয়াসের দাবি এই যে, চামড়া বিক্রি করে কোনো কিছুই ক্রয় করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يَشْتَرِيْ بِهِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ الخ : লেখক বলেন, এমন বস্তু খরিদ করা যাবে না যার মূল অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায় না; বরং উপকৃত হতে হলে মূল হালাক করতে হয়। যেমন– সিরকা, মসলা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য। লেখক বলেন, এ সুরতটিকে ফকীহগণ اَلْبَيْعُ بِالدَّرَاهِمِ -এর উপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ চামড়া টাকার বিনিময়ে যেমন বিক্রি করা যায় না তদ্রূপ চামড়ার বিনিময়ে এসব দ্রব্য ক্রয় করা যায় না।

قَوْلُهُ وَالْمَعْنٰى فِيْهِ اَنَّهُ تَصَرُّفٌ عَلٰى قَصْدِ التَّمَوُّلِ : লেখক বলেন, চামড়া দ্বারা এমন বস্তু ক্রয় করা যার মূল অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায় না– নিষেধ হওয়ার কারণ হলো এরূপ বিনিময় করা বা চামড়া টাকায় বিক্রি করে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া মূলত অর্থসম্পদ লাভ করার উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর। অথচ ইবাদত বা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেকৃত কাজের মধ্যে এরূপ করা নাজায়েজ ও অবৈধ। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে মাল অর্জনের চেষ্টা করে তাহলে তার জন্য সেই মাল / টাকা-পয়সা সদকা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা উক্ত মাল/ টাকা-পয়সা অর্জিত হয়েছে শরিয়ত বহির্ভূত পন্থায়। সুতরাং এটা নাপাক সাব্যস্ত হবে। আর তাই তা সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব।

قَوْلُهُ وَاللَّحْمُ بِمَنْزِلَةِ الْجِلْدِ : লেখক বলেন, সহীহ বর্ণনা মতে গোশত চামড়া সদৃশ। অর্থাৎ গোশত বিক্রি করে টাকা-পয়সা গ্রহণ করা যেমন অবৈধ তদ্রূপ গোশত দ্বারা এমন বস্তু খরিদ করা অবৈধ যার মূল অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায় না। আর যদি গোশত দ্বারা এমন বস্তু খরিদ করে যার মূল অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায় তাহলে তা করা তার জন্য অবৈধ হবে না। যেমন কেউ গোশত বিক্রি করে টেবিল ক্রয় করল।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি গোশত বিক্রি করে রুটি খরিদ করে তাহলে তা করা জায়েজ। কেননা শুধু গোশত খাওয়া যায় না বা খাওয়া হয় না; বরং গোশত রুটি বা ভাতসহ খাওয়া হয়। অতএব, গোশত বিক্রি করে রুটি কিংবা ভাত/চাউল খরিদ করা জায়েজ।

قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ الْجِلْدَ اَوِ اللَّحْمَ بِالدَّرَاهِمِ : লেখক বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি চামড়া বা গোশত বিক্রি করে এর বিনিময়ে টাকা নেয় কিংবা এমন বস্তু গ্রহণ করে যার মূল অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায় না -তাহলে সে বিক্রীত চামড়া বা গোশতের বিনিময় সদকা করে দেবে। কেননা কুরবাত বা ইবাদতের বিষয় স্থানান্তরিত হয়ে বদলের দিকে চলে এসেছে। আর আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মাল বা সম্পদ অর্জনের নিমিত্তে বদলের মালিক হওয়াকে শরিয়ত অনুমোদন করে না। অতএব, উক্ত বিনিময় দান করা ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় রইল না। আর এক্ষেত্রে কুরবাত অর্জনের উপায় হচ্ছে উক্ত বিনিময় সদকা করে দেওয়া।

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَاعَ جِلْدَ اُضْحِيَّتِهِ فَلَا اُضْحِيَّةَ لَهُ يُفِيْدُ كَرَاهَةَ الْبَيْعِ اَمَّا الْبَيْعُ جَائِزٌ لِقِيَامِ الْمِلْكِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيْمِ وَلَا يُعْطَى اَجْرُ الْجَزَّارِ مِنَ الْاُضْحِيَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَصَدَّقْ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا وَلَا تُعْطِ اَجْرَ الْجَزَّارِ مِنْهَا شَيْئًا وَالنَّهْىُ عَنْهُ نَهْىٌ عَنِ الْبَيْعِ اَيْضًا لِاَنَّهُ فِىْ مَعْنَى الْبَيْعِ وَيُكْرَهُ اَنْ يُجَزَّ صُوْفُ اُضْحِيَّتِهِ وَيُنْتَفَعُ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَذْبَحَهَا لِاَنَّهُ الْتَزَمَ اِقَامَةَ الْقُرْبَةِ جَمِيْعَ اَجْزَائِهَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الذَّبْحِ لِاَنَّهُ اُقِيْمَتِ الْقُرْبَةُ بِهَا كَمَا فِى الْهَدْيِ وَيُكْرَهُ اَنْ يُحْلَبَ لَبَنُهَا فَيُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا فِى الصُّوْفِ ـ

অনুবাদ : আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– مَنْ بَاعَ جِلْدَ اُضْحِيَّتِهِ فَلَا اُضْحِيَّةَ لَهُ "যে ব্যক্তি তার কুরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করল তার কুরবানি হয়নি" -এর দ্বারা বিক্রি মাকরূহ হওয়া প্রমাণিত হয়। অবশ্য [এতদসত্ত্বেও] মূল বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে বস্তুর মালিকানা ও তা হস্তান্তর করার শক্তি থাকার কারণে। আর কসাই -এর পারিশ্রমিক কুরবানির পশু থেকে দেওয়া যাবে না। কেননা রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে বলেছেন– تَصَدَّقْ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا وَلَا تُعْطِ اَجْرَ الْجَزَّارِ مِنْهَا অর্থাৎ, 'কুরবানির পশুর চাদর, লাগাম এবং নাসারন্ধ্রে পরানো দড়ি সদকা করে দাও এবং এর থেকে কসাইয়ের অংশ দিও না।' এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞাও প্রমাণিত হয়। কেননা এটা বিক্রয়ের হুকুমে। আর কুরবানির পশু জবাইয়ের পূর্বে তার পশম কেটে নেওয়া এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া মাকরূহ। কেননা কুরবানিদাতা পূর্ণ পশু দ্বারা কুরবত হাসিল করার ইচ্ছা করেছে। অবশ্য জবাইয়ের পরের বিষয় এমন নয়। কেননা ইতিমধ্যে পশু দ্বারা ইবাদতের বিষয়টি বাস্তবায়ন করা হয়ে গেছে। যেমন হাদীর [হাজীদের কুরবানির পশুর] ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অদ্রূপ [জবাইয়ের পূর্বে] দুধ দোহন করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া মাকরূহ। যেমন পশম কাটা মাকরূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَاعَ جِلْدَ اُضْحِيَّتِهِ الخ : আলোচ্য ইবারতে পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার উপর আপত্তি করে তার জবাব দেওয়া হয়েছে। দলিল হচ্ছে রাসূল ﷺ বলেন– مَنْ بَاعَ جِلْدَ اُضْحِيَّتِهِ فَلَا اُضْحِيَّةَ لَهُ 'যে ব্যক্তি কুরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করে তার কুরবানি হয় না'– এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখক বলেন, এ হাদীস দ্বারা চামড়া বিক্রি করা মাকরূহ হওয়া বুঝা যায়। এ হাদীস দ্বারা বিক্রিকে নাজায়েজ করা হয়নি। অর্থাৎ হাদীসে উল্লিখিত نَفِىْ টি كَمَالْ نَفِىْ বা পরিপূর্ণতাকে নফী করেছে। রাসূল ﷺ -এর অন্য এক হাদীসে এরূপ অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন– لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِى الْمَسْجِدِ। 'মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মসজিদে নামাজ আদায় করা ছাড়া নামাজ হয় না।' সারকথা হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি কুরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করেছে তার কুরবানি পরিপূর্ণ হয়নি।

আর মূলগতভাবে কুরবানি হয়ে যাওয়ার দলিল হলো উক্ত চামড়ার উপর কুরবানিদাতার মালিকানা পূর্ণমাত্রায় রয়েছে এবং উক্ত চামড়াটি সে ক্রেতার হাতে সোপর্দ করতেও সক্ষম। আর বেচাকেনা জায়েজ হওয়ার জন্য এ দু'টি বিষয় শর্ত। মোটকথা যেহেতু বেচাকেনা জায়েজ হওয়ার শর্তাবলি আলোচ্য বেচাকেনায় বিদ্যমান তাই বেচাকেনা জায়েজ হয়ে যাবে, তবে উল্লিখিত হাদীসের বেচাকেনাটি মাকরূহ সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يُعْطِى أَجْرَ الْجَزَّارِ الخ : লেখক বলেন, কুরবানির পশুর কোনো অংশ থেকে কসাইকে তার পারিশ্রমিক বা মজুরি দেওয়া জায়েজ হবে না। এর প্রথম দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস। রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.) -কে লক্ষ্য করে বলেন- تَصَدَّقْ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا وَلَا تُعْطِ أَجْرَ الْجَزَّارِ مِنْهَا شَيْئًا 'তুমি কুরবানির পশুর চাদর ও তার লাগাম সদকা করে দাও এবং কসাইয়ের কোনো মজুরি এর থেকে দিও না।'

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র.) ব্যতীত অন্যরা عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلٰى থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلٰى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ وَنَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ কসাইকে কুরবানির পশুর অংশবিশেষ প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।

قَوْلُهُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ نَهْيٌ عَنِ الْبَيْعِ : লেখক বলেন, কসাইকে কুরবানির পশু থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাটি কুরবানির পশুর কোনো অংশ বিক্রি করার নিষেধাজ্ঞাকে আবশ্যক করে। কেননা কুরবানির পশুর কোনো অংশ কসাইকে দেওয়া বিক্রি করার নামান্তর। কারণ বিক্রির মধ্যে যেমন ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে আদান-প্রদান হয় তদ্রূপ এখানেও কসাই -এর সাথে শ্রমের বিনিময়ে চামড়া প্রদান করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ يُكْرَهُ أَنْ يُجَزَّ صُوفُ أُضْحِيَتِهِ : লেখক বলেন, কুরবানির পশু জবাইয়ের পূর্বে তার দেহ থেকে পশম কেটে নেওয়া এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া মাকরূহ। কেননা কুরবানিদাতা গোটা পশুটিকেই ইবাদতের উদ্দেশ্যে জবাই করার ইচ্ছা করেছে। অতএব, জবাই এর পূর্বে তার কোনো অংশ কেটে নেওয়া হলে পূর্ণ পশু ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করা হলো না। অবশ্য পশু জবাই করার পর তার থেকে পশম কেটে নেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা পশু জবাইয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ইবাদত সম্পন্ন হয়ে গেছে, অর্থাৎ কুরবানির পশুর ক্ষেত্রে জবাই করা মূল ইবাদত, আর তা আদায় হয়ে গেছে। كَمَا فِي الْهَدْيِ অর্থাৎ, হাদীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ মাসআলা। অর্থাৎ যদি কোনো হাজী হাদী নিয়ে হজে রওয়ানা করে তাহলে তার জন্য উক্ত হাদী জবাই করার পূর্বে তার গায়ের পশম কেটে নেওয়া মাকরূহ।

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْلُبَ لَبَنَهَا : লেখক বলেন, পশমের মতো কুরবানির পশুর দুধ দোহন করে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া মাকরূহ। এটা আহনাফের অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহমদ (র.)-এর মতে যদি দুধ দোহনের দ্বারা পশুর ক্ষতি হয় কিংবা গোশত কমে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে এমন করা নাজায়েজ। অন্যথায় দুধ দোহন করা ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়া মাকরূহ নয়।

আহনাফের মতে যদি কুরবানির পশুর দুধ দোহন করলে পশু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে স্তনে পানি ছিটিয়ে দিবে তবুও দুধ দোহন করবে না।

অবশ্য ফকীহগণ এ মাসআলার ক্ষেত্রে এই শর্তারোপ করেছেন যে, পানি ছিটানোর বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কুরবানির দিন নিকটবর্তী হবে। আর যদি কুরবানির দিন যদি এখনো অনেক দূরে হয় তাহলে পানি ছিটাবে না; বরং দুধ দোহন করে তা সদকা করে দেবে। -[বিনায়া]

পুনশ্চ যদি কুরবানির পশুর পশম কাটা হয় অথবা পশুটি ভাড়ায় খাটানো হয়, অথবা এর উপর আরোহণ করা হয় কিংবা এর দুধ দোহন করা হয়- এমতাবস্থায় যদি এসব বস্তু সদকা করার উপযুক্ত হয় তাহলে তা সদকা করে দিবে। আর যদি তা ভাড়ায় খাটিয়ে কিছু উপার্জন করে থাকে তাহলে তাও সদকা করে দেবে।

قَالَ : وَالْاَفْضَلُ اَنْ يَذْبَحَ اُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ اِنْ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ وَاِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهُ فَالْاَفْضَلُ اَنْ يَسْتَعِيْنَ بِغَيْرِهِ وَاِذَا اسْتَعَانَ بِغَيْرِهِ يَنْبَغِىْ اَنْ يَشْهَدَهَا بِنَفْسِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قُوْمِىْ فَاشْهَدِىْ اُضْحِيَّتَكِ فَاِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِاَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ قَالَ : وَيُكْرَهُ اَنْ يَذْبَحَهَا الْكِتَابِىُّ لِاَنَّهُ عَمَلٌ هُوَ قُرْبَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِهَا وَلَوْ اَمَرَهُ فَذَبَحَ جَازَ لِاَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الذَّكَاةِ وَالْقُرْبَةُ اُقِيْمَتْ بِاِنَابَتِهِ وَنِيَّتِهِ بِخِلَافِ مَا اِذَا اَمَرَ الْمَجُوْسِىَّ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ الذَّكَاةِ فَكَانَ اِفْسَادًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানিদাতার নিজ হাতে জবাই করা উত্তম হবে যদি সে ভালোভাবে জবাই করতে সক্ষম হয়। আর যদি সে উত্তমরূপে জবাই করতে সক্ষম না হয় তাহলে অন্যের সহযোগিতা গ্রহণ করবে। যখন অন্যের সহযোগিতা নিবে তখন তার কুরবানির পশুর সামনে উপস্থিত থাকা সমীচীন। কেননা রাসূল ﷺ হযরত ফাতেমা (রা.)-কে ইরশাদ করেছেন- قُوْمِىْ فَاشْهَدِىْ اُضْحِيَّتَكِ فَاِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِاَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا 'তুমি যাও, তোমার কুরবানির সামনে উপস্থিত থাক। কেননা এ পশুর প্রথম রক্তের ফোঁটা দ্বারা তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানির পশু কোনো কিতাবী জবাই করা মাকরূহ। কেননা এটি একটি ইবাদত। আর কিতাবী ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তবে কেউ যদি কিতাবীকে আদেশ করে আর সে জবাই করে তাহলে কুরবানি বৈধ হয়ে যাবে। কেননা কিতাবী কুরবানি করার উপযুক্ত ব্যক্তি। আর ইবাদতের বিষয়টি আদায় হবে মুসলমানের স্থলবর্তী রূপে এবং তার নিয়ত অনুযায়ী। পক্ষান্তরে যদি কোনো অগ্নিপূজারীকে আদেশ করে [তাহলে কুরবানি জায়েজ হবে না।] কেননা অগ্নিপূজারী কুরবানি করার উপযুক্তই নয়। সুতরাং তখন কুরবানি নষ্ট করা হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَالْاَفْضَلُ اَنْ يَذْبَحَ اُضْحِيَّتَهُ الخ : আলোচ্য ইবারতে কুরবানির পশু জবাই করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত উদ্ধৃত করে বলেন, যদি কুরবানিদাতা নিজে ভালোভাবে জবাই করতে সক্ষম হয় তাহলে কুরবানিদাতা নিজে কুরবানি করা সর্বোত্তম। আর যদি কুরবানিদাতা নিজে ভালোভাবে কুরবানি না করতে পারে বা নিজের উপর পূর্ণ আস্থা না থাকে তাহলে অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা কুরবানি করাবে। তবে এ অবস্থায় কুরবানিদাতা সশরীরে সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত। কেননা রাসূল ﷺ হযরত ফাতেমা (রা.)-কে তাঁর কুরবানির কাছে হাজির থাকার আদেশ করেছেন। রাসূল ﷺ -এর শব্দ হচ্ছে- قُوْمِىْ فَاشْهَدِىْ اُضْحِيَّتَكِ فَاِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِاَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا এ হাদীসটি মোট তিনজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। প্রথমত مُسْتَدْرَكُ الْحَاكِم -এর মধ্যে عمران بن حصين থেকে বর্ণিত-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ قُوْمِىْ اِلٰى اُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِىْ بِهَا فَاِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِاَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيْهِ وَقُوْلِىْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ ...... اِلٰى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ عِمْرَانُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لَكَ وَلِاَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً اَمْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً قَالَ بَلْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً .

একই ধরনের হাদীস হযরত আলী (রা.) ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। মোটকথা উক্ত হাদীস দ্বারা কুরবানিদাতা যদি নিজ হাতে কুরবানি করতে সক্ষম না হয় তাহলে অন্য ব্যক্তি তার কুরবানি করার সময় তার সেখানে থাকা মোস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَذْبَحَهَا الْكِتَابِيُّ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরবানির পশু অমুসলমান অর্থাৎ আসমানি কিতাবের অনুসারী [যেমন ইহুদি / খ্রিস্টান] যদি জবাই করে তাহলে তা মাকরূহ হবে। হিদায়ার ভাষ্যকার আইনীর মতে বিশুদ্ধ অনুলিপি (نُسْخَةٌ) -তে قَالَ শব্দটি নেই। যদি তাই হয় তাহলে এটা ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত হবে না। এরপর লেখক আলোচ্য জবাই মাকরূহ হওয়ার কারণ বর্ণনা করেন এই বলে যে, জবাই এখানে একটি ইবাদত। আর অমুসলমান কিতাবী সে ইবাদত বাস্তবায়নের উপযুক্ত নয়। এজন্য এমন ব্যক্তির জবাই দ্বারা কুরবানি মাকরূহ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি কুরবানিদাতা কিতাবীকে জবাই করার আদেশ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে মাকরূহ হবে না। কেননা কিতাবী জবাই কাজ সম্পাদন করার উপযুক্ত ব্যক্তি, ফলে মুসলমানের হুকুমে জবাই করলে তার জবাই করা মুসলমানের জবাই করার মতো বলে সাব্যস্ত হবে। আর ইবারতের বিষয়টি তখন স্থলবর্তীরূপে আদায় হয়ে যাবে। তাছাড়া এখানে মুসলমানের ইবাদতের নিয়ত তার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ الْمَجُوْسِيَّ : লেখক এ ইবারত দ্বারা আরেকটি মাসআলার অবতারণা করেছেন। আর তা এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার কুরবানির পশু জবাই করতে কোনো অগ্নিপূজক বা মজূসীকে আদেশ করে তাহলে তার কুরবানি আদায় হবে না। কেননা মজূসী কুরবানি করার উপযুক্ত নয় এবং সে একত্ববাদে বিশ্বাসীও নয়। তবে মজূসীকে এ ক্ষেত্রে জরিমানা প্রদান করতে হবে না। কারণ তার জবাইয়ের দ্বারা যে পশুটি নষ্ট হলো তার জন্য সে দায়ী নয়। সে কুরবানিদাতার আদেশ কার্যকর করেছে মাত্র।

قَالَ : اِذَا غَلَطَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اُضْحِيَّةَ الْاٰخَرِ اَجْزَى عَنْهُمَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَاَصْلُ هٰذَا اَنَّ مَنْ ذَبَحَ اُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ ذٰلِكَ وَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيْمَتِهَا وَلَا يُجْزِيْهِ مِنَ الْاُضْحِيَّةِ فِى الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رح) وَفِى الْاِسْتِحْسَانِ يَجُوْزُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الذَّابِحِ وَهُوَ قَوْلُنَا وَجْهُ الْقِيَاسِ اَنَّهُ ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اَمْرِهِ فَيَضْمَنُ كَمَا اِذَا ذَبَحَ شَاةً اِشْتَرَاهَا الْقَصَّابُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দু ব্যক্তি ভুল করে একজন অন্যজনের কুরবানির পশু জবাই করে দেয় তাহলে উভয়ের কুরবানি সহীহ হয়ে যাবে এবং তাদের কারো উপর জরিমানা আরোপিত হবে না। এ মাসআলাটি সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। এ ব্যাপারে মূলনীতি [যুক্তি] হলো, একজনের বিনা অনুমতিতে অন্যজন তার কুরবানি করলে কুরবানিদাতার জন্য উক্ত কুরবানির পশু হালাল। আর জবাইকারী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। কিয়াসানুযায়ী এ কুরবানি শুদ্ধ হবে না। এটাই ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইসতিহসান অনুযায়ী তা বৈধ এবং জবাইকারীর উপর কোনো জরিমানা আরোপিত হবে না। আর এটা আমাদের [আহনাফের অন্য ইমামগণের] অভিমত। কিয়াসের দলিল এই যে, জবাইকারী অন্যের পশু তার বিনা অনুমতিতে জবাই করে ফেলেছে। অতএব সে জরিমানা আদায়ের জামিনদার হবে। যেমন যদি কেউ কসাইয়ের খরিদকৃত বকরি জবাই করে [তাহলে তার জরিমানা দিতে হয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اِذَا غَلَطَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ الخ : আলোচ্য ইবারতে ভুল করে অন্যের পশু জবাই করার বিধান আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দু ব্যক্তি একে অন্যের পশু বিনা অনুমতিতে ভুলে জবাই করে তাহলে উভয়ের কুরবানি আদায় হবে। হেদায়া গ্রন্থের টীকায় বলা হয়েছে যে, যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কারো পশু জবাই করে তাহলে পশুর মালিকের কুরবানি আদায় হবে না। এবং জবাইকারী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে। অবশ্য যদি পশুর মালিক তার থেকে জরিমানা আদায় করে নেয় তাহলে জবাইদাতার পক্ষে কুরবানি হয়ে যাবে। এ মাসআলা বর্ণনা করার পর হিদায়ার লেখক বলেন, এ মাসআলার দলিল হলো ইস্তিহ্সান বা সূক্ষ্মকিয়াস, কিয়াসানুযায়ী এরূপ জবাই দ্বারা কারো কুরবানি হবে না।

قَوْلُهُ اَصْلُ هٰذَا اَنَّ مَنْ ذَبَحَ الخ : লেখক বলেন, এ ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে যদি একব্যক্তি অপর ব্যক্তির পশু বিনা অনুমতিতে জবাই করে তাহলে পশুর মালিকের কুরবানি হবে না এবং জবাইকারী জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে। আর এটাই হচ্ছে কিয়াস বা যুক্তি। ইমাম যুফার (র.) এ মত পোষণ করেন।

কিন্তু ইস্তিহ্সান বা সূক্ষ্মকিয়াসনুযায়ী কুরবানিদাতার কুরবানি সহীহ হবে এবং জবাইকারীর জরিমানা প্রদান করতে হবে না।

قَوْلُهُ وَجْهُ الْقِيَاسِ اَنَّهُ ذَبَحَ شَاةَ الخ : লেখক বলেন, কিয়াসের দলিল এই যে, জবাইকারী অন্যের অনুমতি ব্যতীত অন্যের পশু জবাই করে ফেলেছে। সুতরাং সে জরিমানা প্রদান করতে বাধ্য হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি কসাইয়ের খরিদকৃত বকরি জবাই করে ফেলল, তাহলে জবাইকারী কসাইকে জরিমানা প্রদান করবে। যদিও উক্ত কসাই জবাই -এর উদ্দেশ্যেই বকরিটি খরিদ করেছিল।

তদ্রূপ যদি কেউ অন্যের কুরবানির পশু তার বিনা অনুমতিতে কুরবানির দিনসমূহ আগমনের পূর্বেই জবাই করে ফেলে তাহলে তাকে জরিমানা প্রদান করতে হবে।

وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّهَا تَعَيَّنَتْ لِلذَّبْحِ لِتَعَيُّنِهَا لِلْاُضْحِيَةِ حَتّٰى وَجَبَ عَلَيْهِ اَنْ يُضَحِّيَ بِهَا بِعَيْنِهَا فِيْ اَيَّامِ النَّحْرِ وَيَكْرَهُ اَنْ يُبَدِّلَ بِهَا غَيْرُهَا فَصَارَ الْمَالِكُ مُسْتَعِيْنًا بِكُلِّ مَنْ يَكُوْنُ اَهْلًا لِلذَّبْحِ اِذْنًا لَهٗ دَلَالَةً لِاَنَّهَا تَفُوْتُ بِمُضِيِّ هٰذِهِ الْاَيَّامِ وَعَسَاهُ يَعْجِزُ عَنْ اِقَامَتِهَا لِعَوَارِضِ فَصَارَ كَمَا اِذَا ذَبَحَ شَاةً شَدَّ الْقَصَّابُ رِجْلَهَا فَاِنْ قِيْلَ يَفُوْتُهٗ اَمْرٌ مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ اَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهٖ اَوْ يَشْهَدَ الذَّبْحَ فَلَا يَرْضٰى بِهٖ قُلْنَا يَحْصُلُ لَهٗ مُسْتَحَبَّانِ اٰخَرَانِ صَيْرُوْرَتُهٗ مُضَحِّيًا لِمَا عَيَّنَهٗ وَكَوْنُهٗ مُعَجِّلًا بِهٖ فَيَرْتَضِيْهِ ـ

অনুবাদ : আর ইস্‌তিহ্‌সানের দলিল এই যে, কুরবানির জন্তুটি কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে কুরবানির উদ্দেশ্যে এটাকে নির্ধারণ করা মাধ্যমে। ফলে কুরবানিদাতার উপর কুরবানি দিনসমূহের মধ্যে সেই পশুটি জবাই করা ওয়াজিব এবং এর পরিবর্তে অন্য একটি পশু জবাই করা মাকরূহ। এ কারণে পশুর মালিক পরোক্ষভাবে এমন ব্যক্তির সাহায্যপ্রার্থী হবে যে জবাই করার উপযুক্ত ব্যক্তি এবং সে তার অনুমতি প্রদানকারীও হবে। কেননা কুরবানির সুযোগ এই দিনগুলো অতিবাহিত হলে হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং [এও হতে পারে যে,] সে বিভিন্ন সমস্যার কারণে কুরবানি দিতে অক্ষম হয়ে যাবে। সুতরাং মাসআলাটি এমন হলো যে, কসাই যে পশুটিকে [জবাই করার উদ্দেশ্যে] সেটির পা বেধেঁছে সেটিকে আরেকজন জবাই করে দিয়েছে। যদি কেউ আপত্তি করে যে, এর পূর্বে উল্লিখিত মাসআলা দ্বারা একটি মোস্তাহাব ছুটে যাচ্ছে। আর তা হচ্ছে কুরবানিদাতার নিজেই জবাই করা কিংবা জবাইয়ের সময় নিজে উপস্থিত থাকা। অতএব, [মোস্তাহাব ছুটে যাওয়ার কারণে] সে এতে রাজি থাকবে না। উত্তরে আমরা বলব, এর দ্বারা ভিন্ন দুটি মোস্তাহাবের আমল হচ্ছে। আর তা এই যে, ১. সে যে পশুটিকে কুরবানির জন্য নির্ধারিত করেছিল সেটির কুরবানিদাতা সে হচ্ছে এবং ২. কুরবানির আমলটি দ্রুত আদায়কারী হচ্ছে সুতরাং সে এতে রাজি হবে বৈ কি!

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّهَا تَعَيَّنَتْ لِلذَّبْحِ الخ : চলমান ইবারতে লেখক পূর্বে বর্ণিত মাসআলার ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্মকিয়াসের উল্লেখ করা হয়েছিল তার দলিল বর্ণনা করেছেন।

ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, কুরবানির দিনগুলোতে কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের পশু জবাই করে ফেলে তাহলে কিয়াসানুযায়ী পশুর মালিকের কুরবানি সহীহ হবে না এবং জরিমানা আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে সূক্ষ্মকিয়াস মতে তার কুরবানিও সহীহ হবে এবং জবাইকারীর উপর জরিমানাও আবশ্যক হবে না।

ইস্‌তিহ্‌সান বা সূক্ষ্মকিয়াসের দলিল : আলোচ্য মাসআলায় বকরি বা কুরবানির পশুগুলো যে উদ্দেশ্যে খরিদ করা হয়েছে পরস্পর বিনা অনুমতিতে জবাই করার দ্বারা সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। অর্থাৎ বকরিগুলো কুরবানির উদ্দেশ্যে খরিদ করা হয়েছিল, আর তা কুরবানির উদ্দেশ্যেই জবাই করা হয়েছে। অতএব, এভাবে জবাই করার দ্বারা উদ্দেশ্যের খেলাফ করা হয়নি; বরং উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হয়েছে মাত্র। যেহেতু মালিক পশুটি কুরবানির উদ্দেশ্যে খরিদ করেছে এবং কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট করেছে সেহেতু মালিক যেন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির প্রতি সাহায্যপ্রার্থী যিনি জবাই করার উপযুক্ত এবং যেন তিনি পরোক্ষভাবে জবাইকারীর প্রতি অনুমতি প্রদানকারী। কেননা কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট দিনসমূহ পার হয়ে যাওয়ার পর কুরবানি করার অবকাশ থাকে না। আর অনেক সময় কুরবানিদাতা নিজে কুরবানি করতে সক্ষম হয় না, অন্যদের থেকে সাহায্য নেওয়ার মুখাপেক্ষী হয়। এমতাবস্থায় অন্যের সাহায্যে তার পশু জবাই হলে কুরবানি সহীহ হয়ে যাওয়ার কথা। আর আমরা তা কুরবানি হয়ে যাওয়ার পক্ষেই মত প্রদান করেছি।

এরপর লেখক বলেন, আমাদের মাসআলাটি ঐ কসাইয়ের মতো যে তার পশু জবাইয়ের উদ্দেশ্যে সেটির পা বেঁধেছে, অতঃপর অন্য ব্যক্তি সেটিকে জবাই করে দিয়েছে। এখানে জবাইকারীর উপর জরিমানা আরোপিত হয় না, কারণ সেতো কসাইয়ের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছে। কসাইয়ের উদ্দেশ্যের খেলাফ কিছু করেনি।

তদ্রূপ আমাদের চলমান মাসআলায় দুই কুরবানিদাতা একে অন্যের পশু বিনা অনুমতিতে জবাই করার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্যের খেলাফ কিছু করেনি; বরং তাদের যে উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ কুরবানি করা তা বাস্তবায়ন করেছে মাত্র। অতএব, তাদের দু'জনের কুরবানি সহীহ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোনো দরিদ্র ব্যক্তি [যার উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়] যদি কোনো পশু কুরবানি করার জন্য খরিদ করে তাহলে তার সেই পশুটি কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তি মান্নতের মাধ্যমে তার উপর কুরবানি করাকে আবশ্যক করে এবং সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে কোনো পশু খরিদ করে তাহলেও তার উপর সেই পশুটি কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে কোনো ধনবান ব্যক্তি যদি পশু খরিদ করে তাহলে তার উপর খরিদ করার কারণে কুরবানি আবশ্যক হয়নি; বরং তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হয়েছে তার ধন-সম্পত্তি বা মালের কারণে। এমন ব্যক্তির কুরবানির জন্য কেনা পশুটি জবাই করা আবশ্যক হয় না। অবশ্য সেটার পরিবর্তে অন্য পশু কুরবানি করা মাকরূহ হয়। মুসান্নিফ (র.) প্রথম দুটি সুরতকে حَتّٰى وَجَبَ عَلَيْهِ اَنْ يُضَحِّيَ-এর দ্বারা এবং তৃতীয় সুরতটিকে وَيُكْرَهُ اَنْ يُبَدِّلَ بِهَا غَيْرَهَا-এর দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ فَاِنْ قِيْلَ يَفُوْتُهُ اَمْرٌ مُسْتَحَبٌّ الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক আপত্তি তুলে তার জবাব বর্ণনা করেছেন। আপত্তিটি পূর্বালোচিত মাসআলার উপর করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, একে অন্যের কুরবানির জন্তু বিনা অনুমতিতে জবাই করলে সেটি ইসতিহসান হিসেবে জায়েজ হবে। এ মাসাআলার উপর কেউ আপত্তি করছেন এই বলে যে, মোস্তাহাব হলো কুরবানিদাতা ভালোভাবে কুরবানি দিতে সক্ষম হলে কুরবানি করা, অন্যথায় নিজের কুরবানির সময় উপস্থিত থাকা– আলোচ্য মাসআলায় কোনো একটির উপর আমল হয়নি। মোটকথা আলোচ্য সুরতে মোস্তাহাব ছুটে যাচ্ছে, যার কারণে এমন কুরবানিতে কুরবানিদাতা রাজি হওয়ার কথা নয়। আর কুরবানিদাতা রাজি না হলে কুরবানি বৈধ হবে না।

লেখক উত্তরে বলেন, আপনাদের উত্থাপিত আপত্তি তো সঠিক, কিন্তু আলোচ্য মাসআয় এ একটি মোস্তাহাব ছুটলে তো অন্য দুটি মোস্তাহাবের উপর আমল হচ্ছে। সেগুলোর প্রথমটি হচ্ছে–

১. কুরবানির জন্য যে পশু/বকরিকে কুরবানিদাতা নির্ধারিত করেছিল সেটিই জবাই করা হচ্ছে। আর কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট করা বকরি/পশু জবাই করা মোস্তাহাব এবং এর পরিবর্তে অন্য আরেকটি জবাই করা মাকরূহ।
২. দ্বিতীয় মোস্তাহাব হলো, ওয়াজিব বা কুরবানির কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করা মোস্তাহাব। এখানে সেই মোস্তাহাবটিও আদায় হচ্ছে। অতএব, একটি মোস্তাহাব ছুটলেও যেহেতু অন্য দুটি মোস্তাহাব আদায় হচ্ছে তাই কুরবানিদাতা এমন কুরবানিতে সন্তুষ্ট হওয়ারই কথা।

وَلِعُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ مِنْ هٰذَا الْجِنْسِ مَسَائِلُ اِسْتِحْسَانِيَّةٌ وَهِيَ اَنَّ مَنْ طَبَخَ لَحْمَ غَيْرِهِ اَوْ طَحَنَ حِنْطَتَهُ اَوْ رَفَعَ جَرَّتَهُ فَانْكَسَرَتْ اَوْ حَمَلَ عَلٰى دَابَّتِهِ فَعَطِبَتْ كُلُّ ذٰلِكَ بِغَيْرِ اَمْرِ الْمَالِكِ يَكُوْنُ ضَامِنًا وَلَوْ وَضَعَ الْمَالِكُ اللَّحْمَ فِي الْقِدْرِ وَالْقِدْرُ عَلَى الْكَانُوْنِ وَالْحَطَبُ تَحْتَهُ اَوْ جَعَلَ الْحِنْطَةَ فِي الدَّوْرَقِ وَ رَبَطَ الدَّابَّةَ عَلَيْهِ اَوْ رَفَعَ الْجَرَّةَ وَاَمَالَهَا اِلٰى نَفْسِهِ اَوْ حَمَلَ عَلٰى دَابَّتِهِ فَسَقَطَ فِي الطَّرِيْقِ فَاَوْقَدَ هُوَ النَّارَ فِيْهِ فَطَبَخَهُ اَوْ سَاقَ الدَّابَّةَ فَطَحَنَهَا اَوْ اَعَانَهُ عَلٰى رَفْعِ الْجَرَّةِ فَانْكَسَرَتْ فِيْمَا بَيْنَهُمَا اَوْ حَمَلَ عَلٰى دَابَّتِهِ مَا سَقَطَ فَعَطِبَتْ لَا يَكُوْنُ ضَامِنًا فِيْ هٰذِهِ الصُّوَرِ اِسْتِحْسَانًا لِوُجُوْدِ الْاِذْنِ دَلَالَةً ـ

অনুবাদ : [হিদায়ার লেখক বলেন,] আমাদের ওলামায়ে কেরামের মতে এ জাতীয় আরো কতিপয় মাসায়েল ইসতিহসানের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য। যেমন কেউ অন্যের গোশত রান্না করল, অথবা অন্যের গম পিষে দিল, অথবা অন্যের কলস উঠানোর সময় তা ভেঙ্গে গেল, কিংবা অন্যের সওয়ারির উপর নিজ বোঝা উঠানোর ফলে সওয়ারিটি মারা গেল– এ সকল অবস্থাতে যদি মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি এরূপ করে থাকে তাহলে সে ক্ষতিপূরণ আদায়ে বাধ্য হবে। আর ১. যদি [গোশতের] মালিক উনানের উপর স্থাপিত ডেকচিতে গোশত রাখে, আর উনানের নীচে লাকড়ি থাকে অথবা ২. [গমের] মালিক গম [চাক্কি চালানোর উদ্দেশ্যে] টুকরিতে রাখে এবং চাক্কির সাথে পশু বেঁধে দেয়, অথবা ৩. [কলসের] মালিক যদি কলস উঠানোর জন্য উদ্যত হয় এবং সেটিকে নিজের দিকে টেনে নেয় কিংবা ৪. [বাহন জন্তুর] মালিক যদি তার সওয়ারির উপর কোনো বোঝা উঠায়, অতঃপর তা রাস্তায় পড়ে যায় তাহলে প্রথম মাসআলায় অন্য ব্যক্তি যদি আগুন জ্বালিয়ে গোশত রান্না করে অথবা দ্বিতীয় মাসআলায় অন্য ব্যক্তি যদি পশু চালিয়ে আটা পিষে নেয় অথবা তৃতীয় মাসআলায় অন্য ব্যক্তি যদি কলস উঠাতে সাহায্য করে এমতাবস্থায় দুজনের মুখোমুখিতে কলসটি ভেঙ্গে যায় অথবা চতুর্থ মাসআলায় পড়ে যাওয়া মালামালগুলো যদি অন্য ব্যক্তি উঠিয়ে দেয় আর তাতে যদি পশুটি মারা যায় তাহলে এ চার সুরতে দ্বিতীয় ব্যক্তি মালিককে জরিমানা প্রদান করবে না ইসতিহসানের [সূক্ষ্ম কিয়াসের] ভিত্তিতে। কেননা এ সুরতগুলোতে পরোক্ষভাবে [মালিকের] অনুমতি পাওয়া গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : وَلِعُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ مِنْ هٰذَا الْجِنْسِ الخ : আলোচ্য ইবারতে ওলামায়ে আহনাফের ইসতিহসানের ভিত্তিতে গ্রহণ করা কতিপয় মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মূলত চারটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে যেহেতু কুরবানি সংক্রান্ত একটি ইসতিহসানী মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে সেহেতু এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আরো চারটি ইসতিহসানী মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। এ মাসআলাগুলোর দুটো দিক রয়েছে– ১. একে অন্যের মাল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দূরতম বা পরোক্ষ অনুমতিও লাভ করেনি। ২. অন্যের মাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অনুমতি না পেলেও পরোক্ষ অনুমতি লাভ করেছে। প্রথম অবস্থায় ব্যবহারকারী মালিকের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। দ্বিতীয় অবস্থায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক নয়।

লেখক প্রথমে প্রথম অবস্থার বিধান আলোচনা করেছেন। চারটি মাসআলার প্রথম মাসআলা–

১. রাশেদ খালেদের গোশত রান্না করল– এমতাবস্থায় রাশেদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য হবে।

২. রাশেদ খালেদের গম নিয়ে তা পিষে আটা বানিয়ে ফেলল– এমতাবস্থায় রাশেদকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৩. রাশেদ খালেদের সিরকা ভর্তি কলস উত্তোলন করল, যার ফলে উক্ত কলসটি ভেঙ্গে গেল– এমতাবস্থায়ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক হবে।

৪. রাশেদ খালেদের ঘোড়া / খচ্চরের উপর তার বোঝা উঠিয়ে দিল, অতঃপর বোঝা বহন করতে গিয়ে পশুটি মারা গেল– এমতাবস্থায়ও রাশেদকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

উল্লিখিত চারটি সুরতে খালেদ রাশেদকে এসব কাজ করার জন্য প্রত্যক্ষ অনুমতি দেয়নি। এমনকি খালেদ উল্লিখিত বস্তুগুলো দ্বারা এরূপ কোনো কাজ করার মনস্থ করেছে, এমনও কিছু বুঝা যায় না। আর রাশেদ কর্তৃক এরূপ করার দ্বারা খালেদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এজন্য খালেদের ক্ষতিপূরণ আদায় করা রাশেদের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে। অবশ্য খালেদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অনুমতি হলে মাসআলার হুকুম ভিন্ন ধরনের হবে, সামনের ইবারতে তার বিবরণ আসছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ وَضَعَ الْمَالِكُ اللَّحْمَ الخ : চলমান ইবারতে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) পূর্ববর্তী মাসআলার সাথে সম্পর্কিত এমন চারটি মাসআলার আলোচনা করেছেন যেগুলোতে ইসতিহসানের ভিত্তিতে জারিমানা আরোপিত হয় না। পূর্ববর্তী চার সুরতে আমরা দেখেছি যে, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কোনোরূপ অনুমতি না থাকার কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর মালিকের জরিমানা প্রদান করা আবশ্যক হয়েছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য চার সুরতে পরোক্ষ অনুমাতির কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তির জরিমানা প্রদান করা আবশ্যক নয়।

প্রথম মাসআলা : জনৈক গোশতের মালিক গোশত রান্না করার উদ্দেশ্যে ডেকচিতে গোশত নিয়ে তা উনানের উপর রেখেছে। উনানের নীচে জ্বালানিরূপে লাকড়িও বিদ্যমান। এমতাবস্থায় সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে যে, লোকটি এই গোশতগুলো রান্না করার ইচ্ছা করেছে। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি উদাহরণস্বরূপ রাশেদ যদি লাকড়িতে আগুন জ্বালিয়ে গোশত রান্না করে ফেলে তাহলে এ রান্না করার কারণে রাশেদের উপর জরিমানা আরোপিত হবে না। কেননা মালিকের পক্ষ থেকে এখানে গোশত রান্না করার পরোক্ষ অনুমতি রয়েছে। [বরং বলা যায় রান্না করার মাধ্যমে মালিকের কিছুটা উপকার করা হয়েছে; সে হিসেবে সে তো মালিকের কাছে পাওনাদার হয়ে গেছে– জরিমানা প্রদান তো দূরের কথা।]

দ্বিতীয় মাসআলা : মালিক গম পিষার চাক্কির সাথে সংযুক্ত টুকরি বা বিশেষ পাত্রের মাঝে গম রাখল, অতঃপর সে চাক্কি যে পশুর সাহায্যে ঘোরানো হয় সেই পশুটিও চাক্কির সাথে যুক্ত করল। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এসে পশুটিকে চালিয়ে গম পিষে আটা তৈরি করে নিল। তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে পশু চালিয়ে আটা তৈরি করল তার উপর কোনো জরিমানা আবশ্যক হবে না। কেননা এখানেও মালিকের পরোক্ষ অনুমতি রয়েছে; বরং গম পিষার মাধ্যমে মালিকের উপকার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, دَوْرَقٌ শব্দটির অর্থ টুকরি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি চৌকোণবিশিষ্ট বিশেষ পাত্র যা গম পিষার চাক্কির উপর স্থাপিত এবং এর থেকে গম / চাল ইত্যাদি চাক্কির মধ্যে যায়। বর্তমান যুগের আটাকলগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে, মেশিনের উপর টিনের চৌকাণবিশিষ্ট চোঙ্গ যুক্ত থাকে, মূলত সেগুলোকেই আরবিতে দাওরাক (دَوْرَقٌ) বলা হয়। যুগের পরিবর্তনে এর কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তৃতীয় মাসআলা : রাশেদ তথা জনৈক কলসের মালিক তার কলস উঠানো জন্য কলসটিকে নিজের দিকে টেনেছে মাত্র। এমতাবস্থায় খালেদ বা দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কলসটি উঠাতে হাত লাগাল, ঘটনাচক্রে সে সময় কলসটি ভেঙ্গে গেল, তাহলে রাশেদের উপর কলস ভাঙ্গার জরিমানা আরোপিত হবে না। কেননা এখানেও খালেদ বা কলসের মালিকের কলস উত্তোলনের ব্যাপারে পরোক্ষ অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে।

চতুর্থ মাসআলা : জনৈক ঘোড়ার মালিক বা খালেদ তার ঘোড়ার উপর বোঝা রাখল, কিছুদূর যাওয়ার পর ঘোড়া থেকে বোঝাটি পড়ে গেল। অতঃপর রাশেদ পতিত সেই বোঝাটি উঠিয়ে ঘোড়ার উপর রাখল, কিন্তু তারপর বোঝার চাপে ঘোড়াটি মারা গেল তাহলে রাশেদের উপর ঘোড়ার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক হবে না। কেননা এখানেও রাশেদ খালেদ কর্তৃক পরোক্ষভাবে বোঝা উঠানোর অনুমতি পেয়েছে।

إِذَا ثَبَتَ هٰذَا نَقُوْلُ فِيْ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ ذَبَحَ كُلٌّ مِنْهُمَا اُضْحِيَّةَ غَيْرِهٖ بِغَيْرِ اِذْنِهٖ صَرِيْحًا فَهِيَ خِلَافِيَّةُ زُفَرَ (رح) بِعَيْنِهَا وَيَتَأَتّٰى فِيْهَا الْقِيَاسُ وَالْاِسْتِحْسَانُ كَمَا ذَكَرْنَا فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَسْلُوْخَةً مِنْ صَاحِبِهٖ وَلَا يَضْمَنُهٗ لِاَنَّهٗ وَكِيْلُهٗ فِيْمَا فَعَلَ دَلَالَةً ـ فَاِنْ كَانَا قَدْ اَكَلَا ثُمَّ عَلِمَا فَلْيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهٗ وَيُجْزِيْهِمَا لِاَنَّهٗ لَوْ اَطْعَمَهٗ فِي الْاِبْتِدَاءِ يَجُوْزُ وَاِنْ كَانَ غَنِيًّا فَكَذَا لَهٗ اَنْ يُحَلِّلَهٗ فِي الْاِنْتِهَاءِ وَاِنْ تَشَاحَنَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنْ يَضْمَنَ صَاحِبَهٗ قِيْمَةَ لَحْمِهٖ ثُمَّ يَتَصَدَّقَ بِتِلْكَ الْقِيْمَةِ لِاَنَّهَا بَدَلٌ عَنِ اللَّحْمِ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ اُضْحِيَّتَهٗ وَهٰذَا لِاَنَّ التَّضْحِيَةَ لَمَّا وَقَعَتْ عَنْ صَاحِبِهٖ كَانَ اللَّحْمُ لَهٗ وَمَنْ اَتْلَفَ لَحْمَ اُضْحِيَّةِ غَيْرِهٖ كَانَ الْحُكْمُ مَا ذَكَرْنَاهُ ـ

অনুবাদ : যখন উপরিউক্ত মাসায়েল ইসতিহসানের ভিত্তিতে বৈধ প্রমাণিত হলো তখন আমরা কুদূরীর [পূর্বে উল্লিখিত] মাসআলার ব্যাপারে বলব অর্থাৎ যখন পরস্পর দুই ব্যক্তি একে অন্যের কুরবানির পশু জবাই করবে প্রত্যক্ষ অনুমতি ব্যতীত তখন সেটি হুবহু ইমাম যুফার (র.)-এর ইখতিলাফকৃত মাসআলা যাতে কিয়াস ও ইসতিহসান উভয়দিক রয়েছে, এর বর্ণনা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। অতএব, [ইসতিহসান অনুযায়ী] তাদের প্রত্যেকে একে অন্যের জবাইকৃত পশুর চামড়া নিয়ে নেবে এবং কেউ কাউকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না। কেননা তারা যা করেছে এতে একে অন্যের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেছে। [অর্থাৎ তারা পরস্পর পশু জবাইয়ের উকিল বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।] আর যদি তারা [পশু জবাই করে তা] খেয়ে ফেলে অতঃপর তারা জানতে পারে [যে, তারা অন্যের বকরি/পশু জবাই করে খেয়েছে] তাহলে তাদের জন্য সমীচীন হলো পরস্পর পরস্পরের জন্য নিজ পশু হালাল করে দেওয়া। আর এ পদ্ধতিতেও তাদের জন্য কুরবানি সহীহ হয়ে যাবে। কেননা যদি কুরবানিদাতা প্রথমেই অন্যকে আহার করায় যদিও সে ধনী হয় -তা জায়েজ হয় তাহলে তো তার জন্য শেষ অবস্থাতেও তা অন্যের উদ্দেশ্যে হালাল করা জায়েজ হবে। আর যদি তারা এ ব্যাপারে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তাদের পরস্পরকে গোশতের জরিমানা আরোপ করার অধিকার থাকবে। অতঃপর সেই জরিমানা বাবদ উসুলকৃত মূল্যকে তারা সদকা করে দেবে। কেননা এ মূল্য গোশতের বিনিময়ে প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং এটা এমন হলো যে, সে তার কুরবানির পশুকে যেন বিক্রি করে দিয়েছে। কারণ কুরবানি যার পক্ষ থেকে হয় গোশত তার মালিকানাধীন সাব্যস্ত হয়। আর যদি কেউ অন্যের কুরবানির গোশত নষ্ট করে দেয়, তাহলে এর হুকুম তাই হবে যা আমরা মাত্র উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا ثَبَتَ هٰذَا نَقُوْلُ فِيْ مَسَائِلِ الْكِتَابِ الخ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) চলমান ইবারতে পূর্বে উল্লিখিত ইস্‌তিহ্‌সানী মাসআলার উপসংহার টানছেন। তিনি বলেন, যখন উল্লিখিত মাসায়েলের হুকুমেরও ইস্‌তিহসানের বিষয়টি প্রমাণিত হলো তখন আমাদের জন্য ইমাম কুদূরী (র.)-এর পরস্পর বিনা অনুমতিক্রমে পশু জবাই করার মাসআলাটি বুঝা সহজ হয়ে গেছে। কেননা সে মাসআলাতেও রাশেদ খালেদের কিংবা খালেদ রাশেদের কুরবানির পশু যদিও সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত জবাই করেছে; কিন্তু তাতে এক ধরনের অস্পষ্ট বা পরোক্ষ অনুমতি বিদ্যমান। যেহেতু এর মাঝে পরোক্ষ অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে তাই সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী উভয়ের জবাই সহীহ হয়ে যাবে। অবশ্য এ মাসআলাতে কিয়াসের দাবি অনুযায়ী কারো কুরবানি সহীহ না হওয়ার কথা। আর কিয়াসের পথ ধরে হেঁটেছেন ইমাম যুফার (র.)। তাঁর মতে দু'জনের কারো জবাই শুদ্ধ হয়নি। তাই প্রত্যেকে অন্যকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

قَوْلُهُ فَيَاْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : লেখক বলেন, যেহেতু ইস্‌তিহ্‌সান অনুযায়ী উভয়ের কুরবানিই সহীহ বলে বিবেচিত হয়েছে তাই প্রত্যেকে তার চামড়া ছিলানো বকরি/পশুটি তার সাথী থেকে গ্রহণ করবে এবং কেউ কাউকে জরিমানা প্রদান করবে না। পরস্পর বকরি গ্রহণ করা এবং জরিমানা আরোপিত না হওয়ার কারণ হলো প্রত্যেকে জবাই ও চামড়া ছিলানোর ক্ষেত্রে অন্যের তরফ থেকে উকিল সাব্যস্ত হবে। আর নিয়ম হচ্ছে উকিল তার মুআক্কিলকে জরিমানা প্রদান করেন না, তাই এখানেও কোনো জরিমানা হবে না।

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَ قَدْ اَكَلَا ثُمَّ الخ : আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) পূর্বের মাসআলার সাথে সম্পর্কিত আরেকটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন।

মাসআলা : যদি একে অন্যের অনুমতি ব্যতীত কুরবানির পশু জবাই করে, অতঃপর তারা সে পশু খেয়ে ফেলে, তারপর তারা অবগত হয় যে, তারা ভুলক্রমে অন্যের পশু জবাই করে ফেলেছে এবং তা খেয়েও ফেলেছে, এমতাবস্থায় যদি তারা একে অন্যের জন্য তাদের পশুটি হালাল সাব্যস্ত করে তাহলে উভয়ের কুরবানি সহীহ হবে। কেননা তারা যদি প্রথমেই তাদের কুরবানির পশু ভুলব্যতীত অন্য কোনো ধনী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে খাওয়ায় তাহলে যেমন তা করা বৈধ হয় তদ্রূপ যদি তারা পরবর্তীতে খাওয়ায় অর্থাৎ একজন তার পশুকে অন্যজনের জন্য হালাল করে দেয় তাহলেও তা হালাল সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ تَشَاحَّا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الخ : **মাসআলা :** যদি একে অন্যের কুরবানির পশু জবাই করত তা খেয়ে ফেলে, অতঃপর তাদের মাঝে গোশতের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয়। যেমন– একজন বলল, আমার গোশত উত্তম ছিল। অন্যজন বলল, আমার কুরবানির পশু বেশি দামি ছিল ইত্যাদি। এমতাবস্থায় তাদের বিবাদ মীমাংসায় এ সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে যে, তারা পরস্পর নিজেদের গোশতের মূল্য একে অন্য থেকে ফেরত নেবে অর্থাৎ রাশেদ তার কুরবানির গোশতের মূল্য খালেদ থেকে এবং খালেদ তার গোশতের মূল্য রাশেদ থেকে ফেরত নেবে। অবশ্য তাদের এ গোশতের মূল্য ফেরত নেওয়া বেচাকেনার নামান্তর। অর্থাৎ যেন একজন তার গোশত অন্যের কাছে বিক্রি করে তার মূল্য গ্রহণ করল। আর কুরবানির গোশত বিক্রি সংক্রান্ত মাসআলা ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, উক্ত বিক্রির টাকা বা বিনিময় কুরবানিদাতা ব্যবহার করতে পারে না; বরং তা সদকা করে দিতে হয়, তাই এখানেও গোশত বিক্রির মূল্য সদকা করে দিতে হবে। কেননা যখন কুরবানির পশু এবং এর গোশত প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে আদায় হচ্ছে, জবাইকারীর পক্ষ থেকে হচ্ছে না। অতএব, জবাইকারী অন্যের গোশত খাওয়ার কারণে জরিমানা প্রদান করবে। আর যে ব্যক্তি অন্যের গোশত যে কোনোভাবেই বিনষ্ট করবে সেই ব্যক্তি মালিকের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে বাধ্য থাকবে।

وَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَضَحّٰى بِهَا ضَمِنَ قِيْمَتَهَا وَجَازَ عَنْ اُضْحِيَّتِهٖ لِاَنَّهٗ مَلَكَهَا بِسَابِقِ الْغَصْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اُوْدِعَ شَاةً فَضَحّٰى بِهَا لِاَنَّهٗ يَضْمَنُهٗ بِالذَّبْحِ فَلَمْ يَثْبُتِ الْمِلْكُ لَهٗ اِلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি অন্যের বকরি ছিনতাই করে কুরবানি করে সে মালিকের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে, তবে তার কুরবানি শুদ্ধ হবে। কেননা সে পূর্ববর্তী ছিনতাই দ্বারা বকরিটির মালিক হয়ে গেছে। অবশ্য যদি কারো কাছে বকরি আমানত রাখা হয় আর সে আমানতের বকরিটিকে জবাই করে দেয় তাহলে ভিন্ন হুকুম হবে [অর্থাৎ তার এ কুরবানি সহীহ হবে না।] কেননা এ ব্যক্তিকে জবাই করার কারণেই জরিমানা প্রদান করতে হবে। সুতরাং জবাই করার পূর্বে তার মালিকানা প্রমাণিত হচ্ছে না [বরং জবাইয়ের পর মালিকানা সাব্যস্ত হচ্ছে। সারকথা হচ্ছে জবাইয়ের সময় বকরির উপর মালিকানা না থাকার কারণে কুরবানি সহীহ হবে না।] আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَضَحّٰى بِهَا الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক কুরবানি সংক্রান্ত সর্বশেষ মাসআলা বর্ণনা করেছেন। লেখক বলেন, যদি কেউ অন্যের বকরি ছিনিয়ে নিয়ে বা জোরপূর্বকভাবে জবাই করে দেয় তাহলেও তার কুরবানি শুদ্ধ হয়ে যাবে। কুরবানি জায়েজ হওয়ার দলিল হচ্ছে গসব বা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়ার দ্বারা গাসিব / ছিনতাইকারীর উপর জরিমানা আরোপিত হয়। আর জরিমানা আদায় করার দ্বারা গাসিবের বকরিটির উপর মালিকানা সাব্যস্ত হয়। মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার পর কুরবানি করাতে কুরবানি সহীহ হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে ইমাম যুফার (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তাঁরা বলেন, এমন বকরি / পশু দ্বারা কুরবানি করা চলবে না। কেননা পশুটি এখনো গাসিবের পূর্ণ মালিকানায় আসেনি। সুতরাং এটি গাসিব কর্তৃক গসবকৃত গোলাম আজাদ করার মতো হলো। অর্থাৎ কেউ যদি গসবকৃত গোলামের জরিমানা প্রদানের পূর্বে গোলামটি আজাদ করে তাহলে তার এই আজাদকরণ শুদ্ধ হয় না।

তাদের এ আপত্তির জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, পূর্ববর্তী গসবের দ্বারা গাসিবের মালিকানা গসবকৃত পশুর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অবশ্য কুরবানির ক্ষেত্রে পশুর উপর পূর্ণ মালিকানা শর্ত নয়, অথচ আজাদকরণের ক্ষেত্রে গোলাম / বাঁদির উপর পূর্ণ মালিকানা শর্ত। গসবকৃত গোলামের উপর মালিকানা বর্তমানে মুলতবি রয়েছে; তাই গোলাম আজাদ করলে আজাদ হবে না। মোটকথা গোলাম আজাদ করা এবং কুরবানির পশু জবাই করা এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আর তাই একটিকে অন্যটির উপর কিয়াস করা সহীহ নয়।

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ مَا لَوْ اُوْدِعَ شَاةً الخ : লেখক বলেন, যদি কারো কাছে কুরবানির পশু আমানত রাখা হয় অতঃপর আমানত গ্রহীতা সেই পশুটি কুরবানি করে দেয় তাহলে তার কুরবানি সহীহ হবে না। যদিও এখানে কুরবানিদাতার উপর জরিমানা আরোপিত হচ্ছে। তবে তাঁর উপর জরিমানা আরোপিত হচ্ছে وَدِيْعَتْ-এর কারণে নয়; বরং অন্যের বকরি জবাই করার কারণে। অতএব আমীন বা আমানত গ্রহীতা বকরিটির মালিক হলো জবাই করার পর, জবাই করার পূর্বে সে বকরিটির মালিক ছিল না। আর কুরবানি সহীহ হওয়ার জন্য কুরবানি করার পূর্বে সেই পশুটির মালিক হওয়া শর্ত। সেহেতু وَدِيْعَتْ বা আমানতের সুরতে কুরবানি জায়েজ হবে না। আলোচ্য আলোচনা থেকে দুই মাসআলার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।
সংক্ষেপে দুই মাসআলার মাঝে পার্থক্য এই যে, আমানত বা ওয়াদিয়ত আমানত গ্রহীতার মালিকানার সবব হয় না। পক্ষান্তরে গাসিবের জন্য গসব মালিকানার সবব হয়। যেহেতু কুরবানির সময় পশুর মালিকানা শর্ত তাই গসবের অবস্থায় কুরবানি সহীহ হবে আর আমানতের অবস্থায় কুরবানি সহীহ হবে না।

كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ

অধ্যায় : মাকরূহ বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা

পূর্বাপরের সাথে সম্পর্ক : সাধারণভাবে ভাষ্যকারগণ এ অধ্যায় এবং পূর্ববর্তী অধ্যায় তথা কুরবানির মাসায়েল সংক্রান্ত অধ্যায়ের মাঝে এভাবে সম্পর্ক বর্ণনা করেন যে, কুরবানির অধ্যায়ে এমন মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে যা মাকরূহ ছিল। যেমন– রাতে কুরবানি করা, কুরবানির পশুর দুধ দোহন করা, এর গায়ের পশম কাটা ইত্যাদি। সেখানে মাকরূহ বিষয়াদির বর্ণনা এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে, আর এ অধ্যায়ে এর বর্ণনা এসেছে বিস্তারিতভাবে। সুতরাং এ দু অধ্যায়ের মাঝে প্রথমে ইজমাল, পরে তাফসীল এমন সম্পর্ক বিদ্যমান।

কিন্তু বিনায়া গ্রন্থের মুসান্নিফ আল্লামা আইনী এরূপ মুনাসাবাতকে যথার্থ মনে করেন না। তাঁর মতে এভাবে সম্পর্ক বর্ণনা করলে সব অধ্যায়ের সাথে এর সম্পর্ক বর্ণনা করা যেতে পারে। কেননা মাকরূহ বিষয়ের আলোচনা তো সব অধ্যায়েই প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। তিনি বলেন, একথা উত্তম যে, জবাই অধ্যায় ও কুরবানি অধ্যায়ের মাসায়েলগুলো হাদীস ও আছার দ্বারা প্রমাণিত। তদ্রূপ কারাহিয়াহ অধ্যায়ের বেশির ভাগ মাসআলা হাদীস ও আছার দ্বারা প্রমাণিত। আর এ সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে হিদায়ার লেখক জবাই ও কুরবানি অধ্যায়ের পর কারাহিয়াহ -এর অধ্যায় যুক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এ অধ্যায়ের শিরোনাম বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্নভাবে এসেছে। যেমন, জামিউস সাগীর ও শরহুত ত্বাহাবী গ্রন্থে এ অধ্যায়ের শিরোনাম كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ রয়েছে। আর আমাদের মুসান্নিফ (র.) এ ক্ষেত্রে এ শিরোনামটিকে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে নূরুল ঈযাহ ও মুখতাসারুল কুদূরী গ্রন্থের শিরোনাম হচ্ছে– كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ। ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও মুখতাসারে কারখী গ্রন্থে এ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে– اَلتَّتِمَّةُ وَالتُّحْفَةُ। মুহীত (اَلْمُحِيْطُ), যাখীরাহ (اَلذَّخِيْرَةُ) ও আল কাফী (اَلْكَافِيْ) কিতাবে এর শিরোনাম হচ্ছে– اَلْاِسْتِحْسَانُ। কেউ কেউ তাদের কিতাবে এ অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন– كِتَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ।

উল্লেখ্য যে, এ অধ্যায়ের শিরোনাম হিসেবে اَلْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ শব্দদ্বয়কে ওলামায়ে কেরাম উত্তম মনে করেন। কারণ حَظْر শব্দের অর্থ হচ্ছে নিষেধ বা নিষিদ্ধ, আর اَلْإِبَاحَةُ শব্দের অর্থ হচ্ছে বৈধ। যেহেতু উভয় ধরনের মাসায়েল এ অধ্যায়ে বিদ্যমান তাই এর শিরোনাম اَلْحَظْرُ وَالْإِبَاحَةُ হওয়াই অধিক সমীচীন। পক্ষান্তরে যারা اِسْتِحْسَانٌ বলে নামকরণ করেছেন তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাকরূহ বিষয়গুলোর অবগতির মাধ্যমে তারা শরিয়তের সর্বোত্তম বিষয়গুলোর উপর আমল চালু করবে। কিংবা এ অধ্যায়ের বিষয় সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে প্রচলিত হয়েছে।

আর اَلزُّهْدُ وَالْوَرَعُ বলে নামকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ অধ্যায়ের অনেক মাসআলা এমন রয়েছে যা শরিয়তের দলিলে বৈধ হলে তাকওয়া অর্জনের জন্য সেগুলোকে অর্জন করাই সমীচীন।

প্রকাশ থাকে যে, اَلْكَرَاهِيَةُ শব্দটি فَعَالِيَةٌ -এর ওযনে মাসদার। كَرَاهِيَة শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে এমন বস্তু বা বিষয় যা কাম্য নয়। اَلْمِيْزَانُ গ্রন্থে এর অর্থ লিখা হয়েছে– اَلْكَرَاهِيَةُ ضِدُّ الْمَحَبَّةِ وَالرِّضٰى 'কারাহিয়াহ অর্থ পছন্দ ও প্রিয় না হওয়া।' এ শব্দের ব্যবহার পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে– عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ الخ

অর্থাৎ 'তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটি বিষয় পছন্দসই নয় অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।'

মোটকথা مَكْرُوْه শব্দের অর্থ হচ্ছে মোস্তাহাব না হওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, মাকরূহ হওয়ার অর্থ ইরাদা (اِرَادَه) -এর বিপরীত নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুফর ও গুনাহের প্রতি অসন্তুষ্ট (كَارِهْ) কিন্তু গুনাহ ও কুফর তাঁর ইরাদার বিপরীত নয়; বরং কুফর ও গুনাহ তাঁর مَشِيَّةٌ -এর বিপরীত।

পক্ষান্তরে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে কারাহাত আল্লাহ তা'আলার ইরাদার পরিপন্থি।

قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَكَلَّمُوْا فِىْ مَعْنَى الْمَكْرُوْهِ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) نَصًّا اَنَّ كُلَّ مَكْرُوْهٍ حَرَامٌ اِلَّا اَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيْهِ نَصًّا قَاطِعًا لَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ لَفْظُ الْحَرَامِ وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) اَنَّهُ اِلَى الْحَرَامِ اَقْرَبُ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلٰى فُصُوْلٍ مِنْهَا فِى الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ ـ

অনুবাদ : হিদায়ার মুসান্নিফ [আল্লামা বুরহান উদ্দীন আলী ইবনে আবূ বকর] রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ফকীহগণ مَكْرُوْه শব্দের অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন মত বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে স্পষ্টত: বর্ণিত আছে যে, মাকরূহ হচ্ছে হারাম। তবে যে মাসআলায় বা বিধানাবলিতে অকাট্য দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না তাতে হারাম শব্দটি প্রয়োগ করা হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মাকরূহ হারামের কাছাকাছি। এ সংক্রান্ত কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। একটি অনুচ্ছেদ পানাহার সম্পর্কে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَكَلَّمُوْا الخ : উল্লিখিত ইবারতে গ্রন্থকার (র.) উক্ত অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় তথা اَلْكَرَاهِيَةُ শব্দের তাহকীক করেছেন। হিদায়ার লেখক শায়খ বুরহান উদ্দীন (র.) বলেন, اَلْكَرَاهِيَةُ শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য কি হবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তার সবিস্তার আলোচনা করা হলো–

১. একদল আলিম মনে করেন, এর অর্থ হচ্ছে– مَا يَكُوْنُ تَرْكُهُ اَوْلٰى مِنْ تَحْصِيْلِهٖ অর্থাৎ, যে কাজ করার চেয়ে বর্জন করা উত্তম।'

২. কেউ কেউ বলেন– مَا يَكُوْنُ الْاَوْلٰى اَنْ لَا يَفْعَلَهُ অর্থাৎ 'যা না করা উত্তম।'

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক মাকরূহ-ই হারাম। তবে যদি কোনো মাসআলায় সুস্পষ্ট দলিল না পাওয়া যায় তাহলে সেটির ব্যাপারে হারাম শব্দটি প্রয়োগ করা হয় না। আর যে মাসআলায় সুস্পষ্ট কোনো দলিল নেই সে মাসআলার হুকুম বৈধ হলে তাকে لَا بَأْسَ بِهٖ এবং বৈধ না হলে তাকে মাকরূহ বলে সম্বোধন করা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে– اِنَّهُ اِلَى الْحَرَامِ اَقْرَبُ অর্থাৎ 'মাকরূহ হারামের নিকটবর্তী।'

ইমাম তাজুশ্ শারী'আহ (র.) বলেন, এটি একটি বিরল বর্ণনা। কেননা মাব্সূত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি যখন কোনো বিষয়ে اَكْرَهُهُ বলেন– তখন এর দ্বারা কি উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে? উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, হারাম।

তদ্রূপ اَلْمُحِيْطُ গ্রন্থে বর্ণিত আছে– اَلْكَرَاهِيَةُ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ يُرَادُ بِهَا التَّحْرِيْمُ অর্থাৎ 'كَرَاهِيَةٌ শব্দটি সাধারণভাবে বলা হলে এর দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য হয়।' اَلْحَقَائِقُ গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর একটি উদ্ধৃতি রয়েছে যে, মাকরূহ এর সাথে [হালালের চেয়ে] হারামের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। –[সূত্র বিনায়া]

قَوْلُهُ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلٰى فُصُوْلٍ الخ : লেখক বলেন, اَلْكَرَاهِيَةُ নামক অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম অনুচ্ছেদ হলো পানাহার সম্পর্কিত।

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَكْرَهُ لُحُوْمَ الْأُتُنِ وَأَلْبَانُهَا وَأَبْوَالُ الْإِبِلِ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ وَتَأْوِيْلُ قَوْلِ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا لِلتَّدَاوِيْ وَقَدْ بَيَّنَّا هٰذِهِ الْجُمْلَةَ فِيْمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّلٰوةِ وَالذَّبَائِحِ فَلَا نُعِيْدُهَا وَاللَّبَنُ مُتَوَلِّدٌ مِنَ اللَّحْمِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, গাধীর গোশ্ত এবং তার দুধ ও উটের পেশাব [খাওয়া ও পান করা] মাকরূহ। অন্যদিকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উটের পেশাব [পান করাতে] কোনো সমস্যা নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর উক্তির ব্যাখ্যা হচ্ছে, উটের পেশাব চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পান করাতে কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা সালাত ও জবাই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে তা পুনরায় আলোচনা করলাম না। আর দুধ তৈরি হয় গোশ্ত থেকে তাই তা গোশ্তের হুকুম রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَكْرَهُ لُحُوْمَ الْأُتُنِ الخ : আলোচ্য ইবারতে গাধা ও গাধীর গোশ্ত, গাধীর দুধ ও উটের দুধের হুকুম আলোচনা করা হয়েছে।

হিদায়ার মুসান্নিফ শায়খ বুরহান উদ্দীন (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, গাধীর গোশ্ত খাওয়া এবং এর দুধ পান করা উভয়ই মাকরূহ। তদ্রূপ তাঁর মতে উটের পেশাব পান করা মাকরূহ।

ইবারতে اَلْأُتُنُ শব্দটি أَتَانٌ -এর বহুবচন। অর্থ– গাধী।

প্রশ্ন. এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে আর তা হচ্ছে এই যে, সব ধরনের গাধার গোশতই তো মাকরূহ। তবে লেখক কর্তৃক গাধী বা মাদীকে খাস করার যৌক্তিকতা কি?

এর উত্তর হলো মুসান্নিফ (র.) اَلْبَانُهَا কে আত্ফ করবেন বলে أُتُنٌ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কেননা দুধ তো কেবল গাধী থেকেই হয়ে থাকে।

উত্তর. এ প্রসঙ্গে আল্লামা আইনী (র.) ইমাম আওযায়ী (র.) -এর উদ্ধৃতি নকল করেন, ইমাম আওযায়ী ও বিশ্র আল মুরাইসী (র.) বলেন, গৃহপালিত গাধার গোশ্ত হারাম। আমরা জবাই অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যে, যখন কোনো প্রাণীর গোশ্ত হারাম সাব্যস্ত হয় তখন তার দুধ হারাম হওয়া প্রমাণ হয়। কারণ দুধ গোশ্ত থেকেই তৈরি হয়।

আর ফখরুল ইসলাম বাযদুভী (র.) জামিউস্ সাগীরের ভাষ্যগ্রন্থে লিখেন, "আমাদের ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যদি গাধা জবাই করা হয় তাহলে তার গোশ্ত পাক হয়ে যাবে; কিন্তু তা খাওয়া যাবে না। কিন্তু এর চর্বি দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে কিনা এ ব্যাপারে অবশ্য আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর গোশ্ত খাওয়া যেমন হালাল নয়, তদ্রূপ উপকৃত হওয়া হালাল হবে না। অন্যরা বলেন, এর চর্বি দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে।"

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উটের পেশাব পান করা মাকরূহে তাহরীমী। পক্ষান্তরে সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতে উটের পেশাব পান করাতে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের স্বপক্ষে দলিল হলো, যে কোনো পেশাব পান করা হারাম– উটের পেশাবও এর মধ্যে শামিল। অবশিষ্ট রইল উটের পেশাবের ব্যাপারে যে হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ উরাইনাহ সম্প্রদায়ের কতিপয় লোককে উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলেছিলেন তা দ্বারা উটের পেশাব পবিত্র এ কথা প্রমাণ করা যায় না। কেননা তাদের রোগের আরোগ্যতা যে পেশাবের মধ্যে ছিল তা রাসূল ﷺ ওহী মারফত অবগত হয়েছিলেন। সুতরাং উটের পেশাব সংক্রান্ত রাসূল ﷺ -এর বাণী সেই উটগুলোর সাথে খাস বলে ধরে নেওয়া হবে। সেগুলো ব্যতীত অন্যসব উট এবং অন্য সকল প্রাণীর পেশাব নাপাক বলে সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ تَاوِيْلُ قَوْلِ اَبِى يُوْسُفَ الخ : এ ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত যে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত থেকে ভিন্ন তা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উটের পেশাব চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা জায়েজ, সাধারণ প্রয়োজনে সচরাচর পান করা হালাল নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) সাধারণভাবে একে হালাল বলেন। তাদের উভয়ের দলিল হলো উরাইনাহ সম্প্রদায়ের লোকদের উটের পেশাব পান করার নির্দেশ সংক্রান্ত রাসূল ﷺ -এর হাদীস।

অতঃপর লেখক বলেন, এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা সালাত তথা তাহারাত অধ্যায় ও জবাই অধ্যায়ে আমরা দলিল-প্রমাণসহ আলোচনা করে এসেছি। সুতরাং এখানে দ্বিতীয় বার উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি না। উল্লেখ্য যে, জবাইকৃত গাধার গোশ্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, এর গোশত খাওয়া হালাল নয়। আর দুধ যেহেতু গোশ্ত থেকে উৎপন্ন হয় তাই দুধ পান করাও হারাম হবে।

قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ الْاَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْاِدِّهَانُ وَالتَّطَيُّبُ فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ اِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ وَاُتِىَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بِشَرَابٍ فِىْ اِنَاءِ فِضَّةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِذَا ثَبَتَ هٰذَا فِى الشُّرْبِ فَكَذَا فِى الْاِدِّهَانِ وَنَحْوِهٖ لِاَنَّهٗ فِىْ مَعْنَاهُ وَلِاَنَّهٗ تَشَبُّهٌ بِزِىِّ الْمُشْرِكِيْنَ وَتَنَعُّمٌ بِتَنَعُّمِ الْمُتْرَفِيْنَ وَالْمُسْرِفِيْنَ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পুরুষ ও মহিলা তাদের কারো জন্য স্বর্ণ ও রুপার পাত্রে পানাহার করা এবং এগুলোকে তেল ও সুগন্ধির পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা জায়েজ নেই। কেননা যে সোনা-রুপার পাত্রে পানি পান করে তার সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন– সে তার পেটে দোজখের আগুন ভরবে।' [তাছাড়া] একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর কাছে রুপার পাত্রে পানীয় আনা হয়েছিল। তিনি সে পাত্রটি গ্রহণ না করে বললেন, রাসূল ﷺ এটি ব্যবহার করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। যখন পান করার ব্যাপারে নিষেধ প্রমাণিত হলো তখন তেল ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা এগুলোও পানপাত্র হিসেবে ব্যবহার করার মতো। অধিকন্তু এতে মুশরিক সম্প্রদায়ের রীতির সাথে সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয় এবং বিলাসী ও অপব্যয়কারীদের বিলাসী জীবনযাপন করা হয়, যা কোনো মুসলমানের জন্যে উচিত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَلَا يَجُوْزُ الْاَكْلُ وَالشُّرْبُ الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক সোনা ও রুপার পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। লেখক ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারত নকল করে বলেন যে, সোন ও রুপার পাত্রে পানাহার করা নাজায়েজ এবং এসব পাত্রে তেল ও সুগন্ধি ব্যবহারও নাজায়েজ। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। হাদীসটি সনদসহ নিম্নরূপ–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ فِضَّةٍ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ ـ (اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ)

'বুখারী ও মুসলিম উভয়ে তাদের কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রুপার পাত্রে পানি পান করবে সে তার পেটে দোজখের আগুন ভরবে।'

হাদীসটি ইমাম মুসলিম নিম্নোক্ত শব্দেও বর্ণনা করেছেন– مَنْ شَرِبَ فِىْ اِنَاءِ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ এবং اَلَّذِىْ يَاْكُلُ وَيَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ –[সূত্র বিনায়া]

মোটকথা, উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বর্ণ ও রুপার পাত্রে পানি পান করা হারাম।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বিষয়টির অবৈধতা প্রমাণে যে হাদীসটি পেশ করেন তা হলো এই- إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ فِضَّةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . এ হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন- لَمْ أَجِدْهُ অর্থাৎ 'আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে এমন হাদীস পাইনি।' তিনি বলেন- إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّحِيْحِ عَنْ حُذَيْفَةَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 'এটি সহীহ বর্ণনায় হুযায়ফা থেকে বর্ণিত।' -[সূত্র দিরায়া / টীকা]

আল্লামা যাইলাঈ (র.) হাদীসটি সম্পর্কে বলেন- غَرِيْبٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ তিনি বলেন-

هُوَ فِي الْكُتُبِ السُّنَّةِ عَنْ حُذَيْفَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلٰى قَالَ اِسْتَسْقٰى حُذَيْفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ .

'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণিত নয়; বরং সিহাহ সিত্তার ছয় কিতাবে আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (র.) সূত্রে হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একদা জনৈক মাজূসী তথা অগ্নিপূজারীর কাছে পানি চাইলেন, মাজূসী তাঁকে রুপার পাত্রে পানি দিল। তিনি বললেন, আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা রেশমি পোশাক পরিধান করো না, স্বর্ণ ও রুপার পাত্রে পানি পান করো না এবং সেসব পাত্রে খাবার খেয়ো না। কেননা এগুলো তাদের জন্য [কাফেরদের জন্য] দুনিয়ার জীবনে আর তোমাদের জন্য তা আখেরাতে তথা বেহেশতে দেওয়া হবে।'

মোটকথা, উপরিউক্ত হাদীস দুটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সোনা-রুপার পাত্রে পানাহার করা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ هٰذَا فِي الشُّرْبِ الخ : লেখক বলেন, যখন উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা পান করার ক্ষেত্রে সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধতা প্রমাণ হলো তখন তেল ও সুগন্ধি ব্যবহারও এসব পাত্রে করা নাজায়েজ সাব্যস্ত হবে। কারণ পানপাত্রের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ব্যবহারের নিষিদ্ধতা যে কারণে অর্থাৎ বিলাসিতা সে কারণ তো তৈল ও সুগন্ধির পাত্রের মধ্যেও বিদ্যমান। তাছাড়া স্বর্ণ ও রূপার পাত্র ব্যবহার হারাম তা যেভাবেই হোক না কেন ? হারাম ও অবৈধতার হুকুম পাত্রভেদে ভিন্ন হবে না।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِزِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ الخ : লেখক বলেন, উক্ত পাত্র ব্যবহার হারাম হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো এতে কাফের সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করা হয় এবং বিলাসী ও অপব্যয়কারীদের ভোগ-বিলাসের মতো আচরণ করা হয়। আর এরূপ ব্যক্তিদের জীবনাচারের সাথে সাদৃশ্য শরিয়তে চরমভাবে নিষিদ্ধ। এসব ব্যক্তিদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে- كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ '[কাফেররা] দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত ছিল।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا 'তোমরা তোমাদের সুখ-শান্তি পার্থিব জীবনেই শেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদের অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে।'

স্পষ্টতই এসব আয়াত দ্বারা ভোগ-বিলাসের জীবনের নিন্দা করা হয়েছে এবং সে জীবন পরিহার করতে মু'মিনদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَقَالَ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ يَكْرَهُ وَمُرَادُهُ التَّحْرِيْمُ وَيَسْتَوِى فِيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ لِعُمُوْمِ النَّهْيِ وَكَذٰلِكَ الْاَكْلُ بِمِلْعَقَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْاِكْتِحَالُ بِمَيْلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذٰلِكَ مَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ كَالْمُكْحَلَةِ وَالْمِرْآةِ وَغَيْرِهِمَا لِمَا ذَكَرْنَا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস্ সাগীর গ্রন্থে [স্বর্ণ ও রুপার পাত্র ব্যবহার সম্পর্কে] বলেছেন, এগুলোর ব্যবহার মাকরূহ। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাহরীমী। আর এসব ব্যবহারের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ সকলেই সমান। কেননা এ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্রূপ সোনা-রুপার চামচ দ্বারা খাওয়া মাকরূহ এবং সোনা-রুপার কাঠি দ্বারা সুরমা লাগানো মাকরূহ। তাছাড়া এ জাতীয় যা কিছু আছে যেমন সুরমাদানি, আয়না ইত্যাদি সবকিছু ব্যবহার করা মাকরূহে তাহরীমী হবে আমাদের পূর্ববর্ণিত দলিলের ভিত্তিতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ الخ : আলোচ্য ইবারতে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) সোনা-রুপার তৈজসপত্রের ব্যবহারের হুকুম আলোচনা করছেন। ইমাম কুদূরী এগুলোর হুকুম সম্পর্কে বলেছেন, لَا يَجُوْزُ [জায়েজ নেই]। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে لَا يَجُوْزُ -এর পরিবর্তে يَكْرَهُ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর ইবারত নিম্নরূপ–

قَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوْبَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْاَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْاِدِّهَانَ فِى اٰنِيَةِ الذَّهَبِ ـ

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, مُرَادُهُ اَىْ مُحَمَّدٌ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর يَكْرَهُ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মাকরূহে তাহরীমী। কেননা এসব পাত্র ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَسْتَوِىْ فِيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الخ : লেখক বলেন, নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এসব পাত্র পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা যেমন মাকরূহে তাহরীমী, তদ্রূপ মহিলাদের জন্য ব্যবহার করাও মাকরূহে তাহরীমী।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ الْاَكْلُ بِمِلْعَقَةِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, সোনা-রুপানির্মিত চামচ দ্বারা খানা খাওয়া এবং সোনা-রুপার শলা/কাঠি দ্বারা সুরমা লাগানোও মাকরূহে তাহরীমী। এমনিভাবে সোনা-রুপার তৈরি সুরমাদানি ও আয়না ব্যবহার করাও মাকরূহে তাহরীমী। যেহেতু এ সকল পাত্র ব্যবহার্য এবং অন্য যে কোনো ধাতবের তৈরি পাত্র দ্বারা মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় তাই এসব পাত্র সোন-রুপার দ্বারা তৈরি করা এবং তা ব্যবহার করা অপচয় ও অপব্যয়ের শামিল। এজন্য এগুলো ব্যবহার করা শরিয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য বিলাসী সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা হয়, তাই এসব পাত্র ব্যবহার শরিয়তে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য যে, ফাতাওয়ায়ে শামীর বর্ণনা মতে সোনা-রুপার কলম, দোয়াত, দস্তরখান, বদনা, অজুর পাত্র আংটি ইত্যাদি সবকিছুই ব্যবহার করা মাকরূহে তাহরীমী।

পুনশ্চ যদি কেউ সোনা-রুপার পাত্র থেকে মাথায় তৈল ঢালে তাহলে তা নাজায়েজ। পক্ষান্তরে যদি কেউ সোনা অথবা রুপার পাত্রে হাত দিয়ে তা থেকে তৈল উঠায় তাহলে তা মাকরূহ হবে না।

তদ্রূপ যদি কেউ স্বর্ণের তৈরি পাত্র থেকে তরকারি উঠিয়ে তা রুটি দিয়ে খায় তাহলে তা মাকরূহ হবে না। অবশ্য ফাতাওয়ায়ে শামীতে এরূপ মাসআলা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, যদিও মাসআলাগতভাবে এসব সুরত জায়েজ কিন্তু এ ব্যাপারে ফতোয়া দেওয়া হবে না যাতে সোনা-রুপা ব্যবহারের দ্বার উন্মুক্ত না হয়। –[ফাতাওয়ায়ে শামী]

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ اٰنِيَةِ الرَّصَاصِ وَالزُّجَاجِ وَالْبِلَّوْرِ وَالْعَقِيْقِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَكْرَهُ لِاَنَّهُ فِيْ مَعْنَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِى التَّفَاخُرِ بِهِ قُلْنَا لَيْسَ كَذٰلِكَ لِاَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِمُ التَّفَاخُرُ بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সীসা, কাচ, স্ফটিক ও আকীক পাথরের তৈরি পাত্র ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এসব পাত্র ব্যবহার করা মাকরূহ। কেননা উপরিউক্ত ধাতুর তৈরি পাত্র অহংকারের বস্তু হিসেবে সোনা-রুপার সমগোত্রীয়। আমরা বলি আসলে বিষয়টি এমন নয়। কেননা সোনা-রুপা ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে গর্ব করা মুশরিক [ও বিলাসী] সম্প্রদায়ের স্বভাব ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ الخ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরী (র.)-এর উক্তি নকল করে বলেন যে, ইমাম কুদূরী (র.) বলেন– সীসা, কাঁচ, স্ফটিক ও আকীক পাথরের তৈরি পাত্র ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। এটা আহনাফের সব ইমামের মত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে এসব বস্তু দ্বারা তৈরি পাত্র ব্যবহার করা মাকরূহ। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হলো, এসব দ্রব্য মূল্যের দিক থেকে সোনা-রুপার কাছাকাছি। সোনা-রুপার ব্যবহারে যেরূপ বিলাসিতা ও অহংকার প্রকাশ পায় তদ্রূপ এসবের ব্যবহারেও অহংবোধ ও বিলাসিতা প্রকাশ পায়। তাই এগুলো সোনা-রুপার সমগোত্রীয় বলে সাব্যস্ত হবে। এর জবাবে আহনাফের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) যা বলেছেন তা ঠিক নয়। কেননা মুশরিক, কাফের ও বিলাসীদের মধ্যেও এসব দ্রব্যের তৈরি পাত্র নিয়ে গর্ব করার রীতি ছিল না। আর যে কোনো বস্তুর আসল হলো মুবাহ হওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا
'তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন।'
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ
'হে নবী আপনি বলুন! কে হারাম করল আল্লাহর সুন্দর বস্তুসমূহ যা মানুষের কল্যাণের জন্য উদ্ভাবন করেছেন।'
আয়াত দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট সব বস্তুই মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা ব্যবহার মানুষের জন্য হালাল। অবশ্য যদি কোনো খাস বস্তুর ব্যাপারে হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তার ব্যবহার নাজায়েজ হবে বৈকি?

قَالَ : وَيَجُوزُ الشُّرْبُ فِى الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَالرُّكُوبُ فِى السَّرْجِ الْمُفَضَّضِ وَالْجُلُوْسُ عَلَى الْكُرْسِىِّ الْمُفَضَّضِ وَالسَّرِيْرِ الْمُفَضَّضِ اِذَا كَانَ يَتَّقِىْ مَوْضِعَ الْفِضَّةِ وَمَعْنَاهُ يَتَّقِىْ مَوْضِعَ الْفَمِ وَقِيْلَ هٰذَا وَمَوْضِعُ الْيَدِ فِى الْاَخْذِ وَفِى السَّرِيْرِ وَالسَّرْجِ مَوْضِعُ الْجُلُوْسِ ـ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَكْرَهُ ذٰلِكَ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) يُرْوٰى مَعَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَيُرْوٰى مَعَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الْاِنَاءُ الْمُضَبَّبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْكُرْسِىُّ الْمُضَبَّبُ بِهِمَا وَكَذَا اِذَا جُعِلَ ذٰلِكَ فِى السَّيْفِ وَالْمِشْحَذِ وَحَلْقَةِ الْمِرْآةِ اَوْ جُعِلَ الْمُصْحَفُ مُذَهَّبًا اَوْ مُفَضَّضًا وَكَذَا الْاِخْتِلَافُ فِى اللِّجَامِ وَالرِّكَابِ وَالثَّفْرِ اِذَا كَانَ مُفَضَّضًا وَكَذَا الثَّوْبُ فِيْهِ كِتَابَةٌ بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ عَلٰى هٰذَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে রুপার নিকেল করা পাত্র দ্বারা কোনো কিছু পান করা বৈধ। তদ্রূপ রুপা লাগানো গদিতে আরোহণ করা, রুপা লাগানো চেয়ারে ও চৌকিতে বসা বৈধ। যদি রুপা লাগানো স্থানকে ব্যবহারের সময় পরিহার করতে পারে। অর্থাৎ পান করার সময় যদি ঐ স্থানে মুখ না লাগে। কেউ কেউ বলেন, পান করার সময় যদি রুপাযুক্ত স্থানে মুখ না লাগে এবং ধরার সময় হাত যদি রুপাযুক্ত স্থানে লাগে তাহলে ব্যবহার বৈধ। তদ্রূপ যদি খাট ও গদিতে বসার স্থানটিতে রুপা সংযুক্তি পরিহার করতে পারে তাহলে তা ব্যবহার করা বৈধ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এগুলোর ব্যবহার মাকরূহ, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত এক বর্ণনা মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সাথে। অন্য বর্ণনায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে পাওয়া যায়। একই মতবিরোধ পাওয়া যায় স্বর্ণ ও রুপার পাত মোড়ানো পাত্র ও চেয়ারের ক্ষেত্রে। তদ্রূপ তরবারি, শান দেওয়ার পাথর, আয়নার বৃত্ত ও কুরআন মাজীদ যদি স্বর্ণ বা রুপা মোড়ানো হয় তাহলে তাতে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ মতানৈক্য লাগাম, পাদানী ও লেজবন্ধনীর ক্ষেত্রেও যদি তা রুপার পাতযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে কাপড়ে যদি স্বর্ণ কিংবা রুপার দ্বারা কোনো কিছু লিখা হয় তা ব্যবহারের ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجُوزُ الشُّرْبُ فِى الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে রুপার নিকেল করা পাত্রের মধ্যে পানি বা পানি জাতীয় কোনো তরল পদার্থ পান করা জায়েজ। এমনিভাবে রূপার পাতযুক্ত গদিতে আরোহণ করা এবং রুপার পাতযুক্ত চেয়ার ও খাটে বসা জায়েজ যদি বসার সময় রুপাযুক্ত স্থানকে পরিহার করা সম্ভব হয়।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, يَتَّقِيْ مَوْضِعَ الْفِضَّةِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পানপাত্রের যে স্থানে মুখ লাগানো হয় সে স্থানটি যদি রুপাযুক্ত না থাকে এবং যে স্থানটি হাত দ্বারা ধরবে সেটিতে রুপা লাগানো না থাকে। অর্থাৎ ব্যবহারের স্থানটুকু রুপামুক্ত থাকলে এর ব্যবহার মাকরূহ হবে না।

তদ্রূপ যদি গদি ও খাটে রূপা লাগানো হয় এবং বসার ও শোয়ার সময় রুপা লাগানো জায়গাকে পরিহার করা যায় তাহলে তা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَكْرَهُ الخ : আলোচ্য ইবারতে পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এতে পূর্বের মাসআলাগুলোর অনুরূপ আরো কতিপয় মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, রুপার নিকেল করা কিংবা রুপাযুক্ত যে কোনো পাত্র ব্যবহার করা মাকরূহ।

এ মাসআলাগুলোতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দুটি মত পাওয়া যায়। প্রথম অভিমত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে অর্থাৎ এসব পাত্র বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহার করা জায়েজ। দ্বিতীয় অভিমত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর সাথে অর্থাৎ এসব পাত্র কোনোক্রমেই ব্যবহার করা বৈধ নয়।

ইমাম আল ইস্তিজাবী (র.)-এর মতে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সাথে, পক্ষান্তরে আবূ আমের আল আমেরী (র.) -এর মতে তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর সাথে।

হিদায়ার টীকায় এ মাসআলাগুলো সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) অভিমত সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, আবূ জাফর আদ্ দাওয়ানিকী এর মজলিসে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সমসাময়িক যুগের কতিপয় ইমাম বসাছিলেন। এমতাবস্থায় এ মাসআলা আলোচনায় আসল। উপস্থিত আলেমগণ মাকরূহ হওয়ার পক্ষে তাদের অভিমত ব্যক্ত করলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রথমত মন্তব্য করা হতে বিরত রইলেন। তখন কোনো একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল– এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? উত্তরে তিনি বললেন, যদি রুপাযুক্তস্থানে মুখ লাগায় তাহলে মাকরূহ হবে। অন্যথায় নয়। এতদশ্রবণে এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল; আপনার দলিল কি? তিনি বললেন, আপনার হাতে আংটি থাকা অবস্থায় যদি আপনি অঞ্জলি ভরে পানি পান করেন তাহলে তাতে কোনো সমস্যা হয় না, তাহলে রুপাযুক্ত স্থানে মুখ না লাগিয়ে পানি পান করলে তা বৈধ হবে না কেন? তাঁর এ উত্তর শুনে উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম আর কোনো জবাব দিলেন না। আর আবূ জাফরও মুগ্ধ হলেন।

মোটকথা আলোচ্য মাসআলায় হানাফী ইমামগণের মাঝে যে মতবিরোধ হয়েছে তা এ জাতীয় আরো বিভিন্ন মাসআলাতে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন– সোনা ও রুপার পাতযুক্ত পাত্র এবং চেয়ার ব্যবহার করা শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ হবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে তা জায়েজ হবে না।

অনুরূপভাবে তরবারি, শান দেওয়ার পাথর, আয়নার চার পাশের বৃত্ত ও কুরআনের গিলাফ ইত্যাদিতে যদি সোনা-রুপার পাত লাগানো হয় তাহলে তাতে অনুরূপ মতবিরোধ বিদ্যমান।

তদ্রূপ যদি লাগাম, পাদানি, লেজবন্ধনী রৌপ্য খচিত হয় তাহলেও তা ব্যবহার করা যাবে কিনা তাতে মতবিরোধ রয়েছে। সোনা-রুপার তৈরি জরি দ্বারা যদি কেউ কাপড়ে নকশা করে তাহলে তা ব্যবহার করার ব্যাপারে অনুরূপ মতবিরোধ রয়েছে।

টীকা : উপরিউক্ত মাসআলায় যদি পাত্রগুলোতে রুপার বদলে সোনা লাগানো হয় তাহলেও একই হুকুম হবে। আলোচ্য মাসআলার উদ্দেশ্য হচ্ছে রুপা ও সোনা যেন সরাসরি ব্যবহারে না আসে; বরং এগুলো অন্য ধাতবের অধীন হয়। যদি তা হয় তাহলে বলা যাবে যে, সে সরাসরি সোনা ও রুপা ব্যবহার করেনি।

وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ فِيْمَا يُخَلَّصُ فَامَّا التَّمْوِيْهُ الَّذِيْ لَا يُخَلَّصُ فَلَا بَأْسَ بِهٖ بِالْاِجْمَاعِ لَهُمَا اَنَّ مُسْتَعْمَلَ جُزْءٍ مِنَ الْاِنَاءِ مُسْتَعْمَلُ جَمِيْعِ الْاَجْزَاءِ فَيُكْرَهُ كَمَا اِذَا اسْتُعْمِلَ مَوْضِعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ ذٰلِكَ تَابِعٌ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالتَّوَابِعِ فَلَا يُكْرَهُ كَالْجُبَّةِ الْمَكْفُوْفَةِ بِالْحَرِيْرِ وَالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ وَمِسْمَارِ الذَّهَبِ فِي الْفَصِّ .

অনুবাদ : [হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন,] তাদের মাঝে এ মতবিরোধ ঐ সোনা-রুপার ব্যাপারে যা মূল বস্তু থেকে পৃথক করা যায়। পক্ষান্তরে যদি কোনো বস্তুতে স্বর্ণ-রুপা গলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয় যা পৃথক করা সম্ভব নয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে উক্ত দ্রব্যাদি ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, কোনো পাত্রের একাংশ ব্যবহার করার মানে হলো পুরো পাত্র ব্যবহার করা। সুতরাং এগুলো [অর্থাৎ সোনা-রূপার তৈরি পাত্র ব্যবহার করা যেমন মাকরূহ তদ্রূপ এর অংশবিশেষ ব্যবহার করাও] মাকরূহ হবে। যেমন– রুপাযুক্ত স্থান ব্যবহার করা মাকরূহ হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, উপরে বর্ণিত পাত্রসমূহের সাথে সংযুক্ত সোনা-রুপা পাত্রসমূহের অনুগামী বা সংশ্লিষ্ট। সংশ্লিষ্ট বিষয় শরিয়তে ধর্তব্য হয় না। যেমন রেশমের ঝলরযুক্ত জুব্বা, কাপড়ে সোনা-রুপার নকশা ও আংটির পাথরের উপর সোনার কীলক [ব্যবহার করা জায়েজ]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ فِيْمَا يُخَلَّصُ الخ : চলমান ইবারতে মুসান্নিফ (র.) পূর্ববর্ণিত মাসআলার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং ইখতিলাফের সুরত ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, সোনা-রুপার অংশবিশেষের সংযুক্তি দ্বারা পাত্র ব্যবহার জায়েজ বা নাজায়েজ তখনই হবে বা এ মাসআলায় মতবিরোধ তখনই হবে যখন সোনা ও রুপাকে মূল পাত্র থেকে পৃথক করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে যদি সোনা কিংবা রুপা এমনভাবে মূল বস্তুর সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় যা পৃথক করা সম্ভব নয়, তাহলে এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, সেই পাত্রসমূহ ব্যবহার করা যাবে।

প্রথম সুরতে সাহেবাইন (র.)-এর মতে, এরূপ পাত্র ব্যবহার করা নাজায়েজ। তাঁদের দলিল হলো, কোনো পাত্রের অংশবিশেষ ব্যবহার করা এবং পূর্ণপাত্র ব্যবহার করার মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। সুতরাং কোনো পাত্রের কিয়দংশ যদি [সোনা-রুপা দ্বারা আবৃত থাকে তাহলে সেই পাত্র ব্যবহার করা মাকরূহ হবে, যেমন সম্পূর্ণ সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার করা মাকরূহ।

তাঁরা বলেন, কোনো পাত্রের সোনা-রুপা দ্বারা আবৃত অংশ ব্যবহার করা সকলের মতে নাজায়েজ। অতএব পাত্রের সোনা-রূপা লাগানো পাত্র ব্যবহার ও নাজায়েজ হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, কোনো পাত্রে সোনা-রূপা যুক্ত থাকলে তা অনুগামী বা তাবে' বলে গণ্য হয়। যে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে শরিয়তে মূল বিষয়ের ধর্তব্য হয় অনুগামী বা তাবে এর ধর্তব্য হয় না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় উল্লিখিত বস্তুসমূহ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে সোনা-রুপা যেহেতু তাবে' বা সংশ্লিষ্ট তাই অনুগামী বিষয়ের ধর্তব্য হবে না; বরং বস্তুসমূহের ব্যবহার জায়েজ সাব্যস্ত হবে। তাছাড়া এ ধরনের বস্তুসমূহের ব্যবহার শরিয়তে বৈধ হওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। যেমন– রেশম বা সিল্কের ঝালরযুক্ত জুব্বা ও জামা ব্যবহার করা বৈধ। তদ্রূপ কাপড়ের মধ্যে যদি সোনা-রুপার কিংবা রেশমের নকশা বা কারুকাজ থাকে তাও ব্যবহার করা জায়েজ। অনুরূপভাবে আংটির পাথরে যদি স্বর্ণের কীলক থাকে তা ব্যবহার করাতে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নেই।

মোটকথা সামান্য পরিমাণ তথা কোনো বস্তুর অনুগামী হিসেবে যদি সোনা-রুপার ব্যবহার করা হয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে বৈধ। এরূপ সামান্য পরিমাণ হারাম বস্তু ব্যবহারের বৈধতা শরিয়তে অনুমোদিত, যার উদাহরণ ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

قَالَ : وَمَنْ أَرْسَلَ أَجِيرًا لَهُ مَجُوسِيًّا أَوْ خَادِمًا فَاشْتَرَى لَحْمًا فَقَالَ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ وَسِعَهُ أَكْلُهُ لِأَنَّ قَوْلَ الْكَافِرِ مَقْبُولٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ صَحِيحٌ لِصُدُوْرِهِ عَنْ عَقْلٍ وَ دِيْنٍ يَعْتَقِدُ فِيْهِ حُرْمَةَ الْكِذْبِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى قَبُوْلِهِ لِكَثْرَةِ وُقُوْعِ الْمُعَامَلَاتِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, যদি কোনো মুসলমান তার অগ্নিপূজারী কর্মচারী কিংবা খাদেমকে [গোশ্ত ক্রয় করার জন্য বাজারে] প্রেরণ করে। অতঃপর সে গোশ্ত ক্রয় করে নিয়ে আসে এবং বলে যে, আমি গোশ্ত ইহুদি বা খ্রিস্টান কিংবা মুসলমান থেকে ক্রয় করেছি, তাহলে উক্ত মুসলমানের জন্য গোশ্ত খাওয়া জায়েজ। কেননা মু'আমালাত তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে কাফেরের কথা গ্রহণযোগ্য। অধিকন্তু এটি একটি সত্য সংবাদ। কেননা তা জানা গেছে এমন ব্যক্তি থেকে যার বিবেক আছে এবং এমন ধর্মও আছে যাতে মিথ্যা বলা হারাম বলে বিশ্বাস করা হয়। এরূপ সংবাদ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা লেনদেনের ঘটনা মানব জীবনে খুব বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ أَرْسَلَ أَجِيْرًا لَهُ مَجُوْسِيًّا أَوْ خَادِمًا الخ : আলোচ্য ইবারতে লেখক ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর জামিউস সাগীর-এর একটি মাসআলা আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু মুসলমানদের জন্য হালাল। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি তার অগ্নিপূজক গোলাম কর্মচারী কিংবা খাদেমকে বাজারে গোশ্ত ক্রয় করার জন্য পাঠায়, অতঃপর সেই খাদেম বা কর্মচারী তার জন্য গোশ্ত ক্রয় করে এবং বলে যে, আমি মুসলমান কসাই কিংবা ইহুদি কসাই অথবা খ্রিস্টান কসাই থেকে তা ক্রয় করেছি, তাহলে তার মুসলিম মনিবের জন্য সেই গোশত খাওয়া মাকরূহ নয়। কেননা উক্ত অগ্নিপূজক গোলাম ইহুদি, খ্রিস্টান কিংবা মুসলমান থেকে ক্রয় করা সংক্রান্ত যে সংবাদ দিয়েছে তা একটি মু'আমালা। এটি মূলত হালাল বা হারাম হওয়া সংক্রান্ত খবর নয়– যার মধ্যে ধর্মীয় দিকটি প্রাধান্য পাবে। পক্ষান্তরে যেহেতু মু'আমালার ক্ষেত্রে কাফেরের সংবাদ গ্রহণযোগ্য– সে হিসেবে উক্ত কাফের গোলামের এ খবর গ্রহণযোগ্য হবে। অধিকন্তু এ সংবাদটি এমন ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পেয়েছে, যার বিবেক সুস্থ এবং যে এমন দীন বিশ্বাস করে যাতে মিথ্যা বলা হারাম ও নিষিদ্ধ। মুসলমানদের কাছে যদিও সেই কাফেরের দীন গ্রহণযোগ্য নয় এবং ধর্ম বলারও উপযুক্ত নয়, তবুও একথা তো অবশ্যই সত্য যে, সে একটি দীনের সাথে সম্পৃক্ত– যাতে মিথ্যা বলা পাপ বলে গণ্য হয়ে থাকে। তাছাড়া মিথ্যা বলা তো সব ধর্মেই হারাম।

মোটকথা আলোচ্য গোলাম একজন অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তার ধর্মে মিথ্যা বলা হারাম হওয়ার কারণে তাকে তার সংবাদের ব্যাপারে সত্যবাদী ধরে নেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى قَبُوْلِهِ الخ : লেখক বলেন, উক্ত কাফেরের সংবাদ সত্য বলে ধরে নেওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, লেনদেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপকভাবে ঘটতে থাকে। যদি এতে কাফেরের সংবাদ গ্রহণ না করা হয় তাহলে এতে এক ধরনের সংকীর্ণতা দেখা দেবে। এজন্য শরিয়ত মু'আমালাতের ক্ষেত্রে কাফেরদের বক্তব্য সত্য বলে গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে।

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ ذَبِيحَةُ غَيْرِ الْكِتَابِيِّ وَالْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ لَمَّا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الْحِلِّ أَوْلٰى أَنْ يُقْبَلَ فِي الْحُرْمَةِ قَالَ : وَيَجُوْزُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ قَوْلُ الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ وَالصَّبِيِّ لِأَنَّ الْهَدَايَا تُبْعَثُ عَادَةً عَلٰى أَيْدِيْ هٰؤُلَاءِ وَكَذَا لَا يُمْكِنُهُمْ إِسْتِصْحَابُ الشُّهُوْدِ عَلَى الْإِذْنِ عِنْدَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْمُبَايَعَةِ فِي السُّوْقِ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ يُؤَدِّيْ إِلَى الْحَرَجِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ إِذَا قَالَتْ جَارِيَةٌ لِرَجُلٍ بَعَثَنِيْ مَوْلَايَ إِلَيْكَ هَدِيَّةً وَسِعَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا أَخْبَرَتْ بِإِهْدَاءِ الْمَوْلٰى غَيْرَهَا أَوْ نَفْسَهَا لِمَا قُلْنَا .

অনুবাদ : আর যদি বিষয়টি [উপরে বর্ণিত অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ] এমন না হয় তাহলে তার [মনিবের] জন্য গোশ্‌ত খাওয়া জায়েজ হবে না। এর ব্যাখ্যা হলো, যদি পশুটি কিতাবী বা মুসলমান কর্তৃক জবাই হয়নি এমন সংবাদ গোলাম প্রদান করে [তাহলেও তা গ্রহণ করা হবে] কেননা, যখন ইতঃপূর্বে হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা হয়েছে তখন হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হাদিয়া ও অনুমতি [প্রাপ্তির সংবাদ প্রদান] -এর ব্যাপারে দাস-দাসী ও শিশুর কথা গ্রহণ করা জায়েজ। কারণ সাধারণভাবে হাদিয়া এদের হাত দিয়ে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া সফর করার সময় কিংবা বাজারে বেচাকেনার সময় অনুমতির উপর সাক্ষী রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং যদি তাদের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তা এক ধরনের সংকট সৃষ্টি করবে। জামিউস্ সাগীর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, "যখন কোনো দাসী কোনো ব্যক্তিকে বলে আমার মনিব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন হাদিয়া স্বরূপ; তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। কেননা মনিব কর্তৃক দাসী ব্যতীত অন্য কাউকে হাদিয়া করার সংবাদ দেওয়া এবং দাসীকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়ার সংবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ لَمْ يَسَعْهُ الخ : আলোচ্য ইবারত পূর্বের মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত। পূর্বে বলা হয়েছিল যে, যদি কোনো কাফের গোলাম এই সংবাদ দেয় যে, গোশ্‌ত কোনো মুসলমান কিংবা আহলে কিতাবের জবাইকৃত তাহলে সেই গোশ্‌ত মুসলমান মনিবের জন্য খাওয়া বৈধ। আলোচ্য ইবারতে বলা হয়েছে যে, যদি সেই কাফের গোলাম এই সংবাদ দেয় যে, জবাইকৃত পশুটি মুসলমান কিংবা কিতাবী দ্বারা জবাই করা হয়নি তাহলে তার জন্য সেই গোশ্‌ত খাওয়া জায়েজ হবে না। কারণ, ইতঃপূর্বে সেই গোলামের সংবাদ হালাল হওয়ার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছে। হালাল হওয়ার ব্যাপারেই যেহেতু তার উক্তি গ্রহণযোগ্য, তাহলে হারাম হওয়ার ব্যাপারে তার উক্তি গ্রহণ না করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফের আলোচ্য ইবারত দ্বারা এ সন্দেহ হতে পারে হালাল ও হারামের ভিত্তিতে তিনি কাফের গোলামের কথা বিবেচনা করছেন, অথচ হালাল ও হারাম তো দীনি বিষয়। আর দীনি বিষয়ে কাফেরের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

এরূপ সন্দেহের প্রতি উত্তরে বলা যায় যে, আলোচ্য বিধানে হারাম ও হালাল হওয়ার বিষয়টি মুখ্য নয়; বরং হালাল কিংবা হারাম হওয়ার বিষয়টি এখানে গৌণ, এখানে লেনদেনের ব্যাপারে কাফেরের সংবাদ মূল বিষয়। অর্থাৎ এখানে এ সংবাদটি মূল যে, আমি গোশ্ত কোনো মুসলমান বা আহলে কিতাব কিংবা কোনো অগ্নিপূজক থেকে ক্রয় করেছি। এখানে গোশত হালাল কিংবা হারাম এ সংবাদটি মূল নয়। কেননা যদি তা হতো তাহলে কাফেরদের কথা দীনি বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হয় না বিধায় এখানে কাফেরের সংবাদ অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতো।

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْهَدِيَّةِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হাদিয়া এবং অনুমতি প্রাপ্তির ব্যাপারে দাস-দাসী এবং শিশুর কথা গ্রহণযোগ্য। আলোচ্য ইবারতের সূরতে মাসআলা হলো, কোনো ছোট নাবালেগ শিশু অথবা দাস-দাসী যদি অন্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলে যে, আমার পিতা বা আমার মনিব আমাকে এ হাদিয়া দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, অথবা কোনো দোকানদারের কাছে গিয়ে বলল, আমার পিতা বা আমার মনিব এ বস্তুটি ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন তাহলে শিশু বা দাস-দাসীর উক্ত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কারণ মানুষের সাধারণ রীতি এই যে, হাদিয়া শিশু বা দাস-দাসীর মাধ্যমে অন্যের কাছে প্রেরণ করে। এমনিভাবে কোনো কিছু ক্রয়বিক্রয় করার জন্য এমনিতে অনুমতি দিয়ে শিশু বা দাস-দাসীকে পাঠানো হয়। কেননা অনুমতি প্রদান করেছে একথা সাক্ষীসহ প্রেরণ করা এক জটিল কাজ। এমনিভাবে হাদিয়ার সাথে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করাও কঠিন কাজ। যদি অনুমতির কথা জানানো এবং হাদিয়া করার সাথে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক হয় তাহলে এর দ্বারা সাধারণ লেনদেনে এক ধরনের সমস্যা বা সংকট সৃষ্টি হবে, যা সাধারণের জন্যে খুবই কঠিন হবে। অথচ শরিয়তের মাঝে কোনো সংকট নেই। তাই শিশু ও দাস-দাসীর কথা গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা হবে।

এরপর লেখক আলোচ্য মাসআলার সমর্থনে জামিউস সাগীর -এর একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, যদি কোনো দাসী কোনো লোকের কাছে গিয়ে বলে, আমার মনিব আমাকে আপনার কাছে হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য উক্ত দাসীকে গ্রহণ করা বৈধ হবে। কেননা মালিক কর্তৃক অন্য বস্তু হাদিয়া করার সংবাদ দেওয়া এবং নিজেকে হাদিয়া করার সংবাদ দেওয়ার মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। উক্ত হাদিয়া কবুল হওয়ার কারণ হলো হাদিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মালিক সব সময় উপস্থিত থাকতে পারে না; বরং এ দাস-দাসীর মাধ্যমেও হাদিয়া করা হয়। যদি এ পদ্ধতির হাদিয়া গ্রহণ না করা হয় তাহলে সংকট সৃষ্টি হবে অথচ শরিয়তে সংকট রহিত করা হয়েছে।

قَالَ : وَيُقْبَلُ فِى الْمُعَامَلَاتِ قَوْلُ الْفَاسِقِ وَلَا يُقْبَلُ فِى الدِّيَانَاتِ اِلَّا قَوْلُ الْعَدْلِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ الْمُعَامَلَاتِ يَكْثُرُ وُجُوْدُهَا فِيْمَا بَيْنَ اَجْنَاسٍ فَلَوْ شَرَطْنَا شَرْطًا زَائِدًا يُؤَدِّى اِلَى الْحَرَجِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ فِيْهَا عَدْلًا كَانَ اَوْ فَاسِقًا كَافِرًا كَانَ اَوْ مُسْلِمًا عَبْدًا كَانَ اَوْ حُرًّا ذَكَرًا كَانَ اَوْ اُنْثٰى دَفْعًا لِلْحَرَجِ اَمَّا الدِّيَانَاتُ لَا يَكْثُرُ وُقُوْعُهَا حَسْبَ وُقُوْعِ الْمُعَامَلَاتِ فَجَازَ اَنْ يُشْتَرَطَ فِيْهَا زِيَادَةُ شَرْطٍ فَلَا يُقْبَلُ فِيْهَا اِلَّا قَوْلُ الْمُسْلِمِ الْعَدْلِ لِاَنَّ الْفَاسِقَ مُتَّهَمٌ وَالْكَافِرَ لَا يَلْتَزِمُ الْحُكْمَ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُلْزِمَ الْمُسْلِمَ بِخِلَافِ الْمُعَامَلَاتِ لِاَنَّ الْكَافِرَ لَا يُمْكِنُهُ الْمَقَامُ فِىْ دِيَارِنَا اِلَّا بِالْمُعَامَلَةِ وَلَا يَتَهَيَّأُ لَهُ الْمُعَامَلَةُ اِلَّا بَعْدَ قَبُوْلِ قَوْلِهِ فِيْهَا فَكَانَ فِيْهِ ضَرُوْرَةٌ فَيُقْبَلُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মু'আমালাতের ক্ষেত্রে ফাসিকের কথা গ্রহণযোগ্য হয় কিন্তু দীনি বিষয়ে শুধুমাত্র ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হয়। এ দু-অবস্থার মাঝে মাসআলার পার্থক্যের কারণ এই যে, মু'আমালাত বিভিন্ন ধরনের মানুষের মাঝে অধিক হারে সংঘটিত হয়। সুতরাং যদি আমরা এতে কোনো অতিরিক্ত শর্ত জুড়ে দেই তাহলে তা সমস্যা সৃষ্টি করবে। সুতরাং সমস্যা দূরীকরণার্থে এতে এক ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে চাই সে ন্যায়পরায়ণ হোক অথবা ফাসিক হোক, মুসলমান হোক অথবা কাফের হোক, গোলাম হোক অথবা আজাদ হোক, পুরুষ হোক কিংবা মহিলা। আর দীনি বিষয় মু'আমালাতের তুলনায় এত অধিক হারে সংঘটিত হয় না। সুতরাং এতে অতিরিক্ত শর্তারোপ করা জায়েজ। আর তাই এতে মুসলমান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা মুসলমান ফাসিক তো সন্দেহযুক্ত, আর কাফের তো নিজের জন্য ইসলামি বিধানকে মেনে নেয়নি। সুতরাং মুসলমানদের উপর ইসলামি বিধান আরোপ করার ক্ষেত্রে তার কোনো অধিকার নেই। পক্ষান্তরে মু'আমালাতের বিষয়টি এমন নয়, কেননা মুসলমানদের সাথে মু'আমালা [লেনদেন] করা ব্যতীত কাফেরদের আমাদের [মুসলমানদের] দেশে থাকা সম্ভব নয়। আর কাফেরের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া ব্যতীত তার পক্ষে লেনদেন করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রয়োজনের খাতিরে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيُقْبَلُ فِى الْمُعَامَلَاتِ الخ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য ইবারতে লেনদেন, কাজকারবার এবং দীনি বিষয়ে কাদের কথা গ্রহণযোগ্য এবং কাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থকার ইমাম কুদূরী (র.) -এর উদ্ধৃত মাসআলার আলোকে বলেন, মু'আমালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে ফাসিক ও দীনদার সকলের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে দীনি বিষয়ে শুধুমাত্র ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

অতঃপর হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) দু-মাসআলার মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন যে, লেনদেন বিভিন্ন ধরনের মানুষের মাঝে অধিক হারে সংঘটিত হয়। যদি এতে কোনো বিশেষ শর্তারোপ করা হয়, যেমন– এতে কেবল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে অন্যদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না তাহলে এতে সংকট সৃষ্টি হবে। সুতরাং লেনদেনের ক্ষেত্রে সব ধরনের লোকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ লেনদেনের ক্ষেত্রে ফাসিক, ন্যায়পরায়ণ, কাফের, মুসলমান, গোলাম-আজাদ, নারী-পুরুষ সর্বস্তরের লোকজনের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

পক্ষান্তরে দীনি বা ধর্মীয় বিষয় লেনদেনের তুলনায় অধিক হারে সংঘটিত হয় না। সুতরাং এতে অতিরিক্ত শর্তারোপ করার দ্বারা এতে সংকট সৃষ্টি হবে না। যেহেতু এতে অতিরিক্ত শর্তারোপের দ্বারা সংকট হবে না তাই শরিয়ত এতে শুধুমাত্র একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমানের কথাকে গ্রহণ করে; ফাসিক কিংবা অমুসলমানের কথা এতে গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা ফাসিক হলো সন্দেহযুক্ত বা অভিযুক্ত ব্যক্তি। আর ফাসিক কবীরা গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়। সুতরাং তার মিথ্যা কথায় লিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়। আর কাফের তো নিজে ইসলামি বিধিবিধান ও অনুশাসন মেনে নেয়নি। সুতরাং কাফেরের পক্ষে যা নিজে মেনে নেয়নি তা অন্য মুসলমানের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারও নেই।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُعَامَلَاتِ الخ : লেখক বলেন, লেনদেন ও পারস্পরিক পণ্যের আদান-প্রদানের বিষয়টি দীনি বিষয়ের ব্যতিক্রম। অর্থাৎ লেনদেনের ক্ষেত্রে কাফের ও ফাসিকদের কথা গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ কাফেরদের পক্ষে আমাদের দেশে অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রে লেনদেন করা ব্যতীত বসবাস করা সম্ভব নয়। কাফের তার নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য আবশ্যিকভাবে লেনদেন করতে বাধ্য। আর কাফেরের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া ব্যতিরেকে তার পক্ষে কোনো লেনদেন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং যেহেতু ইসলাম কাফেরদেরকে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেছে তাই লেনদেনের ক্ষেত্রে কাফেরদের কথা গ্রহণ করা প্রয়োজন। উক্ত প্রয়োজন পূরণার্থে ইসলাম লেনেদেনের ক্ষেত্রে কাফেরদের কথা গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। যেহেতু একই বিষয় ফাসিকদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় তাই তাদের কথাও লেনদেনের বেলায় গ্রহণযোগ্য হবে।

বি. দ্র. دِيَانَاتٌ শব্দটি دِيَانَةٌ -এর বহুবচন। دِيَانَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন বিষয় যা দ্বারা বান্দা আল্লাহর আনুগত্য সংবলিত হুকুম পালন করতে সক্ষম হয়। এর বিভিন্ন সুরত রয়েছে–

১. একজন নির্ভরযোগ্য মুসলমান পানি নাপাক হওয়ার সংবাদ দিল তাহলে অন্য সকলের জন্য সেই পানি দ্বারা অজু করার সুযোগ থাকবে না। আর যদি সে অনির্ভরযোগ্য হয় কিন্তু শ্রোতার নিকট তার সংবাদ সত্য বলে মনে হয় তাহলে উত্তম হবে সেই পানি থেকে বেঁচে থাকা, যদিও পানি দ্বারা অজু করলে তা জায়েজ হবে।

২. এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করল। অতঃপর তাদেরকে এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সংবাদ দিল যে, তাদের উভয়ের মাঝে দুগ্ধপানের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ তারা দুজন এক মহিলা থেকে দুধপান করার সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, যার কারণে তাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক নাজায়েজ। এ সংবাদের ভিত্তিতে যদিও তাদের বিবাহ নষ্ট হবে না। কারণ রাযা'আত প্রমাণিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে দুজনের সাক্ষ্য প্রয়োজন, তবুও এ সংবাদের পর মহিলাকে তালাক দিয়ে বিবাহ বাতিল করা উত্তম।

এ দুটি উদাহরণ দেওয়ার পর "বিনায়া" গ্রন্থের গ্রন্থকার (র.) দীনি খবরকে চারভাগে ভাগ করে তার হুকুম বর্ণনা করেন। প্রথম প্রকার হচ্ছে শরিয়তের বিধিবিধানসমূহ যা দীনের শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা। এটি আবার দু-ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. **ইবাদাত :** এতে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট, তবে এ সাক্ষীর ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তার স্মৃতিশক্তি সঠিক এবং সে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

২. **বান্দার হক :** দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে বান্দার হকের সাথে সম্পর্কিত সংবাদ। বান্দার হকের সাথে সম্পর্কিত সংবাদ আবার তিন প্রকার। যথা–

১. বান্দার ঐ সকল হক যাতে শুধুমাত্র ইলযাম [অর্থাৎ অন্যের হকে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ] রয়েছে। এসব হক শুধুমাত্র একজনের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হবে না; বরং এ সংক্রান্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে– ১. সাক্ষ্যদাতা একাধিক হতে হবে। ২. তারা ন্যায়পরায়ণ তথা আদেল হতে হবে। ৩. সাক্ষ্যদানের যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। ৪. شهادة শব্দ বলে সংবাদ দিতে হবে। – এ প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে ঈদুল ফিত্‌রের চাঁদ দেখা সংক্রান্ত সাক্ষ্য প্রদান। আরো উদাহরণ হচ্ছে– রাযা'আত প্রমাণিত হওয়া সংক্রান্ত সংবাদ যার দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়ে যায়। এ সংবাদ গ্রহণ করার ভিত্তিতে বান্দার মালিকানা অর্থাৎ উপভোগ করার স্বত্ব বা অধিকার রহিত হয়ে যায়।

আর প্রথম প্রকার তথা ইবাদতের উদাহরণ হচ্ছে– ক. রমজানের রোজার চাঁদ দেখা সংক্রান্ত সংবাদ। খ. পানি পাক বা নাপাক হওয়া সংক্রান্ত সংবাদ। গ. খাবার-পানীয় হালাল বা হারাম হওয়া সংক্রান্ত সংবাদ। এ সংবাদের দ্বারা মালিকানা দূরীভূত হয় না।

২. হুকূকুল ইবাদ এর দ্বিতীয় প্রকার এমন সংবাদ যাতে কারো উপর ইলযাম করা হয় না। যেমন– মুযারাআতের উকিল নিয়োগ সংক্রান্ত সংবাদ, গোলামকে বেচাকেনা করার আদেশ সংক্রান্ত সংবাদ। এ জাতীয় সংবাদ যে কোনো এক ব্যক্তি থেকে পাওয়া গেলেই তা গ্রহণযোগ্য হবে। চাই সে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হোক অথবা ফাসিক হোক, মুসলমান হোক কিংবা কাফের হোক।

৩. তৃতীয় প্রকার সংবাদ যাতে এক ধরনের ইলযাম রয়েছে, আবার এতে ইলযাম নেই একথাও বলা যায়। যেমন– উকিলকে বরখাস্ত করা এবং গোলামের বেচাকেনার অনুমতি প্রত্যাহার সংক্রান্ত সংবাদ দেওয়া। এতে এভাবে ইলযাম রয়েছে যে, বরখাস্ত করার পর যে লেনদেন করবে তার জিম্মাদার উকিল হবে। তদ্রূপ গোলাম থেকে অনুমতি প্রত্যাহার করার পর সে যে চুক্তিগুলো করবে সেগুলো ফাসিদ বলে সাব্যস্ত হবে। আবার এ দুটি বিষয় ইলযামহীন এ কথাও বলা চলে। তা এভাবে যে, মালিক ও মুআক্কিল দুজনেই তাদের স্বীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে মাত্র।

উল্লেখ্য যে, দীনি বিষয়সমূহে কাফেরদের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য হওয়ার অর্থ সাধারণ দীনি বিষয় বা উল্লিখিত চার প্রকারের প্রথম প্রকার। এতে অন্য প্রকারগুলো উদ্দেশ্য নয়।

وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَسْتُوْرِ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيْهَا جَرْيًا عَلٰى مَذْهَبِهِ اَنَّهُ يَجُوْزُ الْقَضَاءُ بِهِ وَفِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ هُوَ وَالْفَاسِقُ سَوَاءٌ حَتّٰى يُعْتَبَرَ فِيْهِمَا اَكْبَرُ الرَّأْيِ قَالَ : وَيُقْبَلُ فِيْهَا قَوْلُ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالْاَمَةِ اِذَا كَانُوْا عُدُوْلًا لِاَنَّ عِنْدَ الْعَدَالَةِ الصِّدْقُ رَاجِحٌ وَالْقَبُوْلُ لِرُجْحَانِهِ فَمِنَ الْمُعَامَلَاتِ مَا ذَكَرْنَا وَمِنْهَا التَّوْكِيْلُ وَمِنَ الدِّيَانَاتِ الْاِخْبَارُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ حَتّٰى اِذَا اَخْبَرَهُ مُسْلِمٌ مَرْضِيٌّ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ وَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ فَاسِقًا اَوْ مَسْتُوْرًا تَحَرّٰى فَاِنْ كَانَ اَكْبَرُ رَأْيِهِ اَنَّهُ صَادِقٌ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ وَاِنْ اَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ تَيَمَّمَ كَانَ اَحْوَطَ ـ

অনুবাদ : জাহেরী রেওয়ায়েত এর বর্ণনানুযায়ী অজ্ঞাত ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দীনি বিষয়ে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এটা ইমাম সাহেবের মাযহাবানুযায়ী ঠিক যে, অজ্ঞাত [যার ন্যায়পরায়ণ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট নয়] ব্যক্তির বিচার বা রায় গ্রহণযোগ্য হয়। আর জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী অজ্ঞাত ব্যক্তি এবং ফাসিক একই পর্যায়ের ফলে তাদের ব্যাপারে প্রবল ধারণায় গ্রহণযোগ্য হবে। [অর্থাৎ প্রবল ধারণা যদি তাদের কথা সত্য বলার ব্যাপারে হয় তাহলে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য - অন্যের নয়।] ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দীনি বিষয়ে গোলাম, বাঁদি ও স্বাধীন ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হয় যদি তারা ন্যায়পরায়ণ হোন। কেননা ন্যায়পরায়ণতা থাকা অবস্থায় কথা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর কারো কথা গ্রহণযোগ্য হয় সত্য হওয়ার প্রবল সম্ভাবনার ভিত্তিতে। আর মু'আমালাত ও লেনদেনের বিষয়ে তো আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। উকিল নিয়োগ করার বিষয়টি লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত। পানি নাপাক হওয়ার সংবাদ দীনি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি কোনো নির্ভরযোগ্য মুসলমান পানি নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সংবাদ দেয় তাহলে সেই পানি দ্বারা অজু করবে না; বরং তায়াম্মুম করবে। পক্ষান্তরে যদি সংবাদদাতা ফাসিক কিংবা অজ্ঞাত ব্যক্তি হয় তাহলে এ ব্যাপারে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেবে। যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সংবাদদাতা সত্যবাদী তাহলে তায়াম্মুম করবে এবং অজু করবে না। আর যদি পানি ব্যবহার করে তারপর তায়াম্মুম করে তাহলে তা হবে অধিক সর্তকতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَسْتُوْرِ الخ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, مَسْتُوْرُ الْحَالِ [অজ্ঞাত ব্যক্তি] -এর বক্তব্য জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। مَسْتُوْرُ الْحَالِ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার ন্যায়পরায়ণতা কিংবা ফাসেকী কোনো অবস্থায় মানুষের সামনে জানা থাকে না। জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী এমন ব্যক্তির সংবাদ দীনি বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা এরূপ পাওয়া যায় যে, এমন ব্যক্তির কথা দীনি বিষয়েও গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁর এ কথার ভিত্তি বিচারকার্যে অজ্ঞাত ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর মাযহাবের উপর। তাঁর মতে যার ন্যায়পরায়ণতা ও পাপাচার কোনো বিষয়ে জানা নেই এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা বিচারের রায় প্রদান করা যাবে।

ইমাম সাহেবের এ মাযহাব সম্পর্কে শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) তাঁর উসূলে উল্লেখ করেন যে, ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আ'যম (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, مَسْتُورُ الْحَالِ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত। এর দলিল হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তাছাড়া রাসূল ﷺ ও বর্ণনা করেন– اَلْمُسْلِمُوْنَ عُدُوْلٌ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ অর্থাৎ 'মুসলমানগণ পরস্পরের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ।'

অতঃপর তিনি বলেন, এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) অজ্ঞাত ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা বিচারের রায় প্রদানকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। তবে শর্ত হচ্ছে প্রতিপক্ষের লোকেরা যদি সেই সাক্ষীর ব্যাপারে আপত্তি না জানায়।

এরপর ইমাম সারাখসী (র.) এই বলে নিজ মন্তব্য পেশ করেন যে, বর্তমান যুগে জাহেরী রেওয়ায়েতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা বর্তমান যুগে মানুষের মাঝে পাপাচারের প্রতি ঝোঁক বেশি। সুতরাং যে পর্যন্ত তার ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণ না হবে তার বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না। –[বিনায়া]

قَوْلُهُ وَفِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, জাহেরী রেওয়ায়েতের মতে অজ্ঞাত ও ফাসিক ব্যক্তি সমপর্যায়ে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ফয়সালা করা হবে। অর্থাৎ যদি প্রবল ধারণা হয় যে, সে বা তারা সত্য বলছে তাহলে তাদের কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি এর বিপরীত প্রবল ধারণা হয় তাহলে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ وَيُقْبَلُ فِيْهَا قَوْلُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দীনি বিষয়ে স্বাধীন ব্যক্তির কথা যেমন গ্রহণযোগ্য হয় তদ্রূপ পরাধীন দাস-দাসীর কথাও তেমনি গ্রহণযোগ্য হয়। এ ব্যাপারে মূল শর্ত হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা। স্বাধীন, মুক্ত বা অন্য কিছু শর্ত নয়। সুতরাং দাস-দাসীর কথাও গ্রহণযোগ্য হবে যদি তারা ন্যায়পরায়ণ হয়। কেননা কারো মাঝে ন্যায়পরায়ণতা থাকলে তার সত্য কথা বলার সম্ভাবনা প্রবল এবং মিথ্যা কথা বলার সম্ভাবনা খুবই কম। অতএব দাস-দাসী ন্যায়পরায়ণ হলে তাদের কথা দীনি বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হবে। এরপর লেখক বলেন, কারো কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো প্রবল ধারণা [সুনিশ্চিত বিশ্বাস নয়]। প্রবল ধারণার ভিত্তিতে কথা সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। আবার প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই কথা মিথ্যা বলে ধরে নেওয়া হয়। কারণ অনেক সময় ন্যায়পরায়ণ বা সৎ ব্যক্তিরাও মিথ্যা কথা বলে। আবার কখনো মিথ্যুকরাও সত্য কথা বলে ফেলে।

قَوْلُهُ فَمِنَ الْمُعَامَلَاتِ مَا ذَكَرْنَا الخ : লেখক বলেন, মু'আমালাত বা লেনদেনের ব্যাপারে দাস-দাসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা আমরা আলোচনা করেছি। [লেনদেনের ক্ষেত্রে দাস-দাসী এমনকি কাফেরদের কথাও গ্রহণযোগ্য হয়।]

লেখক বলেন, কাউকে উকিল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া সংক্রান্ত সংবাদ লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এতেও দাস-দাসীর সংবাদ বা কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ مِنَ الدِّيَانَاتِ الخ : লেখক বলেন, "পানি নাপাক [অপবিত্র] হওয়া" সংক্রান্ত সংবাদ দীনি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ বিষয়ের সংবাদদাতা যদি ন্যায়পরায়ণ মুসলমান হয় তাহলে তার সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ সে যদি বলে, পানি অপবিত্র তাহলে সেই সংবাদ শোনার পর শ্রোতার জন্য উক্ত পানি ব্যবহার করা জায়েজ হবে না। সে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে। পক্ষান্তরে যদি সংবাদদাতা ফাসিক বা অজ্ঞাত ব্যক্তি হয় তাহলে তার সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং শ্রোতা এমতাবস্থায় তার প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বা কর্তব্য নির্ধারণ করবে। যদি শ্রোতার প্রবল ধারণা হয় যে, উক্ত ব্যক্তি সত্য বলেছে তাহলে তা সত্য বলে ধরে নেবে এবং সে অনুপাতে কাজ করবে। অর্থাৎ সেই পানি দ্বারা অজু করবে না; বরং তায়াম্মুম করবে। তবে উত্তম হচ্ছে সন্দেহযুক্ত উক্ত পানি ফেলে দিয়ে তায়াম্মুম করবে, তাহলে পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করা হলো না। আর যদি সংবাদ অসত্য বলে ধারণা হয় তাহলে উক্ত পানি দ্বারা অজু করবে।

وَمَعَ الْعَدَالَةِ يَسْقُطُ احْتِمَالُ الْكِذْبِ فَلَا مَعْنًى لِلْاِحْتِيَاطِ بِالْإِرَاقَةِ اَمَّا التَّحَرِّىْ فَمُجَرَّدُ ظَنٍّ وَلَوْ كَانَ اَكْبَرُ رَأْيِهِ اَنَّهُ كَاذِبٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْكِذْبِ بِالتَّحَرِّىْ وَهٰذَا جَوَابُ الْحُكْمِ فَاَمَّا فِى الْاِحْتِيَاطِ يَتَيَمَّمُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ لِمَا قُلْنَا وَمِنْهَا الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ زَوَالُ الْمِلْكِ وَفِيْهَا تَفَاصِيْلُ وَتَفْرِيْعَاتٌ ذَكَرْنَاهَا فِىْ كِفَايَةِ الْمُنْتَهِىْ.

অনুবাদ : সংবাদদাতার মাঝে ন্যায়পরায়ণতা থাকলে মিথ্যা সংবাদের সম্ভাবনা রহিত হয়ে যায়। সুতরাং [ন্যায়পরায়ণতা থাকা অবস্থায়] পানি ফেলে দিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। আর কারো ন্যায়পরায়ণ হওয়ার চিন্তা করা (تَحَرِّىْ) তো হচ্ছে নিছক ধারণামাত্র। [অর্থাৎ এটি নিশ্চিত ন্যায়পরায়ণতার পর্যায়ে নয়।] এমতাবস্থায় যদি শ্রোতার প্রবল ধারণা হয় যে, সংবাদদাতা মিথ্যাবাদী তাহলে [তার সংবাদের পর] পানি দ্বারা অজু করবে– তায়াম্মুম করবে না। কেননা এখানে শুধু ধারণার মাধ্যমে মিথ্যার সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে। অবশ্য এটি হচ্ছে বিধিগত কথা। আর সতর্কতা হচ্ছে অজু করার পর তায়াম্মুম করে নেওয়া। এর দলিল ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। হালাল ও হারাম হওয়া সংক্রান্ত সংবাদ দীনি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত– যদি এর দ্বারা কারো মালিকানা বদল না হয়। এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা ও শাখা-প্রশাখাগত মাসায়েল রয়েছে, যা আমরা কিফায়াতুল মুনতাহী নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَعَ الْعَدَالَةِ يَسْقُطُ احْتِمَالُ الخ : লেখক বলেন, যদি কোনো ন্যায়পরায়ণ সংবাদদাতা সংবাদ দেয় যে, পানি অপবিত্র। তাহলে উক্ত সংবাদের শ্রোতা অন্য কোনো পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে, তবে উক্ত পানি ফেলে দিয়ে তার সতর্কতা অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ ন্যায়পরায়ণতা এমন গুণ যা সংবাদদাতার মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনাকে রহিত করে। পক্ষান্তরে تَحَرِّىْ [কারো ব্যাপারে অনুমান] ন্যায়পরায়ণতার সমপর্যায়ে নয়; বরং تَحَرِّىْ হচ্ছে নিছক ধারণা বা অনুমান মাত্র। এজন্য কারো ব্যাপারে নেক ধারণা করা অবস্থায় পানি ফেলে দিয়ে সতর্কতামূলকভাবে তায়াম্মুম করতে বলা হয়েছিল। মোটকথা অজ্ঞাত ব্যক্তির সংবাদের ক্ষেত্রে পানি ফেলে দিয়ে তায়াম্মুম করার মধ্যে সর্তকতা ছিল। কিন্তু যখন নিশ্চিত কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সংবাদ দিল তখন তার সংবাদ মিথ্যা না হওয়ার প্রবল সম্ভাবনার কারণে তার খবরের ভিত্তিতে তায়াম্মুম করবে এবং সতর্কতামূলকভাবে পানি ফেলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ اَكْبَرُ رَأْيِهِ الخ : লেখক বলেন, যদি অজ্ঞাত ব্যক্তির সংবাদের ব্যাপারে প্রবল ধারণা এই হয় যে, এটা মিথ্যা। তাহলে সংবাদদাতার কথার প্রতি কর্ণপাত না করে উক্ত পানি দ্বারা অজু করবে এবং তায়াম্মুম পরিহার করবে। কেননা এক্ষেত্রে অনুমান বা ধারণায় সংবাদদাতার মিথ্যার সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا جَوَابُ الْحُكْمِ الخ : লেখক বলেন, আমাদের বর্ণিত মাসআলা তথা সংবাদদাতা মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রবল ধারণা হলে উক্ত পানি দ্বারা অজু করবে, তায়াম্মুম করবে না। এটা বাহ্যিক বিধান। তবে সতর্কতা হচ্ছে প্রথমে অজু করার পর তায়াম্মুম করবে। কারণ এখানেও তো অনুমান করা হয়েছে। আর অনুমান অকাট্য কোনো দলিল নয়।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, কোনো বস্তু হালাল ও হারাম হওয়ার সংবাদও দীনি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত হচ্ছে এমন সংবাদ দেওয়ার দ্বারা কারো মালিকানা রহিত হতে পারবে না। অর্থাৎ কোনো এক ব্যক্তি যদি কোনো বস্তু হালাল বা হারাম হওয়া সংক্রান্ত সংবাদ দেয়। যেমন বলল, এই খাবার হালাল বা এই পানীয় হারাম। আর যদি এ সংবাদ দেওয়ার দ্বারা কারো মালিকানা চলে যায় তাহলে এক ব্যক্তির এমন সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারো মালিকানা চলে যায় এমন সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দু-ব্যক্তির সাক্ষ্য কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য অপরিহার্য। যেমন– কোনো একজন পুরুষ অথবা কোনো একজন মহিলা এই মর্মে সংবাদ দিল যে, অমুক স্বামী-স্ত্রী একজন মহিলার দুধ পান করেছে। এমতাবস্থায় একজন পুরুষ বা মহিলার সংবাদ দ্বারা উক্ত স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বাতিল হবে না। কেননা এ সংবাদ দ্বারা স্বামীর স্ত্রীর উপর যে, مِلْكِ مُتْعَه রয়েছে তা রহিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এ সংবাদ দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সংবাদ ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَفِيْهَا تَفَاصِيْلُ وَتَفْرِيْعَاتُ ذَكَرْنَاهَا الخ : লেখক বলেন, দীনি বিষয়ে সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়া সংক্রান্ত প্রতিটি মাসআলায় বিস্তারিত আলোচনা ও মাসআলাগুলোর সাথে শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা রয়েছে। এর বিস্তারিত আলোচনা ও শাখা-প্রশাখাগত মাসআলাগুলো আমি كِفَايَةُ الْمُنْتَهِىْ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছি।

قَالَ : وَمَنْ دُعِىَ اِلٰى وَلِيْمَةٍ اَوْ طَعَامٍ فَوَجَدَ ثَمَّهُ لَعِبًا اَوْ غِنَاءً فَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَقْعُدَ وَيَاْكُلَ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) اُبْتُلِيْتُ بِهٰذَا مَرَّةً فَصَبَرْتُ وَهٰذَا لِاَنَّ اِجَابَةَ الدَّعْوَةِ سُنَّةٌ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ فَلَا يَتْرُكُهَا لِمَا اقْتَرَنَتْ بِهٖ مِنَ الْبِدْعَةِ مِنْ غَيْرِهٖ كَصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ وَاجِبَةُ الْاِقَامَةِ وَاِنْ حَضَرَتْهَا نِيَاحَةٌ فَاِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ مَنَعَهُمْ وَاِنْ لَمْ يَقْدِرْ يَصْبِرُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তিকে অলিমা [বৌভাত] কিংবা অন্যকোনো ভোজনের দাওয়াত দেওয়া হয়। অতঃপর সে সেখানে [যাওয়ার পর তাতে] ক্রীড়া-কৌতুক অথবা গানবাজনার আয়োজনও দেখতে পায় তাহলে তার জন্য সেখানে বসা ও খাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আমি একবার এমন পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। অতঃপর আমি ধৈর্যধারণ করেছি। এর কারণ হলো, দাওয়াত কবুল করা সুন্নত। রাসূল ﷺ বলেছেন–'যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না সে রাসূলের নাফরমানি করল।' সুতরাং দাওয়াত কবুল করাকে বর্জন করবে না অন্য কোনো বিদ'আত তার সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে। যেমন জানাজার নামাজ কায়েম করা জরুরি যদিও জানাজার মধ্যে বিলাপকারীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। অবশ্য যদি গানবাজনায় বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তাহলে বাধা দেবে। যদি বাধা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে তাহলে ধৈর্যধারণ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ دُعِىَ اِلٰى وَلِيْمَةٍ اَوْ طَعَامٍ الخ : আলোচ্য অংশে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) জামিউস সাগীরের একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন।

মাসআলা : কাউকে অলিমার [বৌভাতের] অথবা অন্য কোনো ভোজনের দাওয়াত দেওয়া হলো। আর উক্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দাওয়াতে শরিক হওয়ার পর দেখতে পেল যে, সেখানে খাবারের সাথে গানবাজনা কিংবা শরিয়ত বিরোধী ক্রীড়া-কৌতুক চলছে। এমতাবস্থায় তার পক্ষে সে মজলিসে বসা এবং খাওয়া জায়েজ আছে।

এ প্রসঙ্গে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর একটি উক্তি নকল করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, আমি একবার এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। অর্থাৎ খাবারের দাওয়াতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে গমন করার পর দেখি সেখানে শরিয়ত বিরোধী ক্রীড়া-কৌতুক ও গানবাজনা চলছে। এমতাবস্থায় আমি সেখানে ধৈর্যধারণ করেছি।

অতঃপর হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলার দলিল বয়ান করেছেন এই বলে যে, এমনটি করাই উচিত। কারণ দাওয়াত কবুল করা সুন্নত। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করল না সে আবুল কাসিম তথা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাফরমানি করল।'

এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, দাওয়াত কবুল করা সুন্নত এবং তা কবুল করা না হলে রাসূল ﷺ -এর সুন্নতের লঙ্ঘন হবে।

উল্লেখ্য যে, অলিমা ও অন্যান্য দাওয়াত ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে কবুল করা সুন্নত। ইমাম আহমদ (র.) ও ইমাম মালেক (র.) -এর অভিমতও এক বর্ণনানুসারে এরূপই।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতানুসারে অলিমার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব, আর অন্যান্য দাওয়াত কবুল করা মোস্তাহাব। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেক (র.) -এর মতও তাই। অন্য বর্ণনা অনুসারে অলিমা ছাড়া অন্যান্য দাওয়াত কবুল করা আহনাফের মতে মোস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতও তাই। আর ইমাম মালেক ও আহমদ (র.) -এর মতানুযায়ী জায়েজ– মোস্তাহাবও নয়। –[সূত্র বিনায়া]

ইবারতে উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা :

مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ . এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর মুসলিম শরীফে 'নিকাহ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সনদসহ মূল হাদীসটি উদ্ধৃত করা হলো–

عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَيَاضٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ .

হাদীসটি এভাবে মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে। আর ইমাম তিরমিযী (র.) ছাড়া অন্যরা হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর উক্তি হিসেবে নকল করেন। সেই রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করা হলো–

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ .

উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইবনে মাজাহ নিকাহ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ اَلْأَطْعِمَةُ অধ্যায়ে এবং ইমাম নাসায়ী اَلْوَلِيْمَةُ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা দাওয়াত কবুল করা সুন্নত হওয়া প্রমাণ হয়। কেননা হাদীস দুটিতে দাওয়াত কবুল না করাকে রাসূল ﷺ -এর নাফরমানি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সুতরাং দাওয়াত কবুল করতে গিয়ে যদি কোনো বিদ'আত বা গুনাহে লিপ্ত হতেও হয় তবুও তা ছাড়বে না। অবশ্য নিজে সেসব গানবাজনা বা ক্রীড়াকৌতুকে অংশগ্রহণ করবে না।

আলোচ্য মাসআলাটি জানাজার নামাজের মতো। জানাজার নামাজ আদায় করা জরুরি। যদি জানাজাকে কেন্দ্র করে কিছু লোক বিলাপ ও আহাজারিতে লিপ্ত হয় [যা মূলত হারাম] তবুও জানাজার নামাজ পরিত্যাগ করা যাবে না।

মোটকথা জানাজার নামাজে যেমন গুনাহের উপস্থিতি সত্ত্বেও পরিত্যাগ করা চলে না, তদ্রূপ দাওয়াতের মাঝে গুনাহের আয়োজন থাকলেও দাওয়াত ছাড়া ঠিক হবে না।

قَوْلُهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ الخ : লেখক বলেন, যদি দাওয়াতে অংশগ্রহণকারী মেহমানের পক্ষে দাওয়াতে চলমান গানবাজনা বা শরিয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তাহলে তিনি অবশ্যই তাতে বাধা দেবেন। বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে তিনি চুপ করে থাকবেন না।

আর যদি দাওয়াতি মেহমানের উক্ত শরিয়ত বিরোধী কাজে বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা না থাকে তাহলে তিনি কোনো প্রতিবাদ না করে দাওয়াতে শরিক হবেন। তবে নিজে সতর্কভাবে গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

وَهٰذَا اِذَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدًى فَاِنْ كَانَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلٰى مَنْعِهِمْ يَخْرُجُ وَلَا يَقْعُدُ لِاَنَّ فِيْ ذٰلِكَ شَيْنَ الدِّيْنِ وَفَتْحَ بَابِ الْمَعْصِيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُحْكٰى عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فِى الْكِتَابِ كَانَ قَبْلَ اَنْ يَصِيْرَ مُقْتَدًى .

অনুবাদ : উপরিউক্ত হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন দাওয়াতি মেহমান অনুসরণীয় ব্যক্তি (مقتدى) না হবেন। যদি তিনি অনুসরণীয় ব্যক্তি হন এবং এসব গুনাহের কাজে বাধা দিতে সক্ষম না হন তাহলে তিনি মজলিস থেকে বের হয়ে যাবেন। তিনি সেই দাওয়াতের মজলিসে বসবেন না। কেননা এতে করে [অর্থাৎ অনুসরণীয় ব্যক্তির এ ধরনের গুনাহের মজলিসে অংশগ্রহণের দ্বারা] দীনের অমর্যাদা করা হয় এবং মুসলমানদের মাঝে গুনাহের দরজা খুলে দেওয়া হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত বিষয়টির ব্যাপার এই যে, এটা তাঁর অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে উপনীত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذَا اِذَا لَمْ يَكُنْ الخ : আলোচ্য ইবারতে পূর্বের মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাতে গানবাজনা কিংবা অন্য কোনো শরিয়ত বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে তাহলে বাধা দেওয়ার শক্তি থাকলে বাধা দেবে, অন্যথায় প্রতিবাদ না করে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করবে। আর আলোচ্য ইবারতে বলা হচ্ছে যে, পূর্ববর্ণিত এ হুকুম সাধারণ লোকদের জন্য। দীনি বা ধর্মীয় ব্যাপারে যিনি সকলের অনুসরণীয় তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। দীনি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ব্যক্তি এরূপ পরিবেশে প্রতিবাদ না করে ধৈর্যধারণ করে দাওয়াতের মজলিসে শরিক হবেন না।

যদি বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তাহলে তিনি বাধা দেবেন। আর যদি বাধা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে; বরং মজলিসে গুনাহের প্রতি মানুষের সমর্থন বেশি হয় এবং বাধা দিতে গিয়ে ফিতনার ভয় হয় তাহলে তিনি দাওয়াতের মজলিস হতে বের হয়ে যাবেন এবং সেখানে বসে থাকবেন না। কেননা গুনাহের কাজ চলছে এমন মজলিসে দীনের অনুসরণীয় কোনো ব্যক্তির অংশগ্রহণ করার দ্বারা দীনের অবমাননা করা হয় এবং মুসলমানদের মাঝে ফিতনার দরজা খুলে দেওয়া হয়। কারণ সাধারণ লোকেরা এ ধরনের মজলিসের আয়োজন করে। যখন তাদেরকে নিষেধ করা হবে তখন তারা বলবে, অমুক আলেম বা ইমাম সাহেব তো এসব মজলিসে শরিক হয়েছেন। এসব মজলিস যদি খুবই খারাপ হতো তাহলে তো অমুক আলেম তাতে বসতেন না বা অংশগ্রহণ করতেন না ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَالْمُحْكٰى عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) الخ : লেখক এ ইবারত দ্বারা একটি আপত্তির জবাব দিচ্ছেন। আপত্তিটি এই যে, পিছনের ইবারতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, তিনি একবার দাওয়াতে শরিক হওয়ার জন্য কোনো একস্থানে গমন করেন। আর সেখানে শরিয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড হচ্ছিল। ইমাম সাহেব সেই পরিস্থিতিতে সেখানে ধৈর্যধারণ করে বসে পড়েন।

এখন প্রশ্ন হলো, ইমাম সাহেব তো অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কি করে সেখানে বসলেন?

উত্তরে লেখক বলেন, ইমাম সাহেবের আলোচ্য উক্তিটি তাঁর জীবনের প্রথম দিককার কথা– যখন তিনি অনুসরণীয় ব্যক্তি (مُقْتَدٰى) হিসেবে গণ্য হননি।

وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَقْعُدَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَدًى لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ وَهٰذَا كُلُّهُ بَعْدَ الْحُضُوْرِ وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْحُضُوْرِ لَا يَحْضُرُ لِاَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ حَقُّ الدَّعْوَةِ بِخِلَافِ مَا اِذَا هَجَمَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ وَدَلَّتِ الْمَسْاَلَةُ عَلٰى اَنَّ الْمَلَاهِيْ كُلَّهَا حَرَامٌ حَتّٰى التَّغَنِّيْ بِضَرْبِ الْقَضِيْبِ وَكَذَا قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اُبْتُلِيْتُ لِاَنَّ الْاِبْتِلَاءَ بِالْمُحَرَّمِ يَكُوْنُ.

অনুবাদ : যদি গানবাজনা খাবারের দস্তরখানে সংঘটিত হয় তাহলে যদিও মুকতাদা না হয় [বরং সাধারণ ব্যক্তি হয়] তবুও তার জন্য উক্ত দস্তরখানে বসা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "অনন্তর স্মরণ হওয়ার পর জালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।" অবশ্য উপরিউক্ত বিধানগুলো মজলিসে উপস্থিত হওয়ার পরবর্তী হুকুম। যদি কেউ মজলিসে উপস্থিত হওয়ার আগেই এরূপ গুনাহের বিষয়ে অবগত হয় তাহলে সে মজলিসেই শরিক হবে না। কেননা এ ধরনের পরিস্থিতিতে তার উপর দাওয়াতের হক আবশ্যক নয়। তবে হ্যাঁ যদি কেউ হঠাৎ করে এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় [তাহলে তার হুকুম ভিন্ন]। কেননা এমতাবস্থায় তার উপর দাওয়াতের হক অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আলোচ্য মাসআলার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সব ধরনের অনর্থক খেলাধুলা হারাম। এমনকি বাঁশের বাঁশি দ্বারা বাজনা বাজানোও হারাম। অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর উক্তি اُبْتُلِيْتُ [আমি আক্রান্ত হয়েছি] থেকেও হারাম হওয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা হারামের ক্ষেত্রেই اِبْتِلَاء শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى الْمَائِدَةِ الخ : লেখক বলেন, দাওয়াতের মজলিসে গানবাজনা হলে তাতে অংশগ্রহণ করা সংক্রান্ত বিধিবিধানের কথা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তা সেই ক্ষেত্রে যখন সরাসরি খাওয়ার দস্তরখানে বা টেবিলে না হয়। আর যদি খাওয়ার টেবিল বা দস্তরখানে এরূপ আয়োজন হয় তাহলে কারোর জন্যই সেই দস্তরখানে বসা উচিত নয়। যদিও দাওয়াতি মেহমান অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব না হয়। বিষয়টিকে লেখক কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ - সুতরাং [আল্লাহর আদেশ-উপদেশ] জানার পর জালেমদের সাথে বসবে না। –[সূরা আন'আম]

قَوْلُهُ وَهٰذَا كُلُّهُ بَعْدَ الْحُضُوْرِ الخ : লেখক বলেন, উপরিউক্ত আলোচনা দাওয়াতে উপস্থিত হয়ে যাওয়ার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি দাওয়াতে উপস্থিত হওয়ার আগেই মেহমান সেই মজলিসের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয় যে, সেখানে গানবাজনা কিংবা শরিয়ত বিরোধী ক্রীড়াকৌতুক হচ্ছে তাহলে সে তাতে অংশগ্রহণ করবে না। কেননা এ ব্যক্তির জন্য এরূপ দাওয়াতে শরিক হওয়া অপরিহার্য নয়। যে দাওয়াত সুন্নত মোতাবেক পরিচালিত হয় সেই দাওয়াত গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। আর যদি কোনো মেহমান খাবারের মজলিস সম্পর্কে পূর্ব থেকে কোনো কিছু না জানে, আর হঠাৎ করে মজলিসে গুনাহের পরিবেশ চলে আসে এমতাবস্থায় তার কোনো সমস্যা নেই। কেননা এ ব্যক্তির উপর উপস্থিত হওয়ার কারণে দাওয়াতের হক তো অপরিহার্য হয়ে গেছে।

আলোচ্য মাসআলা এই ইঙ্গিতই করছে যে, সব ধরনের খেলাধুলা হারাম। এমনকি বাঁশের তৈরি বাঁশি দ্বারা হলেও। মোটকথা যে ধরনের খেলাধুলা এবং আসর দ্বারা কেবলই বিনোদন উদ্দেশ্য হয়– শারীরিক শ্রম ও কসরতও হয় না তা শরিয়তে হারাম। লেখক বলেন, এসব গানবাজনা যে হারাম তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর উল্লিখিত উক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হয়, তিনি বলেছিলেন, اُبْتُلِيْتُ بِهٰذَا مَرَّةً এখানে তিনি اِبْتِلَاء শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ফিক্‌হের পরিভাষা অনুযায়ী اِبْتِلَاء শব্দটি হারামের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, গানবাজনা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম। গানবাজনা হারাম হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১. এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে ঘোষণা করেন– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الخ অর্থাৎ 'যারা আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য গানবাজনা খরিদ করে এবং কুরআনকে ঠাট্টার বস্তু বানায় তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।'

অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে لَهْوَ الْحَدِيثِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গানবাজনা। যেহেতু যারা এমন করে তাদের জন্য আয়াতে চরম আজাবের ভয় দেখানো হয়েছে তাই এটি হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়।

২. হযরত সদরুশ্ শহীদ (র.) তাঁর কিতাবে রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন–

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ اِسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا مِنَ الْكُفْرِ .

'রাসূল ﷺ বলেছেন, গান-বাজনা শুনা গুনাহ। আর এর মজলিসে বসা ফিস্ক বা কবীরা গুনাহ এবং একে উপভোগ করা ও এর দ্বারা পুলকিত হওয়া কুফরি কাজ।'

৩. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ صَوْتَ اللَّهْوِ وَالْغِنَاءِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ النَّبَاتَ بِالْمَاءِ .

অর্থাৎ 'হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, গান ও অশ্লীল কথাবার্তার আওয়াজ অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি করে, যেমন পানি দ্বারা উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।'

উপরিউক্ত দলিলগুলো দ্বারা গানবাজনা হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সুতরাং হারাম কাজ হয় এমন পরিবেশ বর্জন করা সকলের উপর কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, চলমান মাসআলার অধীনে আশরাফুল হিদায়ার লেখক কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মাসআলা বর্ণনা করেছেন। উপকারী মনে করে তা এখানে উল্লেখ করা হলো–

১. যদি অলিমার দাওয়াত দেওয়া হয় এবং তা কবুল করাতে কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে কতিপয় আলেমের মতে তা কবুল করা সুন্নত। আর কারো কারো মতে তা কবুল করা ওয়াজিব। –[ফাতাওয়ায়ে শামী, খ. ৫]

২. যদি খাবারের দস্তরখানে গিবত হয় তাহলে তার হুকুম গান-বাজনার মতোই। –[শামী, খ. ৫, পৃ. ২২১]

৩. যে ব্যক্তি শরিয়ত বিরোধী গর্হিত কোনো কাজে লিপ্ত রয়েছে তাকে সেই কাজ থেকে বাধা দেওয়ার জন্য তার অনুমতি ছাড়া সেখানে প্রবেশ করা বৈধ। –[প্রাগুক্ত]

৪. নিজের প্রাণকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পানাহার করা ফরজ। সতর ঢাকার জন্য পোশাক পরিধান করাও ফরজ। তবে শীত-গরম থেকে বাঁচার জন্য অতিরিক্ত পোশাক পরা এবং পেটভরে খাওয়া গুনাহ। যদি এর চেয়ে বেশি খাওয়া হয়- যা দ্বারা পাকস্থলিতে সমস্যা দেখা দেয় তা খাওয়া হারাম। অবশ্য মেহমানের খুশির জন্য এরূপ খাওয়া হালাল।

৫. খাওয়ার শুরুতে যুবকদের প্রথমে হাত ধোয়াবে, পক্ষান্তরে খাবারের শেষে বৃদ্ধদের হাত প্রথম ধোয়াবে। –[শামী, খ. ৫, প. ২১৬]

৬. যে ব্যক্তি চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত জন্তু খাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও খেলো না, নিজেকে মৃত জন্তু খাওয়া থেকে দূরে রাখল। অতঃপর অনাহারে মারা গেল তাহলে সেই ব্যক্তি গুনাহগার হবে। তবে যে অসুস্থ হওয়ার পর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা গ্রহণ না করে। অতঃপর যদি বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তাহলে গুনাহগার হবে না। কেননা ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়; বরং চিকিৎসা ছাড়াও আরোগ্য লাভ হতে পারে।

৭. নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী উপার্জন করা ফরজ। একেবারে যা না হলেই নয়– এর চেয়ে বেশি উপার্জন করা মোস্তাহাব। তাহলে এর দ্বারা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা যাবে। একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার জন্য উপার্জন করা মুবাহ। তবে গর্ব ও অহংকারের উদ্দেশ্যে অধিক উপার্জন করা হারাম। –[মাজমাউল আনহার, খ. ৫, পৃ. ৫০৮]

৮. যে ব্যক্তি উপার্জন করতে সক্ষম নয় [তা যে কোনো প্রতিবন্ধকতার জন্যেই হোক] তার নিজ প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে কারো কাছে চাওয়া জরুরি। যদি সে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কারো কাছে চাইল না, অতঃপর অনাহারে বা খাদ্যাভাবে মারা গেল তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর যদি সে ব্যক্তি কারো কাছে চাইতে অক্ষম হয়, এমতাবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি তার সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে এমন ব্যক্তির উপর অসহায় ব্যক্তিটিকে খাওয়ানো আবশ্যক কিংবা সে এমন ব্যক্তির অনুসন্ধান দেবে যে তাকে খাওয়াতে পারে। –[সূত্র মাজমাউল আনহার, ২-৫৮ পৃ.]

فَصْلٌ فِى اللُّبْسِ
অনুচ্ছেদ পোশাক সম্পর্কিত

قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ لُبْسُ الْحَرِيْرِ وَيَحِلُّ لِلنِّسَاءِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَقَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِنَّمَا حَلَّ لِلنِّسَاءِ بِحَدِيْثٍ اٰخَرَ وَهُوَ مَارَوَاهُ عِدَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ وَبِاِحْدٰى يَدَيْهِ حَرِيْرٌ وَبِالْاُخْرٰى ذَهَبٌ وَقَالَ هٰذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ حَلَالٌ لِاِنَاثِهِمْ وَيُرْوٰى حِلٌّ لِاِنَاثِهِمْ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পুরুষদের জন্য রেশমি [সিল্কের তৈরি] পোশাক পরিধান করা বৈধ নয়, মেয়েদের জন্য বৈধ। কেননা রাসূল ﷺ রেশমি অথবা রেশম জাতীয় কিংখাপ কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। আর [এ প্রসঙ্গে] তিনি বলেন, যে ব্যক্তির আখেরাতে কোনো [নিয়ামতের] অংশ নেই সেই কেবল এগুলো পরবে। অবশ্য মহিলাদের জন্য এ জাতীয় পোশাক হালাল হয়েছে অন্য একটি হাদীস দ্বারা। হাদীসটি অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন হযরত আলী (রা.)। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একবার সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে আসলেন। এমন সময় তাঁর এক হাতে একখণ্ড রেশমবস্ত্র ও অন্য হাতে এক টুকরো সোনা ছিল। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, এ দুটি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় حَلَالٌ শব্দের পরিবর্তে حِلٌّ শব্দ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ فِى اللُّبْسِ قَالَ : لَا يَحِلُّ الخ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে পোশাক-পরিচ্ছেদ সম্পর্কিত মাকরূহ বিষয়ের মাসায়েলের আলোচনা শুরু করেছেন।

প্রথম মাসআলা : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পুরুষদের জন্য রেশমি বস্ত্র বা সিল্কের তৈরি পোশাক পরিধান করা হালাল নয়, আর মহিলাদের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা হালাল। পুরুষদের জন্য রেশম বা সিল্ক ব্যবহার হালাল না হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ সাধারণ রেশমি কাপড় এবং কিংখাপ জাতীয় রেশমের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেন– اِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ 'রেশমি বস্ত্র তো সেই ব্যক্তিই পরিধান করবে, যার জন্যে আখেরাতে নিয়ামতের কোনো অংশ নেই।'

রাসূল ﷺ -এর উপরিউক্ত দুটি হাদীস দ্বারা পুরুষদের জন্য রেশমি বস্ত্র ব্যবহার করার অবৈধতা প্রমাণিত হয়।

হাদীস দুটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) এভাবে হাদীস দুটি উল্লেখ করেছেন–

١- رُوِىَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ .

٢- وَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ .

প্রথম হাদীসটি দ্বারা হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) হযরত হুযায়ফা (রা.) এবং হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) -এর হাদীসদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত হুযায়ফা (রা.) -এর হাদীসটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো–

عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةِ وَلَا تَاْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

এ হাদীসে রাসূল ﷺ পরিষ্কারভাবে রেশম ও দীবাজ পরিধান করতে পুরুষদেরকে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি হযরত বারা (রা.) থেকেও বর্ণিত। উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) দুয়ের অধিক স্থানে এবং ইমাম মুসলিম দু-স্থানে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি এই–

حَدِيْثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ وَفِيْهِ وَعَنِ الدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ .

'হযরত বারা (রা.) -এর বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ যে সাতটি বিষয় করতে নিষেধ করেছেন তন্মধ্যে দীবাজ ও রেশমিবস্ত্র রয়েছে।'

দ্বিতীয় হাদীস : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) কর্তৃক উদ্ধৃত দ্বিতীয় হাদীসটি খুবই সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। আর পুরো হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে তাদের কিতাবে একাধিকভাবে উল্লেখ করেছেন। পুরো হাদীসটি নিম্নে সংক্ষিপ্ত সনদসহ উল্লেখ করা হলো–

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) رَاٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اِشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حُلَلٌ فَاَعْطٰى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اَخًا لَهُ مُشْرِكًا .

অর্থাৎ 'একদা হযরত ওমর (রা.) মসজিদের দরজায় একটি ডোরাকাটা রেশমের তৈরি [দুই চাদরের] সেট দেখলেন। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ -কে সেটি ক্রয় করার অনুরোধ করলেন। যাতে রাসূল ﷺ জুমার দিন এবং প্রতিনিধি দলের আগমনের দিন তা পরিধান করবেন। রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, পৃথিবীতে সেই রেশমিবস্ত্র পরবে -যার আখেরাতে কোনো অংশ নেই। এরপর রাসূল ﷺ-এর দরবারে কিছু রেশমি চাদর আসে। রাসূল ﷺ এগুলো থেকে ওমরকে একটি প্রদান করলে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি আমাকে রেশমি সেট পরতে দিলেন? অথচ এর ব্যাপারে আপনি আমাকে নিষেধ করেছিলেন। রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, আমি তো তোমাকে এটি পরতে দেইনি। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) সেই সেটটি তাঁর সৎমায়ের ঘরের মুশরিক ভাইকে [যার নাম ওসমান ইবনে হাকীম] দিয়ে দেন।'

মোটকথা উপরের বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুসান্নিফ (র.) যে দুটি হাদীসকে উল্লেখ করেছেন তা হুবহু শব্দ না থাকলেও তার অর্থের হাদীস অবশ্যই বিদ্যমান এবং হাদীসগুলো বিশুদ্ধতার মানে প্রথম ঘরের।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا حَلَّ لِلنِّسَاءِ بِحَدِيثٍ أُخَرَ الخ : লেখক বলেন, রেশমি বস্ত্র যদিও পুরুষদের জন্য হালাল নয় তথাপি তা মহিলাদের জন্য অবশ্যই হালাল। তিনি বলেন, মহিলাদের জন্য তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর বিখ্যাত একটি হাদীস। সেই হাদীসটি রাসূল ﷺ -এর অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হযরত আলী (রা.)। হযরত আলী (রা.) -এর হাদীসটি হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) এভাবে বর্ণনা করেছেন−

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ وَبِإِحْدَى يَدَيْهِ حَرِيْرٌ وَبِالْأُخْرَى ذَهَبٌ وَقَالَ هٰذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلٰى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ . وَيُرْوٰى حَلٌّ لِإِنَاثِهِمْ .

হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ইমাম আবূ দাউদ (র.) ও ইবনে মাজাহ (র.) তাদের হাদীসের কিতাবদ্বয়ে لِبَاسٌ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ইমাম নাসাঈ (র.) اَلزِّيْنَةُ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমদ ও ইবনে হিব্বানও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় হাদীসটি এভাবে রয়েছে−

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِيْ شِمَالِهِ فَقَالَ إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ . زَادَ ابْنُ مَاجَةَ حَلٌّ لِإِنَاثِهِمْ .

তাদের বর্ণিত হাদীসটির সাথে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) -এর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে শেষাংশে পুরো মিল পাওয়া যায়। অবশ্য প্রথমাংশের মিল পাওয়া যায়নি।

অপরদিকে হযরত আলী (রা.) ছাড়াও অন্য অনেক সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব, আবূ মূসা আশ'আরী, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসটির প্রথমাংশ অবশ্য মুসান্নিফ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হযরত আলী (রা.) -এর রেওয়ায়েতের সাথে মিলে যায়। হযরত ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি মুসনাদে বায্যারে এরূপ আছে−

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَفِيْ إِحْدٰى يَدَيْهِ حَرِيْرٌ وَفِي الْأُخْرٰى ذَهَبٌ فَقَالَ .....

প্রকৃত ঘটনা এমন হতে পারে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) উভয়ের হাদীস একত্রে মিলিয়ে ফেলেছেন। অতঃপর তা হযরত আলী কর্তৃক বর্ণিত বলে সাব্যস্ত করেছেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদিও তার হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সামান্য সমস্যা হয়েছে, তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসের আসল বা মূলরূপ অবশ্যই প্রমাণিত। −[সূত্র বিনায়া ও নাসবুর রায়াহ]

মোটকথা, হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন অর্থাৎ মহিলাদের জন্য রেশমি বস্ত্র পরিধান করা জায়েজ তা খুব ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, রেশমি বস্ত্রের ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা পুরুষদের জন্যে খাস ও নির্দিষ্ট।

إِلَّا أَنَّ الْقَلِيلَ عَفْوٌ وَهُوَ مِقْدَارُ ثَلْثَةِ اَصَابِعَ اَوْ اَرْبَعٍ كَالْاَعْلَامِ وَالْمَكْفُوفِ بِالْحَرِيرِ لِمَا رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ اِلَّا مَوْضِعَ اِصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلْثٍ اَوْ اَرْبَعٍ اَرَادَ الْاَعْلَامَ وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ جُبَّةً مَكْفُوفَةً بِالْحَرِيرِ .

অনুবাদ : তবে হ্যাঁ সামান্য পরিমাণ রেশম ব্যবহার করা ক্ষমাযোগ্য। আর সামান্যের পরিমাণ হলো তিন আঙ্গুল বা চার আঙ্গুল পরিমাণ কাপড়। যেমন বুটিক বা রেশমের ঝালর। এর দলিল হলো রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি দুই, তিন কিংবা চার আঙ্গুল পরিমাণের বেশি রেশমি বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এ পরিমাণ দ্বারা ঝালর উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তাছাড়া রাসূল ﷺ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রেশমের নকশা বা কারুকাজ করা জুব্বা পরিধান করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّ الْقَلِيلَ عَفْوٌ الخ : আলোচ্য ইবারতে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) পুরুষদের জন্য সামান্য পরিমাণ রেশমি কাপড় ব্যবহার করা যে জায়েজ তা আলোচনা করেছেন। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পূর্ববর্তী ইবারতের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়েছিল যে, পুরুষদের জন্যে সব ধরনের রেশম ব্যবহার করা অবৈধ চাই তা অল্প হোক অথবা বেশি হোক। চলমান ইবারতে আগের সেই ধারণা রহিত করত বলা হচ্ছে যে, অল্প পরিমাণ রেশম ব্যবহার করা জায়েজ।

আর অল্প পরিমাণ হলো তিন বা চার আঙ্গুল পরিমাণ। যেমন– কাপড়ের মধ্যে ঝালর লাগানো থাকে বা নকশা করা থাকে। সাধারণভাবে কারুকাজ তিন বা চার আঙ্গুলের চেয়ে বেশি হয় না। আর শরিয়তের বিধান সেই পরিমাণই মাফ করা হয়েছে। এই পরিমাণ মাফ বা ক্ষমারযোগ্য হওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল ﷺ -এর দুটি হাদীস এ প্রসঙ্গে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন। যথা–

প্রথম হাদীস– اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ اِلَّا مَوْضِعَ اِصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلْثَةٍ اَوْ اَرْبَعٍ

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর স্বীয় গ্রন্থ لِبَاسٌ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণিত হাদীসটি নিম্নে সংক্ষিপ্ত সনদসহ উল্লেখ করা হলো–

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ اِلَّا مَوْضِعَ اِصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلَاثٍ اَوْ اَرْبَعٍ .

অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) একবার জাবিয়া নামক স্থানে ভাষণ দেন। তথায় তিনি বলেন, রাসূল ﷺ দুই, তিন কিংবা চার আঙ্গুলের চেয়ে বেশি পরিমাণ রেশম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, হাদীসটি مَوْقُوْف নাকি مَرْفُوْع এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম নাসাঈ (র.) مَوْقُوْف হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। –[সূত্র-বিনায়া]

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন দুই, তিন ও চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম ব্যবহার করা ক্ষমার যোগ্য এ কথার দ্বারা রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্য হলো কাপড়ের এই পরিমাণ অংশ যদি রেশমের কারুকাজ করা থাকে তাহলে তা মাফ। যেহেতু পূর্বযুগে কাপড়ের মধ্যে রেশমের ঝালর লাগানো হতো তাই ঐ পরিমাণ মাফ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ঝালর সাধারণভাবে মূল কাপড়ের অংশ হয় না। মূল কাপড়ের সাথে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য সংযুক্ত থাকে।

দ্বিতীয় হাদীস– عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ جُبَّةً مَكْفُوفَةً بِالْحَرِيرِ

লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত এ হাদীসটিও ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর কিতাবে لِبَاسٌ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসটি এখানে প্রদত্ত হলো–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) عَنْ مَوْلٰى اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ قَالَتْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ (رض) فِى السُّوْقِ وَقَدِ اشْتَرٰى ثَوْبًا شَامِيًّا فَرَأٰى فِيْهِ خَيْطًا اَحْمَرَ فَرَدَّهُ فَأَتَيْتُ اَسْمَاءَ . فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا جَارِيَةُ نَاوِلِيْنِىْ جُبَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْرَجَتْ لِىْ جُبَّةً طَيَالِسَةً كَرَوَانِيَّةً بِهَا لِبْنَةُ دِيْبَاجٍ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوْفَانِ بِالدِّيْبَاجِ فَقَالَتْ كَانَتْ هٰذِهٖ عِنْدَ عَائِشَةَ (رض) حَتّٰى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ اَخَذْتُهَا وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضٰى فَنَسْتَشْفِىْ بِهَا .

উল্লিখিত এ দীর্ঘ হাদীসটির প্রতি হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) ইঙ্গিত করেছেন, যাতে রাসূল ﷺ -এর তায়ালেসী জুব্বার কথা উল্লেখ আছে। রাসূল ﷺ -এর সেই জুব্বার নিম্নাংশে রেশমের কারুকাজ করা ছিল। রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রা.) -এর কাছে সেই জুব্বাটি ছিল। তাঁর তিরোধানের পর সেটা হযরত আসমা (রা.) -এর দাসীর কাছে ছিল। সে সময় তারা এ জুব্বাটির ভিজানো পানি রোগীদের পান করিয়ে রোগমুক্ত করতেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) ও হাদীসটি তাঁর স্বীয় গ্রন্থে বয়ান করেন। তাঁর বর্ণনায় শব্দের মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মোটকথা হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বর্ণিত উভয় হাদীসের মূল পাওয়া গেল এবং উভয় হাদীস বিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণ। উভয় হাদীস দ্বারা সামান্য পরিমাণ রেশম ব্যবহার করার বৈধতা প্রমাণিত হলো।

বি. দ্র. দীবাজ (دِيْبَاجٌ) -এর তাহকীক সম্পর্কে ওলামাগণ লিখেন যে, যে কাপড়ের তানা এবং বানা [উভয় সুতা] রেশমি সুতায় হয় তাকে দীবাজ বলা হয়।

নোট : সতর ঢাকা পরিমাণ কাপড় পরিধান করা যায়। শীত-গরম থেকে বাঁচার জন্য যতটুকু কাপড় জরুরি তাও ফরজ। উত্তম হলো তুলা থেকে তৈরি কাপড় পরিধান করা। এতে অহংকারের সম্ভাবনা কমে যায়। খুব দামি এবং একেবারে কম দামি হওয়াও সমীচীন নয়। প্রয়োজনানুযায়ী হওয়া মোস্তাহাব এবং ভালো হওয়া মুবাহ। সাদা রঙের কাপড় পরা মোস্তাহাব, টকটকে লাল পরিধান করা মাকরূহ। –[মাজমাউল আনহার, খ. ২, পৃ. -১২]

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِتَوَسُّدِهِ وَالنَّوْمِ عَلَيْهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا يَكْرَهُ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ ذُكِرَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَحْدَهُ وَلَمْ يُذْكَرْ قَوْلُ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَاِنَّمَا ذَكَرَهُ الْقُدُوْرِىُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَكَذَا الْاِخْتِلَافُ فِىْ سِتْرِ الْحَرِيْرِ وَتَعْلِيْقِهِ عَلَى الْاَبْوَابِ لَهُمَا الْعُمُوْمَاتُ وَلِاَنَّهُ مِنْ زِىِّ الْاَكَاسِرَةِ وَالْجَبَابِرَةِ وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ حَرَامٌ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِيَّاكُمْ وَ زِىَّ الْاَعَاجِمِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুসারে রেশমের তৈরি বালিশে হেলান দেওয়া এবং এর উপর মাথা রেখে নিদ্রা যাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। আর সাহেবাইন (র.) -এর মতে এরূপ করা মাকরূহ। জামিউস সাগীর গ্রন্থে দ্বিতীয় মতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নামোল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর নামোল্লেখ করা হয়নি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নাম [ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে] উল্লেখ করেছেন ইমাম কুদূরী ও অন্যান্য মাশায়েখ। অনুরূপভাবে মতবিরোধ রয়েছে রেশমের পর্দা এবং তা দরজায় লটকানোর ব্যাপারে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো এ প্রসঙ্গে বর্ণিত সাধারণ নিষেধাজ্ঞা সংবলিত হাদীসসমূহ। তাছাড়া এ সকল প্রথা অনারব রাজন্যবর্গ এবং অহংকারী লোকদের প্রথার অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথে সাদৃশ্য হারাম। হযরত ওমর (রা.) বলেন, তোমরা অনারব [অমুসলমানদের] বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের ব্যাপারে সতর্ক থাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِتَوَسُّدِهِ وَالنَّوْمِ الخ : আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার (র.) সামান্য পরিমাণে রেশমি বস্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রেশমি কাপড় দ্বারা তৈরি করা বালিশে হেলান দেওয়া বা এর উপর মাথা রেখে ঘুমানোতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে কোনো সমস্যা নেই।

সাহেবাইন (র.) -এর মতে, এরূপ রেশম ব্যবহার করা মাকরূহ। এরূপ ব্যবহার নারী ও পুরুষ সকলের জন্যই মাকরূহ। যদিও নারীদের জন্য পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে রেশম ব্যবহার করা জায়েজ।

এরপর হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) কুদূরী ও জামিউস সাগীরের বর্ণনার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, জামিউস সাগীরের ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিপরীত মত পোষণ করেন, শুধুমাত্র ইমাম মুহাম্মদ (র.) সেখানে ইমাম আযম (র.)-এর বিপরীতে সাহেবাইনের কথা উল্লেখ নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর বিপরীতে সাহেবাইন (র.) -এর কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম কুদূরী ও অন্যান্য কতিপয় মাশায়েখ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইমাম কারখী (র.) ও কাজি আবূ আসেম।

অনুরূপ মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় রেশমি পর্দা ব্যবহার ও তা দরজায় ঝুলানোর ব্যাপারেও। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে রেশমি পর্দা ব্যবহার ও তা দরোজায় ব্যবহার করা জায়েজ। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) -এর মতে তা নাজায়েজ।

সাহেবাইন (র.) -এর অভিমতের স্বপক্ষে দলিল : রেশমি বস্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা সংবলিত হাদীসগুলোই তাদের দলিল।

তাঁদের যৌক্তিক দলিল হলো, রেশমি কাপড়ের বালিশ ও পর্দা অনারব অমুসলিম রাজা বাদশাহদের ব্যবহার্যের জিনিস। তারা এগুলো শানশওকতের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। দ্বিতীয়ত এগুলো ব্যবহারে অহংকার প্রকাশ পায়। আর অপর পক্ষে অনারব-অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম।

এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর বিখ্যাত বাণী হচ্ছে– مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি গ্রহণ করে সে তাদের দলভুক্ত।'

গ্রন্থকার (র.) সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হিসেবে এখানে হযরত ওমর (রা.) -এর উক্তি উল্লেখ করেছেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন– اِيَّاكُمْ وَ زِيَّ الْاَعَاجِمِ

তোমরা অনারব-অমুসলিমদের [রীতি-নীতি ও] পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।

হাদীসটি ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ -এ উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সেখান থেকে উদ্ধৃত করা হলো–

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ يَقُوْلُ اَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِاَذَرْبَيْجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ اَمَّا بَعْدُ فَاتَّزِرُوْا وَارْتَدُوْا وَانْتَعِلُوْا وَارْمُوْا بِالْخِفَافِ وَاقْطَعُوْا السَّرَاوِيْلَاتِ وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ اَبِيْكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَ زِيَّ الْعَجَمِ الخ

হাদীসটি যদিও বেশ দীর্ঘ তথাপি আমরা আমাদের দলিলের প্রয়োজনীয় অংশটুকু উল্লেখ করলাম মাত্র।

ইমাম মুসলিম (র.)ও হাদীসটি বর্ণনা করেন তবে তাতে শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম মুসলিমের বর্ণিত হাদীসের শব্দগুলো নিম্নরূপ– اِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَ زِيَّ اَهْلِ الشِّرْكِ وَلُبُوْسَ الْحَرِيْرِ –[সূত্র বিনায়া]

মোটকথা আমাদের মুসান্নিফ (র.) রেশমের তৈরি বালিশ ব্যবহার নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে সাহেবাইনের পক্ষে হযরত ওমর (রা.)-এর এ উক্তি দ্বারা দলিল দেন। আল্লামা যায়লাঈ (র.) বলেন, তবে মুসান্নিফ (র.) যদি ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হযরত হুযায়ফা (রা.) -এর হাদীসের সাহায্যে দলিল দিতেন তাহলে তা আরো উত্তম এবং শক্তিশালী হতো। হযরত হুযায়ফা (রা.) -এর হাদীস নিম্নরূপ–

عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نَشْرَبَ فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَاَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ .

এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে রেশমি বস্ত্র পরিধান ছাড়া অন্যভাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَلَهُ مَا رُوِىَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَلَسَ عَلٰى مِرْفَقَةِ حَرِيْرٍ وَقَدْ كَانَ عَلٰى بِسَاطِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِرْفَقَةُ حَرِيْرٍ وَلِأَنَّ الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَلْبُوْسِ مُبَاحٌ كَالْأَعْلَامِ فَكَذَا الْقَلِيْلُ مِنَ اللُّبْسِ وَالْاِسْتِعْمَالِ وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ نَمُوْذَجًا عَلٰى مَا عُرِفَ -

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ রেশমের তৈরি বালিশে [হেলান দিয়ে] বসেছেন। অধিকন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিছানায় রেশমের তৈরি বালিশ ছিল বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়। [পক্ষান্তরে যৌক্তিক দলিল হলো,] পরিধেয় বস্ত্রে কারুকাজ পরিমাণ সামান্য অংশে যেমন রেশম ব্যবহার জায়েজ তদ্রূপ ব্যবহার্য বস্তু সামগ্রীতেও অল্প পরিমাণ রেশম ব্যবহার করা জায়েজ হবে। পরিধেয় পোশাক ও ব্যবহারের বস্তুসামগ্রীর মাঝে অল্প পরিমাণ রেশম ব্যবহার বৈধ হওয়ার কারণ হলো, এগুলো নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হয় আর এটা ঐ ব্যাখ্যা অনুযায়ী যা সর্বজনবিদিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُ مَا رُوِىَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ : উপরিউক্ত আলোচনায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল পেশ করা হয়েছে। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) ইমাম সাহেবের পক্ষে প্রথম দলিল উপস্থাপন করেছেন রাসূল ﷺ -এর ঐ আমল দ্বারা যাতে তিনি বলেন- رُوِىَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَلَسَ عَلٰى مِرْفَقَةِ حَرِيْرٍ .
অর্থাৎ 'বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ রেশমি কাপড় দ্বারা তৈরি বালিশের উপর হেলান দিয়ে বসেছেন।'
এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা আইনী (র.) বলেন, এ হাদীসের বক্তব্য প্রমাণিত নয়। এ হাদীস কোনো মুহাদ্দিস সহীহ সনদে তো উল্লেখ করেননি– এমনকি দুর্বল সনদেও উল্লেখ করেননি।
তাছাড়া যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এটির ভিত্তি আছে। তবুও এর দ্বারা দলিল দেওয়া চলে না। কেননা তখন এ হাদীস ইতঃপূর্বে হযরত হুযায়ফা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিপরীতে আসবে। আর হযরত হুযায়ফা (রা.) -এর হাদীসের সাথে মোকাবিলা করা এ হাদীসের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব না। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, এ হাদীস দলিলযোগ্য নয়।
অবশিষ্ট রইল হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিছানায় যে রেশমের তৈরি বালিশ ছিল তা। ইবনে সা'দের তাবাকাতের রেওয়ায়েত দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয় বটে কিন্তু এ হাদীসটিও হযরত হুযায়ফা (রা.) -এর হাদীসের মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য হয় না।
এরপর হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পক্ষে যৌক্তিক দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন, পরিধেয় পোশাকের মাঝে সামান্য পরিমাণ রেশম ব্যবহারে শরিয়তের অনুমোদন রয়েছে। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, কারুকাজ ও নক্‌শা পরিমাণ রেশম ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই।
যেহেতু পরিধেয় পোশাকের মাঝে সামান্য পরিমাণ রেশম ব্যবহার করা জায়েজ সুতরাং বালিশ ও বিছানার চাদর ইত্যাদি ব্যবহার্যের বস্তুর মাঝেও সামান্য পরিমাণ রেশম ব্যবহার করা জায়েজ হবে।
পোশাক-পরিচ্ছদের মাঝে অল্প পরিমাণ রেশম ব্যবহার জায়েজ হওয়ার যুক্তি হলো জান্নাতের মধ্যে জান্নাতিদেরকে রেশমি পোশাক পরিধানের জন্যে দেওয়া হবে। পৃথিবীতে সামান্য পরিমাণ রেশম ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে জান্নাতের রেশমি বস্ত্রের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জন্মাবে এবং সেই জন্য আমল করতে থাকবে। মোটকথা জান্নাতের রেশমি বস্ত্রের নমুনাস্বরূপ দুনিয়াতে সামান্য পরিমাণ রেশম ব্যবহার করা জায়েজ।
প্রশ্ন. এখন প্রশ্ন হলো, পরিধেয় পোশাকের ক্ষেত্রে তো নমুনা হিসেবে রেশম ব্যবহার জায়েজ হলো; কিন্তু ব্যবহার্যের বস্তুসামগ্রীর মাঝে রেশম ব্যবহার কিভাবে জায়েজ হবে?
উত্তর. এর উত্তরে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, ব্যবহারের বস্তু সামগ্রীকে পরিধেয় পোশাকের উপর কিয়াস করা হয়েছে। কারণ, পরিধেয় পোশাকের মাঝে যে ইল্লত রয়েছে অর্থাৎ বেহেশ্‌তি পোশাকের নমুনা হওয়া সেই ইল্লত তো ব্যবহারের বালিশ, চাদর ইত্যাদির মধ্যেও রয়েছে। যেহেতু উভয়ের মধ্যে একই ইল্লত বিদ্যমান তাই উভয়ের ব্যবহারই জায়েজ হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলায় অধিকাংশ মাশায়েখ সাহেবাইন (র.) -এর মাযহাবকে গ্রহণ করেছেন এবং এটাই সঠিক।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ فِي الْحَرْبِ عِنْدَهُمَا لِمَارَوَى الشَّعْبِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ فِي الْحَرْبِ وَلِاَنَّ فِيْهِ ضَرُوْرَةً فَاِنَّ الْخَالِصَ مِنْهُ اَدْفَعُ لِمَعَرَّةِ السِّلَاحِ وَاَهْيَبُ فِيْ عَيْنِ الْعَدُوِّ لِبَرِيْقِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাহেবাইন (র.) -এর মতানুসারে রণাঙ্গনে রেশমি এবং রেশমি কিংখাপ পরাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা হযরত শা'বী (র.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ রণাঙ্গণে রেশমি ও রেশমি কিংখাপ পরিধান করার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। তাছাড়া যুদ্ধের ময়দানে এরূপ পোশাক পরিধান করার প্রয়োজনও রয়েছে। কেননা খাঁটি রেশমের তৈরি পোশাক যুদ্ধাস্ত্র প্রতিহত করার ব্যাপারে অধিক কার্যকর এবং ঔজ্জ্বল্যের কারণে শত্রুর চোখে ভীতি বা ভয়ের সৃষ্টি করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيْرِ الخ : উপরের আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার (র.) যুদ্ধের ময়দানে খাঁটি রেশমের পোশাক পরিধান করার হুকুম আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে রণাঙ্গনে খাঁটি রেশমের তৈরি পোশাক পরিধান করাতে কোনো দোষ নেই।

মুসান্নিফ (র.) তাঁদের পক্ষে দুটি দলিল পেশ করেছেন।

প্রথম দলিল : رَوَى الشَّعْبِيُّ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ فِي الْحَرْبِ .

ইমাম শা'বী (র.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ রণাঙ্গনে রেশমি এবং রেশমি কিংখাপ পরিধান করার অনুমতি দিয়েছেন।

উপরে উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে আল্লামা যায়লাঈ (র.)-এর মন্তব্য হচ্ছে ইমাম শা'বী থেকে হাদীসটি প্রমাণিত নয়। বিনায়ার মুসান্নিফ (র.)-এর মতও তাই। অবশ্য ইবনে আদী আল কামেল গ্রন্থে নিম্নোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন–

عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ عِيْسَى بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ لِبَاسِ الْحَرِيْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ .

এ হাদীসের ইবারত দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, যুদ্ধের ময়দানে রেশমি পোশাক পরিধান করার বৈধতা রয়েছে। তবে হাদীসটি মুহাদ্দিসীনের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলিল : রণাঙ্গনে রেশমি কাপড় পরিধান করার আবশ্যকতা রয়েছে। কেননা রেশমি পোশাক যুদ্ধের ময়দানে দুটি উপকারে আসে। যথা– ক. খাঁটি রেশমের পোশাক শত্রুর আঘাত প্রতিহত করতে অধিক কার্যকর। কারণ রেশমি কাপড় মজবুত ও পিচ্ছিল হয়, যার ফলে তাতে আঘাত খুব ভালোভাবে লাগতে পারে না।

খ. রেশমি কাপড়ে বিশেষ চমক থাকে যা শত্রুর দৃষ্টিতে বিভ্রাট সৃষ্টি করে।

وَيُكْرَهُ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) لِأَنَّهُ لَا فَصْلَ فِيْمَا رَوَيْنَا وَالضَّرُوْرَةُ اِنْدَفَعَتْ بِالْمَخْلُوْطِ وَهُوَ الَّذِىْ لُحْمَتُهُ حَرِيْرٌ وَسَدَاهُ غَيْرُ ذٰلِكَ وَالْمَحْظُوْرُ لَا يُسْتَبَاحُ اِلَّا الضَّرُوْرَةَ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمَخْلُوْطِ .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে [যুদ্ধের ময়দানে রেশমি কাপড় পরিধান করা] মাকরূহ। কেননা আমরা পূর্বে যে হাদীস বর্ণনা করেছি তাতে [যুদ্ধের ময়দান ও অন্যাবস্থার মাঝে] কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আর যুদ্ধের ময়দানে রেশম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তো রেশম ও অন্য সুতার মিশ্র কাপড় দ্বারা পূরণ হওয়া সম্ভব। মিশ্র সুতার কাপড় হচ্ছে যার বানা রেশমের কিন্তু তানা অন্য সুতার। তাছাড়া নিষিদ্ধবস্তু অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ছাড়া বৈধ হয় না। আর পূর্বে [সাহেবাইন (র.) -এর পক্ষ থেকে] যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সুতা মিশ্রিত রেশমি কাপড়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) الخ : আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) যুদ্ধের মধ্যে রেশমি কাপড় পরিধান করার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাব আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাহেবাইন (র.) -এর মতে যুদ্ধের মধ্যে খাঁটি রেশম ব্যবহার করা জায়েজ। পক্ষান্তরে এখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধের ময়দানেও খালেস রেশমি কাপড় ব্যবহার করা তাঁর মতে মাকরূহ। কেননা রেশমি বস্ত্র নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত যে হাদীসগুলো ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধের ময়দানের হুকুম ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং সেই হাদীসগুলো সর্বাবস্থার জন্য প্রযোজ্য। অতএব যুদ্ধের ময়দানে রেশম ব্যবহারের হুকুম হাদীসের নিষিদ্ধতার বাইরে নয়।

قَوْلُهُ وَالضَّرُوْرَةُ اِنْدَفَعَتْ الخ : এ ইবারতে লেখক সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ময়দানে রেশম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে যে দলিল দেওয়া হয়েছিল তার জবাব দেওয়া হচ্ছে। জবাবের সারকথা হচ্ছে, যুদ্ধের ময়দানে রেশম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য খালেস রেশম ব্যবহার করা আবশ্যক নয়; বরং অন্য সুতা মিশ্রিত রেশমি কাপড় দ্বারাও এর প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব। আর অন্য সুতা মিশ্রিত রেশমি কাপড় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কাপড় যার বানা রেশমি সুতার কিন্তু তানা অন্য সুতার। পক্ষান্তরে যে কাপড়ের তানা রেশমের এবং বানা অন্য সুতার সে কাপড় তো প্রয়োজন ছাড়াও স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার করা যায়।

قَوْلُهُ وَالْمَحْظُوْرُ لَا يُسْتَبَاحُ اِلَّا لِضَرُوْرَةٍ : এরপর মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাবকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে বলেন, শরিয়তের নিষিদ্ধ বস্তু তো মারাত্মক প্রয়োজন ছাড়া বৈধ হয় না এবং যতটুকু দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয় ততটুকুই বৈধ হয় এর চেয়ে বেশি বৈধ হয় না। যেহেতু মিশ্র সুতার কাপড় দ্বারা এখানে প্রয়োজন পুরা হয়ে যাচ্ছে তাই খালেস রেশমের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمَخْلُوْطِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইন (র.) -এর পক্ষে উদ্ধৃত হাদীসটির জবাব দিচ্ছেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, তাদের পক্ষে যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে সেটি খালেস রেশমের ব্যাপারে নয়; বরং হাদীসটি রেশমের সাথে অন্য সুতা মিশ্রিত কাপড়ের বৈধতার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এভাবে বলা হলে নিষিদ্ধতা ও বৈধতা সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ থাকে না।

নোট : ১. যোদ্ধা যখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে তখন থেকেই সে রেশমের পোশাক পরিধান করতে পারবে। অবশ্য এ কাপড়ে নামাজ আদায় করবে না। আর যদি শত্রু কর্তৃক আক্রমণের ভয় থাকে তাহলে রেশমের পোশাক পরিহিত অবস্থায় নামাজ আদায় করতে কোনো সমস্যা নেই।

২. শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা রাসূল ﷺ -এর বংশধরের জন্য রেশমি বস্ত্র পরিধান করা বৈধ মনে করে। আহলুস্ সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে তাদের এ ধারণা সঠিক নয়।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ مَا سَدَاهُ حَرِيْرٌ وَلُحْمَتُهُ غَيْرُ حَرِيْرٍ كَالْقُطْنِ وَالْخَزِّ فِى الْحَرْبِ وَغَيْرِهِ لِاَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ كَانُوْا يَلْبَسُوْنَ الْخَزَّ وَ الْخَزُّ مُسْدًى بِالْحَرِيْرِ وَلِاَنَّ الثَّوْبَ اِنَّمَا يَصِيْرُ ثَوْبًا بِالنَّسْجِ وَالنَّسْجُ بِاللُّحْمَةِ وَكَانَتْ هِىَ الْمُعْتَبَرَةُ دُوْنَ السَّدٰى ـ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) اَكْرَهُ ثَوْبَ الْقَزِّ يَكُوْنُ بَيْنَ الْفَرْوِ وَالظِّهَارَةِ وَلَا اَرٰى بِحَشْوِ الْقَزِّ بَأْسًا لِاَنَّ الثَّوْبَ مَلْبُوْسٌ وَالْحَشْوُ غَيْرُ مَلْبُوْسٍ قَالَ : وَمَا كَانَ لُحْمَتُهُ حَرِيْرًا وَسَدَاهُ غَيْرَ حَرِيْرٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِى الْحَرْبِ لِلضَّرُوْرَةِ وَيُكْرَهُ فِىْ غَيْرِهِ لِانْعِدَامِهَا وَالْاِعْتِبَارُ لِلُّحْمَةِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এমন কাপড় পরিধান করাতে কোনো সমস্যা নেই যে কাপড়ের তানা রেশম এবং বানা রেশম ব্যতীত তুলা বা কাঁচা রেশম ইত্যাদি সুতার। যুদ্ধের মধ্যে এবং স্বাভাবিক অবস্থায়। কেননা সাহাবায়ে কেরাম (خَزٌّ) খায [কাঁচা রেশম] দ্বারা তৈরি পোশাক [সাধারণ অবস্থায়] ব্যবহার করতেন। খায বলা হয় এমন কাপড়কে যার তানা রেশমের। [তানা রেশমের হলে তা পরা জায়েজ] এর কারণ এই যে, সুতা দ্বারা বুনন করে কাপড় তৈরি হয়। আর বুননের কাজ মূলত হয় বানা দ্বারা। সুতরাং বানাই ধর্তব্য, তানা ধর্তব্য নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, বহিরাবরণের নিচে [চামড়ার উপর] কায তথা গুটিপোকা থেকে প্রাপ্ত রেশমের তৈরি কাপড় পরিধান করা মাকরূহ মনে করি, তবে রেশমকে কোনো কাপড়ের ভিতরের তুলা হিসেবে ব্যবহার করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা কাপড় পরিধান করা হয় কিন্তু কাপড়ের ভিতরগত বস্তু পরিধান করা হয় না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে কাপড়ের বানা রেশমের আর তানা অন্য সুতার সেই কাপড় প্রয়োজন পূরণার্থে যুদ্ধের ময়দানে পরিধান করাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে অন্য ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা মাকরূহ। প্রয়োজন না থাকার কারণে। আর ধর্তব্য হচ্ছে বানার সুতার যা আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ مَا الخ : উপরের ইবারতে গ্রন্থকার (র.) কাপড়ের সুতা হিসেবে যদি রেশম ও অন্য কিছু ব্যবহার করা হয় তাহলে সেই কাপড়ের হুকুম কি হবে তা আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যে কোনো কাপড়ে সাধারণত দুটি বাইন থাকে। লম্বালম্বি বা খাড়া বাইনটিকে বানা বলা হয়, আর যে বাইনটি প্রস্থে বা আড়াআড়িভাবে থাকে তাকে তানা বলা হয়। কাপড়ের মধ্যে বানার সুতা হচ্ছে আসল। সুতরাং কোনো কাপড়ের তানার সুতা যদি রেশমের হয় এবং বানার সুতা যদি রেশম ছাড়া তুলা বা কাঁচা রেশম বা অন্য কোনো ধরনের সুতার হয় তাহলে সেই বুননের কাপড় সর্বাবস্থায় অর্থাৎ যুদ্ধ ও স্বাভাবিক উভয় অবস্থায় পরিধান করাতে কোনো ধরনের সমস্যা নেই।

এ মাসআলার দলিল হলো সাহাবায়ে কেরামের আমল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) খায তথা কাঁচা রেশমের তৈরিকৃত কাপড় ব্যবহার করতেন।

খায (خَزٌّ) শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিনায়া গ্রন্থের গ্রন্থকার (র.) বলেন, খায হচ্ছে পানিতে বসবাসকারী এক ধরনের বিশেষ প্রাণীর পশম।

আল্লামা তাজুশ শরীয়তের মতে, খায হচ্ছে এমন কাপড় যার তানার সুতা রেশমের এবং বানার সুতা এক ধরনের জলজ প্রাণীর পশমে তৈরি।

হিদায়ার মুসান্নিফের মতে, যে কাপড়ের তানা রেশমের তাকে খায বলা হয়। মোটকথা সাহাবীগণ এমন কাপড় পরতেন যার তানা রেশমি সুতা দ্বারা তৈরি হতো। অতএব, এমন কাপড় পরিধান করা আমাদের জন্য বৈধ যার তানা রেশমি সুতার।

এরপর লেখক এই বলে যৌক্তিক দলিল দেন যে, কাপড় তৈরি হয় বুনন দ্বারা। বুননের ক্ষেত্রে বানাই হলো মূল। সুতরাং যে কোনো কাপড়ের মান নির্ণয় করা হবে সেই কাপড়ের বানার সুতা দেখে। অতএব কোনো কাপড়ের বানার সুতা যদি রেশমি সুতা না হয় তাহলে সেই কাপড় সর্বাবস্থায় পরিধান করা জায়েজ আছে। পক্ষান্তরে কোনো কাপড়ের বানার সুতা যদি রেশমি সুতার হয় তাহলে সে কাপড় পুরুষদের জন্য সাধারণভাবে পরিধান করা নাজায়েজ।

قَوْلُهُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) الخ : যে কাপড় মূল কাপড়ের নিচে পরা হয় যেমন গেঞ্জি; সেটিও যদি রেশমের তৈরি হয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে তা পরিধান করা নাজায়েজ। কারণ যদি মূল কাপড়ের নিচে পরিধান করা হয় তবুও তা তো কাপড় বা পরিধেয় বস্ত্র। আর পূর্বে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রেশমি কাপড় পরিধান করা নাজায়েজ। অতএব রেশমের তৈরি এ জাতীয় কাপড়ও পরিধান করা নাজায়েজ হবে।

পক্ষান্তরে যদি রেশমকে কাপড়ের ভিতরে দেওয়া হয়। যেমন তুলা বা ফোম ভিতরে দেওয়া হয় তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েজ। কারণ রেশম কাপড়ের ভিতরে থাকাবস্থায় তা পরিধেয় বলে সাব্যস্ত হয় না।

আর শরিয়তে রেশম পরিধান করাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র। যে কোনোভাবে রেশম ব্যবহারকে নাজায়েজ করা হয়নি।

قَوْلُهُ قَالَ وَمَا كَانَ لُحْمَتُهُ حَرِيْرًا الخ : উক্ত ইবারত পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট। পূর্বে বলা হয়েছিল যে, যে কোনো কাপড়ের জন্য বানার সুতাই হচ্ছে মূল। বানার সুতা যদি রেশমি না হয়ে অন্য সুতার হয় তাহলে সেই কাপড় যুদ্ধক্ষেত্র এবং অন্যান্য সাধারণ অবস্থায় তথা উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার জায়েজ। পক্ষান্তরে [আলোচ্য ইবারতে বলা হচ্ছে] যে কাপড়ের বানার সুতা রেশমি হয় সে কাপড় শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ব্যবহার করা চলে। যুদ্ধ ছাড়া সাধারণ অবস্থায় প্রয়োজন না থাকার কারণে তা ব্যবহার করা মাকরূহ হবে। এ মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, বানার সুতাই ধর্তব্য। বিষয়টি আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি।

উল্লেখ্য যে, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি তার দ্বারা রেশম পরিধান করার অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বেশি মূল্যবান পোশাক পরিধান করা যাবে না। কেননা রাসূল ﷺ একদা এমন একটি চাদর পরিধান করেন যার মূল্য চার হাজার দিরহাম। একবার তাঁর এক সাহাবী মূল্যবান চাদর পরে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে তিনি ইরশাদ করেন যে, যখন আল্লাহ কোনো বান্দার উপর বিশেষ নিয়ামত দান করেন তখন তাঁর সেই নিয়ামতের প্রকাশ হওয়াকে পছন্দ করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) চারশত দিনার মূল্যের দামি চাদর পরতেন এবং قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ الخ [আপনি বলুন! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর মধ্য থেকে সৌন্দর্যময় বস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে?] এ আয়াত দ্বারা মূল্যবান পোশাক পরিধান করার বৈধতার দলিল পেশ করতেন। একবার কেউ ইমাম আবূ হানীফা (র.) -কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হযরত ওমর (রা.) তো তালিওয়ালা জামা পরতেন [তবে আপনি কেন এত দামি কাপড় পড়েন?] উত্তরে ইমাম সাহেব (র.) বলেন, তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করার মধ্যে তাঁর বিশেষ হেকমত ছিল। তা এই যে, তিনি আমীরুল মু'মিনীন হয়ে যদি দামি পোশাক ও বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর নিযুক্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তারাও এতে অভ্যস্ত হতো। অভ্যস্ত হওয়ার পর যদি তারা সহজে সেগুলো না পেতেন তখন জুলুমের মাধ্যমে সেসব আহরণের চেষ্টা চালাতেন, আর তখন পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি হতো। এ বিশেষ হেকমতের কারণে তিনি মূল্যবান কাপড় পরিধান করা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছিলেন।

মোটকথা, রাসূল ﷺ এবং সালফে সালেহীনের আমল দ্বারা দামি পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ التَّحَلِّيْ بِالذَّهَبِ لِمَا رَوَيْنَا وَلَا بِالْفِضَّةِ لِأَنَّهَا فِيْ مَعْنَاهُ إِلَّا بِالْخَاتَمِ وَالْمِنْطَقَةِ وَحِلْيَةِ السَّيْفِ مِنَ الْفِضَّةِ تَحْقِيْقًا لِمَعْنَى النَّمُوْذَجِ وَالْفِضَّةُ أَغْنَتْ عَنِ الذَّهَبِ إِذْ هُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَيْفَ وَقَدْ جَاءَ فِيْ إِبَاحَةِ ذٰلِكَ أٰثَارٌ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পুরুষদের জন্য স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা নাজায়েজ। আমাদের বর্ণিত হাদীসের কারণে। তদ্রূপ রুপার অলংকার ব্যবহার করাও জায়েজ নয়। কেননা রুপা স্বর্ণের হুকুমে। তবে আংটি, কোমর বন্ধনী ও তরবারি সজ্জিতকরণে রুপা ব্যবহার জায়েজ। কেননা এসবের ক্ষেত্রে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি পাওয়া যায়। আর স্বর্ণের [নমুনা হিসেবে ব্যবহার করার] প্রয়োজনীয়তা রুপা দ্বারা পূরণ হয়ে যায়। কেননা উভয়টি একই প্রকৃতির ধাতু। তাছাড়া রুপা ব্যবহার করা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَجُوْزُ لِلرِّجَالِ الخ : আলোচ্য ইবারতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও রুপা ব্যবহার করা নাজায়েজ হওয়া সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পূর্ববর্ণিত হাদীসের কারণে পুরুষদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা নাজায়েজ। বর্ণিত হাদীস দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য রাসূল ﷺ -এর উক্তি- هٰذَانِ حَرَامَانِ عَلٰى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ
[স্বর্ণ ও রেশম আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা হারাম।]

এরপর তিনি বলেন, স্বর্ণের মতো রুপা ব্যবহার করাও হারাম। কারণ স্বর্ণ ও রুপা এ উভয় ধাতু একই প্রকৃতির। অর্থাৎ যদিও রুপা ব্যবহার করা নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো হাদীস উল্লেখ নেই তবুও উভয়টি একই প্রকৃতির ধাতু হওয়ার কারণে স্বর্ণের মতো রুপা ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য অবৈধ।

তবে রুপার আংটি, রুপার কোমর বন্ধনী ও তরবারি সজ্জিতকরণে রুপা ব্যবহার করাতে কোনো দোষ নেই। মুসান্নিফ (র.) পুরুষদের জন্য রুপা ব্যবহার করার সাধারণ হুকুম থেকে এ তিনটি বস্তুকে পৃথক করেছেন। এ তিনটি বস্তুর মাঝে রুপার ব্যবহার জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে তিনি দু'টি দলিল পেশ করেছেন।

প্রথম দলিল : تَحْقِيْقًا لِمَعْنَى النَّمُوْذَجِ অর্থাৎ এ তিনটি বস্তুর মাঝে নমুনা হিসেবে রুপা ব্যবহার করা জায়েজ। আর নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা সংক্রান্ত মাসআলা আমরা ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

অতঃপর তিনি বলেন, নমুনা হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি যেহেতু রুপার দ্বারা পূরণ হয়ে যায় তাই স্বর্ণকে নমুনা হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে না। কেননা স্বর্ণ ও রুপা উভয়টি একই প্রকৃতির ধাতু।

দ্বিতীয় দলিল : মুসান্নিফ (র.) كَيْفَ وَقَدْ جَاءَ فِيْ إِبَاحَةِ ذٰلِكَ أٰثَارٌ এ ইবারত দ্বারা তাঁর দ্বিতীয় দলিলটি পেশ করেন। তাঁর দ্বিতীয় দলিল হলো, রুপার আংটি, কোমর বন্ধনী ইত্যাদি ব্যবহার করা যে বৈধ এর প্রমাণ হাদীস শরীফে পাওয়া যায়। স্বয়ং রাসূল ﷺ রুপার আংটি তৈরি করে তা ব্যবহার করেছিলেন। এ সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত হাদীস ইমাম জুহুরী (র.) থেকে বর্ণিত। হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবে বর্ণিত আছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো-

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ لَهُ فَصٌّ حَبْشِيٌّ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

অন্য একটি হাদীস যা কাতাদার সূত্রে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তা হলো এই–

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَادَ اَنْ يَكْتُبَ اِلٰى بَعْضِ الْاَعَاجِمِ فَقِيْلَ اِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُوْنَ كِتَابًا اِلَّا بِخَاتَمٍ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَكَانَ فِيْ يَدِهٖ حَتّٰى قُبِضَ وَفِيْ يَدِ عُثْمَانَ حَتّٰى سَقَطَ مِنْهُ فِيْ بِئْرِ اَرِيْسٍ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَنُزِحَتْ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ .

উল্লিখিত দুটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ রুপার তৈরি আংটি আমৃত্যু ব্যবহার করেন।

কোমর বন্ধনী ও তরবারির মাঝে রুপা ব্যবহার করার বর্ণনাও হাদীস দ্বারা জানা যায়। মোটকথা যেহেতু আংটি, কোমর বন্ধনী ও তরবারির মধ্যে রুপার ব্যবহার জায়েজ হওয়ার বিষয়টি হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো তাই এগুলো ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই। পক্ষান্তরে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা নাজায়েজ হওয়ার বিষয়টিও বুখারীর একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায়। বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ فَصَّهٗ مِمَّا يَلِىْ بَاطِنَ كَفِّهٖ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهٗ فَلَمَّا رَاٰهُمْ اِتَّخَذُوْهُمَا رَمٰى بِهٖ وَقَالَ لَا اَلْبَسُهٗ اَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ حَتّٰى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِىْ بِئْرِ اَرِيْسٍ .

উপরে উল্লিখিত হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা গেল যে, রাসূল ﷺ প্রথমে স্বর্ণের আংটি তৈরি করেন। পরে সাধারণ লোকেরা যখন তাঁর অনুকরণে এর ব্যবহার শুরু করে তখন রাসূল ﷺ স্বর্ণের আংটি ছুড়ে ফেলে দেন এবং বলেন যে, আমি এটি আর কখনো ব্যবহার করব না। এভাবে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা চিরতরে হারাম হয়ে যায়।

وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَلَا يَتَخَتَّمُ اِلَّا بِالْفِضَّةِ وَهٰذَا نَصٌّ عَلٰى اَنَّ التَّخَتُّمَ بِالْحَجَرِ وَالْحَدِيْدِ وَالصُّفْرِ حَرَامٌ وَرَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ خَاتَمَ صُفْرٍ فَقَالَ لِىْ مَا اَجِدُ مِنْكَ رَائِحَةَ الْاَصْنَامِ وَ رَاٰى عَلٰى اٰخَرَ خَاتَمَ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَا لِىْ اَرٰى عَلَيْكَ حِلْيَةَ اَهْلِ النَّارِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ اَطْلَقَ فِى الْحَجَرِ الَّذِىْ يُقَالُ لَهٗ يَشْبُ لِاَنَّهٗ لَيْسَ بِحَجَرٍ اِذْ لَيْسَ لَهٗ ثِقْلُ الْحَجَرِ وَاِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِى الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلٰى تَحْرِيْمِهٖ .

অনুবাদ : জামিউস সাগীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রুপা ব্যতীত অন্য কোনো ধাতুর আংটি পরিধান করা জায়েজ নেই। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পাথর, লোহা ও পিতলের আংটি পরিধান করা হারাম। অধিকন্তু রাসূল ﷺ [একদা] এক ব্যক্তির হাতে পিতলের আংটি দেখে বললেন, আমার কি হলো যে, তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি এবং তিনি আরেক ব্যক্তির হাতে লোহার আংটি দেখে বললেন, আমার কি হলো যে, তোমার গায়ে দোজখি লোকদের অলঙ্কার দেখতে পাচ্ছি। কতিপয় ফকীহের মতে ইয়াশিব (يَشْبُ) পাথর [আংটি হিসেবে] ব্যবহার করা বৈধ। কেননা এটি পাথর নয় এবং এর পাথরের মতো ওজন নেই। কিন্তু জামিউস সাগীর কিতাবের ইবারত নিঃশর্তভাবে ব্যবহার হওয়া প্রমাণ করে যে, এটিও হারাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَلَا يَتَخَتَّمُ اَلخ : উপরের ইবারতে স্বর্ণ ছাড়া আরো কি ধরনের আংটি ব্যবহার করা অবৈধ তা জামিউস সাগীরের উদ্ধৃতিতে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, জামিউস সাগীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে– وَلَا يَتَخَتَّمُ اِلَّا بِالْفِضَّةِ [পুরুষদের জন্য] রুপা ছাড়া অন্য কোনো ধাতুর আংটি পরিধান করা জায়েজ নেই।' এ ইবারতের ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, ইবারত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পাথর, লোহা ও পিতলের আংটি ব্যবহার করা হারাম।

প্রশ্ন. এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এ ইবারত দ্বারা কিভাবে সুস্পষ্টভাবে রূপা ব্যতীত পাথর, লোহা ও পিতলের আংটি ব্যবহার হারাম হওয়া প্রমাণিত হলো?

উত্তর. এর উত্তর নিম্নরূপ, আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী لَا يَتَخَتَّمُ اِلَّا بِالْفِضَّةِ বাক্যটি حَصْر -এর সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ রুপার কথা اِسْتِثْنَاء -এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ বাক্যের অর্থ হলো রুপা ছাড়া অন্যসব ব্যবহার করা নাজায়েজ এবং শুধুমাত্র রূপা ব্যবহার করাই জায়েজ।

এরপর মুসান্নিফ (র.) পিতল ও লোহার আংটি নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীস– رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ خَاتَمَ صُفْرٍ فَقَالَ مَا لِىْ اَجِدُ مِنْكَ رَائِحَةَ الْاَصْنَامِ

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) তাঁর রীতি অনুযায়ী হাদীসটি সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচিত হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম তিরমিযী (র.) স্ব-স্ব কিতাবে নিম্নোক্ত সনদে উল্লেখ করেছেন।

عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَا لِىْ اَرٰى عَلَيْكَ حِلْيَةَ اَهْلِ النَّارِ ثُمَّ جَاءَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شِبْهٍ فَقَالَ مَا لِىْ اَرٰى مِنْكَ رِيْحَ الْاَصْنَامِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَىِّ شَيْءٍ اَتَّخِذُهٗ مِنْ وَرِقٍ ؟ فَقَالَ اِتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ لَا تُتِمَّهٗ مِثْقَالًا .

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর কাছে আসল, তার হাতে লোহার আংটি ছিল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, আমার কি হলো যে, আমি তোমার হাতে জাহান্নামিদের অলঙ্কার দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর সে পিতলের আংটি পরে আসলে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, আমার কি হলো যে, আমি তোমার থেকে মূর্তিদের গন্ধ পাচ্ছি। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কি দ্বারা আংটি তৈরি করব? রুপা দিয়ে? রাসূল ﷺ তাকে বললেন, রুপা দিয়ে আংটি তৈরি কর এবং এতে এক মিছকালের বেশি রূপা দিও না।

মোটকথা এ হাদীস দ্বারা লোহা ও পিতলের তৈরি আংটি ব্যবহার করার অবৈধতা প্রমাণিত হয়। সেই সাথে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ একই ব্যক্তির হাতে লোহা ও পিতলের আংটি দেখেছিলেন। সুতরাং হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) যে বলেছেন, رَأٰى عَلٰى اٰخَرَ এ কথাটি ঠিক নয়।

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ اَطْلَقَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, জামিউস সাগীরের ইবারত দ্বারা সাধারণভাবে পাথরের আংটি ব্যবহার করা হারাম প্রমাণিত হয়। কিন্তু কতিপয় ফকীহ, যেমন– শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) সহ প্রমুখের মতে ইয়াশিব (يَشْبٌ) নামক পাথরের আংটি ব্যবহার করা জায়েজ।

তিনি জামিউস সাগীরের ভাষ্যগ্রন্থে যা উল্লেখ করেন তা হলো নিম্নরূপ, "জামিউস সাগীরের ইবারতের কারণে কতিপয় মাশায়েখ ইয়াশিব পাথরের আংটি ব্যবহারকে মাকরূহ মনে করেন। কিন্তু বিশুদ্ধতার কথা এই যে, ইয়াশিব পাথরের আংটি ব্যবহার করাতে কোনো দোষ নেই। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর উদ্দেশ্য হলো স্বর্ণ ও লোহার আংটি ব্যবহার করা হারাম। এগুলোর ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এগুলো জাহান্নামিদের পরিধেয় বস্ত্র হবে। আমরা বলি, আকিক পাথরের মতো ইয়াশিব পাথরের আংটি ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই।

আকিক পাথরের ব্যাপারে হাদীসে পাওয়া যায় যে, রাসূল ﷺ আকিক পাথরের আংটি ব্যবহার করেছেন এবং তিনি বলেছেন, তোমরা এর আংটি ব্যবহার কর। কেননা এটি মুবারক পাথর।" –[সূত্র-বিনায়া]

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِحَجَرٍ اِذْ لَيْسَ لَهُ ثِقْلُ الْحَجَرِ : লেখক এখানে কতিপয় আলেমের পক্ষে যুক্তি পেশ করেন, যারা বলেছেন ইয়াশিব পাথর আংটি হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ। লেখক বলেন, ইয়াশিব তো মূলত পাথরই নয়। কারণ পাথরের যে ওজন হয় ইয়াশিবের মধ্যে তেমন ওজন নেই।

এই যুক্তির উপর বিনায়ার গ্রন্থকার (র.) আপত্তি করে বলেন, এর ওজন কম হওয়ার কারণে এটি পাথর নয় এ কথা বলা উচিত নয়। কেননা আকিকের ওজনও কম তারপরেও সকলে আকিককে পাথর হিসেবে মেনে নিয়েছে।

قَوْلُهُ اِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِى الْكِتَابِ الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে লেখক ইয়াশিব সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত জানান। ইবারতের সারকথা হলো ইয়াশিব একটা পাথর। জামিউস সাগীরের ইবারত দ্বারা সব ধরনের পাথরের আংটি পরা নিষিদ্ধ হয়েছে তাই ইয়াশিব পাথরের আংটি ব্যবহারও হারাম হবে।

অবশ্য হিদায়ার মুসান্নিফের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের উপর ফতোয়া নয়। ফতোয়া হলো ইয়াশিব ব্যবহার জায়েজ হওয়ার উপর। ফাতওয়ায়ে শামী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইয়াশিব পাথর নয়, তাই এর ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।

وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامٌ لِمَا رَوَيْنَا وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَلِاَنَّ الْاَصْلَ فِيْهِ التَّحْرِيْمُ وَالْاِبَاحَةُ ضَرُوْرَةَ الْخَتْمِ اَوِ النَّمُوْذَجِ وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِالْاَدْنٰى وَهُوَ الْفِضَّةُ وَالْحَلْقَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ لِاَنَّ قِوَامَ الْخَاتَمِ بِهَا وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْفَصِّ حَتّٰى يَجُوْزَ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ حَجَرٍ وَيَجْعَلُ الْفَصَّ اِلٰى بَاطِنِ كَفِّهِ بِخِلَافِ النِّسْوَانِ لِاَنَّهُ تَزَيُّنٌ فِيْ حَقِّهِنَّ .

অনুবাদ : আমাদের বর্ণিত হাদীসের কারণে স্বর্ণের আংটি পুরুষদের জন্য পরিধান করা হারাম। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া [স্বর্ণের ক্ষেত্রে] মূলনীতি হলো তা [পুরুষের জন্য] হারাম। আংটির ব্যবহার কিংবা নমুনা হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োজনে এটাকে বৈধ করা যেত। কিন্তু সেই প্রয়োজন তো এর চেয়ে কম মানের ধাতু তথা রুপা দ্বারা পূরণ হয়ে গেছে। আংটির ক্ষেত্রে রিংটিই মূল। কেননা এর দ্বারাই আংটি অস্তিত্ব লাভ করে। আংটির নগিনা ধর্তব্য নয়। এ কারণেই তো এটি পাথরের হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। নগিনাকে হাতের পেটের দিকে রাখবে তবে মহিলাগণ তা ভিতরে রাখবে না। কেননা আংটি তাদের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য প্রকাশক হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ عَلَى الخ : ইতঃপূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যাতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম বলা হয়েছে। সেই হাদীসের আলোকে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এখানে মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন যা দ্বারা বিশেষভাবে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি হলো নিম্নরূপ– عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ [মহানবী ﷺ স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।]

এ হাদীস সম্পর্কে বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম বুখারী ছাড়া ইমাম মুসলিমসহ অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এতদসম্পর্কিত পুরো হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

'হযরত রাসূল ﷺ স্বর্ণের আংটি, কাসী পোশাক ও কুসুম রঙের কাপড় পরিধান করতে এবং রুকু ও সিজদারত অবস্থায় কেরাত পড়তে নিষেধ করেছেন।'

মোটকথা এ হাদীস দ্বারা সরাসরি এবং পূর্বে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম হওয়ার অধীনে স্বর্ণের আংটি পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ وَلِاَنَّ الْاَصْلَ فِيْهِ التَّحْرِيْمُ : লেখক এ ইবারত দ্বারা স্বর্ণের আংটি ব্যবহার হারাম হওয়ার সম্পর্কে যুক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, স্বর্ণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে হারাম হওয়া।

এখানে فِيْهِ -এর ضَمِيْر -এর مَرْجِع কি হবে? এ ব্যাপারে ভাষ্যকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আশরাফুল হিদায়ার মুসান্নিফের মতে এর مَرْجِع হলো تَخَتُّم - এ হিসেবে ইবারতের অর্থ হবে– আংটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধান হলো হারাম হওয়া। পক্ষান্তরে বিনায়া গ্রন্থের গ্রন্থকার (র.) -এর মতে এর مَرْجِع হলো اِسْتِعْمَالُ الذَّهَبِ - অবশ্য তিনি বলেন, اِسْتِعْمَالُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ হলে আরো উত্তম হয়। আমরা বিনায়ার মুসান্নিফের বর্ণিত ব্যাখ্যানুযায়ী ইবারতের অর্থ করেছি।

قَوْلُهُ وَالْاِبَاحَةُ ضَرُوْرَةَ التَّخَتُّمِ اَوْ الخ : আংটির ব্যবহার কিংবা স্বর্ণ-রুপার ব্যবহার বৈধ করা হয়েছে আংটি ব্যবহারের প্রয়োজনের খাতিরে কিংবা নমুনা হিসেবে ব্যবহারের জন্য। সেই প্রয়োজন যেহেতু স্বর্ণের চেয়ে কম মানের ধাতু তথা রুপা দ্বারা পূরণ হয়ে যায়, তাই আংটির ক্ষেত্রে স্বর্ণ ব্যবহারের নিষিদ্ধতা পূর্ববৎ বহাল থাকবে।

নমুনা হিসেবে ব্যবহার করার কি ব্যাখ্যা হতে পারে তা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর তা হলো জান্নাতে স্বর্ণ ও রুপা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। এখানে সেই নিয়ামতের নমুনা হিসেবে সামান্য ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ জান্নাতের নিয়ামত হাসিলের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করে।

قَوْلُهُ وَالْحَلْقَةُ هِىَ الْمُعْتَبَرَةُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আংটির মধ্যে হালকা বা রিংটাই মূল। কারণ রিং-এর উপর ভিত্তি করে আংটি অস্তিত্ব লাভ করে। আংটির নগিনা বা যে অংশে পাথর থাকে সেটা কখনো ধর্তব্য হয় না। সুতরাং খেয়াল রাখতে হবে যেন আংটির রিং শরিয়তে নিষিদ্ধ এমন কোনো ধাতু দ্বারা না হয়। নগিনা যে ধর্তব্য নয় এর প্রমাণ হলো, পাথরের আংটি ব্যবহার করা জায়েজ নেই অথচ পাথরের নগিনা ব্যবহার করা জায়েজ।

قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ الْفَصَّ اِلٰى بَاطِنِ كَفِّهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পুরুষগণ যখন আংটি ব্যবহার করবে তখন আংটির নগিনা হাতের পেটের দিকে বা ভিতরের দিকে রাখবে। পক্ষান্তরে মহিলারা তাদের আংটির নগিনা হাতের পিঠে বা বাইরের দিকে রাখবে। কারণ আংটির নগিনা দ্বারা তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আর মহিলাদের আংটি পরিধানের উদ্দেশ্যই হলো সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। মহর মারার প্রয়োজন তো তাদের নেই।

নোট : আংটি কোন হাতে পরবে এর কোনো উল্লেখ এখানে করা হয়নি। কারণ উভয় হাতে পরা যায়। রাসূল ﷺ থেকে হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ডান হাতে আংটি পরতেন। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বাম হাতে আংটি পরতেন।

বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) -এর মতে বাম হাতে আংটি পরা উত্তম।

وَإِنَّمَا يَتَخَتَّمُ الْقَاضِيْ وَالسُّلْطَانِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْخَتْمِ فَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتْرُكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِمِسْمَارِ الذَّهَبِ يَجْعَلُ فِيْ حَجَرِ الْفَصِّ أَيْ فِيْ ثَقْبِهِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَالْعِلْمِ فِي الثَّوْبِ فَلَا يُعَدُّ لَابِسًا لَهُ .

অনুবাদ : বাদশাহ এবং বিচারক মহর [সীল] মারার উদ্দেশ্যে আংটি ব্যবহার করবেন। অন্যদের ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন না থাকার কারণে উত্তম হলো আংটি ব্যবহার না করা। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, স্বর্ণের পেরেক ব্যবহার করাতে কোনো ধরনের সমস্যা নেই- যা দ্বারা আংটির নগীনার ছিদ্র ভরাট করা হয়। কেননা, এটি তো মূল বস্তুর অনুগামী [তা'বে] যেমন– মূল কাপড়ের মাঝে স্বর্ণের কারুকাজ করা জায়েজ। অতএব, এ ব্যক্তি স্বর্ণ পরিধান করেছে বলে গণ্য করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يَتَخَتَّمُ الْقَاضِيْ الخ : পুরুষদের মধ্যে বিচারক, বাদশাহ কিংবা বাদশাহের প্রতিনিধি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য সীল মহরের উদ্দেশ্যে রূপার আংটি পরিধান করা বৈধ রাখা হয়েছে। আর যাদের এরূপ কোনো প্রয়োজন নেই তাদের জন্য আংটি পরিধান না করাই উত্তম।

সদরুশ্ শহীদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বাদশাহ ও বিচারক যাদের আংটি পরিধান করা প্রয়োজন তাদের জন্য আংটি পরা সুন্নত। অন্য যাদের এরূপ প্রয়োজন নেই তাদের জন্য আংটি ব্যবহার না করা উত্তম।

উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ অপ্রয়োজনে আংটি পরিধান করা মাকরূহ মনে করেন। মূলত: অপ্রয়োজনে আংটি পরা মাকরূহ নয়; বরং অপ্রয়োজনে আংটি পরা অনুচিত ও অনুত্তম। –[ফাতাওয়ায়ে শামী]

قَوْلُهُ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِمِسْمَارِ الذَّهَبِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, রূপার আংটির নগীনা বা পাথর বসানোর স্থানে যদি সামান্য ছিদ্র থাকে, আর সেই ছিদ্র যদি স্বর্ণের পেরেক দ্বারা ভরাট করা হয় তাহলে এতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ এ সামান্য স্বর্ণ যা নগীনার মাঝে ব্যবহার করা হচ্ছে তা মূল আংটির তা'বে [অনুগামী] আর তা'বে বস্তু কখনো ধর্তব্য হয় না। এটা কাপড়ের মাঝে স্বর্ণের কারুকাজের মতো হলো। কোনো কাপড়ের মাঝে স্বর্ণের কারুকাজ করলে এর ব্যবহার যেমন অবৈধ হয় না তদ্রূপ উল্লিখিত আংটি ব্যবহার করা অবৈধ হবে না এবং উক্ত আংটি ব্যবহারকারীকে স্বর্ণ ব্যবহারকারী সাব্যস্ত করা হবে না।

قَالَ : وَلَا تُشَدُّ الْاَسْنَانُ بِالذَّهَبِ وَتُشَدُّ بِالْفِضَّةِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَا بَأْسَ بِالذَّهَبِ اَيْضًا وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) مِثْلُ قَوْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَهُمَا اَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ اَسْعَدَ اُصِيْبَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَانْتَنَّ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاَنْ يَتَّخِذَ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْاَصْلَ فِيْهِ التَّحْرِيْمُ وَالْاِبَاحَةُ لِلضَّرُوْرَةِ وَقَدِ انْدَفَعَتْ بِالْفِضَّةِ وَهِىَ الْاَدْنٰى فَبَقِىَ الذَّهَبُ عَلَى التَّحْرِيْمِ وَالضَّرُوْرَةُ فِيْمَا رُوِىَ لَمْ تَنْدَفِعْ الْاَنْفُ دُوْنَهُ حَيْثُ اِنْتَنَّ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাঁধানো জায়েজ নেই। দাঁত বাঁধানো হবে রূপা দ্বারা। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাঁধানোতে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে তাদের প্রত্যেকের অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। তাঁদের দলিল হলো এই যে, হযরত আরফাজাহ ইবনে আসআদ কুলাব যুদ্ধের ময়দানে তার নাকে আঘাত পান [এবং এতে তাঁর নাক কেটে যায়]। অতঃপর তিনি রুপার একটি নকল নাক তৈরি করে সেখানে স্থাপন করেন। এতে দুর্গন্ধ ছড়ালে রাসূল ﷺ তাকে স্বর্ণের নাক তৈরি করার আদেশ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, স্বর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার বিধান হলো হারাম হওয়া। তা বৈধ করা হয় প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। এখানে সে প্রয়োজন এর চেয়ে নিম্নমানের ধাতু তথা রুপা দ্বারা পূরণ হয়েছে। সুতরাং স্বর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। কিন্তু হাদীসের বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, স্বর্ণের নিম্নমানের ধাতু [তথা রুপা] দ্বারা তা সমাধান হয়নি। কেননা তা ব্যবহারের ফলে নাক দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا تُشَدُّ الْاَسْنَانُ بِالذَّهَبِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুসারে কারো দাঁত ভেঙ্গে গেলে তদস্থলে স্বর্ণের দাঁত বাঁধানো নাজায়েজ। তবে রুপা নির্মিত দাঁত বাঁধানো জায়েজ আছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে স্বর্ণের দাঁত বাঁধানোতে কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সাথে। আর অন্য বর্ণনা মতে তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর সাথে।

ফখরুল ইসলাম ইমাম বাযদুবী (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফের আখিরী মত ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর সাথে। প্রথমে অবশ্য তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অনুরূপ মত পোষণ করতেন। পরবর্তীতে তিনি তা পরিবর্তন করেন।

সাহেবাইন (র.) -এর দলিল–

اِنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ اَسْعَدَ اُصِيْبَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَاَنْتَنَ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِاَنْ يَّتَّخِذَ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ .

'হযরত নবী করীম ﷺ হযরত আরফাজাহ (রা.) -কে স্বর্ণ দ্বারা তার নাক বাঁধনোর আদেশ করেন।' এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্ণ দ্বারা নাক বাঁধানো জায়েজ। যেহেতু স্বর্ণ দ্বারা নাক বাঁধানো জায়েজ অতএব স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাঁধানো জায়েজ হবে।

আলোচ্য হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (র.), ইমাম নাসাঈ (র.) ও ইমাম তিরমিযী (র.) তাদের কিতাবে নিম্নোক্ত সনদে রেওয়ায়েত করেছেন–

عَنْ اَبِى الْاَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ طَرَفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ اَنَّ جَدَّهٗ عَرْفَجَةَ بْنَ اَسْعَدَ اُصِيْبَ اَنْفُهٗ يَوْمَ الْكِلَابِ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَاَنْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ .

উক্ত হাদীস ছাড়াও আরো অনেক হাদীস আল্লামা যায়লাঈ (র.) نَصْبُ الرَّايَةِ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যা দ্বারা স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাঁধানোর বৈধতা প্রমাণিত হয়।

মোটকথা বহু হাদীস দ্বারা সাহেবাইন (র.)-এর মাযহাব প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, স্বর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধান হলো তা পুরুষের জন্য হারাম। অবশ্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কখনো তা ব্যবহার করা বৈধ হয়। দাঁত বাঁধানোর জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা আবশ্যক নয়; বরং রুপা দ্বারা দাঁত বাঁধানো যায়। যেহেতু রুপা দ্বারা দাঁত বাঁধানো যায় তাই দাঁত বাঁধানোর ক্ষেত্রে স্বর্ণ ব্যবহারের অবৈধতা বহাল থাকবে। অর্থাৎ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম– এ হাদীসের আলোকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) দাঁত বাঁধানোর ক্ষেত্রে স্বর্ণ ব্যবহারকে অবৈধ বলে মনে করেন।

قَوْلُهٗ وَالضَّرُوْرَةُ فِيْمَا رُوِىَ لَمْ تَنْدَفِعْ فِى الْاَنْفِ دُوْنَهُ الخ : উক্ত ইবারত ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পক্ষ থেকে সাহেবাইন (র.) -এর পক্ষে বর্ণিত হাদীসের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারকথা হলো, আরফাজাহ (রা.) -এর নাকের মধ্যে রুপা দ্বারা প্রয়োজন সমাধা হয়নি। কেননা রুপা দ্বারা নাক বাঁধাই করার পর নাকটি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায় অতএব রাসূল ﷺ স্বর্ণ দ্বারা নাক বাঁধাই করার আদেশ করেন। অতএব এ হাদীস দ্বারা দাঁত বাঁধাই করার পক্ষে কোনো দলিল পাওয়া গেল না।

নোট : কুলাব (كِلَابٌ) কুফা ও বসরা নগরীর মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। এতে আরবদের মাঝে এক মারাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধে হযরত আরফাজাহ (রা.) -এর নাক কাটা পড়ে।

قَالَ : وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الذُّكُورُ مِنَ الصِّبْيَانِ الذَّهَبَ وَالْحَرِيْرَ لِأَنَّ التَّحْرِيْمَ لَمَّا ثَبَتَ فِيْ حَقِّ الذُّكُوْرِ وَحَرُمَ اللُّبْسُ حَرُمَ الْإِلْبَاسُ كَالْخَمْرِ لَمَّا حَرُمَ شُرْبُهُ حَرُمَ سَقْيُهُ . قَالَ وَتُكْرَهُ الْخِرْقَةُ الَّتِيْ تُحْمَلُ فَيُمْسَحُ بِهَا الْعِرْقُ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُّرٍ وَتَكَبُّرٍ وَكَذَا الَّتِيْ يُمْسَحُ بِهَا الْوُضُوْءُ أَوْ يُمْتَخَطُ بِهَا وَقِيْلَ إِذَا كَانَ عَنْ حَاجَةٍ لَا يُكْرَهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَكَبُّرٍ وَتَجَبُّرٍ فَصَارَ كَالتَّرَبُّعِ فِي الْجُلُوْسِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْبِطَ الرَّجُلُ فِيْ إِصْبَعِهِ أَوْ خَاتَمِهِ الْخَيْطَ لِلْحَاجَةِ وَيُسَمَّى ذٰلِكَ الرَّتَمُ وَالرَّتِيْمَةُ وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ قَالَ قَائِلُهُمْ شِعْرٌ : لَا يَنْفَعَنَّكَ الْيَوْمَ إِنْ هَمَّتْ بِهِمْ * كَثْرَةُ مَا تُوْصِيْ وَتَعْقَادُ الرَّتَمِ * وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ بِذٰلِكَ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَبَثٍ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْغَرَضِ الصَّحِيْحِ وَهُوَ التَّذَكُّرُ عِنْدَ النِّسْيَانِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ছেলে শিশুদেরকে স্বর্ণ ও রেশমি পোশাক পরিধান করানো মাকরূহ। কেননা যখন পুরুষদের ব্যাপারে এগুলো ব্যবহার করা হারাম হওয়া প্রমাণিত হলো, তখন এগুলো পরিধান করা ও করানো উভয়ই হারাম সাব্যস্ত হলো। যেমন মদ, যখন এর পান করা হারাম হলো পান করানোও হারাম সাব্যস্ত হলো। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শরীরের ঘাম মোছার উদ্দেশ্যে টুকরা কাপড় সঙ্গে রাখা মাকরূহ। কেননা এটা এক ধরনের অহংকার ও আত্মম্ভরিতা। তদ্রূপ যে কাপড় দ্বারা অজুর পানি মোছা হয় এবং নাক পরিষ্কার করা হয় তাও মাকরূহ। অবশ্য মাকরূহ তখনই হবে যখন এরূপ করা হবে অহংবোধ ও গর্ববোধের কারণে। সুতরাং এটা আসন পেতে [চারজানু হয়ে] বসার মতো হলো। কোনো ব্যক্তির আঙ্গুলে কিংবা আংটিতে প্রয়োজনে সুতা বাঁধাতে কোনো সমস্যা নেই। একে রাতম (رَتَم) ও রাতীমা (رَتِيْمَة) বলা হয়। এরূপ করা পূর্ব যুগে আরবদের একটি অভ্যাস ছিল। যেমন কোনো আরব কবি বলেছেন– 'আজ তোমার বেশি বেশি নসিহত ও গাছের ডাল বেঁধে রাখা কোনোই কাজে আসবে না। সে যদি কোনো ধরনের ব্যভিচারের ইচ্ছা করে থাকে।' অধিকন্তু বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর জনৈক সাহাবীকে এরূপ করার আদেশ করেছেন। আর [এটা জায়েজ] এজন্য যে, এটা কোনো অনর্থক কাজ নয়। কারণ এতে ভালো ও সৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হলো ভুলে যাওয়ার সময় স্মরণ হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الذُّكُوْرُ الخ : অনেকে এমন আছে যারা শরীরের ঘাম মোছার জন্য রুমাল বা টুকরা কাপড় ইত্যাদি সাথে রাখেন। এমন রুমাল বা টুকরা কাপড় সাথে রাখা মাকরূহ যদি তা অহংকার ও আভিজাত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

এ মাসআলা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী (র.) জামিউস সাগীরের ভাষ্যগ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, 'ফকীহ আবূ জা'ফর (র.) বলতেন, এটা তখনই মাকরূহ হবে যখন সেই কাপড় বা রুমালটি মূল্যবান ও দামি বস্ত্র হবে। কেননা কেবলমাত্র তখনই সেটা দ্বারা অহংকার বা গর্ব প্রকাশ করা যাবে। পক্ষান্তরে যদি সেই টুকরা কাপড় বা রুমাল কম দামি হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কারণ কম দামি কাপড়ে নাক মোছাতে অহংকারের কিছু নেই।' [সূত্র- বিনায়া]

قَوْلُهُ وَكَذَا الَّتِي يَمْسَحُ بِهَا الْوُضُوءَ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অনুরূপভাবে যে সকল কাপড় দ্বারা অজুর পানি মোছা হয় কিংবা নাক পরিষ্কার করা হয় তা সাথে রাখা মাকরূহ।

ইবারতের ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) বলেন, কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন– প্রয়োজনে এরূপ কাপড় সাথে রাখা হলে মাকরূহ হবে না। মুসান্নিফ (র.) বলেন, আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে বিনায়াতে কিতাবুল আ-ছারের একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাম্মাদ (র.) থেকে, তিনি ইবরাহীম নাখঈ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অজু করে কাপড় দ্বারা চেহারা মুছে। তার হুকুম কি? তিনি বলেন, এরূপ করাতে কোনো দোষ নেই। অতঃপর তিনি বলেন যে, তুমি কি মনে কর, একটা লোক প্রচণ্ড শীতে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করল সে কি তার শরীর শুকানো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে? ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এ মতটি আমরা গ্রহণ করেছি। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। তা ছাড়া ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন–

كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ

বর্ণিত হাদীসে সনদের দিক থেকে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। বাকি এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ একটি টুকরো কাপড়ে অজুর পানি মাসেহ করতেন।

মোটকথা, অজুর পানি মোছার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে টুকরো কাপড় রাখাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে কেউ যদি অহংকার ও আভিজাত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে এরূপ কাপড় সাথে রাখে তাহলে অহংকার প্রকাশের কারণে তা মাকরূহ হবে।

قَوْلُهُ فَصَارَ كَالتَّرَبُّعِ فِي الْجُلُوْسِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, অজুর পানি মোছার জন্য টুকরো কাপড় ব্যবহার করাটা আসন পেতে বসা বা চারজানু হয়ে বসার মতো। চারজানু হয়ে বসার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম হলো, যদি তা অহংকারের কারণে হয়, তাহলে মাকরূহ অন্যথায় এতে কোনো সমস্যা নেই। অনুরূপভাবে রুমাল বা টুকরা কাপড় ব্যবহার করা অহংকারের কারণে হলে মাকরূহ অন্যথায় এতে কোনো সমস্যা নেই।

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْبِطَ الرَّجُلُ فِي إِصْبَعِهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তার হাতে বা আংটিতে সুতা বেঁধে রাখে তাহলে তাতে কোনো রকম সমস্যা নেই। এরূপ সুতা বাঁধাকে رَتَمٌ [রাতাম] ও رَتِيْمَةٌ [রাতীমা] বলা হয়। আর এরূপ করা আরবের সাধারণ মানুষের অভ্যাস ছিল। তারা কোনো কিছু স্মরণ করার উদ্দেশ্যে এরূপ করত।

رَتَمٌ [রাতাম]-এর আরেকটি সুরত হলো, সেই যুগের লোকেরা কোথাও সফরে বা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গমনের সময় গাছের দুটি ডালের মধ্যে সুতার সাহায্যে গিঁঠ দিত বা দুটি ডাল একত্রে বাঁধত। অতঃপর সফর থেকে ফিরে আসার পর সেই দুটি ডালের বাঁধন পরীক্ষা করে দেখত যে, তা খোলা অবস্থায় আছে নাকি বাঁধা অবস্থায়। বাঁধা অবস্থায় পেলে তারা মনে করত তাদের স্ত্রীরা তাদের অনুপস্থিতিতে কারো সাথে কোনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি। পক্ষান্তরে ডালের বাঁধন খোলা অবস্থায় পেলে তারা মনে করত যে, তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্ত্রীগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) রাতাম যে আরবের সাধারণ লোকদের প্রথাসিদ্ধ একটি বিষয় ছিল তা একটি কবিতার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন।

জনৈক আরব কবি বলেন- وَلَا يَنْفَعَنَّكَ الْيَوْمَ إِنْ هَمَّتْ بِهِمْ * كَثْرَةُ مَا تُوصِى وَتَعْقَادُ الرَّتَمِ

কবিতার সাধারণ অর্থ এই- যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে যতই উপদেশ দাও এবং গাছের ডালে বেঁধে দাও তাতে কোনোই কাজে আসবে না যে, সে ব্যভিচারের ইচ্ছা পোষণ করে।

কেউ কেউ এ কবিতায় উল্লিখিত رَتَم দ্বারা আঙ্গুলে সুতা বেঁধে দেওয়ার অর্থ গ্রহণ করেছেন।

কবিতার মর্মার্থ এই যে, যদি তোমার স্ত্রী সতীসাধ্বী হয় তাহলে এরূপ গাছের ডালে বেঁধে দেওয়া কিংবা আঙ্গুলে সুতা না বাঁধলেও তারা সুপথে থাকবে। পক্ষান্তরে যদি তারা অসতী হয় তাহলে এরূপ করে তাদেরকে খারাপ পন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

মোটকথা মুসান্নিফ (র.) এ কবিতা দ্বারা এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, রাতাম আরবের লোকদের একটি সাধারণ আচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

قَوْلُهُ وَقَدْ رُوِىَ أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بَعْضَ الخ : মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা রাতাম যে শরিয়ত অনুমোদিত তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ তাঁর জনৈক সাহাবীকে রাতাম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ হাদীস সম্পর্কে বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) -এর মন্তব্য হলো, রাসূল ﷺ এরূপ কাউকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য এ সংক্রান্ত [অর্থাৎ রাসূল ﷺ তাঁর আংটিতে সুতা বেঁধেছেন জাতীয়] কিছু হাদীস বর্ণিত আছে- যার সবগুলোই সনদের দিক থেকে চরম দুর্বল।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَبَثٍ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْغَرْضِ الصَّحِيْحِ : রাতাম জায়েজ হওয়ার পক্ষে মুসান্নিফ (র.) এখানে একটি যুক্তি পেশ করেছেন। তা এই যে, এরূপ সুতা বাঁধার পিছনে একটি ভালো উদ্দেশ্য আছে। তা হলো কোনো বিষয় ভুলে গেলে এটা দেখে স্মরণ হবে। আর সাধারণ নিয়ম হলো, যদি কোনো কাজের পিছনে ভালো উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেই কাজ মাকরূহ ও নিষিদ্ধ হয় না। তাছাড়া এরূপ করার সাধারণ রীতি চলে আসছে বহুকাল থেকে। এ ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি। অতএব, এটা জায়েজ হবে বৈকি।

فَصْلٌ : فِى الْوَطْئِ وَالنَّظْرِ وَالْمَسِّ

অনুচ্ছেদ : সঙ্গম, তাকানো এবং স্পর্শ করা প্রসঙ্গে

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَّنْظُرَ الرَّجُلُ اِلَى الْاَجْنَبِيَّةِ اِلَّا اِلٰى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَالْمُرَادُ مَوْضِعُهُمَا وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفُّ كَمَا اَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّيْنَةِ الْمَذْكُوْرَةِ مَوَاضِعُهَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বেগানা [যে সকল মহিলাকে বিবাহ করতে শরিয়তে কোনো নিষেধ নেই।] মহিলার মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি ছাড়া দেহের অন্য কোনো অংশ দেখা জায়েজ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ আর তারা যেন সাধারণভাবে যা অনাবৃত থাকে তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। [২৪ : ৩১] হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, مَا ظَهَرَ مِنْهَا দ্বারা সুরমা ও আংটি। অর্থাৎ এ দুটির স্থান। আর তা হলো চেহারা তথা মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জি। যেমন সৌন্দর্য (زِيْنَةٌ) দ্বারা উদ্দেশ্য এর স্থানসমূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَصْلٌ فِى الْوَطْئِ وَالنَّظْرِ وَالْمَسِّ : আলোচ্য ইবারত থেকে নতুন একটি অনুচ্ছেদের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) এ অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন فِى الْوَطْئِ وَالنَّظْرِ وَالْمَسِّ -এর মাধ্যমে। এখানে اَلنَّظْرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বেগানা মহিলাদের প্রতি তাকানো। আর اَلْمَسُّ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বেগানা মহিলার শরীর স্পর্শ করা, ছোঁয়া বা ধরা। اَلْوَطْئُ দ্বারা এখানে عَزْلٌ তথা যৌন মিলনে বীর্য স্খলন ঘটানো উদ্দেশ্য।

মুসান্নিফ (র.) প্রথমে نَظْرٌ -এর আলোচনা করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো বেগানা মহিলার চেহারা ও দুই হাতের কব্জি ছাড়া শরীরের অন্য কোনো স্থান দেখা জায়েজ নেই। আর এ দুটি অঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গকে দেখা যে জায়েজ নেই তা মুসান্নিফ (র.) কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ, মহিলাদের যেসব অঙ্গ সাধারণভাবে প্রকাশমান তাছাড়া অন্য অঙ্গ যেন প্রকাশ না করে। এ আয়াতের مَا ظَهَرَ مِنْهَا -এর অর্থ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আলী (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুরমা ও আংটি।

অর্থাৎ সুরমা ও আংটি লাগানোর স্থান তথা মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের কব্জি পর্যন্ত। এ দুটি অঙ্গ সাধারণভাবে অনাবৃত থাকে বা রাখতে হয়। অতএব, এ দুটি অঙ্গ ছাড়া অন্য সব অঙ্গ যেগুলো মহিলাদের সৌন্দর্য প্রকাশক সেগুলোকে মহিলারা ঢেকে রাখবে। এ অঙ্গগুলো ঢেকে রাখা তাদের উপর ফরজ। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এ অঙ্গগুলো ঢেকে রাখা আবশ্যক করেছেন তাই পুরুষদের জন্য এ অঙ্গগুলোর দিকে তাকানো নাজায়েজ।

উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) যে আয়াত এখানে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন এর পূর্ববর্তী আয়াতটিকেও এখানে দলিল হিসেবে পেশ করতে পারতেন। আয়াতটি নিম্নরূপ– قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ অর্থাৎ হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। [২৪ : ৩০] দৃষ্টি নত রাখার অর্থ এমন বস্তু থেকে তা ফিরিয়ে নেওয়া যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া শরিয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাছীর ও ইবনে হাইয়ান এ তাফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ নিয়তে দেখা হারাম ও বিনা নিয়তে দেখা মাকরূহ– এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। –[মাআরেফুল কুরআন]

মোটকথা এ আয়াত দ্বারা পুরুষদের জন্য বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যে নিষিদ্ধ তা প্রমাণ হয়। তাই মুসান্নিফ (র.) আয়াতটি দলিল হিসেবে উপস্থাপন করতে পারতেন।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মুসান্নিফ (র.) কর্তৃক উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা যদিও মহিলাদের দু-হাত ও চেহারার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সাধারণভাবে পুরুষদের জন্য জায়েজ মনে হয় কিন্তু যদি এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার দ্বারা ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার ভয় থাকে তাহলে এগুলোর প্রতিও দৃষ্টি প্রদান বৈধ হবে না।

অনুরূপভাবে বর্তমান কেলেংকারীর যুগে মহিলাদের জন্য তাদের চেহারা ও হস্তদ্বয় অনাবৃত রাখা উচিত হবে না। কারণ এতেও ফিতনার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম ফিতনার কারণে মহিলাদের চেহারা খোলা মাকরূহ বলেছেন।

وَلِاَنَّ فِيْ اِبْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ ضَرُوْرَةٌ لِحَاجَتِهَا اِلَى الْمُعَامَلَةِ مَعَ الرِّجَالِ اَخْذًا وَاِعْطَاءً وَغَيْرَ ذٰلِكَ وَهٰذَا تَنْصِيْصٌ عَلٰى اَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظَرُ اِلٰى قَدَمِهَا وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ يُبَاحُ لِاَنَّ فِيْهِ بَعْضَ الضَّرُوْرَةِ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ اِلٰى ذِرَاعَيْهَا اَيْضًا لِاَنَّهُ قَدْ يَبْدُوْ مِنْهَا عَادَةً ـ

অনুবাদ : তাছাড়া পুরুষদেরকে কোনো কিছু দেওয়া এবং তাদের থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা ইত্যাদি কারণে লেনদেনের প্রয়োজনে মহিলাদের হাত ও চেহারা খোলার প্রয়োজনও রয়েছে। এ আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের পায়ের দিকে তাকানো বৈধ নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পায়ের দিকে তাকানো বৈধ। কেননা পা খোলারও প্রয়োজন রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নারীর দু বাহুর দিকে তাকানোও জায়েজ। কেননা তা স্বাভাবিকভাবে খুলে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِاَنَّ فِيْ اِبْدَاءِ الْوَجْهِ الخ : আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) মহিলাদের হাত ও চেহারা খোলা রাখা জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, মহিলাদের অনেক সময় পুরুষদের সাথে বিভিন্ন রকম দ্রব্যাদির আদান-প্রদান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যদি চেহারা ও হাত খোলার অবকাশ না থাকে তাহলে সেই আদান-প্রদান তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। তাই উক্ত প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করত শরিয়ত মহিলাদের চেহারা ও হাত খোলার অবকাশ দিয়েছে। বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেন যে, মুসান্নিফ (র.) যদি বিষয়টিকে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত মারফূ' হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করতেন তাহলে উত্তম হতো। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَا اَسْمَاءُ الْمَرْاَةُ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَا يَصْلُحُ اَنْ يُرٰى مِنْهَا اِلَّا هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ ـ

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) মহানবী ﷺ -এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তার গায়ে ছিল পাতলা কাপড়। [রাসূল ﷺ তাকে দেখে] চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে আসমা! মেয়েরা যখন বালেগা তথা প্রাপ্তবয়স্কা হয় তখন তার এই এই অঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গ দেখা জায়েজ নেই। এই এই অঙ্গ বলে তিনি চেহারা ও হাতের প্রতি ইশারা করলেন।

এ হাদীস দ্বারা হাত ও চেহারা খোলা রাখার বৈধতার স্পষ্ট দলিল পাওয়া গেল।

قَوْلُهُ وَهٰذَا تَنْصِيْصٌ عَلٰى اَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظَرُ اِلٰى قَدَمِهَا : মুসান্নিফ (র.) বলেন, اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا -এর ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যা বলেছেন তাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বেগানা মহিলার পায়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ يُبَاحُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইবনে শুজা' বর্ণনা করেন যে, তাঁর মতে মহিলার পায়ের দিকে তাকানো জায়েজ। কারণ মহিলাদের পা খোলার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন মহিলাদের কখনো প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হয় তখন তারা খালি পায়ে থাকে, পায়ে জুতা বা সেণ্ডেল থাকে বটে কিন্তু মোজার ব্যবস্থা থাকে না। সুতরাং যদি তাদের পা খোলার অনুমতি না দেওয়া হয় তাহলে তাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হবে।

قَوْلُهُ وَعَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহিলাদের বাহুর দিকে তাকানো বৈধ। কারণ মহিলা বিভিন্ন কাজ করার সময় বিশেষ করে রান্না করার সময় তাদের বাহু থেকে কাপড় সরে যায়।

قَالَ : فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ لَا يَنْظُرُ اِلَى وَجْهِهَا اِلَّا لِحَاجَةٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَظَرَ اِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ اَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ الْاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَحَرُّزًا عَنِ الْمُحَرَّمِ وَقَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ لَا يُبَاحُ اِذَا شَكَّ فِي الْاِشْتِهَاءِ كَمَا اِذَا عَلِمَ اَوْ كَانَ اَكْبَرُ رَأْيِهِ ذٰلِكَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কামভাবের ব্যাপারে নিরাপদবোধ না করে তাহলে বেগানা মহিলার চেহারার দিকে প্রয়োজন ছাড়া তাকাবে না। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বেগানা মহিলার সৌন্দর্যের দিকে কামভাবের সাথে তাকাবে কিয়ামতের দিন তার চোখে সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। সুতরাং কামভাব উদ্রেকের আশঙ্কা করলে প্রয়োজন ছাড়া তাকাবে না, হারাম থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। ইমাম কুদূরী (র.) -এর শব্দ لَا يَأْمَنُ এ অর্থ প্রদান করে যে, কামভাবের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাকানো বৈধ নয়। যেমন কামভাব উদ্রেকের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা থাকলে তাকানো বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : فَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ الخ : আলোচ্য ইবারতে মহিলাদের চেহারা ও হাতের দিকে কখন তাকানো বৈধ এবং কখন তাকানো বৈধ নয় তা আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ইবারতে মহিলাদের চেহারা ও হাতের দিকে তাকানো যে বৈধ বলা হয়েছে তা তখনই জায়েজ হবে যখন তাকানোর দ্বারা কামভাব উদ্রেকের কোনো রকম সম্ভাবনা না থাকবে। আলোচ্য ইবারতে বলা হয়েছে যে, যদি তাকানোর ফলে কামভাব উদ্রেকের সম্ভাবনা থাকে তাহলে প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের হাত ও চেহারার দিকে তাকানো বৈধ নয়।

প্রয়োজন দ্বারা উদ্দেশ্য শরিয়ত অনুমোদিত প্রয়োজন। যেমন– মহিলার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হলে, অথবা বিবাহ করার উদ্দেশ্যে মহিলাকে দেখতে চাইলে কিংবা দাসী ক্রয় করার ইচ্ছা করলে ইত্যাদি। এ অবস্থাসমূহে উপরিউক্ত মহিলাদের দিকে তাকানো বৈধ, যদিও কামভাব উদ্রেকের সম্ভাবনা থাকে।

সাধারণ অবস্থায় কামভাবের সম্ভাবনা থাকলে দেখা নাজায়েজ হওয়ার দলিল রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীস। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– مَنْ نَظَرَ اِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ اَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ الْاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেন, যদি কেউ বেগানা মহিলার প্রতি কামোদ্দীপনার সাথে দৃষ্টি দেয় তাহলে কিয়ামতের দিন তার চোখে সীসা ঢেলে দেওয়া হবে।'

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, হাদীসটি শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র.) شَرْحُ الْكَافِيْ তে উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ নয়। এমন শব্দের প্রসিদ্ধ একটি হাদীস রয়েছে তা এই–

مَنِ اسْتَمَعَ اِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِي اُذُنَيْهِ الْاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কোনো দলের কথা চুরি করে শোনে, আর তারা সেটা অপছন্দ করে, তাহলে কিয়ামতের দিন উক্ত ব্যক্তির উভয় কানে সীসা ঢেলে দেওয়া হবে।' হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) নিম্নোক্ত সূত্রে كِتَابُ التَّعْبِيْرِ -এ উল্লেখ করেন-
عَنْ اَيُّوْبَ السِّجِسْتَانِىْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

অবশ্য মুসান্নিফ (র.) যদি নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করতেন তাহলে উত্তম হতো। হাদীসটি হলো- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ الْاُوْلٰى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ . অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, হে আলী ! তুমি [মহিলাদের প্রতি] দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিয়ো না। কারণ তোমার জন্য প্রথম দৃষ্টি বৈধ আর দ্বিতীয় সৃষ্টি অবৈধ।'

এ বিষয়ে আরেকটি হাদীস সুনানের চারটি কিতাবেই রয়েছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ كَتَبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ حَظًّا مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مُحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَ زِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَتَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ .

অর্থাৎ 'হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি মহানবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জেনার অংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন। সে সেটা করবেই। চোখের জেনা হলো কুদৃষ্টি, আর মুখের জেনা হলো অশ্লীল কথা। মানুষের নফ্স কামনা করে এবং কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়ন করে।' -[সূত্র-টীকা]

এ হাদীসে কুদৃষ্টিকে জেনা [ব্যভিচার] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

قَوْلُهُ فَاِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বেগানা মহিলার দিকে তাকালে তার কামোদ্দীপনার আশঙ্কা করে তাহলে প্রয়োজন ছাড়া তার দিকে তাকাবে না।' তাহলে সে হারাম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। কারণ অপ্রয়োজনে কামভাবের সাথে বেগানা মহিলার দিকে তাকানো হারাম। প্রয়োজন বলতে কি বুঝায় তা আমরা ইতঃপূর্বে সবিস্তার উল্লেখ করেছি।

قَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ يَدُلُّ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারতের শব্দ لَا يَأْمَنُ -এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি কারো কামভাব উদ্রেকের সন্দেহ হয় তাহলে তার জন্য মহিলার দিকে অপ্রয়োজনে তাকানো নাজায়েজ। যেমন কামোত্তেজনার প্রবল ধারণা কিংবা নিশ্চিত বিশ্বাস হলে তাকানো নাজায়েজ।

وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّهَا وَاِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ لِقِيَامِ الْمُحَرَّمِ وَانْعِدَامِ الضَّرُوْرَةِ وَالْبَلْوٰى بِخِلَافِ النَّظَرِ لِاَنَّ فِيْهِ بَلْوٰى وَالْمُحَرَّمُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَسَّ كَفَّ اِمْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيْلٍ وُضِعَ عَلٰى كَفِّهِ جَمْرٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَهٰذَا اِذَا كَانَتْ شَابَّةً تُشْتَهٰى اَمَّا اِذَا كَانَتْ عَجُوْزٌ لَا تُشْتَهٰى فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا لِانْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ـ

অনুবাদ : বেগানা মহিলার চেহারা ও হাত স্পর্শ করা বৈধ নয়। যদিও কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। কারণ কাজটি হারাম, এতে কোনো প্রয়োজনও নেই এবং এ থেকে বাঁচাও অসম্ভব নয়। কিন্তু তাকানোর বিষয়টি এমন নয়, কারণ এটি এমন বিষয় যা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। হারাম হওয়ার দলিল রাসূল ﷺ-এর বাণী– তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মহিলার হাত স্পর্শ করে অথচ তাতে তার কোনো অধিকার নেই। এমন ব্যক্তির হাতে কিয়ামতের দিন আগুনের জ্বলন্ত কয়লা রাখা হবে। এটা তখনই যখন কামভাব সম্পন্না যুবতী হয়। পক্ষান্তরে যদি মহিলা কামভাব গত হওয়া বয়স্কা হয় তাহলে তার সাথে হাত মিলানো এবং তার হাত স্পর্শ করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা এখানে ফিতনার ভয় নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا الخ : আলোচ্য ইবারতে বেগানা মহিলাকে স্পর্শ করার হুকুম আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, বেগানা মহিলার চেহারা ও হাত স্পর্শ করা বৈধ নয়। কামভাব জাগ্রত হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাক অথবা না থাক। কারণ বেগানা মহিলার শরীর স্পর্শ করা হারাম। এটি হারাম হওয়ার পেছনে কামভাবের কোনো শর্ত নেই। আর দ্বিতীয় কারণ হলো এরূপ স্পর্শ করার কোনো প্রয়োজনও তো নেই। তাছাড়া এটি এমন কোনো বিষয়ও নয় যা এড়িয়ে চলা অসম্ভব।

অবশ্য নজর বা তাকানোর বিষয়টি এমন নয়। ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোনো কোনো প্রয়োজন এমন আছে যখন মেয়েদের দিকে তাকাতেই হয়। আর এমন অবস্থায় নিপতিত ব্যক্তির জন্যে তাকানো বৈধ।

মেয়েদের হাত ও চেহারা স্পর্শ করা হারাম হওয়ার দলিল রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীস। তা এই যে, مَنْ مَسَّ كَفَّ اِمْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيْلٍ وُضِعَ عَلٰى كَفِّهِ جَمْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি বেগানা মহিলার হাত স্পর্শ করবে অথচ তাতে তার কোনো অধিকার নেই, কিয়ামতের দিন তার হাতে জ্বলন্ত কয়লা রাখা হবে।'

উল্লেখ্য যে, এমন শব্দে রাসূল ﷺ -এর কোনো হাদীস বর্ণিত নেই এবং কোনো সহীহ ও হাসান হাদীস সংকলনকারী মুহাদ্দিসগণ তাদের কিতাবে এ হাদীসটি সংকলন করেননি। –[সূত্র -বিনায়া]

قَوْلُهُ وَهٰذَا اِذَا كَانَتْ شَابَّةً الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে নারীদের চেহারা ও হাত স্পর্শ করা হারাম সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে তা এমন নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা বয়সে যুবতী এবং যাদের দেখে পুরুষদের কামভাব জাগ্রত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে মহিলা যদি বয়স্কা ও বৃদ্ধা হয় যাকে দেখে কামভাব জাগ্রত হওয়ার মাঝে কোনো সম্ভাবনা নেই তার চেহারা ও হাত স্পর্শ করাতে কোনো দোষ নেই। কারণ ঐ শ্রেণির মহিলাদের স্পর্শ করাতে ফিতনার ভয় নেই।

মাসআলার বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি স্পর্শকারী কামভাব সম্পন্ন হয় তাতেও কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মাবসূত কিতাবের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যদি স্পর্শকারী বৃদ্ধ হয় এবং যাকে স্পর্শ করা হচ্ছে সেও বৃদ্ধা হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং কোনো একজন যদি যৌনক্ষমতা সম্পন্ন হয় তাহলে তার জন্য অপরজনকে স্পর্শ করা আদৌ ঠিক হবে না।

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَدْخُلُ بَعْضَ الْقَبَائِلِ الَّتِيْ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْهِمْ وَكَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِسْتَأْجَرَ عَجُوْزًا لِتُمَرِّضَهُ وَكَانَتْ تَغْمِزُ رِجْلَهُ وَتَفْلِيْ رَأْسَهُ وَكَذَا اِذَا كَانَ شَيْخًا يَأْمَنُ عَلٰى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا لِمَا قُلْنَا وَاِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَا تَحِلُّ مُصَافَحَتُهَا لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّعْرِيْضِ لِلْفِتْنَةِ .

অনুবাদ : বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এমন কিছু গোত্রে যাতায়াত করতেন যেগুলোতে তিনি [শিশুকালে] দুধপান করেছিলেন এবং তিনি [সেখানে] বৃদ্ধা মহিলাদের সাথে হাত মিলাতেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) একজন বৃদ্ধা রমণীকে তার সেবার জন্য ভাতা প্রদানের চুক্তিতে নিয়োগ দিয়েছিলেন। সে তার পা টিপে দিত এবং মাথার উকুন বেছে দিত। আর অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তি এমন বৃদ্ধ হয় যে সে নিজের উপর এবং মহিলার ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত থাকে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর মহিলার ব্যাপারে যদি শঙ্কামুক্ত না হয় তাহলে মহিলার সাথে মুসাফাহা করবে না। কেননা এতে ফিতনার দিকে নিজেকে পেশ করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الخ : চলমান ইবারতে পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার দলিল-প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, যদি মহিলা বৃদ্ধা হয় তাহলে তার সাথে হাত মিলানোতে কোনো সমস্যা নেই। এর দলিল নিম্নে প্রদত্ত হলো–

رُوِيَ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَدْخُلُ بَعْضَ الْقَبَائِلِ الَّتِيْ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْهِمْ وَكَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ .

'হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এমন কতিপয় গোত্রে যাতায়াত করতেন যেগুলোতে তিনি দুগ্ধপোষ্য হিসেবে ছিলেন এবং সেখানে বৃদ্ধা মহিলাদের সাথে হাত মিলাতেন।' দ্বিতীয় দলিল হলো–

إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اِسْتَأْجَرَ عَجُوْزًا لِتُمَرِّضَهُ وَكَانَ تَغْمِزُ رِجْلَهُ وَتَفْلِيْ رَأْسَهُ .

অর্থাৎ 'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) তাঁর অসুস্থ কালীন সময়ে রোগের সেবার জন্য একজন বৃদ্ধা মহিলাকে ভাতা দিয়ে নিয়োগ করেছিলেন যে তার পা টিপে দিত এবং মাথার উকুন বেছে দিত।'

আল্লামা যায়লাঈ (র.) ও বিনায়ার মুসান্নিফ এবং আল্লামা মাহমূদ ইবনে আহমদ আইনী (র.)-এর মতে, উল্লিখিত দুটি হাদীসের কোনোটিই বিশুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ وَكَذَا اِذَا كَانَ شَيْخًا يَأْمَنُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, কোনো বৃদ্ধলোক [যার যৌনক্ষমতা লোপ পেয়েছে] যদি কোনো মহিলার সাথে হাত মিলায়, আর হাত মিলানো অবস্থায় তার নিজের এবং মহিলার ব্যাপারে উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে তার জন্য হাত মিলানোতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি মহিলার ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত না হয় অর্থাৎ মহিলার উত্তেজিত হওয়ার সামান্যও সম্ভাবনা থাকে তাহলে এমতাবস্থায় মহিলার সাথে হাত মিলানো জায়েজ নয়। কেননা এতে মহিলাকে ফিতনার পথে টেনে আনা হবে।

وَالصَّغِيْرَةُ إِذَا كَانَتْ لَا تُشْتَهٰى يُبَاحُ مَسُّهَا وَالنَّظْرُ إِلَيْهَا لِعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَيَجُوْزُ لِلْقَاضِيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهَا وَلِلشَّاهِدِ إِذَا أَرَادَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا النَّظْرُ إِلٰى وَجْهِهَا وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِىَ لِلْحَاجَةِ إِلٰى إِحْيَاءِ حُقُوْقِ النَّاسِ بِوَاسِطَةِ الْقَضَاءِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلٰكِنْ يَنْبَغِيْ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ أَوِ الْحُكْمَ عَلَيْهَا لَا قَضَاءَ الشَّهْوَةِ تَحَرُّزًا عَمَّا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَهُوَ قَصْدُ الْقَبِيْحِ وَأَمَّا النَّظْرُ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ إِذَا اشْتَهٰى قِيْلَ يُبَاحُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لِأَنَّهُ يُوْجَدُ مَنْ لَا يَشْتَهِىْ فَلَا ضَرُوْرَةَ بِخِلَافِ حَالَةِ الْأَدَاءِ .

অনুবাদ : নাবালেগ তথা অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কামভাবের অধিকারিণী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে স্পর্শ করা এবং তার প্রতি তাকানো বৈধ। কেননা এতে ফিতনার ভয় নেই। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক যদি কোনো মহিলার ব্যাপারে বিচারের ফয়সালা করতে চায় এবং কোনো সাক্ষী যদি মহিলার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে চায় তাহলে তাদের জন্য মহিলার দিকে তাকানো জায়েজ। যদিও সে উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা করে। আর এটা বিচার ও সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কারণে। তবে তাকানোর দ্বারা সে সাক্ষ্য প্রদান করা বা বিচারের রায় প্রদানের ইচ্ছাই করবে তার কামভাব চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাকাবে না। এমন কাজ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে যার থেকে বিরত থাকা সম্ভব। আর তা হলো মন্দ কাজের ইচ্ছা। আর সাক্ষী হওয়ার উদ্দেশ্যে তাকালে যদি কামভাব জাগ্রত হয় তাহলে কেউ কেউ বলেন, এমতাবস্থায় তাকানো বৈধ। কিন্তু বিশুদ্ধতম অভিমত হলো এমতাবস্থায় তাকানো বৈধ নয়। কেননা [সাক্ষী হওয়ার জন্য] এমন ব্যক্তি পাওয়া সম্ভব যে উত্তোজিত হয় না। সুতরাং এটি আবশ্যকীয় কোনো বিষয় নয়। সাক্ষ্য প্রদান করার বিষয়টি অবশ্য এমন নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالصَّغِيْرَةُ إِذَا كَانَتْ لَا الخ : নাবালেগা মেয়ে যে এখনো কামভাবের অধিকারী হয়নি, তাকে স্পর্শ করা ও তার দিকে তাকানোর দ্বারা যেহেতু ফিতনার আশঙ্কা নেই তাই তার দিকে তাকানো ও তাকে স্পর্শ করা বৈধ। কেননা নাবালেগা মেয়ের শরীর আওরত নয়। যেহেতু তাদের শরীর আওরত নয় তাই তার হুকুম বালেগা মেয়ের হুকুম থেকে ভিন্ন হবে।

ফিকহশাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবে আলোচ্য মাসআলার পর পরেই শ্মশ্রুবিহীন সুশ্রী চেহারার বালকের দিকে তাকানোর মাসআলা আলোচনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে শ্মশ্রুবিহীন সুশ্রী বালকের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকানো মাকরূহ। আল্লামা নববী (র.) -এর মতে কামভাবের সাথে কিংবা কামভাব ছাড়া উভয় অবস্থায় তাকানো মাকরূহ। কারো কারো মতে কামভাবের সাথে তাকানো মাকরূহ। তবে সাধারণভাবে তাকানো মাকরূহ নয়। বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) -এর মতে বর্তমান যুগে যেহেতু পাপাচার বৃদ্ধি পেয়েছে তাই ইমাম নববী (র.)-এর উক্তি অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করা উচিত।

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوزُ لِلْقَاضِيْ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিচারক তার বিচারকার্য পরিচালনা করার সময় মহিলাদের দিকে তাকাতে পারবে। যদিও তাকানোর দ্বারা কামভাব জাগ্রত হয়।

তদ্রূপ কোনো মহিলার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করার সময় সাক্ষীর জন্য উক্ত মহিলার দিকে তাকানো বৈধ। এমনকি যদি তাকানোর ফলে কামভাব জাগ্রতও হয় তবুও তাকানো জায়েজ।

জায়েজ হওয়ার দলিল হলো বিচারকার্য এবং সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

উল্লেখ্য যে, ন্যায়বিচার পাওয়া প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার। সে অধিকার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি সামান্য গুনাহও হয়ে যায় তবুও সে অধিকার বাস্তবায়নের ব্যাপারে অগ্রসর হতে হবে। তবে আলোচ্য ক্ষেত্রে বিচারক ও সাক্ষী বিচার পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং সাক্ষী সাক্ষ্য আদায়ের উদ্দেশ্যে মহিলার দিকে তাকাবে- নিজে পুলক অনুভব করার উদ্দেশ্যে মহিলার দিকে তাকাবে না। তাহলে গুনাহ থেকে যতটা সম্ভব বাঁচা যাবে।

উল্লেখ্য যে, যদি কোনো মুসলমান কোনো নর অথবা নারীকে ব্যভিচার করতে দেখে তাহলে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করার উদ্দেশ্যে সেদিকে তাকানো তার জন্য বৈধ। অনুরূপভাবে যদি [যুদ্ধের সময়] কাফেরগণ মুসলমানদের শিশুদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে সে শিশুদের প্রতি মুসলমানদের তীর ছোঁড়া বৈধ। তবে তীর ছোঁড়ার সময় কাফেরদের হত্যা করার নিয়তে তীর মারবে- যদিও বাহ্যত আঘাত করবে মুসলমানদের শিশুদের। –[সূত্র-বিনায়া]

قَوْلُهُ وَاَمَّا النَّظَرُ لِيَحْمِلَ الشَّهَادَةَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি সাক্ষী হওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো বেগানা মহিলার দিকে তাকায় এবং তাতে তার উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তার জন্য তাকানো বৈধ হবে কিনা এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাকানো বৈধ এবং তাকানোর সময় সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে তাকাবে, পুলকিত হওয়ার জন্য তাকাবে না। অন্যরা বলেন, সাক্ষী হওয়ার সময় যদি উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তার জন্য তাকানো বৈধ নয়। কেননা সাক্ষী হওয়ার জন্য এমন লোক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয় যে উত্তেজিত হবে না।

নোট : কোনো মহিলার বিরুদ্ধে রায় প্রদানের পূর্বে তাকে চেনা বিচারকের জন্য জরুরি, যাতে অপরিচিত কোনো মহিলার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করতে বাধ্য না হয়।

যদি কোনো সাক্ষী মহিলার আওয়াজ শুনে, আর সে মহিলার আশপাশে থাকা অন্য মহিলারা তার পরিচয় বলে দেয় এবং সাক্ষীর তাদের কথায় আস্থা হয় তাহলে এমন মহিলার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ।

وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهَا وَاِنْ عَلِمَ اَنْ يَشْتَهِيَهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْهِ اَبْصِرْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا وَلِاَنَّ مَقْصُوْدَهُ اِقَامَةُ السُّنَّةِ لَا قَضَاءُ الشَّهْوَةِ ـ

অনুবাদ : যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেছে তার জন্য সেই মহিলাকে দেখাতে কোনো সমস্যা নেই। যদিও তার কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কেননা [কনে দেখা সম্পর্কে] রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– তুমি কনে দেখে নাও। এটা তোমাদের মাঝে হৃদ্যতা স্থায়ী হওয়ার জন্য সহায়ক। তা ছাড়া এর উদ্দেশ্য হলো সুন্নতের উপর আমল করা, কামভাব পূরণ করা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَتَزَوَّجَ الخ : আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার (র.) বিবাহের প্রাক্কালে কনে দেখার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেছে তার জন্য উক্ত মহিলাকে দেখে নেওয়া বৈধ। এক্ষেত্রে যে কনে দেখবে তার যদি কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবুও দেখে নেওয়া বৈধ। এ মাসআলার দলিল রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীস। যে হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

(عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ خَطَبَ اِمْرَأَةً) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَبْصِرْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ـ

অর্থাৎ হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা এটা তোমাদের মাঝে ভালোবাসা স্থায়ী হওয়ার মাধ্যম হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

আলোচ্য হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর জামে তিরমিযীর মাঝে সংকলন করেছেন। এ হাদীসটি এখানে সনদসহ উল্লেখ করা হলো–

عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ لَهُ اَنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ـ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ـ

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেন–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِيْ اَعْيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا ـ

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি [হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা] জনৈক আনসারী মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে রাসূল ﷺ তাকে বলনে, যাও কনে দেখে আস। কেননা আনসারীদের চোখে সমস্যা থাকে।

মোটকথা আলোচ্য হাদীস দ্বারা বিবাহের প্রাক্কালে কনে দেখার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং কামভাব জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও বিবাহের উদ্দেশ্যে কনে দেখা বৈধ হবে। তবে দেখার সময় সুন্নতের নিয়তে কনে দেখবে, নিজ খাহেশাত বা কামভাব পূরণের জন্য দেখবে না।

وَيَجُوزُ لِلطَّبِيبِ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى مَوْضَعِ الْمَرَضِ مِنْهَا لِلضَّرُوْرَةِ وَيَنْبَغِى اَنْ يُعَلِّمَ اِمْرَأَةً مُدَاوَاتِهَا لِاَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ اِلَى الْجِنْسِ اَسْهَلُ فَاِنْ لَمْ يَقْدِرُوْا يُسْتَرُ كُلُّ عَضْوٍ مِنْهَا سِوٰى مَوْضَعِ الْمَرَضِ ثُمَّ يَنْظُرُ وَيَغُضُّ بَصَرَهٗ مَا اسْتَطَاعَ لِاَنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُوْرَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَصَارَ كَنَظَرِ الْخَافِضَةِ وَالْخِتَانِ وَكَذَا يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ اِلٰى مَوْضَعِ الْاِحْتِقَانِ مِنَ الرَّجُلِ لِاَنَّهٗ مُدَاوَرَةٌ وَيَجُوْزُ لِلْمَرَضِ وَكَذَا لِلْهُزَالِ الْفَاحِشِ عَلٰى مَا رُوِىَ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لِاَنَّهٗ اِمَارَةُ الْمَرَضِ ـ

অনুবাদ : প্রয়োজনের স্বার্থে মহিলার অসুখের স্থানের দিকে তাকানো ডাক্তারের জন্য জায়েজ। এ ব্যাপারে কোনো মহিলাকে অসুস্থ মহিলার চিকিৎসা বাতলে দেওয়া সমীচীন। কেননা সমগোত্রীয়র প্রতি তাকানো সহজ কাজ। আর যদি অসুস্থ মহিলা এসবে সক্ষম না হয় তাহলে অসুখের স্থান ছাড়া অন্যসব অঙ্গ ঢেকে রাখবে। অতঃপর ডাক্তার শুধু রোগের স্থানে তাকাবে এবং যথাসম্ভব দৃষ্টি রোগের স্থানে সংকোচিত অবনত রাখবে। কেননা যা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বৈধ হয়েছে তাতে প্রয়োজন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং এটা খতনার স্থান দেখার মতো হলো। অনুরূপভাবে পুরুষের জন্য পুরুষের ঢুস লাগানোর স্থান দেখা বৈধ। কেননা এটা এক প্রকারের চিকিৎসা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর বর্ণনানুযায়ী ঢুস চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করা জায়েজ এবং অতি দুর্বলতার জন্য ব্যবহার করাও জায়েজ। কেননা অতি দুর্বলতা রোগের চিহ্ন বহন করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيَجُوْزُ لِلطَّبِيْبِ اَنْ الخ : যদি কোনো মহিলা অসুস্থ হয় এবং তার রোগ বা ক্ষত এমন স্থানে হয় যা দেখা পরপুরুষের জন্য অবৈধ। এমতাবস্থায় ডাক্তারের জন্য চিকিৎসার স্বার্থে অসুখের স্থান দেখা জায়েজ। তবে মহিলার শরীরের অন্য অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখবে। তবে এক্ষেত্রে উত্তমপন্থা হলো, ডাক্তার অন্য কোনো মহিলা বা নার্সের সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা করবে। সেই মহিলাকে রোগীর চিকিৎসা বাতলে দেবে। অতঃপর ঐ মহিলা মহিলা রোগীর দেখাশুনা করবে। কেননা মহিলা কর্তৃক অন্য মহিলার চিকিৎসা করা বা এক মহিলা অন্য মহিলার ক্ষত দেখা সহজ কাজ। আর যদি অন্যকোনো মহিলার সাহায্যে চিকিৎসা করা সম্ভব না হয়, তাহলে ডাক্তার রোগী মহিলার রোগের স্থান ছাড়া অন্যসব অঙ্গ ঢেকে নেবে। অতঃপর যথাসম্ভব চোখ অবনত রেখে শুধু অসুখের স্থানটির দিকে তাকাবে। কেননা যা প্রয়োজনের খাতিরে বৈধ হয় তা প্রয়োজন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থানের দিকে বৈধতা প্রসারিত হয় না। অবশ্য বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর।

এ প্রসঙ্গে ফতোয়ার কিতাবে বর্ণিত আছে যে, পুরুষ ও মহিলার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এতটুকু স্থানের দিকে শরিয়তের প্রয়োজন ব্যতীত তাকানো বৈধ নয়। যখন ওজর বা অসুবিধা দেখা দেয় তখনই কেবল দেখা বৈধ হয়। যেসব ওজর শরিয়ত অনুমোদন করে তা এই–

১. সন্তান প্রসবের সময় ধাত্রী মহিলার জন্য জন্মদাত্রীমায়ের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো বৈধ।

২. যখন একান্ত প্রয়োজনে ঢুস দেওয়ার দরকার হয়।

৩. যদি কোনো মহিলার এমন স্থানে ক্ষত হয় যা পুরুষের জন্য দেখা বৈধ নয়। অতঃপর উক্ত স্থানের চিকিৎসা করার জন্য কোনো মহিলা পাওয়া না যায়। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার অবস্থা চরমে পৌঁছে অথবা তার ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করা হয় কিংবা এর কারণে এমন ব্যথা হয় যা সহ্য করতে মহিলা অপারগ হয়। আর তখন যদি পুরুষ ছাড়া উক্ত স্থানের চিকিৎসা করার জন্য অন্য কোনো উপায় অবশিষ্ট না থাকে তাহলে পুরুষ ডাক্তারের জন্য চিকিৎসার নিমিত্তে উক্ত ক্ষতস্থান দেখা জায়েজ। তবে তখন মহিলার পুরো শরীর ঢেকে কেবল ক্ষতস্থানটুকু খোলা রাখতে হবে তার চেয়ে বেশি খোলা অবৈধ। কেননা এতটুকু খোলা রাখার দ্বারাই প্রয়োজন পুরো হয়ে যায়।

৪. খৎনা করার সময় পুরুষের লজ্জাস্থান অপর পুরুষের জন্য দেখা বৈধ।

৫. কোনো ব্যক্তি বিবাহ করার পর তার স্ত্রী যদি স্বামী নপুংসক বলে দাবি করে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বলে আমার কুমারীত্ব নষ্ট হয়নি। এমন মহিলার দাবির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বিচারক অন্য মহিলা কর্তৃক বাদীর লজ্জাস্থান পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার স্বার্থে দেখা বৈধ।

৬. অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো দাসীকে কুমারী হিসেবে ক্রয় করে। অতঃপর দেখে যে, উক্ত দাসীর কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু বিক্রেতা কুমারীত্ব নষ্ট হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে এরূপ অবস্থায় বিষয়টি যাচাই করার জন্য এক পর্যায়ে দাসীর লজ্জাস্থান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দেখা বৈধ।

আলোচ্য মাসআলাগুলো বিনায়া থেকে নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَنَظْرِ الْخَافِضَةِ وَالْخَتَّانِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ডাক্তারের জন্য চিকিৎসার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে রোগীর আবরণীয় অঙ্গ দেখা পুরুষ ও মহিলা খতনাকারীর খতনার স্থান দেখার অনুরূপ। অর্থাৎ খতনাকারীরা যেমন খৎনার স্থান খতনা করার প্রয়োজনে দেখতে পারেন তদ্রূপ ডাক্তার এর জন্য ক্ষতস্থান চিকিৎসার প্রয়োজনে দেখা বৈধ।

উল্লেখ্য যে, পুরুষের জন্য খতনা করা সুন্নতে মুআক্কাদাহ এবং এটি ইসলামের একটি প্রতীক। অন্যদিকে মহিলাদের জন্য খতনা করা যদিও সুন্নতে মুআক্কাদাহ নয়, তবে তা শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়। তাই পুরুষ ও মহিলার খতনা একটি ওজর, এ কারণে খতনার স্থান দেখা বৈধ।

قَوْلُهُ وَكَذَا يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ النَّظْرُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ঢুস [বায়ুপথে দেওয়ার ঔষধবিশেষ] দেওয়ার স্থানের দিকে তাকানো জায়েজ। কারণ তাকানো ব্যতীত ঢুস প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ঢুস দেওয়ার স্থানের দিকে তাকানো বৈধ হওয়ার দলিল হলো ঢুস এক ধরনের চিকিৎসা। আর চিকিৎসার স্বার্থে গোপনীয় স্থান দেখা বৈধ হওয়া সংক্রান্ত আলোচনা ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

অতঃপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ঢুস দেওয়া হয়। যেমন– অসুস্থতার জন্য ঢুস দেওয়া হয়। অতি দুর্বল ব্যক্তিকে দুর্বলতা কাটানোর উদ্দেশ্যে ঢুস দেওয়া হয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে ঢুস দেওয়া ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতানুসারে বৈধ। কারণ অতি দুর্বলতা তো রোগাক্রান্ত হওয়ারই আলামত। তবে শক্তিবৃদ্ধি কিংবা সহবাসে শক্তি অর্জনের জন্য ঢুস দেওয়া বৈধ নয়।

قَالَ : وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ اِلَى جَمِيْعِ بَدَنِهِ اِلَّا اِلَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ اِلَى رُكْبَتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ اِلَى رُكْبَتِهِ وَيُرْوٰى مَا دُوْنَ سُرَّتِهِ حَتّٰى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ وَبِهٰذَا ثَبَتَ اَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ خِلَافًا لِمَا يَقُوْلُهُ اَبُوْ عِصْمَةَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ (رح) وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ خِلَافًا لِاَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ وَمَا دُوْنَ السُّرَّةِ اِلَى مَنْبَتِ الشَّعْرِ عَوْرَةٌ خِلَافًا لِمَا يَقُوْلُهُ الْاِمَامُ اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْفَضْلِ الْكُمَارِيُّ (رح) مُعْتَمِدًا فِيْهِ الْعَادَةَ لِاَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهَا مَعَ النَّصِّ بِخِلَافِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পুরুষ অন্য পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছাড়া অবশিষ্ট শরীর দেখতে পারবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, পুরুষের আবশ্যম্ভাবী আবরণীয় স্থান নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। কোনো কোনো বর্ণনামতে নাভির নিচ থেকে হাঁটুর শেষ সীমা পর্যন্ত স্থান ঢেকে রাখা ফরজ। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ মতটির বিরোধিতা করেন আবূ ইসমাহ (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)। হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত, তবে জাহেরপন্থি (اَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ) ওলামায়ে কেরাম ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা বলে নাভি থেকে পশম উঠার স্থান পর্যন্ত সতরের অন্তর্গত। তবে ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইবনুল ফজল কুমারী মানুষের অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে বিপরীত মত পোষণ করেন। তবে তাঁর এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তাঁর মতের বিপরীতে সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : يَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ الخ : আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) পুরুষের শরীরের কোন কোন অঙ্গ সতর তথা আবরণীয় বা গোপন অঙ্গ তা আলোচনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারত নকল করে উল্লেখ করেন যে, এক পুরুষ অন্য পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গসমূহ ছাড়া পুরো শরীর দেখতে পারবে। অর্থাৎ পুরুষের গোপন অঙ্গ বা সতর হলো, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এ মাসআলার দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস। তিনি বলেন– عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ اِلَى رُكْبَتِهِ অর্থাৎ 'পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত।'
অন্য আরেক বর্ণনায় রয়েছে– مَا دُوْنَ سُرَّتِهِ حَتّٰى تَجَاوَزَ رُكْبَتَهُ অর্থাৎ 'নাভির নিচ থেকে হাঁটুর শেষ সীমা পর্যন্ত পুরুষের জন্য ঢেকে রাখা আবশ্যক।' প্রথম বর্ণনা দ্বারা নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত কিনা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো দলিল পাওয়া যায় না। তবে দ্বিতীয় বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, নাভি সতরের মধ্যে পড়ে না; বরং নাভির নিচ থেকে সতর শুরু হয়েছে। আর হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি দ্বিতীয় হাদীসটি সহীহ হয় তাহলে এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, প্রথম বর্ণনার اِلَى শব্দটি مَعَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রথম হাদীসটির শুদ্ধতা সম্পর্কে ভাষ্যকারগণ কোনো মন্তব্য করেননি। তবে বিনায়া গ্রন্থে اَلدَّارَقُطْنِيُّ -এর একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যা এ হাদীসের শব্দের অনেকটা কাছাকাছি। আর তা হলো নিম্নরূপ–

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ السُّرَّةِ اِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ .

অর্থাৎ 'হযরত আবূ আইয়ুব (রা.) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর।'

এ ছাড়া নাভি যে সতরের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রমাণের জন্য বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) আরো কয়েকটি ইবারত উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম কারখী (র.) তা মুখতাসার কিতাবে উল্লেখ করেন–

لَا يَنْبَغِى اَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ اِلَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَ رُكْبَتِهِ وَلَا بَأْسَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى سُرَّتِهِ وَيَكْرَهُ النَّظَرَ مِنْهُ اِلَى الرُّكْبَةِ .

অর্থাৎ 'পুরুষের জন্য অন্য কোনো পুরুষের নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান দেখা উচিত নয়। তবে তার নাভির দিকে তাকানোতে কোনো সমস্যা নেই। আর হাঁটুর দিকে তাকানো মাকরূহ।'

এরপর বলা হয়েছে যে, আমাদের কাছে এমন এক বর্ণনা পৌঁছেছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) যখন ইজার [লুঙ্গি] পড়তেন তখন তার নালি খোলা রাখতেন।

قَوْلُهُ وَبِهٰذَا ثَبَتَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পরের বা দ্বিতীয়বার বর্ণিত হাদীসটি দ্বারাও একথা বুঝা যায় যে, নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ হাদীসের শব্দ হলো مَا دُوْنَ السُّرَّةِ [নাভির নিচ থেকে]। সুতরাং নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন প্রখ্যাত হানাফী আলেম আবূ ইসমাহ তথা সাঈদ ইবনে মু'আয আত তাবারী (র.)। তিনি বলেন, নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)ও একই মত পোষণ করেন।

قَوْلُهُ وَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ : অত্র গ্রন্থের গ্রন্থকার (র.) বলেন, পুরুষের হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। এটাই আহনাফের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর মতে হাঁটু সতরের শেষ সীমা, এর দ্বারা সতরের সীমা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এটা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে আহনাফ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর হাদীস দ্বারা দলিল দেন। তাতে বলা হয়েছে– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেছেন, হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত।'

হাদীসটি অবশ্য সনদের দিক থেকে দুর্বল। তথাপি পূর্বে বর্ণিত ইমাম দারাকুতনী (র.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা হাঁটু সতর হওয়া বুঝা যায়।

قَوْلُهُ وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ خِلَافًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে আসহাবে জাওয়াহিরের ভিন্নমত রয়েছে। জাহিরপন্থিগণ বলেন, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা কুরআনের আয়াত فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا অর্থাৎ 'যখন আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) দুজনে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হলে, তখন তাদের লজ্জাস্থান অনাবৃত হলো।' এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য [উরু ইত্যাদি] অঙ্গ খোলা ছিল। সুতরাং উরু খোলা জায়েজ হবে।

জাওয়াহিরদের উক্ত দলিলের প্রতি উত্তরে আহনাফের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, আয়াত দ্বারা উরু ইত্যাদি খোলা ছিল তা নিশ্চিত করে প্রমাণ হয় না। তাছাড়া যদি নিশ্চিত করে প্রমাণও হয় তবুও তা দ্বারা বর্তমান যুগের বিধান প্রমাণিত হবে না। বিশেষ করে যখন বর্তমান শরিয়তে এর বিরুদ্ধে দলিল পাওয়া যায় তখন কিভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের বিধানকে দলিল হিসেবে দাঁড় করানো যায়।

قَوْلُهُ وَمَا دُوْنَ السُّرَّةِ اِلَى مَنْبَتِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পুরুষের নাভীর নিচ থেকে পশম উদ্‌গত হওয়ার স্থান পর্যন্ত সতরের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফজল আল কুমারী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে সাধারণ মানুষের অভ্যাস বা রীতির উপর ভিত্তি করে এ স্থানটুকুকে সতরের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। তিনি বলেন, সাধারণভাবে মানুষ নাভির নিচে কাপড় / লুঙ্গি বাঁধে ফলে তাদের এ স্থান খোলা থাকে। এমতাবস্থায় এ স্থানকে সতরের অন্তর্ভুক্ত বলা হলে মানুষের কষ্ট হবে। তাই এ স্থান সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তাঁর এ অভিমতের জওয়াবে গ্রন্থকার (র.) বলেন, তাঁর এ মত সঠিক নয়। কেননা তাঁর এ মত হাদীস বিরোধী। হাদীসে বলা হয়েছে নাভির নিচ থেকে সতর শুরু। সুতরাং হাদীসের বিপরীতে তার এ মত গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَقَدْ رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ قَالَ الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ وَاَبْدَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سُرَّتَهُ فَقَبَّلَهُمَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِجَرْهَدٍ وَارِ فَخِذَكَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ وَلِاَنَّ الرُّكْبَةَ مُلْتَقٰى عَظْمِ الْفَخِذِ وَالسَّاقِ فَاجْتَمَعَ الْمُحَرِّمُ وَالْمُبِيْحُ وَفِىْ مِثْلِهِ يَغْلِبُ الْمُحَرِّمُ وَحُكْمُ الْعَوْرَةِ فِى الرُّكْبَةِ اَخَفُّ مِنْهُ فِى الْفَخِذِ وَفِى الْفَخِذِ اَخَفُّ مِنْهُ فِى السَّوْءَةِ حَتّٰى اِنْ كَاشَفَ الرُّكْبَةَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ وَكَاشِفُ الْفَخِذِ يُعَنَّفُ عَلَيْهِ وَكَاشِفُ السَّوْءَةِ يُؤَدَّبُ اِنْ لَجَّ -

---

অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। একদা হাসান ইবনে আলী (রা.) তাঁর নাভি খুললে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তাতে চুমো খান। রাসূল ﷺ জারহাদ (রা.)-কে বলেন, তুমি তোমার উরু আবৃত কর। তুমি কি জান না যে, উরু সতরের মধ্যে? তাছাড়া হাঁটু, উরু এবং নলি হাড়ের সঙ্গমস্থল। সুতরাং হারাম ও হালাল একত্রিত হয়েছে। ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে হারাম হালালের উপর প্রাধান্য লাভ করে। হাঁটুর মাঝে পর্দার হুকুম উরুর পর্দার হুকুমের থেকে সহজতর, আর উরুর পর্দার হুকুম লজ্জাস্থানের পর্দার হুকুমের চেয়ে সাধারণ। আর তাই হাঁটু খোলা ব্যক্তিকে তিরস্কার করা হবে নরমভাবে, আর উরু খোলা ব্যক্তিকে কঠিনভাবে তিরস্কার করা হবে। আর লজ্জাস্থান যে অনাবৃত রাখে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে যদি সে এরূপ বারবার করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَدْ رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) الخ : আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) হাঁটু সতরের মধ্যে গণ্য হওয়ার এবং নাভি সতরের মধ্যে গণ্য না হওয়ার দলিল পেশ করেছেন। হাঁটু সতরের মধ্যে গণ্য হওয়ার পক্ষে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেছেন। আর তা হলো নিম্নরূপ–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেছেন, হাঁটু সতরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে আমরা হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি।'

আর যৌক্তিক দলিল হলো, উরু ও পায়ের নলির হাড় হাঁটুতে এসে মিলিত হয়েছে। উরু ঢেকে রাখা আবশ্যক আর পায়ের নলি খোলা রাখাতে কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং হাঁটুর মধ্যে এমন দুটি হাড় মিলিত হয়েছে যার একটিকে দেখা জায়েজ, আর অন্যটিকে দেখা নাজায়েজ। এক কথায় হাঁটুর মধ্যে হালাল ও হারামের মিলন ঘটেছে। এখন কোন হুকুমকে প্রাধান্য দেওয়া হবে? হারামকে নাকি হালালকে?

উসূলে ফিকহ -এর নিয়মানুযায়ী ঐ সকল ক্ষেত্রে হারাম হালালের উপর প্রাধান্য পায়। সে নিয়মানুযায়ী এখানেও হারামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সুতরাং হাঁটু ঢেকে রাখা আবশ্যক হবে এবং তা দেখা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ وَأَبْدَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (رض) : এ হাদীস দ্বারা মুসান্নিফ (র.) নাভি যে সতরের মধ্যে গণ্য নয় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

হাদীসটি মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবনে হিব্বানসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত আছে। পুরো হাদীসটি এই–

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِيْ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَلَقِيَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) فَقَالَ لِلْحَسَنِ اِكْشِفْ عَنْ بَطْنِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ حَتَّى أُقَبِّلَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُهُ قَالَ فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ مَا كَشَفَهَا .

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নাভি সতরের মধ্যে গণ্য নয়, যদি তা হতো তাহলে হযরত হাসান (রা.) তা খুলতেন না আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তা খুলতে বলতেন না এবং তাতে চুমোও খেতেন না। –[নাসবুর রায়াহ]

قَوْلُهُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِجَرْهَدٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) এ তৃতীয় হাদীস দ্বারা উরু যে সতরের মধ্যে গণ্য তা প্রমাণ করেছেন। এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাঁর স্বীয় কিতাব আবূ দাউদ শরীফের لِمَنِ النَّهْىُ عَنِ التَّعَرِّىْ পরিচ্ছেদে সংকলন করেছেন। হাদীসটি সনদসহ এখানে উল্লেখ করা হলো–

عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ جَرْهَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ أَنَّهُ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَنَا وَفَخِذِىْ مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟

হযরত 'যুরআতা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে জারহাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা [আব্দুর রহমান] থেকে বর্ণনা করেন যে, জারহাদ (র.) সুফ্ফায় বসবাসকারী সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন ছিলেন। তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ আমাদের মাঝে বসলেন। সে সময় আমার উরু খোলা ছিল। রাসূল ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি জান না উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গ?'

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র.), ইমাম আহমদ (র.) ও ইমাম আব্দুর রাযযাক (র.) সহ অনেক মুহাদ্দিস তাঁদের কিতাবে বিভিন্ন সনদে সংকলন করেছেন।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আলোচ্য হাদীস দ্বারা উরু সতরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْعَوْرَةِ فِى الرُّكْبَةِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) হাঁটু, উরু ও লজ্জাস্থান এগুলোর মধ্যে কোনটি ঢেকে রাখা অধিক জরুরি তার একটি ক্রমবিন্যাস করেছেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, হাঁটু ঢেকে রাখার হুকুম উরুর তুলনায় সাধারণ। অর্থাৎ উরু ঢেকে রাখার ব্যাপারে হাঁটুর তুলনায় অধিক সতর্ক হওয়া উচিত। আর উরুর তুলনায় লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতে হবে কঠোরভাবে। এ কারণে যে ব্যক্তি হাঁটু খোলা রাখবে তাকে নরমভাবে তিরস্কার করা হবে। আর যে ব্যক্তি উরু অনাবৃত রাখবে তাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি লজ্জাস্থান খুলবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ যদি সে বারংবার তা খুলে এবং নিষেধ না মানে তাহলে তাকে প্রহার বা বেত্রাঘাত করা হবে।

وَمَا يُبَاحُ النَّظَرُ اِلَيْهِ لِلرَّجُلِ مِنَ الرَّجُلِ يُبَاحُ الْمَسُّ لِاَنَّهُمَا فِيْمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ سَوَاء ، قَالَ : وَيَجُوْزُ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُلِ اِلٰى مَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلَيْهِ مِنْهُ اِذَا اَمِنَتِ الشَّهْوَةَ لِاِسْتِوَاءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ فِى النَّظَرِ اِلٰى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ .

অনুবাদ : পুরুষের যে অঙ্গের প্রতি অন্য পুরুষের দৃষ্টিপাত করা জায়েজ, সে অঙ্গ স্পর্শ করাও জায়েজ। কেননা দেখা ও স্পর্শ করা এমন অঙ্গে ঘটছে যা [শরিয়তের দৃষ্টিতে] সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মহিলার জন্য পুরুষের সেসব অঙ্গ দেখা জায়েজ যা অন্য পুরুষের জন্য দেখা জায়েজ, যদি মহিলা কামভাব জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করে। কেননা যেসব অঙ্গ সতর নয় তা দেখার ব্যাপারে নারী-পুরুষ সকলেই সমান। যেমন– কাপড় ও চতুষ্পদ জন্তু দেখার ব্যাপারে [তারা উভয়েই সমান]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا يُبَاحُ النَّظَرُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পুরুষের জন্য অন্য পুরুষের যেসব অঙ্গ দেখা জায়েজ তা স্পর্শ করাও জায়েজ [যদি উত্তেজনা অনুভূত না হয়]। কেননা যে অঙ্গ সতর নয় সে অঙ্গের ব্যাপারে দৃষ্টি ও স্পর্শ উভয়ই এক হুকুম রাখে। হিদায়া কিতাবের টীকায় এ কথার উপর আপত্তি করে বলা হয়েছে যে, এ কথাটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ ইতঃপূর্বে মাসআলা আলোচিত হয়েছে যে, অপরিচিত মহিলার হাত ও চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ যদি দর্শকের কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। অথচ কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলেও তা স্পর্শ করা বৈধ নয়। উল্লেখ্য যে, মহিলার হাত ও চেহারা কোনোটাই সতর নয়। অতএব যা সতর নয় তা দেখা ও স্পর্শ করা সর্বক্ষেত্রে সমান নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়ের হুকুম সমান হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجُوْزُ لِلْمَرْاَةِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মহিলার জন্য পুরুষের ঐ সব স্থান দেখা বৈধ যা অন্য পুরুষের জন্য দেখা বৈধ। অর্থাৎ পুরুষের নাভির উর্ধ্বাংশ এবং হাঁটুর নিম্নাংশ দেখাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে শর্ত হলো এতে যদি তার উত্তেজিত হওয়ার কোনো আশঙ্কা না থাকে।

দেখা বৈধ হওয়ার দলিল হলো, সেসব অঙ্গ দেখা বৈধ অর্থাৎ সতর নয় তা দেখার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান। যেহেতু পুরুষের জন্য পুরুষের সতর ছাড়া অন্য অঙ্গ দেখা বৈধ। অতএব, মহিলার জন্য পুরুষের সেসব অঙ্গ দেখাও বৈধ।

অতঃপর মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলাটি বুঝানোর জন্য একটি বাহ্যিক উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন– কারো কাপড় ও বাহনজন্তু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর তাই তা সকলের জন্য দেখা জায়েজ। সুতরাং কোনো পুরুষের কাপড় ও বাহনজন্তু অন্য মহিলার জন্য দেখা জায়েজ। অনুরূপভাবে কোনো মহিলার কাপড় ও বাহনজন্তু অন্য পুরুষের জন্য দেখা জায়েজ।

নোট : ১. কারো উরু টিপে দেওয়া জায়েজ যদি মাঝখানে মোটা কাপড়ের প্রলেপ আবরণ থাকে। অন্যথায় তা করা জায়েজ নয়।

–[সূত্র ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া]

২. যদি কোনো স্ত্রী তার নিজ স্বামীর লজ্জাস্থানে হাত দেয় এবং স্বামী স্ত্রীর লজ্জাস্থানে হাত দেয়, আর তা দ্বারা তারা উত্তেজিত হওয়ার উদ্দেশ্য করে তাহলে কোনো সমস্যা নেই; বরং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এর দ্বারা তারা ছওয়াবের অধিকারী হবে বলে আশা করা যায়।

–[ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ খ. ৫, পৃ. ৩২৮]

৩. কোনো কোনো ফকীহের মতে, স্ত্রীসহবাসের সময় স্ত্রীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো উত্তম। কারণ এর দ্বারা সহবাসে সুখ লাভ হয়। তবে অন্য অনেকের মতে তা করা ঠিক নয়। কেননা এর দ্বারা স্মৃতিভ্রম হয়। –[মাজমাউল আনহার]

৪. ছেলে তার মায়ের খেদমত বা সেবা করার উদ্দেশ্যে তার মায়ের কোমর ও পেট কাপড়ের উপর দিয়ে টিপে দিতে পারবে। অনুরূপভাবে কাপড়েরর উপর দিয়ে উরু টিপে দেওয়াও জায়েজ। –[ফাতাওয়ায়ে হিনদিয়াহ, পৃ: ৩২৮, খণ্ড-৫]

৫ সহবাসের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে বিবস্ত্র করা বৈধ। –[ফাতওয়ায়ে হিনদিয়াহ। খ. ৫, পৃ. ৩২৮]

وَفِىْ كِتَابِ الْخُنْثٰى مِنَ الْاَصْلِ اَنَّ نَظَرَ الْمَرْأَةِ اِلَى الرَّجُلِ الْاَجْنَبِىِّ بِمَنْزِلَةِ نَظَرِ الرَّجُلِ اِلٰى مَحَارِمِهٖ لِاَنَّ النَّظَرَ اِلٰى خِلَافِ الْجِنْسِ اَغْلَظُ فَاِنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهَا شَهْوَةٌ اَوْ اَكْبَرُ رَائِهَا اَنَّهَا تُشْتَهٰى اَوْ شَكَّتْ فِىْ ذٰلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهَا اَنْ تَغُضَّ بَصَرَهَا وَلَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الرَّجُلُ اِلَيْهَا وَهُوَ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يَنْظُرْ وَهٰذَا اِشَارَةٌ اِلَى التَّحْرِيْمِ -

---

অনুবাদ : মাবসূত কিতাবের اَلْخُنْثٰى অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, কোনো মহিলা পরপুরুষের দিকে তাকানো এবং কোনো পুরুষ তার মাহ্‌রামের দিকে তাকানো একই পর্যায়ের। কেননা ভিন্ন লিঙ্গের কারো প্রতি তাকানো তুলনামূলক ভয়াবহ হয়ে থাকে। যদি সে মহিলার মনে কামভাব থাকে অথবা তার কামভাব জাগ্রত হওয়ার প্রবল ধারণা হয় কিংবা যদি এ ব্যাপারে তার সন্দেহের উদ্রেক হয় তাহলে তার দৃষ্টি অবনত রাখা মোস্তাহাব। আর যদি কোনো পুরুষ মহিলার দিকে তাকায় এবং তার মাঝে উপরিউক্ত বিষয়গুলো পাওয়া যায় তাহলে তার জন্য মহিলার দিকে তাকানো বৈধ নয়। এতে বিষয়টি হারাম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَفِىْ كِتَابِ الْخُنْثٰى مِنَ الخ : আলোচ্য ইবারতে নারী পুরুষ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সংক্রান্ত মাসআলা আলোচিত হয়েছে। মাবসূত গ্রন্থের خُنْثٰى তথা হিজড়া অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পরপুরুষের প্রতি কোনো মহিলার তাকানোর হুকুম হলো কোনো পুরুষের জন্য তার মাহরামের প্রতি তাকানোর মতো। অর্থাৎ কোনো পুরুষ যেমন তার মাহরাম কোনো মহিলার পেট-পিঠ দেখতে পারে না, তদ্রূপ পরপুরুষের পেট-পিঠ দেখাও কোনো মহিলার জন্য জায়েজ নয়। কেননা বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি তাকানো সমলিঙ্গের কারো প্রতি তাকানোর চেয়ে তুলনামূলকভাবে মারাত্মক হয়। আর এর দ্বারা যদি দৃষ্টিদানকারিণী মহিলার মনে কামভাব থাকে অথবা তাকানোর দ্বারা কামভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে অথবা তাকানোর দ্বারা কামভাব জাগ্রত হওয়ার প্রবল ধারণা হয় কিংবা কামভাব জাগ্রত হওয়া বা না হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে এমতাবস্থায় মহিলার জন্য তার দৃষ্টি অবনত রাখা মোস্তাহাব।

আর যদি কোনো পুরুষ পরনারীর দিকে তাকানোর সময় তার মনে কামভাব থাকে কিংবা তাকানোর দ্বারা কামভাব জাগ্রত হওয়ার প্রবল ধারণা হয় কিংবা কামভাব জাগ্রত হওয়া বা না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমতাবস্থায় পুরুষের জন্য নারীর দিকে তাকানো নাজায়েজ। এখানে নাজায়েজ বা لَمْ يَنْظُرْ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো হারাম।

وَ وَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ الشَّهْوَةَ عَلَيْهِنَّ غَالِبَةٌ وَهُوَ كَالْمُتَحَقِّقِ اِعْتِبَارًا فَاِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ كَانَتِ الشَّهْوَةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَوْجُوْدَةً وَلَا كَذٰلِكَ اِذَا اشْتَهَتِ الْمَرْاَةُ لِاَنَّ الشَّهْوَةَ غَيْرُ مَوْجُوْدَةٍ فِيْ جَانِبِهٖ حَقِيْقَةً وَاعْتِبَارًا فَكَانَتْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَالْمُتَحَقِّقُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِي الْاِفْضَاءِ اِلَى الْمُحَرَّمِ اَقْوٰى مِنَ الْمُتَحَقِّقِ فِيْ جَانِبٍ وَاحِدٍ .

অনুবাদ : [উপরিউক্ত দুটি মাসআলার হুকুমে] পার্থক্যের কারণ এই যে, মেয়েদের মধ্যে কামভাব প্রবল, তাই এর অস্তিত্ব নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায়। অতঃপর যখন পুরুষ উত্তেজিত হলো তখন কামোত্তেজনা উভয়ের পক্ষ থেকে পাওয়া গেল। মহিলা যখন একাকী উত্তেজনা অনুভব করে তখন বিষয়টি এমন হয় না। কেননা তখন পুরুষের মাঝে উত্তেজনা অনুপস্থিত। প্রকৃতপক্ষেও নয় এবং ধরেও নেওয়া যায় না। সুতরাং কামোত্তেজনা এক পক্ষ থেকে হলো। উভয় পক্ষের মাঝে কামভাবের উপস্থিতি হারামের পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী একপক্ষের মাঝে কামভাবের উপস্থিতি থেকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ الشَّهْوَةَ عَلَيْهِنَّ الخ : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, পুরুষের কামভাবের সাথে অথবা কামভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা অবস্থায় মহিলার দিকে তাকানো হারাম অথচ মহিলার কামভাবের সাথে কিংবা তার জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা অবস্থায় দেখা মাকরূহ এবং তার দৃষ্টিপাত হারাম এবং মহিলার ক্ষেত্রে তা মাকরূহ বলা হয়েছে। আলোচ্য ইবারতে নারী পুরুষের দৃষ্টিপাতের হুকুমের মাঝে কোনো পার্থক্য হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

হেদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, উভয় মাসআলার মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, মহিলাদের মাঝে কামভাব ও যৌন উত্তেজনা প্রবল। প্রবল হওয়ার কারণে মহিলা উত্তেজিত থাকে এটা ধরে নেওয়া যায়। এরপর যখন কোনো পুরুষ তাকিয়ে উত্তেজনা অনুভব করে তখন উভয় পক্ষ থেকে উত্তেজনা পাওয়া গেল। পুরুষের মাঝে প্রকৃতপক্ষে কামভাব পাওয়া গেল আর মহিলার মাঝে পাওয়া গেল হুকমিভাবে। উভয়ের দিক থেকে কামভাব পাওয়া গেলে হারাম কাজ তথা ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়। যেহেতু পুরুষের তাকানোর ফলে উত্তেজিত হওয়ার কারণে এরূপ অবস্থা হয়েছে তাই পুরুষের তাকানো হারাম। পক্ষান্তরে যখন কোনো মহিলা পরপুরুষের দিকে তাকায় তখন সে একা উত্তেজিত হয়; পুরুষ উত্তেজিত হয় না। প্রকৃতপক্ষেও হয় না এবং হুকমিভাবেও হয় না। তখন উভয় পক্ষের উত্তেজনা না থাকার কারণে হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি প্রবল হয় না। যেহেতু মহিলার তাকানোর দ্বারা হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তাই মহিলার না তাকানো কে মোস্তাহাব বলা হয়েছে।

বি. দ্র. উপরে যে মাসআলা আলোচনা করা হলো এর উপর ফতোয়া নয়; বরং ফাতাওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে যে, পুরুষের মতো মহিলার ও পুরুষের দিকে কামভাবের সাথে তাকানো কিংবা কামভাব জাগ্রত হওয়ার সন্দেহ থাকা অবস্থায় তাকানো হারাম। ফাতাওয়ায়ে শামীর ইবারত হলো–

وَكَذَا تَنْظُرُ الْمَرْاَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَنَظَرِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اِنْ اَمِنَتْ شَهْوَتَهَا فَلَوْ لَمْ تَاْمَنْ اَوْ خَافَتْ اَوْ شَكَّتْ حَرُمَ اِسْتِحْسَانًا كَالرَّجُلِ هُوَ الصَّحِيْحُ فِي الْفَصْلَيْنِ .

অর্থাৎ মহিলা যদি কামভাব জাগ্রত না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয় তাহলে পুরুষের দিকে তাকাতে পারবে। যেমন– এক পুরুষ অন্য পুরুষের দিকে তাকাতে পারে। আর যদি কামভাব জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয় অথবা কামভাব জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ হয় কিংবা সন্দেহ হয় তাহলে তার জন্য তাকানো হারাম। যেমন– পুরুষের জন্য এসব অবস্থায় তাকানো হারাম। এটাই সহীহ। –[সূত্র -কিতাবুল হাযর ও ইবাহাত (كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْاِبَاحَةِ) পৃ. ৫৩৩, খণ্ড. ৯ ফাতাওয়ায়ে শামী দেওবন্দী ছাপা]

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, হিদায়া কিতাবে যা লেখা হয়েছে তা বিশুদ্ধ নয়। হিদায়ার ইবারত যে বিশুদ্ধ নয় এর ইঙ্গিতও ফাতাওয়ায়ে শামীতে পাওয়া যায়।

قَالَ : وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ اِلَى مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهِ مِنَ الرَّجُلِ لِوُجُوْدِ الْمُجَانَسَةِ وَانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ غَالِبًا كَمَا فِيْ نَظَرِ الرَّجُلِ اِلَى الرَّجُلِ وَكَذَا الضَّرُوْرَةُ قَدْ تَحَقَّقَتْ اِلَى الْاِنْكِشَافِ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ نَظَرَ الْمَرْأَةِ اِلَى الْمَرْأَةِ كَنَظَرِ الرَّجُلِ اِلَى مَحَارِمِه بِخِلَافِ نَظْرِهَا اِلَى الرَّجُلِ لِاَنَّ الرِّجَالَ يَحْتَاجُوْنَ اِلَى زِيَادَةِ الْاِنْكِشَافِ لِلْاِشْتِغَالِ بِالْاَعْمَالِ وَالْاَوَّلُ اَصَحُّ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর পুরুষের শরীরের যে অংশ অন্য পুরুষ দেখতে পারে এক মহিলা অন্য মহিলার ততটুকু অংশ দেখতে পারে [অর্থাৎ দেখা জায়েজে]। সমলিঙ্গ হওয়ার কারণে এবং সাধারণত দৃষ্টির মাঝে কামভাব না থাকার কারণে। যেমন– পুরুষের অন্য পুরুষের দিকে তাকানোর মাঝে কামভাব থাকে না। তাছাড়া মহিলাদের পরস্পরের মাঝে এতটুকু অঙ্গ [অর্থাৎ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ব্যতীত অবশিষ্ট অঙ্গসমূহ] খোলার প্রয়োজনও হয়ে থাকে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোনো পুরুষের জন্য তার মাহরামের দিকে দৃষ্টির হুকুম যেমন এক মহিলার জন্য অন্য মহিলার প্রতি দৃষ্টির হুকুমও তেমন। অবশ্য কোনো মহিলার পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাতের হুকুম তেমন নয়। কেননা পুরুষেরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে অঙ্গসমূহ খোলা রাখার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ الخ : একজন পুরুষ অন্য পুরুষের যতটুকু অংশ দেখতে পারে অর্থাৎ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছাড়া বাকি অঙ্গসমূহ একজন মহিলা অন্য মহিলার ততটুকু অংশ দেখতে পারে। কেননা দু মহিলার মাঝে লিঙ্গের ভিন্নতা নেই; বরং অভিন্নতা বিদ্যমান। মানুষ সাধারণভাবে ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না। তাছাড়া এক মহিলা অন্য মহিলার প্রতি তাকানো দ্বারা সাধারণভাবে উত্তেজনা বোধ করে না। এতদ্ভিন্ন এমন অনেক প্রয়োজনও দেখা দেয় যার কারণে এক মহিলার বুক পেট অন্য মহিলার সামনে প্রকাশিত হয়ে যায়। যেমন– মহিলাদের গোসলের স্থানে একসাথে অনেক মহিলা গোসল করে তখন একজনের সতরের জায়গা অন্যের সামনে খোলা বা প্রকাশিত হয়।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করে শরিয়ত এক মহিলার পক্ষে অন্য মহিলার এতটুকু অংশ দেখা জায়েজ সাব্যস্ত করেছে যতটুকু একজন পুরুষ অন্য পুরুষের শরীর থেকে দেখতে পারে।

قَوْلُهُ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ نَظَرَ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক মহিলা অন্য মহিলার ততটুকু অংশ দেখতে পারবে যতটুকু অংশ একজন পুরুষ তার মাহরামের দেখতে পারে। অর্থাৎ একজন মহিলা অন্য মহিলার বুক পিঠ দেখতে পারবে না, তবে মহিলাগণ পুরুষদের পেট পিঠ দেখতে পারবে। কেননা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তাদের পেট পিঠ অনাবৃত থাকে। মহিলাদের বিষয়টি এমন নয়; বরং তাদের কাজের সময়ও পিঠ ও পেট আবৃতই থাকে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর এ মতটি বর্ণনা করার পর মুসান্নিফ (র.) মন্তব্য করেন যে, তাঁর মতের চেয়ে প্রথমটি বেশি বিশুদ্ধ। অর্থাৎ প্রথম মতটির উপর ফতোয়া।

قَالَ : وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ اَمَتِهِ الَّتِىْ تَحِلُّ لَهُ وَ زَوْجَتِهِ اِلٰى فَرْجِهَا وَهٰذَا اِطْلَاقٌ فِى النَّظَرِ اِلٰى سَائِرِ بَدَنِهَا عَنْ شَهْوَةٍ وَغَيْرِ شَهْوَةٍ وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ غُضَّ بَصَرَكَ اِلَّا عَنْ اَمَتِكَ وَامْرَأَتِكَ وَلِاَنَّ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ مِنَ الْمَسِيْسِ وَالْغِشْيَانِ مُبَاحٌ فَالنَّظَرُ اَوْلٰى اِلَّا اَنَّ الْاَوْلٰى اَنْ لَا يَنْظُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلٰى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَتَجَرَّدُ اِنْ تَجَرُّدَ الْعِيْرِ وَلِاَنَّ ذٰلِكَ يُوْرِثُ النِّسْيَانَ لِوُرُوْدِ الْاَثَرِ وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ الْاَوْلٰى اَنْ يَنْظُرَ لِيَكُوْنَ اَبْلَغَ فِىْ تَحْصِيْلِ مَعْنَى اللَّذَّةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পুরুষের জন্য তার হালাল ক্রীতদাসী ও নিজ স্ত্রীর যৌনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েজ। এ উক্তি দ্বারা তাদের পুরো দেহের প্রতি মালিক কর্তৃক দৃষ্টিপাত করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। তা উত্তেজনার সাথে হোক কিংবা উত্তেজনা ছাড়া হোক। এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ -এর হাদীস– 'তুমি তোমার চোখ দাসী ও স্ত্রী ছাড়া অন্য সকল থেকে অবনত রাখ।' তাছাড়া দৃষ্টির চেয়ে গভীর বিষয় হলো স্পর্শ ও সহবাস করাই যেহেতু বৈধ তাহলে তো দৃষ্টিপাত আরো উত্তমভাবে বৈধ হবে। তবে সর্বোত্তম হলো স্বামী-স্ত্রীর কেউই পরস্পরের যৌনাঙ্গের দিকে না তাকানো। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে সে যেন যতদূর সম্ভব পর্দা করে। তারা যেন বন্য গাধা বা পশুর মতো উলঙ্গ না হয়। অধিকন্তু হাদীসের বর্ণনানুযায়ী তা স্মৃতি বিভ্রাট সৃষ্টি করে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলতেন, উত্তম হলো দৃষ্টিপাত করা যাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাদ লাভ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ اَمَتِهِ الخ : আলোচ্য ইবারতে স্ত্রী ও দাসীর দেহের কতটুকু অংশ দেখা যাবে তার বর্ণনা সীমা পরিসীমা সম্পর্কে সবিস্তার দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ব্যক্তির স্ত্রী ও হালাল দাসীর যৌনাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ ইবারত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রী ও দাসীর পুরো শরীর দেখা বৈধ। চাই তা কামভাবের সাথে দেখা হোক কিংবা কামভাব ছাড়া সাধারণভাবে দেখা হোক। আলোচ্য মাসআলার দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর একটি বিখ্যাত হাদীস, যা নিম্নরূপ– قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ غُضَّ بَصَرَكَ اِلَّا عَنْ اَمَتِكَ وَامْرَأَتِكَ অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেন, তুমি তোমার দৃষ্টি দাসী ও স্ত্রী ছাড়া অন্য সকল মহিলা থেকে অবনত রাখ।' আল্লামা হাকেম যায়লাঈ (র.) হাদীসটির মান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, এরূপ অর্থের হাদীস ইমাম নাসাঈ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ সকলেই তাঁদের কিতাবে সংকলন করেছেন। তাঁদের কিতাবে নিম্নোক্ত সনদের হাদীসটি এভাবে বর্ণিত আছে–

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ حَيْدَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِىْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ قَالَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لَا تَرِيَنَّهَا فَلَا تَرِيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا كَانَ اَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُسْتَحْىٰ مِنَ النَّاسِ (قَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ).

অর্থাৎ 'হযরত মুআবিয়া ইবনে হীদাহ (র.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে বললাম, আমাদের সতরের কোন অংশ খুলতে পারব আর কোন অংশ খুলতে পারব না? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া সকলের থেকে সতরের হেফাজত কর। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদি একজন অন্যের উপর উপগত হয় [তাহলে কী করব?] রাসূল ﷺ বললেন, যদি তা না দেখে পার তাহলে তা দেখো না। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদি কেউ নির্জনে তা করে [তাহলেও কি সতর ঢেকে রাখবে?] রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহকে মানুষের চেয়ে বেশি লজ্জা করা উচিত।'

এ হাদীসের দ্বারা হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বর্ণিত হাদীসের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং কিতাবে বর্ণিত হাদীসের হুবহু শব্দ নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রে না পাওয়া গেলেও এর বক্তব্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

মোটকথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নিজ স্ত্রী ও দাসীর সামনে অনাবৃত হওয়া স্বামী বা মালিকের জন্য বৈধ।

মাসআলাটির যৌক্তিক দলিল হলো, স্ত্রী ও দাসীর সাথে সহবাস করা ও তাদের গোপনাঙ্গ স্পর্শ করা যেহেতু বৈধ, তাই স্পর্শ ও সহবাস যা নজরের তুলনায় মারাত্মক তাই যখন জায়েজ তাহলে এর চেয়ে সাধারণ দৃষ্টিপাত তো স্বাভাবিকভাবে জায়েজ হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّ الْاَوْلٰى اَنْ لَّا يَنْظُرَ الخ : বিখ্যাত হিদায়ার গ্রন্থকার (র.) এতদসম্পর্কে বলেন, যদিও স্ত্রী ও দাসীর যৌনাঙ্গের দিকে তাকানো বৈধ, তবে তা উত্তম নয়। স্বামী ও স্ত্রী এবং দাসী ও মনিবের উচিত সহবাস বা আদর-সোহাগের সময় কারো গোপনাঙ্গের দিকে না তাকানো। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন- اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهٗ فَلْيَسْتَتِرْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيْرِ

অর্থাৎ 'যদি কেউ সহবাস করে তবে তার জন্য উচিত যথাসম্ভব পর্দা করা এবং স্বামী-স্ত্রী যেন বন্য গাধার মতো উলঙ্গ না হয়।'

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি মোট পাঁচজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। তাঁরা হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস, উত্‌বা ইবনে আব্‌দ আস্‌সুলামী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবূ হুরায়রা ও আবূ উমামাহ (রা.)। আমরা এখানে নাসবুর রায়াহ থেকে শুধুমাত্র হযরত উত্‌বা (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর হাদীস দুটি উদ্ধৃত করছি।

১ম হাদীস :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهٗ فَلْيُلْقِ عَلٰى عَجُزِهٖ وَعَجُزِهَا شَيْئًا وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيْرَيْنِ .

অর্থাৎ 'যখন কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয় তখন তারা যেন তাদের উভয়ের সতরের উপর কাপড় রাখে এবং তারা যেন দুটি গাধার মতো উলঙ্গ না হয়।'

২য় হাদীস :

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهٗ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعِيْرِ .

অর্থাৎ 'হযরত উত্‌বা ইবনে আব্‌দ আস্‌সুলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয় তাহলে সে যেন পর্দা করে এবং বন্য গাধার মতো উলঙ্গ না হয়।'

এ দু'টি হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সহবাসের সময় স্বামী স্ত্রী কারো জন্যেই একেবারে বিবস্ত্র হওয়া উচিত নয়।

قَوْلُهُ وَلِاَنَّ ذٰلِكَ يُوْرِثُ النِّسْيَانَ الخ : মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলার স্বপক্ষে এ ইবারত দ্বারা ২য় দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, স্ত্রী ও দাসীর যৌনাঙ্গের দিকে তাকানো স্বামী বা মালিকের ঠিক নয়। কারণ এর দ্বারা স্মরণশক্তি হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে গ্রন্থকার (র.) দাবি করেছেন যে, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কিন্তু আল্লামা যায়লাঈ (র.) -এর মতে এ দাবি সঠিক নয়। অর্থাৎ কোনো হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, যৌনাঙ্গের দিকে তাকালে স্মরণশক্তি হ্রাস পাবে।

তিনি বলেন, অবশ্য দুটি চরম দুর্বল হাদীসের উক্তি দ্বারা এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এরূপ দৃষ্টিদানের দ্বারা অন্ধত্ব চলে আসে।

قَوْلُهُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ (رضـ) يَقُوْلُ الْاَوْلٰى الخ : মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলার বিপরীতে এখানে হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর একটি উক্তি উল্লেখ করছেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন-

اَلْاَوْلٰى اَنْ يَنْظُرَ لِيَكُوْنَ اَبْلَغَ فِيْ تَحْصِيْلِ مَعْنَى اللَّذَّةِ .

অর্থাৎ 'স্বামী ও মালিকের জন্যে দাসী ও স্ত্রীর যৌনাঙ্গের দিকে তাকানো উত্তম। কারণ এর দ্বারা সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাদ উপভোগ হয়।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এই উক্তি সম্পর্কে আল্লামা যায়লাঈ (র.) -এর মন্তব্য হলো غَرِيْبٌ جِدًّا। অর্থাৎ হাদীসটি প্রমাণিত নয়।

এ সম্পর্কে আল্লামা আইনী (র.) -এর মন্তব্য হলো- اِنَّ هٰذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَا بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ وَلَا بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ

এ হাদীস হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে সহীহ কিংবা দুর্বল কোনো সূত্রেই প্রমাণিত নয়।

قَالَ : وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ اِلَى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقَيْنِ وَالْعَضُدَيْنِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَى ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا وَفَخِذِهَا وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ الْاٰيَةَ وَالْمُرَادُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ مَوَاضِعُ الزِّيْنَةِ وَهِىَ مَا ذَكَرْنَا فِى الْكِتَابِ وَيَدْخُلُ فِىْ ذٰلِكَ السَّاعِدُ وَالْاُذُنُ وَالْعُنُقُ وَالْقَدَمُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পুরুষের জন্য তার মাহরামের চেহারা, মাথা, বুক, দু পায়ের নলি ও দু বাহু দেখা বৈধ। তবে তার পেট, পিঠ ও উরুর দিকে তাকাবে না। এর দলিল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ- وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ الْاٰيَةَ 'তারা [মহিলাগণ] যেন তাদের স্বামী [ও অন্যান্য মাহরাম] ব্যতীত অন্য কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য [আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন] সৌন্দর্যের স্থানসমূহ। আর তা হলো ঐ সকল স্থান যা আমরা এ কিতাবে উল্লেখ করেছি। এর মধ্যে হাতের বাহু, কান, ঘাড় ও পা অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوَاتِ الخ : আলোচ্য ইবারতে মাহরাম মহিলার দেহের কতটুকু অংশ পুরুষের জন্য দেখা জায়েজ সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাহরাম মহিলা বলা হয় এমন মহিলাকে যার সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম। বংশগত কারণে হোক কিংবা অন্য যে কোনো কারণে হোক। যেমন- ফুফু, খালা, বোন, মেয়ে ও ভাতিজির সাথে বংশগত নৈকট্যের কারণে বিবাহ হারাম। শাশুড়ি, খালা শাশুড়ি ও ফুফু শাশুড়ির সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে বিবাহ হারাম হয়ে যাব। আর দুধমা, দুধ-বোনের সাথে দুগ্ধপানের কারণে বিবাহ হারাম।

মোটকথা, মাহরাম মহিলার চেহারা, মাথা, বুক, দু পায়ের নলি, উভয় কান, ঘাড়, দু হাতের বাহু ও পা দেখা পুরুষের জন্য জায়েজ। তবে জায়েজ হওয়ার অর্থ হলো, যদি এসব অঙ্গের দিকে তাকালে কামভাব জাগ্রত না হয় তবে তাকানো জায়েজ। আর যদি তাকানোর দ্বারা উত্তেজনা অনুভব হয় বা এ ব্যাপারে সংশয় সন্দেহের সৃষ্টি হয় তাহলে তা বৈধ নয়। আর যদি মনে প্রবল ধারণা হয় যে, তাকালে উত্তেজিত হয়ে পড়বে তাহলে দৃষ্টি অবনত রাখা উচিত। -[সূত্র : ফাতাওয়ায়ে শামী]

মাহরাম মহিলার ঐ সকল অঙ্গ দেখা বৈধ হওয়ার দলিল কুরআন মাজীদের একটি আয়াত। আয়াতটি হলো-

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ . (الاية)

অর্থাৎ 'তারা যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, মহিলা, মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ- এরা ব্যতীত অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।'

আয়াতে উল্লিখিত زِيْنَةٌ শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্য প্রকাশের স্থানসমূহ। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, মহিলাদের জন্য সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গসমূহ নিজ স্বামী, মাহরাম, মহিলা ও খোজা পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সামনে প্রকাশ করা নিষেধ। সুতরাং এদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গ বা স্থানসমূহ প্রকাশ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

আর সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গ হলো চেহারা, মাথা, বুক, দু-পায়ের নলা, দু-হাতের বাহু, কান, ঘাড় ও পা।

এ অঙ্গগুলো দেখা মাহরাম পুরুষের জন্য প্রয়োজনের খাতিরে জায়েজ আছে। তবে মহিলাগণ তাদের মাহরাম পুরুষের সামনে এ অঙ্গগুলোও ঢেকে রাখবে।

لِاَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ مَوَاضِعُ الزِّيْنَةِ بِخِلَافِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ مَوَاضِعَ الزِّيْنَةِ وَلِاَنَّ الْبَعْضَ يَدْخُلُ عَلَى الْبَعْضِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِيْذَانٍ وَاحْتِشَامٍ وَالْمَرْاَةُ فِيْ بَيْتِهَا فِيْ ثِيَابِ مَهْنَتِهَا عَادَةً فَلَوْ حُرِّمَ النَّظْرُ اِلٰى هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ اَدّٰى اِلَى الْحَرَجِ وَكَذَا الرَّغْبَةُ تَقِلُّ لِلْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ فَقَلَّ مَا تَشْتَهِىْ بِخِلَافِ مَا وَرَاءَهَا لِاَنَّهَا لَا تَنْكَشِفُ عَادَةً وَالْمَحْرَمُ مَنْ لَا تَجُوْزُ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَلَى التَّابِيْدِ بِنَسَبٍ كَانَ اَوْ بِسَبَبٍ كَالرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ لِوُجُوْدِ الْمَعْنَيَيْنِ فِيْهِ وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْمُصَاهَرَةُ بِنِكَاحٍ اَوْ سِفَاحٍ فِى الْاَصَحِّ لِمَا بَيَّنَّا ـ

অনুবাদ : কেননা এসবই সৌন্দর্য প্রকাশক আকর্ষণীয় স্থানের অন্তর্ভুক্ত। তবে পিঠ, পেট ও উরু এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এগুলো সৌন্দর্য প্রকাশক স্থানসমূহের মধ্যে গণ্য নয়। আর [মাহরাম মহিলার সৌন্দর্য প্রকাশের স্থানগুলো দেখা বৈধ হওয়ার] কারণ হলো, সাধারণভাবে মাহরাম আত্মীয়স্বজন পরস্পরের মাঝে সংকোচ ও অনুমতি ব্যতীতই গমনাগমন করে থাকে। আর মহিলারা তাদের ঘরে সাধারণভাবে কাজের পোশাকেই অবস্থান করে। অতএব, যদি মাহরাম মহিলাদের এসব স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম সাব্যস্ত হয় তাহলে [চলাফেরার ক্ষেত্রে] অসুবিধা সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু মাহরাম মহিলা চিরস্থায়ীভাবে হারাম হওয়ার কারণে তাদের প্রতি আকর্ষণ কম হয়। সুতরাং কামভাবও কম হবে। তবে উল্লিখিত অঙ্গগুলো ছাড়া অন্য অঙ্গসমূহের [পেট, পিঠ ও উরুর] হুকুম ভিন্ন। কেননা মহিলাগণ সাধারণত ঐ সব অঙ্গ খোলা রাখে না। আর মাহরাম হলো এমন মহিলা যাদের সাথে চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম বংশগত কারণে কিংবা অন্যকোনো কারণে। যেমন– দুধপানের সম্পর্ক কিংবা শ্বশুরালয়ের সম্পর্ক। এতে উভয় বিষয় [তথা প্রয়োজন ও কম আকর্ষণ] বিদ্যমান। [প্রকাশ থাকে যে,] বিশুদ্ধতম মতানুসারে মুসাহারা বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে হোক কিংবা ব্যভিচারের কারণে হোক-উভয়েই সমান। এর কারণ আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, কোনো পুরুষের জন্য তার মাহরাম মহিলার পেট, পিঠ ও উরুর দিকে তাকানো জায়েজ নেই। কারণ, এ স্থানগুলো মহিলাদের সৌন্দর্য প্রকাশের স্থান হিসেবে গণ্য নয়। কুরআনের আয়াতে সৌন্দর্য প্রকাশের স্থানসমূহ মাহরাম পুরুষের সামনে খোলা রাখা জায়েজ বলে সাব্যস্ত করেছে। অতএব, মহিলাদের পেট, পিঠ ও উরু মাহরাম পুরুষের জন্য দেখা অবৈধ।

قَوْلُهُ وَلِاَنَّ الْبَعْضَ يَدْخُلُ عَلَى الْبَعْضِ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে মাহরাম মহিলার সৌন্দর্যের স্থানসমূহ দেখা বৈধ হওয়ার যৌক্তিক দলিল বা প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, সাধারণত মাহরাম নারীদের কাছে পুরুষরা অনুমতি ও সংকোচ ছাড়া অবাধে যাতায়াত করে। আর মহিলাগণ সাধারণত ঘরের মধ্যে কাজকর্মের পোশাক– যা পুরো দেহ আবৃত করার মতো হয় না তা-ই পরিহিতা অবস্থায় থাকে। এমতাবস্থায় যদি শরিয়তের পক্ষ থেকে মাহরাম মহিলাদের সৌন্দর্যের স্থানসমূহ যথা– হাত, পা, ঘাড়-গলা, চুল ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম সাব্যস্ত হয় তাহলে তাদের চলাফেরার ক্ষেত্রে বহু সমস্যা সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়ত মাহরাম মহিলাদের সাথে যেহেতু সর্বাবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম তাই তাদের প্রতি আকর্ষণ কম হয় অধিকন্তু যারা মাহরাম হন তারা সাধারণত শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয় হয়ে থাকে। আর যারা সম্মানীয় ও শ্রদ্ধেয় হয় তাদের সামনে কামভাব উত্তেজিত হয় না তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকার কারণে আর যদিও হয় তা নিতান্তই নগণ্য। আর আকর্ষণ কম হওয়াতে আসক্তি বা কামভাব কম হয়।

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ مَا وَرَاءَهَا : মুসান্নিফ (র.) বলেন, সৌন্দর্যের স্থানসমূহ ছাড়া অন্য স্থানসমূহ যথা– পেট, পিঠ ও উরু এর বিষয় এমন নয়। কারণ এ স্থানগুলো মেয়েরা সাধারণত খোলা রাখে না; বরং সবসময় এ স্থানগুলো ঢেকে রাখে। [অতএব, এগুলো ঢেকে রাখার কারণে কোনো সমস্যা হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।]

قَوْلُهٗ وَالْمَحْرَمُ مَنْ لَا تَجُوْزُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাহরাম বলা হয় এমন মহিলাকে যার সাথে চিরস্থায়ীভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। আর হারাম হওয়ার কারণ নিকটাত্মীয় হওয়ার ভিত্তিতেও হতে পারে আবার অন্যকোনো কারণেও হতে পারে [যে কারণ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে]।

নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে যেমন– ফুফু, খালা, মা ও মেয়ে ইত্যাদি অনেকের বিবাহ চিরতরে হারাম।

বৈবাহিক সম্পর্ক ও নিকটাত্মীয় হওয়া ছাড়া অন্য কারণেও হারাম হতে পারে। যেমন– দুধ পানের কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়।

যদি কোনো ছেলে শিশু দু-বছর বয়সের মধ্যে কোনো মহিলার দুধ পান করে তাহলে ঐ মহিলা, তার মেয়ে, তার মা, বোন ইত্যাদি অনেকের সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক চিরস্থায়ীভাবে হারাম সাব্যস্ত হয়। এছাড়া মুসাহারার তথা বিবাহ করার কারণে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক হয় এর দ্বারা অনেকের সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম হয়ে যায়। যেমন– শাশুড়ি, খালা শাশুড়ি, ফুফু শাশুড়ি ইত্যাদি অনেকের সাথে।

উল্লেখ্য যে, এখানে মুসাহারার বিষয়টি ব্যাপক। বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে মুসাহারা হয় তা যেমন এতে শামিল তেমনি ব্যভিচারের মাধ্যমে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাও শামিল।

قَوْلُهٗ لِوُجُوْدِ الْمَعْنَيَيْنِ فِيْهِ الخ : উক্ত গ্রন্থের গ্রন্থকার (র.) বলেন, কোনো মহিলা যে কোনোভাবেই মাহরাম হোক না কেন তাদের সৌন্দর্যের স্থানসমূহ দেখা বৈধ। কারণ তাদের মাঝে দেখা জায়েজ হওয়ার দুটি শর্তই বিদ্যমান। শর্ত দুটি হলো–

১. এদের কাছে অনুমতি ও সংকোচ ছাড়া যাতায়াত করা যায়। এমতাবস্থায় যদি পর্দার শর্তারোপ করা হয় তাহলে সমস্যা সৃষ্টি হবে।

২. তাদের সাথে সর্বাবস্থায় বিবাহ হারাম হওয়ায় তাদের প্রতি আকর্ষণ কম হয়, আর তাই আসক্তি ও কামভাবও কম হয়।

অতঃপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসাহারা যেভাই স্থাপিত হোক না কেন উভয়ের হুকুম সমান। অর্থাৎ যদি বিবাহের মাধ্যমে মুসাহারা স্থাপিত হয় তাহলে যে হুকুম– ব্যভিচারের মাধ্যমে মুসাহারা স্থাপিত হলে একই হুকুম সাব্যস্ত হবে। হুকুমে কোনো তারতম্য নেই। কেননা উভয় অবস্থায় দেখা জায়েজ হওয়ার শর্ত বিদ্যমান।

জ্ঞাতব্য : যদি কোনো পুরুষ ও মহিলার মধ্যে ব্যভিচারের মাধ্যমে মুসাহারা স্থাপিত হয় তাহলে এর দ্বারা যাদের সাথে বিবাহ হারাম হয় তাদের সৌন্দর্যের অঙ্গসমূহ দেখা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কতিপয় ওলামায়ে কেরামের ভিন্নমতও রয়েছে। তারা বলেন, ব্যভিচারের মাধ্যমে যদি মুসাহারা হয় তাহলে এর মাহরাম মহিলাদের সৌন্দর্যের অঙ্গসমূহ দেখা ও স্পর্শ করা নাজায়েজ। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি উত্থাপন করে বলেন, ব্যভিচারের মাধ্যমে যে মুসাহারা সাব্যস্ত হয়েছে তা শাস্তিরূপে হয়েছে। আর যেহেতু এ ব্যক্তি থেকে একবার [ব্যভিচারের মাধ্যমে] খিয়ানত পাওয়া গেছে তাই পুনর্বার তাকে বিশ্বাস করা যায় না। তাই তার জন্য ঐ সব মহিলার সৌন্দর্যের স্থানসমূহ দেখা ও স্পর্শ করাও বৈধ নয়। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধতম মতানুসারে তাদের সৌন্দর্যের অঙ্গসমূহ দেখা বৈধ। কারণ তাদের সাথেও চিরতরে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করা হয়েছে।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ مَا جَازَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْهَا لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ إِلَى ذٰلِكَ فِي الْمُسَافَرَةِ وَقِلَّةِ الشَّهْوَةِ لِلْمَحْرَمِيَّةِ بِخِلَافِ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفِّهَا حَيْثُ لَا يُبَاحُ الْمَسُّ وَإِنْ أُبِيحَ النَّظَرُ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ مُتَكَامِلَةٌ إِلَّا إِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى نَفْسِهِ الشَّهْوَةَ فَحِينَئِذٍ لَا يَنْظُرُ وَلَا يَمَسُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَحُرْمَةُ الزِّنَاءِ بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ أَغْلَظُ فَيُجْتَنَبُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাহরাম মহিলার যে সকল অংশ দেখা জায়েজ তা স্পর্শ করাও জায়েজ। কেননা সফর ও ভ্রমণের অবস্থায় এরূপ স্পর্শ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর তারা সর্বাবস্থায় হারাম হওয়ার কারণে তাদের প্রতি আসক্তি কম থাকে। তবে বেগানা [যাদেরকে বিবাহ করা জায়েজ] মহিলার চেহারা ও হাত এর ব্যতিক্রম। কেননা তা দেখা যদিও জায়েজ কিন্তু স্পর্শ করা জায়েজ নয়। কারণ তাদের ক্ষেত্রে কামভাব পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত থাকে। কোনো মাহরাম ব্যক্তি যদি নিজের ব্যাপারে কিংবা মাহরাম মহিলার ব্যাপারে উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে তার প্রতি নজর করা ও তাকে স্পর্শ জায়েজ হবে না। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– 'দু-চোখ জেনা করে আর এদের জেনা হলো দৃষ্টিপাত এবং দু-হাত জেনা করে আর এদের জেনা হলো হাতে স্পর্শ করা।' মাহরাম মহিলার সাথে জেনা করা অধিক মারাত্মক। সুতরাং তা থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ الخ : ইতঃপূর্বে মাহরাম মহিলার কোন কোন অঙ্গ দেখা জায়েজ তা আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য ইবারতে মাহরাম মহিলার কোন কোন অঙ্গ স্পর্শ করা বৈধ তা বর্ণনা করা হবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাহরাম মহিলার যেসব অঙ্গ দেখা বৈধ তা স্পর্শ করাও বৈধ। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) স্পর্শ করা জায়েজ হওয়ার পক্ষে দুটি যুক্তি পেশ করেন–

১. মাহরামের সাথে সফর করা জায়েজ, আর এমতাবস্থায় সফরের মধ্যে কোনো কিছুতে আরোহণ করাতে, তা থেকে নামাতে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে মাহরামের গায়ে স্পর্শ করার প্রয়োজন হয়। তাই তা বৈধ হওয়া উচিত।
২. সর্বদার জন্য তাদের সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার কারণে তাদের প্রতি আসক্তি বা কামভাব কম হয়। তাই তাদের স্পর্শ করাতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এটা খুবই যুক্তিযুক্ত কথা।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্ববর্ণিত বেগানা মহিলার চেহারা ও হাতের মাসআলা আলোচ্য মাসআলার সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এভাবে যে, বেগানা মহিলার চেহারা ও হাত দেখা জায়েজ হলেও তা স্পর্শ করা নাজায়েজ। আর মাহরাম মহিলার যেসব অঙ্গ দেখা জায়েজ তা স্পর্শ করাও জায়েজ। বেগানা মহিলার হাত ও চেহারা স্পর্শ করা নাজায়েজ এজন্য হবে যে, তাদের সাথে বিবাহ জায়েজ হওয়ার কারণে তাদের প্রতি কামভাব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। আর সাধারণভাবে তাদের চেহারা ও হাত স্পর্শ করার প্রয়োজনও হয় না।

قَوْلُهُ اِلَّا اِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهَا اَوْ عَلٰى نَفْسِهِ الشَّهْوَةَ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার ব্যতিক্রমী সূরত আলোচনা করছেন। তিনি বলেন, যদি কোনো পুরুষ তার মাহরাম মহিলার যেসব অঙ্গ দেখা ও স্পর্শ করা জায়েজ তা দেখলে বা স্পর্শ করতে গেলে নিজের উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা করে কিংবা মহিলা উত্তেজিত হতে পারে এমন কিছু মনে হয় তাহলে তার জন্য দেখা ও স্পর্শ করা জায়েজ নয়।

এর দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর হাদীস– اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেন, চোখের দ্বারা জেনা হয়, এদের জেনা হলো দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। আর হাতের দ্বারাও জেনা হয়, এদের জেনা হয় হাত দ্বারা ধরার বা স্পর্শ করার মাধ্যমে।'

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে আল্লামা আইনী (র.) বলেন, হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.)-এর বিখ্যাত কিতাব মুসলিম শরীফে নিম্নোক্ত সনদে উল্লেখ করেছেন–

عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مُحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَ زِنَاهُمَا الْمَشْىُ وَالْقَلْبُ يَهْوٰى وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرَجُ اَوْ يُكَذِّبُهُ .

এ ছাড়া ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসালিম (র.) শায়েখদ্বয় এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। আর তা হলো নিম্নরূপ–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مُحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَ زِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَتَمَنّٰى وَالْفَرَجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ اَوْ يُكَذِّبُهُ .

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) যা বর্ণনা করেছেন তার চেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ لَمَم -এর ব্যাখ্যা আর কিছুতে পাইনি। রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জেনার অংশ নির্ধারিত করে রেখেছেন সে সেই অংশ অবশ্যই পাবে। দু-চোখের জেনা হলো দৃষ্টিপাত, মুখের জেনা [অশ্লীল] কথা, মানুষের মন কামনা করে আর তার যৌনাঙ্গ তা বাস্তবায়ন করে কিংবা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

মোটকথা, উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা হাত ও চোখ দ্বারা যে জেনা হয় তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা হলে মাহরাম মহিলার গায়ে স্পর্শ করবে না। তাছাড়া حُرْمَةُ الزِّنَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ اَغْلَظُ 'মাহরাম মহিলার সঙ্গে জেনা করার নিষিদ্ধতা অন্যদের তুলনায় বেশি মারাত্মক।' তাই এর থেকে অতি সাবধানতার সাথে বেঁচে থাকতে হবে।

وَلَا بَأْسَ بِالْخَلْوَةِ وَالْمُسَافَرَةِ بِهِنَّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيْلٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَالْمُرَادُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا فَإِنِ احْتَاجَتْ إِلَى الْإِرْكَابِ وَالْإِنْزَالِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهَا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَيَأْخُذُ ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا دُوْنَ مَا تَحْتَهَا إِذَا أَمِنَا الشَّهْوَةَ فَإِنْ خَافَهَا عَلٰى نَفْسِهِ أَوْ عَلَيْهَا تَيَقُّنًا أَوْ ظَنًّا أَوْ شَكًّا فَلْيَجْتَنِبْ ذٰلِكَ بِجُهْدِهِ ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَهَا الرُّكُوْبُ بِنَفْسِهَا يَمْتَنِعُ عَنْ ذٰلِكَ أَصْلًا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا يَتَكَلَّفُ بِالثِّيَابِ كَيْلَا تُصِيْبَهُ حَرَارَةُ عُضْوِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الثِّيَابَ يَدْفَعُ الشَّهْوَةَ عَنْ قَلْبِهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পুরুষের জন্য মাহরাম মহিলাদের সাথে একান্তে অবস্থান করা ও তাদের সাথে সফর করাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো মহিলার জন্য তিনদিন তিনরাতের বেশি সময় তার স্বামী ও মাহরাম ছাড়া সফর করা জায়েজ নয়। রাসূল ﷺ এও বলেছেন যে, কোনো পুরুষ অনাত্মীয় মহিলার সাথে কোনোভাবেই যেন নির্জনে অবস্থান না কারে। [যদি তা করে] তাহলে তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হবে শয়তান। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যদি পুরুষটি মাহরাম না হয়। যদি মাহরাম মহিলা পরিবহনে আরোহণ করা এবং তা থেকে নামার সময় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় তাহলে কাপড়ের উপর দিয়ে তাকে স্পর্শ করাতে কোনো সমস্যা বা দোষ নেই। [তখন] তার পেট ও পিঠ ধরবে, এর নিম্নাংশ ধরবে না। যদি সে কামভাবের ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করে। আর যদি নিজের ব্যাপারে অথবা মাহরাম মহিলার ব্যাপারে কামভাবের আশঙ্কা করে নিশ্চিতভাবে অথবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে কিংবা শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে তাহলে যথাসম্ভব সাধ্যমতো ধরাছোঁয়া থেকে বেঁচে থাকবে। অতঃপর যদি মহিলার পক্ষে একাকী পরিবহনে আরোহণ করা সম্ভব হয় তাহলে সম্পূর্ণভাবে ধরাছোঁয়া থেকে বিরত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি একাকী তার পক্ষে আরোহণ সম্ভব নাই হয় তাহলে তাকে কাপড়ের সাহায্যে ধরবে তবে সাবধানতা অবলম্বন করবে যাতে শরীরের উত্তাপ না লাগে। আর যদি কাপড়ও না পাওয়া যায় তাহলে অন্তর থেকে যথাসম্ভব কামভাবকে দূরে রাখবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِالْخَلْوَةِ الخ : আলোচ্য ইবারতে প্রথমে মাহরাম মহিলাদের সাথে একান্তে অবস্থান করা এবং সফর করার মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলা : মাহরাম মহিলার সাথে একান্তে অবস্থান করা এবং তাদের সাথে প্রয়োজনে সফর করাতে কোনো সমস্যা নেই। এ বিধানের দলিল রাসূল ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীস–

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا .

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো মহিলা যেন তিনদিন তিনরাতের বেশি সময়ের সফর তার স্বামী কিংবা মাহরাম যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম [নিকটাত্মীয়] ব্যতীত না করে।'

আলোচ্য হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর সহীহ মুসলিম শরীফের হজ্জ অধ্যায়ের سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ নামক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। সেখানে হাদীসটি এভাবে আছে–

عَنْ قُزْعَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا .

এ বর্ণনায় তিনদিনের কথা উল্লেখ আছে। বুখারী শরীফের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি বর্ণনায় তিনদিন, দুইদিন ও একদিনের দূরত্বের সফরের কথা উল্লেখ আছে। তবে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ তিনদিনের হাদীসকে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তিনদিনের দূরত্ব পরিমাণ সফর করা হলে মাহরাম ছাড়া যে সফর করা যাবে না এ ব্যাপারে সবাই একমত। মোটকথা, উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা মাহরাম পুরুষের সাথে মহিলাদের সফর করার অনুমতি পাওয়া যায়। সুতরাং মাহরাম মহিলার সাথে পুরুষদের সফর করার বৈধতা উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো।

এরপর মুসান্নিফ (র.) আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেন তা এই–

أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيْلٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ .

অর্থাৎ 'কোনো পুরুষ যেন এমন কোনো মহিলার সাথে একান্তে সময় না কাটায়, যার সাথে তার বৈধ কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি তা করে তাহলে তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হবে শয়তান।' [আর শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদের মাঝে অপকর্ম ঘটাবে।]

আলোচ্য হাদীস দ্বারা মুসান্নিফ (র.) প্রমাণ করতে চান যে, যার সাথে বৈধ সম্পর্ক আছে তার সাথে একান্তে সময় কাটানো যাবে। আর এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيْلٍ বাক্য দ্বারা। অথচ এতদসম্পর্কে আল্লামা যায়লাঈ (র.) বলেন, এই (لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيْلٍ) শব্দে হাদীসটি প্রমাণিত হয়। হাদীসের প্রথমাংশ (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) ও শেষাংশ (فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) অবশ্য বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ওমর (রা.), হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস ইমাম তিরমিযী (র.) ও ইমাম নাসাঈ (র.) তাঁদের নিজ নিজ কিতাবের যথাক্রমে فِتَنٌ ও عِشْرَةُ النِّسَاءِ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি নিম্নে প্রদত্ত হলো–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُمْتُ فِيْكُمْ كَمَقَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْنَا فَقَالَ أُوْصِيْكُمْ بِأَصْحَابِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُوْا الْكِذْبُ حَتّٰى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ إِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ (قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ) .

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) জাবিয়া নামক স্থানে এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, হে লোক সকল! রাসূল ﷺ তোমাদের মাঝে যে স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন আমি বর্তমানে সেখানে দাঁড়িয়েছি। অতঃপর তিনি বলেছেন, আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীগণের [অনুসরণের] ব্যাপারে অসিয়ত বা উপদেশ করছি। অতঃপর তাদের পরে যারা [তাবেয়ীগণ] আসবে। অতঃপর তাদের পরে যারা [তাবে তাবেয়ীগণ] আসবে। তারপর মিথ্যার প্রসার ঘটবে। লোকে শপথ করবে অথচ তার কাছে শপথ চাওয়া হয়নি। সাক্ষী চাওয়া ব্যতীত সাক্ষ্য দান করবে। সাবধান! কোনো পুরুষ যেন কোনো [বেগানা] মহিলার সাথে নির্জনে একত্রিত না হয়। আর যদি একত্রিত হয় তাহলে তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হবে শয়তান। তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে [জামাতের সাথে] থাকবে। তোমরা বিভক্ত থেকে বেঁচে থাকবে। একজনের সাথে শয়তান থাকে। শয়তান দুজন থেকে দূরে থাকে।

আর হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.)-এর হাদীস সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণিত। তা এই–

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا .

মোটকথা, মুসান্নিফ (র.) কর্তৃক হাদীসের প্রথমাংশ ও শেষাংশ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে, যা দ্বারা পরোক্ষভাবে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মাহরাম মহিলার সাথে কিছুতেই একান্তে অবস্থান করা যাবে না।

قَوْلُهُ فَإِنِ احْتَاجَتْ إِلَى الْإِرْكَابِ الخ : যদি মাহরাম মহিলা সফরের মধ্যে কোনো বাহনজন্তু বা পরিবহনে আরোহণ করতে এবং তা থেকে নামতে এমন কারো মুখাপেক্ষী হয় যে তাকে উঠিয়ে দেবে এবং নামিয়ে দেবে, তাহলে মাহরাম পুরুষের জন্য কাপড়ের উপর দিয়ে তাকে ধরা ও তার গায়ে স্পর্শ করাতে কোনো ধরনের সমস্যা নেই। প্রয়োজনে মহিলার পেট, পিঠও কাপড়ের উপর দিয়ে ধরবে, তবে পেট, পিঠের নিচের অংশ তথা নাভির নিচের অংশ কিছুতেই ধরবে না। কেননা নাভির নিচের অংশ সকলের ক্ষেত্রেই সতরের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে পেট ও পিঠ মহিলাদের পরস্পরের ক্ষেত্রে সতর হিসেবে গণ্য নয়। যেহেতু এখানে পেট ও পিঠের দ্বারা উঠানো ও নামানোর প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় তাই নাভির নিচের অংশ স্পর্শ করার অনুমতি শরিয়তে দেয়নি। তবে এরূপ ধরা ও স্পর্শ করার অনুমতি তখনই পাওয়া যাবে যদি এর দ্বারা স্পর্শকারী এবং যাকে স্পর্শ করা হচ্ছে তাদের কারো মাঝে কামভাব জাগ্রত না হয়।

قَوْلُهُ فَإِنْ خَافَهَا عَلَى نَفْسِهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি স্পর্শকারী নিজের ব্যাপারে অথবা মাহরাম মহিলার ব্যাপারে কামভাব জাগ্রহ হওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কা করে অথবা প্রবল ধারণা করে কিংবা কামভাব জাগ্রত হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে স্পর্শ করার ব্যাপারে যথাসম্ভব বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

উপরে উল্লিখিত তিনও অবস্থার হুকুম একই। تَيَقُّنٌ বলা হয় সুনিশ্চিত বিশ্বাসকে। ظَنٌّ হলো প্রবল ধারণা বা দু-বিষয়ের কোনো এক বিষয়ের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হওয়া। আর شَكٌّ বলা হয় কোনো কিছু হওয়া বা না হওয়ার ধারণা সমান হওয়া।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَهَا الرُّكُوبُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি মহিলা নিজে বাহনজন্তু বা পরিবহনে আরোহণ করতে সমর্থ হয় তাহলে মাহরাম পুরুষের জন্য কোনোক্রমেই স্পর্শ করা জায়েজ নয়।

আর যদি মহিলা তার নিজ কর্ম সম্পাদনে সক্ষম না হয় বা তা করতে না পারে তাহলে মাহরাম পুরুষ কাপড়ের দ্বারা প্রলেপ দিয়ে তাকে এমনভাবে ধরবে যাতে মহিলার দেহের উত্তাপ অনুভূত না হয়। যদি এমন কাপড় খুঁজে না পায় যা দ্বারা মহিলাকে ধরবে তাহলে প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মহিলার গায়ে স্পর্শ করবে বটে তবে যতটুকু সম্ভব অন্তর থেকে কামভাব দূরে রাখার চেষ্টা করবে।

قَالَ : وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ اِلَى مَا يَجُوزُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهِ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ لِاَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَوَائِجِ مَوْلَاهَا وَتَخْدِمُ اَضْيَافَهُ وَهِىَ فِىْ ثِيَابِ مِهْنَتِهَا فَصَارَ حَالُهَا خَارِجَ الْبَيْتِ فِىْ حَقِّ الْاَجَانِبِ كَحَالِ الْمَرْأَةِ دَاخِلَهُ فِىْ حَقِّ مَحَارِمِ الْاَقَارِبِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا رَاٰى جَارِيَةً مُتَقَنِّعَةً عَلَاهَا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ اَلْقِ عَنْكِ الْخِمَارَ يَا دِفَارُ اَتَتَشَبَّهِيْنَ بِالْحَرَائِرِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পর পুরুষের জন্য অন্যের দাসীর দেহের এতটুকু অংশই দেখা জায়েজ যতটুকু তার মাহরাম মহিলার মধ্যে জায়েজ। কেননা দাসীকে কাজের পোশাক পরিধান করে তার নিজ মনিবের প্রয়োজনে বাহিরে যেতে হয় এবং তার মেহমানের সেবা করতে হয়। সুতরাং ঘরের ভিতর নিকটাত্মীয় মাহরাম পুরুষের সামনে মহিলার যে অবস্থা ঘরের বাইরে পরপুরুষের সামনে দাসীর সেই অবস্থাই হলো। হযরত ওমর (রা.) কোনো দাসীকে [দেহ ও মাথা] আবৃত অবস্থায় দেখলে দুররা মারতেন এবং বলতেন, হে দাফার! তোমরা ওড়না ফেল, তুমি কি স্বাধীনা মেয়েদের মতো হতে চাও?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ الخ : আলোচ্য ইবারতে অন্যের মালিকানাধীন দাসীর দেহের কতটুকু অংশ দেখা যাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পুরুষের জন্য তার মাহরাম মহিলার শরীরের যতটুকু অংশ দেখা জায়েজ অন্যের মালিকানাধীন দাসীর এতটুকু অংশ দেখা জায়েজ।

উল্লেখ্য যে, মাহরাম মহিলার হাত, পা, বাহু, পায়ের নলা, বুক, চুল, গলা দেখা জায়েজ। ইতঃপূর্বে এ সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ দাসীদেরকে কাজের পোশাক পরিহিত অবস্থায় মনিবের প্রয়োজন সারতে ঘরের বাহিরে যেতে হয়। মনিবের মেহমানদের খেদমত করতে তাদের সামনে উপস্থিত হতে হয়। ফলে ঘরের বাইরে পরপুরুষের সামনে দাসীর অবস্থা এমন হলো যেমন একজন মহিলার অবস্থা হয় তার মাহরাম পুরুষের সামনে ঘরের ভিতরে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, মাহরাম মহিলার কাছে পুরুষেরা অবাধে যাতায়াত করে, আর মহিলারা তখন কাজের পোশাকে থাকে তাই মাহরাম মহিলার বাহু, বুক, গলা ইত্যাদি দেখা জায়েজ। তদ্রূপ দাসীরা যেহেতু কাজের পোশাকে বাইরে যায় এবং তাদের মনিবের কাজ করে তাই তাদেরও সেসব অঙ্গ দেখা জায়েজ বলে সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো হযরত ওমর (রা.) -এর আমল। হযরত ওমর (রা.) রাস্তা-ঘাটে কোনো দাসীকে দেহ মাথা ঢাকা অবস্থায় দেখলে ধমকাতেন ও দুররা মারতেন এবং বলতেন– اَلْقِ عَنْكِ الْخِمَارَ يَا دِفَارُ اَتَتَشَبَّهِيْنَ بِالْحَرَائِرِ

অর্থাৎ 'হে দাফার ! তোমার ওড়না ফেল, তুমি কি স্বাধীনা মেয়েদের সাদৃশ্য অবলম্বন করছ ?'

دِفَارُ শব্দটি نَزَالِ -এর ওযনে دَفْر থেকে নির্গত। অর্থ– দুর্গন্ধ। دِفَارُ অর্থ– দুর্গন্ধযুক্তা মহিলা। এখানে দাসী উদ্দেশ্য। আলোচ্য (وَكَانَ عُمَرُ اِذَا رَاٰى جَارِيَةً مُتَقَنِّعَةً عَلَاهَا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ اَلْقِ عَنْكِ الْخِمَارَ يَا دِفَارُ اَتَتَشَبَّهِيْنَ بِالْحَرَائِرِ) হাদীস সম্পর্কে আল্লামা যায়লাঈ (র.) বলেন, এরূপ শব্দে হাদীসটি প্রমাণিত নয়। অবশ্য ইমাম বায়হাকী (র.) এর কাছাকাছি শব্দে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ نَافِعٍ اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ اَبِىْ عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ خَرَجَتْ اِمْرَاَةٌ مُخْتَمِرَةٌ مُتَجَلْبِبَةٌ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ ؟ فَقِيْلَ لَهُ جَارِيَةٌ لِفُلَانٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِيْهِ فَاَرْسَلَ اِلٰى حَفْصَةَ فَقَالَ مَاحَمَلَكِ عَلٰى اَنْ تُخَمِّرِىْ هٰذِهِ الْاَمَةَ وَتُجَلْبِبِيْهَا حَتّٰى هَمَمْتُ اَنْ اَقَعَ بِهَا لَا اَحْسِبُهَا اِلَّا مِنَ الْمُحْصَنَاتِ وَلَا تُشَبِّهُوْا الْاِمَاءَ بِالْمُحْصَنَاتِ (نَصْبُ الرَّايَةِ) .

হাদীসটির সনদ সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী (র.) বলেন, এর সনদ শক্তিশালী। –[বিনায়া]

মোটকথা কিতাবে উল্লিখিত শব্দে হাদীসটি যদিও প্রমাণিত নয় কিন্তু এর বক্তব্য বায়হাকীর এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়।

وَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ اِلٰى بَطْنِهَا وَظَهْرِهَا خِلَافًا لِمَا يَقُوْلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ (رح) اَنَّهُ يُبَاحُ اِلَّا اِلٰى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ اِلَى الرُّكْبَةِ لِاَنَّهُ لَا ضَرُوْرَةَ كَمَا فِى الْمَحَارِمِ بَلْ اَوْلٰى لِقِلَّةِ الشَّهْوَةِ فِيْهِنَّ وَكَمَالِهَا فِى الْاِمَاءِ وَلَفْظَةُ الْمَمْلُوْكَةِ تَنْتَظِمُ الْمُدَبَّرَةَ وَالْمُكَاتَبَةَ وَاُمَّ الْوَلَدِ لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ وَالْمُسْتَسْعَاةِ كَالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) عَلٰى مَا عُرِفَ وَاَمَّا الْخَلْوَةُ بِهَا وَالْمُسَافَرَةُ مَعَهَا فَقَدْ قِيْلَ يُبَاحُ كَمَا فِى الْمَحَارِمِ وَقَدْ قِيْلَ لَا يُبَاحُ لِعَدَمِ الضَّرُوْرَةِ وَفِى الْاِرْكَابِ وَالْاِنْزَالِ اِعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ (رح) فِى الْاَصْلِ الضَّرُوْرَةَ فِيْهِنَّ وَفِىْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مُجَرَّدَ الْحَاجَةِ .

অনুবাদ : তবে অন্যের মালিকানাধীন দাসীর পেট ও পিঠের দিকে তাকানো বৈধ নয়। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল (র.) -এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। [তিনি বলেন] নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছাড়া অন্যস্থান দেখা বৈধ। [জমহুরের দলিল হলো,] পেট ও পিঠ দেখার কোনো প্রয়োজন নেই যেমন মাহরাম মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই; বরং মাহরাম মহিলার প্রতি আকর্ষণ কম এবং দাসীদের মধ্যে আকর্ষণ বেশি হওয়ার কারণে তাদের পেট ও পিঠের দিকে না তাকানোই উত্তম। উল্লেখ্য যে, مَمْلُوْكَةٌ শব্দটি এখানে ব্যাপকার্থে মুদারাবা, মুকাতাবা ও উম্মে ওয়ালাদ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কারণ তাদের মধ্যে [দাসীর মতো] প্রয়োজন রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে মুস্তাসআত মুকাতাবা মহিলার মতো। এ সম্পর্কিত আলোচনা ইতঃপূর্বে করা হয়েছে। আর অন্যের দাসীর সাথে একান্তে অবস্থান করা ও সফর করার ব্যাপারে [ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে।] কেউ কেউ বলেন, তারা মাহরাম মহিলাদের মতো তাদের ক্ষেত্রেও [সফর ও একান্তে অবস্থান] জায়েজ আবার কেউ কেউ বলেন, প্রয়োজন না থাকায় জায়েজ নয়। কোনো কিছুতে উঠিয়ে দেওয়া, নামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত কিতাবে কঠিন প্রয়োজনকে ধর্তব্য বলেছেন। পক্ষান্তরে মাহরাম মহিলার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রয়োজনও ধর্তব্য বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ اِلٰى بَطْنِهَا وَظَهْرِهَا الخ : আলোচ্য ইবারতে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো–

১. مُدَبَّرَةٌ এমন দাসীকে বলা হয় যাকে মালিক একথা লিখে বা বলে দিয়েছে যে, আমি মারা গেলে তুমি স্বাধীন বা মুক্ত।
২. مُكَاتَبَةٌ এমন দাসীকে বলা হয় যার সাথে মালিকের এরূপ চুক্তি হয়েছে যে, এ পরিমাণ টাকা দিলে তুমি আজাদ।
৩. اُمُّ الْوَلَدِ এমন দাসীকে বলা হয় যার সাথে মনিবের সহবাস হওয়াতে দাসীটি মা হয়েছে।
৪. اَلْمُسْتَسْعَاةُ এমন দাসীকে বলা হয় যার অর্ধেক বা কোনো অংশ মনিব আজাদ করেছে এবং অবশিষ্ট অংশ বিনিময় প্রদানের শর্তে আজাদ করার ব্যাপারে দাসীকে উপার্জন করার অনুমতি দিয়েছে।

মাসআলা : অন্যের দাসীর পেট ও পিঠের দিকে তাকানো বৈধ নয়। এটা জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

বিখ্যাত হানাফী আলেম মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল আল রাযী (র.) এ মাসআলায় ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, তাদের পেট ও পিঠ দেখা বৈধ। তবে নাভির নিচের অংশ হাঁটু পর্যন্ত দেখা বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও এরূপ মত পোষণ করেন। তাদের দলিল হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর একটি হাদীস। তিনি বলেছেন–

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا إِلَّا مَوْضِعَ الْإِزَارِ .

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কোনো দাসী ক্রয় করতে চায় সে যেন তার কোমর ছাড়া অন্য অংশ দেখে নেয়।'

তাদের দ্বিতীয় দলিল হলো মক্কা ও মদিনার লোকদের আমল।

জমহুর আলেমদের মত হলো পেট ও পিঠ দেখা বৈধ নয়। কারণ এ অংশ দেখার আদতে কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন মাহরাম মহিলার পেট ও পিঠ দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, দাসীদের মধ্যে দেখার প্রয়োজন আরো কম এবং না দেখাতে অধিক সতর্কতা। কেননা মাহরাম মহিলাদের প্রতি হারাম হওয়ার কারণে আকর্ষণ কম থাকে, আর দাসীর মাঝে আকর্ষণ ও কামভাব বেশি থাকে। [তাই তাদের পেট ও পিঠের দিকে না তাকানো উচিত।]

قَوْلُهُ وَلَفْظَةُ الْمَمْلُوكَةِ تَنْتَظِمُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইবারতে (يَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ) উল্লিখিত مَمْلُوكَةٌ শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে মুদাববারা, মুকাতাবা ও উম্মে ওয়ালাদ সকলেই শামিল। কেননা বাঁদি বা দাসীকে যে প্রয়োজনে দেখা বৈধ সেই প্রয়োজন তাদের মাঝেও সমানভাবে বিদ্যমান।

আর مُسْتَسْعَاةٌ বাঁদির হুকুম ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুসারে মুকাতাবা বাঁদির মতো। যেহেতু মুকাতাবাকে দেখা বৈধ তাই মুসতাসআতকে দেখা বৈধ সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত হলো কারো কিয়দংশ আজাদ করা পুরো আজাদ করার মতো। তাই মুসতাসআত পূর্ণ আজাদের হুকুমে পরিগণিত হবে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْخَلْوَةُ بِهَا وَالْمُسَافَرَةُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, অন্যের দাসীর সঙ্গে নির্জনে স্বামী-স্ত্রী হক আদায় হতে পারে এমন স্থানে সহাবস্থান করা ও তার সাথে সফর করা বৈধ হবে কিনা– এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে কিছুটা মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

কোনো কোনো আলেমের মতে, মাহরাম মহিলাদের মতো তাদের সাথে সফর করা ও নির্জনে অবস্থান করা জায়েজ। তারা মাহরাম মহিলাদের উপর কিয়াস করেন। তবে শর্ত হলো যদি নিজের ও উক্ত মহিলার ব্যাপারে কামভাব জাগ্রত হওয়ার কোনো আশঙ্কা না থাকে। যদি উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে জায়েজ নেই।

অন্যরা বলেন, অন্যের দাসীর সাথে সফর কিংবা একান্তে অবস্থান নাজায়েজ। তারা তাদেরকে বেগানা মহিলাদের উপর কিয়াস করেন। তাছাড়া তাদের সাথে এরূপ নির্জনে অবস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই।

উল্লেখ্য যে, প্রথম মতটির সাথে শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) একমত পোষণ করেন। আর দ্বিতীয়টির সাথে হাফেজ শহীদ (র.) একমত পোষণ করেন।

قَوْلُهُ وَفِي الْإِرْكَابِ وَالْإِنْزَالِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, অন্যের দাসী যদি সওয়ার বা পরিবহনে উঠতে সক্ষম না হয় কিংবা কষ্টের শিকার হয় তদ্রূপ নামার ক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাহলে পরপুরুষের জন্য তাকে উঠিয়ে দেওয়া বা নামিয়ে দেওয়া জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত কিতাবে মাসআলাটি আলোচনা করেছেন। তিনি এ দুটিকে প্রয়োজন বা জরুরত সাব্যস্ত করেছেন, যার ভিত্তিতে তাদের শরীরে স্পর্শ করা বৈধ প্রমাণিত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে দাসীরা যদি খুব বেশি কষ্টের সম্মুখীন না হয় তাহলে তাদের স্পর্শ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাহরাম মহিলাদের ক্ষেত্রে উঠা ও নামানোকেই প্রয়োজন সাব্যস্ত করেছেন। চাই মাহরাম মহিলা সওয়ারিতে উঠা-নামাতে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হোক কিংবা না হোক।

সুতরাং তার সাধারণ এই উঠা-নামার জন্য তাকে সহযোগিতা করতে তার শরীরে স্পর্শ করা যাবে।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ ذٰلِكَ إِذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَ كَذَا ذُكِرَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَأَطْلَقَ أَيْضًا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَلَمْ يُفَصِّلْ قَالَ مَشَائِخُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ يُبَاحُ النَّظَرُ فِيْ هٰذِهِ الْحَالَةِ وَإِنِ اشْتَهَى لِلضَّرُوْرَةِ وَلَا يُبَاحُ الْمَسُّ إِذَا اشْتَهَى أَوْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ ذٰلِكَ لِأَنَّهُ نَوْعُ اسْتِمْتَاعٍ وَفِيْ غَيْرِ حَالَةِ الشِّرَاءِ يُبَاحُ النَّظَرُ وَالْمَسُّ بِشَرْطِ عَدَمِ الشَّهْوَةِ ـ قَالَ : وَإِذَا حَاضَتِ الْأَمَةُ لَمْ تُعْرَضْ فِيْ إِزَارٍ وَاحِدٍ وَمَعْنَاهُ بَلَغَتْ وَهٰذَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الظَّهْرَ وَالْبَطْنَ مِنْهَا عَوْرَةٌ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَشْتَهِيْ وَتُجَامِعُ مِثْلُهَا فَهِيَ كَالْبَالِغَةِ لَا تُعْرَضُ فِيْ إِزَارٍ وَاحِدٍ لِوُجُوْدِ الْاِشْتِهَاءِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ দাসী ক্রয় করার ইচ্ছা করে তাহলে সেসব স্থান স্পর্শ করাতে কোনো সমস্যা নেই [যেসব স্থান দেখা বৈধ] যদিও এতে উত্তেজিত বা কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা হয়। এভাবেই মুখতাসারুল কুদূরীতে মাসআলাটি বর্ণিত হয়েছে। জামেউস সাগীর গ্রন্থেও মাসআলা এরূপ নিঃশর্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। আমাদের মাশায়েখ বলেছেন, এ অবস্থায় প্রয়োজনের স্বার্থে দৃষ্টিপাত করা বৈধ যদিও উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা বোধ করা হয়। তবে কামভাব জাগ্রত হলে কিংবা কামভাব জাগ্রত হওয়ার প্রবল ধারণা হলে স্পর্শ করা বৈধ হবে না। কেননা এটা একপ্রকারের ভোগ বলে বা স্বাধ আস্বাদন গণ্য। আর ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকা অবস্থায় কামভাব না থাকলে দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ করা বৈধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) [জামিউস সাগীরের মধ্যে] বলেন, যখন কোনো দাসী সাবালক তথা প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন সে যেন শুধুমাত্র নিম্নাঙ্গের একটি পোশাক পরে নিজেকে লোকজনের সামনে পেশ না করে। حَاضَتْ শব্দটি بَلَغَتْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, দাসীর পেট ও পিঠ সতরের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, যখন কিশোরী এমন বয়সে উপনীত হয় যে, তাকে দেখলে কামভাব জাগে এবং তাঁর মতো মেয়েদের সাথে সঙ্গম করা যায় তাহলে সে সাবালিকার মতো, তাকে এক কাপড়ে বাজারে উপস্থিত করা যাবে না তার মাঝে কামভাব থাকার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ الخ : উপরের ইবারতে দাসী ক্রয়ের সময় শরিয়ত নির্ধারিত দর্শনীয় অঙ্গসমূহ স্পর্শ করা যাবে কিনা তা আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) তাঁর মুখতাসারুল কুদূরীতে বলেন, যদি কেউ দাসী ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করে তার জন্য দাসীর ঐ সকল অঙ্গসমূহ স্পর্শ করা জায়েজ, যা দেখা জায়েজ। এমনকি যদি স্পর্শ করার দ্বারা ক্রেতার মধ্যে কামভাব জাগ্রত হয় তবুও।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর জামিউস সাগীরের মধ্যে এভাবেই মাসআলাটি উল্লেখ করেছেন। জামিউস সাগীরের ইবারত এই–

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي الرَّجُلِ يُرِيْدُ شِرَاءَ جَارِيَةٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ سَاقَيْهَا وَصَدْرَهَا وَ ذِرَاعَيْهَا وَيَنْظُرَ إِلَى ذٰلِكَ كُلِّهِ مَكْشُوْفًا ـ

অর্থাৎ 'ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কোনো দাসী ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করেছে তার জন্য সে দাসীর পায়ের নলি, বুক ও হাত স্পর্শ করাতে কোনো ক্ষতি বা দোষ নেই এবং এসব

অঙ্গ অনাবৃত অবস্থায় দেখাতেও কোনো সমস্যা নেই।' যেহেতু এ ইবারতে কামভাব জাগ্রত হওয়া বা না হওয়ার কোনো উল্লেখ নেই, তাই এ ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, কামভাব জাগ্রত হলেও স্পর্শ করা বৈধ হবে।

قَوْلُهُ قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ يُبَاحُ النَّظَرُ الخ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদিও কুদূরী ও জামিউস সাগীরের ইবারত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্পর্শ করার দ্বারা কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও স্পর্শ করা জায়েজ, কিন্তু মাশায়েখ এর উপর ফতোয়া দেননি। তাদের মতে ক্রয় করার উদ্দেশ্যে দাসীর দিকে তাকানো বৈধ, যদিও এতে উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে ক্রয়ের সময় স্পর্শ করার দ্বারা যদি উত্তেজনা সৃষ্টি হয় কিংবা উত্তেজিত হওয়ার প্রবল ধারণা হয় তবুও স্পর্শ করা অবৈধ তথা মাকরূহ হবে। কেননা স্পর্শ করে উত্তেজিত হওয়া ও পুলকিত হওয়া তথা মনের দিক থেকে তৃপ্ত হওয়াও একপ্রকার ভোগ করা। আর ভোগ করা এভাবে হবে যে, উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করাকে শরিয়ত বিধানগত সহবাস সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ সহবাসের দ্বারা যে বিধান সাব্যস্ত হয় [যেমন- حُرْمَةُ مُصَاهَرَةٍ] অনুরূপ বিধান উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করার দ্বারাও তা সাব্যস্ত হয়। যদি ক্রয়ের ইচ্ছা করে তখন প্রকৃত সহবাস যেমন হারাম তদ্রূপ যা সহবাসের সমপর্যায়ের অর্থাৎ উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা তাও হারাম বলে বিবেচিত হবে।

আর যদি দাসী ক্রয়ের ইচ্ছা না করে তাহলে অন্যের দাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত এবং তাকে স্পর্শ করা তখনই জায়েজ হবে যদি এতে কোনো কামভাব না থাকে। আর যদি কামভাব জাগ্রত থাকে তাহলে দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ কোনোটাই জায়েজ নয়। -[সূত্র বিনায়া]

এ প্রসঙ্গে ফাতাওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে যে, পূর্বযুগের ইমামগণ দাসী করার সময় তাদের ত্বক সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার উদ্দেশ্যে স্পর্শ করাকে বৈধ বলতেন। কেননা সে সময়ের লোকজন সাধারণভাবে নেক ছিলেন। বিধায় তাঁরা স্পর্শ করার এ অনুমতি ভিন্ন মতলবে ব্যবহার করতেন না যা আজকের দিনে পাওয়া খুবই কঠিন। পক্ষান্তরে পরবর্তীকালের লোকজনের মাঝে চারিত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়াতে খুবই ভয় হয় যে, তারা শরিয়তের এ অনুমতিকে খাহেশাত পূরণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। বিধায় পরবর্তীকালে ওলামাগণ কামভাব না থাকা অবস্থায় স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর এর উপরই বর্তমান ফতোয়া।

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا حَاضَتِ الْأَمَةُ الخ : আলোচ্য ইবারতের মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি সেখানে বলেন, যখন কোনো কিশোরী দাসী প্রথম ঋতুমতী হয় তারপর থেকে উক্ত দাসীকে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে নিয়ে নিম্নাঙ্গ আবৃত হয় এমন এক কাপড় পরিয়ে তাকে দর্শন করা যাবে না। কারণ ঋতুমতী হওয়ার অর্থ হলো সে বালেগা হয়েছে। আর বালেগা দাসীর পেট ও পিঠ সতরের অন্তর্ভুক্ত যা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখন যদি শুধুমাত্র নিম্নাঙ্গের পোশাক পরিধান করানো হয় তাহলে বুক ও পিঠ খোলা থাকবে তাই তাকে উর্ধ্বাঙ্গের কামিস তথা পোশাক পরাতে হবে। উল্লেখ্য যে, إِزَارٌ এমন পোশাককে বলা হয় যার দ্বারা শুধুমাত্র নাভি থেকে নিচের অংশ ঢাকা যায় বা আবৃত করা যায়।

قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَشْتَهِى الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আরেকটি মতের কথা উল্লেখ করছেন। আর তা হলো, যদি কোনো কিশোরী [দাসী] এমন বয়সে উপনীত হয় যে, তাকে দেখলে সাথে সাথে পুরুষের কামভাব জাগ্রত হয় এবং তার মতো বয়সের মেয়েদের সাথে সঙ্গমও করা যায় তাহলে সে বালেগার পর্যায়ে গণ্য হবে। অর্থাৎ তাকে শুধু নিম্নাঙ্গের পোশাক পরিয়ে বুক ও পিঠ খোলা অবস্থায় বাজারে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কেননা এর মাঝে কামভাব সৃষ্টি হওয়ার মতো বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে এবং এ বয়সের মেয়েদের সাথে সহবাস করাও সম্ভব।

এ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, এর চেয়ে কম বয়সী দাসীদের বুক পিঠ খোলা অবস্থায় বাজারে নিয়ে যাওয়াতে কোনো দোষ নেই। উল্লেখ্য যে, এ প্রসঙ্গে ফাতাওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে-

أَمَةٌ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ (بِأَنْ تَصْلُحَ لِلْجِمَاعِ وَلَا اعْتِبَارَ لِلسِّنِّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ) لَا تُعْرَضُ .

অর্থাৎ 'যে কিশোরী দাসী কামভাবের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে [অর্থাৎ সঙ্গমের উপযুক্ত হয়েছে, এতে সাত বা নয় বছর বয়সের কোনো শর্ত নেই] তাকে বিক্রির জন্য এক কাপড়ে পেশ করা যাবে না।'

ফাতাওয়ায়ে শামীর এ বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দ্বিতীয় বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন এবং ফতোয়ার জন্য দ্বিতীয় মতটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন।

قَالَ : وَالْخَصِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْفَحْلِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ فَلَا يُبِيحُ مَا كَانَ حَرَامًا قَبْلَهُ وَلِأَنَّهُ فَحْلٌ يُجَامِعُ وَكَذَا الْمَجْبُوبُ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ وَيَنْزِلُ وَكَذَا الْمُخَنَّثُ فِي الرَّدِيِّ مِنَ الْأَفْعَالِ لِأَنَّهُ فَحْلٌ فَاسِقٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ فِيهِ بِمُحْكَمِ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ فِيهِ وَالطِّفْلُ الصَّغِيرُ مُسْتَثْنًى بِالنَّصِّ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খাসি করা ব্যক্তি [ক্লীব] বেগানা মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে সাধারণ পুরুষের মতো। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, খাসি করা এক প্রকারের মুছলা [বিকৃতি]। সুতরাং ব্যক্তির জন্য যা [খাসি করার] পূর্বে হারাম ছিল এখন তা বৈধ হবে না। তাছাড়া সে এমন পুরুষ, যে সঙ্গম করতে সক্ষম। তদ্রূপ পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তি [এর হুকুম]। কেননা সে ঘষা-ঘষি করে বীর্যপাত করতে সক্ষম। অনুরূপ হুকুম মন্দ কাজে অভ্যস্ত হিজড়াও। কেননা সে ফাসিক পুরুষ। মোটকথা, উপরিউক্ত তিন শ্রেণির পুরুষের ব্যাপারে কুরআন অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে। তবে নাবালেগ শিশু কুরআনের নির্দেশানুযায়ী উপরিউক্ত হুকুমের বাইরে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَالْخَصِيُّ فِي النَّظَرِ الخ : আলোচ্য ইবারতে বিশেষ তিন শ্রেণির পুরুষের জন্য পর্দার হুকুম আলোচনা করা হয়েছে।

১. প্রথম প্রকার হলো– خَصِيّ যাদের খাসি করা তথা অণ্ডোকোষ কেটে ফেলা হয়েছে। খাসি করা হলে সে পুরুষ সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়ে যায়। তবে সে সঙ্গম করার যোগ্যতা হারায় না।

খাসি করা ব্যক্তি সাধারণভাবে অন্য পুরুষের মতো। তার জন্য বেগানা মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা নাজায়েজ। এর দলিল হলো হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। তা এই– قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ অর্থাৎ 'খাসি করা মুসলা (مُثْلَةٌ) তথা অঙ্গের বিকৃতি সাধন করা।' এটা হারাম কাজ। এ হারাম কাজের কারণে যা পূর্বে হারাম ছিল তা বৈধ হতে পারে না। তাছাড়া দ্বিতীয় দলিল হলো, খাসি করা ব্যক্তি সহবাস করার যোগ্যতা রাখে তাই তার উপর পর্দার হুকুম বলবৎ থাকবে।

মুসান্নিফ (র.)-এর ইবারতের উপর দুটি আপত্তি বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন।

১. তাঁর বর্ণিত এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এরূপ কোনো হাদীস বর্ণিত নেই; বরং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে যা ইমাম আবূ বকর আবী শায়বা (র.) তাঁর মুসান্নাফে উল্লেখ করেছেন। সে হাদীসটি হলো–

فَقَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلَةٌ ثُمَّ تَلَا (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ) .

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, চতুষ্পদ জন্তুকে খাসি করা বিকৃতির নামান্তর। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন– [শয়তান বলে] অবশ্যই আমি তাদের আদেশ করব যাতে তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করে'। মোটকথা, মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, এটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস, অথচ তাঁর এ মন্তব্য শুদ্ধ নয়।

২. দ্বিতীয় আপত্তি হলো, খাসি করা যদি বিকৃতি হয় তাহলে এর দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, পরনারীর দিকে খাসি করা ব্যক্তির দৃষ্টি অন্য পুরুষের মতো। কারণ খাসি করার পরও সে ব্যক্তির যৌন উত্তেজনা বাকি থাকে। সুতরাং খাসি করা এবং না করার মধ্যে তো কোনো পার্থক্য হলো না। সুতরাং اَلْخِصَاءُ مُثْلَةٌ فَلَا يُبِيْحُ مَا كَانَ حَرَامًا قَبْلَهُ -এর দ্বারা দলিল পূর্ণ হয় না।

দ্বিতীয় দলিল হলো– لِاَنَّهُ فَحْلٌ يُجَامِعُ খাসি করা ব্যক্তির দৃষ্টি অন্য লোকের মতো, কারণ সে সাধারণ ব্যক্তির মতো সহবাস করতে সক্ষম; বরং খাসি করা ব্যক্তি সহবাসে অন্যদের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে থাকে। কেননা বীর্যপাত না হওয়াতে তাদের পুরুষাঙ্গ স্তিমিত হয় না।

قَوْلُهُ وَكَذَا الْمَجْبُوْبُ لِاَنَّهُ يَسْتَحِقُّ وَيُنْزِلُ : ২. এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় শ্রেণির পুরুষদের কথা আলোচনা করছেন। مَجْبُوْبٌ অর্থ– যার পুরুষাঙ্গ কর্তিত। পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তি পরনারীকে দেখার ব্যাপারে খাসি করা ব্যক্তির মতো। অর্থাৎ এ ব্যক্তি এবং সাধারণ অন্য পুরুষের মাঝে দৃষ্টিপাতের হুকুমে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ এমন ব্যক্তির কামভাব পূর্ণরূপে রয়েছে। এরা ঘষাঘষির মাধ্যমে তার স্ত্রীর যোনির মধ্যে বীর্যপাত করে এবং এর ফলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব করে তাহলে এ বাচ্চার বংশ এ ব্যক্তি থেকে জারি হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا الْمُخَنَّثُ فِى الرَّدِىِّ مِنَ الْاَفْعَالِ الخ : ৩. এখান থেকে তৃতীয় শ্রেণির পুরুষের হুকুম আলোচনা করছেন। ৩য় শ্রেণি হলো মুখান্নাছ বা হিজড়া। তবে এখানে হিজড়া দ্বারা উদ্দেশ্য এমন পুরুষ যারা বিকৃত যৌন কাজে অভ্যস্ত। এমন হিজড়া এখানে উদ্দেশ্য নয় যাদের মধ্যে জন্মগতভাবে মেয়েলী স্বভাব ও চাল-চলন রয়েছে। কারণ এরূপ হিজড়াদের মেয়েদের প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকে না। কারো কারো মতে কুরআন মাজীদের আয়াত (اَلتَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) দ্বারা এরূপ হিজড়াদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা, এখানে খারাপ কাজে অভ্যস্ত হিজড়াদের বুঝানো হয়েছে। এরা মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে অন্য সাধারণ পুরুষের মতো। কেননা এরা পাপাচারে অভ্যস্ত বদকার পুরুষ। এদের মেয়েলী সাজ মূলত খারাপ কাজ সহজ করার জন্য।

قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ اَنَّهُ يُؤْخَذُ فِيْهِ بِمُحْكَمِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলার তথা নপুংসক, পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তি ও হিজড়ার দৃষ্টিপাতের হুকুম পবিত্র কুরআন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আয়াত– قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ [মু'মিনদের আপনি বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে] এবং আয়াত اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ [যৌনকামনামুক্ত পুরুষ– যারা নারীদের আবরণীয় অঙ্গ সম্পর্কে অনবগত] -এর সঙ্গে আলোচ্য মাসআলাটি সম্পর্কিত। প্রথম আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল মু'মিনদের দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। এ আয়াত مُحْكَمٌ বা এর হুকুম সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয় আয়াতাংশ مُتَشَابِهٌ অর্থাৎ এর হুকুম সুস্পষ্ট নয়। এর বিভিন্ন তাফসীর বর্ণিত আছে। এক তাফসীর অনুযায়ী اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ দ্বারা নপুংসক, পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তি ও হিজড়া বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তাদের দৃষ্টিপাতের হুকুম নাবালেগ শিশুর মতো।

মোটকথা, আয়াতের مُحْكَمْ অংশ দ্বারা উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গের মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাতের হুকুম নাজায়েজ প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে مُتَشَابِهْ অংশ দ্বারা দৃষ্টিপাতের হুকুম জায়েজ প্রমাণিত হয়। সুতরাং مُحْكَمْ ও مُتَشَابِهْ -এর মাঝে বৈপরীত্য সৃষ্টি হলো। উসূলে ফিকহের নিয়মানুযায়ী এ ধরনের বৈপরীত্যের [تَعَارُضْ -এর] ক্ষেত্রে مُحْكَمْ -কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সে মতে উপরিউক্ত নপুংসক, পুরুষাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তি ও হিজড়া মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাতের হুকুম সাধারণ অন্য মু'মিনদের মতো। অন্য মু'মিনদের যেমন বেগানা মহিলাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা নাজায়েজ, তদ্রূপ এদেরও বেগানা মহিলাদের প্রতি তাকানো নাজায়েজ।

তাছাড়া বিষয়টি একটি সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। হাদীসটি সহীহ বুখারীতে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত–

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ اُمِّهَا اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَعِنْدِىْ مُخَنَّثٌ فَسَمِعَهُ يَقُوْلُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ .... غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ ...

অর্থাৎ হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ আমার ঘরে আসলেন, তখন আমার ঘরে একজন হিজড়া ছিল। সে আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়াকে লক্ষ্য করে যা বলছিল রাসূল ﷺ তা শুনলেন। [সে বলছিল,] হে আব্দুল্লাহ! যদি আল্লাহ তোমাদের জন্য আগামীতে তায়েফের বিজয় দান করেন তাহলে তুমি গায়লান গোত্রের মেয়েদের খুঁজে নিও। তারা বেশ মোটাতাজা হয় [ভাবার্থ]। রাসূল ﷺ একথা শুনে বললেন, এ ধরনের হিজড়া যেন তোমাদের ঘরে না আসে।

এ হাদীস দ্বারা হিজড়া বা মুখান্নাছের হুকুম জানা যায়। রাসূল ﷺ এরূপ ব্যক্তিদের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং তাদের হুকুম পরপুরুষের মতো। আর তাদের মাহরাম ছাড়া অন্য মহিলারা তাদের কাছে বেগানা মহিলা বলে সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَالطِّفْلُ الصَّغِيْرُ مُسْتَثْنٰى بِالنَّصِّ : তবে নাবালেগ ছেলেদের হুকুম পবিত্র কুরআনে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের জন্য বেগানা মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে কোনো সমস্যা নেই। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য এই যে– اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ অর্থাৎ 'এমন শিশুদের সাথে পর্দা করতে হবে না যারা মহিলাদের আবরণীয় অঙ্গ সম্পর্কে অবগত হয়নি।'

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ سَيِّدَتِهِ إِلَّا إِلَى مَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) هُوَ كَالْمَحْرَمِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مُتَحَقِّقَةٌ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِيْذَانٍ وَلَنَا أَنَّهُ فَحْلٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ وَلَا زَوْجٍ وَالشَّهْوَةُ مُتَحَقِّقَةٌ لِجَوَازِ النِّكَاحِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْحَاجَةُ قَاصِرَةٌ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ خَارِجَ الْبَيْتِ وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ الْإِمَاءُ قَالَ سَعِيْدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمَا لَا تَغُرَّنَّكُمْ سُورَةُ النُّورِ فَإِنَّهَا فِي الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্রীতদাসের জন্য তার মহিলা মনিবের ততটুকু অংশ দেখা জায়েজ যতটুকু দেখা অন্য পুরুষের জন্য জায়েজ। আর ইমাম মালেক (র.) বলেন, ক্রীতদাস মাহরাম পুরুষের মতো। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি অভিমত। তাঁদের দলিল কুরআনের আয়াত– أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ [তবে অধিকারভুক্ত দাসের হুকুম ভিন্ন] তাছাড়া দাস মহিলা মনিবের ঘরে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করতে পারার কারণে এমনটি হওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। আমাদের দলিল হলো, ক্রীতদাস মাহরাম নয় এবং স্বামীও নয়। তাছাড়া মহিলা মনিবের সাথে এক পর্যায়ে তার বিবাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব বলে কামভাবও রয়েছে। আর প্রয়োজন তো প্রবল নয়। কেননা ক্রীতদাস বাড়ির বাইরে কাজ করে। আর কুরআনের আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্রীতদাসী। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, হাসান বসরী (র.) ও অন্যরা বলেন, সূরা নূর যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। কেননা এটি মহিলা সম্পর্কে, পুরুষ [দাসের] সম্পর্কে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَنْظُرَ الخ : চলমান ইবারতে ক্রীতদাসের সাথে তার মহিলা মনিবের পর্দার কি হুকুম? তা আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) আহনাফের মাযহাব বর্ণনা করার জন্য ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গোলাম বা ক্রীতদাস তার মহিলা মনিবের দেহের এতটুকু অংশ দেখতে পারবে যতটুকু ভিন্ন একজন পরপুরুষ দেখতে পারে। কারণ গোলামের সাথে তার মহিলা মনিবের মাহরাম হওয়ার কোনো আত্মীয়তা নেই; বরং এক পর্যায়ে এ গোলামের পক্ষে সেই মহিলাকে বিবাহ করাও বৈধ হয়। তা এভাবে যে, যদি গোলামকে আজাদ করে দেওয়া হয় তাহলে সে তার পূর্ববর্তী মহিলা মনিবকে বিবাহ করতে পারবে। যেহেতু এক পর্যায়ে বিবাহ করা সম্ভব এবং মাহরাম হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই তাই কামভাবও পরিপূর্ণ রয়েছে।

মোটকথা যেহেতু ক্রীতদাস তার মহিলা মনিবের মাহরাম নয়; বরং স্বামীও নয়, তাছাড়া গোলাম ঘরের বাইরে কাজকর্ম করার কারণে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার প্রয়োজনও নেই তাই পরপুরুষের যে হুকুম ক্রীতদাসেরও সেই হুকুম।

এ মাসআলায় ইমাম মালেক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে ক্রীতদাস মাহরামের মতো। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দুটি অভিমত রয়েছে। একটি মত ইমাম মালেক (র.)-এর অনুরূপ। তাদের পক্ষে মুসান্নিফ (র.) দুটি দলিল পেশ করেছেন।

প্রথম দলিল : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ সূরা নূরের এ আয়াতে যাদের সামনে সৌন্দর্যের স্থানসমূহ দেখানো জায়েজ বলা হয়েছে তাদের মধ্যে مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ -ও অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে مَا এখানে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে দাস ও দাসী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, দাসীর সামনে যেভাবে সৌন্দর্যের অঙ্গসমূহ খোলা যাবে তদ্রূপ দাসের সামনেও তা খোলা যাবে।

দ্বিতীয় দলিল : وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مُتَحَقِّقَةٌ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اِسْتِيْذَانٍ মহিলা মালিকের ঘরে ক্রীতদাসের প্রবেশের অনুমতি থাকে। আর ঘরের ভিতরে মহিলারা সাধারণত চুল, পা ইত্যাদি খোলা অবস্থায় থাকে। এমতাবস্থায় যদি দাসকে তার মনিবার দিকে দৃষ্টিপাতের অনুমতি না দেওয়া হয় তাহলে অসুবিধা সৃষ্টি হবে। উক্ত সমস্যার কথা বিবেচনা করত তাকে মনিবার দিকে তাকানোর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) তাদের উক্ত দু-দলিলের দ্বিতীয়টির জবাবে বলেন, গোলামের ঘরে আসা-যাওয়ার যে প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে তা প্রবল নয়। কেননা ক্রীতদাসেরা সাধারণত কাজ করে ঘরের বাইরে, তারা ঘরের ভিতরে বা অন্দর মহলে কাজ করে না। তাই যে প্রয়োজন বা অসুবিধার কথা বলা হয়েছে তা সঠিক নয়; বরং ঘরের বাইরে কাজ করার কারণে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজনই হয় না।

প্রথম দলিলের জবাব হলো, আয়াতের مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ দ্বারা উদ্দেশ্য ক্রীতদাসী, ক্রীতদাস এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

এরপর মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য জবাবটির সমর্থনে দুজন বিখ্যাত তাবেয়ীর উক্তি উদ্ধৃত করেন।

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) ও হাসান বসরী (র.) বলেন–

لَا تَغُرَّنَّكُمْ سُوْرَةُ النُّوْرِ فَاِنَّهَا فِى الْاِنَاثِ دُوْنَ الذُّكُوْرِ .

অর্থাৎ সূরা নূরের আয়াত– أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। কেননা আয়াতটি ক্রীতদাসী সম্পর্কে, এতে ক্রীতদাসের কথা বলা হয়নি।

এ রেওয়ায়েত সম্পর্কে আল্লামা হাফেয জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র.) বলেন যে, হুবহু এ শব্দে হাদীসটি প্রমাণিত হয়। অবশ্য এরূপ অর্থ প্রদান করে একটি হাদীস মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে বিবাহ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। আর তা এই যে–

حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَا تَغُرَّنَّكُمُ الْاٰيَةُ (اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ) اِنَّمَا عُنِىَ بِهِ الْاِمَاءُ وَلَمْ يُعْنَ بِهِ الْعَبِيْدُ .

অপরটি হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত। তা এই–

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوْكُ عَلٰى مَوْلَاتِهٖ بِغَيْرِ اِذْنِهَا .

প্রথম বর্ণনায় সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) বলেন– اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য দাসী, এর দ্বারা দাস উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় বর্ণনায় হযরত হাসান বসরী (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ক্রীতদাস বিনা অনুমতিতে মহিলা মনিবের ঘরে প্রবেশ করাকে অপছন্দ করতেন। –[নাসবুর রায়াহ] উভয় বর্ণনা থেকে যা বুঝা যায় তার সারমর্ম হলো, তাঁরা দুজনেই দাসের সাথে মহিলা মনিবের পর্দা করা জরুরি মনে করতেন এবং দাসদেরকে মাহরাম পুরুষদের মতো মনে করতেন না। যেহেতু আহনাফ এরূপ মতই পোষণ করে তাই তাদের বর্ণনার মাধ্যমে আহনাফের মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ -এর মধ্যে দাস ও দাসী উভয়ে যে অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রমাণিত হয়।

জ্ঞাতব্য : ক্রীতদাস তার মনিবার শুধুমাত্র হাত ও চেহারা দেখতে পারবে। অবশ্য তার মনিবার অনুমতি ছাড়া তার কাছে যেতে পারবে এবং তার সাথে সফরও করতে পারবে। –[রদ্দুল মুহতার, টীকা : আদ দুররুল মুখতার]

قَالَ : وَيَعْزِلُ عَنْ اَمَتِهٖ بِغَيْرِ اِذْنِهَا وَلَا يَعْزِلُ عَنْ زَوْجَتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهَا لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ اِلَّا بِاِذْنِهَا وَقَالَ لِمَوْلٰى اَمَةٍ اِعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ وَلِاَنَّ الْوَطْئَ حَقُّ الْحُرَّةِ قَضَاءً لِلشَّهْوَةِ وَتَحْصِيْلًا لِلْوَلَدِ وَلِهٰذَا تُخَيَّرُ فِى الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَلَا حَقَّ لِلْاَمَةِ فِى الْوَطْئِ فَلِهٰذَا لَا يُنْقَصُ حَقُّ الْحُرَّةِ بِغَيْرِ اِذْنِهَا وَيَسْتَبِدُّ بِهِ الْمَوْلٰى وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهٗ اَمَةُ غَيْرِهٖ فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِى النِّكَاحِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মালিক তার ক্রীতদাসীর সাথে সহবাসের সময় তার অনুমতি ছাড়া আযল করতে পারবে। অবশ্য তার স্ত্রীর সাথে বিনা অনুমতিতে আযল করা জায়েজ নেই। কেননা রাসূল ﷺ স্বাধীনা স্ত্রীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া আযল করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি একজন দাসীর মালিককে বলেছেন, তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আযল করতে পার। তাছাড়া সহবাস হলো স্বাধীন স্ত্রীর হক তার কামোত্তেজনা চরিতার্থ করা ও সন্তান লাভ করার উদ্দেশ্যে। আর এ কারণেই স্বামীর লিঙ্গ কর্তিত হলে এবং স্বামী নপুংসক হলে স্ত্রীকে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার এখতিয়ার দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সহবাসে দাসীর কোনো হক নেই। অতএব স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার হক নষ্ট করা যাবে না। অন্যদিকে মনিব দাসীর সাথে আযল করার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যদি কারো বিবাহের অধীন অন্যের দাসী থাকে তাহলে তার [সাথে আযলের] কি হুকুম? এ সম্পর্কিত মাসআলা আমরা বিবাহ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَيَعْزِلُ عَنْ اَمَتِهٖ بِغَيْرِ اِذْنِهَا الخ : চলমান ইবারতে আযল সম্পর্কিত মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আযল (عَزْل) এক ধরনের সন্তান জন্মরোধ পদ্ধতি। এতে সহবাসকালে যখন বীর্যপাতের সময় ঘনিয়ে আসে তখন পুরুষ তার লিঙ্গ বের করে যোনির বাইরে বীর্যপাত ঘটায়। এটি জায়েজ নাকি জায়েজ নয়? এ সম্পর্কে অন্যস্থানে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে মূলত আযল করার ব্যাপারে স্ত্রী কিংবা দাসীর অনুমতি লাগবে কি লাগবে না? এ সম্পর্কে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত উদ্ধৃত করেন যে, তিনি বলেছেন, দাসী-বাঁদির সাথে তার অনুমতি ছাড়াই আযল তথা তার যোনির বাইরে বীর্যপাত করা যাবে। পক্ষান্তরে স্বাধীন স্ত্রীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া আযল করা যাবে না। উভয় মাসআলার দলিল হলো–

١. لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ اِلَّا بِاِذْنِهَا ـ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ আজাদ স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার সাথে আযল করতে নিষেধ করেছেন।'

٢. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَوْلَى اَمَةٍ اِعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ .

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ এক দাসীর মালিককে বলেছেন, তুমি যদি চাও তার সাথে আযল করতে পার।' উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা স্ত্রীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া আযল করার নিষিদ্ধতা এবং দাসীর সাথে তার বিনা অনুমতিতে আযল করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। হাদীস দুটির মান নির্ণয় করতে গিয়ে আল্লামা যায়লাঈ (র.) বলেছেন, উভয়টিই হুবহু শব্দে প্রমাণিত। অর্থাৎ হাদীসশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে সনদসহ হাদীস দুটি বর্ণিত আছে।

প্রথম হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে বিবাহ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عِيْسَى عَنِ ابْنِ لُهَيْعَةَ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ مُحَرَّزِ بْنِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى اَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ اِلَّا بِاِذْنِهَا .

ইমাম আমহদ (র.), ইমাম বায়হাকী (র.) ও ইমাম দারাকুতরী (র.)-ও হাদীসটি তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) বিবাহ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত সনদে 'বর্ণনা করেছেন–

عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً اَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اِعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ اَخْبَرْتُكَ اَنَّهَا سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا .

অর্থাৎ হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী সাহাবী রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার একটি দাসী আছে, যার সাথে আমি সহবাস করি। তবে আমার এটা পছন্দ নয় যে, সে গর্ভবতী হয়ে যায়। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আযল করতে পার। কিন্তু আল্লাহ তার জন্য যা ফয়সালা করেছেন সে তা প্রসব করবেই। কিছুকাল পরে লোকটি পুনরায় রাসূল ﷺ -এর কাছে আসল। অতঃপর সে বলল, দাসীটি গর্ভবতী হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে বলেছি যে, তার ব্যাপারে যা ফয়সালা হয়েছে তা সে প্রসব করবেই।

فَصْلٌ : فِي الْاِسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ : গর্ভমুক্ত করা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً فَاِنَّهُ لَا يَقْرُبُهَا وَلَا يَلْمَسُهَا وَلَا يُقَبِّلُهَا وَلَا يَنْظُرُ اِلٰى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا وَالْاَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ سَبَايَا اَوْطَاسٍ اَلَا لَا تُوْطَأُ الْحَبَالٰى حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَلَا الْحَيَالٰى حَتّٰى يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ اَفَادَ وُجُوْبَ الْاِسْتِبْرَاءِ عَلَى الْمَوْلٰى وَ دَلَّ عَلَى السَّبَبِ فِي الْمَسْبِيَّةِ وَهُوَ اِسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ لِاَنَّهُ هُوَ مَوْجُوْدٌ فِيْ مَوْرِدِ النَّصِّ وَهٰذَا لِاَنَّ الْحِكْمَةَ فِيْهِ التَّعَرُّفُ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ صِيَانَةً لِلْمِيَاهِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنِ الْاِخْتِلَاطِ وَالْاَنْسَابِ عَنِ الْاِشْتِبَاهِ وَ ذٰلِكَ عِنْدَ حَقِيْقَةِ الشُّغْلِ اَوْ تَوَهُّمِ الشُّغْلِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ দাসী ক্রয় করে তাহলে উক্ত দাসীর গর্ভ মুক্ত করার আগ পর্যন্ত তার কাছে যাবে না, তাকে স্পর্শ করবে না, তাকে চুমো খাবে না এবং তার লজ্জাস্থানের দিকে কামভাবের সাথে তাকাবে না। এর দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস : তিনি আওতাস গোত্রের বন্দিদের সম্পর্কে বলেছেন, সাবধান! কোনো গর্ভবতী দাসীর সাথে তার সন্তান প্রসবের আগে যেন সহবাস না করা হয় এবং কোনো গর্ভহীন মহিলার সাথে তাকে এক হায়েযের মাধ্যমে পবিত্র করার আগে যেন সহবাস না করা হয়। এ হাদীস দাসীর মালিকের উপর গর্ভাশয় মুক্ত করা ওয়াজিব করে। সেই সাথে গ্রেফতারকৃত দাসীর ব্যাপারে গর্ভাশয় মুক্ত করা ওয়াজিব কেন তার কারণের প্রতিও ইঙ্গিত করে। আর তা হলো নতুন মালিকানা ও দখল উদ্ভূত হওয়া। কেননা এটি হাদীস বর্ণিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান। অধিকন্তু [গর্ভাশয় মুক্ত করা ওয়াজিব হওয়া] এর মধ্যে হিকমত হলো, এর মাধ্যমে দাসীর জরায়ু অন্যের বীর্য তথা সন্তান থেকে পবিত্র কিনা তা জানা যাবে, ফলে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম বীর্য অন্যের বীর্যের সাথে মিশ্রণ হওয়া থেকে এবং বংশধারা সন্দেহযুক্ত হওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকবে। আর এ সংরক্ষণ প্রমাণিত হবে প্রকৃতপক্ষে জরায়ুতে অন্যের সম্মানজনক পানি তথা বীর্য থাকার দ্বারা অথবা অন্যের বীর্য থাকার সম্ভাবনা দ্বারা। সম্মানজনক পানির অর্থ হলো [এ বীর্য ব্যভিচারের বীর্য নয়; বরং] এ পানির দ্বারা সন্তানের নসব প্রমাণিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : অভিধানগতভাবে اِسْتِبْرَاء শব্দের অর্থ- মুক্তি কামনা করা বা মুক্ত করতে চাওয়া। এখানে এর অর্থ- দাসীর জরায়ুকে গর্ভমুক্ত করার ইচ্ছা করা বা চেষ্টা করা।

মুসান্নিফ (র.) এখানে اِسْتِبْرَاء দ্বারা কোনো দাসী ক্রয় করা হলে কিংবা অন্যকোনোভাবে প্রাপ্ত হলে তার গর্ভে কোনো সন্তান আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য যে হায়েয হওয়ার অপেক্ষা করা হয় সে প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন। আর غَيْرُهٗ দ্বারা মুআনাকা, মুসাফাহা ও চুমো খাওয়া সংক্রান্ত মাসআলা উল্লেখ করবেন।

اِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব। এর ওয়াজিব হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কেউ যদি اِسْتِبْرَاء-কে অস্বীকার করে তাহলে তার হুকুম কি হবে– সে সম্পর্কে বিখ্যাত ফতোয়ার গ্রন্থ কাযীখানে বলা হয়েছে– 'কেউ কেউ বলেন, এমন ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। কারণ সে এরূপ অস্বীকার করার মাধ্যমে মুসলমানদের ইজমাকে অস্বীকার করল।' পক্ষান্তরে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে এমন ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ কুরআনের আয়াত– أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ দ্বারা اِسْتِبْرَاء ছাড়াই মুসলমানদের জন্য দাসী বৈধ– একথা বুঝা যায়। অতএব কেউ اِسْتِبْرَاء-কে অস্বীকার করলে কাফের হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً الخ : আলোচ্য ইবারতে اِسْتِبْرَاء তথা দাসীর জরায়ু সন্তানমুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রথম মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। মূল ইবারতটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি দাসী ক্রয় করে তাহলে সে দাসীর কাছে যাবে না, তাকে স্পর্শ করবে না, তাকে চুমো খাবে না এবং তার যৌনাঙ্গের দিকে কামভাবের সাথে তাকাবে না যে পর্যন্ত না তার জরায়ুকে এক হায়েযের মাধ্যমে পবিত্র না করবে।

হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) এ মাসআলার দলিল বর্ণনা করেন রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীসের মাধ্যমে। তা এই–

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ أَلَا لَا تُوْطَأُ الْحَبَالٰى حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَلَا الْحَبَالٰى حَتّٰى يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ.

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আওতাস যুদ্ধের মহিলা বন্দীদের ব্যাপারে ঘোষণা করেন যে, সাবধান! কোনো গর্ভবতী মহিলার সাথে তার গর্ভ প্রসবের পূর্বে এবং সাধারণ গর্ভহীন মহিলাদের সাথে তাদের গর্ভ এক হায়েযের মাধ্যমে পবিত্র করার আগে যেন কেউ তাদের সাথে সহবাস না করে।

অতঃপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, দাসীর মালিকের উপর اِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব। তা এভাবে যে, রাসূল ﷺ اِسْتِبْرَاء-এর পূর্বে তাদের ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, অথচ দাসীর উপর তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা اِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ وَدَلَّ عَلَى السَّبَبِ فِي الْمَسْبِيَّةِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এবং এ হাদীস গ্রেফতারকৃত দাসীকে কেন পবিত্র করতে হবে এর কারণ (سَبَبٌ) ও নির্দেশ করে। কারণ হলো নতুন মালিকানা ও নতুন দখল উদ্ভূত হওয়া। এ কারণটি রাসূল ﷺ -এর বর্ণিত হাদীসের মধ্যেও বিদ্যমান। রাসূল ﷺ আওতাসের বন্দী নারীদের সম্পর্কে বলেন– لَا تُوْطَأُ الْحَبَالٰى وَلَا الْحَيَالٰى 'তাদের গর্ভবতী ও গর্ভহীন নারীদের সাথে সহবাস করা যাবে না।' কেননা তারা মাত্র মুসলমানদের অধিকারে এসেছিল। অর্থাৎ কাফেরদের মালিকানা ও দখল থেকে মুসলমানদের মালিকানা ও দখলে আসার কারণে রাসূল ﷺ তাদের জরায়ুকে পবিত্র করার আদেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং নতুন মালিকানা ও দখলই হলো اِسْتِبْرَاء-এর সবব ও কারণ। অতএব, যেখানেই এ সবব পাওয়া যাবে, সেখানেই اِسْتِبْرَاء করতে হবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِيْهِ التَّعَرُّفُ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) اِسْتِبْرَاء-এর হিকমত বর্ণনা করেছেন। তা হলো, শরিয়ত اِسْتِبْرَاء-কে ওয়াজিব করেছে যাতে জরায়ুর মাঝে একাধিক ব্যক্তির বীর্যের মিশ্রণ না হয় এবং এর ফলে সন্তানের বংশ প্রমাণের সন্দেহের সৃষ্টি না হয়।

উল্লেখ্য যে, দাসী কারো অধিকারে আসার পর তার জরায়ুতে পূর্ব মালিকের বীর্য আছে কিনা? তা জানা আবশ্যক। আর জানার উপায় হলো হায়েযের অপেক্ষা করা। যদি উক্ত দাসীর হায়েয হয়ে যায় তাহলে ধরে নিতে হবে দাসীর জরায়ুতে অন্যের বীর্য নেই।

আর যদি এরূপ হায়েয হওয়ার অপেক্ষা না করা হয় এবং দাসী অধিকারে আসা মাত্রই তার সাথে সহবাস করা হয়, অতঃপর যদি দাসী গর্ভবতী প্রমাণিত হয় তাহলে বর্তমান মালিকের বীর্য দ্বারা গর্ভবতী হলো, নাকি পূর্ব মালিকের বীর্য দ্বারা গর্ভবতী হলো এতে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। ফলে পরস্পর বিবাদ বাঁধবে এবং সন্তানের বংশ প্রমাণেও জটিলতা সৃষ্টি হবে। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে শরিয়ত দাসীর اِسْتِبْرَاء বা জরায়ু পবিত্র করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে।

মুসান্নিফ (র.) مَاءٌ مُحْتَرَمٌ বলে এমন বীর্য উদ্দেশ্য করেছেন যা দ্বারা সন্তানের নসব প্রমাণ হয় অর্থাৎ তা জেনার বীর্য নয়।

قَوْلُهُ وَذٰلِكَ عِنْدَ حَقِيْقَةِ الشُّغْلِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, নতুন মালিকের জন্য তখনই اِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব হবে যখন দাসী পবিত্র পানি তথা বৈধ বীর্য দ্বারা গর্ভবতী হবে। কিংবা যখন পবিত্র পানি দ্বারা দাসী গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

উল্লেখ্য যে, مَاءٌ مُحْتَرَمٌ -এর قَيْد -এর কারণে কারো এরূপ সন্দেহ হতে পারে যে, যদি বৈধভাবে গর্ভবতী হয় তাহলেই اِسْتِبْرَاء করতে হবে অন্যথায় নয়। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়; বরং অবৈধভাবেও যদি কোনো দাসী গর্ভবতী হয় তাহলেও তার গর্ভপ্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِىْ لاَ عَلَى الْبَائِعِ لِاَنَّ الْعِلَّةَ الْحَقِيْقِيَّةَ اِرَادَةُ الْوَطْئِ وَالْمُشْتَرِىْ هُوَ الَّذِىْ يُرِيْدُهُ دُوْنَ الْبَائِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ غَيْرَ اَنَّ الْاِرَادَةَ اَمْرٌ مُبْطَنٌ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى دَلِيْلِهَا وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ الْوَطْئِ وَالتَّمَكُّنُ اِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْمِلْكِ وَالْيَدِ فَانْتَصَبَ سَبَبًا وَاُدِيْرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ تَيْسِيْرًا فَكَانَ السَّبَبُ اِسْتِحْدَاثُ مِلْكِ الرَّقَبَةِ الْمُؤَكِّدِ بِالْيَدِ وَتَعَدّٰى الْحُكْمُ اِلَى سَائِرِ اَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيْرَاثِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِىْ مِنْ مَالِ الصَّبِىِّ وَمِنَ الْمَرْأَةِ وَمِنَ الْمَمْلُوْكِ وَمِمَّنْ لاَ يَحِلُّ لَهُ وَطِيْهَا وَكَذَا اِذَا كَانَتِ الْمُشْتَرَاةُ بِكْرًا لَمْ تُوْطَأْ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَاِدَارَةُ الْاَحْكَامِ عَلَى الْاَسْبَابِ دُوْنَ الْحِكَمِ لِبُطُوْنِهَا فَيُعْتَبَرُ تَحَقُّقُ السَّبَبِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الشُّغْلِ ـ

অনুবাদ : ইসতিব্রা করা ক্রেতার উপর ওয়াজিব, বিক্রেতার উপর নয়। কেননা এর মূল কারণ হলো দাসীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করা। আর তা ক্রেতাই করে থাকে, বিক্রেতা করে না। অতএব, ক্রেতার উপরই اِسْتِبْرَاء তথা জরায়ু পবিত্র করা ওয়াজিব। তবে সহবাসের ইচ্ছা একটি গোপন বিষয়, তাই اِسْتِبْرَاء-এর হুকুম আবর্তিত হবে এর দলিলের উপর। আর সে দলিল হলো সহবাস করার বৈধ কর্তৃত্ব। এ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় মালিকানা ও দখলের দ্বারা। আর তাই কর্তৃত্বকেই কারণ বা সবব সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং বিষয়টিকে সহজ করার জন্য হুকুম উক্ত কর্তৃত্বের সাথেই আবর্তিত হবে। সুতরাং اِسْتِبْرَاء করার সবব হলো দাসীর সত্তার মালিকানা যা দখলের মাধ্যমে মজবুত হয়েছে। এ হুকুম মালিকানার অন্যান্য সববের দিকে সম্প্রসারিত হবে। [মালিকানার অন্যান্য সবব] যেমন– ক্রয়, দান, অসিয়ত, মিরাস, খুলা ও কিতাবাত ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ক্রেতার উপর اِسْتِبْرَاء ওয়াজিব হবে যদি সে দাসীকে কোনো শিশুর মাল থেকে অথবা কোনো মহিলার মাল থেকে, অথবা [ব্যবসায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত] কোনো দাস থেকে কিংবা এমন ব্যক্তি থেকে ক্রয় করে যার জন্য সেই দাসীর সাথে সহবাস করা হালাল নয়। অনুরূপভাবে যদি ক্রয়কৃত দাসীটি সহবাসে অযোগ্য কুমারী হয় তবুও [اِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব হবে]; সবব পাওয়া যাওয়ার কারণে। আর হুকুমসমূহ সববসমূহের সাথেই আবর্তিত হয়, হিকমত বা রহস্যসমূহের সাথে নয়। কেননা হিকমত গোপন থাকে। সুতরাং জরায়ুতে বীর্য থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকলেও সবব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِى لَا عَلَى الْبَائِعِ الخ : আলোচ্য ইবারতে কার কার উপর إِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, إِسْتِبْرَاء করা ক্রেতার উপর ওয়াজিব, বিক্রেতার উপর নয়। এটাই জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত। এ ব্যাপারে অবশ্য হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.) ও হযরত হাসান বসরী (র.) প্রমুখের ভিন্নমত রয়েছে। তাঁদের মতে إِسْتِبْرَاء করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব। তাঁদের যুক্তি হলো– إِسْتِبْرَاء -এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় বিক্রেতার বীর্য দাসীর জরায়ুর মধ্যে আছে কিনা? তাই এটা বিক্রেতার উপরই ওয়াজিব।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْحَقِيْقِيَّةَ الخ : এখান থেকে জমহুরের মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। তাঁরা বলেন, ক্রেতার উপর إِسْتِبْرَاء ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, إِسْتِبْرَاء -এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দাসীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করা। আর এখানে সে ইচ্ছা ক্রেতাই করছে, বিক্রেতা নয়। এজন্য ক্রেতার উপর إِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব। তাছাড়া শরিয়তদাতা ক্রয়ের পর উক্ত দাসীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন। আর কোনো কাজের নিষেধাজ্ঞা তখনই আসে যখন সে কাজের সক্ষমতা থাকে। আর আলোচ্য মাসআলায় সহবাসের সক্ষমতা তো ক্রেতারই। কারণ দাসীর বর্তমান মালিক ক্রেতা, বিক্রেতা নয়। তাই ক্রেতার উপরই إِسْتِبْرَاء করা আবশ্যক হওয়া যুক্তিসম্মত। –[বিনায়া]

قَوْلُهُ غَيْرَ اَنَّ الْاِرَادَةَ اَمْرٌ مُبْطَنٌ الخ : তবে সহবাসের ইচ্ছা একটি গোপন বিষয়। [অনেকে দাসীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে, অনেকে তা করে না] এমতাবস্থায় إِسْتِبْرَاء -এর হুকুম ইচ্ছার দলিলের উপর আবর্তিত হবে। আর এর দলিল হলো সহবাস করার সক্ষমতা বা সুযোগ লাভ করা। আর এ সক্ষমতা প্রমাণিত হয় মালিকানা ও দখল দ্বারা। অতএব সহবাস করার সক্ষমতা ও সুযোগ إِسْتِبْرَاء ওয়াজিব হওয়ার সবব সাব্যস্ত হলো। ফলে হুকুম সহবাস করার সক্ষমতার উপর আবর্তিত হবে বিষয়টিকে সহজ করার জন্য। আর সহবাস করার সক্ষমতা ও সুযোগ যেহেতু মালিকানা ও দখলের দ্বারা অর্জিত হয় তাই দখলসহ দাসীর মালিকানাই সর্বশেষ সবব সাব্যস্ত হবে। সুতরাং যেখানেই নতুন মালিকানার উদ্ভব হবে সেখানেই إِسْتِبْرَاء করার আদেশ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য যে, নতুন মালিকানা বিভিন্নভাবে অর্জিত হয় নিম্নে এর কয়েকটি সুরত দেওয়া হলো– ১. কেউ যদি দাসী ক্রয় করে। ২. দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। ৩. কারো অসিয়তের মাধ্যমে লাভ করে। ৪. উত্তরাধিকার সূত্রে কারো অধিকারে দাসী আসে, তাহলে উপরিউক্ত সব সুরতে দাসীর إِسْتِبْرَاء করানো ওয়াজিব।

এছাড়া خُلْع ও كِتَابَتْ -এর মাধ্যমেও দাসী মালিকানায় আসতে পারে। خُلْع -এর ব্যাখ্যা হলো, কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর কাছে বিনিময়ের মাধ্যমে তালাক চায় এবং সে বিনিময় হিসেবে স্বামীকে কোনো দাসী প্রদান করে তাহলে خُلْع [বিনিময়ের মাধ্যমে তালাক] দ্বারা দাসী মালিকানায় আসল। এমতাবস্থায় স্বামীর উপর উক্ত দাসীর إِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব।

كِتَابَتْ -এর মাধ্যমে দাসী মালিকানায় আসে এভাবে যে, কোনো মালিক তার ক্রীতদাসকে বলল যে, তুমি যদি একটি দাসী ক্রয় করে আমাকে দিয়ে দাও তাহলে তুমি আজাদ। অতঃপর গোলাম যদি তার মালিককে একটি দাসী ক্রয় করে প্রদান করে তাহলে তার উপর إِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব।

এছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে যদি দাসী কারো মালিকানায় আসে তাহলে সে দাসী মালিকানায় আসা মাত্র তার গর্ভাশয় পবিত্র করা জরুরি।

قَوْلُهُ وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِيْ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি কেউ শিশুর মালিকানাধীন দাসী ক্রয় করে তাহলে তার উপরও দাসীর اِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোনো শিশুর পিতা সেই শিশুর কোনো দাসী বিক্রি করে। আর একথা বলা বাহুল্য যে, শিশু সহবাস করতে সক্ষম নয় এবং শিশুর পিতার জন্যও সেই দাসীর সাথে সহবাস করা হালাল নয়। তবুও ক্রেতার জন্য উক্ত দাসীর সাথে গর্ভাশয় পবিত্র করার পূর্বে সহবাস করা জায়েজ নয়। কারণ اِسْتِبْرَاء করার সবব তথা নতুন মালিকানা দখল উদ্ভূত হয়েছে। একই হুকুম হবে যদি কেউ কোনো নারীর মালিকানাধীন দাসী ক্রয় করে।

অনুরূপভাবে যদি ব্যবসায়ে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমন দাস থেকে কোনো দাসী ক্রয় করে [সেই দাসীর সাথে উক্ত দাসের সহবাস বৈধ নয়। কারণ দাসীটি তার মালিকানধীন নয়] তাহলেও একই হুকুম হবে।

আর যদি এ গোলামের ঘাড়ে তার মূল্য পরিমাণ কর্জ থাকে [তাহলে গোলামের মনিবের পক্ষে সে দাসীর সাথে সহবাস হালাল নয়] অতঃপর যদি উক্ত গোলাম থেকে মনিব দাসী ক্রয় করে তাহলে তার জন্য উক্ত দাসীর اِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব।

قَوْلُهُ وَمِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْيُهَا : অনুরূপভাবে যদি কেউ এমন লোক থেকে দাসী ক্রয় করে যার জন্য সেই দাসীর সাথে সহবাস হারাম ছিল। যেমন কারো মালিকানায় তার দুধবোন ছিল [দুধবোনের সাথে সঙ্গম করা হারাম]। তার থেকে যদি কেউ তার দুধবোনকে ক্রয় করে নেয় তাহলে ক্রেতার উপর اِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব এবং তা করার পূর্বে তার জন্য উক্ত দাসীর সাথে সহবাস করা জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُشْتَرَاةُ بِكْرًا الخ : অনুরূপভাবে যদি কেউ কুমারী দাসী ক্রয় করে যার সাথে এখনো সহবাস করা হয়নি তার সাথেও اِسْتِبْرَاء করার পূর্বে সহবাস করা বৈধ নয়। অবশ্য ইমাম মালেক (র.) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যদি ইতঃপূর্বে সহবাস না করা হয়ে থাকে তাহলে গর্ভমুক্তকরণ ওয়াজিব নয়। এর কারণ ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, গর্ভমুক্ত করা [তথা اِسْتِبْرَاء]-এর সবব হলো নতুন মালিকানা ও দখল। এটা যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই اِسْتِبْرَاء করতে হবে। কেননা হুকুমসমূহ সববসমূহের সাথে আবর্তিত হয়। যেখানে সবব পাওয়া যাবে সেখানেই হুকুম কার্যকর হবে। হিকমত বা সূক্ষ্ম কারণের ভিত্তিতে হুকুম আসে না। কেননা হিকমত তো গোপন থাকে। সুতরাং যেখানে সবব পাওয়া যাবে এবং দাসীর জরায়ুতে বীর্য থাকার সামান্যতম সম্ভাবনা থাকবে সেখানেই হুকুম কার্যকর হবে।

وَكَذَا لاَ يَجْتَزأُ بِالْحَيْضَةِ الَّتِىْ اِشْتَرَاهَا فِىْ اَثْنَائِهَا وَلاَ بِالْحَيْضَةِ الَّتِىْ حَاضَتْهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ اَوْ غَيْرِهِ مِنْ اَسْبَابِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلاَ بِالْوِلاَدَةِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ خِلاَفًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) لِاَنَّ السَّبَبَ اِسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ وَالْحُكْمُ لاَ يَسْبِقُ السَّبَبَ وَكَذَا لاَ يَجْتَزأُ بِالْحَاصِلِ قَبْلَ الْاِجَازَةِ فِىْ بَيْعِ الْفُضُوْلِىِّ وَاِنْ كَانَتْ فِىْ يَدِ الْمُشْتَرِىْ لاَ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِى الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ قَبْلَ اَنْ يَشْتَرِيَهَا شِرَاءً صَحِيْحًا لِمَا قُلْنَا وَيَجِبُ فِىْ جَارِيَةٍ لِلْمُشْتَرِىْ فِيْهَا شِقْصٌ فَاشْتَرَى الْبَاقِىَ لِاَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَمَّ الْاٰنَ وَالْحُكْمُ يُضَافُ اِلٰى تَمَامِ الْعِلَّةِ وَيَجْتَزأُ بِالْحَيْضَةِ الَّتِىْ حَاضَتْهَا بَعْدَ الْقَبْضِ وَهِىَ مَجُوْسِيَّةٌ اَوْ مُكَاتَبَةٌ بِاَنْ كَاتَبَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ ثُمَّ اَسْلَمَتِ الْمَجُوْسِيَّةُ اَوْ عَجَزَتِ الْمُكَاتَبَةُ لِوُجُوْدِهَا بَعْدَ السَّبَبِ وَهُوَ اِسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ اَوْ هُوَ لِلْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ لِمَانِعٍ كَمَا فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ .

অনুবাদ : অনুরূপভাবে ঐ হায়েয [اِسْتِبْرَاء -এর জন্য] যথেষ্ট নয় যা চলাকালে দাসী ক্রয় করা হয়েছে এবং যথেষ্ট নয় ঐ হায়েয যা ক্রয় কিংবা মালিকানা লাভের অন্য কোনো সূত্রের পরে, কিন্তু দখলের পূর্বে হয়েছে এবং সন্তান প্রসব করা [اِسْتِبْرَاء -এ জন্য] যথেষ্ট নয় যা মালিকানা লাভের কোনো সূত্রের পরে; কিন্তু দখল বা কবজের পূর্বে হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা গর্ভমুক্তকরণের সবব নতুন মালিকানা ও দখল। আর হুকুম সববের পূর্বে আসতে পারে না। অনুরূপভাবে ঐ হায়েয যথেষ্ট নয় যা ফুযূলী ব্যক্তির বিক্রয়ে অনুমতি প্রদানের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। যদিও তখন দাসীটি ক্রেতার হাতে থাকে। তদ্রূপ ঐ হায়েযও যথেষ্ট নয় যা ফাসিদ ক্রয়ের দখলের পর, কিন্তু শুদ্ধভাবে ক্রয় করার পূর্বে দেখা গেছে। তা ঐ দলিলের ভিত্তিতে যা ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। যে দাসীর মধ্যে ক্রেতার আংশিক মালিকানা আছে, অতঃপর ক্রেতা অবশিষ্ট অংশটুকু ক্রয় করে নিল তাহলে সে দাসীর اِسْتِبْرَاء করা ওয়াজিব হবে। কারণ মালিকানার সবব এখন পূর্ণতা লাভ করেছে। আর হুকুম পূর্ণ ইল্লতের সাথেই সম্পৃক্ত হয় [তাই পূর্ণ মালিকানা লাভের পর এখন ইসতিবরা করা ওয়াজিব]। কবজের পর দাসী মাজূসী কিংবা মুকাতাবা থাকা অবস্থায় তার যে হায়েয হয় اِسْتِبْرَاء -এর জন্যে একে যথেষ্ট মনে করা হবে। অতঃপর যদি মাজূসী দাসী মুসলমান হয়ে যায় কিংবা মুকাতাবা তার চুক্তির টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় [তাহলে কোনো সমস্যা নেই; বরং ঐ হায়েয যথেষ্ট হবে] কেননা তা পাওয়া গিয়েছে সববের পর। আর সবব হলো নতুন মালিকানা ও দখল। আর তা হালাল হওয়াকে চায়। তবে তখন [মুকাতাবা বা মাজূসী থাকা অবস্থায়] সহবাস হারাম হয়েছে ভিন্ন নিষেধাজ্ঞার কারণে। যেমন হায়েয অবস্থায় [স্ত্রীর সাথে সহবাস] হারাম [হায়েযের কারণে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَجْتَزِأُ بِالْحَيْضَةِ الخ : উপরের ইবারতে এমন কতিপয় মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে যাতে পূর্ণ মালিকানা লাভের পূর্বে হায়েয হওয়াতে তা اِسْتِبْرَاء -এর জন্য যথেষ্ট হয়নি। উল্লেখ্য যে, মালিকানা অর্জিত হওয়ার পর এক হায়েয দ্বারা اِسْتِبْرَاء তথা গর্ভাশয়কে পবিত্র করা জরুরি।

১ম মাসআলা : যদি কোনো দাসীকে হায়েয চলাকালে ক্রয় করা হয় তাহলে এ হায়েযটি মালিকানা অর্জিত হওয়ার আগে শুরু হয়েছে বিধায় তা اِسْتِبْرَاء -এর জন্য যথেষ্ট নয়। এখন মালিকানা লাভের পর নতুন হায়েযের মাধ্যমে اِسْتِبْرَاء করতে হবে।

২য় মাসআলা : ক্রয় কিংবা মালিকানা লাভের অন্য কোনো সূত্রের মাধ্যমে দাসীর মালিকানা নিশ্চিত হলো; কিন্তু এখনো দাসীটি হস্তগত হয়নি। এমতাবস্থায় যদি দাসীর হায়েয দেখা দেয় তাহলে ও এ হায়েযটি اِسْتِبْرَاء -এর জন্য যথেষ্ট হবে না; বরং হস্তগত হওয়ার পর নতুন হায়েযের মাধ্যমে اِسْتِبْرَاء করতে হবে। কেননা اِسْتِبْرَاء -এর সবব হলো দুটি– ১. নতুন মালিকানা ও ২. নতুন দখল। ক্রয় বা মালিকানা লাভের অন্য যে কোনো সূত্রের মাধ্যমে এখানে মালিকানা নিশ্চিত হলেও কবজ (قَبْض) না করার কারণে দখল হয়নি। তাই দখলের পূর্বে যে হায়েয হয়েছে তা اِسْتِبْرَاء -এর জন্য যথেষ্ট হয়নি।

৩য় মাসআলা : মালিকানা লাভের যে কোনো সূত্রের মাধ্যমে মালিকানা নিশ্চিত হওয়ার পর এখনো দাসীটি কবজ করা হয়নি এমতাবস্থায় যদি দাসী সন্তান প্রসব করে তাহলে এ সন্তান প্রসব করার দ্বারা اِسْتِبْرَاء তথা গর্ভাশয় মুক্ত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে না। এ মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যখন এ কথা প্রমাণিত হলো যে, গর্ভাশয়ে কোনো বীর্য নেই তখন নতুন করে اِسْتِبْرَاء করা লাগবে না; বরং পূর্বের সন্তান হওয়াকে গর্ভাশয় মুক্তকরণের জন্য যথেষ্ট মনে করা হবে।

তিনি বলেন, যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে স্ত্রীর জন্য যেমন ইদ্দত পালন করা জরুরি নয় তদ্রূপ এখানেও গর্ভাশয় মুক্ত এ কথা নিশ্চিত হওয়ার জন্য নতুন করে হায়েযের মাধ্যমে اِسْتِبْرَاء করতে হবে না। পক্ষান্তরে তারফাইন (র) দলিল হলো, اِسْتِبْرَاء করার জন্য সবব হলো নতুন মালিকানা ও দখল। আর হুকুম সবব অর্জিত হওয়ার পর কার্যকর হয়, সববের আগে হুকুম আসে না।

৪র্থ মাসআলা : যদি কোনো ফুযূলী (فُضُوْلِيْ) কোনো ব্যক্তির জন্য দাসী ক্রয় করে, তাহলে যার জন্য ক্রয় করেছে (اَصِيْل) তার অনুমতি দেওয়ার উপর বেচাকেনা কার্যকর হওয়া নির্ভর করে। যদি সে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে দাসীর হায়েয হয় তাহলে উক্ত হায়েয اِسْتِبْرَاء -এর জন্য যথেষ্ট হবে না। এর দলিল ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর যদি দাসীটি পূর্ব থেকে মূল ক্রেতার দখলে থাকে আর এমতাবস্থায় সে ঋতুমতী হয় তবুও সেই ঋতুস্রাব ইসতিবরার জন্য যথেষ্ট হবে না।

৫ম মাসআলা : যদি কেউ ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে দাসী ক্রয় করে, অতঃপর দাসীটি ঋতুমতী হলো। অতঃপর ক্রেতা পুনরায় বৈধ ক্রয়ের মাধ্যমে দাসীটির মালিক হলো তাহলে পূর্বের ফাসিদ ক্রয়ের পর হওয়া ঋতুস্রাব ইসতিবরার জন্য যথেষ্ট হবে না। এর দলিলও তাই যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

قَوْلُهُ وَيَجِبُ فِيْ جَارِيَةٍ لِلْمُشْتَرِيْ فِيْهَا الخ : উপরের ইবারতে পূর্বে উল্লিখিত মূলনীতি অর্থাৎ নতুন মালিকানা ও দখলের পর اِسْتِبْرَاء করা জরুরি এর শাখা-প্রশাখাগত আরো কয়েকটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

১ম মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি দাসীর আংশিক মালিকানা লাভ করে তাহলে উক্ত দাসীর সাথে তার সহবাস করা বৈধ হবে না। কারণ দাসীর উপর তার মালিকানা এখনো পরিপূর্ণ হয়নি। অতঃপর যদি এ ব্যক্তি দাসীর বাকি অংশ ক্রয় করে তাহলে তার মালিকানা পরিপূর্ণ হলো। মালিকানা পরিপূর্ণ হওয়ার পর সেই দাসীর জরায়ু এক হায়েযের মাধ্যমে পবিত্র করবে। তবে আংশিক মালিকানা লাভের পর পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হওয়ার আগে যদি কোনো হায়েয হয় সেই হায়েয اِسْتِبْرَا.-এর জন্যে যথেষ্ট হবে না। কেননা তার সেই হায়েযটি পূর্ণ মালিকানা লাভের আগে হয়েছে তাই সববের আগে হায়েয হয়েছে। যেহেতু সববের আগে হুকুম ধর্তব্য হয় না তাই সেই হায়েয اِسْتِبْرَا.-এর জন্যে গ্রহণযোগ্য নয়।

২য় মাসআলা : যদি কেউ একটি মাজূসী [অগ্নিপূজারী] দাসী ক্রয় করে, অতঃপর দাসীটি কবজ করার পর মাজূসী থাকা অবস্থায় তার হায়েয হয় তারপর মাজূসীটি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে যে হায়েযটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তা দ্বারাই দাসীর اِسْتِبْرَا. হয়েছে ধরে নেওয়া হবে। কারণ আলোচ্য হায়েযটি দাসীর উপর মালিকানা পূর্ণ হওয়ার পর দেখা দিয়েছে। অবশ্য দাসীর সাথে মুসলমান হওয়ার আগে সহবাস করা বৈধ ছিল না সেটা ভিন্ন বিষয়। যেমন– কোনো ব্যক্তির স্ত্রী যদি ঋতুমতী হয় তাহলে তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয় হায়েযের কারণে, যদিও তার স্ত্রী তার জন্য ব্যবহার করা সম্পূর্ণ বৈধ।

তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় নতুন মালিকানা ও দখল পাওয়া যাওয়াতে তার সাথে সহবাস বৈধ হয়ে গেছে; কিন্তু একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকের কারণে তার সাথে সহবাস করা অবৈধ। সেটি হলো তার মাজূসী হওয়া। সে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে প্রতিবন্ধকটি যেহেতু অপসারিত হয়ে গেছে তাই এখন দাসীটির সাথে তার সহবাস করাতে কোনো সমস্যা নেই।

৩য় মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি দাসী ক্রয় করে তাকে মুকাতাবা বানায়, অর্থাৎ তার সাথে বিনিময় গ্রহণ করে আজাদ করার চুক্তি করে। অতঃপর যদি দাসী তার চুক্তিতে ধার্যকৃত বিনিময় প্রদান করতে অসমর্থ হয়, অবশ্য ইতোমধ্যে দাসীর হায়েয হয়ে গেছে, তাহলে আলোচ্য দাসীর সাথে সহবাস করার ক্ষেত্রে নতুন হায়েযের মাধ্যমে اِسْتِبْرَا. করা জরুরি নয়; বরং পূর্বে মুকাতাবা অবস্থায় যে হায়েযটি হয়েছে তাই اِسْتِبْرَا.-এর জন্যে যথেষ্ট। কেননা সেই হায়েযটি পূর্ণ মালিকানা লাভের পর দেখা গিয়েছে। অবশ্য দাসীর সাথে সহবাস করা বৈধ ছিল না তার সাথে কিতাবতের চুক্তি থাকার কারণে। বর্তমানে সে আর মুকাতাবা নেই তাই তার সাথে সহবাস করতে আর কোনো বাধা নেই।

وَلَا يَجِبُ الْاِسْتِبْرَاءُ اِذَا رَجَعَتِ الْاٰبِقَةُ اَوْ رُدَّتِ الْمَغْصُوْبَةُ اَوِ الْمُوَاجَرَةُ اَوْ فُكَّتِ الْمَرْهُوْنَةُ لِانْعِدَامِ السَّبَبِ وَهُوَ اِسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ وَهُوَ سَبَبٌ مُتَعَيَّنٌ فَاُدِيْرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ وُجُوْدًا وَ عَدَمًا وَلَهَا نَظَائِرُ كَثِيْرَةٌ كَتَبْنَاهَا فِىْ كِفَايَةِ الْمُنْتَهٰى . وَاِذَا ثَبَتَ وُجُوْبُ الْاِسْتِبْرَاءِ وَحَرُمَ الْوَطْئُ وَحَرُمَ الدَّوَاعِىْ لِاِفْضَائِهَا اِلَيْهِ اَوْ لِاِحْتِمَالِ وُقُوْعِهَا فِىْ غَيْرِ الْمِلْكِ عَلٰى اِعْتِبَارِ ظُهُوْرِ الْحَبْلِ وَ دَعْوَةِ الْبَائِعِ .

অনুবাদ : যদি পালিয়ে যাওয়া দাসী ফিরে আসে, অথবা ছিনতাইকৃত দাসী কিংবা ভাড়ায় দেওয়া দাসী ফেরত দেওয়া হয় অথবা বন্ধক দেওয়া দাসী ছাড়ানো হয় তাহলে এদের ইসতিবরা করা ওয়াজিব নয়। কেননা এদের মাঝে ইসতিবরা করার সবব পাওয়া যায়নি। সবব হলো নতুন মালিকানা ও দখল। সববটি যেহেতু সুনির্দিষ্ট তাই হুকুম সববের সাথে আবর্তিত হবে। সবব পাওয়া যাওয়া অবস্থায় এবং না পাওয়া অবস্থায়। এর সদৃশ অনেক মাসআলা রয়েছে যা আমি কিফায়াতুল মুনতাহী কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি। যখন ইসতিবরা করার আবশ্যকতা প্রমাণিত হলো এবং সহবাস হারাম হলো তখন সহবাসের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহও হারাম হবে। কেননা এগুলো সহবাস পর্যন্ত নিয়ে যায় অথবা এ কাজগুলো অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর মাঝে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদি গর্ভ প্রকাশ পায় অথবা বিক্রেতা যদি গর্ভের সন্তানের দাবিদার হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ الْاِسْتِبْرَاءُ اِذَا الخ : আলোচ্য ইবারতে নতুন মালিকানা ও দখলের আবির্ভাব না হওয়াতে যেসব সুরতে ইসতিবরা করা ওয়াজিব নয় এমন কয়েকটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

১ম মাসআলা : যদি কোনো দাসী তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে চলে যায়, অতঃপর কিছুদিন পরে যদি ফিরে আসে তাহলে যদিও এ সম্ভাবনা আছে যে, পালায়নকালীন সময়ে কারো সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে তবুও তার গর্ভাশয় পবিত্র করার প্রয়োজন নেই। কারণ এখানে . اِسْتِبْرَا -এর সবব পাওয়া যায়নি।

২য় মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি কারো দাসী ছিনতাই করে নিয়ে যায় অতঃপর কিছুদিন পর ফিরিয়ে দেয় এমতাবস্থায় যদিও সম্ভাবনা আছে যে, ছিনতাইকারী স্বয়ং অথবা অন্য কেউ দাসীটির সাথে সহবাস করেছে তবুও সেই দাসীর গর্ভাশয় পবিত্র করার প্রয়োজন নেই।

৩য় মাসআলা : অনুরূপভাবে যদি কেউ তার দাসী কাউকে ভাড়া হিসেবে দিয়ে থাকে কিংবা কারো কাছে বন্ধক হিসেবে রেখে থাকে অতঃপর দাসীটি মূল মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয় এমতাবস্থায় যদিও যার কাছে ভাড়া দিয়েছিল অথবা বন্ধক রেখেছিল সেই ব্যক্তি কর্তৃক দাসীটি ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবুও তার গর্ভাশয় পবিত্র করা আবশ্যক নয়। কারণ উপরিউক্ত মাসআলাগুলোতে . اِسْتِبْرَا তথা গর্ভাশয় পবিত্র করার সবব পাওয়া যায়নি।

সবব হলো নতুন মালিকানা ও দখল। আর এ মাসআলাগুলোর নতুন মালিকানা ও নতুন দখল উদ্ভূত হয়নি তাই হুকুম তথা গর্ভাশয় পবিত্র করার বিধান আরোপিত হবে না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু ইসতিবরা করার সবব সুনির্দিষ্ট তাই সবব পাওয়া গেলে হুকুম আসবে আর সবব না পাওয়া গেলে হুকুম আসবে না। তিনি বলেন, এ মাসায়েলের অনুরূপ আরো অনেক মাসআলা আছে আমি 'কিফায়াতুল মুনতাহী' কিতাবে উল্লেখ করেছি।

قَوْلُهُ وَاِذَا ثَبَتَ وُجُوْبُ الْاِسْتِبْرَاءِ الخ : লেখক বলেন, যখন পূর্বের আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হলো যে, নতুন মালিকানা ও দখল উদ্ভূত হলে দাসীর গর্ভাশয় এক হায়েযের মাধ্যমে কিংবা সন্তান প্রসবের মাধ্যমে পবিত্র করতে হবে এবং এর আগ পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা হারাম সুতরাং তার সাথে সহবাস করার পূর্বে যেসব কাজ দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাও হারাম হবে। কারণ সহবাসের পূর্বে যেসব কাজের দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা অনেক সময় সহবাস পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

অথবা এমনও হতে পারে যে, সহবাসের পূর্বে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ যার সাথে করা হয় তা তার মালিকানাধীন নয়। তা এভাবে যে, ইতোমধ্যে দাসী গর্ভবতী একথা প্রমাণিত হলো। দাসী গর্ভবতী হলে বিক্রেতা দাবি করবে যে, দাসীর গর্ভের বাচ্চা তার। আর তখন দাসীটি বিক্রেতার উম্মে ওয়ালাদে রূপান্তরিত হবে। উল্লেখ্য যে, উম্মে ওয়ালাদের বেচাকেনা নাজায়েজ। অতএব, এ দাসীর বিক্রির ব্যাপারে যে চুক্তি হয়েছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। এমন হলে সহবাসের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজগুলো অন্যের মালিকানাধীন দাসীর সাথে হলো। আর অন্যের দাসীর সাথে এরূপ আচরণ শরিয়তসম্মত নয়। মোটকথা, যেহেতু সহবাসের পূর্বের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজগুলোর দ্বারা সহবাস সংঘটিত হওয়ার সম্ভবনা আছে তাই সহবাসের মতো উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহও হারাম হবে।

بِخِلَافِ الْحَائِضِ حَيْثُ لَا تَحْرُمُ الدَّوَاعِيْ فِيْهَا لِأَنَّهُ لَا تَحْتَمِلُ الْوُقُوْعُ فِيْ غَيْرِ الْمِلْكِ وَلِأَنَّهُ زَمَانُ نَفْرَةٍ فَالْإِطْلَاقُ فِي الدَّوَاعِيْ لَا يُفْضِيْ إِلَى الْوَطْئِ وَالرَّغْبَةُ فِي الْمُشْتَرَاةِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ اَصْدَقُ الرَّغَبَاتِ فَتُفْضِيْ إِلَيْهِ وَلَمْ يُذْكَرِ الدَّوَاعِيْ فِي الْمُسَبَّبَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّهَا لَا تَحْرُمُ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ وُقُوْعُهَا فِيْ غَيْرِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ لَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْحَرْبِيِّ بِخِلَافِ الْمُشْتَرَاةِ عَلٰى مَا بَيَّنَّا ۔ وَالْإِسْتِبْرَاءُ فِي الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ لِمَا رَوَيْنَا وَفِيْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ بِالشَّهْرِ لِأَنَّهُ اُقِيْمَ فِيْ حَقِّهِنَّ مَقَامَ الْحَيْضِ كَمَا فِي الْمُعْتَدَّةِ ۔

অনুবাদ : তবে ঋতুমতী দাসীর সাথে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজগুলো করা হারাম নয়। কেননা তার ক্ষেত্রে অন্যের মালিকানাধীন দাসীর সাথে এরূপ আচরণ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া এজন্য যে, হায়েযের সময়কাল মহিলাদের প্রতি অনাসক্তির সময় তাই তার সাথে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজের বৈধতা সহবাস পর্যন্ত পৌছাবে না। সহবাসের পূর্বে ক্রয়কৃত দাসীর মাঝে আসক্তি খুব বেশি হয় তাই তা সহবাস পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যে দাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার সাথে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহ করা যাবে কিনা তা জাহেরী রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এগুলো হারাম নয়। কেননা গ্রেফতারকৃত দাসীর ক্ষেত্রে অন্যের মালিকানায় তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এর কারণ হলো, যদি দাসীর গর্ভ প্রকাশ পায় তাহলে তাতে হারবীর দাবি চলে না। তবে কৃতদাসীর বিষয়টি এমন নয়। এর কারণ আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। গর্ভবতী দাসীর গর্ভাশয় পবিত্র করা হয় গর্ভ প্রসবের মাধ্যমে। ঐ দলিলের ভিত্তিতে যা আমরা বর্ণনা করেছি। আর যেসব দাসী মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালন করে তার ইসতিবরা করা হবে এক মাসের দ্বারা। কেননা তাদের ক্ষেত্রে মাসকে হায়েযের স্থলবর্তী করা হয়েছে। যেমন ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার ক্ষেত্রে মাসকে হায়েযের স্থলবর্তী করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَائِضِ حَيْثُ الخ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) পূর্ববর্তী মাসআলার ব্যতিক্রমী কিছু মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

মাসআলা : দাসী যদি ঋতুমতী হয় তাহলে ঐ অবস্থাতে তার সাথে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী আদর সোহাগ করা যায় অথচ হায়েয অবস্থায় সহবাস নিষিদ্ধ তাই دَوَاعِيْও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এর উত্তর হলো, এ অবস্থাতে دَوَاعِيْ বৈধ। কেননা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এমন কাজ নিষিদ্ধ হয় দুটি কারণে–

১. দাসীর গর্ভ প্রকাশিত হলে তা অন্যের মালিকানায় চলে যেতে পারে। এমতাবস্থায় উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজগুলো করা হবে অন্যের মালিকানাধীন দাসীর সাথে।
২. উত্তেজনার এক পর্যায়ে সহবাস সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ দুটি কারণের কোনোটিই এখানে পাওয়া যায় না। প্রথম কারণটি পাওয়া যাবে না এজন্য যে, যখন দাসীটি ঋতুমতী হলো এর দ্বারা দাসীটি যে গর্ভবতী নয় তা প্রমাণ হলো। তার দাসীটির গর্ভবতী না হওয়া নিশ্চিত হওয়াতে অন্যের মালিকানা তার উপর আরোপিত হওয়ার সম্ভবনা রহিত হলো। অতএব, প্রথম কারণটি এখানে অবিদ্যমান।

দ্বিতীয় কারণটিও এখানে হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেননা হায়েয বা ঋতুমতী অবস্থায় সুস্থ রুচির মানুষের পক্ষে সে স্ত্রী বা বৈধ দাসীর সাথে সহবাস করা অসম্ভব। এ সময়কালে তাদের প্রতি বরং অনাসক্তি থাকে। তাছাড়া এ অবস্থায় সহবাস করা শরিয়তের দৃষ্টিতে চরম গর্হিত কাজ তাই কেউ তখন সহবাস করতে উদ্বুদ্ধ হবে না।

যেহেতু যে দুটি কারণে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহ নিষিদ্ধ হয় তার কোনোটির এখানে পাওয়া যায়নি, তাই উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজের [دَوَاعِى وَطِئْ -এর] অনুমতির ফলে কোনো সমস্যা হবে না।

قَوْلُهُ وَالرَّغْبَةُ فِى الْمُشْتَرَاةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে দাসী মাত্র ক্রয় করা হয়েছে এবং যে ঋতুমতী নয় তার বিষয়টি ঋতুমতী দাসী বা স্ত্রীর মতো নয়। অর্থাৎ তার সাথে সহবাসের পূর্বের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহ করা বৈধ নয়। কেননা দাসীটি নতুন এবং ঋতুমতী না হওয়াতে তার প্রতি আকর্ষণ তীব্র হওয়া স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় دَوَاعِى -এর অনুমতি প্রদান করা হলে সহবাস সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হবে। আর তাই এমতাবস্থায় শরিয়ত সহবাস করার পূর্বের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহ তথা دَوَاعِى وَطِئْ -এর অনুমতি দেয়নি।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الدَّوَاعِىْ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে দাসীকে মুসলিম রাষ্ট্র থেকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে এবং তা কোনো মুসলিম যোদ্ধার অংশে পড়েছে সে দাসীর اِسْتِبْرَاء করার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। অবশ্য তার সাথে دَوَاعِى وَطِئْ করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে জাহিরুর রেওয়ায়েতের কোনো বিধান পাওয়া যায় না। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত নাওয়াদির রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, এমন দাসীর সাথে دَوَاعِى وَطِئْ করা অবৈধ নয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, এমন দাসীর সাথে دَوَاعِى وَطِئْ করার দ্বারা অন্যের মালিকানাধীন দাসীর সাথে এরূপ করার সম্ভাবনা নেই। কেননা ইতোমধ্যে যদি দাসীর গর্ভ প্রকাশিতও হয় তবুও তাতে তার অমুসলিম স্বামীর সন্তানের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে সে ক্রয়কৃত দাসীর মধ্যে বিক্রেতার দাবি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَالْاِسْتِبْرَاءُ فِى الْحَامِلِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে গর্ভবতী দাসী ও যেসব দাসীর হায়েয স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালন করে তাদের গর্ভাশয় পবিত্র করার মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। গর্ভবতী দাসীর ইসতিবরা তথা গর্ভমুক্তকরণ সম্পন্ন হবে তাদের গর্ভস্থিত সন্তান প্রসবের মাধ্যমে। এ মাসআলার দলিল ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সে দলিলটি হলো, পূর্ববর্ণিত রাসূল ﷺ -এর হাদীস– اَلَا لَا تُوْطَأُ الْحَبَالٰى حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ আওতাসের বন্দিদের সম্পর্কে বলেন, সাবধান! গর্ভবতী দাসীদের সাথে তাদের গর্ভ প্রসব না হওয়ার আগে যেন সহবাস না করা হয়।'

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কোনো গর্ভবতী যদি ঋতুমতী হয় তাহলে এর দ্বারাই তার ইস্তিব্রা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) সুস্পষ্ট হাদীসের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে গর্ভবতী মহিলার হায়েয হতে পারে।

قَوْلُهُ وَفِى ذَوَاتِ الْاَشْهُرِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেসব দাসী মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালন করতে হয় অর্থাৎ বয়সের স্বল্পতার কারণে এখনো যাদের হায়েয শুরু হয়নি কিংবা অধিক বয়সের কারণে হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে এমন দাসী যদি কারো অধিকারে আসে তাহলে সে দাসীর গর্ভাশয় পবিত্র বলে সাব্যস্ত হবে এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারা। কেননা এসব মহিলার ক্ষেত্রে একমাসকে এক হায়েযের স্থলবর্তী এবং তিন মাসকে তিন হায়েযের স্থলবর্তী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَمَا فِى الْمُعْتَدَّةِ : যেমন ইদ্দতপালনকারিণী মহিলা যার হায়েয আসে না তার ইদ্দত পালন করার বিধান দেওয়া হয়েছে মাস গণনার মাধ্যমে অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে এক মাসকে যেমন এক হায়েযের স্থলবর্তী করা হয়েছে তদ্রূপ যার হায়েয আসে না তার ইস্তিব্রার ক্ষেত্রে এক মাসকে এক হায়েযের স্থলবর্তী ধরা হবে।

وَاِذَا حَاضَتْ فِىْ اَثْنَائِهٖ بَطَلَ الْاِسْتِبْرَاءُ بِالْاَيَّامِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْاَصْلِ قَبْلَ حُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ بِالْبَدَلِ كَمَا فِى الْعِدَّةِ فَاِنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا تَرَكَهَا حَتّٰى اِذَا تَبَيَّنَ اَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ فِيْهِ تَقْدِيْرٌ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقِيْلَ يَتَبَيَّنُ بِشَهْرَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَعَنْهُ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ اَيَّامٍ اِعْتِبَارًا بِعِدَّةِ الْحُرَّةِ وَالْاَمَةِ فِى الْوَفَاةِ وَعَنْ زُفَرَ (رحـ) سَنَتَانِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) .

অনুবাদ : [মাসকে হায়েযের স্থলবর্তী ধরে] মাস গণনার মাধ্যমে ইসতিবরা শুরু করার পর যদি মাসের মাঝামাঝি আবার দাসীটি ঋতুমতী হয়ে যায় তাহলে মাস গণনার মাধ্যমে ইসতিবরা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা স্থলবর্তী বা বদলের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিলের পূর্বে সে আসলের উপর সক্ষমতা লাভ করেছে। যেমন ইদ্দতের ক্ষেত্রে এরূপ করা হয়। আর যদি [হায়েয চলাকালে] হঠাৎ হায়েয বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দাসীটি গর্ভবতী নয় এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে [সহবাসের ক্ষেত্রে] পরিত্যাগ করবে। জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী [গর্ভ সুস্পষ্ট হওয়ার] কোনো সময় নির্ধারিত নেই। কেউ কেউ বলেন, দুইমাস অথবা তিনমাস সময় নির্ধারণ করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, চার মাস দশদিন। আবার দু-মাস পাঁচদিনের কথাও বর্ণিত আছে। তিনি এতে স্বাধীন মহিলা অথবা দাসীর স্বামীর মৃত্যুকালীন ইদ্দতের উপর কিয়াস করেছেন। ইমাম যুফার (র.) থেকে বর্ণিত আছে দু-বছর। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا حَاضَتْ فِىْ اَثْنَائِهٖ بَطَلَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে দাসী মাস গণনার মাধ্যমে তার গর্ভাশয় যে পবিত্র তা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ তার হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মাস গণনার মাধ্যমে ইস্‌তিব্‌রা করার চেষ্টা করছে, ইতিমধ্যে যদি তার নতুন করে হায়েয দেখা দেয় তাহলে এখন তার দিন গণনার মাধ্যমে ইস্‌তিব্‌রা করা সহীহ হবে না। কারণ মাস বা দিন গণনা হলো হায়েযের স্থলবর্তী। কারো হায়েয চালু থাকলে দিন গুনে ইদ্দত বা ইসতিবরা করার সুযোগ থাকে না। আর নিয়ম হলো আসল পাওয়া গেলে স্থলবর্তীর হুকুম বাতিল হয়ে যায়।

আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু মাসের মাঝখানে হায়েয দেখা গেছে তাই এখন আর দিন গণনার মাধ্যমে ইসতিবরা করা যাবে না।

قَوْلُهٗ كَمَا فِى الْعِدَّةِ الخ : যেমন ইদ্দতের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কোনো মহিলা যদি মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালনরত থাকে, ইতোমধ্যে হায়েয দেখা দেয় তাহলে সেই মহিলার জন্য হায়েযের মাধ্যমে ইদ্দত পালন আবশ্যক হবে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় হায়েযের মাধ্যমে ইসতিবরা করা জরুরি হবে।

قَوْلُهٗ فَاِنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا الخ : যদি কোনো মহিলার হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ طُهْر -এর সময়কাল দীর্ঘায়িত হয় তাহলে তার সাথে সহবাস করা যাবে না যে পর্যন্ত তার গর্ভ প্রকাশিত হয়। যদি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহিলাটি গর্ভবতী নয় তাহলে তার সাথে সহবাস করা যাবে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِيْهِ تَقْدِيْرٌ الخ : মহিলার طُهْر -এর সময়কাল দীর্ঘায়িত হওয়ার অবস্থায় কতকাল তার সাথে সহবাস বন্ধ রাখবে এবং হায়েয হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে এর কোনো নির্ধারিত সময় জাহেরী রেওয়ায়েতে উল্লেখ নেই। কেননা জাহেরী রেওয়ায়েতের ইবারত নিম্নরূপ–

إِنَّ مُحَمَّدًا رَوٰى عَنْ أَبِىْ يُوْسُفَ عَنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَطَأُهَا حَتّٰى يَعْلَمَ أَنَّهَا عِنْدَ حَامِلٍ وَلَمْ يُقَدَّرْ بِشَئٍ ذٰلِكَ .
অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এরূপ দাসীর সাথে সহবাস করা যাবে না যে পর্যন্ত একথা জানা যায় যে, দাসীটি গর্ভবতী নয়। আর এ কথা জানার ব্যাপারে কোনো মেয়াদ নির্ধারিত নেই। মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সময় নির্ধারিত না হওয়াই অধিকতর বিশুদ্ধ। –[বিনায়া]

মোটকথা জাহেরী রেওয়ায়েতে কোনো মেয়াদের কথা বর্ণিত নেই।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ يَتَبَيَّنُ بِشَهْرَيْنِ الخ : কোনো কোনো ফকীহ বলেন, দু-মাস অথবা তিনমাস সময় অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে যদি তার গর্ভ প্রকাশিত না হয় এবং গর্ভ প্রকাশিত হওয়া সংক্রান্ত কোনো আলামতও প্রকাশিত না হয় তাহলে তার গর্ভ পবিত্র বলে ধরে নেবে এবং তার সাথে সহবাস করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে নাওয়াদির রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, [এক মতে] চারমাস দশদিন সময় পর্যন্ত দেখবে দাসীর গর্ভ প্রকাশিত হয় না। চারমাস দশদিনের মেয়াদের বিষয়টি তিনি স্বাধীন বা আজাদ মহিলার স্বামীর মৃত্যুর পর তারা যে ইদ্দত পালন করে তা থেকে কিয়াসের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। কারণ এটিই হলো দিন গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালনের সর্বোচ্চ সময়। অথবা দিন গণনার মাধ্যমে গর্ভাশয় পবিত্র কিনা তা যাচাই করার সর্বোচ্চ সময়।

قَوْلُهُ وَعَنْهُ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে আরেকটি মত নাওয়াদির রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, তা হলো দু-মাস পাঁচদিন পর্যন্ত দেখবে। ইতোমধ্যে যদি দাসীর গর্ভ প্রকাশিত হয় তাহলে তো হলো। অন্যথায় দু-মাস পাঁচদিনের পর সেই দাসীর সাথে সহবাস করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) পরবর্তীকালে এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন এবং এর উপরই ফতোয়া। –[সূত্র-হিদায়ার টীকা, ফাতাওয়ায়ে শামী খ. ৫, পৃ. ২৪০]

এ মতটির পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি পেশ করা হয়– দাসীর স্বামী মারা যাওয়ার দু-মাস পাঁচদিন পর দাসীটি অন্যের বিবাহের উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হয়। যেহেতু দু-মাস পাঁচদিন পর অন্যের স্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে তো এ মেয়াদের মধ্যে অন্যের মালিকানাধীন দাসী হওয়ার অধিক উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ عَنْ زُفَرَ (رحـ) سَنَتَانِ الخ : ইমাম যুফার (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দু-বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তিনি দু-বছরের কথা এজন্য বলেছেন যে, কোনো শিশু দু-বছরের বেশি মায়ের পেটে থাকতে পারে না। অতএব, দু-বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার সাথে সহবাস করবে।

ইমাম যুফার (র.) -এর এ মতটিতে যদিও সবচেয়ে বেশি সতর্কতার প্রতি খেয়াল করা হয়েছে, তবে এ মতের উপর ফতোয়া নয়।

ইমাম যুফার (র.) -এর বর্ণনার অনুরূপ একটি বর্ণনা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِالْاِخْتِيَالِ لِإِسْقَاطِ الْاِسْتِبْرَاءِ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوَجْهَيْنِ فِي الشُّفْعَةِ وَالْمَأْخُوْذُ قَوْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فِيْمَا إِذَا عُلِمَ اَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَقْرَبْهَا فِيْ طُهْرِهَا ذٰلِكَ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) فِيْمَا إِذَا قَرِبَهَا وَالْحِيْلَةُ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَ الْمُشْتَرِيْ حُرَّةٌ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ يَشْتَرِيْهَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ইসতিবরার বিধান এড়ানোর জন্য কৌশল অবলম্বন করাতে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। আমরা উভয়ের দলিল শুফআ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত গ্রহণযোগ্য হবে যখন এটা জানা যাবে যে, বিক্রেতা ঐ طُهْر -এর মধ্যে দাসীর সাথে সহবাস করেনি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কথা গ্রহণ করা হবে যখন বিক্রেতা দাসীর সাথে সহবাস করবে। আর কৌশল এই যে, যখন ক্রেতার অধীনে স্বাধীন স্ত্রী না থাকে এমতাবস্থায় দাসীটিকে ক্রয়ের আগে প্রথমে বিবাহ করবে অতঃপর তাকে ক্রয় করবে [তাহলে তার ইসতিবরা করা লাগবে না]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِالْاِخْتِيَالِ الخ : আলোচ্য ইবারতে দাসীর গর্ভাশয় মুক্তকরণ সংক্রান্ত বিধান এড়ানোর জন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করা বৈধ কিনা এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) আলোচনা করেছেন।

এ মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কৌশল অবলম্বন করে ইসতিবরা এড়ানো জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এরূপ করা নাজায়েজ।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমি শুফ্আ অধ্যায়ে উভয় ইমামের দলিল নিয়ে আলোচনা করেছি।

তবে যদি বিক্রেতার সম্পর্কে এতটুকু জানা যায় যে, বিক্রেতা দাসীটির সর্বশেষ হায়েয হওয়ার পর যে পবিত্রাবস্থা এসেছে তাতে সে দাসীর সাথে সহবাস করেনি তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী ফতোয়া দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি জানা যায় যে, বিক্রেতা সেই طُهْر -এর মধ্যে দাসীর সাথে সহবাস করেছে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুযায়ী ফতোয়া দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَالْحِيْلَةُ إِذَا لَمْ تَكُنْ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে একটি কৌশলের কথা বলেছেন, সামনে আরেকটি কৌশল উল্লেখ করবেন।

প্রথম কৌশল হলো, যদি কোনো ব্যক্তির অধীনে কোনো আজাদ স্ত্রী না থাকে তাহলে সে যে দাসীটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক সেই দাসীটিকে প্রথমে বিবাহ করবে। অতঃপর সেই দাসীটিকে সে ক্রয় করবে। ক্রয় করা মাত্র দাসীটির সাথে যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়েছিল তা রহিত হয়ে যাবে। আর এ কৌশল অবলম্বন করার কারণে দাসীটির ইস্তিবরা তথা গর্ভমুক্ত করার আবশ্যক থাকবে না। ইসতিবরা বিধান এ কারণে বাতিল হবে যে, নিজের বিবাহিত দাসীকে যদি কেউ ক্রয় করে তার সেই দাসীর ইসতিবরা করার আবশ্যকতা থাকে না।

আলোচ্য সুরতটির মধ্যে একটি শর্ত এই আরোপ করা হয়েছে যে, দাসীটিকে যখন বিবাহ করবে তখন তার অধীনে কোনো আজাদ স্ত্রী না থাকতে হবে। আজাদ স্ত্রী থাকার শর্ত এ কারণে আরোপ করা হয়েছে যে, যদি কারো ঘরে স্বাধীন স্ত্রী থাকে তাহলে তার জন্য দাসী বিবাহ করা বৈধ নয়।

অনুরূপভাবে যদি কারো অধীনে স্ত্রীরূপে চারটি দাসী থাকে তাহলেও তার জন্য আলোচ্য কৌশল অবলম্বন জায়েজ হবে না। কারণ, চারজন স্ত্রী থাকা অবস্থায় কারো জন্য পঞ্চম কোনো মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ নয়।

وَلَوْ كَانَتْ فَالْحِيْلَةُ اَنْ يُزَوِّجَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الشِّرَاءِ اَوِ الْمُشْتَرِىْ قَبْلَ الْقَبْضِ مِمَّنْ يُوْثَقُ بِهِ ثُمَّ يَشْتَرِيْهَا وَيَقْبِضُهَا اَوْ يَقْبِضُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُ الزَّوْجُ لِاَنَّ عِنْدَ وُجُوْدِ السَّبَبِ وَهُوَ اِسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ الْمُوَكَّدِ بِالْقَبْضِ اِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْجُهَا حَلَالًا لَهُ لَا يَجِبُ الْاِسْتِبْرَاءُ وَاِنْ حَلَّ بَعْدَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْمُعْتَبَرَ اَوَانُ وُجُوْدِ السَّبَبِ كَمَا اِذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةَ الْغَيْرِ ـ

অনুবাদ : আর যদি ক্রেতার অধীনে স্বাধীন স্ত্রী থাকে তাহলে কৌশল এরূপ হবে যে, বিক্রেতা ক্রয়ের পূর্বে দাসীটিকে বিশ্বস্ত যে কারোর কাছে [যে দাসীকে পরে তালাক দিয়ে দেবে এ শর্তে] বিবাহ দেবে অথবা ক্রেতা ক্রয়ের পর কবজ করার আগে দাসীটি কারো কাছে বিবাহ দেবে। অতঃপর [প্রথম সুরতে] দাসীটি ক্রয় করে কবজা করবে অথবা [দ্বিতীয় সুরতে] দাসীটি শুধু কবজা করবে। তারপর দাসীর স্বামী দাসীটিকে তালাক দিয়ে দেবে। যখন সবব পাওয়া গেল অর্থাৎ দখলসহ মালিকানা অর্জিত হলো তখন দাসীটি [অন্যের স্ত্রী হওয়ার কারণে] হালাল নয়। যেহেতু দাসী হালাল নয় তাই তার উপর ইস্তিবরা করা ওয়াজিব নয়। যদিও পরে গিয়ে দাসীটি হালাল হবে [তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়] কেননা ঐ হালাল গ্রহণযোগ্য যা দাসীটি পাওয়া যাওয়া অবস্থায় হয়। এরূপ বিধান হয় যখন দাসীটি অন্যের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হিসেবে ইদ্দতপালনকারিণী হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ فَالْحِيْلَةُ اَنْ يُزَوِّجَهَا الْبَائِعُ الخ : চলমান ইবারতে ইসতিবরার বিধান এড়ানোর দ্বিতীয় কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় কৌশলটি প্রয়োগ করা যায় যখন দাসী ক্রয় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির অধীনে আজাদ স্ত্রী থাকে। কৌশলটি হলো, প্রথমত এমন একজন লোক খুঁজে নেওয়া হবে যার ব্যাপারে এ আস্থা থাকে যে, সে দাসীটি তার কাছে বিবাহ দিলে দাসীটিকে সে তালাক দিয়ে দেবে এবং তালাক দেওয়ার আগে তার সাথে সহবাসও করবে না। এমন লোক পাওয়া গেলে দাসীটি ক্রয় করার আগে বিক্রেতা দাসীটিকে সেই লোকের কাছে দেবে। অতঃপর ক্রেতা দাসীটি বিক্রেতা থেকে ক্রয় করে কবজ করে নেবে। ক্রয় ও কবজ করা সত্ত্বেও দাসীটি ক্রেতার জন্য হালাল নয়। কারণ দাসীটি বর্তমানে অন্যের স্ত্রী।

অথবা ক্রেতা দাসীটি ক্রয় করে কবজ করার আগে দাসীটিকে এমন কোনো লোকের কাছে বিবাহ দেবে। অতঃপর দাসীটি কবজ করবে। এ অবস্থাতেও দাসীটি তার জন্য হালাল নয়। কেননা দাসীটি বর্তমানে অন্যের বৈধ স্ত্রী। এ উভয় অবস্থায় যেহেতু দাসীটি হালাল নয় তাই নতুন মালিকানা ও দখল লাভের পরও দাসীটির ইসতিবরা করা ওয়াজিব নয়। এরপর যখন তার বর্তমান স্বামী তাকে তালাক দিল [তালাকটি সহবাসের পূর্বে হওয়ার কারণে সেই দাসীর উপর ইদ্দতও ওয়াজিব নয়। কারণ সহবাসের আগেই তালাক দিলে সেই স্ত্রীর উপর ইদ্দত থাকে না।] এমন দাসীটি তার মালিকের অধিকারে চলে আসল। এমতাবস্থায় ইসতিবরা করতে হবে না। কেননা ইতঃপূর্বে নতুন মালিকানা ও দখল তথা সবব পাওয়া যাওয়ার সময় দাসীটি তার জন্য হালাল ছিল না, তাই ইসতিবরা ছিল না। আর বর্তমানে ওয়াজিব এজন্য নয় যে, এখন নতুন করে কোনো সবব পাওয়া যায়নি। অথচ ইসতিবরার জন্য সবব পাওয়া যাওয়া জরুরি।

قَوْلُهُ كَمَا اِذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةَ الْغَيْرِ : লেখক আলোচ্য মাসআলার একটি নজির পেশ করছেন। তিনি বলেন, আলোচ্য মাসআলার নজির হলো, কোনো ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল, যে দাসীটি অন্যের স্ত্রী ছিল অতঃপর দাসী স্বামী দাসীকে তালাক দিয়ে দিল। অতঃপর দাসীটি ইদ্দত পালন করা অবস্থায় তার মনিব তাকে বিক্রয় করে দিল। এমতাবস্থায় ক্রেতার জন্য সেই দাসীর সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। কেননা দাসীটি বর্তমানে ইদ্দত পালন করছে। এরপর যখন দাসীর ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে তখন সেই দাসীর ইসতিবরা করা ক্রেতার উপর ওয়াজিব নয়। কারণ দাসীটির মালিকানা ও দখল লাভের সময় দাসীর লজ্জাস্থান ক্রেতার জন্য বৈধ ছিল না, তাই ইসতিবরা করা ওয়াজিব হয়নি। এরপর যখন দাসীটি হালাল হলো তখন ইসতিবরা করার সবব তথা নতুন মালিকানা ও দখল না পাওয়া যাওয়াতে ইসতিবরা করা ওয়াজিব নয়।

قَالَ : وَلَا يَقْرَبُ الْمُظَاهِرُ وَلَا يَلْمَسُ وَلَا يُقَبِّلُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُكَفِّرَ لِأَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ الْوَطْئُ إِلَى أَنْ يُكَفِّرَ حَرُمَ الدَّوَاعِي لِلْإِفْضَاءِ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ سَبَبَ الْحَرَامِ حَرَامٌ كَمَا فِي الْاِعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ وَفِي الْمَنْكُوحَةِ إِذْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ بِخِلَافِ حَالَةِ الْحَيْضِ وَالصَّوْمِ لِأَنَّ الْحَيْضَ يَمْتَدُّ شَطْرَ عُمْرِهَا وَالصَّوْمُ يَمْتَدُّ شَهْرًا فَرْضًا وَأَكْثَرَ الْعُمْرِ نَفْلًا فَفِي الْمَنْعِ عَنْهَا بَعْضُ الْحَرَجِ وَلَا كَذٰلِكَ مَا عَدَدْنَاهَا لِقُصُوْرِ مُدَدِهَا وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُضَاجِعُ نِسَاءَهُ وَهُنَّ حُيَّضٌ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যিহারকারী কাফফরা আদায় করার আগে তার স্ত্রীর কাছে যাবে না, তাকে স্পর্শ করবে না, তাকে চুমো খাবে না এবং তার লজ্জাস্থানের প্রতি উত্তেজিত অবস্থায় তাকাবে না। কেননা যেহেতু কাফফরা দেওয়ার পূর্বে সহবাস হারাম সাব্যস্ত হয়েছে তাই সহবাসের পূর্বের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজগুলোও হারাম সাব্যস্ত হবে। কেননা এগুলো সহবাস পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তাছাড়া মূলনীতি হলো হারামের যা সবব হয় তাও হারাম হয়। যেমন ই'তিকাফ ও ইহরাম অবস্থায় উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ হারাম। তদ্রূপ নিজ স্ত্রীর সাথে এগুলো হারাম যখন সে শুবহা বা ভুলক্রমে সহবাসের শিকার হয়। অবশ্য হায়েয এবং রোজার অবস্থা এর ব্যতিক্রম [অর্থাৎ এ দু সময় উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজগুলো হারাম নয়]। কারণ হায়েয মহিলাদের জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় ধরে পরিব্যাপ্ত থাকে, আর ফরজ রোজা তো পুরো এক মাসব্যাপী হয় আর নফল রোজা তো জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে। সুতরাং এ সময়ে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহ নিষিদ্ধ করা হলে একপ্রকার সংকীর্ণতা আসবে। আমরা যে সুরতগুলো উল্লেখ করেছি সেগুলো সংক্ষিপ্ত সময় জুড়ে হয় বলে তাতে এমন সমস্যা হয় না। এ ছাড়া সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ রোজা অবস্থায় [তার স্ত্রীদের] চুমো খেতেন এবং হায়েয অবস্থায় তাঁর স্ত্রীদের পাশে শুতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَقْرَبُ الْمُظَاهِرُ الخ : চলমান ইবারতে যিহারকারী ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে? সে সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ظِهَارٌ করল [অর্থাৎ তার স্ত্রীকে তার নিকটবর্তী মাহরাম যেমন মায়ের সাথে উপমা দিল। সে বলল, তুমি আমার মায়ের মতো] সে কাফফরা দেওয়ার পূর্বে তার স্ত্রীর কাছে যাবে না, তাকে স্পর্শ করবে না, তাকে চুমো খাবে না এবং তার লজ্জাস্থান উত্তেজনার সাথে দেখবে না।

উল্লেখ্য যে, স্পর্শ করা, চুমো খাওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া এবং লজ্জাস্থানের প্রতি কামভাবের সাথে তাকানো সবই دَوَاعِي وَطْئٍ -এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আলোচ্য ইবারত দ্বারা বুঝা গেল যে, যিহারকারীর জন্যে دَوَاعِي وَطْئٍ জায়েজ নয়।

এরপর মুসান্নিফ (র.) دَوَاعِيْ নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে দলিল পেশ করছেন এই বলে যে, যখন যিহারকারীর জন্যে কাফফরার পূর্বে সহবাস হারাম সাব্যস্ত হয়েছে তখন তার জন্যে সহবাসের পূর্বে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহও হারাম হবে। কেননা دَوَاعِيْ -ই তো সহবাস পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সুতরাং دَوَاعِيْ হলো সহবাসের সবব। আর উসূলে ফিকহের মূলনীতি হলো কোনো হারাম কাজের সববও হারাম বা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হয়। অতএব যিহারকারীর জন্যে সহবাসের মতো সহবাসের পূর্ববর্তী উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহও হারাম।

قَوْلُهُ كَمَا فِي الْاِعْتِكَافِ : অর্থাৎ اِعْتِكَافٌ ও اِحْرَامٌ অবস্থায় সহবাস করা যেমন হারাম সহবাসের পূর্ববর্তী উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহও হারাম। সুতরাং যিহারকারীর বিধান ই'তিকাফকারী ও ইহরাম পরিহিত ব্যক্তির মতো হলো।

قَوْلُهُ وَفِي الْمَنْكُوْحَةِ اِذَا وُطِئَتْ الخ : এ ইবারতে লেখক যিহারকারীর অনুরূপ আরেকটি মাসআলাকে পেশ করেছেন।

وَطْى بِالشُّبْه বলা হয় ভুলক্রমে নিজ স্ত্রী বা দাসী ব্যতীত অন্য কারো সাথে নিজ স্ত্রী বা দাসী মনে করে সহবাস করে ফেলা। এখানে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে ভুলক্রমে সহবাস করা হয়, তাহলে সেই মহিলাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। তার ইদ্দত পালনকালে তার স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা হারাম। যেহেতু তার সাথে সহবাস করা হারাম সেহেতু সহবাসের পূর্বে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী তথা دَوَاعِي وَطْى -ও হারাম সাব্যস্ত হবে।

মোটকথা, আলোচ্য ইবারতে চার প্রকারের ব্যক্তি যথা– যিহারকারী, ই'তিকাফকারী, ইহরাম পরিহিত ব্যক্তি ও যার সাথে ভুলক্রমে সহবাস করা হয়েছে তার স্বামীর কথা আলোচনা করা হয়েছে। যাদের প্রত্যেকের জন্যে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস ও এর পূর্ববর্তী যৌনকর্মসমূহ হারাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَالَةِ الْحَيْضِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত চার প্রকারের ব্যতিক্রমী দু প্রকারের মাসআলা আলোচনা করেছেন, যাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস হারাম হলেও সহবাসের পূর্ববর্তী উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহ হারাম নয়। এ দু প্রকার হলো স্ত্রীর হায়েযের অবস্থা ও স্বামীর রোযা রাখা অবস্থা। অর্থাৎ কারো স্ত্রী যদি হায়েযের অবস্থায় থাকে তাহলে সেই স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। তবে তার সাথে دَوَاعِيْ হারাম নয়। এমনিভাবে স্বামীর রোজা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস হারাম হলেও তার সাথে دَوَاعِي وَطْى করাতে শরিয়তের কোনো বাধা নেই।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْحَيْضَ يَمْتَدُّ شَطْرَ الخ : এখান থেকে লেখক হায়েয ও রোজা অবস্থায় دَوَاعِيْ কেন হালাল হবে– এর যুক্তি তুলে ধরেছেন। আর তা হলো, হায়েযের ক্ষেত্রে دَوَاعِيْ হালাল হওয়ার যুক্তি এই যে, হায়েয মহিলাদের জীবনের অংশ। যে কোনো সুস্থ মহিলার প্রত্যেক মাসের বিশেষ একটা সময় হায়েয থাকবেই। যে হিসেবে মহিলার জীবনের একটা বড় অংশ হায়েয অবস্থায় কেটে যায়। যদি এ দীর্ঘ সময় ধরে স্ত্রী সম্ভোগ থেকে পূর্ণ বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয় তাহলে স্বামী ও স্ত্রীর জীবনযাপনে সংকীর্ণতা দেখা দেবে।

আর রোজার ক্ষেত্রে ভিন্ন বিধানের কারণ হলো, ফরজ রোজা দীর্ঘ এক মাস জুড়ে স্থায়ী হয়। আর নফল রোজা জীবনের অধিকাংশ সময় রাখা হয়। যদি পুরো সময় دَوَاعِيْ -ও নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে একপ্রকার সংকট তৈরি হবে। এজন্য শরিয়ত এ দু অবস্থায় دَوَاعِيْ -কে বৈধ রেখেছে; কিন্তু সহবাস হারাম সাব্যস্ত করেছে।

قَوْلُهُ وَلَا كَذٰلِكَ مَا عَدَدْنَاهَا الخ : লেখক বলেন, আমরা যে চার প্রকার লোকের কথা আলোচনা করেছি, যেমন– যিহারকারী, ই'তিকাফকারী, মুহরিম ও যার সাথে ভুলক্রমে সহবাস করা হয়েছে তাদের বিষয়টি এমন নয়। কেননা বিষয়গুলো সব সময় ঘটে না। কোনোটি হয়তো জীবনে একবারও ঘটে না, আবার কোনোটি একবার দুবার ঘটে তাই এর মেয়াদ স্বল্প। তাই এগুলোর হুকুম হায়েযাবস্থা ও রোজার মতো না।

মোটকথা, মুসান্নিফ (র.) রোজা ও হায়েযাবস্থার বিধান পূর্বে উল্লিখিত চারটি বিষয়ের বিধানের চেয়ে যে ব্যতিক্রম তা যুক্তির আলোকে বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি হায়েয ও রোজার বিধান যে ব্যতিক্রম তা হাদীসের আলোকে বর্ণনা করছেন।

রোজার অবস্থা সম্পর্কে হাদীস– قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ রোজা রাখা অবস্থায় স্ত্রীদের চুমো খেতেন।'

হায়েযাবস্থা সম্পর্কে হাদীস– يُضَاجِعُ نِسَاءَهُ وَهُنَّ حُيَّضٌ অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে শুতেন, অথচ তারা হায়েযাবস্থায় থাকতেন।'

উল্লেখ্য যে, হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) কর্তৃক বর্ণিত এ দুটি হাদীসই হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। মুসান্নিফ (র.) সংক্ষিপ্তভাবে হাদীস দুটিকে এখানে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আমরা সনদসহ হাদীসগুলো উল্লেখ করছি।

প্রথম হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ ব্যতীত সকলে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلٰكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ .

অর্থাৎ হযরত আসওয়াদ (র.) ও আলকামা (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রোজা রাখা অবস্থায় [তার স্ত্রীদের] চুমো খেতেন। আর ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ স্ত্রীর সাথে রোজা অবস্থায় ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। তবে তিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেন।

রোজা সংক্রান্ত হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। ইমাম বুখারী (র.) সহ প্রায় সকলেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই– عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) এ সম্পর্কিত হাদীস হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটি এই–

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

অর্থাৎ হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ রোজা রাখা অবস্থায় তাকে চুমো খেতেন।

মোটকথা, হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) যে দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন তা বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত এবং হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোজা ও হায়েযাবস্থায় রাসূল ﷺ স্ত্রীদের ঘনিষ্ঠভাবে আদর-সোহাগ করতেন, যা دَوَاعِيْ -এর পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং রোজা ও হায়েযাবস্থায় স্ত্রী কিংবা দাসীর সাথে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহ তথা دَوَاعِيْ করার বৈধতা প্রমাণিত হলো।

قَالَ : وَمَنْ لَهُ اَمَتَانِ اُخْتَانِ فَقَبَّلَهُمَا بِشَهْوَةٍ فَاِنَّهُ لَا يُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَا يُقَبِّلَهَا وَلَا يَمُسُّهَا بِشَهْوَةٍ وَلَا يَنْظُرُ اِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حَتّٰى يُمَلِّكَ فَرْجَ الْاُخْرٰى غَيْرَهُ بِمِلْكٍ اَوْ نِكَاحٍ اَوْ يُعْتِقَهَا وَاَصْلُ هٰذَا اَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ الْمَمْلُوْكَتَيْنِ لَا يَجُوْزُ وَطْيًا لِاِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ وَلَا يُعَارَضُ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ لِاَنَّ التَّرْجِيْحَ لِلْمُحَرِّمِ وَكَذَا لَا يَجُوْزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِى الدَّوَاعِىْ لِاِطْلَاقِ النَّصِّ وَلِاَنَّ الدَّوَاعِىَ اِلَى الْوَطْئِ بِمَنْزِلَةِ الْوَطْئِ فِى التَّحْرِيْمِ عَلٰى مَا مَهَّدْنَاهُ مِنْ قَبْلُ فَاِذَا قَبَّلَهُمَا فَكَاَنَّهُ وَطِيَهُمَا وَلَوْ وَطِيَهُمَا لَيْسَ لَهُ اَنْ يُجَامِعَ اَحَدَهُمَا وَلَا اَنْ يَأْتِىَ بِالدَّوَاعِىْ فِيْهِمَا فَكَذَا اِذَا قَبَّلَهُمَا وَكَذَا اِذَا مَسَّهُمَا بِشَهْوَةٍ اَوْ نَظَرَ اِلٰى فَرْجِهِمَا بِشَهْوَةٍ لِمَا بَيَّنَّا اِلَّا اَنْ يُمَلِّكَ فَرْجَ الْاُخْرٰى غَيْرَهُ بِمِلْكٍ اَوْ نِكَاحٍ اَوْ يُعْتِقَهَا لِاَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُهَا لَمْ يَبْقَ جَامِعًا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তির দুজন সহদোরা দাসী রয়েছে, অতঃপর মনিব দুজনকে কামভাবের সাথে চুমো খেল, তাহলে সে দুজনের একজনের সাথেও সহবাস করতে এবং চুমো খেতে পারবে না এবং তাদের কারো লজ্জাস্থানের প্রতি উত্তেজনার সাথে তাকাবে না যে পর্যন্ত সে অন্য বোনটিকে অপর ব্যক্তির অধিকারে না দেয় মালিকানার মাধ্যমে অথবা বিবাহের মাধ্যমে কিংবা সে যদি তাকে আজাদ না করে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, দুজন সহদোরা দাসীকে সহবাসের মাধ্যমে একত্র করা যায় না। আরেকটি দলিল হলো কুরআনের আয়াত– وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ 'আর তোমাদের জন্যে হারাম করে দেওয়া হয়েছে দু বোনকে একত্র করা।' তাছাড়া কুরআনের অপর আয়াত اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে বিরোধপূর্ণ সাব্যস্ত হবে না। কারণ হারামের বিধান তো প্রাধান্য দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে দু-সহদোর বোনকে সহবাসের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহের মাধ্যমে একত্র করা জায়েজ নয়। কেননা এ [দু-বোনকে একত্র করা] সংক্রান্ত আয়াতের বিধান মুতলাক। তাছাড়া আমরা পূর্বে যে আলোচনা করেছি তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে সহবাসের পূর্বে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহ সহবাসের সমপর্যায়ের। সুতরাং যখন তাদের দুজনকে চুম্বন করল সে যেন দুজনের সাথে সহবাসই করল। আর যদি দুজনের সাথে সহবাস করে তাহলে তার জন্যে পরবর্তীতে দুজনের কারো সাথে সহবাস করা জায়েজ নয় এবং দুজনের কারো সাথে সহবাস পূর্ব উত্তেজক কাজসমূহও জায়েজ নয়। এমনিভাবে যদি তাদের দুজনকে চুম্বন করে কিংবা কামভাবেব সাথে স্পর্শ করে তাহলে পরে তাদের কারো সাথে সহবাস কিংবা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজসমূহ করা জায়েজ নয়। তবে যদি একজনের লজ্জাস্থানের অধিকারী বিবাহ কিংবা মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে অন্য কাউকে করে দেয় অথবা তাকে আজাদ করে দেয় তাহলে [অপরজনের সাথে সহবাস ও অন্যান্য সব কর্ম] জায়েজ। কেননা যখন তার জন্য অপরজনের যৌনাঙ্গ হারাম হয়ে গেল তখন সে আর দু বোনকে একত্রকারী সাব্যস্ত হলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ لَهُ اَمَتَانِ اُخْتَانِ الخ : আলোচ্য ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর গ্রন্থের একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, যদি কারো অধিকারে দুজন দাসী থাকে যারা পরস্পর সহোদর বোন, অতঃপর মনিব তাদের উভয়ের সাথে কামভাবের সাথে চুম্বন করে তাহলে এরপর থেকে দুজনের কোনো একজনের সাথে সহবাস করা, চুম্বন করা, কামভাবের সাথে স্পর্শ করা ও তাদের কারো যৌনাঙ্গের দিকে তাকানো এর কোনোটাই জায়েজ নয়। তবে যদি দুজনের কোনো একজন অন্যের অধিকারে চলে যায় মালিকানার সূত্রে অথবা বৈবাহিক কিংবা যদি বর্তমান মনিব তাদের কাউকে আজাদ করে দেয় তাহলে এ তিন অবস্থার যে কোনো অবস্থায় অপর বোনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য যে, ইবারতের মধ্যে فَقَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ [যদি তাদের কামভাবের সাথে চুমো খায়] চুম্বন করার ক্ষেত্রে কামভাবের শর্তারোপ করা হয়েছে। সুতরাং যদি কেউ কামভাব ছাড়া এমনিতে চুমো খায় তাহলে উল্লিখিত বিধান প্রযোজ্য হবে না তাই বুঝা যায়।

قَوْلُهُ وَاَصْلُ هٰذَا اَنَّ الْجَمْعَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার দলিল বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, এ মাসআলার দলিল হলো দু সহোদর বোন যদি দাসী হয় এবং তারা এক মালিকের অধীন হয় তাহলে মালিক তাদের দুজনের সাথে একত্রে সহবাসের সম্পর্ক রাখতে পারে না। কেননা পবিত্র কুরআনে দু বোন বৈবাহিক সূত্রে কিংবা সহবাসের সূত্রে একত্র করাকে হারাম করা হয়েছে। কুরআনের সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে [যা حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ দ্বারা শুরু হয়েছে এবং চার নং পারার সর্বশেষ আয়াতে] বলেছেন– وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ [আর দু-বোনকে একত্রিত করা তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে]। উল্লেখ্য যে, উত্তেজনার সাথে চুম্বন করা ও অন্যান্য কিছু করা শরিয়তের দৃষ্টিতে সহবাসের পর্যায়ে। সুতরাং যদি কারো অধীনে দুজন পরস্পর সহোদর বোন থাকে এবং সে দুজনকে কামভাবের সাথে চুম্বন করে তাহলে সে দুজনকে যেন সহবাসের সাথে একত্র করল। সুতরাং এখন আর মনিব দুজনের কোনো একজনের সাথে সহবাস করতে পারবে না। তদ্রূপ উত্তেজনার সাথে চুম্বন ইত্যাদি কোনো কিছু করতে পারবে না। যদি করে তাহলে দু বোনকে সহবাসের সাথে একত্র করল যা হারাম।

তবে যদি দু-বোনের কোনো এক বোনের লজ্জাস্থানের অধিকার অন্য কারো হাতে সোপর্দ করে কিংবা মালিকানা অন্যের হাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে অথবা তাদের [অন্যের কাছে] বিবাহ দিয়ে একজনকে আজাদ করে দেয় তাহলে অন্য বোন ব্যবহার করতে পারবে।

উল্লেখ যে, যদি দু-বোনের কোনো একবোনকে কামভাবের সাথে চুম্বন করে তাহলে তার সাথে সহবাসসহ অন্য সবকিছু করা জায়েজ। তবে অপর বোন হারাম হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَا يُعَارَضُ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى او ما ملكت الخ : এ ইবারত থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, কুরআনের আয়াত اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ দ্বারা বুঝা যায় সব ধরনের দাসী ও যে কোনো পরিমাণে দাসী ব্যবহার করা একজনের জন্যে জায়েজ। অথচ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ দ্বারা বুঝা যায় দু-বোনকে সহবাসের সাথে একত্র করা হারাম। সুতরাং দু আয়াতের মাঝে বৈপরীত্য প্রমাণিত হয়। দু আয়াতের এ পারস্পরিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে কোন আয়াতকে গ্রহণ করব?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ দু আয়াতের মাঝে কোনো বৈপরীত্য প্রমাণিত হয় না। কেননা বৈপরীত্য প্রমাণের জন্যে শর্ত হলো উভয় দলিলের সমকক্ষ হওয়া। এখানে দু দলিল পরস্পর সমকক্ষ নয়। কারণ মূলনীতি হলো, দু দলিলের কোনো একটি যদি হারামকারী হয় আর অপরটি হালালকারী হয়, তাহলে হারামকারী দলিলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাছাড়া আলোচ্য দু আয়াতের প্রথমটির হুকুম মুতলক আর দ্বিতীয় দলিল اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর হুকুম عَامٌ ; নিয়মানুযায়ী عَامٌ ও مُطْلَقٌ -এর মাঝে কোনো সংঘর্ষ হয় না।

জ্ঞাতব্য : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -এর মাঝে দুধবোন, দুধমা ও মাজূসী দাসীও অন্তর্ভুক্ত। অথচ তারা সকলের ঐকমত্যে হারাম অর্থাৎ বিবাহের বা ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -এর প্রয়োগ عَامٌ [ব্যাপক] নয়; বরং এর হুকুম مَخْصُوصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ। সুতরাং প্রথম আয়াতের দ্বারা পরস্পর সহোদর দু-বোনের হুকুমও أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -এর থেকে খাস করা হবে।

মোটকথা, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, দু-বোনকে বিবাহের মাধ্যমে যেমন একসাথে একত্র করা হারাম তদ্রূপ সহবাসের মাধ্যমে একসাথে একত্র করা হারাম।

قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا الخ : আলোচ্য ইবারতে মুসান্নিফ (র.) পূর্বে উল্লিখিত মাসআলার শাখাপ্রশাখাগত মাসায়েল বর্ণনা করেছেন। পূর্বে বলা হয়েছিল যে, দু-বোনকে সহবাসের মাধ্যমে একত্র করলে পরবর্তীতে দুজন তার অধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন না হলে দুজনের কারো সাথে কোনো ধরনের যৌনাচার করা যাবে না।

এখানে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি কেউ সহবাস ব্যতীত অন্য কোনো যৌনাচার দু'জনের সাথে করে তাহলেও একই হুকুম। অর্থাৎ দুজনের সাথে যৌন উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ করার পর দুজনের একজন তার অধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন না হলে দুজনের কাউকে আর ব্যবহার করা যাবে না। এ মাসআলার প্রথম দলিল হলো, এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত তথা وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ মুতলাক; এখানে দুজনের কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছে। তাই এতে দু-সহোদর বোন বিবাহের মাধ্যমে একত্র করা এবং দু-সহোদর দাসীকে সহবাসের মাধ্যমে একত্র করা যেমন হারাম তদ্রূপ দু-সহোদর দাসীকে সহবাসপূর্ণ যৌনাচারের মাধ্যমে একত্র করাও হারাম সাব্যস্ত হবে। অবশিষ্ট রইল সহবাস এবং সহবাস পূর্ব যৌনাচার উভয়ের হুকুম কি এক? এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) দলিল পেশ করছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– اَلدَّوَاعِي إِلَى الْوَطْيِ بِمَنْزِلَةِ الْوَطْيِ فِي التَّحْرِيمِ 'হারাম হওয়ার বিধান আরোপিত হওয়ার ব্যাপারে সহবাসপূর্ব যৌনাচার সহবাসের সমপর্যায়ের বলে পরিগণিত হবে।' এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَإِذَا قَبَّلَهُمَا فَكَأَنَّهُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য বিষয়টিকে আরো বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করছেন। তিনি বলেন, যখন কোনো মনিব দু-বোনের উভয়ের সাথে সহবাস করল সে এখন থেকে কারো সাথে সহবাস এবং তার পূর্ব যৌনাচার তার জন্য বৈধ হবে না।

অনুরূপভাবে যদি কেউ দু-বোনের উভয়কে চুমো খায় অথবা কামভাবের সাথে স্পর্শ করে তাহলে তারপর থেকে কারো সাথে সহবাস ও তার পূর্ব যৌনাচার করা জায়েজ নয়। আর উভয়টার কারণ একই।

কিন্তু যদি দু-বোনের একজনকে কারো সাথে বিবাহ দিয়ে দেয় অথবা কাউকে মালিক বানিয়ে দেয় কিংবা একজনকে আজাদ করে দেয় তাহলে একজনের লজ্জাস্থান তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। আর তখন অপরজনকে ব্যবহার করাতে তার আর কোনো বাধা থাকবে না। কেননা তখন অপর বোন ব্যবহার করলে দু-বোনকে একত্রে সহবাসের মাধ্যমে একত্র করা সাব্যস্ত হয় না।

وَقَوْلُهُ بِمِلْكٍ أَرَادَ بِهِ مِلْكَ يَمِيْنٍ فَيَنْتَظِمُ التَّمْلِيْكَ بِسَائِرِ أَسْبَابِهِ بَيْعًا أَوْ غَيْرَهُ وَتَمْلِيْكُ الشِّقْصِ فِيْهِ كَتَمْلِيْكِ الْكُلِّ لِأَنَّ الْوَطْئَ يَحْرُمُ بِهِ وَكَذَا إِعْتَاقُ الْبَعْضِ مِنْ إِحْدٰهُمَا كَإِعْتَاقِ كُلِّهَا وَكَذَا الْكِتَابَةُ كَالْإِعْتَاقِ فِيْ هٰذَا لِثُبُوْتِ حُرْمَةِ الْوَطْئِ بِذٰلِكَ كُلِّهِ وَبِرَهْنِ إِحْدٰهُمَا وَإِجَارَتِهَا وَتَدْبِيْرِهَا لَا تَحِلُّ الْأُخْرٰى لِأَنَّهَا تَخْرُجُ بِهَا عَنْ مِلْكِهِ ـ وَقَوْلُهُ أَوْ نِكَاحٍ أَرَادَ بِهِ النِّكَاحُ الصَّحِيْحُ أَمَّا إِذَا زَوَّجَ أَحَدَهُمَا نِكَاحًا فَاسِدًا لَا يُبَاحُ لَهُ وَطْئُ الْأُخْرٰى إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ الزَّوْجُ بِهَا فِيْهِ لِأَنَّهُ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا وَالْعِدَّةُ كَالنِّكَاحِ الصَّحِيْحِ فِي التَّحْرِيْمِ وَلَوْ وَطِئَ إِحْدٰهُمَا حَلَّ لَهُ وَطْئُ الْمَوْطُوْءَةِ دُوْنَ الْأُخْرٰى لِأَنَّهُ يَصِيْرُ جَامِعًا بِوَطْئِ الْأُخْرٰى لَا بِوَطْئِ الْمَوْطُوْءَةِ وَكُلُّ امْرَأَتَيْنِ لَا يَجُوْزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا نِكَاحًا فِيْمَا ذَكَرْنَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتَيْنِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর শব্দ بِمِلْكٍ দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য করেছেন কোনো ব্যক্তির দাসীর মালিক হওয়া। আর এটা মালিকানার বিক্রয় ইত্যাদি সবগুলো সববকে বা কারণকে একত্রিত করে। বর্ণিত পরিস্থিতিতে আংশিক মালিকানা পূর্ণ মালিকানার পর্যায়ে গণ্য হবে। কেননা এর দ্বারাই সহবাস হারাম হয়ে যায়। তদ্রূপ একজনের কিয়দংশ আজাদ করা এ ব্যাপারে পুরা অংশ আজাদ করার নামান্তর। কেননা এর দ্বারাও সহবাস হারাম হয়ে যায়। তবে কোনো একজনকে বন্ধক রাখা অথবা ভাড়া দেওয়া কিংবা মুদাব্বার বানানোর দ্বারা অপরজন হালাল হয় না। কেননা এ কাজগুলো দ্বারা দাসীটি মনিবের মালিকানা থেকে বের হয় না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) أَوْ نِكَاحٍ শব্দ দ্বারা বিশুদ্ধ বিবাহ উদ্দেশ্য করেছেন। সুতরাং যদি তাদের [দু-বোনের] একজনকে ফাসেদ বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে অপর বোনটি তার জন্য বৈধ হবে না। তবে যদি ফাসেদ বিবাহের মধ্যে স্বামী তার সাথে সহবাস করে তাহলে অপর বোন বৈধ হবে। কেননা এতে ইদ্দত [নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা] ওয়াজিব হয়, আর হারাম বিধান আরোপিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দত বিশুদ্ধ বিবাহের পর্যায়ে। আর যদি [দু-বোনের] একজনের সাথে সহবাস করে, তাহলে সহবাসকৃত দাসীটি হালাল থাকবে অপরটি হালাল নয়। কেননা অপরজনের সাথে সহবাস করার দ্বারা দু-বোনকে [সহবাসের মাধ্যমে] একত্র করার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু যার সাথে সহবাস করা হয়েছে তার সাথে পুনরায় সহবাস করলে দু-বোনকে একত্রকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। যে ধরনের দু মহিলাকে একসাথে বিবাহ করা যায় না তারা উল্লিখিত মাসায়েলে দু-বোনের হুকুমে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ بِمِلْكٍ أَرَادَ بِهِ مِلْكَ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর জামিউস সাগীরের মূল ইবারতের কিছু কিছু শব্দের বিশ্লেষণ করছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর ইবারতের অংশবিশেষ এরূপ ছিল যে, حَتّٰى يُمَلِّكَ فَرْجَ الْأُخْرٰى غَيْرَهُ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ 'যতক্ষণ মনিব অপর বোনের লজ্জাস্থানের অধিকারী অন্যকে মালিকানার মাধ্যমে বা বিবাহ করে দেয়।' এ ইবারতে بِمِلْكٍ শব্দ দ্বারা তিনি কি উদ্দেশ্য করেছেন?

উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেন, مِلْك শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مِلْك يَمِيْن অর্থাৎ দাসত্বের মালিকানা। আর এখানে দাসত্বের মালিক বানানোর বিষয়টি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মালিকানার যতগুলো সবব বা কারণ রয়েছে সবই এতে শামিল হবে। যেমন– কেনাবেচা, হেবা বা দান, সদকা, খুলা, মিরাস ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَتَمْلِيْكُ الشِّقْصِ فِيْهِ : কাউকে দাসীর কিছু অংশের মালিক বানানো অর্থ হলো পুরো অংশের মালিক বানানো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি কোনো ব্যক্তি যার অধীনে দু-সহোদর বোন রয়েছে তাদের একজনের কিছু অংশের মালিক অন্যকে বানিয়ে দেয়। যেমন– কাউকে বলল, তুমি এ দাসীর অর্ধাংশের মালিক আর আমি অবশিষ্ট অর্ধাংশের। মালিকের জন্য তাহলে এতটুকু বলার দ্বারা অপর বোনের সাথে সহবাস ও সহবাসপূর্ব যৌনাচার করা বৈধ হয়ে যাবে। কেননা অংশীদারি দাসীর কোনো অংশীদারের জন্য দাসীর সাথে সহবাস করা জায়েজ নয়। যেহেতু এ দাসীর সাথে সহবাস হারাম হলো তাই তার বোনের সাথে সহবাস করা বৈধ সাব্যস্ত হবে। কারণ এখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকল না।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِعْتَاقُ الْبَعْضِ الخ : অনুরূপভাবে কোনো দাসীর অংশবিশেষ আজাদ করার দ্বারা পুরো অংশ আজাদ করার হুকুম চলে আসে। অতএব যদি দু-বোনের কোনো এক বোনের অংশবিশেষ আজাদ করে, তাহলে অপর বোনের সাথে সহবাস করাতে কোনো সমস্যা নেই।

قَوْلُهُ وَكَذَا الْكِتَابَةُ كَالْإِعْتَاقِ الخ : অনুরূপভাবে যদি কোনো বোনের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে আজাদ করে দেওয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তথা কিতাবত করে তাহলে অবস্থা এমন হলো যে, যেন সে দাসীটিকে আজাদ করে দিল। এমতাবস্থায় তার জন্যে অপর বোনের সাথে সহবাস ইত্যাদি করা জায়েজ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لِثُبُوْتِ حُرْمَةِ الْوَطْءِ بِذٰلِكَ كُلِّهِ : মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা পূর্ববর্তী সবগুলো মাসআলার ইল্লত তথা কারণ বর্ণনা করছেন। উল্লিখিত সবগুলো সুরতে অর্থাৎ দাসীর কিছু অংশের মালিক বানিয়ে দেওয়া, আজাদ করে দেওয়া ও দাসীর সাথে কিতাবত চুক্তি করার সুরতে দাসীটি মনিবের জন্য আর হালাল থাকে না। যেহেতু দাসীটি মনিবের জন্যে হালাল নেই তাই তার বোনের সাথে সহবাস ও অন্যান্য যৌনাচার বা যৌন পূর্ব প্রস্তুতির সকল প্রকার কার্যক্রম করাতে আর কোনো সমস্যা নেই।

قَوْلُهُ وَبِرَهْنِ إِحْدَاهُمَا الخ : তবে হ্যাঁ, যদি দু-বোনের কোনো একজনকে বন্ধক রাখা হয় অথবা ভাড়া দেওয়া হয় অথবা মুদাব্বার বানানো হয় তখন অপর বোনের সাথে সহবাস ইত্যাদি করা জায়েজ হবে না। কারণ এ তিনটি সুরতের কোনো সুরতেই কিন্তু দাসীটি তার বর্তমান মালিকের মালিকানা থেকে বের হয় না এবং এ সুরতগুলোতে মালিকের অধিকার আগের মতোই বহাল থাকে।

وَقَوْلُهُ أَوْ نِكَاحٍ أَرَادَ بِهِ الخ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ইবারতের أَوْ نِكَاحٍ অংশের বিশ্লেষণ করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, نِكَاحٌ শব্দ দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর উদ্দেশ্য نِكَاحٌ صَحِيْحٌ তথা শরিয়তসম্মত বিবাহ [যা ফাসেদ নয়]। সুতরাং যার অধীনে দু-সহোদর বোন রয়েছে সে যদি দুজনের একজনকে কারো কাছে نِكَاحٌ فَاسِدٌ -এর মাধ্যমে বিবাহ দেয় তাহলে এর দ্বারা অপর বোন হালাল হবে না। অপর বোন আগের মতো হারামই থাকবে।

অবশ্য যদি ফাসেদ বিবাহের পর স্বামী দাসীটির সাথে সঙ্গম করে তাহলে অপর বোনটি হালাল সাব্যস্ত হবে। এর কারণ দর্শাতে গিয়ে তিনি বলেন, সহবাসের দ্বারা ইদ্দত ওয়াজিব হয়, যখন ইদ্দত ওয়াজিব তখন দাসীটি মনিবের জন্য হারাম হয়ে গেল। যেহেতু দাসীটি মনিবের জন্য হারাম হলো তাই তার বোন মনিবের জন্য হালাল সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَالْعِدَّةُ كَالنِّكَاحِ الصَّحِيْحِ فِي التَّحْرِيْمِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইদ্দত বিশুদ্ধ বিবাহের সমপর্যায়ের অর্থাৎ শুদ্ধ বিবাহের দ্বারা যেমন দাসী হারাম হয় তদ্রূপ ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার দ্বারা দাসী হারাম হয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ وَطِئَ إِحْدٰهُمَا الخ : যদি মনিব দু-বোনের কোনো এক বোনের সাথে সহবাস করে তাহলে এ বোনটি মনিবের জন্য হালাল এবং অপর বোনটি হারাম হলো। অর্থাৎ এখন আর মনিবের জন্য অপর বোনের সাথে সহবাস করার সুযোগ নেই। যদি অপর বোনের সাথে সহবাস করে তাহলে সে দু-বোনকে সহবাসের মাধ্যমে একত্রিতকারীর দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে যা মূলত হারাম।

পক্ষান্তরে যার সাথে একবার সহবাস করেছে তার সাথে যদি আরো সহবাস করে তাহলে তার দ্বারা সে দু-বোনকে সহবাসের মাধ্যমে একত্রিত সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَكُلُّ امْرَأَتَيْنِ لَا يَجُوْزُ الْجَمْعُ الخ : এখান থেকে প্রাসঙ্গিকভাবে মুসান্নিফ (র.) দু-বোন ছাড়া এমন দু'মহিলার কথা আলোচনা করছেন যাদেরকে একত্রে বিবাহ করা যায় না। যেমন– ফুফু ও ভাগ্নি, খালা ও ভাতিজি ইত্যাদি।

দু-বোনকে যেমন একসাথে বিবাহ করা যায় না তদ্রূপ উল্লিখিত মহিলাদেরকেও একসাথে বিবাহ করা যায় না। সুতরাং দু-বোন দাসী হলে যেমন তাদের সহবাসের মাধ্যমে একত্র করা যায় না তদ্রূপ উল্লিখিত মহিলাদের সহবাসের মাধ্যমে এমনকি সহবাসপূর্ব যৌনাচারের মাধ্যমে একত্রিত করা যাবে না।

সুতরাং যদি কারো মালিকানায় এমন দু-মহিলা এসে যায় যাদেরকে একসাথে বিবাহ করা যায় না [যেমন– খালা ও ভাতিজি] তাহলে মনিবের জন্য উভয়ের সাথে সহবাস করা কিংবা সহবাসপূর্ব যৌনাচার করা জায়েজ নয়। কারণ এর দ্বারা এমন দু-মহিলা একত্রিতকারী সাব্যস্ত হবে যাদেরকে একত্র করা নাজায়েজ।

বি. দ্র. ফাসেদ বিবাহের মধ্যে সহবাসের ফলে যখন ইদ্দত ওয়াজিব হয় তখন অপর বোনের সাথে সহবাস হালাল হয়। কিন্তু এরপর যখন ইদ্দত শেষ হবে তখন পুনরায় হারামের বিধান ফিরে আসবে এবং হারামের বিধান অব্যাহত থাকবে। তবে যদি এরপর অন্য কারো কাছে বিবাহ দেয় অথবা অন্য কারো মালিকানায় সোপর্দ করে তাহলে আবার তার বোনের সাথে সহবাস ইত্যাদি করা হালাল হবে। যদি এবারো তার স্বামী তালাক দেয় অতঃপর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তার কাছে ফিরে আসে তাহলে পুনরায় হারামের বিধান চলে আসবে।

মোটকথা এক বোনের সাথে সব সময়ের জন্য সহবাস হালাল হওয়ার শর্ত হলো এক বোনকে বিক্রি বা আজাদ করে দেওয়া।

–[আশরাফুল হিদায়া, রদ্দুল মুহতার]

قَالَ : وَيُكْرَهُ اَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ فَمَ الرَّجُلِ وَيَدَهُ اَوْ شَيْئًا مِنْهُ اَوْ يُعَانِقَهُ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ اَنَّ هٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ لَا بَأْسَ بِالتَّقْبِيْلِ وَالْمُعَانَقَةِ لِمَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَانَقَ جَعْفَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الْحَبْشَةِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَهُمَا مَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْمُكَامَعَةِ وَهِىَ الْمُعَانَقَةُ وَعَنِ الْمُكَاعَمَةِ وَهِىَ التَّقْبِيْلُ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى مَا قَبْلَ التَّحْرِيْمِ ثُمَّ قَالُوا الْخِلَافُ فِى الْمُعَانَقَةِ فِىْ اِزَارٍ وَاحِدٍ اَمَّا اِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيْصٌ اَوْ جُبَّةٌ فَلَا بَأْسَ بِهَا بِالْاِجْمَاعِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এক পুরুষের জন্য অন্য পুরুষের মুখে, হাতে অথবা অন্য কোনো অংশে চুম্বন করা ও মুআনাকা করা মাকরূহ। ইমাম তাহাবী (র.) উল্লেখ করেন যে, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, চুম্বন করা ও মুআনাকা করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা বর্ণিত আছে যে, হযরত জা'ফর (রা.) হাবশা থেকে ফিরে আসলে রাসূল ﷺ তার সাথে মুআনাকা করেছেন এবং তার দু'চোখের মাঝামাঝি স্থানে চুমো খেয়েছেন। তরফাইন (র.) -এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ مُكَامَعَة তথা মুআনাকা করতে নিষেধ করেছেন এবং مُكَاعَمَة তথা চুমো খেতে নিষেধ করেছেন। [তারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিলের জবাবে বলেন,] তিনি যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা হারামের পূর্ববর্তী সময়ের হাদীস। অতঃপর ফকীহগণ বলেন, ইমামগণের মাঝে মুআনাকা সংক্রান্ত যে মতবিরোধ তা খালি গায়ে শুধুমাত্র নিম্নাঙ্গের পোশাক পরিধান করা অবস্থায় হলে। আর যদি গায়ে জামা কিংবা জুব্বা থাকে তাহলে সকলের ঐকমত্যে মুআনাকা করা জায়েজ। এটাই সহীহ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَيُكْرَهُ اَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে এক পুরুষ অন্য পুরুষের মুখে হাতে অথবা শরীরের কোনো অংশে চুমো খেতে পারবে কিনা এবং পরস্পর মুআনাকা করতে পারবে কিনা এতদসম্পর্কিত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর জামিউস সাগীরের ইবারত নকল করে মুসান্নিফ (র.) ইমামগণের কোনো মতবিরোধ ছাড়া এগুলোকে মাকরূহ বলেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ জাফর তাহাবী (র.) তাঁর সুবিখ্যাত হাদীসের কিতাব শরহে মাআনী আল আছার গ্রন্থে এ মাসআলা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও তরফাইন (র.) -এর মতবিরোধসহ বিধান উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতানুসারে এসব ক্রিয়াকর্ম মাকরূহ। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতানুসারে এক পুরুষ অন্য পুরুষকে চুম্বন করা ও তার সাথে মুআনাকা করাতে কোনো দোষ নেই।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমতের পক্ষে হাদীসের মাধ্যমে দলিল দেওয়া হয় আর তাঁর মতের স্বপক্ষের হাদীসটি নিম্নরূপ–

رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَانَقَ جَعْفَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الْحَبْشَةِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ـ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ হযরত জাফর ইবনে আবূ তালিব (রা.) আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসলে তার সাথে মুআনাকা করেন এবং তার দু-চোখের মাঝামাঝি স্থানে চুম্বন করেন।'

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটি বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। তন্মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবির (রা.), আয়েশা (রা.) ও আবূ জুহাইফা অন্যতম।

হযরত জাবির (রা.) -এর হাদীসটি এখানে সনদসহ উল্লেখ করা হলো–

عَنْ اَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَقَدِمَ جَعْفَرُ مِنَ الْحَبْشَةِ تَلَقَّاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ بِاَيِّهِمَا اَفْرَحُ بِفَتْحِ خَيْبَرَ اَمْ بِقُدُوْمِ جَعْفَرَ ـ

অর্থাৎ 'হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূল ﷺ খায়বর থেকে ফিরলেন আর ওদিকে হযরত জাফর (রা.) আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন পর রাসূল ﷺ -এর সাথে তার সাক্ষাৎ হলো এবং তিনি তার কপালে চুমো খেলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম আমি জানি না কিসে আমি বেশি আনন্দিত, খায়বর বিজয়ে নাকি জাফর (রা.) -এর আগমনে।'

এ হাদীস ও অন্যান্য এরূপ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ হযরত জাফর (রা.) -এর সাথে মুআনাকা করেছেন এবং তাঁর কপালে চুম্বন করেছেন। এর দ্বারা উভয় কাজই বৈধ প্রমাণিত হয়। কারণ যদি এগুলো বৈধ না হতো তাহলে রাসূল ﷺ এরূপ করতেন না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো–

مَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى الْمُكَامَعَةَ (وَهِىَ الْمُعَانَقَةُ) اَوْ عَنِ الْمُكَاعَمَةِ وَهِىَ التَّقْبِيْلُ ـ

অর্থাৎ 'বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মুআনাকা করতে এবং চুমো খেতে নিষেধ করেছেন।' হাদীসটি ইমাম আবূ বকর ইবনে শায়বা তাঁর মুসান্নাফে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কিতাবে নিম্নোক্ত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে–

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ الْمِصْرِىُّ اَخْبَرَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ عَيَّاشٍ الْحُمَيْرِىُّ عَنْ اَبِى الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرٍ الْحَجَرِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الْمُكَامَعَةِ وَالْمُكَامَعَةِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ وَالْمُكَامَعَةِ الرَّجُلَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ ـ

ইমাম আবূ দাউদ এবং নাসায়ী (র.)ও مُكَامَعَة -এর হাদীস তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আর তাদের হাদীসের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো–

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ فُضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِى الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شَفِىٍّ عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ الْمَعَافِرِىِّ عَنْ اَبِىْ رَيْحَانَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَشْرَةٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَمُكَامَعَةِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ شِعَارٍ الخ ـ

এ হাদীসে রাসূল ﷺ দশটি বিষয়ে সম্পর্কে নিষেধ করেছেন এর মধ্যে একজন পুরুষ অপর কোনো পুরুষের সাথে কাপড়ের আবরণ ছাড়া মুআনাকা করা এবং একইভাবে দু-মহিলা মুআনাকা করতে নিষেধ করেছেন। –[সূত্র বিনায়া]

মোটকথা, সহীহ হাদীস দ্বারা পুরুষে পুরুষে কাপড়ের আবরণ ছাড়া মুআনাকা করার নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। অবশ্য চুম্বন করার বিষয়টি সেভাবে প্রমাণিত হয় না।

তরফাইন (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীসের জবাব দেন। তাঁরা বলেন, হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তারা মানসূখ বা রহিত হওয়ার পক্ষে কোনো কারণ বা যুক্তি উল্লেখ করেননি।

তবে উভয় হাদীসের বিধানই কার্যকর হতে পারে অর্থাৎ উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব যদি মাশায়েখের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়। মাশায়েখ বলেন, আহনাফের ইমামগণের মধ্যে মুআনাকা নিয়ে যে বিরোধ তা স্বাভাবিক কাপড় পরা অবস্থার হুকুম নিয়ে নয়। তাদের মধ্যে মতবিরোধ ঐ অবস্থায় যখন দুজন লোক খালি গায়ে শুধুমাত্র লুঙ্গি বা পাজামা পরা অবস্থায় মুআনাকা করে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এ অবস্থায় মুআনাকা করা মাকরূহ নয় যদি কামভাবের সম্ভবনা না থাকে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এ অবস্থাতে যেহেতু কামভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই এটা মাকরূহ।

সুতরাং আমরা নিষেধাজ্ঞা সংবলিত হাদীসগুলো খালি গায়ে কামভাব জাগ্রত হওয়ার অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট করব। আর জায়েজ হওয়া প্রমাণ করে এমন হাদীসগুলোকে জামা পরিধান করা অবস্থায়, কামভাব না থাকাকালীন হুকুমের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করব।

মাশায়েখ আরো বলেন যে, যদি উভয় পুরুষ জামা বা জুব্বা পরিহিত অবস্থায় হয় তাহলে মুআনাকা করাতে কোনো সমস্যা নেই। এটাই সহীহ মত ও এর উপরই ফতোয়া।

আশরাফুল হিদায়ার মুসান্নিফ আলোচ্য অংশে প্রাসঙ্গিকভাবে কয়েকটি মাসআলা আলোচনা করেছেন। প্রয়োজনীয় মনে করে নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো।

১ম মাসআলা : পরস্পর দেখা সাক্ষাতের সময় কিংবা বিদায়ের সময় নারীতে নারীতে অথবা পুরুষে পুরুষে কামভাবের সাথে চুমো খাওয়া মাকরূহ। আর যদি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এমনটি করা হয় তাহলে তা মাকরূহ নয়। যেমন– কোনো বড় আলেমকে চুম্বন করা। –[দুররুল মুখতার ৫ : ২৪৪]

২য় মাসআলা : বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কোনো আলেম বা নেককার লোকের হাতে চুমো খাওয়া জায়েজ। তদ্রূপ কোনো দীনদার বিচারক এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকের কপালে চুম্বন করা জায়েজ। কতিপয় আলেমের মতে এরূপ করা সুন্নত।

৩য় মাসআলা : ন্যায়পরায়ণ নয় এমন শাসক অথবা আলেম নয় এমন ব্যক্তিকে চুম্বন করার আদৌ অনুমতি নেই। মুজতবা ও মুহীত গ্রন্থে এ মাসআলা বর্ণিত আছে। তবে যদি কেউ ইসলামের সম্মানার্থে বা ধর্মীয় বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার্থে এরূপ করে তাহলে তা বৈধ। যদি কেউ পার্থিব স্বার্থে এমন করে তাহলে তা মাকরূহ। –[দুররে মুখতার]

৪র্থ মাসআলা : এক শ্রেণির সাধারণ মানুষকে দেখা যায় তারা কারো সাথে সাক্ষাতের সময় নিজ হাতে চুমো খায় এটা মাকরূহ। অনুরূপভাবে আলেম বা নেককার লোক ছাড়া অন্য কারো হাতে চুমো খাওয়া মাকরূহ। –[প্রাগুক্ত]

৫ম মাসআলা : কোনো আলেম বা আমিরের সামনে মাটি চুম্বন করা হারাম। যে এরূপ করবে এবং যে এতে খুশি হবে উভয়েই সমান গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা এ কাজটি মূর্তিপূজার সাথে সাদৃশ্য কাজ। এ ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে শামীর ইবারত এই–

وَكَذَا مَا يَفْعَلُوْنَهُ مِنْ تَقْبِيْلِ الْاَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ فَحَرَامٌ وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِىْ بِهِ آثِمَانِ لِاَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الْوَثَنِ وَهَلْ يَكْفُرَانِ عَلٰى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالتَّعْظِيْمِ كُفْرٌ وَاِنْ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَا وَصَارَ آثِمًا مُرْتَكِبًا لِكَبِيْرَةٍ.

অর্থাৎ যদি কেউ এমন মাটি চুম্বন করে তাহলে তারা কি কাফের হবে? [উত্তর হলো] যদি তা ইবাদতের নিয়তে কিংবা সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা কুফর হবে। আর যদি তা অভিবাদনের বা শুভেচ্ছা প্রদানের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা কুফর হবে না। অবশ্য যে এরূপ করবে সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে গুনাহগার হবে।

৬ষ্ঠ মাসআলা : কোনো আগন্তুক ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ানো মোস্তাহাব। অনুরূপভাবে কোনো আলেমের আগমনে কুরআন তেলাওয়াতকারীর দাঁড়ানো জায়েজ। এমনকি যে কোনো সম্মানী উপযুক্ত ব্যক্তির জন্যও দাঁড়ানো জায়েজ।

–[ফাতাওয়ায়ে শামী : খ. ৫, পৃ. ৫৫১]

বি. দ্র. কেউ কেউ বলেন, চুম্বন সাধারণত পাঁচ প্রকার। যথা– ১. সন্তানের গালে স্নেহের চুমো, ২. পিতামাতার মাথায় ভালোবাসার চুমো, ৩. ভাইয়ের কপালে আবেগের চুমো, ৪. স্ত্রী বা দাসীর মুখে কামভাবের চুমো ও ৫. মু'মিনদের হাতে অভিবাদনের চুমো।

আর কেউ কেউ আরেকটি প্রকার বাড়িয়ে বলেন– ৬. দীনের জন্য হাজরে আসওয়াদ নামক পাথরে চুমো। অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদে চুমো খাওয়া দীনের মহব্বতের অন্তর্ভুক্ত হবে। –[সূত্র প্রাগুক্ত]

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَوَارِثُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুসাফাহা করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা এটি ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত একটি সুন্নত। অধিকন্তু রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করল এবং হাত নাড়া দিল তার গুনাহসমূহ ঝড়ে পড়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ الخ : মুসাফাহা (مُصَافَحَة) অর্থ– এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে হাত মিলানো। মুসাফাহা করাতে কোনো দোষ নেই; বরং এটি একটি সুন্নত, যা রাসূল ﷺ-এর জমানা হতে ধারাবাহিকভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত এই রীতি চলে এসেছে।

এ হাদীস যা মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা মুসাফাহা করার ফজিলত প্রমাণিত হয়। আলোচ্য হাদীসটি বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আছে। তবে সেই হাদীসগুলোতে حَرَّكَ يَدَهُ শব্দটি নেই। তাই হাত ঝাকানোর বিষয়টি হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয় বলে তা পরিত্যাজ্য।

তাবারানী শরীফে হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ الْحُزَيْقِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا تَنَاثَرُ أَوْرَاقُ الشَّجَرِ .

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেন, যদি এক মু'মিন আরেকজন মু'মিনের সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম দেয় এবং তার হাত ধরে মুসাফাহা করে তাহলে তার গুনাহসমূহ সেভাবে ঝরে পড়ে যেভাবে [শীতকালে] গাছের পাতাসমূহ ঝরে পড়ে।'

হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, অভিবাদনের পূর্ণতা মুসাফাহা করার দ্বারা অর্জিত হয় এবং প্রতি সাক্ষাতেই তা করা মোস্তাহাব।

বি. দ্র. দু-হাতে মুসাফাহা করা সুন্নত।

খ. মুসাফাহার পদ্ধতি হলো, দুজনের চেহারা সামনাসামনি করে একজনের হাত অপরের হাতের মধ্যে নেওয়া। শুধুমাত্র আঙ্গুলের সাথে আঙ্গুল লাগানো সুন্নত নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের লোকেরা আঙ্গুলে আঙ্গুল মিলায়। মুসাফাহার সময় দু-হাতের মাঝে কোনো কাপড় থাকবে না এবং সাক্ষাতের সময় সালামের পরে মুসাফাহা করা উচিত।

গ. বিশেষ কোনো নামাজের পর, জুমার পর ও দু-ঈদের নামাজের পর খাসভাসে মুসাফাহা করা ঠিক নয়। তা পরিত্যাগ করা উচিত। –[সূত্র- আশরাফুল হিদায়া]

فَصْلٌ : فِى الْبَيْعِ
অনুচ্ছেদ : ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ السِّرْقِيْنِ وَيُكْرَهُ بَيْعُ الْعَذْرَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَا يَجُوْزُ بَيْعُ السِّرْقِيْنِ اَيْضًا لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَشَابَهَ الْعَذْرَةَ وَجِلْدَ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَلَنَا اَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ لِأَنَّهُ يُلْقٰى فِى الْاَرَاضِىْ لِاسْتِكْثَارِ الرَّيْعِ فَكَانَ مَالًا وَالْمَالُ مَحَلٌّ لِلْبَيْعِ بِخِلَافِ الْعَذْرَةِ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهَا مَخْلُوْطًا وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْمَخْلُوْطِ هُوَ الْمَرْوِىُّ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَكَذَا لَا يَجُوْزُ الْاِنْتِفَاعُ بِالْمَخْلُوْطِ لَا بِغَيْرِ الْمَخْلُوْطِ فِى الصَّحِيْحِ وَالْمَخْلُوْطُ بِمَنْزِلَةِ زَيْتٍ خَالَطَتْهُ النَّجَاسَةُ قَالَ : وَمَنْ عَلِمَ بِجَارِيَةٍ اَنَّهَا لِرَجُلٍ فَرَاٰى اٰخَرَ يَبِيْعُهَا وَقَالَ وَكَّلَنِىْ صَاحِبُهَا بِبَيْعِهَا فَاِنَّهُ يَسَعُهُ اَنْ يَبْتَاعَهَا وَيَطَأَهَا لِأَنَّهُ اَخْبَرَ بِخَبَرٍ صَحِيْحٍ لَا مُنَازِعَ لَهُ وَقَوْلُ الْوَاحِدِ فِى الْمُعَامَلَاتِ مَقْبُوْلٌ عَلٰى اَىِّ وَصْفٍ كَانَ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَكَذَا اِذَا قَالَ اِشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ اَوْ وَهَبَهَا لِىْ اَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَىَّ لِمَا قُلْنَا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গোবর [যা সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা যায়] বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে পায়খানা বিক্রি করা মাকরূহ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, গোবর বিক্রি করাও জায়েজ নয়। কেননা গোবর মৌলিকভাবে নাপাক। সুতরাং তা পায়খানা ও দাবাগাতের পূর্বের চামড়া সদৃশ হলো। আমাদের দলিল হলো, গোবর একটি অতি উপকারী বস্তু। কেননা গোবর জমিনের মধ্যে উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য দেওয়া হয়। সুতরাং তা মাল হিসেবে সাব্যস্ত হলো। আর মাল বেচাকেনার উপযুক্ত, কিন্তু পায়খানার বিষয়টি এমন নয়। কেননা তা মিশ্রিত অবস্থায় উপকারী বস্তু। অবশ্য মিশ্রিত অবস্থায় পায়খানা বিক্রি জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে এমনটি বর্ণিত আছে এবং এটাই সহীহ। অনুরূপভাবে সহীহ মতানুযায়ী মিশ্রিত পায়খানা ব্যবহার জায়েজ, অমিশ্রিত জায়েজ নয়। মিশ্রিত পায়খানা ঐ তেলের মতো যাতে নাপাকী মিশেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি একটি দাসী সম্পর্কে জানে যে, দাসীটি অমুক ব্যক্তির। অতঃপর অপর ব্যক্তিকে দাসীটি বিক্রি করতে দেখল। অবশ্য তখন অপর ব্যক্তি বলল যে, দাসীকে বিক্রি করতে দাসীর মালিক আমাকে উকিল [দায়িত্বশীল] বানিয়েছে তাহলে তার জন্য সেটি ক্রয় করা এবং এর সাথে সহবাস করা জায়েজ। কেননা সে সঠিক সংবাদ দিয়েছে এবং তার সংবাদের কোনো প্রতিবাদকারীও নেই। মুআমালাতের ক্ষেত্রে একজনের সংবাদই গ্রহণযোগ্য, চাই তা যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন। এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তদ্রূপ [তার থেকে ক্রয় করা যাবে] যদি সে বলে যে, মালিক থেকে আমি ক্রয় করেছি অথবা সে আমাকে দান করেছে অথবা সে আমাকে সদকা হিসেবে দিয়েছে। ঐ দলিলের ভিত্তিতে যা আমরা [এইমাত্র] বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ قَالَ وَلَا بَأْسَ الخ : এ অনুচ্ছেদে বেচাকেনার মধ্যে যে সব বিষয়াদি মাকরূহ সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার (র.) প্রথমে গোবর বিক্রির মাসআলা এনেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গোবর বিক্রি করা জায়েজ। পক্ষান্তরে মানুষের পায়খানা বিক্রি করা মাকরূহ। এটা আহনাফের অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে পায়খানার মতো গোবর বিক্রি করাও মাকরূহ। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মতও তাই।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : গোবর মৌলিকভাবে একটি নাপাক বস্তু। সুতরাং এটা পায়খানা ও দাবাগতের পূর্বে কাঁচা চামড়ার মতো হলো।

আহনাফের দলিল : আমাদের দলিল হলো, গোবর একটি উপকারী বস্তু। জমিনে সার হিসেবে গোবর ব্যবহার হয়, তাতে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই গোবরকে একপ্রকার মাল হিসেবে গণ্য করা যায়। আর যে কোনো মাল বিক্রি করা যেহেতু জায়েজ তাই গোবর বিক্রি করাও জায়েজ।

আর পায়খানা বালু বা মাটির সাথে মিশ্রিত করে বিক্রি করা হলে তাও জায়েজ। কেননা মিশ্রিত অবস্থায় পায়খানা উপকারী বস্তু বলে সাব্যস্ত হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে মাসআলাটি বর্ণিত আছে এবং এটাই সহীহ বা বিশুদ্ধ অভিমত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এটাই সহীহ একথা বলে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত অভিমতটি যে শুদ্ধ নয় তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, অমিশ্রিত পায়খানাও ব্যবহার করা জায়েজ।
উভয় বর্ণনা ফকীহ আবুল লাইছ (র.) আল জামিউস সাগীর গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। -[সূত্র বিনায়া]

قَوْلُهُ وَالْمَخْلُوطُ بِمَنْزِلَةِ زَيْتٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, বালু বা মাটি মিশ্রিত পায়খানা নাপাক মিশ্রিত তেলের মতো। অর্থাৎ নাপাক মিশ্রিত তেল যেমন প্রদীপ ইত্যাদি জ্বালানোর জন্য বিক্রি করা যায় তদ্রূপ মাটি ও বালু মিশ্রিত পায়খানা বিক্রি করাও জায়েজ।

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ عَلِمَ بِجَارِيَةٍ الخ : বক্ষ্যমাণ ইবারতে বেচাকেনা সম্পর্কিত আরেকটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। আর মাসআলাটি একটি মূলনীতির সাথে সম্পর্কিত। মূলনীতিটি হলো, মুআমালা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির কথা বা সংবাদই যথেষ্ট। চাই সে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা সাধারণ লোক হোক। এ মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি দাসীকে ভালোভাবেই চিনে যে, দাসীটি খালেদের। কিন্তু রাশেদ নামের এক ব্যক্তিকে দেখল সে দাসীটি বিক্রি করতে বাজারে এনেছে। তখন সে রাশেদকে জিজ্ঞাসা করল যে, তুমি কিভাবে একে আনলে? উত্তরে রাশেদ বলল, এর মালিক [খালেদ] আমাকে এটি বিক্রি করার দায়িত্ব দিয়েছে। ব্যাস এতটুকু কথার ভিত্তিতেই রাশেদ থেকে দাসীটি ক্রয় করা, তারপর দাসীর সাথে সহবাস করা এ ব্যক্তির জন্য জায়েজ। কেননা রাশেদ দাসী সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছে সেটি সহীহ এবং এ সংবাদের বক্তব্যকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ এর বিরুদ্ধ বা ব্যতিক্রম কোনো কিছু জানা নেই, তাই এ সংবাদ গ্রহণযোগ্য। কেননা লেনদেনের ক্ষেত্রে একজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য হয়। আর সে সংবাদ যে কোনোভাবে দেওয়া হোক না কেন। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, রাশেদ যদি প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে একথা বলে যে, খালেদ আমাকে উকিল বানিয়েছে তাহলে যে হুকুম হবে, একই হুকুম হবে যদি বলে আমি খালেদ থেকে ক্রয় করেছি। অথবা যদি বলে খালেদ আমাকে হেবা করেছে। অথবা যদি বলে, খালেদ আমাকে দান-সদকা করেছে ইত্যাদি।

মোটকথা, রাশেদ যাই বলুক তা একটি সংবাদ বা খবর বলে গণ্য হবে। আর মুআমালাতের ক্ষেত্রে একজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য।

وَهٰذَا اِذَا كَانَ ثِقَةً وَكَذَا اِذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ وَاَكْبَرُ رَأْيِهِ اَنَّهُ صَادِقٌ لِاَنَّ عَدَالَةَ الْمُخْبِرِ فِى الْمُعَامَلَاتِ غَيْرُ لَازِمَةٍ لِلْحَاجَةِ عَلٰى مَا مَرَّ وَاِنْ كَانَ اَكْبَرُ رَأْيِهِ اَنَّهُ كَاذِبٌ لَمْ يَسَعْ لَهُ اَنْ يَتَعَرَّضَ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ لِاَنَّ اَكْبَرَ الرَّأْيِ يُقَامُ مَقَامَ الْيَقِيْنِ وَكَذَا اِذَا لَمْ يَعْلَمْ اَنَّهَا لِفُلَانٍ وَلٰكِنْ اَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْيَدِ اَنَّهَا لِفُلَانٍ وَاَنَّهُ وَكَّلَهُ بِبَيْعِهَا اَوِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَالْمُخْبِرُ ثِقَةٌ قُبِلَ قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً يُعْتَبَرُ اَكْبَرُ الرَّأْيِ لِاَنَّ اِخْبَارَهُ حُجَّةٌ فِىْ حَقِّهِ .

অনুবাদ : এ [আলোচ্য সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার] বিধান প্রযোজ্য হয় যদি সংবাদদাতা বিশ্বস্ত হয়। তদ্রূপ যদি সংবাদদাতা অবিশ্বস্ত হয়, কিন্তু শ্রোতার মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে, সংবাদদাতা সত্যাবাদী [তাহলেও সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে]। কেননা লেনদেনের ক্ষেত্রে সংবাদদাতার ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয় নয়। এজন্য যে, এ ধরনের [অবিশ্বস্ত ব্যক্তির] সংবাদ গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। ইতঃপূর্বে এর সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি শ্রোতার এক্ষেত্রে প্রবল ধারণা হয় যে, সংবাদদাতা মিথ্যাবাদী তাহলে এ সংবাদের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া তার জন্য আর জায়েজ নয়। কেননা প্রবল ধারণা নিশ্চিত বিশ্বাসের সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যদি এটা জানা না থাকে যে, দাসীটি অমুকের, কিন্তু বর্তমান দখলদার তাকে বলে যে, 'এটা অমুকের এবং সে তাকে এটা বিক্রির দায়িত্ব দিয়েছে' অথবা 'সে তার থেকে ক্রয় করেছে'। আর সংবাদদাতাও সত্যবাদী তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য। আর যদি সে সত্যবাদী না হয় তাহলে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ফয়সালা করা হবে। কেননা তার [যার দখলে দাসী আছে] কথা নিজের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ : وَهٰذَا اِذَا كَانَ ثِقَةً وَكَذَا الخ : চলমান ইবারতে পূর্বের মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের দাসীর ব্যাপারে এ সংবাদ দেয় যে, সে তাকে দাসী বিক্রি করার দায়িত্ব দিয়েছে অথবা সে দাসীটি তার থেকে ক্রয় করেছে ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তির খবর গ্রহণযোগ্য হবে। আর বর্তমান ইবারতে বলা হচ্ছে যে, এরূপ সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে যদি সেই সংবাদদাতা বিশ্বস্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি সংবাদদাতা অবিশ্বস্ত হয় তাহলে কি হবে? এ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি সংসবাদাতা অবিশ্বস্ত হয় তাহলে সংবাদটির ব্যাপারে ফয়সালা করা হবে শ্রোতার প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ যদি শ্রোতার প্রবল ধারণা হয় যে, সংবাদদাতা সংবাদটির ব্যাপারে সত্যবাদী তাহলেই সে সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে অন্যথায় গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এখানে তো অবিশ্বস্ত তথা ন্যায়পরায়ণহীন ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণযোগ্য হচ্ছে?

উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, লেনদেনের সংবাদের ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ত হওয়া কোনো সমস্যা নয়। কারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ত ব্যক্তির সংবাদ শরিয়ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বিশদভাবে বিষয়টি আলোচনা করেছি।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ اَكْبَرُ رَأْيِهِ اَنَّهُ كَاذِبٌ الخ : আর যদি শ্রোতার প্রবল ধারণা হয় যে, সংবাদদাতা আলোচ্য সংবাদের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী তাহলে তার সংবাদের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ শ্রোতার জন্য অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ শ্রোতা এরূপ সংবাদ শ্রবণের পর এ দাসী দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোনো চিন্তা করতে পারবে না। কেননা যেখানে নিশ্চিত বিশ্বাস বা জ্ঞান লাভের সুযোগ থাকে না সেখানে শরিয়ত প্রবল ধারণাকে নিশ্চিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের স্থলাভিষিক্ত করেছে। অতএব, প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ফয়সালা করা হবে। যেমন– এক লোকের ঘরে রাতের বেলায় অপর কোনো লোক তরবারি উঁচু করে ঢুকল। এমতাবস্থায় যদি ঘরের মালিকের এরূপ ধারণা হয় যে, লোকটি ডাকাত। আর সে তাকে হত্যা করার জন্য অথবা তার মাল ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করেছে তাহলে ঘরের মালিকের জন্য সেই লোকটিকে হত্যা করা জায়েজ। পক্ষান্তরে যদি তার এমন ধারণা হয় যে, লোকটি ডাকাত দলের ভয়ে পলায়ন করছে তাহলে তাকে হত্যা করা কিছুতেই জায়েজ নয়।

প্রবল ধারণা যে, নিশ্চিত বিশ্বাসের সমপর্যায়ে গণ্য হয় তার দলিল কুরআনের একটি আয়াতাংশ। তা এই যে, فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ [যদি তোমরা তাদেরকে মুমিন বলে জান] এ আয়াতে প্রবল ধারণা (ظَنّ) -কে عِلْم বলে প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা অপরিচিত কোনো ব্যক্তির ঈমান সম্পর্কে প্রবল ধারণা হয়, নিশ্চিতজ্ঞান লাভ হয় না।

আরেকটি দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীস। রাসূল ﷺ ওয়াবিসা (রা.) -কে লক্ষ্য করে বলেন–

ضَعْ يَدَكَ عَلَى صَدْرِكَ وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ فَمَا حَاكَ فِىْ صَدْرِكَ فَدَعْهُ وَإِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ بِهِ .

অর্থাৎ 'তুমি তোমার বুকে হাত রেখে তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। অতঃপর তোমার মনে যে ব্যাপারে সন্দেহ হয় তা বর্জন কর– যদিও তা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে লোকেরা ফতোয়া দেয়।'

এ হাদীসে রাসূল ﷺ মনের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলেছেন। –[সূত্র বিনায়া]

মোটকথা, সেক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না যেক্ষেত্রে শরিয়ত প্রবল ধারণাকে নিশ্চিতজ্ঞানের স্থলাভিষিক্ত করেছে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الخ : আর যদি ক্রেতার জানা না থাকে যে দাসীর মালিক কে? কিন্তু যার হাতে বর্তমানে দাসীটি রয়েছে সে [রাশেদ] তাকে বলল যে, দাসীটি খালেদের। খালেদ আমাকে দাসী বিক্রি করার দায়িত্ব দিয়েছে অথবা আমি খালেদ থেকে এটি ক্রয় করেছি। এমতাবস্থায় যদি সংবাদদাতা [বিক্রেতা] বিশ্বস্ত হয় তাহলে সংবাদদাতার খবর গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হবে। আর যদি সংবাদদাতা অবিশ্বস্ত হয় তাহলে ক্রেতা তার প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে। যেমন– ইতঃপূর্বে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এরপর লেখক প্রবল ধারণার ভিত্তিতে কেন সিদ্ধান্ত নেবে এর কারণ উল্লেখ করে বলেন– لِاَنَّ إِخْبَارَهُ حُجَّةٌ فِىْ حَقِّهِ সংবাদদাতা তার নিজের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছিল যে, সে দাসীটির মালিক নয়; বরং এর মালিক হলো খালেদ নামের এক ব্যক্তি। তার এ খবর গ্রহণযোগ্য ছিল। [কেননা খবরটি তার নিজের ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে।]

পরে যে সংবাদ দিয়েছে অর্থাৎ খালেদ তাকে এটি বিক্রি করার দায়িত্ব দিয়েছে অথবা সে তার থেকে খরিদ করেছে। এ সংবাদ দু'টো মূলত: খালেদের ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সংবাদটি খালেদের ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে। তাই এ সংবাদটি দলিল ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু এখানে নিশ্চিতজ্ঞান লাভের সুযোগ নেই তাই প্রবল ধারণাকে দলিল হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

وَاِنْ لَمْ يُخْبِرْهُ صَاحِبُ الْيَدِ بِشَيْءٍ فَاِنْ كَانَ عَرَفَهَا لِلْاَوَّلِ لَمْ يَشْتَرِهَا حَتّٰى يَعْلَمَ اِنْتِقَالَهَا اِلٰى مِلْكِ الثَّانِىْ لِاَنَّ يَدَ الْاَوَّلِ دَلِيْلُ مِلْكِهِ وَاِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ ذٰلِكَ لَهُ اَنْ يَشْتَرِيَهَا وَاِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ فَاسِقًا لِاَنَّ يَدَ الْفَاسِقِ دَلِيْلُ الْمِلْكِ فِىْ حَقِّ الْفَاسِقِ وَالْعَدْلِ وَلَمْ يُعَارِضْهُ مُعَارِضٌ وَلَا مُعْتَبَرَ بِاَكْبَرِ الرَّأْىِ عِنْدَ وُجُوْدِ الدَّلِيْلِ الظَّاهِرِ ـ

অনুবাদ : আর যদি বর্তমান দখলদার তাকে কোনো কিছু না বলে এবং ক্রেতা জানতে পারে যে, দাসীটি প্রথম ব্যক্তির তাহলে সে দখলদারের হাত থেকে দাসীটি ক্রয় করবে না যে পর্যন্ত না সে দাসীটির মালিকানা দ্বিতীয়জনের কাছে বদল হওয়ার বিষয়ে অবগত হবে। কেননা প্রথমজনের দখল তার মালিকানার দলিল। আর যদি প্রথমজনের বলে না জানে তাহলে তার জন্য দাসী ক্রয় করা জায়েজ। যদিও দখলদার ফাসেক হোক না কেন। কেননা ফাসেকের দখল ফাসেকের আদিল বা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ব্যাপারে মালিকানার দলিল। আর এক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতাও নেই। প্রকাশ্য দলিল থাকা অবস্থায় প্রবল ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يُخْبِرْهُ صَاحِبُ الْيَدِ الخ : চলমান ইবারতে ইতঃপূর্বে যে মাসআলার অবতারণা করা হয়েছিল তারই শাখাপ্রশাখাগত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলা : যদি দাসী বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বাজারে উপস্থিত বিক্রেতা যার হাতে দাসী রয়েছে সে দাসী সম্পর্কে কোনো কিছু না বলে, [যেমন– অমুক আমাকে দাসী বিক্রি করার দায়িত্ব দিয়েছে কিংবা অমুক থেকে দাসী ক্রয় করে এটা বিক্রি করতে এনেছি] কিন্তু ক্রেতা যে কোনোভাবে বুঝতে পারে যে, দাসীটি খালেদের। তাহলে ক্রেতার জন্য সে দাসী ক্রয় করা বৈধ নয়, যে পর্যন্ত না সে খালেদের মালিকানা থেকে রাশেদের মালিকানায় দাসীটি হস্তান্তরিত হয়েছে এ সম্পর্কে অবগত হয়। কেননা সে জানতে পেরেছে যে, দাসীটি খালেদের হাতে [দখলে] ছিল। আর খালেদের দাসীটি এখন যেহেতু রাশেদের হাতে– এমতাবস্থায় রাশেদের হাতে কিভাবে দাসীটি আসল? সে সম্পর্কে অবগত হওয়া ছাড়া দাসীটি ক্রয় করা ক্রেতার জন্য বৈধ নয়। [কেননা হতে পারে রাশেদ চুরি কিংবা গসব করে দাসীটি এনেছে।]

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ ذٰلِكَ الخ : আর যদি [বিক্রেতা কোনোকিছু না বলে এবং] ক্রেতা ও দাসীর পূর্বাবস্থা সম্পর্কে কোনো কিছু না জানে তাহলে তার জন্য দাসীটি খরিদ করাতে কোনো বাঁধা নেই।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ فَاسِقًا الخ : যদিও দখলদার বা যার হাতে দাসী আছে সে ফাসেক হোক না কেন। অর্থাৎ দখল বা হাতে থাকা মালিকানার দলিল, চাই দখলদার ফাসেক হোক কিংবা আদেল বা ন্যায়পরায়ণ হোক। এখানে ফাসেক ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার মাঝে কোনো তারতম্য নেই।

মোটকথা দখলের ভিত্তিতে মালিকানা সাব্যস্ত হয় যদি বিপক্ষ কোনো দলিল না থাকে। এখানে যেহেতু বিপক্ষ কোনো দলিল নাই তাই দখলের ভিত্তিতে মালিকানার ফয়সালা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِاَكْبَرِ الرَّأْىِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় প্রবল ধারণাকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়নি। অর্থাৎ এখানে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে কোনো ফয়সালা গ্রহণ করা যাবে না। কেননা এখানে এর চেয়ে শক্তিশালী দলিল রয়েছে। আর তা হলো মালিকানার জন্য দখল। অতএব, দখলের ভিত্তিতে মালিকানা ধর্তব্য হবে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।

বি. দ্র. لِاَنَّ يَدَ الْفَاسِقِ دَلِيْلُ الْمِلْكِ فِىْ حَقِّ الْفَاسِقِ وَالْعَدْلِ উক্ত ইবারতের সাধারণ অর্থ হলো– ফাসেকের দখল তার মালিকানার দলিল। তাই ক্রেতা ফাসেক হোক কিংবা আদেল [ন্যায়পরায়ণ] হোক। অথচ এখানে ইবারতের অর্থ এমন হওয়া উচিত যে, ফাসেকের দখল হোক কিংবা আদিলের দখল হোক উভয়ের দখলই মালিকানার দলিল। দখল মালিকানার দলিল হওয়ার ক্ষেত্রে ফাসেক ও আদেলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এজন্য লেখকের ইবারত নিম্নরূপ হওয়া উচিত ছিল বলে আল্লামা আইনী (র.) মন্তব্য করেন, لِاَنَّ الْيَدَ دَلِيْلُ الْمِلْكِ فِىْ حَقِّ الْفَاسِقِ وَالْعَادِلِ [দখল মালিকানার দলিল ফাসেক ও আদেল উভয়ের ক্ষেত্রে বরাবর।] অথবা لِاَنَّ يَدَ الْفَاسِقِ دَلِيْلُ الْمِلْكِ وَالْفَاسِقُ وَالْعَادِلُ فِيْهِ سَوَاءٌ [ফাসেকের দখল মালিকানার দলিল। ফাসেক ও আদিল এক্ষেত্রে সমান সমান।]

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يَمْلِكُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَحِينَئِذٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَنَزَّهَ وَمَعَ ذٰلِكَ لَوْ اِشْتَرَاهَا يُرْجٰى أَنْ يَكُونَ فِي سَعَةٍ مِنْ ذٰلِكَ لِاعْتِمَادِهِ الدَّلِيلَ الشَّرْعِيَّ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَتَاهُ بِهَا عَبْدًا وَأَمَةً لَمْ يَقْبَلْهَا وَلَمْ يَشْتَرِهَا حَتّٰى يَسْأَلَ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا مِلْكَ لَهُ فَيَعْلَمُ أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لِغَيْرِهِ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلَاهُ أَذِنَ لَهُ وَهُوَ ثِقَةٌ قُبِلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً يُعْتَبَرُ أَكْبَرُ الرَّأْيِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ لَمْ يَشْتَرِهَا لِقِيَامِ الْحَاجِزِ فَلَابُدَّ مِنْ دَلِيلٍ ـ

অনুবাদ : তবে যদি তার মতো ব্যক্তি এরূপ বস্তুর মালিক হওয়ার যোগ্য না হয় তখন মোস্তাহাব হলো ঐ সকল বস্তু বেচাকেনা থেকে বেঁচে থাকা মোস্তাহাব। কিন্তু এরপরেও যদি ক্রেতা তার থেকে দাসী ক্রয় করে নেয় তাহলে আশা করা যায় তার জন্য এরূপ করা জায়েজ হবে। কেননা সে শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে তা করেছে। আর যদি দাসী নিয়ে কোনো গোলাম অথবা বাঁদি আসে তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না এবং তার থেকে ঐ দাসী জিজ্ঞাসাবাদ করার আগে ক্রয়ও করবে না। কেননা দাসের কোনো মালিকানা নেই। সুতরাং বুঝাই যায় যে, এর মালিকানা অন্য কারো। আর যদি সে জানায় যে, তার মনিব তাকে দাসীটি বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছে এবং সে বিশ্বস্ত তাহলে তার খবর গ্রহণযোগ্য। আর যদি বিশ্বস্ত না হয় তাহলে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আর যদি তার কোনো ধারণা না হয় তাহলে প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে দাসী ক্রয় করবে না; বরং এখানে দলিল উপস্থাপন করা আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ الخ : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, যার হাতে বিক্রয়ের পণ্য থাকে তার কথার ভিত্তিতে তার থেকে পণ্য ক্রয় করা যাবে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, যদি বিক্রয় পণ্য এমন মূল্যবান বস্তু হয় যে, বিক্রেতা এর মালিক হওয়া বাহ্যত অসম্ভব মনে হয়। যেমন– হতদরিদ্র ব্যক্তি মুক্তার মালা বিক্রি করতে আনল কিংবা মূর্খ ব্যক্তির হাতে উচ্চজ্ঞানের কোনো বই ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য উচিত হবে এমন ব্যক্তি থেকে পণ্য ক্রয় না করা। কিন্তু তারপরেও যদি ক্রেতা এরূপ গোলাম থেকে কোনো কিছু ক্রয় করে তাহলে মাসআলাগতভাবে তার এ কেনা বৈধ। কেননা ক্রেতা শরিয়তের অনুমোদিত দলিলের ভিত্তিতে তা ক্রয় করেছে। সে দলিল হলো ক্রেতার দলিল। দখল মালিকানার প্রমাণ বহন করে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَتَاهُ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে নতুন একটি মাসআলার আলোচনা শুরু করেছেন। মাসআলাটি হলো, যদি কোনো গোলাম বা বাঁদি অন্য আরেকটি দাসী নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে হাজির হয় তাহলে সে দাসীর মালিকানা স্বত্ব কার এবং গোলাম এটা নিয়ে আসল কিভাবে? এ বিষয়ে অবগত না হয়ে তা কেনাবেচা করা যাবে না। কারণ কোনো দাস বা দাসীর পক্ষে কোনো বস্তুর মালিক হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের সাথে যে বস্তু রয়েছে তা নিশ্চয় অন্যের অধিকারভুক্ত। আর তাই উক্ত মালের ক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নয়। অর্থাৎ উক্ত দাসীকে হাদিয়া কবুল করা এবং এটা ক্রয় করা যাবে না। অবশ্য যদি জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে বলে যে, আমার মনিব আমাকে এটা বিক্রি করার বা হাদিয়া দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে তাহলে এটা ক্রয় করা কিংবা হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ হবে।

যদি সংবাদদাতা গোলাম বা বাঁদি বিশ্বস্ত হয় তাহলে বিধান কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে যদি সংবাদদাতা অবিশ্বস্ত হয় তাহলে ক্রেতা তার প্রবল ধারণা (غَالِبُ الظَّنِّ) -এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

আর যদি ক্রেতার ধারণা কোনোদিকেই প্রবল বা শক্তিশালী না হয়; বরং তার মনে দোদুল্যমান অবস্থা বিরাজ করে তাহলে বিক্রেতার গোলাম এ প্রতিবন্ধকতার কারণে বেচাকেনা না করা উচিত হবে। তারপরও যদি গোলামের কথা সত্য বলে কোনো দলিল বা সাক্ষ্য পাওয়া যায় তখন ক্রয় করা বৈধ সাব্যস্ত হবে।

قَالَ : وَلَوْ أَنَّ إِمْرَأَةً أَخْبَرَهَا ثِقَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْغَائِبَ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ثَلٰثًا أَوْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ وَاتَاهَا بِكِتَابٍ مِنْ زَوْجِهَا بِالطَّلَاقِ وَلَا تَدْرِىْ أَنَّهُ كِتَابُهُ أَمْ لَا إِلَّا أَنَّ أَكْبَرَ رَأْيِهَا أَنَّهُ حَقٌّ يَعْنِىْ بَعْدَ التَّحَرِّىْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَعْتَدَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجَ لِأَنَّ الْقَاطِعَ طَارٍ وَلَا مُنَازِعَ -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো মহিলাকে কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি এ মর্মে সংবাদ প্রদান করে যে, তার অনুপস্থিত স্বামী মারা গেছে অথবা তাকে তিন তালাক দিয়েছে। অথবা যদি সংবাদদাতা অবিশ্বস্ত হয় কিন্তু সে মহিলার স্বামীর তালাক সংক্রান্ত পত্র নিয়ে আসে আর এদিকে মহিলা জানে না যে, পত্রটি তার স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত কিনা? তবে প্রবল ধারণা হয় যে, এটি সত্য অর্থাৎ চিন্তাভাবনার পর [এমন মনে হয়] তাহলে তার ইদ্দত পালনের পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোনো সমস্যা নেই। কেননা বিবাহ বিচ্ছেদকারী আপতিত হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধ কোনো বক্তব্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَهَا ثِقَةٌ الخ : উপরে উল্লিখিত ইবারতের মাসআলা এবং তার পরবর্তী কয়েকটি মাসআলা كِتَابُ الْاِسْتِحْسَانِ থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে লেখক জামিউস সাগীরের মাসায়েলের সংশ্লিষ্ট হিসেবে এগুলোকে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীরে উল্লেখ করেন যে, যদি কোনো মহিলাকে কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি এসে এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, তোমার অনুপস্থিত স্বামী মারা গেছে অথবা বলে যে, তোমার স্বামী তোমাকে তিন তালাক দিয়েছে। অথবা কোনো অবিশ্বস্ত ব্যক্তি এর অনুরূপ সংবাদ তার স্বামীর পক্ষে পত্রের মাধ্যমে জানায়। অবশ্য মহিলা জানে না যে, পত্রটি তার স্বামীর কি না। কিন্তু মহিলার চিন্তাভাবনার পর প্রবল ধারণা হয় যে, পত্রটি সঠিক বা পত্রের বক্তব্য সত্য।

উপরিউক্ত উভয় সুরতে মহিলা তার স্বামী মারা গেছে মনে করে কিংবা তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে মনে করে ইদ্দত পালন করবে, অতঃপর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এতে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা নেই। কেননা তার বিবাহ বিচ্ছেদকারী তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যুর আগমন ঘটেছে। আর পুরাতন বৈবাহিক সম্পর্ক এটি পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হতে পারছে না। কারণ বৈবাহিক সম্পর্ক চিরস্থায়ী কিছু নয় [যা ভাঙ্গতে পারে না।] অতএব তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যু দ্বারা বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এটাকেই মুসান্নিফ (র.) لَا مُنَازِعَ বলে ব্যক্ত করেছেন।

وَكَذَا لَوْ قَالَتْ لِرَجُلٍ طَلَّقَنِيْ زَوْجِيْ وَانْقَضَتْ عِدَّتِيْ فَلَا بَأْسَ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَكَذَا إِذَا قَالَتِ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلٰثُ اِنْقَضَتْ عِدَّتِيْ وَتَزَوَّجْتُ بِزَوْجٍ اٰخَرَ وَ دَخَلَ بِيْ ثُمَّ طَلَّقَنِيْ وَانْقَضَتْ عِدَّتِيْ فَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَتَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْاَوَّلُ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ جَارِيَةٌ كُنْتُ اَمَةً لِفُلَانٍ فَاَعْتَقَنِيْ لِاَنَّ الْقَاطِعَ طَارٍ ـ وَلَوْ اَخْبَرَهَا مُخْبِرٌ اَنَّ اَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ فَاسِدًا اَوْ كَانَ الزَّوْجُ حِيْنَ تَزَوَّجَهَا مُرْتَدًّا اَوْ اَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهٗ حَتّٰى يَشْهَدَ بِذٰلِكَ رَجُلَانِ اَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَكَذَا اِذَا اَخْبَرَهٗ مُخْبِرٌ اَنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا وَهِيَ مُرْتَدَّةٌ اَوْ اُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِاُخْتِهَا وَاَرْبَعٍ سِوَاهَا حَتّٰى يَشْهَدَ بِذٰلِكَ عَدْلَانِ لِاَنَّهٗ اَخْبَرَ بِفَسَادٍ مُقَارِنٍ وَالْاِقْدَامُ عَلَى الْعَقْدِ يَدُلُّ عَلٰى صِحَّتِهٖ وَاِنْكَارِ فَسَادِهٖ فَيَثْبُتُ الْمُنَازِعُ بِالظَّاهِرِ ـ

অনুবাদ : অনুরূপ হুকুম হবে যদি কোনো মহিলা কোনো লোককে উদ্দেশ্য করে বলে যে, আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে এবং আমার ইদ্দত শেষ হয়েছে। সুতরাং সে লোকের জন্য তাকে বিবাহ করাতে কোনো সমস্যা নেই। অনুরূপভাবে যদি তিন তালাকপ্রাপ্ত কোনো মহিলা বলে, আমার ইদ্দত শেষ হয়েছে তারপর অন্যস্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি এবং সে আমার সাথে সহবাস করেছে অতঃপর আমাকে তালাক দিয়েছে তারপর আমার ইদ্দতও শেষ হয়েছে। সুতরাং প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করাতে কোনো সমস্যা নেই। তদ্রূপ যদি কোনো দাসী বলে যে, আমি অমুকের দাসী ছিলাম অতঃপর সে আমাকে আজাদ করেছে। কেননা সম্পর্কচ্ছেদকারী আপতিত হয়েছে। যদি কোনো সংবাদদাতা [কোনো মহিলাকে] এ সংবাদ দেয় যে, বিবাহটি মূলে ফাসেদ ছিল অথবা বিবাহের সময় স্বামী মুরতাদ ছিল অথবা তার স্বামী তার দুধ ভাই তাহলে এ ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যদি এ ব্যাপারে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষ্য দেয় [তাহলে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।] অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো সংবাদদাতা এ খবর দেয় যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে মুরতাদ অবস্থায় তাকে বিবাহ করেছ অথবা সে তোমার দুধ বোন তাহলে এ ব্যক্তি তার স্ত্রীর বোনকে কিংবা সে ছাড়া অন্য চারজন মহিলা বিবাহ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষ্য না দেয়। কেননা এ ব্যক্তি বিবাহ নষ্ট হওয়ার এমন সংবাদ দিয়েছে, যা বিবাহ চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। আলোচ্য অবস্থাগুলোতে বিবাহ করতে উদ্যত হওয়া বিবাহের চুক্তিটি শুদ্ধ তা প্রমাণ করে এবং তা ফাসেদ হওয়াকে অস্বীকার করে। সুতরাং বাহ্যিকভাবে বিপরীত দলিল পাওয়া গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ لِرَجُلٍ الخ : উপরের ইবারতে তিনটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে–

১ম মাসআলা : কোনো এক মহিলা অন্য এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলল, আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে এবং আমার ইদ্দত শেষ হয়েছে। [অতএব আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে বিবাহ করতে পারেন] মহিলার এ খবরকে বিশ্বাস করত উক্ত ব্যক্তির জন্য তাকে বিবাহ করা বৈধ– যদি তার খবর প্রবল ধারণানুযায়ী সত্য বলে মনে হয়। কেননা এ খবরের বিপরীত কিছু জানা নেই।

২য় মাসআলা : তিন তালাকপ্রাপ্তা এক মহিলা বলল, আমার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আমি অন্য এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি এবং সে আমার সাথে সহবাসও করেছে। অতঃপর সে আমাকে তালাক দিয়েছে এবং সে তালাকের ইদ্দতও শেষ হয়েছে। মহিলার এ খবরের ভিত্তিতে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে বিবাহ করা বৈধ হবে। কেননা এখানেও মহিলার খবরটি এমন বিষয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে বিপরীত কোনো কিছু জানা নেই।

৩য় মাসআলা : কোনো দাসী বলল, আমি অমুকের বাঁদি ছিলাম আমাকে আমার মনিব আজাদ করে দিয়েছে এখন তাকে বিবাহ করা বৈধ। কেননা এখানে গোলামির সম্পর্ক নষ্টকারী বিষয়টি নতুন। আর তা হলো গোলামি দূর করে দেওয়া বা আজাদ করে দেওয়া। এর বিপরীতে কোনো দলিল নেই তাই মহিলার কথা সত্য ধরে নেওয়া হবে।

قَوْلُهُ : وَلَوْ اَخْبَرَهَا مُخْبِرٌ اَنَّ اَصْلَ الخ : উপরের ইবারতে পূর্ববর্তী মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি সুরত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম সুরত : যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে এ সংবাদ দেয় যে, তার যে বিবাহ হয়েছে তা মূলে ফাসেদ ছিল।

দ্বিতীয় সুরত : বিবাহের সময় মহিলার স্বামী মুরতাদ ছিল।

তৃতীয় সুরত : মহিলার স্বামী মহিলার দুধ-ভাই হয়।

এ তিনটি সুরতের প্রত্যেকটি বিষয়ই বিবাহ বিচ্ছেদকারী। কিন্তু এ বিবাহ বিচ্ছেদকারী বিষয়গুলো পরবর্তীতে দেখা দেয়নি; বরং বিবাহ সংঘটিত হওয়ার সময় সেগুলো বিদ্যমান ছিল। অতএব, মূলনীতি অনুযায়ী এগুলো দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার জন্য শরিয়ত নির্ধারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে হবে। অর্থাৎ দুজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য অথবা একজন পুরুষ ও দুজন ন্যায়পরায়ণ মহিলার সাক্ষ্য হাজির করে উপরিউক্ত বিষয়গুলো প্রমাণ করতে হবে। যদি তা প্রমাণিত হয় তাহলে বিবাহ বাতিল হবে অন্যথায় বিবাহ বহাল থাকবে। আর বিবাহ বহাল থাকলে উক্ত মহিলার স্বামীর জন্য স্ত্রীর বোন বিবাহ করা বৈধ হবে না এবং এ স্ত্রী ছাড়া আরো চারজন বিবাহ করা বৈধ হবে না। কেননা একসাথে চারের অধিক স্ত্রী রাখা ইসলামে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

قَوْلُهُ وَالْاِقْدَامُ عَلَى الْعَقْدِ يَدُلُّ عَلٰى صِحَّتِهِ الخ : ইতঃপূর্বে যে মাসআলাগুলো আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোতে একজনের সংবাদের ভিত্তিতেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে দু কারণে। এক তো সে সব মাসআলাতে শাহাদাতের আবশ্যকতা ছিল না। দ্বিতীয়ত যে সংবাদের বিপরীত কোনো বিষয় ছিল না যা দ্বারা সে সংবাদের হুকুম বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

আলোচ্য মাসআলাতে শাহাদাতের আবশ্যকতা যেমন আছে তদ্রূপ সংবারে বিপরীত দলিল (مُنَازِعٌ) ও আছে।

উপরের ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) সেই বিপরীত দলিলের (مُنَازِعٌ-এর] প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তিনি বলেন, স্বামীর মুরতাদ হওয়া অথবা দুধ-ভাই ইত্যাদি হওয়া যদি বাস্তবে প্রমাণিত হতো তাহলে তো বিবাহ করার জন্য মেয়ে পক্ষ অগ্রসর হতো না। মেয়ে পক্ষ বিবাহ দেওয়ার জন্য অগ্রসর হওয়াই দলিল যে, বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে এবং আলোচ্য ফ্যাসাদগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

মোটকথা, আলোচ্য মাসআলায় একজনের সংবাদের ভিত্তিতে দু-কারণে বিবাহ ফাসেদ সাব্যস্ত হবে না। ১. এ জাতীয় বিষয় শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য ছাড়া প্রমাণিত হয় না। ২. সংবাদদাতার এ সংবাদের বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে।

بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوحَةُ صَغِيرَةً فَأُخْبِرَ الزَّوْجُ أَنَّهَا ارْتَضَعَتْ مِنْ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ حَيْثُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ فِيهِ لِأَنَّ الْقَاطِعَ طَارٍ وَالْإِقْدَامُ الْأَوَّلُ لَا يَدُلُّ عَلَى انْعِدَامِهِ فَلَمْ يَثْبُتِ الْمُنَازِعُ فَافْتَرَقَا وَعَلَى هٰذَا الْحَرْفِ يَدُورُ الْفَرْقُ وَلَوْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَا تُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهَا فِي يَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي أَنَّهَا لَهُ فَلَمَّا كَبُرَتْ لَقِيَهَا رَجُلٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَقَالَتْ أَنَا حُرَّةُ الْأَصْلِ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِتَحَقُّقِ الْمُنَازِعِ وَهُوَ ذُو الْيَدِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ.

অনুবাদ : তবে যদি বিবাহিত স্ত্রী শিশু হয়, আর স্বামীকে এ মর্মে সংবাদ দেওয়া হয় যে, সে [স্ত্রী] তার [স্বামীর] মা থেকে অথবা তার বোন থেকে [বিবাহের পর] দুধ পান করেছে তাহলে এখানে একজনের সংবাদই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বিবাহবিচ্ছেদকারী বিষয় আপতিত হয়েছে। আর বিবাহের প্রথম পদক্ষেপ দুধ পান না করা প্রমাণ করে না। সুতরাং এতে বিপরীত কিছু পাওয়া গেল না। এ দুটি মাসআলা স্বতন্ত্র সাব্যস্ত হলো। এ মূলনীতির ভিত্তিতে পার্থক্য তথা একজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার হুকুম আবর্তিত হতে থাকবে। নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে সক্ষম নয় এমন ছোট দাসী যদি কোনো ব্যক্তির অধীনে থাকে, আর সে দাবি করে যে দাসীটি তার, তারপর যখন দাসীটি বড় হয়ে অন্য শহরে গেল এবং তার সাথে আরেকটি লোকের সাক্ষাৎ হলো, অতঃপর সে বলল যে আমি মূলত আজাদ। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তির জন্য তাকে বিবাহ করা বৈধ নয় [এ ব্যাপারে] বিপরীত দাবি থাকার কারণে। আর তা হলো বর্তমান দখলদার। যে মাসআলাটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে তা এর ব্যতিক্রম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوحَةُ الخ : উপরের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) প্রথমে পূর্ববর্ণিত মাসআলার বিপরীত একটি মাসআলা আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, পূর্বে বলা হয়েছিল কোনো একজন লোক যদি এই মর্মে সংবাদ প্রদান করে যে, তোমার স্ত্রী তোমার দুধ-বোন তাহলে একজনের এ সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না।

আলোচ্য ইবারতে বলা হয়েছে যে, যদি স্বামীকে একজনে অনুরূপ সংবাদ দেয় অর্থাৎ কেউ বলল, তোমার স্ত্রী বিবাহের পর তোমার মায়ের বা বোনের দুধ পান করেছে, আর তার স্ত্রী নাবালিকা [শিশু] হয় তাহলে একজনের সংবাদই এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এখানে বিবাহ বিচ্ছেদকারী বিষয়টি পরবর্তীতে এসেছে। পক্ষান্তরে আগের সুরতে বিবাহবিচ্ছেদকারী বিষয়টি বিবাহের চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। দ্বিতীয়ত এখানে এ সংবাদের বিপরীত কোনো বিষয়ও নেই। অথচ এর আগের সুরতে এ সংবাদের বিপরীতে দলিল ছিল। কেননা এখানে বিবাহ করার পদক্ষেপ দুধ পান না করার দলিল বহন করে না; বরং দুধ পান করার ঘটনা তো পরে ঘটেছে। বিবাহ করার সময় দুধ পান করার বিষয়টি ছিল না।

পরবর্তীতে শিশুটি দুধ পান করায় বিবাহবিচ্ছেদকারী বিষয় আপতিত হয়েছে । মোটকথা, যেহেতু বিবাহ সংঘটিত হওয়ার সময় দুধ পানের ঘটনা ছিল না; বরং পরবর্তীতে বিবাহবিচ্ছেদকারী বিষয় আপতিত হয়েছে তাই একজনের সংবাদ এখানে গ্রহণযোগ্য হবে। উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা দু-মাসআলার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا الْحَرْفِ يَدُوْرُ الْفَرْقُ : আলোচ্য মূলনীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন মাসআলায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেখানে বিবাহের সাথে বিবাহবিচ্ছেদকারী সংশ্লিষ্ট থাকে সেখানে একজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য হয় না। আর যেখানে বিবাহের পর বিবাহবিচ্ছেদকারী আপতিত হয় এবং কোনো বিপরীত দলিল থাকে না সেখানে একজনের সংবাদই গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتْ جَارِيَةٌ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) পূর্ববর্ণিত মূলনীতির আলোকে একটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। মূলনীতিটি হলো এই, যদি কারো সংবাদের বিপক্ষে কোনো বক্তব্য না থাকে তাহলে একজনের সংবাদই গ্রহণযোগ্য হয়। আর যদি বিপক্ষে বক্তব্য থাকে তাহলে একজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য হয় না।

মাসআলা : কোনো এক ব্যক্তির অধিকারে এমন অল্প বয়স্ক একটি দাসী রয়েছে, যে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। যার অধিকারে দাসীটি রয়েছে সে দাবি করছে দাসীটি তার। এর অনেক বছর পর দাসীটি বড় হলে ভিন্ন এক শহরে দাসীটির সাথে এক লোকের সাক্ষাৎ হয় এবং সে লোকটিকে বলল– আমি মূলত আজাদ [কিন্তু অমুকে দাসী বানিয়ে রেখেছে]। আর এ কথার ভিত্তিতে লোকটির জন্য দাসীটিকে বিবাহ করা জায়েজ নয়। কারণ দাসীর কথার বিপক্ষ বক্তব্য বা দলিল রয়েছে। আর তা হলো সে কোনো এক ব্যক্তির দখলে রয়েছে যে তাকে তার বাঁদী বলে দাবি করছে।

মোটকথা, যেহেতু দাসীর কথার বিরুদ্ধ বক্তব্য রয়েছে তাই দাসীটির কথার ভিত্তিতে তাকে বিবাহ করা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ : ইতঃপূর্বে একটি মাসআলায় শুধুমাত্র দাসীর বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছিল বিপক্ষ বক্তব্য না থাকায়। সে মাসআলাটি হলো, একটি দাসী কাউকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল যে, আমি অমুকের দাসী ছিলাম সে আমাকে আজাদ করে দিয়েছে। তখন তার কথা গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং সে মাসআলা ও আলোচ্য মাসআলার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

قَالَ : وَاِذَا بَاعَ الْمُسْلِمُ خَمْرًا اَوْ اَخَذَ ثَمَنَهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاِنَّهُ يَكْرَهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ اَنْ يَاْخُذَ مِنْهُ وَاِنْ كَانَ الْبَائِعُ نَصْرَانِيًّا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَالْفَرْقُ اَنَّ الْبَيْعَ فِي الْوَجْهِ الْاَوَّلِ قَدْ بَطَلَ لِاَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِيْ حَقِّ الْمُسْلِمِ فَبَقِيَ الثَّمَنُ عَلٰى مِلْكِ الْمُشْتَرِيْ فَلَا يَحِلُّ اَخْذُهُ مِنَ الْبَائِعِ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِيْ صَحَّ الْبَيْعُ لِاَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِيْ حَقِّ الذِّمِّيْ فَمَلَكَهُ الْبَائِعُ فَيَحِلُّ الْاَخْذُ مِنْهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো মুসলমান মদ বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করে। আর তখন সে ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে পাওনাদারের জন্য ঋণগ্রহীতা থেকে [এ অবস্থায়] ঋণের টাকা নেওয়া মাকরূহ। আর যদি বিক্রেতা খ্রিস্টান হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এ দু-মাসআলায় পার্থক্য হলো, প্রথম সুরতে বিক্রয় বাতিল হয়েছে। কেননা মুসলমানের ক্ষেত্রে মদ মূল্যমানসম্পন্ন কোনো বস্তু নয়। আর তাই মদের মূল্য ক্রেতার মালিকানায় রয়ে গেছে। সুতরাং [যা ক্রেতার মালিকানায় রয়ে গেছে] তা বিক্রেতা থেকে গ্রহণ করা জায়েজ নয়। আর দ্বিতীয় সুরতে বিক্রয় শুদ্ধ হয়েছে। কেননা জিম্মির ক্ষেত্রে মদ মূল্যমানসম্পন্ন মাল, আর তাই বিক্রেতা এর মালিক হয়েছে ফলে তা থেকে এ মূল্য নেওয়া জায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَاِذَا بَاعَ الْمُسْلِمُ الْخَمْرَ الخ : উপরের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) কোনো মুসলমান কর্তৃক মদ বিক্রি করা ও তার মূল্য গ্রহণ করা এবং জিম্মির জন্য তা বিক্রি করতঃ মূল্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কি পার্থক্য হয় তা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর সে আলোকে একটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, মদ মুসলমানদের জন্য কোনো মূল্যমান সম্পন্ন মাল নয়। পক্ষান্তরে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক তথা জিম্মিদের নিকট মদ একটি মূল্যসম্পন্ন মাল। এ মূলনীতির আলোকে একটি মাসআলা বের হয় যে, যদি কোনো মুসলমান কারো কাছে টাকা পায়। সে দেনাদার তার ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে মদ বিক্রি করে যে মূল্য পেয়েছে তা দিয়ে মুসলমান পাওনাদারের পাওনা শোধ করে। এমতাবস্থায় যদি দেনাদার তথা মদ বিক্রেতা জিম্মি হয় তাহলে সে যেহেতু মদ বিক্রির টাকার মালিক হয়েছে তাই তার থেকে উক্ত টাকা নেওয়া জায়েজ। পক্ষান্তরে যদি মদ বিক্রেতা মুলসমান হয় তাহলে তার থেকে উক্ত মদ বিক্রির টাকা নেওয়া জায়েজ নয়। কেননা মদ মুসলমানদের কাছে মূল্যমানসম্পন্ন মাল না হওয়াতে মদ বিক্রি করে যে টাকা সে পেয়েছে সেই টাকার মালিকানা তার অর্জিত হয়নি; বরং উক্ত টাকার মালিক পূর্ববৎ ক্রেতাই রয়ে গেছে। যেহেতু উক্ত টাকার মালিক [মুসলমান] বিক্রেতা হতে পারেনি তাই তার থেকে তা নেওয়া জায়েজ নয়।

قَالَ : وَيُكْرَهُ الْاِحْتِكَارُ فِىْ اَقْوَاتِ الْاٰدَمِيِّيْنَ وَالْبَهَائِمِ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ فِىْ بَلَدٍ يَضُرُّ الْاِحْتِكَارُ بِاَهْلِهٖ وَكَذٰلِكَ التَّلَقِّىْ فَاَمَّا اِذَا كَانَ لَا يَضُرُّ فَلَا بَاْسَ بِهٖ وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ وَلِاَنَّهٗ تَعَلَّقَ بِهٖ حَقُّ الْعَامَّةِ وَفِى الْاِمْتِنَاعِ عَنِ الْبَيْعِ اِبْطَالُ حَقِّهِمْ وَتَضْيِيْقُ الْاَمْرِ عَلَيْهِمْ فَيُكْرَهُ اِذَا كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ ذٰلِكَ بِاَنْ كَانَتِ الْبَلْدَةُ صَغِيْرَةً بِخِلَافِ مَا اِذَا لَمْ يَضُرَّ بِاَنْ كَانَ الْمِصْرُ كَبِيْرًا لِاَنَّهٗ حَابِسُ مِلْكِهٖ مِنْ غَيْرِ اِضْرَارٍ بِغَيْرِهٖ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মানুষ ও জীবজন্তুর খাদ্য [মূল্য বৃদ্ধির আশায়] মজুতদারি করা মাকরূহ। যদি তা এমন শহরে হয় যাতে মজুতদারির দ্বারা শহরবাসীর ক্ষতি হয়। অনুরূপভাবে শহরের বাইরে গিয়ে শহরমুখী বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের থেকে [কম মূল্যে] ক্রয় করে নেওয়াও মাকরূহ। তবে যদি এর দ্বারা শহরবাসীর ক্ষতি না হয় তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়ে দলিল হলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস : আমদানিকারক রিজিক প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে মজুতদার অভিশপ্ত হয়। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্যাদির সাথে সাধারণ জনগণের হক জড়িত। আর তা বিক্রি বন্ধ করে দেওয়াতে তাদের হক বাতিল ও তাদের উপর খাদ্যাভাবের সংকট সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং যদি সাধারণ জনগণের ক্ষতি সাধিত হয় তাহলে তা মাকরূহ। যেমন— ছোট শহরে এরূপ মজুত করা [যাতে শহরবাসীদের কষ্ট হয় তা] মাকরূহ। পক্ষান্তরে যদি তাদের কষ্ট না হয় এ কারণে যে, শহরটি বড় [এবং এতে মালের প্রচুর আমদানি রয়েছে] তাহলে তা মাকরূহ নয়। কেননা তখন মজুতদার কাউকে কষ্ট না দিয়ে কেবল নিজ মাল মজুত রাখছে মাত্র। [আর নিজ মাল গুদামজাত করার অধিকার সবার রয়েছে তাই তা মাকরূহ নয়]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيُكْرَهُ الْاِحْتِكَارُ فِىْ الخ : আলোচ্য ইবারতে মানুষ ও গৃহপালিত পশুর খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্যাদি মজুত ও গুদামজাত করার শরয়ী বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ খাদ্যদ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির আশায় মজুত করাকে আরবিতে اِحْتِكَارْ বলা হয়।

اِحْتِكَارْ বা মজুতদারি সর্বাবস্থায় মাকরূহ নয়। যদি কোনো শহর বা এলাকায় এরূপ মজুত করার দ্বারা শহরবাসীর ক্ষতি হয়। যেমন— এরূপ করার দ্বারা শহরবাসীর খাদ্যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হলো তাহলে তা অবশ্যই মাকরূহ হবে।

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ التَّلَقِّىْ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাধারণ জনগণের ক্ষতি হলে মজুত করা যেমন মাকরূহ তদ্রূপ জনগণের ক্ষতি হলে تَلَقِّىْ মাকরূহ।

تَلَقِّى الْجَلَبِ -এর সংজ্ঞা : تَلَقِّى الْجَلَبِ -এর সংজ্ঞা হলো, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক শহরের বাইরে গিয়ে শহরমুখী বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে তারা শহরে আসার পূর্বে রাস্তায় দেখা করে তাদের থেকে মাল কিনে নেওয়া এরূপ মালের ক্রেতা সাধারণত অল্পমূল্যে কিনে তাই সে লাভবান হয় আর শহরবাসীরা অল্পমূল্যে মাল ক্রয় করা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আবার কখনো কখনো যারা বাইরে গিয়ে মাল কিনে, তারা শহরের বাজারমূল্য বিক্রেতাদের কাছে গোপন করে ফলে বিক্রেতারাও প্রতারিত হয়।

অতঃপর উভয় সুরতে ক্রেতা সেই মাল শহরে এনে মজুদ করে রাখে মূল্য বৃদ্ধির আশায়। এ অবস্থায় যদি শহরের সাধারণ ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় [আর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক] তাহলে তা মাকরূহ।

মাকরূহ হওয়ার দলিল হলো– রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীস– اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি শহরে এনে পণ্য বিক্রি করে সে রিজিকপ্রাপ্ত হয়। আর যে পণ্য মজুত করে সে অভিশপ্ত।'

কেননা যে শহরে এনে মালামাল বিক্রি করে তার দ্বারা সাধারণ জনগণ আরাম পায় তাই সে মুসলমানদের দোয়ার বরকতে রিজিক লাভ করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শহরে পণ্য এনে তা মজুত করে এর দ্বারা শহরবাসীদের কষ্ট আরো বাড়ে তাই সে অভিশাপের উপযুক্ত হয়।

উল্লেখ্য যে, لَعْنَتٌ শব্দের অর্থ– দূরে সরিয়ে দেওয়া। সে হিসেবে مَلْعُوْنٌ শব্দের অর্থ হলো যাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। مَلْعُوْنٌ দু প্রকার : যথা– ১. مَلْعُوْنٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ 'আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে যে বঞ্চিত।' আর এ প্রকারের লোক শুধুমাত্র কাফেররাই হয়ে থাকে।

২. مَلْعُوْنٌ مِنْ مَقَامِ الصَّالِحِيْنَ 'নেককার লোকদের মাঝে যে গণ্য নয়।'

আলোচ্য হাদীসে مَلْعُوْنٌ বলে ২য় প্রকারের লোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাসানুযায়ী মু'মিন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমান থেকে বাহিরে চলে যায় না।

* ইবারতে উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা : আলোচ্য (اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ) হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) স্বীয় গ্রন্থে تِجَارَاتٌ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত সনদে উল্লেখ করেছেন–

عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ.

হাদীসটির সনদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি রয়েছে। অবশ্য এর কাছাকাছি বা পাশাপাশি বক্তব্যের আরেকটি হাদীস ভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে যা ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর কিতাবে 'বেচাকেনা অধ্যায়ে উল্লেখ' করেছেন। হাদীসটি এই–

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ اِلَّا خَاطِئٌ.

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ বলেন, বিভ্রান্ত লোকেরাই মজুতদারিতে লিপ্ত হয়।' [সংক্ষেপিত সূত্র নাসবুর রায়াহ] মোটকথা, যদি মজুত করার দ্বারা শহরের বা এলাকার লোকদের ক্ষতি না হয় তাহলে তা মাকরূহ নয়।

আর যদি এতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তা মাকরূহে তাহরীমী। মাকরূহ হওয়ার প্রথম দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস। দ্বিতীয় [যৌক্তিক] দলিল হলো, খাদ্যদ্রব্য লাভ করা মানুষের একটি [মৌলিক] অধিকার। যদি মজুত করার দ্বারা এর বেচাকেনা বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে [উক্ত মজুতের দ্বারা] সাধারণ মানুষের অধিকার নষ্ট করা হলো। সেই সাথে খাদ্য-দ্রব্যাদি মজুত করে খাদ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হলো [তাই এটা মাকরূহ]।

قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ اِذَا كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরিউক্ত দলিল দ্বারা বুঝা গেল যে, মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো সাধারণ জনগণের ক্ষতি। আর তা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয় যদি শহরটি ছোট হয়। কেননা ছোট শহরে মাল আমদানির উপায় কম থাকে এবং আমদানিকারকও কম থাকে। তাই দু-একজনের ষ্টক করার দ্বারাই শহরবাসী ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সুতরাং সাধারণ জনগণের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেই কেবল মজুদ করা মাকরূহ হবে।

আর যদি মজুত করার দ্বারা সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহলে মজুত করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা তখন মজুতকারী অন্যের ক্ষতি না করে তার মালিকানাধীন মাল সংরক্ষণ করল মাত্র। আর এরূপ করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

وَكَذَا التَّلَقِّيْ عَلَى هٰذَا التَّفْصِيْلِ لِاَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ وَعَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ قَالُوْا هٰذَا اِذْ لَمْ يَلْبِسِ الْمُتَلَقِّيْ عَلَى التُّجَّارِ سِعْرَ الْبَلْدَةِ فَاِنْ لَبَسَ فَهُوَ مَكْرُوْهٌ فِي الْوَجْهَيْنِ لِاَنَّهٗ غَادِرٌ بِهِمْ ـ

অনুবাদ : শহরের বাইরে গিয়ে পণ্য ক্রয় করার বিধান উল্লিখিত [মজুতদারির] বিবরণ অনুযায়ী হবে। কেননা রাসূল ﷺ শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলা থেকে পণ্য ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মাশায়েখ বলেন, এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে যখন ক্রেতা ব্যবসায়ীদের কাছে শহরের পণ্যের মূল্য গোপন না করে। যদি সে তা করে তাহলে তা দু-কারণে মাকরূহ হবে। কেননা সে তাদের সাথে প্রতারণা করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَكَذَا التَّلَقِّيْ هٰذَا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, اِحْتِكَارٌ [মজুতদারি] এর প্রসঙ্গে যে বিশ্লেষণ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি এর ফলে শহরবাসী বা এলাকাবাসীর ক্ষতিসাধন হয় তাহলে তা মাকরূহ। আর যদি তাদের ক্ষতি না হয় তাহলে মাকরূহ নয়। হুবহু একই বিধান تَلَقِّيْ -এর। অর্থাৎ শহরের বাইরে গিয়ে শহরমুখী বাণিজ্যিক কাফেলা থেকে মালামাল ক্রয় করে নিয়ে আসার দ্বারা যদি শহরের লোকদের ক্ষতি হয় তাহলে তা নাজায়েজ। আর যদি এর দ্বারা ক্ষতি না হয় তাহলে জায়েজ।

নাজায়েজ হওয়ার দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস– اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ وَعَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ শহরমুখী পণ্য শহরের বাইরে গিয়ে এবং বাণ্যিজ্যিক কাফেলা থেকে পণ্য শহরে পৌঁছার পূর্বে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'

উল্লেখ্য যে, جَلَبٌ শব্দের অর্থ আনা/আমদানি করা। এখানে جَلَبٌ শব্দ দ্বারা مَجْلُوْب উদ্দেশ্য! অর্থাৎ যা বয়ে শহরের দিকে আনা হয়।

আর رُكْبَانٌ শব্দের অর্থ (اَلرُّكْبَانُ الْجَمَاعَةُ مِنْ اَصْحَابِ الْاِبِلِ فِي السَّفَرِ) সফররত উষ্ট্রী বাহিনী যারা পণ্য বহন করে চলে। দশ বা তদূর্ধ্ব উটের বাহিনীকে رُكْبَانٌ বলা হয়। تَلَقِّي الْجَلَبِ وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ -এর অর্থ প্রায় একই।

মুসান্নিফ (র.) মূলত দুটি হাদীসকে একত্রে বর্ণনা করেছেন।

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ হলো একটি হাদীস আর تَلَقِّي الرُّكْبَانِ আরেকটি হাদীসের অংশবিশেষ।

প্রথম হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর কিতাবে নিম্নোক্ত সনদে ও শব্দে উল্লেখ করেছেন–

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ ـ

আবার ভিন্ন শব্দেও হাদীসটির বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন–

قَالَ لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَاهُ فَاِذَا اَتٰى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ـ

আর দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) উভয়েই নিম্নোক্ত সনদে উল্লেখ করেছেন–

عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

মোটকথা, উভয় হাদীস দ্বারা [অবশ্য মুসান্নিফ (র.) দু'টি হাদীসকে এক হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।] এ কথা প্রমাণিত হয় যে, শহরের বাইরে গিয়ে শহরমুখী পণ্য কিনে আনা অবৈধ। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো গ্রামাঞ্চলের লোকেরা যেন তাদের পণ্য শহরে এনে সরাসরি বিক্রি করতে পারে এবং শহরের লোকেরা যেন তাদের থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারে সেই সুযোগ উভয়কে দেওয়া উচিত। তাদের মাঝে যেন কোনো ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর অনুপ্রবেশ না ঘটে। তবে যদি উভয়ের মাঝে কোনো ব্যবসায়ী যুক্ত হওয়ার দ্বারা শহরবাসীর কোনো ক্ষতি না হয় তাহলে তা জায়েজ।

قَوْلُهُ قَالُوْا هٰذَا إِذَا الخ : হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) এখানে মাশায়েখের এক ব্যাখ্যাকে সংযোজন করেছেন। মাশায়েখ বলেন, উপরে تَلَقِّى الْجَلَبِ -এর যে মাসআলা আমরা উল্লেখ করলাম [শহরবাসীর ক্ষতি না হলে তা জায়েজ, আর ক্ষতি হলে তা নাজায়েজ] তা তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তিটি তাদের কাছে শহরে প্রচলিত স্বাভাবিক দর গোপন না করে। আর যদি সে তাদের কাছে শহরে প্রচলিত দর তথা বাজারদর [কমমূল্যে ক্রয় করার আশায়] গোপন করে তাহলে তা মাকরূহ হবে চাই এর দ্বারা শহরবাসীর ক্ষতি হোক বা না হোক। কেননা সাক্ষাৎকারী ক্রেতা তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। আর প্রতারণা করা হারাম। তাই এটা মাকরূহে তাহরীমী।

আর যদি প্রচলিত দর তথা বাজারদর গোপন করে এবং এর দ্বারা শহরবাসীর ক্ষতি হয় তাহলে মাকরূহ হওয়ার দুটি সবব বা কারণ পাওয়া গেল। ১. দর গোপন করে প্রতারণা করার কারণে মাকরূহ। ২. শহরবাসীর ক্ষতি হওয়াতে মাকরূহ।

وَتَخْصِيْصُ الْاِحْتِكَارِ بِالْاَقْوَاتِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتِّبْنِ وَالْقَتِّ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) كُلُّ مَا اَضَرَّ بِالْعَامَّةِ حَبْسُهُ فَهُوَ اِحْتِكَارٌ وَاِنْ كَانَ ذَهَبًا اَوْ فِضَّةً اَوْ ثَوْبًا وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رح) اَنَّهُ قَالَ لَا اِحْتِكَارَ فِى الثِّيَابِ فَاَبُوْ يُوْسُفَ (رح) اِعْتَبَرَ حَقِيْقَةَ الضَّرَرِ اِذْ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِى الْكَرَاهَةِ وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) اِعْتَبَرَ الضَّرَرَ الْمَعْهُوْدَ الْمُتَعَارِفَ ـ

অনুবাদ : [ইমাম কুদূরী (র.) কর্তৃক] মজুতদারিকে খাদ্য-দ্রব্যাদির যথা– গম, যব, ভূষি ও শুকনো বা তাজা খাদ্যের সাথে খাস করা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত [অনুসারে]। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, যা মজুত করার দ্বারা সাধারণ জনগণের ক্ষতি হয় তাই মজুতদারি। যদিও তা স্বর্ণ, রৌপ, কিংবা কাপড় হোক না কেন ? ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, বস্ত্রের মধ্যে মজুতদারি হয় না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) প্রকৃত ক্ষতির কথা বিবেচনা করেছেন। আর এটিই মাকরূহ করার আসল কারণ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাধারণ জনগণের প্রচলিত ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَخْصِيْصُ الْاِحْتِكَارِ الخ : চলমান ইবারতে মুসান্নিফ (র.) কি কি দ্রব্যে মজুতদারি শরিয়তে নিষিদ্ধ তা আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন, মানুষ ও পশুখাদ্যে মজুতদারি নিষিদ্ধ বলে ইমাম কুদূরী (র.) যে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে যা মজুত করার দ্বারা সাধারণ জনগণের ক্ষতি সাধিত হয় তাই শরিয়তে নিষিদ্ধ এবং শরিয়তের পরিভাষায় তা اِحْتِكَارٌ বলে সাব্যস্ত হবে। চাই সে দ্রব্য স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা বস্ত্র জাতীয় হোক না কেন?

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো কাপড়ে اِحْتِكَارٌ হয় না। তিনি বলেন, মানুষের বেঁচে থাকা নির্ভর করে খাদ্যদ্রব্যের উপর, কাপড়চোপড়ের উপর নয়।

মূলত اِحْتِكَارٌ-এর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মৌলিকভাবে ক্ষতি হওয়াকেই ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং তাঁর মতে, যে মাল মজুত করার দ্বারা জনগণের ক্ষতি হবে সেটাই اِحْتِكَارٌ সাব্যস্ত হবে। তাছাড়া হাদীসের মধ্যে اِحْتِكَارٌ-এর বিষয়টি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাধারণভাবে যে ক্ষতি সর্বজনে স্বীকৃত ছিল সেটাকে বিবেচনা করেছেন। আর সাধারণভাবে খাদ্যেদ্রব্যে মজুত করার ক্ষতি জনগণের মাঝে স্বীকৃত ছিল।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতের উপরই ফতোয়া।

ثُمَّ الْمُدَّةُ اِذَا قَصُرَتْ لَا يَكُوْنُ اِحْتِكَارًا لِعَدَمِ الضَّرَرِ وَاِذَا طَالَتْ يَكُوْنُ اِحْتِكَارًا مَكْرُوْهًا لِتَحَقُّقِ الضَّرَرِ ثُمَّ قِيْلَ هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِاَرْبَعِيْنَ يَوْمًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ وَقِيْلَ بِالشَّهْرِ لِاَنَّ مَا دُوْنَهُ قَلِيْلٌ عَاجِلٌ وَالشَّهْرُ وَمَا فَوْقَهُ كَثِيْرٌ اٰجِلٌ وَقَدْ مَرَّ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَيَقَعُ التَّفَاوُتُ فِي الْمَأْثَمِ بَيْنَ اَنْ يَتَرَبَّصَ الْعِزَّةَ وَبَيْنَ اَنْ يَتَرَبَّصَ الْقَحْطَ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ وَقِيْلَ اَلْمُدَّةُ لِلْمُعَاقَبَةِ فِي الدُّنْيَا اَمَّا يَأْثَمُ وَاِنْ قَلَّتِ الْمُدَّةُ وَالْحَاصِلُ اَنَّ التِّجَارَةَ فِي الطَّعَامِ غَيْرُ مَحْمُوْدَةٍ ـ

অনুবাদ : অতঃপর স্বল্প সময়ের জন্য মজুত করা হলে ক্ষতি না হওয়াতে তা ইহতিকার সাব্যস্ত হয় না। আর যদি সময় দীর্ঘ হয় এবং এর দ্বারা [সাধারণের] ক্ষতি সাধিত হয় বলে তা মাকরূহ ইহতিকার হিসেবে গণ্য হয়। অতঃপর কেউ কেউ বলেন, মজুতের সময় চল্লিশ দিন হলে তা দীর্ঘ সময়। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি চল্লিশদিন খাদ্য মজুত রাখবে সে আল্লাহর জিম্মাদারি থেকে মুক্ত এবং আল্লাহও তার থেকে মুক্ত। আবার কেউ কেউ বলেন, এক মাস হলো দীর্ঘ সময়। কেননা এর চেয়ে কম হলো অল্প ও সামান্য সময়। একমাস বা তদূর্ধ্ব সময় হলো বেশি ও লম্বা সময়। একাধিক স্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। যে সকল মজুতদার মূল্যবৃদ্ধির আশায় অপেক্ষা করে আর যে সকল মজুতদার দুর্ভিক্ষের অপেক্ষা করে তাদের মাঝে গুনাহের ক্ষেত্রে তারতম্য হবে। [নাঊযুবিল্লাহ] কেউ কেউ বলেন, মজুতদারির সময় তো পার্থিব শাস্তির জন্য। তবে সময় অল্প হলেও গুনাহগার হবে। সারকথা হলো, [মূল্যবৃদ্ধির আশায়] খাদ্য দ্রব্যাদি মজুত করে ব্যবসা করা পছন্দনীয় নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُدَّةُ اِذَا الخ : উপরের ইবারতে মাল কতদিন সময় পর্যন্ত গুদামজাত ও মজুত করা হলে তা ইহতিকার বলে সাব্যস্ত হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি স্বল্প সময়ের জন্য খাদ্য-দ্রব্যাদি গুদামজাত করা হয় তাহলে এর দ্বারা জনগণের তেমন ক্ষতি হয় না বিধায় তাকে ইহতিকার সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ পণ্য মাপজোখ করা, প্যাকেটজাত করা ও সরবরাহ করার কল্পনাতে কিছু সময় লেগে যায়। তাই স্বল্পসময়ের মজুতের দ্বারা ইহতিকার [মজুতদারি] সাব্যস্ত হয় না।

আর যদি পণ্য গুদামজাত করার পর মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, যে কারণে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হয়, তাহলে তা ইহতিকার সাব্যস্ত হবে।

এখন প্রশ্ন হলো কতদিন সময়কে দীর্ঘসময় সাব্যস্ত করা হবে ? এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রথমত قِيلَ هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا অর্থাৎ মুসান্নিফ (র.) বলেন, কারো কারো মতে চল্লিশ দিন বা তার চেয়ে বেশি সময় খাদ্যদ্রব্য মজুত করা হলে তা ইহতিকার বলে সাব্যস্ত হবে। এ মতের পক্ষে দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীস। তিনি বলেছেন– مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি চল্লিশদিন পর্যন্ত স্টক করে সে আল্লাহর দায়িত্বের বাইরে চলে যায় এবং আল্লাহও তার ব্যাপারে দায়িত্বমুক্তি ঘোষণা করেন।'

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (র.), ইবনে আবী শায়বা (র.) ও ইমাম বায্যার (র.) তাদের মুসনাদসমূহে উল্লেখ করেছেন। কিতাবগুলোতে নিম্নোক্ত সনদে হাদীসটি রয়েছে–

عَنْ اَصْبَغَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ وَاَيُّمَا اَهْلُ عَرْصَةٍ بَاتَ فِيْهِمْ اِمْرِئٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللّٰهِ ـ

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা গ্রন্থকার (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মূল খুঁজে পাওয়া গেল। অবশ্য হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনের আপত্তি রয়েছে। –[সূত্র -বিনায়া ও নাসবুর রায়াহ পৃ. ২৬২.]

قَوْلُهُ وَقِيلَ بِالشَّهْرِ الخ : কোনো কোনো ফকীহ তাদের স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, দীর্ঘ সময় সাব্যস্ত হবে পূর্ণ এক মাস সময়ের দ্বারা। কারণ এক মাসের চেয়ে কম সময়কে শরিয়ত অল্প সময় সাব্যস্ত করেছে। আর এক মাস ও তদূর্ধ্ব সময়কে বেশি ও লম্বা সময় সাব্যস্ত করেছে। এ বিষয়ে কিতাবুস সালাত, সালম, ওকালাহ ও ইয়ামীন পরিচ্ছেদে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। সেসব অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে এক মাস সময়কে লম্বা সময় সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব, আলোচ্য মাসআলায় এক মাস অথবা তার চেয়ে বেশি সময় দীর্ঘ সময় বলে বিবেচিত হবে।

বাকি রইল হাদীস শরীফে যে চল্লিশ দিন সময় উল্লেখ করা হয়েছে এর অর্থ চল্লিশ দিন আবশ্যক নয়; বরং এখানে লক্ষণীয় হলো, সাধারণ মানুষের কষ্টের বিষয়টি। আর শরিয়ত লম্বা সময়ের মজুতদারিকে ক্ষতিকর সাব্যস্ত করেছে। আর লম্বা সময় হলো এক মাস, যা এইমাত্র আমরা উল্লেখ করেছি। –[সূত্র-টীকা]

قَوْلُهُ وَيَقَعُ التَّفَاوُتُ فِي الْمَأْثَمِ الخ : উপরের ইবারতে মজুতকারকদের মধ্যে তাদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে গুনাহের যে তারতম্য হয় সে মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে মজুতদার মূল্যবৃদ্ধির আশায় মালামাল মজুত করে, আর যে মজুতদার মানুষের খাদ্যদ্রব্যে চরম অনটন দেখা দেওয়া পর্যন্ত মালামাল মজুত করে তাদের উভয়ে গুণাহগার হবে। তবে এদের মধ্যে বেশি ও বড় গুনাহগার হলো, যে দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যাদি মজুত করে রাখে।

কোনো কোনো ফকীহের মতে মজুত করা সংক্রান্ত যে মেয়াদের বা সময়সীমার কথা আলোচনা হয়েছে তথা চল্লিশদিন বা এক মাস মজুত রাখলে মজুতদার সাব্যস্ত হবে তাতো দুনিয়ার বিধান হিসেবে। অর্থাৎ দুনিয়াবি আইনে এ পরিমাণ সময় মজুত করা দণ্ডনীয় অপরাধ। আর আখেরাতের হিসেবে কিংবা গুনাহের কথা বিবেচনা করলে তা অল্প সময়ের জন্য হলেও বৈধ নয়। তাদের মতের সারকথা হলো, মূল্যবৃদ্ধির আশায় খাদ্যদ্রব্য মজুত করে ব্যবসা করাই অপছন্দনীয়।

বি. দ্র. ক. সাধারণ জনগণের ক্ষতি হলে মজুতদারি করা মাকরূহ। এর উপরই ফতোয়া। –[সাকবুল আনহার ২য় খ. পৃ. ৪৭৭]

খ. খাদ্যদ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্য যদি মজুতদারির করার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা প্রশংসনীয় নয়। আর যদি তা না হয় তাহলে তা প্রশংসনীয়। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ 'উপার্জনকারী আল্লাহ তা'আলার প্রিয়বন্ধু।' [প্রাগুক্ত]

قَالَ : وَمَنِ احْتَكَرَ غَلَّةَ ضَيْعَتِهِ اَوْ مَا جَلَبَهُ مِنْ بَلَدٍ اٰخَرَ فَلَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ اَمَّا الْاَوَّلُ فَلِاَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ اَلَا تَرٰى اَنَّ لَهُ اَنْ لَا يَزْرَعَ فَكَذٰلِكَ لَهُ اَنْ لَا يَبِيْعَ وَاَمَّا الثَّانِيْ فَالْمَذْكُوْرُ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّ حَقَّ الْعَامَّةِ اِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا جُمِعَ فِي الْمِصْرِ وَجُلِبَ اِلٰى فِنَائِهَا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يُكْرَهُ لِاِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) كُلُّ مَا يُجْلَبُ مِنْهُ اِلَى الْمِصْرِ فِي الْغَالِبِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ فِنَاءِ الْمِصْرِ يَحْرُمُ الْاِحْتِكَارُ فِيْهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَامَّةِ بِهِ بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ الْبَلَدُ بَعِيْدًا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالْحَمْلِ مِنْهُ اِلَى الْمِصْرِ لِاَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ নিজ জমিনের শস্যাদি মজুত করে অথবা অন্য শহর থেকে আমদানি করা মালামাল জমা করে রাখে তবে সে [শরিয়তের দৃষ্টিতে] মজুতদার নয়। প্রথম ব্যক্তি [মজুতদার নয়] এজন্য যে, সে একান্তই নিজ মাল জমা করেছে, যার সাথে সাধারণ জনগণের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, এই ব্যক্তির ফসল না ফলানোর যেমন অধিকার রয়েছে তদ্রূপ ফসল বিক্রি না করারও অধিকার রয়েছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। কেননা, সাধারণ জনগণের অধিকার তো ঐ মালের সাথে যা শহরের মাঝে ও শহরতলীতে জমা করা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আমাদের বর্ণিত দলিল মুতলাক হওয়ার কারণে দ্বিতীয় সুরতও মাকরূহ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে শহর থেকে সাধারণত খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানি করা হয় সেই শহর শহরতলী পর্যায়ে গণ্য হবে। সুতরাং এতে মাল গুদামজাত করা মজুত করা মাকরূহ। কেননা এ সুরতে সাধারণ মানুষের অধিকার জড়িত আছে। পক্ষান্তরে যে শহর থেকে আমদানি করা হয়েছে তা যদি এমন দূরবর্তী হয় যা থেকে খাদ্যদ্রব্যাদি সাধারণত আমদানি করা হয় না [তা থেকে আমদানিকৃত দ্রব্য ষ্টক করা হলে তা মজুতদারি বলে গণ্য হবে না]। কেননা এ জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের সাথে জনগণের কোনো অধিকার জড়িত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ احْتَكَرَ غَلَّةَ الخ : চলমান ইবারতে এমন দুটি সুরত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যাতে খাদ্যদ্রব্যাদি মজুত করলেও তা ইহতিকার বলে পরিগণিত হয় না।

প্রথম সুরত : কোনো ব্যক্তি যদি নিজ জমিনে উৎপাদিত খাদ্য-শস্যাদি গুদামজাত করে রাখে তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে ইহতিকার সাব্যস্ত হবে না। কারণ এরূপ ব্যক্তির একান্তভাবে নিজের হক যাতে সাধারণ জনগণের কোনো হকই জড়িত নয়– মজুতকৃত বস্তুতে।

এটা যে একান্তভাবেই তার হক এ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) -একটি দলিল পেশ করেছেন। দলিল হলো, উপরিউক্ত ব্যক্তির ফসল উৎপাদন না করারও অধিকার আছে। সে ইচ্ছা করলে জমি চাষ করবে অথবা তার জমিন পতিত ফেলে রাখবে। যেহেতু তার ফসল চাষ করা বা না করা উভয়েরই এখতিয়ার আছে। অতএব, ফসল বেচা বা না বেচা উভয়ের এখতিয়ারও তার থাকবে। এ মাসআলায় কারো কোনো ধরনের দ্বিমত নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এমন ব্যক্তির মজুতদারির কারণে গুনাহ হবে না। কিন্তু যদি সে বাজার ভীষণভাবে চড়া হওয়ার অপেক্ষা করে অথবা চরম খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষের অপেক্ষা করে তাহলে সাধারণ মুসলমানদের সাথে অকল্যাণকর আচরণ করার কারণে গুনাহগার অবশ্যই হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, খাদ্যাভাবের সময় তাকে কি তার শস্য বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে কিনা? উত্তর হলো, সাধারণ জনগণ যদি মুখাপেক্ষী হয় তাহলে তাই করা হবে। অর্থাৎ তার নিকট জমাকৃত মালামাল বিশেষ প্রয়োজনে বিক্রির জন্য বাধ্য করা যাবে। –[রদ্দুল মুহতার পৃ. ৫৭২, খ. ৯]

যেসব খাদ্যদ্রব্যাদি ভিন্ন শহর থেকে আমদানি করা হয় তাতে মজুতদারির কি হুকুম?

এ প্রসঙ্গে ফকীহ আবুল লাইছ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য মাসআলার তিনটি সুরত রয়েছে– ১. উল্লিখিত সুরতে এরূপ করাতে সমস্যা নেই। ২. সকলের মতে মাকরূহ। ৩. মাকরূহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের ইখতিলাফ।

ক. যে সুরতে মজুত করা সকলের মতে মাকরূহ, তা হলো ভিন্ন শহর থেকে আমদানিকৃত পণ্য যদি শহরে ক্রয় করে তা মজুত বা গুদামজাত করা হয় এবং এর ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেহেতু এতে সাধারণ জনগণের কষ্ট হয় তাই এটা মাকরূহ। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে তার পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে। যদি তার পরেও সে বিক্রি করতে না চায় তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তবে তার উপর বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ দেওয়া যাবে না; বরং তাকে বলা হবে অন্যরা যেভাবে বিক্রি করে তুমি সেভাবেই বিক্রি কর।

খ. আর যে সুরতে কোনো সমস্যা নেই তা হলো এক ব্যক্তি নিজ জমি থেকে উৎপাদিত শস্য জমা করল বা অন্য শহর থেকে আমদানি করল অথবা শহর থেকে ক্রয় করে তা জমা করল অথচ তার এভাবে জমা করার দ্বারা শহরবাসীর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী (র.) -এর মতে, উপরের দু-সুরতের কোনো সুরতেই মতবিরোধ নেই।

ফকীহ আবুল লাইছ (র.)-এর ইবারত এতটুকু নকল করেই বিনায়ার মুসান্নিফ (র.) হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) -এর উপর আপত্তি করেছেন। তিনি বলেন, আবুল লাইছ (র.)-এর ইবারত দ্বারা হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) যা বলেছেন (وَالْمَذْكُورُ قَوْلُهُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَكْرَهُ يَعْنِيْ فِيْمَا جَلَبَهُ مِنْ بَلَدٍ أُخَرَ) অর্থাৎ তাতে আপত্তি সৃষ্টি হয়। কারণ মুসান্নিফ (র.) যে সুরতে মতবিরোধ বর্ণনা করেছেন সে সুরতকে আবুল লাইছ (র.) মতবিরোধমুক্ত বলেছেন।

ইমাম কুদূরী (র.) -এর কথা দ্বারাও ফকীহ (র.) -এর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি كِتَابُ التَّقْرِيْبِ -এ উল্লেখ করেন যে, رَوٰى هِشَامٌ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِيْمَنْ جَلَبَ طَعَامًا ثُمَّ احْتَكَرَهُ لَمْ يَكْرَهْ وَكَرِهَ إِنَّمَا الْحَكْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي الْمِصْرِ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ إِنْ جَلَبَهُ مِنْ نِصْفِ مِيْلٍ فَلَيْسَ بِحَكْرَةٍ.

অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে মজুত রাখে তা মাকরূহ নয়। তবে মাকরূহ এবং মজুতদারি হলো শহরে ক্রয় করে মজুত করে রাখা।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যদি অর্ধ মাইল দূর থেকে মালামাল আনা হয় তাহলে তা মাকরূহ নয়। [এর পর আল্লামা আইনী (র.) বলেন,] যদি এটা ইহতিকার না হয় তবে অন্য শহর থেকে আমদানি করলে তা কি করে ইহতিকার হয়? বিষয়টি ইমাম কারখী (র.) তার মুখতাসারে উল্লেখ করেছেন যে, قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ إِذَا جَلَبَهُ مِنْ نِصْفِ مِيْلٍ فَلَيْسَ بِحَكْرَةٍ. । ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, যদি অর্ধ মাইল দূর থেকে খাদ্য আমদানি করে তাহলে তা ইহতিকার নয়।

গ. আর যে সুরতে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে তা এই, যখন কোনো ব্যক্তি বণিকদলের কাছ থেকে মালামাল কিনে শহরে মজুত করে। ফকীহ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এতে কোনো সমস্যা নেই। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এমন ব্যক্তি মজুতদার (مُحْتَكِرٌ) সাব্যস্ত হবে। কেননা শহরের লোকদের সরাসরি বণিকদল থেকে ক্রয় করার সুযোগ ছিল। অতএব, সে যেন শহরে ক্রয় করেই তা জমা করল। ফকীহ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতটিকে আমরা গ্রহণ করব। –[সূত্র-বিনায়া]

আলোচ্য মাসআলায় ফকীহ আবুল লাইছ (র.) -এর ব্যাখ্যা অধিক নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে বলে তা উল্লেখ করা হলো। [আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অবগত।]

قَالَ : وَلاَ يَنْبَغِيْ لِلسُّلْطَانِ يُسَعِّرُ عَلَى النَّاسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لا تُسَعِّرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَقُّ الْعَاقِدِ فَإِلَيْهِ تَقْدِيْرُهُ يَنْبَغِيْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِحَقِّهِ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ دَفْعُ ضَرَرِ الْعَامَّةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ. وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِيْ هٰذَا الْأَمْرَ يَأْمُرُ الْمُحْتَكِرُ بِبَيْعِ مَا فَضَلَ عَنْ قُوْتِهِ وَعَنْ قُوْتِ أَهْلِهِ عَلَى اِعْتِبَارِ السَّعَةِ فِيْ ذٰلِكَ وَيَنْهَاهُ عَنِ الْاِحْتِكَارِ فَإِنْ رُفِعَ إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى حَبَسَهُ وَعَزَّرَهُ عَلَى مَا يَرَى زَجْرًا لَهُ وَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ فَإِنْ كَانَ أَرْبَابُ الطَّعَامِ يَتَحَكَّمُوْنَ وَيَتَعَدَّوْنَ عَنِ الْقِيْمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا وَعَجَزَ الْقَاضِيْ عَنْ صِيَانَةِ حُقُوْقِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا بِالتَّسْعِيْرِ فَحِيْنَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ بِمَشْوَرَةٍ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْبَصِيْرَةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রাষ্ট্র প্রধানের জন্য মানুষের মালামালের মূল্য ধার্য করে দেওয়া উচিত নয়। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ো না। কারণ আল্লাহ হলেন মূল্য নির্ধারণকারী, সংকীর্ণকারী, প্রশস্তকারী ও রিজিকদাতা। তাছাড়া বিক্রয়মূল্য চুক্তিকারী ব্যক্তির হক। তাই তা নির্ধারণের অধিকার তারই। অতএব, রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য বিক্রেতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নয়। তবে হ্যাঁ, যদি সাধারণ জনগণের ক্ষতি বিদূরিত করার বিষয়টি এর সাথে জড়িত হয় তাহলে ভিন্ন কথা। এর বর্ণনা আমরা সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। যদি কাজী [বিচারক] -এর আদালতে এ বিষয়ে [অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি মজুতদারি করে এমন অভিযোগ] উত্থাপন করা হয়, তবে বিচারক মজুতদারকে এই মর্মে আদেশ দেবেন যেন সে তার ও তার পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ রেখে অবশিষ্ট খাদ্য বিক্রি করে দেয়। আর তিনি তাকে গুদামজাত করতে নিষেধ করে দেবেন। যদি দ্বিতীয়বার তার দরবারে অভিযোগ দায়ের করা হয় [যে, সে এখনো ইহতিকার করছে], তবে বিচারক তাকে গ্রেফতার করে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং লোকজনের ক্ষতি দূর করার লক্ষ্যে তার বিবেচনা অনুযায়ী শাস্তি দেবেন। আর যদি খাদ্যের মালিক [ও ব্যবসায়ীরা] সেচ্ছাচারী করে এবং মূল্য নির্ধারণে চরমভাবে সীমালঙ্ঘন করে, আঁর বিচারক মূল্য ধার্য করে দেওয়া ছাড়া সাধারণ জনগণের স্বার্থ বা অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের মতামতের ভিত্তিতে মূল্য ধার্য করাতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلاَ يَنْبَغِى لِلسُّلْطَانِ الخ : উপরের ইবারতে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে মজুতকারীর বস্তুসমূহের মূল্য ধার্য করার অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারত নকল করে মুসান্নিফ (র.) বলেন, রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত নয়।

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে সাধারণ জনগণের যাতে ক্ষতি না হয় সেই বিবেচনায় মূল্য ধার্য করে দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধানের উপর ওয়াজিব।

আমাদের হানাফী মতাবলম্বী বিখ্যাত আলেম ইমাম কাকী (র.) এ ব্যাপারে বলেন যে, মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোনো আলেমের দ্বিমত নেই। তবে যদি ভোগ্যপণ্যের ব্যবসায়ীরা সীমালঙ্ঘন করে [যেমন বর্তমানে বাংলাদেশে বড় বড় ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে] তাহলে সরকারিভাবে মূল্য নির্ধারণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। বিনায়ার গ্রন্থকার বলেন- اَلصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ الْكَاكِىْ 'ইমাম কাকী (র.) যা বলেছেন তাই সঠিক।'

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ تُسَعِّرُوْا الخ : মূল্য নির্ধারণ না করার পক্ষে মুসান্নিফ (র.) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন- لاَ تُسَعِّرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ

অর্থাৎ 'তোমরা বিক্রয়মূল্য বেঁধে দিয়ো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত মূল্য নির্ধারণকারী, [রিজিক] প্রশস্তকারী, সংকীর্ণকারী ও রিজিকদাতা।'

উদ্ধৃত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা : আলোচ্য হাদীসটি চারজন বিখ্যাত সাহাবী রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁরা হলেন- ১. হযরত আনাস (রা.), ২. আবূ জুহাইফা (রা.), ৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও ৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (র.) ও ইমাম তিরমিযী (র.) উভয়ে তাদের সুনানে بُيُوْع অধ্যায়ে নিম্নোক্ত সনদে হাদীসটি চয়ন করেছেন-

عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ثَلاَثَتُهُمْ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَاِنِّىْ اَرْجُوْ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِىْ بِظُلْمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلاَ مَالٍ .

অর্থাৎ 'হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন রাসূল ﷺ -কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রব্য মূল্যের প্রচণ্ড উর্ধ্বগতি। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য বিভিন্ন বস্তুর মূল্য ধার্য করে দিন। রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহই মূল্য নির্ধারণকারী, রিজিক প্রশস্তকারী, সংকীর্ণকারী এবং তিনিই রিজিকদাতা। আর আমি কামনা করি আল্লাহ তা'আলার সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, কেউ আমার কাছে খুন বা মালের ব্যাপারে জুলুমের দাবি করবে না।'

ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ [সূত্র-বিনায়া]

অপর তিন সাহাবীও প্রায় একই অর্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মুসান্নিফ (র.) বর্ণিত হাদীস প্রমাণিত হলো। হাদীসের দ্বারা দ্রব্যাদির মূল্য বেঁধে দেওয়া যে অনুচিত তা প্রমাণিত হয়।

এরপর মুসান্নিফ (র.) একটি যুক্তি পেশ করেন। তা হলো, যে কোনো দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করার অধিকার বিক্রেতার। অতএব, রাষ্ট্র প্রধানের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় বিক্রেতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

قَوْلُهُ اِلَّا اِذَا تَعَلَّقَ الخ : হ্যাঁ, তবে যদি সাধারণ জনগণের ক্ষতি দ্রব্যমূল্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক যদি কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়, আর তার ফলে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ রয়েছে। যার বর্ণনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

قَوْلُهُ وَاِذَا رُفِعَ اِلَى الْقَاضِىْ هٰذَا الخ : আলোচ্য ইবারতে কোনো বিচারকের আদালতে যদি ইহতিকার সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করা হয় তাহলে বিচারক কি ফয়সালা করবেন সে বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যদি কোনো বিচারকের দরবারে এ মর্মে অভিযোগ দায়ের করা হয় যে, অমুক [আ: করীম] ইহতিকার করে তাহলে বিচারক তাকে ডেকে মজুতদারির দ্বারা সাধারণ জনগণের যে ক্ষতি হচ্ছে তা বুঝিয়ে তাকে বলতেন যে, তুমি এবং তোমার পরিবারের সদস্যদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য শস্য রেখে অবশিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রি করে দাও এবং মজুতদারি বন্ধ কর।

যদি এতটুকুতে কাজ হয় তাহলে তো ভালো। কিন্তু যদি এতে কাজ না হয় এবং পুনরায় তার ব্যাপারে একই ধরনের অভিযোগ আসে তাহলে বিচারক এবার তাকে গ্রেফতার করে তিনি তার ব্যাপারে যতটা সমীচীন মনে করেন শাস্তি দেবেন। এতে বিচারকের উদ্দেশ্য একেতো তাকে সতর্ক করা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ যারা এ ধরনের মজুতদারের কারণে কষ্ট পাচ্ছিল তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করা।

উল্লেখ্য যে, জামিউস সাগীর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বিচারক ২য় দফাতে তাকে গ্রেফতার করবেন না; বরং বুঝিয়ে সাবধান করার চেষ্টা চালাবেন। যদি এতেও কাজ না হয় তাহলে ৩য় দফাতে তাকে গ্রেফতার করবেন। -[সূত্র -মূলগ্রন্থের টীকা]

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَ اَرْبَابُ الطَّعَامِ يَتَحَكَّمُوْنَ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে কখন বিচারক কর্তৃক মূল্য ধার্য করা বৈধ তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ক্ষেত্রবিশেষে বিচারক যারা ইহতিকার করে তাদের গ্রেফতার করবেন এবং দ্রব্যাদির মূল্য নির্দিষ্ট করে দিবেন। কারণ খাদ্য সম্ভারের মালিক ও খাদ্য ব্যবসায়ীরা অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে এবং মূল্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে। যেমন- দশ টাকায় একটি দ্রব্য কিনে সেটা একশত টাকায় বিক্রি করে। এমতাবস্থায় বিচারক সাধারণ জনগণের অধিকার মূল্য নির্ধারণ করা ব্যতীত রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে পড়েন। তাই তখন বিচারকের উচিত বাজার ব্যবস্থার সাথে জড়িত অর্থাৎ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করে মূল্য নির্ধারণ করা।

বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া প্রয়োজন যাতে ক্রেতা, বিক্রেতা ও ভোক্তা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

فَإِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ وَتَعَدّٰى رَجُلٌ عَنْ ذٰلِكَ وَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَجَازَهُ الْقَاضِىْ وَهٰذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِأَنَّهُ لَا يَرَى الْحَجْرَ عَلَى الْحُرِّ وَكَذَا عِنْدَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْحَجْرُ عَلٰى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَمَنْ بَاعَ مِنْهُمْ بِمَا قَدَّرَهُ الْإِمَامُ صَحَّ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ عَلَى الْبَيْعِ وَهَلْ يَبِيْعُ الْقَاضِىْ عَنِ الْمُحْتَكِرِ طَعَامَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ قِيْلَ هُوَ عَلَى الْاِخْتِلَافِ الَّذِىْ عُرِفَ فِىْ بَيْعِ مَالِ الْمَدْيُوْنِ وَقِيْلَ يَبِيْعُ بِالْاِتِّفَاقِ لِأَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ (رح) يَرَى الْحَجْرَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ وَهٰذَا كَذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : যদি বিচারক মূল্য ধার্য করে দেন, অতঃপর কোনো ব্যক্তি এ [নির্ধারিত মূল্যের] সীমালঙ্ঘন করে এবং এর চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করে তাহলে বিচারক উক্ত বেচাকেনাকে বৈধতা দান করবেন। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুযায়ী সুস্পষ্ট। কেননা তিনি কোনো স্বাধীন ব্যক্তির উপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা বৈধ মনে করেন না। সাহেবাইন (র.) -এর অভিমতও এরূপ, তবে তাঁদের মতে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়। তাদের মধ্য হতে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী যারা বিক্রি করে তাদের বিক্রি শুদ্ধ হবে। কেননা তারা বিক্রি করতে বাধ্য নয়। বিচারক মজুতদারের সন্তুষ্টি ব্যতীত তার খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এতে ইমামগণের সেই মতবিরোধই দেখা যায় যা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মাল বিক্রির ব্যাপারে ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, সকলের ঐকমত্যে বিচারক তা বিক্রি করতে পারবেন। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাধারণ জনগণের ক্ষতি বিদূরিত করার স্বার্থে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা বৈধ মনে করেন। এ মাসআলা তো সেরূপই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ وَتَعَدّٰى الخ : উপরের ইবারতে তিনটি মাসআলার বিবরণ দেওয়া হয়েছে–

১ম মাসআলা : বিচারক কর্তৃক যে মূল্য ধার্য করা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করে নিজ ইচ্ছানুযায়ী বেচাকেনা করে তাহলে হানাফী মাযহাবের সকল ইমামের মতে এ ব্যক্তির বিক্রি বৈধ হবে। বিচারকের উক্ত বেচাকেনা অবৈধ সাব্যস্ত করার অধিকার নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুযায়ী এ মাসআলার বিধান খুবই পরিষ্কার। আর তা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.) কোনো স্বাধীন ব্যক্তির উপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা অবৈধ মনে করেন। অতএব, বিক্রেতার বেচাকেনার অধিকার রয়েছে এবং সে তার বেচাকেনার ক্ষেত্রে স্বাধীন। সুতরাং তার কারবার জায়েজ।

সাহেবাইন (র.) যদিও স্বাধীন ব্যক্তির উপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জায়েজ মনে করেন কিন্তু তা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ব্যাপারে। আলোচ্য মাসআলায় বিক্রেতা যেহেতু অনির্দিষ্ট তাই তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না। অতএব, সে বেচাকেনার ব্যাপারে স্বাধীন। তাই তার কারবার বৈধ হবে। উল্লেখ্য যে, আইম্মায়ে ছালাছা এ মাসআলায় অনুরূপ মতই পোষণ করেন।

২য় মাসআলা : বিচারক বা নির্ধারণ শাসক কর্তৃক যে মূল্য বা নির্ধারণ করা হয়েছে যদি কোনো মজুতদার সেই ধার্যকৃত রেট অনুযায়ী বেচাকেনা করে তাহলে তার বেচাকেনা বৈধ এবং বিক্রেতার জন্য পরবর্তীতে সে বেচাকেনা রহিত করার অধিকার নেই। কেননা বিক্রেতাকে বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়নি [অবশ্য বাধ্য করা হলে তার বিক্রি রহিত করার অধিকার থাকত] বরং তাকে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে। যেহেতু বেচাকেনার ব্যাপারে সে স্বাধীন তাই তার বিক্রি শুদ্ধ হবে।

৩য় মাসআলা : যদি মজুতদার তার মজুতকৃত পণ্য বিক্রি করতে অস্বীকার করে তাহলে বিচারক তার পণ্য তার সন্তুষ্টি তথা অনুমতি ছাড়া বিক্রি করতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে কোনো কোনো ফকীহের মতে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুযায়ী বিচারক তা বিক্রি করার অধিকার রাখে না। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) -এর মতানুযায়ী তা বিক্রি করতে পারে।

এ মাসআলাটিতে যেরূপ মতবিরোধ বর্ণনা করা হলো ঋণগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তির মাল বিক্রি করে তার পাওনাদারের ঋণ শোধ করার ক্ষেত্রে বিচারকের অধিকার আছে কিনা তাতেও অনুরূপ মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তির মাল তার অনুমতি ছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুযায়ী বিক্রি করার অধিকার বিচারকের নেই। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) -এর মতে বিচারক এমন ব্যক্তির মাল বিক্রি করে পাওনাদারদের ঋণ শোধ করতে পারবেন।

অন্য অনেক ফকীহের মতে আলোচ্য মাসআলায় কোনো মতবিরোধ নেই। অর্থাৎ সকল ইমামের ঐকমত্যে বিচারক মজুতদারের মাল তার অনুমতি ব্যতীত বিক্রি করতে পারবেন। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, সাধারণ জনগণের ক্ষতি নিরসনের স্বার্থে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞাকে জায়েজ মনে করেন। আর এখানে মজুতদারের অনুমতি ছাড়া তার মাল বিক্রি করার যে অধিকার বিচারকের পক্ষে দেওয়া হচ্ছে তা তার উপর নিষেধাজ্ঞার মতোই। আর এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সাধারণ জনগণের স্বার্থেই।

অতএব, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী এটা জায়েজ।

এ ধরনের আরো বিভিন্ন বিষয়ে বিচারকের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করার অধিকার রয়েছে। যেমন– বিচারক আনাড়ি ডাক্তার, প্রতারক ও অজ্ঞ মুফতিদের কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন।

জ্ঞাতব্য :

ক. অপ্রয়োজনে মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া মাকরূহ।

খ. বিক্রেতার পক্ষ থেকে বেশি মূল্য আদায় করার অর্থ হলো দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করা।

গ. ব্যবসায়ীদের দ্বারা সাধারণ জনগণ নির্যাতিত হলে বিচারক বা শাসকের উপর মূল্য ধার্য করে দেওয়া আবশ্যক।

[তিনটি মাসআলাই ফাতাওয়ায়ে শামীর ৫ম খণ্ডের ২৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রয়েছে।]

ঘ. যদি মজুতদার বেচাকেনা বন্ধ করে দেয় তাহলে সকল ইমামের ঐকমত্যে তার মালামাল বিচারক বিক্রি করে দেবেন।

–[সাকবুল আনহার খ. ২, পৃ. ৪৭৭]

قَالَ : وَيُكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ فِيْ اَيَّامِ الْفِتْنَةِ مَعْنَاهُ مِمَّنْ يُعْرَفُ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْفِتْنَةِ لِاَنَّهُ تَسْبِيْبٌ اِلَى الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِى السِّيَرِ وَاِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْفِتْنَةِ لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ لِاَنَّهُ يَحْتَمِلُ اَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِى الْفِتْنَةِ فَلَا يُكْرَهُ بِالشَّكِّ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيْرِ مِمَّنْ يُعْلَمُ اَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا لِاَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تُقَامُ بِعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَغْيِيْرِهِ بِخِلَافِ بَيْعِ السِّلَاحِ فِيْ اَيَّامِ الْفِتْنَةِ لِاَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقُوْمُ بِعَيْنِهِ قَالَ : وَمَنْ اَجَرَ بَيْتًا لِيُتَّخَذَ فِيْهِ بَيْتَ نَارٍ اَوْ كَنِيْسَةٍ اَوْ بَيْعَةً اَوْ يُبَاعَ فِيْهِ الْخَمْرُ بِالسَّوَادِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا لَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُكْرِيَهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ لِاَنَّهُ اِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গোলযোগের সময় অস্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ। অর্থাৎ গোলযোগের মুহূর্তে এমন ব্যক্তির কাছে অস্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ যার সম্পর্কে পূর্ব থেকেই জানা আছে যে, লোকটি গোলযোগকারীদের একজন। কেননা এটা গুনাহের তথা গোলযোগ বৃদ্ধির কারণ হয়। এ বিষয়ে সিয়ার অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। আর যদি লোকটি ফিতনার সাথে জড়িত বলে পরিচিত না হয় তাহলে তার কাছে অস্ত্র বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা তার ব্যাপারে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে ফিতনার মধ্যে এগুলো ব্যবহার করবে না। সুতরাং সন্দেহের ভিত্তিতে বিক্রি করা মাকরূহ নয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আঙ্গুরের রস এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করাতে কোনো অসুবিধা নেই যার ব্যাপারে একথা সুস্পষ্টভাবে জানা আছে যে, সে এটা দ্বারা মদ তৈরি করবে। কেননা আঙ্গুরের রসের দ্বারা সরাসরি কোনো গুনাহের কাজ হয় না; বরং তা পরিবর্তনের পর। বিদ্রোহ চলাকালে অস্ত্র বিক্রির মাসআলা এর ব্যতিক্রম, কেননা হুবহু সেই অস্ত্র দ্বারাই গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো লোক তার গ্রামের ঘর ভাড়া দেয় অগ্নিপূজকদের উপাসনালয় বানানোর জন্য বা গীর্জা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অথবা ইহুদি সম্প্রদায়ের উপাসনালয় তৈরীর জন্য কিংবা মদ বিক্রি করার জন্য তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটি অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে এ ধরনের কোনো কাজে ঘর ভাড়া দেওয়া সমীচীন নয়। কেননা এটাতো গুনাহের কাজে সহযোগিতা করারই নামান্তর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيُكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ فِيْ اَيَّامِ الخ : উপরের ইবারতে ফেতনা বা গোলযোগ কিংবা বিদ্রোহ চলাকালে অস্ত্র বিক্রি করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত নকল করে ইরশাদ করেন যে, গোলযোগ ও বিদ্রোহ চলাবস্থায় যারা বিদ্রোহী বা গোলযোগসৃষ্টিকারী তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ। মাকরূহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো নিশ্চিতভাবে ফিতনাবাজ ও বিদ্রোহী সাব্যস্ত হতে হবে। অনুমানভিত্তিক কিছু করা যাবে না। কেননা এ ধরনের ব্যক্তিদের হাতে অস্ত্র বিক্রি করার অর্থ হলো ফিতনা ও বিদ্রোহে শক্তি যোগান দেওয়া। আর ফিতনা ও বিদ্রোহে মদদ যোগানোর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি ও অন্যায় কাজে সাহায্য করা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হলো- وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা গুনাহ ও অবাধ্যাচারণে পরস্পর সহযোগিতা করো না।'

قَوْلُهٗ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِى السِّيَرِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলাটি আমরা سِيَرٌ অধ্যায়ের শেষাংশে উল্লেখ করেছি।

আর যদি ক্রেতা ফিতনাবাজ ও বিদ্রোহী হিসেবে পরিচিত না হয় তাহলে শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তার কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করা সমীচীন নয় এবং অস্ত্র বিক্রি করলে তা মাকরূহও হবে না। কেননা কোনো সন্দেহের ভিত্তিতে বেচাকেনা করা মাকরূহ নয়।

قَوْلُهٗ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الخ : উপরের ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে–

১ম মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি এমন লোকের কাছে আঙ্গুরের রস বিক্রি করে যে তা দ্বারা মদ বানাবে বলে দৃঢ়ভাবে জানা থাকে তাহলে তার এ বিক্রি বৈধ। নিশ্চিতভাবে মদ বানাবে এ কথা জানা সত্ত্বেও তার নিকট বিক্রি মাকরূহ নয়। কারণ মদ তৈরির ফলে যে গুনাহের কাজ হবে তা সরাসরি আঙ্গুরের রস দ্বারা তো হয়নি; বরং আঙ্গুরের রসের পরিবর্তিত রূপ তথা মদের দ্বারা যেহেতু হুবহু আঙ্গুরের দ্বারা গুনাহের কাজ হয় না তাই এর বিক্রি বৈধ।

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ بَيْعِ السِّلَاحِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটি পূর্ববর্ণিত বিদ্রোহের সময় অস্ত্র বিক্রির মাসআলার বিপরীত মাসআলা। কেননা সেখানে যে অস্ত্র বিক্রি করা হয়েছিল সরাসরি তা দ্বারাই গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়। উল্লিখিত পার্থক্যের কারণে আঙ্গুরের রস বিক্রি জায়েজ আর বিদ্রোহের বা ফিতনার সময় অস্ত্র বিক্রি মাকরূহ।

জ্ঞাতব্য : শ্মশ্রুবিহীন বালক এমন কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা মাকরূহ যার ব্যাপারে জানা আছে যে, সে বালকের সাথে বলৎকার করে। –[বিস্তারিত দেখুন, শামী খ. ৫, পৃ. ২৫০]

২য় মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি গ্রামাঞ্চলে তার নিজ ঘর ভাড়া দেয়, যাতে ভাড়াটিয়ারা তাতে অগ্নিপূজকদের উপাসনালয় তৈরি করে অথবা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গীর্জা বানায় অথবা ইহুদি সম্প্রদায়ের ইবাদতখানা তৈরি করে কিংবা মদ বিক্রির ঘর হিসেবে তা ব্যবহার করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) মতানুযায়ী উক্ত কাজের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া দোষের কিছু নয়। উল্লেখ্য যে, এ মাসআলায় ইবারতে গ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা শহরাঞ্চলের গীর্জা, মন্দির ও মদ বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তবে গ্রামে এগুলো নির্মাণ করতে বাধা নেই। তার কারণ হলো, ইসলামের প্রতীকসমূহ যেমন– জুমা, ঈদ, হুদূদ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় শহরের সাথে খাস। সুতরাং শহরাঞ্চলে যদি অমুসলিমদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে ইসলামের অবমাননা করা হয়।

قَوْلُهٗ وَقَالَا لَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُكْرِيَهٗ الخ : সাহেবাইন (র.) বলেন, কোনো মুসলমানের জন্য উপরে উল্লিখিত বিধর্মীদের প্রতিষ্ঠান বানানোর উদ্দেশ্যে তার ঘর ভাড়া দেওয়া সমীচীন নয়। আইম্মায়ে ছালাছার একই অভিমত। কারণ এরূপ ভাড়া দেওয়ার দ্বারা গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা হয়।

وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَرِدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ وَلِهٰذَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيْمِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيْهِ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيْهِ فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ عَنْهُ وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ بِالسَّوَادِ لِأَنَّهُمْ لَا يُمَكَّنُوْنَ مِنْ اِتِّخَاذِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَإِظْهَارِ بَيْعِ الْخُمُوْرِ وَالْخَنَازِيْرِ فِي الْأَمْصَارِ لِظُهُوْرِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فِيْهَا بِخِلَافِ السَّوَادِ قَالُوْا هٰذَا كَانَ فِيْ سَوَادِ الْكُوْفَةِ لِأَنَّ غَالِبَ أَهْلِهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَأَمَّا فِيْ سَوَادِنَا فَأَعْلَامُ الْإِسْلَامِ فِيْهَا ظَاهِرَةٌ فَلَا يُمَكَّنُوْنَ فِيْهَا أَيْضًا وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَ : وَمَنْ حَمَلَ الذِّمِّيَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ يَطِيْبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) يُكْرَهُ لَهُ ذٰلِكَ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشْرًا حَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَ إِلَيْهِ وَلَهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ فِيْ شُرْبِهَا وَهُوَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُوْرَاتِ الْحَمْلِ وَلَا يَقْصِدُ بِهِ وَالْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُوْنِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, ভাড়া দেওয়ার কাজটি [ইজারা] ঘরের বিশেষ সুবিধাভোগের উপর সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই ঘর সমর্পণ করার দ্বারাই ভাড়া ওয়াজিব হয়। আর এতটুকুতে কোনো গুনাহ নেই। গুনাহ সংঘটিত হয় ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তির কর্মকাণ্ড দ্বারা। আর সে তো তার কাজে স্বাধীন। সুতরাং তার কাজের সম্পর্ক ভাড়া দেওয়ার সাথে ছিন্ন হয়েছে। আর [উপরিউক্ত ভাড়া দেওয়ার কাজটি] গ্রামের সাথে খাস করেছেন। কেননা তাদের পক্ষে শহরে গীর্জা, উপাসনালয়, প্রকাশ্যে মদ ও শূকর বিক্রি করা সম্ভব নয়। ইসলামের প্রতীকসমূহ শহরে প্রকাশিত থাকার কারণে। গ্রামের বিষয়টি এমন নয়। মাশায়েখ বলেন, এ বিধান কূফার গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা সেখানকার গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী জিম্মি সম্প্রদায়ের লোক। আর আমাদের গ্রামাঞ্চলে ইসলামের চিহ্নসমূহ প্রকাশমান। সুতরাং তাতে এরা এ সুযোগ লাভ করবে না। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো জিম্মির মদ বহন করে দিল ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুযায়ী তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। অপর পক্ষে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার জন্য পারিশ্রমিক [গ্রহণ করা] মাকরূহ। কেননা এটা গুনাহের কাজে সহায়তা করা হলো। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মদ সংক্রান্ত ব্যাপারে দশ ব্যক্তির উপর লা'নত [অভিশাপ] দিয়েছেন। এর মধ্যে বাহক ও যার কাছে বহন করে নেওয়া হয় [তারা উভয়ে রয়েছেন।] ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, গুনাহ হয় মদ পান করার মধ্যে। আর এটা তো একজন স্বাধীন ব্যক্তির কাজ। আর পান করার জন্য তো বহন করা আবশ্যক নয়। তাছাড়া বহনকারী তো মদ পানের ইচ্ছা করেনি। আর হাদীসে যে বহনের উপর লা'নত বা অভিশাপ দেওয়া হয়েছে তা গুনাহের উদ্দেশ্যে বহনের সাথে সংযুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ الخ : চলমান ইবারতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আলোচ্য ঘরে ভাড়ার চুক্তিটি হয়েছে ঘরের সুবিধাভোগের উপর। এ কারণে ঘরটি ভাড়ার জন্য সোপর্দ করার দ্বারাই ভাড়া ওয়াজিব হয়ে যায়। আর ঘর ভাড়া দেওয়ার মধ্যে তো কোনো রকম গুনাহ নেই।

এখানে গুনাহের কাজ যা পরে সংঘটিত হয়েছে তা ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তির কর্মকাণ্ড দ্বারা, আর ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তি তার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে স্বাধীন। অতএব, ভাড়া গ্রহণকারীর কর্মকাণ্ড ভাড়াদানকারীর সাথে সম্পর্কিত হবে না। অর্থাৎ ভাড়া গ্রহণ করার পর সংঘটিত গুনাহের দায় তার উপর বর্তাবে না।

আল্লামা সারাখসী (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলাটি এমন হলো যে, কোনো ব্যক্তি তার দাসীকে এমন লোকের কাছে বিক্রি করল যার সম্পর্কে সে জানে যে, দাসীর ইসতিবরা করবে না অথবা সে তার সাথে অন্য কোনো অবৈধ কাজ করবে এমতাবস্থায় ক্রেতার ঐ কাজগুলোর কারণে দাসী বিক্রেতা গুনাহগার হবে না। [সূত্র বিনায়া]

জ্ঞাতব্য : উল্লেখ্য, আলোচ্য দলিলের উপর এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, উল্লিখিত সুরত এবং বিদ্রোহীর হাতে অস্ত্র বিক্রি করা প্রায় একই ধরনের এবং এ দুটি মাসআলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অতএব, সে অনুযায়ী এর বিধানও সেই মাসআলার মতো হওয়া উচিত। সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখুন।

قَوْلُهُ إِنَّمَا قَيَّدَهُ بِالسَّوَادِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ঘর ভাড়া দেওয়ার মাসআলাটি গ্রামের সাথে কেন খাস করা হলো তা বর্ণনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, গ্রামের সাথে ঘর ভাড়া দেওয়ার মাসআলাটি এজন্য খাস করা হয়েছে যে, শহরের মধ্যে গীর্জা, ইহুদিদের ইবাদতখানা, প্রকাশ্যে মদ ও শূকর বিক্রি করা নাজায়েজ। কারণ ইসলামি রাষ্ট্রের শহরসমূহে ইসলামের মৌলিক প্রদর্শনীয় বিষয়গুলো ও প্রতীকসমূহ থাকে। এমতাবস্থায় যদি শহরে বিধর্মীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ইসলামে চরমভাবে নিষিদ্ধ [যেমন– মদ ও শূকর] বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে প্রকারান্তরে ইসলামেরই অবমাননা করা হয়।

قَالُوْا هٰذَا كَانَ الخ : মাশায়েখ বলেন, আলোচ্য ইবারতে যে سَوَادٌ বা গ্রামাঞ্চলের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা সব ধরনের গ্রাম উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে উদ্দেশ্য কূফা শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল। কারণ তৎকালে কূফার গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ লোকেরা অমুসলিম তথা জিম্মি ছিল। সুতরাং কোনো এলাকায় বর্তমানেও যদি অমুসলিম লোকদের প্রাধান্য হয় তাহলে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি গ্রামাঞ্চলে অমুসলিম ও মুসলিম সমান সমান হয় কিংবা মুসলিমদের প্রাধান্য হয় তাহলে শহর ও গ্রামের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না।

উল্লেখ্য যে, হিদায়া ২য় খণ্ডের ৫৭৭ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ حَمَلَ الخ : চলমান ইবারতে মুসান্নিফ (র.) মুসলমান কর্তৃক মদ বহন করার মাসআলা আলোচনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোনো মুসলমান কুলি কোনো অমুসলিম [জিম্মি]-এর মদ বা মাদকদ্রব্য বহন করে দেয় তাহলে উক্ত বহন করার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যাবে কিনা এ নিয়ে ইমাম আ'যম (র.) ও সাহেবাইন (র.) -এর মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম আযম (র.) -এর মতে উক্ত বাহকের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ।

পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) -এর মতে যেহেতু তার এই কর্ম দ্বারা গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা হয় তাই এর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ বলেন। তারা এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর একটি বিখ্যাত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

মুসান্নিফ (র.) খুবই সংক্ষেপে ঐ হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আমরা হাদীসটির পুরো অংশ এখানে উল্লেখ করলাম। উল্লেখ্য যে, এ হাদীস হযরত ইবনে ওমর (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আনাস (রা.) প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবী থেকে বর্ণিত।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর হাদীসটি এই–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمْ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ (رضـ) يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعِهَا وَعَاصِرَهَا وَأَكِلَ ثَمَنِهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মদ, তার পানকারী, তার সাকী, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, আঙ্গুরের রস তৈয়ারকারী, এর মূল্য ভক্ষণকারী, রস তৈরির হুকুমদাতা, এটি বহনকারী ও যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের সকলের উপর আল্লাহর লানত।

ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম আহমদ (র.) ও ইমাম আবূ বকর ইবনে শায়বা প্রমুখ মুহাদ্দিস এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আনাস (রা.) -এর হাদীস প্রায় কাছাকাছি শব্দে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসগুলোর মধ্যে মদ বহনকারী ব্যক্তিকে আল্লাহর লানতের উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব, এ হাদীসগুলো দ্বারা মদ বা মাদকদ্রব্য বহনকারীর জন্য উক্ত কাজ যে অবৈধ তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।

আলোচ্য মাসআলায় আইম্মায়ে ছালাছা সাহেবাইনের অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। দলিলের বিবেচনায় তাদের মাযহাবের প্রাধান্য সুস্পষ্ট।

অন্যদিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল দুর্বল। কারণ মদের গুনাহ্ শুধুমাত্র পান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যদি তাই হতো তাহলে শরাব বা মাদক তৈরিকারী ব্যক্তিও গুনাহগার হতো না। তদ্রূপ তা ক্রয়বিক্রয়কারীও গুনাহগার হতো না। সুতরাং এ মাসআলায় ইমাম আ'যম (র.)-এর অভিমত দুর্বল এবং সাহেবাইন (র.) -এর মত শক্তিশালী। তাই তাদের মতের ভিত্তিতে ফতোয়া দেওয়া হবে।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بِنَاءِ بُيُوْتِ مَكَّةَ وَيُكْرَهُ بَيْعُ أَرْضِهَا وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا بَأْسَ بِبَيْعِ أَرْضِهَا أَيْضًا وَهٰذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) لِأَنَّهَا مَمْلُوْكَةٌ لَهُمْ لِظُهُوْرِ الْاِخْتِصَاصِ الشَّرْعِيِّ بِهَا فَصَارَ كَالْبِنَاءِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও ইমারত বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এর ভূমি বিক্রি করা মাকরূহ। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, মক্কা শরীফের ভূমি বিক্রি করাতেও কোনো দোষ নেই। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি মত। কেননা জমি তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তি। এতে মালিকানার শরিয়ত সম্মত বৈশিষ্ট্যাবলি স্পষ্ট। সুতরাং এটা ইমারতের মতোই হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بِنَاءِ الخ : পবিত্র মক্কা নগরীর ভূমি ও তাতে অবস্থিত ঘরবাড়ি এবং অন্যান্য নির্মাণ অবকাঠামো বিক্রি করা যায় কিনা তাই উপরের ইবারতে আলোচিত হয়েছে। মক্কা নগরীতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও অন্যান্য অবকাঠামো বিক্রি করা সকলের মতে বৈধ। কারণ এগুলো নির্মাতার মালিকানাধীন সম্পত্তি। তাই এর বিক্রির অধিকার নির্মাতার থাকবে বৈকি। তবে মক্কা শরীফের জমি বিক্রির ব্যাপারে সাহেবাইন ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আর এখানে সাহেবাইন (র.) -এর মতে ঘরবাড়ির মতো জমি বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। পক্ষান্তরে ইমাম সাহেবের মতে তা বিক্রি করা মাকরূহ হবে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, মক্কা শরীফের জমিতে মালিকানার যাবতীয় শরয়ী বৈশিষ্ট্যাবলি পাওয়া যায়। যেমন– যদি এ জমির মালিক মারা যায় তাহলে তার উত্তরাধীকারগণ সে জমির মালিক হয় উত্তরাধীকার বন্টনের ভিত্তিতে এবং রাসূল ﷺ -এর জামানা থেকে আজ পর্যন্ত তা হয়ে আসছে।

যেহেতু মক্কা শরীফের জমির মধ্যে উত্তরাধীকারীদের হিসসা প্রদানের জন্য বা অংশ নির্ধারণের বণ্টন পদ্ধতি রাসূল ﷺ -এর জমানা থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে তাই এর মধ্যে বেচাকেনাও চলবে। অতএব, জমি বিক্রির হুকুম ইমারতের মতো হয়ে গেল। অর্থাৎ ইমারতের মতো জমি বিক্রি বৈধ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সাহেবাইন (র.) -এর অনুরূপ অভিমত ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও বর্ণিত আছে। তাঁর এ মতটি ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম কারখী (র.) স্বীয় মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) একই অভিমত পোষণ করেন।

বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ইমাম ত্বাহাবী (র.) মাকরূহ না হওয়ার মতটিকে প্রাধান্য দেন। আর এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ নামক গ্রন্থে একটি রেওয়ায়েত পেশ করেন, যা দ্বারা মক্কা শরীফের জমি বেচাকেনা করা যে বৈধ তাতে রাসূল ﷺ -এর অনুমোদন পাওয়া যায়। হাদীসটি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। হাদীসটি এই–

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْزِلْ فِيْ دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ وَدُوْرٍ (اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُمَا) هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلًا وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ اَبَا طَالِبٍ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ لِاَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ.

অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের সময় হযরত রাসূল ﷺ -কে সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার বাড়িতে আপনি অবস্থান করুন। রাসূল ﷺ বললেন, আকীল ইবনে আবী তালিব কি আমাদের ঘরবাড়ি কিছু রেখেছে? [বুখারী ও মুসলিম (র.) তাদের কিতাবে নিম্নোক্ত শব্দে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন] আকীল কি আমাদের জন্য কোনো বাড়ি রেখেছে! আকীল আবূ তালিবের উত্তরাধিকারী হয় কিন্তু আলী (রা.) ও জাফর (রা.) তার উত্তরাধিকারী হননি। কারণ তাঁরা ছিলেন মুসলমান, আর আকীল ও তালিব ছিলেন কাফের। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) বলতেন, কোনো মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হবে না।

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মক্কা শরীফের ভূমির মালিকানা লাভ করা যায় এবং তাতে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হয়। কেননা এতে আকীল ও তালিবের উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়টি রয়েছে এবং আকীল কর্তৃক তার মিরাশি সম্পদ বিক্রির কথাও রয়েছে। –[সূত্র বিনায়া, খ. ১১, পৃ. ২৫৫]

وَلِأَبِي حَنِيْفَةَ (رح) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا إِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُوْرَثُ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ مُحْتَرَمَةٌ لِأَنَّهَا فِنَاءُ الْكَعْبَةِ وَقَدْ ظَهَرَ أَثَرُ التَّعْظِيْمِ فِيْهَا حَتَّى لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا فَكَذَا فِي حَقِّ الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ خَالِصُ مِلْكِ الْبَانِي وَيُكْرَهُ إِجَارَتُهَا أَيْضًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَجَرَ أَرْضَ مَكَّةَ فَكَأَنَّمَا أَكَلَ الرِّبٰوا وَلِأَنَّ أَرَاضِي مَكَّةَ تُسَمَّى السَّوَائِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا سَكَنَهَا وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا أَسْكَنَ غَيْرَهُ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস– "সাবধান! নিশ্চয়ই মক্কা সংরক্ষিত এলাকা। এর ভূমি বিক্রি করা যাবে না এবং এতে উত্তরাধীকারও প্রতিষ্ঠিত হবে না।" তাছাড়া মক্কা শরীফের ভূমি স্বাধীন ও সম্মানিত। কেননা মক্কার ভূমি কা'বা শরীফের প্রাঙ্গণ ও আঙ্গিনা। এটি সম্মানিত হওয়ার নিদর্শন ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাই এর শিকারি জন্তু তাড়ানো হয় না, এর ঘাস কাটা হয় না এবং এর কাটা কেটে দেওয়া হয় না বা ভেঙ্গে দেওয়া হয় না। সুতরাং বেচাকেনার ক্ষেত্রেও এটা সম্মানিত সাব্যস্ত হবে। কিন্তু ইমারতের বিষয়টি এমন নয়। ইমারত তো নির্মাণকারীর মালিকানাধীন সম্পত্তি। এর সম্পত্তি ভাড়া দেওয়া মাকরূহ। কেননা রাসূল ﷺ মক্কার ভূমি ব্যবহারের ব্যাপারে বলেছেন, যে ব্যক্তি মক্কার জমি ভাড়া দেবে সে যেন সুদ খেল। অধিকন্তু মক্কা শরীফের ভূমিকে রাসূল ﷺ-এর যুগে সায়বা [যার উপর কারো আধিপত্য নেই] ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ ভূমির মুখাপেক্ষী সে তাতে বসবাস করবে, আর যে এর প্রতি মুখাপেক্ষী নয় সে অন্যকে সেখানে থাকার সুযোগ করে দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيْفَةَ (رح) قَوْلُهُ عَلَيْهِ الخ : চলমান ইবারতে মুসান্নিফ (র.) পূর্বে উল্লিখিত মাসআলায় ইমাম আযম (র.) যে মাযহাব বয়ান করেছেন তার দলিল উল্লেখ করেছেন।

তাঁর প্রথম দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস। যে হাদীসে নবী ﷺ বলেন– إِلَّا إِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُوْرَثُ অর্থাৎ 'সাবধান! মক্কা শরীফ সংরক্ষিত ও সম্মানিত এলাকা। এর জমি বিক্রি করাও যায় না এবং এতে উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয় না।'

আলোচ্য হাদীসটি মুসতাদরাকে হাকেমে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত আছে–

عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةُ مَنَاخٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُؤْجَرُ بُيُوْتُهَا.

এছাড়া ভিন্ন আরেকটি সনদে এভাবে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَأَكْلُ ثَمَنِهَا.

এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মক্কা শরীফের জমি বেচাকেনা করা অবৈধ।

যৌক্তিক দলিল হলো, কা'বা ঘর ওয়াক্ফ করা হয়েছে এর বেচাকেনা অবৈধ। মক্কা শরীফের জমি যেহেতু কা'বা শরীফের আঙ্গিনা বা উঠানের পর্যায়ে গণ্য হয় তাই সেগুলো বিক্রি করা বৈধ নয়।

তাছাড়া পুরো মক্কা যে বিশেষভাবে সম্মানিত তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল ﷺ কা'বার হুরমতের ব্যাপার বলেছেন, মক্কাতে অর্থাৎ হারামের কোনো ঘাস, এমনকি কাটাও পর্যন্ত কেটে ফেলা অবৈধ। তাই মক্কার জমিন বিক্রি অবৈধ হবে বৈকি।

মোটকথা হাদীসে মক্কা শরীফের যে সম্মানের কথা বলা হয়েছে তার সে সম্মান রক্ষা করার স্বার্থে এর জমি বেচাকেনা অবৈধ হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ اِجَارَتُهَا اَيْضًا الخ : ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী মক্কার জমি ইজারা দেওয়া বা চুক্তিভিত্তিক বন্ধক প্রদান করা মাকরূহ। মাকরূহ হওয়ার দলিল রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীস। তিনি বলেন- مَنْ اٰجَرَ اَرْضَ مَكَّةَ فَكَاَنَّهَا اَكَلَ الرِّبَا অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মক্কার জমি ভাড়া দেয় [এবং তার বিনিময় ভোগ করে] সে যেন সুদ খায়।'

আলোচ্য হাদীসটি সম্পর্কে হাফেজ জামালুদ্দীন [আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ] যায়লাঈ (র.) বলেন, এ শব্দে হাদীসটি পাওয়া যায় না।

অবশ্য كِتَابُ الْاٰثَارِ -এ ইমাম মুহাম্মদ (র.) নিম্নোক্ত সনদে হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন-

اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ وَعَنْ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ مِنْ اُجُوْرِ بُيُوْتِ مَكَّةَ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا .

অর্থাৎ এ হাদীস দ্বারা পূর্বে উল্লিখিত হাদীসের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তাছাড়া হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে মক্কায় অবস্থানকারীদের ঘরবাড়িতে দরজা দিতে নিষেধ করতেন, যাতে মুসাফিরগণ তাদের নিজ সুবিধামত স্থানে থাকতে পারে। আর তখনকার যুগে সাধারণত সকলেই তাদের ঘরবাড়ি মুসাফিরদের জন্য অবারিত রাখতেন। তারা মূলত এক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ [মক্কা নগরীকে / মসজিদে হারাম ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাকে] আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমভাবে।

قَوْلُهُ وَلِاَنَّ اَرَاضِىْ مَكَّةَ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মক্কার জমিতে কোনো ঘর ভাড়া দেওয়া যে নাজায়েজ তার স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন। তা এই যে, মক্কা নগরীর ভূমিকে রাসূল ﷺ-এর যুগে سَوَائِبُ -এর মধ্যে গণ্য করা হতো। سَوَائِبُ শব্দটি سَائِبَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো মালিকানাবিহীন যা দ্বারা যে কেউ উপকৃত হতে পারে। সুতরাং মক্কা শরীফের ভূমি সবার জন্য অবারিত ছিল। এতে কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য ভাড়া দেওয়া এবং তা ভোগ করা বৈধ নয়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ত্বাহাবী (র.) হযরত আলকামা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি হলো-

تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ وَرِبَاعُ مَكَّةَ تُدْعٰى السَّوَائِبَ مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنٰى اَسْكَنَ .

অর্থাৎ রাসূল ﷺ, হযরত আবূ বকর (রা.), ওমর (রা.) ও ওসমান (রা.) ইন্তেকাল করেন এমতাবস্থায় মক্কা শরীফের ভূমিসমূহ سَوَائِبُ বলে গণ্য হতো। যার প্রয়োজন হতো সে থাকত, আর প্রয়োজন না হতো সে অন্যকে থাকতে দিত।

একই বক্তব্যের আরো কয়েকটি হাদীস আল্লামা আইনী (র.) নকল করেছেন।

অন্যদিকে সাহেবাইন (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত হলো, মক্কার জমি ও বাড়ি বেচাকেনা করা ও তা ভাড়া দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে আমরা তাদের দলিল পেশ করেছি। নিম্নে এ ব্যাপারে ইমাম ইসহাক, ইমাম আহমদ (র.) -এর সাথে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর একটি বিতর্ক এখানে উপস্থাপন করা হলো।

ইমাম বায়হাকী (র.) তাঁর اَلْمَعْرِفَةُ গ্রন্থে এ বির্তকটি ইমাম ইসহাক (র.) -এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইসহাক (র.) বলেন, একদা আমরা মক্কায় অবস্থান করছিলাম। আমাদের সাথে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, চলুন, আপনাকে এমন একজন লোক দেখাব যার মতো কাউকে আপনি কখনো দেখেননি, অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)। আমি তাঁর সাথে গেলাম এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর অন্যতম উস্তাদ ইমাম শাফেয়ী (র.) কে দেখলাম। আমি ইমাম আহমদ (র.)-কে বললাম, আমি তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তিনি বললেন, বলুন। অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আব্দুল্লাহ ! মক্কার বাড়িঘর ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, এতে তো কোনো সমস্যা দেখি না।

আমি বললাম, সমস্যা নয় কি? অথচ হযরত ওমর (রা.) বলেছেন–

يَا اَهْلَ مَكَّةَ لَا تَجْعَلُوْا عَلٰى دُوْرِكُمْ اَبْوَابًا لِيَنْزِلَ الْبَادِىْ حَيْثُ شَاءَ.

অর্থাৎ 'হে মক্কার অধিবাসী ! তোমরা তোমাদের বাড়িতে দরজা দিয়ো না। আর এটা এজন্য যে, যাতে আগন্তুকরা এসে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারে।' সাঈদ ইবনে জুবাইর ও মুজাহিদ (র.) মক্কায় [যেখানে খুশি] অবস্থান করতেন এবং চলে যেতেন তাদের কোনো বিনিময় দিতেন না। এর উত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত অধিকতর উত্তম। আমি বললাম, এ ব্যাপারে কি রাসূল ﷺ -এর সুন্নত আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلًا 'আকীল ইবনে আবূ তালিব কি আমাদের জন্য কোনো বাড়ি রেখেছে ?' কেননা আকীল আবূ তালিবের ওয়ারিশ হয়েছে। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এবং জা'ফর (রা.) তার ওয়ারিশ হতে পারেননি। তাঁরা মুসলমান ছিলেন। যদি মক্কা শরীফের স্থানসমূহে মালিকানা না চলত তাহলে রাসূল ﷺ কি করে বললেন যে, সে কি আমাদের জন্য ছেড়ে গেছে কোনো বাড়িঘর। অথচ তা কারো মালিকানাধীন নয় ? বর্ণনাকারী বলেন, ইমাম আহমদ (র.) বিষয়টি উত্তম মনে করলেন। আর তিনি বললেন, এটি তো আমার মনে আসেনি।

অতঃপর ইসহাক (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) -কে বললেন, আল্লাহ তো বলেছেন– سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ 'এতে মুসাফির ও স্থানীয় সকলেই সমান।' উত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, আয়াতের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করুন– وَالْمَسْجِدِ الَّذِىْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً 'মসজিদে হারামকে আমি স্থানীয় ও মুসাফির সকলের জন্য সমান করেছি।' আপনি যা ধারণা করছেন যদি তা সত্য হয় তাহলে তো কারো জন্য মক্কা শরীফে হারানো বস্তু তালাশ করা, উষ্ট্রী/উট নহর করা ও উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়া কোনো কিছুই বৈধ হবে না। আয়াতের মধ্যে মুসাফির ও স্থানীয় ব্যক্তির যে সমধিকারের কথা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র মসজিদে হারামের ব্যাপারে। রাবী বলেন, অতঃপর ইসহাক ইবনে রাহওয়াই চুপ হলেন। –[নাসবুর রায়াহ খ. ৪, পৃ. ২৬৬-২৬৭]

উপরের ঘটনাটিতে যেহেতু উভয় পক্ষের প্রমাণাদি রয়েছে তাই তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সাহেবাইন (র.) কর্তৃক উদ্ধৃত দলিলসমূহও যথেষ্ট শক্তিশালী। এমনকি দুররে মুখতার গ্রন্থে মক্কা শরীফের জমি ও বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে সাহেবাইন (র.)-এর উক্তির উপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। দুররে মুখতারের ইবারত হলো– وَجَاءَ بَيْعُ بِنَاءِ بُيُوْتِ مَكَّةَ وَاَرْضِهَا بِلَا كَرَاهَةٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ وَبِهِ يُفْتٰى

আর ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে মুখতারাতুন নাওয়াযিল (مُخْتَارَاتُ النَّوَازِلِ) গ্রন্থে বলা হয়েছে– وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بِنَائِهَا وَاِجَارَتِهَا 'মক্কা শরীফের ঘর বিক্রি ও ভাড়া দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।'

পক্ষান্তরে ইমাম যায়লাঈ ও অন্যান্য কিতাবে ভাড়া দেওয়া মাকরূহ বলা হয়েছে। তাতার খানিয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইমাম আযম (র.) হজের মৌসুমে এরূপ ভাড়া দেওয়া মাকরূহ বলেছেন, অন্য সময় তা মাকরূহ নয়।

–[দুররে মুখতার- খ. ৯, পৃ. ৫৬৩]

وَمَنْ وَضَعَ دِرْهَمًا عِنْدَ بَقَّالٍ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ يَكْرَهُ لَهُ ذٰلِكَ لِاَنَّهُ مِلْكُهُ قَرْضًا جَرَّ بِهِ نَفْعًا وَهُوَ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ حَالاً فَحَالاً وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا وَيَنْبَغِيْ اَنْ يَسْتَوْدِعَهُ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ جُزْءًا فَجُزْءًا لِاَنَّهُ وَدِيْعَةٌ وَلَيْسَ بِقَرْضٍ حَتّٰى لَوْ هَلَكَ لَا شَيْءَ عَلَى الْاٰخِذِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

অনুবাদ : যদি কেউ কোনো দোকানদারের কাছে এক দিরহাম [কিছু টাকা] এ শর্তে রাখে যে, যখন তার প্রয়োজন হবে সে সদাই [পণ্যদ্রব্য] নিবে তাহলে তা মাকরূহ। কেননা সে দোকানদারকে এমন কর্জ দিয়ে মালিক বানিয়ে দিয়েছে যে কর্জ থেকে সে উপকৃত হচ্ছে। উপকার এই যে, সে তার [দোকানদার] থেকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন দ্রব্যাদি নেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কর্জকে নিষিদ্ধ করেছেন যা সুবিধা ভোগ করে। তার উচিত দোকানদারের কাছে টাকা আমানত রেখে বিনিময় হিসেবে যা ইচ্ছা নেওয়া। [এরূপ করা জায়েজ] কারণ এটা আমানত, কর্জ নয়। সুতরাং যদি উক্ত টাকা খোয়া যায় তাহলে গ্রহণকারীর উপর কোনো জরিমানা হবে না। সব বিষয়ে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ وَضَعَ دِرْهَمًا عِنْدَ بَقَّالٍ الخ : উপরের ইবারতে কর্জ দিয়ে তা থেকে উপকার ভোগ ও আমানত রেখে তা থেকে উপকার ভোগের হুকুম ও এ দুয়ের মাঝে কি পার্থক্য? তা আলোচনা করা হয়েছে।

১ম মাসআলা : একব্যক্তি একজন দোকানদারের কাছে কিছু টাকা দিয়ে বলল, [আমার কাছে টাকা খরচ হয়ে যায়] আপনি টাকাগুলো রাখুন। আমি আপনার থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নেব। এ সুরতটিকে ওলামায়ে কেরাম মাকরূহ বলেছেন। তার কারণ হলো, যে পরিমাণ টাকা খরিদদার দোকানদারের কাছে রেখেছে তা কর্জ হিসেবে রেখেছে। অর্থাৎ কর্জের মাধ্যমে দোকানদার কে সে মালিক বানিয়ে দিয়েছে। আর এটা এমন কর্জ যা থেকে উপকার ভোগ করছে। উপকার হলো, ক্রেতা তার প্রয়োজনানুযায়ী সময়ে সময়ে অল্প অল্প করে বিভিন্ন দ্রব্যাদি নিচ্ছে।

হাদীস শরীফে কর্জ দিয়ে তা থেকে যে কোনোভাবে উপকৃত হওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে। আলোচ্য কর্জটি যেহেতু সে রকম তাই এটি নিষিদ্ধ হবে।

২য় মাসআলা : قَوْلُهُ يَنْبَغِيْ اَنْ يَسْتَوْدِعَهُ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় মাসআলার বর্ণনা শুরু করেছেন। দ্বিতীয় মাসআলাটি মূলত প্রথম মাসআলার অনুরূপ তবে এটি মাকরূহ নয়। মাকরূহ থেকে বাঁচার উপায় মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় মাসআলায় উল্লেখ করেছেন।

তা হলো, যে ক্রেতা তার কাছে টাকা থাকলে খরচ হয়ে যাবে মনে করছেন তিনি উক্ত টাকা দোকানদারের কাছে আমানত হিসেবে রেখে দেবেন। অতঃপর দোকানদার থেকে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সময়ে সময়ে অল্প অল্প করে নিতে থাকবেন।

এখন এরূপ করাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা ক্রেতার রাখা মুদ্রা আমানত সাব্যস্ত হবে। আমানতের মাল যেহেতু হস্তক্ষেপ করা যায় না তাই দোকানদারের জন্য উক্ত টাকায় হস্তক্ষেপ করা অবৈধ হবে। আর যদি উক্ত টাকা দোকানদারের কাছে কোনো হস্তক্ষেপ করা ছাড়া নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর কোনো জরিমানা তাকে দিতে হবে না। কেননা আমানতের কোনো জরিমানা নেই। অবশ্য কর্জের জরিমানা রয়েছে এবং তাতে হস্তক্ষেপ করার পুরো অধিকার কর্জগ্রহীতার রয়েছে। আর এটা স্বাভাবিক রীতি যে, যে ভোগ করবে তাকেই জরিমানার দায় বহন করতে হবে। আর যার ভোগের অধিকার নেই তার উপর জরিমানাও নেই।

জ্ঞাতব্য : ক. بَقَّالْ শব্দের অভিধানগত অর্থ– সবজি বিক্রেতা। তবে পরবর্তীতে মুদি মনোহরি ও অন্যান্য আসবাবপত্র বিক্রেতাকেও بَقَّالْ বলা হয়।

বর্তমানে সৌদি আরবে মুদি ও জেনারেল স্টোরকে بَقَّالَةٌ বলা হয়। সিরিয়ার লোকেরা بَقَّالْ -কে قَاضِيْ ও মিশরের লোকেরা زَيَّاتٌ বলে থাকে।

খ. আলোচ্য ইবারতে قَرْض শব্দের কোনো উল্লেখ নেই; বরং এখানে عِنْدَ بَقَّالٍ শব্দ রয়েছে। সাধারণত عِنْدَ শব্দ দ্বারা আমানতের অর্থ গ্রহণ করা হয়। তাহলে লেখক - قَرْض -এর অর্থ কোথায় পেলেন। এটি একটি প্রশ্ন। এর উত্তর হলো, মুসান্নিফ (র.) يَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ শব্দটিকে শর্তের অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ক্রেতা দোকানিকে টাকা দিয়ে শর্তারোপ করেছে যে, সে যা ইচ্ছা দোকান থেকে নিবে। উক্ত শর্তের কারণে মনে করা হয়েছে যে, দোকানিকে উক্ত দিরহামের মালিক বানিয়ে দিয়েছে। যদি ক্রেতা শর্ত না দিয়ে টাকা রাখত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল নিত তাহলে বিষয়টি মাকরূহ হতো না।

مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ
বিবিধ মাসায়েল

قَالَ : وَيُكْرَهُ التَّعْشِيْرُ وَالنَّقْطُ فِى الْمُصْحَفِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَرِّدُوا الْقُرْاٰنَ وَيُرْوٰى جَرِّدُوا الْمَصَاحِفَ وَفِى التَّعْشِيْرِ وَالنَّقْطَةِ تَرْكُ التَّجْرِيْدِ وَلِاَنَّ التَّعْشِيْرَ يُخِلُّ بِحِفْظِ الْاٰىِ وَالنَّقْطُ بِحِفْظِ الْاِعْرَابِ اِتِّكَالًا عَلَيْهِ فَيُكْرَهُ قَالُوْا فِىْ زَمَانِنَا لَابُدَّ لِلْعَجَمِ مِنْ دَلَالَةٍ فَتَرْكُ ذٰلِكَ اِخْلَالٌ بِالْحِفْظِ وَهِجْرَانُ الْقُرْاٰنِ فَيَكُوْنُ حَسَنًا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পবিত্র কুরআনে দশ আয়াত পরপর বিশেষ চিহ্ন দেওয়া ও নুকতা লাগানো মাকরূহ। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন, "তোমরা কুরআন শরীফকে মুক্ত কর।" অন্য বর্ণনায় (جَرِّدُوا الْمَصَاحِفَ) 'তোমরা মহাগ্রন্থসমূহকে খালি কর' রয়েছে। দশ আয়াত পরপর চিহ্ন ও নুকতা ব্যবহারে কুরআন শরীফকে খালি করা সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘিত হয়। তাছাড়া দশ আয়াত পরপর চিহ্ন লাগালে কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ সংরক্ষণে ক্ষতি হয়। কেননা তখন এসবের উপর নির্ভর করা হয়, তাই এসব মাকরূহ। মাশায়েখ বলেন, আমাদের যুগে বরং অনারব লোকদের স্বার্থে নুকতা ইত্যাদি লাগানো জরুরি। এগুলো না দেওয়া কুরআন শরীফ সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর। আর তাই এগুলো দেওয়া উত্তম হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ : এ শিরোনামের অধীনে মুসান্নিফ (র.) বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মাকরূহসমূহের আলোচনা করবেন। উল্লেখ্য যে, হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বিভিন্ন অধ্যায়ের পরিশিষ্টে এ ধরনের মাসায়েলের আলোচনা করে থাকেন।

قَوْلُهُ قَالَ : وَيُكْرَهُ التَّعْشِيْرُ وَالنَّقْطُ الخ : উপরের ইবারত থেকে মুসান্নিফ (র.) বিভিন্ন বিষয়ের মাকরূহ মাসায়েলের আলোচনা করেছেন। تَعْشِيْر বলা হয় কুরআন শরীফের প্রতি দশ আয়াত পর এক বিশেষ চিহ্ন লাগানো। আর نَقْط শব্দটি نَقْطَة-এর বহুবচন। নুকতা বলা হয় আরবি হরফসমূহ চেনার বিভিন্ন চিহ্ন। যেমন–, بَا ও تَا লেখাতে একই রকম। তবে بَا-এর নিচে একটি নুকতা ও تَا-এর উপর দুটি নুকতা দ্বারা দুটিকে পৃথক করা হয়েছে।

تَعْشِيْر ও نَقْطَة লাগানোকে ইবারতে মাকরূহ বলা হয়েছে। এর দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস। হাদীসটি দু-ধরনের শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে যথা– جَرِّدُوا الْقُرْاٰنَ / جَرِّدُوا الْمَصَاحِفَ তোমরা কুরআন শরীফ/মহাগ্রন্থসমূহে অন্য বিষয়কে খালি কর।

অর্থাৎ কুরআন শরীফের অংশ নয় এমন সব বিষয় থেকে কুরআন শরীফকে খালি কর। এজন্য পবিত্র কুরআনে أَمِيْن লেখা হয়নি। সুতরাং কুরআন শরীফে নুকতা ও হরকত লাগানো এবং প্রতি দশ আয়াত পরপর বিশেষ চিহ্ন লাগানো, এমনকি রুকু এর চিহ্ন দেওয়া সবই মাকরূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা এসব বিষয় থেকে কুরআন শরীফকে খালি করতে বলা হয়েছে। তাছাড়া এ সবের কারণে কুরআন শরীফ মুখস্থ করার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং إِعْرَابْ সঠিকভাবে পড়তে অস্পষ্টতা দেখা দেয়।

মোটকথা হাদীসের দাবি ও যুক্তির আলোকেই পবিত্র কুরআন থেকে কুরআন বহির্ভূত বিষয়সমূহকে বর্জন করা উচিত। যদি কেউ এগুলো লাগায় সে মাকরূহ কাজে লিপ্ত হয়েছে সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ قَالُوْا فِيْ زَمَانِنَا الخ : মাশায়েখ ও ফকীহগণ আলোচ্য মাসআলার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন, অনারব ও আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের দিকে লক্ষ্য করে কুরআন শরীফে إِعْرَابْ ، حَرْكَتْ ও নুকতা (نُقْطَه) লাগানো আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কেননা তারা এসব ছাড়া কুরআন শরীফ পড়তে অক্ষম। যদি তাদের স্বার্থে হরকত ও ই'রাব না লাগানো হয় তাহলে তারা কুরআন শরীফ পড়াই ছেড়ে দেবে।

তাই ফকীহগণ সাধারণ অনারব লোকদের জন্য কুরআন শরীফে হরকত ও নুকতা লাগানোকে মুসতাহসান (مُسْتَحْسَنْ) বলেছেন। মোটকথা নুকতা ও হরকত লাগানো বিদ'আতে হাসানাহ।

জ্ঞাতব্য : হাদীস শরীফে পবিত্র কুরআনে নুকতা ও হরকত লাগানো সম্পর্কিত যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে তা রাসূল ﷺ -এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের সাথে খাস। অধিকন্তু তৎকালীন লোকদের জন্য إِعْرَابْ ছাড়া তেলাওয়াত করা সহজ ছিল, তাদের জন্য দশ আয়াত পরপর চিহ্ন লাগানো এবং নুকতা লাগানো কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ হিফজ করা ও ই'রাব পড়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করত। আমাদের যুগের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের জন্য এরূপ করাই উত্তম। কেননা স্থান, কাল, পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে শরিয়তের বিধিবিধানে পরিবর্তন সাধিত হয়।

-[মাজমাউল আনহার, খ. ২, পৃ. ৫৩০ শামী খ. ৯, পৃ. ২৪৭]

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمَصَاحِفِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِهِ وَصَارَ كَنَقْشِ الْمَسْجِدِ وَتَزْيِينِهِ بِمَاءِ الذَّهَبِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ - قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَدْخُلَ اَهْلُ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَكْرَهُ ذٰلِكَ وَقَالَ مَالِكٌ (رحـ) يَكْرَهُ فِيْ كُلِّ مَسْجِدٍ لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَلِاَنَّ الْكَافِرَ لَا يَخْلُوْ عَنْ جَنَابَةٍ لِاَنَّهُ لَا يَغْتَسِلُ اِغْتِسَالًا يُخْرِجُهُ عَنْهَا وَالْجُنُبُ يُجْنِبُ الْمَسْجِدَ وَبِهٰذَا يَحْتَجُّ مَالِكٌ (رحـ) وَالتَّعْلِيْلُ بِالنَّجَاسَةِ عَامٌّ فَيَنْتَظِمُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরআন শরীফ সুসজ্জিত করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা এটি কুরআনের মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন শরীফ সুসজ্জিত করা মসজিদকে স্বর্ণ দ্বারা কারুকাজ করা ও সুসজ্জিত করার মতোই। মসজিদ সজ্জিত করার মাসআলা ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জিম্মি সম্প্রদায়ের লোক মসজিদে হারামে প্রবেশ করাতে কোনো দোষ নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এটা মাকরূহ। ইমাম মালেক (র.) বলেন, সব মসজিদে জিম্মির প্রবেশ করা মাকরূহ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী "নিশ্চয় মুশরিক নাপাক, তারা যেন এ বছরের পর মসজিদে হারামের নিকটবর্তী না হয়।" তাছাড়া কাফের জানাবাতমুক্ত হয় না। কেননা তারা জানাবাত থেকে মুক্ত হওয়ার মতো গোসল করে না। আর জুনুবী ব্যক্তি মসজিদকে নাপাক করে দেয়। ইমাম মালেক (র.)ও উক্ত দলিল পেশ করেন। আর নাপাকীর বিষয়টি যেহেতু ব্যাপক তাই পৃথিবীর সব মসজিদকে এটি শামিল করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمَصَاحِفِ الخ :

১ম মাসআলা : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরআন শরীফ সুসজ্জিত করাতে কোনো দোষ নেই। কুরআন শরীফ সুসজ্জিত করার দ্বারা কুরআন শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, কুরআন শরীফ সুসজ্জিত করা মসজিদ স্বর্ণের পানি দ্বারা নকশা ও সুসজ্জিত করার মতো। মানুষ মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক যদি এরূপ কারুকাজ করে তা যেমন জায়েজ তদ্রূপ কুরআন শরীফ সুসজ্জিত করাও জায়েজ।

উল্লেখ্য যে, মসজিদ সুসজ্জিতকরণ সংক্রান্ত মাসআলা এ কিতাবের প্রথম খণ্ডের ১৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে মসজিদের অতিরিক্ত সাজসজ্জা মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ থেকে না করা উচিত। যদি উক্ত মাল দ্বারা করে তাহলে মুতাওয়াল্লী জরিমানা বহন করবে।

২য় মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে লিখেছেন যে, মসজিদে হারামে অমুসলিম অভিবাসী যার সাথে মুসলিম সরকারের চুক্তি আছে এমন ব্যক্তি প্রবেশ করাতে কোনো সমস্যা নেই। তদ্রূপ পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদে কাফেরের প্রবেশ করাতে কোনো সমস্যা নেই। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মত।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, মসজিদে হারামে কোনো কাফেরের প্রবেশ করা মাকরূহ। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও তাই।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, সব মসজিদে কাফেরের প্রবেশ করা মাকরূহ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো–

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا .

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয় মুশরিক সম্প্রদায় অপবিত্র। সুতরা তারা যেন এ বছরের পর মসজিদে হারামের নিকটবর্তী না হয়।' –[সূরা তাওবা : ২৮]

দ্বিতীয় দলিল হলো, কাফের সর্বাবস্থায় নাপাক [জানাবাতযুক্ত] থাকে। কাফের যদিও গোসল করে তবুও তার গোসল যেহেতু শরিয়ত সম্মতভাবে করা হয় না তাই গোসল করার পরও জুনূবী থেকে যায়। জুনূবী ব্যক্তির জন্য যেহেতু মসজিদে হারামে প্রবেশ করা নাজায়েজ তাই কাফেরের জন্য মসজিদে প্রবেশ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যুক্তির উপর একটি আপত্তি হয় যে, যদি জানাবাতের কারণে তাদের মসজিদে হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় তবে তো অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ করাও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

অন্যদিকে ইমাম মালেক (র.) উপরিউক্ত দলিলের আলোকে বলেন, যেহেতু কাফের অপবিত্র সাব্যস্ত হলো তাই পৃথিবীর সব মসজিদে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে।

وَلَنَا مَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْزَلَ وَفْدَ ثَقِيْفٍ فِىْ مَسْجِدِهٖ وَهُمْ كُفَّارٌ وَلِاَنَّ الْخُبْثَ فِىْ اِعْتِقَادِهِمْ فَلَا يُؤَدِّىْ اِلَى تَلْوِيْثِ الْمَسْجِدِ وَالْاٰيَةُ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى الْحُضُوْرِ اِسْتِيْلَاءً وَاسْتِعْلَاءً اَوْ طَائِفِيْنَ عُرَاةً كَمَا كَانَتْ عَادَتُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ـ

অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো, বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ছাকীফ গোত্রের লোকদেরকে তার মসজিদে স্থান দিয়েছিলেন। অথচ তারা ছিল কাফের সম্প্রদায়ভুক্ত। আর আয়াতে যে নাপাকীর কথা বলা হয়েছে তা তো তাদের বিশ্বাসগত নাপাকী। সুতরাং তা দ্বারা মসজিদ নষ্ট হবে না। তাছাড়া তাদের উপস্থিত হতে যে বারণ করা হয়েছে তা প্রবলভাবে ও প্রভাব বিস্তারের সাথে অথবা উলঙ্গ অবস্থায় প্রদক্ষিণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যেমনটা তাদের অভ্যাস ছিল জাহিলি যুগে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا مَا رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْزَلَ الخ : উপরের ইবারতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম সাহেব রাসূল ﷺ -এর একটি হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন–

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَنْزَلَ وَفْدَ ثَقِيْفٍ فِىْ مَسْجِدِهٖ وَهُمْ كُفَّارٌ ـ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ ছাকীফ গোত্রের লোকদের মসজিদে স্থান দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা ছিল কাফের।'

আলোচ্য হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাঁর সুনানে উল্লেখ করেছেন। সেখানে এভাবে হাদীসটি রয়েছে–

عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ لَمَّا قَدِمُوْا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُوْنَ اَرَقَّ لِقُلُوْبِهِمْ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ اَنْ لَا يُحْشَرُوْا وَلَا يُعْشَرُوْا وَلَا يُجَبُّوْا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكُمْ اَنْ لَّا تُحْشَرُوْا وَلَا يُعْشَرُوْا وَلَا خَيْرَ فِىْ دِيْنٍ لَيْسَ فِيْهِ رُكُوْعٌ ـ

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) তাঁর مَرَاسِيْل -এ হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন–

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِىِّ اَنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَضَرَبَ لَهُمْ قُبَّةً فِىْ مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ لِيَنْظُرُوْا اِلٰى صَلٰوةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقِيْلَ لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُنْزِلُهُمُ الْمَسْجِدَ وَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ اِنَّ الْاَرْضَ لَا تَنَجَّسُ اِنَّمَا يَنَجَّسُ ابْنُ اٰدَمَ ـ

উভয় বর্ণনায় ছাকীফ গোত্রের লোকদের রাসূল ﷺ মসজিদে স্থান দিয়েছিলেন এ কথা সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে দ্বিতীয় হাদীসে রাসূল ﷺ -কে সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের মসজিদে স্থান দেওয়া নিয়ে আপত্তি করলে এর উত্তরে বলেন, জমিন তো মানুষের অবস্থানের কারণে নাপাক হয় না; নাপাক হয় মানুষের শরীর।

উপরিউক্ত হাদীস দুটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ কাফেরদের মসজিদে স্থান দিয়েছিলেন এবং তাদের অবস্থানের কারণে যে মসজিদের কোনো ক্ষতি হয় না তাও উল্লেখ করেছেন। রাসূল ﷺ এও বলেছেন যে, তাদের নাপাকী তাদের বিশ্বাসগত, শারীরিক নয়।

قَوْلُهُ وَالْآيَةُ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى الْحُضُوْرِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) অন্য ইমামদের পক্ষ থেকে আয়াতের (إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ) দ্বারা দলিল দেওয়া হয়েছে তার জবাব দিয়েছেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, "মুশরিক সম্প্রদায় যেন মসজিদে হারামের নিকটবর্তী না হয়" এর অর্থ হলো মুশরিকরা যেন বিজয় ও কর্তৃত্ব নিয়ে মসজিদে হারামে না আসে।

অথবা আয়াতের অর্থ হলো, জাহিলি যুগের মতো মুশরিকরা যেন উলঙ্গ হয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ না করে। উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ ছুমামা ইবনে আছাল নামে এক মুশরিককে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন।

মোটকথা উপরিউক্ত দলিলসমূহের সাহায্যে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কাফের/মুশরিকের জন্য মসজিদে হারাম ও অন্যান্য মসজিদে প্রবেশের অনুমতি রয়েছে।

জ্ঞাতব্য : ক. কুরআনের আয়াত فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الخ আয়াতের বিধান শরিয়তের সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং এটি সৃষ্টিজগতের সাথে সম্পর্কিত (تَكْوِيْنِيٌّ) বিধান।

খ. যখন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের চুক্তি চূর্ণ করে দিলেন ফলে আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রভূমি তথা মক্কা শরীফ মুসলমানদের হাতে বিজিত হয় এবং আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে মুসলমান হতে লাগল তখন [নবম হিজরিতে] এ ঘোষণা দেওয়া হয় যে, আগামীতে কোনো মুশরিক মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা হারামের সীমানাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা তাদের মন-মস্তিষ্ক শিরক ও কুফরের পঙ্কিলতায় নষ্ট হয়ে গেছে। তাই তারা পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান এবং ঈমান ও তাওহীদের কেন্দ্রভূমিতে প্রবেশ করার উপযুক্ত নয়। অধিকন্তু সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূল ﷺ পরবর্তীতে আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিক, ইহুদি ও খ্রিস্টান সকলকে বের করে দেওয়ার ফরমান জারি করেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে রাসূল ﷺ -এর এ ফরমান পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করেন তখন থেকে কাফের সম্প্রদায়ের জন্য আরব উপদ্বীপে বসবাসের কিংবা দাপটের সাথে অবস্থানে কোনো সুযোগ নেই। কোনো মুসলমানের জন্য এ ব্যাপারে অনুমতি দেওয়াও নাজায়েজ। সেখানের লোকদের জন্য আরব উপদ্বীপকে মুশরিকমুক্ত রাখা কর্তব্য।

গ. পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদে কাফেরদের প্রবেশের অনুমতি রয়েছে; কিন্তু হানাফী মাযহাবের সর্বশেষ তাহকীক অনুসারে মসজিদে হারামে মুশরিক সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর সর্বশেষ সংকলিত কিতাব সিয়ারে কাবীরে মুশরিকের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ লিখেছেন। তাদের মক্কা শরীফ ও মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করাও নাজায়েজ। দুররুল মুখতারের ফতোয়া অনুযায়ী ব্যবসার জন্য তাদের সেখানে যাওয়া বৈধ বলা হয়েছে। তবে কাফের সেখানে বেশি সময় অবস্থান করবে না। -[দুররুল মুখতার, খ. ৫, পৃ. ২৪৮, পুরাতন মুদ্রণ]

ঘ. উল্লেখ্য যে, বর্তমান সৌদী আরবের রাজ পরিবার মুশরিকদের মসজিদে হারামে এমনকি হারামের সীমানায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে।

قَالَ : وَيُكْرَهُ اِسْتِخْدَامُ الْخِصْيَانِ لِاَنَّ الرَّغْبَةَ فِى اِسْتِخْدَامِهِمْ حَثُّ النَّاسِ عَلٰى هٰذَا الصَّنِيْعِ وَهُوَ مُثْلَهٌ مُحَرَّمَةٌ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِاِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ وَاِنْزَاءِ الْحَمِيْرِ عَلَى الْخَيْلِ لِاَنَّ فِى الْاَوَّلِ مَنْفَعَةُ الْبَهِيْمَةِ وَالنَّاسِ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَكِبَ الْبَغْلَةَ فَلَوْ كَانَ هٰذَا الْفِعْلُ حَرَامًا لَمَا رَكِبَهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ فَتْحِ بَابِهٖ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খোজা লোকদের থেকে খেদমত গ্রহণ করা মাকরূহ। কেননা এদের থেকে খেদমত গ্রহণের আগ্রহ মানুষকে এ ধরনের কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়। অথচ এটা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃতি সাধন করার নামান্তর, যা হারাম। ইমাম কুদূরী (র.) (আরো) বলেন, চতুষ্পদ জন্তুকে খাসী করানো এবং গাধাকে ঘোড়ার উপর উপগত করানোতে কোনো দোষ নেই। কেননা প্রথম অবস্থায় চতুষ্পদ জন্তু ও মানুষ উভয়েরই লাভ। তাছাড়া সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ খচ্চরের উপর আরোহণ করেছেন। যদি এ [ঘোড়ার সাথে গাধার সঙ্গম করানো] কাজ হারাম হতো তাহলে রাসূল ﷺ খচ্চরের উপর আরোহণ করতেন না। কেননা এ আরোহণ উক্ত কাজের দ্বার উন্মোচন করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيُكْرَهُ اِسْتِخْدَامُ الْخِصْيَانِ الخ : উপরের ইবারতে তিনটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে–

১ম মাসআলা : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খোজা অর্থাৎ খাসি করানো হয়েছে এমন লোকদের থেকে খেদমত গ্রহণ করা মাকরূহ।

উল্লেখ্য যে, পুরুষদের অণ্ডকোষ নষ্ট করে যৌনক্ষমতা ও যৌন অনুভূতি রহিত করার প্রক্রিয়াকে খাসি করানো বলা হয়, পূর্বযুগে রাজা-বাদশার অন্দর মহলে পুরুষদের খাসি করে রাখা হতো। যাতে করে পুরুষদের কাজ তাদের দ্বারা নেওয়া যায় এবং তাদের থেকে হেরেমের মেয়েদের কোনো আশঙ্কা না থাকে।

শরিয়ত খোজা লোকদের থেকে খেদমত গ্রহণ করা মাকরূহ সাব্যস্ত করেছে, যাতে কোনো লোক খেদমত বা রাজদরবারে কাজ পাওয়ার আশায় খোজা হতে উৎসাহিত না হয়।

শরিয়তের দৃষ্টিতে খাসি করানো / হিজড়া হওয়া হারাম। কেননা এর দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং বিকৃতি সাধন করা হয়। আল্লাহর কোনো সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি সাধন করা যেহেতু হারাম তাই খোজা হওয়াও হারাম।

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِاِخْصَاءِ الْبَهَائِمِ : এখান থেকে ২য় মাসআলার আলোচনা শুরু হয়েছে। গরু, ছাগল ও মহিষ ইত্যাদি জন্তুকে খাসি করা জায়েজ। খাওয়া জায়েজ এমন জন্তু এবং অন্যান্য জন্তুকে খাসি করা জায়েজ। জায়েজ হওয়ার পক্ষে মুসান্নিফ (র.) যৌক্তিক দলিল পেশ করেছেন। তা হলো, খাসি করার দ্বারা পশু ও পশুর মালিক উভয়েরই লাভ। পশুর লাভ এই যে, খাসী করা পশুর রুচি বাড়ে এবং তা মোটা তাজা হয় আর পশুর মালিকের লাভ হলো পশুটির গোশত বেশি হয় এবং গোশত সুস্বাদু হয়।

মুসান্নিফ (র.) এখানে খাসি করার বৈধতা সম্পর্কে কোনো হাদীস পেশ করেননি। বিনায়ার মুসান্নিফ আল্লামা মাহমূদ ইবনে আহমদ আইনী (র.) হাদীস উল্লেখ করেছেন–

رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَحّٰى بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ وَهُوَ الْمَرْضُوْضُ خِصَاهُمَا ـ

অর্থাৎ 'রাসূল ﷺ দুটি খাসি করা ভেড়া কুরবানি করেছেন।'

যদি খাসি করা নাজায়েজ হতো তাহলে রাসূল ﷺ তা জবাই করতেন না, যাতে লোকেরা খাসি করা থেকে বিরত থাকে। উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি উট, গরু ও ছাগল খাসি করতে নিষেধ করেছেন।

তাঁর এ হাদীসের জবাব হলো, এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত যা রাসূল ﷺ -এর হাদীসের মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়।

দ্বিতীয় জবাব হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর এ নিষেধাজ্ঞা এজন্য যে, যাতে মানুষ অধিক হারে খাসি করতে শুরু না করে তাহলে পশুর প্রজনন বন্ধ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ اِنْزَاءُ الْحَمِيْرِ عَلَى الْخَيْلِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) তৃতীয় মাসআলার বর্ণনা শুরু করেছেন। اِنْزَاءُ الْحَمِيْرِ عَلَى الْخَيْلِ -এর অর্থ পুরুষ গাধাকে মাদি ঘোড়ার উপর উপগত করানো বা গাধা ও মাদি ঘোড়ার মধ্যে সঙ্গম করানো। এরূপ সঙ্গম করানোর ফলে মিশ্র একটি প্রজাতির জন্ম হয় যাকে খচ্চর বলা হয়। এরূপ করানো জায়েজ। দলিল হলো, রাসূল ﷺ খচ্চরের উপর আরোহণ করেছেন। যে হাদীসটিতে এ বর্ণনা পাওয়া যায় তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো–

(رَوٰى مُسْلِمٌ فِى الْجِهَادِ) عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ (رحـ) وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ اَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَاللّٰهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاةً وَاِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ اِنْكَشَفُوْا فَاَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُوْنَا بِالسِّهَامِ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَاَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ اٰخِذٌ بِلِجَامِهَا وَهُوَ يَقُوْلُ اَنَا النَّبِىُّ لَا كَذِبْ اَنَا بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ـ

এ হাদীসের فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ অংশ যার অর্থ আমি রাসূল ﷺ -কে তার সাদা খচ্চরের উপর আরোহী দেখেছি দ্বারা প্রমাণ হয় রাসূল ﷺ খচ্চরের উপর আরোহণ করেছেন।

যদি গাধা ও মাদি ঘোড়ার মধ্যে সঙ্গম করানো হারাম হতো তাহলে রাসূল ﷺ এর উপর আরোহণ করতেন না। কেননা রাসূল ﷺ -এর গাধা ও খচ্চরের সঙ্গম দ্বারা ভূমিষ্ঠ প্রজাতির জন্তুর উপর আরোহণ করা সেই কাজটির বৈধতার দলিল।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ لِاَنَّهُ نَوْعُ بِرٍّ فِىْ حَقِّهِمْ وَمَا نُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَصَحَّ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَادَ يَهُوْدِيًّا مَرِضَ بِجَوَارِهِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইহুদি ও খ্রিস্টান রোগীকে দেখতে যাওয়া দোষের নয়। কেননা এটা তাদের প্রতি এক ধরনের সদাচরণ। আমাদেরকে এরূপ সদাচরণ করতে নিষেধ করা হয়নি। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর জনৈক ইহুদি প্রতিবেশী রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে গিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الْيَهُوْدِ الخ : ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা অন্যকোনো কাফের সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে তাদের দেখতে যাওয়া ইসলামে নিষেধ নয়। কেননা যে কোনো রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা একটি ভালো কাজ। ইসলাম এ ধরনের ভালো কাজ ও সদাচরণ করতে উৎসাহ প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ .

অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয় না তাদের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। –[সূরা মুমতাহিনা]

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে সাধারণ কাফেরদের সাথে উত্তম আচরণ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য যারা মুসলমানদের সাথে সরাসরি শত্রুতায় লিপ্ত তাদের প্রতি এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অধিকন্তু যদি তাদের সাথে উত্তম আচরণ না করা হয় তাহলে তারা ইসলামের দিকে ঝুঁকবে না।

قَوْلُهُ صَحَّ اَنَّ النَّبِيَّ الخ : কাফেরদের সেবা-শুশ্রূষা করার প্রমাণ সরাসরি মহানবী ﷺ -এর আমল থেকে পাওয়া যায়। একদা রাসূল ﷺ এক ইহুদি যুবককে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে যান।

সেই ঘটনা বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এভাবে এসেছে–

عَنْ حَمَّادِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَخْدِمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ فَخَرَجَ وَقَدْ اَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ .

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, জনৈক ইহুদি যুবক রাসূল ﷺ -এর খেদমত করত। একবার সে অসুস্থ হলে রাসূল ﷺ তাকে দেখতে তার বাড়িতে আসেন এবং তার শিয়রে বসেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, ইসলাম গ্রহণ কর। সে তার নিকটে অবস্থানরত পিতার দিকে তাকাল। তার পিতা তাকে বললেন, তুমি আবুল কাসিম [মুহাম্মদ ﷺ] -এর কথা মেনে নাও। অতঃপর সে মুসলমান হলো। রাসূল ﷺ তাকে মুক্ত করে বের হয়ে আসলেন। তখন তিনি বলছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছেন। –[বিনায়া]

এ হাদীস দ্বারা অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সেই সাথে একথাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ এভাবে দেখতে যাওয়ার কারণেই ইহুদি যুবকের ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়।

قَالَ : وَيُكْرَهُ اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ فِىْ دُعَائِهٖ اَسْأَلُكَ بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَلِلْمَسْأَلَةِ عِبَارَتَانِ هٰذِهٖ وَمَقْعَدُ الْعِزِّ وَلَا رَيْبَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الثَّانِيَةِ لِاَنَّهٗ مِنَ الْقُعُوْدِ وَكَذَا الْاُوْلٰى لِاَنَّهٗ يُوْهِمُ تَعَلُّقَ عِزِّهٖ بِالْعَرْشِ وَهُوَ مُحْدَثٌ وَاللّٰهُ تَعَالٰى بِجَمِيْعِ صِفَاتِهٖ قَدِيْمٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তির দোয়াতে اَسْأَلُكَ بِمَعْقَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ "হে আল্লাহ! আরশের গদীর ইজ্জতের দোহাই দিয়ে দোয়া করছি" বলা মাকরূহ। এভাবে দোয়া করার ইবারত দু-ধরনের হতে পারে। একটি তো بِمَعْقَدِ الْعِزِّ অপরটি بِمَقْعَدِ الْعِزِّ দ্বিতীয় ইবারত মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা শব্দটি قُعُوْد থেকে নির্গত। প্রথমটিও এরূপই। কেননা প্রথমটি দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর সম্মান আরশের সাথে সম্পৃক্ত, অথচ আরশ হলো ক্ষণস্থায়ী ও সৃষ্টবস্তু, আর মহান আল্লাহ তাঁর যাবতীয় গুণাবলিসহ চিরস্থায়ী-অবিনশ্বর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَيُكْرَهُ اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ فِىْ دُعَائِهٖ الخ : আলোচ্য ইবারতে দোয়াতে শিরকের সন্দেহ সৃষ্টিকারী শব্দাবলি ব্যবহার করা সংক্রান্ত মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর যাবতীয় গুণাবলিসহ অবিনশ্বর (قَدِيْمٌ)। পক্ষান্তরে আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্ট এবং ক্ষণস্থায়ী। এমনকি আল্লাহর আরশ (عَرْش) ও কুরশী (كُرْسِىْ) সবই ক্ষণস্থায়ী (حَادِثٌ)। সুতরাং যদি এমন শব্দ বলা হয় যার দ্বারা আরশ আল্লাহর বসার স্থান নির্ধারণ হয় কিংবা আরশ মহাসম্মানিত এ কথা বুঝা যায় তাহলে শিরকের প্রতি ইঙ্গিত বহন করার কারণে মাকরূহ সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهٗ لِلْمَسْأَلَةِ عِبَارَتَانِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলার ইবারত বা শব্দচয়ন দুভাবে হতে পারে–

১. اَسْأَلُكَ بِمَعْقَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ [প্রথমে عَيْن পরে قَافْ] مَعْقَدْ শব্দটি عَقْد থেকে নির্গত। যার অর্থ– গিঁঠ দেওয়া বা সম্পৃক্ত করা। مَعْقَدْ অর্থ– গিঁঠ দেওয়ার স্থান। সুতরাং পুরো বাক্যের অর্থ হলো, আপনার আরশের তথা আপনার ইজ্জতের বন্ধনের স্থানের দোহাই দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার আরশ তাঁরই সৃষ্ট বস্তু। সুতরাং তা ক্ষণস্থায়ী পক্ষান্তরে তাঁর ইজ্জত তাঁর মতোই চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। তাঁর অবিনশ্বর গুণাবলির একটিকে ক্ষণস্থায়ী বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর অবিনশ্বর কোনো কিছুর স্থান [বা مَحَلّ] নশ্বর / ক্ষণস্থায়ী কোনোকিছুকে নির্ধারণ করা নাজায়েজ।

২. اَسْئَلُكَ بِمَقْعَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ [প্রথমে قَافْ পরে عَيْنْ] مَقْعَدْ শব্দটি قُعُوْدْ মূলধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ– বসা আর مَقْعَدْ অর্থ– বসার স্থান বা আসন। পুরো বাক্যের অর্থ এই যে, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের বসার স্থান তথা আরশের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।

উল্লেখ্য যে, বসা বা উপবেশনের জন্য আসন ও দেহ আবশ্যক। অথচ আল্লাহ তা'আলার জাত শরীরী এবং দেহবিশিষ্ট হওয়া এবং কোনো স্থানে আবদ্ধ হওয়ার উর্ধ্বে। আল্লাহর জন্য দেহ প্রমাণিত হয় এমন কোনো বাক্য ব্যবহার করা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত -এর আকিদা অনুযায়ী বিরাট [কবীরা] গুনাহ। এজন্যই মুসান্নিফ (র.) বলেছেন– اَسْأَلُكَ بِمَقْعَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ - মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

আর ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, প্রথম বাক্য ব্যবহার করাও মাকরূহ।

وَعَنْ اَبِى يُوسُفَ (رحـ) اَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَبِهِ اَخَذَ الْفَقِيْهُ اَبُو اللَّيْثِ (رحـ) لِاَنَّهُ مَاثُوْرٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُوِىَ اَنَّهُ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِمَعْقَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَجَدِّكَ الْاَعْلٰى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ وَلٰكِنَّا نَقُوْلُ هٰذَا خَبَرُ الْوَاحِدِ وَكَانَ الْاِحْتِيَاطُ فِى الْاِمْتِنَاعِ وَيُكْرَهُ اَنْ يَقُوْلَ فِىْ دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ اَوْ بِحَقِّ اَنْبِيَاءِكَ وَرُسُلِكَ لِاَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوْقِ عَلَى الْخَالِقِ ـ

অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এরূপ বাক্য ব্যবহার করাতে কোনো অসুবিধা নেই। ফকীহ আবুল লাইছ (র.) একই মত পোষণ করেন। কেননা এটি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত। বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ-এর দোয়ার মধ্যে ছিল– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِمَعْقَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَجَدِّكَ الْاَعْلٰى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমি তোমার আরশের সম্মানের সম্পর্ক, তোমার কিতাবের চূড়ান্ত রহমত, তোমার মহান নাম ও শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্ত্বের এবং তোমার পূর্ণাঙ্গ বাণীসমূহের অসিলা দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। কিন্তু আমরা বলি এটা খবরে ওয়াহিদ। সতর্কতা হলো এ থেকে বেঁচে থাকার মধ্যে। দোয়ার মধ্যে 'অমুকের হকের অসিলায়' অথবা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ ও নবীগণের হকের অসিলায়' বলা মাকরূহ। কেননা, স্রষ্টার উপর সৃষ্টির [মাখলুকের] কোনো হক নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَنْ اَبِى يُوسُفَ (رحـ) اَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ الخ : চলমান ইবারতে পূর্ববর্ণিত মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর যে ভিন্নমত উল্লেখ করে তার জবাব দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন– اَسْأَلُكَ بِمَقْعَدِ الْعِزِّ / بِمَقْعَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ বলে প্রার্থনা করাতে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এ মত সমর্থন করেন ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী (র.)।

এ ব্যাপারে তাঁদের দলিল হলো এ ধরনের শব্দে প্রার্থনা করার বিষয়টি থেকে রাসূল ﷺ -এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর রাসূল ﷺ -এর আমল দ্বারা যা প্রমাণিত তা নাজায়েজ হয় কি করে ?

আসলে কি এটি হাদীসে বর্ণিত আছে? এ প্রসঙ্গে বিনায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (র.) তাঁর اَلدَّعْوَاتُ الْكَبِيْرُ গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تُصَلِّيْنَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ وَتَشَهَّدِيْنَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَاِنْ تَشَهَّدْتَ فِىْ اٰخِرِ صَلَاتِكَ فَاثْنِ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاقْرَأْ وَاَنْتَ سَاجِدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَاٰيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ ثُمَّ سَلِّمْ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَلَا تُعَلِّمُوْهَا السُّفَهَاءَ فَاِنَّهُمْ يَدْعُوْنَ فَيُسْتَجَابُ ـ

হাদীসটি আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) তাঁর كِتَابُ الْمَوْضُوعَاتِ -এ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন– هٰذَا حَدِيْثٌ مَوْضُوعٌ بِلَا شَكٍّ [হাদীসটি নিঃসন্দেহে জাল]।

এ হাদীসের সনদে عُمَرُ بْنُ هَارُوْنَ রয়েছেন, যাকে হযরত ইবনে মঈন (র.) كَذَّابٌ বলেছেন। তাছাড়া হাদীসটিতে সেজদা অবস্থায় কেরাত পড়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ অন্যান্য হাদীসে সেজদা অবস্থায় কেরাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মোটকথা হাদীসটি কোনোভাবে দলিল হওয়ার যোগ্য নয়। অতএব শিরকের সন্দেহ হওয়ার কারণে দোয়ার মধ্যে এরূপ বাক্য বলা যাবে না।

قَوْلُهُ لٰكِنَّا نَقُوْلُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) হাদীসটির জবাব দিয়েছেন। মুসান্নিফ (র.) অবশ্য সাধারণভাবে জবাব দিয়েছেন যে, হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ (خَبَرُ وَاحِدْ), তাই এর উপর আমল না করে এর থেকে বিরত থাকাই অধিক সতর্কতা।

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ اَنْ يَّقُوْلَ فِىْ دُعَاءِهٖ بِحَقِّ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, بِحَقِّ فُلَانٍ/ بِحَقِّ اَنْبِيَاءِكَ/ بِحَقِّ رُسُلِكَ ইত্যাদি বলে দোয়া করা মাকরূহ। এ শব্দগুলোর অর্থ হলো অমুকের অধিকারে আমি প্রার্থনা করছি কিংবা নবী / রাসূলের অধিকারের অসিলায় আমি প্রার্থনা করছি।

মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, এভাবে বলার দ্বারা মনে হয় যেন ব্যক্তিবিশেষের আল্লাহর উপর হক বা অধিকার রয়েছে। অথচ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوْقِ عَلَى الْخَالِقِ অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের কারো জন্য আল্লাহর উপর কোনো অধিকার নেই। আল্লাহ যা কিছু দান করেন সবই তাঁর অনুগ্রহ মাত্র।

টীকা : كُتُبُ الْاَنْهُرِ কিতাবে বলা হয়েছে যে, দোয়ার মধ্যে এভাবে বলার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তবে যদি حَقٌّ শব্দের অর্থ অধিকার বা দাবি [সাধারণভাবে যা বুঝায়] না নিয়ে সম্মান ও মর্যাদার অর্থে গ্রহণ করা হয় কিংবা অসিলার অর্থে নেওয়া হয় তাহলে এতে কোনো দোষ নেই। আমাদের বুজুর্গানে দীনের শাজারার মধ্যে যখনই এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তখন তা অসিলার অর্থে নেওয়া হয়েছে। আর وَسِيْلَةٌ তো জায়েজ।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শামী (র.) বলেন, حَقٌّ শব্দের যে ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তা স্পষ্ট অর্থের বা স্বাভাবিক অর্থের বিপরীত তাই আমাদের ওলামায়ে কেরাম এ শব্দ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে বলেছেন।

আলোচ্য মাসআলা প্রসঙ্গে আশরাফুল হিদায়ার এ খণ্ডের লেখক জনাব মুফতি ইউসুফ সাহেব (দা. বা.) বলেন, যেহেতু আমাদের [হিন্দুস্তানী] ভাষায় এটি অসিলার অর্থে ব্যবহার হয়। অতএব, যদি কেউ এ অর্থে ব্যবহার করে তাহলে তার জন্য দোয়াতে بِحَقِّ فُلَانٍ বলা নাজায়েজ হবে না। তাছাড়া একটি হাদীসে এভাবে দোয়া করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে আছে– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَاىَ اِلَيْكَ

قَالَ : وَيُكْرَهُ اللَّعْبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةِ عَشَرَ وَكُلِّ لَهْوٍ لِأَنَّهُ إِنْ قَامَرَ بِهَا فَالْمَيْسِرُ حَرَامٌ بِالنَّصِّ وَهُوَ اِسْمٌ لِكُلِّ قِمَارٍ وَإِنْ لَمْ يُقَامِرْ بِهَا فَهُوَ عَبَثٌ وَلَهْوٌ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهْوُ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا الثَّلَاثَ تَأْدِيْبُهُ لِفَرَسِهِ وَمُنَاضَلَتُهُ عَنْ قَوْسِهِ وَمُلَاعَبَتُهُ مَعَ أَهْلِهِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يُبَاحُ اللَّعْبُ بِالشِّطْرَنْجِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَشْحِيْذِ الْخَوَاطِرِ وَتَذْكِيَةِ الْأَفْهَامِ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ الشَّافِعِيِّ (رح) .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দাবা, পাশা ও চৌদ্দগুটি এবং সবধরনের খেলা মাকরূহ। কেননা যদি এর জন্য জুয়া ধরা হয় তাহলে তো জুয়া। আর জুয়া (مَيْسِرٌ) সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা মাকরূহ। যে কোনো ধরনের জুয়াকে মাইসির বলা হয়। আর যদি খেলার সাথে জুয়া না থাকে তাহলে সেটা অনর্থক কাজ ও নিছক ক্রীড়া। আর রাসূল ﷺ বলেছেন, মুমিনের ক্রীড়া সবই বাতিল, তবে তিন প্রকারের ক্রীড়া বৈধ। নিজ ঘোড়াকে [যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে] প্রশিক্ষণ প্রদান, ধনুক হতে তীর নিক্ষেপ করা ও স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করা। কেউ কেউ বলেন, দাবা খেলা বৈধ। কেননা এতে বুদ্ধির প্রখরতা ও মেধা তীক্ষ্ণ হয়। এ মতটি ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيُكْرَهُ اللَّعْبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ الخ : উপরের ইবারতে বিভিন্ন প্রকারের খেলার হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর কিতাবে লিখেছেন, দাবা, পাশা, চৌদ্দগুটি ও সব ধরনের ক্রীড়া মাকরূহ। উল্লিখিত খেলাগুলো মাকরূহ হওয়ার কারণ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাধারণত এসব খেলায় জুয়া / বাজি ধরা হয়। যদি এসব খেলায় জুয়া থাকে তাহলে তো খেলাগুলো হারাম হবে। কারণ কুরআনের আয়াত দ্বারা জুয়া হারাম হওয়া প্রমাণিত। কুরআনের আয়াতে জুয়াকে مَيْسِرٌ [মাইসির] বলা হয়েছে। যে কোনো ধরনের জুয়াকে মাইসির বলা হয়। অতএব উক্ত খেলাগুলোর সাথে যদি জুয়া যুক্ত হয় তাহলে তো তা হারাম, আর যদি খেলাগুলোর সাথে জুয়া না থাকে তাহলেও তা মাকরূহ। কারণ তখন এগুলো অনর্থক কাজ ও ক্রীড়া বলে বিবেচিত হবে। রাসূল ﷺ তিন ধরনের ক্রীড়া ব্যতীত সবধরনের খেলাকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

لَهْوُ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا الثَّلَاثَ تَأْدِيْبُهُ لِفَرَسِهِ وَمُنَاضَلَتُهُ عَنْ قَوْسِهِ وَمُلَاعَبَتُهُ مَعَ أَهْلِهِ .

অর্থাৎ 'মুমিনের সবধরনের ক্রীড়া বাতিল। তবে তিন ধরনের খেলা জায়েজ– ১. অশ্ব নিয়ে কসরত করা, ২. ধনুক হতে তীর নিক্ষেপ করে নিশানা ঠিক করা ও ৩. স্ত্রীর সাথে হাস্যরস ও ক্রীড়া-কৌতুক করা।'

আলোচ্য হাদীসটি চারজন বিশিষ্ট সাহাবী রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), হযরত উকবা ইবনে আমের আল জুহানী, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)।

হযরত উকবা (রা.)-এর হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসায়ী (র.) তাঁদের কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁদের বর্ণিত হাদীসটি এই–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنَ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَّامٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ان لَيَدْخُلَ بِالسَّهْمِ الْرَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِىَّ بِهٖ وَمَنْبِله وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاِنْ تَرْمُوْا اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ اِلَّا الثَّلَاثَ تَادِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ اَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهٖ وَنَبْلِهٖ وَمَنْ يَتْرُكُ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ فَاِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَهَا .

অর্থাৎ হযরত উকবা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের বিনিময়ে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন–

১. তীর প্রস্তুতকারী যে তীর তৈরি করার সময় ছওয়াবের নিয়তে তৈরি করেছে।

২. তীর নিক্ষেপকারী এবং

৩. সরবরাহকারী।

রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর ও ঘোড় সওয়ার হও। তবে আমার কাছে অশ্বারোহী হওয়ার থেকে তোমাদের তীরন্দাজী করা উত্তম। তিনটি খেলা ব্যতীত কোনো খেলা জায়েজ নেই–

১. অশ্ব প্রশিক্ষণ

২. স্ত্রীর সাথে হাস্যরস ও ক্রীড়া-কৌতুক করা

৩. তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করা। যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শেখার পর সেটাকে ছেড়ে দিল। সে একটি নি'আমত ছাড়ল অথবা তিনি বললেন, সে নিয়ামতের প্রতি অবিচার করল।

আলোচ্য হাদীসের অন্য তিন সাহাবীর বর্ণিত বক্তব্যও প্রায় একই যে, তিনটি খেলা ছাড়া সব খেলা নাজায়েজ। মোটকথা হাদীস দ্বারা দাবা, পাশা ও চৌদ্দগুটি খেলার অবৈধতা প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يُبَاحُ اللَّعْبُ الخ : কোনো কোনো ফকীহ বলেন যে, দাবা খেলা বৈধ। তাদের যুক্তি হলো, দাবা খেলার দ্বারা বুদ্ধি প্রখর হয় এবং মেধা তীক্ষ্ণ হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এ মতটি বর্ণিত আছে।

اَلْحِلْيَةُ গ্রন্থে বর্ণিত আছে দাবা খেলা মাকরূহ। যদি তা কোনো বিনিময়ে না হয় তাহলে হারাম হবে না। তবে এর কারণে কোনো ফরজ নামাজ ছাড়া যাবে না এবং মিথ্যা বলা যাবে না।

যদি কোনো ব্যক্তি বেশি বেশি দাবা খেলে তাহলে তার শাহাদাত [সাক্ষ্য] গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও তাই।

অনুরূপভাবে যদি কেউ তা রাস্তাঘাটে খেলে কিংবা বখাটে লোকদের সাথে খেলে তাহলেও হারাম হবে। আর যদি ভালোলোকদের সাথে খেলে তাহলে এর দ্বারা বুদ্ধি প্রখর হবে এবং মেধাও তীক্ষ্ণ হবে।

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِيْ دَمِ الْخِنْزِيْرِ وَلِأَنَّهُ نَوْعُ لَعْبٍ يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الْجَمْعِ وَالْجَمَاعَاتِ فَيَكُوْنُ حَرَامًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا اَلْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ ثُمَّ إِنْ قَامَرَ بِهِ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَامِرْ لَا تَسْقُطُ لِأَنَّهُ مُتَأَوَّلٌ فِيْهِ وَكَرِهَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) اَلتَّسْلِيْمَ عَلَيْهِمْ تَحْذِيْرًا لَهُمْ وَلَمْ يَرَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) بِهِ بَأْسًا لِيَشْغَلَهُمْ عَمَّا هُمْ فِيْهِ .

অনুবাদ : আমাদের দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দাবা ও পাশা খেলবে সে যেন তার হাত শূকরের রক্তে ডুবাল। তাছাড়া এটি একটি খেলা যা আল্লাহর স্মরণে, জুমার নামাজে ও জামাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এটা হারাম হওয়া উচিত। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, যা তোমাকে আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ করে তাই জুয়া। অতঃপর যদি দাবার সাথে জুয়া খেলা হয় তাহলে উক্ত খেলোয়াড়ের আদালত [ন্যায়পরায়ণতা] বাতিল হবে। আর যদি জুয়া না খেলা হয় তাহলে তা বাতিল হবে না। কেননা সে এ ব্যাপারে যুক্তির আশ্রয় নেবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.) এসব ব্যক্তিদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তাদের সালাম দেওয়া মাকরূহ মনে করেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) সালাম দেওয়াতে কোনো সমস্যা মনে করেন না, যদি এর দ্বারা তাদেরকে খেলা থেকে নিবৃত্ত করা উদ্দেশ্য হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ لَعِبَ الخ : উপরের ইবারতে পূর্ববর্ণিত মাসআলায় আহনাফের দলিল উল্লেখ করা হয়েছে। দলিল হলো রাসূল ﷺ -এর হাদীস– مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِيْ دَمِ الْخِنْزِيْرِ
অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবা ও পাশা খেলল সে যেন শূকরের রক্তে তার হাত ঢুকাল।

বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা যায়লাঈ (র.) মন্তব্য করেন যে, হাদীসটি এ শব্দে পাওয়া যায় না। হাদীসটি অবশ্য মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে তবে তাতে شِطْرَنْج [দাবা] -এর কথা উল্লেখ নেই। মুসলিম শরীফে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত আছে–

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَ دَمِهِ .

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পাশা খেলবে সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে হাত মাখাল।

আল্লামা যায়লাঈ (র.) নাসবুর রায়াহ গ্রন্থে দাবা সম্পর্কিত কিছু দুর্বল হাদীস উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এর একটি দেওয়া হলো–

أَخْرَجَ الْعُقَيْلِيُّ فِيْ ضُعَفَائِهِ عَنْ مُطَهَّرِ بْنِ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَوْمٍ يَلْعَبُوْنَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الْكُوْبَةُ؟ اَلَمْ أَنْهَ عَنْهَا لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ يَلْعَبُ بِهَا .

এ হাদীসটিতে যারা দাবা খেলে রাসূল ﷺ তাদের লানত করেছেন। অবশ্য হাদীসটি সহীহ নয়।

মোটকথা দাবার (شِطْرَنْج) উল্লেখ আছে এমন কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না, তবে পাশা খেলার অবৈধতা সম্পর্কে সহীহ হাদীস পাওয়া যায়।

মুসান্নিফ (র.) দাবা ও পাশা খেলার অবৈধতা সম্পর্কে দ্বিতীয় যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা যদিও সরাসরি খেলা দুটির অবৈধতা প্রমাণ করে না, তবে হাদীসের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে খেলা দুটি অবৈধ প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় হাদীসটি এই- قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا اَلْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন যা তোমাকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল করবে তাই জুয়া।

এ হাদীস সম্পর্কে যায়লাঈ (র.)-এর মন্তব্য হলো হাদীসটি مَرْفُوْعٌ হিসেবে সহীহ নয়। ইমাম আহমদ (র.) হাদীসটিকে হাসিম ইবনে মুহাম্মদ (র.)-এর উক্তি হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটি এই-

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُلُّ مَا اَلْهٰى عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ مَيْسِرٌ .

হাদীসটি শু'আবুল ঈমানে এভাবে আছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ هٰذِهِ النَّرْدُ تَكْرَهُوْنَهُ فَمَا بَالُ الشِّطْرَنْجِ قَالَ كُلُّ مَا اَلْهٰى عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ مَيْسِرٌ .

দ্বিতীয় হাদীসের অর্থ হলো কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র.)-কে হযরত ইবনে ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন। এ পাশা খেলাকে তো আপনারা মাকরূহ বলেন। দাবা (شِطْرَنْج) খেলার কি অবস্থা। তিনি উত্তর করলেন, যা আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে গাফেল করে তাই জুয়া।

মোটকথা যদিও এটি রাসূল ﷺ-এর বাণী নয়, তবুও কাসেম ইবনে মুহাম্মদ [যিনি মদিনার প্রখ্যাত সাতজন ফকীহের অন্যতম ছিলেন] এটিকে নামাজ ও আল্লাহর স্মরণের জন্য ক্ষতিকারক মনে করতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে তিনি এ বিষয়টি বললে তিনি তার এ মতকে প্রত্যাখ্যান করেননি। অতএব, এটি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতও বটে।

তাছাড়া যৌক্তিক দলিল হলো, এটি এমন একপ্রকার খেলা, যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ, জুমা ও জামাত থেকে বিরত রাখে।

قَوْلُهُ ثُمَّ اِنْ قَامَرَ بِهِ تَسْقُطُ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে দাবা-পাশার সাথে জুয়া মিশ্রিত হলে এর হুকুম কী হবে? সে প্রসঙ্গে হুকুম বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, যদি কেউ দাবা বা পাশা খেলার সাথে জুয়াও খেলে তাহলে যে ব্যক্তি এরূপ খেলবে তার عَدَالَتْ [ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা] বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

আর যদি এর সাথে জুয়া না খেলে তাহলে উক্ত ব্যক্তির عَدَالَتْ বাতিল হবে না। কেননা সে ব্যক্তি যুক্তির আশ্রয় নেবে অর্থাৎ সে বলবে আমি বুদ্ধির প্রখরতা ও মেধা শাণিত করার জন্য এ খেলায় অংশগ্রহণ করেছি।

قَوْلُهُ وَكَرِهَ اَبُوْ يُوْسُفَ الخ : সাহেবাইন (র.) দাবা ও পাশা খেলায় লিপ্ত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরূহ মনে করেন। তাদের যুক্তি হলো তাকে সালাম দেওয়া বর্জন করলে সে বুঝতে পারবে যে, সে এ জাতীয় খেলায় লিপ্ত হওয়াতে সালামের অনুপোযুক্ত হয়েছে। এটা চিন্তা করে সে খেলা ছাড়ার চেষ্টা করবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো এরূপ ব্যক্তিকে সালাম দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। তাঁর যুক্তি হলো সালাম ও এর উত্তরে যতটা সময় ব্যয় হবে ততক্ষণ সময়ের জন্য হলেও তো সে খেলা থেকে বিরত রইল।

জ্ঞাতব্য. ক. شِطْرَنْج [شِين -এর নিচে যের] একপ্রকার বিশেষ খেলা, যা প্রাচীন ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে প্রসিদ্ধ ছিল। শতরঞ্জ শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ। মূলে چَتْرَنْگْ [চতরঙ] ছিল। আরবিতে এসে شِطْرَنْج হয়েছে। এতে ছয় ধরনের মোট ১৬ টি গুটি থাকে [একজনের]। অপরজনের অনুরূপ ভিন্ন রঙের ১৬ টি গুটি থাকে। বাংলাতে এ খেলাকে দাবা বলা হয়। ছয় ধরনের গুটি হলো– ১. রাজা [১টি] ২. মন্ত্রী [১টি] ৩. নৌকা [২টি] ৪. হাতি [২টি] ৫. ঘোড়া [২টি] ৬. সৈন্য [৮টি]।

আল্লামা শামী (র.)-এর মতে شَدْرَنْج শব্দের আরবি রূপ হলো شِطْرَنْج।

খ. نَرْدٌ বা نَرْدَشِيْر শব্দটি ফারসি থেকে আরবিতে এসেছে। খেলাটি اِرْدْشِيْر بِنْ بَابَكْ আবিষ্কার করেন। তিনিই খেলাটির নাম نَرْدْشِيْر রাখেন। قُهُسْتَانِيْ গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ খেলাটি شَاپُوْر بِنْ اِرْدْشِيْر আবিষ্কার করেন। শাহপুর ছিলেন সাসানীয় বংশের দ্বিতীয় রাজা। বাংলায় একে পাশা খেলা বা অক্ষ ক্রীড়া বলা হয়। এ খেলা হারাম।

গ. চৌদ্দগুটি একপ্রকারের বিশেষ খেলা যা হারাম।

ঘ. যে খেলায় দীন অথবা দুনিয়ার বিশেষ কোনো উপকারিতা নেই শরিয়তের দৃষ্টিতে সব নাজায়েজ ও অবৈধ। চাই উক্ত খেলার সাথে বাজি বা জুয়া ধরা হোক কিংবা না ধরা হোক।

সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, কবুতর নিয়ে খেলা করা, পাখি নিয়ে খেলা, মোরগ লড়াই, কুকুর দৌড় ও তাশ খেলা সবই নাজায়েজ।

ঙ. যেসব খেলার মধ্যে দীনি অথবা দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ রয়েছে তা খেলা জায়েজ আছে। শর্ত হলো এসব খেলার মধ্যে উক্ত উপকারিতার প্রতি খেয়াল করতে হবে। অবশ্য কেউ যদি কেবলই আমোদ-ফূর্তির জন্য এসব খেলে তাহলে তা জায়েজ নয়। তবে এসব খেলার মধ্যে যদি কোনো আর্থিক স্বার্থ জড়িত হয় তাহলে তা নাজায়েজ হবে।

যেমন ফুটবল খেলার মধ্যে শারীরিক কসরত হয় তাই ফুটবল ও ভলিবল্ খেলা জায়েজ। তদ্রূপ লাঠি খেলা ও কুস্তিগিরী খেলা জায়েজ যদি তা দ্বারা শারীরিক শক্তি অর্জন কেবল উদ্দেশ্য হয় অন্যথায় তা জায়েজ নয়।

তদ্রূপ কবিতা আবৃত্তি তা'লিমী তাশ যদি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে জায়েজ।

তবে হার-জিতের উপর বাজি ধরা এবং এর জন্য টাকার পরিমাণ নির্ধারণ নাজায়েজ; বরং জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় বলে তা হারাম।

–[জাওয়াহিরুল ফিকহ]

চ. যেসব লেনদেন মুনাফা ও লোকসানের ব্যাপারে অস্পষ্ট, শরিয়তের পরিভাষায় সেগুলোকে مَيْسِرْ ও قِمَارْ বলা হয়। বাংলায় এগুলোকে জুয়া বলা হয়।

আসলে লাভ ও লোকসানের ব্যাপারে অস্পষ্ট হওয়ার অর্থ হলো অল্প পুঁজি খাটিয়ে তেমন পরিশ্রম না করে যেখানে অঢেল পাওয়ার আশা করা হয় আবার গচ্ছা যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে তাকে জুয়া বলা হয়।

ছ. ফতোয়ায়ে শামীতে بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلٰوةَ পরিচ্ছেদে প্রাসঙ্গিকভাবে এমন কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে সালাম দেওয়া মাকরূহ। তাদের মধ্যে যারা দাবা খেলায় অভ্যস্ত তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে প্রকাশ্য ফাসিককে সালাম দেওয়াও মাকরূহ বলা হয়েছে।

জ. যারা দাড়ি কামায় এবং তারাও প্রকাশ্য ফাসিক। নিয়মানুযায়ী তাদের সালাম দেওয়া মাকরূহ।

অবশ্য হযরত থানবী (র.) বলেছেন, তাকে তা'লীমের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া যাবে; সম্মানের উদ্দেশ্যে নয়।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِقَبُوْلِ هَدِيَّةِ الْعَبْدِ التَّاجِرِ وَاِجَابَةِ دَعْوَتِهِ وَاسْتِعَارَةِ دَابَّتِهِ وَتُكْرَهُ كِسْوَتُهُ الثَّوْبَ وَهَدِيَّتُهُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرَ وَهٰذَا اِسْتِحْسَانٌ وَفِي الْقِيَاسِ كُلُّ ذٰلِكَ بَاطِلٌ لِاَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِهِ وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبِلَ هَدِيَّةَ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ كَانَ عَبْدًا وَقَبِلَ هَدِيَّةَ بَرِيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَكَانَتْ مُكَاتَبَةً وَاَجَابَ رَهْطٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ دَعْوَةَ مَوْلَى اَبِيْ اُسَيْدٍ وَكَانَ عَبْدًا وَلِاَنَّ فِيْ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ ضَرُوْرَةً لَا يَجِدُ التَّاجِرُ بُدًّا مِنْهَا وَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا يَمْلِكُ مَا هُوَ مِنْ ضَرُوْرَاتِهِ وَلَا ضَرُوْرَةَ فِي الْكِسْوَةِ وَاِهْدَاءِ الدَّرَاهِمِ فَبَقِيَ عَلٰى اَصْلِ الْقِيَاسِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ব্যবসায়ী গোলামের হাদিয়া গ্রহণ করা, তার দাওয়াতে সাড়া দেওয়া ও তার বাহনজন্তু ধার হিসেবে নেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। তবে তার কাপড় পরানো, তার দিরহাম ও দিনার হাদিয়া দেওয়া মাকরূহ। এটি ইস্তিহসানের বিধান। কিয়াসানুযায়ী এর সবই বাতিল। কেননা এসব হলো নফল কাজ। অথচ গোলাম নফল কাজের অনুপোযুক্ত। ইসতিহসানের দলিল হলো, রাসূল ﷺ হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর হাদিয়া তার গোলাম থাকাকালে গ্রহণ করেছেন, এবং তিনি বারীরাহ (রা.) -এর হাদিয়াও গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন মুকাতাবা। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের একটি দল হযরত আবূ সাঈদ (রা.)-এর গোলামের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি তখন গোলাম ছিলেন। অধিকন্তু এসব কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনও রয়েছে। ব্যবসায়ীর এগুলো করা ছাড়া উপায় থাকে না। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছুর মালিক হয় সে তার সাথে সম্পর্কিত জরুরি বিষয়গুলোর অধিকার লাভ করে। কিন্তু দিরহাম ও দিনার হাদিয়া দেওয়া ব্যবসায়ীর জন্য জরুরি নয়। সুতরাং এটি মূল কিয়াসানুযায়ী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِقَبُوْلِ هَدِيَّةِ الْعَبْدِ التَّاجِرِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যদি কোনো গোলামকে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (مَأْذُوْنٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ) সে যদি তার মনিবকে হালকা কোনো কিছু হাদিয়া দেয় কিংবা দাওয়াত দেয় যে হাদিয়া কবুল করা ও দাওয়াতে সাড়া দেওয়াতে কোনো দোষ নেই। অনুরূপ সে গোলাম যে ঘোড়া ব্যবহার করে তা ধার হিসেবে নেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি উক্ত গোলাম কোনো টাকা, স্বর্ণ ও রূপা হাদিয়া হিসেবে দেয় কিংবা কাপড় দেয় তাহলে তা গ্রহণ করা মাকরূহ।

প্রথম অবস্থায় যেসব বিষয় হাদিয়া হিসেবে দেওয়া হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে কিয়াসানুযায়ী বিধান গ্রহণ করা হলে মাকরূহ হবে। কিন্তু ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে যেগুলোকে জায়েজ বলা হয়েছে। পরের সুরতের বিষয়গুলো কিয়াস ও ইস্তিহাস উভয় বিবেচনায় মাকরূহ।

وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ বলে মুসান্নিফ (র.) ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াসের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তা এই যে, রাসূল ﷺ হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর হাদিয়া গোলাম থাকা অবস্থায় গ্রহণ করেছেন। অনুরূপ হযরত বারীরাহ (রা.)-এর হাদিয়া তার মুকাতাবা থাকা অবস্থায় গ্রহণ করেছেন।

তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা সংক্রান্ত হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো– হযরত সালমান (রা.)-এর হাদীস যা তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে। হাদীসটি বেশ দীর্ঘ যাতে হযরত সালমান (রা.)-এর পুরো জীবনে সত্যের সন্ধানে কি কি করেছেন এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। যে হাদীসের একাংশে রয়েছে যে, মদিনায় আখেরী জমানার নবীর আবির্ভাব হবে যাঁর মধ্যে তিনটি নির্দশন থাকবে। তিনি ১. সদকার মাল খাবেন না, ২. হাদিয়ার মাল খাবেন, ৩. তাঁর পৃষ্ঠদেশে ছোট পাখির ডিমের মতো একটি নবুয়তের মহর থাকবে। হযরত সালমান (রা.) বলেন, জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমি মদিনায় ক্রীতদাস হিসেবে আগমন করি। কিছুদিন পর সেখানে একজন নবীর আগমনের সংবাদ পাই। আমি তারই অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলাম। একদিন কিছু কাঠ সংগ্রহ করে তা অল্পমূল্যে বিক্রি করি। অতঃপর তা দ্বারা খানা তৈরি করে তার জন্য নিয়ে যাই। তাঁর সামনে এগুলো পেশ করলে তিনি বললেন–

(مَا هٰذَا ؟ قُلْتُ صَدَقَةٌ فَقَالَ لِاَصْحَابِهٖ كُلُوْا وَاَبٰى هُوَ اَنْ يَّاْكُلَهٗ فَقُلْتُ فِىْ نَفْسِىْ هٰذِهٖ وَاحِدَةٌ ثُمَّ مَكَثْتُ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَوْهَبْتُ قَوْمِىْ يَوْمًا اٰخَرَ فَفَعَلُوْا فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ فَبِعْتُهٗ بِاَفْضَلِ مِنْ ذٰلِكَ فَصَنَعْتُ طَعَامًا وَاَتَيْتُهٗ بِهٖ فَقَالَ مَا هٰذَا ؟ قُلْتُ هَدِيَّةٌ فَقَالَ بِيَدِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ كُلُوْا فَاَكَلَ وَاَكَلُوْا مَعَهٗ .)

অর্থাৎ এটা কি? আমি বললাম, সদকা। তিনি দরিদ্র সাহাবীদের বললেন, তোমরা খাও। কিন্তু তিনি তা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমি মনে মনে বললাম, এটি একটি আলামত। অতঃপর [বেশ কিছুদিন আল্লাহ যতদিন চাইলেন] অপেক্ষা করলাম। অতঃপর আমার অভিভাবকদের কাছে ছুটি চাইলাম। তারা আমাকে তা দিল। তারপর আবারো কিছু কাঠ সংগ্রহ করে আগের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করলাম। অতঃপর তা দ্বারা খাবার তৈরি করলাম এবং তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি বললেন, এগুলো কি ? আমি বললাম, হাদিয়া। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, তোমরা খাও। অতঃপর তিনি খেলেন এবং তাঁর সাথে সাহাবীগণ খেলেন। সংক্ষিপ্ত হাদীসটি ইবনে হিব্বান তাঁর "সহীহে" উল্লেখ করেছেন।

–[নাসবুর রায়াহ খ. ৪, পৃ. ২৭৫]

আর হযরত বারীরাহ (রা.)-এর হাদীসটি নিম্নে দেওয়া হলো। আল্লামা যায়লাঈ (র.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে হযরত বারীরাহ (রা.)-এর হাদীসটি সিহাহের ছয় কিতাবেই বর্ণিত আছে–

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ اَرَادَ اَهْلُهَا اَنْ يَّبِيْعُوْهَا وَيَشْتَرِطُوْا وَلَاهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَالْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَعَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهَا وَتَهْدِىْ لَنَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ اِنْتَهٰى .

(اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হযরত বারীরাহ (রা.)-এর মধ্যে তিনটি সুন্নত রয়েছে। তার মালিকগণ তাকে বিক্রি করার ইচ্ছা করল। কিন্তু তারা শর্ত করল যে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তারাই লাভ করবে। [হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বিষয়টি রাসূল ﷺ-কে জানালাম। তিনি বললেন, তুমি ক্রয় করে আজাদ করে দাও। পরিত্যক্ত সম্পত্তি সেই পাবে, যে আজাদ করে। অতঃপর আমি ক্রয় করে আজাদ করে দিলাম। রাসূল ﷺ তাকে তার স্বামীর কাছে [থাকা বা না থাকার] এখতিয়ার দিলেন। তিনি নিজেকে স্বামী থেকে মুক্ত করে নিলেন।

তাকে লোকেরা এটা সেটা সদকা দিত। অতঃপর সে আমাদের হাদিয়া দিত। আমি রাসূল ﷺ -কে এ ব্যাপারে অবগত করালাম। তিনি বললেন, তার জন্য সেটা সদকা কিন্তু আমাদের জন্য তা হাদিয়া। –[নাসবুর রায়াহ খ. ৪, পৃ. ২৮১]

মোটকথা, হযরত সালমান ফারসী ও বারীরাহ (রা.) উভয়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ তাদের উভয়ের হাদিয়া গোলাম থাকা অবস্থায় গ্রহণ করেছেন। এর দ্বারা গোলামের / বাঁদির হাদিয়া গ্রহণ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

উল্লেখ্য যে, হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, হযরত বারীয়াহ (রা.) মুকাতাবা ছিলেন। তাঁর এ উক্তি সম্পর্কে আল্লামা যায়লাঈ (র.) মন্তব্য করে বলেন, কোনো সূত্রেই আমি এ কথা পাইনি যে, হযরত বারীয়াহ (রা.) তখন কারো মুকাতাবা ছিলেন। অবশ্য মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে হযরত উরওয়া (রা.) থেকে আলোচ্য হাদীসটি বর্ণিত আছে এভাবে যে, হযরত আয়েশা (রা.) হযরত বারীরাহ (রা.)-কে মুকাতাবা অবস্থায় ক্রয় করেছেন। তার ক্রয়মূল্য ছিল আট উকিয়াহ। কিন্তু বারীরাহ কিতাবাতের বদল হিসেবে কিছুই পরিশোধ করেননি।

قَوْلُهُ وَاَجَابَ رَهْطٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) রাসূল ﷺ -এর হাদীসের পর সাহাবীদের আমল পেশ করেছেন। যার দ্বারা আলোচ্য বিষয়টি সাহাবাদের আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়। মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাত আবূ উসাইদ (রা.)-এর গোলাম উসাইদ (রা.) স্বীয় অলিমার দাওয়াত দিলে তাতে অংশগ্রহণ করেন। হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা যায়লাঈ (র.) বলেন, হাদীসটি গরীব (غَرِيْبٌ); এ বিষয়ে মারফূ' হাদীস রয়েছে। আর তা এই–

اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِى الْجَنَائِزِ عَنْ مُسْلِمٍ الْاَعْوَرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَتْبَعُ الْجَنَازَةَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ الخ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ অসুস্থ রোগীকে দেখতে যেতেন, জানাজার পিছনে পিছনে চলতেন, গোলামের দাওয়াতে সাড়া দিতেন এবং গাধার উপর সওয়ার হতেন।

মোটকথা, উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা গোলামের হাদিয়া গ্রহণ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। যেহেতু হাদীস দ্বারাই বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়। তাই বিষয়টি اِسْتِحْسَانٌ বা সূক্ষ্ম কিয়াসের দ্বারা প্রমাণিত একথা বলার প্রয়োজন কি?

قَوْلُهُ وَلِاَنَّ فِىْ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ ضَرُوْرَةً الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলার পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন। যুক্তিটি হলো, যখন কোনো ব্যবসায়ী দোকান খুলে তখন তার দোকানে বিভিন্ন লোকজন আসা-যাওয়া করে। তারা এটা সেটা খেতে চাইতে পারে অথবা গ্রাহক ধরে রাখার জন্য খাওয়াতে হতে পারে। এমতাবস্থায় যদি তাকে কোনো কিছু হাদিয়া দেওয়া নিষেধ করে দেওয়া হয় তাহলে সে ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং হাদিয়া দেওয়া তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু সে [গোলাম] ব্যবসায়ের অনুমতি পেয়েছে অতএব, ব্যবসায়ের স্বার্থে যা জরুরি তারও অনুমতি লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَلَا ضَرُوْرَةَ فِى الْكِسْوَةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ব্যবসার স্বার্থে বা প্রয়োজনে যে হাদিয়ার দেওয়ার কথার উপরে আলোচনা করা হয়েছে, সে প্রয়োজনের মধ্যে কাপড় ও টাকাপয়সা [দিরহাম-দিনার] হাদিয়া দেওয়া আসে না। যেহেতু এগুলো প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই গোলামের জন্য এগুলো হাদিয়া দেওয়া জায়েজ নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে যে কিয়াস রয়েছে যে, "গোলাম কোনো নফল কাজ করার অধিকার রাখে না" তা-ই বহাল থাকবে।

قَالَ : وَمَنْ كَانَ فِيْ يَدِهٖ لَقِيْطٌ لَا اَبَ لَهٗ فَاِنَّهٗ يَجُوْزُ قَبْضُهُ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ لَهٗ وَاَصْلُ هٰذَا اَنَّ التَّصَرُّفَ عَلَى الصِّغَارِ اَنْوَاعٌ ثَلٰثَةٌ نَوْعٌ هُوَ مِنْ بَابِ الْوَلَايَةِ لَا يَمْلِكُهٗ اِلَّا مَنْ هُوَ وَلِيٌّ كَالْاِنْكَاحِ وَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ لِاَمْوَالِ الْقِنْيَةِ لِاَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الَّذِيْ قَامَ مَقَامَهٗ بِاِنَابَةِ الشَّرْعِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যার তত্ত্বাবধানে কোনো কুড়িয়ে পাওয়া পিতাহীন ছেলে রয়েছে, সে ব্যক্তি [তত্ত্ববধায়ক] -এর জন্য উক্ত কুড়ানো সন্তানের পক্ষে দান ও সদকা গ্রহণ করা জায়েজ। এ মাসআলার মূলনীতি হলো, নাবালেগদের উপর কর্তৃত্ব তিন ধরনের। ১. এর একপ্রকার হলো ওলায়াত (وَلَايَةٌ) -এর সাথে সম্পর্কিত। এটির অধিকার নির্ধারিত শুধুমাত্র ওলীর জন্য। যেমন বিবাহ করানো, সংরক্ষণ করা যায় এমন সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয় করা। কেননা শরিয়তের স্থলবর্তী করার মাধ্যমে ওলী উক্ত নাবালেগের স্থলবর্তী সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَمَنْ كَانَ فِىْ يَدِهٖ لَقِيْطٌ الخ : উপরের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীরের একটি মাসআলা চয়ন করেছেন।

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি রাস্তায় একটি নবজাতক কুড়িয়ে পেল। উক্ত নবজাতক তার ভবিষ্যতের বিবেচনায় لَقِيْط বা কুড়ানো সন্তান। বাহ্যিকভাবে তো এ নবজাতকের কোনো পিতা নেই। যে ব্যক্তি কুড়িয়ে পেয়েছে সেই শিশুটিকে লালনপালন করছে। এমতাবস্থায় যদি কেউ এ শিশুকে কোনো কিছু দান করে অথবা সদকা হিসেবে দেয় তাহলে যে লালনপালন করছে উক্ত দান সদকা ইত্যাদি শিশুটির অভিভাবক হিসেবে শিশুটির পক্ষ থেকে গ্রহণ করবে।

قَوْلُهٗ وَاَصْلُ هٰذَا اَنَّ التَّصَرُّفَ عَلَى الصِّغَارِ اَنْوَاعٌ ثَلٰثَةٌ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলার মূলনীতি কি সে সম্পর্কে বিবরণ শুরু করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, নাবালেগ শিশুদের উপর তিন ধরনের কর্তৃত্ব রয়েছে–

১. تَصَرُّفُ وَلَايَةٍ ২. تَصَرُّفُ ضَرُوْرَةٍ ৩. تَصَرُّفُ نَفْعٍ مَحْضٍ

تَصَرُّفُ وَلَايَةٍ বলা হয় ওলী কর্তৃক নাবালেগ শিশুর উপর কর্তৃত্বকে। স্বাভাবিকভাবেই শরিয়ত নির্ধারিত ওলী ছাড়া অন্য কেউ এ কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে না। শরিয়ত নির্ধারিত ওলী হলো পিতা, দাদা, চাচা ও তাদের অনুপস্থিতে বিচারক।

তারা বিবাহ দেওয়া, সংরক্ষণ করে রাখা যায় এমন সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করার কর্তৃত্ব লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, যে মাল পচনশীল সে মাল বিক্রি করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ওলীরও প্রয়োজন নেই।

وَنَوْعٌ اٰخَرُ مَا كَانَ مِنْ ضَرُوْرَةِ حَالِ الصِّغَارِ وَهُوَ شِرَاءُ مَا لَابُدَّ لِلصَّغِيْرِ مِنْهُ وَبَيْعُهُ وَاِجَارَةُ الْاَظْاٰرِ وَ ذٰلِكَ جَائِزٌ مِمَّنْ يَعُوْلُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ كَالْاَخِ وَالْعَمِّ وَالْاُمِّ وَالْمُلْتَقِطِ اِذَا كَانَ فِيْ حَجْرِهِمْ وَاِذَا مَلَكَ هٰؤُلَاءِ هٰذَا النَّوْعَ فَالْوَلِيُّ اَوْلٰى بِهِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيْ حَقِّ الْوَلِيِّ اَنْ يَكُوْنَ الصَّبِيُّ فِيْ حَجْرِهٖ وَنَوْعٌ ثَالِثٌ مَا هُوَ نَفْعٌ مَحْضٌ كَقَبُوْلِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَبْضِ فَهٰذَا يَمْلِكُهُ الْمُلْتَقِطُ وَالْاَخُ وَالْعَمُّ وَالصَّبِيُّ بِنَفْسِهٖ اِذَا كَانَ يَعْقِلُ لِاَنَّ اللَّائِقَ بِالْحِكْمَةِ فَتْحُ بَابِ مِثْلِهٖ نَظَرًا لِلصَّبِيِّ فَيَمْلِكُ بِالْعَقْلِ وَالْوِلَايَةِ وَالْحَجْرِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْاِنْفَاقِ ـ

অনুবাদ : ২. আরেক প্রকার কর্তৃত্ব হলো যা শৈশবের অবস্থার প্রয়োজনের নিমিত্তে সাব্যস্ত হয়। আর তা হলো শিশুর জন্য যা আবশ্যকীয় তা ক্রয় করা, বিক্রি করা ও দুধমা'কে ভাড়া নেওয়া ইত্যাদি। এগুলো যারা লালনপালন করে এবং যার উপর তার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব থাকে তাদের জন্য জায়েজ। যেমন– ভাই, চাচা, মা ও এমন ব্যক্তি যে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছে [এ কর্তৃত্ব তখনই প্রযোজ্য হবে] যখন শিশুটি তাদের প্রতিপালনে থাকবে। যখন এ ধরনের লোকেরা এরূপ কর্তৃত্বের অধিকারী তখন ওলী আরো ভালোভাবে এর অধিকারী হবে বৈ কি! তবে ওলীর ক্ষেত্রে তার প্রতিপালনে থাকা শর্ত নয়। ৩. তৃতীয় প্রকার হলো, এমন কর্তৃত্ব যাতে কেবলই লাভ। যেমন দান ও সদকা কবুল করা ও কবজ করা। এর অধিকার পায় কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি, ভাই, চাচা ও শিশু স্বয়ং যদি সে জ্ঞানসম্পন্ন হয়। কেননা হিকমতের দাবি হলো শিশুর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে এ ধরনের কর্তৃত্ব প্রয়োগের দ্বার উন্মুক্ত রাখার মধ্যে। সুতরাং জ্ঞান ও বিবেকের ভিত্তিতে [নাবলেগ বাচ্চা] অভিভাবকের দায়িত্বপালনকারী এবং লালনপালনের ভিত্তিতে প্রতিপালনকারী এ ধরনের কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। অতএব, মাসআলাটি শিশুর জন্য খরচ করার অনুরূপ হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَوْعٌ اٰخَرُ مَا كَانَ مِنْ ضَرُوْرَةِ الخ : পূর্বে নাবালেগ শিশুর উপর যে তিন ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছিল এখানে ২য় ও ৩য় প্রকার কর্তৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রথম প্রকার কর্তৃত্ব হলো নাবালেগ শিশুর অভিভাবকদের কর্তৃত্ব, যা শরিয়ত কর্তৃক ঘোষিত কয়েক প্রকার অভিভাবকের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয় প্রকারের কর্তৃত্ব تَصَرُّفٌ ضَرُوْرَةٌ অর্থাৎ শিশুর জন্য অতীব প্রয়োজনীয় কোনোকিছু ক্রয় করা অথবা শিশুর কোনো দ্রব্যাদি বিক্রয় করা। অথবা শিশু দুধের বাচ্চা, এমতাবস্থায় তার জন্য দুধ পান করাবে এমন কাউকে ভাড়া করা ইত্যাদি। শিশুর জন্য এ ধরনের অত্যাবশকীয় কাজগুলো সেই করবে যার তত্ত্বাবধানে শিশুটি থাকবে। যেমন– ভাই, চাচা, মামা, মা ও যে ব্যক্তি শিশুটিকে কুড়িয়ে পেয়েছে। তবে তারা এ ধরনের কাজ করার কর্তৃত্ব তখনই লাভ করবে যখন তারা শিশুটিকে লালনপালন করবে।

قَوْلُهُ وَاِذَا مَلَكَ هٰؤُلَاءِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি ওলী ছাড়া অন্য লালনপালনকারী ব্যক্তি নাবালেগ শিশুর এ ধরনের কর্তৃত্ব (تَصَرُّفُ ضَرُوْرَةٍ) লাভ করে তাহলে তো শিশুটির যারা অভিভাবক তারা আরো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। তবে অভিভাবক বা ওলীর এ কর্তৃত্বের প্রয়োগের জন্য শিশুটি তার তত্ত্বাবধানে থাকা শর্ত নয়; বরং শিশুটি যদি অন্য কারো তত্ত্বাবধানে থাকে তবু তার জন্য এরূপ কর্তৃত্ব প্রয়োগের অধিকার রয়েছে।

قَوْلُهُ نَوْعٌ ثَالِثٌ مَا هُوَ نَفْعٌ مَحْضٌ الخ : তৃতীয় প্রকার কর্তৃত্ব হলো যাতে শিশুটির কেবল লাভ রয়েছে। যেমন– শিশুটিকে কেউ কোনো কিছু দান করল ও সদকা করলে তা কবুল করা ও বুঝে নেওয়া। এ প্রকারের হস্তক্ষেপ ভাই, চাচা, যে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছে, এমনকি নাবালেগ বাচ্চাটি যদি বোধসম্পন্ন হয় তাহলে সে নিজেও এর অধিকারী হবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ اللَّائِقَ بِالْحِكْمَةِ فَتْحُ الخ : মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা নাবালেগ শিশুটি কিভাবে এ অধিকারী হয় তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হিকমতের দাবি হলো শিশুটির জন্য তার কল্যাণের যাবতীয় পথ অবারিত করে দেওয়া। হাদিয়া ও দান ইত্যাদির দ্বারা যে শিশুটির কল্যাণ সাধিত এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেটা গ্রহণ করার পথ যতই প্রশস্ত হবে ততই তা অধিক ফলপ্রসূ হবে। সেই পথ প্রশস্ত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই শরিয়ত নাবালেগ বোধসম্পন্ন শিশুকে তার গ্রহণ করার ও বুঝে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং এ প্রকারের কর্তৃত্ব কয়েকভাবে লাভ হয়–

১. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার দ্বারা নাবালেগের ক্ষেত্রে।

২. অভিভাবকত্বের দ্বারা অভিভাবকদের জন্য।

৩. লালনপালন করার দ্বারা যারা প্রতিপালন বা তত্ত্বাবধান করে থাকে।

এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি তার অভিভাবক না হয় এবং লালন-পালনকারীও না হয় তবু তার জন্য শিশুর পক্ষে এমন দান, উপঢৌকন ইত্যাদি গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এতে তো কেবল শিশুর উপকারিতাই বিদ্যমান। সুতরাং এটা যেন শিশুর জন্য কোনো কিছু খরচ করার মত হলো। আর খরচ করার ক্ষেত্রে যে কেউ যত ইচ্ছা খরচ করতে পারে। এতে শরিয়তের কোনো বাধা নেই।

قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ لِلْمُلْتَقِطِ اَنْ يُوَاجِرَهُ وَيَجُوْزُ لِلْاُمِّ اَنْ تُوَاجِرَ اِبْنَهَا اِذَا كَانَ فِىْ حَجْرِهَا وَلَا يَجُوْزُ لِلْعَمِّ لِاَنَّ الْاُمَّ تَمْلِكُ اَتْلَافَ مَنَافِعِهِ بِاِسْتِخْدَامِهِ وَلَا كَذٰلِكَ الْمُلْتَقِطُ وَالْعَمُّ وَلَوْ اٰجَرَ الصَّبِىُّ نَفْسَهُ لَا يَجُوْزُ لِاَنَّهُ مَشُوْبٌ بِالضَّرَرِ اِلَّا اِذَا فَرَغَ مِنَ الْعَمَلِ لِاَنَّ عِنْدَ ذٰلِكَ تَمَحَّضَ نَفْعًا فَيَجِبُ الْمُسَمّٰى وَهُوَ نَظِيْرُ الْعَبْدِ الْمَحْجُوْرِ يُوَاجِرُ نَفْسَهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কুড়িয়ে পেয়েছে তার জন্য কুড়ানো শিশুটিকে [শ্রমিক হিসেবে] ভাড়া দেওয়া জায়েজ নয়। তবে মায়ের জন্য তার ছেলেকে ভাড়া দেওয়া জায়েজ যদি ছেলেটি তার প্রতিপালনে থাকে। কিন্তু চাচার জন্য তা নাজায়েজ। কেননা মায়ের জন্য সন্তানের খেদমত নেওয়ার মাধ্যমে তার সুবিধাদি ভোগ করা জায়েজ। যে ব্যক্তি কুড়িয়ে পেয়েছে সে এবং চাচা এমন নয়। যদি কোনো নাবালেগ বাচ্চা নিজে কাজে যোগ দেয় তবুও তা জায়েজ নয়। কেননা এতে ক্ষতি মিশ্রিত আছে। কিন্তু [এতদসত্ত্বেও যদি সে কাজে যোগ দেয় এবং] যখন কাজ শেষ করে তার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক আবশ্যক হবে। কেননা কেবল তার লাভ হয়– এমন চুক্তি করা বৈধ। এটি মালিকের পক্ষ থেকে ব্যবসার অনুমতি না পাওয়া গোলামের মত, যে গোলাম তার নিজেকে খাটায়। ইতঃপূর্বে আমরা বিষয়টি আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ لِلْمُلْتَقِطِ الخ : অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে ভাড়ায় লাগিয়ে সে ভাড়া তার অভিভাবক / তত্ত্বাবধায়কের জন্য গ্রহণ করা বৈধ কিনা? সে মাসআলা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো একটি শিশুকে কুড়িয়ে পেল, অতঃপর সেই শিশুটি সে লালনপালন করল। তারপর যখন এটি কাজ করার মতো উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলো তখন উক্ত শিশুটিকে কোথাও শ্রমিক হিসেবে ভাড়া দিয়ে তার থেকে অর্জিত পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নয়। অনুরূপভাবে যদি কোনো চাচা তার ভাতিজাকে লালনপালন করে তাহলেও উক্ত চাচার জন্য ভাতিজাকে ভাড়া দিয়ে তার মূল্য ভোগ করা নাজায়েজ।

অবশ্য মায়ের বেলায় এ হুকুম ভিন্ন। অর্থাৎ কোনো মা যদি তার নাবালেগ সন্তানকে কাজ করতে দেয় অতঃপর কাজের বিনিময় হিসেবে তার সন্তান যা উপার্জন করে ভোগ করে তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে মায়ের জন্য উক্ত ছেলেকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করার পূর্বশর্ত হচ্ছে ছেলেটির লালনপালনের দায়িত্ব মায়ের দায়িত্বে হতে হবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْاُمَّ تَمْلِكُ اِتْلَافَ مَنَافِعِهِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) মায়ের জন্য তার নাবালেগ সন্তানের উপার্জন বৈধ হওয়ার পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন। যুক্তি হলো, মায়ের জন্য সন্তানের থেকে খেদমত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু চাচা বা কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির জন্য এরূপ খেদমত নেওয়ার অধিকার নেই।

যেহেতু মায়ের জন্য খেদমত নেওয়ার মাধ্যমে ছেলের যোগ্যতা ও সক্ষমতা ভোগ করার অনুমতি রয়েছে; সুতরাং মায়ের জন্য ছেলের যোগ্যতা অন্যত্র খাটিয়ে তার ভাড়া উপভোগ করাও জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ اٰجَرَ الصَّبِيُّ نَفْسَهُ لَا يَجُوْزُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি কোনো নাবালেগ বাচ্চা নিজেকে ভাড়ায় খাটানোর জন্য কোথাও উপস্থিত হয় তাহলে তাকে ভাড়ায় নেওয়া বৈধ নয়; কিন্তু তারপরেও যদি শিশুটিকে কাজে নেওয়া হয় এবং যে উক্ত কাজ সম্পাদন করে তাহলে পারিশ্রমিক তার প্রাপ্য হয়ে যায়। কেননা যেখানে তার কেবলই লাভ এমন বিষয়ে চুক্তি করা / হস্তক্ষেপ করা তার জন্য বৈধ।

قَوْلُهُ وَهُوَ نَظِيْرُ الْعَبْدِ الْمَحْجُوْرِ يُوَاجِرُ نَفْسَهُ : মুসান্নিফ এ ইবারত দ্বারা আলোচ্য মাসআলার একটি নজির পেশ করেছেন। নজির মাসআলাটি হলো, কারো অধীনে একটি গোলাম রয়েছে। গোলামটিকে সে ব্যবসা করার অনুমতি দেয়নি। সুতরাং গোলামটির জন্য নিজেকে ভাড়া হিসেবে কোথাও নিয়োগ নাজায়েজ। কিন্তু তারপরেও যদি সে কোথাও নিজেকে ভাড়া খাটায় এবং চুক্তি মোতাবেক কারো কাজ করে দেয় তাহলে কাজ করা মাত্র গোলাম ভাড়ার উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে।

জ্ঞাতব্য : ক. যে ব্যক্তি কুড়িয়ে পেয়েছে তার জন্য নাবালেগ বাচ্চাটিকে ভাড়ায় দেওয়া জায়েজ নয়। কিন্তু যদি কেউ বাচ্চাকে কাজ শেখার জন্য কোথাও দেয় তাহলে তা জায়েজ। কোনো কোনো ফকীহ উভয় মাসআলাকে এক মনে করে বাচ্চাকে ভাড়া হিসেবে দেওয়াকেও জায়েজ বলেছেন। অথচ এটা ভুল। –[সূত্র, শামী খ. ৫, পৃ. ২৫০ পুরাতন মুদ্রণ]

খ. বাবা, দাদা ও বিচারকের জন্যও নাবালেগ বাচ্চা ইজারা হিসেবে প্রদান করা জায়েজ। অবশ্য ফুফু পারবে কিনা? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

قَالَ : وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِىْ عُنُقِ عَبْدِهِ الرَّايَةَ وَيُرْوٰى الدَّايَةَ وَهُوَ طَوْقُ الْحَدِيْدِ الَّذِىْ يَمْنَعُهُ مِنْ اَنْ يُحَرِّكَ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَادٌ بَيْنَ الظَّلَمَةِ لِاَنَّهُ عُقُوْبَةُ اَهْلِ النَّارِ فَيُكْرَهُ كَالْاِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَلَا يُكْرَهُ اَنْ يُقَيِّدَهُ لِاَنَّهُ سُنَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِى السُّفَهَاءِ وَاَهْلِ الدِّعَارَةِ فَلَا يُكْرَهُ فِى الْعَبْدِ تَحَرُّزًا عَنْ اِبَاقِهِ وَصِيَانَةً لِمَالِهِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, গোলামের গলায় বিশেষ গলবন্ধ দেওয়া মাকরূহ। কোনো অনুলিপিতে اَلرَّايَةَ শব্দের স্থানে اَلدَّايَةَ শব্দটি বর্ণিত আছে। اَلرَّايَةَ হলো লোহার বেড়ি, যা তার পরিহিত ব্যক্তির মাথা নাড়তে দেয় না। অত্যাচারীদের মাঝে এরূপ বেড়ি লাগানোর প্রচলন রয়েছে। [এটা মাকরূহ হবে] কেননা, তা দোজখিদের শাস্তিদানের একটি প্রক্রিয়া। সুতরাং আগুনে জ্বালিয়ে শাস্তি দেওয়ার মতো এটাও মাকরূহ। তবে গোলামের পায়ে শিকল দিয়ে তাকে কয়েদ করা মাকরূহ নয়। কেননা বুদ্ধিহীন ও অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের এ রীতি রয়েছে। সুতরাং গোলামের ক্ষেত্রে পলায়নের থেকে রক্ষা পাওয়া ও তার মালের হেফাজতের জন্য এটা মাকরূহ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيُكْرَهُ اَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো মানুষের জন্য অন্য মানুষের গলায় বেড়ি দেওয়া নাজায়েজ, চাই সে ক্রীতদাস হোক না কেন।

পূর্বকালে জালেম সম্প্রদায়ের মাঝে গোলামদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেওয়ার অমানবিক রীতি ছিল। তারা গোলামের গলায় ভারি লোহার বেড়ি পরিয়ে দিত। উক্ত বেড়ির ভার এবং কঠিনভাবে তা লেপ্টে থাকার কারণে তারা মাথা নড়াচড়া করতে পারত না। এটি একটি অমানবিক আচরণ। তাই ইসলাম এরূপ করা নিষিদ্ধ করেছে।

তবে যদি গোলামের মালিক গোলামের ব্যাপারে আশঙ্কা করে যে, সে পালিয়ে যেতে পারে, অথবা তার মাল নিয়ে উধাও হতে পারে, বা অন্যকোনোভাবে ক্ষতি করতে পারে এমতাবস্থায় শরিয়ত গোলামের পায়ে শিকল লাগানোর অনুমতি দিয়েছে। আর গোলামের পায়ে শিকল লাগানোর রীতি পূর্বযুগে মুসলমানদের মাঝেও প্রচলিত ছিল। অতএব, বর্তমান যুগে এরূপ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

মুসান্নিফ (র.) "গলায় বেড়ি পরানো মাকরূহ কেন" তার কারণ বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, গলায় বেড়ি লাগানো জাহান্নামিদের শাস্তি দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلٰسِلَ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا .

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত আগুন। –[সূরা দাহর : ৫]

যেহেতু এটি দোজখীদের শাস্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া, তাই আগুনে পুড়িয়ে মারার মতো এটাও মাকরূহ।

উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ কোনো মানুষকে আগুনে পুরিয়ে মারতে নিষেধ করেছেন। কেননা আগুন দিয়ে জ্বালানো জাহান্নামিদের শাস্তি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : দুররে মুখতার ৫ম খণ্ড, পুরাতন ছাপার [বর্তমান দশম খণ্ড] দু'শত তিপ্পান্ন নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, গোলামের গলায় বিশেষ যে গলবন্ধ লাগানো হতো [লেখকের যুগে] তা দ্বারা উদ্দেশ্য এটা হতো যে, গোলামটির পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। লেখক বলেন, আমাদের যুগে এরূপ বেড়ি লাগানোতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ বর্তমানে গোলামদের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা খুব বেশি। বর্তমান যুগে এটা করা বরং ভালো।

আল্লামা শামী (র.) قُهُسْتَانِىْ -এর সূত্রে এরূপই বর্ণনা করেছেন। আশরাফুল হিদায়ার এ খণ্ডের লেখক মুফতি ইউসুফ সাহেব [দা. বা.] -এর মতে এ পরিস্থিতিতেও বেড়ি লাগানো মাকরূহ সাব্যস্ত হবে।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِالْحُقْنَةِ يُرِيْدُ بِهِ التَّدَاوِيْ لِأَنَّ التَّدَاوِيْ مُبَاحٌ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ وَرَدَ بِإِبَاحَتِهِ الْحَدِيْثُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمُحَرَّمَ كَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الْاِسْتِشْفَاءَ بِالْمُحَرَّمِ حَرَامٌ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ঢুস দেওয়াতে কোনো দোষ নেই, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দ্বারা চিকিৎসা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা সকলের ঐকমত্যে চিকিৎসা করা মুবাহ। এর বৈধতা সম্পর্কে হাদীস এসেছে। এ মাসআলায় নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। তবে চিকিৎসায় কোনো হারাম বস্তু তথা মদ ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা কোনো হারাম বস্তুর সাহায্যে আরোগ্য লাভে চেষ্টা করা হারাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِالْحُقْنَةِ يُرِيْدُ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, حُقْنَةٌ [ঢুস দেওয়া] অর্থাৎ গুহ্যদ্বার দিয়ে কোনো ঔষধ/পিচকারী দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এরূপ ঢুস দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং যদি কেউ মোটা হওয়ার জন্য ঢুস ব্যবহার করে তাহলে তা জায়েজ নয়।

চিকিৎসা করা শরিয়তে বৈধ; বরং মোস্তাহাব। রাসূল ﷺ -এর ছয়জন সাহাবী থেকে চিকিৎসা করা সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন– হযরত উসামা (রা.), হযরত আবুদ্দারদা (রা.), হযরত আনাস (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত আছে।

তন্মধ্যে একটি বিখ্যাত হাদীস হলো–

فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ دَوَاءً إِلَّا الْمَوْتُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ .

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু রোগ ছাড়া প্রত্যেক রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। সাহাবীগণ রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যা দান করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বস্তু কি? তিনি বললেন, উত্তম চরিত্র।' হাদীসটি দ্বারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিরাট একটি মূলনীতি এই পাওয়া যায় যে, কোনো রোগ এমন নেই, যার ঔষধ আল্লাহ সৃষ্টি করেননি। এর দ্বারা রোগসমূহের ঔষধ অনুসন্ধান করার প্রতি আল্লাহর ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ঢুস ও অন্যান্য চিকিৎসা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই।

মুসান্নিফ (র.) আরো বলেন, চিকিৎসার স্বার্থে কোনো হারাম দ্রব্যাদি ব্যবহার করা বৈধ নয়। কেননা হারাম কোনো দ্রব্য দ্বারা আরোগ্য লাভ করার চেষ্টা করাও হারাম।

জ্ঞাতব্য : কোনো রোগের চিকিৎসা হিসেবে রক্ত ও পেশাব পান করা এবং মৃত জন্তু খাওয়াও জায়েজ যদি কোনো অভিজ্ঞ মুসলমান ডাক্তার এ ব্যবস্থাপত্র দেয় যে, উক্ত রোগের আরোগ্য এতেই, সেই সাথে কোনো বৈধ বস্তু যদি এর স্থলবর্তী সাব্যস্ত না হয়। তবে যদি কোনো বৈধ বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা যায় তাহলে এসব হারাম দ্রব্য ব্যবহারের অবকাশ থাকবে না।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِرِزْقِ الْقَاضِى لِاَنَّهُ عَلَيْهِ بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ اُسَيْدٍ اِلَى مَكَّةَ وَفَرَضَ لَهُ وَبَعَثَ عَلِيًّا اِلَى الْيَمَنِ وَفَرَضَ لَهُ وَلِاَنَّهُ مَحْبُوْسٌ لِحَقِّ الْمُسْلِمِيْنَ فَتَكُوْنُ نَفَقَتُهُ فِىْ مَالِهِمْ وَهُوَ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ وَهٰذَا لِاَنَّ الْحَبْسَ مِنْ اَسْبَابِ النَّفَقَةِ كَمَا فِى الْوَصِىِّ وَالْمُضَارِبِ اِذَا سَافَرَ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَهٰذَا فِيْمَا يَكُوْنُ كِفَايَةً فَاِنْ كَانَ شَرْطًا فَهُوَ حَرَامٌ لِاَنَّهُ اِسْتِيْجَارٌ عَلَى الطَّاعَةِ اِذِ الْقَضَاءُ طَاعَةٌ بَلْ هٰذَا هُوَ اَفْضَلُهَا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বিচারকের জন্য ভাতা নির্ধারণ করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা রাসূল ﷺ হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণ করে তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং হযরত আলী (রা.)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করে তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছেন। তাছাড়া বিচারক মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকেন। সুতরাং তা ব্যয় নির্বাহ জনগণের মালের মধ্যে হবে। তাদের মাল হলো বায়তুল মাল [রাষ্ট্রীয় কোষাগারের মাল]। তাদের মালে তার ব্যয় এ কারণে নির্বাহ করা হবে যে, কাউকে কোনো কাজে ব্যাপৃত রাখা এমন এক বিষয় যা ব্যয় নির্বাহ করার সববের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অছির খোরপোশ দিতে হয় এবং মুযারিব যখন সফর করে তার ব্যয়ও মুযারাবার মাল থেকে নির্বাহ করতে হয়। এ ভাতা হবে প্রয়োজন অনুপাতে। যদি এ ভাতার শর্ত করা হয় তাহলে তা হারাম। কেননা তখন নেক কাজের বিনিময়ে ভাতা গ্রহণ করার পর্যায়ে গণ্য হবে। কারণ বিচারকার্য সম্পাদন করা একটি ইবাদত; বরং এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِرِزْقِ الْقَاضِىْ الخ : চলমান ইবারতে বিচারকের জন্য ভাতা নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বিচারকের জন্য ভাতা নির্ধারণ করাতে কোনো দোষ নেই। যিনি আমীরুল মুসলিমীন বা সরকার প্রধান হবেন তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিচারকদের ভাতা নির্ধারণ করবেন।

এ মাসআলার দলিল হলো, রাসূল ﷺ হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা.)-কে মক্কা নগরীর বিচারক নিয়োগ করে তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা.)-কে ইয়েমেনের বিচারক নিযুক্ত করে তার জন্যও বিশেষ ভাতা নির্ধারণ করেন। অবশ্য যেহেতু সে সময়ে বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার গঠন করা হয়নি তাই রাসূল ﷺ তার নিজ মাল থেকে তাদের ভাতার ব্যবস্থা করেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত আত্তাব (রা.)-কে যে, রাসূল ﷺ মক্কার আমেল নিযুক্ত করেছিলেন এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস রয়েছে। কিন্তু তার জন্য রাসূল ﷺ ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন কিনা? এ বিষয়ে মুহাদ্দিসীন এর মাঝে ইখতিলাফ পাওয়া যায়।

আল্লামা যায়লাঈ (র.) বলেন, ভাতা নির্ধারণ করার বিষয়টি "গরীব"। তিনি আহনাফের ইমামগণের পক্ষ থেকে ইমাম বায়হাকী (র.)-এর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। হাদীসটি এই–

عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ عَتَّابَ بْنَ اُسَيْدٍ (رض) عَلٰى مَكَّةَ وَفَرَضَ لَهُ عُمَالَتَهُ اَرْبَعِيْنَ اُوْقِيَةً مِنْ فِضَّةٍ ـ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ হযরত আত্তাব (রা.)-কে মক্কা শরীফের আমেল [দায়িত্বশীল] নিয়োগ করেন এবং তার ভাতা নির্ধারণ করেন রুপার চল্লিশ উকিয়্যাহ।

হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা আইনী (র.) মন্তব্য করে বলেন, এ হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কেননা যে ব্যক্তি কোনো কাজে ব্যস্ত হয় সে তার ও তার পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের সে মুখাপেক্ষী হবে। যদি তার কাজের বিনিময়ে রিজিক না দেওয়া হয়, তাহলে মাল হালাক হবে। তখন কোনো ব্যক্তি এ ধরনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে রাজি হবে না। ফলে মুসলমানদের জরুরি বিষয়গুলো দেখাশুনা করার মতো কেউ থাকবে না। আলোচ্য বিষয়টি সহীহ হওয়ার দলিল হলো ইমাম বুখারী (র.) শাসকদের ভাতা সম্পর্কে একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

প্রখ্যাত কাজি [বিচারক] ইমাম শুরাইহ (র.) তাঁর বিচারকার্যের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। –[বিনায়া খ. ১১, পৃ. ৩০৮]

قَوْلُهُ وَلِاَنَّهُ مَحْبُوْسٌ لِحَقِّ الْمُسْلِمِيْنَ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) যৌক্তিক দলিল পেশ করছেন। তা হলো, বিচারক মুসলমানদের অধিকার, বিশেষত জানমালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় বিচারকার্যের মাধ্যমে দেখাশুনা করেন। সুতরাং তার ভরণপোষণের দায়িত্ব মুসলমানদের মালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। মুসলমানদের মাল রাষ্ট্রীয় কোষাগার [বায়তুল মাল]-এর মাল। সুতরাং বায়তুল মাল থেকে বিচারকের খরচ নির্বাহ করা হবে।

বায়তুল মাল থেকে বিচারকের ভাতা ব্যবস্থা করার যুক্তি এই যে, কারো স্বার্থে ব্যস্ত হওয়া তার পক্ষ থেকে খরচ পাওয়ার উপযুক্ত তার সববসমূহের একটি সবব। যেমন, অছি [এতিমের অভিভাবক] যখন এতিমের মালের দেখাশুনা করে এবং তার সময় ব্যয় করে তখন অছির জন্য এতিমের মাল থেকে প্রয়োজনানুপাতে খরচ নেওয়া জায়েজ। অনুরূপভাবে মুযারিব [যে অন্যের মূলধন নিয়ে নিজ অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রম দিয়ে ব্যবসা করে] -এর জন্য মুযারাবার মাল নিয়ে সফর করা অবস্থায় তার প্রয়োজনীয় খরচ মুযারাবার মাল থেকে নেওয়া জায়েজ।

মোটকথা যখন কোনো ব্যক্তি কারো স্বার্থে নিজেকে নিযুক্ত করে তখন ঐ ব্যক্তির জন্য যার স্বার্থে নিজেকে নিয়োগ করেছে তার মাল থেকে ভাতা নেওয়া বা প্রয়োজন-পূরণ করার জন্য খরচ নেওয়া জায়েজ। এ মূলনীতির ভিত্তিতে বিচারকের জন্য বায়তুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ করা জায়েজ।

তবে বিচারকের ভাতা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, আমির/রাষ্ট্রপ্রধান বিচারক নিয়োগ দেবেন শর্তহীনভাবে। অতঃপর বিচারকের চাহিদা অনুপাতে ভাতা নির্ধারণ করবেন।

যদি বিচারক দায়িত্বগ্রহণের পূর্বে এরূপ শর্ত দেয় যে, আমাকে মাসিক এত টাকা ভাতা দিতে হবে তাহলে তা হারাম হবে। কারণ তখন এটা ইবাদতের বিনিময়ে ভাতা গ্রহণ করা সাব্যস্ত হবে, অথচ ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা হারাম। আর বিচারকার্য সর্বোত্তম ইবাদতসমূহের একটি।

জ্ঞাতব্য : ক. হিদায়ার আলোচ্য মাসআলা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা হানাফীদের মতে হারাম। আধুনিক কালের ইমামগণ প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে সকল ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ বৈধ সাব্যস্ত করেছেন সেগুলো হলো এমন ইবাদত যার অপরিহার্যতা সর্বজনবিদিত। যেমন– পবিত্র কুরআনের তালীম, মাসাইলের তালীম, আযান-ইকামত ও ইমামত।

খ. বর্তমানযুগে কুরআন তেলাওয়াতের বিনিময় গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় কুরআনের হাফেজগণ কুরআন শুনিয়ে বিনিময় গ্রহণ করেন। এটা নিশ্চিতভাবে হারাম।

ثُمَّ الْقَاضِيْ إِذَا كَانَ فَقِيْرًا فَالْأَفْضَلُ بَلِ الْوَاجِبُ الْأَخْذُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إِقَامَةُ فَرْضِ
الْقَضَاءِ إِلَّا بِهِ إِذِ الْاِشْتِغَالُ بِالْكَسْبِ يُقْعِدُهُ عَنْ إِقَامَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَالْأَفْضَلُ
الْاِمْتِنَاعُ عَلَى مَا قِيْلَ رِفْقًا بِبَيْتِ الْمَالِ وَقِيْلَ الْأَخْذُ وَهُوَ الْأَصَحُّ صِيَانَةً لِلْقَضَاءِ
عَنِ الْهَوَانِ وَنَظَرًا لِمَنْ يُوَلّٰى بَعْدَهُ مِنَ الْمُحْتَاجِيْنَ لِأَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ زَمَانًا يَتَعَذَّرُ
إِعَادَتُهُ ثُمَّ تَسْمِيَتُهُ رِزْقًا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ وَقَدْ جَرَى الرَّسْمُ بِإِعْطَائِهِ فِيْ
أَوَّلِ السَّنَةِ لِأَنَّ الْخَرَاجَ يُؤْخَذُ فِيْ أَوَّلِ السَّنَةِ وَهُوَ يُعْطٰى مِنْهُ وَفِيْ زَمَانِنَا الْخَرَاجُ
يُؤْخَذُ فِيْ أٰخِرِ السَّنَةِ وَالْمَأْخُوْذُ مِنَ الْخَرَاجِ خَرَاجُ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَلَوْ
اُسْتُوْفِيَ رِزْقُ سَنَةٍ وَعُزِلَ قَبْلَ اِسْتِكْمَالِهَا قِيْلَ هُوَ عَلَى اِخْتِلَافٍ مَعْرُوْفٍ فِيْ نَفَقَةِ
الْمَرْأَةِ وَإِذَا مَاتَتْ فِي السَّنَةِ بَعْدَ اِسْتِعْجَالِ نَفَقَةِ السَّنَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ .

অনুবাদ : অতঃপর বিচারক যদি দরিদ্র হন তাহলে উত্তম বরং ওয়াজিব হলো বিনিময় গ্রহণ করা। কেননা তার পক্ষে বিচারকার্যের দায়িত্ব পরিচালনা করা বিনিময় গ্রহণ ছাড়া সম্ভবই নয়। কারণ অর্থ উপার্জনের ব্যস্ততা তাকে দায়িত্বপালনে অক্ষম করে দেবে। আর যদি তিনি [বিচারক] ধনী হন তাহলে কোনো কোনো ফকীহের মতে উত্তম হলো বিনিময় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা- বায়তুল মালের প্রতি লক্ষ্য করে। আর কেউ কেউ বলেন, বিনিময় গ্রহণ করা উত্তম এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। বিচারকার্যকে সাধারণ বিষয়ে পরিগণিত হওয়া থেকে রক্ষা করার এবং পরবর্তীতে অভাবী কাউকে উক্ত পদে নিয়োগ দানের পথ খোলা রাখার স্বার্থে। কেননা কিছুকাল ভাতা প্রদান বন্ধ থাকার পর এটিকে পুনরায় জারি করা কষ্টকর। অতঃপর লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ইবারতে এ [ভাতা] -কে رِزْق [রিযক] করে নামকরণ এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, ভাতা প্রয়োজনানুপাতে হবে। বছরের শুরুতে বিচারকের ভাতা প্রদান করার প্রচলন চলে আসছে [আগ থেকে]। কেননা কর আদায় করা হয় বছরের শুরুতে। আর ভাতা প্রদান করা হয় কর বা রাজস্ব থেকে। আমাদের যুগে কর আদায় করা হয় বছরের শেষে। অবশ্য যে কর আদায় করা হয় তা বিগত বছরের কর [রাজস্ব]। এটাই সহীহ। যদি কোনো বিচারককে এক বছরের ভাতা দিয়ে দেওয়া হয় অতঃপর বছর পুরো হওয়ার আগে যদি তাকে বরখাস্ত করা হয়। তাহলে এর বিধান কি হবে? এ নিয়ে একই ধরনের মতবিরোধ রয়েছে, যেমন মতবিরোধ আছে স্ত্রীকে পুরো এক বছরের খোরপোশ দেওয়ার পর বছর পুরো হওয়ার আগে যদি সে মারা যায়। [অর্থাৎ সেই মাসআলায় যে ইখতিলাফ আলোচ্য মাসআলায় একই ইখতিলাফ বিদ্যমান] তবে বিশুদ্ধতম মত হলো, অবশিষ্ট ভাতা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْقَاضِىْ إِذَا كَانَ فَقِيْرًا الخ : চলমান ইবারতে পূর্বে উল্লিখিত বিচারকের ভাতা নির্ধারণ প্রসঙ্গে যে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছিল তারই অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি কাজি অর্থাৎ বিচারক দরিদ্র হন তাহলে বায়তুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ করা তার জন্য ওয়াজিব।

দরিদ্র হওয়ার অর্থ হলো যার এমন কোনো স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি নেই যার সাহায্যে সংসারের খরচ নির্বাহ করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খলিফা নিযুক্ত হোন। খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর একদিন প্রত্যুষে কাপড়ের বোঝা নিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন [হযরত আবূ বকর (রা.) একজন কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন] পথিমধ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। হযরত ওমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, খলিফা ! আপনি কোথায় চলেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, কাপড়ের বাজারে। আমার সংসারের খরচ নির্বাহের জন্য সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন। হযরত ওমর (রা.) তাঁকে বাজারে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করে বললেন, আপনি ব্যবসা করলে এ বিরাট ইসলামি সাম্রাজ্য সামলাবে কে? অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে হযরত আবূ বকর (রা.) -এর জন্য বাইতুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করা হয়। তাঁকে প্রতিদিন এক দিরহাম করে ভাতা দেওয়া হতো। হযরতের ইন্তেকালের সময় হলে তিনি পরিবারের লোকদের বলেন, তোমাদের কাছে যা আছে সব বায়তুল মালে জমা দাও!

আলোচ্য ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যে বিচারকের আর্থিক সঙ্গতি কম, তার জন্য বায়তুল মাল থেকে ভাতা বরাদ্দ করা উচিত, যাতে তিনি নির্বিঘ্নে বিচারকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَالْأَفْضَلُ الخ : আর যদি বিচারক ধনী হয় তাহলে তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হবে কিনা? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহের মতে বায়তুল মালের প্রবৃদ্ধির প্রতি খেয়াল করে উক্ত ধনী বিচারকের জন্য কোনো ভাতা নির্ধারণ করা হবে না।

অন্যরা বলেন, বায়তুল মাল থেকে ভাতা নেওয়া উত্তম। এ মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। এর কারণ ব্যাখ্যা করে মুসান্নিফ (র.) বলেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়। যদি বিচারকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য কোনো ভাতা নির্ধারণ না করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ এ পদটিকে তুচ্ছ মনে করবে। অথচ বিচারকার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন কাজ।

দ্বিতীয় যুক্তি হলো, বর্তমান বিচারক যদিও আর্থিকভাবে সচ্ছল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে এমন বিচারক নিয়োগ হতে পারেন যিনি আর্থিকভাবে ততটা সচ্ছল নন। বর্তমানে যদি উক্ত পদের জন্য ভাতা নির্ধারণ না করা হয় পরবর্তীতে ভাতা নির্ধারণ করা কষ্ট হয়ে যাবে অথবা এতে বিলম্ব হবে, আর তাতে করে বিচার ব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে। অথচ বিচার ব্যবস্থায় অচলাবস্থা দেশের ও জনগণের জন্য বিরাট ক্ষতিকর। এজন্য বিচারক ধনী ও সচ্ছল হলেও তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করাই অধিকতর শ্রেয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ تَسْمِيَتُهُ رِزْقًا تَدُلُّ عَلٰى أَنَّهُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল ইবারতের একটি শব্দের বিশ্লেষণ করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে لَا بَأْسَ بِرِزْقِ الْقَاضِىْ -এর মধ্যে رِزْق শব্দটি ব্যবহার করে তিনি এ ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, এ ভাতা প্রয়োজনানুপাতে হবে। কারণ রিজিক বলা হয় মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রকে।

قَوْلُهُ وَقَدْ جَرَى الرَّسْمُ بِاعْطَائِهِ الخ : উপরের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) বিচারকদের ভাতা কিভাবে ও কখন দেওয়া হবে তা আলোচনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্ব থেকে এ প্রচলন চলে আসছে যে, বছরের প্রারম্ভেই বিচারকগণের পুরো বছরের ভাতা একসাথে দিয়ে দেওয়া হয়।। কেননা বিচারকগণের ভাতা দেওয়া হয় খারাজ বা ভূমি কর থেকে। [বর্তমান যুগে একে কর বা রাজস্ব বলা হয়।] রাজস্ব বা কর বছরের শুরুতে আদায় করা হতো বিধায় বিচারকগণের ভাতাও বছরের প্রারম্ভে আদায় করার রীতি পূর্ব থেকে চলে আসছে।

قَوْلُهُ وَفِيْ زَمَانِنَا الْخِرَاجُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের যুগে কর আদায় করা হয় বছরান্তে। অতএব, বিচারকগণের ভাতাও বছরের শেষেই প্রদান করা হবে। অবশ্য বছরের শেষে যে কর আদায় করা হয় তা বিগত বছরের কর। এটাই সহীহ অভিমত।

قَوْلُهُ وَلَوِ اسْتَوْفَى رِزْقَ سَنَةٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি কোনো বিচারকের পুরো বছরের ভাতা দিয়ে দেওয়া হয় [যেমন পূর্বে এরূপ রীতিই চালু ছিল] অতঃপর কোনো কারণে বিচারক বছরের মাঝে বরখাস্ত হন তাহলে অগ্রীম প্রদানকৃত ভাতার কি হবে? এ ব্যাপারে মুসান্নিফ (র.) দুটি জবাব দিয়েছেন। প্রথম জবাব হলো, এ মাসআলায় ইখতিলাফ আছে। এ মাসআলার ইখতিলাফ "ইতঃপূর্বে বর্ণিত স্ত্রীর খোরপোশ অগ্রীম প্রদান করার পর বছরের মাঝে স্ত্রী মারা গেলে বাকি খোরপোশ ফেরত দিতে হবে কিনা" সেই ইখতিলাফের মতো। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী অগ্রীম খোরপোশ নেওয়ার পর বছরের মাঝে যদি মারা যায় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বছর পুরো হতে যে কয়মাস বাকি আছে সে কয়মাসের খোরপোশ ফেরত দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো স্ত্রীকে তার স্বামী বছরে ১২০০ বারশত টাকা ভাতা দেয়। এমতাবস্থায় ৭ মাস যাওয়ার পর যদি স্ত্রী মারা যায় তাহলে অবশিষ্ট পাঁচমাসের ৫শত টাকা ফেরত দিতে হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত হলো অবশিষ্ট মাসগুলো খোরপোশ ফেরত দেওয়া আবশ্যক নয়। এ বিষয়ে ফতোয়া ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের উপরই।

স্ত্রীর খোরপোশের মাসআলার ইখতিলাফ যেহেতু জানা হলো সুতরাং বিচারকের অগ্রীম গ্রহণ করা ভাতার অবশিষ্টাংশ বরখাস্ত হওয়ার পর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতানুযায়ী ফেরত দেওয়া ওয়াজিব, আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর সাথে।

قَوْلُهُ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলায় বর্ণিত দ্বিতীয় মতটি উল্লেখ করেছেন। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। আর তা হলো বিচারক যদি বছরের অগ্রীম বেতন-ভাতা নেওয়ার পর বছরের মাঝে বরখাস্ত হন তাহলে বরখাস্ত হওয়ার পর অবশিষ্ট যে কয় মাস থাকে সে মাসগুলোর ভাতা / বেতন ফেরত দেওয়া ওয়াজিব।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ اَنْ تُسَافِرَ الْاَمَةُ وَاُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ لِاَنَّ الْاَجَانِبَ فِىْ حَقِّ الْاِمَاءِ فِيْمَا يَرْجِعُ اِلَى النَّظْرِ وَالْمَسِّ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَارِمِ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُمُّ الْوَلَدِ اَمَةٌ لِقِيَامِ الْمِلْكِ فِيْهَا وَاِنِ امْتَنَعَ بَيْعُهَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) [জামিউস সাগীরে] উল্লেখ করেছেন যে, দাসী ও উম্মে ওয়ালাদের জন্য মাহরাম ছাড়া সফর করাতে কোনো বাধা নেই। কেননা দাসীর জন্য পরপুরুষ মাহরাম আত্মীয়ের মতো দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ করার ক্ষেত্রে, ইতিপূর্বে আমরা যা উল্লেখ করেছি সে অনুযায়ী। উম্মে ওয়ালাদও ক্রীতদাসীর মতো। কেননা তাতে মনিবের মালিকানা এখনো বিদ্যমান, যদিও তাকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ সঠিক বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ اَنْ تُسَافِرَ الْاَمَةُ الخ : ইতঃপূর্বে اِسْتِبْرَاءٌ-এর আলোচনায় বলা হয়েছে যে, দাসীর সাথে নির্জনে অবস্থান করা ও সফর করা বৈধ, যেমন মাহরামদের সাথে সফর করা বৈধ। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পরপুরুষের সামনে দাসী মাহরাম মহিলার মতো। অর্থাৎ মাহরামের যেসব অঙ্গ দেখা যায় ও ছোঁয়া যায় দাসীরও সেসব অঙ্গ দেখা ও স্পর্শ করা যায়। যেহেতু পরপুরুষের সামনে মাহরামের মতো তাই দাসীর সফরের মধ্যে মাহরামের প্রয়োজন নেই।

উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে যেহেতু মনিবের মালিকানা পুরো রয়েছে তাই তার বিধানও দাসীর মতোই। অবশ্য উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা যায় না তার মধ্যে আজাদি চলে আসার কারণে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ এবং মহাজ্ঞানী।